চিতা বহ্নিমান
স্বাক্ষর
চরণ দিলাম রাঙায়ে
দীপ চাহে শিখা
জীবন-রুদ্র
মহারুদ্র
ভাগীরথী বহে ধীরে
মেঘ-মেদুর

ফাল্গুনী অমনিবাস

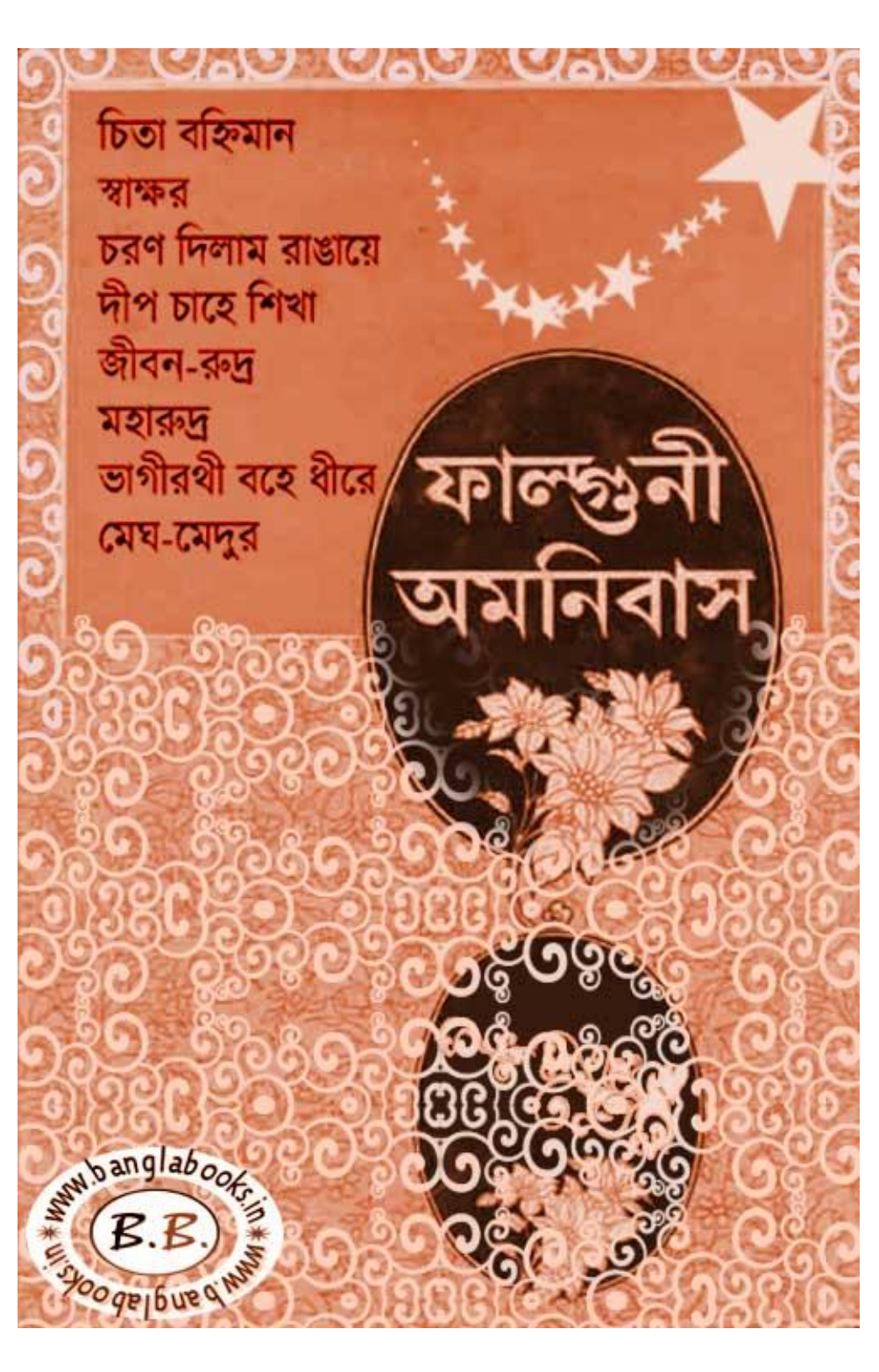

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get More
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.banglabooks.in

Click here

ফাল্গুনী অমনিবাস

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৭০

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত
মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন্ সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৩৭-বি বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীপ্রদোষকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত

ফাল্গুনী অমনিবাস

সূচীপত্র

চিতা বহ্নিমান
স্বাক্ষর
চরণ দিলাম রাঙায়ে
দীপ চাহে শিখা
জীবন-রুদ্র
মহারুদ্র
ভাগীরথী বহে ধীরে
মেঘ-মেদুর

চিতা বহ্নিমান

তপতী বড় হইয়া উঠিল।

মেয়েদের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আধুনিক যুগে অবশ্য কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই, তথাপি একমাত্র কন্যার বিবাহটা একটু শীঘ্রই দিবার ইচ্ছা মিঃ শঙ্কর চ্যাটার্জির। সম্বন্ধও পাকা এবং দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে। বাকি শুধু বিবাহটার।

তপতী এবার বি-এ পরীক্ষা দিবে, তাহারই জন্য ব্যস্ত সে। বিবাহের নামে বাঙালী মেয়েরা যেরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তপতীর তাহা কিছুই হয় নাই। কেন হয় নাই, জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে—বাপ-মা'র হাতের দেওয়া অনিবার্য শাস্তি যখন লইতেই হইবে, তখন ভাবিয়া লাভ কি! বিয়েটা হইয়া গেলেই আনন্দ-বা-নিরানন্দ যাহোক একটা করা যাইবে। এখন পরীক্ষার পড়াটা করা যাক্।

কিন্তু ইহাতে ভাবিবার কিছুই নাই। তপতীর জন্য ভদ্রবংশের জনৈক শিক্ষিত এবং সুন্দর যুবক প্রস্তুত হইতেছেন। আর তপতী তাঁহাকে দেখিয়াছেও। বিবাহের পর যুবকটিকে বিলাত পাঠানো হইবে পূর্তবিদ্যা শিখিবার জন্য, ইহাই মিষ্টার এবং মিসেস চ্যাটার্জির ইচ্ছা।

এই তপতী—শিক্ষিতা, আধুনিকা এবং প্রগতিবাদিনী। উহাকে লাভ করিবার জন্য সোসাইটির কোন্ যুবক না সচেষ্ট। দিনের পর দিন তপতীকে ঘিরিয়া তাহারা গুঞ্জন তুলিয়াছে, গান করিয়াছে, গবেষণা করিয়াছে তপতীর ভবিষ্যৎ লইয়া। হ্যাঁ, তপতী অনিন্দ্যা, অনবদ্যাঙ্গী, অসাধারণীয়া। কিন্তু এহেন তপতীকে লাভ করিবে মাত্র একজন, ইহা সহ্য করা অপরের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু উপায় কি, ধনী পিতা তাহার, যাহাকে উপযুক্ত মনে করিবেন, তাহারই হাতে কন্যা দান করিবেন। অপরের তাহাতে কি বলিবার থাকিতে পারে।

মিঃ চ্যাটার্জির 'তপতী-নিবাস' নামক নবনির্মিত বিশাল প্রাসাদে মহাসমারোহে বিবাহোদ্যোগ চলিতেছে। বর এখনো আসিয়া পৌঁছায় নাই, কিন্তু বরযাত্রীগণ প্রায় অনেকেই আসিয়াছেন এবং খাইতেছেন। রাত্রি প্রায় দশটা, অতি মলিন বেশ ছেঁড়া একটা কামিজ গায়ে মাথার চুল সম্পূর্ণভাবে মুণ্ডিত একটি যুবক আসিয়া মিঃ চ্যাটার্জির সহিত দেখা করিতে চাহিল। বিবাহ সভায় এরূপ অতিথি কেই বা পছন্দ করে! কিন্তু যুবক দেখা করিবেই।

মিঃ চ্যাটার্জি কন্যা সম্প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তথাপি যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিজেই খাসকামরায় নামিয়া আসিলেন।

একখানি জীর্ণ দলিল বাহির করিয়া যুবক বলিল,—আমার বাবার বাক্সে এই দলিলখানি পেয়েছি, এটা আপনার—আর সম্ভবত দরকারী। দয়া করে গ্রহণ করুন। মিঃ চ্যাটার্জি বিস্মিত হইয়া বলিলেন ;—তুমি মহাদেবের ছেলে? এত বড়ো হয়েছ! বসো বাবা, আজ আমার মেয়ের বিয়ে, এখানেই খেয়ে যাবে।

—আমার কিন্তু অন্যত্র কাজ ছিল। যুবক সবিনয়ে জানাইল।

—তা থাক, কাজ অন্যদিন করবে, বসো।

মিঃ চ্যাটার্জি দলিলখানি গ্রহণ করিলেন। সত্যই দরকারী দলিল। যুবককে আর একবার বাসিতে অনুরোধ করিয়া তিনি ভেতরে গেলেন।

বর আসিয়াছে এবং বরের পিতা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মিঃ চ্যাটার্জি আসিতেই তিনি বলিলেন,—

—পণ-এর টাকাটা আমায় দিন, তারপর ছেলে আপনার, যা-খুসি করবেন তাকে নিয়ে।

—হ্যাঁ, বেয়াই-মশাই, কাল পরশুই আপনার টাকাটা দিয়ে দেবো।

—কেন? আজই দিয়ে ফেলুন না! ছেলেতো আমি বেচেই দিচ্ছি। নগদ কারবারই ভালো।

—এ রকম কথা কেন বলছেন বেয়াই-মশাই। মিঃ চ্যাটার্জি অত্যন্ত আহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

—বলছি যে আমায় যে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবার কথা সেটা দিয়ে ছেলেকে আপনার নিজস্ব করে নিন, আমি নগদ কারবারই ভালবাসি।

—কিন্তু আজই তো দেবার কথা নয়। আর এই রাত্রে অত টাকা কি করে দেওয়া যাবে বলুন! নগদ টাকাটা কাল নিলে কি ক্ষতি হবে আপনার!

—ওসব চলবে না চাটুজ্যেমশাই, টাকা না পেলে আমি পাত্র উঠিয়ে নিয়ে যাবো।

—উঠিয়ে নিয়ে যাবেন?

বিরাট বিবাহ সভা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সভা, শিক্ষিত সমাজে এরূপ একটা কাণ্ড ঘটিতে পারে, কেহ কল্পনাও করে নাই। মিঃ চ্যাটার্জি রুদ্ধ-রোষ দমন করিয়া বলিলেন—আচ্ছা, যান উঠিয়ে নিয়ে, টাকা দেবো না।

—হেমেন—চলে এসো—বলিয়া বরকর্তা ডাক দিলেন। বর তৎক্ষণাৎ সুড়সুড় করিয়া উঠিয়া আসিল। বরকর্তা মিঃ চ্যাটার্জিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—ফাঁকি দিয়ে বিয়েটি সেরে নিয়ে কাল উনি আমায় কলা দেখাবেন। ওসব চলবে না, চাটুজ্যেমশাই, আমার পণ-এর টাকাটা ফেলে দিয়ে মেয়ে জামাই নিয়ে যা ইচ্ছে করুন! আপনি তো ধনী, টাকাটা না-দেবার কি কারণ থাকতে পারে?

—টাকা দেবো না! মিঃ চ্যাটার্জি সরোষে বলিয়া উঠিলেন।

—আচ্ছা, তাহলে—হেমেন, চলে এসো!

বর ও বরকর্তা উঠিয়া গেলেন। সভাস্থ সকলে "আঃ কি করেন ঘোষাল মশাই, বসুন", বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি দারোয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন,—ওঁরা বেরিয়ে গেছেন? বেশ, গেট বন্ধ করে দাও আর যেন না ঢোকেন।

সকলে অবাক হইয়া গেল। মিঃ চ্যাটার্জি খাসকামরায় আসিয়া ডাকিলেন—তোমার বিয়ে এখনো হয়নি তো বাবা?

—আজ্ঞে না। কেন?

—এসো তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা ছিল, তোমাকে আমার জামাই করবো। এতদিন ভুলে ছিলুম, তাই ঈশ্বর আজ ঠিক দিনটিতে তোমায় পাঠিয়েছেন। এসো বাবা।

—আমি? আমি কি আপনার মেয়ের যোগ্য?

—নিশ্চয়! তুমিই তার যোগ্য।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অসামান্যা সোসাইটি গার্ল তপতী চ্যাটার্জির সহিত এক নিতান্ত দীনহীন ব্রাহ্মণ যুবকের বিবাহ হইয়া গেল।

তপতীর পুরুষ বন্ধুরা, যাহারা কৌশলে এই বিবাহ পণ্ড করিবার জন্য ঘোষাল মহাশয়কে টাকা চাহিতে বলিয়াছিল, বুঝাইয়াছিল যে মিঃ চ্যাটার্জির মতলব ভাল নয়।—তাঁহারা নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিল, তপতীকে গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের কাহাকেও ডাকা হইল না। সব আশায় তাহাদের ছাই পড়িল দেখিয়া তাহারা মুণ্ডিত মস্তক, রৌদ্রদগ্ধ গোবেচারী বরের মুণ্ডপাত করিয়া ঘরে ফিরিল। কিন্তু নিশ্চিন্ত রইল না।

পরদিন সকালে কুশণ্ডিকার পর বরকে জিজ্ঞাসা করা হইল—বাবাজি কতদূর পড়াশুনো করেছো? উত্তরে তপনজ্যোতি জানাইল, অকালে বিতৃবিয়োগ হওয়ায় স্কুল হইতে তাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অবশ্য নিজে বাড়ীতে সে তাহার পর যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়ার চর্চা করিয়াছে। পিতৃবিয়োগের পরবৎসরই মাতৃবিয়োগ হওয়ায় সে অনাথ হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সম্প্রতি গয়ায় পিতৃতর্পণ শেষ করিবার সময় পিতার বাক্সের কাগজপত্রাদি নদীর জলে বিসর্জন দিতে গিয়া মিঃ চ্যাটার্জির দলিলখানি দেখিতে পায় এবং উহাই তাহাকে এখানে আসিতে বাধ্য করে।

শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। তপতী চ্যাটার্জির মতো সুন্দরী শিক্ষিতা বি-এ পড়া মেয়ের এই কি উপযুক্ত বর! মেয়েরা নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন, পুরুষেরা সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, যা হবার হয়ে গেছে—ওকে তো আর চাকরী করতে হবে না। সই করতে পারলেই চলে যাবে। তপতীর সমবয়সী বন্ধুগণ সামনে সহানুভূতি জানাইয়া অন্তরালে বলিল,—আচ্ছা হয়েছে! যেমন অহঙ্কারী মেয়ে!

তপতী নিজে কিছুই বলিল না। গত রাত্রে ব্যাপারটার আকস্মিকতা তাহাকে প্রায় বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, বরের সহিত আলাপ করা হইয়া উঠে নাই। পিতা তাহাকে নিশ্চয়ই অযোগ্যের হাতে দিবেন না, এই বিশ্বাসই তাহার ছিল, আজ কিন্তু সমস্ত শুনিয়া পিতার বিরুদ্ধে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু এখন আর কিছুই করিবার নাই।

মিঃ চ্যাটার্জি ও মিসেস চ্যাটার্জি দুঃখিত হইলেন। জিদের বসে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য অনুতপ্ত হইলেন, কিন্তু নিরুপায়ের সান্ত্বনা স্বরূপ তিনি ভাবিলেন, তাঁহার জামাতাকে তো কেরাণীগিরি করিতে হইবে না। নাইবা হইল সে বি-এ, এম. এ. পাশ। কন্যাকে ডাকিয়া তিনি শুধু বলিলেন, খুকী, তোর বাবার অপমানটা ও বাঁচিয়েছে, মনে রাখিস্।

খুকী তথাপি চুপ করিয়া রহিল এবং পরীক্ষার পড়ায় মনোযোগ দিবার জন্য পাঠগৃহে চলিয়া গেল।

তপনজ্যোতি জানাইল,—সে যেখানে থাকে তাহাদিগকে বলিয়া আসা হয় নাই, অতএব সে আজ যাইতেছে, আগামীকল্য সকালে ফিরিয়া আসিবে।

উৎসবগৃহ ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া গেল।

ফুলশয্যার রাত্রে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের সংলগ্ন বারান্দায় একখানা সোফা পুষ্প-পত্র দিয়া সাজানো হইয়াছে। চন্দ্রালোকে তাহা স্নিগ্ধ হইয়া বর-বধূর অপেক্ষা করিতেছে।

তপনজ্যোতিকে আনিয়া সেখানে বসানো হইল। দুই চারজন রসিকা তাহার সহিত রহস্যালাপের চেষ্টাও করিল, কিন্তু তপনজ্যোতি বিশেষ কোন সাড়া দিল না। সকলেই বুঝিল—পাড়াগাঁয়ের ছেলে, কথা কহিতে জানে না। বিরক্ত হইয়া সকলে চলিয়া গেল। তপনজ্যোতি তখন ভাবিতেছিল, যাহাকে সে বিবাহ করিয়াছে, কেমন সে, তপনজ্যোতিকে সে গ্রহণ করিতে পারিবে কি না। মন তাহার এতই উন্মনা হইয়া উঠিয়াছে যে অন্য কাহারও সহিত কথা বলা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অধীর চিত্তে সে বধূর অপেক্ষা করিতে লাগিল। সঙ্গিনীগণ তপতীকে লইয়া আসিল। তপনের হৃদয় নবোঢ়া বধূর মতোই দুরু দুরু করিয়া উঠিল। তপতী কিন্তু সিঙ্গিনীগণকে দরজা হইতেই বিদায় করিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিল এবং যে বারান্দাটুকুতে বর বসিযাছিল, তাহাব ও ঘরের মধ্যকার দরজাটি সজোরে বন্ধ করিয়া দিয়া যেন তপনকে বুঝাইয়া দিল যে, শয়নকক্ষে বরের প্রবেশ নিষেধ।

কাচের সার্শির মধ্যে চাহিয়া তপন দেখিতে লাগিল, তপতী শয়নের বেশ পরিধান করিল; তারপর উজ্জ্বল আলোটা নিবাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ নীল আলো জ্বালাইল এবং সটান শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

তপন স্তম্ভিত! অনেকক্ষণ পরে তাহার মনে হইল, হয়ত তপতী জানে না যে, সে এখানে বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে সে রুদ্ধ দরজার বাহিরে করাঘাত করিয়া ডাকিল,—তপতী! দরজাটা খোল!

তপতী পিছন ফিরিয়া শুইয়াছিল। তেমনি ভাবেই জবাব দিল,—ঐখানেই থাকুন।

তপনের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম বিমূঢ় হইয়া আসিতে লাগিল। তবে তো তাহার আশঙ্কাই সত্য হইয়াছে। তপতী তাহাকে গ্রহণ করিবে না। তাহার পঞ্চবিংশ বর্ষের নির্মল নিষ্কলুষ প্রেমকে তপতী এমন দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিল! কিন্তু কি কারণে! অর্থাভাবে সে কলেজে পড়িতে পারে নাই, কিন্তু পড়াশুনা সে যথেষ্টই করিয়াছে এবং এখনো করে। এই কথা সে আজ নিজে তপতীকে জানাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু শুরুতেই তপতী তাহাকে এমনভাবে বাধা দিল যে কিছুই আর বলিবার উপায় রহিল না। নীরবে সে ভাবিতে লাগিল, তাহাকে গ্রহণ না-করিবার কি কি কারণ তপতীর পক্ষে থাকিতে পারে। সে ডিগ্রীধারী নয়, কিন্তু পড়াশুনা সে ভালই করিয়াছে এবং সে-কথা গতকলা যতদূর সম্ভব জানাইয়াছে। অবশ্য আত্মশ্লাঘা করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই যথাসম্ভব বিনয়েব সহিত জানাইয়াছে। দ্বিতীয়, সে পল্লীগ্রামে জন্মিয়াছে কিন্তু সে তো শহরবাসের অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছে। তৃতীয়, ব্রাহ্মণত্বের গোঁড়ামী তাহার একটু বেশী, তপতী একথা মনে করিতে পারে—কিন্তু, বি-এ পড়া মেয়ের পক্ষে কাহাকেও কিছুমাত্র চিনিবার চেষ্টা না করিয়াই একটা বিরুদ্ধ ধারণা করা কি ঠিক! তপনের চেহারা এমন কিছুই খারাপ নয় যে তপতীর চক্ষু পীড়িত হইবে। বরং চেহারার প্রশংসাই তপন এতাবৎকাল শুনিয়াছে। তবে হইল কি?

স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে তপনের দুটি চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। জীবনের কত সাধ কত আশা আজই বুঝি চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। তপনেরই অন্তর-বেদনা যেন শিশিরে শিশিরে ঝরিতেছে। কিন্তু এই গভীর বেদনাকে এত শীঘ্র বরণ করিয়া লইবে তপন! নাঃ—আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। তপন বলিতে চাহিল,—ওগো, তুমি যাহা মনে করিয়াছ, তাহা আমি নহি,—আমায় সুযোগ দাও, আমি তোমার যোগ্য হইবাব চেষ্টায় জীবনপাত করিব।

তপন পুনরায় উঠিয়া দেখিতে লাগিল, তপতীব শয্যালুণ্ঠিত সুকোমল দেহখানি।

তপতী ঘুমাইয়া গিয়াছে। সুদীর্ঘ বেণী দুটি পিঠের উপর দিয়া নামিয়া কোমরের নীচে তলাইয়া গিয়াছে, যেন দুইটি কৃষ্ণকায় সর্প তাহাকে পাহারা দিতেছে। সুখসুপ্তির সুদীর্ঘ নিশ্বাস তপনকে জানাইয়া দিল—তপতী তাহার নহে, তাহার হইলে এত সহজে, এত নিরুদ্বেগে সে এমন করিয়া ঘুমাইতে পারিত না।

চকিতে তপনের মস্তিষ্কে একটা বিদ্যুৎচিন্তা খেলিয়া গেল। তবে, তবে হয়ত যাহার সহিত তপতীর বিবাহ হইল না, তাহাকেই সে ভালোবাসে—কিম্বা—ভাবিতে গিয়া তপন অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। যুগসঞ্চিত হিন্দুসংস্কারে গঠিত তাহার মন যেন কোন অতল বিষ-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছে। একি হইল। তাহার সুন্দর সুনির্মল জীবনে এ কার অভিশাপ! সে তো ইহা চাহে নাই। ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিবার লোভ তাহার কোনদিন ছিল না। কিন্তু যাক—তপন স্থির করিয়া ফেলিল, তপতীকে কিছুই সে বলিবে না। তাহার বাঞ্ছিতকে—যদি অবশ্য তপন ব্যতীত অপর কেহ তাহার বাঞ্ছিত হয়—ফিরিয়া পাইতে তপন সাহায্যই করিবে।

তপন সেই যে ভোরে উঠিয়া গিয়া তাহার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষটিতে শয়ন করিয়াছে, বেলা বারটা বাজিয়া গেল, এখনো ওঠে নাই। প্রথমে সকলেই ভাবিয়াছিল, ইহা বধূর সহিত রাত্রি জাগরণজনিত অনিদ্রার আলস্য। কিন্তু তপতী দিব্যি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার দেহমনে ক্লান্তির কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁরে তপন কখন ঘরে গিয়া শুয়েছে? এখনো উঠছে না কেন?

—আমি তার কি জানি। বলিয়া তপতী অন্যত্র চলিয়া গেল।

ইহাকে নবোঢ়ার লজ্জা মনে করিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু মা চিন্তিত মুখে তপনের ঘরে আসিয়া দেখিলেন,—গা অত্যন্ত গরম—তপন চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। প্রথম ফুলবাসরের পরেই জামাইয়ের জ্বর—আধুনিক সমাজের মধ্যে বাস করিয়াও তপতীর মা'র মনের সাধারণ বাঙালী মেয়ের সংস্কার ইহাকে অমঙ্গল-সূচক মনে করিল। ব্যগ্র ব্যাকুল ভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—জ্বর কেন হলো বাবা? কখন থেকে হলো?

তপন চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, শিয়রে জ্যোতির্ময়ী জননীমূর্তি। তাহার চিরদিনের স্নেহবুভুক্ষু মন কাঁদিয়া উঠিল—

"স্নেহে-বিহ্বল করুণা ছলছল শিয়রে জাগে কার আঁখিরে"।

তপন বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এই মা, আর ঐ তাঁর মেয়ে। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার তপন জীবনে আর দেখে নাই। স্নিগ্ধ শিশুকণ্ঠে সে উত্তর দিল—একটু ঠাণ্ডা লেগেছে মা, কিছু ভয়ের কারণ নাই, একটা দিন উপোষ দিলেই সেরে যাবে।

—ডাক্তার ডাকি বাবা। জননীর স্নেহ করপুট তপনের ললাটে নামিল।

—না মা ওষুধ আমি খাইনে—কিছু ভাবনা নেই আপনার। আমি কালই ভালো হয়ে যাবো মা—আপনার মঙ্গল হাতের ছোঁয়ায় অসুখ কতক্ষণ টিকতে পারে?

পুত্রবঞ্চিতা শিক্ষিতা জননী এমন করিয়া মা ডাক কোনদিন শুনেন নাই। অন্তর তাঁহার বিমল মাধুর্যে ভরিয়া উঠিল।

আপনার গর্ভজাত পুত্রের স্থানেই তিনি তপনকে সেই মুহূর্তে বরণ করিয়া লইলেন, বলিলেন—কি খাবে বাবা, সাবু?

—না মা, সাবু আমি খেতে পারি নে, বেঙাচির মতো দেখতে লাগে।

—আচ্ছা বাবা, একটু গ্লাক্‌সো দিই।

—শুধু একটু গরম দুধ দেবেন মা.—এ বেলা আর কিছু খাবো না। আর আমি একা শুয়ে থাকবো—আপনার খুকীর বন্ধুরা যেন আমায় জ্বালাতন না করে এইটুকু দেখবেন।

—আচ্ছা, তাদের বারণ করে দেবো।

মা চলিয়া গেলেন, তপন শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল। কুলহীন পারহীন চিন্তা সমুদ্রে সে যেন তলাইয়া যাইতেছে। কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে আজ? এতাবৎকাল সে নিজের জীবনকে যেভাবে গঠিত করিয়াছে তাহাতে তপতীকে বিবাহ করিবার পর অন্য কাহাকেও গ্রহণ করা তাহার কল্পনারও অতীত, অথচ তপতীকে পাইবার সমস্ত আশাই বুঝি নির্মূল হইয়া গেল? কিন্তু মা! আশ্চর্য ঐ মহিমাময়ী নারী উহার গর্ভে জন্মিয়াছে সে, যাহাকে গত রাত্রে তপন দেখিয়াছে। যে নিষ্ঠুরা নারী শীতের রাত্রে একজনকে বাহিরের বারান্দায় রাখিয়া নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে ঘুমাইতে পারে! কিম্বা তপন ভুল দেখিয়াছে, সে ইঁহার কন্যা নহে। কিন্তু যতদূর মনে হয়, ইনিই মা এবং এই সংসারের কর্ত্রী। ইঁহারই কন্যা এত নিষ্ঠুর হইল কিরূপে? হিন্দুনারী হইয়াও আপনার স্বামীকে বুঝিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিল না, বুঝাইবার সুযোগ পর্যন্ত দিল না। ইহার অন্তর্নিহিত রহস্য যতই ভীতিপ্রদ হউক, যেমনই কদর্য হউক, তপন তাহাকে আবিষ্কার করিবে। তারপর যথা কর্তব্য করা যাইবে।

ভাবিতে গিয়া তপন আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।—যদি সে দেখে তপতী অন্যাসক্তা, তপতী তাহার অন্তরে অপরের মূর্তি আঁকিয়া পূজা করিতেছে—তপন কি করিবে? ভাবিতে গিয়া তপনের মনে হইল—হয়ত তাহাই সত্য, তপনকে তাহাই সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং তপতীকে সুযোগ দিতে হইবে তাহার বাঞ্ছিতকে লাভ করিবার জন্য। বর্তমানে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুই ভাবিবার নাই। যদি সত্যই সে কাহাকেও ভালোবাসে তবে তাহাকেই লাভ করুক। অন্যথায় তাহার কুমারী-হৃদয় একদিন তপনের কাছে ফিরিয়া আসিবে—সেই শুভদিনের জন্য অপেক্ষা করিবে তপন। যদি তাহাও না হয় তবে তপনের জীবন—সে তো চিরদিনই দুঃখের তিমির-গর্ভে চলিয়াছে, তেমনিই চলিবে।

ক্লান্ত তপন কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

শহরতলীর সর্পিল পথ ধরিয়া চলিয়াছে বিনায়ক। মন তাহার বিষাদখিন্ন। তার একমাত্র অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু তপনের অন্তরে বিষাক্ত কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে। সে কাঁটা তুলিয়া ফেলার উপায় বাহির করা সহজ নহে, কারণ তুলিতে গেলে তপনের হৃদপিণ্ডটিকে জখম করিতে হয়। বিনায়ক ভাবিতেছে আর চলিতেছে। দিকে দিকে বাসন্তী শ্রী ফুটিয়া উঠিতেছে; মাঘ মাসের শেষ হইয়া আসিল। সরস্বতী পূজা, কিন্তু পূজার শ্রেষ্ঠ পুরোহিত তপন আসিবে না। বিনায়কের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল তপনের বিরুদ্ধে। কেন সে না দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে গেল? মিঃ চ্যাটার্জির বিষয়-সম্পত্তির প্রতি তো তপনের লোভ নাই। লোভ তাহার কিছুতেই নাই। আজ দ্বাদশ বৎসর বিনায়ক তপনকে দেখিয়া আসিতেছে। অথচ সেই তপন কিনা এক কথায় মিঃ চ্যাটার্জির মেয়েকে বিবাহ করিয়া বসিল? যেমন কর্ম তেমনি ফল হইয়াছে। নইলে সারা বাংলা দেশে তপনের মতো ছেলের বধূ যোগাড় করা কিছুই কঠিন ছিল না।

বিনায়ক গভীর দুঃখের মধ্যে আত্মবঞ্চনার শান্তি লাভ করিতেছে, তাহার হাসি পাইল

নিজের বোকামির জন্য। তপন কোনদিন বিনা কারণে কিছুই করে না। তপনের হৃদয়, আকাশের তপনের মতই জ্বলন্ত, জাগ্রত, জ্যোর্তিময়।

কারখানায় আসিয়া পড়িল বিনায়ক। খেলনা তৈয়ারীর ছোট কারখানা। তপনের মস্তিষ্কউদ্ভূত নানাপ্রকার খেলনা তৈরী হয় শিশুমনের উৎকর্ষতার উপযোগী করিয়া। তপনই ইহার জনক এবং বিনায়ক তাহার মালিক ও পরিচালক। তপন নিজের খাওয়া পরার যৎসামান্য খরচ ছাড়া কিছুই গ্রহণ করে না। কারণ সে একা, তাহার খরচ খুবই কম, আর বিনায়কের মা-ভাই-বোন আছে, বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে হয় এবং বাজার করিয়া খাইতে হয়।

বিনায়ককে একা আসিতে দেখিয়া শ্রমিকবর্গ উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, ছোটদা কই বড়দাদাবাবু?

শ্রান্তকণ্ঠে বিনায়ক উত্তর দিল—অসুস্থ। তোমাদের জন্য মা'র কাছে প্রার্থনা জানিয়ে দু'লাইন কবিতা পাঠিয়েছে—

"দীর্ণ জীর্ণ জীবনে তোমার বাসন্তী বিভা ছড়ায়ে দিও,
—দুঃখ-আর্ত বঞ্চিত প্রাণে নব যৌবনে আশ্বাসিও।"

এইবার এসো ভাই সব, পূজায় বসি।

সকলেই ক্ষুব্ধ হইল, উদ্বিগ্ন হইল কিন্তু পূজার সময় হইয়াছে। বিনায়ক পূজায় বসিল। করজোড়ে কর্মীগণ উপবিষ্ট রহিল।

পূজা শেষে প্রসাদ বিতরণ করিয়া বিনায়ক বলিল—তোমাদের ছোটদা দু'চারদিন আসতে পারবে না ভাই সব, অসুখের জন্য নয়, অন্য কারণ আছে। ভেবো না তোমরা।

—তিনি ভালো আছেন তো?

—হ্যাঁ, সামান্য সর্দি মতো হয়েছে।

বিনায়ক একাকী ফিরিয়া চলিল। দুই পাশে কচুরীপানার জঙ্গল শুকাইয়া উঠিয়াছে। দূরে দূরে দুই একটা গাছে লাল ফুল ফুটিতেছে। বাসন্তীর আগমনে সবই যেন লাল হইয়া যায়, এমন কি তপনের হৃদয়টাও আজ রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বিনায়ক নিশ্বাস ফেলিল একটা।

তপন, তাহার বাল্যবন্ধু তপন—জীবনে যে কোনদিন কোনরূপ অসৎ কার্য করে নাই, কাহারও মনে বেদনা দেয় নাই, জীবন-পণ করিয়া যে পরোপকারবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, সেই তপনের জীবনে এমন দুর্বিপাক কেন ঘটিল? তপন না থাকিলে মাতা-ভ্রাতা-ভগিণীকে লইয়া বিনায়ক আজ ভাসিয়া যাইত। এম-এ পাশ করিয়াও যখন চল্লিশ টাকার চাকুরী জুটিল না তখন একদিন নিরাশ নয়নে গড়ের মাঠে বিনায়ক বসিয়া ভাবিতেছিল, আত্মহত্যাই তাহাকে করিতে হইবে। ঠিক সেই সময় তপন রাস্তার উপর দাঁড়ানো মোটরগাড়ীর আরোহীগণকে বিক্রয় করিতেছিল তাহার স্বহস্তের প্রস্তুত খেলনা। বিনায়ককে ক্লান্ত অবসাদখিন্ন দেখিয়া সেই তো এই কারখানার পত্তন করে নিজের হাতের আংটি বেচিয়া। সেদিন ছিল তিন টাকা ভাড়ার একটি চালাঘর এবং দুইজন শ্রমিক বিনায়ক আর তপন। সে আজ আট বৎসর পূর্বের ঘটনা। আজ এই কারখানায় পঞ্চাশ জন শ্রমিক কাজ করে। প্রস্তুত খেলনা বিদেশী খেলনার সহিত প্রতিযোগিতা করে। নীট্ আয় মাসিক দুই শত টাকার কম নয়।

কিন্তু তপন ইহার কতটুকু অংশ গ্রহণ করিয়াছে। মাসে পনের টাকাও সে গ্রহণ করে

নাই, বিনায়কের সংসার পালনের জন্য দান করিয়াছে। এই অসাধারণ বন্ধুবৎসল তপন আজ ভাগ্যের ফেরে ক্ষতচিহ্ন, আর্তহৃদয়—অথচ বিনায়ক তাহার কোন উপকার করিতে পারে না! হয়ত পারে! বিনায়ক দ্রুত পা চালাইয়া নিকটবর্তী একটি দোকানে আসিয়া কয়েক আনা পয়সা দিয়া ফোন করিল।

অসুস্থ তপন আসিয়া ফোনে বলিল—কি বলছিস বিনু?

—তুই আত্মপরিচয় কেন দিবিনে তপু—তাহলে সে তোকে ভালোবাসবে।

—না, তার দরকার নাই। যে আমায়, কুৎসিত দেখে ভালোবাসলে না, সে আমায় সুন্দর দেখে ভালবাসতে পারে না, যে আমায় মূর্খ ভেবে গ্রহণ করলে না, আমাকে পণ্ডিত দেখে গ্রহণ করবার তার আর অধিকার নেই। যদি সে অন্য কাউকে চায় তবে তারই হাতে ওকে তুলে দেবো।

—কিন্তু তাহলে...

—থাক বিনু—এসব ফোনে হয় না।

তপন ফোন ছাড়িয়া দিয়াছে। বিনায়ক গভীর শ্রান্তিতে এলাইয়া পড়িল। বাড়ী আসিয়া যখন সে পৌঁছিল তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে এবং স্নেহময়ী জননী তাহার আহার্য লইয়া বসিয়া ঢুলিতেছেন।

বিনায়ক খাইতে বসিল।

তপতী চ্যাটার্জি সাবানঘষা একরাশ চুলে লাল ফিতা বাঁধিয়া বাসন্তী রং-এর কাপড় পরিয়া সেতার কোলে চলিয়াছে কলেজ-হোস্টেলে সরস্বতী পূজা করিবার জন্য। সেখানে সে গাহিবে, নাচিবে এবং রূপের বিদ্যুতে সকলকে চমকিত করিয়া দিবে।

মা বলিলেন—খুকী, তপন ওঘরে সরস্বতী পূজা করছে যা প্রণাম করে আয়।

নাক বাঁকাইয়া তপতী কহিল,—তুমি যাও, আমার প্রণাম করিবার ঢের জায়গা আছে।

তপতী গিয়া গাড়ীতে উঠিল। তপতীর দুই একজন বন্ধু, যাহরা তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, তাহারা কিন্তু তপনকে একবার দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। তপনের কক্ষদ্বারে গিয়া দেখিল, ক্ষৌম বস্ত্র-পরিহিত, উত্তরীয়-আবৃত দেহ তপন পিছন ফিরিয়া পূজা করিতেছে। তাহার মুণ্ডিত মস্তকের উপর লাউয়ের বোঁটার মতো টিকিতে একটা গাঁদা ফুল। তরুণীর দল আর স্থির থাকিতে পারিল না। একটা ছোট কাঁচি আনিয়া টিকিটি আমূল ছাঁটিয়া দিল। হাসির উচ্ছল শব্দে মুখ ফিরাইয়া তপন দেখিল, ঘরে চাঁদের হাট। সে পুনরায় মুখ ফিরাইয়া পূজা করিতে লাগিল। তাহার চন্দন-চর্চিত মুণ্ডিত মুখশ্রী আধুনিক আলোক-প্রাপ্তাদের মোটেই ভালো লাগিল না। তাহার উপর তপন কয়েকদিনের অসুস্থতার জন্য দাড়ি কামায় নাই, ইহা তাহার দ্বিতীয় অপরাধ। সর্বোপরি সে যে পুস্তকখানির উপর পুষ্পার্ঘ অর্পণ করিতেছিল, সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, লালচে রং-এর কাগজের মলাটে তাহার নাম লেখা "হারু ঠাকুরের পাঁচালী।"

ঐ বটতলার নিদারুণ অশ্লীল বই তপন পড়ে এবং সরস্বতী পূজার জন্য উহারই উপর পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করে, ইহা অপেক্ষা কদর্যতার পরিচয় আর কি হইতে পারে। উহার আর কোন বই নাই, আর কিছু পড়িবার যোগ্যতা নাই! কি হইবে উহার সহিত রসিকতা করিয়া। তরুণী দল বাহিরে আসিল মুখ টেপাটেপির হাসিতে। তপতীর অদৃষ্ট সম্বন্ধে যাহারা

এতাবৎ ঈর্ষাপরায়ণা ছিল, তাহারা বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিল, তপনের অর্বাচীনতাটা তাহারা আজ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে।

গাড়িতে বসিয়া তপতী বিরক্তিতে তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। ঝঙ্কার দিয়া কহিল—এরকম দেরী করলে যাবো না আমি। রেবা মৃদু হাসিয়া বলিল—দেখে এলাম তোর বর—পাঁচালী পড়ছে। এবার সচিত্র প্রেম পত্তর আউড়ে চিঠি দেবে তোকে—"যাও পাখী বলো তারে—"

সকলে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন তপনের কর্তিত টিকিটি আনিয়াছিল, তপতীর অঞ্চল-বিদ্ধ ব্রোচটিতে সেই টিকিটি আটকাইয়া দিয়া কহিল—তোর বরের মাথার ধ্বজা—রাখ্ বুকে গুঁজে!

আবার হাসি! রাগে তপতীর যেন বাকরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ; রোষকষায়িত নয়নে সে ড্রাইভারকে ধমক দিল—জল্‌দি চালাও—জলদি! বান্ধবীদের মধ্যে একজন সহানুভূতি দেখাইয়া কহিল,—তপু, কি করে জীবনটা কাটাবী তুই?

অন্যজন বলিল,—রিয়েলি, উই আর সো স্যরি।

তৃতীয়া বলিল,—মন্দই বা কি ভাই! বেশ হুকুম মতো চলবে, গা-হাত পা টিপে দেবে, মাঝে মাঝে পাঁচালী পড়ে শোনাবে, দরকার হলে রান্না-বান্নাটাও—

হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে আর একজন বলিল,—চেহারাটাও ঠিক রাঁধুনি বামুনের মতন।

তপতীর আপাদমস্তক জ্বলিতেছে, কিন্তু উপায় নাই। ইহারা যাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঐরকমই নিশ্চয়, বিরুদ্ধে তপতী কিছুই বলিতে পারে না। তাহার যত রাগ গিয়া পড়িল তাহার বাবার উপর। বাবা তাহাব একি করিলেন? একটা নিতান্ত অশিক্ষিত, সভ্য সমাজে অপাংক্তেয় ছেলের সহিত তপতীর বিবাহ দিলেন। আশ্চর্য! ইহাই যদি বাবার মনে ছিল তবে তপতীকে তিনি এত লেখাপড়া শিখাইলেন কেন? তপতী তো ঠাকুরদার কাছে যতটুকু লেখাপড়া শিখিয়াছিল তাহাতেই বেশ চলিত। ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পর তপতীকে কলিকাতায় আনিয়া তিনি কলেজে ভর্তি করিয়াছেন। তাহার জন্য গানের মাষ্টার রাখিয়াছেন, নাচের মাষ্টার রাখিয়াছেন। পাঁচটা সাতটা ক্লাবে তাহাকে ভর্তি করিয়া দিয়াছেন, এক কথায় সম্পূর্ণ আধুনিক ছাঁদে তপতীকে গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা কি ঐ পাঁচালী পাঠকারী টিকিওয়ালা গণ্ডমুর্খের জন্যই! বেশ—তপতী ইহার শোধ তুলিয়া তবে ছাড়িবে।

তপতীর ব্যবহার কয়েকদিন মিসেস্ চ্যাটার্জি লক্ষ্য করিতেছিলেন। আজ তাহার মুখে বিদ্রোহের বাণী শুনিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়াই অপেক্ষা করিতেছিলেন। গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া তপতী সীমাহীন তিক্ততার সহিত জানাইল, আমার বন্ধুরা তোমার জামাইয়ের কাছে যেন না যায়, বুঝেছো—তা হলে আমায় বাড়ীছাড়া হতে হবে।

—কেন? মা স্নিগ্ধকণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন।

—কেন! তপতীর কণ্ঠে অগ্ন্যুদগার হইল—কেন, তা জানো না! একটা হতভাগ্য মূর্খ লোককে ধরে এনেছো—টিকি রাখে, পাঁচালী পড়ে—আবার কেন! লজ্জা করলো না জিজ্ঞাসা করতে?

মা নিঃসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। মুহূর্তে সামলাইয়া কহিলেন,—গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে

এসেছে, তাই টিকি রয়েছে, ওটা তুই ছেঁটে দিস্।

—তুমি ছাঁটো গিয়ে, ধুয়ে ধুয়ে জল খাবে—আর পাঁচালী শুনবে—।

—পাঁচালী পড়তে আমি বারণ করে দেবো, খুকী।

—কিছু তোমার করতে হবে না, শুধু এইটি করো যেন আমার কোন বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা না হয়, তা'হলেই বাধিত থাকবো।

তপতী রোষভরে শয়নকক্ষে চলিয়া গেল। মা একবার তপনের কক্ষে আসিয়া উঁকি দিয়া দেখিয়া গেলেন, ক্লান্ত অসুস্থ তপন একক শয্যায় ঘুমাইতেছে। কক্ষের মৃদু আলোক তাহার প্রশস্ত ললাটে আসিয়া পড়িয়াছে—যেন রূপকথার রাজপুত্র, সোনার কাঠির ছোঁয়ায় এমনি জাগিয়া উঠিবে। মিসেস্ চ্যাটার্জি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, এমন সুন্দর ছেলে, লেখাপড়া কেন যে শেখে নাই। পর মুহূর্তেই মনে পড়িল তপনের দারুণ অবস্থা-বিপর্যয়ের কথা। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃহীন হইয়া তপনকে পাঠ্য পুস্তক বেচিয়া বাড়ী ফিরিতে হয়। কিন্তু কি-ই-বা উহার বয়স? এখনো তো পড়াশুনা করিতে পারে।

মিসেস্ চ্যাটার্জি স্বামীর কক্ষে আসিলেন। মিঃ চ্যাটার্জি এখনও তাঁহার অপেক্ষায় জাগিয়া ছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—খুকী ফিরেছে?

—হ্যাঁ, এইমাত্র ফিরলো।

মিঃ চ্যাটার্জি নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন। মিসেস্ চ্যাটার্জি কয়েক মিনিট থামিয়া বলিলেন,—খুকী কিন্তু তপনকে মোটেই পছন্দ করছে না।

বিস্ময়ের সুরে মিঃ চ্যাটার্জি কহিলেন,—কেন! অপছন্দের কি কারণ?

ছেলেটাকে আমার তো খুব ভাল লাগছে গো, তবে লেখাপড়া ভালো জানে না, পাঁচালী, ছড়া, এইসব নাকি পড়ে। খুকী তো এই ক'দিনে একবারও তার কাছে যায়নি। কতবার বললাম, জ্বর হয়েছে, একবার যা, কাছে গিয়ে বোস, তা কথাই কানে তুললো না। আজ আবার এসে বললো, তার বন্ধুরাও যেন ওর কাছে না যায়। আমি বাবু বেশ ভালো মনে করছি না, অতবড় মেয়ে!

পত্নীর এতগুলি কথার উত্তরে মিঃ চ্যাটার্জি হাসিয়া উঠিলেন, পরে বলিলেন,—খুকীর পরীক্ষাটা হয়ে যাক—তারপর দেখে নিও। ও ছেলেকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি, আর জানতাম ওর বাবাকে। সেই বাপের শতাংশের এক অংশও যদি পেয়ে থাকে, তা হলে ও হবে অসাধারণ।

—কিন্তু খুকী ওর সঙ্গে মিশছেই না—বলে, মূর্খ, পাড়াগেঁয়ে।

—মূর্খ তো নয়ই, পাড়াগেঁয়েও নয়। আমি দু'চারটা কথা কয়েই বুঝেছি। কিছু ভেবো না তুমি, আমি ওকে পরশু থেকেই আমার ব্যবসায়ে লাগাব, আর তোমার খুকী ইতিমধ্যে পরীক্ষাটা দিয়ে নিক্। তারপর দুজনকে শিলং-এ নতুন বাড়ীটাতে দেব পাঠিয়ে—সব ঠিক হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, পাঁচালী, ছড়া এসব পড়ে কেন? ইংরাজী না জানুক বাংলা ভালো বই, মাসিকপত্র, এসব তো পড়তে পরে?

তুমি বোলো সে কথা। আর ইংরাজী যে একেবারে জানে না, তা তো নয়, যা জানে তাতে আমার অফিসের কাজ চলে যাবে। আর তোমার ঐ আধুনিক সমাজের ধরণাধারণ শিখতে মাসখানেকের বেশী লাগে না। আমি ওকে আপ-টু-ডেট করে দিচ্ছি। ভেবো না তুমি।

মিসেস্ চ্যাটার্জি কতকটা আশ্বস্ত হইয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন মিসেস্ চ্যাটার্জি তপনকে চা খাওয়াইতে বসাইয়া বলিলেন,—তুমি পাঁচালী কেন পড় বাবা? খুকীর বিস্তর মাসিক পত্রিকা আছে—সেইগুলো পড়ো। ভাল বাংলা বই পড়ো, বুঝলে।

উত্তরে তপন স্মিত হাস্যে কহিল,—পাঁচালী বাংলার আদি সাহিত্য মা, ওর ওপর এত রাগ কেন আপনাদের।

—না বাবা, আজকাল ওগুলো আর চলে না কিনা, তাই বলছি আধুনিক সমাজে ওর কদর নেই।

—কিন্তু আমি আধুনিক নই মা, অত্যন্ত প্রাচীন, আপনার শ্বশুরের মতন প্রাচীন। আর ঐ পাঁচালীখানা আপনার শ্বশুরমশায়ের—আপনারই বাড়িতে পেয়েছি কাল।

স্নিগ্ধ মধুর হাসিয়া মিসেস্ চ্যাটার্জি বলিলেন,—ওঃ তাই বলো বাবা তুমি শ্বশুর—আবার ফিরে এলে বুঝি?

তপন মৃদু হাসিয়া বলিল,—হ্যাঁ মা, এবার ছেলে হয়ে এলাম।

মিসেস চ্যাটার্জি যে সমাজে বাস করেন সে সমাজে এরূপ কথার চলন বিশেষ নাই, সেখানে কথা-বার্তার স্রোত আন্তরিকতাহীন কৃত্রিমতার মধ্যে বহিয়া যায়। কিন্তু সে সব ছেঁদো কথা এমন করিয়া তো মনকে আকর্ষণ করে না, এ যেন নিমেষে আপন করিয়া লয়। তপন যেন ক্রমশ তাঁহার পুত্রহীনতার স্থানটিকে জুড়াইয়া দিতেছে। এমন সুন্দর ছেলেকে তাঁহার খুকী গ্রহণ করিবে না। নিশ্চয় করিবে। খুকীর পরীক্ষাটা হইয়া যাক—তারপর মিসেস্ চ্যাটার্জি খুকীর উপর চাপ দিবেন। তপন তো বাড়ীতেই রহিল। ব্যস্ত হইবার কিছু কারণ নাই।

পরদিন সাহেব কোম্পানীর দোকানের কোট-প্যান্টালুন পরাইয়া মিঃ চ্যাটার্জি তপনকে নিজের অফিসে লইয়া গেলেন। তপন এখন হইতে তাঁহাকে কাজ কর্মে সাহায্য করিবে।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আপনার টু-সীটার খানায় খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া তপতী স্নান করে এবং বাপের সহিত চা খাইয়া পড়িতে বসে। তপন সে সময় আপনার ঘরে স্নান করিয়া পূজা করিতে থাকে। যখন খাইতে আসে তখন একমাত্র মিসেস, চ্যাটার্জি ছাড়া আর কেহই থাকে না।

খাইয়াই তপন বাহির হইয়া যায়, বহুস্থানেই তাহাদের কোম্পানীর কন্ট্রাক্টে বাড়ী নির্মিত হইতেছে, তাহাই দেখিতে। ফিরিয়া যখন আসে তখন তপতী খাইয়া বিশ্রাম করিতেছে আপনার ঘরে। তপন মধ্যাহ্নে ভোজন সারিয়া আবার বাহির হয় অফিসে। বিকাল সাড়ে পাঁচ-ছটায় ফিরিয়া আসে জল খাইবার জন্য। তপতী তখন কোনদিন বন্ধুদের লইয়া বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছে, কোনদিন বা লনে টেনিস খেলিতেছে, কোনদিন হয়ত বন্ধুবান্ধবদের সহিত সঙ্গীতের আসর জমাইয়া তুলিয়াছে। তপনের সহিত তাহার সাক্ষাতের অবসর নাই, ইচ্ছে তো নাই-ই। দৈবাৎ উহা ঘটিলেও ঘটিতে পারিত, কিন্তু তপতী যতখানি এড়াইয়া চলে, তপন এড়াইতে চায় ততোধিক। বৈকালিক জলযোগ সারিয়া তপন পুনরায় বাহিরে চলিয়া যায় এবং ফিরিয়া আসে রাত্রি সাড়ে দশটার আগে নয়।

মিষ্টার বা মিসেস্ চ্যাটার্জি তাহাকে এতখানি পরিশ্রম করিতে দিতে চান না, কিন্তু তপন মৃদু হাসিয়া বলে,—গরীবের ছেলে মা আমি খেটে খেতেই তো জন্মেছি। মিসেস চ্যাটার্জি

ক্ষুব্ধস্বরে বলেন,—সে যখন ছিলে বাবা, এখন তো তোমার কিছু অভাব নাই, এত খাটুনি কমাও তুমি। তপন আরও মধুর করিয়া উত্তর দেয়—বাবাকে একটু সাহায্য করার জন্য আমি চেষ্টা করছি মা,—আমার বিদ্যে-সাধ্যি অল্প, তাই খুব সাবধানে কাজ করি, যাতে ভুল কিছু না হয়। খাটুনি আমার কিছু লাগে না মা।

মিসেস্ চ্যাটার্জির আর কিছু কথা যোগায় না। অনেকক্ষণ পরে তিনি বলিলেন,—তোমার জন্য একটা গাড়ী কিনে দিই বাবা।

—কি দরকার মা? ট্রামে তো দিব্যি যাচ্ছি-আসছি।

কিন্তু পরদিন মিঃ চ্যাটার্জি তপনের জন্য একখানা গাড়ী কিনিয়া আনিলেন। তপন পরদিন নূতন গাড়ী চড়িয়া অফিসে গেল। বিকেলে ফিরিয়া গাড়ীখানা গাড়ীবারান্দায় রাখিয়া সে জল খাইতে বসিয়াছে, তপতী দেখিল, নূতন গাড়ীখানা দেখিতে খুবই সুন্দর সে অন্য সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া গাড়ীটাকে লইয়া বেড়াইতে চলিয়া গেল। তপন নীচে আসিয়া দারোয়ানের মুখে দিদিমণির কীর্তি শুনিয়া মৃদু হাসিল এবং ট্রামের পাশখানা পকেটে ঠিক আছে দেখিয়া লইয়া হাঁটিয়া গিয়া ট্রামে উঠিল।

রাত্রে ফিরতেই মিসেস চ্যাটার্জি বলিলেন,—খুকীটা বড্ড দুষ্টু বাবা, তোমার গাড়ী নিয়ে বেড়াতে চলে গিয়েছিল। আবার বকতে গেলুম, তো হাসে।

—নিক্ না মা ; ছেলেমানুষ, ঐ গাড়ীটা যদি ওর ভাল লাগে তো নিক—আমি ট্রামে বেশ যাতায়াত করতে পারি।

—না বাবা, তুমি এমন কিছু বুড়ো মানুষ নও। আর খুকীর তো গাড়ী রয়েছে। তুমি দিও-না ওকে তোমার গাড়ী।

উত্তরে তপন মৃদু হাসিল, কিছুই বলিল না। খাইতে খাইতে সে ভাবিতে লাগিল, তপতীর ইহা নিছক ছেলেমানুষি, নাকি ইহার অন্তরালে আরো কিছু আছে? এই দীর্ঘ পনেরদিন একটিবারও তপনের সহিত তাহার দেখা হয় নাই। দুজনেই দুজনকে এড়াইয়া চলিয়াছে ; হঠাৎ তাহার জন্য ক্রীত গাড়ীখানা লইয়া তপতীর বেড়াইতে যাইবার উদ্দেশ্য কি? সে কি চায় যে তপন তাহার সহিত মিশুক, তাহার সহিত বেড়াইতে যাক্—কিম্বা তাহার বিপরীত। তপন কিছুই স্থির করিতে পারিল না। খাওয়া শেষ করিয়া আপনার কক্ষে গিয়া শয়ন করিল।

কিন্তু ঘুম কি আসিতে চায়। তপতী তাহার পঞ্চবিংশতি বর্ষের জীবনে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। তপন এই কয়দিন লক্ষ্য করিয়াছে, যাহাদের সহিত তপতী বেড়াইতে যায়, গান করে, টেনিস খেলে, তাহারা সকলেই আধুনিক সমাজের তরুণ-তরুণী। সুশ্রী, সভ্য এবং সর্বতোভাবে তপতীর যোগ্য। এত লোককে ছাড়িয়া কেন মিঃ চ্যাটার্জি তপনের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন, তপন তাহা ভাবিয়া পায় না, তাহার পিতার সহিত নাকি মিঃ চ্যাটার্জির বন্ধুত্ব ছিল। তপন যখন নিতান্ত ছোট তখনই নাকি মিঃ চ্যাটার্জির কন্যার সঙ্গে তপনের বিবাহের কথা হয়। কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি সে কথা ভুলিয়াই বা রহিলেন কেন, আর আজ এতকাল পরে সেই অঘটনটা ঘটাইয়াই বা দিলেন কেন! কিন্তু ভাবনা, নিষ্ফল। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে।

সকালে উঠিয়া স্নান পূজা যথারীতি সারিয়া সে বাহিরে যাইবার জন্য আজো তাহার গাড়িখানি লইতে আসিয়া দেখিল, তাহারই গাড়ী লইয়া তপতী প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনো ফিরে নাই। তপতীর গাড়ীটা অবশ্য গ্যারেজেই রহিয়াছে, কিন্তু তপনের উহা লইতে সঙ্কোচ বোধ হইল। শুধু সঙ্কোচ বলিলে যথেষ্ট হয় না, হয়তো একটু ঘৃণার

ভাবও মনে আসিল তাহার। কতদিন তপন দেখিয়াছে, ঐ গাড়ীখানার চালকের স্থানে তপতী এবং পাশে মিঃ ব্যানার্জী না হয় মিঃ অধিকারী কিম্বা চৌধুরী—কোনদিন বা তিনজনই। ও গাড়ী না লওয়াই ভালো। তপন ট্রাম ধরিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

তপতী বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, তাহার টু-সীটার গ্যারেজে রহিয়াছে। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল,—জামাইবাবু গাড়ী নেহী লিয়া?

—নেহী হুজুর—ট্রামমে চলা গিয়া।

তপতী উপরে চলিয়া আসিল এবং নিঃশব্দে আপন ঘরে ঢুকিয়া পড়িতে বসিল ; মা কিন্তু সমস্তই জানিয়াছেন ; কন্যার ঘরে আসিয়া একটু উত্তপ্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন,—খুকী, আজও তুই ওর গাড়ী নিয়েছিলি?

—নিলুম তো কি হলো মা? ও আমার গাড়ীটায় চড়লো না কেন? বলে দিও ঐটা নিতে। এ গাড়ীটা বেশ দেখতে, তাই নিয়েছিলুম। এই গাড়ীটাই আমি নেবো এবার থেকে।

মা বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—কেন, তোর গাড়ী মন্দ?

—মন্দ কেন—এটা নতুন, বেশ রংটা আর দৌড়ায় খুব। কিন্তু আমার গাড়ীটাও খারাপ নয়—চড়ে দেখতে বলো একদিন।

তপতী মধুর হাসিল। মা ভাবিলেন, খুকী তাঁহার জামাতার সঙ্গে ভাব করিতে চায়। বয়স্কা মেয়ে, লজ্জায় সব কথা খুলিয়া বলে না, আর এ-যুগের মেয়েদের চিনিবার উপায় নাই। হয়ত খুকী তপনের সঙ্গে কথাবার্তা কিছু কহিয়াছে,—হয়ত ইহা ভালোরই লক্ষণ। মা খানিকটা স্বস্তির হাসি হাসিয়া বলিলেন,—বেশ তো, দুজনে বদ্‌লাবদ্‌লি করিস।

—হ্যাঁ, তুমি বলে দিও সে কথা!

তপতী পাঠে মন দিল। মা চলিয়া আসিলেন। দুপুরে তপন খাইতে আসিলে মা বলিলেন,—তুমি খুকীর গাড়ীটাই নাও বাবা, তোমার গাড়ীর সবুজ রং ওর বড্ড পছন্দ হয়েছে, তাই তোমারটাই নিতে চাইছে।

—বেশ তো মা, ও নিক—গাড়ীর আমার কী-ই বা দরকার? তখনও যেমন চলছিলাম, এখনও তেমনি চলবো ট্রামে।

—না বাবা—না। মা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাহলে আমি খুকীর কাছ থেকে গাড়ীটা কেড়ে নেবো।

—ছিঃ মা, ওর এখন পড়ার সময়, মনে আঘাত পাবে। আমি কিছু মনে করছি না মা, দুটো গাড়ীই থাকলো, যখন যেটাতে খুসি ও চড়বে।

—তুমি তাহলে কি ট্রামেই চড়বে বাবা? মাতার স্বরে আতঙ্কের আভাস স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

হাসিয়া তপন বলিল—আচ্ছা মা, আমি একটা মোটর বাইক কিনে নেবো।

—বড্ড বিপদজনক গাড়ী বাবা—ভয় করে।

—কিছু ভয় নেই মা, আমার জীবনে কোন অকল্যাণ স্পর্শ করে না।

মা খানিকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—মেয়েটার কি যে কাণ্ড।

—আপনার খুকীর গাড়ী না হলে একদিনও চলে না, আর আমার পা-গাড়ীতে আমি পঁচিশ বছর চলে এলুম। আমার জন্য অত ভাবছেন কেন মা! তাছাড়া মোটর বাইকে চড়তে আমি ভালোবাসি।

—বেশ বাবা, তাই করো অহলে—আজই কিনে নাও একখানা মোটর বাইক।

খাওয়ার শেষে আপন কক্ষে আসিয়া তপনের হাসি পাইতে লাগিল। প্রাচুর্যের মধ্যে যাহাদের বাস তাহারা অর্থ সম্পদ দিয়াই মানুষকে বশ করিতে চায়। কিন্তু মানুষ যে অর্থের অপেক্ষা অন্য একটা জিনিসের বেশী আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা ইহারা কিরূপে জানিবে? যাক্, মোটর বাইক একখানা কিনিতেই হইবে নতুবা মা ভাবিবেন, খুকীর উপর তপন রাগ করিয়াছে।

পরদিন তপন একটা মোটর বাইকে চড়িয়া বাড়ী ফিরিল।

পরীক্ষার জন্য তপতী কিছুদিন যাবৎ অত্যন্ত ব্যস্ত তাই তাহার সঠিক স্বরূপ তপন দেখিতে পাইতেছে না। তথাপি সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, তপতীর নিকট তপনের কোন আশা নাই। তপতী তাহার বন্ধুদের মধ্যে কাহাকেও নিশ্চয় ভালোবাসে, কিম্বা এমনও হইতে পারে, তপতী আজো কাহাকেও ভালবাসিবার সুযোগ পায় নাই, তবে তপনকে যে সে কোন দিন গ্রহণ করিবে না, ইহা নানা ভাবে বুঝাইয়া দিতে চায়।

আজও তপন বাহির হইবার পূর্বে তাহার মোটর বাইকখানা লইয়া সেই যে তপতী লনের চক্রাকার পথে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে; নামিবার নামটি নাই। তপন নীরবে গেটের নিকট মিনিটখানেক দাঁড়াইল,—ভাবটা,—তাহাকে দেখিয়া যদি তপতী বাইক খানা ছাড়িয়া দেয়। তপন পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তপতী বাইকের বিকট শব্দ করিয়া বাহির হইয়া গেল একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে। অর্থাৎ এবাড়ীর সব জিনিসেই তপতীর অধিকার, তপনের কিছুমাত্র অধিকার নাই। তপন হাঁটিয়া গিয়া ট্রামে উঠিল। তারপর সে সনাতন ট্রামেই যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিল।

মা কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে মেয়েকে বলিলেন,—এসব তোর কি কাণ্ড খুকী!

উচ্ছল হাসিতে ঘর ভরাইয়া তুলিয়া খুকী জবাব দিল,—জানো মা মোটর গাড়ী সব মেয়েই চালায়, কিন্তু মোটর বাইক চালাতে বেশী মেয়ে জানে না—আমি তাদের হারিয়ে দিলাম।

মা খুশী না হইয়া বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন,—তোর বাবাকে বল, তোর জন্যে একখানা কিনে দিক; ওরটা কেন নিলি?

—নিলুম, তাতে তোমার জামাই ধন্য হয়ে যাবে বুঝেছো!

তপতী হাসিয়া আপন কক্ষে চলিয়া গেল একটা ইংরেজী গানের এক লাইন গাহিতে গাহিতে।

খুকীর মন তপনের প্রতি অনুকূল না প্রতিকূল! আপনার গর্ভজাত কন্যার অন্তররহস্য মা আজ কিছুমাত্র অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের সময়ে এসব ছিল না। ধনী শ্বশুরের আদরিণী পুত্রবধূ হইয়া তিনি আসিয়াছিলেন প্রথম দর্শনের দিনটি হইতেই স্বামীকে আপনার বলিয়া চিনিয়াছিলেন, স্বামীও তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এ-যুগের আবহাওয়া কখন কোন দিক দিয়া প্রবাহিত হয় তাহা বুঝিবার সাধ্য স্বয়ং মহাকালের আছে কিনা সন্দেহ।

ইহা লক্ষ্য করিয়া তপন বাড়ী ফিরিলে তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবেই প্রশ্ন করিলেন,—ট্রামেই তো এলে বাবা

—হ্যাঁ মা। কিন্তু আপনি এত ভাবছেন কেন! ট্রামে বিস্তর বড়লোকের ছেলে চড়ে। ট্রাম কিছু খারাপ নয় মা।

মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। দরিদ্র এই ছেলেটি নিজেকে দরিদ্র বলিয়া প্রচার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। এখনি হয়ত বলিয়া বসিবে, "আমি ফুটপাতের মানুষ মা, আপনার আবুহোসেনি রাজত্বে এসে নাই-বা চড়লাম মোটরে। রাজত্ব তো রয়েছে!" আর ইহাকে দেওয়া জিনিস যখন তাঁহারই মেয়ে কাড়িয়া লইয়াছে তখন বেশী কিছু বলিতে যাওয়া উচিত নয়। হয়ত মনে করিবে, নিজের মেয়েকে বলিতে পারেন না, যত কথা তাহাকেই বলা হয়। উহার ভালোমানুষির সুযোগ লইয়া খুকী কিন্তু বড়ই অন্যায় করিতেছে। একটু ভাবিয়া বলিলেন—খুকীর গাড়ীটাই বা কেন তুমি নাও না বাবা?

—গাড়ীর দরকার নেই মা, অনর্থক কেন ভাবছেন আপনি! আর দরকার যখন হবে তখন নেবো, ও নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। আমরা বুঝব সে সব!

মা ভাবিলেন, হয়তো তাহাই ঠিক,—খুকীর সহিত তপনের কোনরূপ কথাবার্তা হইয়া থাকিবে। তিনি আর উচ্চবাচ্য করিলেন না।

আহারান্তে তপন চলিয়া যাইতেছিল, মা বলিলেন,—খুকীর জন্মদিন বাবা, আজ একটু সকাল সকাল ফিরো!

—চেষ্টা ক'রবো মা। বলিয়া তপন চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় বাড়ীতে মহাসমারোহ! আধুনিক সমাজে বিবাহের পূর্ব্বেই অবশ্য মেয়ের জন্মদিন-উৎসব ধুমধামে হইয়া থাকে, বিবাহের পর উহার প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়! কারণ, জন্মদিন-উৎসবটা ছেলেদের ও মেয়েদের পরস্পর পছন্দ করিয়া বিবাহ-বন্ধনের জন্য প্রস্তুত হইবার দিন! কিন্তু তপতী ইহাদের একমাত্র কন্যা, তাই জন্মদিনটা এবারও হইতেছে।

তপতীর বন্ধুর দল তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। গান গাহিতেছে একটি মেয়ে! বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তপতীকে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। অনেকে মিসেস চ্যাটার্জিকে জামাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মিসেস চ্যাটার্জি প্রত্যেককে জানাইলেন, সে জরুরী কাজে গিয়াছে, এখনি আসিবে।

মিসেস চ্যাটার্জির কথায় মিঃ অধিকারী কহিলেন—সেই বামুন ঠাকুরটি কোথায় গেলেন? ভয়ে পালিয়েছেন নাকি?

মিঃ ব্যানার্জি উত্তর দিলেন—ভয় নয় ভাবনায়, আমরা তাঁর বোকামী ধরে ফেলবো বলে!

মিঃ চৌধুরী বলিলেন—রেবা দেবী সেদিন তার টিকি কেটে দিয়েছেন।

রেবা দেবী কহিলেন,—মাথাটা মুড়ানো আছে, তুই ঘোল ঢেলে দিস তপতী।

—না না না মিস চ্যাটার্জি, ঘোল নয়, ওর মাথায় কড্‌লিভার অয়েল দেবেন, চুলগুলো একটু ভিটামিন খেয়ে বাঁচবে!

সকলেই হাসিয়া উঠিল। মিস চ্যাটার্জি আখ্যাতা তপতী কহিল,—চুপ করুন, মা শুনতে পেলে বকবেন এখুনি।

—বকবেন কি? এর জন্য দায়ী তো আপনার মা আর বাবা! আপনার মতো সর্বগুণান্বিতা মেয়েকে একটি বানরের গলায় দিতে ওঁদের বাধলো না?

তপতী চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণ পরে কহিল—মিঃ ব্যানার্জি তো আমায় "দুল" দিয়েছেন, মিঃ চৌধুরী দিলেন ব্রোচ, মিঃ অধিকারীর কথা ছিল যা দেবার তা না দিয়ে অন্য একটা বাজে জিনিস দিলেন, ওঁর শাস্তি হওয়া দরকার।"

সকলেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"সার্টেনলি।"

মিঃ অধিকারী কহিলেন,—সে জিনিস আপনি নিলে আমি কৃতার্থ হ'য়ে যাবো।

—নিশ্চয়ই নেবো, দিন!

—জিনিসটা কি মিঃ অধিকারী!—প্রশ্ন করিলেন মিঃ ব্যানার্জি।

—একটা ডায়মন্ড রিং। উত্তর দিল তপতী স্বয়ং।

সকলে একটু বিচলিত হইল। বিবাহিতা মেয়েকে আংটি দেওয়া চলে কি? কিন্তু তপতী নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিতে চায়, সে আজো বিবাহিত নহে এবং এ জন্যই "মিস চ্যাটার্জি" নামে অভিহিতা হইতে আপত্তি করে না। মিঃ অধিকারী ধনীর সন্তান। তিনি তপতীর জন্য আংটি কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহা বাহির করিয়া তপতীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তপতী তাহা পরাইয়া দিবার জন্য বাঁ হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

মিঃ অধিকারীর আংটি পরানো তখনো শেষ হয় নাই, মা'র সঙ্গে তপন আসিয়া ঢুকিল, হাতে তাহার একগুচ্ছ ফুল। মা তপতীর কাণ্ড দেখিয়া মুহূর্তে থ হইয়া গেলেন, কিন্তু তপনের সামনে কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়া কহিলেন,—প্রণাম কর খুকী...

তপতী উঠিল না, যেমন ছিল তেমনি বসিয়া রহিল। তপন একমুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল,—থাক মা, আমি এমনি আশীর্বাদ করছি। বলিয়া সে অশোক গুচ্ছটি তপতীর হাতে দিতে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করিল,—তোমার জীবনে পবিত্র হোমশিখা জ্বলে উঠুক...

তপতী পুষ্পগুচ্ছটা টানিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া সরোষে বলিল,—যাত্রা দলে প্লে করে নাকি? আশীর্বাদের ছটা দেখো!

বন্ধুদল হাসিয়া উঠিল, কিন্তু মা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই তপন মা'কে কহিল—বলুকগে মা, আমি কিছু মনে করিনি।

তপন আপন কক্ষে চলিয়া গেল। মা'ও অত্যন্ত বিরক্ত এবং বিব্রত হইয়া চলিয়া গেলেন। বন্ধুর দল হাসি থামাইয়া বলিল,—সত্যি একটা ওরাংওটাং।

পরদিন সকালে আসিল শিখা, তপতীর বন্ধুদের মধ্যে নিকটতমা। আসিয়াই বলিল—কাল সবে এসেছি ভাই, তোর বর কোথায় বল—আলাপ করব।

—আলাপ করতে হবে না, সে একটা যাচ্ছেতাই।

—ওমা, সেকি? কেন?

—যা কপালে ছিল ঘটেছে আর কি। হুঁ, ঠাকুরদা নাকি গণনা করে বলেছিলেন, আমার বর হবে অদ্ভুত, তাই অদ্ভুত হয়েছে, যাত্রাদলের ভাঁড় একটা।

শিখা বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কেন তপু ব্যাপার কিরে?

—ব্যাপার তোর মাথা! যা, দেখে আয়, ওঘরে রয়েছে!

শিখা আর কোন কথা না বলিয়া তপনের কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। তপন তখন পূজা শেষ করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেছে। পিছন ফিরিতেই শিখার সহিত চোখ মিলিল। তাহার চন্দনচর্চিত পূত দেহকান্তি, উন্নত প্রশস্ত ললাটে ত্রিপুণ্ডক রেখা, গলায় শুভ্র উপবীত শিখাকে

মুহূর্তে যেন অভিভূত করিয়া দিল। শিখা ভুলিয়া গেল, সে দেখা করিতে আসিয়াছে তাহার বন্ধুর বরের সঙ্গে। ভুলিয়া গেল উহার সহিত শিখার সম্বন্ধ কি! যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া নমস্কার করিতে গিয়া শিখা আভূমি লুণ্ঠিত হইয়া তপনকে প্রণাম করিয়া বসিল!

মৃদু হাসিয়া তপন কহিল,—তুমি কে ভাই দিদি? এ সমাজে তোমাকে দেখবার আশা তো করিনি?

পাঁচ সাত সেকেণ্ড কণ্ঠরোধ হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে সে কহিল—আমি আপনার ছোট বোন আর তপতীর বন্ধু আর জাষ্টিশ মুখার্জির মেয়ে।

—ওঃ! তুমিই শিখা। কিন্তু একটা কথা আছে!

—বলুন!

—এখানে আমাকে তুমি কেমন দেখলে, কিছুই বলবে না তোমার বন্ধুর কাছে বা কারো কাছে। আজ বিকেলে আমি তোমাদের বাড়ী গিয়ে যা-কিছু বলবার বলবো—অনেক কথা আছে। তুমি এখন বাড়ী চলে যাও ভাই শিখা।

—যাচ্ছি। কিন্তু আমার নাম জানলেন কি করে?

—মা'র কাছে শুনেছি। আচ্ছা, এখন আর কথা নয়।

শিখা বাহিরে আসিয়া আপনার গাড়ীতে উঠিয়া প্রস্থান করিল, তপতীর সহিত আর দেখাও করিল না।

তপনের অভ্যর্থনার জন্য শিখা পরিপাটি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। কয়েক মিনিটের দেখা তপনের কথা শিখা আজ সারাদিন ভাবিয়াছে। আশ্চর্য ঐ মানুষটি। মুহূর্তে যে এমন করিয়া আপন করিয়া লইতে পারে, তপতী তাহার সম্বন্ধে কেন ওরূপ কথা বলিল! শিখা সমস্ত দিন ভাবিতেছে ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু রহস্য আছে। তপতীর বিবাহের গোলযোগের কথা ভাগলপুরে থাকিতেই সে শুনিয়াছিল তার মা'র চিঠিতে। আজ তপতীর সেই বরকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে! শিখারা দুই বোন, দাদা বা ছোট ভাই নাই,—তপন যদি শিখার দাদা হয়,—শিখা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,—হ্যাঁ, হইয়াছেনই তো।

তপতীর সহিত ফিরিবার সময় দেখা না করিয়া আসাটা ভালো হয় নাই। কিন্তু উনি যে বারণ করিলেন। ওঁর কথায় অবাধ্য তো হওয়া যায় না। তপতী রাগ করে করুক—তাহার ভাব করিতে বেশী দেরী হইবে না। ব্যাপারটা তো শোনা যাক দাদার মুখ হইতে।

তপন আসিয়া পৌঁছিল। পরনে অফিসের পোশাক, হ্যাট-কোট-প্যান্ট। শিখা আগাইয়া যাইতে হাসিমুখে বলিল, চিনতে পাচ্ছিস ভাই, দিদি?

—চিনিবার তো কথা নয় যা ভোল বদলেছো—বদলেছেন।

—থাক্, আর 'ছেন' জুড়তে হবে না। দুজনেই হাসিয়া উঠিল। শিখা আবেগজড়িত কণ্ঠে বলিল.—কখন্ যে মনের মধ্যে দাদার আসনখানি জুড়ে বসেছো, টেরই পাইনি। নিজের অজ্ঞাতসারেই তুমি বলে ফেললাম।

—তোর কাছে এমনটাই আশা ক'রছিলাম ভাই। চল, বাবা মা'কে প্রণাম করি গিয়ে।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে শিখা তপনকে ভিতরে আনিয়া তাহার মা-বাবার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। তপন হেঁট হইয়া তাঁহাদের প্রণাম করিয়া উঠিয়াই বলিল,—আমি নিজে নিমন্ত্রণ নিয়েছি কাকীমা, আপনার দুষ্টু মেয়ে নিমন্ত্রণ করেনি।

হ্যাঁ, করেনি—নিমন্ত্রণ করবার সুযোগ দিয়েছিলে? যাওয়া মাত্র তাড়িয়ে ছাড়ল মা। এত্তো দুষ্টু!

জাস্টিশ মুখার্জি অত্যন্ত নিরীহ এবং গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাঁহার গাম্ভীর্য টুটাইয়া তিনি কহিলেন,—শঙ্কর বলছিল যে জামাই তাঁর খুব ভালো হ'য়েছে, তা এতো ভালো হয়েছে কে জানতো! খুব ভালো ছেলে!

—তোমার খুব ভালো লেগেছে,—নয় বাবা? এত কথা বলে ফেল্লে যে! শিখা কৌতুক হাস্যে চাহিল তার বাবার পানে।

শিখার মা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, বলিলেন,—তোমার আর একটা জোড় নেই বাবা? দুটোকেই বাঁধতুম!

শিখা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—ওকি গরু নাকি মা, বাঁধতে চাইছো?

—তোর বন্ধু সেদিন স্যার রমেনের বাড়ীর পার্টিতে ব'লছিল, তার বর নাকি হ'য়েছে একটা গরু। তাই তোর জন্যেও একটা এমনি গরু আমরা খুঁজছি।

—না মা, গরুটরু বলো না, আমার দাদা যে ও। শিখা মৃদু হাসিয়া বলিল।

—নিশ্চয় আপনি বলবেন কাকীমা। আমার মা আমার শেষ দিন পর্যন্ত গরু আর গাধা ব'লতেন। তারপর থেকে আর কেউ বলেনি। আপনি বলুন তো, আপনার কণ্ঠে আমার মা'র কণ্ঠস্বর শুনে নিই আর একবার!—তপনের দুটি চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। শিখার মাতা বিহ্বল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—তুমি যদি গরু হও বাবা, তাহ'লে মানুষ কে, তাই ভাবছি। কিন্তু বাবা, অফিস থেকে আসছো তো? এসো, হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে গল্প করবে'খন।

খাইতে বসিয়া তপন বলিল,—শিখার বিয়ে দিতে চান কাকীমা! আপনার কিছু ঠিক করা নেই তো?

—না বাবা, ঠিক কিছু নেই। মেয়েকে আর বড় ক'রতে ভরসা করিনে বাবা; চারিদিকে দেখছো তো, ধিঙ্গি মেয়েরা সব মোটরে চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। বয়স বাড়ছে বিয়ে হ'চ্ছে না। সমাজে কত মেয়ে যে আইবুড়ো র'য়েছে তার ঠিক নেই।

—আপনাদের সমাজের তো এই রকমই গতি কাকীমা। কিন্তু সমাজের উপর আপনি চট্‌লেন কেন?

—না বাবা, আমাদের সেকালের সমাজই ভালো ছিল। বিয়ে করবে না, ধিঙ্গিপনা করে বেড়াবে, তারপর বয়েস বাড়লে আর বিয়েই হবে না। এই তো হ'চ্চে আকছার।

—আশায় আশায় থাকে কাকীমা, মনে করে, আরো ভালো বর জুটবে, তারপর আরো ভালো, এমনি করেই বয়েস বেড়ে যায়। আর আমাদের সমাজের মতো আপনারা তো কচি মেয়ের জোর করে বিয়ে দেন না; জোর করে বিয়ে দেবার অবশ্য আমিও পক্ষপাতী নই, তবে ষোল থেকে কুড়ি একুশের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া উচিত।

শিখা এতক্ষণ নতমুখে তপনের চা তৈরী করিতেছিল, বাগ পাইয়া বলিয়া উঠিল,—তপির বয়স এখনো কুড়িও পেরোযনি, অতএব মাভৈঃ দাদা!

—তুই থাম—গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাগড়া দিস নে!

শিখা অনাবিল আনন্দে তপনের মুখের দিকে চাইল। শিখার দাদার অধিকারটি তপন অতি সহজে গ্রহণ করিয়াছে। এমন করিয়া কেহ কোনদিন তাহাকে ধমক দেয় নাই, এমন

মিষ্ট, এমন আন্তরিকতাপূর্ণ। হাসি মুখে সে চা আগাইয়া দিয়া বলিল,—আচ্ছা, গুরুজনদের সঙ্গে কথা শেষ হ'লে ডেকো আমায়।

শিখা চলিয়া যাইতেছে, মা বলিলেন,—যাচ্ছিস কেন?

শিখা দুই পা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ভাবছো কৈন মা? ও তোমার আধুনিক যুগের চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, মুখার্জি, ঘোষ, বোস, মিত্তির নয়। শিখা না থাকলেও ওর চলবে, বরং ভালোই চলবে। আমি কিছু বেল ফুল তুলে নিয়ে আসি।

শিখা চলিয়া গেল। তপন মধুর হাসিয়া বলিল,—কাকীমা, এই আধাবিলেতি সহরের বুকের ওপর মেয়েকে আপনারা কি করে এমন শুদ্ধাচারিণী রেখেছেন?

—আমি ওকে খুব কড়া নজরে রাখি বাবা। চারিদিকে তো দেখছি। আমি ছিলুম ভট্চাজ্যি বামুনের মেয়ে, একেবারে সনাতনপন্থী ; এখানকার সব দেখে মনে হয় ভালো আমাদের সমাজে অনেকেই ছিল, মন্দ যে না ছিল তা নয়, কিন্তু মন্দটা বেছে না ফেলে আমরা ভালোমন্দ সবই বিসর্জন দিয়েছি অথচ যাদের অনুকরণ করতে চাইছি, তাদের ভালোগুলো ছেড়ে মন্দগুলোই নিচ্ছি।

তপন হাসিমুখে শুনছিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল,—আমি দেখেই বুঝেছিলাম কাকীমা, আপনার সতী-শোণিত ওর প্রতি শিরায় বইছে। আচ্ছা কাকীমা আপনি আমার উপর নির্ভর যদি করেন তো ওর যোগ্য এবং আপনার মনের মতো ছেলে আমি ওর জন্যে এনে দেবো। কিন্তু আমি যে আপনার বাড়ী এসেছি বা মাঝে মাঝে আসবো একথা যেন কোনরূপে আমার শ্বশুরবাড়ীতে প্রকাশ না পায়। কারণ শিখার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক হওয়া উচিত বলে ওঁরা মনে করেছেন, শিখা তার থেকে আমার ঢের বেশী আপনার।

—তুমি ওঁদের বলে আসনি বুঝি।

—না,—এবং কোনদিন বলে আসবো না। কারণ ওদের জামাই সম্পর্কে তো আর আমি আপনার বাড়ীতে আসছি না, আসছি আপন বোনটিকে দেখতে। আমি কায়-মন এক ক'রে কথা বলি কাকীমা, শিখার সঙ্গে আমার সহোদর বোনের আর কিছু তফাৎ নাই। আমি তো আজকালকার "দা জাতীয়" জীব নই—যাকে তাকে আমি "দাদা" বলতে অনুমতি দিই না।

—বেশ বাবা, তুমি শিখার দাদা, এ তার গৌরব। তোমার ক'টি ভাই-বোন?

—আমার কেউ নেই কাকীমা, একটা খুড়তুতো বোন আছে। এই সারা বিশ্ব-সংসারে আজ সকাল পর্যন্ত সেই একমাত্র মেয়ে ছিল যার সঙ্গে আমি যখন তখন কথা বলি, দুষ্টুমি করি; আজ থেকে হলো আমার দু'টি বোন শিখা আর সে!

শিখা আসিয়া পড়িল একটা রূপার রেকাবিতে কতকগুলি ফুটন্ত বেল ফুল লইয়া। বলিল,—পা দুটি বাড়াও তো! তোমার পায়ে শ্বেতপুষ্প ছাড়া আর কিছুই দেওয়া যায় না।

মা বলিলেন,—তোমরা গল্প করো বাবা, আমি ঘরের কাজ দেখি। তিনি চলিয়া গেলেন।

তপন বলিল,—লক্ষ্মী বোনটি একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা ক'রবো, সত্যি উত্তর দিস।

—তোমার কাছে মিথ্যে বলবো না দাদা, যদিও মিথ্যে অনেক সময়ই বলি আমি।

তপন তাহার বিবাহ হওয়ার পর হইতে এই দুই মাসের ঘটনা শিখাকে বলিয়া গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল,—ওর মতবল কি শিখা, ও কি কাউকে ভালোবাসে?

—তাতো জানিনে দাদা, সেরকম কিছুতো দেখিনি! দাদা, তোমায় ও ভুল বুঝেছে। আমি কালই ওকে বুঝিয়ে দেবো।

—না! তপনের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত দৃঢ়—না শিখা, তাহলে তোকে আর ভগ্নীস্নেহ দিতে পারবো না। সে আমায় ভালো যদি বাসে, এমনিই বাসবে, কারো প্ররোচনায় নয়! আমি যেমন, যেমনটি সে আমায় দেখেছে, তেমনি ভাবেই আমি তার হৃদয় জয় করতে চাই! যদি না পারি, জানবো সে আমার নয়।

কয়েক মিনিট নীরবে কাটিয়া গেল। তপন পুনরায় আরম্ভ করিল—আমি তো আধুনিক কোন ককেট মেয়েকে বিয়ে করতে আসিনি শিখা, আমি ভেবেছিলুম বিয়ে ক'রছি স্বর্গীয় মহাত্মা শ্যামসুন্দর চ্যাটুজ্যের নাত্‌নীকে। যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া তপন সেই স্বর্গীয় মহাত্মার উদ্দেশে নতি জানাইল। তারপর বলিল,—আর শুনলাম, আমার বাবা নাকি মিঃ চ্যাটার্জিকে কথা দিয়েছিলেন, তাই পিতৃসত্য পালন আর বিপন্ন মিঃ চ্যাটার্জিকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম আর ভেবেছিলাম, আমার অনন্ত জীবনের সাথীকে হয়ত ঐ বাড়ীতেই খুঁজে পাবো।

ব্যথায় বেদনায় তপনের কণ্ঠ মলিন শুনাইতেছে। শিখা অভিভূতের মতো তপনের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখ তাহার জলে ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। এই অপরূপ সুন্দর হৃদয়বান মানুষটিকে তপতী গ্রহণ করে নাই—আশ্চর্য!

—তুমি আমায় অনুমতি করো দাদা, আমি কালই তোমার সাথীকে এনে দেবো—সে তোমায় চেনেনি!

—না, শিখা তা হয় না। আমার স্বরূপ উদঘাটিত ক'রে তার ভালোবাসা পাওয়া এখন আর আমার আকাঙ্ক্ষার বস্তু নয়। আমি জানি প্রত্যেক মেয়েই চায়, তার স্বামী রূপবান, জ্ঞানবান, ধনবান হোক, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তা কারো না হয়, তবে সে কি এমন করে স্বামীর অন্তর চূর্ণ করে দেবে? হিন্দু নারী সে, পবিত্র বৈদিক-মন্ত্রে তার বিয়ে হয়েছে—যে বিয়ের জের জন্ম হতে জন্মান্তরে চলে বলেই-না শাস্ত্রের বিশ্বাস—সেই ধর্মের মেয়ে হ'য়ে সে স্বামীকে একটা সুযোগ পর্যন্ত দিল না নিজেকে প্রকাশ করবার! আমি বুঝেছি শিখা, এই অহঙ্কারের মূলে দুটো জিনিস থাকতে পারে। এক, সে অন্য কাউকে ভালোবাসে, যাকে পেল না বলে গভীর ক্ষুব্ধ হয়েছে; নয় ত, সে আজো অন্যাসক্তা, পবিত্র আছে, কাউকেই ভালোবাসে না। যদি শেষের কারণ সত্যি হয়, তবে আমি তাকে এমনি থেকেই ফিরে পাব, আর যদি প্রথম কারণটা সত্যি হয়, তাহলে সে আমায় হাজার ভালোবাসলেও আমি তাকে গ্রহণ করবো না। আমার জীবনে অন্যাসক্তা নারীর ঠাঁই নেই।

শিখা শিহরিয়া উঠিল। তপতী এ কি করিয়া বসিয়াছে। যে অদ্ভুত চরিত্রবান স্বামী সে লাভ করিয়াছে, তাহাতে তপতীকে অন্যাসক্তা ভাবিয়া ত্যাগ করা তপনের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে।...গভীর স্তব্ধতার মধ্যে শিখা ভাবিতে লাগিল।

—বোনটি, আমার মায়ের পেটের বোনের সঙ্গে তোর আজ কিছু তফাৎ নেই। আমার কথা রাখবি তো?

—নিশ্চয় দাদা, তোমার কথার অবাধ্য হবো যেদিন সেদিন তোমায় দাদা বলবার যোগ্যতা হারাবো যে।

তপতীর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আজ সে আসিয়া বসিবে বন্ধুদের আসরে। উপরে প্রসাধনে সে ব্যস্ত। বন্ধুগণ আসরটা জমাইয়া তুলিতেছেন।

রেবা দেবী বলিলেন,—এবার কিন্তু তপতী বরের সঙ্গে মিশবার বিস্তর সময় পাবে

—বুঝেছো, এতকাল তো বৃথাই কাটালে সব। এখনো সে দেখেনি, কিন্তু একবার দেখলে আর রক্ষে নাই।

সমস্বরে ব্যানার্জি-চ্যাটার্জি-ঘোষ প্রশ্ন করিলেন—কেন?

—কারণ ছেলেটা যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি সুন্দর কথা ; তপতী আবার কাব্যপ্রিয়, ওর একটা কথাতেই মুগ্ধ হয়ে যাবে।

—বলো কী! সে তো একটা বোকারাম, মূর্খ!

—মোটেই না! আমি মাত্র একদিন গিয়েছিলাম তার কাছে। আমায় দেখে কি বল্লে জানো?

—কি বল্লে!

—বল্লে, আসুন। আপনি কোন্ দেশীয়া? নমস্কার না করমর্দন করবো! আমি বল্লাম একদম স্বদেশী, নাম শ্রীমতী রেবা দেবী! তা বল্লে কি জানো? বল্লে রেবা তো উপল-বিষমে বিশীর্ণা। কিন্তু আপনি তো দেখছি শীর্ণা নন!

—উত্তরে তুমি কি বল্লে?—মিঃ ব্যানার্জি প্রশ্ন করিলেন।

—বল্লাম, আমি মোটা হলে তো কিছু যায় আসে না, তপতী খুব স্লিম্।

—ও কথা তুমি বলতে গেলে কেন? তপতীর রূপ ওর না দেখাই তো দরকার।

—শোনই-না কথাটা। তপতী স্লিম্ শুনে বল্লে, বড্ড খুসী হলাম শুনে ; ওর তন্বী দেহ তরবারী দিয়ে অনেককে জবাই করতে পারবে, কি বলেন? আমি তো অবাক! বল্লুম, হাঁ আমাদেরগুলো একদম ভোঁতা।

—তাতে কি বল্লে? মিঃ ব্যানার্জি শুধাইলেন।

—বল্লে, শান দিয়ে নিন। এত রুজ্‌পাউডার লিপষ্টিক্ রয়েছে কি জন্যে। শুনে আমি চুপ করে গেলুম। ও মুখ ফিরিয়ে 'হরু-ঠাকুরের পাঁচালী' পড়তে লাগলো। পরদিন তপতীর মা বারণ করলেন ওখানে যেতে। নইলে ওর জবাব আমি দিতাম।

—বারণ করলেন কেন?

—তা জানি না, বোধহয়, ও বিরক্ত হয়।

—বিরক্ত নয়, ভয় করে, ওর বিদ্যে প্রকাশ হয়ে পড়বে।

—ওর বিদ্যে প্রকাশ হলে তোমাদের বিশেষ সুবিধে হবে না। কারণ ও সত্যি বিদ্বান—তোমাদের মতো শ্যালো নয়।

ইতিমধ্যে মিঃ অধিকারী আসিয়া পৌঁছিলেন। এই মিঃ অধিকারীকে এখন আর ইহারা সুনজরে দেখিতেছেন না। কারণ তপতী তাহার কাছ হইতে আংটি লইয়াছে। অধিকারীই তাহা হইলে তপতীর মন আকর্ষণ করিয়াছে সর্বাপেক্ষা অধিক।

রেবা তাহাকে দেখিয়া বলিল,—আসুন—মিঃ অধিকারী এবার আমাদের মেঘদূতের আপনিই তো যক্ষ!

মিঃ অধিকারী আত্মপ্রসাদের হাস্য করিলেন। ওদিকে তিন-চারটি যুবক তাহার দিকে জনান্তিকে ক্রুদ্ধ ভ্রূর কটাক্ষপাত করিতেছে। বিনয়ের সহিত অধিকারী কহিলেন,—বেশ, আমি সম্মত।

—কিন্তু সম্মতি যাঁর কাছ থেকে পাওয়া চাই, তিনি টয়লেটে ব্যস্ত ; ঐ এসে পড়েছে।

তপতী তর তর বেগে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। সুদীর্ঘ বেণী সর্পাকারে দুলিতেছে,

তাহার অর্ধেকটা আচ্ছন্ন করিয়া ধূপছায়া রঙের অঞ্চলপ্রান্ত পিঠের উপর দিয়া কোমরের কাছে পড়িয়াছে। সমস্ত তনুলতা ঘিরিয়া একটা স্নিগ্ধ সুরভি। সকলে তাহাকে সহাস্যে অভিবাদন করিল। একজন প্রশ্ন করিল,—পরীক্ষা নিশ্চয় ভালোদিলেন!

—হ্যাঁ, আজকার প্রোগ্রাম কি! অকাজে বসে থাকা?

—না, নিশ্চয় না। আজই আমরা ঠিক করবো আগামী মেঘদূত উৎসবে কে কি রোলে নামবেন! প্রথমে দু'একটা গান হোক একটু নাচও যদি হয় আপনার।

হাসির বিদ্যুৎ ছড়াইয়া তপতী কহিল—নাচ আজ নয়, বড় ক্লান্ত। পরশু বরং চলুন স্টিমার ভাড়া করে খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

সকলে সমস্বয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল,—হুর্‌রে! এইতো চাই। থি চীয়ার্স ফর মিস চ্যাটার্জি।

তপতী আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার অবকাশ পাইবার পূর্বেই মিঃ ব্যানার্জি শুধাইলেন—সেই ভদ্রলোকটির খবর কি, দ্যাট গুড, ওল্ড ম্যান?

মধুর হাসিয়া তপতী বলিল,—থাক, তার কথায় কি দরকার! ওর ওপর জেলাস হবার কোন দরকার নাই, ও আমাদের ছায়াও মাড়াবে না।

—গুড্। না মাড়ালেই আমরা খুশি থাকব।

তপতী এবং আরো অনেকের গান গাওয়ার পর আগামী উৎসবের কর্মসূচী প্রস্তুত হইল এবং আগামী কল্যকারও একটা খসড়া তৈরী হইল। রাত্রি অনেক হইয়াছে সকলে চলিয়া গেলে তপতী উপরে আসিয়া দেখিল, তপন খাইতে বসিয়াছে। মা সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতেছে। তপতীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মা ডাকিলেন,—আয় খুকী খেয়ে নে। তপন ওদিকে মুখখানা এতই নীচু করিয়া দিয়াছে যে প্রায় দেখা যায় না। মা দেখিয়া বলিলেন,—খাও বাবা এত লজ্জা কেন।

তপতীর দিকে তপন পিছন ফিরিয়াই ছিল, সেই ভাবেই উত্তর দিল,—লজ্জা না মা অনভ্যাস। খাওয়া হয়ে গেছে, উঠলাম।

—দুধ খাও নি বাবা এখনো।

—আজ আর দুধ খাব না মা, বড্ড ঘুম পাচ্ছে। তপন মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

মিসেস চ্যাটার্জি তপতীকে বলিলেন, খাওয়ার পর তুই আজ ওর ঘরে গিয়ে শুবি খুকী।

তপতী অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—তুমিও সেকেলে হ'য়ে যাচ্ছ মা। কোন ঘরে শুতে হবে, না হবে, আমি খুব ভালো জানি। আমি আর কচি খুকীটি নই।

মিসেস্ চ্যাটার্জি অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—সে কি খুকী, তোর মতলব কি তা'হলে!

ব্যাপারটা অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া উঠিতেছে বুঝিতে পারিয়া তপতী সাবধান হইয়া গেল। বলিল,—তুমি মিছেমিছি অত ভাব কেন মা। দিন পালিয়ে গেল নাকি? বলিয়া তপতী হাসিয়া উঠিল।

মা ভীতভাবেই বলিলেন,—কিন্তু আজই-বা গেলি?

—না-মা না, ভালো একটা দিনক্ষণ ঠিক করো। তোমার ঐ গোঁড়া বামুন জামাইয়ের কাছে কৃষ্ণপক্ষের দিনে নাই বা গেলাম।

মা খানিকটা প্রসন্না হইলেন। তাঁহারা দিনক্ষণ না-মানিলে কি হইবে তপন তো মানে। হ্যাঁ, সেই ভালো হইবে। একটা ভালো দিন তিনি ঠিক করিবেন।

তপতী আহার সারিয়া আপন কক্ষে গিয়া হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। মা'কে কত সহজে ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু পাঁজিতে ভালো দিনের অভাব নাই এবং মা কালই বাহির করিবেন। আচ্ছা তখন অন্য মতলব খাটানো যাইবে। তপতী নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িল।

একখানা প্রকাণ্ড গাড়ি আসিয়া থামিল, নামিল তপন আর শিখা—বিনায়ক অভ্যর্থনা করিতে আসিয়া থামিয়া গেল ; কর্মিগণ বিব্রত হইয়া উঠিল। মীরা ব্যতীত নারী অতিথি এখানে কখনো কেহ আসে নাই। বিনায়ক কোনরূপে নিজেকে সামলাইয়া একটা নমস্কার করিল। অন্যান্য সকলেই তাহার অনুসরণ করিল কোন প্রকারে। কিন্তু শিখা সহজ হাসিতে সকলকে চকিত করিয়া দিয়া বলিল—সব কিন্তু খুঁটিয়ে দেখাবেন বিনায়কবাবু, চলুন আগে অফিস দেখি আপনার।

কে এ? তপন যাহাকে বিবাহ করিয়াছে, সে নয় নিশ্চয়ই। তপনটা কি ফন্দিবাজ। কাহাকে লইয়া আসিতেছে কিছুমাত্র জানায় নাই। তপন বলিল—তুই ওর সঙ্গে ঘুরে সব দেখ ভাই শিখা, আমি ততক্ষণ একটা নতুন খেলনার নক্সা করি—কেমন? তপন গদীতে আসিয়া বসিল।

—আচ্ছা,—আসুন বিনায়কবাবু।

নিরুপায় বিনায়ক শিখাকে লইয়া কারখানা দেখাইতে গেল। ছোট ছোট যন্ত্রগুলি হাতেই চলে। একটা মাত্র বিদ্যুৎ পরিচালিত কল রহিয়াছে। যতদূর সম্ভব শিখা বুঝিতে চেষ্টা করিল। বিনায়ক ধীরে ধীরে বলিয়া গেল এই কারখানা প্রতিষ্ঠার করুণ ইতিহাস, তাহার দরিদ্র জীবনের কাহিনী। লাজুক বিনায়ক নত মুখেই কথা কহিতেছে ; বড় সুন্দর লাগিল শিখার। কোনরূপ ঔদ্ধত্য নাই, সহজ অনাড়ম্বর লোকটি। বন্ধুবাৎসল্যে চোখ দুইটি ছলছল করিতেছে। বিনায়ক বলিয়া চলিল,—তপনকে যদি না পেতাম শিখা দেবী, তা হলে হয়ত বিনায়কের অস্তিত্বও মুছে যেতো। কিন্তু তপনের কিছুই করতে পারলাম না।

—ক'রতে পারলাম না কেন! চেষ্টা করেছেন?

—কি চেষ্টা ক'রবো? তপন তো হাত পা বেঁধে দিয়েছে?

শিখাও নীরব হইয়া গেল। তপনকে সে এই কয়দিনে ভালো রকমই চিনিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে বিনায়ক জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি চেনেন তাকে, কিসের অত অহঙ্কার তার।

—শুধু চিনি নয় সে আমার বিশেষ বন্ধু। আপনার মতো আমারও হাত-পা দাদা বেঁধে দিয়েছেন।

বিনায়ক শুধু বলিল,—হুঁ।

শিখা বলিল,—কিন্তু আপনি ভাববেন না বিনয়বাবু, যতদূর জানি তপতী এখনও নিষ্কলঙ্ক আছে। সে নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝতে পারবে। বিনায়ক আবার একটা হুঁ দিল।

একটি কিশোর কর্মী আসিয়া বলিল,—বড়দাদাবাবু, ছোট-দা ডাকছেন আপনাদের।

—যাচ্ছি। বলিয়া উভয়ে উঠিল। চলিতে চলিতে শিখা বলিল,—আপনারা বুঝি এদের বড়দা আর ছোট্‌দা।

হ্যাঁ, এখানে চাকর কেউ নেই। সবাই ভাই ভাই, সবাই অংশীদার।

—সব নিয়মই বুঝি আপনাদের দুজনের মস্তিষ্ক-প্রসূত?

—সবই ঐ তপনের সৃষ্টি দেবী। মাথা আমার খোলে না। ও যা বলে, তাই আমি করে যাই।

আশ্চর্য। এই লোকটির মতো বন্ধুর উপর এমন অগাধ স্নেহ আর শ্রদ্ধা একযোগে পোষণ করিতে শিখা আর কাহাকেও দেখে নাই। নিজে তিনি কেমন, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা মাত্র করিলেন না। বিনায়কের দিকে একটা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া শিখা হাসিয়া বলিল,—সবই'ত ওঁর বলছেন, আপনার নিজের কি কিছুই নাই?

—আছে, আমার নিজের অতুল সম্পদ আছে। ঐ বন্ধু, আমার তপন।

শিখা অভিভূত হইয়া গেল। দুজনে অফিস ঘরে আসিয়া পৌঁছিল। অফিস দেখিয়া শিখার চোখ জুড়াইয়া যাইতেছে। দেওয়ালে টাঙানো শিবমূর্তিগুলি যেন জীবন্ত। মেঝের আলপনাগুলি কোন্ অতীত যুগের সহিত যেন বর্তমানের যোগ স্থাপন করিতেছে। ঘরে ধূপ-সুরভীত বাতাস মন্থরমদির। চতুর্দিকে শান্তির আবহাওয়া। একটাও চেয়ার বা টেবিল নাই; থাকিলেও যেন এ ঘরে মানাইত না।

শিখা দ্বিধাহীন মনে ঠিক তপনের ছোট বোনটির মতই পলাশপাতাটা টানিয়া লইয়া খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে বলিল—তোমাদের এখানে তো ভাই রোজ পিক্‌নিক্—আমার কিন্তু যেদিন খুসি ভাগ রইল এতে।

বিনায়ক বলিল,—খুসিটা যেন আপনার রোজই হয়।

শিখা বলিল,—আপনার ভাগে তাহ'লে কম পড়ে যাবে। দুই ভাইবোনে জুটলে আপনি পাবেন না।

হাসিতে হাসিতে বিনায়ক কহিল—না হয় হেরেই জিতবো।

—অর্থাৎ। শিখা তাকাইল।

তাহার চোখের দিকে চাহিয়া বিনায়ক বলিল,—অর্থাৎ এত বেশী হারবো যে হারের দিক দিয়ে আমিই হব ফার্স্ট।

তিনজনেই হাসিয়া উঠিল।

তপতী আসিয়া অনুযোগ করিল,—সকাল থেকে তিনবার ফোন করলাম মা, শিখা কিছুতেই আসছে না—আমাদের পার্টিতে যাবে না ব'লছে।

—কেন? কি হল তার? যাবে না কেন? মা নিরীহের মতো প্রশ্ন করিলেন।

—কে জানে! তোমার জামাই কিছু ব'লেছে নাকি? সেই যে সেদিন ওর সঙ্গে দেখা ক'রতে গেল তারপর থেকে আর শিখা আসেনি।

—জামাই কি বলবে খুকী। ওর নামে মিছেমিছি কেন বদনাম দিচ্ছিস?

মা বিরক্ত হইতেছেন, কিন্তু তপতী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, খুব বলতে পারে। যা অসভ্য। ভদ্র মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অভদ্রতা করা কিছু বিচিত্র নয়।

—ও কথাই বলে না তো বেশী, ভদ্র কি আর অভদ্রই কি। তোদের পার্টিতে ওকে নিয়ে যাচ্ছিস তো আজ—দেখে নিস্ আমার কথা ঠিক কি না।

—ওকে নাই-বা নিয়ে গেলুম মা, বিস্তর বড় বড় লোক যাবে সেখানে যদি কিছু অসভ্যতা ক'রে বসে, গঙ্গার জলে সে লজ্জা ধোয়া যাবে না।

—সে কি খুকী, ওকে না নিয়ে গেলে ভাববে কি। লোকেই-বা ব'লবে কি? নিরুপায়

তপতী রাজি হইল, নতুবা মা হয়ত একটা 'সীন ক্রীয়েট' করিয়া বসিবেন। বলিল,—আচ্ছা, তাহলে এই জিনিস ক'টা কিনে নিয়ে যেতে বলো। তপতী একটা লিস্ট দিল।

বন্ধুবর্গের সহিত তপতী পূর্বেই যাত্রা করিল। তপনকে মা যেমনটি আদেশ করিয়াছিলেন, সে তেমনি ভাবেই গিয়া স্টিমারে উঠিল এবং জিনিসগুলি চাকরের হাতে দোতলায় তপতীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া নীচেই বসিয়া রহিল। যথাসময়ে স্টিমার ছাড়িয়া গেল।

উপর হইতে সঙ্গীতের মধুর স্বরলহরী ভাসিয়া আসিতেছে। তপন অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয়। কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল—ঐ সভায় গিয়া একখানি গান গাহিলেই সে তপতীকে আকর্ষণ করিতে পারে কিন্তু যে নারী অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তা, তাহাকে তপনের আর কোন প্রয়োজন নাই। তপনের জীবনসঙ্গিনীর স্থানে সে বসিতে পাইবে না।

তপতীর পরিচিতের সংখ্যা শতাধিক। প্রায় সকলেই আসিয়াছে। অতবড় স্টিমারখানা জুড়িয়া নানাভাবে নানা কথাবার্তা চলিতেছে। পরিচিত হিসাবে মিঃ ঘোষাল, যাঁহার সহিত তপতীর বিবাহ হইবার কথা ছিল, তিনিও আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই তপতী বলিয়া উঠিল,—আসুন, বাপের লক্ষ্মী ছেলে—আছেন কেমন?—এই বিদ্রূপ সকলেই উপভোগ করিল কিন্তু মিঃ ঘোষালের বুকের ভিতর কোথায় যেন একটা আনন্দের শিহরণ জাগিতেছে। বাপের ডাকে বিবাহ-সভা হইতে উঠিয়া যাওয়া তাঁহার চরম নির্বুদ্ধিতা, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য তো তাহা ছিল না। তপতীর বাবাই তো যত গোল বাধাইলেন। টাকাটা ফেলিয়া দিলেই চুকিয়া যাইত। মিঃ ঘোষালের জীবনে এই ব্যর্থতার ক্ষতি কোনদিন পূরণ হইবে না তথাপি আজ তিনি আনন্দিত হইলেন এই ভাবিয়া যে, তপতীর অনুযোগের অভ্যন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে তাহার প্রতি ভালোবাসার ইঙ্গিত। তপতী সেদিন তাহাকে চাহিয়াছিল, আজো তাহাকে না পাওয়ার দুঃখ অনুভব করে। প্রীতিকণ্ঠে তিনি বলেন,—বরাতে সইলো না তপতী দেবী, আমার দোষ কি বলুন? নইলে বাবার কথাকে মান্য আমি জীবনে ঐ একবারই করেছি, আর ঐবারই শেষ বার। কিন্তু এখন তো...

—হ্যাঁ, এখনো লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপ করে থাকুন।

যে তাঁহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা হওয়া মিঃ ঘোষালের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু যাহাদের তিনি দেখিতেছেন, সকলেই প্রায় পরিচিত, স্বল্পপরিচিত। প্রশ্ন করিলেন,—তিনি কি আসেননি—আপনার স্বামী?

"স্বামী" কথাটা উচ্চারিত হইতে শুনিয়াই তপতীর মুখ লজ্জারক্ত হইয়া গেল।

—কি জানি, আছে কোথায় ওদিকে। বলিয়াই সে অর্গান লইয়া বসিল। চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকলে জানিল, জামাইবাবু নীচে একাই বসিয়া আছেন। চপলা তরুণীর দল তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিল এবং তপনকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। অতিথি বর্গ দেখিল, তাহার চোখে, একটা ঘন সবুজ রংএর ঠুলি, কপালে ও গণ্ডে চন্দনপঙ্ক। এদিকে পরনে কোট প্যান্ট এবং মাথায় হ্যাট। এই অদ্ভুত বেশ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত, বিরক্ত হইল এবং একটা বিজয়ের উল্লাসও অনেকেই অনুভব করিল। তপতীর অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তপতী কোন দিন স্বামীর দিকে চাহে নাই, আজো চাহিল না। তরুণীর দল তপনকে লইয়া এক জায়গায় বসাইয়া দিল, বলিল,—স্বদেশী আর বিদেশীতে মেলাচ্ছেন বুঝি। কিন্তু টুপিটা খুলুন টিকি আর কাটবো না—অভয় দিচ্ছি।

তপন শান্ত করে বলিল,—ভরসা পাচ্ছিনে টিকির বদলে মাথাই যদি..

হাসিতে হাসিতে একজন বলিল,—মাথা তাহলে আছে আপনার? আমরা ভেবেছিলাম, তপতী সেটা ঘুরিয়ে দিয়েছে অনেক আগেই?

তপন নিতান্ত গোবেচারার মতো বলিল,—টিকি না থাকায় ওঁর ঘোরাতে অসুবিধা হচ্ছে।

রেবা দেবী আসিয়া বলিল,—আমি কেটেছিলাম টিকি, আমি শ্রীমতী রেবা..

—আপনি আমার বড্ড উপকার করেছেন রেবা দেবী টিকির উপর দিয়েই ফাঁড়াটা উতরে গেল! মাথাটা বাঁচতেও পারে।

—বাঁচবে না, ওটাকে আজ তপি'র পায়ে সমর্পণ করাবো।

অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে তপন কহিল,—ওঁর পা থেঁতলে না যায়।

তপতী ওদিক হইতে ক্রুদ্ধস্বরে ডাকিল,—কি ক'রছিস তোরা? এদিকে আয়না সব!

—তোর বর যে যাচ্ছে না। বলিয়াই তাহারা তপনকেও ধরিয়া আনিয়া একটা টিপয়ের কাছে বসাইয়া দিল। তাহার অদ্ভুত বেশ প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। মৃদুগুঞ্জন বিদ্রূপ শুরু হইয়া গিয়াছে। তপতীর কানেও দুই চারিটা কথা ভাসিয়া আসিল কিন্তু এখানে সে নিরুপায়। অত্যন্ত বিরক্তির সহিত সে একবার তপনের দিকে আঁখিপাত করিল। চোখের ঠুলি এবং চন্দনে মুখখানা আচ্ছন্ন। লোকটা কালো কি ফর্সা তাও বোঝা যায় না। মাথায় টুপি থাকার জন্য চুলও দেখা যাইতেছে না। গঙ্গা-বক্ষে এই অপরূপ মূর্তি দেখিয়া হাসিই পাওয়া উচিত কিন্তু হাসিতে গিয়াই মনে পড়িয়া গেল, ঐ কিম্ভূত কিমাকার লোকটা তাহার স্বামী! তপতীর কান্না পাইতে লাগিল। আত্মসম্বরণ করিবার জন্য সে রেলিং-এর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীরবে চা-টুকু শেষ করিয়া উঠিয়া তপন বলিল,—নমস্কার, আমি নীচেই ব'সছি গিয়ে।

তাহার রূপ, আচার, ব্যবহার দেখিয়া সকলেই বুঝিয়াছিল, এখানে বসিবার সে যোগ্য নয়। কেহই বিশেষ কিছু বলিল না। তপতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু তপন চলিয়া যাইবামাত্র মিঃ ঘোষাল কহিলেন—ওই লোকটা আপনার বর? আশ্চর্য। আপনার বাবার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারলাম না।

অত্যন্ত উষ্মার সহিত তপতী জবাব দিল,—থাক, আমার বাবা আপনার বুদ্ধি ধার করতে যাবেন না নিশ্চয়ই।

তপতীর মনের অবস্থা বুঝিয়া সকলেই এ আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল। তপতী কিন্তু আর কোন কথাই কহিল না। অপমানে তাহার সারা অন্তর জ্বলিতেছে। স্টিমার জেঠিতে ফিরিবামাত্র সে চার পাঁচজন অন্তরঙ্গ বন্ধু লইয়া নিজে গাড়ী চালাইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

তপন একধারে দাঁড়াইয়া দেখিল। আপন মনে হাসিল। উহাদের সে নিষ্ঠুর ভাবে ঠকাইয়া দিয়াছে। ধীরে ধীরে আসিয়া সে ট্রামে উঠিল।

তপতী গৃহে ফিরিয়া শয্যায় লুটাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। আজ তাহার ঠাকুরদা'র কথাগুলি মনে পড়িতেছে। তিনি বলিতেন—"তোর যা বর হবে দিদি, তার আর জোড়া মিলবে না"—তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়তির এমন নিষ্ঠুর বিদ্রূপ হইয়া দেখা দিবে—কে জানিত! তপতী স্থির করিয়া ফেলিল—অপমান করিয়া ঐ বর্বরকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবে। সারা জীবন তপতী একা থাকিবে, সেও ভালো—তপতীর উহার সহিত এক গৃহে বাস অসম্ভব।

দুঃস্বপ্নের মধ্যেই তপতীর রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে তাহার গা-হাত পা ব্যথা

করিতেছে, উঠিল না। মা আসিয়া ডাকিলেন,—শরীর খারাপ খুকী! উঠছিস না কেন?

মায়ের উপর এক চোট ঝাল ঝাড়িয়া লইতে গিয়া তপতী থামিয়া গেল। বেচারী মা, উহার কি দোষ? জামাইকে স্নেহ মমতা করা শাশুড়ীর কর্তব্য।

তপতী উঠিয়া পড়িল। স্নান সারিয়া চা খাইতে আসিয়া দেখিল, রবিবার বলিয়া তপন বাহিরে যায় নাই, চা খাইতেছে। তপতীর গলার স্বর শুনিয়াই সে মুখ নীচু করিল, যেন তপতী তাহাকে দেখিতে না পায়।

তপতী আসিয়া তপনকে দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। রুক্ষ স্বরে বলিল,—বৈরাগী আগে চা খেয়ে যাক্, তারপর আমি খাবো।

মা রাগিয়া বলিলেন,—ছিঃ খুকী, কি সব বলছিস?

তপন হাসিয়া কহিল,—ভালোই তো বলেছে মা। বৈরাগী যেন আমি হতে পারি। অনেক তপস্যায় মানুষ বৈরাগী হয় মা। বৈরাগ্য সাধনার ধন।

রোষ ভরে তপতী বলিয়া চলিল,—যথেষ্ট হয়েছে আর দরকার নাই! তপতী চলিয়া গেল।

মা বলিলেন—কিসব তোমাদের ব্যাপার বাবা, ঝগড়া করেছো নাকি?

—কিছু না মা, ঝগড়া আমি করি নে। আমার চন্দন তিলক ওর পছন্দ নয়; তা কি করা যায় বলুন। কারো রুচির খাতিরে চন্দন মাখা আমি ছাড়তে পারবো না।

তপনের মুখের হাসি দেখিয়া মা আশ্বস্ত হইলেন। ছোটখাটো কিছু একটা উহাদের হইয়া থাকিবে। দম্পতীর কলহ, ভাবনারও কিছুই কারণ নাই।

তপন চা খাইয়া উঠিয়া গেলে তপতী আসিল। মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। মা হাসিয়া বলিলেন,—ঝগড়া টগড়া করিস নে খুকী—ছেলেটা বড় ভালো।

—অত ভালো ভালো নয় বুঝলে মা। অত ভালো হতে ওকে বারণ করে দিও।

—তুই বারণ করিস, আমার কি দায়?

তপতী রুখিয়া উঠিল। বলিল—ঐ 'ইডিয়ট'টাকে শাঁখ বাজিয়ে ঘরে তুলতে তো দায় পড়েছিল তখন—যত সব।

কিন্তু তপতী সামলাইয়া লইল। মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, চুপ কর খুকী, স্বামীকে ওসব বলতে নেই।

তপতীর ইচ্ছা হইতেছিল, মাকে আচ্ছা করিয়া কয়েকটা কথা শুনাইয়া দেয়। বলে যে 'তোমরা যাহাকে আনিয়াছ, সে আমার পদ-সেবার যোগ্য নহে। তাহাকে আমি লইব না। তোমরা তাহাকে লইয়া যাহা খুশি করিতে পার।' কিন্তু ব্যাপারটা বিশ্রী হইবে, বাবা শুনিবেন, এখনি একটা কেলেঙ্কারী ঘটিয়া যাইবে, অতএব সে থামিয়া গেল।

মা বলিলেন—দিন ঠিক করেছি, পয়লা বোশেখ তোদের আবার ফুলশয্যা হবে।

—আচ্ছা, পয়লা বোশেখ সে কথা ভাবা যাবে। বলিয়া তপতী চলিয়া আসিল।

শিখা কেন আসিল না কাল? তাহাকে যে তপতীর কি ভীষণ দরকার। তপতী আবার ফোন্ করিল!

শিখা ফোনে আসিয়া বলল,—কি বলছিস তপু?

—আমার বিপদে তুই চিরকাল সাহায্য করেছিস; আজ আমার এই ঘোর দুর্দিনে কেন তুই লুকোচ্ছিস বল ত?

শিখা ভরা গলায় বলিল,—লুকোইনি তপু! আমি একজন সন্ন্যাসী দাদা পেয়েছি, তাঁর কাছেই এ কয়দিন কাটলো। এখনি আবার আসবেন তিনি।

—বেশ তো তাঁকেও নিয়ে আয়।

—যাবেন না। আলাপ-পরিচয় না হলে যাবেন কেন?

—তা হ'লে কি আমি যাবো তোদের বাড়ী?

—আসতে পারিস, তবে দাদার সঙ্গে দেখা হবে না।

—কারণ?

—দাদা চট্ করে কারো সঙ্গে আলাপ করেন না। তারপরে তুই আর্যনারী হয়ে স্বামীকে গ্রহণ করিসনি শুনলে চটে যাবেন।

মুহূর্তে তপতীর অন্তর রোষরক্তিম হইয়া গেল, বলিল—থাক ভাই, সেই আর্যপুত্রের সঙ্গে আলাপ করবার আমার দরকার নাই। তাহলে আসবি নে?

—না ভাই, মাফ করিস?

—আচ্ছা, আর ডাকবো না তোকে।

তপতী ফোন ছাড়িয়া দিল। ওদিকে ফোন হাতে করিয়া শিখা বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছে।

সকালবেলায় শীতল হাওয়া বহিয়া যাইতেছে। একটা চাঁপাগাছের তলায় তিনখানা বেতের চেয়ার পাতিয়া শিখা অপেক্ষা করিতেছিল। মাত্র মাসখানেক হইল তপনের সহিত তাহার পরিচয়, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাহার কি অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। ঐ স্পর্শমণির পরশে শিখার অন্তর যেন সোনা হইয়া গেল। কিন্তু ঐ মণিটি যাহার সে উহাকে পাথর ভাবিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছে। তার মতো দুর্ভাগিনী আর কেহ আছে কি না, শিখা জানে না। তপতীর জন্যে শিখার অন্তর করুণায় দ্রব হইয়া উঠিল।

তপন ও বিনায়ক আসিয়া পৌঁছিল। শিখা প্রণাম সরিয়া বলিল,—একটা কথা শোন দাদা—একটা প্রার্থনা।

—কি বল্। তোর প্রার্থনা পুরানো তো দাদার গৌরব।

—জানি। অনুচিত কিছু চাইবো না দাদা। তুমি তপতীর সঙ্গে বা তার কাছে এমন দুচারটে কথা বল, যাতে সে তোমাকে চিনবার সুযোগ পায়, অন্তত উৎসুক হয়।

—তাতে লাভ কি শিখা?

—আছে লাভ। আমার বিশ্বাস, তপতী আজো তোমার অযোগ্য হয়ে যায়নি। ওর প্রথম জীবন অত্যন্ত সুন্দর ঠাকুমা-ঠাকুরদার হাতে গড়া। ও এই সোসাইটির চার্মে পড়ে নষ্ট হতে বসেছে, কিন্তু এখনো নষ্ট সে হয়নি। তুমি ওকে বাঁচাও দাদা।

—মরণ-বাঁচনের অধিকার আমার হাতে নেই শিখা। তবে যদি সে আজো অনন্যপরায়ণা থাকে, যদি সে সতী থাকে, তাহলে তাকে পাব। তার জন্য আয়োজনের কিছু তো দরকার নেই। তবুও তোর কথা রাখবো যতটা সম্ভব।

শিখা নীরবে নত নেত্রে সহস্তে প্রস্তুত খাবারগুলি সাজাইতে লাগিল। বিনায়ক ফুটন্ত চাঁপা ফুলের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। ফুলটা ফুটিয়াছে অনেক উঁচুতে নাগাল পাওয়া যায় না। বিনায়ক একটু লাফ দিল।

শিখার করুণ মুখশ্রী হাসিতে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বলিল, শুধু কারখানার হিসাবই

দেখেন না, ফুলের খবরও রাখেন [illegible]

হাসিমুখে বিনায়ক বলিল, রাখি. কিন্তু নিজের জন্য নয়, মীরাটা বড্ড ফুল ভালোবাসে।

—আমার জন্যও একটা পাড়বেন।

বিনায়ক ত্বরিতে জবাব দিল, কেন, আপনার তো দাদা রয়েছে, দিক না পেড়ে।

ঠোঁট ফুলাইয়া শিখা কহিল. দাদা তো আছেই. আপনি বুঝি কেউ নন? কথাটা বলিয়াই শিখার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখিল তপন কিঞ্চিৎ দূরে একটা কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছে। নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিবার জন্য ডাকিল, দাদা খাবে এসো।

বিনায়ক কিন্তু কথাটার জের ছাড়ে নাই. কহিল,—আমার সঙ্গেও তাহলে একটা সম্পর্ক আপনার হওয়া দরকার। কী সম্পর্ক বাঞ্ছনীয় আপনার?

—আপাতত বন্ধু। শিখা জবাব দিয়া সরবৎ তৈরী করিতে লাগিল।

ঐ "আপাতত" কথাটির মধ্যে রহিয়াছে যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত তাহাই ভাবিতে গিয়া শিখার হাস্যমধুর মুখের পানে চাহিয়া বিনায়ক বুঝিল. শিখাকে পাওয়া তাহার পক্ষে খুব কঠিন না-ও হইতে পারে। কিন্তু তাহার ভয় করিতেছে। তপনের দারুণ ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা তাহাকে আতঙ্কিত করিয়াছে। এই সোসাইটিতে দরিদ্র বিনায়ক আবার ঢুকিবে। শিখা তাহার আকাঙ্ক্ষার ধন, শিখাকে পাইলে ধন্য হইয়া যাইবে বিনায়ক কিন্তু শিখাকে সে রাখিবে কোথায়?

—কি ভাবছিস্ বিনু। বলিয়া তপন ফিরিয়া আসিল।

—ভাবছেন, আমার সঙ্গে উনি কি সম্পর্ক পাতাবেন। বলিয়া শিখা গ্লাসের সরবৎ আরো বেগে নাড়িতে লাগিল। মুখে তাহার হাসি মাখানো।

তপন শিখার গায়ে একটা কৃষ্ণচূড়ার ঝরা ফুল ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল,—দুষ্টু আমার বন্ধুকে বিব্রত করে তুলেছিস্?

—কি করা যায় দাদা, তোমার বন্ধু যদি নিঃসম্পর্কীয় কাউকে ফুল তুলে না দেন, তাহলে, সম্পর্ক একটা পাতানো ভালো নয় কি? মীরাটা কিন্তু বড্ড দেরী করছে।

—থাম্—তার স্বামী, শাশুড়ী, শ্বশুর। সকালবেলা বিস্তর কাজ। ঐ তো এসেছে...

প্রকাণ্ড একটা গাড়ী গেটে ঢুকিতেই শিখা ছুটিয়া গিয়া মীরাকে জড়াইয়া ধরিল—আয় দুষ্টু, এতো দেরী করলি যে...?

—চুপ চুপ বিনুদা এক্ষুণি মার লাগাবে। ওর কারখানার পাংচুয়ালিটি বড্ড কড়া। কিন্তু বিনুদার মুখটা যেন,—কি হয়েছে বিনুদা? মীরা বিনায়কের মাথার চুলে হাতের আঙুলগুলি চালাইয়া নড়িতে লাগিল।

—না বোনটি, কিছু হয়নি ; আয়, তোর জন্য এই ফুলটা পেড়ে রেখেছি।

মীরা ফুলটা লইয়া খোঁপায় পরিতে পরিতে বলিল,—তোর কই শিখা?

শিখা করুণ কণ্ঠে কহিল,—আমার দাদাও দিল না, তোর বিনুদাও না।

—বা-রে! বিনুদা, [illegible] পেড়ে দাও, আমার হুকুম, ওঠো।

বিনায়ক উঠিতে যাইতেই শিখা ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল,—না, না, আগে খেয়ে নিন—।

মীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে, এমনি ভঙ্গি করিয়া বলিল,—বটে। আমার চেয়ে তোর দরদ ওর উপর বেশি? আচ্ছা। তোমাকে ওর হাতে দিয়ে দিলুম বিনুদা, বুঝে কাজ কর

এবার থেকে।

মীরা সটান তপনের পায়ের কাছে বসিয়া হাঁটুতে চিবুক রাখিয়া বলিল,—কাল কি হলো দাদা, কেঁদেছিলে সারারাত?

—না বোন্‌টি কাঁদবো কেন? তোর দাদা কি এত দুর্বল।

কথাটা বলিয়াই তপন মীরার খোঁপা হইতে চাঁপা ফুলটা তুলিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—"আমারে ফুটিতে হোল বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে—আমি চম্পা।"

ব্যাপারটা বেশ সরস হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মীরার প্রতি উচ্চারিত তপনের শেষের কথাটি এই ক্ষুদ্র সভাটিকে সচকিত করিয়া দিল। এইখানে এমন একজন আছে, অতলান্ত সাগরের মতো যাহার বেদনা পারহীন, কূলহীন। তাহার কথা শিখা বা বিনয়ক ভুলিয়া না গেলেও খুব তীক্ষ্ম ভাবে মনে রাখে নাই।

তপনের কথায় শিখার নারী হৃদয়ের কোমলতা যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল, তিরস্কারের স্বরে সে বলিল,—তুমি হয়তো খুব কঠিন দাদা, কিন্তু তুমি এমন করে কথা বলো যে পাষাণও কেঁদে ওঠে—শিখার দুই চোখ কারুণ্যে কোমল হইয়া উঠিল।

মীরা শিখার কানে আসিয়া স্নেহের মাধুর্যে কহিল,—দাদা আমার আকাশের তপনের মতই নিজেকে ক্ষয় ক'রে পৃথিবীকে আলোক দেবে। এই তার সাধনা শিখা।

—তোর ভাই বোন দু'জনেই সমান মীরা। তোদের হাসিভরা কথা শুনে জনহীন প্রান্তর কেঁদে ওঠে।

মীরা এবং তপন অপ্রস্তুতের মতো চুপ করিয়া গেল। বিনায়ক অবস্থাটাকে একটু হালকা করিবার জন্য বলিল,—কান্না মানুষের প্রথম অভিব্যক্তি।

রুখিয়া শিখা জবাব দিল,—তাই অমনি বন্ধু জুটিয়েছেন, প্রতি কথায় কাঁদবো।

বিনায়ক বলিল,—রোদনের মধ্যে দিয়েই আমরা শ্রেয়ঃ লাভ করি, শিখা দেবী।

—রাখুন আপনার ফিলজফি। শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে আমার ধারণা আপনার সমান নাও হতে পারে।

—না হতে পারে, কিন্তু হতেও তো পারে। তপন টীপ্পনি দিল।

—রাগিও না দাদা, ভালো লাগছে না। তোমার বন্ধুর শ্রেয়ঃ যদি দিনরাত কান্না দিয়ে পাওয়া যায়, তাহলে আমার তা চাইনে।

—আমরা কে কি চাই তা আমরা নিজেরাই জানিনে শিখা দেবী। বিনায়ক বলিল।

—রাখুন, রাখুন, এটা কলেজের ক্লাশরুম নয়। আমি কি চাই, তা আমি খুব ভালো ক'রেই জানি।

মীরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল,—জানিস তো চেয়ে নে-না ভাই।

রোষরক্ত নয়নে শিখা ডাকিল—মীরা ভালো হচ্ছে না।

হাসি বিকশিত মুখে মীরা বলিল,—খুব ভালোহ'চ্ছে শিখা।

দোতলার বারান্দা হইতে শিখার মা ডাকিয়া বলিলেন—রোদটা কড়া হ'য়ে উঠলো তপন, ঘরে চলে এসো বাবা তোমরা।

তপন ও মীরা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। এ যাওয়ার উদ্দেশ্য এতই স্পষ্ট যে শিখা লজ্জানতমুখে খাবারের বাসনগুলি গুছাইতে লাগিল। বিনায়ক একটা ফুল পাড়িয়া শিখার হাতে দিয়া বলিল,—বেশ তা'হলে বন্ধুই হলেন—কেমন, রাজি।

—রাজি। শিখা নতমুখে বলিল কথাটা।

ইচ্ছা থাকিলেও বেশীক্ষণ বিনায়কের কাছে একলা থাকিতে শিখার লজ্জা করিতেছিল। উভয়ে চলিয়া আসিল ছায়াঢাকা বারান্দায়।

পয়লা বৈশাখ সকালে উঠিয়াই তপতীর মনে পড়িল, নববর্ষের নিমন্ত্রণ-লিপি কেনা হয় নাই। আজই বন্ধুগণকে তাহা পাঠানো উচিত। বৎসরের প্রথম দিন বলিয়া হয়তো তপনের উপর তাহার মনটা একটু প্রসন্ন ছিল।

মা'কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল,—আমার নববর্ষের নিমন্ত্রণ-লিপি কেনা হয়নি মা, এখুনি যেতে হবে। সে আবার সেই কলেজ স্ট্রীট,—এ পাড়ায়, পাওয়া যায় না।

মা বলিলেন,—তা যা-না কলেজ স্ট্রীট, কিনে আন্‌গে।

—একা যাবো মা? ওদিকে আমি বেশী যাইনে।

মা এক মুহূর্ত কি ভাবিলেন, তারপরই হাস্যদীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, একা কেন যাবি তপনকে নিয়ে যা। যাও তো তপন, নববর্ষের কার্ড কিনে আনো গিয়ে।

এতোটা তপতীর ইচ্ছা ছিল না। ঐ অভদ্র লোকটাকে লইয়া বাজার করিতে যাইতে সে নারাজ। কিন্তু মা যেভাবে কথাটা বলিলেন তপতী আর না যাইয়া পারে নাই। সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—বেশ, গাড়ীটা বের করুন।

তপন নীরবে চা পান শেষ করিয়া উঠিয়া গেল এবং গ্যারেজ হইতে গাড়ী বাহির করিয়া চালকের আসনে বসিয়া তপতীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সুন্দর একটা হালকা রং-এর শাড়ী পরিয়া তপতী নামিয়া আসিল। কিন্তু ঐ সুবেশা তরুণীকে একটা চন্দন-তিলক আঁকা কিম্ভূতের পাশে দেখিলে লোকে ভাবিবে কি। দুই মুহূর্ত ভাবিয়া তপতী ভিতরে আসনে উঠিয়া বসিল—তপন গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

কলেজ স্ট্রীটের একটা বড় দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল গাড়ী। নামিয়া তপতী দোকানে ঢুকিল। সম্ভ্রান্ত তরুণী দেখিয়া দোকানের কর্মীরাও প্রয়োজন জানিবার জন্য ব্যস্ত হইল।

তপতী কার্ড দেখিতে চাহিল, একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল তপন গাড়ীতে বসিয়া রাস্তার ওপারে ফুলের দোকানটায় সাজানো ফুলগুলির দিকে চাহিয়া আছে। দোকানের একজনকে তপতী আদেশ করিল,—ওকে বলুন তো দু'টাকার ফুল কিনে আনুক।

সে ব্যক্তি দোকানের ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া কহিল,—এ ড্রাইভার, দু'রুপেয়াকো ফুল লে-আও।

তপন নীরবে নামিয়া ফুলের দোকানে চলিয়া গেল। তাহাকে 'ড্রাইভার' সম্বোধন করায় তপতীর প্রথমটা লজ্জাই হইয়াছিল, কিন্তু ভাবিয়া দেখিল, দোকানের কর্মচারীর কিছুমাত্র অপরাধ নাই। মৃদু ভাবিয়া সে কার্ড চাহিয়া লইয়া এবং মূল্য দিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া চালকের আসনে নিজে বসিল।

তপন অনেকগুলি ফুলের বোঝায় মুখ আড়াল করিয়া ফিরিতেই তপতী নিজের বাঁ-দিকের খালি জায়গাটা দেখাইয়া দিয়া বলিল,—রাখুন।

তপন ফুলগুলি সেখানে রাখিয়া দেখিল, তপতীর পাশে বসিবার আর স্থান নাই। সে ভিতরের সীটে আসিয়া বসিবামাত্র তপতী গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি একটি লোককে দেখিয়া তপতী গাড়ী থামাইয়া প্রশ্ন করিল,—এখানে কোথায়?

—রুগী দেখিতে গিয়াছিলাম—ফিরছি।

—আসুন গাড়ীতে। বলিয়া ফুলগুলি তুলিয়া নিজের কোলের উপর রাখিয়া ভদ্রোলোকের বসিবার স্থান করিয়া দিল আপনার পাশে। ভদ্রলোক তপনকে চিনেন না কিন্তু তপতী পরিচয় করাইয়া না দেওয়ায় তাহার দিকে একবার চাহিয়াই মুখ ফিরাইলেন।

তপন নীরবেই বসিয়া রহিল। তাহাকে এইভাবে অপমান করিবার জন্যই তবে তপতী সঙ্গে আনিয়াছে! ভালই। ব্যথা তপনের অন্তরে জাগিতেছে কিন্তু মহাশক্তিও তাহার অসীম। ওদিকে তপতী গাড়ী চালাইতে চালাইতে কথা বলিতেছে,—এইখানেই নিমন্ত্রণ করছি, নিশ্চয়ই যাবেন বিকালে।

—নিশ্চয়ই যাবো। আপনার হাতের লিপি না পেলে বছরটাই মিছে হবে।

—খোসামুদি খুব ভালো শিখেছেন, দেখ্‌ছি। কার কার স্তব করছেন আজকাল?

—স্তব করবার যোগ্য মেয়ে কমই থাকে মিস্ চ্যাটার্জি।

—যেমন আমি একজন। বলিয়াই তপতী উচ্ছলভাবে হাসিয়া উঠিল।

ভদ্রলোক বিব্রত হইতে গিয়া সামলাইয়া লইলেন, বলিলেন,—কথাটা সত্যি।

—ওঃ! এইখানে নামবেন আচ্ছা—নমস্কার।

ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ির দরজায় নামিয়া গেলেন। তপতী আবার গাড়ী চালাইল। তপনকে সে যথেষ্ট অপমান আজ করিয়াছে। যদি সে মা'কে গিয়া সব কথা বলিয়া দেয়। তপতীর মাথায় এতক্ষণে একটা দুশ্চিন্তা জাগিল। পিছন ফিরিয়া দেখিল, তপন গাড়ীর কিনারায় মাথা রাখিয়াছে। তাহার কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশগুলি বাতাসে উড়িয়া বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তপতী দেখিয়াছে তপনের মুণ্ডিত মস্তক, আজ দেখিল তাহার মাথার চুলগুলি নরম রেশমের মতো থোকা থোকা হইয়া উড়িতেছে। তপতীর বুকে অকস্মাৎ একটা শিহরণ জাগিল। গাড়ী বাড়ির কাছাকাছি আসিয়াছে। গেটে ঢুকিয়া তপতী নামিতেই দেখিতে পাইল, তপন নামিয়া দারোয়ানকে বলিতেছে,—মা'কে বলে দিও, আমি বারোটা নাগাদ ফিরবো।

তপতী কত কি ভাবিতে ভাবিতে উপরে উঠিয়া আসিল।

বিকালে স্নান সারিয়া তপন যখন খাইতে আসিল, তপতীর বন্ধুরা তখন মহাসমারোহে আহারে বসিয়াছে। তপনকে দেখিয়া দু'একজন একটু নাক সিট্‌কাইল। অধিকাংশই তাহাকে চেনে না।

বন্ধুরা যে বারান্দায় খাইতে বসিয়াছে, তপন তাহা পার হইয়া ওদিকের ঘরে তাহার নিত্যকার খাইবার স্থানে গিয়া বলিল,—কৈ মা, খাবার দিন।

—ওখানে বসবে না বাবা—ওদের সঙ্গে?

—না মা, আমার অসুবিধা বোধ হয়। ওদের দলের তো আমি নই মা।

তপতী উৎকর্ণ হইয়া ছিল, মা'র সহিত তপনের কি কথা শুনিবার জন্য। যেটুকু সহানুভূতি আজ তপনের উপর জন্মিয়াছিল, মুহূর্তে তাহা উবিয়া গেল। উনি ওদের দলের নন—কি বাহাদুরী? উহার জন্য তবে তপতীকে বুঝি ভদ্র-সমাজ ত্যাগ করিতে হইবে। রাগিয়া তপতী চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু আরো কি কথা হয় শুনিবার জন্য দাঁড়াইল; মা হাসিয়া

বলিলেন—আচ্ছা বাবা, এইখানেই বোস। তিনি একটা চপ ও একটা কাটলেট তপনকে খাইতে দিলেন।

তপন নিতান্ত বিনয়ের সহিত বলিল,—ওসব আমি ভালবাসিনে মা, মাছ মাংস তো আমি খুব কম খাই, আমায় রুটি-মাখন, আর জেলি দিন।

তপতী আর শুনিল না। ঐ দারুণ বর্বরকে লইয়া তাহাকে ঘর করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা তপতী যেন মরিয়া যায়। মা জানুক সব কথা, তপতী ঐ হতভাগাকে যেমন করিয়াই হউক বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিবে।

মনের ভিতরটা যেন আগুনের মতো পুড়িয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে বন্ধুগণের প্রতি তাহার স্নেহাধিক্যে। সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজ সমাধা করিল, তপতীর জয়গান করিল এবং নূতন তৈরী লনটাতে খেলিবার জন্য গিয়া জমায়েত হইল।

তপনকে আর একচোট অপমান করিবার জন্য চেঁচাইয়া তপতী বলিল,—আমি খেলতে যাচ্ছি মা, বারান্দা থেকে দেখো কেমন খেলা শিখেছি।

মা বলিলেন, তুমি টেনিশ খেলবে না বাবা?

—ও খেলা আমি খেলিনে মা, ওটা বড়লোকদের খেলা, আমাদের পোষায় না।

—হলোই বা, যাও, একটু খেলা কর গিয়ে।

—না মা, আমি একটু বেড়াতে যাচ্ছি।

তপন বাহির হইয়া গেল।

মা'র মন সন্তানের কল্যাণকামনায় সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। খুকীর কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মিসেস চ্যাটার্জি অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া পড়িয়াছেন। স্বামীকে সব করা খুলিয়া বলিতেও তাহার ভয় হয়—কারণ তিনি জানেন, স্বামীই এই ব্যাপারের মূল। খুকী তপনকে দেখিতে পারে না শুনিলেই তিনি অত্যন্ত ব্যথা পাইবেন। আর খুকী ঠিক কি ভাবে তপনকে দেখিতেছে, তাহা মা'ও সঠিক জানিতে পারিতেছেন না। এ যুগের তরুণ-তরুণীকে লইয়া ফ্যাসাদ বড় কম নয়। যাহা হউক, আজ তিনি উহাদের ফুলশয্যার আয়োজন করিয়াছেন। খুকীর ঘরে তপনকেই আজ তিনি পাঠাইয়া দিবেন।

রাত্রে খাওয়া শেষ হইলে স্নেহকোমল কণ্ঠে মা বলিলেন—খুকীর এখন আর পড়াশুনার চাপ নেই, এবার ওর সঙ্গে একটু মেলামেশা কর বাবা।

তপন একটু চকিত হইল, তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল,—ওর মনের উপর চাপ দিচ্ছেন কেন মা? এ যুগের মেয়েরা মনের উপর চাপ সহ্য করে না।

—কিন্তু বাবা...

বাধা দিয়া তপন বলিল,—আপনি সব কথা বুঝবেন না মা, আর আমি বলতেও পারবো না। তবে আমার হাতে আপনার খুকীকে সম্প্রদান করেছেন,—এ কথা যদি সঠিক হয় তাহলে তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে সে ভার আমার হাতেই ছেড়ে দিন। আপনাদের উদ্বেগ অনাবশ্যক। আরো কিছু দিন যাক্।

মা তপনের কথা শুনিয়া কয়েক মিনিট নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর করুণকণ্ঠে কহিলেন—খুকীর ঐ বন্ধুগুলোকে আমার ভয় করে বাবা—

কিছু ভয় নেই মা, মেয়ে আপনার যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। ওরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর ক্ষতি যদি হয়ে থাকে, তাহলে অনেক আগেই তা হয়েছে।

—সে কি কথা বাবা! মাতা শিহরিয়া উঠিলেন।

—না মা বিচলিত হবেন না। আপনার মেয়েকে বুঝতে সময় লাগে। তবে যতদূর মনে হয়, সে আত্মরক্ষায় সক্ষম। আমার ঘুম পাচ্ছে মা, শুইগে।

মা আর কিছুই বলিলেন না, বলিতে তাঁহার বাধিতেছিল। আপন কন্যার সম্বন্ধে আপনারই জামাই-এর সহিত কতক্ষণই বা আলোচনা করা যায় এইরকম একটি বিষয় লইয়া! তপন চলিয়া গেলে তিনি তপতীর কক্ষে আসিয়া দেখিলেন, তপতী অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া গিয়াছে। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি শয়নকক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু ফিরিয়া গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। আধুনিক আলোকপ্রাপ্তা শিক্ষিত মেয়েকে তিনি অধিক আর কি বলিতে পারেন। যতদূর বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। এ সমাজে এতখানিও কেহ বলে না। কিন্তু তাঁহার আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, খুকী জানে তপন ও-ঘরে আজ যাইবে, অথচ খুকী নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িল! তপনের জন্য এতটুকু উদ্বেগ, একটুখানি উৎকণ্ঠাও কি তাহার মনে জাগে না? সমস্ত ব্যাপারটা মিসেস চ্যাটার্জির অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় বোধ হইতেছে।

তপনই-বা কেন ওভাবে জবাব দিল? তপন যাহা বলিল, হয়ত সেই কথাই সত্য; জোর করিলে খুকীর জেদ বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু জোর করিতে হয় কিসের জন্য! আজ দুই আড়াই মাস তিনি তপনকে দেখিতেছেন, তাহার মতো চোখ জুড়ানো ছেলে তিনি কমই দেখিয়াছেন। খুকী যদি তাহাকে অভদ্র বা ইডিয়ট মনে করিয়া থাকে তবে অত্যন্ত ভুল করিয়াছে—খুকীর এ ভুল ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। মিসেস চ্যাটার্জি কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন ক্রমশ।

ওদিকে পদশব্দটা ফিরিয়া যাইবা মাত্র তপতী চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল, তপন নহে, মা; তপন আসিতেছে ভাবিয়াই সে ঘুমের ভান করিয়াছিল, কিন্তু তৎপরিবর্তে মা'কে আসিয়া ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইল। হয়ত তপন আসিবে না, কিম্বা পরে আসিবে! রাত্রি তো এগারটা বাজিয়া গেল।

তপতী দরজা খোলা রাখিয়া অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল। তপন তাহা হইলে আজ আসিবে না। তপতী যেন বাঁচিয়া গেল। তপন আসিলে তাহাকে একটা নির্মম আঘাত করিবার জন্য তপতী প্রস্তুত হইতেছিল,—আসিল না, ভালোই হইল। কিন্তু সত্যিই কি আসিবে না।

তপতী পা-টিপিয়া-টিপিয়া এদিকের বারান্দা পার হইয়া তপনের রুদ্ধদ্বার শয়ন কক্ষের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতর হইতে নিদ্রিত ব্যক্তির ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ আসিতেছে। তপন তাহা হইলে ঘুমাইয়া গিয়াছে! কিন্তু কেন? তপতী মা'র কথায় সম্মতি দেয় নাই, কিন্তু প্রতিবাদও করে নাই। যাক্, না আসিয়া ভালোই করিয়াছে। তপন তাহা হইলে বুঝিয়াছে তপতী তাহাকে চায় না। তপতী নিশ্চিন্ত হইতে গিয়া ঠিক বুঝিল না, আধুনিক যুগের বিকৃত শিক্ষা তাহার নৈরাশ্যকে নিশ্চিন্ততার রূপে দেখাইতেছে কিনা। তপতী ফিরিয়া আসিয়া শয়ন করিল। ঘুম তাহার ভালই হইবার কথা, কিন্তু অনেক—অনেকক্ষণ তপতী জাগিয়া রহিল সেদিন...।

পরদিন সকালে তপতীর ক্লান্ত-বিষণ্ণ মুখশ্রী দেখিয়া মা সস্নেহে কহিলেন,—বরের সঙ্গে ভাব্‌সাব্ করগে খুকী, দেখবি, ছেলেটা খুব ভালো।

ঝঙ্কার দিয়া তপতী কহিল—তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছো মা, থামো এবার!

মা মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। একটা ভয়ানক কিছু উহাদের হইয়াছে, কিন্তু কী

হইয়াছে? প্রশ্নের উত্তর মা খুঁজিয়া পাইলেন না তপতীর মুখের কোনো রেখায়। মায়ের চিন্তাকুল মুখ দেখিয়া তপতী নিজের কথাটা সম্বন্ধে সচকিত হইল, মৃদু হাসিয়া কহিল,—এত বড়ো মেয়েকে কিছু শেখাতে হয় না, তোমার অত ভাবনা কেন? ভাব সাব হয়েছে আমাদের। এক ঘরে না শুলেই বুঝি আর ভাব হয় না!

তপতীর মুখের হাসি দেখিয়া মা অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিলেন। আজকালকার চালাক ছেলেমেয়ে, হয়ত মা'কে ফাঁকি দিয়া বিদায় করিয়া উহারা দুজনে মিলিত হইয়াছে। তাই তপতীর জাগরণ-ক্লান্ত মুখশ্রী মা'কে অত্যন্ত আনন্দ দিল। স্নেহ বিগলিত স্বরে তিনি কহিলেন,—বেশ মা, আমার মনটা খুব চঞ্চল হয়েছিল কিনা, তাই বল্‌ছিলাম। এবার আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো তাহলে!

মধুর হাসিয়া তপতী কহিল,—একদম নিশ্চিন্ত হয়ে যাও, কিছু ভাবনার দরকার নেই তোমার।

তপন আসিয়াই ঘরের মধ্যে তপতীকে দেখিয়া দরজার কাছে থামিয়া গেল। মা ডাকিলেন,—এসো বাবা, খাবে। তপতীর পাশ কাটাইয়া তপন ও-দিকের একটা চেয়ারে মুখ ফিরাইয়া বসিল। তপতী সন্ধানী দৃষ্টিতে তাহার আপাদ-মস্তক দেখিতে চাহিল, কিছুই দেখা যায় না। কোট-প্যান্টগুলো সমস্ত দেহটা ঢাকা। উর্ধ্বাংশে তিলক এবং চোখে সবুজ ঠুলি। মুখখানা অমন ভাবে ফিরাইয়া রাখিবার হেতু কি। তপতীর আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল। ভাবিল, মুখের ডোল্‌টা বোধ হয় ভালোনয়। হয়ত দাঁতগুলো উঁচু কিম্বা ঠোঁট দুইটা পুরু তাই তপতীকে দেখাইতে চাহে না। কিম্বা লজ্জাও হইতে পারে। তপতী মাথার চুলগুলি শুধু দেখিতে পাইতেছে! ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত চুলগুলি পিছনদিকে উল্টাইয়া দিয়াছে, সদ্যস্নাত চুল-ঝরা একটা জলধারা ঘাড়ের পাশে গড়াইয়া আসিতেছে, ঘাড় এবং কাঁধের সংযোগস্থলে একটা ডাগর কালো তিল! পিছনটা তো খুবই সুন্দর মনে হইতেছে, আর ফিগারটাও বেশ—লম্বা দোহারা, বলিষ্ঠ!

সবই হয়ত ভাল, কিন্তু অসভ্য যে। আবার ঐ দারুণ গোঁড়ামী, তিলক-ফোঁটা, নিরামিষ খাওয়া, পাঁচালী পড়া—নাঃ, উহাকে লইয়া তপতীর চলিবে না। খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া গেল, কিন্তু একেবারে চলিয়া গেল না, বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল তপনের সহিত মা'র কথা শুনিবার জন্য। মা বলিতেছে,—কাল তোমার কথাটা আমি ভেবে দেখলাম বাবা, ঐ ঠিক। তবে তোমরা দুটি আমাদের সর্বস্ব-ধন তোমাদের ভালোর জন্য মন বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

তপন সহাস্যে কহিল,—আচ্ছা মা আমার দ্বারা আপনার খুকীর কিছু মন্দ হবে ব'লে কেন আপনি মনে ক'রছেন?

শুনিতে শুনিতে তপতী বিরক্ত হইয়া উঠিল। উনি তপতীর ভালো করিয়া দিবেন। কী আস্পর্ধা। মা বলিলেন,—তোমাদের দুটিকে সুখী দেখবার জন্যই বেঁচে আছি বাবা।

মা'র কণ্ঠে কল্যাণাশীষ ঝরিয়া পড়িতেছে। এই অপার্থিব মাতৃমূর্তির সম্মুখে বসিয়া প্রতারণার কথা বলিতে তপনের বিবেক পীড়িত হইতেছে! সে চুপ করিয়া খাইতে লাগিল। তপতী পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—আমায় আর এক কাপ চা দাও মা, কড়া করে!

মা অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিলেন! নিশ্চয়ই উহারা কাল মিলিত হইয়াছিল, রাত জাগার জন্য খুকীর কড়া চা খাইতে ইচ্ছা হইতেছে। বলিলেন—আর একটু ঘুমোগে, শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে।

তপনের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, অনুভব করিল, খুকীর অভিনয় চমৎকার জমিতেছে। মা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। মাতৃত্বের এই ব্যাকুল আবেদন তপনের মনকে আর্ত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু কিছুই সে করিতে পারে না। মা'র কন্যাটি যখন অভিনয় করিতেছে, তখন সে আর কি করিবে?

বিষাদক্ষিন্ন তপন বাহিরে চলিয়া গেল। তপতীও কড়া চা খাইয়া আপন কক্ষে আসিল, হাসিল খানিক আপন মনে এবং কবিতার খাতাটা টানিয়া লইয়া "বঞ্চিতের বেদনা" লিখিতে বসিল।

শিখা কয়েকটি মেয়েকে কারখানার প্রাঙ্গণে আনিয়া জড় করিয়াছে। উহাদের নিকট তাহার কি একটা প্রস্তাব আছে। বিনায়ক একধারে চুপচাপ দাঁড়াইয়াছিল, তপন এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই। শিখা কহিল,—আচ্ছা মিতা, দাদার যদি দেরি থাকে তো আমরা আরম্ভ করি।

—বেশ তো ; করুন আরম্ভ। বিনায়ক মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল। শিখা আরম্ভ করিল,—ভগ্নিগণ আমাদের অভাব এত বেশী, যে মেটাবার চেষ্টা করতেও ভয় হয়। কিন্তু ভয় করলে চলবে না। অভাব আমাদের যত অভাব বোধ তার চেয়ে তীব্র হ'য়ে উঠেছে। অতএব এই ঠিক সুযোগ, যখন আমরা অভাবের প্রতিকার করতে কায়মনে লাগতে পারবো!

আমার প্রস্তাব এই যে, আপনারা দিনকয়েক এই কারখানায় খেলনাগুলো রং করতে শিখুন, ছোট ছোট পার্টসগুলোকে জোড়া দিতে শিখুন যাঁর হাত নিপুণ তিনি আরো কিছু বেশী শিখুন। তারপর সাজসরঞ্জাম নিয়ে আপনারা যাবেন অভাবগ্রস্তদের অন্তঃপুরে। সেখানে মেয়েদের এই কাজ শিখিয়ে দেবেন, তাঁদের কাঁচামাল সরবরাহ করবেন, তৈরী করাবেন এই সব খেলনা। তৈরী মাল বিক্রী করবার ভার আমাদের। মজুরী তাঁরাও পাবেন, আপনারাও পাবেন। অবসর সময়ে একাজ করে বেশ দু'পয়সা রোজগার করা যাবে বাড়িতে বসে।

খেলনার সঙ্গে আমরা কার্ডবোর্ড বাক্স তৈরী শেখাবো আর শেখাবো আয়ুর্বেদীয় নানা রকম ঔষধ আর টয়লেট তৈরী করতে, যার গুণ আপনাদের বিলিতি ঔষধ, এসঙ্গে সাবান-স্নো-পাউডার থেকে অনেক বেশী। অথচ দাম হবে বিলাতীর অর্ধেক। এসব কাজের জন্য যা কিছু দরকার সবই এখান থেকে দেওয়া হবে। আপনারা শুধু কাজ করবেন। ছয়মাস করে দেখুন, না-পোষায় ছেড়ে দেবেন।

শুধু সৌখীন শিল্প, ঘর সাজাবার উপকরণ দিয়ে দেশের কিছু হবে না। ওগুলোর দরকার আছে তরকারী হিসাবে, কিন্তু ডালভাতের দরকার আগে। অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন না করলে কিছুতেই সুসার হয় না।

এ কাজ যদি আমাদের সফল হয় ; তাহলে পরের কাজ হবে আমাদের আরো বড়—আরো ব্যাপক! সে কাজ দেশের মানুষ তৈরী করার কাজ। আমরা প্রত্যেকে শুধু দুটি-চারটি করে মানুষ গড়ে যাবো যারা নেতার আহ্বানে সাড়া দেবে, অকম্পিত হৃদয়ে মৃত্যুবরণ করবে শ্রেয়ঃ লাভের জন্য। আমি আপনাদের নেত্রীত্ব চাইনে, আমিও আপনাদের মতন একজন কর্মী থাকতে চাই এবং সমান কাজ করতে চাই।

তপন আসিয়া পৌঁছিল এবং হাসিমুখে আসিয়া অভিবাদন করিল। শিখা বলিয়া চলিল—এই আমার দাদা, অন্তরাল থেকে উনি এবং ওঁর বন্ধু বিনায়কবাবু আমাদের সাহায্য

করবেন—দেখবেন, ক্ষতি যাতে আমাদের না হয়। ওঁরা দু'জনে এই কারবারটা গড়ে তুলেছেন ; অতএব মাড়োয়ারীজনোচিত অভিজ্ঞতা যে ওঁদের আছে তা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। আর ওঁরা বলেছেন, ক্ষতি যদি হয় ওঁদের হবে, লাভ যদি হয় তো আমাদের; আর ক্ষতিই বা হবে কেন? আসুন, আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করবো।

মেয়েগুলি সত্যই অভাবগ্রস্ত পরিবারের। কাজের প্ল্যান শুনিয়া ও সমস্ত দেখিয়া তাহাদের প্রত্যয় জন্মিল! অবসর সময়ে এ কাজ করিয়া কিছু উপার্জন করিতে পারে—তাহারা লাগিয়া গেল।

তপন শিখাকে ডাকিয়া বলিল,—বিয়ে-থা করতে হবে না বুড়ি? এই সব করবি নাকি তুই?

—বিয়ের হয়তো দরকার আছে দাদা, দিও যখন ইচ্ছে কিন্তু এ সবেরও দরকার আছে। তোমার বোন তোমার মর্যাদা রাখতে চায়।

হাসি মুখে তপন বলিল,—বেশ কথা, তবে বিয়েটাও দেব, আব এই মাসেই।

—কেন? বুড়িয়ে গেলুম নাকি দাদা?

—সেটা দেখবার ভার আমাদের উপর—তুই এখনও যা করছিস্ কর!

তপন অফিস ঘরে চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পর বিনায়ক বিপন্ন মুখে কহিল,—শুনছেন মিতা আপনার দাদা বড্ড জ্বালাতন করছে।

আমার দাদা কাউকে জ্বালায় না—শিখা জবাব দিল।

বিনায়ক মাথা চুলকাইয়া বলিল,—কিন্তু আমায় করছে জ্বালাতন।

—কেন?

—আমি আর সব কাজ করতে পারি, লাউ-কুমড়ো কুটতে পারিনি। শিখা কলহাস্যে ঝঙ্কারিয়া উঠিল,—দাদা পারে কিন্তু...।

—আমি পারিনে যে—বিনায়কের মুখে অসহায়তার ছবি ফুটিয়া উঠিল।

শিখাব নারী হৃদয় স্নেহে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। বলিল,—তা আমায় বুঝি আপনার কাজটা করে দিতে হবে? চলুন, যাচ্ছি।

শিখা আসিয়া একটা ইঁচড় কুটিতে বসিতেই তপন গম্ভীর মুখে বলিল,—ভাল হচ্ছে না ভাই শিখা, ওর কাজ কেন তুই করবি? তোর সঙ্গে ওর সম্পর্ক—?

—"মিতা"—বলিয়া শিখা হাসিয়া উঠিল!

—ওঃ, তা হলে কিন্তু—তপন হাঁসিমুখেই থামিয়া গেল!

—কিন্তু কি দাদা?—শিখার চোখে প্রশ্নের আকুতি!

কাঁঠালের আঠায় কুলবে না। ফুলের ফিতে দিয়ে বাঁধনটা পোক্ত করে দিতে হবে।

—ক্ষাও তুমি বড্ড ইয়ে—।

শিখা মুখ ফিরাইয়া তরকারী কুটিতে বসিল। তাহার লজ্জারক্ত মুখের পানে তাকাইয়া বিনায়ক বসিয়া ভাবিতে লাগিল, তপনের ইচ্ছা শিখার অন্তরে সঞ্চারিত হইয়াছে। শিখা বিনায়ককে গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু শিখাকে পাইবার যোগ্যতা কি বিনায়কের আছে! তপনের ইচ্ছায় চিরদিনই আত্মসমর্পণ করিয়াছে, বিনায়ক আজও কিছুই বলিল না।

সেদিন বৌদ্ধ-পূর্ণিমা।

একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তপন জাগিয়া উঠিল! দক্ষিণ দিকের চওড়া বারান্দাসংলগ্ন পূর্বদিকের ঘরটায় তপন আর ঐ বারান্দারই পশ্চিমদিকের ঘরটায় থাকে তপতী। মাঝখানে বারান্দাটা যেন একটা দুরন্ত নদী—কোন দিন পার হওয়া যাইবে না। প্রভাতের সূর্য আসিয়া তপনের কক্ষে সূর্য-কিরণ ছড়াইয়া দেয়—অস্তগামী সূর্য তপতীর ঘরের পশ্চিমের জানালাপথে উঁকি মারিয়া যায়। ইহারও মধ্যে হয়ত বিধাতার কোন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে।

মা বেশ শান্ত এবং নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছেন। উহাদের এই কয়দিনের সংবাদ তিনি বেশী রাখেন না। বেশ বুঝিয়াছেন, বারান্দা পার হইয়া উহাদের মিলনগুঞ্জন ভালরূপেই চলিতেছে—ভাবিবার কিছু আবশ্যক নাই।

তপন বলিল,—কি ভাবছেন মা?

—কিছু না বাবা, খাও! তোমার মতো ছেলে পেয়েছি, ভাববার কি আছে?

তপনের অন্তর মুচড়াইয়া উঠিল। এই পরম স্নেহময়ী জননীকে সে প্রতারিত করিতেছে সজ্ঞানে। একবার তার ইচ্ছা হইল মাকে সব কথা বলিয়া জানায় যে তাঁহারা ভুল করিয়াছে। ডিগ্রীহীন আর্য্যধর্ম্মভক্ত তপনকে তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিবে না। কিন্তু তাহাতে ফল কি হইবে। অনর্থক একটা উৎপাত, তপতীর উপর শাসন এবং আরো কিছু কেলেঙ্কারী। না, থাক, তপন কৌশলে জানিয়া লইবে তপতী কাহাকে চায়, তাহারই হাতে তপতীকে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া সে নীরবে চলিয়া যাইবে। এই যে এখানে ইঁহাদের প্রচুর স্নেহমমতা সে পাইতেছে, ইহারও ঋণ তপন শেষ করিয়া যাইতে চায়—তাহা সময়সাপেক্ষ। তাহারও একটা উপায় তপন ভাবিয়া রাখিয়াছে।

অস্নাতা তপতী বাসি কাপড়েই আসিয়া ঘরের চৌকাট হইতে বলিল,—মা আমার লেক-ক্লাবে সুইমিং কম্‌পিটিশন্ আছে। এখুনি যেতে হবে। নিজে গাড়ী চালিয়ে গেলে হাতের পরিশ্রম হবে মা, ড্রাইভারটা আসেনি—কি করি বলোতো?

মা হাসিমুখে বলিলেন—তপন যাক্ না গাড়ী চালিয়ে! যাওতো বাবা। —আয় খুকী, খেয়ে নে!

—আচ্ছা মা, যাচ্ছি—বলিয়া তপন উঠিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে তপতী আসিয়া গাড়ীর ভিতরের সীটে আসন গ্রহণ করিল। তপনের পাশে বসিল না। তপন নিরুদ্বেগে নির্বিকার চিত্তে গাড়ী চালাইয়া দিল। ক্লাবের জুনিয়র ও সিনিয়ার মেম্বারগণ একযোগে আসিয়া দাঁড়াইল গাড়ীর কাছে তপতীকে অভ্যর্থনা করিতে। সুন্দরী, সুবেশা, তরুণী তপতী! তাহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা কার না হয়!

—আসুন, আসুন, আপনার জন্যই অপেক্ষা, সময় হয়ে গেছে।—

তপতী নামিয়া গেল। গাড়ীটা ঘুরাইয়া ষ্ট্যান্ডে লইয়া রাখিতে হইবে, তপন ঘুরাইতেছে, একজন ডাকিয়া কহিল, সুইমিং কষ্টিউমটা দিয়ে যাও তো হে!

তপতী উহা লইতে ভুলিয়া গিয়াছে, না ইচ্ছা করিয়াই ফেলিয়া গিয়াছে কে জানে! তপন, নির্বিকার চিত্তে নামিয়া কষ্টিউমটা ভদ্রলোকের হাতে দিয়া আসিল।

প্রায় দুই ঘণ্টা তপন গাড়ীতে বসিয়া আছে। অকস্মাৎ দেখিল, অসংখ্য নারীপুরুষ তপতীকে ঘিরিয়া ক্লাবঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তপতীর জলসিক্ত সুদীর্ঘ বেণী সর্পের মতো দুলিতেছে। ভিজা কষ্টিউমটার উপরেই সে তাহার পাতলা শাড়িটা

জড়াইতেছে, হাতে একটা রূপার কাপ, প্রাইজ পাইয়াছে বোধ হয়। তপন কোন দিন তপতীকে ভালোকরিয়া দেখে নাই, আজও তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা তাহার হইল না। মুখ নামাইয়া সে গাড়ীটা চালাইয়া দিল।

তপতী ভিতরে বসিয়া ভাবিতেছে, ঐ নির্ব্বোধটা দেখুক, তপতীর সম্মান প্রতিপত্তি! তপতীকে লাভ করিবার যোগ্যতা যে উহার কিছু মাত্র নাই ইহা যেন সে অচিরে বুঝিতে পারে। কিন্তু তপন ফিরিয়া তাকাইল না। তপতী ভাবিল, এসব ব্যাপারে মর্য্যাদা ঐ গ্রাম্য বর্ব্বর কি বুঝিবে। তিলক কাটিতে যাহার দিন ফুরাইয়া যায় তাহাকে কান ধরিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, তপতীর মূল্য কতখানি!

বাড়ি ফিরিয়া তপতী তাহার বিজয়ের নিদর্শন 'কাপ'টা অন্যান্য প্রাপ্ত পুরস্কারগুলির সহিত সাজাইয়া রাখিল।

সারাদিন তপতীর মনটা আত্মপ্রসাদের আনন্দে ভরপুর রহিয়াছে। সাঁতারে সে আজ প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে। কত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, কত উত্তেজক কথা তাহার স্নায়ু-কেন্দ্রগুলিকে দুর্দান্ত আবেগে যেন ঝঙ্কৃত করিতেছিল! সন্ধ্যা হইতে বন্ধুদের লইয়া সে গানের মজলিশ বসাইয়াছে।

অন্যদিন তপন রাত্রি সাড়ে দশটার পূর্বে ফিরে না, আজ কিন্তু নয়টার সময় ফিরিয়া আসিল। তপতীদের সঙ্গীত-চর্চ্চার ঘরটার পাশ দিয়াই দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। তপন নিঃশব্দে উঠিয়া যাইতেছিল, ঘরের কয়েকজন তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল,—এই যে মিস্টার গোঁসাই, কোথায় গিয়েছিলেন?

তপন সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রশ্নটা তাহাকেই করা হইতেছে বুঝিয়া শান্তস্বরে বলিল—বৌদ্ধ বিহারে গিয়েছিলাম।

—ওরে বাপ্—বৌদ্ধ বিহারের কি বোঝেন আপনি। সেখানে যান কেন?—বিদ্রূপটা স্পষ্ট।

তপন এক মিনিট স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর শান্ত স্বরেই জবাব দিল—' মেয়েদের কাছে এক কণা প্রসাদ ভিক্ষা করার চাইতে সেটা ভালো, কিছু না বুঝলেও ভালো।

তপন চলিয়া গেল। একটি মেয়ে তপনের কথাটা শুনিয়াছিল, বলিল,—ঠিক বলেছেন উনি, আপনারা তো মেয়েদের প্রসাদ ভিক্ষাই করেন।

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—করি, ভিক্ষা পাবার যোগ্যতা আছে বলে। ওকে কে ভিক্ষা দেবে শুনি?

মেয়েটি বলিল,—ভিক্ষা উনি করেন না, কোন দিন আসেননি এখানে।

—আসেননি কেন? আসার কোন্ যোগ্যতাটা আছে? বৌদ্ধ-বিহারে যাওয়ার কথাটা একটা চাল। ভাবলো, ঐ শুনে আমরা ওকে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ভেবে নেব। ওসব আমরা ঢের বুঝি।

মিঃ অধিকারী কহিলেন,—হাঁ হাঁ, করবে কি আর, এখানে তো এসে মিশতে পারে না, তাই ঐ সব ভণ্ডামী দেখাইয়া পণ্ডিতি জাহির করিতে চায়।

তপতী উঠিল; ভালোলাগিতেছে না তাহার। কি যেন কোথায় কাঁটার মতো বিঁধিতেছে, তপন কি সত্যিই কোন নারীর কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করে না? সত্যিই কি বৌদ্ধ-বিহারে যায় সে?

শিখার কথাটা মনে পড়িয়া গেল—"আর্য্যনারী হয়ে তুই স্বামীকে গ্রহণ করিলি

না"—তপতী উঠিয়া উপরে আসিল!

তপন তখনো খাইতে আসে নাই। রাত্রি মাত্র দশটা বাজিতেছে। অন্যদিন সে সাড়ে দশটার পূর্বে ফিরে না। তপতী চাহিয়া দেখিল, মা খাবার ঘরে টেবিলের উপর রাখিয়া কি একটা সেলাই করিতেছে। ঘরে না ঢুকিয়া তপতী বাহিরের একটা সোফায় শুইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, কোটপ্যান্ট ছাড়িয়া ধুতি ফতুয়া পরিহিত তপন খড়ম পায়ে দিয়া আসিয়া ঢুকিল খাবার ঘরে, হাতে শ্বেতপদ্ম। তপতী চাহিয়া দেখিল, মুখ তাহার পূর্ববৎ ফিরানো রহিয়াছে। মুখ না দেখিয়া তপতী পায়ের দিকে চাহিল। সুন্দর সুগঠিত পা দুখানি খড়মের কালোর উপর কাঞ্চনবর্ণ বিকীর্ণ হইতেছে। রংটা এত সুন্দর নাকি!

—এসো বাবা, হাতে ও ফুলটি কিসের?—মা সাদর আহ্বান জানাইলেন। তপতী কান পাতিয়া রহিল তপনের উত্তর শুনিবার জন্য।

তপন বলিল, আজ বুদ্ধদেবের জন্মতিথি মা, গিয়েছিলাম দেখতে, ফুলটি নির্মাল্য সেখানকার।

মা হাসিয়া বলিলেন,—তোমাকে দেখলেই আমার বুদ্ধদেবের মুখ মনে পড়ে বাবা, তুমিই আমার বুদ্ধদেব।

তপন ত্বরিতকণ্ঠে বলিল,—না মা, ও কথা বলবেন না। তিনি মানব-দেবতা আমি তাঁর দাসানুদাস হবার যোগ্য নই!

মা চকিত হইয়া বলিলেন,—বুদ্ধদেবকে তুমি তো খুব বেশী শ্রদ্ধা করো তপন!

—করা কি উচিত নয় মা? শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করার মধ্যে তো আমরা নিজেদেরকেই শ্রদ্ধাভাজন করে তুলি—শ্রদ্ধা-না করলে বুদ্ধদেবের কিছু ক্ষতি হবে না মা, আমাদেরই মনুষ্যত্বের অপমান হবে।

মাতা মুগ্ধ হইয়া গেলেন, তপতী বিস্মিত বিহ্বল হইয়া গেল। এই লোকটা ইডিয়ট! ইহার অপেক্ষা মানবতায় অধিকতর গৌরব-বহনকারী মানুষ তপতী তাহার জীবনে দেখে নাই। চঞ্চল পদে সে ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

—আয়, খেয়ে নে খুকী—মা ডাকিলেন!

তপনের আনিত পদ্মটা লইয়া খোঁপায় গুঁজিতে গুঁজিতে তপতী কহিল—আমি এখনো কাপড় ছাড়িনি মা।

—যা, ছেড়ে আয় চট্ করে।

তপতী তথাপি দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার আজ ইচ্ছা করিতেছে, তাহার সন্ধ্যাকে পরিহিত সুচারু তনিমার দিকে তপন একবার চাহিয়া দেখুক। তপন কিন্তু মুখ তুলিল না। পাঁচ-সাত মিনিট অপেক্ষার পর নিরাশ হইয়া তপতী চলিয়া গেল।

গভীর রাত্রে একাকী শুইয়া তপতী ভাবিতেছে, ঐ তো ওপাশের ঘরটায় সে ঘুমাইতেছে ঐ নিরহঙ্কার মানুষটি, কম খায়, কম কথা বলে, নিজেকে জাহির করে অত্যন্ত কম। খুঁজিয়া ফিরিলেও উহার সাড়া প্রায় পাওয়া যায় না! যাকিছু কথা উহার মা'র সঙ্গে। তপতী তো এতদিন উহার খবর লয় নাই, বরং নির্মমভাবে উহাকে নির্য্যাতিত করিয়াছে। প্রায় প্রাপ্য সম্মান হইতে উহাকে সে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করিয়াছে তথাপি সে রহিয়া গেল তপতীকে নির্বিকারে। ভাবিতে ভাবিতে তপতী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘুম ভাঙিতেই সর্পের মতো বেলা হইয়া গিয়াছে; উঠিতে গিয়া শরীরটা অত্যন্ত অসুস্থ বোধ হইল, কিন্তু শরীরের

গ্লানিকে মনের জোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে স্নানের ঘরে ঢুকিল। পরিপাটি করিয়া স্নান সারিয়া ফিকে নীল শাড়ী পরিয়া সে বাইরে আসিয়া দাঁড়াইল এক পিঠ খোলা চুল মেলিয়া, আশা জাগিতেছিল অন্তরে, তপনের সহিত যদি একবার দেখা হইয়া যায়। তপনের রুদ্ধদ্বার কক্ষের পানে চাহিয়া দেখিল সে বাহির হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে খাবার ঘরের দরজায় আসিয়া শুনিল, মা বলিতেছে দু'লাখ—টাকা! অত টাকা করবে কি ও?

কি জানি! যা খুশী করুকগে! টাকার তো আমার অভাব নাই নীলা! বাবা উঠিয়া যাইতেছিলেন, মা বলিলেন, ভালোই হয়েছে, ছেলেটার যা নিস্পৃহ মন? টাকাকড়ি নিলে বাঁচি।

পিতা হাসিয়া বলিলেন,—নেবে, নেবে, ভাবছো কেন! শিলং-এ তাহলে পাঠাচ্ছ না।

—থাক্। ছেলে মানুষ দু'জনেই! কোথায় একলা পাঠাবো বাপু, তার চেয়ে আমার চোখের উপর দু'টিতে থাক্; পূজার সময় সবাই যাব শিলং।

কথাটা তপনের সম্বন্ধে। মুহূর্তে তপতীর অন্তর স্তব্ধ হইয়া গেল। দুই লক্ষ টাকা সে বাবার কাছ হইতে লইয়াছে। এত টাকা দিয়া কি করিবে সে! তবে কি টাকার জন্য সে তপতীর অত্যাচার নীরবে সহিয়া যায়। লোকটা তো আচ্ছা ধড়িবাজ। এজন্যই বুঝি তপতীর ব্যবহারের কথা বাবা মাকে একদিনও বলে নাই। দিব্যি অভিনয় করিয়া চলিয়াছে তো!—আচ্ছা, দেখা যাইবে।

তপতী আসিয়া চা খাইতে বসিল! মা সস্নেহে বলিলেন,—রান্না-বান্না যে ছেড়ে দিলি খুকি, ভালোলাগে না?—মাতার ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট।

তপতী ক্রোধ দমন করিয়াকহিল,—নিরামিষ রাঁধার জন্যে আমার হাত কামড়াচ্ছে না।

মা একটু বিষণ্ণ হইলেন, বলিলেন—কি করবো বাছা, মাছ-মাংস খেতে ও ভালবাসে না—তবে একেবারে যে খায় না তা তো নয়। তুই বলিস না কেন খেতে?

—আমার দায় পড়েনি—যার যা খুশী খাবে আমার কি?

তপতী চলিয়া গেল। মা বুঝিলেন, ইহা জামাতার উপর কন্যার অভিমান। মধুর হাসিতে তাঁহার মুখ ভরিয়া গেল। ভাবিলেন তপনকে মাংস খাইবার জন্য তিনি নিজেই অনুরোধ করিবেন। তপন তাহার কথা নিশ্চয় রাখিবে।

তপতী আপন ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া কত কি ভাবিল। বাবার কাছে টাকা আদায় করিবার বেশ চমৎকার ফন্দি আবিষ্কার করিয়াছে লোকটা তো বেশ, নিক্ সে, টাকা লইয়া যদি সরিয়া পড়ে। তপতী উহার মুখ দেখে নাই—দেখিবে না।

তপতীর অন্তরে বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল! মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য মিঃ ঘোষালের মতো সুপাত্রের সহিত তপতীর বিবাহ হয় নাই, আজ তাহারই স্থান অধিকার করিয়া ঐ বর্ব্বর লোকটা দুই লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইল! টাকার উপর তপতীর কিছুমাত্র মায়ামমতা নাই। কিন্তু লোকটা ধূর্ত্তামী তপতীর অসহ্য বোধ হইতেছে। সে নিঃসংশয়ে বাবা আর মাকে বুঝাইয়াছে যে তপতীর সহিত আমার প্রেম নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, অতএব লক্ষ টাকা সে এখন পাইতে পারে। তপতীর নির্বোধ স্নেহময় বাবা-মা নিশ্চিন্ত মনে উহার খোস-খেয়াল মিটাইবার জন্য নগদ দুই লক্ষ টাকা উহার হাতে তুলিয়া দিলেন। আচ্ছা, তপতীও দেখিয়া লইবে সে কতবড় ধূর্ত্ত।

কিন্তু লোকটা মোটেই মূর্খ নয়। লেখাপড়া ভালো না জানিলেও সে নিশ্চয় বুদ্ধিমান। কোথা হইতে অভিনয় করিয়া কতগুলি পাকাপাকা কথা শিখিয়া রাখিয়াছে, যথাস্থানে যথোপযুক্ত

ক্ষেত্রে তাহা সে প্রয়োগ করে। মা নিতান্তই মা, তাই উহার মা ডাক শুনিয়া গলিয়া গিয়াছে। মা আবার বলে, বুদ্ধদেবের মতো সুন্দর। সুন্দর নয় বলিয়াই হয়ত বাড়াবাড়ি করিয়া বলে ঐ সব। যাক্—সুন্দর হোক আর কুৎসিত হোক, তপতীর আসে যায় না!

তপতী গিয়া গম্ভীরমুখে খাইতে বসিল।

শিখা কারুণ্য-কোমলকণ্ঠে ঘরে ঢুকিল—জানো মা, অমন দাদা কারোর হয় না মা! দাদা আশ্চর্য্য, দাদা অদ্ভুত। মানুষকে অমন করে ভালোবাসতে আর কাউকে দেখিনি! কিন্তু মা আমায় এখুনি হাসপাতালে যেতে হবে।

—কেন? কার অসুখ?—মা উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

অসুখ একটা কেরাণীর, তার গায়ে রক্ত নাই, দাদা তাই তাকে নিজের রক্ত দিয়ে বাঁচাবে। কারুর কথা শুনলো না মা, আমরা এতো বারণ করলাম,—বললাম, অন্য একটা লোককে তো কিছু টাকা দিলেই সে রক্ত দিতে পারে। তা বলে, তার রক্তটাও তার বোনদের কাছে এমনি দামী বুঝেছিস্ কি বলবো আর!

মা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তপন কোন একটা অজ্ঞাত কেরাণীর জন্য নিজের দেহের রক্ত দান করবে। ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—না-না শিখা, ওকে বারণ কর তোরা।

ও শুনবে না মা, কারুর কথা শুনবে না। আর যুক্তি দিয়ে ওকে হারাতে পারবে না কেউ। ওর বন্ধু বিনুবাবু সকাল থেকে সে চেষ্টা করছেন। আমায় খানিকটা দুধ আর কিছু লেবুর রস করে দাও শিগ্‌গীর।

নিরুপায় মাতা লেবুর রস তৈরী করিতে করিতে বলিলেন,—ওর শ্বশুরবাড়ির কেউ জানে না?

—না ওঁদের জানাবে না—তুমি জানিয়ে দিও না যেন।

বেলা এগারোটার সময় শিখা ও বিনায়ক তপনকে লইয়া ফিরিল। শিখা তাহার নিজের শয়নকক্ষে তপনকে শোয়াইয়া দিল; বিনায়ক তপতীর মাকে 'ফোন' করিয়া জানাইয়া দিল, তপনবাবু আজ দুপুরে অন্যত্র খাইবেন—তাঁহার যেন অপেক্ষা না করেন।

শিক্ষার মা আসিয়া অনুযোগ করিলেন—একি বাবা, নিজের রক্ত কেন তুমি দিতে গেলে?

—দিলাম তো কি হলো মা, আমি তো আপনার সুস্থ সবল ছেলে।

কিন্তু বাবা, তোমার জীবন আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান!

—সে লোকটির জীবন কিছু কম মূল্যবান নয় মা, তারও মা, ভাই বোন, স্ত্রী, সব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, সেই একমাত্র উপার্জনকারী তাদের।

মা চুপ করিয়াই রহিলেন! তপন আর একটু দুধ খাইয়া বলিল,—কিছু ভয় নেই বোনটি, ওবেলাই সেরে উঠবো; ঘুমুই একটু। শিখা বসিয়া বসিয়া হাওয়া করিতেছে। চোখ দু'টি জলে ছলছল করিতেছে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তপন বলিল,—কি হোলরে? কাঁদছিস?

—ভালো লাগছে না দাদা, তুমি রক্ত দিয়ে বেড়াবে নাকি?

—একা আমার রক্তে কি হবে শিখা, তবে এই আত্মসুখ সর্ব্বস্ব ক্লীব, পশুর জাতটাকে রক্ত দিয়ে বাঁচাতে হবে নইলে আর্য্যগৌরব বুঝিবা ডুবলো।

তপন পাশ ফিরিয়া শুইল। বিনায়ক ইসারায় শিখাকে নিষেধ করিল আর কথা না বলিতে।

স্নেহের যে সামান্য সূত্রটুকু ধরিয়া তপনের অন্তরে তপতী প্রবেশ করিতে পারিত, তপতীর মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষক মনের উষ্ণ চিন্তাধারায় তাহা পুড়িয়া গেল। তপনকে সে একটা অর্থশোষণকারী পরভৃতিক ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারিতেছে না। এক একবার মনে হইতেছে, হয়ত উহার মধ্যে এমন কোন গুণ আছে যাহাতে তার মা-বাবা এতটা মুগ্ধ হইতেছেন, আবার মনে হইতেছে, ইহা ঐ সুচতুর লোকটির সু-অভিনয়ের গুণ। তপতী উহাকে কঠোর পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিল।

সেদিন টকটকে লাল শাড়ীখানা পড়িয়া তপতী বাহির হইয়া আসিল, যেন অগ্নিশিখা। মা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বেড়াতে যাবি নাকি!

—না, মিঃ অভিনব বোস ব্যারিস্টার হয়ে এসেছেন তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছি চা'য়ে। কিন্তু মা, ফুল আনা হয়নি। দাও না ফোন করে তোমার জামাইকে, ফুল কিনে আনবে।

মা, তাঁহার খুকীর দুরভিসন্ধি কিছুমাত্র অবগত নহেন। হাসিয়া বলিলেন,—নিজে বলতে পার না? লাজুক মেয়ে!

—নিজের জন্য তো নয় মা, একজন অতিথির জন্য তাই লজ্জা করছে।

মা বিশেষ কিছু বুঝিলেন না, ফোন করিয়া দিলেন তপনকে। বিজয়িনীর আনন্দে তপতী ভাবিতে লাগিল, বোকা মা কিছুই বুঝিলেন না যে তাঁহাকে দিয়াই তাঁহার স্নেহপাত্রকে কেমন করিয়া তপতী অপমান করিল। ফুলগুলি লইয়া যখন সে আসিবে, তখন তাহার সম্মুখেই মিঃ বোসকে তপতী তাহারই আনা ফুল উপহার দিবে। তপতী সাজিয়া-গুজিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মিঃ বোস আসিয়া পৌঁছিলেন অথচ ফুল এখনো আসিল না, তপতী অত্যন্ত চটিয়া বিরক্ত মুখে মিঃ বোসকে চা পরিবেশন করিতেছে দোতলার বারান্দায়। ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় তপন কাগজে মোড়া একগোছা ফুল লইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে, দেখিয়া তপতী ত্বরিতে নিকটবর্তী হইয়া বলিল,—বড্ড দেরী হোল,—দিন,—সে হাত বাড়াইল ফুলগুলি লইবার জন্য। কাছেই একটা ছোট টিপয় ছিল, তপন নীরবে ফুলের গোছাটা সেই টিপয়ের পর রাখিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে, রাগে তপতীর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, সরোষে গর্জ্জন করিয়া সে কহিল—হাতে দিতে পারেন না! একে তো আনলেন দেরী করে!

তপন ফিরে তাকাইল না, ধীরে ধীরে যাইতেছে, মিঃ বোস জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে লোকটি?

—আমার মা'র পুষ্যি—তপতী সক্রোধে জবাব দিল। তপন কথাটা শুনিল তথাপি মুখ ফিরাইল না, চলিয়া গেল। তপতীর সর্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেছে। ফুলের তোড়াটা তুলিয়া লইয়া সে কাগজটা ছিঁড়িয়া ফিলিয়া সবেগে আসিয়া ঢুকিল খাইবার ঘরে, যেখানে তপনকে খাবার দিতেছেন। তোমার জামাই ফুল কিনে এনেছে দেখো, কতকগুলো চিরো ফুল, বাসি পচা—একটা বোকে বাঁধিয়ে আনতে পারেনি!

মা তাকাইয়া দেখিলেন, সুন্দর ফুলগুলি তপতীর হাতের আছাড় খাইয়া ম্লান হইয়া যাইতেছে। রাগিয়া বলিলেন, বোকে আনতে তো তুই বলিসনি খুকী, আর ফুল তো খুবই সস্তা।

-তোমার মাথা—এই ফুল নাকি বিলেত ফেরত লোককে দেওয়া যায়! বলিয়া তপতী

সরোষে প্রস্থান করিল।

মা বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—মেয়েটা বড্ড রাগী বাবা, তুমি দুঃখ করো না কিছু! ফুলগুলো তোমার ঘরেই দিয়ে আসছি।

জলতরঙ্গের মতো সুমিষ্ট হাসিতে ঘর ভরাইয়া দিয়া তপন বলিল—ঐ ফুলগুলো আপনার পায়ে দিই মা, আমার বয়ে আনা সার্থক হবে।

মা কি বলে শুনিবার জন্য তপতী বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, তপনের কাণ্ড দেখিয়া সে শুধু বিস্মিত নয়, বিমূঢ় হইয়া গেল। এতবড় অপমানটা ও গায়েই মাখিল না। উহারই সামনে অন্য একজন পুরুষকে অন্যত্র বসাইয়া তপতী পরম যত্নে খাওয়াইতেছে, মা যার জন্য কত বকিলেন। বিলাত ফেরত লোকের টেবিলে তপন বসিবে না বলিয়া তপতী রক্ষা পাইয়াছে। সেই অন্য পুরুষের জন্য নির্বিকার চিত্তে তপন ফুল আনিয়া দেয়, সে-ফুল না লইয়া অপমান করিলে সেই ফুল দিয়াই অপমানকারীর মা'র পূজা করে। এতবড় বিস্ময় তপতীর জীবনে আর ঘটে নাই। লোকটা হয় সাংঘাতিক ধূর্ত্ত নয়তো সবসহিষ্ণু সন্ন্যাসী

ঠাকুরদার কথাটা তপতীর অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল, "তোর যে বর হবে দিদি তার আর জোড়া মিলবে না" সত্যই, উহার জোড়া মিলিবে না। কিন্তু টাকা তাহা হইলে সে লইয়াছে কেন। দুই লক্ষ টাকা লইয়া সে কি করিবে? গরীবের ছেলে, দু'লাখ টাকা কৌশলে আদায় করিয়া লইল। আরো কিছু আদায়ের ফন্দীতে আছে, তাই এমন করিয়া অপমান সহ্য করে। ইহার পর আমরা তাড়াইয়া দিলেও যাহাকে ও সুখে থাকিতে পারে তাহারই জোগাড়ে ফিরিতেছে।

তপতীর ক্রোধ কমিতে গিয়া পরবর্তী চিন্তায় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। কত অপমান সহ্য করিতে পারে তপতী তাহা দেখিয়া লইবে, শেষ অবধি 'প্রহারেণ ধনঞ্জন' করিয়া ঐ বেহায়া ইতর লোকটাকে তপতী তাড়াইয়া দিবে—স্থির করিল।

মিঃ বোসের সহিত চা খাইয়া তপতী বেড়াইতে চলিয়া গেল মিঃ বোসের মোটরেই তপন কোনদিনই তপতীর সহিত বেড়াইতে যায় না, বৈকালিক জলযোগের পর সে আবার বাড়ি তৈরীর কাজ দেখিতে যায় বা একাই বেড়াইতে যায়। তপতী নিত্যই তাহার বন্ধুদের সহিত টেনিস খেলে কিম্বা বেড়াইতে যায়। কিন্তু মিঃ বোসের সহিত আজ একা বেড়াইতে যাওয়াটা মা পছন্দ করিলেন না। মিঃ বোস বা তপনের সাক্ষাতে তিনি কিছু না বলিলেও ঠিক করিয়া রাখিলেন, ফিরিলে তপতীকে তিনি ভর্ৎসনা করিবেন এবং যাহাতে আর না যায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

মিঃ বোসের পাশে বসিয়া গাড়ীতে বায়ু সেবন করিতে করিতে তপতী ওদিকে ভাবিতেছে, ঐ লোকটাকে অপমান করিবার কতরকম ফন্দি বাহির করা যাইতে পারে!

মিঃ বোস বলিলেন,—কি ভাবছেন মিস্ চ্যাটার্জি?

তপতী বলিল—হুঁ!

—হুঁ কি? এতো বেশী ভাবছেন যে কথাই শুনতে পাচ্ছেন না!

লজ্জিত হইয়া তপতী বলিল,—হাঁ ভাবছিলাম একটা কথা। চলুন, সিনেমা যাওয়া যাক!

তৎক্ষণাৎ গাড়ী আসিয়া একটা বড় রকম সিনেমা হাউসের গেটে ঢুকিল। উভয়ে নামিয়া টিকিট কিনিয়া ঢুকিল ভিতরে। অন্ধকার ঘরে বসিয়া ফন্দি আঁটিতে বেশ সুবিধা

হইবে। তপতী নিঃশব্দে চেয়ারে বসিয়া আছে। মিঃ বোস কিন্তু সিনেমা দেখার চেয়ে তপতীর নয়নানন্দকর রূপ দেখার ও শ্রবনানন্দকর কথা শোনার বেশী পক্ষপাতী, কহিলেন,—সিনেমা বিস্তর দেখে এলাম। ছায়া, কায়া, দুই-ই, ছায়া আর দেখতে ইচ্ছা করে না।

কায়াও তো বিস্তর দেখেছেন—সাদা, তুষার শুভ্র, তার প্রতি অরুচি জন্মালো না যে?

—জন্মেছে। তাই কাঞ্চনকান্তি দেখতে এলাম।

—এখানে তো সব তন্বীশ্যামা : কাঞ্চনকান্তি চান তো কানাকুব্জে যান।

—সে আবার কোন্ দেশ? মিঃ বোস প্রশ্নের সঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।

—জিওগ্রাফি দেখতে হবে, কারণ আমিও জানিনে।

—জেনে দরকার নেই—এখানেই—পেয়েছি কাঞ্চনকান্তি!

—পাশেই বুঝি?

তপতী নিজের দিকেই ইঙ্গিত করিল। মিঃ বোসের স্বপ্ন কি তবে সত্য হইবে! তপতী, তপস্যার ধন তপতী! মিঃ বোস তপতীর একখানা হাত নিজের হাতে ধরিয়া বলিলেন,—রিয়েলি আই হ্যাভ নো হোয়ার সিন সাচ্ এ বিউটিফুল গার্ল লাইক ইউ।

তপতী আপন ঠোঁটের সহিত ঠোঁট মিলাইয়া একটা মিষ্টি শব্দ করিয়া বলিল,—ও কথা অনেকের কাছেই শুনেছি।

—চির পুরাতনটাই চিরদিন সুন্দর মিস্ চ্যাটার্জি!

—তা নয়, চিরসুন্দরটাই চিরদিন পুরাতন। কারণ পুরাতন হলেও তা সুন্দর না হতে পারে কিন্তু সুন্দর হলেই তা আর পুরানো হয় না। যেমন এই পৃথিবী, ঐ আকাশ, ঐ সব গ্রহ-নক্ষত্র! ওরা পুরানো বলেই সুন্দর নয়, সুন্দর বলেই চির নূতন।

মিঃ বোস তাঁহার বিলাতি বিদ্যায় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন,—প্রেমের বাণী কি পুরানো নয়?

—প্রেমের বাণী সুন্দর বলেই পুরানো নয়—পুরানো হয় না।

—তাহলে আমার কথাটাকে আপনি পুরানো বলবেন কেন?

—ওটা আপনার প্রেমের বাণী নাকি? ওতো রূপমুগ্ধ পুরুষচিত্তের একটা স্তাবকতা! প্রেমের বাণী অমন হয় না।

—কি রকম হয় তাহলে?

—তা জানিনে, আজো শুনিনি কারো কাছে।

—সিনেমা শেষ হইয়া গিয়াছে। তপতী পুনরায় বলিল—সময়টা গল্পেই কাটলো, কিছুই দেখলাম না।

—কাল আবার আসবেন?

—দেখা যাবে বলিয়া তপতী আসিয়া গাড়ীতে উঠিল।

বাড়ি ফিরিতেই মা তাঁহার পূর্ব সঙ্কল্পমতো তপতীকে বকিতে গিয়া দেখিলেন,—কাপড় না ছাড়িয়া তপতী বিছানায় বসিয়া আছে, দু'টি চোখে তাহার জল টলমল করিতেছে।

মা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হলো মা, খুকু?

—"জানিনে—যাও"—বলিয়া তপতী শয্যায় লুটাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিস্মিত বেদনাহত মা অনেকক্ষণ তপতীর মাথায় হাত বুলাইয়া আবার ডাকিলেন,—হয়েছে খুকী—আমায় বলতে তোর লজ্জা কি-রে?

—কিছু না মা, ঠাকুরদার কথা মনে পড়ছিল। বুড়ো আমায় বড্ডো ঠকিয়ে গেছে ছিঃ মনি স্বর্গগত মহাপুরুষের নামে ও কথা বলতে নেই। কি হলো কি?

তপতী খানিকটা সামলাইয়া লইয়াছে। উঠিতে উঠিতে বলিল—তোমার শ্বশুর তোম কাছে মহাপুরুষ, আমার ঠাকুরদা, যা খুশী বলবো ওকে।

উঠিয়া তপতী কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেল। মা বলিয়া আসিলেন—কাপড় ছেড়ে খেতে আয় রাত হয়ে গেছে মা!

তপতী কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ভাবিতে লাগিল—ঠাকুরদা বলিতেন তপতীর স্বা হইবে অদ্বিতীয় প্রেমিক, অদ্বিতীয় মানুষ, যাহার জন্য তপতী সহস্র প্রলোভনের মা আজও নিজেকে অনাঘ্রাতা রাখিয়াছে। সে কি ঐ ধূর্ত অর্থালোভীটার জন্য! জ্যোতি কোনদিন সত্য হয় না!

মানুষের মন এমনভাবে গঠিত যে নিজের সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে সে ভয় পায়! মনে অজ্ঞাতসারে সে এড়াইয়া যায় তাহার দুষ্কর্ম্মগুলির অপরাধ অথবা আপনার দুর্বলতা দি সে সমর্থন করে তার কৃতকর্মকে। তপতী যদি তপনের প্রতি তাহার কৃত ব্যবহারের ক একবারও ভাবিত তাহা হইলে হয়ত বুঝিতে পারিত, দোষটা সবই তপনের ন অত্যাধুনিক হইতে গিয়া সে তাহার পূর্ব সংস্কৃতি তাহার চেতনা হইতে হারাই ফেলিয়াছে; আর তাহার অবচেতন মনে জাগিয়া রহিয়াছে বংশপরম্পরায় লব্ধ সংস্কা এই দুই পরস্পরবিরোধী সংস্কারের সংঘাতে তপতী নিজের অজ্ঞাতসারেই হইয়া উঠি উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল। তপনের মধ্যেও যে কিছুমাত্র ভাল থাকিতে পারে, ইহা যেন সে ভাবিতে চাহে না। ভাল কিছু না থাকিলেই যেন খুশি হয়। মা-বাবা উহাকে এত ভালবাসে তপতী যেন ঈর্ষায় জ্বলিয়া যায়। উহাকে ভালবাসিবার কোন কারণ নাই। বার কতক মা বলিয়া ডাকিলে আর যাত্রাদলের মার্কা দেওয়া বাহবা পাওয়া বুলি আওড়াইলে কাহারও ভালবাসা পাইবার যোগ্যতা জন্মে না। উহার আলাপ করিবার সঙ্গী একম মা—তা মা'র সহিত কিই বা কথা ও কয়? কথা কহিবার আছেই বা কি? যদি বা থা বাড়িতে তো সে সব মিলাইয়া আধ ঘণ্টার বেশী থাকে না, এমন কি রবিবারেও না। ত মধ্যে ছয় ঘণ্টা ঘুম।

টাকাটা লইয়া কি যে করিল, কেহ জানিতে পর্য্যন্ত পারিল না! ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া আর কি! কাল বাবা মা'কে বলিলেন—টাকা নিয়ে কি করছে জানতে চেও না, মদ-ও ও খায় না'। মদ-ভাং না খাওয়া ছাড়া টাকা খরচ করিবার যেন আর পন্থা নাই? আর খরা বা করিবে কেন? ভবিষ্যতের জন্য করিতেছে। ও তো নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছে, তপতী উহা তাড়াইয়া দিবে। তাই যতদূর সম্ভব সাবধানে কাজ গুছাইতেছে।

তপতী ক্লান্তি অনুভব করিতেছে। এই বিরক্তিকর পরিস্থিতি সে আর কতদিন ভে করিবে। উহাকে তাড়াইয়া দিলেই তো সব লেঠা চুকিয়া যায় কিন্তু তাড়াইবার উপায় বা করা সহজ নহে।

তপন খাইতে বসিয়াছে। কি কথা কহিতেছে, শুনিবার জন্য তপতীও গিয়া খাই

বসিল। তপন মুখ নত করিয়া বসিয়াছে। মা জানেন, এখনো তপনের লজ্জা ভাঙে নাই, বলিলেন—তুই একটু পরে খাবি খুকী।

—কেন। আমি তোমার ছেলের কেড়ে খেতে যাব না। খিদে পেয়েছে আমার।

সন্তান ক্ষুধা পাইতেছে বলিলে কোন মাতা আর স্থির থাকিতে পারেন না, তথাপি মা ইতস্তত করিতেছিলেন। তপতী চাপিয়া বসিল—না খাইয়া যাবে না। অগত্যা তাহাকে খাবার দিলেন।

তপন খাইতে খাইতে বলিল—ও বেলা জল খেতে আসবো না মা।

কেন বাবা? কোথায় যাবে?—মা প্রশ্ন করিলেন!

—আমার সেই ছোট বোনটির বাড়ি—তাকে নিয়ে আজ সিনেমা যেতে হবে।

মা এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—খুকীকেও নিয়ে যাবে বাবা ;—খুকী প্রতিবাদ না করিয়া বসিয়া রহিল।

তপন বলিল,—তা কি করে হবে মা? আমার বোনের বাড়ি আপনার খুকী কি করে যাবে! কুটুম্বের বাড়ি তো বিনা নিমন্ত্রণে যায় না কেউ!

মাতা আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ বাবা, ও কথা আমার মনে হয়নি। কোন সিনেমায় যাবে? যাবার পথে হলে তুলে নিও ওকে!

—আমি ট্রামে যাবো মা, আর যাবো ও পাড়ার দিকে ; এ পথে মোটেই পড়বে না!

তপন চলিয়া গেল। তপতী খাইয়া উঠিয়া খবরের কাগজ খুলিয়া দেখিল জ্যোতি গোস্বামী নামক জনৈক লেখকের লেখা একখানা বই ওখানে আজই প্রথম আরম্ভ হইবে। সেও স্থির করিল, ঐ সিনেমায় যাইবে।

বিকালে তিন চারজন বন্দু-বান্ধবী লইয়া তপতী আসিয়া দেখিল 'হাউসফুল' টিকিট না পাইয়া তাহারা ফিরিয়া যাইতেছে, এমন সময় মিঃ ব্যানার্জি চ্যাঁচাইয়া উঠিলেন,—তপনবাবু।

তপন মুখ তুলিয়া তাকাইল,—কিছু বলছেন?

তপতী সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, তপনের পাশে একটি সুন্দরী মেয়ে! তপতীর সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, ঈর্ষায় বা ইতরতায়!

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—আমরা টিকিট পাচ্ছি না ; আপনার কেনা হয়েছে?

তপন জিজ্ঞাসা করিল,—ক'জন আছেন আপনারা?

—পাঁচজন—বলিয়া মিঃ ব্যানার্জি ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তপন বলিল—এক মিনিট দাঁড়ান, দেখছি।

সকলেই উহারা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তপন সেই মেয়েটির হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। মিনিট দুই পরে একজন সুদর্শন যুবক আসিয়া বলিল—আসুন আপনারা।

—টিকিট পেয়েছেন?

—হ্যাঁ।

তাহাদের সকলকে লইয়া গিয়া বক্সে বসাইয়া দিল বিনায়ক।

তপতীদের আশ্চর্য্যবোধ হইতেছে। তপন কেমন করিয়া টিকিট কিনিতে পারিল? বোধ হয় ঘুষ দিয়া তপতীর সম্মান রক্ষা করিয়া থাকিবে। টাকা তো তাহারই বাবার ; কিন্তু সে নিজে বসিল কোথায়? নিজেদের টিকিটগুলিই উহাদিগকে দিয়াছে নাকি চতুর্দ্দিকে চাহিয়া

অন্বেষণ করিয়াও তপন কিংবা সেই মেয়েটির কোন সন্ধান মিলল না। তপতীর ভয়ে মেয়েটাকে লইয়া পলাইয়া গেল নাকি!

মিঃ ব্যানার্জি তপতীকে বলিলেন,—তপনবাবুকে দেখছি না। পালিয়েছে নিশ্চয়!

তপতী শুধু বলিল হুঁ!

সিনেমা আরম্ভ হইল। একটি নারী-জীবনের বেদনার ইতিহাস স্বামী বঞ্চিতা ঐ দুর্ভাগিনী নারী স্বামী আসিবে ভাবিয়া নিত্য ফুলশয্যা রচনা করে অঙ্গনে আলপনা দেয়, পথের দুর্ব্বাকে চুম্বন করিয়া বলে,—আমার প্রিয়তম যেদিন আসিবে তোমার কোমল বুকে চরণ ফেলিয়া, সেদিন হে শ্যামল দুর্বাদল, তোমায় আমি শত চুম্বন দান করিব। তথাপি তাহার প্রিয় আসিল না, আসিল তাহার বাণী : "প্রিয়া, তোমার আমার মাঝখানে চোখের জলের নদীটি যুক্ত হল। তোমার আমার মাথায় একই আকাশ সেই জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে তুমি এসেছো, শুধু চোখের জলটুকুর ব্যবধান। ঐটুকু থাক—তোমায় পরিপূর্ণ করে পেয়ে ফুরাতে চাইনে—তুমি থাকো না পাওয়ার আলোকে অফুরন্ত আশা হয়ে আমার মনের গহন গভীরে।"

তপতী বিমুগ্ধ চিত্তে দেখিল। তাহার রসগ্রাহী মন স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল কে এই রূপদক্ষ কবি?

প্রশ্নটার কেহই উত্তর দিতে পারিল না, কারণ চিত্রলিপিতে লেখকের কোন পরিচয় নাই। কেন যে এই অদ্ভুত নাট্যকার নিজেকে এমনভাবে প্রচ্ছন্ন করিলেন ; তপতী ভাবিয়া পাইল না।

বাড়ি ফিরিয়াই সে তপনের ঘরের দিকে চাহিল, তপন তখনো ফেরে নাই। কোথায় গিয়াছে সেই মেয়েটাকে লইয়া? খাইতে খাইতে সে, ভাবিতে লাগিল সিনেমার কথা।

তপন আসিয়া বাহির হইতে বলিল—খেয়ে এসেছি মা, আর কিছু খাব না।

তপতীর রাগ আরও বাড়িয়া গেল। ওখানে রাত্রির খাওয়া পর্য্যন্ত খাওয়া হয়! তপন চলিয়া গেলে তপতী জিজ্ঞাসা করিল—ওর কি রকম বোন মা, মা'র পেটের না পাতানো!

—নারে খুড়তুতো! মেয়েটা নাকি ছেলেবেলা থেকে ওর খুব নেওটা।

ওঃ! তপতী ঠোঁটের আগায় একটা বিদ্রূপধ্বনি তুলিয়া চলিয়া গেল আপনার ঘরে।

তপতীর জীবন যেরূপভাবে গাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আধুনিক সমাজের কোন ছেলের পক্ষে তাহার মন জয় করা সহজ নয়, আবার প্রাচীন সমাজের পক্ষপাতী কাহারো পক্ষে তপতীকে মুগ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন। প্রাচীন এবং আধুনিক সংস্কারের সঞ্চয়ন হইয়াছে তাহার জীবনে কিন্তু সমন্বয় হয় নাই। তাহার ঠাকুরদার শিক্ষা পদ্ধতি ছিল একদেশদর্শী, প্রাচীন—আবার তাহার পিতার শিক্ষাপদ্ধতি একান্তভাবে আধুনিক। দুইটি শিক্ষাকে একত্র মিলাইবার ক্ষীণ চেষ্টা করিতেছেন তপতীর মাতা কিন্তু প্রগতিবাদের উচ্ছৃঙ্খল স্রোতে তাহার বাঁধ বাঁধাইবার দুর্বল প্রচেষ্টা ভাসিয়া গিয়াছে। যেটুকু তিনি করিয়াছেন, তাহার ফল হইয়াছে বাধাপ্রাপ্ত জলস্রোতের মতো আরো উদ্দাম। চিন্তার সমুদ্রে তপতী আছাড় খাইয়াছে এ কয়দিন। তপনকে নানাভাবে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিবার কল্পনা করিয়াছে, আবার ভাবিয়াছে ; তাড়াইয়া কাজ নাই তপন তো তপতীর কোন ক্ষতি করে না।

কিন্তু সেদিন সিনেমায় একজন সুন্দরী নারীর সহিত তপনকে দেখার পর হইতে

তপতীর মনে আগুনের জ্বালা ধরিয়া গিয়াছে। ঐ মেয়েটা উহার আপন বোন নয়, হয়তো কেহই নয়, মিথ্যা করিয়া বোন বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। না হোক, তপতী তার জন্য ঈর্ষা করিবে না, ঈর্ষা করিবার কারণও নাই। তপন যে-চুলোয় খুশী যাইতে পারে কিন্তু তপতী তাহার নিজের বাড়িতে বসিয়া তাহার পিতার জনৈক অন্নদাসের নিকট এ অপমান সহ্য করিবে না। ইহার প্রতিকার করিবার জন্য সে তপনকে সাংঘাতিক অপমান করিবার সঙ্কল্প করিল।

কি মতলবে যে সে এখনো এখানে বাস করিতেছে তাহা বোঝা তপতীর বুদ্ধির বাহিরে, কিন্তু মতলব তাহার যে একটা কিছু রহিয়াছে তাহা তপতী বুঝিতে পারিতেছে। টাকা সে লইয়াছে, এবার তো অনায়াসে সরিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু আরো টাকা আদায় করিবার জন্যই সে আছে নিশ্চয় অথবা ধীরে ধীরে তপতীর মনকে জয় করিতে চায় সে। সে মতলব যদি উহার থাকে তবে তপতী যেমন করিয়াই হোক উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিবে। তপতীর সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। সে আসিয়া ফোন করিল মিঃ বোসকে। তাহার সহিত তপতী বেড়াইতে যাইবে আজ। মিঃ বোস কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসিলেন ; সুসজ্জিত তপতী তাঁহাকে নীচের তলায় অভ্যর্থনা করিল, ইচ্ছাটা, তপন এখনি জলযোগের জন্য বাড়ি ফিরিয়া তপতীকে মিঃ বোসের সহিত একাসনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আর একবার অপমানিত হইবে। কিন্তু অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরও তপন আসিল না দেখিয়া তপতী ও মিঃ বোস বাহিরে চলিয়া গেল মিঃ বোসেরই গাড়ীতে।

রাত্রি প্রায় দশটায় তপতী স্বয়ং মিঃ বোসের গাড়ী চালাইয়া বাড়ি ফিরিতেছে, মিঃ বোসও পাশে বসিয়া আছেন—তপতী দেখিল গেটের নিকট দারোয়ানগুলোর সঙ্গে তপন কি কথা বলিতেছে। গাড়ীর হর্ণ না দিযাই তপতী চলিয়া যাইবে কিন্তু তপন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দেখিতে পাইল না। মিঃ বোস তপনকে উদ্দেশ্য করিয়া ধমক দিলেন,—রাস্তায় দাঁড়ান কেন? 'ইডিয়ট'।

তপন বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিল এবং তৎক্ষণাৎ পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে এভাবে অপমানিত হইতে দেখিয়া দারোয়ানগুলো পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তপতী গাড়ীটা চালাইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল,—'ইডিয়ট' মানেই ও জানে না মিঃ বোস—অনর্থক গলা ফাটাচ্ছেন।

তপন নীরবে, নতমুখে প্রায় সাত মিনিট দাঁড়াইয়া রহিল সেইখানেই স্থাণুবৎ। চলৎশক্তি তাহার যেন থামিয়া গিয়াছে। তপতী মিঃ বোসকে এক কাপ কোকো পান করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া ভিতরে লইয়া গেল, তপন তাহাও দেখিল, তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া উপরে উঠিল, ক্লান্ত, শ্রান্ত দেহভার বহন করিয়া।

তপতী মিঃ বোসকে কোকো খাওয়াইয়া বিদায় করিল। মার কাছে যাইতেই তিনি বলিলেন,—তপন এখনো এলো না কেন রে, জানিস?

—এসেছে তো।—বলিয়া তপতী মার পানে চাহিল হাসিমুখে।

মা ভাবিলেন, হয়তো উহারা একসঙ্গেই বেড়াইতে গিয়াছিল। তিনি তপনের দরজায় আসিয়া ডাকিলেন,—এসো বাবা, খাবে এসো!

—আজ কিছু খাব না মা—লক্ষ্মী মা, আপনি জেদ করবেন না, বড্ড ক্লান্তি লাগছে—শুয়ে পড়েছি!—তপন উত্তর দিল।

—সে কি বাবা! একটু দুধ মিষ্টি?—মা অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে কহিলেন।

—না মা, না—আজ কিছু না—আমায় শুতে দিন একটু! তপনের স্বর এত করুণ যে মা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তপতীকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঝগড়া টগড়া কিছু করেছিস খুকী?

—আমার অত দায় পড়েনি! আমি খেয়ে এসেছি 'ফারপো'তে। আজ আর খাব না কিছু—বলিয়া তপতী চলিয়া গেল।

মা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নানা সন্দেহ দোলায় দুলিতে লাগিলেন। শেষে তিনি নিজের মনকে বুঝাইলেন, হয়তো তপন কিছু খাইয়া থাকিবে। আজ তাহার 'সাবিত্রী ব্রত' বলিয়া সারাদিন তপন উপবাসী আছে, রাত্রে ফল মিষ্টি খাইবে ভাবিয়া মা সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু খুকী হয়তো দোকানেই কিছু ফল মিষ্টি খাওয়াইয়াছে—না হইলে খুকী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিত!

তপতী এতক্ষণ ভাবিতেছিল—আজ সে তপনকে চরম অপমান করাইয়াছে। ইহার পরও যদি সে এ বাড়ি না ছাড়ে তবে তপতী আর কি করিতে পারে! মিঃ বোস অবশ্য জানেন না তপনের সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক কি। তিনি উহাকে একজন পোষ্য মনে করিয়া এবং তপতী উহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না জানিয়া তপতীর প্রীত্যর্থেই উহাকে 'ইডিয়ট', বলিয়াছেন। তপতী বেশ কৌশলেই মিঃ বোসকে দিয়া তপনকে অপমানটা করাইয়া লইল। অন্য কেহ, যাহারা তপনের সহিত এ বাড়ির সম্বন্ধে অবগত আছে, তাহারা সাহস করিত না। তপন নিশ্চয়ই ইহার পর চলিয়া যাইবে।

কিন্তু তপনের সহিত মা'র কথাগুলি তপতী শুনিয়াছে। লোকটা খাইল না কেন! তপতীর এবং মি বোসের কৃত অপমানের প্রতিকারের জন্য সে অনশন আরম্ভ করিল নাকি! আশ্চর্য্য নয়! তপন যে আজ সমস্ত দিনই খায় নাই, তপতী সে সংবাদ অবগত নয়! তপন অনশন আরম্ভ করিয়াছে, অন্ততঃ আজ রাত্রে কিছু না খাইয়া তপতীকে বুঝাইয়া দিতে চায় যে, সে অপমানিত হইয়াছে। ঐ ভণ্ড প্রবঞ্চক মনে করিয়াছে, তপতী ইহাতে ভয় পাইয়া যাইবে। না, তপতী ভয় পাইবে না। কাল সকালে যদি সে মা-বাবার নিকট সব কথা প্রকাশ করে তাহাতেও তপতীর ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। বরং সে ভালই হইবে! মা ও বাবাকে তপতী উহার স্বরূপ চিনাইয়া দিবে।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া তপতীর মনে হইল,—মিঃ বোস যখন জানিবেন, তপতীর সহিত ঐ লোকটির সম্বন্ধ কি, তখন তপতীকে তিনি কি মনে করিবেন? ভালই মনে করিবেন। একান্ত অনুপযুক্ত ভাবিয়া তপতী উহাকে অপমান করিয়াছে। কিন্তু মা-বাবা যদি খুব বেশী চটিয়া যান। মা তো নিশ্চয়ই চটিয়া যাইবেন। আজই যদি তপন বলিয়া দিত, কি কারণে সে খাইল না, তাহা হইলে মা হয়ত এখনি একটা অনর্থ ঘটাইতেন। কিন্তু কেন সে কিছুই বলিল না? এখনো কি এই বাড়িতে থাকিবার ইচ্ছা পোষণ করে! নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে তপতীর ভাল নিদ্রা হইল না।

সমস্ত রাত্রি আপনার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া তপন সকালে স্নান করিয়া পূজায় বসিল। দারুণ অপমানে মনটা তাহার বিকল হইয়া গিয়াছে, ধ্যানে মনঃসংযোগ হইতেছিল না। অনেক—অনেকক্ষণ পরে পূজা শেষ করিয়া সে উঠিল এবং বাহিরে যাইবার বেশ না

পরিয়াই দরজা খুলিয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিল, তপতী বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে স্নানসিক্ত চুলগুলি পিঠে ছড়াইয়া। তপনের ঘরের এত কাছে তপতী কোনদিন আসে নাই। তপন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, যদি তপতী কিছু বলে। আশা এবং উদ্বেগে তাহার অন্তর আন্দোলিত হইতেছে।

—দেখুন মশাই—তপতী সরোষে কহিল,—এ বাড়িতে থেকে ওসব 'হাঙ্গার ষ্ট্রাইক ফাইক' করা চলবে না। ওসব করতে হলে যেখানকার মানুষ সেখানে যান—

তপন দুই মুহূর্ত বিমূঢ় হইয়া রহিল, তারপর কিছু না বলিয়াই খাইবার জন্য মা'র কাছে চলিয়া গেল। তাহার কথাটাকে এভাবে অগ্রাহ্য করার জন্য তপতীর মন উত্তপ্ত লৌহের মতো অগ্নিময় হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তপনকে খাইবার ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া সে ভাবিল, হয় সে সেখানে গিয়া মা'কে সব কথা বলিবে, না হয় নির্বিবাদে খাইবে। কি করে দেখিবার জন্য তপতীও তৎক্ষণাৎ খাইবার ঘরে আসিল। তপন মুখ নামাইয়া একটা চেয়ারে বসিতেই মা বলিলেন,—এসো বাবা, কাল সারা দিনরাত উপোস আছ।

—দিন মা, এবার খেতে দিন কিছু ফল মিষ্টি—নির্লিপ্তের মতো জবাব দিল!

মা তাঁহাকে ফল মিষ্টি আগাইয়া দিয়ে সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন,—সাবিত্রী ব্রত তো মেয়েরা করে বাবা, তুমি কেন করেছ?

—ব্রতটা আমার মা করতেন, উদযাপনের আগেই তিনি স্বর্গে যান মা, তাই আমি শেষ করে দিচ্ছি। শাস্ত্রে এ রকম বিধান আছে!

—ও! আজো ভাত খাবে না বাবা?

—না মা—ফল জল খাবো—ভাত খাবো কাল।

তপতী বসিয়া চা খাইতেছিল। তপনের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। অপমানিত হইয়া সে তবে অনশন করে নাই, তাহার ব্রত পালনের জন্যই করিয়াছে! কিন্তু গত রাত্রে নিশ্চয়ই কিছু খাইবে বলিয়াছিল, না হইলে মা তাহাকে ডাকিতে যাইবে কেন? রাত্রের না খাওয়াটা নিশ্চয় তপতী ও মিঃ বোসের উপর রাগ করিয়া। কিন্তু মা'কে তো কথাটা সে বলিয়া দিতে পারিত। না-বলার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে যে গভীরতম উদ্দেশ্য—টাকা আদায় করিবার মতলব, তাহা হাসিল করিতে হইলে তপতীকে চটানো চলে না, এ বাড়ি ছাড়া চলে না, মা বাবাকে বলা চলে না যে তপতী তাহাকে গ্রহণ করিবে না! ভাল, তপতী নিজেই মা ও বাবাকে জানাইবে—ঐ অর্থ-লোভী মতলববাজ গণ্ডমূর্খটাকে তপতী কোন দিন স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবে না।

এখনি তপতী সে-কাজটা করিতে পারিত, কিন্তু লোকটা কাল থেকে উপবাসী আছে এখনি একটা হাঙ্গামা করিবার ইচ্ছা সে কষ্টেই দমন করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল!

—আচ্ছা দাদা, তুমি তো এবার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারো।

—না ; শিখা, নেতার কাজ অতো সোজা নয়। মনে করলেই নেতা হওয়া যায় না।

—তা হলে নেতার লক্ষণ কি দাদা, কি দেখে চিনবো?

—নেতার ডাক হবে দুর্বার—ইরেজিস্টিবিল্। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনে ব্রজগোপীরা যেমন কূল-মান বিসর্জ্জন দিয়ে ছুটে যেতো, নেতার ডাক হবে তেমনি।

—কোথায় সে নেতা পাবো দাদা?

—সেজন্য চিন্তা নেই বোনটি—যেদিন তোরা মানুষ হবি, সেদিন নেতাও আসবেন। মানুষের নীতিকে আজ যারা পদদলিত করছে, স্বেচ্ছাচারিতায় আজ যারা বনের পশুকে হারিয়ে দিচ্ছে, তাদের জন্য পাশব-শক্তিব আবির্ভাব পৃথিবীতে বিরল নয়। কিন্তু বহু যুগ পূর্বে জন্মগ্রহণ করেও পশ্বেতর প্রাণী এই মানব আজো পশুধর্ম ছাড়তে পারলো না। এই পশুধর্মকে যিনি জয় করতে পারবেন, তিনি হবেন সেই নেতা!

পশুধর্ম একেবারে কি করে ছাড়া যায় দাদা—মানুষ তো পশুও!

—না শিখা, "প্রাণীও" বলতে পারিস। প্রাণধর্ম তো তাকে বিসর্জন দিতে বলা হচ্ছে না। প্রাণকে মহান করতে, বিশাল করতে বলা হচ্ছে। শিখা! আমি কতকগুলো কঠোর নিয়ম পালন করি ; দেখে হয়তো তোরা ভাবিস—দাদা তোদের গোঁড়া। কিন্তু ভেবে দেখেছিস কি—পশুর কোন বাঁধা-ধরা নীতি নেই। উদর পালনের প্রয়োজনই তার নীতি। তাছাড়া অনানীতি যদি কেউ পালন করতে পারে তো সে মানুষ। "সত্য কথা নিশ্চয় বলবো" এই প্রতিজ্ঞা মানুষই করতে পারে। "হিংসা করবো না"—এ নীতি মানুষেরই পালনীয়। ঈশ্বর বলে কেউ থাকুন আর নাই থাকুন—প্রকৃতি মানুষের মধ্যে যে ভাল-মন্দ বোঝবার শক্তি দিয়েছেন,—যে কল্যাণকারী বুদ্ধিটুকু দিয়েছেন, মানুষ কেন তাকে ব্যবহার করবে না, বলতে পারিস?

শিখা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। বিনায়ক আসিয়া বলিল,—তোমাদের ভাই-বোনের গল্প তো আর শেষ হবে না, এদিকে রান্নাকরা খাদ্য সব ঠাণ্ডা মেরে যাচ্চে, আর পেটের খিদে গরম হয়ে উঠেছে।

শিখার দুটি চোখ দরদে ভরিয়া উঠিল,—ওঃ! এত খিদে পেয়েছে আপনার? তো ডাকলেই পারতেন আমাদের! চলুন চলুন!

তপন হাসিয়া বলিল,—না কহিতে ব্যাথাটুকু পার না বুঝিতে?

—যাও বলিয়া শিখা প্রায় ছুটিয়াই পলাইতেছে, তপন তাহার বেণীটা ধরিয়া আটকাইয়া ফেলিল, তারপর বলিল,—মিতা পাতিয়েছিস যে,—কি রকম মিতা তাহলে। খিদের সময় বুঝতে পারিস নে?

—আমি দাদারই খিদের কথা ভুলে গিয়েছিলাম, তা মিতা।

—তা হলে ওকে আর এক ডিগ্রি প্রমোশন দে ভাই শিখা। ও খিদে মোটেই সইতে পারে না!

—মানে? কোন ক্লাসে প্রমোশন।

—মিতার উপরের ক্লাসে?

শিখা হাসিতে গিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, বিনায়ক হাসি চাপিতে গিয়া অত্যধিক গম্ভীর হইয়া গেল এবং তপন ভাতের হাঁড়িটা লইয়া পাতায় ভাত পরিবেশন করিতে লাগিল।

খাওয়া শেষ হইলে শিখা বলিল—তুমি দিল্লী কি জন্যে যাবে দাদা। কদিন দেরী করবে সেখানে?

—দিন দশ মাত্র। কি জন্যে যাবো সেটা এখন নাই শুনলি ভাই?

—তুমি বড্ড কথা লুকিয়ে রাখ দাদা। শুনলাম তো কি হলো ক্ষতিটা।

—প্রকাশ করে ফেলতে পারিস সেটা আমি চাইনে। কাজে সিদ্ধিলাভ করে অন্যের

মুখে সুযশ শোনা আমার শিক্ষা বোনটি! তবে মনে রাখ—মিঃ আর মিসেস চ্যাটার্জির স্নেহঋণ শোধ করবার জন্যই যাচ্ছি।

শিখা আর অনুরোধ করিল না, কিন্তু মনটি তাহার অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া রহিল দেখিয়া তপন তাহাকে কাছে ডাকিয়া সস্নেহে কহিল,—আমি নাইবা বইলাম রে, যার হাতে তোকে দিচ্ছি সে তোর অযোগ্য হবে না।

—কিন্তু সেদিনটিতে আমি তোমার আশীর্বাদ পাবো না দাদা। আর কারো আশীর্বাদে তৃপ্তি হবে না আমার।

—আশীর্বাদ আজও করছি আবার ফিরে এসেও করব। আর যতকাল বাঁচবো করবো। তোদের কল্যাণ কামনাই যে আমার জীবনের ব্রত শিখা। এই বিশাল পৃথিবীতে তুই, মীরা আর বিনায়ক ছাড়া আত্মীয় বলতে তো আমার আর কেউ...

তপন থমিয়া গেল। অসহনীয় ব্যথায় কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সংযমী তপন আত্মসংবরণ করিল কিন্তু শিখার নারীহৃদয় এ বেদনা সহিতে পারিল না, দরদর ধারায় তরল মুক্তাবিন্দু তাহার দুই গণ্ডে ঝরিয়া পরিল। বিনায়ক নীরবেই এই শোকাবহ দৃশ্য অন্যদিন দেখিয়াছে, আজো দেখিল নীরবেই।

আত্মসম্বরণ করিয়া শিখা বলিল.—তপতীর আশা কি তুমি তবে ছেড়েই দিয়েছো দাদা?

—প্রায় ; কারণ সে অন্য কাউকে ভালবাসে কি না আমি জানিনে, তবে আমায় সে গ্রহণ করবে না, এটা বহু প্রকারে জানিয়ে দিয়েছে!

—কিন্তু দাদা, তুমি সেখানে যে ভাবে থাকো. যে ছদ্মবেশে সে তোমায় দেখেছে, তাতে তার মতো একজন শিক্ষিতা তরুণীর পক্ষে তোমাকে স্বামী স্বীকার করা কঠিন তো?

—আমি তো বলছিনে শিখা, যে সহজ। কঠিন নিশ্চয়ই। তবে সেটাও সম্ভব, যদি সে আজো অনন্যপরায়না থাকে। আছে কি না জানবার জন্য আমি এত ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছি। এত অপমান সহ্য করছি। আমি যদি আজ আত্মপ্রকাশ করি, তাহলে তো নিশ্চয়ই সে আমায় গ্রহণ করবে কিন্তু তাতে সে পূর্বে আর কাউকে ভাল বেসেছে কি না, তা আর আমার জানা হবে না।

—তা যদি বেসেই থাকে দাদা, তাহলে কি তুমি ওকে গ্রহণ করবে না?

—নিশ্চয় না। আমার জীবনে অন্যাসক্তা নারীর ঠাঁই নেই। শিখা, আমি কোনো মানবীকে আমার সহধর্ম্মিণীর আসন দিতে চাই, যে মানবী শুধু দেহধর্ম্মিণী নয়। এর জন্য যদি শত জন্মও আমার একক জীবন কাটাতে হয়, সেও ভালো।

শিখা নীরবে তপনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল,—মিঃ বোসকে দিয়ে তোমায় অপমান করালো এরপর তোমার আর কিসের সন্দেহ দাদা—ছেড়ে দাও ও-বাড়ি।

দেরী আছে ভাই। মিঃ বোসকে দিয়ে আমায় অপমান করানোর জন্য কারণও থাকতে পারে, এমন কি, সে আজো নির্ম্মল আছে ঐটাই তার একটা বড় প্রমাণ।

—তা হলে আরও পরীক্ষা তাকে করবে?

—আমি কিছুই করবো না শিখা, যা-কিছু করবার সেই করবে! আমি শুধু জানতে চাইছি, কাকে সে চায়। তা যদি না জানতে পারি তাহলে ওর মা-বাবের কাছে পাওয়া

স্নেহের যৎকিঞ্চিৎ ঋণ আমি শোধ করে যাবো—তারই জন্য দিল্লী যাচ্ছি!

তপন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—শিখা, এই দেশের মেয়েরাই স্বামীর নিন্দা শুনে মৃত্যু বরণ করেছে, মৃত স্বামীর কঙ্কাল নিয়ে দেশে দেশে ফিরেছে, গলিত কুষ্ঠ স্বামী কাঁধে করে বয়ে বেড়িয়েছে,—আধুনিকতা তোরা ; অতটা বাড়াবাড়ি না-হয় নাই করলি! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কারো ভাগ্যে যদি মূর্খ স্বামীই জোটে তো, তাকে কি স্নেহের সুরে একটা কথাও বলবি নে? বন্ধু দিয়ে অপমান করে তাড়াবি? তার চেয়ে নিজেই কি বলা উচিত নয়, 'তুমি চলে যাও, আমি তোমায় চাইনে।' তপতী যদি বলতো, সে অন্য কাউকে ভালোবাসে, তাহলে আমি আনন্দে তাকে তার প্রিয়তমের হাতে তুলে দিতাম। আজো তারজন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি আমি, শিখা—কিন্তু তপতীর মনের খবর জানবার সুযোগ আমার খুবই কম। ওর মা-বাবাকে কথাটা জানালে তাঁরা অত্যন্ত আহত হবেন, তাই নিজেই সহ্য করছি। দুঃখ আমি বিস্তর সহ্য করেছি। এটাও সইতে পারবো—তোরা সুখে থাক...

তপন চলিয়া গেল—শিখা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

তপতী নির্বাক হইয়া চাহিয়াছিল কার্ডখানার দিকে, শিখায় বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র। তপতী এবং তপন দুজনকেই এক পত্রে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তপতীর গাত্রদাহ হইতেছিল ঐ ইতর লোকটার সহিত তাহার নাম যুক্ত হইতে দেখিয়া। কিন্তু নিরুপায় নিষ্ফল গর্জন ছাড়া তপতী আর কি করবে। সৌভাগ্য এই যে তপতী সেদিন এখানে থাকিবে না, দিল্লীতে নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য কালই তারা যাত্রা করিবে।

তপতী নীচে আসিয়া বসিল বন্ধুদের অপেক্ষায়,—অনেক কিছু আয়োজন করিবার আছে তাহাদের। মিঃ ব্যানার্জি, মিঃ অধিকারী, মিঃ সান্যাল, রেবা সিকতা, শৈলজা ইত্যাদি আসিয়া পৌঁছিল।

রেবা বলিল,—বন্ধুর বে'তে থাকবি নে তুই? কেমন ছেলে রে? তুই জানিস?

তপতী অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—জানার দরকার? সে যখন আমায় ছাড়তে পেরেছে তখন আমিই-বা না পারবো কেন?

—ঠিক কথা। তবে বিয়েটা কার সঙ্গে হচ্ছে, জানতে ইচ্ছে করে।

—জেনে আয় গিয়ে। নাম তো দেখলাম বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তপতী একটা দীর্ঘশ্বাস নিজের অজ্ঞাতেই মোচন করিল।

মিঃ ব্যানার্জি তাহার কথাটা ধরিয়া বলিলেন,—বিলেৎফেরত নাকি ; করে কি?

—জানিনে—বলিয়া তপতী অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিজের দুর্ভাগ্য আজ তাহাকে অপরের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত করিতেছে! তপতী বুঝিতেছে, ইহা অন্যায় ; কিন্তু তাহার আয়ত্তের বাহিরে। নিজের মনের এই শোচনীয় অধোগতি আজ তপতীকে ব্যথা দিল না, বিষাক্ত করিয়া দিল। তাহার যত কিছু জ্বালা তপনের সর্বাঙ্গে ঢালিয়া দিতে পারিলে তপতী যেন কতকটা জুড়াইতে পারে।

মিঃ অধিকারী বলিলেন—লোকটা ব্রাহ্ম, না হিন্দু, না খৃষ্টান? জানেন?—হিন্দুই হবে বোধ হয়—শিখা কি আর অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করবে! ওর যা হিন্দুয়ানী স্বভাব! ওর বাবা তার উপর যান। আর মা যান তারো উপরে।

রেবার কথাকটি শুনিয়া সকলেই হাসিল, হাসিল না শুধু তপতী ; গম্ভীর মুখে খানিক বসিয়া থাকিয়া কহিল,—ভালই। শিখা হচ্ছে আর্যনারী।

—কেন? আমরাও তো আর্যনারী—আমরাই বা সতীর কম কি? রেবা কহিল।

—বেফাঁস কথা কেন বলিস রেবা—সতীত্বের মানে বুঝিস?

তপতীর উষ্ণ কথায় সবাই চুপ হইয়া গেল। মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন—আমরাও জানিনে সতীত্বের মানে ; আপনি যদি বলেন দয়া করে? শুনে ধন্য হই।

—জানেন—কোন কালে কেউ সতী ছিল বলে আমি বিশ্বাস করি না।

—কেন? সীতা সাবিত্রী, বেহুলা,—রেবা ত্বরিতে কথাটা বলিয়া তপতীর মুখের দিকে চাহিল।

কলহাস্যে তপতী ঘর ভরাইয়া দিয়া বলিল,—থাম্ থাম—সীতার মতন বোকা মেয়ে পৃথিবীতে আর জন্মায়নি। আর সাবিত্রী তো এক নম্বর পলিটিসিয়ান্, আর নির্লজ্জ বেহুলার কথা বলতে ইচ্ছে করে না, একটা ফাষ্ট ক্লাস ককেট। নাচ্‌নী সেজে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে ফিরে এল!

সবাই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। মিঃ ব্যানার্জি প্রশ্ন করিলেন,—সীতা বোকা, কিসে প্রমাণ হয়?

—বরাবর। প্রথম, রাবণের মতো একটা পশুপ্রকৃতির লোককে অত রূপগুণ থাকা সত্ত্বেও সীতা খেলাতে পারেনি ; অশোক বনে পড়ে পড়ে মার খেলো। তারপর আগুনে পুড়ে পরীক্ষা দিয়ে নিজের আত্মার করলো অপমান। রাণী তুই না-হয় নাই হতিস বাপু, তাবলে পরীক্ষা দিবি কিসের জন্য! তিন নম্বর বোকামী তার পরের কথায় তার নিষ্ঠুর স্বামী তাকে দিল বনবাস, আর সে দিব্যি বনে চলে গেল! কেন? সেও তো একজন প্রজা, বিনা অপরাধে তার শাস্তি সে কেন মেনে নিলো?—কেন বিচার চাইল না? তাতে সে স্বামীকেও স্বধর্মের পথে চালনা করতে পারতো! সতী হবার কাঙালপনায় ঐ মেয়েটা নারীত্বের চরম অপমান ঘটিয়েছে। চতুর্থ দফায় সে করলো পাতাল প্রবেশ! আত্মহত্যার আর ভালো উপায় তখনকার দিনে ছিল কিনা আমার জানা নেই—পটাসিয়াম সায়নাইড্ তখনো বার হয়নি, কিন্তু আত্মহত্যা ও করলো কেন? এই কাপুরুষত্ব আই মিন কা-নারীত্ব—সবাই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, তপতী ধমক দিয়া কহিল,—থামুন হাসি কেন অত? এই কা-নারীত্ব আমি কিছুতেই সমর্থন করিনে। সীতার যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকতো তাহলে রামের গড়া সোনার সীতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে বলতে-পারতো, আমি পরীক্ষাও দেব না আত্মহত্যাও করবো না। তুমি আমায় বিয়ে করেছে বনে যদি যেতে হয়, চল দুজনেই। তোমার বোকামীর জন্য আমার একা কেন শাস্তি হবে? তুমি গিয়েছিলে কেন সোনার হরিণ ধরতে? কেন তুমি রাবণের বাড়ি থাকার সময়েই আমায় আত্মহত্যা করতে বলনি? কেন তুমি অগ্নি পরীক্ষাটা এখানেই এনে করলে না? কেনইবা তুমি বিনাবিচারে আমায় বনে পাঠালে? নিজে যেমন তুমি নির্বুদ্ধিতা করে একটা বুড়ো স্ত্রৈণ লোকের কথা রাখবার জন্য বনে গিয়েছিলে তেমনি কি সবাই বোকা নাকি? কিন্তু সীতা এত বোকা ছিল আর ছিল সতীত্বের নামে কাঙাল যে এ-সব কথা ওর মাথায় একদম ঢোকেনি।

আলোচনাটা অত্যন্ত সরল এবং উপভোগ্য ভাবিয়া মিঃ অধিকারী কহিলেন,—আচ্ছা, —সাবিত্রী সম্বন্ধে কি আপনার বক্তব্য?

—সি ওয়াজ এ গ্রেট পলিটিসিয়ান্। সাবিত্রী সতী কিনা বলতে পারি না, তবে সীতার চেয়ে সে হাজারগুণ বুদ্ধিমতী। যম রাজার মতো ঘড়িয়াল লোককে সে সাতঘাটের জল খাইয়ে দিল! নারীত্বের সম্মান সে কিছুটা রেখেছে, এই জন্য ওকে আমি শ্রদ্ধা করি। দেখুন না রাজার মেয়ে তো, চেহারা নিশ্চয় ভাল ছিল, যম রাজাও এসে গেছে, আর সাবিত্রী আরম্ভ করেছে নানারকম কথার প্যাঁচ। পুরুষমানুষের মাথা ঘুলিয়ে দিতে কতক্ষণ! শেষ যখন বললো, তার একশ' ছেলে চাই, তখন যম ভাবলো আহা বেচারা, এই বয়সে সেক্স-আকাঙ্ক্ষাটা মিটোবার বায়না ধরেছে, অস্বাভাবিক তো কিছু নয়! দিয়ে দিলো বর। সাবিত্রী যে পলিশি করে ওর প্রার্থনার মধ্যে "সত্যবানের দ্বারা" কথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে, রূপমুগ্ধ যমের তখন আর সেদিকে খেয়াল নেই! কেমন কৌশলে বর নিল বলুন তো? একশ' ছেলে, বছরে একটা হলেও স্বামী তার অন্তত একশ' বছর বাঁচবে। ছেলের আর কিছু দরকার ছিল বলে তো মনে হয় না, দরকার যা ছিল তার সে ঠিক আদায় করে নিয়েছে। এমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকলে যদি সতী বলা চলে, তাহলে অবশ্য সাবিত্রী সতীই।

মিঃ—সান্যাল পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—বেহুলার কথাটাও বলুন একটু—

—ও আর বলে কাজ নেই। ও যখন দেখলো যে দেবতারা তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিতে পারে তখন সেখানে গিয়ে নাচ গান যা কিছু করা দরকার, করে স্বামীর জীবনটাকে ফিরিয়ে নিল, আধুনিক যেসব মেয়েকে চাঁদা আদায় করতে পাঠানো হয়, বেহুলা তাদের চেয়ে অনেক উঁচুদরের ককেট।

তপতীর প্রত্যেক কথা হাস্যোদ্রেক করিলেও তাহার চিন্তাশীলতা গভীরতা অন্যান্য সকলকে অভিভূত করিতেছিল, হাসিতে গিয়াও তাহারা ভাবিতেছিল, তপতীর চিন্তাধারা ভিন্ন খাতে বহিয়া চলে। আর তপতী ভাবিতেছিল, ভারতের চিরবরেণ্যা কয়জন মহামানবীর চরিত্রের যে সমালোচনা সে আজ করিতেছে, তাহা শুনিলে তাহার ঠাকুরদা হয়তো মূর্চ্ছা যাইতেন। তপতীর মনে বেশ একটা তীব্র সুরার আনন্দ অনুভূত হইতেছে। ঠাকুরদার মৃত আত্মা যদি কোথাও থাকেন তো শুনুন, তাঁহার নাতনী ঠাকুরদার চিন্তাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে!

মিঃ সান্যাল এবার বেশ জোরে হাসিয়া কহিলেন,—আপনার অভিধানে তাহলে সতী কথাটা নেই, কেমন?

—থাকবে না কেন? 'সৎ' কথাটার স্ত্রীলিঙ্গ 'সতী'! কিন্তু সৎ কাকে বলে তা বুঝতে হলে অভিধান দরকার। ঠাকুরদা বলতেন সৎ চিরস্থায়ী আর অপরিবর্তনীয়, কিন্তু এরকম কোন কিছু আমি তো খুঁজে পাইনে। ভগবান যদিবা থাকেন তো তিনি দেশ-কাল-পাত্র হিসেবে পরিবর্তিত হন, অর্থাৎ তিনি নেই, আছে মানুষের কল্পনা যার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী!

—ভগবান না থাকাই ভালো, অনেক হাঙ্গামা চুকে যায়। আর থেকেই বা উনি কি করছেন আমাদের?—কথাটা বলিয়াই মিঃ ব্যানার্জি টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

—তাঁর থাকার ভয়ানক দরকার, নইলে মানুষ তার হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তিগুলো দেবে কাকে? চৈতন্যের মতন খোল-বাজিয়ে দিনরাত কান্নাকাটি কেবল ঐ নির্বিকার ভগবান সইতে পারেন। ঐ তাণ্ডব কোন মানুষের উপর চালালে সেও যে নির্বিকার পাথর বনে যাবে। তপতীর কথায় আবার সকলে হাসিয়া উঠল।

অকস্মাৎ তপতীর ঠাকুরদার হাতে-গড়া মন চীৎকার করিয়া উঠিল : এ সত্য নয়,

তপতী আত্মবঞ্চনা করিতেছে। নিজেকে সংশোধন করিবার জন্যই যেন সে বলিয়া উঠিল,—ঐ নির্বিকার ভগবান আছে, ও থাক্—ওকে মানুষের বড় দরকার। যে কথা নিজের কাছেও বলতে মানুষ কুণ্ঠিত হয়, সে কথাও ওর কাছে বলে খানিকটা হাল্কা হওয়া যায়। জীবনে এমন দুঃসময় আসে, যখন একটা অচেতন কিছুকে চেতন ভেবে নিজের সুখ দুঃখের কথা বলতে ভাল লাগে, ভালো লাগে নিজের আরোপিত স্নেহকেই তার কাছ থেকে ফিরে পেতে। নিজের ক্ষুদ্রতাকে মানুষ নিজের কল্পনায় বিশালতার মধ্যে অনুভব করতে চায়!—তপতী কথাগুলো বলিয়া যেন দম লইতেছে।

—তা হলে ভগবানকে মেনে নিলেন আপনি?—মিঃ ব্যানার্জি পুনঃ প্রশ্ন করিলেন।

—মানা মা-মানায় ওঁর কিছু এসে যায় না, ওঁকে দরকার হলে ডাকবো, না-হলে ডাকবার দরকার নেই, এমন সুবিধার জিনিস না ত্যাগ করাই বুদ্ধির কাজ। চলুন এখন সব গোছগাছ করে নিতে হবে।

তপতী উঠিল এবং বাধ্য হইয়া অন্য সকলেও উঠিল।

পরদিন বিকালের ট্রেনে তপতীদের দল মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যাল কর্তৃক পরিচালিত হইয়া যথাসময়ে হাওড়ায় পৌঁছিয়া রিজার্ভ ফার্স্ট ক্লাসের দুইটি কক্ষে স্থান গ্রহণ করিল। ট্রেন প্রায় ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় তপন একজন কুলির মাথায় সুটকেশ ও বেডিং লইয়া তপতীদের কামরার সামনে দিয়া চলিয়া গেল।

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—তপনবাবুও যাচ্ছে নাকি?

তপতী লক্ষ্য করে নাই ; মিঃ ব্যানার্জির কথায় চাহিয়া দেখিল, তপন যে গাড়িতে উঠিতেছে, তাহার দরজাটায় একটা বড় অক্ষরের 'তিন' নম্বর।

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—কি রকম! থার্ড ক্লাশে যাচ্ছে যে?

তপতী চুপ করিয়া রহিল। বিস্ময় ও লজ্জায় তাহার মাথা নীচু হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া সে মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যালকে কহিল,—ও যে আমাদের কেউ, একথা যেন এখানে আর কেউ না শোনে, বুঝলেন! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

মিঃ ব্যানার্জি বলিলেন,—আমরা এত নির্বোধ নই, মিস্ চ্যাটার্জি? কিন্তু লোকটা কী ধড়িবাজ। আপনার বাবার কাছে নিশ্চয় ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া ও আদায় করেছে,—টাকাটা জমিয়ে নিল।

ইহা ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে। বাবা নিশ্চয় জামাইকে থার্ড ক্লাসে পাঠাইবেন না। কোটিপতি লোকের জামাই তপন থার্ড ক্লাসে যাইতেছে, শুনিলে লোকে কী ভাবিবে! রাগে দুঃখে তপতীর কান্না পাইতে লাগিল। স্থির করিল ফিরিয়া বাবাকে বলিয়া ইহার প্রতিকার সে করিবেই। তখনকার মতো তপতী বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিল, কিন্তু মনের ভিতর যেন একটা আগ্নেয়গিরি ফাটিয়া গিয়াছে। তাহার ধূমায়িত শিখায় তপতীর চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে। ঐ লোকটার সীমাহীন অর্থলোলুপতা তপতীর পিতাকে পর্যন্ত অপদস্থ করিতেছে। ধনীর দুলালী আভিজাত্য গৌরবে গরবিণী তপতী ভাবিতেই পারে না, থার্ড ক্লাসে যাইতেছে তাহার স্বামী—তাহারই পিতার যাবতীয় সম্পত্তির মালিক!

নির্বাক তপতীর মনের ভাব বুঝিয়া মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,

—আর দেরী করায় লাভ কি মিস্ চ্যাটার্জি? আপনার বাবাকে বলে ওকে তাড়িয়ে দিন বাড়ি থেকে!

—হুঁ—

—আপনার মত মেয়েকে পাওয়া যে-কোন উচ্চ শিক্ষিত যুবকের অহঙ্কারের বিষয়।

—হুঁ—

—অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদের দলিলটা রেজিষ্টারী করিয়ে নিতে হবে তার আগে! তপতী এবারও একটা হুঁ দিয়া অন্য দিকে সরিয়া জানালায় মুখ বাড়াইল।

নিখিল-ভারত-সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় খেয়াল গানে প্রথম পুরস্কার পাওয়ার আনন্দ লাভ করিতে গিয়া তপতীর মন বিষাদে পূর্ণ লইয়া গেল। এই গান তাহার শুনিবে কে? কার জন্য তপতীর এই সাধনা! সে কি ঐ নিতান্ত অপদার্থ একটা গণ্ডমূর্খের জন্য? তপতীর বিষবাষ্প তপনকে এই মুহূর্তে দগ্ধ করিয়া দিতে চায়! যেন মিঃ ব্যানার্জি এবং মিঃ সান্যাল তপতীর মনের গতি সর্ব্বদা লক্ষ্য কবিতেছেন।

তাহাদের কাজ হাসিল করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট সুযোগ। তপতীর নিকট আসিয়া কহিলেন,

—চলুন একটু বেড়িয়ে আসা যাক্—হুমায়ুনের কবর দেখে আসি গে!

তপতী আপত্তি করিল না। একটু বাহিরে গিয়া আপনার চিত্তবেগ প্রশমিত করিতে তাহারও ইচ্ছা জাগিতেছিল। ট্যাক্সি চড়িয়া সকলে যাত্রা করিল। পৃথ্বীরাজ রোডের উপর দিয়া গাড়ি চলিয়াছে। দুইপাশে ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি তাহার উপর বাব্‌লা বন,—যেন সুদূর অতীতের পথ ধরিয়া চলিয়াছে তাহার পৃথ্বীরাজরেই রাজত্বে!

তপতী হঠাৎ কহিল,—সংযুক্তার কথা মনে পড়ছে। যোগ্য স্বামীকে পাবার জন্য বাপ-মাকে ছাড়তে সে দ্বিধা করেনি—অদ্ভুত মেয়ে।

মিঃ ব্যানার্জি তাহাকে উস্কাইবার জন্য কহিলেন,—আপনার মনের শক্তিও কিছু কম নয়। আজ দীর্ঘ সাতমাস আপনি মা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

তপতী একটা নিঃশ্বাস ছাড়িল তারপর ধীরে ধীরে কহিল,—যুদ্ধ এখনো করিনি মিঃ ব্যানার্জি এ কেবল সমরায়োজন চলছে। কিন্তু সংযুক্তার মতো ভাগ্য তো আমার নয়, আমার পৃথ্বীরাজ এখনো আসেননি!

মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যাল চকিত হইয়া উঠিতেছেন! তপতীর মনটাকে তাহারা আজো আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তবে! কে তবে উহাকে লাভ করিবে। এখনি সেটা জানিয়া লওয়া দরকার, বলিলেন,—আপনার পৃথ্বীরাজ কিভাবে আসবেন, বলতে পারেন মিস্ চ্যাটার্জি?

না! যেদিন আসবেন সেদিন বলতে পারবো! আজ শুধু জানি যারা এতদিন আসছেন তাঁরা কেউ-ই পৃথ্বীরাজ নন! তাঁদের মধ্যে অনেক ঘোরী আছেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজ নেই।

তপতীর ইঙ্গিত ব্যঙ্গের কাছে ঘেঁষিয়া মিঃ ব্যানার্জিদের পীড়িত করিতেছে। মিঃ ব্যানার্জি আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন কহিলেন,

—ঘোরীর হাতে পৃথ্বীরাজের পরাজয় ঘটেছিল, বীরত্ব তার কম ছিল না মিস্ চ্যাচার্জি?

দুর্ভাগা সংযুক্তার—বাবা তার জয়চন্দ্র আর সৌভাগ্য সংযুক্তার স্বামী তার মৃত্যুঞ্জয়ী। ঘোরীর বীরত্ব দেশজয় করতে সক্ষম, নারী হৃদয় নয়, কারণ নারী নিজে ছলনাময়ী বলে ছলনা কপটতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। নারী নিশ্চিত নির্ভরতায় তাকে বুকের পদ্মটিতে গন্ধ

হয়ে ফোটে যে-পুরুষ আপন পৌরুষ মহিমায় মৃত্যুপথকে উজ্জ্বল করে তুলবে ; চালাকিতে নয়, ছলনায় নয়, কপটতায় নয়। নারী নিজে সাংঘাতিক কপট তাই অন্যের কপটতা সহজে বুঝতে পারে।

—আপনি কি বলতে চান যে আমরা আপনার সঙ্গে কপটতা করি?

—হাঁ, তাই। তার প্রমাণ আপনার এই প্রশ্নটি। আপনি যদি অকপট হতেন তাহলে এ প্রশ্ন আপনার মনে আসতো না। আমি তো কোন ব্যক্তিগত কথার আলোচনা করিনি। আপনি নিজেই ধরা পড়লেন! তপতী হাসির বিদ্যুৎ হানিল।

মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যাল মুষড়াইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু মিঃ সান্যাল কানে কানে মিঃ ব্যানার্জিকে বলেন,—আধুনিক সাইকোলজি বলে : "মেয়েরা যাকে ভালোবাসে তাকেই ঐ রকম আক্রমণ করে ; অতএব ভাবনার কিছু নাই।"

কথাটা শুনিয়া মিঃ ব্যানার্জি প্রীত হইয়া কহিলেন, কপটকে কপটতা দিয়েই তো জয় করা যায়।

তপতী মধুর হাসিল, একটু থামিয়া বলিল,—জয়ীর লক্ষণ হচ্ছে বিজিতের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা—পারবেন তো?

—নিশ্চয়। বলুন কি আকাঙ্ক্ষা। মিঃ ব্যানার্জি সাগ্রহে চাহিলেন তপতীর দিকে!

—উপস্থিত যৎসামান্য। ঐ-যে লোকটা বসে আছে, পিছনের চুলগুলো ঠিক তপনবাবুর মতো, দেখে আসুন তো, ও সেই কি না? আপনাকে আশা করি চিনতে পারবে না।

—সম্ভব নয়—বলিয়া মিঃ ব্যানার্জি গাড়ী হইতে নামিয়া গেলেন। হুমায়ুনের কবরের নিকট এক টুকরো ঘাসে-ভরা জমির উপর তপন নিশ্চল-ভাবে বসিয়া ছিল। মিঃ ব্যানার্জি গিয়া দেখিলেন, এবং নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি বাঙালী দেখছি—

—হ্যাঁ—বলিয়া তপন তাহার মুখের পানে তাকাইল। মিঃ ব্যানার্জিদের সহিত তাহার পরিচয় নাই। ব্যানার্জি জিজ্ঞাসা করিলেন,—বেড়াতে এসেছেন বুঝি? ক'দিন থাকবেন? উত্তরে তপন জানাইল, তাহার কাজ শেষ হইয়াছে, কাল সে আগ্রা যাইবে পরশু বৃন্দাবনধাম দর্শন করিয়া পরদিন কলিকাতা ফিরিবে। মিঃ ব্যানার্জি হয়তো আরো কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু তপন উঠিয়া নমস্কার করিয়া অদূরে দণ্ডায়মান টাঙ্গায় চড়িয়া প্রস্থান করিল। মিঃ ব্যানার্জি ফিরিয়া তপতীকে সব কথা জানাইয়া শেষে কহিলেন,—ভদ্রলোক দেখলেই ও ভয় পায়।

—পায় হয়তো। চলুন ; কাল আমরাও আগ্রা যাই।

এভাবে কেন তপনের পিছনে ঘুরিয়া মরিবে, জিজ্ঞাসার উত্তরে তপতী জানাইল, উহার পিছনে একটু গোয়েন্দাগিরি করা দরকার, নতুবা বাবা-মাকে কি বলিয়া সে বুঝাইবে যে তপনকে বাড়িতে রাখা যায় না। আগ্রায় এবং বৃন্দাবনে সে কি করে জানিতে হইবে। এই সঙ্গে আগ্রা সহরটাও দেখা হইয়া যাইবে আর একবার!

পরদিন নিউ-দিল্লী স্টেশনে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় আসিয়া উঠিল তপতীদের দল। তপনকে তাহারা অনেক খুঁজিয়াও দেখিতে পাইল না। তপতী সেই দীর্ঘ পথ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—হয়তো তপন এ-গাড়ীতে আসে নাই, কিম্বা কোন থার্ডক্লাসের ভিড়ে লুকাইয়া গিয়াছে। যদি না আসে তবে তপতীদের পরিশ্রম বৃথা হইবে। তপতী জানিতে

চায়, এতদূরে আসিয়া ঐ অদ্ভুত লোকটা কী করিতেছে।

বেলা বারটায় গাড়ী আসিয়া থামিল। জিনিসপত্র গুছাইয়া সিসিল হোটেলের লোকদের সহিত গাড়ীতে উঠিতে গিয়া মিঃ ব্যানার্জি দেখাইলেন, একটা টাঙ্গায় সুটকেশ ও বেডিং হাতে তপন উঠিয়া চলিয়া গেল। হয়তো কম দামের কোন হোটেলে উঠিবে। এইভাবে পয়সা বাঁচাইতে গিয়া তপন যে তাহার সম্মানিত পিতার কতখানি অপমান করিতেছে তাহা ঐ ইডিয়ট্ বোঝে না। তপতীর সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল!

হোটেলে আসিয়া স্নানাহার সারিয়া সকলেই বলিল,—ফতেপুর সিক্রী, আগ্রা ফোর্ট, ইৎমাৎ-উদ্দৌলা ইত্যাদি দেখিতে যাইবে। তপতীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে অসুস্থতার ছুতা করিয়া হোটেলেই পড়িয়া রহিল। আগ্রা সে পূর্বে দুইবার দেখিয়াছে। অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইবার পর তপতী ভাবিতে বসিল তাহার জীবনের অপরিসীম ব্যর্থতার ইতিহাস। তপনকে ভালবাসিবার আকাঙ্ক্ষা সে তাহার মনের অলিগলিতে ঘুরিয়াও কুড়াইয়া পাইল না। ঐ লোকটার উপর বিতৃষ্ণাই কেবল জাগিয়া উঠে এবং বিতৃষ্ণার কথা ভাবিতে গিয়া ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়। উহার হাত হইতে উদ্ধার লাভের কি কোন উপায় নাই। সারাদিন চিন্তার পর ক্লান্ত তপতীর মনে হইল, প্রেমের শ্রেষ্ঠ তীর্থ তাজমহলটা একবার দেখিয়া আসিবে! হোটেলের গাড়ী আনাইয়া তপতী উঠিয়া বসিল।

আশ্চর্য! তাজমহলের সম্মুখে ঝাউবীথি-বেষ্টিত প্রকাণ্ড চত্বরে বসিয়া আছে তপন—দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত। তাজের শুভ্র মর্ম্মরমূর্তিকে যেন সে ধ্যান করিতেছে। তপনের পিছন দিকটা তপতী ভালভাবেই চিনিত—ঘাড়ের পাশেই সেই কালো তিলটি, লম্বা গভীর কালো কোঁকড়ানো চুল লতাইয়া পড়িয়াছে যেখানে। সামনে গেলে পাছে তপতীকে দেখিয়া তপন চলিয়া যায়, এই ভয়ে তপতী পাশ্চাতেই অপেক্ষা করিতে লাগিল।...সন্ধ্যা হইতেছে। আষাঢ় পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় বিরহী সম্রাটের প্রেমদ্যুতি যেন ভাষা লাভ করিতেছে!

তপন উঠিয়া তাজমহলের মধ্যে আসিল। তপতী তাহার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। জনতার মধ্যে কে কোথায় কি উদ্দেশ্যে চলিতেছে তপন লক্ষ্যমাত্র করিল না। সম্রাট সম্রাজ্ঞীর সমাধিপার্শ্বে আসিয়া সে হাতের ফুলগুলি অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া আবৃত্তি করিল :

"হে সম্রাট কবি, এই তব জীবনের ছবি—
এই তব নব মেঘদূত, অপূর্ব্ব—অদ্ভুত,
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া—
'ভুলি নাই—ভুলি নাই—ভুলি নাই প্রিয়া'..."

তপতীর বিস্ময় সীমাতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই তপন! সত্যই তপন তো? কিম্বা তপতী অন্য কাহাকেও তপন ভাবিয়াছে। না, তপতীর ভুল হয় নাই। ও-যে তপন, তাহার পরিচয় রহিয়াছে উহার পোষাকে। ঐ পোষাকে সে দিল্লীতেও পরিয়াছিল—ঐ রং—ঐরকম কোট।

তপন প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিল। তপতী পিছনে পিছনে আসিয়াছে বরাবর। তাজমহলের সুবিস্তৃত আঙ্গিনা পার হইয়া তপন বাহিরের গাড়ী থামিবার জায়গায় আসিল। তাহার টাঙ্গাওয়ালা কহিল,—আইয়ে!

তপতী ত্বরিতে তপনের নিকট আসিয়া বলিল,

—আমায় একটু পৌঁছে দেবেন?

তপন এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া বলিল,

—একা এসেছেন? চলুন, কোথায় যাবেন?

—সিসিল হোটেল—বলিয়া তপতী চাহিল জ্যোৎস্নালোক-দীপ্ত তপনের মুখের পানে। ভাল দেখা যায় না, তথাপি তপতীর মনে হইল—এমন সুন্দর সে আর দেখে নাই! টাঙ্গার সামনেকার আসনে তপতী উঠিয়া বসিল, তপন বসিল পিছনে!

—এদিকে আসুন!—তপতী অনুরোধ করিল তপনকে তাহার পাশে বসিতে।

—থাক্—আমি বেশ আছি—বলিয়া তপন আদেশ করিল গাড়ী চালাইতে।

—কেন? এখানে আসবেন না?—তপতীর কণ্ঠে অজস্র বিস্ময়!

—মাফ করবেন, আমি অনাত্মীয়া মেয়েদের পাশে বসি নে—তপনের কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

—অনাত্মীয়া! আমি আপনার অনাত্মীয়া নাকি? এই, রোখো!—তপতী কঠোর আদেশ করিল চালককে।

রাগে তপতীর আপাদমস্তক ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিয়াছে। লাফ দিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া সক্রোধে কহিল,—আমিও অনাত্মীয় পুরুষের গাড়ীতে চড়ি না—বলিয়াই অপেক্ষামাত্র না করিয়া তপতী হোটেলের গাড়ীতে চড়িয়া প্রস্থান করিল।

ব্যাপারটা কি ঘটিল, কেন উনি এভাবে চলিয়া গেলেন—তপন কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বিব্রতভাবে চাহিল। কোন নারীর মুখের পানে সে পারতপক্ষে তাকায় না। ইহাকেও চাহিয়া দেখে নাই। একক কোনো মহিলা পৌঁছাইয়া দিতে বলিতেছেন, তপনের অন্তরের কাছে ইহাই যথেষ্ট আবেদন। সমস্ত ব্যাপারটা তপনের দুর্জ্ঞেয় বোধ হইতেছে।

গাড়ীতে উঠিয়া উত্তেজনার আতিশয্যে তপতী কয়েক মুহূর্ত প্রায় কোন চিন্তাই করিতে পারিল না। তাহার মনে হইতেছিল, তপন তাহাকে এত বেশী অসম্মান করিয়াছে যাহা পৃথিবীর কোন মেয়েকে কোন পুরুষ কখনও করে নাই। কিন্তু সন্ধ্যার শীতল বায়ুর স্পর্শে এবং তপনের সুন্দর মুখের মোহমদিরার যাদু-মহিমায় তপতী যেন কিছুটা কোমল হইয়া গেল। তাহাব মনে পড়িল—তপতী যে এখানে আসিয়াছে ইহা তপন তো জানে না। অনাত্মীয়া মনে করা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আজ দীর্ঘ সাত মাস তপন একই বাড়িতে তপতীর সহিত বাস করিতেছে, এতকালেও কি সে তাহাকে চেনে নাই? নিজে তপন মুখ ফিরাইয়া থাকে, চোখে ঠুলি পরে, তথাপি তপতীর তাহাকে চিনিতে ভুল হইল না ; আর তপন তাহাকে অত কাছে দেখিয়াও চিনিল না। তপন নিশ্চয়ই তাহাকে ঠকাইয়াছে। এইভাবে তপতীকে অপমানিত করিয়া সে তপতীর অপমানের শোধ লইল। কিন্তু তাহার ব্যবহারে তো সেরূপ মনে হইল না!

এই মুহূর্তে তপতীর মনে প্রশ্ন জাগিল, তপন তাহাকে 'অনাত্মীয়' বলায় সে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিম্বা অপমানিত বোধ করিতেছে। তপতীর পিতার অন্নদাস একটা দরিদ্র ভিক্ষুক—তপতীর আত্মীয়তাকে অস্বীকার করিবার শক্তি তপন পাইবে কোথায়? কোন্ সাহসে? বিবাহের বন্ধনগ্রন্থী আধুনিক কালে এমন কিছুই জটিল নয়, যাহা খুলিতে তপতীর খুব বেশী আটকাইতে পারে। কিন্তু কেন তবে লোকটা তপতীকে অপমান করিল? সে কি সত্যই তবে তপতীকে চেনে নাই? না চেনাই সম্ভব। এমন অস্থিরভাবে গাড়ী হইতে না নামিয়া আসিলেই ভাল হইত। বলিল যে, অনাত্মীয়া মেয়ের পাশে বসে না। আচ্ছা পরীক্ষা

করিতে হইবে। অনাত্মীয়া মেয়ে বসিতে আহ্বান করিলেও বসিবে না, এমন সুদুঃসহ গোঁড়ামির মূল কোথায় তপতী তাহা দেখিয়া লইবে!

হোটেলে আসিয়াই তপতী আবদার ধরিল, কাল বৃন্দাবন যাইবে। তপতীর অনুরোধ আদেশেরই নামান্তর। সকলে হোটেলের দুইখানা 'কার' লইয়া সকলে বৃন্দাবন যাত্রা করিল। সেই বৃন্দাবন, যেখানে বংশীরবে যমুনা বহিত উজান ; বাঁধনহারা ব্রজগোপিগণ ছুটিয়া আসিত কোন অন্তর প্রেমসাগরে আত্মবিসর্জন করিতে—কালো কৃষ্ণ যেখানে কালাতীত হইয়াছে, প্রেমের আলোয়। সারাদিন, শ্যামকুঞ্জ, রাধাকুঞ্জ দর্শনে কাটিল। গৌরাঙ্গ কোনো পুরুষ দেখলেই তপতীর মনে হয়, ঐ বুঝি তপন! কিন্তু পরক্ষেণেই ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। তপনকে কোথাও দেখা যাইতেছে না! তবে কি সে আসে নাই! তপতীকে অপমান করিয়া ফিরিয়া গেল নাকি? তপতী চতুর্দিকে অন্বেষণ করে। মিঃ ব্যানার্জি এবং মিঃ সান্যালও তপনকে খুঁজিতেছেন। তাঁহাদের মনে একটা আশা জাগিতেছে, তপনকে কোনো একটা বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে দেখাইয়া দিতে পারিলেই তপতীর অন্তর হইতে তাহাকে চিরনির্বাসিত করা যাইবে। কোন একটা ব্রজাঙ্গনার সঙ্গে যদি তপনকে দেখা যায় তবে এখনই প্রমাণ হইয়া যায় যে তপন শুধু অর্থলোভীই নয়, অসচ্চরিত্রও। তপনকে না তাড়াইতে পারিলে তাহারা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বহুস্থান ঘুরিয়া সকলেই প্রায় ক্লান্ত হইয়া বাসায় ফিরিতেছে,—একটা স্থানে কতকগুলি লোক জটলা করিতেছে দেখিয়া তপতীর দল গাড়ী থামাইল। এক বাঙালী ভদ্রলোক একটি পাখি কিনিতে চান ; তিনি কহিলেন,—'আমি দু'টাকা দেবো' তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে যে উত্তর দিল সবিস্ময়ে চাহিয়া তপতীর দল দেখিল, সে তপন ;—বলিল, 'আমি চার টাকা দিচ্ছি'। তপনের পরিহিত পোশাক ধূলিমলিন, গায়ে এত ধূলা লাগিয়াছে যে প্রায় চেনা যায় না। সারাদিন রোদে ঘুরিয়া মুখকান্তি মলিন এবং অসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে. ঐ ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখশ্রীকে তাহার অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছিল! তপন বলিল,—'দাও পাখিটা।' সে চারটা টাকা দিয়া পাখিওয়ালার নিকট হইতে পাখিটা লইল। একটু বয়স্ক হইলেও ভারী সুন্দর রং পাখিটার। ধরা পড়িয়া মুক্তির জন্য পাখিটা করুণভাবে কাঁদিতেছে আর ডানা ঝাপটাইতেছে। তপতীর ইচ্ছা করিতেছিল, তপনের হাত হইতে সে এখনি উহা লইয়া আসে, কিন্তু সঙ্গীদের মধ্যে মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যাল ছাড়া কেহই তপনকে চেনে না। তাহারা কি ভাবিবে। তারপর ঐ নিতান্ত কদর্য্য পোশাক-পরিহিত দরিদ্রমূর্তিকে তপতী স্বামী বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে না। সে থামিয়া গেল।

প্রথমে যে ভদ্রলোক পাখিটি কিনিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি শুষ্কমুখে কহিলেন,—অতবড় বুড়ো পাখি, পোষ মানবে না মনে হচ্ছে—

—ঠিক মানবে। এই দেখুন না—বলিয়া তপন পাখিটাকে মুক্ত আকাশে উড়াইয়া দিয়া হাসিয়া কহিল,—মুক্তির মধ্যেই প্রেমের বন্ধন দৃঢ়তর হয়।

—করলেন কি মশাই! বলিয়া একজন চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

—ওকে ভালবাসি কিনা, তাই মুক্তি দিলাম—বলিয়াই তপন চলিয়া গেল।

চোখের জল লুকাইবার জন্য তপতী তখন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াছে। মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—আমাদের দেখে কি-রকম অভিনয়টা করলো।

জলভরা চোখে তপতীর রোষবহ্নি গর্জিয়া উঠিল,—থামুন! যথাযোগ্য স্থানে

যথাযোগ্য কথার ব্যবহারের যোগ্যতা পৃথিবীতে কম অভিনেতারই থাকে! ও যদি অভিনেতা হয় তো, আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি—ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

গাড়ীস্থ সকলেই একমুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল তপতীর কথা শুনিয়া।

তপতীর সারা অন্তরখানি স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে ছাইয়া গেছে। গাড়ীতে সারা পথ সে বিশেষ কিছু কথা বলে নাই, সর্বক্ষণ তপনের কথা ভাবিয়াছে আর বিস্মিত হইয়াছে। যে মানুষ অর্থ বাঁচাইবার জন্য থার্ড-ক্লাসে দূর পথের যাত্রী হয়, মুটে খরচের ভয়ে স্বয়ং বাক্স-বিছানা বহন করে ; পোষাকের কদর্য্যতায় পর্যন্ত যাহার কৃপণতা পরিস্ফুট—সেই কিনা দুই টাকার পাখি চার টাকা দিয়া কিনিয়া আকাশে উড়াইয়া দেয়, আবার বলে 'ওকে ভালবাসি, তাই উড়াইয়া দিলাম'। ইহা অপেক্ষা মানবতার প্রকৃষ্টতম পরিচয় আর কি হইতে পারে? মিঃ ব্যানার্জি বলেন, উহা তপনের অভিনয়। হউক উহা অভিনয়, তথাপি আজ প্রেমের শ্রেষ্ঠতম তীর্থ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেমের যে নবীনতম বাণী তপনের মুখে শুনিয়াছে, তাহা তপতীর জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারিবে। আর অভিনয়ইবা হইবে কেন? তপন তো জানিত না তাহারা ওখানে দাঁড়াইয়া আছে। তপতী স্থির করিল, তপনকে লইয়া সে একবার অভিনয় করিবে। প্রেমের অভিনয়।

পরদিন বিকালে হাওড়ায় গাড়ী থামিলে তপতী নিজের গাড়ীতে চড়িয়া বাড়ি ফিরিল! মা তাহাকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন,—তপন নামেনি খুকী? ওরও তো নামবার কথা এই ট্রেনে।

—নেমেছে, আমি দেখা না করে চলে এসেছি! ও আসছে ঘোড়ার গাড়ীতে, আমার যাওয়ার কথা ওকে বলোনো মা—তুমি বরং ওকে জিজ্ঞাসা করো থার্ড-ক্লাসে কেন ও যায়?

তপতী স্নান করিতে চলিয়া গেল। স্নানাদি সেরে সে আবার আসিয়া বসিল এমন স্থানে যেখান হইতে মা'র সহিত তপনের কথা শুনা যাইতে পারে।

তপন ফিরিয়া আসিল একটা ফিটনে। 'মা' বলিয়া ডাকিতেই মা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তপনের মূর্তি দেখিয়া দুঃখে তাঁহার অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে। আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন,—কী চেহারাই করেছ বাবা। মাথায় এত ধূলো যে ধান চাষ করা চলে—

সুমিষ্ট হাসিতে ঘরখানা পূর্ণ হইয়া গেল। তপনের হাসির আওয়াজ যে এত মিষ্টি তপতী তাহা কোনদিন জানে না। তপন কহিল,—মাথাটা তাহলে ধান চাষের যোগ্য হয়েছে মা! ধানের জমি সব থেকে দামী।

মা আরো ব্যথিত হইয়া কহিলেন,—রাখো বাবা, তোমার হাসি দেখে আমার রাগ বাড়ছে। থার্ড-ক্লাসে কেন তুমি যাবে, বলো তো?

কোটটা খুলিয়া কামিজের বোতাম খুলিতে খুলিতে তপন জবাব দিল,—কেন মা থার্ড-ক্লাসে তো মানুষই যায়—গরু ছাগল তো যায় না!

মা এবার হাসিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন,—কিন্তু ফার্ষ্ট ক্লাসেও যায় মানুষ—

—সে বড় মানুষ। আপনার ছেলে তো বড়মানুষ নয়, মা! গরীব ছেলে আপনার—

—না বাবা, না। ওরকম করো না তুমি। মা'র মনে দুঃখ দিতে নাই, জান তো?

—দুঃখ কেন পাবেন, মা? আপনার সক্ষম ছেলে যে-কোনো অবস্থায় নিজেকে চালিয়ে নিতে পারে—এ তো আপনার সুখেরই কারণ হওয়া উচিত?

কিন্তু আমাদের ক্ষমতা যখন আছে, বাবা—তখন ফার্ষ্ট-ক্লাসেই—

বাধা দিয়া তপন বলিল,—ক্ষমতার সংযত ব্যবহারটাই মানুষের শিক্ষণীয় বিষয় মা। এতেই তার মহিমা বাড়ে! মানুষের অক্ষমতাকে ভেংচিয়ে ক্ষমতার জাহির নাই-বা করলাম?

তপন স্নানাগারে ঢুকিল। মা তপনের কথা কয়টি আপনার মনে পুনরাবৃত্তি করিয়া বাহিরে আসিলেন। তপতী বিহ্বল দৃষ্টিতে মাঠের পানে তাকাইয়া আছে। সস্নেহে মা ডাকিলেন,—আয় খুকী, খেয়ে নে কিছু।

—আসছি—বলিয়া তপতী আপনার ঘরে চলিয়া গেল। তপনের কথা বলার আশ্চর্য্য ভাঙ্গিটি আজ তপতীকে যেন ভাঙ্গিয়া গড়িতেছে। এই সুকুমার দর্শন যুবকটি মূর্খ, উহাকে তপতী উৎপীড়িত করিয়াছে, অপমানিত করিয়াছে,—অতিষ্ঠ করিয়াছে,—তথাপি সে যায় নাই! কিন্তু কেন যায় নাই, সে-কথা ভাবিতে গিয়াই তপতী আর একবার শিহরিয়া উঠিল। সত্যই কি তপন অর্থলোভী? সত্যই কি সে তপতীর জন্য এত অত্যাচার সহ্য করে নাই, তুচ্ছ অর্থের জন্যই করিয়াছে? ভাবিতে ভাবিতে তপতীর অন্তর ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। হে ঈশ্বর! যদি তপতী কখনও তোমায় ডাকিয়া থাকে, তবে বলিয়া দাও তপতীর জন্যই তপন এত অপমান নীরবে সহ্য করিয়াছে। এইটাই যেন সত্য হয় তপতী তাহার জীবনে আর কিছুই তোমার নিকট চাহিবে না।

মায়ের দ্বিতীয় ডাকে ক্লান্ত তপতী যখন খাইতে আসিল, তখনও তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া রহিয়াছে। মা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,—কি হল রে, মা! কাঁদছিস?

অনেক তীর্থ ঘুরে এলাম মা, ঠাকুরদার সঙ্গে সেই গিয়েছিলাম। আজ তিনি নাই—বলিতে বলিতে তপতী অজস্র ধারায় কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। বি এ. পড়া শিক্ষিত মেয়ের এরূপ অসাধারণ দুর্ব্বলতা দেখিয়া মা বিস্মিত হইলেন, কিন্তু আনন্দিত হইলেন ততোধিক। তপতী আবার তাঁহার পূর্বের তপতীর মতোই হইয়া উঠিতেছে? চোখের জলে মানুষের মনের ময়লা ধুইয়া যায়—তপতী আবার সুন্দর হইয়া উঠুক, তাহার তপতী নাম সার্থক হোক!

মায়ের কল্যাণাশীষের স্পর্শে তপতীর অন্তর সেদিন জুড়াইয়া গেল।

পরদিন সকালেই তপতী আয়োজন করিল বন্ধুদিগকে ভোজ দিবার। বি. এ. পরীক্ষায় সে পাশ করিয়াছে, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাইয়াছে, এবং সর্বোপরি যাহা সে লাভ করিয়াছে—তাহা তপনের সঠিক পরিচয়! এমন দিনে সে খাওয়াইবে না তো কবে খাওয়াইবে? তপতী টেলিফোনে সকলকে নিমন্ত্রণ করিল এবং মাকে বলিল,—ওকে বলে দিয়ো মা, সবার সঙ্গে বসে যেন আজ খায়—

মা হাসিয়া কহিলেন—নিজে বলতে পারিস্ নে খুকু? কি লাজুক মেয়ে তুই!

—না মা, ও ছুতো করে এড়িয়ে যায়—জানো তো, কি রকম দুষ্টু!

তপতী চলিয়া গেল। মার কাছে তপনের সম্বন্ধে দুষ্টুমির আরোপ তাহাকে লজ্জিতই করিয়াছে। তাহার নারী-হৃদয় ঐ কথাটুকু বলিয়াই যে এত তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, তপতী তাহা কখনও ভাবে নাই। হউক লজ্জা, তথাপি তপতীর আনন্দ যেন মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে!

নির্দিষ্ট সময়ে সকলেই আসিল—আসিল না শুধু তপন। তপতীর প্রশ্নের উত্তরে মা বলিলেন,—সাড়ে পাঁচটার আগে সে তো ফেরে না—ঠিক সময়েই ফিরবে।

নিরুপায় তপতী অন্যান্য সকলকে খাইতে দিল। সাড়ে পাঁচটায় তপন আসিতেই মা তাহাকে সকলের সঙ্গে বসাইয়া দিলেন। তপতী স্বহস্তে পরিবেশন করিল চপ-কাট্‌লেট্ ইত্যাদি।

নিরুপায়ভাবে কিছুক্ষণ খাদ্যগুলির দিকে চাহিয়া থাকিয়া তপন কহিল মাংস খেতে আমি ভালবাসিনে—আমায় একটু রুটি-মাখন দিলে ভাল হয়—

মা বলিলেন.—একটু খাও বাবা, রুটি মাখন আজ নাই-বা খেলে? তুমি তো বৌদ্ধ নও যে অহিংস হচ্ছ।

তপন হাসিয়া বলিল,—মাংস না খেলেই অহিংস হয় না, মাংস তো খাদ্যই। ও খাওয়ায় হিংসাও হয় না। তবে আমার প্রয়োজনাভাব।

মিঃ ব্যানার্জি তপনকে আক্রমণের জন্যে যেন ওৎ পাতিয়া ছিলেন, কহিলেন,—চপ-কাটলেট-ডিম খাওয়া কাঁটা-চামচেতে খাওয়া আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ একটা—তপন চুপ করিয়া রহিল। উত্তর না পাইলে মিঃ ব্যানার্জি অপমান বোধ করিবেন ভাবিয়া মা বলিলেন.—ওর কথাটির জবাব দাও তো বাবা!

হাসিয়া তপন বলিল,—'সভ্যতা' কথাটা আপেক্ষিক, মা। বিলাতের লোক আমাদের অসভ্য বলে, আমরা আবার আমাদের থেকে অসভ্য বাছাই করে নিজের সভ্যতা প্রমাণ করতে চাই। দেশ আর পাত্র এবং রুচি ভেদে ওর পরিবর্তন হয়।

তপতী এতক্ষণ পরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, মানুষকে যুগোপযোগী হতে হবে—তপন নির্লিপ্তের মতো বলিল—এটাও অপেক্ষিক শব্দ। আমার সমাজে এই যুগেই আমি বেশ উপযোগী আছি, আবার সাঁওতালরা তাদের সমাজে এই বিংশ-শতাব্দীতেই বেশ উপযোগী রয়েছে!

কিন্তু আপনি তো এসে পড়েছেন আমাদের সমাজে? মিঃ অধিকারী ব্যঙ্গের সুরে কহিলেন।

—আপনাদের সঙ্গে আমার পবিচয় আজই প্রথম, এর মধ্যে আপনাদের সমাজে এসে পড়লুম কেমন করে, বুঝলুম না তো?—তপন প্রশ্নসূচক ভঙ্গীতে চাহিল।

তপতীকে বিয়ে করে।—রেবা উত্তর দিল হাসির মাধুর্য্য দিয়া।

তপন কয়েক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া কহিল,—আমার ধারণা ছিল—বিয়ে করে মানুষ তার নিজের সমাজেই স্ত্রীকে নিয়ে যায়। আপনাদের বুঝি উল্টা হয় জানতুম না তো!

এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি তপতীকে স্পর্শ করিল গভীরভাবে। জেলিমাখা রুটিটা তপনের দিকে আগাইয়া দিতে-দিতে সে কহিল,—সব স্ত্রী যদি সে সমাজে না মিশতে পারে? না সইতে পারে সে সমাজকে?

তপন নিঃশব্দে কাপের চা-টুকু পান করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল,—সে তবে স্ত্রী নয়, সহধর্মিণী নয়—সে শুধু বিলাস সঙ্গিনী। সব স্বামীরও তাকে সইবার ক্ষমতা না থাকতে পারে।

—তপন চলিয়া গেল সকলকে নমস্কার জানাইয়া। চির অসহিষ্ণু তপতী শান্তস্নিগ্ধ

ঔদার্য্যে চাহিয়া রহিল তপনের গমন পথের পানে—দৃষ্টিতে তাহার কোন সুদূর অতীত যুগের উজ্জ্বলতা ছড়ানো।

অতিথিদের সকলেই চলিয়া যাইবার পরেও রহিল রেবা, মিঃ ব্যানার্জি, মিঃ অধিকারী, মিঃ সান্যাল। তপতী উঠি উঠি করিতেছে, ভদ্রতার খাতিরে পারিতেছে না। মিঃ ব্যানার্জি এবং অন্যরা যাহারা এতদিন তপনকে পাড়াগেঁয়ে গণ্ড মূর্খ বর্বর ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল, তাহারা আজ নিঃসংশয়ে বুঝিল, তপন মূর্খ তো নহেই, উপরন্তু উহার কথা বলার কায়দা অসাধারণ। উহারা বেশ বুঝিল—তপতী মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। 'কর্ণের' শেষ অস্ত্র ত্যাগের মতো মিঃ ব্যানার্জি বলিয়া উঠিল,—পাঁচালি ছড়া পড়লেও অনেক কিছু শেখা যায়, দেখছি!

মিঃ অধিকারী তাহাকে সমর্থন করিয়া বলিল,—গোঁড়ামি দিয়েও আধুনিকদের বশ করা যায় দেখা যাচ্ছে!

রেবা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল—সুযোগ বুঝিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—বশ কাকে হতে দেখলেন আপনারা? কথাটার নূতনত্ব আমাদিগকে একটু চমকে দিয়েছে মাত্র। ভেবে দেখতে গেলে, তপনবাবু সেই প্রাচীন কুসংস্কারের জগদ্দল পাথরটাই তপতীর ঘাড়ে বসাতে চান, বোঝা যাচ্ছে! অর্থাৎ উনি চান, তপতী তার সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-দীক্ষা সব বিসর্জন দিয়ে ওর সঙ্গে সেই ঘোমটা-টানা বৌ হয়ে থাক্। যত অনাসৃষ্টি কাণ্ড লোকটার।

মিঃ সান্যাল কহিল,—নিশ্চয়ই তাই, নইলে ঐ সহধর্মিণী হওয়া কথাটা তুলবে কেন? সহধর্মিণীর যুগ আর নেই বাপু সখীত্বের যুগ চলছে—

উহারা যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। তপতী কোন কথাই বলিল না, যদিও রেবার কথাগুলি তাহার বুকে গভীর আলোড়ন তুলিয়াছে। সকলে চলিয়া যাওয়ার পরেও তপতী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—সমাজ-সংস্কার ছাড়িলে তো তাহার চলিবে না, তপনকে লইয়া কি সে বনে গিয়া বাস করিবে? তপন যদি আমাদের সমাজে না মিশতে পারে তবে তো তপতীর পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপদের কথা! তপতী প্ল্যান আঁটিয়া রাখিল আগামী পরশু তাহার সহপাঠিনী টুকুর বিবাহে তপনকে সঙ্গে লইয়া সে বরাহনগর যাইবে। তপনকে তাহাদের সমাজের যোগ্য করিয়া লইতেই হইবে, নতুবা তপতীর উপায় নাই।

নির্দিষ্ট দিনে দুপুর বেলা তপন খাইতে আসিতেই মা বলিলেন,—আজ খুকীর এক বন্ধুর বিয়ে বাবা, ওর সঙ্গে তোমায় যেতে হবে সন্ধ্যেবেলা বুঝলে?

তপন ভাতের গ্রাসটা গিলিয়া কহিল,—আমি নাই-বা গেলাম মা! আমার যে অন্যত্র কাজ রয়েছে। আগে বললে সময় করে রাখতাম আমি।

—সে কাজ পরে করো, বাবা! মা সস্নেহে আদেশ করিলেন—

—তা হয় না, মা আমি কথা দিয়েছি—আমার কথা আমি রাখবোই। একটা উপহার আমি এনে দেবো, আপনার খুকীর সেটা নিয়ে গেলেই হবে। আমার না যাওয়ায় ক্ষতি হবে না!

তপতী আড়ালেই ছিল।—তপন যাওয়াটা এড়াইয়া যাইতেছে দেখিয়া সম্মুখে আসিয়া বলিল,—'যেতে—ভয় করে' বললেই সত্যি বলা হয়। না-যাবার হেতু?

তপনের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, তপতীর কথাটার জবাবমাত্র না দিয়া সে আঁচাইবার

জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। রুদ্ধ অপমানে তপতীর সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া গেল। একে তো আজ যাচিয়া তপনের সহিত যাইতে চাহিয়াছে,—তার উপর মাকে দিয়া সে-ই অনুরোধ করাইয়াছে, আবার নিজে আসিয়া প্রস্তাব করিল, আর ঐ ইতর কিনা ভদ্রভাবে একটা জবাব পর্য্যন্ত দিল না! তপতীর প্রশ্নটাও যে ভদ্রজনোচিত হয় নাই, ইহা তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। তপনের পিছনে গিয়া সে আদেশের সুরে কহিল,—যেতেই হবে বুঝেছেন?

মুখ ধুইয়া মশলা কয়টা মুখে ফেলিবার পূর্বে তপন অতি ধীর শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল,—যেতে পারবো না—মাফ চাইছি—

উত্তর দিয়াই তপন চলিয়া গিয়াছে, তপতী যখন বুঝিল, তখন যুগপৎ ক্রোধ এবং অপমান তাহাকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে।

সন্ধ্যার পূর্বেই তপন একটি ভেলভেটের কেসে একটি মূল্যবান ব্রোচ কিনিয়া মা'র হাতে দিয়া বলিল,—এইটা নিয়ে গেলেই আমার না যাওয়ার অসৌজন্য হবে না, মা। মুখ্য-সুখ্য মানুষ, আমার না যাওয়াই ভালো।

—হ্যাঁ, ভালোই—তপতীও তাহা সমর্থন করিল এবং তপনের বদলে তাহার প্রদত্ত উপরাহটা লইয়া বিবাহ-বাড়ি চলিয়া গেল। সেখানে বহু লোকের উপহৃত দ্রব্যের মধ্যে তপনের দেওয়া ব্রোচটা তুলিয়া দেখা গেল লেখা আছে : 'আপনাদের জীবন বসন্তের বনফুলের মতো বিকশিত হোক, বর্ষার জলোচ্ছ্বাসের মতো পরিপূর্ণ হোক—শরতের শস্যের মতো সুন্দর আর সার্থক হোক!...

তপনের আশীর্বাণী। যিনি পড়িলেন, তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। কহিলেন—বেশ আশীর্বাদটি, বৎসরের শ্রেষ্ঠ তিনটি ঋতুর আশিস যেন ঐ কথা ক'টিতে ভরে দিয়েছে! চমৎকার লাগলো।

তপনের না-আসার জন্য অনেকেই ক্ষুণ্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাহার আশীর্বাদের প্রশংসা করিল সকলেই। দু'চারজন কিন্তু বলিতে ছাড়িল না—'জামাই মূর্খ, তাই তপতী সঙ্গে আনে না। ও আশিস কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে।'

কথাটা তপতী শুনিল ; লজ্জায় সে রাঙা হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু বলিবার মতো কথা আজ তার জুটিতেছে না। যত শীঘ্র সম্ভব সে পলাইয়া আসিল।

সমস্ত রাত্রি তপতীর ভালো নিদ্রা হইল না। গত সন্ধ্যায় বিবাহ বাড়িতে সে রীতিমতো অপমানিত হইয়াছে। তপন কেন তাহার সঙ্গে গেল না? ভালো ইংরাজি জানে না সে, নাই বা জানিল। তপতী সামলাইয়া লইত। মাছ-মাংস খায় না বলিলেই কাঁটা-চামচের হাঙ্গামা ঘটিত না। তপনের না যাইবার কী কারণ থাকিতে পারে? কোনদিনই সে কোথাও যায় নাই অবশ্য তপতীও ডাকে নাই। কিন্তু ডাকিলেও যাইবে না, এমন কি গুরুতর কাজ তাহার থাকিতে পারে? বিদ্যা তো অতি সামান্য। সারা দিন-রাত্রি কী এতো তাহার কাজ? না যাইবার অছিলায় সে ঐভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়—কাহারও সহিত দেখা করিতে চাহে না। তপতী আজ নিঃসংশয়ে বুঝিল—কতকগুলি পাকাপাকা কথা তপন বলিতে পারে, ভদ্রতা বা অভদ্রতা, অপমান বা সম্মান সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই। তাহাকে এই বাড়িতে থাকিতে হইতেছে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই। সে বুঝিয়াছে তপতীকে সে পাইবে না, এখন টাকাই তাহার লক্ষ্য। কিন্তু কাল তো তপতী তাহাকে আত্মদান করিতে প্রস্তুতই ছিল,

তথাপি তপন কেন গেল না? তপতীর আন্তরিকতার অভাব সে কোথায় দেখিল?

ভোরে উঠিয়াই তপতী স্নান করিয়া এলোচুল ছড়াইয়া বসিল খাইবার ঘরে। তাহার অঙ্গের স্নিগ্ধ সুরভি ঘরের বাতাসকে মন্থর করিয়া তুলিয়াছে। পূজা করিয়া তপন চা খাইতে আসিল। মা দুজনকে খাবার দিয়া বসিয়া আছেন। তপতী যেন আপন মনেই বলিল,—আজ বিকেলে আমি সিনেমায় যাবো, নিয়ে যেতে হবে আমায়।

মা হাসিয়া করিলেন,—শুনেছো বাবা, ওকে আজ যেন নিয়ে যেয়ো—

তপন মৃদুস্বরে কহিল, আজ থাক্, মা, আমার ছোট বোনটিকে আজ একটু দেখতে যাব—যদি বলেন তো কাল সিনেমায় যেতে পারি!

রাগে তপতীর সর্বাঙ্গ কাঁপিতে ছিল। তাহার অসংযত মন বিদ্রোহের সুরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—থাক, কাল আর যেতে হবে না! বোনকে নিয়ে থাকুন গে! বোনের বাড়ি থাকলেই পারতেন!

মা ধমক দিয়া উঠিলেন,—কী সব বলছিস, খুকী? চুপ কর্।

—থামো তুমি মা—কাজিন-এর উপর অত দরদের অর্থ তুমি বুঝবে না। তুমি থামো।

তপন চায়ের কাপটা চুমুক দিতে যাইতেছিল—নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মা, ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, উঠলে যে বাবা, বসো!

তপন বাহিরে যাইতে যাইতে শুধু বলিল,—আপনার খুকীকে বলে দেবেন মা, আমি আধুনিক যুগের তরুণ নই—আমার বোন 'বোন'ই!—তপন সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার পথ ধরিল। মা বিপন্না বোধ করিয়া কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না।

তপতী রুখিয়া নীচে নামিতে নামিতে পিছন হইতে তপনকে বলিল,—যান চলে যান, আসবেন না আর।

তপন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আমি চলে যাই এই কি চান আপনি?

—হ্যাঁ, চাই—চাই—চাই, আজই চলে যান, এক্ষুণি চলে যান।

তপনের দুই চোখে সীমাহারা বেদনা ঘনাইয়া উঠিল, নির্বাক স্তব্ধভাবে সে দাঁড়াইয়া আছে। ব্যঙ্গ করিয়া তপতী বলিল.—দু'লাখ তো নিয়েছেন, আরো কিছু যদি পারেন তো দেখেছেন—কেমন?

বিস্মিত তপনের কথা ফুটিল ; কহিল,—শ্যামসুন্দর চাটুজ্যের নাতনী সামান্য দু'লাখ টাকার সন্ধানও রাখেন দেখছি?

ক্রোধে আত্মহারা তপতীর অভিজাত্যে আঘাত লাগিল। সক্রোধে সে জবাব দিল—শ্যামসুন্দরের নাতনীর বাবাকে কোনো জোচ্চোর ঠকিয়ে দু'লাখ টাকা নিয়ে যাবে, এ সে সইবে না মনে রাখবেন। যাবার আগে টাকাটার হিসেব দিয়ে যাবেন যেন।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তপতী চলিয়া আসিল। মা ভাবিয়াছিলেন তপতী তপনকে ডাকিতে যাইতেছে, কিন্তু তাহাকে একা ফিরিতে দেখিয়া ব্যগ্র ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিলেন,—তপন কই খুকী?

—'জানিনে—চুলোয় গ্যাছে।' বলিয়া তপতী আপন ঘরে চলিয়া গেল।

বিপন্না মাতা উহাদের কলহের কারণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। খুকীর ঘরে আসিয়া তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—কি বলে গেলো রে, না খেয়েই গেল যে!

তপতীর রাগ তখনও পড়ে নাই, তথাপি সংযত কণ্ঠেই উত্তর দিল ;—আসবে

এক্ষুণি—ভাবছো কেন তুমি।

—কি সব বলিস বাবু তুই—রাগের মাথায় ওরকম বিশ্রী কথা কেন তুই বলিস খুকী?

তপতী এবার আর রাগ দমন করিতে না পারিয়া কহিল.—বেশ করেছি, বলেছি! কী এমন বললাম যে, না খেয়ে গেলেন—ভারী তো...!

মা ভাবিলেন দম্পতীর কলহ, চিরশান্ত তপন নিশ্চয়ই রাগ করিয়া যায় নাই। কিন্তু ভয় তাঁহার জাগিয়াই রহিল মনের মধ্যে।

বেলা প্রায় বারোটার সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই উৎকণ্ঠিতা তপতী ছুটিয়া গিয়া ফোন ধরিল। মা-ও তখনি আসিয়া পাশে দাঁড়াইলেন। তপতী শুনিল পুরুষকণ্ঠে কে বলিতেছেন—তপনবাবু আজ বাড়ি ফিরবেন না, কাল সকালে ফিরবেন।

—'কেন? কোথায় থাকবেন?' তপতী প্রশ্ন করিল।

কিন্তু উত্তরদাতা ফোন ছাড়িয়া দিয়াছে।

মা ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন.—কে ফোন করছে রে? তপন?

—হ্যাঁ, আজ আসবে না, বোনের বাড়ি থাকবে বলিয়া তপতী চলিয়া যাইতেছিল, পুনরায় ফিরিয়া কহিল,—রাগ করেনি মা, কাল ঠিক আসবে আমায় বললে ; ভেবো না তুমি।

মা নিশ্চিন্ত হইলেন কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু তপতী ধরা পড়িবার ভয়ে পলায়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল—কোথায় আর যাইবে, যাইবার জায়গা তো ঐ ফুটপাত, আর তপতীরই বাপের দুই লক্ষ টাকা—টাকার হিসাব দিতে হইলেই চক্ষু চড়কগাছ হইয়া যাইবে। ও ভাবিয়াছে, 'যাইবে' বলিলেই তপতী ভয়ে কাঁদিয়া পড়িবে পায়ে! তপতীর অদৃষ্টে তাহা কখনও লেখে নাই, কিছুতেই না, তপতীর হাসি পাইল! তাহার পিতামহের গোঁড়ামী কম ছিল না, কিন্তু তাহার পিছনে ছিল যুক্তি—তিনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত! আর তপন কতকগুলি বাছা বাছা বুলি কপচাইয়া ভাবিয়াছে তপতীর অন্তর জিনিয়া লইল! অত সহজ নয়—তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না।

বিকালে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া তপতী মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যালের সহিত বেড়াইতে বাহির হইল যথারীতি।

পরদিন সকালেই তপন ফিরিয়া আসিল ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখশ্রী লইয়া।

তপতীর সহিত তাহার কি কথা হইয়াছিল, মা কিছুই জানিতেন না ; তিনি তপনকে স্বাগত সম্ভাষণে সস্নেহে বলিলেন,—শরীর ভলো তো বাবা! বড্ড শুক্‌নো দেখাচ্ছে?

হ্যাঁ, মা, শরীর ভালোই আছে—খেতে দিন কিছু—বলিয়া তপন খাইতে বসিল।

তপতী আপন ঘরে বসিয়া দেখিল, তপন ফিরিয়াছে এবং নির্লজ্জের মতো খাইতেছে। অদ্ভুত এই লোকটা। এতবড় অপমান করার পরেও সে নির্বিকার? কোন্ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে এইরূপ অপমান সহিতেছে, তপতীর আর তাহা অজানা নাই। ভালো, উহার ভণ্ডামীর শেষ কোথায় দেখা যাক্।

দিন দুই তপনের আর কোন খোঁজ না-লইবার ভান করিল তপতী। সে দেখিতে চাহিতেছে, তপনের দিক্ হইতে কোনো আবেদন আসে কিনা। কিন্তু তপন পূর্বের মতোই নির্বিকার . আসে, খায়, চলিয়া যায়! তৃতীয় দিনে তপতী ভীষণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। এমন করিয়া

সে আর পারে না! তপন আসে, খায়, মা'র সহিত পূর্বের ন্যায় দুই-একটা কথা যাহা কহিত তাহাও বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দুইদিন তপতী সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিয়াছে, সুবিধা হয় নাই। তপন যেন আপনাকে একেবারে অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছে—অথচ নির্লজ্জের মতো খাওয়া আর থাকাটা তো তেমনই রহিল। এতই যদি উহার সম্মান-জ্ঞান, তবে চলিয়া গেল না কেন? তপতী নিশ্চয় জানে যে-কোন লোক নিতান্ত অপদার্থও, এই অপমানের পর চলিয়া যাইত। তপনের না-যাওয়ার কারণটা এতদিনে বেশ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তপতী সেদিন আগুনের খেলা খেলিয়া বসিল।

মিঃ ব্যানার্জিকে লইয়া সিঁড়ির পাশের ঘরে একটা সোফায় তপতী বসিয়া বেহালা বাজাইতেছে—তপন এখনি আসিবে, তাহাকে দেখানো দরকার যে, তপনের থাকা-না থাকায় বা রাগ-অভিমানে তপতীর কিছুই আসে যায় না।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় তপন প্রবেশ করিল। মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—ভালো আছেন? টিকি-ই দেখা যায় না!

—টিকি নেই, ধন্যবাদ—বলিয়াই তপন পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, তপতী বেহালার ছড়িটা দিয়া তপনকে খোঁচাইয়া কহিল,—ভদ্রভাবে জবাব দিতে পার না উল্লুক!

—আঃ করেন কি মিস চ্যাটার্জি!—বলিয়া মিঃ ব্যানার্জি তাহার হাতটা ধরিলেন।

তপন চোখের কোণে দৃষ্টিপাতও করিল না, ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে—শুনিতে পাইল তপতী বলিতেছে,—ওকে লাথি মারলে যাবে না, জুতো মারলেও যাবে না—সত্যি কি না মেরে দেখুন।

তপনের হৃৎপিণ্ডে কে যেন একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ হুল ফুটাইয়া দিয়াছে। ধীরে ধীরে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ নামিয়া আসিয়া তপন পূর্ণদৃষ্টিতে তপতীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—আপনি কি আমার কাছে মুক্তিই চাইছেন?

তপতী নিজের মাথাটা মিঃ ব্যানার্জির কাঁধে রাখিয়া মৃদুহাস্যে বলিল,—চাইছি দাও তো? দেখি তোমার কত ঔদার্য্য!

সত্যি চাইছেন?—তপন পুনরায় প্রশ্ন করিল।

মিঃ ব্যানার্জির একখানা হাত নিজের মসৃণ ললাটে ঘষিতে ঘষিতে তপতী ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—হাঁ—হাঁ—হাঁ, চাইছি! দাও আমায় মুক্তি। পারবে দিতে?

—দিলাম। আজ থেকে আপনি মুক্ত, আপনি স্বতন্ত্র, আপনি স্বাধীন...

তপন সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।—তপতীর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল—ঐ অদ্ভুত লোক, যে দুই টাকার পাখি চার টাকায় কিনিয়া আকাশে উড়াইয়া দেয়, তাহাকে বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া গেল! তপতীর সহিত তাহার আর কোনো সম্বন্ধ রহিল না। না—না—না, তাহা কি হইতে পারে? তপতীকে সে বিবাহ করিয়াছে। এত সহজে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। ওটা একটা কথার কথা। ও তো এখনি আবার বাইরে যাইবে, তখন জিজ্ঞাসা করিবে তপতী 'দুই লক্ষের উপর আরো কত টাকা সে গুছাইয়াছে'।

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—লোকটার ধাপ্পা দেবার শক্তি অসাধারণ!

তপতী এতক্ষণে আবিষ্কার করিল, সে এখনও মিঃ ব্যানার্জির কোলে পড়িয়া আছে। এখনি কেহ দেখিয়া ফেলিবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাজনাটা লইয়া বসিল।

অনেকক্ষণ অতীত হইল, তপন নামিতেছে না কেন? আজ আর বাহিরে যাইবে না কি?

আগ্রহান্বিতা তপতী একটি ছুতা করিয়া উপরে গিয়া দাঁড়াইল তপনের রুদ্ধদ্বার কক্ষের জানালা-পার্শ্বে। দেখিল পরম বিস্ময়ের সহিত, তপন, ভণ্ড, অর্থ লোভী তপন উপুড় হইয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে তাহার পূজার বেদীমূলে। উহার হইল কি? ও কি এমনি ভাবেই কাঁদিয়াই তপতীকে হার মানাইবে? এখনি মা দেখিবেন, বাবা জানিতে পারিবেন, একটা কেলেঙ্কারী বাধিয়া যাইবে। তপতীর ভয় করিতে লাগিল। এত অপমানেও যাহার এতটুকু বিমর্ষতা তপতী দেখে নাই, আজ অতি সামান্য কারণেই সে কেন কাঁদিতেছে। ওঃ, তপতী মিঃ ব্যানার্জির কোলে শুইয়াছিল বলিয়া উহার 'জেলাসি' জাগিয়াছে। নিশ্চয়ই। হাসিতে তপতীর দম আটকাইয়া যাইবার জো হইল। মিঃ ব্যানার্জি—যাহাকে তপতী জুতার ডগায় মাড়াইয়া চলে। নীচে না গিয়া আপন ঘরে আসিয়া তপতী খুব খানিক হাসিল—ঐ লোকটাও তবে 'জেলাস' হইতে পারে! আশ্চর্য্য, উহারও এ বোধ আছে নাকি। থাকিবে না কেন? ও তো নির্বোধ নয়। আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপমান সহ্য করিতেছে। তপতীকে ও নাকি স্বেচ্ছায় মুক্তি দিবে! তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। ভালোই হইয়াছে ঈর্ষায় উহার অন্তরটাকে তপতী ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিবে। দেখিবে তপতী—কত সহ্যশক্তি উহার আছে।

তপতী মা'র কাছে গিয়া দাঁড়াইল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—তপন এখনও ফিরছে না কেনরে—জানিস কিছু?

মা জানেন না তপন ফিরিয়াছে। নিঃশব্দে আসিয়া তপনের দরজায় তপতী একটা জোর ধাক্কা দিল। তপন সম্বিত লাভ করিয়া যখন চোখ-মুখ মুছিয়া বাহিরে আসিল তখন তপতী সরিয়া গিয়াছে। মা'র সহিত কি কথা হয় শুনিতে হইবে, তপতী আড়ালে দাঁড়াইল। মা তপনের মুখ দেখিয়া বলিলেন—কী হল বাবা! মুখ তোমার...

—বিশেষ কিছু না, মা; খেতে দিন।

খাবার দিতে দিতে মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—সত্যি বলো, বাবা, কি তোমার হয়েছে—বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়।

—এক জায়গায় একটু আঘাত পেয়েছি, মা—তা প্রায় সামলে নিলাম।

—কী আঘাত বাবা, কোথায় আঘাত লাগলো?—মা ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

—শারীরিক না মা—মানসিক ; শারীরিক আঘাত আমি সবই প্রায় সইতে পারি মা, মানসিক সব আঘাত এখনও সইতে পারি না, তবু সয়ে যাবো, মা! আমার অন্তর—"নহে তা পাষাণ-মতো, তাহলে ফাটিয়া যেতো।"

বুকের গভীর দীর্ঘশ্বাসটা তপন কিছুতেই চাপিতে পারিল না!

এত কি হইয়াছে! তপতী আশ্চর্য হইয়া গেল। মা প্রায় কান্নাভরা কোমল কণ্ঠে কহিলেন,—হ্যাঁ বাবা, খুকী কিছু বলেছে?

—থাক্ মা—সব কথা মা'দের বলা যায় না—দিন চা আর-একটু।

মা নিশ্চিত বুঝিলেন, খুকী তাহার কিছু বলিয়াছে। নতুবা তপন তো কোন দিন এমন বিহ্বল হয় নাই। আশ্চর্য্য চরিত্র ঐ ছেলেটির। তপন চলিয়া গেলে মা তপতীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কী তুই বলেছিস—বল খুকী আমার বড্ড ভাবনা হচ্ছে—

—ভাবনার কিছু নেই। তোমার অপদার্থ জোচ্চোর জামাইকে ঠেঙালেও তোমার বাড়ি

ছেড়ে যাবে না—ভয় নেই তোমার—!

—খুকী!—মা ধমকাইয়া উঠিলেন!

একটা সামান্য ব্যাপারকে এতখানা বাড়াইয়া তোলার জন্য তপনের উপর তপতী তিক্তই হইয়াছিল। মার ধমক খাইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত উত্তর দিল,—ওকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছি—শুন্‌লে—!

তপতী চলিয়া গেল। নিঃসহায় মাতা বি. এ. পাস মেয়ের কথা শুনিয়া বিস্ময়ে বাসিয়া রহিলেন।

শরাহত বিহঙ্গীর ন্যায় ব্যথিত-হৃদয়ে শিখা ও মীরা শুনিল তপনের মুখে তাহার ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাহিনী। মীরা উদাস দৃষ্টিতে দাদার মুখের পানে চাহিয়া আছে, আর শিখার দুই গণ্ড বহিয়া নামিয়াছে অশ্রুর বন্যা! শিখাই কথা কহিল,

—তাহলে তোমার জীবনটা একেবারে পঙ্গু হয়ে গেল, দাদা?

—না ভাই এই-ই ভালো হয়েছে। আজ ঈশ্বরকে বলতে ইচ্ছে করছে :

"এই করেছো ভালো...
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো!
আমার এ ধূপ না পোড়ালে..."

শিখা তপনের ব্যথা-করুণ গান সহিতে পারিল না, মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল,—থামো দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, থামো! তোমার ঈশ্বর তোমার থাক্—আমাদের তাঁকে দরকার নেই। যে নিষ্ঠুর বিধাতা পবিত্র জীবনকে এমন করে নষ্ট—শিখা আর বলিতে পারিল না, ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মীরা কহিল,—চুপ কর্, শিখা—মানুষের কান্নায় ভগবান অবিচল! তাঁর কাজ তিনি করবেনই।

বিনায়ক দূরে বসিয়া উহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল : আগাইয়া আসিয়া বলিল—তাহলে কবে যাচ্ছিস? একুশেই যাবি তো?

—হ্যাঁ ভাই। আমি না-ফেরা পর্যন্ত তোদের কাজ যেন ঠিক চল্‌তে থাকে। মীরা জিজ্ঞাসা করিল,—সেখানে তোমার কত দেরী হবে, দাদা!—খুব বেশী!

—তা জানিনে বোন্‌টি! এখন আমার কাজ সহজ হয়ে গেছে। আর তো কোন বন্ধন নেই। মুক্তি সে স্বেচ্ছায় চেয়ে নিল।—তোরা সুখে আছিস—আমি এবার সেখানে যতদিন থাকি না—খবর দেবো তোদের—ভাবনা কেন?

মীরা চুপ করিয়া রহিল। শিখা পুনরায় প্রশ্ন করিল ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে—তুমি কি তবে দেশান্তরী হয়ে যাবে, দাদা?

—না, বোন্‌টি! আমার মাতৃভূমি বাংলা ছেড়ে যাবো কোথায়? আমি একনিষ্ঠা পত্নী চেয়েছিলাম—নিজে হয়তো একনিষ্ঠ হাতে পারিনি তাই বঞ্চিত হলাম। এবার যোগ্য হতে হবে।

—তুমি কি তাহলে তপতীকে এখনও ভালোবাসো দাদা?

—বাসি। আত্মবঞ্চনায় কোনো লাভ নেই। ভালবাসি বলেই তাকে অত সহজে মুক্তি দিতে পারলাম। তার বুকের বোঝা হয়ে থাকতে ইচ্ছে করলো না। আমার মনের আসনে

ওর স্মৃতি আমি বহন করবো, শিখা, আমার চোখের জলে নিত্য ধুইয়ে দেবো সেই আসন।

—ও যদি আবার তোমায় ফিরে চায়, দাদা?—মীরা প্রশ্ন করিল তপনকে।

—সে আর হয় না, বোনটি। আমার সত্য চিরদিন অবিচল। কিছুর জন্য সে ভাঙে না। কিন্তু তোরা এমনি বসে থাকলে কি করে চলবে রে? চল্ সব, কাগজপত্রগুলো ঠিক করে ফেলি। বিনায়ক। তুই তোর কারখানা চালা ভাই, আমি আমার কাজের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করবো এবার।

বিনায়ক নতমুখেই দাঁড়াইয়া রহিল।

শিখা বলিল,—তোমার কাজটা কি দাদা?

মানুষ গড়ার কাজ, বোনটি—তোমাদেরও সাহায্য চাই। পৃথিবী থেকে মানবতার সাধারণ সূত্রটি লোপ পেতে বসেছে। আমি শুধু দেখিয়ে দিতে চাই, পশু থেকে মানুষ কোথায় ভিন্ন। পাশবত্ব আর মানবত্বের মাঝখানে সে সূক্ষ্ম ব্যবধান রেখা রয়েছে, তাকেই স্পষ্টতর করা হবে আমার কাজ।

—তোমর 'জ্যোতির্গর্ময়' বইখানা হিন্দুস্থানী ভাষায় অনুবাদিত হয়ে পুরস্কার পেল, আর বাংলাদেশে মোটে বুঝলেই না, এদেশের মানুষকে কি দিয়ে তুমি গড়বে, দাদা?

বিদেশ থেকে গড়া আরম্ভ করবো। যে কোন বিষয়কে অশ্রদ্ধার চোখে দেখা বাঙালীর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এ স্বভাব সহজে যাবার নয়। কিন্তু আয় তোরা—তপন সকলকে লইয়া অগ্রসর হইল।

বিনায়ক মৃদুস্বরে কহিল, আমিও সঙ্গে গেলে হোত-না তপু? একা যদি অতদূর?

—হাঁ একাই যাবো—সঙ্গী যার হবার কথা ছিল সে যখন সরে গেল...

শিখা আবার কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার নারীচিত্ত তপনের বেদনার গভীরতাকে মাপিতেছে না। শান্ত শুদ্ধ তপন বারংবার বিচলিত হইয়া উঠিতেছে কোন্ অসহনীর যন্ত্রণায়, শিখা যেন তাহা নিজের বুকেই অনুভব করিতেছে।

অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে সে কহিল,—লক্ষ্মী দাদা আমার, আজন্ম ব্রহ্মচারী তুমি—আমাদের ভগ্নী স্নেহ নিয়েই কি তুমি চালাতে পারবে না?

—ঠিক চলে যাবে, দিদি, কিছু না থাকলেও চলতো—নিরবধি কাল কোথাও আটকায় না।

—কিন্তু তুমি বড্ড ব্যথা পেয়েছ, দাদা!

—নিজের জন্য নয়, বোনটি—ওর জন্য। ও কেমন করে এতবড় জীবনটা কাটাবে।

—ও আবার বিয়ে করবে।

—আহা, তাই করুক—ও বিয়ে করে সুখী হোক্, শিখা, আমি কায়মনে আশীর্বাদ করছি।

—কিন্তু দাদা তুমি এবার আত্মপ্রকাশ করো—ও বুঝুক, কী ধন হারালো।

—ছিঃ বোনটি। ওর উপর কি আমার প্রতিহিংসা নেবার কথা? ও-যে আমার—এ কথা আর কেউ না জানলেও আমি জানি।

—তাহলে তুমি মুক্তি দিলে কেন, দাদা? তোমাকেই-বা ও চিনলো না কেন?

—ওর শিক্ষা ওকে বিকৃত করেছে, শিখা, মুক্তি না দিলে ও কোনদিন আমায় চিনবে না। অনেকদিন তো অপেক্ষা করে দেখলাম। ওকে ওর মা-বাবা যেভাবে গড়েছেন, তেমনিই

তো সে চলবে। তবে সে যদি আমার হয় তাহলে আমি তাকে পাবোই। একটা জন্ম কেন তার জন্য লক্ষ-জন্ম আমি অপেক্ষা করতে পারবো।

—তুমি তাহলে আত্মপ্রকাশ করবে না?

না। তাহলে তো এখুনি ও আমায় চাইবে। আর সে চাওয়া হবে—আমাকে নয় আমার মর্যাদাকে। তেমন করে ওকে পেতে আমি চাইনে। আমি দরিদ্র তপন, মুর্খ তপন, ভণ্ড এবং অর্থলোভী তপন—এই তার ধারণা। এ ধারণাটা বদলাবার চেষ্টাও সে করলো না ; কারণ, সে সর্বান্তকরণে আমাকে অমনি ভেবে ত্যাগ করতে চায়।

—বিয়ে যদি না করে? শ্যামসুন্দর চাটুজ্যের নাতনীর দ্বিতীয় বিবাহ সহজ হবে না।

—আমি তার কি করবো, শিখা! আর, কঠিনই-বা কেন হবে? ওর বাবার একমাত্র মেয়ের সুখের জন্য নিশ্চয় করবে। তবে তপতী যদি নিজেই বিয়ে না করে তো অন্য কথা।

—তাহলে কি করবে তুমি?

—কিছু না, শিখা—আমার সঙ্গে তার এ-জন্মের সম্পর্ক চুকে গেছে। আমি 'কায়েম-মনসা' কথা বলি ছলনা করি মুক্তি দেবার ভণ্ডামী আমি করি না। প্রয়োজন হলেই রেজিষ্টারী করে দেব।

সকলে অফিস-ঘরে আসিল।

স্নেহাস্পদ জামাতাকে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে বলায় মা যে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তপতীর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু তপন তো সত্যই চলিয়া যাইতেছে না? আশ্চর্য, এতবড় অপমানটা সে সহিয়া গেল! যাইলেই বরং তপতী বাঁচিয়া যাইত। বিদেশে থাকিলে লোকের কাছে তবু বলা যায়, বাড়িতে নেই। ঘরে থাকিয়াও পার্টিতে যোগ না দিলে লোকে যে কথা বলে! পার্টিতে যোগ দিবার যোগ্যতা যে উহার নাই, লোকে তো তাহা বোঝে না।

তপতী স্থির করিল, তপনকে অপমান সে আর করিবে না, যাহা খুশী করুক, তপতীর অদৃষ্টে স্বামীসুখ নাই—কি আর করা যাইবে! তপনকে লইয়া ঘর করা তাহার অসাধ্য।

তপতী তিন-চারদিন একবারও এদিকে আসে নাই। তপন নিয়মিত সময়ে আসে খায়—এবং চলিয়া যায়—ইহার সংবাদ তপতী রাখিয়াছে। ঐ নির্লজ্জ লোকটা আবার মুক্তি দিবার ছলে তাহাকে শাসাইতে আসে,—বলে, 'তুমি মুক্ত স্বাধীন স্বতন্ত্র।' লজ্জা বলিয়া কোন বস্তু কি উহার অভিধানে একেবারে লেখে না! কিন্তু সেদিন অত কাঁদিল কেন? তপতী উহার কোনোই কিনারা করিতে পারিল না ভাবিয়া।

পঞ্চম দিন সকালে সে আসিয়া মাকে বলিল,—আমি তাহলে আজই ভর্তি হচ্ছি গিয়ে, মা, এম এ ক্লাসে।

তপন খাইতেছিল। মা তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—তুমি কি বলো বাবা, তপন?

তপন উত্তর দিল—আমার মতের কি মূল্য, মা। ওর যা ইচ্ছে করবে। তবে অর্থাভাবে আমি পড়তে পারি নি, অর্থ থাকতেও কেউ না পড়লে আমার দুঃখ হয়।

—না বাবা, পড়ুক—বলিয়া মা তপতীকেও খাইতে দিলেন।

তপতী ভাবিতে লাগিল, সে পড়িবে শুনিয়া তপন খুশীই তো হইল। পড়াশুনার দিকে

উহার আগ্রহ বেশীই আছে। মাকে বলিল,—আমার ক'খানা বই কিনতে হবে, মা—দোকানে একা যেতে চাইনে।

—বেশ তো তপন সঙ্গে যাক্। যাও তো বাবা, ওর সঙ্গে একটু। গাড়ী বার করো।

—আচ্ছা মা যাচ্ছি—বলিয়া তপন উঠিল। গ্যারেজ হইতে গাড়ী আনিয়া দাঁড় করাইল। বেশ-বাস করিয়া তপতী আসিয়া উঠিল তপনের পাশেই। তপন নীরবে গাড়ী চালাইতেছে। মুখে তো কথা নাই-ই ; এমন কি মুখখানা যথাসম্ভব নীচু করিয়া এবং ঘাড় ফিরাইয়া রহিয়াছে। তপতী নির্নিমেষ নেত্রে তাহার লতানো চুলগুলোর পানে চাহিয়া রহিল!' নাঃ, তপন মুখ তুলিল না! গাড়ী গিয়া দাঁড়াইল পুস্তকের দোকানের সামনে। তপতী নামিয়া দোকানে ঢুকিল, তপন বসিয়া রহিল গাড়ীতেই। বই কিনিয়া তপতী ফিরিয়া আসিল। গাড়ীতে বসিয়াই বলিল,

—একটু মার্কেটে দরকার ছিল—কথাটা বাতাসকে বলা হইলেও তপন মার্কেটের সম্মুখে গাড়ী থামাইল। নামিয়া তপতী পিছন দিকে চাহিল, ইচ্ছা—তপন আসুক! কিন্তু ডাকিতে তাহার লজ্জা করিতেছে। এত কাণ্ডের পর তপনকে ডাকা সম্ভব হয় কেমন করিয়া। দোকানে ঢুকিয়া সে একটি কর্ম্মচারীকে বলিল তপনকে ডাকিয়া আনিতে। তপন গাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তপতী সাহস করিয়া কহিল একটি কর্ম্মচারীকে, কোন সেন্টটা নেবো ওঁকে দেখান তো?

তপন নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিল,—ও সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

আচ্ছা লোককেই তপতী সেন্ট্ বাছাই করিতে বলিতেছে। তপতীরই বোকামী। একটা 'লিলি' লইয়া সে ফুলের দোকানে আসিল, পিছনে তপন। বিক্রেতা তপতীকে চেনে, বলিল—আসুন, কী ফুল দেবো? একটা ভালো গোড়ে দিই 'যুঁই' এর?

—দিন। ভালো ফুল তো? বাসি হবে না নিশ্চয়ই?

আপনাকে দেবো বাসি ফুল। সেদিনকার মালাটা কি বাসি ছিল?

তপতী লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল। অতি অল্পদিন পূর্বেই যে সে এখানে মালা কিনিয়াছে, তপন তাহা বুঝিতে পারিল। বেশী কথা না বাড়াইয়া সে মালা চাহিল এবং আড়চোখে তপনের দিকেই চাহিল। তপন নির্বিকার নিশ্চল দাঁড়াইয়া... মুখের ভাব তেমনি, চোখে ঠুলি। মালাটা তপনের হাতে দিতে বলিয়া তপতী আগাইয়া গেল, গাড়ীর দিকে। কাগজ দিয়া মালাখানি জড়াইয়া দিলে তপন তাহা আনিয়া তপতী ও তাহার মধ্যকার স্থানে রাখিয়া গাড়ী চালাইল। তাহার মুখের ভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই—কপালে এতটুকু কুঞ্চন-রেখা পড়ে নাই। গতিশীল গাড়ীটাকে নিরাপদে লইয়া যাইবার জন্যই যেন তাহার সব মনটাই সংযুক্ত। তপতী আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এতক্ষণ তপতী পাশে বসিয়া আছে, তপন একবার চাহিল না পর্য্যন্ত! এতটা ঔদাসিন্যের হেতু কি? কিম্বা উহার স্বভাবই এমনি! তপতীকে একবার দেখিলে ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, এ খবর তপতীর অজানা নাই। কিন্তু এই লোকটার কি তপতীকে দেখিতেও কিছুমাত্র আগ্রহ জাগে না! কিম্বা সেদিনকার ব্যাপারটায় এখনও সে রাগ করিয়া আছে।

গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল! তপতী নামিয়া যাইতেই তপন দারোয়ানকে কহিল 'আমি একটা নাগাদ ফিরবো, মাকে বলো।' সে আবার বাহিরে চলিয়া গেল পায়ে হাঁটিয়া ; ট্রামে চড়িবে হয়ত। তপতীর হাতের মালাটা তাহাকে পীড়িত করিতেছিল। কি করিবে সে উহা

লইয়া আর? তপনকে দিবার জন্য সে উহা কেনে নাই! কিন্তু গাড়ীতে আসিবার সময় ইচ্ছ হইয়াছিল মালাটা উহাকেই দিবে এবং ফেরৎ পাইবে ; কিন্তু সাহসে কুলাইল না। মাল লইয়া আজ আর করিবে কি সে? এখনি কলেজে যাইতে হইবে।

'ওবেলা দেখা যাইবে' ভাবিয়া তপতী মালাটা রাখিয়া আহারান্তে—কলেজে চলিয় গেল। তপন তাহার দেওয়া মালার কদর কি বুঝিবে ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্ট করিল, কিন্তু বারম্বার মনে হইতেছে—না-বুঝিবার কারণ নাই। তপন অশিক্ষিত নয়—বর অনেকের চেয়ে বেশী শিক্ষিত।

এই কয়েক মাসের ঘটনাগুলো আলোচনা করিতে গিয়া তপতীর ভয় করিতে লাগিল কী দুঃসহ অপমানই না তপতী করিয়াছে তপনকে! ও যদি একটু রাগিয়াই থাকে, তাহাতে অন্যায় কিছুই হইবে না। কিন্তু রাগিয়াছে কিনা তাহারই বা প্রমাণ কই।

বৈকালবেলা তপতী মা'র কাছে আসিয়া খাবার তৈরী করিতে বসিল। বহুদিন আগে নাই—মা যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন। ভাবিলেন তপনকে খাওয়াইবার জন্য খুকী তাহা রান্নাঘরে আসিয়াছে। মা তাহাকে নিরামিষ চপ-কাট্‌লেট তৈয়ারীর মশলা যোগাইয় দিলেন। তপনের জন্য রান্না করিতে তপতীর লজ্জা করিতেছিল, তাই বলিল,—মি বোসকে আসিতে বলেছি, মা একটু আমিষও রাঁধবো।

মা বিষাদিতা হইয়া উঠিলেন। খুকী আজও তপনের জন্য কিছু করে না। কিন্তু তাহা কিই-বা বলিবার আছে? তপতী রান্না চড়াইয়া লুকাইয়া মিঃ বোসকে ফোন করিল চ খাইতে আসিবার জন্য।

মিঃ বোস আসিবার পূর্বেই আসিল তপন। মা বলিলেন,—বোস সাহেব তো এখনও এল না খুকী, তপনকে খেতে দে—

—এখনি এসে পড়বে, মা—একটু বসতে বলো, তপতী আবদার ধরিল। তপন কিছু বলিল না। নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মিঃ বোস আসিতেই সুসজ্জিত সকালের মালাটা বাঁ হাতে জড়াইয়া বাহিরে আসিল নমস্কার করিতে। মিঃ বোস নমস্কার করিয়া বলিলেন হাসিমুখে,—সুন্দর! আপনাকে এমন চমৎকার মানিয়েছে আজ!

—বসুন বসুন! ওসব বাজে কথা কইতে হবে না—বলিয়া তপতী একটা কৃত্রিম ধমক দিয়া খাবারের প্লেট আগাইয়া দিল দুজনকেই। তপন নীরবে নতমুখে একটুকরা ভাজিয় যেন চুষিতে লাগিল। মা চলিয়া গিয়াছিলেন—তপতী নিজেই যখন খাওয়াইতেছে, তখ তাহার আর থাকার কী দরকার। তপতী লক্ষ্য করিল তপনের না-খাওয়া। মিঃ বোস না কথা বলিতেছেন—হঠাৎ যেন তাঁর চমক ভাঙিল, এমন ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—ও নমস্কার সেদিনকার ব্যবহারটার জন্য আমি লজ্জিত। মাফ করুন!

বিস্মিত তপন বলিল,—মাফ চাওয়ায় কী কারণ ঘটলো বুঝলাম না তো।

—সেদিন না জেনে আপনাকে একটা অন্যায় কথা বলে ফেলেছিলাম।

—ওঃ সেই 'ইডিয়েট'! তাতে কি হয়েছে? আমি কিছু মনে করিনি! নমস্কার।

তপন উঠিয়া পড়িল। তপতী ভাবিতে লাগিল, তপনের জন্য খাবার করিতে আসিয় সে তপনের অসম্মানকারীকেই তাহার পাশে খাইতে বসাইয়াছে, কথাটা তপতীর আদৌ মনে ছিল না। মিঃ বোসকে না ডাকিলেই হইত। তপন হয়তো সেজন্যই খাইল না।

মা আসিয়া দেখিলেন তপন চলিয়া গিয়াছে। বলিলেন—কিছুই সে খায়নি রে! ওস

ভালবাসে না তপন। রুটি-জেলি দিলিনে কেন?

তপতী উত্তর দিবার পূর্বেই মিঃ বোস বলিলেন,—খেতে শেখান, মাসিমা—মেয়েকে যে জলে ফেলে দিয়েছেন।

রাগে মা'র সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল, নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে তিনি শুধু চুপ করিয়া রহিলেন।

তপতী কিন্তু কহিল,—থাক্—আপনাদের তুলতে ডাকা হবে না।

নিজে তপতী ভাবিতেছে, তাহাকে জলেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু অন্যের মুখে সে-কথা তপতী আর শুনিতে চাহে না।

মিঃ বোস শোধরাইয়া লইবার জন্য বলিলেন,—কথাটা আমি খারাপ ভেবে বলিনি—আহার-বিহার, আচার-আচরণ না শিখলে সমাজে মিশবেন কি করে। তার জন্যেই বলছিলাম।

মিঃ বোস অতিথি, তাই তপতী চুপ করিয়াই রহিল ; কিন্তু আজ তাহার মনে হইতেছে, পরের মুখে তপনের নিন্দা শুনিতে তাহার আর ভালো লাগে না।

অসুস্থতার ছুতা করিয়া তপতী মিঃ বোসের সহিত সেদিন আর বেড়াইতে গেল না।

তপনের মনের গঠন হয়তো কিছু অদ্ভুত। সে কোনদিন কাহাকেও আঘাত করে না—এমন কি আঘাতের প্রতিঘাত করে না। ইচ্ছা করিলে তপতীকে সে আঘাত করিয়া চূর্ণ করিয়া দিতে পারিত, কিন্তু কাহাকেও আঘাত দিয়া কিম্বা জোর করিয়া ভালবাসা আদায় করিবার লোক তপন নহে। সে আপনাকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মধ্যে বিকশিত করিতে চায়—ইহাই তাহার সাধনা। তাহার বিষয়-বৈরাগী মন শুধু চাহিয়াছিল একজন সাথী, যাহাকে সে জীবনের পথে দোসর ভাবিতে পারে। কিন্তু অদৃষ্ট তাহার অন্যরূপ। দুঃখ সে পাইয়াছে, কিন্তু সে-দুঃখ সহিবার শক্তিও তাহার আছে।

আজ রিক্ত সর্বস্ব হইয়া মন প্রসারিত হইয়া পড়িল জন-কল্যাণের বিপুলায়তনে। মুক্তির মধ্যে সে খুঁজিয়া পাইল বন্ধনের ইঙ্গিত। সকালে খাইতে বসিয়া তপন কহিল,—আমি একুশে শ্রাবণ একটু মাদ্রাজের ওদিকে যাব, মা, কন্যাকুমারিকা তীর্থের দিকেও যেতে হবে।

—মাদ্রাজ? —অতদূরে তোমার কি কাজ, বাবা? মা ম্লানমুখে প্রশ্ন করিলেন।

তপন হাসিয়া বলিল,—দূর আর কোথায় মা? তারপর একটু থামিয়াই বলল,—

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী
রেখেছো বাঙালী ক'রে মানুষ করোনি!'

তপতী চা খাইতেছিল। কথাটা সে শুনিয়া কিছু উন্মনা হইলা পড়িল।

—কতদিন দেরী করবে, বাবা? মা সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন।

—দেরী একটু হবে বইকি, মা—কাজটা শেষ করবো তবে তো?

আর কোনো কথা না বলিয়া তপন চা-পান শেষ করিল—এবং উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

তপতী একটু ইতস্তত করিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—ও মুখ্যু মানুষ, মাদ্রাজে গিয়ে কি করবে, মা? আমাদের অফিসের কাজ কিছু?

—কি করে জানবো, বাছা, তুই তো জিজ্ঞেস করলেই পারিস। আর মুখ্যু ও মোটেই

নয়, এটা এতদিনেও বুঝতে পারলিনে তুই। তোর বাবা ওর কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তপতী চুপ করিয়া রইল। মা বিরক্ত হইয়াছেন। আর কোনো কথা না বলাই উচিত। তপন যে মূর্খ নয় ইহা তপতীও জানে, আর জানে, মাদ্রাজ যাওয়ার অছিলায় আরো কিছু টাকা তপন বাগাইবে। তা নিক, টাকা তাহার বাবার যথেষ্ট আছে, তপন তো সকলেরই মালিক হইবে একদিন, কিম্বা হয়তো সত্যই কোনো কাজ আছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তপতী কহিল—আমায় আজ একটু বেড়াতে নিয়ে যেতে বোলো, মা! আমি বললে ও এড়িয়ে যায়।

মা হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা বলো দেবো। কিন্তু এড়িয়ে যেতে দিস কেন তুই?

উত্তর না দিয়া তপতী আসিল আপন ঘরে। বিকালে সে আজ তপনকে লইয়া বেড়াইতে যাইবে—দেখিবে তাহার অন্তরে তপতীর স্থান কোথায়। বৈকালিক জলযোগের জন্য তপন আসিবার পূর্বেই তপতী রক্তাম্বরা হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তপন আসিতেই মা তাহাকে বেড়াইতে যাইবার জন্য বলিলেন,—খুকী বললে তুমি নাকি এড়িয়ে যাও বাবা—তাই আমাকে দিয়ে বলাচ্ছে।

—আচ্ছা মা যাচ্ছি। আমার কাজ থাকে, দু'একদিন আগে বললে সময় করে রাখি।

তপন গিয়া গাড়ীতে বসিল—তপতী আসিয়া বসিল পাশে। গাড়ী চলিতেছে। নির্বাক চোখের ঠুলিটার মধ্য দিয়া সোজা সামনের রাস্তায় দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়াছে—বামে যে একটা সুসজ্জিতা নারী অপেক্ষা করিতেছে, তাহার অস্তিত্বও যেন তপন ভুলিয়া গিয়াছে। তপতী উসখুস করিতে লাগিল। সোজা কোনো কথা জিজ্ঞেসা করিতেও তাহার বাধিতেছে, কথাই-বা কহিবে কিরূপে। যাহাকে সে অপমানে, আঘাতে বিদলিত করিয়া দিয়াছে, তাহার সহিত এভাবে বেড়াইতে আসাই তো চরম নির্লজ্জতা! কিন্তু তপন তো আসিল, এতটুকু অসম্মতি জানাইল না? অন্যদিনও সে আসিবে তাহার স্বীকৃতি ছিল—অথচ কোনো কথা বলে না কেন! বাঁ দিকে একটা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। তপতী আপনার ডান হাতটা তপনের দুই হাতের ফাঁকে চালাইয়া দিয়া ষ্টিয়ারিংটা ঘুরাইয়া দিতে দিতে বলিল,—এই দিকে যাবো—

অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত গাড়ীটার ঝোঁক সামলাইয়া লইয়া তপতীর নির্দেশমতো পথেই তপন গাড়ী চালাইল। একটু দূরে কয়েকজন কলেজের মেয়ে বেড়াইতেছে, স্থানটা বেশ ফাঁকা।

তপতী বলিল,—এখানেই নামা যাক একটু—কেমন?

তপন গাড়ী থামাইল। নিজে নামিয়া তপতী ভাবিল, তপনও নিশ্চয় নামিবে; কিন্তু তপন গাড়ীতেই বসিয়া আছে মাথা নিচু করিয়া। তপতীর কেমন লজ্জা করিতে লাগিল তপনকে সঙ্গে আসিতে বলিতে। সে খানিকটা চলিয়া গেল, কিন্তু কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—একা যাবো নাকি?

তপন নিঃশব্দে নামিয়া তাহার অনুগমন করিতেছে। তপতী যা-হোক একটা কিছু বলিবার জন্যই যেন বলিয়া উঠিল,—ঐগুলো বুঝি গাংচিল? নয়?

—হ্যাঁ—বলিয়াই তপন নীরব রইল।

এই নিষ্ঠুর ঔদাসিন্য তপতীর অসহ্য বোধ হইতেছে। তাহার কলকাকলির স্রোত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে যেন। তপনকে কথা কহিবার অধিকার দেওয়ার পরও তাহার এতটা নীরবতা

হেতু কী! তপতী আবার বলিল,—ঐ নৌকোটা কোথায় যাচ্ছে?

—তা তো জানিনে।

তপন কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা একটিও বলিবে না? নৌকোটা কোথায় কোন্ চুলোয় যাইতেছে, কে তাহা জানিতে চায়! তপন কেন বোঝে না?—'মানুষের যাত্রাপথও এমনি—কোথায় যাবে জানে না'—তপতী পুনর্বার হাসিমুখেই বলিল।

তপন কোনোই উত্তর দিল না। নিঃশব্দে হাঁটিতে লাগিল। তপতী ক্রমশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। কথাই যদি না বলে তো সঙ্গে বেড়াইবে কিরূপে! কিন্তু হয়তো তপন এখনও রাগিয়া আছে। অপমানটা তো কম হয় নাই! তপতী কথার মোড় ঘুরাইবার জন্য সোজা প্রশ্ন করিল,—মাদ্রাজে ক'দিন দেরী হবে?

ঠিক বলতে পারিনে—মাস দুই তো নিশ্চয়ই।

দু'মাস! এতদিন কি করিবে সে? কিন্তু প্রশ্ন করিলে যদি তপন ভাবে তাহার কর্ম্মের অযোগ্যতা লইয়া তপতী ব্যঙ্গ করিতেছে। তপতী আর প্রশ্ন করিল না। কিন্তু তপনের রাগ করার প্রমাণ সে পাইতেছে না। কী কথা আরম্ভ করিবে তপতী? কিছুক্ষণ ভাবিয়া প্রশ্ন করিল,—জামা-কাপড়গুলো তো আর একটু—ভালো করলেই হয়?

তপন মৃদুস্বরেই উত্তর দিল,—জীবনে অনেক-কিছু না পেয়ে প্রাপ্ত বস্তুর উপরও আর শ্রদ্ধা নেই!

তপতী রাগিয়া উঠিল, ভণ্ডামীর আর জায়গা নেই যেন! কিন্তু রাগ চাপিয়াই হাসিয়া বলিল,—'ওঃ বুদ্ধদেব! ত্যাগ শেখা হচ্ছে?'—তপতীর কণ্ঠে সুস্পষ্ট ব্যাঙ্গের সুর ধ্বনিয়া উঠিল।

বিস্ময়ের সুরে তপন কহিল,—বুদ্ধদেব তো কিছু ত্যাগ করেননি! তিনি তাঁর পিতার ক্ষুদ্র রাজ্য ছেড়ে অগণ্য মানবের হৃদয়-সিংহাসনে রাজ্য বিস্তার করেছেন। ত্যাগ কোথায়?

বিমূঢ় তপতী কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিল তপনের দিকে তারপর বলিল—ত্যাগ তবে কাকে বলে?

—ত্যাগ বলে কোনো বস্তু তো নেই। আমরা যাকে ত্যাগ বলি, সেটার মানে এড়িয়ে যাওয়া। আর সত্যকার ত্যাগ মানে বন্দীত্ব থেকে মুক্তি অর্থাৎ বিস্তার, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, লঘিষ্ট থেকে গরীয়ানে।

তপতীর বিস্ময় বাড়িয়া উঠিতেছে। প্রতি কথায় তপনের মুখ হইতে একি বাণী ঝঙ্কারিয়া উঠে! তপতী এতটা পড়িয়াছে—এমন করিয়া তো ভাবে নাই। এই লোক কি মূর্খ হইতে পারে? অশিক্ষিত হইতে পারে? তপতী আরো কি কথা বলিবে ভাবিতেছে।

কয়েকটি কলেজের মেয়ে আসিয়া তপতীকে নমস্কার জানাইয়া বলিল,—ভাল তো মিস চ্যাটার্জি।

তপনের সম্মুখে সে তাহাকে 'মিস' বলিয়া সম্বোধন করায় তপতীর লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু আরো কিছু অঘটন ঘটিবার আশঙ্কায় সে তাড়াতাড়ি—'ভালোই আছি' বলিয়া দূরে চলিয়া যাইতে চায়।

একটি মেয়ে তপনকে লক্ষ্য করিয়া, হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—আপনার সঙ্গীর পরিচয়টা।

তপতীকে কিছু বলিবার জন্য ইতস্তত করিতে দেখিয়া তপন কহিল—আমি সামান্য ব্যক্তি, নাম তপনজ্যোতি।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল,—তপন মানে সূর্য্য—উনি কিন্তু বরাবর বড়লোক ; কখনও সামান্য নন।

—আমি বড়লোক? কিসে বুঝলেন?

—ঠিক বুঝেছি। যে প্রকাণ্ড গাড়ীখানা!

—গাড়ী দেখেই বুঝি আপনারা বড়লোক ঠাওরান? আমরা, ছেলেরাও তাই শাড়ী দেখে বড়লোক ভাবি?

—ছেলেরা কিন্তু ভুল করে। কারণ, বাড়ী আর গাড়ীতে পয়সা লাগে—শাড়ীর দাম আর কত?

—ছেলেরা মেয়েদের সম্বন্ধে বরাবর ভুলই করে থাকে—কথাটা বলিয়া তপন নিঃশব্দে হাসিল।

—কেন? আপনি কিছু ভুল করেছেন নাকি—মেয়েটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে কথাটা বলিল।

—না—আমি মেয়েদের এড়িয়ে চলি যথাসম্ভব।

—ভয় করে বুঝি?

—আগে করতো। এখন টিকা নিয়ে ফেলেছি—বসন্ত আর হবে না।

—মেয়েরা বুঝি আপনার কাছে বসন্ত।

—মারীভয়! তাকে কে ভয় না করে বলুন? প্রমাণ তো ইতিহাসে যথেষ্ট রয়েছে ট্রয়ের ধ্বংস, লঙ্কার দহন।

—কিন্তু ভালোও তো বাসেন দেখছি!

—বাসি। মানুষ যাকে ভয় করে, তাকে ভালোও বাসে। প্রমাণ ভূত। ভূতকে ভয় করি বলেই তার গল্প অবধি শুনতে ভালবাসি আমরা। কিন্তু ভূতকে এড়িয়ে যেতে চাই।

আপনার যুক্তি কাটাতে না পারলেও কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারছিনে।

—আমি নিরুপায়—বলিয়া তপন নমস্কার জানাইল।

অতি সাধারণ কথাতেও তপন যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইতে পারে, তপতী আজই প্রথম তপনকে লইয়া বেড়াইতে আসিয়াছে ; দেখিল, সুশিক্ষিতা কলেজের মেয়েদের সহিত আলাপে তপনের কোথাও জড়তা নাই। কেন তপতী এতদিন উহাকে লইয়া বেড়াইতে আসে নাই? তপনকে লইয়া তো তাহাকে অপদস্থ হইতে হইত না।

মোটরে গিয়া তপতী চালকের আসনে বসিল। সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখিদল কুলায় ফিরিতেছে। তপন সেই দিকে চাহিয়া আপন জীবনের কথা ভাবিতেছে—আর তপতী ভাবিতেছে উহার সহিত ভাব করিবার কী কৌশল আবিষ্কার করা যায়। হঠাৎ তপতী ব্রেক কসিয়া থামাইয়া দিল। নির্জ্জন নিস্তব্ধ পথের দু'ধারে ফুটিয়া আছে অজস্র বন্য কুসুম—তপতী নামিয়া তাহাই কতকগুলি তুলিয়া লইল আঁচলে। একটা পুষ্পিত শাখা ছিঁড়িয়া তপনের গায়ে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল,—আপনি চালান, আমি ফুল পরবো—তপতী উঠিতেই তপন নিঃশব্দে চালকের আসনে সরিয়া গিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

এই নিতান্ত নির্লিপ্ততা তপতীর অন্তরকে জাগ্রত করিতেছে। তাহার আধুনিক মন ভাবিতেছিল ফুলগুলি তপন স্বহস্তে তাহাকে পরাইয়া দিবে, কিন্তু ও তপতীর সহিত অসহযোগ আরম্ভ করিল নাকি? তপতী বার বার চাহিয়া দেখিল—তপন অনড়—দৃষ্টি

সম্মুখের দিকে হইতে একচুল নড়ে নাই। আপনার সুদীর্ঘ বেণীতে পুষ্পগুচ্ছ গুঁজিয়া তপতী বেণীটাকে এমনভাবে ফেলিয়া দিল যাহাতে তপনের বাম বাহুতে উহা পড়িতে পারে। তপন নির্বিকার। তপতী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। এই কঠিন পাষাণ-মূর্তিকে লইয়া সে করিবে কি? রাগই যদি তপনের হইয়া থাকে, তবে না-হয় দু'চার কথা শুনাইয়া দিক্—তপতী সহ্য করিবে। কিন্তু এই নীরবতা একান্ত অসহ্য। তপতী ঝাঁজিয়া বলিয়া উঠিল,—কথা তো ভালোই বলতে পারেন চুপ করে কেন আছেন এখন।

—কথা না বলেও তো অনেক কথা বলা যায়—যেমন কথা বলে ঐ পুষ্পিত শাখা—

কিন্তু আমি শাখা নই, আমি মানুষ—কথা বলবার জন্য আমার ভাষা আছে। আর ভাষাকে সুন্দর করবার জন্য আমি অনেক তপস্যা করেছি—

—আমার মৌনতাকে আমি সুন্দর করতে চাই—তাই হোক আমার তপস্যা।

—অর্থাৎ আমি যা চাই তার উল্টোটা, কেমন? চমৎকার!

তপন চুপ করিয়া রহিল। দিকে দিকে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সুষমা গান গাহিয়া উঠিতেছে মৌন মহিমায়। মৌনতার এই সুগভীর সৌন্দর্য্য একান্ত প্রিয়জনের সান্নিধ্যেই যেন অনুভব করা যায়। তপতী অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল,—কাল আসতে হবে বেড়াতে, বুঝলেন? পালাবেন না যেন?

—কাল আমার বোনের বাড়ি যাবো, আসতে পারবো না।

তপতী বারুদের মতো জ্বলিয়া উঠিল। ঐ বোনটাই তপতীর সর্বনাশ করিতেছে। কোনরূপে ক্রোধ দমন করিয়া সে কহিল—আমি যাবো—নিয়ে যাবেন আমায়? আমি দেখতে চাই, তার সঙ্গে আপনার সত্যিকার সম্পর্কটা কী।

তপন সজোরে গাড়ীটার ব্রেক কষিয়া থামাইয়া দিল। তপতী লাফাইয়া উঠিল স্প্রিং-এর গদিতে। তপন ধীরে শান্ত স্বরে কহিল,—তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যাই হোক, মিস্ চ্যাটার্জি আপনার তাতে কিছুই যাবে আসবে না। অনর্থক আঘাত করায় কি আপনার লাভ হচ্ছে? আমার সঙ্গে সব সম্পর্কই তো আপনি ছিন্ন করেছেন! আজ আবার বলছি—'আপনি মুক্ত, আপনি স্বতন্ত্র, আপনি স্বাধীন! আপনার উপর কোন দাবী আর রাখিনে। আশা করি, আপনিও আমার উপর রাখবেন না।'

তপন তীরবেগে গাড়ীটা চালাইয়া দিল। তপতী বসিয়া রহিল বাক্যহারা ব্রততীর মতো।

বাড়ির প্রায় কাছাকাছি আসিয়া তপতী হঠাৎ বলিল; সত্যি তাহলে আপনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন?

—হ্যাঁ। আমি আপনার জীবন থেকে অস্ত গিয়েছি।

—অস্ত-সূর্যটি কিন্তু প্রতি সকালে উদিত হন—তপতীর ব্যঙ্গ তীক্ষ্ম হইয়া উঠিল।

—তার জন্য থাকে রাত্রির সুদীর্ঘ সাধনা—ধীরে উত্তর দিল তপন।

—ভালো! রাত্রি সাধনাই করবে!—তপতী আবার বিদ্রূপ করিল।

—আমি কিন্তু সূর্য নই। আমি দূর নীহারিকাপুঞ্জের এক নগণ্য নক্ষত্র, অস্ত গেলে বহু শতাব্দীর পরেও পুনরুদয়ের সম্ভাবনা কম থাকে।...

গাড়ী বাড়ি পৌঁছিল। তপন দরজা খুলিয়া তপতীর নামিবার পথ করিয়া দিল এবং সে নামিয়া গেলে নিজেও ধীরে ধীরে আপনার ঘরে প্রবেশ করিল।

সমস্ত রাত্রিটাই দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল তপতীর। চিন্তার পর চিন্তার তরঙ্গ যেন

আছড়াইয়া পড়িতেছে তাহার মনের উপকূলে। তপনের সহিত তাহার এই কয়মাসের ব্যবহার স্মৃতিসাগর মথিত করিয়া তপতী কুড়াইয়া ফিরিতেছে—কিন্তু যতদূর দৃষ্টি যায়, যাহা কিছু দেখে, সর্বত্রই তপন নির্বিকার, নির্দোষ সে না হইতে পারে কিন্তু নির্লিপ্ততা সে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে! তপতীর বারম্বার অসম্মানের আঘাতেও তপন অবিচল রহিয়া গিয়াছে—আর আজ সেই আঘাতগুলিই তপতীর অপরিসীম লজ্জার কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

তপন তাহাকে মুক্তি দিয়াছে? সত্যিই কি সে আজ তপনের সহিত বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত? বেশ—ভালো কথাই তো। কিন্তু কেন যেন আনন্দ আসিতেছে না। এতদিন যে লোকটিকে কেন্দ্র করিয়া তপতী তাহার দুঃখের বিলাস-কুঞ্জ রচনা করিতেছিল, আজ যেন সে কুঞ্জ সমূলে ধ্বসিয়া গিয়াছে। অবাধ অসীম বিস্তারের মধ্যে আজ তপতী যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারে—তপন আর কিছুই বলিবে না। সে বলিয়াছে—'তপতীর উপর তাহার আর কোনো দাবী নাই।' নিতান্ত নিস্পৃহের ন্যায় সহজ সুরেই তপন আজ কথা কয়টা বলিয়াছে। সত্যই কি তাহাকে মুক্তি দিয়াছে তপন? হ্যাঁ দিয়াছে। তপতী মুক্তি চাহিয়াছিল—শুধু চাহিয়াছিলই নয়, মিঃ ব্যানার্জির কাঁধে মাথা রাখিয়া তপনকে নিঃসংশয়ে বুঝাইয়া দিয়াছিল, তাহাকে সে চাহে না—তাহাকে সে গ্রাহ্য করে না। এতদিনের এত আঘাতেও যে তপন এতটুকু বিচলিত হয় নাই, সেদিন সেই তপন শরাহত মৃগশিশুর মতো কাঁদিয়াছে,—অজস্র উদ্বেলিত অশ্রুধারায় প্রক্ষালিত করিয়া দিয়াছে তাহার পূজার বেদীমূল, আর তপতী নির্লিপ্ত নিষ্ঠুরতায় সে কান্না দেখিয়াছে—বিদ্রূপ করিয়াছে, বিরক্ত হইয়াছে।

তপনকে আজ বলিবার মতো তপতীর আর কি থাকিতে পারে? হয়তো ক্ষমা চাহিবার অধিকারটুকুও তাহার লুপ্ত হইয়া গেছে। হ্যাঁ, তপতী আজ সত্যই মুক্ত, স্বাধীন, স্বাতন্ত্র। কিন্তু তপন আজও রহিয়াছে কেন? সুদীর্ঘকাল বারম্বার অপমান সহ্য করিয়াও যে-লোক এ গৃহ ত্যাগ করে নাই, সে নিশ্চয়ই এত সহজে তপতীকে ত্যাগ করিবে না। না—না—না—তপতী বৃথাই ভাবিয়া মরিতেছে।

আশ্বস্ত হইয়া তপতী খানিকটা ঝিমাইয়া লইল। তপনের চলিয়া যাওয়াটা তাহার পক্ষে কত বড় ক্ষতি ইহা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না ; কিন্তু তাহার থাকায় যে কিছু লাভ আছে ; ইহা যেন তপতীর আজ বার বার মনে হইতেছে মা-বাবা উহাকে স্নেহ করেন সে নিশ্চয়ই এই বাড়িতেই থাকিবে। আপাতত তপতীকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছে—'মুক্তি দিলাম'। মুক্তি অত সহজ কিনা? এ-তো আর চার টাকায়-কেনা পাখি নয়! আর যদিই-বা মুক্তি দেয় তো ক্ষতিটা কি? তপতী উহার জন্য কাঁদিয়া মরিয়া যাইবে না। বাড়িতে আছে, থাক্—আরো কিছু টাকা লইতে চায়, লউক! তপতী উহাকে আর বিরক্ত করিবে না। দুজনেই তাহারা আজ হইতে স্বাধীনভাবে চলিবে।

তপতী হাসিয়া ফেলিল। তপন তো তাহার স্বাধীনতায় কোনদিন হস্তক্ষেপ করে নাই। তপতী চিরদিনই স্বাধীনা আছে, এবং থাকিবে।

ভোর হইয়া গিয়াছে। বীতবর্ষণ আকাশের কোমল আলোক তপতীর চোখে বড় সুন্দর লাগিতেছিল। উঠিয়া সে স্নান করিয়া ফেলিল। তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল বারান্দায় ; তপনের ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল দরজা খোলা। ত্রস্ত তপতী ত্বরিতে আসিয়া

দেখিল তপন পূজায় বসিয়াছে। তপনের পিছন দিকটা তপতী বহুবার দেখিয়াছে কিন্তু মুখ ভালো করিয়া দেখে নাই। আত্মবিস্মৃতা তপতী ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, জীবনের এই প্রথম। প্রেমাভিসারের এই ক্ষুদ্র আয়োজনটুকুতেই হয়তো তার অনেক সময় ব্যয় হইয়া যাইত, কিন্তু আজ একান্ত অকস্মাৎ তাহা ঘটিয়া গেল।

তপনের দুই আঁখি ধ্যানস্তিমিত। শ্মশ্রু-গুম্ফ মুণ্ডিত সুন্দর মুখমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে যে শান্ত সৌম্য শ্রী, তাহাতে তপতী বুদ্ধদেব ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারে না। তপতী দাঁড়াইয়া রহিল। তপনের স্নানসিক্ত চুল হইতে তখনও জল ঝরিতেছে। তপতীর ইচ্ছা করিতেছে আপনার বুকের অঞ্চল দিয়া তপনের মাথাটি মুছিয়া দেয়।

তপন চক্ষু মেলিয়াই বিস্মিত হইল। অত্যন্তই সহজ সুরেই প্রশ্ন করিল, কিছু বলতে চান?

—না—কিছু না বলিয়া বিমূঢ় তপতী দাঁড়াইয়া রহিল; প্রণাম শেষ করিয়া তপন চলিয়া গেল খাইবার জন্য মা'র কাছে, এবং খাইয়া বাহিরে।

সমস্ত দিনই তপন ঘরে ফিরিল না। সেই সকালে গিয়াছে—তপতী অত্যন্ত উসখুস করিতেছে, মাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার লজ্জা করিতেছিল বিকালে নিশ্চয় জল খাইতে আসিবে। কিন্তু বিকাল হইয়া গেল, ছয়টা বাজিল, তপন আসিল না। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল কাল তপন বলিয়াছিল বোনের বাড়ি যাইবে। তবে কি আজ আর মোটেই আসিবে না? মিঃ ব্যানার্জি প্রভৃতি বন্ধুগণ তপতীকে বহুক্ষণ হইতে ডাকিতেছেন—নিরাশ হইয়া তপতী নীচে নামিল।

মিঃ বানার্জি কহিলেন,—কী ব্যাপার? যক্ষবধূর মতো চেহারা যে মিস চ্যাটার্জি?

—আমি মিসেস্ গোস্বামী—আজ থেকে মনে রাখবেন—বলিয়া তপতী ওধারে ফুলবীথিকায় চলে গেল।

মিঃ অধিকারী ডাকিয়া কহিলেন,—খেলবেন না একটু?

না—তপতীর কণ্ঠস্বর এত দৃঢ় শুনাইল যে সকলেই থামিয়া গেল।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় ফিরিয়া আসিল তপন। মা প্রশ্ন করিলেন,—কি কি খেলে, বাবা বোনের বাড়িতে?

—এই—পাটিসাপ্টা, সরুচাকলী, পানিফলের কি সব—আরো কত-কি খেলাম-মা—

তপতী আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছে। মা কহিলেন,—বেশ বাবা বোনের বাড়ি তো বেশ খাও—আর এখানে খেতে দিলেই বলবে, 'ভালবাসিনে, মা!'—

বিস্ময়ের সুরে তপন বলিল, কেন মা, আপনি যেদিন যা দিয়েছেন খেয়েছি তো? তবে আমি পরিমাণে কম খাই।

মা পুনরায় কহিলেন,—কিন্তু বাবা, খুকী সেদিন যা-কিছু রান্না করলে, তুমি খেলে না।

তপন অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া গেল! বাহিরে তপতী সাগ্রহে কান খাড়া করিয়া আছে, তপন কি বলে শুনিবার জন্য। তপন ধীরে ধীরে বলিল, কথাটার জবাব দিতে চাইনে মা, ব্যথা পাবেন আপনি।

বিস্মিতা মাতা ব্যাকুল হইয়া কহিলেন,—তা হোক বাবা, তুমি বলো,—বলো কিজন্যে তুমি খাওনি? বলো, শুনতে চাই আমি—

—মা'র মনে ব্যথা দেওয়া উচিত নয়, মা—তাই বলতে চাইছি নে।

'না বাবা, তোমায় বলতেই হবে।'—মার নির্বন্ধাতিশয্য বাড়িয়া গেল!

নিরুপায় তপন কোমল কণ্ঠে কহিল,—আপনার খুকী তো আমার জন্য কিছু কোনদিন রান্না করেনি,—মা—যেদিন যা-কিছু করেছে, সবই তার বন্ধুদের জন্য। আর আমার বোন আমার জন্য পাটিসাপ্টা তৈরী করে আঁচল ঢেকে বসে থাকে—যেতে দু'মিনিট দেরী হলে চোখের জলে তার বুক ভেসে যায়।—তার সঙ্গে আপনার খুকীর তুলনা করবেন না, মা—সে তো প্রগতিশীলা তরুণী নয়, ভাইএর বোন সে—

মা একেবারে মূক হইয়া গেলেন। বাহিরে তপতীর অন্তর বিপুল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে! এতবেশী 'সেন্টিমেন্টাল' ও! এতো তীক্ষ্ম লক্ষ্য উহার!

কিছুক্ষণ সামলাইয়া মা কহিলেন,—খুকী বড্ড ছেলেমানুষ, বাবা—বোঝে না।

কলহাস্যে ঘরের বিষাক্ত হওয়াটা উড়াইয়া দিয়া তপন অতি সহজকণ্ঠে কহিল, —আমি কি বলেছি, মা, সে বুড়ো মানুষ। আপনি তো বেশ উল্টো চার্জ্জে ফেলেন। খাওয়া হইয়া গিয়াছে, তপন উঠিয়া আপনার ঘরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে আসিয়াই তপন করুণ কণ্ঠে কহিল,—কাল আপনাকে কথাগুলো বলে মনে বড় কষ্ট পেয়েছি মা—সত্যি বলুন, আপনি দুঃখ পাননি?

—তুমি আমার বড় উপকার করেছ, তপন, দুঃখ পাবার আমার দরকার ছিল।

—খুব বড় কথা বললেন, মা—দুঃখ পাবার মানুষের দরকার থাকে। এই পৃথিবীতে দুঃখের চাকায় আমাদের মন-মাটি মানুষের মূর্তিতে গড়ে ওঠে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"বজ্রে তোলো আগুন ক'রে আমার যত কালো"

তপন খাইতে আরম্ভ করিল। মা দেখিতে লাগিলেন, দরজার আড়ালে তপতীর অঞ্চলপ্রান্ত দুলিতেছে। ডাকিলেন, আয় খুকী—খাবি আয়।

তপতী আসিতে আজ সঙ্কুচিত হইতেছে। মা বলিলেন, লজ্জা দেখো মেয়ের! আয়। ও কাল কি বললো জানো বাবা, তপন? বললো, তোমার জামাইএর জন্য খাবার করবো বলতে আমার লজ্জা করে—জামাই তোমার বোঝে না কেন?

বিস্ময়ে হতবাক তপন দুই মুহূর্ত পরে উত্তর দিল,—লজ্জার একটা সুমিষ্ট সৌরভ আছে, মা, আপনার খুকীর আচরণে এযাবৎ সেটা পাইনি। কিন্তু মা ও কথা এবার বন্ধ করুন! অপ্রিয় আলোচনা না করাই ভালো, মা।

—হ্যাঁ বাবা, থাক—পাছে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে উঠিয়া পড়ে, ভয়ে মা আর কোন কথাই তুলিলেন না। তপন চলিয়া গেলে তপতীকে কহিলেন,—তোর কিন্তু এতোটুকু বুদ্ধি নেই খুকী, মিছেই লেখাপড়া শিখছিস।

তপতী আজ এই ভর্ৎসনা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল। তাহার জন্মার্জ্জিত সংস্কার আজ যেন তাহাকে চাবুক মারিয়া বুঝাইতেছে, আপনার স্বামীকে চিনিয়া লইবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত সে এত বিদ্যাতেও অর্জন করে নাই। মা'র কথার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া তপতী হাসিল—এবং আপন ঘরে গিয়া সারাদিন ভাবিয়া একটা প্ল্যান খাড়া করিয়া ফেলিল!

বিকালে জলযোগের জন্য তপন আসিতেই মা কহিলেন—খুকীর বড্ড মাথা ধরেছে, বাবা, ভীষণ কাতরাচ্ছে। ওকে একটু বেড়িয়ে আনো—

—মাথা ধরেছে? কিন্তু আমার সঙ্গে বেড়িয়ে ও বিশেষ কিছু আনন্দ পাবে না, মা—ওর বন্ধুদেব সঙ্গে যেতে বলুন না? গল্প করলে মাথা ধরা সেরে যাবে শিগ্রী।

তপতী সোফায় শুইয়া সব শুনিতেছিল। নিতান্ত করুণ কণ্ঠে কহিল—থাক মা যেতে হবে না—ওর হয়তো কাজ আছে। না হোক বেড়ানো আমার—

তপন বিস্মিত হইয়া কহিল,—আমি না গেলে বেড়ানো হবে না কেন, বুঝতে পারছি না, মা—রোজই তো বেড়াতে যায়।

তপতীর আর বলিবার মতো কথা ফুটিতেছে না। মা ব্যাপারটা বুঝিলেন। কহিলেন,—এতকাল ছেলেমানুষ ছিল, বাবা, চিরকাল কি আর বন্ধুদের সঙ্গে যায়?

তপন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুমিষ্ট হাসো সারা বাড়িটা মুখরিত হইয়া উঠিল। বলিল—বেশ যা-হোক, মা, গতকালই বলেছেন, আপনার খুকী ছেলেমানুষ—আর আজই বড় হয়ে গেল! আপনার বাপের বাড়িতে তাই হয় বুঝি? ঝিঙে, বেগুন, করলা দুইবেলা কিন্তু বাড়ে, মা—আপনার খুকী কি তাহলে...

তপনের বলার ভঙ্গীতে খুকী অবধি হাসিয়া ফেলিল।

মা বলিলেন, দুষ্টুমি কোরো না, বাবা—যাও দুজনে বেড়িয়ে এসো গে—

—আচ্ছা, মা—যথাদেশ—বলিয়া তপন গাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট মাইল বেগে গাড়ী চলিতেছে। কাহারও মুখে কথা নাই। তপতী বাঁ হাতে কপাল টিপিয়া বসিয়া আছে। তপনের দৃষ্টি দূর দিক্‌চক্রে সমাহিত। হুড্-শূন্য গাড়ীর উপর দিয়া যেন ঝড় বহিয়া যাইতেছে। তপতী মাথাটা টিপিয়া বার দুই 'উঃ-আঃ' করিল। তপন নির্বিকারে গাড়ী চালাইতেছে। তপতী মাথার চুলগুলো এলাইয়া দিল। তপনের চোখে-মুখে লাগিতেছে—তপন মুখটা সবাইয়া লইল। ঘাড়টা কাত করিয়া তপতী পিছনের ঠেসায় রাখিল, তপনের বাম বাহুতে তাহার মাথা ঠেকিতেছে—তপন নির্বিকারে গাড়ীর গতিটা বাড়াইয়া দিল। তপতী 'ওগো, মাগো' বলিয়া মাথাটা তপনের বুকের অত্যন্ত নিকটে আনিয়া ফেলিয়েছে—তপনের নিঃশ্বাস তাহার ললাট স্পর্শ করিবে—তপন অকস্মাৎ গাড়ীর গতি অত্যন্ত মন্দ করিয়া দিল, এবং একটু পরেই থামাইয়া ফেলিল। ঘাড় তুলিয়া তপতী চাহিয়া দেখিল, গঙ্গার কূলেই তাহারা আসিয়াছে।

গাড়ীর দরজা খুলিয়া তপন নামিয়া পড়িল। তপতী বিস্মিতা, ব্যথিতা, বিপন্না বোধ করিতে লাগিল। আপনাকে এতখানি অসহায় তাহার কোনদিন মনে হয় নাই। চাহিয়া দেখিল, তপন গঙ্গার জলের ধারে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তপতীও নামিল এবং একটা কাকন্দগাছ হইতে ফুলগুচ্ছ ছিঁড়িয়া তপনের গায়ে ছুঁড়িয়া দিতে দিতে কহিল—'ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায় তার নামটি কি! বলুন তো?'

তপন পিছন ফিরিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। তপতীর এই নির্লজ্জ ন্যাকামী তাহার চির-সহিষ্ণু অন্তরকেও অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছে। যে নারী দিনের পর দিন বিবাহিত স্বামীর অন্তরকে অপমানে বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে—একবার ফিরিয়া দেখে নাই কতখানি শোণিত ক্ষরণ হইল, যে স্বেচ্ছায় অন্য পুরুষের অঙ্গে শয়ন করিয়া স্বামীর কাছে মুক্তি মাগিয়া লয়—আজ আবার কোন্ সাহসে সে স্বামীর সঙ্গে রঙ্গ করিতে আসে!

ইহাই কি আধুনিকার প্রগতি! কিন্তু তপন কাহাকেও আঘাত করে না—তপতীকেও কিছু বলিল না।

তপতী আশা করিয়াছিল, তাহার কবিতার উত্তরে তপন বলিয়া উঠিবে—তার নাম 'তপতী'। কিছুই তপন বলিল না, এমন কি মুখও ফিরাইল না দেখিয়া তপতী অত্যন্ত

মুষড়াইয়া পড়িল। তাহার এতক্ষণকার ব্যবহার মনে করিয়া লজ্জায় তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। নিরুপায়ের শেষ অবলম্বনের মতো সে শুধু বলিল,—বসবেন না একটু?

তপন নীরবে আসিয়া একটু দূরেই বসিল। সবুজ তৃণমণ্ডিত মাঠে একান্ত আত্মীয় দুইটি মানবের একান্ত নীরবতা বুঝি প্রকৃতিকেও পীড়িত করিতেছে—কোথায় একটা পাপিয়া ডাকিয়া উঠিল—'পিউ কাঁহা?' তপতী নির্ভুলভাবেই বুঝিয়াছে, তপন আর কথা কহিবে না! উপায়হীনা তপতী 'উঃ' বলিয়া সেই ঘাসের উপরই তপনের হাঁটুর কাছে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

হয়তো সত্যিই উহার কষ্ট হইতেছে! কারুণ্য কোমল তপন সস্নেহে হাত দিল তপতীর ললাটে। মাথা ধরার কিছুমাত্র লক্ষণ নাই, দিব্যি শীতল স্নিগ্ধ স্পর্শ কপাল, রগ-দুটি যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবেই টিপটিপ করিতেছে। এই মিথ্যাবাদিনী ছলনাময়ী নারীকে তপন বিবাহ করিয়াছে! ঘৃণায় তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! কিন্তু কিছুই সে বলিল না, তপতীর শীতল মসৃণ কপালে তাহার নিপুণ অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল। আরামে তপতীর চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে। এক এক বার সে ভাবিতেছে তপনের হাঁটুর উপর মাথাটা তুলিয়া দিলে কেমন হয়—কিন্তু থাক্, অতটা বাড়াবাড়ি দরকার নাই—যদি নিজেই তুলিয়া লয় তো আরো ভালো হইবে।

—নমস্কার—

তপতী সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল মিঃ বোস তপনকে নমস্কার করিতেছে। তপতীকে চোখ খুলিতে দেখিয়াই কহিল,—মাসিমার কাছে শুনলাম আপনার মাথাব্যথা, তাই এলাম সন্ধান করে করে। কেমন. বোধ করছেন এখন? অ্যাসপিরিন খাবেন?

মিঃ বোসের এত কথার জবাবে তপতী কিছু না বলিয়া পুনরায় চোখ বুজিল। তাহার অত্যন্ত রাগ হইতেছে—কি জন্য আসে সেই মিষ্টার বোস? সে স্বামীর সহিত বেড়াইতে আসিয়াছে, মাথা ধরুক আর মরিয়া যাক্—তিনি দেখিয়া লইবেন; মিঃ বোসের অ্যাসপিরিন লইয়া দরদ দেখাইতে আসিবার কী প্রয়োজন! কিন্তু তপতীর সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—কাঁটার যে জাল সে এতকাল ধরিয়া নিজের চারিদিকে বয়ন করিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে হাতপা এক-আধটু ছড়িয়া যাইবেই। অন্য কোনো অঘটন ঘটিবার আশঙ্কায় তপতী কথাই কহিল না। চতুর মিঃ বোস তপতীর মনের ভাব বুঝিয়া ফেলিলেন। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে স্বামীর সহিত বেড়াইতে না আসিলে লোকে মন্দ বলিবে! তপতীর আজিকার অভিনয় একটা বিশেষ ধাপ্পা। কহিলেন,

—ওয়েল, মিঃ গোস্বামী, আমি আবার মার্জ্জনা চাইছি আপনার কাছে।

—কি হেতু?—তপন পরম ঔদাসীন্যের সহিত প্রশ্ন করিল।

—সেইদিনকার ব্যাপারটার জন্য সত্যিই আমি লজ্জিত।

তপনের মনটা একেই তো তপতীর লজ্জাকর অভিনয়ে তিক্ততায় ভরিয়া ছিল, তার উপর মিঃ বোসের আগমনের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়বার ক্ষমা চাওয়ার সঙ্গে চতুরা তপতীর কোনো উদ্দেশ্য যুক্ত আছে কিনা সে বুঝিতে পারিতেছে না—যথা সংযত হইয়াই উত্তর দিল, সে কথা আর নাই-বা বললেন, মিঃ বোস। আর অপরাধ তো আপনার কিছু নয়—ওর

পিছনে ছিল যাঁর সমর্থন, অপরাধ যদি কিছু ঘটে থাকে তো, সে তাঁর। কিন্তু যারই হোক—আমি সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করছি। বার বার এক কথা বলার দুঃখ থেকে আমায় রেহাই দিন—এই মিনতি করছি আমি।

তপতীর মাথাটা ভূমি হইতে উর্ধ্বে উঠিয়া পড়িল। তপন এমনি করিয়া ভাবিতে পারে। মিঃ বোসের কৃত আচরণের অন্তরালে রহিয়াছে তপতীর সমর্থন! তপনের মননশীলতাকে তপতী আজ কি বলিয়া মিথ্যা প্রমাণ করিবে? আর, মিথ্যা তো নয়! তপতীর সমর্থন না পাইলে মিঃ বোসের সাধ্য কি যে তপনের অসম্মান করে। তপতী চাহিল তপনের মুখের দিকে। মুখ অন্যদিকে ফিরানো রহিয়াছে—তপতী বুঝিল, সে মুখে রাগ বা দ্বেষের কোনো চিহ্ন নাই।

মিঃ বোস বড় থতমত খাইয়া গিয়াছিলেন! একটু সামলাইয়া কহিলেন, আপনাকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম, মিঃ গোস্বামী। আজ কিন্তু সত্যিই আপনাকে আমরা বন্ধুভাবে পেতে চাই—নাউ উই মাষ্ট বি ফ্রেন্ডস্।

তপন চুপ করিয়া রহিল। তপতীর মাথায় হাত তাহার সমানে চলিতেছে।

—চুপ করে আছেন যে মিঃ গোস্বামী? আমার বন্ধুত্ব আপনি স্বীকার করলেন তো?

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিঃ বোস—আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কি করে সম্ভব হতে পারে! আমি দীন, দরিদ্র, নগন্য, অশিক্ষিত মানুষ—আপনারা অভিজাত ; আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বলা আমার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নয় শুধু, অসম্ভব—

—কিন্তু আমি সেটা প্রার্থনা করছি। আমি চাইছি আপনার বন্ধুত্ব।

—ক্ষমা করবেন মিঃ বোস—আমি জীবনে অসত্য কথা উচ্চারণ করিনি ; আমার অভিধানের 'অত্যাগ সহনো বন্ধু' সঠিক অর্থে আপনাকে পাচ্ছিনে—আপনাকে 'বন্ধু' ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

মিঃ বোস নীরব হইয়া গেলেন। অপমানিত বোধ করলেন তিনি। মুখখানি তাঁহার কালো হইয়া গেল। তপন পুনরায় কহিল,—হয়তো আপনি দুঃখ পাচ্ছেন, কিন্তু উপায় কি বলুন? আমার নীতি জগতের কিছুর জন্যই বদলায় না। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ মাত্র দু'দিন পড়লো আজই। এর মধ্যে এমন কিছু হয়নি যে, আমার বিরহে আপনি বুক ফাটাবেন বা আপনার জন্য আমি বুক ফাটাবো। অবশ্য, বন্ধু না বলে আলাপী বলা যেতে পারে!

মিঃ বোস যেন বিদ্রূপ করিবার জন্য বলিলেন—এরকম বুক ফাটা বন্ধু আপনার ক'জন আছেন, মিঃ গোস্বামী?

বিদ্রূপটাকে গ্রাহ্যমাত্র না করিয়া তপন উত্তর দিল,—বেশী তো পাওয়া যায় না, মাত্র একজন আছে।

—আশা করি তিনিও আপনার মতো সংস্কৃত সূত্র মিলিয়ে বন্ধুত্ব করেন?

—তিনি কী করেন, আমার তো জানার দরকার নেই, মিঃ বোস। আমি যা করি তাই আপনাকে বললাম—তপন উঠিয়া গিয়া তপতীর ললাট-আহৃত ক্রীমটার তৈলাক্ত পদার্থটা গঙ্গার জলে ধুইতে বসিল।

মিঃ বোস চাহিলেন তপতীর দিকে সহাস্যে। স্মিতমুখে বলিলেন এমন অদ্ভুত গোঁড়ামী আর দেখেছেন, মিস চ্যাটার্জি? ধন্য আপনার ধৈর্য্য, ওর সঙ্গে এতক্ষণ বসে রয়েছেন।

—আপনার অধৈর্য্য বোধ হয়ে থাকে তো চলে যান—বলিয়া তপতী উঠিয়া বসিল

এবং তপনের অত্যন্ত নিকটে গিয়া বলিল,—চলুন, বাড়ী যাই—ভালো লাগছে না এখানে।

নিস্পৃহের মতো তপন গাড়ীতে আসিয়া বসিল, তপতী পাশে বসিয়াই বলিল,—চলুন, খুব জোরে চালাবেন না লক্ষ্মীটি! ভয় করে।

মিঃ বোস যে ওখানে তখনও বসিয়া আছে তপতী লক্ষ্যমাত্র করিল না। সারা পথ সে তপনের বাম বাহুতে মাথা রাখিয়া চুপ বসিয়া রহিল—তপন একটা কথাও কহিল না, একবারও জিজ্ঞাসা করিল না তপতীর ব্যথাটা সারিয়াছে কিনা।

গাড়ী গেটে ঢুকিতে দেখিয়া তপতী মাথা তুলিল। বুকের আটকানো নিশ্বাসটা যেন তাহাকে রিক্ত-সর্ব্বস্ব করিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছে!

পরদিন কলেজ হইতে ফিরিতেই মা বলিলেন,—আয় খুকী, কিছু রান্না কর দেখি?

তপতী কুণ্ঠিতপদে আসিয়া কহিল,—আজ থাক মা—ও ভাববে, তুমি আমায় প্ররোচিত করেছ, নিজের ইচ্ছায় আমি রান্না করিনি—দু'দিন যাক্ তারপর রাঁধবো।

মা কথাটার মূল্য উপলব্ধি করিলেন।

তপতী কহিল,—ও তো রবিবারে যাবে, মা, শনিবার একটা পার্টি আছে, ও না গেলে কিন্তু আমি যাবো না—লোকে বড্ড কথা বলে।

—তা তুই বলিস্‌নে কেন? অত লাজুক তো তুই নোস্ খুকী?

—লজ্জা নয়, মা, ও এড়িয়ে যায় নানা ছুতোয়—তুমি তো জানো না—বড্ড চালাক ও! আর দেখো মা, এবার যেন ও থার্ড-ক্লাসে না যায়, বলে দিয়ো তুমি—তপতী একটা বালিশের ওয়াড়ে ফুল তুলিতেছিল। মাকে বলিল,—এটা ওর বিছানার সঙ্গে দিতে হবে, মা, কী লিখবো বলো তো?

মা হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা মেয়ে তুই, কী লিখবি আমি তার কি জানি? নিজে না জানিস, ওকেই জিজ্ঞাসা করিস।

—ও কথাই বলতে চায় না—গম্ভীর মেজাজ! ভয় করে আমার।

মোটে গম্ভীর নয়, খুকী তবে এই ক'দিন বোধ হয় একটু ব্যস্ত আছে, তাই—তপন আসিয়া ঢুকিল খাইবার জন্য। মা হাসিয়া বলিলেন,—তুমি কেন এত গম্ভীর হচ্ছো বাবা, তপন? এর মধ্যে এমন বুড়ো তুমি কিছু হওনি! বড্ড কাজের মানুষ হয়েছো, না? কথা বলো না কেন?

উচ্চহাস্য করিয়া তপন বলিল,—আমাদের বয়সের কাঁটাটা আপনার ঘড়িতে ঠিক আপনার প্রয়োজন মতোই চলে—না মা? কিন্তু কী কথা শুনতে চান—বলুন?

—যে কোন কথা বলো, বাবা—গম্ভীর-হওয়া তোমার মানায় না।

আচ্ছা—"মা যদি তুই আকাশ হতিস, আমি চাঁপার গাছ—
তোর সাথে মোর বিনি-কথায় হোত কথার নাচ!"

শুনলেন কথা : আপনি আকাশ তো আছেনই, আমি চাঁপা গাছ হতে পারবো বলে মনে হচ্ছে—বোশেখের খররোদে ফুটবে আমার ফুল, যখন আর সব ফুলের মেলা শেষ হয়ে যাবে, সাঙ্গ হয়ে যাবে বাসন্তী-উৎসব।

—মা তপনের বেদনাহত চিত্তের সন্ধান জানেন না ; কিন্তু তপতীর অন্তর আলোড়িত করিয়া আজ অশ্রুসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে—কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। তপন স্মিতমুখেই খাইতে বসিয়াছে।

মা বলিলেন,—মাদ্রাজে যাবে বাবা, তোমার বিছানাপত্র সব ঠিক করতে হবে। খুকী একটা ওয়াড় তৈরী করছে—কী লিখবে, ওকে বলে দাও তো।

—কিছু তো দরকার নেই বিছানা আমার ঠিক আছে। কিছু লাগবে না, মা!

কোথায় ঠিক আছে, বাবা! তোমার বোনের বাড়ি? তাহলে ওয়াড়টাই নিয়ো শুধু।

ঘরের জিনিস বাইরে কেন নিয়ে যাব, মা—বাইরের জিনিস ঘরে আনাই তো দরকার।

তপতী অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল! তাহার পাণ্ডুর মুখশ্রী দেখিয়া মা অত্যন্ত কষ্টবোধ করিলেন, কিন্তু তপনের সহিত বেশী কথা বলিতে তাঁহার ভয় করে। আজন্ম সত্যনিষ্ঠ এই ছেলেটি একবার 'না' বলিয়া বসিলে চেষ্টাতেও 'হাঁ' হইবে না। অন্য কথার জন্য মা বলিলেন,—এবার কিন্তু তোমার রিজার্ভ-গাড়ীতে যেতে হবে, বাবা, কথা শুনো মায়ের।

—ওরে বাপরে! রিজার্ভ-গাড়ীতে তো রোগী আর ভোগীরা যায়, মা! আমি ভোগী তো-নই-ই, আপনার আশীর্বাদে রোগও নেই কিছু আমার।

—দুষ্টুমি কোরো না, বাবা, আজই গাড়ী রিজার্ভ করো গিয়ে ; টাকা নিয়ে যাও।

—আমি তো অফিসের কাজে যাচ্ছি না, মা। নিজের কাজে যাচ্ছি।

—হোলই বা তোমার নিজের কাজ। টাকা নাও—নইলে আমি বড্ড দুঃখ পাবো।

তপন বড়ই বিপন্ন বোধ করিতে লাগিল। সত্য বলিলে মা বেশী দুঃখ পাইবেন। এই স্নেহশীলা নারীর ব্যথা চোখের সম্মুখে তপন দেখিতে পারে না,—কী জবাব দিবে? ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল,—নিজের কাজটা নিজের টাকায় করা কি বেশী পৌরুষের কথা নয়, মা? সন্তানগর্ব তাতে তো মায়ের বাড়াই উচিত—তপন হাসিয়া উঠিল।

মা নিরুত্তর রহিলেন। এ কথার পর কিছু বলতে যাওয়া চলে না। একটু ভাবিয়া কহিলেন,—কিন্তু থার্ড-ক্লাসে গেলে আমাদের যে অসম্মান হয়, বাবা! তোমার শ্বশুরের দিকটাও তো তোমার দেখা উচিত?

—আচ্ছা মা সেকেন্ড ক্লাসে যাবো—কেমন, খুশী হয়েছেন?

মা চুপ করিয়া রহিলেন। তপতী বুঝিতে পারিল না, মা কেন টাকা লইবার জন্য তপনকে এত ব্যাকুল হয়ে সাধছেন। মা'র কোলের কাছে ঘেঁসিয়া সে কহিল,—পার্টিটার কথাও তুমি বলো মা।

—তুই কেন বলতে পারিসনে, খুকী? শুনছো বাবা, শনিবার তোমাদের একটা পার্টি আছে—যেতে হবে তোমায়, বুঝলে?

—আমার না-গেলে হয় না, মা?-আমি তো কোনদিন যাইনি।

না বাবা, যাও না বলে আমাদের কথা শুনতে হয়। লোকে বলে জামাইকে আমরা লুকিয়ে রেখেছি। তুমি তো লুকোবার মতো জামাই নও, বাবা—আমাদের সম্মান তুমি রক্ষা করবে তো—

তপন নীরবে খাইতে লাগিল। মা আবার বলিতে লাগিলেন,—এখানে না-থাকলেও অবশ্য কথা ছিল না, কিন্তু বাড়িতে থেকেও তুমি সমাজে মুখ দেখাবে না, এ আমাদের বড় লজ্জার কথা। খুকী দুঃখ করে।

আচ্ছা, মা, যাবো—বলিয়া তপন উঠিল।

তপন বাহিরে যাওয়ার পর তপতী মাকে প্রশ্ন করিল,—কিছুই কি নিতে চায় না মা? টাকা নেবার জন্য তুমি এত সাধাসাধি কেন করছো?

—না খুকী, কিছুই নেয় না। ওর দু'শ টাকা মাসোহারার সব টাকাই আমার কাছে জ
রয়েছে, একটি পয়সা কোনদিন নেয়নি।

—তাহলে দু'লাখ টাকা নিয়েছে, শুনলাম যে? সে কথা মিথ্যে?

—না। দু'লাখ টাকা ও নিয়েছে, কিন্তু কি যে করলো সে-টাকা নিয়ে তার কোন খ
পাচ্ছি না আমরা। জিজ্ঞাসা করতেও ভয় হয়, বাছা—ও অদ্ভুত ছেলে। যদি অপমান বে
করে বলে বসে—'চল্লুম আপনার বাড়ি থেকে', তাহলে নিশ্চয় তখুনি চলে যাবে।

কি করে বুঝলে তুমি? টাকা দু'লাখ নিশ্চয় নিয়েছে মা, নইলে ওর এইসব হিল্লী দিল্লী
যাওয়ার খরচ জুটছে কোথা থেকে?

—ও টাকা সে নিজের জন্য নেয়নি, খুকী। আমায় কতবার বলেছে, 'আপনার স্নেহঋণ
কি করে শুধবো তাই ভাবছি, মা, টাকা নিয়ে আর ঋণভার বাড়াতে চাইনে'। কারও দান
গ্রহণ করে না, কখনও মিথ্যা বলে না ও। একদিন এসে বলল—"দিন মা ভাত।" ভাত
রান্না হয়নি বলে বললাম, 'ভাত তো, রাধিনি বাবা'। তাতে বললে কি জানিস,—বললে
'রান্না তবে করুন, মা—নাহলে চাকরদের ভাত আনিয়ে দিন। ভাত খাব বলেছি, ভাতই
খেতে হবে, নইলে মিথ্যা কথা বলা হবে।' সেই রাত্রে চাকরদের ভাত ওকে দিতে হল
খেয়ে আবার বললে, 'আপনার বাড়িতে চাকররা কেমন খায়, মা, সেটা দেখে নিলুম কেমন
কৌশলে—আপনি বুঝতেই পারলেন না।'

তপতী বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল ; তারপর করুণ কণ্ঠে কহিল,—এসব
কথা তুমি আমায় একদিনও তো বল নি, মা!

—তুই-যে কিছু খবর রাখিস না, তা আমি কেমন করে জানবো, বাছা?

তপতী আর কথা না বাড়াইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। ভুল তাহার হইয়া গিয়াছে
অত্যন্ত সাংঘাতিক ভুল, সংশোধনের উপায় আছে কিনা কে জানে!

তপতী সারারাত্রি বসিয়াই কাটাইয়া দিল।

জীবনের ধারাই যেন বদলাইয়া যাইতেছে তপতীর। স্নান সারিয়াই সে আসিয়া
দাঁড়াইল তপনের কক্ষের সম্মুখে! পূজারত তপন স্তোত্র পাঠ করিতেছে,—'শরণাগত
দীনার্ত-পরিত্রাণপরায়ণে, সর্বস্যার্ত্তিহরে দেবী নারায়ণি নমোহস্তুতে'। তপতীও সঙ্গে সঙ্গে
আবৃত্তি করিয়া গেল মনে মনে। এমনি কত-কিছুই সে তাহার ঠাকুরদার কাছে শিখিয়াছিল
সবই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। অথচ এই মহার্ঘ রত্নগুলি রহিয়াছে তাহারই স্বামীর কণ্ঠে। হ্যাঁ
স্বামী! তপতীর যে আজ তপনকে স্বামী ভাবিতে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ হইতেছে। কেন সে
এতদিন দেখে নাই তপনকে? কেন এতবড় ভুল করিল। ঐ-যে সুমিষ্ট কণ্ঠের প্রণতি
ঝরিতেছে—

'অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ, বিভূতিভূষাঙ্গ-জটাধরায়,
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।।'

কী অপরূপ সুন্দর ঐ শ্লোক-মালা! শেলী, কীটস, বায়রণ, টেনিসন সুন্দর সন্দেহ নাই
কিন্তু ঐ যে—অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি, গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি'—উহার
কি কিছু কম সুন্দর, কম আন্তরিকতাপূর্ণ!

তপতীর মনে হইল, ঠাকুরদা বাঁচিয়া থাকিলে তাহার আজ এই দুর্গতি হইত না। কিন্তু
ঠাকুরদা তাঁহার কাজ যথাসম্ভব করিয়া গিয়াছেন, ষোল বৎসর পর্যন্ত তিনি তপতীকে

শিখাইয়া গিয়াছেন আর্য্যনারীর কর্তব্য—স্বামীর প্রতি, সংসারের প্রতি, সমাজের প্রতি। আধুনিক সমাজের সহিত সে পদ্ধতি হয়তো মিলে না কিন্তু তপতী সমন্বয় করিতে পারিল না কেন? কেন সে ঠাকুরদার এতদিনের শিক্ষা একেবারে ভুলিয়া গেল।

তপতীর মনে হইল তাহার পিতামাতাই ইহার জন্য দায়ী। একদিন তপতীর অন্তর ছিল শুদ্ধ হোমাগ্নির মতো পবিত্র, আজ তাহা বাড়বাগ্নি হইয়া উঠিয়াছে। দুটাই অগ্নি, কিন্তু তফাৎ আছে; কত বেশী তফাত তাহা হোমশিখা যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন না। তপতীর মনে পড়িল—জন্মদিনে তপন তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিল—'জীবনে তোমার হোমশিখা জ্বলে উঠুক'—হয়তো আজ তাই হোমশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ঋত্বিক্ তো আসিতেছে না! আসিবে, আসিবে, তপতীর জীবনে তাহার পিতামহের আশীর্বাণী ব্যর্থ হইবে না।

তপন উঠিয়া কখন খাইতে গিয়াছে। তপতীও বুঝিতে পারিয়াই খাবার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল! মা তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন,—খেয়ে একটু ঘুমো গিয়ে, মা—মা মৃদু হাসিলেন।—লজ্জায় তপতী লাল হইয়া উঠিল। মা হয়তো ভাবিয়াছেন, তপনের সহিত তপতী রাত্রি-জাগরণ করিয়াছে। মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল তপতী। কথাটা সত্য হইলে আজিকার লজ্জাটা তপতীর আনন্দেরই দ্যোতক হইতে পারিত ; কিন্তু সত্য নয়। কবে যে সত্য হইবে তাহাও তপতী জানে না। তাহার শ্বাস ভারী হইয়া উঠিল। তপতীর দিকে না চাহিয়াই তপন কহিল,—অধ্যয়ন একটা তপস্যা, মা ভালো করে ওকে পড়তে বলুন—

—হাঁ বাবা, পড়ছে তো, আর তুমি কি করবে, বাবা?—মাতা হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন।

তপন হাসিয়াই জবাব দিল,—'অজরামরবৎ প্রাজ্ঞবিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ'। ও বিদ্যার চিন্তা করুক, মা, আমি অর্থ চিন্তা করছি। ওর তো অর্থের অভাব নেই।

—তোমার বুঝি বড্ড অভাব? মা প্রশ্নটা করিলেন অভিমানাহত স্বরে।

—অর্থের অর্থটা অত্যন্ত ব্যাপক. মা, তার অভাব আমারও আছে বৈকী। ধরুন—পুরুষার্থ, পৌরুষার্থ, পরমার্থ—অর্থের মানে তো শুধু টাকা নয়।

মা চুপ করিয়া রহিলেন ; তপতী মাকে লক্ষ্য করিয়াই যেন অত্যন্ত নিম্নস্বরে কহিল,—অনর্থের মূল হয় অর্থটা সময় সময়—

ব্যবহার না জানলেই হয়। ব্যবহারের গুণে বিষও অমৃত হয়ে ওঠে—উত্তরটা তপনই দিল।

তপতী চুপচাপ বসিয়া ভাবিতেছে—তপন তাহার কথায় উত্তর দিয়াছে। আরো কিছু কথা বলিয়া দেখিবে কি, তপতীর উপর উহার মনের ভাব কিরূপ? বলিল,—অনেক সময় বিষকেও আবার অমৃত বলে ভ্রম হয়।

—বিষকে বিষ বলে চিনবার শক্তিটা মানুষ লাভ করে জন্মার্জিত সংস্কার থেকে, আর শিক্ষা দ্বারা অর্জন করে তাকে অমৃতরূপে ব্যবহার করার শক্তি।

মা উহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন ; আনন্দিত স্বরে প্রশ্ন করিলে,—বিষ আর অমৃতে তাহলে তফাৎ কোথায় বাবা?

—শুধু ব্যবহারে, মা, আর কোন তফাত নেই। সব-ভালো আর মন্দর অতীত এই বিশ্বের প্রত্যেকটি অণু। দেশ ভেদে, কাল ভেদে, পাত্র ভেদে সে বিষ হয়, আবার অমৃতও

হয় ; যেমন—নারী, কোথাও বিলাসের ধ্বংসমূর্ত্তি কোথাও কল্যাণী মাতৃমূর্ত্তি।

তপনের খাওয়া হইয়া গিয়াছে, উঠিয়া যাইতেছিল, তপতী কহিল ধ্বংসমূর্ত্তিকে কল্যাণী-মূর্ত্তি করে গড়ে তোলার ভার থাকে শিল্পীর হাতে।

—হ্যাঁ। কিন্তু শিল্পীর নিষ্ঠুর ছেনীর আঘাত লইবার জন্য মূর্ত্তিকে প্রস্তুত থাকতে হয় বলিয়াই তপন চলিয়া গেল। কিন্তু কী সে বলিয়া গেল। তপতীকে কি তাহার নিষ্ঠুর ছেনীর আঘাত সহ্য করিতে হইবে? হয় হোক,—তপতী সহ্য করিবে। কথায় কথায় যে-লোক বাক্যের এমন ফুলঝুরি ফুটাইতে পারে, অত্যন্ত সহজ ভাষায় অতিশয় আন্তরিকতা দিয়া যে বলিতে পারে—আমি শিল্পী আমি তোমায় ভালবাসি বলিয়াই আমার নিষ্ঠুর অস্ত্রাঘাতে তোমায় নিখুঁত করিয়া তুলিব, তপতী তাহার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়া যাইবে আসুক ঐ রূপকার, আঘাতে আঘাতে তপতীর সমস্ত কুশ্রীতা ঝরাইয়া দিক, ফুটাইয়া তুলুক তপতীর সারা দেহ-মনে অপরূপের মহিমান্বিত ঐশ্বর্য্য!

তপতীর চোখে দুইবিন্দু জল টলমল করিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল মার কাছ হইতে। আশ্চর্য্য! এমন না হইলে মা-বাবা উহাকে কেন এত ভালবাসিবেন? তপতী কেন এতকাল দেখে নাই? কেন সে বন্ধুদের কথা শুনিয়া আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনকে এমন করিয়া অবহেলা করিয়াছে!

কালই মাদ্রাজ চলিয়া যাইবে। আজ বিকেলে উহাকে পার্টিতে লইয়া যাইতে হইবে দেখিবে সকলে, তপতীর স্বামী অপরূপ, অত্যাশ্চর্য্য!

বিকেলে সুসজ্জিত তপতী অপেক্ষা করিতেছিল, তপন আসিতেই তাহাকে পাশে বসাইয়া স্বয়ং গাড়ী চালাইয়া চলিল। মুখখানি তাহার হাসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে তাহার অন্তর আজ প্রেমের রক্তিমায়। যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনার সহিত তপন ও তপতীকে বসনো হইল। তপন ভাবিতেছে, তাহাকে এভাবে এখানে লইয়া আসিবার কি কারণ থাকিতে পারে তপতীর পক্ষে! তপতী কি আজ এতকাল পরে তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল নাকি! না—লোকের কথা বলা বন্ধ করিবার জন্যই তপতী এ খেলা খেলিতেছে! আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য তপতীর মতো মেয়ে সবই করিতে পারে। কিন্তু তপতীর অদ্যকার আচরণ অত্যন্ত আন্তরিক। তপন নীরবে ভাবিতে লাগিল।

একটি মেয়ে বলিল,—আপনি নিরামিষ খান—এখানে অসুবিধা হবে না তো?

—না, কিছু না। মাংস ছুঁলেই আমার জাত যায় না।

—তাহলে খান না কেন? গোঁড়া তো আপনি নন দেখছি।

—অনেকগুলো কারণ আছে না-খাবার। তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক কারণটা হচ্ছে—বহু যুগ ধরে সিদ্ধকরা খাদ্য খেয়ে আর শাকশব্জি খেয়ে মানুষের পাকস্থলী বেশী মাংস খাবার যোগ্যতা হারিয়েছে। যে-কোন মাংসাশী জন্তুর পাকস্থলীর সঙ্গে মানুষের পাকস্থলীর তুলনা করলেই সেটা বোঝা যাবে।

—অন্য কারণটা কি?

—পৃথিবীতে ফল-মূল-শস্যের তো অভাব নেই—মাংস খাওয়া নিষ্প্রয়োজন, অন্তত আমাদের গরম দেশে অলস কর্ম্ম-জীবনে দরকার হয় না মাংস খাবার।

—মাংস কিন্তু শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে।

—ওটা ভুল ধারণা। ঘোড়ার থেকে বেশি শক্তি নেই বাঘের ; থাবা থাকলে ঘোড়ার সঙ্গে যুদ্ধে বাঘ নিশ্চয় হেরে যেতো। ঘোড়া মাংস খায় না।

তপনের যুক্তির উৎকৃষ্টতা সকলকে আকৃষ্ট করিল। মেয়েটি বলিল,—আরো কোনো কারণ আছে কি আপনার মাংস না-খাবার?

হ্যাঁ, মনের সাত্ত্বিকতা ওতে ক্ষুণ্ণ হয়। মনকে যারা লালন করতে চায় মানুষের মতো করে, এই উষ্ণ দেশে তাদের মাংস না খাওয়াই উচিত। পার্থিব চিন্তার ধারা হয়তো ওতে বিকৃত না হতে পারে কিন্তু পৃথিবীর ওপারের বিষয়ও চিন্তা করে এমন লোকের অভাব নেই।

আলোচনাটা গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে, তরল করিবার জন্য একজন কহিল,—আপনি এতকাল আমাদের কাছে আসেননি কেন বলুন তো? ভয়ে?

অপরাধটা তপতীরই। সে তপনকে লইয়া অসিবার জন্য কোনদিন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। তপন কি বলে, শুনিবার জন্য সে উৎসুক হইয়া উঠিল। তপন হাসিয়া উত্তর দিল—অত্যন্ত বেমানান ঠেকবে বলে। পলাশফুল বনেই থাকে—মার্কেটের কাচের ঘরে ওকে মানায় না।

কথাটায় তপনের বিনায়াতিশয্যের সহিত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ মিশিয়া আছে।

—আমরা বুঝি কাচের ঘরে থাকি।—আমাদের এমনি অসম্মান করবেন নাকি আপনি?—মেয়েটি বলিল।

—ঐ ভয়েই তো আসিনি। আপনাদের সম্মান এবং অসম্মানের দেওয়ালগুলো এত ঠুনকো যে ঢুকতে ভয় করে। অতি সাবধানে টেলিফোন করে বলতে হয়—চার ডজন গোলাপ, দু' ডজন ক্রীসান্থীমাম, পাঁচ ডজন কস্‌মস্...

তপনের বলার ভঙ্গীতে অনেকেই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু যে মেয়েটি অসম্মানের কথা তুলিয়াছিল, সে বলিল বিদ্রূপ করিয়া—আর বনে গিয়ে আপনার ঘাড় মটকে আনতে হয়, কেমন?—তপন নিঃশব্দে হাসিল। মেয়েটি পুনরায় বলিল,—আমরা যে কাচের ঘরের সাজানো ফুল, সেটা আপনি প্রমাণ করুন, নইলে ছাড়ছি না।

—না-ছাড়লে অসুবিধা হবে না, কাচের ঘরে ঢুকতে সাধ হয় মাঝে মাঝে।

—তা হলে এবার ঢুকে পড়লেন—কেমন—? মেয়েটি তপনকে ঠকাইয়াছে।

আমার ঢুকবার অনুমতি দিয়ে এবার কিন্তু আপনিই প্রমাণ করলেন যে, এটা কাচের ঘর।—তপন হাসিল।

মেয়েটি আপনার বাক্যজালে জড়িত হইয়া এমন নির্বোধের মতো ঠকিয়া গেল দেখিয়া সকলেই বলিল—যা যা, কথা কহিতে জানিস নে।—লজ্জিত হইয়া মেয়েটিও হাসিতে লাগিল। তপতীর অন্তর আনন্দে শিহরিয়া উঠিতেছে। এই তপন—তাহার স্বামী যাহার সহিত কথায় পাল্লা দিতে পারে এমন মেয়ে এখানে একটিও নাই?

মিঃ অধিকারী এবং মিঃ বোস আসিয়া দর্শন দিলেন তপনের আসনের পার্শ্বে। মিঃ বোস ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—পুজোর সঙ্গে পার্টির মিস্কচারের ঋষি-সূত্রটা কি তপনবাবু?

কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া তপন উত্তর দিল,—মোগলের সঙ্গে খানা-খাওয়া।

মিঃ বোসকে পরাজিত দেখিয়া মিঃ অধিকারী আরম্ভ করিলেন,—টিকির মাহাত্ম্যটা একটু বর্ণনা করবেন, তপনবাবু—আপনার পাঁচালী থেকে?

সদাহাস্যময় তপন তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করিল,—

টিকির মাহাত্ম-কথা করিব বর্ণন,
অবধান করো সব টিকিহীন জন!
টিকিটি রাখিবে যেবা জয় হবে তার,
টিকি না-থাকায় হারে জজ-ব্যারিষ্টার!
কহিল টিকির কথা বেচারা তপন,
টিকিতে বাঁধিয়া নিয়ো রমণীর মন!

হা হা করিয়া তরুণীর দল কলহাস্যে সভা মুখরিত করিয়া তুলিল। মিঃ অধিকারী ও মিঃ বোস রোষে ফুলিয়া উঠিতেছিলেন—মিঃ বোস কহিলেন,—অত উৎফুল্ল হবেন না। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, 'ফুল্‌স রাশ ইন হোয়্যার এঞ্জেল্‌স...মিঃ বোস থামিলেন।

ক্রোধে তপতীর দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিতেছে। তাহার স্বামীকে তাহারই সম্মুখে ইহারা 'ফুল' বলিবে এবং তাহা তাহারই জন্য? কিন্তু তপন জবাব দিল, দেবদূতরা বেশী সাবধানী, তাদের পথ গোনাগাঁথার গলিতে, আর বোকাদের পথ দরাজ বড় রাস্তা—তাই এসব ব্যাপারে বোকারাই জয়ী হয় চিরদিন। জয়ী না হলেও তারা মরতে পিছোয় না, চালাক দেবদূতদের মতো লাভ আর লোকসান খতিয়ে দেখবার বুদ্ধি তাদের নেই।

মুখের মতো জবাব হইয়া গিয়াছে। নির্ভীক তপন নিঃসঙ্কোচে নিজেকে 'বোকা মানিয়া লইয়াই যাহা জবাব দিল, তরুণীর দল তাহার প্রশংসা না করিয়াই পারে না।

জনৈকা মহিলা কহিলেন—আপনি বোকা? চালাক কে তবে!

—যাদের 'লাক্' চা-চকোলেট আর চপ খেয়ে দিনে দিনে ফুলে ওঠে। তপন উত্তর দিল।

কথাটার মধ্যে যে হুল ছিল, তাহার বিষ তপতীকে পর্যন্ত কুণ্ঠিত করিয়া দিল। মিঃ অধিকারী দাঁড়াইয়া উঠিলেন ; বলিলেন,—আপনি আর আমাদের চা-চপ খেতে ডাকবেন না, তপতী দেবী, উনি সইতে পারেন না বোঝা যাচ্ছে—

তপতী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল,—আমি বড্ড লজ্জা পেলাম, মিঃ অধিকারী আমিই আপনাদের কাছে মাপ চাইছি এর জন্যে।—তপতী হাতজোড় করিল।

যেন কোন মহার্ঘ্য বস্তু লাভ করিয়াছে, তপন এমনি ভাবে হাসিয়া উঠিল ; বলিল, আমিও মাপ চাইছি, মিঃ অধিকারী। কিন্তু রসিকতা করে আঘাত করতে এলে প্রতিঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, এই কথা আমাদের বোকার অভিধানে লেখে। আর আমি শুধু প্রমাণ করে দিলাম যে, বোকা অসুররা মাঝে মাঝে জয়লাভ করলেও স্বর্গরাজ্য পরিণামে দেবতাদেরই, কারণ বোকা অসুররা সেটা রক্ষা করতে পারে না—এ কথা জেনেও তারা স্বর্গরাজ্য লাভের জন্য হাত বাড়ায়—বোকা কিনা, তাই! স্বর্গ কিন্তু দেবতাদের পথ তাকিয়েই থাকে।

মিঃ অধিকারী ও মিঃ বোস খুসী হইয়া উঠিয়াছেন তপতীর সহানুভূতি পাইয়া। তপন বলিয়া চলিয়াছে তখনও,—আপনারা আমার এই ইচ্ছাকৃত অপরাধটা ক্ষমা না করলেও জয়ী আপনারাই।

তপন কী বলিতে চাহিতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া মিঃ অধিকারী ও মিঃ বোস তাকাইয়া রহিলেন। তপতী কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কেন সে মরতে সহানুভূতি

দেখাইতে গেল! মিঃ অধিকারীরা চটিলে তাহার কি বহিয়া যাইবে? কিছু একটা বলা উচিত ভাবিয়া সে বলিল, খাওয়ার খোঁটা দেওয়া খুব অন্যায়।

তপন কহিল,—চা-চপ-খাদকদের চালাক আর 'লাকী' বলায় কোনো ব্যক্তিকে খোঁটা দেওয়া হয়, আমার ধারণা ছিল না!

—অন্য ক্ষেত্রে হয়তো কথাটা দোষের নয়, এক্ষেত্রে অত্যন্ত অভদ্র শোনাচ্ছে।

তপন নির্বিকার চিত্তে তপতীর কথার উত্তরে মিঃ অধিকারীকে হাসিয়া কহিল,—ভদ্র তো আমি নই, মিঃ অধিকারী—বুদ্ধিও নেই। আমার কথাটা তো আপনাদের সুবুদ্ধি হেসেই উড়িয়ে দিতে পারতো।

একটি তরুণী বলিল,—রিয়েলি! রসিকতা করতে এসে রাগ করা চলে না। আপনারা 'ফুল' বলায় উনি কত সুন্দর করে জবাব দিলেন, আর উনি এমন কিছুই বলেননি যাতে আপনাদের চটে যাওয়া চলে।

মিঃ অধিকারী এতক্ষণে বুঝিলেন, চটিয়া যাওয়া তাঁহার অন্যায় হইয়াছে। কহিলেন,—আপনাকে এরকম কথা বললে আপনি কী করতেন?

তপন বলিল,—আমার বোকা বুদ্ধিতে চা আর চপ বেশী করে খেয়ে 'লাকী' হতাম।

তপনের মুখের ভাব ও কথার ভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া উঠিল। মিঃ বোস কহিলেন,—আচ্ছা, যেতে দিন—আসুন, চা-ই খাওয়া যাক আর এক কাপ।

একটি মেয়ে বলিল, তা হলে আপনি সত্যই চালাক হতে চান?

মিঃ অধিকারীর মুখখানা তখনও গম্ভীর ছিল ; বলিলেন,—দিন, খেয়েছি কিন্তু—

তপন হাসিয়া কহিল,—কিছু কিন্তু না, মিঃ অধিকারী, অধিকন্তুটা অনেক সময় আরাম দেয়! যেমন ধরুন—চশমার উপর সান্-গ্লাস, চিবুকের নীচে নেকটাই ; পাঞ্জাবীর উপর চাদর, চামড়ার উপর উল্কী, চায়ের উপর চাঁদমুখ...

হাসিতেছে সকলেই। মিঃ অধিকারীও আর না হাসিয়া পারিল না।

স্মিতমুখে কহিলেন,—রিয়েলি, বাংলা ভাষাটা আপনার আশ্চর্য্য রকম আয়ত্তে—

মিঃ বোস কহিলে,—কিন্তু উনি আমাদের বন্ধু হতে চান না—'সো স্যরি'।

—সার্টেনলি হি উইল বি। নইলে আমরা ওঁকে ছাড়বো না—মিঃ অধিকারী কহিলেন।

তপতী নীরবে চা খাইতেছে। ইচ্ছা করিয়াই যে কঠিন পরিস্থিতির সে সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা হইতে সে মুক্তিলাভ করিল এতক্ষণে। তপতীর মনে এখনও ইহারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। তপন বুঝিল, ইহাদের এতটুকু অসম্মান আজও তপতী সহিতে পারে না। আর তপনের বেলায়?—'আমাকে এবার যেতে হবে, অনুগ্রহ করে অনুমতি দিন!" তপন আবেদন করিল।

—না—না—না, ভারী সুন্দর লাগছে আপনার কথা, এখনি কেন যাবেন?

তরুণীর দল তপনকে ছাড়িতে চাহে না। মিঃ অধিকারী ও মিঃ বোস ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহাদিগকে অসম্মান করিয়াই লোকটা তরুণীমহলে খাতির জমাইয়া ফেলিতেছে! মিঃ বোস কহিলেন, কারও কথায় ওঁর নীতি বদলায় না শুনেছি। অনুরোধ বৃথা!

মিঃ অধিকারীও কথাটায় সায় দিয়া কহিলেন, কাজের মানুষদের আটকাতে নেই।

তরুণীদের একজন চটিয়া বলিল,—আপনারা চান যে, উনি চলে যান, নয়?—রাগটা

সামলাইতে গিয়া মিঃ বোস ও মিঃ অধিকারী চুপ হইয়া গেলেন!—সমস্ত অবস্থাকে সামলাইবার জন্য তপতী কহিল,—না রে, কাজ আছে—যাই আমরা—

—তুই থাম্ তো তপি! ওকে এতকাল কিসের জন্য লুকিয়ে রেখেছিলি বল?

তপতী কোনো উত্তর দিবার পূর্বেই তপন হাসিয়া কহিল,—অচল টাকা বার করা বোকামী—লুকিয়ে রাখতে হয় নিতান্ত ফেলে দিতে না পারলে।

তপন উঠিল ; তপতীর মন আচ্ছন্ন করিয়া ধ্বনিয়া উঠিল বেদনার সুর। তপনকে সে অচল টাকাই মনে করিয়াছে। বারম্বার আঘাত করিয়াছে হাতুড়ী দিয়া—নখের কোণায় বাজাইয়া দেখে নাই।

গাড়ী চলিতে চলিতে তপন একটা কথাও বলিতেছে না। তপতীর মন বিষাদ সাগরে ডুবিয়া যাইতেছে। কেন সে মিঃ অধিকারীদের সহানুভূতি দেখাইতে গেল? যে-কোন অবস্থা-বিপর্য্যয়কে অনায়াসে আয়ত্তে আনিবার শক্তি যে তপনের অসাধারণ, ইহা তপতী আজ ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে। তপন নিজেই তো সমস্ত সামলাইয়া লইল। বরং রসিকতা করিতে আসিয়া চটিয়া যাওয়ার জন্য মিঃ অধিকারী লজ্জাই পাইলেন। কিন্তু তপন কী ভাবিতেছে তপতীর সম্বন্ধে? হয়তো ভাবিতেছে, তপতী আজও উহাদের জান্য তপনকে অভদ্র বলে। এখনও তপতী উহাদের অসম্মান সহিতে পারে না। তপতীর মাথা ঠুকিয়া মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু এখন আর উপায় নাই।

গেটে গাড়ীটা ঢুকাইয়া দিয়া তপন পুনরায় বাহির হইয়া গেল।

প্রেম যখন অন্তরে সত্য-সত্যই জাগিয়া উঠে তখন অনেক কথাই বলি-বলি করিয়া বলা হয় না। সমস্ত রাত্রি তপতী জাগিয়া রহিয়াছে, এতটা সময় চলিয়া গেল, অথচ কিছুই তাহার বলা হইল না তপনকে। কতবার তপতী ভাবিল—ঐ তো ও-ঘরে তপন ঘুমাইতেছে, তপতী গিয়া ডাকিলেই পারে ; কিন্তু লজ্জায় পা চলিতেছে না। এত কাণ্ডের পর তপতী আজ কি করিয়া তপনকে ভালবাসার কথা বলিবে। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় তাহার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া ফিরিতেছে, তপতী আপনাকে নিঃশেষে তপনের কাছে মুক্ত করিয়া দিবার কোনো পথই খুঁজিয়া পাইতেছে না! তপন যদি তাহাকে তাড়াইয়া দেয়! যদি বলে —কেন এ ছলনা করিতে আসিয়াছ? তপতী সে অপমানও সহা করিতে পারে ; কিন্তু তপন হয়তো কিছুই বলিবে না, নীরবে শুনিবে এবং নির্লিপ্তের মতো চলিয়া যাইবে। তথাপি তপতী একবার চেষ্টা করিবেই ; রাত্রিতে আর উঠাইবার কাজ নাই, ঘুমাক, সকালে সময় পাওয়া যাইবে নিশ্চয়।

প্রত্যূষে স্নান সারিয়া তপতী গিয়া দাঁড়াইল খাইবার ঘরে! মাও আসিলেন—তপনের জন্য খাবার প্রস্তুত করিতে হইবে।

—কাল পার্টিতে তপনকে দেখে সবাই কি বললো রে খুকী?—মাতার প্রশ্নের উত্তরে তপতী হাসিমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রইল ; তারপর বলিল,—সবাই খুব ভালো বললো।

মা মধুর হাসিয়া বলিলেন,—আমার কথা ঠিক তো? দেখ এবার—

তপতী কিছু বলিল না ; হাসিমুখে লুচি বেলিতে লাগিল। তপন আসিয়া ঢুকিল। এত সকালে আসিবে, মা তাহা ভাবেন নাই। বলিলেন,—আটটার ট্রেন, বাবা, এত তাড়া কেন তোমার? ছটা তো বাজলো।

—সাতটায় বেরবো, মা,—খাবো, কাপড় পরবো,—একঘণ্টা তো সময়। দিন!

তপন খাইতে বসিল! তাহার ললাটের ত্রিপুণ্ড রেখায় আজ রক্তচন্দনের আভা, পরণে ক্ষৌমাবস্ত্র, গলায় উত্তরীয়। তপতী বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল এই অসাধারণ পবিত্রতার দিকে। তপন কথা বলিতেছে না দেখিয়া মা কহিলেন,—পৌঁছেই চিঠি দিয়ো বাবা, ভুলো না যেন।

না মা, চিঠি দেবো পৌঁছেই!

—খুকী তো স্টেশন যাচ্ছিস 'সী-অফ' করতে?

—না মা, ও কিজন্যে কষ্ট করে যাবে? ফিরতে বেলা হয়ে যাবে অনর্থক। তাছাড়া আমি ট্যাক্সিতে যাচ্ছি, বাড়ির গাড়ী নিলাম না—বলিয়া খাইতে লাগিল। তপতী কিছুই বলিতে পারিল না।

বাকী যাহা বলিবার তপতী বলিবে ভাবিয়া মা আর কিছু বলিলেন না। তপন নীরবে খাইয়া উঠিয়া গেলে মা তপতীকে চা ও খাবার দিয়া বলিলেন,—সুটকেশগুলো গুছিয়ে দিয়েছিস?

দারুণ মানসিক উত্তেজনায় তপতীর সে কথা মনেই ছিল না।

—যাচ্ছি—বলিয়া তপতী তাড়াতাড়ি খাইয়া তপনের ঘরে আসিল, সুটকেস গুছানো এবং চাবিবন্ধ রহিয়াছে। তপনের কাপড় পরাও হইয়া গিয়াছে, একটা চাকর তাহার জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিল। অন্য একজন সুটকেস-দুইটি গাড়ীতে লইয়া গেল। তপনও বাহিরে যাইতেছে,—সম্মুখে তপতীকে দেখিয়া বলিল আচ্ছা—চল্লাম—নমস্কার। তপন চলিয়া গেল মাকে প্রণাম করিতে; পরে মিঃ চ্যাটার্জিকেও প্রণাম করিল—এবং নীচে নামিয়া গেল।

সম্বিৎলব্ধা তপতী ছুটিয়া নীচে আসিবার পূর্বেই তপনের গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে।

কিছুই বলা হইল না...না, বলিতেই হইবে। তপতী তৎক্ষণাৎ একখানা গাড়ী আনাইয়া স্টেশনে ছুটিল। ট্রেন ছাড়িতে মাত্র কয়েক মিনিট বিলম্ব আছে। তপতী ছুটিতে ছুটিতে গিয়া প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়াই দেখিল—বোনটির হাত ধরিয়া তপতী দাঁড়াইয়া আছে। মনটা তাহার দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠিল ক্ষণিকের জন্য, কিন্তু সবলে সমস্ত দৌর্বল্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া তপতী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল...মেয়েটা কাঁদিতেছে—উদ্বেল আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। তপন বলিতেছে তাহাকে,—লক্ষ্মী বোনটি, এমন করে কাঁদে না—যাও, স্বামীর কাছে যাও, স্বামীর চেয়ে বড় বস্তু নারীজীবনের আর কিছু নেই, এই কথা তোকে আমি আজন্ম শিখিয়ে এসেছি—ওরে ধর ওকে!—একটি সুন্দর যুবক আগাইয়া আসিল। মেয়েটা কিছুতেই তপনকে ছাড়িতেছে না, হু হু করিয়া কাঁদিতেছে। তপন তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কহিল,—ছি মীরা, এতকালের শিক্ষা আমার সব পণ্ড করে দিবি তুই? চুপ কর্—আয়, ওঠ্, ধরিত্রির মতো সহিষ্ণু হোস্—আকাশের মতো উদার হোস—সূর্যালোকের মতো পবিত্র থাকিস্...

গাড়ী ছাড়িতেছে। তপন পা-দানিতে উঠিয়া পড়িল। চোখের জলে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, তথাপি মেয়েটা তাকাইয়া আছে, অপসৃয়মান গাড়ীটার দিকে। তপতী যে এত কাছে দাঁড়াইয়া আছে উহাকে কেহ দেখিলই না। তপন এ মুখে ফিরে নাই, আর ইহারা তপতীকে চেনে না! কিন্তু কেন ও এত কাঁদিতেছে? মাদ্রাজ গেল, কয়েকদিন পরেই ফিরিয়া আসিবে, তাহার জন্য এত কান্নার বাড়াবাড়ি কেন। তপতী বিস্মিতা ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কী গভীর কারণ থাকিতে পারে ঐ কান্নার? ধীরে ধীরে সরিয়া আসিয়া সে সহানুভূতি

জানাইতে মীরার হাতটা ধরিতে গেল, চমকাইয়া মীরা কহিল,—কে আপনি? তৎক্ষণাৎ তপতীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল,—ও, লজ্জা করে না আমায় ছুঁতে—হাতখানা মীরা টানিয়া লইল!

তাহার স্বামী বলিল,—ছিঃ ছিঃ, ওরকম করে বলতে আছে?

মীরা সরোষে গর্জিয়া উঠিল,—জুতোর ঠোক্করে নাক ভেঙে দেবো না। দাদাকে আমার দেশান্তরী করে দিল, আবার 'লাভার'-এর দেওয়া আংটি হাতে পরে 'সী-অফ' করতে এসেছে। চলো, চলো—ওর মুখ দেখলে গঙ্গা-নাইতে হয়!—মীরা তৎক্ষণাৎ স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

যে কথা কেহ কোনদিন বলে নাই, বলিবার কল্পনা পর্যন্ত করিতে পারে না, মীরা তাহাই বলিয়া গিয়াছে। তপতীর সমস্ত আভিজাত্য সমস্ত অহঙ্কার ধরার ধুলায় লুটাইয়া দিয়া গেল। 'লাভার'-এর দেওয়া অংটি' হাতে প'রে...তপতী শিহরিয়া আপনার বাম হাতের অনামিকার দিকে চাহিল—মিঃ অধিকারীর প্রদত্ত আংটির হীরকখণ্ডটি জ্বলজ্বল করিতেছে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। আপনার অজ্ঞাতসারেই তপতী আংটি খুলিয়া ফেলিল।

তপন যাহা কোনদিন বলে নাই, মীরা তাহাই নিতান্ত সহজে বলিয়া দিল! বিরুদ্ধে তপতীর কিছু বলিবার নাই। আজ দীর্ঘ পাঁচমাস সে ঐ আংটি পরিয়া আছে। তপতীর চরিত্রের বিরুদ্ধে ঐ জ্বলন্ত জাগ্রত প্রমাণকে লুপ্ত করিবার শক্তি আজ আর কাহারও নাই।

মৃত্যু-পাণ্ডুর তপতী আসিয়া গাড়ীতে উঠিল।

—ওর বোনের ঠিকানাটা তুমি জানো মা? তপতী মাকে প্রশ্ন করিল।

—না রে—কেন, তুই জানিস নে? দেখিস্‌নি তাকে তুই?—মা প্রতিপ্রশ্ন করিলেন।

—দেখেছি সেদিন স্টেশনে! কিন্তু ঠিকানা জানবার আগেই চলে গেল।

—বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে মা! ওকে একদিন তোর গিয়ে আনা উচিত ছিল।

—তুমিও তো বলোনি মা, আজ বলছো অন্যায় হয়েছে।—তপতীর কণ্ঠস্বর ব্যথা করুণ শুনাইতেছে।

স্বামী বিরহ-বিধুরা কন্যার কথা শুনিয়া মা সস্নেহে বলিলেন,—তপন ফিরে এলেই যাবি একদিন,—আজ বোধ হয় তার চিঠি পাবি তুই।

বিষণ্ণা তপতী বিশুষ্ক মুখে চলিয়া গেল। সে চিঠি পাইবে! এতবড় ভাগ্য সে অর্জন করে নাই আজও। এই দীর্ঘ সাতদিন প্রতিটি মুহূর্ত তপতীর অন্তর ধ্যান করিয়াছে তপনের মূর্তি—কিন্তু তাহার অত্যন্ত দেরী হইয়া গিয়াছে। শুধু দেরী হইলেই হয়তো ক্ষতি হইত না, তপতীর অন্তঃসারশূন্য অহঙ্কার তপনকে বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে, বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে তপতীর অন্তর হইতে তাহার অন্তরতমকে। ভাবিয়া ভাবিয়া তপতী ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। তাহার পুণ্যশ্লোক ঠাকুরদা যেন তাহাকে চোখ রাঙাইয়া বলেন,—"অ্যাতো শেখালাম, খুকী—সব পণ্ড করে দিলি!" কিন্তু কেন সে এত ভাবিতেছে? তপন তো কয়েকদিন পরেই ফিরিয়া আসিবে। মীরা বলিয়াছে তাহাকে অত্যন্ত কুৎসিৎ কথা, কিন্তু তপন তো কোনদিন কিছু বলে নাই। যেদিন সে মিঃ ব্যানার্জীর কোলে শুইয়া তপনের কাছে মুক্তি-ভিক্ষা চাহিয়াছিল, সেদিন...হ্যাঁ, সেদিন কিন্তু তপন অসহ্য বেদনায় লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

সময় আব কাটিতে চাহে না—কতক্ষণে 'ডাক' আসিবে। তপতী জানে তপন তাহাকে

চিঠি লিখিবে না—কিন্তু মা'র পত্রে খবরটা জানা যাইবে। অতদূর রাস্তা, ইন্টার-ক্লাসে গিয়াছে, ভালোয় ভালোয় পৌঁছাইলেই ভালো।

মা ডাকিলেন,—আয় খুকী—চিঠি এসেছে, পড়—

তপতী পড়িল,—'মা' আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে নিরাপদে এসে পৌঁছেছি ; আছি সমুদ্রের কিনারে। এ নীড় কালই ছাড়তে হবে। গতরাত্রে শুনেছি সাগরের অশান্ত কল্লোল ; মনে হচ্ছিল, দুহিতা ভারতের দুর্দশায় বিগলিত-হৃদয় মহাসিন্ধুর আর্তনাদ বুঝি আর থামবে না।

আমার কোটি কোটি প্রণাম জানবেন। ইতি—তপন।'

সামান্য কয়েকটি লাইন মাত্র। কিন্তু তপতীর মনে হইল, দুহিতা ভারতের দুর্দশায় বুঝি কোনো হৃদয়-সমুদ্র-ক্রন্দনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। মাকে চিঠিখানা ফিরাইয়া দিয়া তপতী আসিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

বিকালে ঝি আসিয়া সংবাদ দিল—মিঃ ব্যানার্জী, মিঃ বোস, মিঃ অধিকারী ইত্যাদি সব আসিয়াছেন। তপতী যাইতে পারিবে না বলিয়া দিল। মা মেয়েকে একটু অন্যমনা করিবার জন্য বলিলেন,—যা না, মা একটু গল্প কর গিয়ে—না-হয় খেলা করগে একটু—

তপতী অকস্মাৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, যাবো না, যাও।

মা তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া নীরবেই চলিয়া গেলেন। ভাবিতে লাগিলেন সেই তপতী, যে দিনরাত হাসিখুসি আর গল্প লইয়া মাতিয়া থাকিত, সেই কিনা স্বামী বিরহে একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

তাঁহার আনন্দ হইল, হাসিও পাইল। ভাবিলেন, তপন খুকীকে আলাদা পত্র না-দেওয়ায় উহার অভিমানটা হয়তো বেশী হইয়াছে। যা রাগী মেয়ে। তপন যে খুব ব্যস্ত রহিয়াছে সেখানে, ইহা খুকী কেন বুঝিতেছে না।

কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, প্রায় পনের দিন কাটিল, না-আসিল খুকীর চিঠি, না-বা মার চিঠি। মা-ও এখন ভাবিতেছেন। স্বামীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তিনিও তপনের কোনো পত্র পান নাই। তপতীকে ডাকিয়া কহিলেন,—তোকে কি বলে গেছে রে খুকী?

—মাস দুই দেরী হবে, বলেছে, মা। তপতী মৃদুস্বরে উত্তর দিল।

মা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তপতী অত্যন্ত বিমনা হইয়া পড়িয়াছে। মেয়ে কষ্ট পাইতেছে ভাবিয়া মা আর কোনো কথা তুলিলেন না।

তপতীর কিন্তু মনে পড়িয়া গিয়াছে মীরার কথাটা—'দাদাকে আমার দেশান্তরী করে দিল!' সত্যিই কি তাই? সত্যই কি তপন আর আসিবে না? তারই জন্য কি মীরা সেদিন অত কান্নায় ভাঙিয়া পড়িতেছিল? হয়তো তাই—হয়তো তপতীকে সত্য-সত্যই তপন মুক্তি দিয়া গিয়াছে!

তপতী আর অধিক ভাবিতে ভরসা পাইতেছে না। ভাবনার সূত্র ধরিয়া উঠিয়া আসিতেছে মিঃ ব্যানার্জি, মিঃ বোস, মিঃ সান্যাল—তপনকে অপমান করিতে তপতী যাহাদিগকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছে। যাহারা বলিয়াছে,—তপন নির্লজ্জ, উহার মান-অপমান জ্ঞান নাই—তাহারাই আজ অজস্র অবহেলা সহ্য করিয়া তপতীর দরজায় ধরণা দেয়। আর তপন, প্রত্যেকটি কথায় যাহার অনুভূতির মণি-মাণিক্য ছড়াইয়া যাহার বিনয়ের

মধ্যেও জাগিয়া থাকে যুগ-সঞ্চিত সংস্কারের আভিজাত্য, অপমানকে যে নীলকণ্ঠের মতো আত্মসাৎ করিয়া অমৃত বর্ষণ করিয়া যায়—সেই ঋষির মতো স্বামী তপনকে সে অপমান করাইয়াছে ঐসব পথের কুকুর দিয়া!...বেদনায় তপতীর অন্তর অসাড় হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু কী করিবার আছে। ঠিকানা পর্যন্ত দিল না। বোনের ঠিকানাটাও জানিয়া লওয়া হয় নাই। তপতী চারিদিকেই অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

মিঃ চ্যাটার্জী আসিয়া কহিলেন,—ওগো শুনছো, তোমার জামাই-এর কাণ্ড দ্যাখো—

তপতী তৎক্ষণাৎ কান খাড়া করিল। মা-বলিলেন,—খবর পেয়েছ?

—না। খুকী চিঠি পায় নি?—মিঃ চ্যাটার্জী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

—না।—বলিয়া তপতীর মাতা একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন! পুনরায় বলিলেন, —কী কাণ্ড তবে?

—অফিসের একটা কেরানীর অসুখ ছিল প্রায় তিন-চারমাস। তপন তাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। আজ সে ফিরে এসে আমার পায়ে আছড়ে পড়ে বললে—তার অ্যানিমিক্ হয়েছিল, তপন তাকে নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছে।

—রক্ত!—তপতী শিহরিয়া পিতাকে প্রশ্ন করিল।

—হ্যাঁ রে—তুইও জানিস না তাহলে। তারপর হাসপাতালে কত টাকা দিয়েছে, ঐ রকম রোগীদের কিনে রক্ত দেবার জন্যে। সেই দু'লাখ টাকায় এসবই করেছে বোধ হয়। আমায় বলেছিল—'ভালো কাজেই টাকাটা লাগাবো বাবা!'

দু'লাখ কেন, দশ লাখ তপন খরচ করুক সর্বস্ব বিলাইয়া দিক কিন্তু নিজের রক্ত কেন দিল! কবে সে করিল এ কাজ! তপতীর সারা মন ব্যথা-কন্টকিত হইয়া আসিতেছে। কারুণ্যে শীতলতম স্রোতে অবগাহন করিতেছে, তাহার হৃদয়টা বুঝি-বা ফাটিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে।

অনেকক্ষণ একা বসিয়া থাকার পর অকস্মাৎ তপতী উঠিয়া মা'র কাছে গিয়া বলিল,—ওর ঘরের চাবিটা দাও তো, মা?

মা চাবি বাহির করিয়া দিলেন। তপতী আসিয়া ঘরটা খুলিয়া ফেলিল! একটা ছোট টেবিল রহিয়াছে, উপরে মোটা কাচের আবরণের প্যাড। কাচটার নীচে একখণ্ড কার্ড-এ কী লেখা আছে টানিয়া পড়িল তপতী—'আমার বিদায়-অশ্রু রাখিলাম, লহো নমস্কার!'

তপতীর স্নায়ুতন্ত্রী অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। সামলাইবার জন্য সে টেবিলের উপরেই মাথা গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল তপনেরই চেয়ারটায়।

কতক্ষণ কাটিয়াছে খেয়াল নাই তাহার মা স্নেহভরা তিরস্কার করিয়া ঢুকিলেন—কি তুই করছিস্, খুকী! স্বামী সবারই বিদেশে যায়, অমনি করে কাঁদে নাকি তার জন্যে? আয় খেতে আয়।

—কাঁদিনি মা, যাচ্ছি—তুমি যাও—যাচ্ছি আমি—

তপতীর কণ্ঠস্বরে মা অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িলেন। প্রশ্ন করিলেন,—এমন করে কথা বলছিস্? চিঠি না-পেলে কি অত করে কাঁদে?

—ঠাকুরদা আমায় ঠকায়নি, মা—ঠকায়নি গো, ঠকায়নি!—বলিতে বলিতে তপতী ছুটিয়া গিয়া পড়িল পিতামহের প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিংটার পদপ্রান্তে।

বিমূঢ়া মাতা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ব্যথিত মনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্নেহময় পিতা

ছুটিয়া আসিয়া হাজার প্রশ্নে তপতীকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিলেন--কিন্তু তপতীর মুখ হইতে শুধু একটিমাত্র কথাই বাহির হইল,—ও আর আসবে না মা, আসবে না!...

দিনের পর দিন করিয়া দীর্ঘ দুইমাস অতীত হইয়া গেল, না আসিল তপন, না-বা তাহার চিঠি। প্রতীক্ষমানা তপতী ম্লান হইতে ম্লানতরা হইয়া উঠিয়াছে। বিশুষ্কা বিবর্ণা হইয়া উঠিয়াছে তাহার রক্তাভ কপোলতল। তপতী আশা ছাড়িয়া দিয়াছে তপনের, মিঃ চ্যাটার্জীও আর আশা করেন না, কিন্তু তপতীর মা এখনও আশার বুক বাঁধিয়া আছেন—তপন তাঁহার ফিরিয়া আসিবে। এমন ছেলে, হৃদয়ে যাহার অতখানি কোমলতা, সে কি তাহার বিবাহিত পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারে! নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে। হয়তো কোনো বিপাকে পড়িয়াছে। হয়তো অসুস্থ হইয়াছে—হয়তো... না, মা আর অধিক ভাবিতে পারেন না।

তপতীকে প্রশ্ন করা বৃথা ; সে কাঁদে না পর্যন্ত, উদাসদৃষ্টিতে মাঠের দিকে চাহিয়া থাকে। বাবা একদিন ডাকিয়া বলিলেন,—চল্ খুকী পূজার বন্ধে শিলং যাই, নূতন বাড়িটা দেখস্‌নি তুই—!

তড়িতাহতের মতো তপতী চমকিয়া উঠিল। ঐ বাড়িতে তাদের মধুচন্দ্রিমা যাপনের কথা ছিল। নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাস কি!

বুদ্ধিমতী তপতী বুঝিতে পারিয়াছে, পিতামাতার হৃদয়ে যে কী দারুণ শেল বিঁধিয়াছে। তপন তো যাইত না তপতী যে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, একথা কেমন করিয়া সে বলিবে! শত অপমান সহ্য করিয়াও তপন যায় নাই, গিয়াছে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া। কিন্তু যেদিন সে গেল, সেদিন তো তপতী তাহাকে চাহিয়াছিল। তপনের মতো আশ্চর্য বুদ্ধিমান ছেলে কেন সে কথা বুঝিল না!

চিন্তার কুল-কিনারা নাই। কলেজ হইতে ফিরিয়া সেই-যে তপতী ঘরে ঢোকে, আবার বাহির হয় রাত্রে খাইবার সময়। বেড়াইতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে, কাহারও সহিত কথা পর্যন্ত বলিতে চাহে না। মা সেদিন বহু কষ্টে তাহাকে বাহির করিয়া 'লেকে' বেড়াইতে লইয়া গেলেন। তপতী জলের ধারে গিয়া বসিতে যাইতেছে, হাসির শব্দে চাহিয়া দেখিল, শিখা এবং মীরা বসিয়া আছে অদূরে একটা বেঞ্চে। তপতী ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল মীরাই বটে। মাকে বলিল, ঐ শিখার কাছে বসে রয়েছে, মা ওর বোন।—মাতা সাগ্রহে বলিলেন,—আয় তবে দেখি—আয় শীগ্‌গীর—মা তপতীকে টানিতেছেন। কিন্তু তপতীর ভয় করিতেছে। যদি মা'র সম্মুখেই মীরা তাহাকে অপমান করে! করিবেই তো! তপতী যাইতে চাহিতেছে না। মা কিন্তু টানিয়া লইয়া গেলেন। তপতী ধীরে ধীরে করুণ কণ্ঠে ডাকিল শিখা? উভয়েই চকিত চাহিল। শিখা দৃষ্টি নত করিয়া বলিল—আয় বোস।—মীরা কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইল। মা বলিলেন,—তুমি তপনের বোন? তোমার দাদার খবর...

—তার তো আর কিছু দরকার নেই। মেয়ের বিয়ে দিন-গে আবার। দাদা এসে মুক্তিপত্রটা রেজেষ্টারী করে দেবেন, যেদিন বলবেন আপনারা।

মা একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন,—সেকি কথা মা! কী বলছো তুমি?

অত্যন্ত জোরে হাসিয়া উঠিল মীরা, কহিল—আপনার খেলুড়ে মেয়ে বুঝি কিছুই বলেনি আপনাকে। বেশ, বেশ, আমি বলে দিচ্ছি। আপনার মেয়ে আমার দাদার কাছে মুক্তি চেয়ে নিয়েছে—স্থির চিত্তেই—যাকে বলে 'কুল ব্রেনে'। দীর্ঘ সাতমাস ধরে দাদা তাকে

ভাববার সময় দিয়েছিল আর সেই সাতমাস আপনার গুণবতী কন্যা আমার দেবতার মতো দাদাকে নিজে অপমান করেছে, বন্ধু দিয়ে অপমান করিয়েছে, শেষকালে একজন বন্ধুর কোলে শুয়ে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছে মুক্তি। যান, এখন সেই বন্ধুটিকে কিম্বা যাকে ইচ্ছে জামাই করুন গিয়ে।—মীরা খানিকটা দূরে চলিয়া গেল। শিখা নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছে তপতীর দেহের সমস্ত রক্ত যেন শ্বেতবর্ণ ধারণ করিতেছে। মা'র কিছুক্ষণ সময় লাগিল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে, কিন্তু তপতীর এই দুই মাসের আচরণ তাঁহাকে চকিত করিয়া দিল—ইহা সত্য, অতিরঞ্জন নহে।

—খুকী!—মা ডাকিলেন। তপতী সাড়া দিতে পারিতেছে না।—এমন সর্বনাশ তুই করেছিস, খুকী? বল—উত্তর দে।—তপতী কাঁপিতেছিল শিখা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। অস্থির হইয়া মা মীরাকে গিয়া ধরিলেন,—তোমার দাদা কি ফিরেছে, মা।

—না, ফিরতে দেরী আছে। কিন্তু তার ফেরায় আপনার আর কী কাজ? আমার দাদা আপনার মেয়ের যোগ্যপাত্র নয় ; যোগ্যপাত্র দেখুন গিয়ে—

কী কথা বলিবেন, মা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। মীরাকে এতটুকু চটানো তাঁর ইচ্ছা নয়। অত্যন্ত সাবধানে তিনি বলিলেন,—মুক্তি চাইলেই কি হয় মা? আমরা ওকে তপনের হাতে দিয়েছি—ও ছেলেমানুষ—যদিই-বা—

মীরা আবার সজোরে হাসিয়া উঠিল,—ছেলেমানুষ! বেশ মা, আপনার ছেলেমানুষ খুকীকে জিজ্ঞাসা করুন তো, রাত বারটার সময় ক্যাসানোভায় ব'সে জনৈক বন্ধুর সঙ্গে ধর্মান্তর গ্রহণ করার মতলব আঁটা কোনদেশী ছেলেমানুষী?

তপতী রুদ্ধশ্বাসে মীরার কথা শুনিতেছিল ; সরোষে কহিল,—মিথ্যা।

—চুপ কর শয়তানী। আজন্ম সত্যসিদ্ধ তপনের বোন শ্রীমতী মীরা কোনকালে মিথ্যে বলে না। ডাইরীতে তারিখ অবধি লিখে রেখেছি, তোদের দু'জনের ফটো পর্যন্ত তোলা হয়ে গেছে। আর চাস্ প্রমাণ।

মা বুঝিলেন, তপতী বহু দূর আগাইয়া গিয়াছে। তপতী করুণকণ্ঠে কহিল,—প্ল্যানটা আমার নয়, মা, মিঃ ব্যানার্জি বলেছিলেন একদিন—

—বেশ! রাজী হোন-গে এবার—মীরা আরো খানিকটা চলিয়া গেল।

মা মীরাকে কোনরূপে একবার তপতীর বাবার নিকট লইয়া যাইবার জন্য হাত ধরিয়া বলিলেন,—তুমি একবার আমার বাড়ি চলো, মা, ওর বাবাকে সব কথা বলো গিয়ে—

—কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, মা, যার সঙ্গে খুশি আপনার খুকীর বিয়ে দিন-গে—

—হিন্দুমেয়ের কি দু'বার বিয়ে হয়, মা?

—খুব হয়। আপনাদের আবার হিন্দুত্ব। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান—আপনারা কিছু নন।

—যাবে না, মা একবার? চলো—লক্ষ্মী মেয়ে আমার, চলো!

—যেতে পারবো না—মাপ করবেন। যে বাড়িতে আমার দাদার অসম্মান হয়, সে বাড়ির ছায়াও আমি মাড়াইনে।

—তোমার দাদা তাহলে নিশ্চয় ফিরবে না?

—আমার দাদা আপনার ধন-দৌলতের প্রত্যাশী নয়। আপনার সঙ্গে আর কী সম্পর্ক তার?

ক্রোধে অকস্মাৎ তপতী জ্ঞানহারা হইয়া উঠিল। এই ভণ্ডামী তাহার অসহ্য

বলিল—দু'লাখ টাকা বুঝি খোলাম-কুচি? সেটা গ্রহণ করতে তো বাধেনি?

হাসিতে মীরা ফাটিয়া যাইবে কেন! হাসি থামিলে—বলিল—ঐ দু'লাখ টাকা আপনার দ্বিতীয়-বিয়েতে যৌতুক দিয়ে আসবো গিয়ে!

শিখা ম্লানকণ্ঠে কহিল,—ছিঃ তপি, টাকার কথাটা তুলতে তোর লজ্জা করলো না?

মীরা গিয়ে গাড়ীতে উঠিয়া ডাকিল—আয় রে শিখা? শিখাও চলিয়া যাইতেছে! মা ছুটিয়া আসিয়া তপতীকে কহিলেন,—তুই নিজে একবার ডাক, খুকী! যন্ত্রচালিতের মতো তপতী গিয়া মীরার হাত ধরিল ; বলিল—আসুন—চলুন আমাদের ওখানে—

সরোষে মীরা গর্জন করিয়া উঠিল, ছেড়ে দিন! আপনাকে ছুঁলে গঙ্গা নাইতে হয়। অকস্মাৎ ক্রোধে তপতীর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কী এমন সে করিয়াছে যাহাতে তাহাকে ছুঁলে গঙ্গা-নাইতে হইবে?

সক্রোধে সে বলিয়া উঠিল,—যান যান, আপনার দাদা না এলেও আমার চলবে। গাড়ীটায় ষ্টার্ট দিয়া ষ্টিয়ারিংটা ধরিয়া মীরা অত্যন্ত সহজ সুরে কহিল,—তাই চলুক—

"তোমার যে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায়
ভালো-মন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিয়ো তুমি বলি!...

মীরা কি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া যাইতেছে! তাহার শান্ত কণ্ঠস্বর তপতীকে অভিভূত করিয়া দিল। এই অত্যন্ত কোপন স্বভাবা মেয়েটি এত সহজে তাহাকে কবিতা বলিয়া আশীর্বাদ করিতে পারে। মীরার হাতটা পুনরায় ধরিতে গিয়া তপতী বলিল,—যাবেন না একবার?

হাতটা সরাইয়া গাড়ীখানা চালাইয়া দিতে দিতে মীরা কহিল,—না, এখনও আমার সময় হয়নি। 'সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে!'

শিখা ও মীরা এক গাড়ীতেই চলিয়া গেল। মা তপতীর সঙ্গে কথা বলিতেও বিরক্তি বোধ করিতেছেন আজ। কী ভয়ানক কাণ্ড তপতী করিয়াছে, অথচ কিছুই তাঁহারা জানেন না। তপতী আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া এককোণে বসিল। মা বুঝিলেন, কথা সে আর কহিবে না। বাড়ি যাইবার জন্য তিনিও গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ীতে যাইতে যাইতে শিখা কহিল,—তপতী কিন্তু একেবারে বদলে গেছে, মীরা—বড্ড রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা।

একটুও বদলায়নি। তুই জানিস কিচু। ও মেয়ে অত শীগ্‌গীর বদলাবে!

—কিন্তু যদি সত্যি বদলায়, তাহলে কি দাদা নেবে ওকে আবার?—না সে অসম্ভব। ও অন্য কাউকে বিয়ে করলেই আমাদের ভালো হয়।

শিখা চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় কহিল, দাদা যে নীল গোলাপ ফুটালো—যার জন্য কৃষি-প্রদর্শনী ওকে প্রথম পুরস্কার দিয়েছে, সে গোলাপের নাম 'নীল গোলাপ' কেন দিল জানিস্?

—না ভাই, জানি না তো!—মীরা চাহিল শিখার দিকে।

—তপতীর মার নাম নীলা ওঁর নামটা দাদা অমর করে দিল।

—ওঃ! দাদা একদিন বলেছিল,—শাশুড়ীর স্নেহঋণ কি দিয়ে শুধবো, মীরা—তাই চাষ করতে আরম্ভ করেছি। তাই বুঝি 'নীল গোলাপ'।

উভয়েই চুপ করিয়া রহিল কিছুক্ষণ। মীরাই কথা কহিল,—পুরস্কারের টাকাটা দাদা বোটানী শিক্ষায় দান করেছে।

—আমাকে লিখেছে চিঠিতে। কিন্তু বিদেশে দাদা আর কতদিন থাকবে রে?

—কাজ হয়ে গেছে। এবার ফিরবে, এই মাসেই ; দুজনে একসঙ্গে দেশে যাবো।

মীরার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইতে গিয়া করুণ হইয়া গেল। বলিল, ঐ হতভাগীটাও যেতে পারতো। শিখা, আজ 'ঠাট্টা করে উড়াই সখী, নিজের কথাটাই! ...কেঁদে কি করবো বল? আমার কতদিনের সাধ, দাদা গল্প বলবে, তার ডানদিকে থাকবো আমি বাঁদিকে বৌদিদি—দুজনায় ঝগড়া করবো আবার ভাব করবো!...সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসটা মীরা আর চাপিতে পারিল না।

শিখার দুই চোখে জল টলমল করিতেছে। মুছিয়া আস্তে কহিল,—বিয়ের সময় আমি থাকলে এমনটা হোত না। ওর বন্ধুগুলোই ওকে ভুলপথে চালিয়েছে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। কিন্তু আমার আশা ছিল, ওর মা ওকে সামলে নেবেন।

—ছন্নমতিকে কেউ সামলাতে পারে না, শিখা। ওর পতন বোধহয় বিয়ের পূর্বেই হয়েছে—ও আর পবিত্র নেই, মনে হয়।

—আমি কিন্তু তা মনে করিনে, মীরা! ওর বাল্যজীবন বড় সুন্দর। আর ও বন্ধুদের কেবল খেলিয়ে নিয়ে বেড়াতো। কেউ ওর মন কোনদিন এতটুকুও টানতে পারেনি। আজও যে ও কাউকে ভালবাসে তা বিশ্বাস হয় না...হয়তো সে...

বাধা দিয়ে মীরা বলিল,—তাতে ক্ষতি বেশী আমাদের। ও বিয়ে না করলে দাদা শান্তি পাবে না। দাদা ওকে নেবে না, এ সূর্যের মতো সত্য—ভালবেসে ও মরে গেলেও নয়। দাদার সত্য কিছুর জন্য ভাঙে না, শিখা, এ-কথা তুই-ও তো জেনেছিস।

—হুঁ, বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীর কণ্ঠে কহিল,—দাদা মুক্তিটা না দিলেই পারতো। অত শীগ্‌গীর কেন দিল ভাই?

—তুই বন্ধুর দিকটা বেশী মমতায় দেখছিস্ শিখা, দাদার দিকটা তেমনি দ্যাখ্ দেখি। মিঃ ব্যানার্জির কোলে মাথা রেখে সে দাদাকে বুঝিয়ে দিয়েছে মুক্তিই সে চায়, দাদাকে চায় না। সেদিনের সে-চাওয়ায় তার কোনো ছলনা ছিল না। ছিল সত্য, সহজ চাওয়া।

—কিন্তু আজ সে আবার দাদাকে চাইছে কেন? ভালবাসছে বলেই তো।

—ও প্রেম অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, শিখা! দাদা চলে যাওয়ায় ওর নারী গর্বে আঘাত লেগেছে। দাদাকে ও বশ করতে পারলো না বলেই এই আকুতি ওর! তুই এত পড়াশুনা করেছিস এসব কিছু বুঝিস নে। উপেক্ষা সইতে পারে না নারী-হৃদয়। দাদাকে পেলে ও আবার অপমান করবে।

—কিন্তু এবার বিরহের আগুনে খাঁটি হয়ে ও দাদাকে সত্যি ভালবাসতে পারে তো?

—সেদিন যেন না আসে, শিখা, সে-কামনা আর করিস নে। ও যাক্!

শিখা চুপ করিয়া গেল। তপতীর অদৃষ্টের নির্মমতা তাহাকে অত্যন্ত বিমনা করিয়া তুলিছে! তপনের জন্যও মন কাঁদে,—কিন্তু তপন অসাধারণ শক্তিমান মানুষ, সমস্ত দুঃখ সে সহ্য করিতে পারিবে ; কিন্তু তপতী—যদি সত্যিই সে তপনকে আবার ভালবাসে তবে তাহার জীবন দুঃখের অমানিশার চেয়ে কালো।

—বিনুদার খবর কি রে? কত গরু হলো তোর গোয়ালে? ..মীরা প্রশ্ন করিল।

—তা হাজারখানেক। আমি রোজই যাই ওঁর সঙ্গে দমদম। আজ তুই আসবি বলে গেলাম না।

—দুজনেই তোরা অত গরুর যত্ন করিস্! দুধটা কি করিস ভাই?

—যত্ন করবার লোক রয়েছে। দুধটা বিক্রী করা হয়, এক-চতুর্থাংশ বিলি করা হয় শিশু আর রোগীদের। গোবরে হয় দাদার চাষ-বাড়ির সার। খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না বলে দুধের চাষ করা, ভাই! দেশের লোক দুধ খেয়ে বাঁচুক।

আমার ওঁকে দাদা আদেশ করেছেন, বিনে-মাইনের স্কুল-কলেজ করতে। খরচ অবশ্য দাদার সমস্ত উপার্জন, আমাদের আয় আর দেশের বড়লোকদের তহবিল থেকে আসবে। কিন্তু পড়ানো হবে খাঁটি বৈদিক প্রথায়, আর ছাত্র হবে যাদের এক পয়সা দেবার সমর্থ নেই। আর নারী-বিভাগের কর্মী হবে তুই আর আমি। দাদার মনে কষ্ট আছে, পয়সার অভাবে কলেজে পড়তে পায়নি। তাই গরীবদের জন্যই তার স্কুল কলেজ, কোনো বড়লোকের ছেলেমেয়ে সেখানে ঠাঁই পাবে না!

শিখাও কথাটার কিছু কিছু জানিত। বলিল, আরম্ভ হোক, আমরা তো আছি-ই।

—হয়ে গেছে আরম্ভ। শিবপুরে আমাদের যে হাজার বিঘে পতিত জমি ছিল, সেখানে পাঁচশো খোলার কুঁড়ে ঘর তৈরী হয়েছে। গেটে লেখা হয়েছে—

'সবার উপর মানুষ সত্য,—তাহার উপর নাই।
মানুষের মাঝে, হে মানুষ—তুমি সত্যেরে দিয়ো ঠাঁই।

শেষের লাইনটা অবশ্য দাদার রচনা—মীরা আপন মনে হাসিয়া উঠিল।

শিখা মীরার মনের তল পাইতেছে না! তপতী-ভাগ্য-বিপর্যয়ে ব্যথিত শিখা মীরার হাস্য শুনিয়া কহিল,—মীরা, দাদা মহীয়ান্, এ কথা তুই জানিস্, আমিও জানি। কিন্তু তপতীর জন্য তোর মন কি এতটুকু বিচলিত হচ্ছে না আজ?

মীরা মিনিটখানের চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিল,—সে কথা তোকে অনেকক্ষণ বলেছি সখী, ঠাট্টা করেই আজ ওড়াতে চাইছি আমার সেই একান্ত আপনার কথাটা!—তাহার কণ্ঠস্বরে শিখা চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, মীরার দুই গণ্ড অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে!

মা'র মনে যে আশাটুকুও ছিল, তাহা একেবারে নিভিয়া গিয়াছে। স্বামীকে সমস্ত জানাইতে তিনিও কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তপতী মা-বাবার সম্মুখে আসাটা এড়াইয়া যাইতেছে! কিন্তু এমন করিয়া দিন চলা কঠিন। পূজায় কলেজ বন্ধ হইলে পিতা কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন,—যা হবার হয়ে গেছে; তুই ভালো করে পড়াশুনা কর। যদি নিতান্তই সে না ফেরে, তখন অন্য পথ দেখা যাবে...

তপতী চুপ করিয়া রহিল। বাবা তপনকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, ইহা সে জানে। বাবা আবার বলিলেন,—তুই আমাদের একমাত্র মেয়ে, তোর সুখের জন্য আমরা সবই করিতে পারি, খুকী—তোর আবার বিয়ে দেব—

কথাটা বলিয়া যেন মিঃ চ্যাটার্জী চমকিয়া উঠিলেন।

তপতী এখন কোনো কথা কহিল না দেখিয়া তিনি 'আঙুর ফল টক' এই নীতি অনুসরণ করিবার জন্যই বোধহয়, এবং তপতীর নিকট তপনকে এখন খাটো করিবার জন্যই হয়তো

বলিয়া উঠিলেন,—এতো গোঁয়ার সে জানলে কি বিয়ে দিতাম। আমারই বোকামী।

মা কথাটা কিন্তু সমর্থন করিতে পারিলেন না, নীরবেই বসিয়া রহিলেন।

—'কাপড়-চোপড় গুছাইয়া তপতী শিলং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। নাই যদি আসে তপন, কী সে করিতে পারে! তপনকে পাইলে হয়তো সে সুখীই হইতে পারিত, কিন্তু যদি একান্তই না পাওয়া যায় তো তপতী কি তাহার পিতামাতার বুকে শেলাঘাত করিয়া বিধবার মতো বসিয়া রহিবে! এই কয়দিন ধরিয়া তপতী বারংবার এই চিন্তাই করিয়াছে। যে লোক একটা দিনের জন্য এতটুকু রাগ দেখায় নাই, একটু প্রতিবাদমাত্র করে নাই, সে কিনা একেবারে অকস্মাৎ সমস্ত ছাড়িয়া চলিয়া গেল! তপতী ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। তাহার পিতার কোটি মুদ্রা মূল্যের সম্পত্তি, তাহার অতুলনীয় রূপগুণ, তাহার মাতার এত যত্ন আদর—কিছুই কি তপনকে এখানে ফিরিয়া আনিতে পারে না! থাক্, ফিরিবার দরকার নাই, তপতী তাহার ভাগ্য বিধাতার উপরেই নির্ভর করিয়া চলিবে। কিছুই ভয়ঙ্কর অপরাধ তপতী করে নাই, যাহার জন্য তপন তাহাকে এমনভাবে ত্যাগ করিতে পারে। অকস্মাৎ তপতীর মনে পড়িল তপনের কথাটা—'ত্যাগ মানে মুক্তি, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে লঘিষ্ঠ থেকে গরীয়ানে'। হ্যাঁ, মুক্তিই সে তাহাকে দিয়া গেছে! বেশ তপতীও চলিয়া যাইবে।

শিলং-এ আসিয়াই আলাপ হইল মিঃ রায়ের সহিত। রূপবান্ যুবক। সঙ্গীতে তাঁহার অসমান্য অনুরাগ ; আই-এ-এস্ পাশ করিয়া আসিয়াছেন, শীঘ্রই কার্যে যোগদান করিবেন।

মিঃ চ্যাটার্জী সাদরে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া কন্যার সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। তপতী মাকে বলিয়াছে,—যদি সে একান্তই না আসে মা—আমাকে বিবাহিতা বলে পরিচয় দেবার কি দরকার এখানে—মা-বাবা কোনো উত্তর দেন নাই। তপতী মিস চ্যাটার্জী নামেই সম্বোধিতা হইতেছে। মিঃ রায়ও তাহাই জানিয়া রহিলেন।

কয়েদিনের মধ্যেই মিঃ রায়-এর অসামান্য বাক্‌পটুতা, অনুপম সঙ্গীত কুশলতা এবং বিলাতী ধরণধারণের গুণে তপতীর জ্বরাক্রান্ত মনটা শীতলতার দিকে নামিতে লাগিল। রোজই তাহারা দল বাঁধিয়ে বেড়াইতে যায়—পাহাড়ের গাম্ভীর্য, ঝরণার চাপল্য, পাইন বনের শ্যামল সুষমা চোখ জুড়াইয়া দেয়, মন ভরাইয়া তুলে।

পূজার সময় শিলং-প্রবাসী বাঙালীগণ একটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; তপতী দুদিনেই তাহার নেত্রী হইয়া পড়িল। এসব কাজে সে চিরদিন দক্ষ। তাহার পটুতা মিঃ রায় দুই চোখ ভরিয়া দেখেন আর বলেন—'দি এঞ্জেল অব পাইন-বন-দি ডিভাইন নাইটিংগেল ..

তপতী রুমাল দিয়া তাঁর গায়ে হাল্কা আঘাত করিয়া বলে 'নটি বয়!...

অভিনয়ের আয়োজন সমারোহে চলিতেছে ; বিজয়ার দিন অভিনয়। কল্যাণী দেবী কহিল,—মিস চ্যাটার্জীর সঙ্গে মিঃ রায়ের বিয়ের দৃশ্যটা বড্ড হাসির।

—কেন?—প্রশ্ন করিল তপতী।

—মিঃ রায় বিলেতে কিছু করে এসেছেন কিনা, কে জানে।

—অভিনয়ে তার কি ক্ষতি হবে?—তপতী রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিল।

—অভিনয়টা মাঝে মাঝে সত্য হয়ে ওঠে কিনা?—কথাটা বলিয়া কল্যাণী হাসিল।

—আপনার কথাটাকে সত্যের মর্যাদা যদি উনি দেন, কল্যাণী দেবী, তাহলে আমি আপনাকে নিজের খরচে বিলেত পাঠাব এনকোয়ারী করতে—বলিলেন মিঃ রায়।

মিঃ রায়ের এই কথায় সবাই হাসিল।

কল্যাণী কহিল,—আপনি তো বেশ চালাক। আমার কথাটাকে ঘুরিয়ে ওর কাছে 'প্রপোজ' করে বসলেন? বুদ্ধি আপনার সত্যি হাকিমের মতো।

অতসী কহিল,—হাকিমের আর দরকার হবে না, হুকুম তামিল করবেন এবার থেকে।

তপতী একক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল ; হঠাৎ একটু তীক্ষ্ণস্বরেই কহিল,—ঠাকুরদা বলতো—'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই?' আপনাদের দেখছি সেই অবস্থা! কিন্তু আমার একটা কথা আছে।

সমস্বরে প্রশ্ন হইল—কি?

—বিয়ের দৃশ্যটা বাদ না দিলে নাটকের মর্যাদা থাকবে না। বিয়ের বন্ধনে ঐ নায়ক-নায়িকাকে বাঁধা যায় না। নাট্যকার বিয়ের কথাটা মোটে লেখেননি।

—নাটকটা ভালো বলেই আমরা নিয়েছি। কিন্তু পুজোর দিন একটা করুণ নাটক!

তপতী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—এই জগতে বহু মানুষের মনে ওর থেকে ঢের বেশী করুণ নাটকের অভিনয় হচ্ছে—

প্রস্তাব পাস হইয়া গেল। অর্থাৎ তপতীর কথার প্রতিবাদ করিতে কেহউ উৎসাহ দেখাইল না। তপতীর এরকম কথার উদ্দেশ্য কিন্তু মিঃ রায় বুঝিলেন না। মিলনের দৃশ্যটা তিনিই লিখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত অংশটুকুকেই তপতী পরিত্যাগ করিল কেন?

তপতীকে বাড়ী পৌঁছাইবার পথে একখণ্ড শিলাসনে বসিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন,—বিয়ের দৃশ্যটা কেন বাদ দিলেন, মিস চ্যাটার্জী?

তপতী আর্টের দোহাই দিয়া কহিল,—ও বই কেন ধরলেন? আর কি বই ছিল না? জ্যোতি গোস্বামীর বই অভিনয় করা অত্যন্ত কঠিন।

বহুদিনের বিরহের পর প্রিয় মিলনের দৃশ্যটা ভালই জমতো।

না, জমতো না। যাদের এতটুকু কলারস জ্ঞান আছে, তারা বলবে নাটকটাকে খুন করা হয়েছে।

কিছুক্ষণ মিঃ রায় চুপ করিয়া রহিলেন। বহুদিন তিনি বিলাতে থাকায় বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না ; প্রশ্ন করিলেন, জ্যোতি গোস্বামী পুরুষ না মেয়ে? খুব ভালো লেখে বুঝি?

জানি না। কিন্তু লেখে অদ্ভুত। বই এর নামও অদ্ভুত 'মুক্তির বন্ধন'।

মিঃ রায় আশ্বস্ত হইলেন। আর্ট না ক্ষুণ্ণ করার জন্যই বোধ হয়, তপতী তাঁহার লিখিত অংশটি ছাঁটিয়া দিল, তপতীর হাতের মালা তিনি সেদিন পাইবেন না। 'বাট্ ইফ্ প্রেশাস গড্ উইল্স'...

বাড়ি ফিরিয়া আপন কক্ষে একাকী বসিয়া তপতী ভাবিতে লাগিল, মিঃ রায় বেশ সুন্দর ছেলে। উহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে, অবশ্য তার পূর্বে তপনের সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদটা আইন-সিদ্ধ করা দরকার। যে আশা সে এতকাল পোষণ করিয়াছে, তপনকে তাড়াইয়া তাহাই ফলবতী হইয়া উঠিল! এ ভালোই হইল। তপনের মতো একজন নিতান্ত গোঁড়া অদ্ভুত-প্রকৃতির লোক লইয়া সে করিবে কি? তাহার বর্তমানের শিক্ষা-দীক্ষা মোটেই

তপনের উপযুক্ত নয়। মিঃ রায়ই তাহার ভালো।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করিবার কি আছে? কলিকাতা গিয়া আগে বিবাহ বিচ্ছেদটি পাকা করিয়া লওয়া যাক্—তারপর মিঃ রায়কে আরো একটু ভালো করিয়া বোঝা যাক্, এম. এ পড়াটাও শেষ হইয়া যাক্—পরে দেখা যাইবে।

মিঃ রায় কিন্তু বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। আজই তো তিনি প্রায় বলিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার মূলে শুধুই কী তপতীর রূপগুণ? না, আরো কিছু আছে, তাহার বাবার টাকা, যে, টাকার জন্য তপনকে তাড়াইয়া দিয়াছে তপতী! কিন্তু এ ভাবনাও ভাবিয়া লাভ নাই। যে তাহাকে বিবাহ করিবে, সেই তাহার বাবার টাকা পাইবে। মিঃ রায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি, তিনি তো অশিক্ষিত তপন নন! টাকার তোয়াক্কা তিনি নিশ্চয়ই রাখেন না! মুখে পাউডারের পাফটা আর-একবার বুলাইয়া লইয়া তপতী মা'র কাছে আসিল।

মা কন্যার পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছে, কহিলেন,—তোর গলায় ইংরাজী গানগুলো বেশ মিষ্টি লাগে, খুকী! ক'টা শিখলি?

—শিখেছি তিন চারটা। মিঃ রায়ের শেখাবার পদ্ধতিটা বেশ মা, চট্‌পট্ শেখা যায়।

মা খুশী হইয়া কহিলেন, বেশ ছেলেটি। কথাবার্তা চালচলন চমৎকার!

তপতী বিদ্রূপ করিয়া কহিল, তোমার তপনের চেয়ে নাকি!

মা ব্যথিত হইয়া কহিলেন,—তার কথা কেন, খুকী। সে তো সব ছেড়ে চলে গেছে।

তপতী বলিল—এখনও বিচ্ছেদটা কোর্ট থেকে পাকা হয়নি। তুমি তো বোকা মেয়ে, বোঝো কচু। দু'লাখ টাকায় ওর পেট ভরেনি, আরো অত্যন্ত লাখ-খানেক চায়—তাই মুক্তিপত্রটা এখনও হাতে রেখে দিয়েছে।

মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন,—যাক্‌গে খুকী—যেতে দে।

টাকাটাই ওর লক্ষ্য ছিল, মা। আমি যে ওকে নেবো না, সে-কথা ওকে প্রথম দিনই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ঘর থেকে বার করে দিয়ে। লোকটা এতবেশী চালাক যে, সাত মাস ধরে অভিনয় করে তোমাদের ঠকিয়ে গেল। মাসোহারার টাকাটা তোমার কাছে জমা রেখে ও বোঝালে, কারও দান ও নেয় না,—আর বোকা তোমরা দু'লাখ টাকা দিয়ে দিলে—একটা হিসাব পর্যন্ত চাইলে না।

—কিন্তু অফিসের কেরানীটাকে রক্ত দেওয়া?

তপতীর একটা খটকা লাগিল। পরমুহূর্তেই তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাহাকে সাহায্য করিল, কহিল,—ও একটা মস্ত চাল! অফিসের টাকায় তাকে হাসপাতালে রেখেছে—শিখিয়ে দিয়েছে ঐ কথা বলতে, কিংবা দিয়েছে একটু রক্ত, তাতেই কি! শরীরটায় তো রক্তের তার অভাব নেই—যা খাওয়া তুমি খাওয়াতে ওকে!—তপতী আপনার কথায় আপনি হাসিয়া উঠিল।

মারও মনে হইতেছে, হয়তো ইহাই সত্য হইবে। তথাপি তিনি বললেন—না চলে গেলেও পারতো?

—না, ধরা ও পড়াতেই; তাই জেলে যাবার ভয়ে পালিয়েছে দেশ ছেড়ে। বিস্তর বাংলা বই ও পড়েছে, বুঝলে মা? বাংলা কথা কইলে ওকে কিছুতেই ধরা যায় না।

মা সত্যই আজ বিভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। তপন কি তাঁহাদের এমনি ভাবে সত্যই ঠকাইয়াছে।

তপতী আহার সাবিয়া শয়নকক্ষে গেল। শয়নের বেশ পরিধান করিতে গিয়া সে আপনাকে বারবার নিরীক্ষণ করিল দর্পণে। নিটোল কপোল আবার রক্তাভ হইয়া উঠিতেছে। কটাক্ষের বিদ্যুত আবার ফিরিয়া আসিয়াছে পূর্বের মতো! মসৃণ বাহুতে তরঙ্গায়িত হইতেছে দেহের দ্যুতি। রক্তরাঙা ঠোঁটা উল্টাইয়া তপতী আপন মনে বলিল—এই ওষ্ঠে যে প্রথম প্রেমচুম্বন আঁকিবে সে তপন নয়..

ওঃ কি দারুণ ভুল সে করিতে বসিয়াছিল! শরীরটা তাহার ভাঙিয়া গিয়াছিল আর কি! প্রথম জীবনের প্রণয়োচ্ছাস! বোকামী আর কাহাকে বলে? সেই ভণ্ডটার জন্য জন্য প্রাণ দিতে বসিয়াছিল তপতী। গান গাহিতে গাহিতে তপতী শুইয়া পড়িল—'হোয়েন দাই বিলাভেড্ কামস...'

অভিনয়ের দিন আর-একবার মিঃ রায় অনুরোধ করিলেন শেষ দৃশ্যটা জুড়িয়া দেবার জন্য। কিন্তু তপতী দৃঢ়স্বরে কহিল,—না। তাহলে আমি অভিনয় করবো না—বিয়ের বন্ধন আমি সইতে পারিনে।

সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—অর্থাৎ! বিয়ে আপনি করবেন না নাকি?

কলহাস্যে সকলকে চমকাইয়া দিয়া তপতী কহিল,—বিয়ের চেয়ে বড় কিছু আমি করতে চাই।

মিঃ রায় কহিলেন,—আইডিয়াটা চমৎকার, কিন্তু কী সেটা?

—যিনি আমার বিয়ে করবেন, তিনিই সেটা আমায় বলবেন...

মিঃ রায় ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তা কি হইতে পারে? বিবাহের চেয়ে বড় তো প্রেম! কহিলেন,—প্রেম!

—আমি পাদরী নই যে যিশুকে প্রেম নিবেদন করব।

সকলেই হাসিয়া উঠিল। মিঃ রায় আরো খানিক ভাবিয়া বলিলেন,—বুঝেছি। আপনার ইচ্ছে 'কম্প্যানিয়েট ম্যারেজ'।

হো হো করিয়া হাসিয়া তপতী কহিল,—আপনার বুদ্ধিতে কুলোবে না, মিঃ রায়, চুপ করুন।

চারদিক অন্ধকার দেখিয়া মিঃ রায় থামিয়া গেলেন।

তপতী কহিল, আমিই বলে দিচ্ছি, শুনুন। বিবাহের চেয়ে বড় হচ্ছে অবিবাহিত ছেলেদের মাথাগুলো চিবিয়ে খাওয়া!

হাসিয়া কল্যাণী কহিল,—ওটা বুঝি এখন আস্বাদন করছিস?

—চুপ কর, লক্ষ্মীছাড়ি! ওর মাথায় গোবরের গন্ধ!

সকলেই হাসিয়া উঠিল। মিঃ রায়ও হাসিলেন। কিন্তু তপতীকে তাঁহার অত্যন্ত দুর্বোধ বোধ হইতেছে। উহার মনের ইচ্ছাটা কী?

অভিনয় হইয়া গেলে তিনি খানিকটা পথ তপতীর সহিত আসিতে আসিতে কহিলেন,—বিয়ে কি আপনি সত্য করবেন না মিস্ চ্যাটার্জী?

—আমার বাবার ঠিক করা আছে একটি ছেলে। তাকে যদি বিয়ে না করি তো, আপনার কথাটা তখন ভেবে দেখব।

মিঃ রায় কথা শুনিয়া দমিয়া গেলেন। আরো কিছুটা আসিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

তপতী হাসিয়া উঠিল আপন মনে। এক ঢিলে দুই পাখী সে মারিয়াছে। কৌশলে সে

মিঃ রায়কে জানাইয়া দিলো, বিবাহিতা না হইলেও, স্বামী তাহার ঠিক করা আছে—তপনের কথাটা প্রকাশ পাইলেও আর বেশী ভয়ের কারণ থাকিবে না ; দ্বিতীয়ত, মিঃ রায়ের অন্তরে তপতী আরো গভীর ভাবে আসন গড়িবে কিংবা মিঃ রায় তাহাকে ভুলিতে চাহিবেন। তপতী পরীক্ষা করিয়া লইতে চায়। আর সে ঠকিবে না। অবশ্য মিঃ রায়কে বিবাহ করিতে তপতীর কিছুমাত্র আপত্তি হইতে পারে না ; তথাপি মিঃ রায়ের দিকটাও সে ভালো করিয়া জানিয়া লইতে চায়! কারণ এ বিবাহ অন্তরের নয় বাহিরের।

পরদিন সকালে আসিল একখানি চিঠি—মার নামে—

"বিজয়ার সংখ্যাতীত প্রণামান্তে, নিবেদন, মা, আপনাদের অপরিশোধ্য স্নেহঋণের বিনিময়ে কিছুই আমি দিতে পারিনি। অভাগা ছেলেকে মার্জনা করিবেন।

ইতি—প্রণতঃ তপন

মা চিঠিখানার দিকে চাহিয়াই রহিলেন। কলকাতার একটা ঠিকানা রহিয়াছে! ঐখানে হয়তো আছে সে। উঠিয়া তিনি স্বামীকে গিয়া কহিলেন—আসতে টেলিগ্রাম করে দাও, খুকীর সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাক্। আর, মুক্তিনামাও তো লিখিয়ে নেওয়া চাই একটা?

মিঃ চ্যাটার্জী খানিক ভাবিয়া বলিলেন—খুকীকে জিজ্ঞাসা করেছো? কী বলে সে?

—না, ওকে জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। 'টেলি' করে দাও এক্ষুনি প্রি-পেড।

তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করা হইল। উত্তরে তপন জানাইল যে সে ত্রয়োদশীর দিন শিলং আসিবে, কিন্তু উঠিবে হোটেলে।

মা তপতীকে খবরটা জানাইলেন না। আগে আসুক তপন, মা তাহার সহিত কথা বলিবেন, তার পর যাহা হয় করা যাইবে। সত্য বলিতে কি, এখনও তপনের দিকে মন তাঁহার স্নেহাতুর হইয়া রহিয়াছে।

প্রতিদিন সকালে মিঃ রায় আসেন তপতীর সহিত বেড়াইবার জন্য। সেদিনও তপতী সাজিয়া-গুজিয়া মিঃ রায়ের সহিত বেড়াইতে গেল।

পথের ধারে একটা গাছে অজস্র ফুল ফুটিয়াছে, মিঃ রায় একটা ডাল নোয়াইয়া ধরিলেন—তপতী ফুল তুলিয়া খোঁপায় গুঁজিতে লাগিল আর দুই-চারিটা ফুল ছুড়িয়া মিঃ রায়কে মারিতে লাগিল। মিঃ রায় হাসিয়া বলিলেন,—বড্ড বেশী সুইট্...

তপতী আর একগোছা ফুল ছুড়িয়া দিয়া কহিল,—দেখছি কতখানি আমার ইডিয়টের উইট্?

কে একজন মুটের মাথায় বাক্স-বিছানা দিয়া আসিয়া পড়িয়াছে খুব কাছে! তপতী যেন ভূত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—তপন। নীরবে তপন পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখের বিদ্রূপ-হাসিটা বিদ্যুতের মতোই তপতীর চোখে লাগিল। তপতী চাহিয়াই রহিল তপনের দিকে। মিঃ রায় কহিলেন,—চেনেন নাকি।

—হাঁ—বলিয়া তপতী একটা উঁচু পাথরের উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল তপন কোন দিকে যায়। কিন্তু পথের বাঁকে তপন অদৃশ্য হইয়াছে। নিশ্চয় তাহাদের বাড়ি যাইতেছে। তপতী ভাবিতে ভাবিতে আরো খানিক বেড়াইল। ও কেন এখানে আসিল? আর আসিয়াই দেখিল, তপতী মিঃ রায়ের সহিত কেমন স্বচ্ছন্দে খেলা করিতেছে। যদি দেখিয়াছে তো ভালো করিয়াই দেখুক। যে বিদ্রূপের হাসি সে হাসিয়া গেল, তপতী তাহাকে গ্রাহ্যমাত্র করে

না। হয়তো সে ভাবিয়াছিল, তাহার বিরহে তপতী বুক ফাটিয়া মরিবে! হায়রে কপাল!

তপতী মিঃ রায়কে লইয়াই গৃহে ফিরিল। ইচ্ছাটা, তপনকে ভালো করিয়াই দেখাইয়া দিবে, তপতী তাহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই ;—তাহার জীবনে সাথীর স্থান অনায়াসে পূরণ করিয়া লইতে পারে।

—কৈ মা, তোমার সেই ভণ্ড ছেলেটিকে লুকালে কোথায়? বার করো!

মা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন,—তপন এল নাকি?

—হ্যাঁ। কিন্তু কৈ সে? এখানে আসেনি?

—না, হোটেলে উঠবে বলেছে। এখানে কাল আসবে বিজয়ার প্রণাম করতে।

তপতী অত্যন্ত বিস্মিতা হইল। হোটেলে উঠবে কেন? এখানে আসতে তো কেহ বারণ করে নাই। মাকে শুধাইল, তুমি জানতে ও আসবে?

—হ্যাঁ, আমিই তো টেলিগ্রাম করেছিলাম আসতে। তোর সঙ্গে একটা পাকাপাকি কথা হয়ে যাক্—আর মুক্তিনামাটাও করিয়েনি।

—বেশ! কিন্তু বলে রাখছি, কথা যা কইবার আমি বলবো।

মা কিছু বলিলেন না। বিকালে তপতী সুসজ্জিত হইয়া মিঃ রায় সমভিব্যাহারে চলিল তপনের সহিত দেখা করিতে হোটেলে। তাহার আর সবুর সহিতেছিল না। মিঃ রায়কে লইয়া গিয়া তপতী এখনি দেখাইয়া দিবে যে কত সহজে তাহার যোগ্য স্বামী সে লাভ করিতে পারে।

তপন একটা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া পাইন-বনের দিকে চাহিয়া ছিল।

নমস্কার, তপনবাবু। প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, আমাদের ওখানে না-ওঠার জন্য। অনর্থক একটা ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট্ না-করে ভালোই করেছেন।

তপন ফিরিয়া চাহিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল,—আসুন! মীরার কাছে শুনেছিলাম আপনি অসুস্থ। আশা করি ভালো আছেন এখন?

হ্যাঁ ভালো। আসুন মিঃ রায়, আলাপ করিয়ে দিই। এর সঙ্গে আমার হিন্দুমতে বিয়ে হয়েছিল একদিন। আর তপনবাবু, ইনি মিঃ বি. সি. রায়, আই-সি-এস বাঙলায় অনুবাদ হচ্ছে বোকা চন্দ্র রায়—তপতী হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ওঁর সঙ্গে আমার ভাবী সম্বন্ধটা আশা করি আপনি অনুমান করতে পারছেন?

মৃদুহাসির সহিত নমস্কার করিয়া তপন বলিল, বড্ড সুখী হলুম, মিঃ রায়। প্রার্থনা করি আপনাদের জীবনে যেন নেমে আসে পাইন বনের শীতল শান্তি, আর এই নির্ঝরিণীর নন্দিত কল্লোল। বসুন, চা খান একটু।

তপন বয়কে চা আনিতে বলিল।

আশ্চর্য! বাংলা ভাষাটা উহার কণ্ঠে কী বিদ্যুতের মতোই খেলিতে থাকে। কী কবিত্বময় ভাষা!

তপন মিঃ রায়কে বলিল, কোথায় কর্মস্থান হলো আপনার? বাঙলার বাহিরের নয় তো?

না, নদীয়ায়। বড্ড ম্যালেরিয়ার দেশ। তাই ভাবছি—

ম্যালেরিয়া বুভুক্ষু ব্যাধি। আপনাদের তো কিছু ভয়ের কারণ নেই?

অনুপ্রাস না দিয়ে কি আপনি কথা বলেন না, তপনবাবু? তপতী প্রশ্ন করিল।

অনুপ্রাসটা চ্যবনপ্রাসের মতো উপাদেয় আর উপকারী। তপন মৃদু হাসিল।

কথা বলার আর্টটি আপনি চমৎকার আয়ত্ত করেছেন! তপতীও মৃদু হাসিল।

চা আসিলে তপন স্বহস্তে তিন পাত্র প্রস্তুত করিয়া মিঃ রায়কে ও তপতীকে দুই পাত্র দিয়া নিজে এক পাত্র লইয়া। কি কথা বলিবেন মিঃ রায় বুঝিতে পারিতেছেন না। তপতীও কিছুটা উন্মনা হইয়া রহিয়াছে।

তপন কহিল,—মীরা আপনার কাছে বড্ড অন্যায় করেছে, আমি ওর হয়ে মাপ চাইছি। আপনি শিক্ষিতা, ওর মতো একটা পল্লী-মেয়ের দোষ নেবেন না।

তপতীর বিস্ময় ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। তপনের ইহাও কি ভণ্ডামী? সংযতকণ্ঠে কহিল, না, কিছু মনে করিনি। আপনি আমাদের ওখানে যাবেন না?

আজ একটু খাসিয়া-পল্লীতে যাবার কথা আছে, এখনি বেরুবো।

সেখানে কী দরকার? চলুন তাহলে আমরাও যাবো ঐদিকে।

তপন বিস্মিত হইল তপতীর এই আহ্বানে। কিছু না বলিয়া সে বাহির হইল উহাদের সঙ্গে। তিনজনেই নির্বাক চলিতেছে; প্রত্যেকের মন যেন একটা গভীর চিন্তায় ভারাক্রান্ত।

পথের ধারে একটা উঁচু ডালে গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুল ফুটিয়া আছে। তপতী মিঃ রায়কে বলিল,—দিন না ফুলটা পেড়ে?—মিঃ রায় দু'একবার লাফ দিয়াও ডালটা ধরিতে পারিলেন না। আপনার চাদরের খুঁটে একটা ছোট পাথর বাঁধিয়া তপন ডালের উপর ছুঁড়িল। সরু ডালটা নুইয়া পড়িতেই মিঃ রায়কে ডাকিয়া বলিল—তুলে নিন ফুলটা—মিঃ রায় ঘাড় উঁচু করিয়া ফুলটি তুলিতে যাইতেই তাঁহার চোখে পড়িল ডালের ঝরা একটা কুটা। মিঃ রায় ফুল না তুলিয়াই চোখে রুমাল চাপিয়া মাথা নীচু করিলেন। তপনই নিজেই শাখা-সমেত ফুলটি ছিঁড়িয়া আলগোছা তপতীর হাতে ফেলিয়া দিল, তারপর পরম যত্নে রায়ের চোখের উপরের পাতাটি নীচের পাতার মধ্যে ঢুকাইয়া চোখ মর্দন করিয়া দিতেই কুটাটা বাহির হইয়া আসিল।

এখনও তপন তাহাদের উপর এতটা সহানুভূতি কেন দেখায়—তপতী ভাবিয়া পাইতেছে না। মিঃ রায়কে সে লইয়া আসিল তপনকে আঘাত করিতে, আর তপন কিনা পরম যত্নে তাহারই সেবা করিতেছে। এতটুকু বিচলিত হইল না, লোকটা আশ্চর্য!

—পাইন-বন আপনার কি রকম লাগছে?—তপতী প্রশ্ন করিল নীরবতাটা অসহ্য বোধ করিয়া।

সহাস্যে তপন উত্তর দিল,—মায়ের মুখের প্রশান্ত-স্নিগ্ধতার মতো স্নেহমাখা।

দূরের একটা আবছা পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তপতী কহিল—ঐ পাহাড়টা?

তপন নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিল,—দুঃখের দিনে সুখের স্মৃতির মতো বিষাদময়।

কয়েকটা পুষ্পিত বৃক্ষের দিকে তাকাইয়া তপতী বলিল,—ঐ ফুলবীথিকা?

রূপসী মেয়ের সিঁথির মতোই সুন্দর সুকুমার, ওদের সীমান্তের শোভা অক্ষয় হোক!

তপতী হার মানিয়া গেল।

একটা নির্ঝরিণীর দিকে আঙ্গুল তুলিয়া তপতী মিঃ রায়কে কহিল—এবার আপনি বলুন ঐ ঝরণাটা কেমন লাগছে।

মিঃ রায় কহিলেন—আপনার দোদুল্যমান বেণীর মতন।

হাসিয়া তপতী কহিল,—'ইউনিভার্স্যাল' হলো না। আপনি বলুন তো তপনবাবু!

—মৌন গিরিরাজের মুখর বাণী, বিষণ্ণা বনানীর আনন্দ-কলগান, স্থিরা ধরিত্রীর অস্থির আঁখিজল...

একটা খাসিয়া মেয়ে দূরে বসিয়া আছে, তপতী কহিল,—বলুন মিঃ রায় ঐ মেয়েকে কেমন লাগছে?

মিঃ রায় বলিলেন,—ওঁর সঙ্গে এ বিষয়ে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। তবু বলছি—নির্জন পাহাড়ের পটভূমিকায় যেন একখানি জীবন্ত ছবি।

তপতী খুসী হইয়া কহিল,—খুব নতুন না হলেও সুন্দর। এবং আপনারটা বলুন!—তপতী অনুরোধ করিল তপনকে।

তপন কহিল,—কিন্তু আপনারও একটা বলবার আছে আশাকরি, বলুন সেটা!

তপতী কহিল—অলকার অলিন্দে বিরহিনী বধূ—এবার আপনারটা বলুন।

তপন প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল চমৎকার। আমারটা আর থাক্।

—না বলুন—বলতেই হবে—তপতী খুকীর মতো আবদার ধরিল।

আমি যদি অদ্ভুত কিছু বলি?—তপন মৃদুমধুর হাসিল।

তাই বলুন—যা আপনার ইচ্ছে বলুন! তপতীর আগ্রহ অদমনীয় হইয়া উঠিতেছে।

তপন বলিল,—মরণের বীথিকায় জীবনের উচ্ছ্বাস, জীবনেব যাতনায় মৃত্যুর মাধুরী—

সরু রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে খাসিয়া-পল্লীর দিকে। তপন হাসিমুখে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেল। তপতী পরমাশ্চর্য্যের সহিত কবিতাটির টীকা করিতে আরম্ভ করিল মনে মনে। কী বলিয়া গেল তপন ঐ কবিতার মধ্যে? তপতী চিন্তা করিতেছে দেখিয়া মিঃ রায় কহিলেন,—ওর কবিত্ব আপনাকে মুগ্ধ করলো নাকি, মিস চ্যাটার্জী?

—জেলাস হবেন না, মিঃ রায়। ওর কবিতায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। আর ও জেলাস হয় না।

—না, না, জেলাসি কিসের? ও তো আপনাকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়েছে, ও কি যোগ্য আপনার?

তপতী তড়িতাহত হইয়া উঠিল। স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়াছে। না তপতী মুক্তি চাহিয়াছিল। চাহিবার পূর্বে সহস্র অপমান সহ্য করিয়াও তপন তাহাকে মুক্তির কথা বলে নাই। মুক্তি দিবার সময় ও বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এবং মুক্তি দিয়া অজস্র উদ্বেলিত ক্রন্দনে পরিপ্লাবিত করিয়া দিয়াছিল তাহার পূজার বেদীমূল!

তপনের অযোগ্যতা কোথায়! ঐ সুন্দর আনন্দশ্রী, ঐ অদৃষ্টপূর্ব সংযম, ঐ হীরকদীপ্ত বাক্যালাপ—তপতীর অন্তর যেন জুড়াইয়া যাইতেছে। একমাত্র অপরাধ তপনের, সে দুই লক্ষ টাকার হিসাব দেয় নাই। নাই দিল—টাকা তো সে চুরি করিয়া লয় নাই, চাহিয়া লইয়াছে!

তপতী বাড়ি ফিরিতে চাহিল। মিঃ রায় আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন। তপনকে তাঁহার অত্যন্ত ভয় করিতেছে। লোকটা অদ্ভুত প্রকৃতির—হিমাচলের মতো অবিচল, আবার সাগরের মতো সঙ্গীতময়। কহিলেন তিনি,—আর একটু বেড়ানো যাক্-না—আসুন ঐদিকে—তপতীর ভালো লাগিতেছে না। নিতান্ত নিশ্চিন্ততায় সে যে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে এমন করিয়া নিঃশেষে মুছিয়া দিতে পারে, সে কে! মানুষ না পাথর—না দেবতা?

—আর বেড়ানো না, মিঃ রায়—চলুন! বাড়ি যেতে হবে আমায়—বলিয়াই তপতী

ফেরার পথ ধরিল। অগত্যা মিঃ রায়ও ফিরিলেন। সারা পথ নীরবে তপতী হাঁটিয়া আসিল; মিঃ রায়ও কোনো কথা বলিতে পারিলেন না।

রাত্রি গভীর।

আপন কক্ষে বসিয়া তপতী চিন্তা করিতে লাগিল তপনের প্রত্যেকটি ব্যবহার, প্রত্যেকটি কথা—যতদূর মনে পড়ে। মনে পড়ল, তাহাকে জন্মদিনে দেওয়া অশোকগুচ্ছের সহিত ঋষিজনোচিত আশীর্বাদ ; মনে পড়িতেছে অদ্যকার কবিত্বময় আশীর্বাণী ; মনে পড়িয়া গেল—'জীবনের যাতনায় মৃত্যুর মাধুরী' কি বলিয়া গেল তপন ঐ কথাটার মধ্যে? তপতীর বিরহে তপন এতটুকু ব্যথা পাইয়াছে, তাহা তো তপতীর কোনদিন মনে হয় নাই। কিন্তু আজিকার ঐ কথাটা হ্যাঁ, উহাই তপনের অন্তরবেদনার আত্ম প্রকাশ—মধুরতম, করুণতম কিন্তু বিষাক্ত জ্বালাময়।

তপতীর অন্তর তৃপ্তিলাভ করিতেছে। তপনের মর্মমাঝে তবে আজও আছে তাহার আসন!

ঠাকুরদা যদি একবার আসিয়া তপতীকে বলিয়া যান—প্রেমের নবীনতম বাণী তাহাকে শুনাইবে ঐ তপন, তবে তাঁহার আদরের তপতী আজ, বাঁচিয়াই যাইবে!—তপতী আচ্ছন্নের মতো শয্যায় পড়িয়া রহিল। চিন্তাশক্তি তাহার বিলুপ্ত হইয়াছে যেন!

সকালে নিয়মিত সময়ে মিঃ রায় আসিবামাত্র তপতী জানাইল, বেড়াইতে যাইবে না।

মিঃ রায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন,—বেড়াইবার জন্যই তো এখানে আসা মিস চ্যাটার্জি।

—সেটা আপনাদের পক্ষে। আমার আসা অপমানের প্রতিশোধ নিতে।

—কে করেছে অপমান আপনাকে? মিঃ রায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

—ঐ তপন! ও আমার নারীত্বকে নির্মমভাবে পদদলিত করেছে ; আমার প্রেমধারাকে পাষাণের মতো প্রতিহত করছে, আমার বন্ধনকে বিদায়ের নমস্কারে বঞ্চিত করেছে...বলে গেছে—'আমার বিদায় অশ্রু রাখিলাম, লহো নমস্কার।'

তপতী হু হু করে কাঁদিয়া ফেলিল। বিস্ময়-সমুদ্রে নিমজ্জিত মিঃ রায় নির্বাক হইয়া গেলেন। তপতী আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল,—বিকালে আসবেন, মিঃ রায়! ও আসবে সেই সময়। আর শুনে রাখুন, ওকে আমি আজও ভালবাসি, আমার শিরার শোণিতের মতো—বুকের স্পন্দনের মতো,—জীবনের যাতনার মতো।

তপতী চলিয়া গেল অন্যত্র। মিঃ রায় মিনিটখানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। বুঝিলেন, তপতী তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

বিকালে সুসজ্জিতা তপতী বেণী দোলাইয়া বসিয়া রহিল তপনের অপেক্ষায়। কয়েকটি নারী এবং পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে মিঃ রায়ও শেষ চেষ্টা দেখিতে আসিয়াছেন। তপতী বললে,—ওকে যে ঠকাতে পারবে, তাকে পুরস্কার দেবো।

সলিলা বলিল,—ভারি তো! একটা পুরুষকে ভেড়া বানাতে কতক্ষণ লাগে?

মাধুরী বলিল,—অত্যন্ত সহজে জব্দ করে দিচ্ছি—দাঁড়া।

মিনতি বলিল,—পদ্মবনে পথভ্রান্ত পথিক করে ছাড়বো ওকে। কাঁটার ঘায়ে মূর্চ্ছা যাবে।

—তপতী বলিল,—ও কিন্তু তপন, পদ্মরাই ওর পানে চেয়ে থাকে।

মিঃ রায় ভ্রূকুটি করিলেন তপতীর শ্রদ্ধাভরা কথা শুনিয়া। বলিলেন,—গোলাপবাগে গুব্‌রে পোকার মতো করতে পারলে তবে জানি।

তপতী মিঃ রায়ের অন্তরের ঈর্ষ্যা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, গোলাপবাগের ও গোপন

মধুকর, গুব্‌রে পোকার মতো ও ভ্যান্‌ভ্যানায় না! ও থাকে গোপন অন্তঃপুরে!

এমনভাবে কথা বলিতে পারিয়া তপতী যেন অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া গিয়াছে, এমনই দেখাইতেছে তাহার চোখ দুটি। আপনার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার কণ্ঠে যেন আজ তপনের ভাষার মাধুরি ঝরিতেছে। ইহাই কি বৈষ্ণব সাহিত্যের 'অনুখন মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই'।

মিঃ রায় বিপদ বুঝিয়া কথা বন্ধ করিয়া দিলেন।

তপন আসিয়া প্রথমেই বাড়ি ঢুকিয়া মিঃ চ্যাটার্জী ও মিসেস চ্যাটার্জীর পাদবন্দনা করিল। অতঃপর সকলকে বিনীত নমস্কার জানাইয়া আসনে বসিল।

প্রথমালাপের পর সলিলা বলিল, আপনার কথা অনেক শুনেছি, চোখে দেখে মনে হচ্ছে আপনি যাদুকর।

—আমার ভাগ্যটাকে অন্যের ঈর্ষার বস্তু করে তুলবেন না, মিস গুপ্তা, জগতে যাদুকরের আদর এখনও রয়েছে।

কিন্তু আপনিই-বা অনাদৃত কিসে?

—না—তবে, আদরটা আমার সহ্য হয় না—তুষারের পরে যথা রৌদের আদর উত্তপ্ত বালুতে যথা আদর অশ্রুর।

কথাটার কোথায় যেন বেদনার ইঙ্গিত রহিয়াছে। একটা হাসির কিছু আলোচনা হইলেই ভালো হয়। মাধুরী বলিল, ওসব কথা থাক, চায়ের মজলিসে হাসির গল্পই জমে ভালো।

মিঃ রায়ের পটুতা এ-বিষয়ে সর্বজনবিদিত ; কহিলেন, রাইট, হাসি সব সময়ে কাম্য।

অন্যপ্রান্ত হইতে তপতী কহিল, সবারই মন সমান নয়। মানুষকে মানুষ করতে কান্নাই সক্ষম। আপনার মতটা কি বলুন তো? তপতী সাগ্রহে চাহিল তপনের পানে।

বিস্মিত তপন ভাবিয়া পাইল না, তপতী তাহাকে লইয়া আজ কী খেলা খেলিবে। তপতী আজ অত্যন্ত দুর্বোধ্য। মৃদুহাস্য সহকারে সে কহিল ওঁর মতটাকেই তো প্রাধান্য দেওয়া উচিত আপনার।

সুমিষ্ট একটা ধমক দিয়া তপতী কহিল, চুপ। আমার মত কারও মতের অপেক্ষা রাখে না। আমার মত আমার স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত, মুক্ত স্বাধীন,—বলুন এবার আপনারটা—

আরো বিস্মিত হইয়া তপন ধীরে ধীরে কহিল, আমার মতে, হাসির মধ্যে কান্না আর কান্নার মধ্যে হাসিকে দেখতে শেখাই কাম্য। পৃথিবীর তিনভাগ অশ্রু-সাগর মাত্র এক ভাগ হাসির দ্বীপপুঞ্জ। আপাতদৃষ্টিতে মনোরম কিন্তু কুমীরের মাঝে মাঝে জল থেকে উঠে আসার মতো আনন্দদায়ক হলেও অস্বাভাবিক। হাসির প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু কান্নার প্রয়োজন ততোধিক, আনন্দ থেকেই হাসির উদ্ভব, কিন্তু গভীরতম আনন্দ কান্নাতেই প্রকাশ পায়। তাই মনে হয়, হাসি-কান্নাতে মূলত কোন তফাত নেই।

মিনতী বলিয়া উঠিল, বড্ড দার্শনিক প্রবন্ধের মতো শোনাচ্ছে। সহজ হাসি চাইছি আমরা।

তপন বলিল,—সহজ কথাটা পাত্রভেদে বদলায়। যেমন কাঠবিড়ালের গাছে ওঠা আর উদ্‌বিড়ালের জলে নামা।

মিনতী পুনরায় কহিল—অর্থাৎ আপনি বলতে চান, আমাদের চেয়ে আপনি উৎকৃষ্ট পাত্র?

তপন কহিল, উৎকৃষ্টতার প্রশ্ন অবান্তর। পৃথিবীর কাঞ্চনের প্রয়োজন থেকে কাচের প্রয়োজন কম নয়। এমন কি, ক্ষুদ্র কেঁচোরও প্রয়োজন আছে।

মুখ-টেপা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তপতী। কাচ-ভ্রমে সে তপনকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। সে কহিল, আছে, কাগজি লেবু থেকে আরম্ভ ক'রে কাঁচকলার অবধি প্রয়োজন আছে।

সকলেই মৃদুস্বরে হাসিতেছে। তপনের ভাষাটাকে এভাবে অনুকরণ করিয়া তপনকে সমর্থন করার জন্য মিঃ রায় ক্ষুণ্ণ হইতে গিয়া কথার হুল ফুটাইয়া ফেলিলেন। কহিলেন, কাচপোকারাও—কেমন?

তপতীর দুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল। আপনার অজ্ঞাতসারেই সে আজ তপনকে অনুসরণ করিতেছে—কিন্তু মিঃ রায় যে ইহা সহিতে পারিতেছেন না, তাহা বুঝিতে তপতীর মুহূর্ত বিলম্ব হইল না! কহিল, হ্যাঁ, কাচপোকাও ভালো যেমন ভালো কাচের কুঁজোর জলের থেকে কৃষ্ণসাগরের কালো জল।

তপতীর এই উচ্ছ্বাসময় বাণী বিহ্বল করিয়া গিয়াছে সকলকেই। তপন সমস্তই বুঝিল। তাহার দৃষ্টি নিবিড় বেদনায় নির্নিমেষ হইয়া উঠিয়াছে। মৃদুস্বরে কহিল,—ক'কারে কথা কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে তপতী দেবী।

মৃদু হাসিয়া তপতী উত্তর দিল,—কাপুরুষের গায়ে কাদাই ছিটানো উচিত। তাঁহাকেই কাপুরুষ বলা হইতেছে ভাবিয়া মিঃ রায় ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—কাপুরুষের উল্টো লোকটি কে এখানে, মিস চ্যাটার্জী?

তপতী কহিল, নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যারা সম্মুখ-যুদ্ধে পিছোয় না, যেমন আপনি।

আমি! তাহলে কাপুরুষটি কে আবার?

তপনের দিকে আঙুল তুলিয়া কহিল,—ঐ ইডিয়ট্, ঐ ভণ্ড, ঐ জোচ্চর।

সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিতেছে। মিঃ রায় আনন্দিত হইতে গিয়াও যেন ধোঁকায় পড়িয়া কহিলেন,—ছিঃ ছিঃ, মিস চ্যাটার্জী, কি সব বলছেন আপনি?

আপনাকে বারণ করেছি না আমায় 'মিস চ্যাটার্জী বলতে? বলবেন না আর।

কিন্তু আপনি ওঁকে অত্যন্ত অপমান করছেন, মিস চ্যাটার্জী...

মিঃ রায় বাধা পাইলেন। তপতী সজোরে ধমক দিল, শাট্ আপ! ফের মিস চ্যাটার্জী?

তপতীর উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া মা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন, খুকী হয়তো তপনের সহিত কিছু একটা কাণ্ড বাধাইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া তপন কুণ্ঠিত স্বরে কহিল—ওঁরা অতিথি, ওঁদের অসম্মান করতে নেই। মা, ওঁকে বারণ করুন!—তপন মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল মা'র পানে।

অকস্মাৎ তপতী চেয়ার ছাড়িয়া আসিয়া তাহার সুদীর্ঘ বেণীটাকে চাবুকের মতো ব্যবহার করিল তপনের বাম বাহুতে—সপাৎ সপাৎ! চীৎকার করিয়া বলিল,—ওরা তোমার অতিথি, তুমি ওদের সম্মান করবে...আর তোমার বিবাহিতা পত্নীকে ওরা বার বার অসম্মান করবে 'মিস, বলে—নিশ্চিন্ত বসে দেখবে তুমি।...কেন? কিসের জন্য বলো—তপতী আবো একটা আঘাত করিল সজোরে।

এই অকস্মিকতার আঘাতে নিথর হইয়া গেছে রঙ্গভূমি। তপনের সুগৌর বাহুতে প্রত্যেকটি আঘাত রক্তলেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে। মা কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন—কি তুই করলি, খুকী।

ক্রোধ-কম্পিত তপতী চাহিয়া দেখিল তপনের শোণিতাক্ত বাহু! উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে তাহার সীমান্ত লুটাইয়া পড়িল সেই রক্তের উপর—তপতী যেন আজ ঐ রক্ত দিয়াই তাহার

শুভ্র সীমান্ত রঞ্জিত করিয়া লইবে! অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—বড্ড জ্বালা করছে না?

তপতীর আকুল কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট নিরুপায় তপন নির্লিপ্তের মতোই যেন বলিল,—এমন কিছু না। কাঁদবার কি হয়েছে? সেরে যাবে—তারপর তপতীর মাথাটি সস্নেহে তুলিয়া ধরিয়া মাকে বলিল,—মা, ধরুন ওকে,—পড়ে যাবে এখুনি—

মা গিয়া তপতীকে ধরিলেন। তপতী থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে! একটা নীরব নমস্কার জানাইয়া তপন ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে—তপতী ছুটিয়া গিয়া তাহার পথরোধ করিল,—যাচ্ছ যে?

—আমি তোমায় মুক্তি দিয়েছি, তোমায় গ্রহণ করবার সাধ্য আর আমার নেই।

বিস্ময়ে তপতীর চক্ষু বিস্ফারিত হইল—মুক্তি দিয়েছো?'

—হ্যাঁ। আমার সত্য বজ্রের চেয়ে কঠোর, মৃত্যুর চেয়ে নিষ্ঠুর। সত্যভঙ্গ করে তোমায় আমার সহধর্ম্মিণীর আসনে আর বসাতে পারবো না—

তপন চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু বিমূঢ়া তপতী পড়িয়া যাইবে, তপন ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে ধরিয়া স্নেহের শীতলতম-মাধুর্য্যে কহিল,—এতদিন পরে এমন করে কেন তুমি আজ এলে তপতী? তুমি মুক্ত বিহঙ্গের মতো নীল আকাশের বিপুল বিস্তারে পাখা মেলো—আমার ধরার ধুলিতে পড়বে এসে তার ছায়া—একটি মুহূর্তের তরে যেখানে তুমি গ্রহণ করলে তোমার আসন! মুক্তির সেই অবাধ অধিকারে রইল আমাদের চিরমিলনের আকুতি...

তপন চলিয়া গেল।

অকস্মাৎ তপতীর আর্ত চীৎকারে দিগ্‌প্রান্তধ্বনিত হইয়া উঠিল,— ঠাকুরদা—ঠাকুরদা...

দিন, মাস, বর্ষ চলিয়া যাইতেছে...

বিশাল 'তপতী নিবাসে,' তপনের পরিত্যক্ত কক্ষটিতে বসিয়া থাকে তপতী—একা, আত্ম-সমাহিতা কুণ্ঠিত পিতা আসিয়া বলেন—তোর আবার বিয়ে দেবো, খুকী, তুই আমাদের একমাত্র মেয়ে...

নিয়তির মতো নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে তপতী উচ্চারণ করে—তাই বুঝি ঠাকুরদার সৃষ্ট দেবমূর্ত্তিকে দানবী করে তুলেছিলে? কিন্তু ওর নিষ্ঠুর ছেনীর আঘাতে আবার তাকে দেবী করে দিয়ে গেছে বাবা!—এ-মন্দিরে আর কারও প্রবেশ নেই।—যাও।

স্নেহ-দুর্বল পিতা পুনরায় বলেন—আমার কাছে দু'লাখ টাকা নিয়ে আমারই বাবার নামে 'শ্যামসুন্দর ভিক্ষুকাশ্রম' করেছে, এতে-বড়ো হৃদয়বান সে! খুকী, চল্ ওকে ডেকে আনি।

হাস্যদৃঢ় কণ্ঠে তপতী উত্তর করে,—ওর সহধর্ম্মিণী আমি হয়েছি, বাবা, সত্যভঙ্গ করিয়া বিলাস সঙ্গিনী হতে আর চাইনে!

মা আসিয়া স্নেহ-সজল স্বরে কহেন,—এমন করে কতদিন তুই থাকবি খুকী?

তপতী স্নিগ্ধ ঔদার্য্যে আত্মপ্রকাশ করে,—এমনি করে আমরণ রাখবো আমার বিরহের চিতা-বহ্নিমান!—

গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে তপনের শূন্যশয্যা-প্রান্তে নতজানু তপতীর করুণ মধুর কণ্ঠঝঙ্কার শোনা যায় :

—'তোমায়-আমায় মিলেছি, প্রিয়, শুধু চোখের জলের ব্যবধানটুকু রইল।'

চরণ দিলাম রাঙায়ে

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামিয়া আসিতেছে। জনহীন প্রান্তর পার হইয়া আসিতেছে একখানি পাল্কী। চারজন বাহক ক্লান্তি অপনোদনের জন্য পাল্কীর বোল বলিতেছে 'হিঞ্জোরো—বাঁহাবোরা'—ইত্যাদি। আরোহী ভিতর হইতে বলিলেন,

—নামারে, এইখানে রাখ একটু।

বাহকেরা একটা বৃক্ষতলে পাল্কী নামাইয়া বসিল। আরোহী একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি, কিঞ্চিৎ স্থূলকায়! বাহিরে আসিয়া অস্ত সূর্যের বিদায়লিপির পানে চাহিয়া বলিলেন,

—"তারা—তারা আনন্দময়ী মা—"

বিপরীত দিক হইতে যষ্ট হস্তে একজন শ্রান্ত পথিক আসিতেছিল, এইখানে আসিয়া থামিয়া গেল।

আরোহী প্রশ্ন করিলেন—কোথায় যাবে হে এই সন্ধ্যাবেলা?

—নূপুরে একটা গানের মজলিস আছে বাবু মশায়!

—পৌঁছুবে কি ক'রে? সামনে যে অমাবস্যার রাত।

—যেতেই হবে হুজুর, বায়না নিয়েছি পাঁচ টাকা।

—সব শুদ্ধ কত টাকা পাবে?

—দু'দিনে বারো টাকা হুজুর!

—যেতে হবে না, আমার মেয়েকে নাচ গান শেখাবে চলো, মাসে কুড়ি টাকা পাবে।

—এমন চাকরী পেলে বেঁচে যাই হুজুর, কিন্তু ওদের যে কথা দিয়েছি, পরশু আমি—

চুলোয় যাক তোমার কথা, টাকা ফিরিয়ে দেবো—চলো, এই ওঠা পাল্কী—

আরোহী যেন পথিককে আদেশই করিয়া পাল্কীতে উঠিতে যাইতেছেন।

—তা কি হয় হুজুর, আমি কথা দিয়েছি, না গেলে ওঁদের সব মান-সম্ভ্রম নষ্ট হবে।

পথির নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইতেছে, আরোহী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

—ওদের আবার মান-সম্ভ্রম কি? বারোয়ারীর হরিসভা। ফেরো, ওখানে যাওয়া হবে না।

পথিক একটু থামিল, পরে করজোড়ে বলিল—

—তা হয় না হুজুর, আমার কথা আমাকে রাখতে হবে। পরও আমি আসবো আপনার বাড়ি।

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল! আরোহী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রইলেন। পথিকের মূর্তি দূরে মিলাইয়া যাইতেই তিনি পাল্কীতে উঠিয়া বসিলেন। বাহকেরা পাল্কী তুলিতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বন্দুকের আওয়াজ। বাহকেরা ভীত হইয়া পলায়ন করিল। আরোহী পাল্কী হইতে বাহির হইবেন কিনা ভাবিতেছেন! অকস্মাৎ অদৃশ্য কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল,—হেঁটে যাও হে রামেশ্বর—হেঁটে

যাও। মানুষের কাঁধে চ'ড়ে যাওয়ার বড় মানুষী আর করো না হে, আজ থেকে হেঁটে যাও।

—কে তুমি—কে কথা বলছো?

সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় এক মূর্তি দেখা গেল।

আমি শ্রীমান রাজীবলোচন অধিকারী। চমকে উঠলে নাকি রামেশ্বর? চিনতে পারছো না?

—না, চিনবার দরকার নেই, অনর্থক মানুষ খুন করবার চেষ্টা করছো কেন?

—হাঃ হাঃ হাঃ—তুমি আবার খুন জখমের জন্যে অভিযোগ করছো নাকি হে?

—আমি বিনা কারণে কিছু করিনে!

—কারণ একটা অবশ্য আমারো আছে।—তোমাকে পায়ে হেঁটে বাড়ি পাঠানো। যাক্—শোন, তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, যাকে গুলী ক'রে মারবার কারণ ঘটেছিল—আমি যাকে ভালবাসতাম—তার মেয়েটাকে রেখেছ কোথায়? এসো হে—বাইরে এসো, ভয় নাই, তোমায় গুলী করবো না।

—ভয় রামেশ্বর রায় কাউকে করে না। যাক্, সে মেয়ের খোঁজে তোমার দরকার?

রামেশ্বর বাহিরে আসিলেন।

রাজীব বলিলেন—দরকার? ও! আমার দরকার—সে আমারই মেয়ে। আমার মেয়ের খোঁজ করবার অধিকার আমার নিশ্চয় আছে, বিশেষত তার মা যখন জীবন দিয়ে তোমার সঙ্গে তার বিবাহ-ঋণ চুকিয়ে দিয়ে গেছে। শুনলে?

—না, শুনিনি, শুনতে চাইনে, তোমার মতো এক শয়তানের থেকে—

—হাঃ হাঃ হাঃ চমৎকার রামেশ্বর! শয়তান তুমি নও তা হলে! ঈশ্বর তোমাকে বুঝি শয়তানেরও বড়ো করে বানিয়েছেন? জয় হোক তাঁর। কিন্তু কোথায় সে মেয়ে?

—বলবো না; বেশী খোঁজাখুজি কর তো তাকেও তার মার সাথী ক'রে দেব—যাও?

রামেশ্বর হঠাৎ রিভলভার বাহির করিলেন।

রাজীব উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,

—আচ্ছা যাও, হেঁটেই যাও আজ!

রাজীব যেন মুহূর্তে অন্ধকারে মিলাইয়া গেলেন! আকাশের আলো ধীরে ধীরে কমিয়া আসিল, অন্ধকার হইয়া যাইতেছে, শুধু রামেশ্বরের মূর্তিটি আবছা দেখা যাইতেছে। রামেশ্বর সম্মুখের পথ ধরিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। ডাকাত পড়িয়াছে ভাবিয়া বাহকেরা পলাইয়াছে।

কত কথা আজ মনে পড়িতেছে! কলকাতা সহর। কলেজ-হোষ্টেল। সহপাঠি ক্রীড়া-সঙ্গী, পাঠ্যপুস্তক! বন্ধু—না, বন্ধুত্ব তো কারো সঙ্গে হয় নাই রামেশ্বরের। বন্ধু কোথায়? শত্রু? পরম শত্রু ঐ রাজীব। বুদ্ধিমান বিদ্বান রাজীবকে তার সঙ্গী করিয়াছিলেন রামেশ্বর ছাত্রজীবনে। কিন্তু কি হইল? রাজীব তার চোখে ধূলো দিয়াছে—কথাটা কিন্তু সত্য নয়। রাজীবেরই চোখে ধূলো দিয়া জমিদারপুত্র রামেশ্বর ভদ্রাকে আপনার করিয়াছিলেন। না—ঠিক আপনার করা যায় নাই তাকে। জীবন দিল তবু রামেশ্বরের কেউ হইল না। না হোক—রামেশ্বরকে সে একটি অমূল্য রত্ন দিয়া গেছে—তার মেয়ে মীনাক্ষীকে। কিন্তু—এসব কি ভাবিতেছ রামেশ্বর। মীনাক্ষী তো রামেশ্বরের মেয়ে নয়। কেউ-ই নয় সে রামেশ্বরের। না—কেউ নয়।

কিন্তু কেন নয়। তার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছে মীনাক্ষী। পূর্বকালে নাকি নিয়োগপ্রথা ছিল? রামেশ্বর তাই মানিয়া লইবে। মানিয়া লইয়াছে তো! নইলে এতো স্নেহে মীনাক্ষীকে কেন মানুষ করিল রামেশ্বর?

রামেশ্বরের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা সে। সারা বিশ্ব জানে, মীনু রামেশ্বরের কন্যা। তার সর্বস্বের উত্তরাধিকারিণী—কিন্তু রামেশ্বর জানে মীনু তার কেউ নয়—মীনু ঐ রাজিবের কন্যা! তার সর্ব অবয়বে রাজিবের রক্ত—হ্যাঁ—তাই।

নিয়োগপ্রথা! দূর করো। ভাবিয়া সান্ত্বনা পায় না। রামেশ্বরের চোখদুটো অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল। বীভৎস রূপ ধারণ করিল শান্ত স্নেহশীল রামেশ্বরের মুখখানা।

রামেশ্বর হাঁটিয়া চলিয়াছেন—হাতের আঙ্গুলে ছয়ঘরা রিভালভারটা নিসপিস করিতেছে।

গ্রামের সীমানায় আসিতেছেন রামেশ্বর রায়। দূরে প্রকাণ্ড প্রাসাদ দেখা যাইতেছে। প্রাসাদের আলোগুলি নক্ষত্রের ন্যায় দেখাইতেছে কিন্তু রাত্রি অন্ধকার! পথ বাহিয়া রামেশ্বর আসিতেছেন। বলিলেন,

—উঃ—পা দু'টো ভারি হয়ে উঠলো। বহুকাল পথ হাঁটিনি—রাজীব এর মূলে! আচ্ছা. দেখে নেব রাজিব কত বড় শয়তান।

প্রাসাদ হইতে নারীকণ্ঠের সুমিষ্ট সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে।

রামেশ্বর এক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিলেন। তারপর যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে পা চালাইয়া দিলেন বাড়ির দিকে।

প্রাসাদের একটি আলোকজ্জ্বল কক্ষে অর্গ্যানের সম্মুখে বসিয়া মীনা গান গাহিতেছে।

(গান)

প্রজাপতি সাক্ষী আছে ফুলপরীরা এসেছিলো!
সবুজ ঘাসের আসর জুড়ে হাসি তাদের হেসেছিলো।
এসেছিল গোপাল-কলি পাতায় আড়ে মুখ লুকিয়ে,
এসেছিল কেয়াবধূ দীঘল পাতার ঘোমটা দিয়ে,
গন্ধা ঝরা তাদের বুকে ঘুমিয়ে আমি ছিলাম সুখে
অশোকবীথির কচি পাতা আমায় ভাল বেসেছিল।
জেগে দেখি নাই কোন ফুল, লুটিয়ে কাঁদে সকল লতা,
কে তাহাদের তাড়িয়ে দিল, কে বলেছে নিঠুর কথা!
তরুবীথি বলছে মোরে, ঝরাপাতা বলছে মোরে,
কালো ভ্রমর বলছে মোরে, কেউ কাঁদেনি ওদের তরে,
প্রজাপতি বলছে শুধু বাতাস নাকি স্বসেছিলো।

গান তখনো শেষ হয় নাই। রামেশ্বর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মীনা তাহাকে দেখার পরেও শেষ কলিটা শেষ করিতে করিতে নিকটে আসিল, সস্নেহে হাত দুটি ধরিয়া বলিল—

—বড্ড যে ক্লান্ত দেখাচ্ছে বাবা। বসো বাবা! কপালটা ঘেমে উঠেছে যে।

রামেশ্বরকে কৌচে বসাইয়া দিয়া মীনা আঁচল দিয়া তাঁহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল। তারপর হাসিয়া বলিল,

—আর একটা গান গাইছি বাবা, শোন –

(ছড়া)

বাবা আমার বাড়ি এলো নিয়ে এলো চন্দনা,
আজ কি দিয়ে করবো আমি বাবার চরণ বন্দনা?
কুন্দ আছে, কেয়া আছে, চাঁপাও ফুটে আছে গাছে,
চুয়াতে আর চন্দনেতে বন্দনা হয় মন্দ না।
কিন্তু আমার মাথার চুলে বাবার চরণ রাখলে তুলে,
হাত বুলোবার সাথে জাগে আনন্দ—না—না...

রামেশ্বর পা টানিয়া লইতেছেন। মীনা গানের শেষের 'না' কথাটায় জোর দিয়া বলিল—

—না—না—না—বাবা, না। মীনা রামেশ্বরের পা চাপিয়া ধরিল, রামেশ্বর মীনার ললাটে স্নেহস্পর্শ বুলাইতে গিয়া একবার থামিয়া গেলেন। পর মুহূর্তে দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া মীনার মাথায় হাত রাখিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পা টানিয়া লইলেন। বলিলেন,—

—মায়াবিনী মেয়ে! তোকে দেখি আর মনে হয়—কি যে মনে হয়—ক্লান্ত কণ্ঠে থামিলেন।

—না বাবা, তুমি ওরকম করে কথা বলো না। তুমি যেন মাঝে মাঝে কি রকম হয়ে যাও বাবা, কি যেন স্বপ্ন দেখ! আমাকে বলবে না বাবা?

বলবো, তোকেই বলবো মানু! তার আগে তোর চন্দনা নিয়ে আসি। তার হাতে তোকে দিয়ে সব কথাই বলে যাব।

—থাক বাবা, আমি জানতে চাইনে! কি দরকার আমার? চল, কাপড় ছাড়, হাত-মুখ ধোও, রাত হয়েছে বাবা—ক্ষিদে পেয়েছে যে তোমার।

—না রে, রাত তো বেশী হয়নি।

—আমি বিকেল থেকে কিছুটি খাইনি বাবা! তোমায় নিয়ে একসঙ্গে খাব বলে বসে আছি। চলো, ওঠো। কানাই! আমাদের খাবার ব্যবস্থা কর। হাত মুখ ধুয়ে এসো বাবা!

রামেশ্বর চলিয়া গেলেন।

কানাই খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল। রামেশ্বর ও মীনু খাইতে বসিয়াছে।

রামেশ্বর বলিলেন,—তুই এতক্ষণ খেয়ে নিলেই ত পারতিস মা!

মীনু বলিল,—তোমার মা থাকলে কি আগে খেতে পারতো বাবা! আমি যে তোমার মা! বাবা, কিছু খাচ্ছো না, রাগ করবো আমি।

—আর পারছি নে মা। পথ হেঁটে ক্ষিদেটা কমে গেছে। আজ আর থাক, লক্ষ্মী মা আমার, কাল আবার খাবো।

প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের একপার্শ্বে একজন অদ্ভুতদর্শন লোক। অন্ধকারে দূরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ সে পিতাপুত্রীর কথোপকথন শুনিতেছিল। এবার সে নিকটে আসিল, তাহার অবয়ব আধো অন্ধকারে দেখা যায় যেন ছায়া, কিন্তু চক্ষু দুইটি জ্বলিতেছে। বারান্দার এক কোণে আত্মগোপন করিয়া সে রামেশ্বর ও মীনার খাওয়া দেখিতে লাগিল। মীনা বলিতেছে,

—না—না—না, আমি কত কষ্ট করে সন্দেশ তৈরি করলুম আর তুমি খাবে না বাবা?

খাও—খেতেই হবে।

রামেশ্বর বলিল, তোর কাছে আমি হেরে গেলুম মা মীনু! মা-দের কাছে খাওয়া সম্বন্ধে ছেলেদের হার চিরকাল। ভীমের খাওয়া দেখে কুন্তীদেবী খুশী হতেন না, কুম্ভকর্ণের খাওয়া দেখে তার মা বলতেন—বাছা আমার কিছু খেতে পারে না। তুই এবার—

মীনু যেন কতকটা নীরস কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা, ওভালটিন খেয়ে ঘুমুবে চল, এসো হাত ধুইয়ে দিই।

মীনু রামেশ্বরের হাত ধোয়াইয়া দিল। রামেশ্বর ব্যাকুল স্নেহাতুর চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

মীনু বলিল—নাও,—এসো, ওভালটিন খাও।

মীনু মুখের কাছে রূপার পেয়ালটা ধরিল। রামেশ্বর সস্নেহে মীনুকে কাছে টানিয়া বলিলেন—তোর মা যদি আজ থাকতো মীনু—সে যদি আজ থাকতো।

রামেশ্বর উন্মনা হইয়া উঠিলেন। উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কী যে ভাবিতে লাগিলেন—মীনু জানে না। সে অনেকক্ষণ বাবার মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল। চিন্তিত বিষণ্ণ মুখ রামেশ্বরের। মীনু কিন্তু আর কিছু বলিল না।

শয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে। একজন চাকর গড়গড়া রাখিয়া বিছানাটা আর একবার ঝাড়িয়া পাতিল। চতুর্দিক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল কোথাও কোন খুঁৎ আছে কিনা। তৎপরে আলোটি কমাইয়া দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। শয়নের বেশ পরিধান করিয়া রামেশ্বর আসিয়া শয্যায় শুইলেন ও গড়গড়ার নলটা লইয়া টানিতে লাগিলেন। মীনা আসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—

সেতারটা বাজাই বাবা, শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যাও। ভারী লক্ষ্মী ছেলে—কেমন?

মীনা সেতার বাজাইতে লাগিল।

রামেশ্বর বলিলেন—তুই শুগে মা, রাত হয়েছে।

মীনা বলিল—তুমি ঘুমাও, তোমাকে একা ফেলে—

—তোর বুড়ো খোকা ঠিক ঘুমুবে, যা শুয়ে পড় মা, রাত বারোটার উপর।

মীনা নিরুপায়ের মতো সেতার লইয়া আসিতে আসিতে বলিল,

আধঘণ্টার মধ্যে যেন নাক ডাকার শব্দ পাই বাবা।—

মীনা চলিয়া গেল।

মীনার শয়নকক্ষটি আধুনিক রুচিসম্মতভাবে সাজানো। তবে নানারকম সৌখিন দ্রব্যের একটু বেশি ভীড়। ড্রেসিং টেবিলের নিকট আসিয়া বেশবাস শ্লথ করিয়া দিল সে। প্রকাণ্ড পালঙ্কে সুন্দর শয্যা অপেক্ষা করিতেছে। মীনা দেওয়ালে লম্বিত পিতার মূর্তির পানে চাহিল। ভাবিতে লাগিল।

—মার একটা ফটো পর্যন্ত নাই—আশ্চর্য। মার কথা বাবা কোনদিন কিছু বলেন না. আজ বললেন!

মীনা শুইয়া পড়িল এবং একটা উপন্যাসের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ঘুমাইয়া গেল। ঘরে স্নিগ্ধ আলোক জ্বলিতেছে! দেখা গেল এক অদ্ভুত দর্শন মূর্তি বারান্দা দিয়া নিঃশব্দে মীনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেছে।

মীনা ঘুমাইতেছে। অতি নিঃশব্দে সেই অদ্ভুতদর্শনে লোকটি মীনার শয়নকক্ষে আসিয়া ঔষধসিক্ত একটি রুমাল মীনার মুখে চাপিয়া ধরিল এবং দুই তিন মিনিটের মধ্যেই তাহাকে অজ্ঞান করিয়া পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মীনা চলিয়া যাওয়ার পর রামেশ্বর কিছুক্ষণ শুইয়াই ছিলেন। পরে উঠিয়া একটা চাবি লইয়া লৌহ-সিন্দুক খুলিলেন। বহু দিনের বহু বস্তু আছে এই সিন্দুকে। অন্য সব ফেলিয়া দিয়া রামেশ্বর লৌহ-সিন্দুক হইতে একটি ছোট্ট বাক্স বাহির করিলেন। বাক্সের মধ্যে একখানি ফোটো ও এক টুকরো চিঠি। রামেশ্বর ফোটো ও চিঠিখানি কয়েকবার দেখিলেন। শান্ত স্নেহময় রামেশ্বর ধীরে ধীরে যেন পরিবর্তিত হইতে লাগিলেন। মুখের রেখাগুলি কঠিন হইয়া উঠিল। ওষ্ঠে একটা দারুণ সংকল্প পরিস্ফুট হইল। আপন মনেই বলিলেন—.

—রামেশ্বর—ওই মায়াবিনীর শরীরে তোমার এক ফোঁটা রক্ত নেই। তবু ও তোমার কন্যা—তোমার যথাসর্বস্বের অধিকারিণী। কিন্তু রাজীব এতকাল পরে কেন খোঁজ করতে চায়? কেন?—কেন?

কিছুক্ষণ পায়চারি করিলেন, অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন, উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন রামেশ্বর। আপনমনে বলিতে লাগিলেন,

না। রায়বংশের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাক। ওকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিই—ওর মার কাছে গিয়ে জুড়োক।

রামেশ্বর একটা ড্রয়ার হইতে রিভলবার বাহির করিলেন। গুলী ভরা আছে কিনা দেখিলেন। আবার সেফের ভিতরকার ফটো ও চিঠিখানি দেখিলেন। ভাবিতেছেন,

—কেন মিছে মমতা বাড়ানো! রাজীব যদি প্রকাশই করে দেয়,—কিন্তু কি স্বার্থে করবে? এতকাল তো কোন খোঁজ করেনি! আজ তার কি দরকার পড়লো!

আবার কিছুক্ষণ পায়চারি করিতে লাগিলেন :

—মেয়ে তার ; আমি তার পিতৃত্বকে অন্যায়ভাবে ভোগ করছি! অন্যায়? অন্যায় কি আবার!

যেন চমকিয়া উঠিলেন। কি যেন দেখিতেছেন। দ্বারপ্রান্তে এক অশ্রুমতি নারীর ছায়ামূর্তি,—না না ও কিছু নয়।

—কে? ও—কে? ওঃ! আবার এসেছ। ভূত আমি মানি না, শুনলে? তোমাদের প্রেম ছিল,—হ্যাঁ, ছিলো প্রেম তোমাদের—স্বর্গীয় সুকুমার প্রেম! তুমি আসতে চাওনি, কিন্তু তোমার বাবা আমাকেই নির্বাচন করেছিলেন। রাজীবকে বার করে দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে—মনে পড়ে না? রাজীবের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা তোমার বিয়ের পূর্বেই ঘটেছে জানলে—রায়বংশের বধূ করতাম না তোমায়। যা হবার হয়েছে—এখন ওই মেয়েটাকে শেষ না করলে বংশের মর্যাদা নষ্ট হবে। যতবার সঙ্কল্প করি, তুমি এসে বাধা দাও। আচ্ছা, আজ আর কোন বাধা মানব না। আজ নিশ্চয়ই—

রামেশ্বর মূর্তির পানে রিভলবার উদ্যত করিয়া বলিলেন,

—আগে যাও তুমি—যাও—

রামেশ্বর গুলী করিলেন। মূর্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে। রামেশ্বর নিজের

নির্বুদ্ধিতায় নিজের উপর বিরক্ত হইয়া একটা বড় আলমারী হইতে বোতল ও গ্লাস বাহির করিলেন—পানীয় ঢালিলেন এবং সামনে বড় ড্রেসিং টেবিলটার নিকট দাঁড়াইয়া পান করিতে লাগিলেন। আয়নায় তাঁহার মুখ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। পুরু পুরু ঠোঁটের উপর ঘন কাঁচা পাকা গোঁফ মুখখানাকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছে। বাঁ হাতে গোঁফজোড়া একবার মুচড়াইয়া লইয়া রামেশ্বর হাসিলেন—

—কত খুন জখমই তো হয়েছে রামেশ্বর তোমার হাত দিয়ে। এই এক ফোঁটা মেয়েটাকে আজও সরাতে পারলে না! কিসের মায়া-মমতা! কে সে তোমার? রাজীব আজ যদি প্রকাশ করে, ওর মা বিবাহের পূর্বেই আত্মদান করেছিল, যদি বলে ওর বাপ ওই রাজীব—তা হলে রায়বংশের সম্মান—রামেশ্বর রায়ের অহঙ্কার ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। রাজীব কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে? কি ওর মতলব?

আরও কয়েকবার মদ্যপান করিলেন এবং ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো নিজের ছবির পানে চাহিয়া রইলেন। অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতেছেন,

—রায়বংশের কেউ থাকবে না—কিন্তু ও তো রায়বংশের কেউ নয়—ওর গায়ে রায়বংশের একটা ফোঁটা রক্ত নেই ; অনর্থক বিপদ বাড়ানো—নাঃ—আজই, এই অমাবস্যার রাত—এই অন্ধকার—সারা পৃথিবী ঘুমুচ্ছে, এই-ই ঠিক সময়!

রামেশ্বর দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া রিভলবার তুলিয়া লইলেন। অকস্মাৎ বাহিরে কি যেন একটা শব্দ। রামেশ্বর রিভলবার গোপন করিয়া নিঃশব্দে বাহিরে গেলেন।

কেহ কোথাও নাই।

কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে একখানি প্রকাণ্ড বাড়ি। সামনে বড় রাস্তা। বাড়ির ঠিক পাশ দিয়া একটা গলিরাস্তা, সম্মুখে উদ্যান—বাহিরে কলাপসিব্‌স গেটের পাশে উর্দিপরা-তকমাআঁটা দারোয়ান দাঁড়াইয়া আছে। বাড়িতে কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ, শুধু বাগানের একদিকে একটা কাচের ঘরের সামনে একটি ক্ষুদ্র জানালা। কাচের ঘরটির মধ্যে কাচের ছোট ছোট জারে নানা জাতীয় সাপ. কয়েকটা হুড়পিতেও সাপ। খাদ্য দানের ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর।

একটি যুবক—পরণে খদ্দরের পাঞ্জাবী, ধুতিখানা কতকটা কাবুলিওয়ালাদের মতো করিয়া পরা, হাতে কয়েকখানা চক্‌চকে বাঁধানো বই লইয়া গেটের সামনে আসিল।

দারোয়ান সেলাম করিয়া বলিল,

—আভি তক সাহেব নেহি আয়া হুজুর!

যুবক অত্যন্ত বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইল। প্রশ্ন করিল,

—কব্ আয়েঙ্গে কুচ বোলা হ্যায় তোমকো?

—নেহি হুজুর!

যুবক চলিয়া যাইবে কিনা ভাবিতেভাবিতে কাচের ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। নানা রকমের সাপ কিলবিল করিতেছে। যুবকটি শিহরিয়া উঠিল।

যুবক আপন মনে বলিল, লোকে কুকর-বিড়াল পোষে, না হয়, বাঘ-ভাল্লুক পোষে—উনি পোষেন সাপ! আশ্চর্য খেয়াল কিন্তু!

যুবক চলিয়া যাইতেছে : ভিতর হইতে নারীকণ্ঠের সঙ্গীত শোনা গেল। আশ্চর্যান্বিত হইয়া যুবকটি দাঁড়াইল!

(গান)

আকাশ জাগে আলোর লাগি
বাতাস জাগে ফুলের তরে।
আঁধার রাতের তারা জাগে
আঁধার শেষে ফিরতে ঘরে।
কুঁড়ির ভেতর গন্ধ জাগে,
ব্যাকুল প্রাণে মুক্তি মাগে,
জানি না কে আছে জেগে
আমার বুকে এ পিঞ্জরে।

যুবক দারোয়ানকে শুধাইল,

—কোন হ্যায় দারোয়ানজী! গানা করতো হ্যায় কোন্?

দুসরা ভাড়াটিয়া হ্যায় হুজুর! উধার দরয়াজা হ্যায়।

যুবক আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া ঘুরিয়া সটান বারান্দায় আসিয়া উঠিল। দরজা বন্ধ। দিক হইতে গানের শব্দ আসিতেছে—সেই দিকে—সাপের ঘর যেখানে আছে, ইখানে গিয়া দেখিল—জানালা দিয়া আলো আসিতেছে! সে জানে, এ বাড়িতে প্রফেসার ধিকারী ব্যতীত আর কেহ থাকে না। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া নিকটবর্তী একটি থামের ডালে দাঁড়াইয়া ভিতরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

ভিতরে প্রশস্ত একটা কক্ষ। একধারে শুভ্র একটি শয্যা বিছানো রহিয়াছে। কেহ যে হাতে শুইয়াছিল—তাহা বোঝা যায়। ঘরের মধ্যে কয়েকটা কাঠের টিপয়ের উপর য়কটা কাচের জারে একটা একটা করিয়া জীবন্ত সাপ ফণা তুলিয়া দুলিতেছে। ঘরের াটি কোণায় অত্যন্ত ভীত ও সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে একটি মেয়ে ; ভয়ে পিতেছে! মধ্যস্থলে একজন বেদে তুমড়ি বাজাইতেছে আর বলিতেছে,

—গাও—আর একবার গাও—

বেদে একটা সাপকে একটু নাড়িয়া দিল।

মীনা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল,

—বাবা গো—।

—আর একবার বলো—'বাবা গো—বাবা' বলো...

—তা হলে ছেড়ে দেবে?

—না, তা হলে আচ্ছা বলো—বাবা!

—বলছি। আমি সর্পনৃত্য জানি, নাচবো?

—সত্যি জান? সত্যি? নাচ তো মা, নাচ তো ; আমি বাজাচ্ছি। নাচো—কি! ওরা মার পোষা সাপ।

—কিন্তু আমায় ছেড়ে দিতে হবে, বলো—দেবে?

না। তুমি আমায় বাবা বলবে, যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকবো—তুমি শুধু বে,—বাবা—বাবাগো—বাবা। যেমন ক'রে সেদিন রামেশ্বর রায়কে বলেছিলে—বলো। তোমাকে তেমনি করে বাবা বলতে হবে! কী আস্পর্ধা তোমার। মীনা রুখিয়া সরিয়া ল।

—বলবে না? আচ্ছা!

বেদে একটা সাপকে নাড়িয়া দিল। ভয়ে মীনা করুণ কণ্ঠে বলিল,—বলছি—বাবা।

—নৃত্য কর তো মা, সর্পনৃত্য করো। সাপের নৃত্যে বিষ ঝরে, তোমার নৃত্যে অমৃত ঝরুক।

মীনা বাক্যব্যয় না করিয়া ভয়ে ভয়ে সর্পনৃত্য আরম্ভ করিল। নৃত্যের সাথে সাথে তালে তালে বাঁশী বাজিতেছে এবং সাপগুলি হেলিয়া দুলিয়া খেলিতেছে। মীনা বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়া নাচিয়া চলিয়াছে। নৃত্য শেষ হইলে বেদে বলিল,

—রামেশ্বর রায়কে বাবা বলে এতকাল যে বোকামী করেছ মা, আমায় বাবা বলে তার শোধ করো। ও তোমার কেউ নয়। কিন্তু তোমাকে আজ আর কিছু বলবো না। এসো ঘুমুবে

অত্যন্ত স্নেহের সহিত বেদে মীনুকে লইয়া গিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিল এবং সাপগুলি যথাস্থানে রাখিয়া সন্তর্পণে একটি বন্ধদ্বার খুলিয়া চলিয়া গেল।

থামের আড়ালে যে যুবকটি এতক্ষণ ধরিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল, সেও অতঃপর ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া আসিল এবং বহিঃদরজায় আসিয়া দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল,

—উধার কোন হ্যায় দারোয়ানজী?

—দুস্‌রা ভাড়াটিয়া হ্যায় হুজুর। পিছন তরফ উন্‌লোককো ভাড়া দিয়া গিয়া। ও বেদিয়াকো কোই আপনা আদমী হো গা।

যুবকটি আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া নামিল, আবার থামিল, আবার চলিতে লাগিল পুনরায় বাগানের গেটে আসিয়া একটি লতা হইতে ফুল তুলিয়া ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিল।

ও দিককার গলির মোড় হইতে এক ভদ্রলোক—শুভ্র-সুন্দর ধুতি চাদর পরিহিত চোখে চশমা, দ্রুত আসিতেছেন, তিনিই প্রফেসার রাজীব অধিকারী। যুবকের কাছে আসিয়াই থামিয়া বলিলেন,

—চলে যাচ্ছো যে শ্যামল? আমার একটু দেরী হলো। এসো শ্যামল তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করিয়া বলল,

—আজ আর থাকগে স্যার, রাত হয়ে গেল। তাছাড়া আপনি যেন বড় ক্লান্ত। আমি কাল সকালে আসব।

—যে নোটগুলো দিয়েছিলুম—বুঝতে পেরেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—শুধু এক জায়গায়—

—কাল একবার 'এক্সপেরিমেন্ট' করে নিও, সবই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

—যে আজ্ঞে, আজ তা হলে আসি স্যার!—শ্যামল রাজীবকে প্রণাম করিল।

—এসো বাবা—এসো।

শ্যামলের মূর্তি আধো অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। প্রফেসার অধিকারী লেবরেটারীকক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রকাণ্ড ঘর ; এক-পাশ দিয়া দ্বিতলে যাইবার সিঁড়ি দেখা যাইতেছে ঘরটার চারিদিকেই আলমারি—মেঝেতে কয়েকটা বড় টেবিল পাতা, তাহার উপর মাইক্রোসকোপ ইত্যাদি নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। আলমারিতে কাচের জারে নানা প্রকার মৃত সর্প কোনটায় বা সাপের কঙ্কাল সংরক্ষিত। একধারে একটু পর্দা দিয়া পোষাক

বদলের স্থান করা আছে। প্রফেসার অধিকারী সেই স্থানে ঢুকিয়া লেবরেটারীর বেশ পরিধান করিলেন। পরে পাইপটা ধরাইয়া লইয়া ঘরের মাঝে রাখা টেবিলের সামনে চেয়ারে উপবেশন করিলেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাঁহার কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল,

—খাবার দিয়েছি হুজুর।

—উঁ—কিঃ—?

—খাবার—খাবার দিয়েছি হুজুর!

—আঃ—কি জ্বালাতন করিস। যাঃ

—খাবার দিয়েছি হুজুর!

রাজীব এতক্ষণে চোখ ফিরাইয়া দেখিলেন এবং দেখিয়াই কহিলেন,

—শুগে যা খাবো না কিছু।

প্রফেসার অধিকারী পুনরায় কাজে মনোনিবেশ করিলেন। ভৃত্য প্রায় মিনিট খানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ক্লান্ত প্রফেসার বেশীক্ষণ কার্য করিতে পারিলেন না। কাজ ফেলিয়া উঠিলেন এবং ডাকিলেন—

—ওরে—ও—

ভৃত্য আসিয়া করজোড়ে দাঁড়াইল। প্রফেসার খাদ্য চাহিলেন। ঐ ঘরেই তাঁহাকে খাবার দেওয়া হইল—অতি সামান্য খাদ্য। দুই টুকরা রুটি, মাখন, একটু ঝোল এবং কয়েক টুকরো ফল। ভৃত্যকে যাইতে আদেশ করিয়া প্রফেসার খাইতে বসিলেন। কিন্তু আহারে তিনি মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। আলমারি হইতে দুই একটা বই টানিয়া লইয়া যন্ত্রপাতি সহযোগে একাগ্রচিত্তে পুনরায় গবেষণা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ কাজ করিবার পর প্রফেসার অধিকারী অতিশয় ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিলেন; কাজে যেন আর মন বসিতেছে না। লেবরেটরীর এক কোণে রক্ষিত ছোট্ট একটি খাঁচার মধ্যে ছোট্ট একটা পাখী আপন মনে শব্দ করিয়া উঠিল। প্রফেসার অধিকারী ধীরে ধীরে উঠিয়া খাঁচাটি সামনে আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া বলিলেন—

—তোর বড় কষ্ট হচ্ছে, না? একলা থাকা অভ্যাস নেই বুঝি? কিন্তু তোকে দিয়ে আমি যে একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চেয়েছিলাম।

পাখিটা কিচমিচ শব্দে আর একবার ডাকিয়া উঠিল।

—ও—এখানে আর থাকবি না—? সঙ্গীর কথা মনে পড়েছে। বেশ—তবে যা—তারি কাছে উড়ে যা, জোর করে আমি তোকে ধরে রাখবো না।

প্রফেসার অধিকারী খাঁচার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পাখিটা উড়াইয়া দিলেন। বনের পাখি মিলনানন্দের পাখা মেলিয়া নীলিমার বুকে মিলাইয়া গেল।

প্রফেসার অধিকারী কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত উন্মনা দেখাইতেছে; মাথাটা একবার ঝাঁকি দিয়া তিনি দৃষ্টি ফিরাইলেন।

ঘরের এক কোণায় একটি পর্দাঢাকা স্থান। প্রফেসার অধিকারী ধীরে ধীরে গিয়া পর্দাটি তুলিলেন। অপরূপ সুন্দরী একটি নারীমূর্তি দেখা গেল—মূর্তি যেন সজীব, এখনি কথা কহিয়া উঠিবে। প্রফেসার অধিকারী বলিতে লাগিলেন—

—আজো ত তেমনি চেয়ে আছ। তেমনি বিষণ্ণ দৃষ্টি, তেমনি ম্লান। কেন? জানো

না—তোমার মীনাকে আজ আমার কোলে ফিরিয়ে এনেছি। চল, দেখবে চল—ভদ্রা! আত্মসংবরণ করিয়া আবার বলিলেন, ঐ নরপিশাচ তোমার মীনাকে ভালবাসার ভণ্ডামী দেখাতো, যেমন করে তোমার বাবার মন জয় করে আমার বুক থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিয়েছিলো ;—ভদ্রা।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, পরে আবেগের সহিত বলিলেন—

"তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে
মম সুখ দুখ ভাঙ্গিয়া
অয়ি অসীম জীবন বিহারী—
মম হৃদয়রক্ত রঞ্জনে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া..."

প্রঃ অধিকারীর দুই চোখে জল টলমল করিতেছে ; কোথায় কে যে গুমরিয়া কাঁদিতেছে,—বাবা—বাবাগো—। প্রঃ অধিকারী মূর্তিটির উপর পর্দা টানিয়া দিলেন এবং পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। ঘর অন্ধকার হইয়া গেল।

কলিকাতা সহরের উত্তরদিকে একটা বসতি। কয়েকখানা খোলার ঘর। বাসিন্দারা প্রায় সব শুইয়া পড়িয়াছে। একস্থানে একটা খোলা জায়গায় একজন নর্তকী গাহিতেছে। কয়েকজন শুনিতেছে, মদ ও হল্লা চলিতেছে। শ্যামল পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। আরও কিছু দূরে ছোট্ট একটি ঘর। মা আর ছেলে বাস করে। রাত হইয়া গিয়াছে, ছেলে এখনো বাড়ি ফিরিল না—মা অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আহার্য ঢাকা দিয়া বসিয়া আছে—কেরোসিনের আলোটা জোর করিয়া দিয়া রামায়ণ লইয়া বসিল। সুর করিয়া পড়িতেছে।

—মা—ওমা।

—যাই বাবা। এত রাত করলি কেন রে!—মা দরজা খুলিয়া দিল।

—খুব একটা জরুরী কাজ ছিল মা। জান তো—তোমায় বললাম সেদিন, বন্যায় আর কলেরায় বাংলা দেশ উজাড় হতে চলেছে। পেটে খাবার নাই, পরনের কাপড় নাই, কী যে তাদের কষ্ট মা।

—তুই তার কী করতে পারিস বাবা! তোরও তো কিছুই নাই।

—আমার আছে মা, শরীরে শক্তি আছে—তোমার মতো মা আছে, আরো কত কী আছে। দেখবো যদি কিছু করতে পারি।

শ্যামল হাতমুখ ধুইয়া খাইতে বসিল।

—স্বদেশী নয়তো বাবা? সরকার কিছু বলবে না ত।

—না মা, সরকার খুশী হবে, তোমার ভয় নাই।

মা পুত্রের খাওয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্যামল যেন খানিকটা অনামনা হইয়া আছে—ভাল করিয়া খাইতেছে না।

—কিছু যে খাচ্ছিস না—কী ভাবছিস খোকা?

মৃদু হাসে শ্যামল বলিল, আজ একটা মজার ব্যাপার দেখে এলুম মা, প্রফেসার অধিকারীর বাড়িতে, তাই ভাবছি।

—কি এমন মজার ব্যাপার যে খাওয়া ভুলে যেতে হবে।

—প্রফেসার অধিকারী সাপ নিয়ে গবেষণা করেন—জান তো। যে বেদেটা ওঁকে সাপ যোগায়—সে থাকে ওরই বাড়ির পিছন দিকটায়। আজ দেখলুম ওই বেদেটা কোথা থেকে একটা মেয়ে এনে রেখেছে সেই বাড়িতে।

—হবে কেউ হয় ত তার—কত বড় মেয়ে?

—তা পনের, ষোল, সতের, আঠার, উনিশ, কুড়ি হবে।

—সে কিরে, পনের থেকে কুড়ি পর্যন্ত কোন্‌টা বয়স?

—ওর যে কোন একটা। মেয়েদের বয়স চেনা মুস্কিল মা।

—মজার কি হলো তাতে?

—শোন। বেদেটা মেয়েটাকে বলছে,—বাবা বলো—বলো আর একবার বলো—বাবা!' ওকে বাবা বলাবার জন্যে বেদের সে কি আগ্রহ মা,—কল্পনাও করতে পারবে না।

—আহা, ওর হয়ত কেউ নাই।

—"বাবা" ডাক শুনবার জন্যে মানুষ অমনি করে মা? আশ্চর্য নয়? আমি মা বলে না ডাকলে তুমি অমনি করতে?

—তা করতাম হয় ত!

শ্যামল অন্যমনে খাইতে লাগিল।

—আচ্ছা মা, একটা কথা বলবো?

—আগে খেয়ে নে—তারপর কথা।

—খাচ্ছি মা—খাচ্ছি। আচ্ছা মা, ওর না হয় কেউ নেই। তাই একটা মেয়ে ধরে এনে "বাবা" বলাতে চাচ্ছে। আমার বাবার কথা তুমি ত কোনদিনই কিছু বলতে চাও না মা। তিনি কি নেই?

—না। নেই, বেঁচে থেকেও নেই তার নাম কখনো করিসনে খোকা—ভুলে যা—ভুলে যা তার কথা—

মা অত্যন্ত অসম্বৃতা হইয়া উঠিল।

—ভুলে যাওয়া অত সোজা নয় মা। আমি বেটাছেলে—আমার একটা পিতৃ পরিচয় দরকার। কিন্তু কেন তুমি অত উত্তেজিত হচ্ছো? আমাকে বলার কী বাধা আছে মা তোমার?

—হ্যাঁ—খোকন! মাণিক আমার! সে কথা তুই শুনতে চাস কেন বাবা! তোর শয়তান, ব্যভিচারী, লম্পট, নারী-মাংসলোভী কুক্কুর বাবাকে ভুলে যা খোকন—ভুলে যা, মনে কর এই বিশ্বে মা ছাড়া তোর কেউ নাই।

—সত্যি মা—সত্যি? সত্যি তিনি ব্যভিচারী, লম্পট, শয়তান? বলো মা, তিনি যা-ই হোক, আমার তো বাবা!

—নাঁ-না-না—রাক্ষস। তোর মা'র সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পথের ভিখিরী করে তাড়িয়ে দিয়েছে—নারে না, তুই যখন পৃথিবীর আলোকে আসিসনি, গর্ভে যখন তোর স্পন্দনটুকু মাত্র অনুভব করছি, তখনই একদিন সেই শয়তান একটা মোড়ক দিয়ে বললে—এটা দিয়ে ওকে হত্যা করো—সেইদিনই বুঝেছিলাম—সে কতবড় শয়তান!

—তারপর মা তারপর?

—তারপর। বুদ্ধি হয়ত ভগবানই যুগিয়ে দিয়েছিলেন, সেইসময় বলেছিলাম, তাই করবো—কিন্তু এ দেশে নয়; কিছু মোটা রকম টাকা দাও—চলে যাই দূর দেশে। টাকা

তার আছে ; তাই হাজার কতক দিয়েছিলো। সেই রাত্রেই বুড়ী মাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাই. তারপর তুই কোলে এসেছিস।

—আমি এমন একজন ভয়ঙ্কর লোকের ছেলে মা!

—কিন্তু তুই দেবতা হয়ে ওঠ খোকা! আমার বুকের রক্ত দিয়ে, আমার অন্তরের সব স্নেহামৃত দিয়ে, আমার ঈশ্বরের সব আশীর্বাদ দিয়ে আমি তোকে দেবতা করে গড়বো—খোকন—বাবা আমার।

—আচ্ছা মা তাই হবে—কিন্তু কোথায় তিনি থাকেন? আমি একবার তাঁকে দেখতে চাই।

—না-না-না—তোর মার বিয়েই হয়নি, তুই তার অবিবাহিতা অবস্থার সন্তান ; সে তোকে স্বীকার করবে না। লক্ষ্মী বাবা আমার—চল্, ঘুমোবি চল।

—আজই দেখে এলাম একজন 'বাবা' ডাক শুনবার জন্যে কী আকুল হয়ে প্রার্থনা করছে, আর আমার বাবা—হলুমই বা আমি তোমার অবিবাহিতা অবস্থার সন্তান! তাঁর ঠিকানা?

—না, বলবো না। শুনে তোর কিছু দরকার নেই। চল্—শুবি চল।

মা জোর করিয়া শ্যামলকে টানিয়া লইয়া গেল।

শ্যামল শুইল, কিন্তু চিন্তা তাহার অগাধ হইয়া উঠিতেছে। নিজের পিতৃপরিচয় তাহার জানা নাই। এ পর্যন্ত সে প্রফেসার অধিকারীকেই পিতার মতো দেখিয়া আসিয়াছে। যদিও জানে প্রফেসার অধিকারী তাহার পিতা নহেন—পালক-পিতা মাত্র। কিন্তু তাঁহার অতুলনীয় স্নেহ শ্যামলকে পিতার অভাব জানিতে দেয় নাই।

আজ কিন্তু শ্যামল প্রফেসার অধিকারীর মধ্যে কিঞ্চিত ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছে। না—স্নেহের অভাব নয়—অন্য কিছু। প্রফেসার অধিকারী যেন কিঞ্চিৎ উন্মনা—কিঞ্চিৎ উদাস। আজ প্রফেসার অধিকারী তাহাকে না পড়াইয়াই ছাড়িয়া দিলেন—কিন্তু আর কখনো তিনি এমন করেন না। যত রাত্রিই হোক—শ্যামলকে লইয়া তিনি কিছুক্ষণ গবেষণা কার্য চালান। বহুদিনই তাহাকে খাওয়াইয়া ছাড়েন।

শ্যামলের অন্য চিন্তা—কে ওই মেয়েটি! কোথা হইতে আসিল? বেদের মেয়ে সে নয়—নিশ্চয়ই নয়! প্রফেসার অধিকারীর বাড়িতে অন্য ভাড়াটিয়াও নাই। বাড়ি ভাড়া দিবার তাঁহার কোন প্রয়োজনও নাই—তবে কে ও।

অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে—এবং যতটুকু কথা তার শ্যামল শুনিয়াছে তাহাতেই বোঝা যায়—মেয়েটি যথেষ্ট শিক্ষিত এবং সঙ্গীতজ্ঞা। গান সে ভালোই গাহিতে পারে। কে ও।

কিন্তু আজ রাত্রে আর কিছু জানা সম্ভব নহে। মা ওঘরে ঘুমাইতেছেন। শ্যামল মার নিকট তাহার পিতৃপরিচয় কোনদিন জানিতে পারে নাই—আজও পারিল না।

হয়তো প্রফেসার অধিকারী সবই জানেন। কিন্তু তিনিও কোন দিন বলেন নাই। কে জানে কবে শ্যামল তাহার পিতৃপরিচয় জানিতে পারিবে। আজ শুধু জানিল; তাহার পিতা লম্পট ব্যভিচারী মাতাল। হোক—শ্যামলের মনে অজানা পিতার প্রতি কোনরকম ক্রোধ বা দ্বেষ জাগ্রত হইল না। সে ভাবিল—হয়তো কোন বিশেষ? কারণে পিতা তাহার মাতাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। হয়তো কোন পারিবারিক কারণে বিবাহ করিতে পারেন

নাই—কিংবা হয়তো—কিন্তু ভাবিয়া কি হইবে? যে কারণেই হোক—শ্যামল তো তাঁহার পিতৃত্ব অস্বীকার করিতে পারে না। শ্যামলের না-দেখা না-জানা পিতা যেমন হউন—শ্যামল তাহাকে একবার 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে পাইলে যেন ধন্য হইয়া যায়।

আজ সে যে অপরূপ ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছে—বেদেটা ঐ মেয়েটিকে 'বাবা' বলাইবার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে—শ্যামলের পিতা কি ঐ রকম 'বাবা' ডাক শুনিবার জন্য কোন আগ্রহই রাখেন না।

হয়তো তাঁহার আরো সন্তান আছে—যাহাদের 'বাবা' ডাক তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করে। অভাগা শ্যামল জীবনে ঐ মধুর ডাকটি ডাকিতে পাইল না ইহা শুধু দুর্ভাগ্য নহে—প্রকৃতির ইহা নিষ্ঠুর বঞ্চনা।

শ্যামলের অনিদ্রাক্লান্ত চোখে জল গড়াইয়া পড়িল।

নিস্তব্ধ নিশুতি রাত্রি। মীনু শয্যার উপর উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। তাহার তন্বী দেহলতা ক্রন্দনাবেগে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। অশ্রান্ত ক্রন্দন বাধা মানিতেছে না, বেশবাস অত্যন্ত অবিন্যস্ত! কক্ষের স্বল্পলোকে দেহের অবয়ব ভাল দেখা যাইতেছে না। ধীরে ধীরে প্রফেসার অধিকারী আসিয়া দাঁড়াইলেন। মীনুর শয্যালুণ্ঠিত দেহের পানে একবার চাহিলেন—পরে কণ্ঠে অপরূপ স্নেহ মিশাইয়া বলিলেন,

—কাঁদছো কেন মা, মীনু? কি কষ্ট হচ্ছে তোমার?

প্রফেসার অধিকারী আলোটা জোর করিয়া দিলেন। মীনু ত্রস্তে বস্ত্র সংবরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল পরম বিস্ময়ে ; প্রফেসারের দিকে আধ মিনিট চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—

—আপনি কে? আপনি—আপনি কত ভালো—কত সুন্দর! কে আপনি?

—আমি—আমি তোমার—যা খুশি তুমি বলো আমায়। বাবা, কাকা, জ্যেঠা, মেসো, বা—একটু থামিয়া আবার বলিলেন—শোবে না মা! রাত হয়েছে যে! ভয় কি তোমার। এ আমার বাড়ি, আমি তোমাকে দেখবো—আমার কাছে থাকবে—মীনু মা!

—আমাকে আমার বাবার কাছে পৌঁছে দিন—আপনার পায়ে পড়ি। আপনি এতো ভালো—আমায় পৌঁছে দিন।—মীনু প্রফেসার অধিকারীর পায়ের কাছে আসিয়া বসিল।

—আচ্ছা মা, তাই হবে। আমি তোমাকে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দেব—ভয় কি—ঘুমাও।

—না—ওই সাপুড়েটা আবার যদি আসে! যদি আবার ওকে বাবা বলতে বলে! ঘুম পাচ্ছে না—ভয় করছে।

না! ও আজ আর আসবে না। আর যদিই বা কাল এসে 'বাবা' বলতে বলে তো একবার না হয় বলবে। "লেট দ্যাট পুওর শোল বি ইওর ফাদার, চাইল্ড।"

—না—না—না। আমার বাবা রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায়—কিসের জন্য আমি ওকে বাবা বলতে যাবো। কেন আপনি এ রকম বলছেন?

মীনু মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার চোখে আগুন জ্বলিতেছে। প্রফেসার অধিকারী বলিলেন,

—আচ্ছা, থাক, বলো না। তোমার সত্যিকার বাবাকেই বাবা বলো। এখন ঘুমাও—ঘুমাও মা—চলো—ঘুমোবে।

প্রফেসার অধিকারী তাহাকে টানিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন, আলো কমাইয়া দিলেন এবং কচি ছেলেকে ঘুম পাড়াইবার মতো বলিতে লাগিলেন,

"—ঘুমাও মীনু চারিদিকে থাক আঁধার বুড়ী জেগে,
কাল সকালে উঠবে সোনার সূর্যকিরণ লেগে।
সেই সকালে আমি যাব আনতে তোমার বর,
তার সঙ্গে মীনু-মানিক—করবে তুমি ঘর।"

মীনু কাঁদিতেছে না—হাসিয়া উঠিল। বলিল—

আপনার ছেলে-মেয়ে কেউ নেই?

আছে।

—কোথায়?

—এই যে! এই এতবড় বাড়িতে একটি মাত্র মেয়ে আছে, সে তুমি—ছেলে—মেয়ে—সবাই,—কিন্তু ঘুমাও মা আমার! তুমি যা চাইবে, তাই দেবো। তোমার বাবার কাছে যেতে চাও—আমি নিয়ে যাবো। ঘুমাও আজ—রাত হয়েছে।

—ঘুমোচ্ছি। ঐ সাপুড়েটা কে? কেন ওকে এই বাড়িতে ঢুকতে দেন। ওই কি আমাকে এখানে এনেছে!

—হাঁ তুমি জান না মা, আমি সাপ আর তার বিষ নিয়ে গবেষণা করি। ও আমাকে সাপ এনে দেয়। ওকে না হলে আমার চলে না! আর হতভাগারও কেউ কোথাও নাই—তাই তোমাকে মেয়ে করতে সাধ জেগেছে! আচ্ছা—আমি বারণ করে দেবো।

—আমাকে বন্দিনী করে রেখেছে ও!

—না মা। আজ ঘুমাও, কাল আমি তোমাকে নিয়ে সারা সহর বেড়িয়ে আসবো। আমার সঙ্গে সব জায়গায় যাবে তুমি।

প্রফেসার অধিকারী মীনুকে শোয়াইয়া দিলেন।

একটু একটু করিয়া মীনুর চোখের পাতা বুজিয়া গেল। তাহার মাথাটা কোলে লইয়াই প্রফেসার অধিকারী চোখ বুজিলেন। স্নেহের অপার্থিব সুষমায় তাঁর মুখখানা জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিতেছে।

এতো আনন্দ কি জীবনে তিনি কোন দিন পাইয়াছেন? না—আপন আত্মজ দুহিতাকে কোলের কাছে লইয়া ঘুম পাড়াইবার মতো সৌভাগ্য তাঁহার তো কোন দিন হয় নাই। অথচ না হইবার মতো কিছু ছিল না! সবই ঠিক ছিল—কিন্তু বিধি বিড়ম্বনা।

উদ্দাম যৌবনের জোয়ার প্রফেসার অধিকারী হয়তো স্খলিত হইয়াছিলেন মুহূর্তের জন্য; কিন্তু মনে তাঁহার কোন পাপবোধ ছিল না। ইংরাজের হাত হইতে দেশ-মাতাকে উদ্ধারের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন প্রফেসার অধিকারী—তাঁহার ছাত্রজীবনে। ভদ্রা ছিল সেই যজ্ঞের অংশী। সহকর্মিণী শুধু নয়—সহধর্মিণীর আসনেই তাহাকে বসাইবার সব কথাই পাকা ছিল—কিন্তু অকস্মাৎ রাজরোষে পতিত হইলেন রাজীব অধিকারী। ইংরাজের কারাগারে যাইতে হইল তাঁহাকে। এক বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার। রাজীব সকলই বুঝিয়াছিলেন, ভদ্রার সহিত বিবাহ হইবার মাত্র সাতদিন পূর্বে তাঁহাকে জেলে যাইতে হইল রামেশ্বরের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। রামেশ্বরই তাহাদের গুপ্ত চক্রান্তের কথা ইংরাজ দরবারে জানাইয়া দেয়—কিন্তু আরও কি করিবে জানা ছিল না রাজীবের।

কারাগারেই সংবাদ পান—রামেশ্বর ভদ্রার দরিদ্র পিতাকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়া এবং রাজীব ইংরাজের চক্ষুশূল প্রমাণিত করিয়া ভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছে। মীনু তখন মাত্র মাসখানেক ভদ্রার গর্ভে।

এই সেই মীনু! আঠার বছরের হইয়াছে—কিন্তু প্রফেসার অধিকারীর মনে হইতেছে—আঠার দিনের শিশু কন্যা। ঘুমন্ত মীনুর মুখখানা দেখিলেন তিনি—ঠিক ভদ্রার মতই হইয়াছে—হ্যাঁ—প্রায় ওর মার মতই।

কিন্তু প্রফেসার অধিকারী অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শান্ত স্নেহশীল মুখ অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া উঠিল একটা কথা মনে পড়ায়। এই কথাটাই তিনি জেলের বাহিরে আসিয়া শুনিয়াছিলেন।

ভদ্রার গর্ভে রামেশ্বরের কন্যা জন্মিয়াছে এবং পল্লীগ্রামে আঁতুড়-ঘরে বিষাক্ত সর্পের দংশনে ভদ্রার মৃত্যু হইয়াছে। সাপের বিষের ওষুধ পাওয়া যায় নাই। বৈজ্ঞানিক অধিকারী তদবধি সাপের বিষ লইয়া গবেষণা করিতেছেন।

কিন্তু সেদিন তিনি জানিয়া আসিলেন—সাপের বিষে ভদ্রার মৃত্যু হয় নাই। রামেশ্বর পত্নীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাহাকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছিল এবং পুলিসের নিকট জানাইয়াছিল—সর্পদংশনে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে।

এই সাংঘাতিক শয়তান রামেশ্বর কন্যা মীনুকেও হত্যা করিত —করিবার চেষ্টা বহুবারই করিয়াছে—কেন করে নাই বা পারে নাই তাহা অজ্ঞাত। হয়তো মীনুর অতি সুন্দর মুখশ্রী—হয়তো বা রামেশ্বরের অন্তরের অন্য কোনরকম অনুভূতি অথবা তাহাকে স্বকন্যা রূপে প্রতিপালিত করিয়া নিজেকে অপত্যবান বলিয়া পরিচিত করার চেষ্টা। কে জানে কি কারণ! তাহা যাই হোক—প্রফেসার অধিকারী দীর্ঘদিন সাপের বিষ লইয়া গবেষণা করিতেছেন। ভদ্রার মৃত্যুর জন্য সাপকেই নিমিত্ত মনে করিয়া তাহা সত্য নহে। সাপ অপেক্ষাও ক্রূর রামেশ্বর রায়ই নিমিত্ত এবং উপাদান, কারণ! ওঃ কি শয়তান।

কিন্তু রামেশ্বর চিরদিনই ভাগ্যবান। আজিও সে ভাগ্যবান আছে। আশ্চর্য বিধাতার নিয়ম! রামেশ্বর এত পাপ করিয়াও ভাগ্যবান—অপত্যবান—আর দুর্ভাগা রাজীব অধিকারী...

না—রাজীব অধিকারী আজ আর দুর্ভাগা নয়। রাজীব চাহিলেন মীনুর ঘুমন্ত মুখ পানে। আহা—কী সুন্দর! ফুলের কুঁড়ির মতো দেখাইতেছে মীনুকে। রাজীব আজ আর হতভাগ্য নয়—রাজীব আজ কন্যার পিতা—অপত্যবান রাজীবও আজ। তাঁহার বিপুল খ্যাতি—বিশাল সম্পদ সবই এই মীনুর জন্য থাকিবে—এখন একটা ভাল বর দেখিয়া উহাকে পাত্রস্থ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু—

লোক সমাজে মীনু রামেশ্বর রায়ের কন্যা। আইনে মীনু রাজীবের কেহই নহে। রামেশ্বর ইচ্ছা করিলে মামলা করিয়া মীনুকে কাড়িয়া লইতে পারে এবং মেয়ে চুরির অপরাধে রাজীবকে জেলেও ভরিতে পারে। হয়তো রামেশ্বর তাহাই করিবে।

জেলে যাইতে ভয় করেন না রাজীব অধিকারী। কিন্তু মীনুকে যদি কাড়িয়া লয় রামেশ্বর। না না—তাহা কিছুতেই রাজীব সহ্য করিতে পারিবেন না। তাহা অপেক্ষা মীনুকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবেন—বলিবেন, মীনু তাঁহারই কন্যা—কিন্তু মীনু খুব ছোট। সে কি সব কথা বুঝিবে?

প্রফেসার অধিকারী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

সকাল হইয়া গিয়াছে।

প্রফেসার অধিকারীর লেবরেটরী রুমে ভৃত্য আসিয়া দেখিল—গতরাত্রের খাদ্য সামান্য স্পর্শ করা হইয়াছে মাত্র। সেগুলি তুলিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল। একজন চাকর আসিয়া ঘরটা একটু পরিষ্কার করিয়া দিল। দুইজন তরুণী আসিয়া ঢুকিলেন।

প্রফেসার অধিকারী এখনো ওঠেননি?

—না, কাল অনেক রাতে শুয়েছিলেন। বসুন—উঠবেন এখনি। ভৃত্য চলিয়া গেল। তরুণী দুটি এদিকে ওদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। কাচের জারে মৃত সাপ ও সাপের কঙ্কাল। প্রত্যেকটির নীচে লেবেল মারা আছে—কোন্ দেশের সাপ —বিষাক্ত কিনা—সাধারণ প্রকৃতি কিরূপ—ইত্যাদি—

তরুণীদের একজন বলিল—

—যদি রাজি না হন ভাই, যা গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ।

—না হন চলে যাবো।

শ্যামল আসিয়া ঢুকিল।

—এই যে শ্যামল বাবু—ভালো আছেন? নমস্কার।

শ্যামল বলিল—আজ্ঞে হাঁ, এত সকালে?

—আজ আমাদের 'সরিৎপদ্মে' একটা জলসা আছে, আপনাকেও নিমন্ত্রণ করছি। একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র দিল শ্যামলের হাতে।

—ধন্যবাদ। কিন্তু প্রফেসার অধিকারীকে কেন?

—উনি যদি অনুগ্রহ করে প্রিসাইড করেন।

আপনাদের সাহসের প্রশংসা করছি। কিন্তু উনি কি রাজি হবেন মনে করেন?

—জানি না, আপনার কি মনে হয়?

—জানি না। সাপ নিয়েই যিনি সারাজীবন কাটালেন—বিয়ে পর্যন্ত করলেন না, তাঁর মতো লোক এ-ব্যাপারে যাবেন কি না...

নেপথ্যে প্রফেসার অধিকারীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—ওর স্নানকরা কাপড় ছাড়া ইত্যাদি হ'লে আমাকে খবর দিস। বুঝলি? বলিতে বলিতে প্রফেসার নামিয়া আসিলেন। দীর্ঘ সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ ; পঁয়তাল্লিশ বৎসরের সৌম্যশ্রীতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যা ও জ্ঞানের জ্যোতি জাগিয়া আছে। তথাপি মুখে ক্লান্তির চিহ্ন—ওষ্ঠযুগল দৃঢ়তা ও অটুট সংকল্পের পরিচয় দিতেছে। তরুণীদ্বয় নত হইয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া বলিল—

—একটা দরকারে এসেছিলাম, বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে স্যার।

—বলো মা, সঙ্কোচের কি আছে।

—না স্যার—অন্য কথা—

—কারো কাছে ইন্ট্রোডাক্‌শন লেটার—

—না স্যার—আমাদের 'সরিৎপদ্মে' আজ একটা জলসা আছে।

—জলসা। সে কি. কি জিনিস? খাওয়ার নিমন্ত্রণ?

—হ্যাঁ—নাচ, গান, আবৃত্তি সেই সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ।

—ও—আচ্ছা, তা আমায় কি করতে হবে?

—আমাদের সব প্রফেসারই একদিন করে প্রিসাইড করেছেন। আজ যদি আপনি অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করেন।

—আমার একটি আত্মীয়া এসেছে—খুব নিকট আত্মীয়া। তাকে নিয়ে যেতে পারবো?

—নিশ্চয় স্যার—নিশ্চয়। কোথায় তিনি? আমরা নিজে বলে যাব।

সে নেহাৎ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে মা, এখন তোমাদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে পারবে না। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

—বেশ স্যার, তাই করবেন।

আশাতীত সাফল্যে উভয়েই খুব আনন্দিত হইয়া উঠিল। শ্যামল দাঁড়াইয়া ছিল, প্রফেসার অধিকারী তাহার দিকে চাহিলেন। শ্যামল সকালে উঠিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। হাতমুখ ধোয়া এবং কিছু খাওয়া হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। তাহাকে অত্যন্ত ম্লান দেখাইতেছে।

—তোমার এ-রকম অবস্থা কেন শ্যামল? খুব যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। শরীর ভালো আছে? তোমার মা—?

—ভালই আছি স্যার, একটা দরকারে সকালেই এসেছি।

তরুণীদ্বয় সাহস পাইয়া বলিল—শ্যামলবাবু পড়াশুনো যত ভাল করেন বেশবাসে ততোধিক অন্যমনস্ক। ওঁকেও নিয়ে যাবেন স্যার—আমরা নিমন্ত্রণ করে গেলাম। নমস্কারান্তে তরুণীদ্বয় প্রস্থান করিল।

—বসো শ্যামল। দরকার হয়ত মুখ হাত ধোও বাবা। কিছু খাবে? বোধ হয় না খেয়েই এসেছ!

শ্যামলকে পাশের বাথরুমে যাইতে বলিল,

—হ্যাঁ—খাবো কিছু।

শ্যামল চলিয়া গেলে প্রফেসার অধিকারী বিশেষ কিছুই করিতেছেন না। একটা ফুলের টবে কয়েকটা চন্দ্রমল্লিকা ফুটিয়াছে, তাহারই একটা তুলিয়া লইলেন। উপর হইতে বেয়ারা আসিয়া জানাইল, দিদিমণির স্নান হইয়া গিয়াছে। শ্যামল বাহিরে আসিতেই তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিলেন। মীনু বারান্দার একধারে দাঁড়াইয়াছিল। প্রফেসার অধিকারী তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

এসো মা, চা খাবে, এসো! এই আমার ছাত্র শ্যামল, এসো, আলাপ করিয়ে দিই।

শ্যামল বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মেয়েটিকে দেখিতেছে। গতকল্য সে ইহাকেই তো দেখিয়াছে? হ্যাঁ—ঠিক ইহাকেই। মনে তাহার নানা প্রশ্ন উদয় হইতে লাগিল।

—আপনার সাপ এনে দেয় সেই কে উনি স্যার?

অকস্মাৎ অতর্কিত প্রশ্নে বিব্রত হইয়া প্রফেসার অধিকারীর মুখে বিচলিত ভাব দেখা গেল। মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—

—ওর কেউ নয়, আমারই আত্মীয়া—মেয়ের মতো,—বসো।

শ্যামল আর কোন কথা কহিতে সাহস পাইল না। বিশেষ কোন কথাও কহিল না। খাওয়া শেষে প্রফেসার অধিকারী শ্যামলকে লইয়া নীচে নামিলেন। মীনু উপরে রহিল।

প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়াইয়া আছেন রামেশ্বর। হাতে দোনালা বন্দুক। কোথায় যেন বাহির হইবেন। ভৃত্য কানাই আসিয়া করজোড়ে জানাইল প্রাতরাশ দেওয়া হইয়াছে! বন্দুকটা সযত্নে একপাশে রাখিয়া খাবার-ঘরে ঢুকিয়াই বিরক্তির সুরে বলিলেন—

—কি দিয়েছো ওগুলো! মোটা মোটা রুটি। রুটিও কাটতে জানো না। মাখন লাগিয়েছো তো ধ্যাবড়া হয়ে গেছে। নিয়ে যাও।

—ডিম দুটো এতো বেশী সেদ্ধ করেছ কেন? ইডিয়ট সব! হারামজাদার দল—এতকাল কি শিখলি!

খাদ্যপাত্রগুলি ঠেলিয়া দিলেন এবং চায়ের পাত্রে চুমুক দিলেন।

—চা না ছাই হয়েছে—গরম জলে চিনি গুলে দিয়েছ। যত সব! নীরবে কয়েকটা চুমুক দিয়া বলিলেন—

—ও চেয়ারটা এখানে কেন? সরিয়ে দাও—জান না, ওটাতে মীনু বসতো?—ওটা সরাও! আরও এক চুমুক দিয়া,

—নাঃ—খাওয়া গেল না। উঠিয়া আসিবার পথে ঢাকা দেওয়া সেতারটা দেখিয়া—কি এটা—কি ঢেকে রেখেছ?

দিদিমণির সেতার হুজুর।

রামেশ্বর রায় সেতারে প্রচণ্ড একটা লাথি মারিয়া বলিলেন, দূর করো—আমার চোখের সামনে কেন?

ক্রুদ্ধ বাঘের মতো রামেশ্বর বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলেন।

'লোকে বলবে—রায় বংশের মেয়ে বেরিয়ে গেল! না বেরিয়ে সে যায়নি। রাজীব তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।' কে আছিস? দয়াল সর্দারকে ডাক—এক্ষুণি।

—ডাকতে গেছে হুজুর।

—গেছে তো আসছে না কেন? লাটসাহেব হয়েছে নাকি?

রামেশ্বর দ্রুত পাদচারণা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিলেন,

—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। এতবড় স্পর্ধা! আচ্ছা দেখে নেব। দয়াল আসিয়া অভিবাদন করিল!

—এসো দয়াল, এত দেরি করে ফেললে! শুনেছ তো, তোমাদের দিদিরাণীকে, রায় বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারীণীকে চুরি করে নিয়ে গেছে। যে তাকে চুরি করেছে আমি চিনিয়ে দেবো—তুমি শেষ করে আসবে, পুরস্কার দক্ষিণের মাঠের বারো বিঘে জোল জমি। তোমার ছেলে—নাতি—ভোগ করবে! রাজি?

—হুজুরের কথা চিরদিন মেনে এসেছি, কিন্তু চুরি সে করেছে কিনা—

রামেশ্বর উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—চুপ কর বেটা, তোকে তার হিসাব রাখতে হবে না।

দয়াল চুপ করিয়া গেল। রা[illegible] হাঁকিলেন,

—কানাই!

—হুজুর।

—কিছু খেতে দে। ঐ বোতল রয়েছে—একটু কড়া পাক—ঐটে, হ্যাঁ, যা তোরা এবার, আচ্ছা থাম,—না—যা সব।

রামেশ্বর ও দয়াল ব্যতীত অন্য সকলেই চলিয়া গেল।

—মীনুর মা'র কথা মনে আছে তোমার দয়াল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর—মনে থাকবে না কি!

—তাঁরই এক আত্মীয়—হ্যাঁ, আত্মীয়ই বলা যেতে পারে, সেই করেছে এ কাজ। কেন করেছে জান—ভয়ে।

—তা হতে পারে হুজুর, আপনাকে কে না ভয় করে?

—না দয়াল—এই পৃথিবীতে সেই একমাত্র লোক—যে রামেশ্বর রায়কে কোনদিন ভয় করলো না! ভয়ে নয় লোভে—কিন্তু কিসের লোভ জান?

টাকা কড়ি কিছু চায় হয়ত।

—না—না টাকার তার অভাব নাই। যাক—যে জন্যই হোক রায় বংশের সম্মান সে ক্ষুণ্ণ করেছে, অতএব—বুঝেছো?

—যে আজ্ঞে, ওর আর বোঝাবুঝি কি! কালই তা হলে।

সম্মুখের পথ দিয়া একজন বৈষ্ণবী গাহিতে গাহিতে আসিতেছে :

(গান)

সম্মুখের কুঞ্জ-কাননে বসি মনে মনে গাঁথিব যতনে মালা।
আমি প্রভাত-পবনে ভ্রমি বনে বনে জুড়াবো হৃদয়-জ্বালা।
আমার হারানো নিধিরে পাই যদি ফিরে আসিব আবার দেশে,
আর যদি নাই পাই—শোন বলে যাই কি কাজ ফিরিয়া এসে।
আমি সেই দেশে যাব যেথা গেলে পাব আমার সে হৃদিহারা।
মাটিতে না পাই জলেতে খুঁজিব, হব আকাশের তারা।
আমি বাতাসে বাতাসে মিশিয়া থাকিব সে লবে নিঃশ্বাসে টানি,
আমি জীবনে না পাই মরণে খুঁজিব বিশ্বভুবন খানি।

রামেশ্বরে কিছুক্ষণ গান শুনিলেন। এই বিরহসঙ্গীত সহ্য হইতেছে না—বলিলেন—ওকে তাড়িয়ে দে তো—তাড়িয়ে দে।

কানাই ও দয়াল যাইবার ইঙ্গিত করিতেই বৈষ্ণবী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রামেশ্বর কানাইকে বলিলেন—

—ও বেলা কলকাতা যেতে হবে, সুটকেশ, বেডিং, সব গুছিয়ে রাখ! আর ম্যানেজারকে বল কলকাতায় একটা 'তার' করে দিতে।

—যে আজ্ঞে হুজুর।

কানাই চলিয়া গেল। রামেশ্বর বলিলেন—

—আচ্ছা দয়াল, কাল রাত্রেই তোমার দয়ালু নাম সার্থক হবে।

রামেশ্বর উচ্চহাস্য করিলেন।

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দয়াল বলিল—

—হুজুরের দয়া।

দয়াল আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

—রায় বংশের কেউ থাকবে না—না থাক্, যাক—সব যাক।

অত্যন্ত অস্থির হইয়া একটা আয়রন-সেফ খুলিলেন। টানিয়া বাহির করিলেন একটা ফটো ও এক টুকরা কাগজ। জোরে পড়িতে লাগিলেন—

—"প্রিয়, তুমি যে না-দেখা স্বর্গ-কুসুমটি আমাকে উপহার দিয়েছিলে—সে আজ সাতদিন হলো—মাটির ধরণীতে নেমেছে। তোমার অগাধ প্রেমের এই একরত্তি নিদের্শনটুকুই আমার বিশ্ব ভরে রাখবে"...রামেশ্বর উচ্চহাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—হাঃ হাঃ হাঃ! প্রেম! প্রেম বলে কোন পদার্থ আছে নাকি! ও-সব ওই কাব্যময়ী মেয়ে ভদ্রার ছিলো। যাক, সে গেছে—জাহান্নামে গেছে, যদি জানতাম সে বিয়ের পরেও রাজীবের কথাই ভাববে—কিন্তু থাক! সে গেছে। তার মেয়ে যাবে, তার কাছে যাবে রাজীব, যাবেই। বংশের কেউ থাকবে না! দূর হোক—আমি আছি, আমি—স্বয়ং রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায়।

গ্লাসে খাঁটি মদ ঢালিলেন ও মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

চিন্তা তাঁর অগাধ হইয়া উঠিল। বহুদিন যে সব কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন—তাহাও মনে পড়িতেছে—ভদ্রাকে লাভ করিবার জন্য কী ভীষণ চক্রান্ত-জাল তিনি বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু কি হইল? ভদ্রা তাহাকে কিছুই দিল না। না—দিয়াছে অশান্তি। মনে পড়িল, মৃত্যু-মুহূর্তে ভদ্রার কথা—"আমার দেহের দেউলে তিনিই রইলেন—তোমাকে ছুঁতে দিইনি। এই আমার সান্ত্বনা।" আশ্চর্য! মৃত্যু বরণ করিল, তবু সে রামেশ্বরের হইল না। প্রেম কি সত্যই আছে নাকি?

কিন্তু এসব কথা এখন কেন?

চিন্তার মোড় ঘুরাইলেন রায় রামেশ্বর। ভাবিতে লাগিলেন, আগে ভদ্রভাবে বলা যাক—মীনুকে ফিরাইয়া দিতে। অনর্থক ঝামেলা করিতে রামেশ্বর ইচ্ছুক নহেন। মীনুকে তিনি কিছুতেই রাজীবের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারেন না। না—না—না!

রায় বংশের ঐ জ্বলন্ত কলঙ্ক কোন রকমেই পৃথিবীতে থাকিবে না। নিজের হাতে তাহাকে—না—না—না—মীনুকে নিজের হাতে হত্যা করা রামেশ্বরের পক্ষে কোন রকমেই সম্ভব নহে। মীনু—মীনাক্ষী—তাঁহার কত আদরের মীনাক্ষী—যাহার জন্য রায় রামেশ্বর সর্বস্ব দিতে পারেন—তাহাকে একেবারে হত্যা করিতে হইবে!

কিন্তু উপায় কি। বংশের কলঙ্ক সে। বাঁচিয়া থাকিলে কোনদিন না কোনদিন কেহ খুঁজিয়া বাহির করিবে—তাহার জীবনরহস্য। ঐ রাজীবই হয় তো বলিয়া দিবে অথবা ইতিমধ্যেই বলিয়াছে।

কিন্তু হত্যা মীনুকে নিজের হাতে কিছুতেই করিতে পারিবে না রামেশ্বর।—সে কি! কেন? কেন পারিবেন না? কে সে তাঁর। তাঁর নিজের আত্মজ তো...

শিহরিয়া উঠিলেন রায় রামেশ্বর। কোথায় যেন একটা অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে তাঁহার জীবনে! হ্যাঁ—অঘটনই তো!

বহু; বহু দিন চলিয়া গিয়াছে—বৎসর—হয়তো পঁচিশ বৎসর—কে জানে কত দিন—রায় রামেশ্বর একটি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন—বেশ টাকা...নাঃ—রায় রামেশ্বরের হইল কি!

চীৎকার করিয়া হাঁকিলেন—

—এই, কে আছিস!

ভৃত্য কানাই তৎক্ষণাৎ আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন,—কিছু না—যা—

কানাই চলিয়া যাইতেছে। রামেশ্বর বলিলেন—

—আমার বন্দুকটা নিয়ে আয়। না না—থাক—ম্যানেজারকে ডাক! বল, ত্রিশ বছরের হিসাবের খাতা দেখতে চাই আমি।

কানাই চলিয়া গেল। রামেশ্বর মদ ঢালিলেন এবং পান করিলেন। কয়েক মিনিট পরে একটা চাকরের মাথায় কয়েকখানা মোটা খাতা চাপাইয়া ম্যানেজার বলরামবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন—

—আমি কোন কোন সালে কলকাতার কলেজে পড়তাম বলরামবাবু?

—হুজুর—বলরামবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন—বছর পঁচিশ আগের কথা!

—দেখুন তো ঐ সময় একটা মোটা টাকা আমি খরচ করেছিলাম একসঙ্গে। হাজার আট দশ হবে—কত সালে দেখুন।

বলরামবাবু মনে মনে যতটা সম্ভব সালের হিসাব করিয়া একখানা মোটা খাতা খুলিলেন। কিছুক্ষণ দেখিয়া বলিলেন—

—ইংরাজী উনিশ শো' আটত্রিশ সাল হুজুর—ঠিক পঁচিশ বছর হলো। কত টাকা দেওয়া হয়েছিল...

—থাক—আর কিছু দরকার নাই। যান আপনি।

বলরামবাবু চলিয়া গেলেন। রামেশ্বর চিন্তা করিতেছেন,

তহবিল হইতে মোটা টাকাই লওয়া হইয়াছে—কিন্তু সব টাকা তো ঐ বাবদে খরচ হয় নাই। মীনুর মায়ের বাবাকে কিছু মোটা টাকা দেওয়া হইয়াছিল। বেশী অংশই তিনি লইয়াছিলেন। মীনুর মা যে তার পূর্বেই রাজীবকে...না না—এসব কথা রামেশ্বর আর ভাবিবেন না—যত ভাবিতেছেন, ততই তিনি উত্তেজিত হইতেছেন। এখন উত্তেজনার সময় নহে। ধীর মস্তিষ্কে তাঁহাকে সকল দিক সামলাইতে হইবে। আগে রাজীবকে পৃথিবী হইতে সরানো দরকার। তারপর—মীনাক্ষীকে। কিন্তু কেন? অকারণ দুটো খুনের কি দরকার। মীনাক্ষীকে সরাইয়া দিলেই তো চলিবে। রাজীব কাঁদিতে থাকিবে—আঁটকুড়ো রাজীব বুকফাটা চীৎকারে কলকাতা শহর কাঁদাইয়া তুলিবে—সেই তো ভাল প্রতিশোধ। রাজীবের আর কেহই থাকিবে না।

কিন্তু রামেশ্বরেরই বা কে থাকিবে! কেহ না—কেহই না। তার পরও কিছুকাল পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা যাইবে—মন্দ কি? হ্যাঁ—মীনুকেই সাবাড় করিয়া দেওয়া হউক—

—দয়াল!—সজোরে হাঁক দিলেন রামেশ্বর।

—দয়াল তো চলে গেছে হুজুর—কানাই আসিয়া জবাব দিল।

—আচ্ছা থাক্—এখন আর দরকার নেই। তুই যা।

কানাই চলিয়া গেল।

রামেশ্বর ভাবিতেছেন, এত তাড়াতাড়ি কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কলিকাতায় গিয়া ভাল করিয়া ভাবিয়া চিন্তা করিয়া তারপর যা হয় করা যাইবে।

চতুর্দিক শূন্য হইয়া আসিতেছে। বাগানের দিকে একটা মালী ফুলগাছে নিড়ানী চালাইতেছিল—সেও চলিয়া গিয়াছে। রামেশ্বর একা। প্রকাণ্ড ঘরটার মধ্যে একা রামেশ্বর।

চারিদিকে কেহ কোথাও নাই...শুধু আছে রামেশ্বরের চিন্তা—রামেশ্বরের হত্যাপটু হাত এবং সেই হাতে মদের গেলাস।

কিন্তু বিস্তর খাইয়াছেন রামেশ্বর আজ। আর না। রামেশ্বর গ্লাসটা সরাইয়া দিলেন উঠিয়া একটি ছোট বাক্স বাহির করিলেন দেরাজের কোণা হইতে। বাক্সটির মধ্যে কি যেন আছে। মণিমানিক্য নয়—একটা ফোটো। ছোট একটা বাচ্চার ফোটো অনাদৃত—অবহেলিত অবস্থার ফোটো। নিতান্ত শিশুর একখানা ফোটো—হয়ত ছয় মাসের। কে জানে কে সে।

কেউ কি জানে? না। কিন্তু রামেশ্বর জানেন? আর কেহ যদি জানে তো সে রাজীব অধিকারী। হ্যাঁ রাজীবরে আর বাঁচা চলে না। রামেশ্বর-সম্বন্ধে রাজীব অনেক বেশী জানে—অতএব তাহাকে মরিতেই হইবে।

গাড়ীতে চলিতেছিলেন রামেশ্বর রায়—প্রথম শ্রেণীর কামরায়। তখনকার দিনে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ইংরাজ রাজপুরুষ ও বিশেষ ধনী ব্যতীত কেহই চড়িত না।

রায় রামেশ্বর বিশেষ শ্রেণীর ধনী। তাঁহার জমি-জমিদারীতে ও কয়লাকুঠির আয় কয়েক লক্ষ টাকা।

রামেশ্বর রায় গদীমোড়া আসনে শুইলেন। ভৃত্য কানাই চাকরের কামরায় নিজের বিছানা রাখিয়া এখানে আসিল ও মনিবের সবকিছু প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করিয়া চলিয়া গেল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। রামেশ্বর চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন। স্বপ্ন দেখিতেছেন—

জমিদারীর একটা মহলে গিয়াছেন তিনি। প্রকাণ্ড কাছারীর সামনে একটা পুকুর। জল কাক চক্ষুর মতো। সেই পুকুরের বাঁধা ঘাটে বসিয়া মাছ ধরিতেছেন তিনি। ওপাশে গ্রামের মেয়েরা জল লইতে আসে। জমিদার এদিকের ঘাটে আছেন জানিয়া তাহারা কেহই আসিতেছে না। অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে গ্রামের সকলের। কিন্তু কাহারও কিছু বলিবার সাহস নাই।

অবশেষে এক বিধবা আসিয়া করজোড়ে বলিলেন,

—সারা গাঁয়ে এই একটি মাত্র খাবার জলের পুকুর হুজুর...

—হুঁ!—তাতে কি? জল খাবে তোমরা!

—হুজুর ঘাটে থাকতে মেয়েরা জল নিতে আসতে পারে না!

—ও তাই নাকি! তা আমাকে তো কেউ জানায়নি। আচ্ছা...

রামেশ্বর ছিপ গুটাইয়া চলিয়া আসিতেছেন, হঠাৎ ঐ বিধাবাকে বলিলেন—

—তুমি কে? কার ঘরের মেয়ে! কে আছে তোমার?

—আমি হুজুর দেবানন্দ মজুমদারের স্ত্রী। থাকার মধ্যে আছে একটা সোমত্ত মেয়ে।

—চলে কি করে? আয় কি?

—অচল হয়েই আছে হুজুর—[illegible] তিন বিঘে জমির ধান—আর হাতে পৈতে কাটি।

—তোমার মেয়ে? সে কি করে?

—কী আর করবে হুজুর—রাঁধে-বাড়ে—

—লেখাপড়া শিখেছে?

—সামান্য—গাঁয়ের স্কুলে যা হয়।

—আচ্ছা—তাকে নিয়ে এসো—আমি দেখি যদি বিয়ে দিয়ে দিতে পারি।

—যে-আজ্ঞে।

বিধবা চলিয়া গেল।

রামেশ্বর কাছারীর ভিতর নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন ও অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি হইতেছে। তবে কি আজ উহারা আসিবে না নাকি! না আজ আর আসিবে না। রামেশ্বর একজন চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন—

—দেবানন্দ মজুমদারের বাড়ী কতদূর?

—ঐ তো পুকুরটার ওপাশে।

—চল—দেখে আসি। ওদের নাকি খুব অভাব।

হ্যাঁ—হুজুর, চলুন।

জমিদার রামেশ্বর পৌঁছিলেন দেবানন্দ মজুমদারের ভাঙা বাড়ীতে। দরিদ্র বিধবা কি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবে। নাই—কিছুই নাই। কিন্তু কিছুই দরকার হইল না। রামেশ্বর নিজেই একটা কাঠের জলচৌকি টানিয়া বসিলেন এবং বলিলেন,

—কৈ—দেখি কত বড় মেয়ে?

ধীরে ধীরে অষ্টাদশী তরুণী বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রামেশ্বর দেখিলেন তাহাকে—দেখিলেন মৃৎ প্রদীপের আলোক—দেখিয়া আর পলক ফেলিলেন না।

—আমি ওকে বিয়ে করবো। কি নাম তোমার? ভয় কি বলো!

মেয়েটি ভয়ে এবং আশঙ্কায় জড়সড় হইয়া গিয়াছে। রামেশ্বর তাহার দিকে তাকাইয়া আবার বলিলেন—

—ভয় কি! রায় বংশের বৌ হবে তুমি।

—অত সৌভাগ্য কি ওর হবে হুজুর!—বিধবা বলিবেন।

—হবে কি—হয়েছে। এ মেয়ে আমি হাতছাড়া করবো না। চল, তোমরা আজ থেকেই আমার কাছারীতে থাকবে। চলে এসো।

—আজ থেকেই? সেটা কি ঠিক হবে হুজুর?

—ও—আচ্ছা—বেশ। আজ অধিবাস হয়ে গেল। কাল বিয়ে। যোগাড় কর। এই নাও টাকা—

রামেশ্বর এক গোছা নোট দিলেন। তাঁহার যেন আর সবুর সহিতেছে না।

—এটা পৌষ মাস চলেছে হুজুর—বিয়ে হয় না।

—ও হ্যাঁ—আচ্ছা, আমি গন্ধর্ব্ব বিবাহ করবো। শাস্ত্রে-বিধান আছে মালা-বদল হবে। চালই বিয়ে হবে—বুঝলে।

বিধবা চুপ করিয়া রহিলেন। কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে রামেশ্বরের বিরুদ্ধে যাইবে। তিনি মেয়েটিকে আবার দেখিয়া বলিলেন—আচ্ছা—আজ আসি—

কিন্তু তারপর। ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল নাকি। না—একটা ছোট ছেলের ফোটো চোখে ভাসিতেছে।

রামেশ্বর জাগিয়া উঠিলেন।—হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়াছেন।

বড় রাস্তার উপর 'সরিৎ-পদ্মের' প্রকাণ্ড গেট দেখা যায় পত্রপুষ্প দ্বারা সুন্দররূপে সাজানো ছোট ছোট লাল নীল আলোর ফুলঝুরির মধ্যে সুন্দর হরফে লেখা—"সরিৎ-পদ্ম"। দুই একজন নারী ও পুরুষ ঢুকিতেছেন, কেহ বা বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নীলা ও শীলা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের একজনের হাতে একটি পুষ্পপাত্রে গোড়ে মালা অপরের হাতে একটি বোকে। ওদিক হইতে ইলা একগোছা বেলফুলের মালা লইয়া আসিয়া যোগ দিল। অতিথিদের প্রত্যেককে ইলা একটি করিয়া মালা দিতেছে, পরস্পর অভিবাদন করিয়া অতিথিগণ ভিতরে গিয়া আসন গ্রহণ করিতেছেন। সভাপতি এখনো আসেন নাই। শ্যামল আসিয়া প্রবেশ করিল।

—এই যে শ্যামল বাবু—প্রফেসার অধিকারী কৈ?

—মোটরে আসছেন, আমি বাড়ী থেকে এলাম।

—ভুলে যাননি তো তিনি? আপনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেই ভাল হ'তো।

—না—না—কথা দিয়েছেন—আসবেন নিশ্চয়।

একখানি গাড়ী হইতে প্রফেসার অধিকারী নামিলেন। মীনাকে তিনি সস্নেহে হাত ধরিয়া নামাইয়া দিতেছেন। মীনা সাজানো গেট ও লেখাটার দিকে চাহিয়া আছে। হঠাৎ মীনা বলিল,

—সরিৎ মানে তো 'নদী আর 'পদ্ম' মানে বাড়ী, নদীর বাড়ী কি রকম কাকা বাবু?

প্রফেসার অধিকীর বলিলেন,

—মানে খুঁজো না মা, এটা কলকাতা শহর! এখানে কোন কিছুর মানে নেই। এখানে পঁয়ত্রিশ বছরের মেয়েরা গার্ল, তাদের কাছে তুমি বেবি! 'কাম ডাউন মাই বেবি'। দেখো, হোঁচট লাগে না যেন।

সযত্নে মীনুকে নামাইলেন।

প্রফেসার অধিকারীর গলায় নীলা গোড়ে পরাইয়া দিল। শীলা মীনার হাতে দিল বোকেটি। ইলা একটি মালা মীনার গলায় পরাইয়া দিল। সকলে হলের মধ্যে প্রবেশ করিলে মীনার হাত ধরিয়া প্রফেসার অধিকারী তাহাকে নিজের ডানদিকের চেয়ারে বসাইয়া দিলেন।

প্রেসিডেন্টের বসার সারিতে কয়েকজন নামকরা ভদ্রলোক—তৎপরে নৃত্যগীতের জন্য স্থান এবং তাহার পর শ্রোতা ও দর্শকের সারি। প্রথমেই এক লাইনে জন পাঁচেক তরুণী ও অন্য লাইনে জন সাতেক তরুণ সমস্বরে গান ধরিল—

(গান)

"জনগণ মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা"—

গান শেষে একটি মেয়ে আবৃত্তি করিল—

"সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, মথুরা পুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত।"

তৎপরে অন্য একটি তরুণ গাহিল—

"বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিস নে আজি দোল।"

অতঃপর দুইটি তরুণ কমিক করিল—

প্রথম জন বলিল—

—বড্ড পয়সার অভাবে পড়েছি রে, গোল্ডফ্লেকের দাম যা চড়া! পাসিংশোই খাচ্ছি

আজকাল—কি আর করি! একটা রিলিফ ওয়ার্ক খুললে হয় না?

দ্বিতীয় জন বলিল—

—ওপথ একদম বন্ধ। বড় সব জাঁদরেলরা নেমেছেন। তবে ভলেন্টিয়ার হতে পারিস।

—দূর—ছোঃ! আচ্ছা এক কাজ করা যাক। ভদ্রভাবে দুটো পয়সা রোজগার করবো—অন্যায় তো করছি না, কি বল।

২য়—আগে মতলবটাই বল, ভদ্র, অভদ্র পরে বোঝা যাবে।

১ম—তুই আর আমি—বুঝলি, আমি আর তুই, হেঁদোকেও নিতে হবে, বেশ লিখতে পারে ছেলেটা—হ্যাঁ—একটা যাত্রার দল—

২য়—তিনজনে যাত্রার দল হয় নাকি রে ইডিয়ট্।

১ম—হ্যাঁ সেদিকেও মেরে রেখেছে। হিন্দু-সৎকার-সমিতি, অহিন্দু-সৎকার সমিতি কতো কি!

১ম—ধরা, একটা সিগারেট ধরা (সিগারেট ধরাইল) একটা মাসিক পত্র বার করতে হবে মানে বার করবার কসরৎ দেখতে হবে। সব অশ্লীল—আপাদমস্তক অশ্লীল, ন্যাংটা!

২য়—মন্দ মতলব নয়, কিন্তু চালাবি কি দিয়ে? প্রেস, পেপার?

১ম—যারা লিখলে আর যারা পড়বে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে। তোদের বাড়ীর সিঁড়ির পাশে যে জায়গাটা আছে, ওইখানেই অফিস হবে—বুঝেছিস। আমার বাড়ীতে বাবা আছে, তোর ত' আর ঈশ্বরের কৃপায় সে ভয় নেই। দে-না তোর একটা সিগারেট, অনেক দিন উইল্‌স্ খাইনি।

২য়—অফিস করতে বাধা নাই (সিগারেট দিল) কিন্তু টাকা আসবে কি না কে জানে।

১ম—আমি জানি বন্ধু, বাংলার তরুণ-তরুণী এক কলম লিখিবার মতো মাসিকপত্র পেলে আত্মহত্যা করতে পারে। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক—চাঁদা এবং ছাঁদা সংগ্রহার্থে!

একজন পরিচিত ভদ্রলোক আসিতেছেন। কর্মিককারীরা বলিল—

১ম—নীরেন দা, যে। শুনুন শুনুন! আমরা একটা মাসিক বার করছি। সব তরুণের লেখা, আর বেবাক অশ্লীল। আপনার সহানুভূতি নিশ্চয় পাব ভেবেই যাচ্ছিলুম।

—তা বেশ, সবই যখন অশ্লীল—তখন আর কথা কি? বার করো!

—চাঁদা বার্ষিক মাত্র দুটো টাকা। আপনারটা—

—সবই যে অশ্লীল হে, টাকা চাইছো কেন? টাকা তো ভয়ানক রকম শ্লীল। ও সব সময় হয় পাস, নয় পকেটে, নয় প্যাঁটরায় লুকিয়ে থাকে, ও দিয়ে কি করবে তোমরা?

দুইজনেই ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বলিল—মানে ও দিয়ে অশ্লীল বস্তু সংগ্রহ করতে হয় কিনা। তাই চাইছি।

—ও হো! তাহ'লে টাকাওয়ালাদের কাছে যাও, বলো—ভয়ঙ্কর শ্লীল একটা কিছু বার করছো তোমরা। ভাগবততত্ত্ব, গীতামৃত চণ্ডীসার—এমনি একটা কিছু।

প্রথমজন বলল,—কী চমৎকার বুদ্ধি আপনার নীরেনদা, আসুন না আমাদের দলে।

—আগে কিছু যোগাড় হোক, তারপর খবর দিও। নীরেন চলিয়া গেল।

ও দেবে চাঁদা, তুইও যেমন। তার চেয়ে গঙ্গার ঘাটে চল—রামায়ণ পড়বো। দু'একটা বুড়ি এক আধ পয়সা দিতে পারে।

—যাঃ! করিসনে—ইতর কোথাকার।

একটি তরুণী তেছে। হাতে হ্যান্ড ব্যাগ, চোখে চশমা। তাহাকে নমস্কার করিয় বলিল,—একটু দাঁড়াবেন? একটা কথা ছিলো।

—বলুন।

—আমরা একটা মাসিক বার করছি—সব তরুণের লেখা—গীতা, ভাগবত, চণ্ডীরসার সংগ্রহ এবং বেবাক ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়।

তরুণী মুচকি হাসিয়া বলিল,—তা বেশ তো, খুব ভাল কথা—দেবেন একখপি পাঠিয়ে। হ্যান্ড ব্যাগ হইতে কার্ড বাহির করিয়া দিল—ঠিকানাটা রইল—আচ্ছা, নমস্কার।

দুজনে পথ আগলাইয়া বলিল,—চাঁদাটা যদি আগাম দিতেন তো বড় উপকার হতো—মাত্র দুটো টাকা।

—তা বেশ তো, বিকেলে যাবেন। আমি জুতো কিনতে বেরিয়েছি, নতুন এক জোড়া জুতোর বড্ড দরকার হয়েছে—

—জুতো?

—হ্যাঁ, মানে ভদ্রলোকের উপযুক্ত। আচ্ছা নমস্কার! তরুণী চলিয়া যাইতেছে।

প্রথমজন বলিল,—মনে রাখবেন, আমাদের শিল্পীসঙ্ঘ সব তরুণ-তরুণী—সব অশ্লীল—বে-আবরু।

অন্যজন তাতে যোগ দিল—

—মানে—নগ্ন, উলঙ্গ, অবাধ—ঠিক আপনার হাতকাটা ব্লাউজের মতো।

—না—না, তার চেয়ে আমার জুতো অনেক বে-আব্রু—ঠিক আপনাদের মুখের মতো।

বলিয়া তরুণী চলিয়া গেল। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

—দে না একটা সিগারেট—দেখছিস না, মনটা কি খিঁচিয়ে দিয়ে গেল্!

সিগারেট ধরাইয়া চলিয়া গেল।

কমিকের অভিনয় শেষ হইতেই একটি মেয়ে সুকুমার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিল। পরে "বন্দেমাতরম্" গান হইল। সকলে দাঁড়াইলেন।

প্রফেসার অধিকারী নীরবে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার গম্ভীর মুখে দু একবার বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়াই মিলাইয়া যাইতেছে! মীনা প্রথমটা চুপ করিয়া শুষ্ক মুখেই বসিয়া ছিল. কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে নৃত্য ও গীত উপভোগ করিয়া খুশী হইয়া উঠিল। জলসার শেষে প্রফেসার অধিকারী একজন ভদ্রলোককে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন।

প্রথম ভদ্রলোক বলিলেন, মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ। এই তরুণ শিল্পীসংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত আজকের এই উৎসব আমার মনকে আনন্দের মন্দাকিনী-তীরে নিয়ে গিয়েছে! এঁদের আরো সাফল্য কামনা করার সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি—এঁরা সকলেই জয়যুক্ত হোন।

অন্য একজন বলিলেন—

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমাগত ভদ্রবৃন্দ। এই অপরূপ অনুষ্ঠান-এর উদ্যোক্তারা সকলেই ধন্যবাদার্হ। দেশের তরুণ মন যে ললিত কলা-রস কলা সম্বন্ধে এতখানি সজাগ

হয়ে উঠবে, এ আশার এবং আনন্দের কথা। আমি উত্তরোত্তর এদের উন্নতি কামনা করি।

পরবর্তী বক্তা একজন মহিলা। তিনি বলিলেন,

সভাধিষ্ঠাতা ও সভাবৃন্দ, আজ কি বিপুল আনন্দ যে পেয়েছি তা মুখে বলাবার ভাষা আমার যোগাচ্ছে না। এই কিছুদিন পূর্বে আমরা অতি সামান্য একটা নাচগানে যোগ দিতে পারতাম না। বিয়ের সময় বাসর ঘরের কুৎসিত কদর্য রসিকতা আর খিড়কী পুকুরের জঘন্য আলাপ ছাড়া আমাদের—মেয়েদের আর কোন আনন্দ উৎসবে যোগ দেবার অধিকার ছিলো না। আজ এখানে যে সব নারী তরুণী নৃত্য গীত আনন্দ নিয়ে আমাদের চিত্তলোকে রস সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা আমাদেরই জাতি—নারীজাতি—তাই নারীজাতির পক্ষ থেকে আমি এর উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করছি।

এর পর প্রফেসার অধিকারী উঠিলেন।

—উপস্থিত ভদ্রকন্যা ও ভদ্রলোকগণ! আপনাদের এই অভিনব আনন্দোৎসবের মধ্যে আমাকে যে কেন নিমন্ত্রণ করে এনেছেন—বুঝতে পারছি না। তথাপি ধন্যবাদ জানাচ্ছি—এমন একটা ব্যাপার সভ্যরুচিসম্মতভাবে চলতে পারে—এটা দেখবার সুযোগ আমারা আপনারা দিয়েছেন—এই জন্য। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি যে, এই আনন্দোৎসব আমাকে নিরানন্দের অন্ধগহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। মানুষের রসগ্রাহী চিত্ত এতে কিভাবে সংক্ষুব্ধ না হয়ে পারে, তাই ভাবছি।

প্রথম যখন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হল তখন শ্রোতার মন দেশাত্মবোধের উচ্চতন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলল ; ঠিক তার পরেই একটি আদর্শ প্রেম ও চরিত্রনিষ্ঠার নিদর্শন—এতটা ভালই চললো। তার পরই অতি ললিত গান এবং পরমুহূর্তে বিষাদের এক আবৃত্তি, তৎপরেই আবার বীররস এবং তারপরে লাস্যনৃত্য ;—অথচ প্রত্যেকটা আলাদা, কারো, সঙ্গে কারো কোন সামঞ্জস্য নেই। মানুষের সূক্ষ্ম কলারস-জ্ঞানকে এমন অদ্ভুত নাগরদোলায় দুলিয়ে হত্যা করিবার যাঁরা পক্ষপাতী, আমি তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে পারছি না।

আনন্দ উপভোগের নানা পন্থা আছে। মদ বা গাঁজা খেয়েও আনন্দ লাভ হয়, কিন্তু সে আনন্দ স্বাস্থ্যকর নয়, সুস্থ মন তো কিছুক্ষণ সহ্য করতে পারলেও, সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানসম্পন্ন মন এতে আহত হয়। তা ছাড়া, এইরকম নানা রসের সমবায়ে যে কলার সৃষ্টি এঁরা করতে চাইছেন, তাতে উচ্চতর কলানুভূতির কোন আবেদন নেই। একটি মহাকাব্যে সব রসই থাকে কিন্তু সবকে আচ্ছন্ন করে থাকে তার পারম্পর্যা। আর এ যেন টুকরো ছেঁড়া কয়েকটা মৌসুমী ফুলের পাপড়ি, মালা তো হয়ই না—গন্ধও নাই, গোটাফুল দেখারও আনন্দ মেলে না। জাতীয় সঙ্গীতে মন যখন উচ্চগ্রামে বাঁধা ঠিক তার পরেই পারম্পর্য-রহিত প্রেমসঙ্গীত এবং তারপরই ভাঁড়ামী—কলাজ্ঞানের ব্যভিচার—ইতরামির নামান্তর।

আমাকে এখানে না ডাকলেই সুখী হতাম। যাই হোক, আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি,—এঁরা বারান্তরে সূক্ষ্ম কলা, রসকলার উপযুক্ত ভাবেই আসর গড়বেন।

সভায় উদ্যোক্তা শীর্ণকায় এক ভদ্রলোক সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বলিলেন—

আমাদের ত্রুটি এমন স্পষ্ট করে কেউ কোন দিন ধরিয়ে দেয়নি। পূর্বে যাঁরা, এসেছেন—সবাই নিছক প্রশংসাই করে গেছেন। প্রফেসার অধিকারী আমাদের যে পরম উপকারি করলেন এই স্বীকৃতি জানিয়ে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করছি।

সভা ভঙ্গ হইল।

মীনাকে লইয়া প্রফেসার অধিকারী বাহির হইলেন।

রামেশ্বরের কলিকাতার বাটি, প্রকাণ্ড প্রাসাদ, বহির্বাটীও উত্তমরূপে সাজানো। একধারে ফরাস পাতা, অন্যধারে সুদৃশ্য টেবিল এবং তাহার নিকট গদিমোড়া কয়েকখানি চেয়ার। দেওয়ালে একটা সুদৃশ্য সুইজারল্যান্ডের ক্লক টাঙানো। টেবিলের উপর টেলিফোন এবং রাইটিং প্যাড—কলমদানী, একটা ভালো ক্যালেন্ডারের তারিখটা ঠিক করিয়া একজন চেয়ার ও টেবিলগুলি পরিষ্কার তোয়ালে দ্বারা ঝাড়িয়া দিল। অন্য একজন একটি ফুলদানিতে ফুল সাজাইয়া চেয়ার ও টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। অপর একজন ভৃত্য একখানা বাংলা ও একখানা ইংরাজী দৈনিক পত্র আনিয়া বাংলাটি ফরাসে ও ইংরাজীটি টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। চারজন তরুণ-তরুণী চাঁদার খাতা হাতে প্রবেশ করিল! একজন ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—কাকে চান?

—বাড়ীর মালিককে।

—কি দরকার?

—সে কথা তাঁকেই বলবো।

—তিনি সবে এসেছেন—নামতে দেরি হবে।

—আচ্ছা, আমরা অপেক্ষা করছি।

দুইজন তরুণ ফরাসে ও দুইজন তরুণী চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ তুলিয়া লইল।

রামেশ্বর রায় আসিতেছেন। ভৃত্যের দল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দুই একবার এদিক ওদিক ঘুরিয়া গেল। রামেশ্বর প্রবেশ করিলেন। পরণে মিহি শান্তিপুরী ধুতি, গায়ে চীনা-ঢঙয়ের হাতটাকা ফতুয়া এবং চাদর, ডান হাতের কনুইয়ের উপর মোটা একটা সোনার তাবিজ এবং পায়ে শুঁড় উঠানো চটিজুতা। তিনি যেন কোথায় বাহির হইবেন। তরুণ-তরুণীগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। রামেশ্বর কিছুটা বিরক্ত কিছুটা কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

—কি চাই তোমাদের?

—শুনেছেন নিশ্চয় মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া ঘূর্ণিবাত্যায় উৎসন্ন যেতে বসেছে,—মুর্শিদাবাদে মহামারী আকারে কলেরা...

—হ্যাঁ—তার কলকাতায় কি?

—আমরা আমাদের কলেজ থেকে একটা রিলিফ ওয়ার্ক খুলেছি।

—বেশ ; কিন্তু আমি তোমাদের কলেজের মাষ্টারও নই, পড়ুয়াও নই।

—আপনি দেশের একজন মানুষ, আজ আপনার দেশবাসী বিপন্ন—

—তাদের সম্পন্ন হতে বল বাপধনরা, আমি বড় ব্যস্ত আছি। কানাই!...

রামেশ্বর অন্যদিকে চেয়ারে উপবেশন করিলেন। কানাই আসিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

—সম্পন্ন হবার পূর্বে তারা বাঁচুক, তাদের বাঁচাতে হবে আমাদেরই।

রামেশ্বর মেয়েটির দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

—কত টাকা উঠেছে?

—বেশী না—শ' দুই, অবশ্য আমরা এই চার পাঁচ দিন কাজ আরম্ভ করেছি।

—কত টাকা সিনেমায় খরচ করলে?

—সে কি স্যার! সিনেমার খরচ করলুম মানে।

—মানে কত টাকার সিগারেট খেয়েছে ঐ দুশো টাকার মধ্যে?

—আপনি আমাদের হিসাব পরীক্ষা করতে পারেন।

—আমি অডিটর নই, পরীক্ষার দরকার নেই—কিছু দেবো না। তরুণ-তরুণীগণ পরস্পরের মুখে তাকাইয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। শ্যামল সব পশ্চাতে ছিল—আগাইয়া আসিয়া বলিল—

—কিছু দেবেন না মানে! প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে কত টাকার বাড়ী বানিয়েছেন, কতো টাকার আসবাব কিনেছেন, ট্রেনের কোন ক্লাসে চড়ে কলকাতা এসেছেন, কত টাকার মোটর রাখেন, দৈনিক কত টাকার বাজার হয়, কতগুলো চাকর পোষেন সুখ-সুবিধার জন্যে?

রামেশ্বর অবাক হইয়া চাহিয়াছিলেন। বলিলেন,

—কে হে তুমি চমৎকার বলতে পার ত!

—না, এখনো চমৎকার কিছু বলিনি—বলছি কত টাকার মদ কেনা হয়, কত টাকার মেয়ে-মানুষ আছে, ক'জন মোসাহেব আপনাকে চরিয়ে খায়—বলবেন?

—কি বলছো হে তুমি!

—বিশেষ কিছু বলছি না। বাইরে তো দেখে এলুম, ফটকে লেখা রয়েছে "রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায়।" হে ইংরাজ সরকারের পোষ্যপুত্র আপনি অবিলম্বে স্যার হোন; কিন্তু যে দেশের মাটিতে জন্মেছেন, যে দেশের বাতাস নিশ্বাসে টেনে বেঁচে আছেন, সেই দেশের বৃহৎ একটা অংশ আজ বিপন্ন! নিরন্ন দুর্গতদের এই দারুণ দুঃখের দিনে একবার অন্তত বলুন, আপনার সহানুভূতি আছে। টাকা যদি না-ই দিতে পারেন, ওদের কাছ থেকে অপহরণ করা টাকার সবটাই যদি আপনার খোস খেয়ালেই ব্যয় হয়—কলকাতার এই বিলাসের কেলি-নিকুঞ্জে আপনি যত ইচ্ছা সে টাকা খরচ করুন—অন্যের উপর সন্দেহ করবেন না। সবাই রায় বাহাদুর হতে চায় না, কেউ কেউ আছে—যারা শুধু মানুষই হতে চায়; তাদের যদি চিনতে নাও চান—কিছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু তারা আছে—তারা থাকবে, চললুম। নমস্কার!

নির্বাক্ বিস্ময়ে রামেশ্বর চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু উহারা চলিয়া যাইতেছে।

—খুব বড় বড় কথা বললে যে হে? কার ছেলে তুমি? বাড়ী কোথায়?

শ্যামল একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, সে খোঁজে আপনার দরকার? আপনার মতো স্বার্থান্ধ ধনীর কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিলাম—এটা আমার পিতৃপুরুষগণের পক্ষে গৌরবের কথা নয়।

শ্যামল ও তাহার দল চলিয়া যাইতেছে।

ব্যাকুলভাবে রামেশ্বর বলিলেন,

—ওহে ছোকরা—শোন শোন, টাকা নিয়ে যাও।

যাইতে যাইতে শ্যামলের দল বলিল,

—দরকার হবে না, ও-টাকায় আপনার মোসাহেবদের মদ খাওয়াবেন!

সকলে প্রস্থান করিল।

—ছেলেটা কি আশ্চর্য তুখোড়! আমার মুখের উপর কত কথাই না বলে গেল! পুঁচকে একটা কলেজের ছেলে, কিন্তু কি অদ্ভুত সাহস ওর!

হ্যাঁ, ছেলের মতো একটা ছেলে। কী অবাধে—কতটা অনায়াসে কথাগুলো বললো ও! কে জানে কার ছেলে! ওর বাবা নিশ্চয় ভাগ্যবান। এমনি যদি একটি ছেলে পাই মীনুর জন্য! আহা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কী সব ভাবছি! মীনুর ভাবনায় আমার আর কি দরকার! মীনুকে কি আর পৃথিবীতে রাখবো আমি? নিশ্চয় না। রায় বংশের কলঙ্কের ঐ জলন্ত প্রমাণকে পাওয়া মাত্র পৃথিবী থেকে সরাতে হবে।

—এই কে আছিস!

ভৃত্য কানাই আসিয়া করজোড়ে দাঁড়াইল। রামেশ্বর দেখিয়া বলিলেন,

—দয়ালকে ডাক—আমার সঙ্গে যেতে হবে, গাড়ী বার করতে বল।

—যে আজ্ঞে!

গাড়ী আসিতেই রামেশ্বর দয়ালকে লইয়া চড়িয়া বসিলেন।

পথে যাইতেছেন রায় রামেশ্বর। সামনের সীটে দয়াল সর্দার ড্রাইভারের পাশে বসিয়া আছে। গাড়ী চলিতেছে রাজীবের বাড়ীর দিকে। রায় রামেশ্বর ভাবিতেছেন কে ঐ ছেলেটি? কী আশ্চর্য তাহার ভাবভঙ্গি। আর চেহারাখানা—সত্যই সুন্দর। সমাজসেবা করিয়া বেড়াইতেছে, কে জানে কে উহাদের সর্দার। কিছু টাকা দিতে পারিলে হয়তো খুশী হইত রায় রামেশ্বর—কিন্তু উহারা তো চটিয়া চলিয়া গেল।

আশ্চর্য। রায় রামেশ্বর কোনদিন তো এসব কথা ভাবেন নাই। কোনদিন কাহাকেও কিছু দান করিয়াছেন কি তিনি? না, মনে পড়িতেছে না। দান তিনি হয়তো করিয়াছেন। কিন্তু সে সবই আজ্ঞাবাহী স্তাবকবৃন্দকে। বন্যার্ত বা মহামারীতে আক্রান্ত কাহাকেও কিছু দিয়াছেন কি? না—দান তিনি কখনো করেন নাই—গ্রহণ করিয়াছেন চিরদিন। যদি দান কিছু করিয়া থাকেন, সাধারণ ভাষায় তাহার নাম ঘুষ।

কিন্তু কেন আজ দানের কথা মনে হইতেছে রামেশ্বরের? কেন—কেন? ঐ বাচ্চা ছেলেটা কয়েকটা শক্ত কথা বলিয়া গেল—তাহারই জন্য কি! হ্যাঁ—অমন জোরালো কথা কেউ কখনো বলে নাই রায় রামেশ্বরকে।

কিন্তু এসব চিন্তার ইহা সময় নহে। গাড়ী রাজীবের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। রায় রামেশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজীবের হাত হইতে মীনুকে উদ্ধার করিতে হইবে। নালিশ করিয়া তাহা করা যাইতে পারে। কিন্তু আদালতে নানা কেলেঙ্কারীর কথা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। তাছাড়া রায় বংশের কেহ কোনদিন আদালতে যায় নাই। লাঠির জোরেই চিরদিন এ বংশের সমস্ত মামলা ফয়শালা করিয়াছে। হ্যাঁ—লাঠির জোর—রায় রামেশ্বরের হাতে অন্তত তিন হাজার লাঠিয়ালে মজুত। চিন্তা কি?

রামেশ্বর গোঁফে চাড়া দিয়া লইলেন। রাজীবের বার বাড়ীটা দেখা যাইতেছে। প্রকাণ্ড প্রাসাদ—বড় গেট—বাগানে নানা রকম ফুলের গাছ—দরজায় দারোয়ান। রামেশ্বর নিজের বেশবাস সংযত করিয়া লইলেন। গাড়ী আসিয়া গেটে থামিল।

রাজীবের প্রাসাদস্থ লেবরেটারী। রাজীব কোথায় বাহির হইয়াছে। মীনা একাকিনী আসিয়া ঘরে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাপ ও সাপের কঙ্কালগুলি দেখিতে সে যেন কতকটা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিজের মনে হঠাৎ কখন গান ধরিয়াছে।

(মীনার গান)

আমায় ডাক দিয়েছে বনের কোকিল কুহুর বাঁশীতে।
আমায় লিখলো লিপি ফাগুন-মাহা ফুলের হাসিতে।
আমার মনে যত ছিলো চাওয়া—
সব মিটালো দখিন হাওয়া
সঙ্গোপনে এলো প্রিয় প্রেমের ফাঁসিতে
আমায় বাঁধিয়া নিতে।
অশোক পলাশ ফুলের ডোরে বাঁধিয়া নিতে।

শ্যামল নিঃশব্দে আসিয়া দরজার এক কোণে দাঁড়াইল। মীনা গাহিতেছে। শ্যামল বলিল।

—চমৎকার! বেশ তো গাইতে পারেন।

লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া মীনু বলিল,

—যান্—আপনি কখন এসেছেন?

—এই একটুক্ষণ। কিন্তু প্রশংসা করা উচিত হলো না। গানটা থামালেন কেন? গেয়ে চলুন—ভারী সুন্দর লাগছে!

—থাক ঠাট্টা করতে হবে না।

মীনা পাশ দিয়া বাহির হইয়া যাইতে চায়।

—যাবেন না, গান না গাইতে চান, থাক—কথা আছে।

—বলুন। আমার সঙ্গে কি কথা আপনার?

—কিছু মনে করবেন না। প্রফেসার অধিকারীর তো আপনি আত্মীয়া, কিন্তু ঐ বেদেটা কে আপনার?

—জানি না, ও কেউ নয় আমার। কেন বলুন ত'?

—এমনি জিজ্ঞাসা করছি। আজ রাত্রে আমরা বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য মেদিনীপুর চলে যাব। প্রফেসার অধিকারীও যাবেন, আপনিও যাবেন আশা করি।

—জানি না, আমায় কিছু বলেননি।

—হয়তো পরে বললেন। প্রফেসার অধিকারী এলে বলবেন—আমি এসেছিলাম। আবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসবো। যাবার আয়োজনে ব্যস্ত আছি।

শ্যামল ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। মীনু তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

—ছেলেটা কি সুন্দর দেখতে!

প্রবেশ করিল বেদে। হাতে একটা সাপ।

—কেমন আছিস মা? কোন কষ্ট হয়নি তো?

বেদেকে দেখিয়া মীনুর বুকের রক্ত শুকাইয়া যাইতেছে। ভয়ে জড়সড় হইয়া সে বলিল—না—ভালো আছি।

—ভয় কী মা—ভয় কী। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করতে আসিনি। আমাকে যদি বাবা বলতে না পার—বলো না। প্রফেসার অধিকারীর তো আর কেউ নাই, তাকেই বাবা বলো!

—কেন—কিসের জন্য বলবো! আমার বাবা রায় রামেশ্বর রায় বাহাদুর। খবরদার সাবধানে কথা বলবে।

—ভুল মা—ভুল শুনেছিস তুই। রামেশ্বর রায় তোর শত্রু। তোর মাকে তোর বাবার বুক থেকে ছিঁড়ে কিন্তু থাক মা, তুই বড্ড ছোট। এখন এসব বুঝবি নে!

বেদের কথা শুনিয়া মীনু বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল আধ মিনিট। তারপর ব্যাকুলভাবে বলিল,

—তুমি কি করে এসব জানলে? কোথায় আমার মা? তুমি দেখাতে পারো?

—পারি! তবে কথা বলাতে পারি না। রামেশ্বর তাকে খুন করেছে, তোকেও খুন করতো—পারেনি।

—মিথ্যে কথা, রামেশ্বর আমার বাবা—আমার বাবা আমায় কতো ভালোবাসেন তুমি মিথ্যেবাদী—চোর শয়তান!

—থামো মা, থামো। রামেশ্বরের কাছেই যদি ফিরে যেতে চাও—আমি তোমায় তাঁরই কাছে পৌঁছে দেবো, কিন্তু মীনু তোমার হতভাগ্য পিতা, তোমার সত্যিকার বাবাকে একবার দেখতে চাও না মা? সে যে বড় দুর্ভাগা।

—তোমার কথা সত্যি কি না কি করে জানব! এই সতেরো বছর আমি রায় রামেশ্বরের পিতৃস্নেহে বড় হয়েছি, এক দিনের জন্যও এতটুকু দুঃখ পাইনি—আজ তুমি বলছো তিনি আমার কেউ নন—বরং পরম শত্রু। মিথ্যে কথা।

বেদে অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল,

—শোন মা—ঐ ভণ্ড কাপুরুষ তোর মাকে এক ফোঁটা ভালবাসতে পারেনি। তুই ছোট হলেও বুঝতে পারবি, তোর মা এক হতভাগাকে ভালবাসতো। টাকা কড়ির তার অভাব ছিল না, কিন্তু সে ছিল স্বাধীনতার উপাসক। তাই বারবার বিদেশী রাজদ্বারে হতে হয়েছিল তাকে লাঞ্ছিত। আর সেই সুযোগ নিয়ে রামেশ্বর তার কাঞ্চনকৌলিন্যে তোর মায়ের বাবাকে—তোর দাদুকে বশীভূত ক'রে বিয়ে করেছিলো, তখন তুই গর্ভে মা—তোর চিরদুঃখিনী মা নিরুপায়ের মতো আত্মবলি দিতে পারেনি, নির্মম অত্যাচার সহ্য করেও নিজেকে তার বাঞ্ছিত বন্দী প্রিয়তমের জন্য পবিত্র রেখেছিলো। কিন্তু তোর জন্মাবার পর রামেশ্বর আর সহ্য করতে পারেনি—তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলো তুই তখন সাত দিনের মাত্র। তোকেও সে সেই সময় সরাবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু পেরে ওঠেনি, রামেশ্বরের বাবা বাধা হয়েছিলেন। তারপর কতবার যে রামেশ্বর তোকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। শেষদিন—যেদিন তোকে চুরি করে এনেছি, সেইদিন তোর বাবা রামেশ্বরের কাছে তোকে চাইতে গিয়েছিলো। তাই সেই রাত্রেই তোকে—অকস্মাৎ বেদে থামিয়া গেল।

—বলো—বলো—এ যদি সত্যি হয়—কোথায় আমার সেই বাবা?—কোথায় তিনি? তুমি কি সেই...?

উত্তেজনায় মীনু কাঁপিতেছে। বেদে শান্ত কণ্ঠে বলিল,

—থাম না, তুই বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিস্!

মীনা পড়িয়া যাইতেছিল—বেদে ধরিয়া ফেলিল।

—না-না-না আপনি বলুন—বলুন আপনি—আপনি কি—

—না মা না! তোর মাকে দেখতে চাস্?

—হ্যাঁ দেখবো আমি—দেখবো—দেখান আপনি!

অকস্মাৎ বাহির হইতে মোটরের শব্দ হইল। বেদে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাহিরে চাহিয়া দেখিল রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায় ও দয়াল সর্দার নামিতেছে। ত্বরিতে মীনুকে টানিয়া লইয়া সে পাশের অন্য দরজা দিয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণেই লেবরেটরীতে রামেশ্বর ও দয়াল প্রবেশ করিলেন। ভৃত্য আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

—প্রফেসার অধিকারী কোথায়?

—তিনি বাইরে গেছেন হুজুর।

—কখন ফিরবেন?

—আধঘণ্টার মধ্যে। ভৃত্য পাখাটা চালাইয়া দিল।

লেবরেটারী-ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে রামেশ্বর আপন মনে বলিল,—আচ্ছা—আসুক।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

—দয়াল! খুব ভালো করে দেখে রাখো। ঘর, দরজা, ভেতর বার—সব।

—যে আজ্ঞে হুজুর!

উভয়ে কিছুক্ষণ লেবরেটারীতে ঘুরিতে লাগিলেন।

ঢাকা মূর্তিটার কাছে আসিয়া পর্দা সরাইয়া রামেশ্বর যেন ভূত দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

—এ কি?

পরম বিস্ময়ে দয়াল বলিলে,

—রাণীমার মুরত হুজুর!

—হ্যাঁ!—পর্দাটা টানিয়া দিলেন।

—ইনি বুঝি রাণীমার কেউ হোন—হুজুর?

—হ্যাঁ—তাঁর আত্মীয়! নইলে মীনুকে চুরি করবে কেন!

রামেশ্বর এদিক-ওদিক ঘুরিতেছেন। যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করিতেছেন। হঠাৎ রাজীব প্রবেশ করিলেন—স্বদেশী পোষাক পরিহিত জ্যোতির্ময় এক দেশপ্রেমিক।

—ভারত মাতরম বন্দে!

রামেশ্বর পিছন ফিরিয়া দেখিয়া বললেন—বেশ বেশ। স্বদেশী চালাচ্ছো তা হলে এখনো।

নিশ্চয়। স্বদেশী করতে গিয়েই তো ভদ্রাকে হারিয়েছি—তাতে ছাড়িনি। কিন্তু অকস্মাৎ রায় বাহাদুরের দীন-ভবনে শুভাগমন কেন?

—মীনুকে রেখেছো কোথায়? চুরি যে তুমি করেছ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাস্তি। তাকে বার করে দাও, নইলে—

—নালিশ করবে?

—রায় বংশের কেউ কখনো আইন আদালত করে না, জানো ত?

—নিজের মেয়েকে আনবার জন্য আইন-আদালত দরকার হয় না।

—একটা মরা সাপ লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিলেন। বললেন,

—ওরে, রায়বাহাদুর আর তাঁর দেহরক্ষীর জন্যে কিছু চা, জলখাবার আন। কেমন হে—খাবে ত? রামেশ্বর।

—তোমার বাড়ী খেতে আসিনি রাজীব। যদি ভালোয় ভালোয় মীনুকে না দাও—অন্য

পন্থা দেখতে হবে। ভেবে বলো।

নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত প্রফেসার অধিকারী বলিলেন,

—দেবো না, যে-কোন পন্থা দেখাতে পার।

—না দেবার কারণ? কি অধিকার আছে তোমার তাকে আটক রাখবার?

রাজীব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

—অধিকার তোমারই আছে নাকি হে!

—আচ্ছা—তা হলে দেখা যাক।

দয়াল সর্দার ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল—রামেশ্বর ডাকিলেন,—এসো দয়াল।

রামেশ্বর চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া রাজীব মৃদু হাসিয়া বলিলেন,

—শোন রামেশ্বর। তুমি বোধ হয় জানো না যে দীর্ঘ সতের বছর আমি সর্বদা মীনুর খোঁজ নিয়েছি। জানতাম তুমি তাকে নিজের মেয়ের মতই দেখ—সুখে আছে—থাক। কিন্তু সেদিন জানলাম—তুমি তার পিতৃস্নেহবুভুক্ষু হৃদয়কে প্রতারিত করেছো। তুমি তাকে পৃথিবী থেকে—কিন্তু বহুদিন তার লালন-পালন করেছো—ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি তার জন্য। এবার আমাব ধন আমি ফিরে চাই—তাই নিয়ে এসেছি। ভদ্রার দান—আমার প্রথম যৌবনের স্বপ্ন কুসুমকলিটি তোমার মতো শয়তানের হাতে আর ফেরাবো না।

—ভালোয় ভালোয় দেবে বলেই এসেছিলাম, আচ্ছা থাক—তা হলে।

—কিছু একটু খেয়ে যাও হে রামেশ্বর...বিষ দেবো না, ভয় নেই, বসো। পদ্মার খবর বাখ কিছু?

—কে পদ্মা? কোথাকার পদ্মা?

রাজীব উচ্চহাস্য করিলেন—তা বটে। কোথাকার পদ্মা। নদী হে—কীর্তিনাশা পদ্মা। রায়বংশের সব কীর্তি নাশ করে তবে ছাড়বে। মনে নেই?

—অনর্থক ভয় দেখিও না রাজীব, পদ্মা মেঘনাকে ভয় করে না রামেশ্বর। কে সে—কোথায় থাকে? কি সম্পর্ক তার সঙ্গে আমার?

—থাক্ থাক্। যখন ভুলেই গেছ—তখন আর কেন, বসো, চা খাও একপাত্র। ওবে—চা-খাবার নিয়ে আয়।

—থাক রাজীব—এই নীরস আতিথ্যের প্রয়োজন নাই। দয়াল!

দয়াল দরজার ওপাশ হইতে বলিল,

—হুজুর!

উভয়ে যাইবার জন্য বাহির হইতেছেন। শ্যামল ঢুকিল।

একমিনিট তাহার দিকে তাকাইয়া রামেশ্বর বলিলেন,

—এসো দয়াল!

ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে শ্যামল বলিল,

—অধমাধমের আসায় কিছু ক্ষতি হলো নাকি রায়বাহাদুর?

রায় রামেশ্বর তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন। প্রায় আধমিনিট চাহিয়াই রহিলেন তিনি। শ্যামল আবার ব্যঙ্গাশ্বরে বলিল,

—ভয় দেখাচ্ছেন নাকি স্যার! কিন্তু ও চাহনি বুর্জোয়ার চাহনি। ওতে আমাদের আর

কিছু ক্ষতি হয় না।

—সাবধানে কথা বলবে ছোকরা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—সাবধানেই আছি। আপনিও এবার থেকে একটু সতর্ক হবেন—কারণ দেশ শীঘ্রি স্বাধীন হচ্ছে—জমিদারী যাবার মুখে ; স্যার বা রায় বাহাদুরদের আর খাতির নেই—ওটা ত্যাগ করে বরং খবরের কাগজে নাম ছাপাবেন। বলেন তো আমিই আপনার সে উপকারটা করে দিতে পারি।

—ডেঁপো কাঁহাকা! এসো দয়াল।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া রায় রামেশ্বর চলিয়া যাইতেছেন। রাজীব বলিলেন,

—ব্যাপার কি শ্যামল? ওঁর সঙ্গে কিসের ঝগড়া তোমার? ওঁর অসম্মান করো না। উনি আমার বন্ধু!

—বলবেন না স্যার। উনি আপনার বন্ধু হবার একান্ত অযোগ্য। উনি শুধু শোষক জমিদার নন—উনি শয়তান!

রায় রামেশ্বর গেটের বাহিরে গিয়া গাড়ীতে উঠিতেছেন। শ্যামল দেখিল রামেশ্বর চলিয়া গেলেন। রাজীব শ্যামলকে প্রশ্ন করিলেন,

—ওকে তুমি চিন্‌লে কি ক'রে?

—ওঁর বাড়ী চাঁদার জন্য গিয়েছিলাম স্যার। বলেন চাঁদা তুলে কত টাকার সিনেমা দেখলে, কত টাকার সিগারেট খেয়েছ। ও কি জন্যে এসেছে স্যার? এই দেবভূমি অপবিত্র করে যে!

রাজীব মৃদুহাস্যে বলিলেন—আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলাম। ও আমার বন্ধু!

—এ পরিচয় দেবেন না স্যার! ও আপনার বন্ধু হবার যোগ্য নয়।

—বন্ধু নয় শ্যামল—শত্রুতা করতেই এসেছিলো। কিন্তু থাক্ সে কথা। মেদিনীপুর যাবার আয়োজন সব হয়েছে ত?

—হ্যাঁ স্যার—সব ঠিক। আজই আমরা রওনা হতে পারি!

—আর দেরী করা উচিত হচ্ছে না, চলো—আজই যাওয়া যাক।

—আপনার সেই আত্মীয়াটিকে কোথায় রেখে যাবেন স্যার?

—ওকে সঙ্গেই নিয়ে যাব, সেও এ সব কাজে যোগ দেবে।

শ্যামল উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিল—খুব ভাল হবে স্যার। আচ্ছা, আমি তৈরি হয়ে নিইগে।

রাজীব চুপচাপ বসিয়া আছেন। গভীর চিন্তা করিতেছেন তিনি। শ্যামলের সহিত রায় রামেশ্বরের কথা ও তার প্রতি শ্যামলের মনোভাব জানিলেন প্রফেসার অধিকারী। তিনি আজও রামেশ্বরকে শত্রু বলিয়া পরিচিত করিলেন, কিন্তু কেন করিলেন। রামেশ্বর শত্রুতা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে শ্যামলের কি। শ্যামলকে কথাটা বলা ভাল হয় নাই।

কিন্তু শ্যামল তাঁহার ভক্ত শিষ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন—হয়তো সে কোনদিন বাংলার গৌরব, এমন কি ভারতের গৌরব বর্ধন করিতে পারিবে। আগামী দিনের স্বাধীন ভারতে শ্যামলের মতো উদার বুদ্ধিমান ও বিদ্বান যুবকের অত্যন্ত প্রয়োজন। শ্যামলকে তিনি নিজ হাতে গড়িয়াছেন—হ্যাঁ গড়িয়াছেন। বহু ব্যক্তির ধারণা—শ্যামল তাঁহারই পুত্র। অন্তত পালিতপুত্র—ইহা সকলেই জানে।

শ্যামল তাহার মাকে লইয়া অন্য বাড়ীতে থাকে। কিন্তু সে বাড়ীর এবং শ্যামল ও তাহার

মা'র দেখাশুনার সব ভারই প্রফেসার অধিকারীর হাতে। কিন্তু প্রফেসার অধিকারী জানে শ্যামল তাঁহার কেহ নহে—হয়তো কোনদিনই কেহ হইবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন তিনি একটা?

সেই খোলার বস্তিতে শ্যামলের ঘরে টবের উপর একটি তুলসী গাছ। শ্যামলের মা তুলসীমঞ্চতলে প্রণাম করিতেছেন। শ্যামল বাড়ী ঢুকল।

—ভালো ক'রে আশীর্বাদ চেয়ে নাও মা, তোমার খোকা যেন জেলে যায়।

মা চমকিয়া বলিলেন—শয়তান ছেলে! কি অলক্ষুণে কথা—মাগো! খোকা।

হাসিতে হাসিতে শ্যামল বলিল—বন্যায় যারা ডুবেছে, যারা সর্বস্বান্ত হয়েছে, যারা পেটে খাবার আর পরণে কাপড় জোটাতে পারছে না—তাদের জন্য যাচ্ছি মা! তোমার খোকাকে যে দেবতা করতে চাও—ভয় কি তোমার?

—ভয় করে বাবা—মাণিক! আমার যে আর কেউ নেই খোকন!

—আমিই তো আছি মা। প্রফেসার অধিকারী সঙ্গে যাচ্ছেন—তাঁর মেয়েও।

—প্রফেসার অধিকারীর মেয়ে! মেয়ে কোথায় তাঁর?

—ওহো—সেই মেয়েটি—সেই বেদেটা যাকে এনেছে। প্রফেসার অধিকারীর আত্মীয়া—মেয়ে ঠিক নয়—ভুল হয়েছে মা! তবে মেয়ে বললে বিশেষ দোষ হয় না। যাই হোক আজ আমাদের যেতে হবে মা।

—যেতে হয়—আসবি গিয়ে বাবা! তবু মনকে বোঝাতে পারি না।

—বোঝাও মা! মাত্র আট-দশটা দিন মনকে বোঝাও একটু। চলো, খেতে দেবে। মা শ্যামলকে খাইতে দিল। খাইতে খাইতে শ্যামল বলিল, আর একটা কথা আছে মা!

—বল মাণিক।

—"শ্যামল।" বাহির হইতে ডাকিয়া প্রফেসার অধিকারী প্রবেশ করিলেন।

শশব্যস্তে শ্যামল বলিল—আসুন স্যার—আসুন।

—খেয়ে নাও—আমি বসছি। মীনু মা।

পিছনে মীনা প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া শ্যামলের মা বলিল,

—বাঃ, কি সুন্দর মেয়েটি। কে আপনার?

প্রফেসার অধিকারী সহাস্যে বলিলেন?

—আমার গত জন্মের মেয়ে।

শ্যামলের মা মীনাকে কোলের দিকে টানিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। প্রফেসার অধিকারী একটা মোড়া টানিয়া বসিলেন। শ্যামল বারান্দায় খাইতে বসিয়াছে।

প্রফেসার অধিকারী বলিলেন—আজ রওনা না হলে বিশেষ অসুবিধা ঘটতে পারে যাওয়ার পক্ষে তাই ভেবে আজই যেতে হচ্ছে শ্যামল। আশা করি তোমার অসুবিধা হবে না।

—কিছু না স্যার। আমি সব সময়েই তৈরি।

এই তো বীরের লক্ষণ শ্যামল। সব সময়েই সব-কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকো। জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটে, যার জন্য মানুষ মোটে প্রস্তুত থাকে না। বীর যে তার প্রস্তুতি চিরদিন।

—আপনার শিক্ষা যেন সার্থক করতে পারি স্যার।

—মীনা ও শ্যামলের মা ফিরিয়া আসিল।

ওকে কিছু খাওয়াতে পারছি না যে?

—ও খেয়ে এসেছে, তা ছাড়া আরো খাবার সঙ্গে আছে। থাক, ফিরে এসে খাবে আপনার কাছে।

—প্রথম দিন এলো—আজ কিছু খাবে না?

প্রফেসার অধিকারী মীনাকে বলিলেন,

—যা মা—উনি মায়ের মতো, খা কিছু।

—আচ্ছা, দিন। এই শ্যামলবাবুর পাতের সন্দেশটা খেয়েই জল খাই একটু। মীনা শ্যামলের ভুক্তাবশিষ্ট সন্দেশ লইয়া মুখে দিল।

—আমার এঁটো খেলেন?

—হ্যাঁ—কেন? কি হয়েছে তাতে?

—আমার জাতকুল কিছু ঠিক নেই ; জানেন না তো।

প্রফেসার অধিকারী বলিলেন,

—আছে শ্যামল, সব ঠিক আছে। তুমি মানুষ জাত, তোমার কুল সভ্যভদ্র শিক্ষিত কুল, এঁটো খেলে ওর জাত যাবে না।

মা সস্নেহে মীনার দিকে চাহিয়া বলিল,

—ফিরে আসুন আপনারা, ওকে আমি দু'দিন কাছে রাখবো।

—বেশ, সেই দু'দিন শ্যামল আমার কাছে থাকবে।

শ্যামল ও মীনা বাক্স বিছানা বাহিরে গাড়ীতে উঠাইল।

—আসি মা, উনি সঙ্গে রইলেন—ভয় কি তোমার।

না বাবা—ভয় করছি না, তবু বলি সাবধানে থাকিস।

শ্যামল, মীনা ও প্রফেসার অধিকারী চলিয়া গেলেন।

—এতটুকু ছেলে—কত বড় হয়েছে। কত ওর সাহস। দুর্জয় ওর সঙ্কল্প। সেই বাপেরই তো ছেলে! গোঁ যা ধরবে, ছাড়বে না।

মা আপন মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল—এই মেয়েটি কে? প্রফেসার অধিকারী সম্পর্কটা চেপে গেলেন। হবে হয়তো কেউ মা-বাপ মরা। অনাথের বন্ধু প্রফেসার অধিকারী, নইলে আমিই তো ভেসে যেতাম কোথায়!

তুলসীতলায় আর একবার প্রণাম করিয়া বাহিরে দেখিতে লাগিল। অন্ধকার নামিতেছে। বস্তির স্বল্পালোকিত পথে দেখা গেল রামেশ্বর ও দয়ালকে।

—দেখেছিস? চিনতে পারবি তো?

—হ্যাঁ হুজুর, কিন্তু ওঁরা যে ঢাকা মোটরে যাচ্ছেন।

—তাতে তোর কি উল্লুক। চল্, এই, ট্যাক্সি—ট্যাক্সি।

ট্যাক্সিটা থামিল না। রামেশ্বর ও দয়াল দ্রুত হাঁটিতে লাগিলেন।

হাঁটিতে হাঁটিতে দয়াল বলিল,

—কলকাতায় বেশি সুবিধে ছিলো হুজুর!

—ছিলো, কিন্তু তা যখন হলোই না তখন অন্য পন্থা দেখতে হবে। চল্ এখুনি ট্রেন ধরতে হবে।

—চলুন হুজুর!

একখানা ট্যাক্সি চাই-ই, কিন্তু পাওয়া যাইতেছে না। দরকারের সময়ই ওদের পাওয়া যায় না। কিন্তু রামেশ্বর ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি হাঁটিয়াই চলিতেছেন। সঙ্গে স্যুটকেশ ও বিছানার বান্ডিল মাথায় দয়াল। অবশেষে ট্যাক্সি একখানা মিলিল। গলদঘর্ম কলেবরে ষ্টেশনে আসিয়া রায় রামেশ্বর দুইখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিলেন। রাজীব থার্ড ক্লাসে যাইবে। কারণ তাহাদের জন্য একখানা থার্ড ক্লাশ কামরা রিজার্ভ আছে। দয়াল যদি থার্ড ক্লাসের দিকে যায় তো রাজীব বা মীনু তাহাকে চিনিয়া ফেলিতে পারে। তাই দয়ালকেও তিনি প্রথম শ্রেণীতেই রাখিলেন। দয়াল এমন গদীমোড়া গাড়ীতে কখনো বসে নাই। রামেশ্বর গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন,

—ওকে পৃথিবী থেকে সরাতেই হবে দয়াল—ভগবানও ওকে বাঁচাতে পারবে না।

—নিশ্চয় হুজুর—নিশ্চয়! কোথায় আর যাবে। মেদিনীপুরও আমার দেখা আছে হুজুর—কাঁথির ওদিকটায় ছিলাম কিছুদিন।

—তাই নাকি! তবে তো মহাসুবিধে। কাঁথিই যাচ্ছে ওরা, কিন্তু কি ভাবে কাজ হাসিল করবে?

—সে ভাবনা এখন নয় হুজুর। ওখানে যেমন সুবিধে পাব, তেমনি করা যাবে। কি বলেন?

—ঠিক ঠিক—তোমার হাতিয়ার সব কোথায়?

—ছোরা? ও ঠিক আছে হুজুর—ও ছাড়া আমি চলি না।

—বাঃ! এই তো চাই।

—কিন্তু দিদিমণিকে একেবারে খুন কি করে করবো হুজুর!

—কেন? মায়া জাগছে নাকি তোমার?

—তা হুজুর—মায়া-দয়া আমাদের নাই হুজুর, তবে দিদিমণি মা-মরা—মুখখানি দেখলেই রাণীমাকে মনে পড়ে যায়।

রামেশ্বর দুই মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,

—ও সব ছাড় দয়াল—বংশের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তার বেশী আমার কাছে কেউ নয়, কিছু নয়। ও-কথা থাক্—

দয়াল আর কথা কহিল না। রামেশ্বর মোটা একটা চুরুট ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন। গাড়ী গভীর অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হইতেছে।

চাহিয়া দেখিলেন গাড়ীর গদীমোড়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া দয়াল ঘুমাইয়া গিয়াছে। নিদ্রাহীন চোখে রামেশ্বর চাহিয়া রহিলেন বাহিরের অন্ধকার পানে। অন্ধকার পৃথিবীর সর্বত্র—রামেশ্বরের বুকের ভিতরটাতে কিন্তু আগুন জ্বলিতেছে। জিঘাংসার তীব্র বিষাক্ত আগুন...

কিন্তু কেন এই জিঘাংসাবৃত্তি! রামেশ্বরের মনস্তত্ত্ব পড়া মন যেন ব্যাপারটার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে চাহিতেছে। মীনু তাহার কেহ নহে—কিন্তু সারা জীবন প্রতিপালনের কি কোন মূল্য নাই? রক্তের সম্পর্কই কি সব? না—তা যদি হইত তবে...কিন্তু রামেশ্বর চিন্তাটা অন্যদিকে সরাইয়া লইলেন। রাজীব মীনুকে কাড়িয়া লইয়াছেন পিতৃত্বের অধিকারে। রাজীব তাহার পিতা। আর রামেশ্বর কেহ নহেন। চমৎকার! ভাল—দেখা যাক কে জিতে!

জিজ্ঞাসার অগ্নি তিনি জ্বালিয়াই রাখিলেন।

আর্তনাদ আর হাহাকার চলিতেছে সারা দেশটা জুড়িয়া। বন্যা ও মহামারী-রূপে কলেরা দেখা দিয়াছে এমন ভীষণভাবে যে মানুষ পালাইবার পথ পাইতেছে না। সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষেরও আগাইয়া আসা দরকার। সেবা-প্রতিষ্ঠান দেশে বড় কম নাই। স্বেচ্ছাসেবক বিস্তর মেলে, কিন্তু আর্ততা ক্রমেই বাড়িতেছে।

প্রফেসার রাজীব অধিকারী দলবল লইয়া পৌঁছিয়াছেন গত সন্ধ্যায়। সর্বাগ্রে তিনি জনগণের নিকট হইতে জানিলেন কোথায় কিরকম সংক্রামক ব্যাধি চলিতেছে এবং ত্রাণকার্য কেমনভাবে করা হইতেছে। স্থানীয় লোকজন তাহাকে এ বিষয়ে যথাযোগ্য খবর দিল। প্রফেসার রাজীব অধিকারী অতঃপর প্রোগ্রাম ঠিক করিয়া লইলেন—কোন দিক দিয়া কেমনভাবে কাজ আরম্ভ করিবেন। শ্যামল ও মীনু সর্বক্ষণ তাহার কাছে আছে এবং আরো আছে প্রায় জন পঞ্চাশ ছাত্র ও ছাত্রী তাঁহার—যাহারা রাজীবের কথায় মৃত্যুর মুখেও যাইতে পারে।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা করার পর সব ঠিক হইয়া গেল। আগামী সকাল হইতেই কাজ আরম্ভ করা হইবে একটি ছোট গ্রাম হইতে। নদীর কিনারায় এই গ্রামটির সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ধান-ধান তো গিয়াছেই—গোরু-বাছুর এবং ঘর-বাড়ীও গিয়াছে। ইহার পর চলিতেছে সংক্রামক ব্যাধি যাহার প্রকোপ থামিতেছে না।

ঝোপঝাড়, জঙ্গল ও নদী লইয়া এই গ্রাম ও পাশাপাশি আরো কয়েকটি গ্রাম। প্রফেসার রাজীব এইখানে একটা ডাকবাংলোতে আশ্রয় লইলেন এবং কাছাকাছি গ্রামেও তাঁবু ফেলিয়া ঔষধ ও পথ্য দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কাজ ভালই চলিতেছে।

তৃতীয় দিন পার হইয়া গেল। চতুর্থ দিন সকালেই একটু দূরের একটা গ্রামে গিয়াছে মীনু ও শ্যামল এবং আরো কয়েকজন। সন্ধ্যা হইতেছে, এবার তাহারা ফিরিবে। প্রফেসার রাজীবও এখানকার কাজ সারিয়া বাংলোতে ফিরিতেছেন—দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের আশ্রয়-বাংলোর নিকটেই একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। কে ও? কি চায়? রাজীব বলিলেন,

—কে তুমি? ওখানে কেন দাঁড়িয়ে আছে? কি চাও?

—মাছ লিবেন হুজুর! মাছ! বড় মাছ—লোকটা একটা মাছ দেখাইল।

—না—এখানে এখানে মাছ খাওয়া নিরাপদ হবে না।

—একদম জ্যান্ত আছে হুজুর—

—থাক—আমি নেব না।

লোকটা তথাপি দাঁড়াইয়া রহিল। বিরক্ত হইয়া রাজীব বলিলেন,

—উঁকী দিয়ে কী দেখছো? যাও এখান থেকে—যাও...

লোকটি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কিন্তু রাজীবের মনে হইল মাছ বিক্রী তাহার উদ্দেশ্য নহে—বাংলোর ভিতরটাই ও দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু কেন?—চিন্তাটা রাজীবকে বিশেষ ভাবাইয়া তুলিল। কিন্তু ভাবিবার কি আছে? এখানে তিনি একা নাই। তথাপি তাঁহাকে যথেষ্ট সাবধান হইতে হইবে।

মীনু ও শ্যামল এখনো আসিল না কেন? উহারা পাঁচজন গিয়াছে। হয়তো দূরে—আরো দূরে গিয়াছে। অপরিচিত স্থান এবং রাত্রির সামনের দিকটা অন্ধকার—কৃষ্ণপক্ষ চলিতেছে।

প্রফেসর রাজীব ক্রমশ বেশী চিন্তিত হইয়া পড়িতেছেন। বাংলো বাড়ীটা সর্বত্র তিনি স্বয়ং একটা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন লইয়া ঘুরিয়া আসিলেন! সকলেই আসিয়াছে শুধু শ্যামলের দল আসে নাই। কী হইল! কেন তাহারা আসিতেছে না!

রাত্রি বাড়িয়া চলিতেছে। না—শ্যামল বা মীনু ঐ দলের কেহই আসিল না। যেখানে গিয়াছে সে জায়গাটা এখান হইতে চার-পাঁচ মাইল দূর। তবে কি রাজীব সেখানেই দেখিতে যাইবেন? কর্তব্য ঠিক করিতে পারিতেছেন না তিনি। ওখানকার ঠাকুর যে রান্না করিতেছে, তাহাকে ডাকিয়া শুধাইলেন,

—বাউড়ি গ্রামটা ঠিক কতদূরে?

—এজ্ঞে—তা, ক্রোশ দু' আড়াই হবে—রাস্তা খারাপ—কাদা, পিছল—

—নদী আছে?

—হ্যাঁ এজ্ঞে—নদী খাল—ঝোপজঙ্গল তো থাকবেই এদেশে, বুনো গাছ—সাপ শেয়াল—আরও কত কি!

—তুমি পথ—চেনো?

—এজ্ঞে তা আর চিনিনে! আমার শ্বশুর বাড়ী যাবার পথ—ঐদিক পানেই রাসপুর, কাঁটাপালং, ধমেতি হয়ে...

—থাক থাক—বাউড়ী যাব আমি। চল দেখি আমার সঙ্গে।

—এজ্ঞে এই রাত্তিরে?

—হ্যাঁ—চল—বকশিস পাবে।

—এজ্ঞে তাতো পাবই। তবে কি আপনি আর আমি একলা...।

—না-না—তুমি আর আমি একলা নয়। আরো দুজনকে নিচ্ছি, চল!

—এজ্ঞে রান্না হয়েছে, খেয়েই রওনা হব।

—হ্যাঁ—তা মন্দ কথা নয়।

প্রফেসার অধিকারী সবাইকে খাইয়া লইতে বলিলেন কিন্তু নিজে কিছুই খাইলেন না। রাত্রি প্রায় দশটা নাগাদ চারজন লোক লইয়া রাজীব রওনা হইলেন বাউড়ী নামক গ্রামের উদ্দেশে মীনু ও শ্যামলের খোঁজে! চিন্তায় কপালটা ঘামিয়া উঠিয়াছে তাঁহার।

শ্যামল আর মীনু একটু দূরেই আসিয়াছে আজ। এদিকটায় নাকি মড়ক কিছু বেশী। বেলা ন'টা নাগাদ নির্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছাইল। সত্যিই এখানে কে কার মুখে জল দেয়—এমন অবস্থা। ম্যালেরিয়ায় ওরা আগেই জখম হইয়াছিল, তাহার উপর এই জলপ্লাবন এবং সঙ্গে সঙ্গে কলেরা ও আরো হাজার রকম রোগ উহাদের প্রায় নিঃশেষ করিয়া আনিয়াছে।

একটা স্কুল বাড়ীতে আড্ডা লইয়া তাহারা কাজ আরম্ভ করিল। ঔষধ দেওয়া, পথ্য দেওয়া এবং সাবধান হওয়ার জন্য কিছু উপদেশ দেওয়া চলিতে লাগিল। আশ-পাশের গ্রামেও যাইবে। বেলা অনেকটা হইয়াছে। ডাল-ভাত আলু সেদ্ধ রান্না হইয়াছে। সকলে খাইতে বসিল। কয়দিনই তাহাদের এই রকম খাওয়া চলিতেছে! কিন্তু খাওয়া শোওয়ার কথা ভাবিলে এসব কাজ করা যায় না।

বেলা প্রায় দেড়টা। একজন লোক আসিয়া বলিল,

—এই পাশের গাঁয়ে একবার যাবেন বাবারা? ওখানে বড়ই মড়ক চলেছে।

—কোন্ গ্রাম? কতদূর?—শ্যামল জিজ্ঞাসা করিল।

—বাগাটুলি! এই আধক্রোশটাক হবেন! তুমি চলুন বাবা—আপনিই চল।

—বেশ থামো একটু। খেয়েই যাব আমরা!

লোকটি সদরে বসিয়া বিড়ি ধরাইল এবং দুইটা টান দিয়া বলিল,

বেঁচে থাকো বাবারা। তোমরা যে কি উপকার করেছো দেশের, আহা! বলিহারি যাই—

শ্যামল বা অন্য কেহই কিছু বলিল না। খাওয়া শেষ হইলে শ্যামল মীনুকে বলিল,

—যাবে তুমি!

—হ্যাঁ—নিশ্চয়।—চলুন।

উহারা দুইজনে ফার্স্ট এইড্ বাক্স ও পথ্যাদি লইয়া লোকটির সহিত বাহির হইয়া গেল।

নিকটেই বাগাটুলি গ্রাম। বড় জোর পনর-বিশ মিনিটের পথ—তবে রাস্তা কর্দমাক্ত ও পিচ্ছল। কিন্তু এই কয়দিন ঘোরাঘুরি করিয়া মীনু ও শ্যামল এরকম পথে চলার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। লোকটির পিছনে পিছনে তাহারা অনায়াসেই চলিয়া আসিল।

বাগানটুলি একদিন বর্ড় গ্রাম ছিল—তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে গ্রামের প্রান্তেই পাথরের মন্দির, ছোট ইটের বড় বড় বাড়ীর ভগ্নাবশেষ ও শিলালিপিতে। অদূরে প্রকাণ্ড এক জীর্ণ প্রাসাদ। লোকটি সেখানেই আনিল। শ্যামল ও মীনুকে ব্যস্ত স্বরে বলিল,

—আসেন দাদাবাবু, দিদিমনি—এই বাড়ীতে আসুন।

—চল—শ্যামল ও মীনু সেই দীর্ঘ প্রাসাদের ভাঙা দরজায় প্রবেশ করিল।

কী বিপুল বাড়ী! সেকালের রাজাদের গড় হয়তো। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। শ্যামল বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছে এই ভাঙাবাড়ীতে লোক কিভাবে থাকিতে পারে! জিজ্ঞাসা করিল,

—এ বাড়ীতে লোক কেমন করে থাকে হে?

—এজ্ঞে দাদাবাবু—বানের ভয়ে ক'জন এখানে আশ্রয় নিয়েছে।

—ও—তা হতে পারে। কোথায় আছে দেখি চল।

ঘরের পর ঘর—উঠানের পর উঠান পার হইয়া আসিল তাহারা—জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। মীনু বলিল—

—না—সুবিধে লাগছে না। চলুন ফিরে যাই—আর যাবো না।

—ডর লাগছে নাকি দিদিমণি। এই তো আমি সঙ্গে রয়েছি। আসেন।

এখনো অনেকটা বেলা আছে, কিন্তু বাড়ীর এই জায়গাটা অন্ধকার—মনে হয় সন্ধ্যা হইতেছে। মীনু কিছু বলিবার পূর্বেই শ্যামল বলিল—

—চল—চল—আমরা কারো কিছু ক্ষতি করিনি যে ভয় করতে হবে।

—আসেন—

আরো একটা উঠান পার হইল উহারা। ওদিকে একটা ঘরে কে যেন কাতরাইতেছে। শ্যামল ও মীনু গিয়া দেখিল, একটা লোক ছেঁড়া বিছানায় পিড়য়া ছট্‌ফট্ করিতেছে মৃত্যুযন্ত্রণায়, শ্যামল আগাইয়া গেল—সঙ্গের লোকটি বলিল—

—আপনি এই ঘরে আসেন দিদিমণি—ওখেনে উনার ইস্তিরিরও অসুখ—খুব জরুরী।

মীনু যাইবে কিনা ভাবিতেছে! শ্যামল বলিল—

—যাও না—যাও ওখানে। আমি একে দেখছি।

মীনু আর কিছু না বলিয়া লোকটির সঙ্গে অন্য ঘরে গেল। শ্যামল নিচের লোকটির ডান হাতখানা ধরিয়া নাড়ি টিপিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল—লোকটির নাড়ির গতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কী ব্যাপার দরজাটা অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গেল কেন? বাতাসে! শ্যামল উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া দিতে যাইতেছে—বিছানায় শোয়া লোকটি হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল—এবং লাফ দিয়া উঠিয়া লম্বা ঘরটার অন্য দিকের বন্ধ দরজাটা খুলিয়া চলিয়া গেল। পড়িয়া রহিল তাহার ছেঁড়া বিছানাটা। অপর দরজাটাও বন্ধ করিয়া দিল সে। আশ্চর্য! শ্যামল কি বন্দী হইল নাকি!

শ্যামলের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে তাহারা এক কঠিন চক্রান্তে বন্দী। কিন্তু কেন? কারণটা ঠিক মত বুঝিতে পারিতেছে না শ্যামল। নিজের জন্য তাহার চিন্তা নাই—মৃত্যুকে ভয় সে করে না। কিন্তু মীনুও নিশ্চয় অন্যত্র বন্দিনী হইয়াছে। তাহার জন্যই শ্যামলের মন নিদারুণ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। মীনু ঢুকিবার পথে একবার সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল, তখন আর না ঢুকিলেই ভাল হইত। কিন্তু কিরূপে জানিবে—তাহাদের সেবা-ধর্মের কাজেও বাধা দিবার জন্য চক্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু এ চক্রান্ত নিশ্চয় অন্য কিছুর জন্য। শ্যামলের মনে হইল, এই চক্রান্তের সহিত প্রফেসর অধিকারীর জীবনের কোন রহস্য নিশ্চয় লুকাইয়া আছে। অথবা শ্যামলের জীবনের, কে জানে, মীনুর জীবনেও অনুরূপ কোন রহস্য আছে কি না। হ্যাঁ—মনে পড়িতেছে রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায় মীনুর যেন কে হন।—তিনি প্রফেসর অধিকারীর নিকট কি জন্য আসিয়াছিলেন? মীনুকে তিনি চাহিতেছেন। এইখানেই কোন গুপ্ত-রহস্যের সূত্র আছে। কিন্তু এখন আর ভাবিয়া কি হইবে? মীনুকে উদ্ধারের উপায় বাহির করা সর্বাগ্রে দরকার।

শ্যামল ঘরটা ভাল করিয়া দেখিল। দুই প্রান্তে দুইটি দরজা—সেকালের শক্ত শাল কাঠের। একটি মাত্র জানালা আছে। রডগুলি মোটা কাঠের। কোন রকমে এই রডের অন্তত দুটি ভাঙ্গিয়া যদি বাহির হওয়া যায়—অন্য আর কোন উপায় নাই। শ্যামল দেখিল—রডগুলি খুবই শক্ত—তবে কাঠের। উহা কাটা যাইতে পারে। কি দিয়া কাটিবে।

শ্যামলের হঠাৎ মনে পড়িল, তাহার ফার্স্ট-এইড্ বাক্সে ছুরি আছে। তৎক্ষণাৎ ছুরিখানা বাহির করিয়া রড কাটিতে আরম্ভ করিল। অবিলম্বে বুঝিল—ঐটুকু ছুরি দিয়া ঐ শক্ত রড দুটিকে কাটিতে বহু সময় ব্যয় হইবে। এখন করা যায় কি? কয়েকটা লাথি মারিয়া দেখিল, সেকালের শক্ত কাঠের জানালায় কোন ক্ষতিই হইল না। অতঃপর ক্লান্ত শ্যামল সেই ছেঁড়া বিছানাটায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কী সে করিবে।

না—কোন উপায় সে দেখিতেছে না। হাতঘড়িটায় দেখিল প্রায় আড়াই ঘণ্টা পার হইয়া গিয়াছে। বেলা হয়তো আর নাই—কারণ ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হইয়া গিয়াছে—শ্যামল কিছুই দেখিতেছে না আর।

অকস্মাৎ একটা দরজা খুলিয়া গেল। প্রবেশ করিল একজন ষণ্ডামার্কা জোয়ান। আসিয়াই শ্যামলকে ধরিয়া ফেলিল এবং মোটা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। উহার সহিত লড়াই করিয়া কোন ফল হইবে না বুঝিয়া শ্যামল প্রতিবাদ করিল না। তবু প্রশ্ন করিল,

—আমাদের বন্দী করে লাভ কি?

—চোপ রহ—

এছাড়া কোন উত্তর মিলিল না।

ওদিকে মীনুকে লইয়া কোণের একটা ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সঙ্গী লোকটি বলিল—

—যাও দিদিমণি—উখেনে রুগী আছে—হে ঘরটায়। আমি জল আনি।

আচ্ছা!

মীনু নিঃশঙ্ক চিত্তে নয়—কিছুটা ভয়েই প্রবেশ করিল এবং খানিকটা অগ্রসর হইল। হঠাৎ ঘরটা অন্ধকার হইলা গেল। মীনু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দেখিল,—লোকটি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মীনু সভয়ে বলিল,

—ও কি—দরজা খোলো—ও মশাই ;

উত্তর নাই। মীনু আবার ডাকিল—আবার। না—উত্তর পাওয়া যাইবে না। মীনুর দুই চোখ ছাপাইয়া জল আসিয়া পড়িল। কী হইবে। কী ইহারা করিবে তাহাকে লইয়া! চিন্তায়-ভয়ে মীনু যেন দিশাহারা হইয়া সেইখানেই মেঝেতে বসিয়া পড়িল।

দীর্ঘ—দীর্ঘ সময় চলিয়া গেল—কেহই আসিল না, না শ্যামল, না বা সেই চাষী লোকটি—কিম্বা আর কেউ। ক্লান্ত-শ্রান্ত-ভীত মীনু শুকাইয়া গিয়াছে। মনে পড়িতেছে রায় রামেশ্বরের কথা—রাজীবের স্নেহের পরশ—কত কি মনে পড়িতেছে—হায়—সব শেষ হইয়া গেল। এই ঘরেই মীনুকে আমৃত্যু বন্দী থাকিতে হইবে, কিম্বা কি হইবে, কে জানে। কেন ইহারা তাহাকে বন্দী করিল—কেন—কেন?

কতটা সময় গিয়াছে। দিন না রাত্রি—কে জানে। কাঁদিতে কাঁদিতে মীনু আপনিই কখন চুপ করিয়া গিয়াছে! নিজের ভাগ্যের উপর তাহার আর বিশ্বাস নাই। যা হইবার হইবে। চিরদিনের ঈশ্বর বিশ্বাসিনী মীনু ভগবানের উপর নিজের সব ভার ছাড়িয়া দিল। দেওয়ালে ঠেস দিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল সে।

অকস্মাৎ একটা দরজা খুলিয়া গেল ভেতর দিককার। একজন ঝি আসিয়া বলিল—

—এদিকে আসুন দিদিমণি—মুখ-হাত ধোন—জলখাবার খাবেন।

—না—আমাকে ছেড়ে দিতে বলো—নইলে ভাল হবে না।

—কি করবে?—ঝি যেন বিদ্রূপ করিয়া বলিল—যুদ্ধ করবে নাকি!

—আমি না করি—আমার বাবার ভয়ে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তিনি ছেড়ে দেবেন না।

—তাই নাকি—কে তোমার বাবা দিদিমণি?

—রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায়—তাঁর হাতে তিন হাজার ডাকাত আছে।

—ডাকাত!

—হ্যাঁ—তোমার মনিবকে বলবে, যদি ভাল চায় তো আমায় ছেড়ে দিক—শ্যামলবাবু কোথায়?

—আমি জানি না দিদিমণি। আমাকে তোমার জন্যই রাখা হয়েছে। এসো, মুখ-হাত ধুয়ে নাও—ছেড়েই দেবে তোমাকে—এসো।

—না—ছেড়ে না দিলে কিছুই খাবো না আমি। যাও...

ঝি বারম্বার বলা সত্ত্বেও মীনু উঠিল না।

নির্জন পথ—আগে পাছে দুইটি লুণ্ঠন লইয়া চলিতেছেন প্রফেসর রাজীব অধিকারী। সঙ্গের লোকেরা তাঁহার সহিত চলিতে পারিতেছে না—কারণ, মনের ব্যাকুলতায় রাজীব

অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হাঁটিতেছেন। তাঁহার শুধু বারম্বার রামেশ্বরের কথাই মনে পড়িতেছে। কী না করিতে পারে ঐ রায় রামেশ্বর। মীনুকে হত্যা করা তাহার পক্ষে একটা মশা মারার সামিল! কলিকাতায় তাহা না করিতে পারিয়া ক্রোধবশে রামেশ্বর যে এখানে তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে—ইহা রাজীবরে পূর্বেই ভাবা উচিত ছিল। বড়ই দেরী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ লোকটা কেন বাংলোর কাছে দাঁড়াইয়াছিল? কেন! কি তাহার মতলব? বাংলোতে তো মীনু তখন ছিল না। রামেশ্বর কি রাজীবকেও হত্যা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছে নাকি। অসম্ভব কিছু নয় তাহার পক্ষে। কিম্বা অপর কোন মতলবও থাকিতে পারে—প্রফেসর অধিকারী এইসব কথাই ভাবিতেছেন।

পাকা পাঁচ মাইল পথ। পথ তো নয়—পথিকের প্রাণনাশের ফাঁদ। তবু প্রফেসর অধিকারী আসিয়া পৌঁছিলেন। গভীর রাত্রি—নিস্তব্ধ গ্রাম—যেন কেহ কোথাও নাই। অনেক দূরে একটা দোকানঘর—মালিক ঘুমাইতেছে। তাহাকেই ডাকিয়া তুলিলেন।

—অ্যাঁ—কি বলছো? পুলিশ নাকি?—লোকটি সভয়ে বলিল।

—না—এখানে আজ রিলিফ-ওয়ার্ক করতে লোক এসেছিল কিনা জান?

—হ্যাঁ—তাঁহা তো চলে গেছেন বেলা দুটোর সময়।

—কোন গ্রামে গেছেন জান?

—না বাবু—অত খবর জানি না। আমার দোকানে চা খেয়েছেন সব! তবে শুনলাম, বাগাটুলি যাবেন।

—বাগাটুলি কত দূর? কতবড় গ্রাম?

—ঐ তো মাইলট্যাক—যান, দেখুন। গাঁ তো বড়ই ছিল এককালে—এখন ভাঙতা অবস্থা। শুধু লোকজন আছে জনকতক—রাজাও নাকি ছিল। তাঁর গড় রাজবাড়ী ওখেনে আছে। পুরোনো রাজবাড়ী—লোকজন কেউ নাই—পোড়ো বাড়ীটাই আছে শুধু।

রাজীব আর সময় নষ্ট করিলেন না। তৎক্ষণাৎ বাগাটুলির দিকে রওনা হইলেন। বেশী দূর আসিতে হইল না। কতকগুলো আলো দেখিতে পাইলেন—কাহারা যেন আসিতেছে। প্রফেসর থামিলেন। যাহারা আসিতেছিল, তাহারা কাছে আসিল, রাজীব দেখিলেন উহারা তিনজন—তাঁহারই দলের লোক। কিন্তু মীনু বা শ্যামল নাই। ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিলেন—

—মীনু কৈ! শ্যামল কোথায়?

—জানি না স্যার—ওরা যে কোথায় কে জানে। ফেরেন নি—তাই আমরা আপনার কাছে খবর দিতে যাচ্ছিলাম।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই রাজীব একটা গাছের ডাল ধরিয়া ফেলিলেন। মাথাটা তাঁহার ঘুরিয়া গিয়াছিল হয়তো। অবশেষে বসিয়া পড়িলেন তিনি ঐ কাদার উপর! একজন বলিল—

—অত ঘাবড়াবেন না স্যার—হয় তো ওরা আরো দূরে কোথাও গেছে।

—না—রাজীব বলিলেন—ওখানে তোমরা আড্ডা কোথায় করেছিলে?

—একটা স্কুল বাড়ীতে। স্কুল ছুটি—কেউ ছিল না সেখানে। একজন বাসায় ছিলাম—আর দু'জন করে দু'দল বেরিয়েছিলাম গ্রামে। শ্যামল আর মীনুদি একসঙ্গে বেরিয়েছিল—ওরা আর ফেরেনি স্যার।

—ঐটুকু তো গ্রাম। তোমরা খোঁজ করেছিল?

—বিস্তর স্যার! বিস্তর খোঁজ করেছিলাম। ওখানে একটা গড় আছে খুব পুরোনো রাজবাড়ী—মন্দির—ঠাকুর সব পোড়ো। শুধু সাপ থাকে। সেখানেও খোঁজ করেছি আমরা। না স্যার, ওরা ওখানেও নেই।

—তাহলে গেল কোথায়?

—কি জানি স্যার। আমরা ভেবেছিলাম আপনার কাছেই ফিরে গেছে।

—না—যায়নি।

রাজীব এখন কি করিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি নিশ্চয় ধারণা করিলেন—ইহা রামেশ্বরের কাজ। চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়াছে রামেশ্বর। মীনুকে তো লইয়াছেই—শ্যামলকেও চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। কোথায় লইয়া গিয়াছে কে জানে!

এদিকে আর খোঁজাখুঁজি করা বৃথা। রামেশ্বর এতো কাঁচা ছেলে নয় যে, উহাদিগকে এখানেই রাখিবে। নিশ্চয় সে মীনু ও শ্যামলকে অন্য কোথায়ও দূরে সরাইয়া দিয়াছে। এখন কি করা যায়? পুলিশের সাহায্য লইতে হইবে নাকি। হ্যাঁ, তাছাড়া উপায় কি! কিন্তু এতদূর আসিয়া তিনি ঐ পোড়ো বাড়ীটা না দেখিয়াই ফিরিয়া যাইবেন! না, তাহা উচিত হইবে না! প্রফেসার অধিকারী বলিলেন—

—চল—ঐ পোড়ো বাড়ীটা আমি একবার দেখতে চাই।

কেহই কোন প্রতিবাদ করিল না। সকলেই ফিরিল এবং আরো প্রায় পনের মিনিট হাঁটিয়া একটা প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপের মত বিশাল প্রাসাদে পৌঁছিল। অন্ধকার বাড়ীটাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। প্রফেসর অধিকারী সাপ-খোপের ভয় মন হইতে দূর করিয়া দিয়া অন্দরের দিকে একা চলিলেন। চারদিকের অন্ধকার যেন ঠেলিয়া যাইতে হইতেছে। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, ভিতর দিকের উঠানের আগাছাগুলি যেন পা দিয়া মাড়ানো হইয়াছে। টর্চটা ঠিক আছে—কিন্তু আব জ্বালিলেন না।

কে যেন কোথায় কাঁদিতেছে! না। কেহ নয়! বাতাসের শব্দ—না—কান্নাই। কী আশ্চর্য! কোন দিক হইতে কান্নার শব্দটা আসিতেছে? প্রফেসর অধিকারী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন। হ্যাঁ কান্নাই!

—উঠে এসো—

কঠোর কর্কশ স্বর কানে আসিল মীনাক্ষীর—যেন গর্জন। কিন্তু মনকে সে ঠিক করিয়া লইয়াছে। মৃত্যু-পণের দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া বসিয়া রহিল—উঠিল না। অন্ধকার ঘরের কোনার দিক হইতে আবার কে যেন বলিল—

—ওঠো—হাতমুখ ধুয়ে খাও—না খেলে কারো কিছু যায় আসে না এখানে।

—আমারও কিছু যায় আসে না। তবে তুমি জেনে রেখো আমার বাবা রামেশ্বর রায় তোমাদের উচিত শাস্তি দেবেন।

—তাই নাকি—হাঃ হাঃ হাঃ—তোমার বাবা দশ মুণ্ড রাবণ নাকি!

—না—আমার বাবা শ্রীরামচন্দ্র—দশ-মুণ্ড তুমিই—তুমিই রাবণ—রাক্ষস!

—তোমার বাবাকে আমরা ডরাই না মীনু—উঠে এসো—খেয়ে নাও—তোমাকে তারপর চালান করতে হবে—বহুদূর কতদূর তুমি জান না—বহু দূর-দেশে—

বুঝেছি, আমার বাবার ভয়ে আমাকে দূর-দেশে নিয়ে যাবে—কিন্তু জেনে

রাখো—আমার বাবা তোমাদের কিছুতেই রেহাই দেবেন না—চোর—ডাকাত সব।

—খাবে কি না?

—না—খাব না। যা খুসী করতে পার তোমরা।

—আচ্ছা—থাক—এখানে কারো বাপের সাধ্যি নেই তোমাকে বাঁচায়।

মীনু আর কোন কথা শুনিতে পাইল না। লোকটি হয়তো চলিয়া গিয়াছে। ক্লান্ত অবসন্ন মীনু দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে—কে জানে কখন ঘুমাইয়া গিয়াছে।

পাশের ঘরে একটা হ্যাজ্যাগ লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ঘরটার দরজা জানালা সবই বন্ধ। আলো বাহিরে যাইবার কোন উপায় নাই। ঐ ঘরে একটা পুরানো ভাঙা চেয়ারে বসিয়া আছেন রায় রামেশ্বর রায় বাহাদুর। পদতলে দয়াল সর্দার। একদিকে মদের বোতল ও অন্য দিকে একটা ছোরা। রামেশ্বর বলিলেন—

—ঐ ছেলেটা কি করছে?

—কি আর করবে? জানালার রড্ কাটবার চেষ্টা করছিল চাকু ছুরি দিয়ে। তাই ওকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে এলাম। ওকেও তো সরাতে হবে হুজুর।

—হ্যাঁ—নিশ্চয়! এদের কাউকেই রাখা চলে না। ছেলেটা খুবই ভাল। বেঁচে থাকলে দেশের গৌরব বাড়াতে পারতো। কিন্তু উপায় নেই দয়াল—উপায় নেই। ওকেও মরতে হবে।

—ওর সঙ্গে হুজুরের যুবা বয়সের চেহারার খুব মিল আছে হুজুর!

—চুপ কর দয়াল। ওসব কি কথা বলছিস। ও আমার কে?

—ঠিক কথা হুজুর—বেঁচে থাকলে পুলিশে খবর দেবে ও।

—পুলিশে খবর দেবার আরো লোক আছে দয়াল—রাজীব স্বয়ং দেবে খবর। কিন্তু তার আগেই আমরা কাজ সেরে চলে যেতে চাই। দে—ঢাল আর এক পাত্র। ওদিকে কলকাতার কাজটা ঠিক হবে তো?

হ্যাঁ হুজুর—ওখানে কানাই আছে। সে ঠিক কাজ সারবে।

দয়াল মদ ঢালিয়া দিল। রামেশ্বর চিন্তা করিতেছেন এবং ধীরে ধীরে মদ্যপান করিতেছেন। দয়াল চুপচাপ বসিয়া রহিল। জোরালো আলোটার চারিদিকে অসংখ্য কীট-পতঙ্গ উপদ্রব করিতেছে।

বিরক্ত হইয়া রামেশ্বর বলিলেন—

—আলোটা সরা এখান থেকে।

দয়াল আলোটা সরাইয়া লইল। রামেশ্বরকে আর ভাল দেখা যাইতেছে না। তীব্র সুরার গুণে তাঁহার মূর্তি এবং মুখশ্রী ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। পায়ের তলায় ছোরাটা দেখিলেন। দেখিলেন, তাঁহার কোমরে ছয়-ঘরা রিভলভারটাও ঠিক আছে। আর দেরী কেন! রাত্রি তো দ্বি-প্রহর অতীত! অতএব এই সময়ই শেষ করিয়া দেওয়া যাক। উঠিলেন রায় রামেশ্বর। হাতে ছোরাখানা তুলিয়া লইলেন। দয়াল খানিকটা দূরে বসিয়াছিল। বলিল—

—কাজটা নিজের হাতেই করবেন হুজুর?

—হ্যাঁ—দয়াল—নিজের হাতে যে লতায় জল সেচন করেছি, নিজের হাতেই তাকে ছিঁড়বো—নিজের হাতে আগে কখনো একাজ করিনি।

—ও বড় নেশার কাজ হুজুর—মদের চেয়েও নেশা। একবার করলে আবার করতে

ইচ্ছে যায়। জল্লাদের হাত হয়ে ওঠে—মানুষ তখন বাঘ হয়ে যায়।

—তোমার ইচ্ছে করছে নাকি দয়াল?

—তা হুজুর—একটা মস্ত শিকার—অনুমতি করনে তো—

—না দয়াল—একাজ আমি স্বয়ং করবো—মীনুর মৃত্যু আর কারো হাতে হতে দেব না আমি—যাও—তুমি দেখে এসো।

দয়াল দেখিতে গেল। রামেশ্বর ছোরাখানা পরীক্ষা করিলেন। সুতীক্ষ্ণ ছোরা—বহু নর-রক্তে অভিষিক্ত—দয়ালের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু ছোরা কেন। গুলি করিয়াই তো মীনুর কোমল বক্ষ বিদীর্ণ করা সহজ হইবে। দূর হইতে জানালা পথে রামেশ্বর অনায়াসে তাহা করিতে পারেন। কিন্তু গুলি যদি ঠিক জায়গায় না লাগে—যদি মাথায় না লাগিয়া পাশে লাগে—যদি মীনুর মরিতে দেরী হয় তো কষ্ট পাইবে—মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করিবে মীনু। ছোরা একেবারে বুকের ভিতর বসাইয়া দেওয়া যায়—মীনু তৎক্ষণাৎ ইহলোক ছাড়িবে। মৃত্যু-যন্ত্রণা অধিকক্ষণ ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু কে জানে ছোরায় না গুলিতে মৃত্যু সহজ হয়। রামেশ্বর নিজহাতে একাজ তো করেন নাই। না—কখনো না। হ্যাঁ—একবার যেন—অনেক দিন হইল—একজনকে নিজহাতে—না-না-না—নিজহাতে তো মারেন নাই। দয়ালই গলা টিপিয়া তাহাকে ভবধাম হইতে সরাইয়াছিল। উঁহু না—মনে পড়িতেছে—আঁতুড়-ঘরে বিষাক্ত সাপ ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার বাহির হইবার কোন পথ রাখা হয় নাই—সাপের তীব্র বিষে নীল হইয়া গিয়াছিল সে—মৃত্যু-মুহূর্তে রামেশ্বর গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন! নিঃশব্দে সেই যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও সে বলিয়াছিল,—"তোমাকে ধন্যবাদ—তোমার অন্ন গ্রহণের পাপ এই মহাবিষে নষ্ট হয়ে গেল—আমার দেহ পবিত্র রইল। ওপাশে গিয়ে আমি তাঁর জন্য অপেক্ষা করবো—"

আরো বলিয়াছিল—"তোমার জন্য প্রার্থনা করছি, জীবনের শেষদিনেও যেন তুমি বুঝতে পার—প্রেম আছে, আছে স্নেহ-ভালবাসা নিশ্চিন্ত নির্মম হয়ে আছে। ঈশ্বর তোমার অন্তরে সেই অনুভূতি দিন।"—আশ্চর্য!

কিন্তু আরো আশ্চর্য আছে। সেই মৃত্যুরূপী গোক্ষুর বিষধর বাচ্চাটিকে স্পর্শ করে নাই। স্নেহভবে পরিত্যাগ করিয়া রায় রামেশ্বরকে যেন দেখাইয়া দিয়াছিল—স্নেহ আছে—বাঘের আছে—সাপেরও আছে। আজ রামেশ্বর সেই বাচ্চাটির কুসুমিত দেহটিকে ধ্বংস করিবে। সাপ যাহা পারে নাই—রামেশ্বর তাহাই করিবে...

কিন্তু এসব কি ভাবিতেছে রামেশ্বর! কর্তব্য যাহা, তাহা করিতেই হইবে। অকারণ দেরী কেন? মনকে দুর্বল হইতে দেওয়া উচিত নহে। বংশের সম্মান রক্ষার জন্য—রামেশ্বর ছোরাখানা রাখিয়া এক পাত্র মদ নিজে ঢালিয়া লইলেন—হ্যাঁ—বংশের সম্মান রক্ষার জন্য একাজ অবশ্য করণীয়! এতএব চলিলেন রায় রামেশ্বর—হাতে ছোরা—মনে অদম্য হত্যাপিপাসা—

পাশের ঘরে মীনা ঘুমাইয়া গিয়াছে হয়তো। বাহিরের হ্যাজ্যাগ লণ্ঠনটার ছায়াময় আলো আলোকিত করিয়াছে ঘরখানা অতি সামান্যভাবে। সেই আধো অন্ধকারে দেখা যাইতেছে মীনুর মুখ—স্বর্গের পারিজাত—না না—অতুলনীয়—সাগরলক্ষ্মীর মত সুন্দর। কিন্তু রামেশ্বর এ কি ভাবিতেছে! মীনু সুন্দর তো রামেশ্বরের কি! মীনুর বুকে ছোরাটা বসাইয়া রামেশ্বর দেখিবেন—রাজীব ও ভদ্রার রক্তের বন্যা বহিয়া যাইবে—চমৎকার

প্রতিশোধ! হ্যাঁ—আর দেরী নয়—রামেশ্বর সজোরে দরজাটা ঠেলিলেন।

—উঁ—কে?

মীনু জাগিয়া উঠিল। রামেশ্বর ত্বরিতে বাহিরে আসিলেন। মীনু আবার বলিল—

—কে? কে?...

রামেশ্বর একটা কম্বলে নিজেকে আপাদমস্তক মুড়িয়া ঢুকিলেন।

—কে—?

উত্তর না দিয়া রামেশ্বর ছোরা তুলিতেছেন। ভীতা মীনু বলিল,

—মেরো না—মেরো না—আমাকে মেরে কোন লাভ হবে না—আমার বাবার কাছে—রায়বাহাদুর রামেশ্বরের কাছে আমাকে ফিরিয়ে দিলে তিনি তোমাকে লাখ টাকা দেবেন। মেরো না—

জিভ উল্‌টাইয়া রামেশ্বর বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন—

—রামেশ্বর তোর কেউ নয়—

—তিনি আমার বাবা—আমার জন্য তিনি সর্বস্ব দিতে পারেন।

না-না—রামেশ্বর কণ্ঠ আরো জোরে আরো বিকৃত করিয়া বলিলেন—

—রামেশ্বর তোকে মারতে হুকুম করেছে—

—মিথ্যাবাদী—শয়তান—আমার বাবা আমাকে মারতে হুকুম করেছেন।

—রামেশ্বর তোর মাকে মেরেছে—তোকেও মারবে। জানিস!

—না—জানি না! জানতে চাই না। তুমি নিশ্চয় সেই বেদে—যে আমাকে আমার বাবার কোল থেকে চুরি করেছে—রামেশ্বর আমার বাবা—বাবা—আমার আরাধ্য পিতা—

—না। শোন আহাম্মক মেয়ে—তোর বাবা ঐ উদার মহান রাজীব—ঐ দেশসেবক—ঐ আর্ত-আতুরের বান্ধব রাজীব—শুনছিস্—?

—না। শুনবো না। ভগবান বললেও বিশ্বাস করবো না আমি। আমি জানি আমার বাবা রায়বাহাদুর রামেশ্বর—

না-না-না—রামেশ্বরই তোকে খুন করতে চেয়েছে। কারণ, তুই তার কেউ নোস্—তুই আর্তত্রাতা রাজীবের—

—না—আমি শুনবো না—মীনু কানে আঙুল দিয়া বলিল,

—রাজীব মহান হতে পারেন, উদার হতে পারেন, তাতে আমার কি। পৃথিবীতে বিস্তর মহান পুরুষ আছেন—তাই বলে—তাদের 'বাবা' বলতে হবে নাকি?

—কিন্তু জানিস—রামেশ্বরই তোকে খুন করতে পাঠিয়েছেন আমায়।

—অসম্ভব—হোতে পারে না! আমার হাত ছাড়া তাঁর খাওয়া হয় না—আমাকে ঘুমুতে দেখেও তিনি পাহারা দেন—আমার জন্য নিজের শরীরের রক্ত দিতেও পিছপা নন—দিয়েছেন আমার বড় একটা অসুখের সময়। আমার বাবা তোমাকে পাঠিয়েছেন আমাকে খুন করতে। মিথ্যুক শয়তান—কে তুমি? তোমার গলার আওয়াজ চেনা লাগছে। নিশ্চয় তুমি সেই বেদে—কে তুমি—?

—আমি তোকে খুন করতে এসেছি!

—বেশ—করো—তবু তোমাকে আমি 'বাবা' বলবো না! আমার বাবা রায়বাহাদুর রামেশ্বর রায়।

মীনু কাঁদিয়া উঠিল—আমার বাবা—আমার বাবা!...

—ভুল—ভুল। মিথ্যে...

—না—মিথ্যে নয়। আমি আমার বাবা ছাড়া কাউকে চিনি না। মাকে আমি দেখিনি। আমি রায় রামেশ্বরের বুকে চড়ে বড় হয়েছি। রায় রামেশ্বর আমার বাবা। বেশ—আমাকে খুন করো—তবু আমি বলবো আমার বাবা রায় বাহাদুর রামেশ্বর...

রামেশ্বর কম্বলের ভিতর ঘামিতেছেন। না, কাঁপিতেছেন তিনি। সমস্ত দৃঢ়তা—বজ্রকঠিন সংকল্প যেন বর্ষা-ধারার মত গলিতেছে! একি হইল!

ছোরাখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন রায়বাহাদুর রামেশ্বর। এরপর কি করিবেন? কে যেন আসিতেছে? নিশ্চয় রাজীব অধিকারী। এখনি দেখিয়া ফেলিবে...ত্বরিতে ওঘরে চলিয়া গেলেন তিনি—চোখে তাঁহার জল।

অন্ধকার উঠোনের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া রাজীব উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন—কে যেন কাঁদিতেছে—হয় তো কথা কহিতেছে কাহারা। কিন্তু কোথায়—কোন ঘরে? কোন দিকে! এই বিশাল বাড়ীর কোন মহলে কথা হইতেছে—কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না রাজীব। হাতের টর্চটা জ্বালিবেন কিনা, ভাবিতে ভাবিতে অন্ধকারেই অগ্রসর হইলেন। অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকার জন্যে চক্ষের জ্যোতি কিছু বাড়িয়াছে! দেখিতে পাইতেছেন তিনি। চলিলেন।

একটা উঁচু বারন্দা। ঠোক্কর খাইলেন অধ্যাপক। হাঁটুতে বেশ লাগিয়াছে সামলাইয়া বাবান্দাতে উঠিলেন। কণ্ঠস্বর আরো স্পষ্ট হইল। হ্যাঁ—কোণার দিক হইতে শব্দ আসিতেছে। অতি সাবধানে রাজীব অগ্রসর হইলেন। একেবারে কোণের ঘর—ভিতর হতে বন্ধ। একটা জানালাও এদিকে নাই যে ভিতরে কি ঘটিতেছে দেখিতে পাইবেন। বন্ধ দরজাটায় কান পাতিলেন প্রফেসর অধিকারী। অল্প অস্পষ্ট কথা শোনা যাইতেছে। মীনুর গলা! হ্যাঁ—মীনুরই তো!

—'আমার বাবা—আমার বাবা রায় রামেশ্বর রায় বাহাদুর'—কান্না-ভরা কণ্ঠস্বর তাহার।

একটা কি যেন মাটিতে পড়িল—হয়তো ধাতব কিছু—ছোরা-ছুরি নাকি! আর কোন কথা শোনা গেল না। শুধু মীনুর ফুলিয়া ফুলিয়া কান্নার শব্দটা আসিতেছে। কী এখন করিবেন রাজীব অধিকারী? এই শাল কাঠের শক্ত দরজা ভাঙিয়া প্রবেশ করা তাঁহার একার পক্ষে সম্ভব নয়—বাহিরে যাহারা আছে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিবেন নাকি! কিন্তু ততক্ষণে এখানে কি ঘটিবে কে জানে! না—রাজীব ব্যাপারটা ভাল করিয়া না দেখিয়া যাইতে পারেন না। রাজীব ওপাশ ঘুরিলেন। বারান্দায় হয়তো ওদিকে যাইবার পথ আছে।

হ্যাঁ—আছে। বারন্দার ঠিক মাঝামাঝি ওদিকে যাইবার দরজা—রাজীব অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অধিকদূর যাইতে হইল না শুনিতে পাইলেন। কে যেন বলিতেছে—

এদিকে বারান্দায় একজন লোক ঢুকেছে—হয়তো পুলিশ! কি করা যায়?

—দেখি!

উত্তরদাতার কথা এতো মৃদু যে রাজীব ভালরকম শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু তিনি সতর্ক হইবার জন্য একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইলেন। অকস্মাৎ হ্যাজাক লুণ্ঠনের তীব্র

আলো পড়িল বারান্দায়। সর্বাঙ্গে কম্বল চাপা কে একটা লোক লণ্ঠনটা বারান্দায় নামাইয়া এক তাড়া চাবি ছুঁড়িয়া দিল রাজীবের দিকে। লোকটা সবেগে আবার ঘরে ঢুকিল।

ব্যাপার কি রাজীব কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। মিনিট দুই তিন অপেক্ষা করিলেন। পরে সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন—যে-ঘর হইতে লোকটি আসিয়াছিল সেই ঘরের দিকে। গিয়া দেখিলেন, স্বয়ং রামেশ্বর রায় সেখানে বসিয়া রহিয়াছেন—পদপ্রান্তে শূন্য বোতল একটা। ঘরে আর কেহ নাই। রামেশ্বরের চোখে জল। রাজীব বিস্মিত স্বরে বলিলেন—

—রামেশ্বর তুমি এখানে?

—হ্যাঁ রাজীব—এসো! ঘরে আর চেয়ার নেই। আমি চলে যাচ্ছি—বসো—ওঘরে মীনু আছে, পরের ঘরটায় সেই ছোকরা আছে। ওদের নিয়ে যাও। তোমার কাজ সেরে কলকাতা যেও।

—খুন-খারাপী কিছু করতে পারলে না বুঝি!

—না—রামেশ্বর চোখটা মুছিয়া কম্বলটা ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—রাজীব—তুমি মহান—দুর্ভাগাকে বিদ্রূপ করো না—একটা প্রার্থনা।

—বল! সাধ্য থাকলে নিশ্চয় রাখবো।

—আমার আজকের কু-কীর্তি যেন মীনুকে জানিও না। শুনলে সে মনে বড় কষ্ট পাবে।

—তুমি তাকে হত্যা করতে গিয়েছিলে রামেশ্বর?

—হ্যাঁ রাজীব—কিন্তু পারলাম না। কোনদিনই পারবো না। তোমার মেয়ে তোমারই থাক—আমি অভাগা নিঃসন্তানই থাকিলাম—আর—

—বলো—

রামেশ্বর চলিয়া যাইতেছেন—রাজীব বলিলেন—

—যেও না—বলো...

—না—আর বলবার কিছু নেই। আমি যে এখানে এসেছি তাও জানিও না মীনুকে। যদি সম্ভব হয়—কাল বা পরশু তোমার ক্যাম্পে গিয়ে তাকে একবার দেখে দেশে চলে যাব। যাই রাজীব।

আশ্চর্য! দু'চোখে ঝর-ঝর জল রামেশ্বরের—কিন্তু মুহূর্তে ওদিকের একটা ঘরে-ঢুকিয়া পড়িলেন তিনি। রাজীব তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া দেখিলেন কেহ নাই—রামেশ্বর চলিয়া গিয়াছেন। রাজীব চিৎকার করিয়া ডাকিলেন—

—ফিরে এসো রামেশ্বর—আজ সত্যি তুমি মীনুকে ভালবাস। ফিরে এসো। তোমার মেয়েকে তুমি নিয়ে যাও...

না, কোন জবাব পাওয়া গেল না। নিরুপায় অধ্যাপক হ্যাজ্যাগ লণ্ঠনটা লইয়া আবার বারান্দায় আসিলেন এবং চাবির গোছা হইতে দুই তিনটি চাবি বাছিয়া ঘুরাইয়া পাশের ঘরের তালাটা খুলিয়া দেখিলেন—হাত পা বাঁধা শ্যামল শুইয়া আছে।

—স্যার!

—হ্যাঁ আমি—ছুরি দিয়া বাঁধন কাটিয়া দিলেন তিনি। শ্যামল বলিল—

মীনু কোথায়?

—ওঘরে আছে।

—চলুন—দেখি!

দুইজনে পাশের ঘরে আসিয়া তালা খুলিয়া ফেলিলেন। মীনু নিঃশব্দে কাঁদিতেছে—চোখের জল মুছিয়া আনন্দে বলিল—

—আপনি! এখুনি আমাকে খুন করতে এসেছিল একজন...

—কি জন্য আমাদের এমন করে বন্দী করল স্যার? আমরা তো টাকা পয়সার লোক নই...শ্যামল বলিল।

রাজীব একটু ভাবিয়া বলিলেন—

—তুমি নও—কিন্তু মীনু বড় লোকের মেয়ে। বুঝলে শ্যামল—চোর-ডাকাতরা সব খবর রাখে—তারা মীনুকে ভয় দেখিয়ে একখানা চিঠি হয়তো লিখিয়ে নিত ওর বাপের নামে—"টাকা দিলে মীনুকে ছেড়ে দেব।"—এই রকম কিছু মতলব ছিল বোধ হয়।

—তা হবে স্যার—এরকম হয় নাকি আমেরিকায়—ইউরোপে—কিন্তু এদেশে...

—এখানেও হয়—এসো—

—ওঃ এই রাত্রে আপনাকে বিস্তর কষ্ট পেতে হলো স্যার আমাদের জন্য।

—তা হোক—তোমাদের পেলাম এই যথেষ্ট।

সকলে একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিল এবং দলের অন্যান্য সকলের সহিত মিলিত হইয়া ক্যাম্পের দিকে রওনা হইল। রাত্রি প্রায় দুইটা। রাজীব মীনুকে কোলের কাছে লইয়া হাঁটিতেছেন। পথ সংকীর্ণ—সর্প-সংকুল এবং পিচ্ছল—অত্যন্ত সাবধানে চলিতেছেন সকলে। মীনুর চোখে তখনো জল। হঠাৎ সে বলিয়া বসিল—

—বলে কি জানেন—বলে, তোর বাবা তোকে খুন করতে আমাকে পাঠিয়েছে।

—ও রকম কত কথা চোর-ডাকাতরা বলে মা। চলো—রাত বেশী নেই—চলো।

মীনুর কথাটাকে আমলই দিলেন না প্রফেসর অধিকারী। শ্যামল বলিল—

—এবার থেকে আমাদের সাবধানে চলাফেরা করতে হবে স্যার।

প্রফেসর অধিকারী যেন দূর হইতে কথা বলিতেছেন। অর্থাৎ এসব কথায় কান দিবার মত মন তাঁর নাই। কী যেন বিশেষ ভাবনা ভাবিতেছেন তিনি। ভাবিতেছেন—রামেশ্বর যে মীনুকে ভালবাসে না—তাহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছে বারম্বার, এই সত্য নিজেই তিনি মীনুকে জানাইয়াছেন। বেশ বোঝা যাইতেছে মীনু সেকথা বিশ্বাস করে নাই। বিশ্বাস করিবে না কোনদিন। কারণ—রাজীবের কথাটা সত্য নহে। রামেশ্বর মীনুকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা স্নেহের অভাবের জন্য নহে। তাহা শুধু রামেশ্বরের বংশগৌরবের মিথ্যা অভিমান-জনিত। মীনুকে রামেশ্বর সত্যিই ভালবাসে—আত্মজা দুহিতাকে যতখানি ভালবাসা সম্ভব—রামেশ্বরের স্নেহ তাহা অপেক্ষা কিছুই কম নহে! কিন্তু ঐ বংশঅভিমান কিরূপে ছাড়ানো যাইবে রামেশ্বরের মন হইতে। উহা তাহার মজ্জাগত বিশ্বাস—তাহার শিরার শোনিত। তথাপি আজ রাজীব বুঝিতে পারিলেন, রামেশ্বর মীনুকে অত্যন্ত ভালবাসে। ভালই। আনন্দই হইতেছে রাজীবের। কিন্তু কিরূপে সমস্ত দিক রক্ষা পাইতে পারে।

ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না রাজীব। রামেশ্বরের প্রকৃতিকে ভালই চেনেন রাজীব। আজ উচ্ছ্বাসবশে হয়তো রামেশ্বর মীনুকে ছাড়িয়া দিয়া গেল—কিন্তু আগামীকাল অথবা দুই মাস পরে যে আবার রামেশ্বর ভূয়া বংশ গৌরব তাহাকে জিঘাংসা বৃত্তিতে

জাগ্রত করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে। রাজীব জানেন—অকারণ রামেশ্বর তাহার নিরপরাধী পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছেন—শুধু তাহাই নহে—পুত্রকে পর্যন্ত স্বীকার করেন নাই। কারণ—আর কিছুই নহে—ভুয়া বংশগৌরব। জমিদারী ঠাট্ এবং মেকী আভিজাত্য। মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখিবার মন নাই রামেশ্বরের—এই সত্য রাজীবের ভালই জানা আছে। মীনুকে নিরাপদে রাখিতে হইলে আরো কিছু করা দরকার। কিন্তু কি তিনি করিবেন। মীনুকে লইয়া তিনি সুদূর দেশে চলিয়া যাইতে পারিতেন কিন্তু মীনু যাইবে না। কারণ মীনু সর্ব মন-প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করে সে রামেশ্বরের কন্যা! আশ্চর্য রামেশ্বরের ভাগ্য—আশ্চর্য্য সত্যি!

চাঁদ উঠিতেছে। শেষ রাত্রের চাঁদ—ক্ষীণ হইলেও সুন্দর। রাজীব দেখিলেন—চিন্তার জন্য তাঁহার গতি মন্থর হওয়ায় মীনু ও শ্যামল কিছুটা আগাইয়া গিয়াছে। বন-পথের সর্পিল রাস্তা—পথের পাশে বন্য কুসুম—গাছে গাছে শিশির বিন্দুর পতন শব্দ—বড়ই মনোরম! কাব্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে দিক্‌বধূ। সঙ্গের লোকেরা তাঁহাকে আলো দেখাইয়া চলিতেছে। রাজীব বলিলেন—

—বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে—আলোটা নিবিয়ে দাও। অন্তত কমিয়ে দাও।

আলো কমাইয়া দেওয়া হইল। প্রকৃতি যেন নিরাবরণা হইয়া উঠিল। রাজীব ধীরে ধীরে চলিতেছেন। আগে আগে চলিতেছে মীনু ও শ্যামল—দেখিতে পাইলেন, পথের পাশের একগুচ্ছ বনফুল তুলিয়া শ্যামল মীনুর খোঁপায় পরাইয়া দিল।

অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন রাজীব। মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ইচ্ছা করিয়াই তিনি চুরুটটা ধরাইবার অছিলায় আরো খানিকটা পিছাইয়া পড়িলেন।

পদ্মার কথা বলিয়া রাজীব কি ভয় দেখাইয়াছিল রামেশ্বরকে? না—পদ্মা সত্যই কোথাও আছে। কিন্তু এতোদিন তো তাহার বাঁচিয়া থাকিবার কথা নয়। হয় তো ঐ রাজীবই তাহাকে অন্নবস্ত্র দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।—ভাবিতেছিলেন রায় রামেশ্বর।

বিরাট সহর কলিকাতার ঠিকানা না জানা থাকিলে পদ্মার মত একটি তুচ্ছ মেয়েকে খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব নহে। কোথায় তাঁহার খোঁজ করিবেন রামেশ্বর? বিস্তর ভাবিয়া তিনি অবশেষে কানাই ও দয়ালকে নিযুক্ত করিয়াছেন পদ্মার খোঁজ করিবার জন্য। তাহারা পদ্মাকে কিন্তু চেনে না। না-চেনা কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব নহে।

কিন্তু রামেশ্বরের বরাত ভাল। রাজীবের সহিত মীনুকে একটা বস্তিতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি আন্দাজ করিয়া লইয়াছিলেন—পদ্মা যদি এখনো বাঁচিয়া থাকে তবে আছে এই বস্তিতে। রাজীবের ঘরে সে নেই—তাহা রামেশ্বর ভালভাবেই দেখিয়াছেন।

ঐ বস্তিতে যে মহিলাটি রাজীবকে অভ্যর্থনা করিল—রামেশ্বর সবিস্ময়ে দেখিয়াছিলেন—সে পদ্মা—পদ্মা তবে বাঁচিয়া আছে। আর কেহ আছে কিনা জানিবার সুযোগ হয় নাই তাঁহার—কারণ ঐ বস্তির নোংরা জঞ্জাল ও দুর্গন্ধ রামেশ্বরের নাসারন্ধ্রে জন্মাইতেছিল। তিনি দয়াল ও কানাইকে বস্তিটা চিনিয়া রাখিতে বলিয়াই ত্বরিতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কানাই মহিলাটিকে চিনিয়া আসিয়াছিল। রামেশ্বর দয়াল ও কানাইকে হুকুম করিয়াছিলেন—

—ওকে সরাতে হবে—পারবি?

—এ আর এমন কঠিন কি কাজ হুজুর!

—বেশ—হাজার টাকা পুরস্কার।

—আপনারই তো খাচ্ছি হুজুর।

অতঃপর মীনু ও রাজীবের পশ্চাৎ-ধাবন করিয়া রামেশ্বরকে মেদিনীপুর আসিতে হইয়াছে। কানাইকে তিনি হুকুম করিয়া আসিয়াছেন—পদ্মাকে যেন সাবাড় করিয়া দেওয়া হয়। কানাই দয়াল অপেক্ষা কম দক্ষ নহে। হয়তো ইতিমধ্যে কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে তাহার—

কিন্তু রামেশ্বর চিন্তা করিতেছে—না—আর এসব কাজ তিনি করিবেন না। পদ্মা যদি কোনরূপে বাঁচিয়া গিয়া থাকে তো থাক—তাহাকে মারিবার কোন প্রয়োজন নাই। সে আর রামেশ্বরের নিকট কোন দাবী করিতে পারিবে না। বহুদিন হইল—পদ্মা রামেশ্বরের জীবন হইতে খসিয়া গিয়াছে।

কিন্তু রায় রামেশ্বর ভাবিতে লাগিলেন—পদ্মার একটা বাচ্চা হইয়াছিল। তাহার ফটো-সহ পদ্মা একবার অর্থের জন্য আবেদন করিয়াছিল রামেশ্বরের নিকট। সেই ফটো ও চিঠি আছে রামেশ্বরের বাক্সে। সে ছেলে কোথায়?

মনের মধ্যে যে সন্দেহটা উঁকি দিতেছে—রামেশ্বর আর তাকে বাহিরের আলোকে আনিবেন না। না-না-না—কিছুতেই না। রামেশ্বর আজ আর কাহাকেও পুত্ররূপে স্বীকার করিতে পারেন না। মীনুই তাঁহার কন্যা—একমাত্র সন্তান। আর কেহ যদি সত্যই থাকে তবে সে থাক—সে ভগবানের পুত্র হইয়া থাকে—অথবা সে থাক ঐ রাজীবের পুত্র হইয়া। রামেশ্বর তাহাকে কোনদিন গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

চিন্তায় মুখখানা কালো হইয়া উঠিল রামেশ্বরের। কিন্তু তথাপি ভাবিতেছেন—কয়েকদিন হইয়া গেল—কানাইয়ের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে পদ্মাকে ইহধাম হইতে সরাইবার জন্য! হয়তো কানাই সে আদেশ পালন করিয়াছে অক্ষরে অক্ষরে। তাহার দক্ষতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই রামেশ্বরের! কিন্তু যদি তাহা না হইয়া থাকে—তবে রামেশ্বর আর সে চেষ্টা করিবেন না। তবে তিনি কি করিবেন?

তীর্থযাত্রা করিবেন। হ্যাঁ—তীর্থযাত্রীই। কোন তীর্থ? রামেশ্বর নিজের মনেই হাসিয়া ফেলিলেন। তীর্থ তাঁহার জন্য আছে নাকি কোথাও। ঈশ্বর যদি থাকেন তো রামেশ্বরের জন্য নতুন কোন রকম তীর্থ তিনি সৃষ্টি করিবেন—যেখানে শুধু জ্বালা—শুধু তাপ, শুধু যন্ত্রণা..

রামেশ্বরের চোখ জ্বলিতে লাগিল। ভাবিতেছেন—অন্তত বিশ্বে তিনি আজ একা। এমন একাকিত্ব রামেশ্বর আর কোনদিন অনুভব করেন নাই। আর্ত কণ্ঠে রামেশ্বর চেঁচাইয়া উঠিলেন—

—মীনু! মা!

পদ্মা ঘুমাইতেছিল। হয়তো স্বপ্ন দেখিতেছে—কে যেন ঘরে ঢুকিল।—কে?—কে তুমি! পদ্মা প্রশ্ন করিল।

উত্তর নাই। ঘুমটা ভাঙিয়া গেল পদ্মার চমকিয়া জাগিয়া দেখিল—না, ঘুম নয়, সত্যই কে যেন আসিয়াছিল—তাহাকে জাগিতে দেখিয়া চলিয়া গিয়াছে। চোর! নিশ্চয় চোর!

কিন্তু তাহার ঘরে চোর কিজন্য আসিবে, পদ্মা ভাবিয়া পাইল না—চোরে তাহার কি চুরি করিতে আসিবে। তবে কি—তবে কি।...

কিন্তু পদ্মা আর ভাবিতে পারিল না। তাহার মন যেন বারম্বার বলিতেছে—হ্যাঁ—সে-ই—সে-ই—আসিয়াছিল। কিন্তু কি মতলবে? মতলব আর কিছু নহে—তাহাকে ইহধাম হইতে সরাইতে আসিয়াছিল। কিন্তু লোকটা কি নিজেই আসিয়াছিল? না—তাহার নিযুক্ত লোকই আসিয়াছিল।

শ্যামল ঘরে নাই। কয়েকদিন পূর্বে প্রফেসার অধিকারীর সহিত তাহারা মেদিনীপুর গিয়াছে—এবং হয়ত সেদিকেও চক্রান্তজাল বিস্তার করিয়াছেন রামেশ্বর। তবে? তবে কি—চিন্তায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল পদ্মা। তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বালিয়া দেখিল—তাহার ঘরের খিল ওপাশ হইতে খোলা হইয়াছে একটা তার দিয়া—তারটা ওইখানেই পড়িয়া রহিয়াছে। পাশের ঘরে শ্যামল থাকে। পদ্মা আলো লইয়া সেই ঘরের দিকে গেল। সে ঘর ঠিকই আছে—কিন্তু কে যেন ঢুকিয়াছিল। বই-খাতা কিন্তু ওলোটপালট হইয়া রহিয়াছে—কে আসিয়াছিল?

চিন্তায় ঘামিয়া উঠিল পদ্মা। ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু ভয় করিলে তো চলিবে না! নিজের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করে না সে—কিন্তু শ্যামল! রামেশ্বর কি তাহাকেও হত্যা করিবার জন্য কোন চক্রান্ত করিয়াছে? কিছুই আশ্চর্য নয় তাহার পক্ষে। পদ্মা যতখানি তাহার সম্বন্ধে জানে—তাহাতে শ্যামলকে হত্যা করা কিছু বেশী কথা নয়। কারণ শ্যামলকে তিনি কিছুতেই স্বীকার করিবেন না।

পদ্মা কি করিবে কিছুই ভাবিতে পারিতেছে না! প্রফেসার অধিকারী খুবই বুদ্ধিমান এবং সুচতুর ব্যক্তি। শ্যামল তাঁহার কাছে আছে। তথাপি পদ্মার মাতৃ মন শ্যামলের অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁপিতে লাগিল। সে রাত্রে আর ঘুমাইতে পারে নাই পদ্মা।

শ্যামলের পত্র আসিয়াছিল কয়েকদিন পূর্বে—"মা—আমরা ভাল আছি। তোমার কোন চিন্তা নাই।"—লিখিয়াছিল ও ঠিকানা দিয়াছিল।

সকালে পদ্মা পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোককে বলিল—

—একটা 'টেলি' করে দিতে হবে শ্যামলকে—

—কেন? টেলি কেন?

—ওরা ফিরে আসুক—

—সেকি! প্রফেসার অধিকারীর সঙ্গে গেছে কাজ না সেরে ফিরবে?

—তবে আপনি শুধু 'কেমন আছে সে যেন জানায়'—লিখে দিন।

—অনর্থক টাকা খরচ করবেন? চিঠি দিন না একখানা।

—না—টাকা খরচ হোক—আপনি 'তারটা' করে দিন।

পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক জানাইলেন যে তিনি 'তার' করিয়া দিতে রাজী! কিন্তু আজ রবিবার। সাধারণ 'তার' যাইবে না। কাল তিনি শ্যামল বা প্রফেসার অধিকারীকে 'তার' করিয়া দিবেন।

নিরুপায় হইয়া পদ্মা আর কিছু বলিল না। সারাদিন কিন্তু তাহার অন্নজলে রুচি হইল না। রাত্রে প্রায় কিছু না খাইয়াই শুইয়াছে। অকস্মাৎ 'খুট'—শব্দ।

পদ্মা তৎক্ষণাৎ সচকিত হইয়া উঠিল। দরজাটা আস্তে আস্তে খুলিতেছে ; পদ্ম উঠিয়া দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইবে—পাশ বালিশটায় চাদর চাপা দিয়া সে সরিয়া গেল ঘরের কোণার দিকে। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে পদ্মা।

চোর ঘরে ঢুকিল!—বালিশটাকেই সে পদ্মা ভাবিয়াছে। সজোরে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল—পদ্মা সুড়ুৎ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দরজাটা টানিয়া দিল এবং শিকল তুলিয়া দিল বাহির হইতে। লোকটা বন্দী হইয়াছে। পদ্মা ইহার পর পাশের ঘরের লোকজন ডাকিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিবে—পদ্মা ত্বরিতে চলিল লোক ডাকিতে।

কানাই ঘরের মধ্যে বন্দী। কিন্তু রায় রামেশ্বরের লোকরা আহাম্মক নহে। কানাই মুহূর্তে বিপদ বুঝিতে পারিল এবং কোমর হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া ঐ ছিটে বেড়ার ঘরের একদিকে যে একটি ছোট জানালা আছে—তাহাই কাটিয়া লাফ দিয়া ওদিকের গলিতে পড়িল।

পাশের বাড়ীর দুইজন লোক লইয়া পদ্মা যখন ফিরিল—দেখিল ঘরে কেহ নাই। জানালাটা কাটা দেখিয়া সকলেই বুঝিল চোর পলাইয়াছে।

বহু অনুসন্ধানই করা হইল চোরের। মস্ত বড় বস্তি—বিস্তর সরু গলি আছেন্ন! চোরকে আর পাওয়া গেল না। সকলেই ঘরে ফিরিল—এবং সকলেই ভাবিল, পদ্মার এমন কি সম্পদ আছে যাহার জন্য চোর আসে! টাকাকড়ি তো তাহার নাই—ঘটিবাটিও বিশেষ নাই। পদ্মা কিন্তু বুঝিয়াছে—যে আসিয়াছিল, সে রামেশ্বরের লোক—এবং আসিয়াছিল তাহাকে হত্যা করিতে। কিন্তু এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু সে বলিল না।

পরদিন শ্যামলকে টেলিগ্রাম করিল পদ্মা। তাহারা যেন শীঘ্র ফিরিয়া আসে। পদ্মা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে নানা কারণে। প্রফেসার অধিকারীও যেন আসেন।

একটা তাঁবুর বাহিরে প্রফেসার অধিকারী ক্যাম্বিস চেয়ারে অঙ্গ এলাইয়া বসিয়া আছেন। শ্যামল ও মীনা এখনো রিলিফ ওয়ার্ক করিয়া ফেরে নাই। অদূরবর্তী একটা পুষ্পিত তরুর দিকে চাহিয়া প্রফেসার অধিকারী চুরুট টানিতেছেন। সহসা কে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পিছনে বসিয়া পড়িল। প্রফেসার অধিকারী বিস্মিত হইয়া উঁকি দিয়া দেখিলেন—মীনা।

—চুপ—চুপ, ও আমায় ধরতে পারবে না—বলবেন না যেন।

সামনের দিক হইতে শ্যামল আসিল। বেশবাস অত্যন্ত রুক্ষ, স্নান আহার কিছুই হয় নাই। প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া শ্যামল হঠাৎ থামিয়া গেল।

—মীনু কৈ—শ্যামল? বড্ড দেরী করে ফেললে তোমরা।

—যেখানেই যাই শুধু আর্তনাদ স্যার! সে দেখে আর খাওয়ার কথা মনে থাকে না। মীনু তো আমার আগেই এলো।

—দেখ—এসেছে তা হলে।

—তাঁবুতে ঢোকেনি তো স্যার? ওঃ। কি সাংঘাতিক ছুটতে পারে স্যার। আমি একদম হার মেনে গেলুম।

মৃদু হাসিয়া প্রফেসার অধিকারী বলিলেন—হারা উচিত হয়নি তোমার শ্যামল। তুমি যার ছেলে—সে কোথাও কখনো হারেনি।

—আমার বাবাকে কি আপনি চেনেন স্যার?

প্রফেসার অধিকারী আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—কিছু কিছু। যাও, স্নান করে খাও

গিয়ে তোমরা। মীনু!

চেয়ারের পিছন হইতে মীনা বাহির হইয়া আসিল। কবরী খুলিয়া গিয়াছে। মুখে খড়ি উড়িতেছে। ক্লান্তিতে সারা শরীর কোমল হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি হাসিতে এবং আনন্দে সারামুখ উদ্ভাসিত। পরণের কাপড় অবিন্যস্ত। সংযত করিতে করিতে বলিল—ভেবেছেন কলকাতার মেয়ে! সাঁতারে কাল হারিয়েছি, আজ দৌড়ে, আসছে কাল...

—ঘোড়দৌড়ে! কেমন?

—না, ঘোড়ায় আমি চড়তে পারিনে,—আসছে কাল ঝগড়ায়।

—আমি আগেই হেরে রইলাম। স্যার সাক্ষী।

—বেশ—তা হলে অন্য কিছু, গাছে চড়ায়।

—ওতেও হেরে যাব, গাছে চড়া আমার অভ্যাস নেই।

—সত্যি নাকি হে শ্যামল? গাছে চড়তে পার না!—প্রফেসার অধিকারী হাসিতে লাগিলেন।

—না স্যার, আমায় এমন লক্ষ্মী ছেলে করে মানুষ করেছেন যে একেবারে 'বাঙালী' হয়ে উঠেছি।

—আচ্ছা, তাহলে স্যারের পা টেপায়।...

প্রফেসার অধিকারী উচ্ছহাস্য করিয়া উঠিলেন।

—তোরা এখন স্নান করে খেয়ে নে দেখি। কাল কিসের পাল্লা দিবি তা আমি ঠিক করে দেব!

চুরুটে অগ্নি সংযোগ করিয়া তিনি উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। মীনা তাকাইয়া দেখিল প্রফেসার অধিকারী অনেকটা পথ চলিয়া গিয়াছেন। সুমিষ্ট স্বরে গান ধরিল,

(গান)

ও গো সুন্দর!
ধরো ধরো ধরো আমায় ধর গো—সুন্দর।
আমি আছি আকাশ ব্যেপে
তাইতো বাতাস উঠেছে কেঁপে গো...
বনের ফুলের গন্ধে আজি তাই সে হলো মন্থর—
ওগো, সুন্দর...
আছি মেঘের কালো চুলে
আছি তোমার—আছি তোর—আছি তোমা..

—আর বুঝি মিলাতে পারছেন না! আমি মিলিয়ে দিচ্ছি।—আছ আমার মন মুকুলে—আছে তোমার চোখের জলে—থাকো জুড়ে অন্তর!

মীনা হাসিয়া বলিল—বাঃ আপনি তো বেশ মিলিয়ে দিতে পারেন?

—অপরেরটা খুব পারি—নিজেরটাই পারছি নে।

চোখ পাকাইয়া মীনা বলিল—চুপ! কথার প্যাঁচ তো বেশ আছে দেখছি! এর মধ্যে শয়তানি শিখেছেন!

বলিয়াই মীনা ক্যাম্পে ঢুকিল, শ্যামল অন্য কাজে চলিয়া গেল। বাতাসে মীনার গলার সুর ভাসিয়া আসিতেছে। মধুর করুণ, হৃদয়গ্রাহী—চিত্তহারী।

সরু রাস্তাটির উপর স্বল্পালোকে দুইজন মনুষ্যমূর্তি দেখা যাইতেছে। ক্রমশ বোঝা গেল উহাদের একজন রামেশ্বর, অপরজন দয়াল।

অন্য দিক হইতে বেদে সম্মুখবর্তী হইল।

—কি কত্তা! এহানে আইছেন? কেমন দেখতিছেন কত্তা?

—হ্যাঁ হে—এসেছি। তোমার মনিব কোথায়? ক্যাম্পেই আছে?

—আজ্ঞে না কত্তা বারাইছেন। কি কাম আমারে বলতি পারেন।

—চমৎকার রিলিফ-ওয়ার্ক করছে তোমার মনিব। আমিও কিছু টাকাকড়ি দিতে চাই, আর যদি—কাজও কিছু করতে পাই—

ও কত্তা, আপনাগোর এমত সুমতি হইছে। আসেন আসেন. শ্যামলবাবু সব ঠিক কইরা দিবার আছেন।

—না—তোমার মনিব আসুন, তাকেই দরকার আমার।

—মীনা মা আছেন। আসেন কত্তা, চা খাইয়া যান, আসেন।

রামেশ্বর দয়ালের দ্রিকে চাহিলেন—দয়ালের সহিত চোখের ইঙ্গিত হইল—পরে বলিলেন—চল—তোমার মনিবের জন্য অপেক্ষা করা যাক্।

সকলে অগ্রসর হইলেন। ক্যাম্পের সামনে ক্যাম্বিসের চেয়ারে বসিলেন রামেশ্বর। দয়াল কিছু দূরে গিয়া একটা গাছতলায় বসিল। রামেশ্বর একাকী বসিয়া কি যেন ভাবিতেছেন। মীনা সুসজ্জিতা হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

রামেশ্বরকে দেখিয়া মীনা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—বাবা—! তুমি কখন এলে বাবা?

—ক'দিনই এসেছি মা, তোকে খুঁজে বার করতে দেরী হলো। রাজীব কোথায়?

—এই তো ছিলেন। কোথায় গেলেন এক্ষুনি। এখনি আসবেন। ওঁর বিস্তর কাজ বাবা। কোথায় কে কতটা কষ্ট পাচ্ছে—তারই খবর করছেন দিনরাত।

মীনার দিকে চাহিয়া রামেশ্বর বলিলেন—এই বন্দীজীবন তোর ভাল লাগছে মা। বেশ তো হেসে খেলে বেড়াচ্ছিস! খুবই আনন্দে আছিস দেখছি!

—বন্দী আমি নেই বাবা—বরং বৃহত্তর জীবনে মুক্তি পেয়েছি। তোমার বিশাল প্রাসাদের প্রাচীরের বাইরে কোনদিন তাকাতে পারিনি ; এখানে এসে দেখলাম, মানুষ কত দুঃখী—কত অসহায়, কি মর্মন্তুদ ব্যথা-বেদনা নিয়ে সে জীবনের পথে হেঁটে চলে। যিনি আমাকে এই জীবনের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছেন, তিনি মানুষ নন—বাবা—দেবতা।—মীনু রাজীবের উদ্দেশে জোড়হস্ত কপালে ঠেকাইয়া বলিল—আমি যখন ইচ্ছে, তোমার কাছে যেতে পারি বাবা, তিনি আমায় সে স্বাধীনতাও দিয়ে রেখেছেন—কিন্তু—

—কিন্তু কি মা—মীনু?

—আসবার ইচ্ছে আমার ছিল না বাবা, দৈবচক্রে এসে পড়েছি। কিন্তু আমার মা'র কথা তুমি কোনদিন আমাকে কিছুই জানাও নি বাবা—আমার জানতে ইচ্ছে করে। শুনলাম, আমার অভাগী মা বহু দুঃখ, পেয়েছেন, বহু নির্যাতনও নাকি সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। সব কথা আমি শুনিনি বাবা—প্রফেসার অধিকারী জানেন—তিনি আমায় বললেন সব...

—থাক মীনু—বুঝেছি, রাজীব তোকে আমার বিরুদ্ধে—

—ছিঃ বাবা! তাঁর সম্বন্ধে এমন অভিযোগ করো না। তিনি তোমার সম্বন্ধে কোন খারাপ কথা আমায় বলেননি! আর আমি অন্যের কথা কেন শুনবো বাবা? আমি আর কারো কথা

বিশ্বাস করি না বাবা। করবো না। তবে আমার মা'র কথা তুমি আমায় সব বলবে বাবা?

—বলবো, কথা খুব বেশী নেই আর। তবু তোকে সবই বলবো, কেমন করে তুই রায় রামেশ্বরের কোঙ্গ-জোড়া ধন হয়ে আছিস। আমি তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি মা, আমার একমাত্র মেয়ে—আমার বংশের শেষ প্রদীপ-শিখা তুই—চল না, বাড়ী চল। এসব কাজ ভালো হতে পারে, কিন্তু তোর নিজের হাতে করবার মতো কাজ নয়—টাকার দরকার—দিচ্ছি আমি।

—প্রফেসার আধিকারীর সামাজিক গর্ব কিছু কম নয় বাবা! ওসব বলে আমাকে আর ভুলাতে পারবে না। এ সব নিজের হাতেই করবার কাজ—তাই তোমার সঙ্গে বাড়ী ফেরার পূর্বে আমি এ কাজ শেষ করতে চাই। এসব কাজের একটা নেশা আছে বাবা। তুমিও যোগ দাওনা, ভাল লাগবে—দেখবে। বাবা কিছু খাও...

একটা বয় খাদ্যাদি লইয়া আসিল। মীনা সারাদিন খায় নাই। তাহার মুখ শুকাইয়া রহিয়াছে। রামেশ্বর দেখিলেন। বলিলেন,

—তুই খা মা, আমি এখন খাব না।

মীনু খাইতে বসিল। রামেশ্বর চাহিয়া আছেন। খাওয়া হইল। অতি সামান্য খাদ্য। রামেশ্বর দেখিলেন মীনু হাত ধুইল।

কিছুক্ষণ পরে প্রবেশ করিলেন রাজীব। খদ্দরের পোষাক ঝলমল করিতেছে অঙ্গে। বলিলেন—শোন রামেশ্বর—আমি সাপের বিষ নিয়ে গবেষণা করি। তুমি সবচেয়ে বিষধর সাপ—তাই তোমার বিষটা সমস্তই আমার লেবরেটারীতে আনবার চেষ্টা করেছি। ঐ আমার মীনু মা! তুমি এসেছ রামেশ্বর—তোমার বিষদাঁত ভেঙে আমি তোমার এই বুড়ো বয়সে মানুষ করবো ভেবেছিলাম—ঈশ্বর সদয়—তা হয়েছে। কিন্তু—মীনু ভেতরে যাও তো মা। রামেশ্বরের সঙ্গে আমার কথা আছে।

মীনু তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। বলিয়া গেল,

—তোমাদের কথা শেষ হলে আমায় ডাকবে বাবা।

—কথা কিছু নাই রাজীব। মীনুকে আমি নিয়ে যেতে চাই।

—শোনো রামেশ্বর! আমার পিতৃত্বকে তুমি দীর্ঘকাল ভোগ করেছ! চিরকালই করতে পারতে, কারণ মীনুকে সত্যি ভালবাস! আমি তাকে তোমার মেয়ে বলেই জগতে পরিচিত করে দিতে পারতাম রামেশ্বর, কিন্তু...

কিন্তু আর কিছু নেই রাজীব—থাকতে পারে না। সারা পৃথিবী জানে রায়বংশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী মীনাক্ষী। রামেশ্বরের একমাত্র কন্যা সে। তার সত্য পরিচয় জানবেন যদি ভগবান কোথাও থাকেন। তার পৃথিবীর পরিচয়—আইন ও আদালতের সাক্ষীপ্রমাণের সকল পরিচয়, সে আমারই মেয়ে এবং সেই পরিচয়ই তার প্রকাশ থাকবে—অন্যথা হবে না। ডাকো মানুকে—মীনু।

—থামো রামেশ্বর—জোর করে কিছু করা তোমার ঠিক হবে না এখানে। এখানে তোমার লাঠিয়াল নাই—বরং আমার ছাত্র-সৈন্যরা আছে। আর আমি জানি—আদালতে তুমি যাবে না...

—আদালতে গেলে তোমাকে জেলে দিতে পারি—জান রাজীব?

—জানি—কিন্তু আদালতে গেলে তোমার বংশের মাথায় তুমিই ঘোল ঢালবে। অতএব

তুমি সেখানে যাবে না। কিন্তু রামেশ্বর আর কি কিছু তোমার শোনাবার নেই? তোমার জীবনের গত দিনের বিস্তৃত বহু ঘটনার কথা?

—না—ওসব কাব্যিপনার আমি ধার ধারি না, মীনুকে ছেড়ে দাও রাজীব। রাজীব যেন কি একটা কথা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন। পরে বলিলেন—না শোন। এতদিন তুমি মীনুর বাবা ছিলে, এখন আমি কিছুদিন তার পিতৃত্ব ভোগ করতে চাই। তাকে আমি পল্লীগ্রামের একটা নিতান্ত সাধারণ মেয়ে করে রাখতে চাইনে। আমি চাই, সে শিক্ষায়, সমাজ-সেবায়, দেশের নানা কাজে এগিয়ে আসবে। সবার পুরোভাগে তার আসন নেবে। তার লৌকিক পরিচয় যাই হোক তার সত্য পরিচয় তো তোমার অজানা নয় রামেশ্বর! তার রক্তে আছে বিপ্লব বহ্নি, তাকে হতে হবে ভারতমাতার যোগ্য সন্তান। তুমি তাকে জমিদার কন্যা করে, পটের-বিবি করে রেখেছ। তা হয় না রামেশ্বর—তা আমি হতে দেব না।

—তা হলে ভালয় ভালয় দেবে না?

—না—

—বেশ। কিন্তু তুমি জেনে রেখো রাজীব, এই পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই—যা আমার বুক থেকে মীনুকে কেড়ে নিতে পারে।

—বেশ—দেখা যাবে! চোরের ওপর বাটপাড়ী করতে চাও রামেশ্বর। কিন্তু শোন—

—শোনবার আর কিছু দরকার নেই রাজীব—চললুম—

ক্রুদ্ধ রামেশ্বর উঠিলেন। রাজীব হাসিতেছেন। হাসিয়া বলিলেন—

—অত চটাচটির কি দরকার রামেশ্বর—মীনু এখন আমার কাছেই থাক—তাকে সমাজ-সেবার কাজ শেখাচ্ছি—যোগ্য পাত্র খুঁজে তার বিয়ে দেব—তখন অবশ্য নিশ্চয় তোমাকে ডাকবো...আসবে তো?

—বিদ্রূপ করছো রাজীব? ভাল—দেখা যাবে—

ক্রুদ্ধ রামেশ্বর মুহূর্তে চলিয়া গেলেন।

রাজীব হাসিতে লাগিলেন! নিজের মনে বলিলেন—তোমার বিষদাঁত আর নেই। রামেশ্বর—এখন তুমি ঢোঁড়া!

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতেছে পদ্মা! শ্যামলের চিঠি আসিয়াছে—তাহারা শীঘ্র ফিরিবে। পদ্মা নিজের মনে বিগত দিনের কথা ভাবিতে লাগিল!

স্বপ্নের মত মনে পড়ে সেই সেই বহু পুরাতন কাহিনী। হ্যাঁ—রূপকথাই তো! 'জমিদার-গৃহিণী হইতে চলিয়াছে গ্রাম্য মেয়ে পদ্মা। সকলেই তার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। আবার মজাও দেখিতেছিল অনেকে। রামেশ্বরকে যাহারা চেনে তাহারা ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখে নাই কিন্তু কাহারও কিছু বলিবার সাধ্য হইল না! দুর্দান্ত জামিদার একটা ভাঙা শিব মন্দিরে পদ্মার হাতের মালা গ্রহণ করিলেন এবং সকলকে জানাইলেন—গন্ধর্ব মতে এই বিবাহ সম্পন্ন হ'ল।

প্রতিবাদ কেহই করে নাই। করিবার সাহসও কাহারও ছিল না। ভুরি ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া সকলেই বাড়ী চলিয়া গেলেন। রহিল পদ্মা ও তাহার বৃদ্ধা মাতা। সুখেই রহিল, কিন্তু ক'দিন? মাত্র বৎসর খানেক। তারপর—

তারপর শোনা গেল, জমিদারের বৃদ্ধ পিতা আপত্তি করিয়াছেন। বলিয়াছেন এইরূপে বিবাহিত বধূকে ঘরে আনা হইবে না—ইহা রক্ষিতার সামিল—বধূ নহে। বড় লোকের ছেলের অমন দু-চারটা থাকে। বংশের কুলবধূ তাহাকে করা যায় না। না—তাহা সম্ভব নহে।

আশ্চর্য! ঐ জমিদার-তনয়—যাহার দাপটে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খায়—তিনি টুঁ শব্দটি করিলেন না। শুধু পদ্মাকে বলিলেন—পেটের ছেলেটাকে ওষুধ খাইয়ে মেরে ফেলো—তারপর চলে যাও দেশান্তরে—ওকে রাখলে বিস্তর বিড়ম্বনা ঘটবে—আজই যাও—

তাই যাব—সেখানে গিয়েই যা হয় করা যাবে—পদ্মা বলিয়াছিল অশ্রুসজল নয়নে।

নিরুপায় পদ্মা ও তাহার মা অতঃপর কি করিয়াছে, কেমন ভাবে সন্তানটিকে বাঁচাইয়াছে—বড় করিয়াছে—ভগবান জানেন ; আর জানেন রাজীব অধিকারী। রাজীবের ঠিকানা জানা ছিল—ঐ জমিদার-পুত্রই জানাইয়াছিল একদিন কথাপ্রসঙ্গে—পদ্মা তাহার মাকে লইয়া তাঁহারই আশ্রয় ভিক্ষা করে। সন্তানটি তখন বৎসর পাঁচের। উদার মহাপ্রাণ রাজীব নির্বিকার চিত্তে তাহার সব ভার গ্রহণ করিয়াছিল। তদবধি শ্যামলের অভিভাবকের সবকিছু কাজ তিনিই করিতেছেন।

পদ্মার হাতের টাকা বহু আগেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। ছেলের ফটোসহ পুনরায় কিছু টাকা দিবার প্রার্থনা জানাইয়া পদ্মা যে পত্র লিখিয়াছিল—তাহার জবাব আসে নাই।

ইহার পর পদ্মা আর কোন খবর দেয় নাই—খবর রাখেও না। কিন্তু রাজীব রাখেন। খুব ভালভাবেই রাখিয়াছেন—রাখিবার বিশেষ হেতু তাঁহার কন্যা মীনু। নতুবা হয়তো এতো বেশী খবর তিনি রাখিতেন না। খবর লইয়া রাজীব জানিয়াছিলেন—পদ্মার কথা রামেশ্বর আর উচ্চারণ করেন না—হয়তো ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ভুলিয়া গেলে তো চলিবে না। যে সন্তান বড় হইয়া উঠিতেছে—শরীরে স্বাস্থ্যে এবং শিক্ষায় যে সন্তান সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপের পর ধাপ ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছে—তাহার একটা পিতৃ-পরিচয় অবশ্যই প্রয়োজন। সমাজে বাস করিতে হইলে যাহা দরকার শ্যামলকেও তাহা পাইতে হইবে! পদ্মা একথা বারম্বার ভাবিয়াছে। কিন্তু রাজীব ইহা ভাবিয়াছেন কি না, জানা নাই পদ্মার। হয়তো তিনি ভাবেন নাই—কারণ শ্যামলকে তিনি পুত্রবৎ দেখিয়া থাকেন এবং অনেকেই জানে শ্যামল তাঁহার পালিত পুত্র শুধু নহে দত্তক পুত্র।

অধ্যাপক অধিকারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মান যথেষ্ট। তদুপরি তিনি উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। তাঁহার পুত্রত্বের গৌরব কম কিছু নহে। কিন্তু সে কথা তো সত্য নয়। শ্যামল কি তাহার পিতৃ-পরিচয় কোনদিন পাইবে না। শ্যামল তো বহুবার এ প্রশ্ন করিয়াছে—'জবালা'র মতই হয়ত তাহার মাকে মনে করিতেছে শ্যামল। না—পদ্মা আর বিলম্ব করিবে না—একবার রামেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে চাহিবে—শ্যামলের পিতৃত্ব তিনি স্বীকার করিবেন কি না। হয়তো তিনি রাজী হইবেন না—এতোদিন পরে মহা সম্মানিত রায়বাহাদুর রামেশ্বর রায় অকস্মাৎ পুত্র কোথায় পাইলেন—স্ব-গ্রামে এ প্রশ্ন জনগণের মনে হওয়া স্বাভাবিক—তথাপি পদ্মা একবার শেষবারের মত প্রশ্ন করিবে রায় রামেশ্বরকে।

শ্যামল কোনদিন রামেশ্বরের বিষয়-সম্পত্তি লইলে গ্রামে যাইবেও না। না—কোন প্রয়োজন নাই। প্রফেসার অধিকারী তাহাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন—তাহাতেই অন্নবস্ত্র সংগ্রহ সে করিতে পারিবে। এখন ভাল দেখিয়া একটি বধূ যোগাড় করিয়া শ্যামলের বিবাহ দিতে হইবে! তাহাও করিবেন ঐ রাজীব অধিকারী। শ্যামলের সব কিছু তিনিই করিয়া থাকেন।

কিন্তু ঐ মেয়েটি—ঐ মীনু—উহার সহিত শ্যামলের বিবাহ দেওয়া যায় না! চমৎকার মেয়ে! কে জানে এতো ভাগ্য তাহার হইবে কি না। হইলে কিন্তু সত্যি ভাল হয়। অমন সুন্দর মেয়ে কমই দেখিয়াছে পদ্মা।

কিন্তু এসব আকাশ-কুসুম—পদ্মার পুত্রের পরিচয় নাই! কোন ভদ্রলোক তাহার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে রাজী হইবেন না। তার চেয়ে আরও বড় কারণ, পদ্মা দরিদ্র। দানে তাহার দিন চলিয়া থাকে। শ্যামল এখনও রোজগার করে নাই। কবে করিবে কে জানে! তবে পড়াশুনায় সে খুবই ভাল, আর চেহারাও খুব সুন্দর। এইসব কারণে অনেক বড়লোকের নজর আছে তাহার দিকে।

কিন্তু পদ্মা যেন মনে একটি বিশেষ আশা পোষণ করিতেছে। সেটি অন্য কিছু নহে—মীনুকে পুত্রবধূরূপে লাভ করা। কিন্তু মীনু সত্যই কাহার কন্যা—কি তাহার সত্য পরিচয়? কিছুই জানা নাই পদ্মার। অবশ্য রাজীব অধিকারী নিশ্চয় জানেন—কিন্তু তিনি কি মীনুর বাবাকে রাজী করাইতে পারিবেন পিতৃপরিচয় হীন এক পাত্রের সহিত কন্যার সহিত বিবাহ দিতে? কে জানে। উহারা ফিরিলে পদ্মা জিজ্ঞাসা করিবে।

পত্র তো আসিয়াছে—শীঘ্রই আসিবেন রাজীব। কিন্তু যতক্ষণ না ফেরেন পদ্মা নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারে না। সেদিনের চোরের ব্যাপারটার রহস্য যেন বুঝিয়া ফেলিয়াছে সে। উহা যে রামেশ্বরের কীর্তি তাহাতে পদ্মার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ চুরি করিবার মত কিছুই নাই তাহার ঘরে যে চোর আসিবে। রামেশ্বর নিশ্চয় জানিয়াছেন পদ্মা এখনো বাঁচিয়া আছে এবং এখানেই আছে। তাই পদ্মাকে ইহধাম হইতে বিদায় করিবার জন্য রামেশ্বর লোক নিযুক্ত করিয়াছেন!

পদ্মা কোনদিন যদি আদালতে যায়—এই তাঁহার আশঙ্কা—কিম্বা পদ্মা যদি তাহার পুত্র শ্যামলকে লইয়া রামেশ্বরের স্বামীত্ব দাবী করে এবং শ্যামলকে পুত্র বলিয়া প্রচার করে তবে রায় রামেশ্বরের সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে—এই আশঙ্কাও কম নহে।

কিন্তু পদ্মা যতদূর জানে—রামেশ্বর বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পত্নী সর্পাঘাতে মারা যায়, তাহার একটি কন্যা ছিল। রামেশ্বর আর দার পরিগ্রহ করেন নাই। কে জানে করিয়াছেন কি না—পদ্মা কোন খবর রাখে না।

কিন্তু আজ খবরের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে পদ্মার। যদি রামেশ্বর শ্যামলকে পুত্র বলিয়া স্বীকার না করেন তবে কি হইবে! কোন পরিচয়ে শ্যামল জনসাধারণে পরিচিত হইবে।

চিন্তাটা অগাধ হইয়া উঠিল পদ্মার। কিন্তু সে সমস্ত দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিল—শ্যামল এতকাল যে ভাবে পরিচিত হইয়াছে, প্রফেসার রাজীব অধিকারীর পুত্র বা পালিত পুত্ররূপে—তাহাই থাকিবে। ইহার জন্য চিন্তার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই।

অবশ্য একবার শেষবারের মত পদ্মা রামেশ্বরকে প্রশ্ন করিবে—পুত্রকে স্বীকার করিতে

তিনি সম্মত কি না—যদি তিনি সম্মত না হন—হইবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না—তবে পদ্মা আর সে চেষ্টা করিবে না। শ্যামল প্রফেসার অধিকারীর পালিত পুত্ররূপেই আত্মপরিচয় দান করিবে...শ্যামল অবশ্য সবই জানিবে। তাহাকে সবই জানাইবে পদ্মা কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও জানাইবেন—শ্যামল যেন তাহার পর কোনদিন আর রামেশ্বরের পিতৃত্ব কামনা করিতে না যায়।

বাহিরে কে যেন ডাকিতেছে! পদ্মা দরজা খুলিয়া দেখিল—মীনু ও শ্যামল।

শ্যামল ও মীনু চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে—মা—মাগো—মা, দরজা খোল—আমরা এসেছি।

তাড়াতাড়ি প্রদীপ রাখিয়া মা দরজা খুলিয়া দিল। মীনু আগেই আসিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। শ্যামল পশ্চাতে।

—মা—আমরা ফিরে এলাম, মা—মা—মা!

—চুপ—আমার মায়ের উপর ভাগ বসাতে এসেছে—দেখো মা।

—খুব করবো—ভাগ বসাবো। মা—ওমা—মাগো—মা—ওমা—

—ভালো হচ্ছে না কিন্তু—আমি কাকে মা বলবো তা হলে!

পদ্মা হাসিয়া বলিল—দেশমাতাকে মা বলবি—খোকন এখন থেকে দেশমাতৃকাকে তুই মা বলিস, আর আমি মীনুর মা হয়েই থাকবো।

—আশ্চর্য করলে মা, তুমি ' ভয় করছে না তোমার? তুমি এই ক'দিনে এতখানি সাহস কি ক'রে পেলে মা?

—সাহস আমার চিরদিনই দুর্জয় খোকা এতকাল তার প্রকাশ ছিল না ; তুই বড়ো হয়েছিস—আমার দায়িত্ব থেকে এবার আমি মুক্ত হতে চাই। আয়...ঘরে আয় বাবা!

মীনুকে সস্নেহে টানিয়া একটা কক্ষে লইয়া গেল পদ্মা। শ্যামল অন্য কক্ষে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিতে গেল। শূন্য উঠানে দীপশিখা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন প্রফেসার অধিকারী। দুইজন মুটে ব্যাগ, সুটকেস ও বেডিং রাখিয়া গেল। প্রফেসার অধিকারী উঠানের এককোণে রাখা একটা মোড়ায় বসিয়া একটা চুরুট ধরাইলেন। পকেট হইতে একটা নোট-বুক বাহির করিয়া কি কয়েকটা লিখিলেন। তারপর ডাকিলেন—

—শ্যামল!

শ্যামলের মা বাহির হইয়া নমস্কার করিল।

বলিল—ওরা দু'জনেই স্নান করছে! কাপড় ছাড়া হলে কিছু খেতে দেব। আপনি স্নান করে কাপড় ছাড়ুন কিছু খেয়ে নেবেন।

প্রফেসার অধিকারী বলিলেন,—না—না—কিছু দরকার হবে না। আমি বরং ঘণ্টা দুই পরে এসে মীনুকে নিয়ে যাবো। ওরা থাক—খাওয়া-দাওয়া করুক।

—বাড়িতে তো আর আপনার জন্যে কেউ রেঁধে রাখেনি!

—তা হোক—চাকর-বাকর আছে। অন্য একটা কথা বলতে আপনার কাছে এসেছিলাম।

—বলুন!

—শ্যামল বোধ হয় তার বাবার নাম জানতে চাইবে. বলবেন না আপনি—ওতে বিপদ আছে।

—জানতে চেয়েছিলো—আমি বলিনি সেদিন, কিন্তু আবার যদি জিজ্ঞেস করে—

—না, কোন রকমেই বলবেন না। আমি চললুম।

—আমার ইচ্ছে, আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করি—

—রামেশ্বরের সঙ্গে?—তা মন্দ কথা নয়—তাই করুন। তবে ফল কতটা হবে কে জানে।

প্রফেসার চলিয়া গেলেন।

—ও খোকা—আয় বাবা, খাবি।

শ্যামল নিকটে আসিয়া বলিল,

—প্রফেসার অধিকারীর সঙ্গে তুমি চক্রান্ত করেছ মা! আচ্ছা মা, যা গোপন আছে—তা গোপনই থাক। আমি শুনতে চাই না।

—চুপ কর খোকা, মীনু রয়েছে। সব কথাই তোকে যথাসময়ে বলে যাবো। তোর মা এমন কিছুই পাপ বা অকর্ম করেনি, যা শুনে তোর লজ্জার কারণ ঘটবে। এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমি তোকে বুকে নিয়ে তোর বাবার আসার আশায় বসে আছি। আমার এই একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের শ্রেষ্ঠ ধন তুই—এই গর্ব যেন তোকে পৃথিবীর বুকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে শক্তি দেয়!

—সে শক্তি আমি পেয়েছি মা—তোমার অমোঘ আশিস ফলেছে আমার জীবনে। আমি দানব পিতার সন্তান, তবু আমি মানুষ হবো—ধ্রুব যেমন অসুরকুলে জন্মেও তার ধ্রুবকে হারায়নি। কিন্তু তাকে আমি সঠিকভাবে জানতে চাইছিলুম মা।

—আরো কিছুদিন যাক বাবা।

—আচ্ছা মা—যাক্! যদি কোন দিন জানতে পারি কে সেই শয়তান পিতা, যে আমার চিরদুঃখিনী মাকে এমন করে চোখের জলে ভাসিয়েছে—

—না খোকন! চোখের জল ফেলিনি আমি। তোকে পেয়ে সব দুঃখ ভুলে আছি বাবা! তুই আমার মাতৃত্বের বিজয়-বৈজয়ন্তী, দেশমাতার হাতে তোকে দিতে পারবো—সেই আমার নারীজন্মের সার্থকতা!

কাপড় ছাড়িয়া মীনা আসিয়া দাঁড়াইল।

—চল মা—খাবি চল।

মা তাহাদিগকে খাইতে দিল।

রামেশ্বর মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। তাঁহার মনে নানা দুর্ভাবনা জাগিতেছিল। কানাই ওখানে কি কতদূর করিল, তাহা জানা দরকার। রামেশ্বর আর কাহাকেও হত্যা করার ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু কানাই নিশ্চয় তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে।

সকালে পৌঁছিয়াই রামেশ্বর নিভৃত কক্ষে কানাইকে ডাকিলেন। প্রভুর আদেশ পালন করিতে অক্ষম হওয়ার জন্য কানাইয়ের চিন্তার অবধি ছিল না। সে ভীত হইয়া ভাবিতেছিল—রামেশ্বর হয়তো তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিবেন—হয়তো চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবেন—কিম্বা কয়েক ঘা স্বহস্তে-জুতা মারিবেন। তাই অতিশয় শঙ্কিত চিত্তে কানাই আসিয়া দাঁড়াইল। রামেশ্বর চুরুটটা মুখ হইতে না সরাইয়াই প্রশ্ন করিলেন—ও

কাজটার কতদূর?

—ও কাজটা এখনও শেষ হয়নি হুজুর—ওটা বস্তি হলেও খুব লোকজন ওখানে। আর উনি—মানে ঐ মেয়েটি অত্যন্ত সজাগ-সতর্ক—

—হয়নি তাহলে?

—এজ্ঞে না হুজুর—

—আচ্ছা—যা—আর দরকার নেই। ওটা আর করতে হবে না।

কানাই তাহার চাকুরী জীবনে এমন আর দেখে নাই। রায় রামেশ্বরের আদেশ পালিত হয় নাই—তবুও অপরাধীকে তিনি কিছুই বলিলেন না—ইহা কানাই-এর চাকুরীজীবনে এই প্রথম। সে যেন বাঁচিয়া গেল—এমনি তাহার অবস্থা—কানাই চলিয়া আসিতেছিল। রামেশ্বর ডাকিলেন—শোন—

কানাই দাঁড়াইল। রামেশ্বর বলিলেন—ওদিকে আর যাবি না—বুঝলি?

—যে আজ্ঞে হুজুর।

—এখন আর একটা কাজ করতে হবে—দয়ালকে ডাক।

কানাই তৎক্ষণাৎ দয়ালকে ডাকিয়া আনিল। রামেশ্বর তাহাকে বলিলেন—শোন দয়াল—শীঘ্রই আমি দেশে যাব। তোমরা আগে, আজই চলে যাও—সেখানে তোমাদের একটা কাজ করতে হবে।

—আদেশ করুন।

—রাজীব হয় তো এখনো মেদিনীপুরেই আছে। আরো অন্তত তিন-চার দিন থাকবে। তারা না ফেরা পর্যন্ত আমাকে এখানেই থাকতে হবে। মীনুকে নিয়েই আমি ফিরতে চাই। নইলে দেশে গিয়ে কি কৈফিয়ত দেশের লোকদের দেবো।

—সেকথা নিশ্চয় সত্য হুজুর।

—আমি কোনদিন কারো কাছে হার স্বীকার করিনি দয়াল। তোমরা জান—ঐ রাজীব আমাকে হারিয়ে দেবে—এ হতে পারে না। যেমন করে হোক মীনুকে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। আদালত নয়—আইন নয়—গায়ের জোরও ওখানে ঠিক কাজ করছে না—

তা হলে হুজুর কি করা যায়? দয়াল প্রশ্নটা করিয়াই রামেশ্বরের মুখপানে তাকাইল।

—তোমাদের আর এখানে কিছু করতে হবে না—বাড়ী যাও। দেশে গিয়ে বলবে—আমি মীনুর বিয়ের চেষ্টা করছি। ভাল পাত্র যোগাড়ের জন্যই তাকে কলকাতায় এনেছি! এখানকার বড়লোকেরা দেশে-গ্রামে গিয়ে মেয়ে দেখতে চান না—তাই কলকাতায় মীনুকে আনা হয়েছে। বুঝলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ—হুজুর। এ তো সোজা কথা! কিন্তু হুজুর...

—কি বলো!

—ঐ রাজীব যদি মীনুকে না দেন তো একা আপনি কি করবেন এখানে?

—আমার মেয়ে—দেবে না কি?—না-না-না, সেরকম কোন মতলব নেই রাজীবের। রাজীব তাকে চুরি করেছে কেন তা বোঝা গেছে। মীনু আমার এক মাত্র কন্যা। আমার সম্পত্তির আয় কয়েক লক্ষ টাকা—মীনুই তার মালিক। রাজীব চায় মীনুকে হাত করার পর নির্বাচিত কারো সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমার সর্বস্ব অধিকার করে নিতে। সে সবই রাজীব ঐ দান-খয়রাতে খরচ করবে। বুঝলে, রাজীব মহান হতে চায়—মহামানব হতে চায়।

নিজের টাকা তো সব দিচ্ছেই—এখন আমারটাও অধিকার করতে চায়।

—তা হতে পারে হুজুর—কিন্তু আমাদের দিদিমণি তো খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে—

—হ্যাঁ—তাতে কি! রাজীব তাকে বুঝিয়েছে—ঐসব নোংরা কাজই পৃথিবীতে নিদারুণ ভাল কাজ—অবতার হবার কাজ! কিন্তু শোন দয়াল, আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না—মীনুর বিয়ে হবে কোনো এক রাজকুমারের সঙ্গে!

—সে তো নিশ্চয় হুজুর!

—হ্যাঁ—তোমরা যাও—আজই সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ী চলে যাও তোমরা।

—যে আজ্ঞে—

দয়াল ও কানাই চলিয়া গেল। কিন্তু রামেশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন—দয়াল ও কানাইকে যেকথা তিনি এখনই বলিলেন তাহার বর্ণমাত্রও সত্য নহে। রাজীব কেন মীনুকে আনিয়াছে—তাহা রামেশ্বর ভালরূপেই জানেন। কিন্তু সেই সব সত্য কথা বাইরে প্রকাশ করা অসম্ভব। মীনু তাঁহার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে জন্মিয়াছে এই সত্য তাঁহার জমিদারীর সকলেরই জানা। অতএব মীনু যে তাঁহারই কন্যা—ইহা সর্বলোক বিদিত।

রাজীব আজ তাঁহাকে দাবী করিতে চাহে—যদি করে তবে রামেশ্বরের কাছে একটি মাত্র দরজা খোলা থাকিবে—আত্মহত্যা। কারণ, এতকাল পরে নিজে জীবনের সেই গ্লানিকর অধ্যায়কে প্রকাশ করার ব্যথা সহ্য করিতে পারিবেন না তিনি!

তা ছাড়া মীনুকেই তিনি ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন? অসম্ভব। মীনু তাঁহার কেহ না হইয়াও যে সব। মীনু যে তাহার বুক জোড়া ধন—চোখ-জোড়া আলো!

রায় রামেশ্বরের চোখে জল আসিতেছে নাকি! হ্যাঁ—জলই। মনে পড়িল ছোরা হাতে রামেশ্বর গিয়াছিলেন মীনুকে হত্যা করিতে। মীনু তারস্বরে ঘোষণা করিল—"আমার বাবা রায়বাহাদুর রামেশ্বর রায়। আমার বাবা—আমার বাবা রায় রামেশ্বর..."

ওঃ! রায় রামেশ্বর নিজেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'আমার বাবা—আমার বাবা...' যেন মীনুর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি করিতেছেন। আত্মসংবরণ করিতে সময় লাগিল তাঁহার। আপন মনে বলিলেন—হ্যাঁ মা—হ্যাঁ—রায় রামেশ্বরই তোর বাবা! বাবা কি শুধু জন্ম দিলেই হয়? না—বাবা হওয়ার জন্য অনেক কিছু লাগে। বুকের রক্ত লাগে, চোখের জল লাগে, সুদূরূহ আত্মত্যাগ লাগে...

রায় রামেশ্বরের মনে পড়িতেছে—অসুস্থ মীনুর জন্য ডাক্তার রক্ত দিবার কথা বলিলেন। রায় রামেশ্বর রক্ত কিনিলেন না—নিজের ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন তিনি—হ্যাঁ—রায় বংশের রক্ত—রায় রামেশ্বরের রক্ত—আছে ঐ মীনুর শরীরে—আছে—আছে!

উল্লাসে লাফাইয়া উঠিলেন রায় রামেশ্বর। আপন মনে বলিতে লাগিলেন—মীনু আমার মেয়ে—আত্মজা কন্যা। কার সাধ্য তাকে ছিনিয়ে নেয়?—রাজীব কি তার করেছে—কী করেছে রাজীব তার? কোনদিন কোন খবরও কি রেখেছে! তার প্রতিপালন, তার শিক্ষা-সহবৎ—তার আচার-আভিজাত্য—কি আর দেখেছে রাজীব? আজ এসেছে দাবী করতে। করলেই হলো। বাবা হওয়া অত সোজা কিনা!

নাঃ—এভাবে পারিবেন না রায় রামেশ্বর বাঁচিতে। মদের বোতলটা বাহির করিলেন—ছিপি খুলিলেন—পান করিবেন। মীনু এটা পছন্দ করে না। মদ খাওয়া সে

কোনদিন ভাল চোখে দেখে নাই। নাঃ—মদ আর খাইবেন না রায় রামেশ্বর। বোতলটা জানালা দিয়া ফেলিয়া দিলেন।

মীনু বড় হইয়াছে। বিবাহ দিতে হবে। এখানেই কোন একটি ভাল ছেলে দেখিয়া মীনুর বিবাহ দিয়া মেয়ে-জামাই লইয়া রামেশ্বর দেশে যাইবেন। তাহা করিতে পারিলেই মীনুকে চুরি করিয়া আনার কলঙ্ক ঢাকা পড়িয়া যাইবে। দেশে গিয়া ভাল রকম ভোজ খাওয়াইয়া দিবেন সকলকে। ভাল যাত্রা শুনাইয়া দিবেন গ্রামবাসীদের—এবং কবিগানও। মীনু কবিগান ভালবাসে। হ্যাঁ—কবিগান তাহার বিবাহে অবশ্যই করাইতে হইবে। রাজীবকে কথাটা বলা দরকার। হ্যাঁ—রাজীবের হাতে অনেক ভাল ছেলে আছে।

কিন্তু রাজীব মীনুকে দিবে না বলিয়াছে। রাজীব মীনুকে দিয়া সমাজ-সেবা করাইবে। দেশের কাজ করাইবে—হয় তো রেডক্রশে যোগদান করিবার ব্যবস্থা করিবে। কে জানে কি করিতে চায় রাজীব তাহাকে লইয়া। কিন্তু রামেশ্বরের যে আর কেহ থাকিবে না—কিছুই থাকিবে না—না-না—মীনুকে যেমন করিয়াই হোক বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে।

বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল—একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছে হুজুর।

কে আবার আসিল! রামেশ্বর তো কলকাতার আসিয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন! কাহাকেও জানান নাই যে তিনি এখানে আসিয়াছেন। কলিকাতায় বহু বন্ধু এবং বহু পরিচিত তাঁহার—কিন্তু তাঁহারা কেহই রামেশ্বরের এখানে আগমনবার্তা জানেন না। কে আসিল তবে?

—ডাক—আসতে বল।

অল্পক্ষণ পরে যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি রামেশ্বরের বিশেষ পরিচিত বন্ধু—ডাক্তার সোমনাথ চৌধুরী। রামেশ্বর ব্যস্তভাবে বলিলেন—

—আরে, তুমি! এসো...এসো...এসো—কেমন আছ সব?

—ভালই! কিন্তু তুমি হঠাৎ কলকাতায় কেন? মীনু কি বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছে নাকি?

—না। বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেছে তার। এবার বিয়ে দিতে হবে।

—খুব ভাল কথা! তা কোথায় সে? এনেছ এখানে?

—হ্যাঁ। তবে গেছে একটু বেড়াতে! আমার বন্ধু রাজীব—চেন তো?

প্রফেসার রাজীব অধিকারী? হ্যাঁ—ওকে কে না চেনে। সাপের বিষেয় ওষুধ বার করলো—আবার ঐ বিষ নিয়ে কি সব জটিল রোগের ভাল ভাল ওষুধ বার করেছে। ও তো সর্বজন-পরিচিত। কিন্তু প্রফেসার রাজীব তো শুনেছি চিরকুমার! কে কে আছে তাঁর বাড়ীতে?

চিরকুমার ঠিক নয়। আছে কেউ, অন্ততঃ ছিল—ওসব যুবা বয়সের ভালবাসার ব্যাপার। যাক্—রাজীব মীনুকে মেয়ের মত ভালবাসে! সে গেছে মেদিনীপুর বন্যাত্রাণ করতে। তার আরো সব ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে মীনুকেও নিয়ে গেছে। দু'তিন দিন পরে ফিরবে ওরা...

—বেশ! বস! আমি রুগী দেখে ফিরছিলাম—দেখি তোমার দরজায় 'রায় রামেশ্বর ইন্' লেখা। দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম—তুমি এসেছ। ভাবলাম দেখাটা করে যাই। অনেক দিন দেখা হয়নি।

—খুব ভাল করছ। আর কি খবর বলো।

—খবর তো আপাতত ভালই। ছেলেটা আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া থেকে ডাক্তারী

ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছে মাস দুই হোল। প্র্যাক্‌টিশও এরই মধ্যে জমিয়ে ফেলেছে। এখন তাঁর মা'র ইচ্ছে বিয়ে দেওয়ার...

--বেশ তো—ভাল একটি মেয়ে দেখো...

--মেয়েও দেখা আছে আমার, চমৎকার মেয়ে—এখন মেয়েপক্ষের মত হলেই হয়!

—মত না হবার কোন কারণ নেই। তুমি ভাল, তোমার ছেলে ভাল, অমতের আশঙ্কা করছো কেন?

—শোন তা হলে! জমিদারী আজ না থাকলেও তুমি পুরোনো জমিদার বাক্তি। তাই সঙ্কোচ হচ্ছে বলতে—বলি তা হলে কথাটা!

রামেশ্বর কি যেন ভাবিলেন। কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া বলিলেন—বল—সঙ্কোচ কেন?

—মেয়ে আমাদের পছন্দই আছে। তোমারই মেয়ে মীনু!

রামেশ্বর ডাঃ সোমনাথের পানে তাকাইলেন এবং বেশ কয়েক সেকেন্ড তাকাইয়াই রহিলেন! কি বলিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না।

—আশা করি তোমার অমত হবে না রামেশ্বর।

—না। আমার অমতের কারণ কিছুই নাই। কিন্তু সোমনাথ, মীনু আমার মা-মরা মেয়ে। তাকে চোখের আড়াল করতেও পারিনে আমি। তার বিয়ের কথা ভাবতে পেলেই মনে হয় সব আমার অন্ধকার হয়ে যাবে।

—সেকি রামেশ্বর! একটু আগেই বলেছিলে মীনুর বিয়ে দিতে হবে।

—হ্যাঁ! বিয়ে তার দিতে হবে সোমনাথ! দিতেই হবে—কিন্তু...

--কি বলো!

রামেশ্বর কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। ইতিমধ্যে চা-খাবার আসিল। রামেশ্বরে উত্তর দিতেছেন না। ডাঃ সোমনাথ কিছুটা আশ্চর্য কিছুটা বিরক্ত ভাবে বলিলেন—তোমার অসুবিধেটা কোথায়?

—শোন সোমনাথ। তোমার ঘরে মেয়ে দেওয়া আনন্দের এবং গৌরবের কথা। কিন্তু কি জান। আজকালকার বড় বড় ছেলেমেয়ে! তাদের মত না নিয়ে কিছু করা যায় না। মীনু ফিরে আসুক, তার মত নিয়ে তবে আমি এগুবো।

—বেশ! বেশ! এ খুব ভাল কথা। কিন্তু আমার মতলব শোন। মীনু ফিরলে ওকে নিয়ে একদিন বিকালে এসে আমার বাড়ী! ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার ছেলেকে দেখে অপছন্দ করবে এমন মেয়ে তো দেখিনি।

পুত্র-গর্বে ডাঃ সোমনাথের মুখ জ্যোতির্ময় দেখাইতেছে।

রামেশ্বর অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। কি বলিবেন তিনি! অনেকক্ষণ চিন্তা করিবার সময় নাই। ডাঃ সোমনাথ তাঁহার বিশেষ পরিচিত এবং আরো বড় কথা—মীনুর অসুখের সময় এই সোমনাথই চিকিৎসা করিয়া মীনুকে ভাল করিয়াছিলেন। তখন হইতেই মীনুকে পুত্রবধূ করিবার ইচ্ছা ডাঃ সোমনাথের। কিন্তু আজ মীনু তো রাজীবের কন্যা হইয়া গিয়াছে। অবশ্য রাজীব মীনুর বিবাহ নিশ্চয় দিবে কিন্তু তাহাতে রামেশ্বরের কি! রামেশ্বর সেখানে কেহই হইবে না। রামেশ্বরের বিপুল বিত্ত কে ভোগ করিবে কে জানে! রাজীবের শেষ বিদ্রূপটা মনে পড়িল। "আসবে তো?" উঃ, রায়বাহাদুর রামেশ্বরকে কী কঠোর বিদ্রূপ করিয়াছে

রাজীব! ইহার প্রতিশোধ অবশ্যই লইতে হইবে। মীনুকে চুরি করিয়া অথবা অন্য কোনো রকমে হউক রামেশ্বর লইয়া যাইবেন—কিন্তু এটা সহর কলিকাতা—এখানে রাজীবের অগাধ প্রতিপত্তি...

—কথা বলছো না কেন রামেশ্বর? তোমার কি অমত আছে।

—না। অমতের কোন কথাই নাই সোমনাথ। তবে কি জান। আজকালকার বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ে ; দেখাশোনা এবং আরও কিছুটা এগিয়ে যাবার পর যদি কোন কারণে বিয়ে না হয় তো বিপদ ঘটে! যাই-হোক মীনু ফিরে আসুক—দেখি আমি কি করতে পারি।

—বেশ, তাই করবে। খবরটা কবে নাগাদ জানতে পারবো আমি?

—ওরা খুব সম্ভব দিন চার-পাঁচ পরে ফিরবে। তোমাকে ফোন্ করে জানাব।

—আচ্ছা। আমাদের বিশেষ ইচ্ছা মীনুকেই পুত্রবধু করে আনবো বাড়ীতে! এখন তোমার আর তোমার মেয়ের মত...

—তোমার ছেলের মতামত? সে আবার বিগড়াবে না তো!

—সে সব ঠিক আছে। আমার ছেলে ওবিষয়ে প্রাচীনপন্থী। বাপমার উপর সে কোন কথা বলবে না। অবশ্য সে জানে আমরা তার জন্য যোগ্যতমাকেই নির্বাচন করছি।

রামেশ্বর চুপ করিয়া রহিলেন। ডাঃ সোমনাথ সিগারেটটা এ্যাস্ট্রেতে ফেলিয়া দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন,

—তা হলে ঐ ঠিক রইল—কেমন!

—হ্যাঁ—ঐ ঠিক রইল।

ডাঃ সোমনাথ চলিয়া গেলেন। বসিয়া রহিলেন রামেশ্বর রায়। বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছেন তিনি :

সারা পৃথিবী জানে—অতুল সম্পদেব অধিকারী রায় রামেশ্বরের একমাত্র কন্যা মীনাক্ষী। পরমাসুন্দরী সর্বগুণালঙ্কৃতা কন্যা সে—তাহাকে যে বিবাহ করিবে—সে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইবে। ডাঃ সোমনাথ ইহা ভালরূপেই অবগত আছেন। গরীবের ছেলে সোমনাথ ডাক্তারী পাশ করিয়া কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে চাকুরী করিয়া ও প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করিয়া বাড়ী একখানা করিয়াছেন এবং ছেলেটিকেও ডাক্তার করিয়াছেন—কিন্তু আর কি: ডাঃ সোমনাথ মীনুকে পুত্রবধূ করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন—বাংলাদেশে এ ব্যাপার একান্ত বিরল! মীনু তাঁহার এমন অপরূপ কন্যা যে...কিন্তু থামিলেন রামেশ্বর। মীনু, আর তাঁহার কন্যা নহে—না—কেহই নহে মীনু তাঁহার! ওঃ—রামেশ্বর কাঁদিয়া উঠিলেন যেন...মীনু তাঁহার কেহ নহে—এ চিন্তা কিরূপে করিতেছেন রামেশ্বর! মীনু যে তাঁর চক্ষের মণি—বক্ষের শোণিত—অন্তরের অন্তঃস্থলের ললিত-লাবণ্য!

মীনুকে ছাড়িয়া রামেশ্বর বাঁচিবেন কিরূপে! না—মীনুকে তিনি কিছুতেই ছাড়িয়া দিবেন না। প্রয়োজন হইলে রাজীবের পায়ে ধরিয়াও তিনি মীনুকে গৃহে লইয়া যাইবেন—মীনুর পিতারূপে তাঁহার পরিচয় চিরদিন বহাল থাকিবে—ইহা করিতেই হইবে। রাজীব উদার—রাজীব মহান—নিশ্চয় রাজীব মীনুকে ছাড়িয়া দিবে রামেশ্বরের নিকট! রাজীবের বিস্তর আছে ছাত্র-ছাত্রী—আছে বিদ্যা-বুদ্ধি গবেষণা—আছে নাম যশ -কিন্তু রামেশ্বরের কি আছে! একমাত্র সম্বল ঐ মীনু।

কে যেন আসিতেছে! রামেশ্বর ত্বরিতে চোখ মুছিয়া লইলেন।

—কে? কে? কে?—কে ওখানে?

রামেশ্বর আবার ভূত দেখিতেছেন নাকি? না—ভূত নয়। নিশ্চয় কেহ আসিয়াছেন। রামেশ্বর পুনর্বার চীৎকার করিলেন—কে—? দয়াল!

একজন অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। বিস্মিত রামেশ্বর চাহিয়া রহিলেন। যেন চিনিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু চিনিতে পারিতেছেন না।

স্ত্রীলোক বলিল—দয়াল বাইরে গেছে।

রামেশ্বর তাহার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন—কে তুমি—তুমি কে?

—আমি? আমি কে চিনতে পারো না? অনেক দিন পরে এসেছি, তবু চিনতে পারবে—দেখো!

স্ত্রীলোকটি অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। রামেশ্বর চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন,

—পদ্মা! কোথায় ছিলে তুমি এতদিন?

—জাহান্নামে—যেখানে তুমি যেতে বলেছিলে?

—বেশ, সেইখানেই যাও—আমার কাছে কেন?

—দরকার আছে—আমার মত অনেক মেয়েকে পথে বসিয়েছ তুমি, জান। ও শরীরে অনুতাপের আগুন কোন দিন জ্বলবে না—তাও জানি। তাই জানতে এসেছি, হে আমার প্রাণেশ্বর—তোমার কাছে কৃপা ভিক্ষা করতে কোনদিন আসবো না। প্রিয়তম আমার! মনে আছে কি, আমার গর্ভে তোমার সন্তান ছিলো?

এই কঠোর বিদ্রূপবাণ সহ্য করিতে সময় লাগিতেছে। রামেশ্বর একটু থামিয়া শুধাইলেন,

—হ্যাঁ—কোথা সে? সে কি বেঁচে আছে?—যেন অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছে রামেশ্বর।

—আছে—এই পৃথিবীর এক অন্ধ গহ্বরে আছে। পরিচয়হীন পথের কাঙাল হয়ে—

—পরিচয়! পরিচয় কি দেবে তুমি তার?

—সেইটুকুই জানতে এসেছি। আজ সে বড় হয়েছে। তার পিতৃপরিচয় জানতে চায়—জানতে চায় তার ভীরু কাপুরুষ পিতা কে?

—গালমন্দ দিয়ে কিছু লাভ নেই পদ্মা, তার পিতৃপরিচয় পৃথিবীতে অজ্ঞাতেই থাকতে দাও। তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে এই বিড়ম্বনায় ফেলেছ তুমি।

—ঠিক—নিজের ছেলেকে যে নিজের বলে পরিচয় দিতে ভয় পায়, তার পিতৃত্বও যেন আমার ছেলে কামনা না করে। কিন্তু জেনে রেখো, তাকে গ্রহণ করলে তোমার মুখ, তোমার বংশের মুখ উজ্জ্বল হতো। কিন্তু থাক—চললাম!

পদ্মা অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

রামেশ্বর দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কি যেন একটা ঘাটিয়া গেল তাঁহার অন্তরে—কে যেন একটা না-ছোঁয়া তারে ঝঙ্কার তুলিয়া দিয়া গেল। খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া আপন মনে রামেশ্বর বলিলেন—রায়বংশের একজন আছে তাহলে! কিন্তু রায়বংশের সে কেউ হতে পারবে না। আশ্চর্য দৈববিড়ম্বনা! পদ্মা—পদ্মা!

কানাই আসিয়া দাঁড়াইল।

রামেশ্বর বলিলেন—একটি মেয়ে এসেছিল—ডাক তাকে।

—তিনি চলে গেছেন হুজুর।

—এর মধ্যে চলে গেছেন! দেখ—দেখ বাইরে।

কানাই দ্রুত চলিয়া গেল।

রামেশ্বর আপন মনে চিন্তা করিতেছেন, রাজীব যদি এতকাল পরে আমার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাতা কন্যাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিতে পারে—তা হলে আমিই বা কেন পদ্মার ছেলেকে...কিন্তু রাজীব থাকে কলকাতায়—এখানে কে কার খবর রাখে। আমাকে গ্রামে ফিরে যেতে হবে—না—এ অসম্ভব। কানাই!

কানাই প্রবেশ করিল। রামেশ্বর বলিলেন—গাড়ী বের করতে বল—বেরুবো।

রামেশ্বর পিরাণ লইয়া পরিতেছেন! কিন্তু কোথায় বাহির হইবেন তিনি? কোনো নির্দিষ্ট স্থান তো নাই। কোথাও কোন কাজও নাই তাঁহার, কাজ যাহা আছে একটি মাত্র। মীনুকে ফিরাইয়া আনা। তাহারই জন্য হয়তো কোথাও যাইবেন—কিন্তু কোথায়?

অকস্মাৎ রাজীব প্রবেশ করিলেন।

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রামেশ্বর বলিলেন—রাজীব? আমার বাড়ীতে?

হ্যাঁ! আশ্চর্য হচ্ছো রামেশ্বর! কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় আছে। তুমি আজও অপরাজেয়।

—বিদ্রূপ করছো রাজীব?

—না বন্ধু! সত্যিই তুমি ভাগ্যবান। তুমি চিরদিনই অপরাজেয় রইলে। ভদ্রা তোমায় ভালোবাসেনি, কিন্তু তার মেয়ে ভালবেসেছে, ভালবেসেছে বিশেষ এক জনকে। চলো—দেখবে চলো।

—মীনু ভালবেসেছে? বেশ! কি আর দেখবো? কে আমি তার! আমার বিরুদ্ধে তো তুমি তাকে—

উস্কে দিয়েছি। তুমি তার মা'র হত্যাকারী। তার বাবার জীবনের দারুণ কুগ্রহ। তবু তুমি জয়ী হয়েছে।

—ভেঙে বলো রাজীব! সে কি ফিরে আসতে চায়?

—চলো, দেখবে—সে ভালোবেসেছে—ভালোবেসেছে দুর্দান্ত নরপশু রামেশ্বরের আত্মজ সন্তানকে। ভদ্রা যাকে ভালোবাসেনি, তারই ছেলেকে ভালোবাসলো ভদ্রারই মেয়ে। তোমার জয়-পতাকা দেখবে না রামেশ্বর?

—কে সে? কোথায় সে ছেলে আমার!

বিস্মিত রামেশ্বরের হাতের পিরাণটা হাতেই রহিয়া গেল।

রাজীব বলিলেন—শ্রীমান শ্যামল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। এবার সে প্রথম হয়েছে উচ্চতর বিজ্ঞানে—হয়তো স্টেট-স্কলারশিপ পাবে। রূপে-গুণে বিদ্যায় তোমার ছেলে তোমাকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে বন্ধু—চরিত্র-গৌরবে তুমি তাহ হাঁটুর সমানও নও!

—শ্যামল—শ্যামল পুত্র আমার! যে শ্যামলকে...তুমি সত্যি বলছো রাজীব। বিদ্রূপ করছো না তো এক অভাগা সন্তানহীন পিতাকে?

—না রামেশ্বর! তোমাকে আজো বন্ধু বলে মনে করি—তাই মানুষ করে তুলতে চাই। চলো, দেখবে—ভদ্রার মেয়ে মীনু তোমারই আত্মজ সন্তান শ্যামলকে কেমন গভীরভাবে

ভালবাসে।

রামেশ্বর মিনিটখানেক নির্জীবের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন কোন মন্ত্রবলে। পরে বলিলেন—বড্ড দেরী হয়ে গেছে রাজীব—না, আর উপায় নেই। মীনু শ্যামলকে ভালবাসলো রাজীব! আনন্দের কথা। তুমি দেখো। তুমিই জয়ী হলে। রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায় শ্যামলকে আজ পুত্র বলে স্বীকার করতে পারবে না। আমার অন্তরেই সে স্বীকৃত থাক—বাইরে সে আমার কেউ নয়—কেউ হবে না।

—বেশ! কিন্তু দেখতে চাও না তাদের?

—না, কোন প্রয়োজন নাই! কালই আমি দেশে যাচ্ছি।

—মীনুকে নিয়ে যাবে না?

রামেশ্বর একটুখানি চুপ করিয়া কি যেন ভাবিলেন। পরে বলিলেন—মীনু যদি তোমার কাছে থাকতে চায় তো থাকবে কিছু দিন।

—আচ্ছা! ধন্যবাদ—বলিয়া রাজীব তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। মুখে তাঁহার হাসি।

রামেশ্বর আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—সারা জীবনটার উপর কালো যবনিকা টেনে দাও ভগবান—যদি থাকো তুমি কোথাও!

সক্রোধে বাহির হইয়া আসিল পদ্মা রামেশ্বরের প্রাসাদ হইতে। কিন্তু তাহার বুকের ভিতরটা জ্বলিতেছে। নিরাশার মধ্যেও পদ্মা আশা করিয়াছিল, হয়তো রামেশ্বর শ্যামলকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন। কারণ শ্যামল আজ সুন্দর সুপুরুষ যুবক—বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ ডিগ্রিধারী এবং প্রফেসার অধিকারীর গর্বের ধন। তাহাকে পুত্ররূপে পাইতে যে কোন পিতা আগ্রহান্বিত হইবেন—এই বিশ্বাস লইয়াই পদ্মা আজ সাহস করিয়া আসিয়াছিল এখানে। কিন্তু কি হইল? রামেশ্বর পুত্রের সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন পর্যন্ত করিলেন না। সে কে? সে কেমন—কি করে এতটা পড়িয়াছে—নাঃ, কিছুই জানিতে চাহিলেন না তিনি।—আশ্চর্য!

কিন্তু পদ্মা আর কি করিতে পারে! আদালত অবশ্য আছে। তবে এতোকাল পরে ওসব ঝামেলা আর করিতে চাহে না পদ্মা—তা ছাড়া আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে ওসব ব্যাপারে। রায় রামেশ্বর যে কোন মুহূর্তে শ্যামলকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিতে পারেন—সে চেষ্টাও হয়তো তিনি করিয়াছেন! ভালই হইয়াছে শ্যামলের কোন সংবাদ তিনি জানিতে চাহেন নাই। কিন্তু শ্যামলকে কি বলিবে পদ্মা! প্রফেসর রাজীব অধিকারী সবই জানেন—তিনিই যাহা কিছু বলিবেন। পদ্মা কিছুই বলিবে না। প্রফেসর অধিকারী শ্যামলকে সর্বত্র 'অবফ্যান'—কুড়োনো ছেলে বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং নিজেই তাহার অভিভাবক হইয়াছেন। কারণ তিনি গোড়া হইতেই জানিতেন—রামেশ্বর পুত্রকে কোনদিন স্বীকার করিবেন না। এইজন্য প্রফেসর রাজীবই শ্যামলের অভিভাবক হইয়া আছেন। স্কুল-কলেজে তাহার পিতার কি নাম আছে—আছে কি না পদ্মার জানা নাই—খুব সম্ভব শ্যামলের পিতৃনাম অজ্ঞাতই রহিয়াছে স্কুল-কলেজে—কিন্তু এসব ভাবিয়া কি হইবে।

পদ্মা নিজেকে সম্বৃত করিয়া গৃহে ফিরিল। চিন্তায় মন তাহার জ্বলিতেছে। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র তাহার পিতৃপরিচয় জানিতে চায়। নিরপরাধী পদ্মা তাহা বলিতে পারিতেছে না—মনে হইতেছে, এ কালা-মুখ সে শ্যামলকে আর দেখাইবে না। বহুবার তাহার আত্মহত্যা করিবার দুর্দমনীয় ইচ্ছা জাগিয়াছে—শুধু শ্যামলের মুখ চাহিয়াই পদ্মা এযাবৎ নিজেকে ধরিয়া

রাখিয়াছে।

শ্যামল ঘরেই ছিল—পদ্মা আসিতেই অভিমানের সুরে বলিল—কোথায় গিয়েছিলে মা?

—এই একটু ও-বাড়ী গিয়েছিলাম বাবা—এখনও পড়তে যাসনি তুই?

—ওখান থেকেই আসছি মা—প্রফেসর অধিকারীই পাঠালেন। শোন মা—একটা সুখবর আছে। আমি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি—বিজ্ঞানের বড় পরীক্ষা মা—বুঝেছ?

—ভগবান আশীর্বাদ দান করুন—বলিয়া সর্বাগ্রে পদ্মা গিয়া তুলসী মঞ্চতলে প্রণাম করিল ও ফিরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—প্রফেসর অধিকারী জানেন?

—হ্যাঁ মা—তিনি নিশ্চয় জানেন। আরো সবাই জানবে মা—কাল কাগজে ছাপা হয়ে যাবে—আমার ফটোশুদ্ধ। দেখবে তুমিও। কিন্তু মা—

—কি? বল!—

পদ্মা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল। সে যেন বুঝিয়াছে, কি প্রশ্ন শ্যামল করিবে। শ্যামল বলিল—কাগজে ছাপাবার জন্য প্রফেসর অধিকারী প্রেসের লোককে একটা নোট লেখালেন—

—বেশ তো—কি লেখালেন?

—লেখালেন—"শ্রীমান শ্যামলকুমার রায় এই বৎসর বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীমান শ্যামল বাংলার এক বিশিষ্ট জমিদার পরিবারের সন্তান—তাহার প্রাচীন পিতৃবংশের গৌরবোজ্জল পরিচয় বাংলার ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়—অতি শৈশবে শ্যামল পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু স্বীয় প্রতিভাবলে আজ সে ছাত্রমণ্ডলীতে উচ্চস্থান লাভ করিল—তাহা সত্যই গৌরবময়। আমরা শ্রীমানের দীর্ঘজীবন ও সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি—"

—বেশ তো লিখেছেন!

—হ্যাঁ—কিন্তু মা—আমি কি সত্যি কোন জমিদারের ছেলে?

—ও নিয়ে আর গর্ব করার কিছু নেই শ্যামল—জমিদারবংশ লুপ্ত আজ। আর জমিদার বংশ বহু সময়েই অত্যাচারী বংশ। জমিদারের ছেলে বলে আজ আর কোন সম্মান কেউ আদায় করতে চায় না শ্যামল। প্রফেসর অধিকারী ওসব একটু বাড়িয়ে লিখেছেন। ও নিয়ে তুই মাথা ঘামাস নে।

—না মা—কিন্তু আমার পিতৃপরিচয় জেনেও তিনি গোপন করলেন কেন?

—কারণ তুই তোর মার ছেলে, তুই বাংলার—ভারতমাতার পুত্র। তোর বাপের পরিচয়ে গৌরবের কিছু নেই খোকন—সে জানবার তোর কোন দরকার নেই।

শ্যামল মাকে উত্তেজিত দেখিয়া আর কিছুই বলিল না। কিন্তু মনে তাহার অদম্য পিপাসা জাগিয়া রহিয়াছে। তাহার পিতা কে? কেমন তিনি—যিনি পুত্রকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না! কোথায় তাঁহার বাবা!—কিন্তু শ্যামল আর কোন কথা বলিতে চাহে না। একটা কিছু রহস্য তার জন্ম ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছে, ইহা শ্যামল বহুদিন হইতেই জানে এতদিন সে নিজেকে 'অরফ্যান' বলিয়া পরিচিত করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু 'অরফ্যান' সে নহে। তাহার মা তো আছেই—বাবাও আছেন। এই বস্তিতে মা কি বলিয়া স্বামীর পরিচয় দেয়—শ্যামল জানে। মা বলে তাহার স্বামী আবার বিবাহ করায় পদ্মা চলিয়া আসিয়াছে।

যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবে না তাহাকে তাহার পুত্রের পিতা বলিয়াও পরিচয় দিতে চাহে না পদ্মা—অনেকে অনেক কিছু ভাবিয়াছিল—কিন্তু সে সব বহু দিনের কথা। উহা লইয়া এখন আর কেহ কোন প্রশ্ন করে না।

—আয়—চা খা।

শ্যামল ফিরিয়া দেখিল, পদ্মা চোখের জলটা আঁচলে মুছিতেছে। শ্যামল বলিল—তোমাকে আমি দুঃখ দিলাম মা। আজ তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আর কখনো আমি আমার পিতৃপরিচয় জানতে চাইব না। তুমি কেঁদো না মা। আমার পরিচয়েই তোমার পরিচয় হবে। এমন যেন আমি হতে পারি—এই আশীর্বাদ কর।

পদ্মা শ্যামলের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—হ্যাঁ বাবা, তাই যেন হয়।

শ্যামল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—আর কোনদিন সে পিতৃপরিচয় জানিতে চাহিবে না।

রাজীবের কলিকাতার বাড়ী। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। একটা বড় ঘড়িতে দেখা যাইতেছে সাতটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট। ঘরখানারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সাপের প্রত্যেকটি শো-কেশের উপর বড় বড় হরফে লেখা—ভারতীয়—বাংলা, ভারতীয়— মধ্যপ্রদেশ, ভারতীয়—দক্ষিণ প্রদেশ, ভারতীয়—সাঁওতাল পরগণা, ভারতীয়— আসাম—ইত্যাদি। আবার কতকগুলিতে লেখা—চীন, জাপান, তিব্বত, মালয়, ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যান্ড, আফ্রিকা—ইত্যাদি প্রত্যেক দেশের সাপ ও তাহার কঙ্কাল সেই দেশের লেবেল মারা আলমারীতে রাখা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, যে সাপ যেভাবে স্বাধীন জীবনে জীবন্ত অবস্থায় থাকে—যথাসম্ভব তাহার অনুকরণও ঐ ক্ষুদ্রস্থানে করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় টেবিলের যন্ত্রগুলি মাজাঘষা, ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সোফা ও চেয়ারে সুন্দর সিল্কের আচ্ছাদন পড়িয়াছে। ফাঁকে ফাঁকে টিপয় এবং টবসমেত ছোট ফুলের গাছ। রাজীবের বসিবার চেয়ারটায় একটা ভাল ক্যুশন এবং সম্মুখে বড় ফুলদানীতে একগুচ্ছ ফুল।

সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে ভদ্রার মৃন্ময়ী মূর্তিটির। উঁচু বেদীর উপর সেটি বসানো হইয়াছে . কোন সময়েই আর আবৃত থাকে না। মূর্তিটি ঘিরিয়া কয়েকটি ফুলের টব পিতলের পাত্রে রক্ষিত হইয়াছে। মীনু কতকগুলি ফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে ও আপন মনে গাহিতেছে—

(গান)

আমি সন্ধ্যালগনে আপনার মনে
গেঁথেছি মালা, গেঁথেছি মালা।
আকাশের আলো নিবে এলো ধীরে
এই নিরালা—এই নিরালা।

অকস্মাৎ শ্যামল ঢুকিয়া জুতার শব্দ করিল।

মীনু যেন শুনিতে পায় নাই। গান গাহিতেছে—

দলে দলে খেলে সোহাগ-সুবাস
কাজ হারা বুকে জাগে অবকাশ—
হতাশা ঢালা—নিরাশা ঢালা...

শ্যামল পুনরায় শব্দ করিল।

মীনু গাহিয়া চলিয়াছে।

শ্যামল সুর করিয়া বলিল—ওরে ও কালা—কানে কি তালা?

শ্যামল চেয়ারের পিছনে গিয়া হাত দিল।

মীনু বলিল—ও মা কি জ্বালা! বড্ড ইয়ে আপনি যান!

—মিললো না—মিল হলো না, বুদ্ধির ছালা —!

মীনু অকস্মাৎ কৃত্রিম ভয়ে বলিল—স্যার আসছেন—পালা রে পালা।

—কৈ? কোথায়?

শ্যামল অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা টুলে বসিয়া পড়িল সুবোধ ছাত্রের মতো।

—হিঃ হিঃ হিঃ—কেমন জব্দ! মাগো —কি ভীতু আপনি! স্যারের ভয়ে পিঁপড়ের গর্ত খোঁজেন।

—ভয় করিনে—ভক্তি করি! ভয় আমি কাউকে করিনে!

—আমাকে?

—ওহো থুড়ি, তোমায়—খুবই ভয় করি!

—যাঃ—খোসামুদে কোথাকার!

—না লক্ষ্মীটি, সত্যি ভয় করে তোমায়—বিশ্বাস করো!

শ্যামল মীনুর আঁচলটা ধরিল।

—এই যাঃ, ছুঁয়ে দিলেন যে! এখনো মা'র গলায় মালা দিইনি ; যাই—আবার কাপড় ছাড়তে হবে।

—আমি কি অভাজন যে ছুঁলেই জাত যাবে?

অভাজনদের ছুঁলে মোটেই আমার জাত যায় না, আপনি অপবিত্র।

—কেন?

—কারণ আপনি শুধু শ্যামল। ওর আগে, একটা শ্রীও নেই—পরে একটা বিশ্রী কিছুও নেই। কিন্তু ছাড়ুন কাপড় ছাড়বো—মা'র গলায় মালা দিতে হবে।

পথ আগলাইয়া শ্যামল বলিল—পরে বিশ্রী কিছু তুমি জুড়ে দিও মীনু আগে কিন্তু আমি একটা শ্রী জুড়ে নেব।

—কি রকম করে?

—মীনা করে!

—যাঃ—ফের দুষ্টুমী! কে-ওখানে?

বাহিরে একটি মনুষ্যমূর্তির ছায়া নড়িয়া উঠিল। ধীরে ধীরে ঢুকিলেন রায় রামেশ্বর রায়বাহাদুর।

রামেশ্বর বলিলেন—এ ভালোই হয়েছে মা মীনু? সুখে থাকো। আমি আজই চলে যাচ্ছি। রায় বাড়ীর দরজা তোমার কাছে খোলাই রইল—যখন ইচ্ছে, যেও। রামেশ্বর-রায়ের সর্বস্ব তোমারই থাকবে।

অকস্মাৎ এই কথা শুনিয়া খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া মীনু বলিল—কী সব বলছো তুমি বাবা! চলো, আমি তোমার সঙ্গেই ফিরে যাবো। এখানে আসার জন্য আমার অপরাধ নিও না বাবা, আমি স্বেচ্ছায় আসিনি! আমি জানি, তুমিই আমার বাবা। আমায় ভুল বুঝো

না বাবা—আমি তোমাকেই আমার বাবা বলে জানবো। এ বিশ্বাস আমার ভেঙে দিও না তুমি।

মীনু রামেশ্বরের পায়ে ধরিল।

ওঠ মা, তোর বাবা আমি নই। তবে পিতা অর্থে যদি প্রতিপালক হয়, তাহলে আমি হয় তো—কিন্তু থাক সে কথা! আসবার ইচ্ছে ছিলো না এখানে, কিন্তু লোভ সামলাতে পারলাম না তোকে আর একবার দেখবার! তোর এই অভাগা পিতাকে যদি রক্ষা করতে পারিস মীনু—তোর মাতৃহন্তা, তোর জন্মদাতার, মহাশত্রুকে যদি কোনদিন—

ত্বরিতে মীনু বলিল—থামো, বাবা থামো! আমি সইতে পারছি নে। আমি তোমার কাছে যে অগাধ স্নেহ পেয়েছি—তাই আমার সারা জীবন দিয়ে অনুভব করবো বাবা? তুমিই আমার বাবা—তুমিই—বাবা আমার!

—আচ্ছা মা, আশীর্বাদ করি, সুখী হ'। রাজীব তোকে এখন ছাড়বে না। থাক কিছুদিন। আমি আসবো আবার। তোকে নিয়ে যাব...

রামেশ্বর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজীব প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—যেও না হে রামেশ্বর—দাঁড়াও!

—থাক—রাজীব! দুর্ভাগাকে বিদ্রূপ করা তোমার মত মহান্ ব্যক্তির কাছে প্রত্যাশা করিনে!

—দুর্ভাগা তুমি নও রামেশ্বর! তুমিই চির-বিজয়ী হয়ে রইলে। ভাগ্যদেবী চিরদিনই তোমার অনুকূলে। নইলে ভদ্রা যাকে চোখের কোণেও দেখেনি, ভদ্রার মেয়ে তারই পুত্রকে আত্মদান করবে কেন?

—ও কথা থাক রাজীব! ভদ্রার মেয়ের উপর পিতার অধিকার তুমি গ্রহণ কর—আমি নিঃসন্তানই থাকতে চাই।

—সন্তান থাকতেও!

—না! সন্তান আছে বলে স্বীকার করিনে আমি আর।

শ্যামল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল। বিস্মিত সে কম হয় নাই। রাজীব তাহাকে বলিলেন—শ্যামল—রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায় তোমার জন্মদাতা পিতা। প্রণাম কর!

—না—না রাজীব—না। আমি অপুত্রক—আমি অন্য কারো বাবা নই। আমার মীনুই রইল—যদি বাবা কারো হই তো ঐ মীনুর। না, আর কারো বাবা হবার যোগ্য নই আমি। আমি ব্যভিচারী লম্পট...

রামেশ্বর চলিয়া যাইতেছেন। শ্যামল পথ আগুলিয়া পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিল—বাবা! এই মুহূর্তে জানলাম আপনিই আমার জন্মদাতা পিতা।

—না-না-না—আমি ব্যভিচারী, লম্পট, শয়তান—যাও—

—হোন, তাতে আমার কি! আমার তো বাবা।

রামেশ্বর ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অকস্মাৎ যেন স্নেহের সমুদ্র তাঁহার অন্তরে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। হিমালয় গলিয়া পড়িতেছে নাকি। তথাপি কণ্ঠস্বর কঠোর করিয়া কহিলেন—ছাড়ো! পথ ছাড়ো হে ছোকরা—ছাড়ো!

শ্যামল তাঁহার পায়ের উপর দু'হাত রাখিয়া বলিল—কে আপনি—কি আপনি—আমার জানবার আর কিছুই দরকার নেই বাবা, আপনার কাজের বিচার করবার অধিকার নেই

আমার! আমি আজ জানলাম, আপনি আমার বাবা—এই আমার সৌভাগ্য! আমাকে স্বীকার না করেন ক্ষতি নেই। আমি স্বীকার করতে তো বাধ্য—বাবা—আপন জন্মদাতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আপনার যদি অসুবিধা হয়, থাক্। আমার পিতৃ-পরিচয় গোপনই থাকবে। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক থাকেন—আমিও তাদের একজন হয়ে রইলাম। তবু আজ জানলাম আমার বাবা রামেশ্বর রায়! এই আমার সৌভাগ্য! যান—আর কিছু আমার বলবার নেই...প্রণাম।

শ্যামল পথ ছাড়িয়া দিল। রামেশ্বর চলিয়া যাইতেছিলেন—অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিলেন। ছুটিয়া গিয়া মীনুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং রাজীবকে বলিলেন—আমার ছেলে নেই—মেয়ে আছে রাজীব! ছেলে তোমার।

তুমিই তার বাপের কাজ করেছ। রাজীব, শীগ্‌গির আয়োজন কর—আমার মেয়ে মীনুর সঙ্গে তোমার ছেলে শ্যামলের বিয়ে। খুব শীগ্‌গির—হ্যাঁ, আমি বুঝেছি রাজীব—বুঝেছি, পৃথিবীতে স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, শুধু আছে নয়—জীবন্ত, জাগ্রত, মূর্ত হয়ে আছে, বজ্রের চেয়ে কঠোর হয়ে আছে—নিয়তির চেয়ে নিষ্ঠুর হয়ে আছে। রাজীব! কথা বলছো না যে? আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে কি হতে পারে না রাজীব?

—তুমিই জিতলে হে রামেশ্বর—তুমিই জিতে গেলে।

রাজীব ধীরে ধীরে মীনুর গাঁথা মালাটি ভদ্রার গলায় পরাইয়া দিলেন এবং পদ প্রান্তে মালা রাখিয়া বলিলেন—মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে তব চরণ দিলাম রাঙায়ে—।

স্বাক্ষর

আশার বিয়ের বয়স হোল...

বাপের অবস্থা খারাপ নয়। কিন্তু মেয়েকে ভাল করে শিক্ষিতা, সঙ্গীতজ্ঞা এবং সাংসারিক কাজে নিপুণা করতেই মেয়ের বয়স উনিশ পার হয়ে গেল। কলেজে পড়েনি আশা ; কিন্তু বাড়ীতে যা পড়েছে, কলেজে তা পড়ানো হয় না। বিশেষ করে বাপের কাছ থেকে যন্ত্র কণ্ঠসঙ্গীত সে আয়ত্ত করেছে খুবই ভালভাবে। দৈহিক সৌন্দর্যাও যথেষ্ট তার। এরকম মেয়ের বিয়ের জন্য ভাবনার কিছু নেই, তবু আশার বিয়ে আটকে রয়েছে।

বিয়ের ব্যাপারে আশার কোনো ব্যস্ততা নেই, এমন কি কোনো মতামতও নেই ওর। বাবা যখন দেবেন তখন হবে বিয়ে, এবং যার সঙ্গে দেবেন তারই সঙ্গে আশা জীবনের পথে চলে যাবে—এই ওর মত। প্রাচীন পরিবারের কন্যা,—এতোটা লেখাপড়া শিখে এবং সঙ্গীতে পারদর্শিনী হয়েও আশা আধুনিকা হোল না। শহরতলীর নির্জ্জনতা এবং সহরের সবরকম সুবিধায় ও বাস করে। বিজলী-আলোর সঙ্গে রেডিওর গান ওর পাঠকক্ষকে পরিপূর্ণ রাখে, বিলিতী মরশুমী ফুলও ওর বাগানে প্রচুর—তবু আশা ধূপ দীপ জ্বালে যথারীতি। বাদ্যযন্ত্রকে দুবেলা প্রণাম করে শ্বেতপুষ্পের অঞ্জলি দিয়ে। ওর মা-বাবা দেখেন আর হাসেন ; বলেন,

—মেয়েটা সেকেলে হয়েই রইল!

কিন্তু বিয়ে এবার দিতে হবে—বাবা তাই ভাবছেন, রবিবারের খবরের কাগজগুলোতে বিয়ের বিজ্ঞাপন পড়ছেন ক'দিন থেকে, কিন্তু পছন্দমতো বর পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ সেদিন নজরে পড়লো : "পাত্রী চাই—বয়স্থা, সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণা পাত্রী চাই। সঙ্গীতজ্ঞা হইলে ভাল হয়। পাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা ছাত্র। বৈজ্ঞানিক। নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে গবেষণারত। আয় লক্ষ টাকারও অধিক। কলিকাতায় বাড়ী ও গাড়ী আছে। অবিলম্বে সাক্ষাৎ করুন। ঠিকানা—শ্রীঅরুন্ধতী আচার্য, ১৬ সূর্য্য সাহা লেন, কলিকাতা।"

'চমৎকার হবে'! কথাটা ভাবতেই আশার বাবার মনে কেমন যেন উত্তেজনা জেগে উঠলো। ছেলে বৈজ্ঞানিক, মেয়ে সঙ্গীতজ্ঞা—আর্টের পূজারী—বাঃ, এই তো রাজযোটক মিল। কোষ্ঠীর মিলের আর কি দরকার।

চাদরখানা গলায় ফেলে তিনি তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেলেন সূর্য্য সাহা লেনে। কিন্তু ভাবতে লাগলেন পথে—বছরে লক্ষ টাকা আয়, তার ঘরে মেয়ে দেবার মতো কী সম্বল ওঁর আছে? গিয়ে মিছে হাস্যাস্পদ হওয়া। কিন্তু বেরিয়েছেন যখন—যা হয় হবে, যাওয়াই যাক্ না একবার। আশার একখানা ফটোও সঙ্গে নিয়েছেন উনি। একবার সেটা দেখলেন, তার পর বাসে চড়ে বসলেন।

সকাল ন'টা—সূর্য্য সাহা লেনের তিনতলা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঘুরে গেল ভদ্রলোকের!

বাড়ী নয়—প্রাসাদ। বিঘে আড়াই জমিতে বাড়ী, বাগান, আর ল্যাবরেটরী রয়েছে ওপাশে! বর্তমান যুগে কলকাতা শহরে যখন এককাঠা জমির দাম কয়েক হাজার টাকা, তখন এতখানি জমি নিয়ে কেউ বাস করে, জানতেন না উনি। ঢুকবেন কিনা ভাবছেন—গেটের দারোয়ান শুধুলো,

—কিস্‌কো মাংতা, বাবু?

—অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই...

—যাইয়ে ভিতর...দারোয়ান আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল ভিতরটা।

আশার বাবা বিরাট এই বাড়ী আর বাইরে বন্দুকধারী দারোয়ান দেখেই ঘাবড়ে গেছেন। এখানে কি করে তাঁর মতো লোক মেয়ের বিয়ের জন্য ঢুকবেন! কিন্তু দারোয়ান আবার বলল,

—যাইয়ে, বাবুসাব্!

চলেই এলেন আশার বাবা। বসবার ঘরখানা যেন সেকালের রাজা-মহারাজার দরবার। এতবড় তার আকার আর এতো আসবাব যে, ঘণ্টাখানেক ধরে সেগুলো দেখা চলে। এখানে কী আশা করতে পারেন আশার বাবা? তাঁর দৌড় বড়ো পাঁচ-সাত হাজার টাকা। এখানে মেয়ে দিতে হলে অন্তত পঞ্চাশ হাজার দরকার। ফিরেই আসবেন ভাবছেন—হঠাৎ বৃদ্ধা একজন ঝি এসে বলল,

—কাকে চাইছেন, বাবু?

—অরুন্ধতী দেবী আছেন?

—হ্যাঁ। কি দরকার?

—আমি বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি। যদি একবার দেখা হয় তাঁর সঙ্গে তো...

—বসুন বসুন। মা পূজোর ঘরে আছেন। আমি খবর দিচ্ছি।

ঝি চলে গেল। আশার বাবা প্রকাণ্ড চেয়ারটার গদীতে বসে পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরাতে গিয়েই থেমে গেলেন—নাঃ, বিড়ি এ বাড়ীতে মানাবে না। এখানে সিগারেটও মানায় না। এখানে মানায় গোলাপজল-ভরা রূপার ফরসী যার লম্বা নলে মালতী ফুলের মালা জড়ানো থাকবে—যে নলের মুখ হবে সোনায় বাঁধানো...

পুঁথিতে-পড়া নবাবী আমলের বৈঠক-বিলাসের কথাই মনে পড়ছে ওঁর। কিন্তু বাড়ীটা এতো নির্জ্জন যে সহনাতীত হয়ে উঠছে ক্রমশ। কেউ যেন কোথাও নেই—যেন পরিত্যক্ত নবাবী প্রাসাদ! গলির মধ্যে বাড়ী, তাই শহরের গোলমাল এখানে প্রবেশ করে কম—দূরে কোথায় একটা পাখী ডাকছে, তার কণ্ঠে যা একটু জীবনের সাড়া পাওয়া যায়। দীর্ঘক্ষণ বসে বসে ভাবছেন,—এখান থেকে তাঁর চলেই যাওয়া উচিত।

কিন্তু যেতে হোল না। এক মহিলা প্রবেশ করলেন—প্রৌঢ়া, কিন্তু এখনো তাকিয়ে দেখবার মতো রূপৈশ্বর্য্য তাঁর। নমস্কার জানিয়ে বললেন,

—আপনারই তো মেয়ে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই দেখুন তার ফটো...পকেট থেকে ফটোখানা বার করে দিলেন।

পাঁচ মিনিট ধরে দেখলেন মহিলাটি ঐ ফটোখানা, তার পর বললেন,

—ফটো দেখে ঠিক 'সুন্দরী' বোঝা যায় না। কী নাম আপনার মেয়ের?

—আশালতা।

—লেখাপড়া? গান-বাজনা?

—ইংরাজি-বাংলা-সংস্কৃত বাড়ীতেই পড়েছে। গান আমি শিখিয়েছি। নাচ জানে না, বাজাতে পারে ভালই। দেখলে আপনি অপছন্দ করবেন না।

—চলুন, দেখে আসি। ঝি, গাড়ী আনতে বল তো?—একটু জল খান—বলে ঝিব হাত থেকে মিষ্টির থালা নিয়ে এগিয়ে দিলেন উনি। রূপার থালায় ফল-মিষ্টান্ন—রূপার গেলাসে জল।

—দেখুন, আমি নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি। এতবড় বাড়ীতে মেয়ে দেবার মতো কোনো সম্বল আমার নেই। যদি দয়া করে তাকে গ্রহণ করেন...

—আমি ছেলের জন্য বৌ চাইছি, আর চাইছি আমার একটা সঙ্গী—দয়ার কোনো কথা ওঠে না। ছেলের বিয়ে দিয়ে বড়লোক তো আমি হতে চাইনে? আপনার মেয়েকে পছন্দ হলেই নিয়ে আসবো। জল খান। আজ দিন ভাল, আমি আজই মেয়ে দেখতে চাই।

—ছেলেটি কি করে?

—গবেষণা করে। ঐ ওখানে আছে।—কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝিকে ইঙ্গিত করলেন। ঝি বার হয়ে গেল। আশার বাবা জল খেতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তিনি ভাবছেন, এ বাড়ীতে মেয়ে দেওয়ার আশা দুরাশা ছাড়া কিছু নয়। তবু দুরাশাও তো মানুষ করে! দেখাই যাক্ না, আশার বরাতে কী আছে।

জলযোগ শেষ হওয়ার আগেই দুজন যুবক এসে দাঁড়ালো ঘরে।

—আমায় ডাকছো, মা,?—বলে আগন্তুকের দিকে তাকিয়েই চুপ হয়ে গেল। দুটি ছেলে, দুজনেরই পরণে বৈজ্ঞানিকের অ্যাপ্রন। বেশ বোঝা যায়, কাজ করতে করতে মা'র আহ্বানে উঠে এসেছে। মা হাতের ফটোখানা ওদের একজনের হাতে দিয়ে বললেন,

—দেখ বাবা নীতীশ, তোদের পছন্দ হয়?

ছেলেটি দেখতে লাগলো ফটোখানা।

মহিলাটি বললেন আশার বাবাকে দেখিয়ে,

—ইনি এসেছেন মেয়ের বিয়ের জন্য। আমি এখুনি দেখতে যাচ্ছি। যদি পছন্দ হয় তো আশীর্বাদ করেই আসবো।—আশার বাবাকে বললেন,

—এই আমার একমাত্র ছেলে আশিস। সাত-বছরে বাপহারা, পঁচিশ বছরের হোল। এই দীর্ঘকাল ওকে বুকে করে মানুষ করেছি। আর আমি পারি না একা থাকতে। এবার ওর বিয়ে দিয়ে বাড়ীতে আমায় মানুষ আনতে হবে; বৌ—ছেলে— মেয়ে...দেখুন আমার ছেলেকে।

দেখবেন কি! 'হাঁ' করে রয়েছেন আশার বাবা। ছেলে তো নয়, রাজপুত্র বললে খুব বেশী কি আর বলা হয়? আশার কি এমন ভাগ্য হবে! কিছুই বলতে পারছেন না আশার বাবা। দুটি ছেলেই সুন্দর, তবে ফটো যে দেখছে তার থেকে অন্যটি অনেক বেশী সুন্দর—সেই-ই পাত্র!

—আপনার ছেলে পছন্দ হয়েছে?

—হ্যাঁ—এতো ভাগ্যি যদি আমার মেয়ের হয়।

—আচ্ছা, চলুন তাহলে—দেখে আসি তাকে।—তোর কী মত, আশিস?

—আমার সম্বন্ধে তোমার মতই শেষ মত, মা...ওর পর আর কারও মত নেই।

—আপনি নিজেই যাবেন?—আশার বাবা শুধুলো।

—নিশ্চয়, একি বাজারের বাক্স-কেনার কথা! বউ পছন্দ করতে হবে—নিজেই যাব—আশার বাবা বুঝলেন, পরীক্ষাটা খুবই কড়া হবে আশার।

আশিস প্রণাম করলো মাকে, তারপর আশার বাবাকে। অসাধারণ মাতৃভক্ত সন্তান। এক মুহূর্তে পছন্দ হয়ে গেল আশার বাবার। কিন্তু কে জানে, ইনি আশাকে পছন্দ করবেন কি না! গাড়ীতে যেতে যেতে ভদ্রলোক ভাবছিলেন হঠাৎ ইনি মেয়ে দেখতে যাচ্ছে—কে জানে,—কী অবস্থায় এখন আছে আশা! হয়তো কাপড়ে সাবান দিচ্ছে, না-হয় রান্নার কালিঝুলি মেখে কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে আছে। ইনি মহিলা—সটান নিশ্চয় অন্দরে ঢুকে যাবেন। একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে যে মেয়ে দেখাবেন, তার অবসর পাবেন না ভদ্রলোক। এমন করে এত তাড়াতাড়ি মেয়ে দেখতে আসছেন কেন তিনি?—প্রশ্নটা করবেন কিনা ভাবছেন। কিন্তু মহিলাটিই বললেন,

—এভাবে আমি কেন মেয়ে দেখতে যাচ্ছি ভেবে আপনি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন। কিন্তু শুনুন, সাধারণভাবে আমি অনেকগুলো মেয়েই দেখলাম—কাউকে আমার পছন্দ হোল না। ওতে মেয়ের রূপ দেখা যায়, তার গুণের ফিরিস্তি শোনা যায়—কিন্তু অন্তর চেনা যায় না। আকস্মিকভাবে আমি আমার 'ঘরের লক্ষ্মী'কে দেখতে চাই—যার অন্তরের ঐশ্বর্য্য আমার শূন্য ঘরখানা পূর্ণ করবে...একটু থেমে বললেন,—আমি কে, কেন এসেছি আপনি কিছু বলবেন না, এই অনুরোধ!

আশার বাবা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন, কিন্তু তিনি চিন্তায় বিশেষ বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। অবস্থা খারাপ না হলেও বড়লোক তিনি নন ; আশাকে গৃহের বহু কাজ করতে হয় তার মা'র সঙ্গে। কে জানে, এখন কেমন অবস্থায় আছে সে!

গাড়ী এসে দরজায় দাঁড়াতেই নিজের হাতে দরজা খুলে ভদ্রমহিলা নেমে সটান ঢুকে গেলেন ভিতরে। আশার বাবা তখনো গাড়ীতে বসে।

রান্নাঘরের দাওয়ায় আশা শীলের উপর সর্ষে বাটছে—আধময়লা শাড়ী, ভিজে চুল লুটোচ্ছে মাটিতে, মুখে ঘাম দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু, ক্লান্তিতে মুখখানা লাল—ভদ্রমহিলা উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখলেন। আশা তখনো দেখেনি। অকস্মাৎ চোখ তুলেই অবাক হয়ে গেল আশা, কিন্তু ওর তীক্ষ্ম বুদ্ধি ওকে সাহায্য করলো তৎক্ষণাৎ—বাবা গেছেন কোথায় পাত্রের খোঁজে—নিশ্চয় ইনি সেই পাত্রেব কেউ হবেন! কারণ বাবাও তো ফিরলেন মনে হচ্ছে। বাটনাটা চট্ করে একপাশে টেনে রেখে আশা উঠে চলে এল। নতজানু হয়ে প্রণাম করলো মহিলার চরণে! মহিলাটি বললেন,

—আমি কে, কী জাত, কিছু না-জেনেই যে প্রণাম করলে?

—আপনি 'মা'! মার আবার জাত কি, মা! মা'র থেকে বড় কি জাত আছে?—আশার ভিজে চুলগুলো লুটিয়ে পড়ছে ওঁর পায়ে। যেন পা-দুখানা মুছে দিচ্ছে।

আশা বলল,—বসুন, মা।

—কোথায় বসবো?

—যেখানে আপনার ইচ্ছে, মা—

—আমি লক্ষপতির মা—আমাকে তুই বসবার জায়গা দিতে পারবি?

—হ্যাঁ, মা! আপনি লক্ষপতির ঘরে সিংহাসনে বসেন—আমার ভাঙাঘরে কাঠের

পিঁড়িতেও বসবেন। নইলে আপনি 'মা' হবেন কেন?

—সাবাস! চল দেখি, তুই কি রান্না করছিস্—

—ডাল-ভাত-সুক্ত হয়েছে, মা—এবার পোস্তর বড়ার অম্বল বাঁধবো—বাবা খেতে ভালবাসন...আসুন!—আশা এগিয়ে এল ওঁর বসবার ঠাঁই করবার জন্য।

—আমি কি খেতে ভালবাসি, বল তো?

আশা আধমিনিট চুপ করে ভাবলো, তারপর হেসে বলল,

—মেয়ে আপনাকে যা দেবে তাই আপনি ভালবাসবেন। আপনি যে 'মা'!

—দেখি তোর মুখখানা তোল তো—বলে নিজেই উনি আশার মুখখানা ধরে দেখলেন কিছুক্ষণ। সস্নেহে চুমু দিয়ে বললেন,

—ভেবেছিলাম, তোকে অনেক করে দেখবো, অনেক প্রশ্ন করবো, কিছু যে করতে দিলি নে? কে জানে, তোর সঙ্গে কত জন্মের সম্বন্ধ! আয়, আরো কাছে আয় মা—কোলে জড়িয়ে ধরলেন আশাকে।

আশার মা ইতিমধ্যে স্বামীর কাছে সংবাদ শুনে শাঁখ বাজিয়ে দিলেন। গলার মোটা হারটা খুলে পরিয়ে দিলেন অরুন্ধতী দেবী আশার শুভ্র-সুন্দর কণ্ঠে।

নিস্তব্ধ বাড়ীখানা লোক-লস্করে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো—বিয়ে। কিন্তু যার বিয়ে সে ল্যাবরেটরীতেই দিন গুজরান করে। মা সব ব্যবস্থাই করছেন। যথারীতি রসুনচৌকী থেকে মোটর-সাজানো এবং আলো জ্বালা ঠিক-ই হোল—যথাকালে বিয়ে করতে গেল ছেলে পাড়ার এবং পরিচিত আত্মীয়দের বরযাত্রী করে! বিয়ে করে বৌ নিয়ে ফিরে বলল,

—এবার খুসী তো, মা? তোমার সঙ্গী তুমিই বেছে এনেছ। আমাকে এবার গবেষণাটা শেষ করতে দাও!

—বিয়ের একটা দায়িত্ব আছে, জানিস?—মা হেসে বললেন,—তোর গবেষণার থেকে সেটা অনেক বড় দায়িত্ব। যার সারা জীবনের সুখ-সৌভাগ্যের ভার নিলি, তাকে দেখতে হবে।

—হ্যাঁ, মা! নিশ্চয়। কিন্তু আপাতত তোমার শ্রীচরণেই সে-ভার অর্পণ করে আমি দিনকতক ছুটি চাই পড়াশুনো করতে।

—তোর পড়াশুনায় কেউ বাধা দিচ্ছে না, আশিস, কিন্তু কর্তব্য, বিশেষ পত্নীর প্রতি কর্তব্যে যেন ত্রুটি না হয়।

—হবে না, মা—কিন্তু মাসখানেক সময় দাও। আসছে মাসে বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমার 'থিসিস' দাখিল কববার দিন! ওটা প্রায় শেষ করে এনেছি। দিন-পনেরর মধ্যে হয়ে যাবে। বলে মা'র চরণে আবার প্রণাম জানিয়ে ছেলে গিয়ে ঢুকলো ল্যাবরেটরীর ঘরে।

আশা তখন তিনতলার সাজানো ঘরখানায় বসে প্রতিবেশিনী সখীদের সঙ্গে প্রথম আলাপ করছে। 'বৌ কেমন হয়েছে?'—প্রশ্নের উত্তরে সকলেই একবাক্যে বলল—'চমৎকার'। আশিসদার উপযুক্ত বৌ হয়েছে, একথা রাষ্ট্র হয়ে গেল পাড়াতে। বৌভাতের বিরাট আয়োজনে বিস্তর উপহার লাভ করলো আশা—বই থেকে বাক্স ভর্তি অলঙ্কার পর্যন্ত। শাশুড়ী স্বয়ং যে চন্দ্রহারখানি দিয়েছেন, তার ওজন ছত্রিশ ভরি। আশা দেখছে আর ভাবছে, এতো সৌভাগ্য তার কোথায় লুকিয়ে ছিল! রাজপ্রাসাদে এসে সে-

যে একেবারে রাণী হয়ে বসলো। নতুন একখানা মোটর কিনে দিয়েছেন শাশুড়ী, ঐ গাড়ীতেই বৌ নিয়ে এসেছে আশিস! এখনো ওর ফুলে-গড়া হংসমূর্তি খোলা হয়নি—দেখছিল আশা শোবার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

বাড়ী আর ল্যাবরেটরীর মাঝে শ'খানেক গজ ব্যবধান—বাগান, মাঝে রাস্তা—কেয়ারী-করা ফুলগাছ—মাধবীলতায় অজস্র পুষ্পস্তবক! চাঁপা গাছটায় সহস্র কুঁড়ি এসেছে—ফুটেছেও দু'চারটে। মনোরম পরিবেশ। আশার আনন্দে গান গাইতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু নতুন বধূ সে, যখন-তখন গান গাওয়া উচিৎ হবে না।

স্বামীকে কিন্তু ভাল করে এখনো দেখেনি আশা। আজ দেখবে। আজই ফুল শয্যা। সবাই তো বলল, চমৎকার বর হয়েছে আশার। চমৎকার নিশ্চয়ই হবে, নইলে বাবা এখানে বিয়ে দিতেন না। বাবার পছন্দের ওপর আশার অগাধ বিশ্বাস। তবু নিজের বরকে নিজে না দেখা পর্যন্ত স্বস্তি পাওয়া যায় না।

কী মধুর উৎকণ্ঠা! কখন সে আসবে, তার আশায় জাগর-ক্লান্ত আঁখিতে জানালাপানে চেয়ে থাকা—আশার উনিশ বছরের জীবনে এমন মধুর-বেদনা কখনো আসেনি। কিন্তু রাত বাড়ছে। সখীরা পর পর তিনখানা গান ওকে গাইয়ে তবে ছাড়লো, অথচ যাকে শোনাবার জন্য তার কণ্ঠে আজ গান ঝরছে—সে এল না। শেষে সখীরা খবর দিলো। উত্তরে আশিস বলে পাঠালো যে তার যেতে দেরী হবে। অবশেষে যে-যার বাড়ী চলে গেল প্রতিবেশিনীগণ। আশা একা। হাতের বীণাটায় মাথা রেখে চোখ বুজলো...ঘুমিয়ে গেল আশা!

উঠে দেখে বেলা হয়ে গেছে। কে জানে স্বামী এসেছিল কিনা! এসেছিল যদি তো ওকে জাগায়নি কেন? শোফাতেই শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল আশা—কেউ যে ওকে ছুঁয়েছে, এমন তো মনে হয় না? কপালের চন্দন, গলার মালা, চুলের খোঁপা ঠিকই তো রয়েছে! এক কাতেই ঘুমিয়েছিল আশা। আসেনি তা'হলে? আশ্চর্য্য তো! কিন্তু কে জানে, হয়তো এসে ওকে ঘুমন্ত দেখে ডাক দেয়নি!...ভাবতে ভাবতে আশা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বিরাট বাড়ীটায় তখনো আত্মীয়স্বজন রয়েছেন দু'চারজন! শাশুড়ী সস্নেহে বললেন,—স্নানটা সেরে নে, মা—তোর আবার সকালেই নাওয়া অভ্যাস।

আশা নীরবে চলে গেল স্নানাগারে। ওর অপরূপ দেহসুষমার সঙ্গে নিঃশব্দে আদেশ-পালনের মধুর ভঙ্গী যে দেখলো, সেই বলল.—যেমন মাতৃভক্ত ছেলে, তেমন বৌ হয়েছে! ভাগ্যবতী মা তুমি!

স্নান করে বেরিয়ে আসতে শাশুড়ী চা-জলখাবার এগিয়ে দিচ্ছেন—কিন্তু আশা বলল,—আপনার পূজার ঘরে আগে যাব, মা!

—আয়—সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন আশাকে। ঠাকুরকে প্রণাম করলো আশা। শ্বশুরের ফটোতে মালা দিল। তার পর শাশুড়ীকে প্রণাম করলো আঁচল দিয়ে। বলল,

—আশীর্বাদ করুন, আপনাদের সেবায় যেন ত্রুটি না করি!

—চিরায়ুষ্মতী হও, মা!—শাশুড়ী ওর ললাটে চুম্বন করলেন। পুত্র-গর্বের সঙ্গে বধূর গৌরবে সর্বাঙ্গ ঝলমল করে উঠলো তাঁর। বললেন,

—সাত বছরের আশিসকে আমি পঁচিশ-বছরেব করেছি, মা আশা, আজ থেকে ওর

সব ভার তোর হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। ও নির্দোষ নিরীহ ছেলে আমার—আপনভোলা বৈজ্ঞানিক! ওর সাধনার রাজ্যে ও একা। ওকে সঙ্গ দিস—ওর সঙ্গিনী হোস—আর একটু থেমে বললেন,—বাড়ীটা বড় নিঝুম হয়ে আছে বহুদিন, তুই যেন শিগ্রি দু'একটা ছেলেমেয়ে এনে আমার ঘর ভর্তি করতে পারিস...

আশা আবার ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে পদধূলি নিল! প্রণামের এতোটা বাড়াবাড়ি বর্তমান যুগে প্রচলিত নেই। বিশেষত কলকাতা শহরে। কিন্তু শাশুড়ী খুশী হচ্ছিলেন। ওকে টেনে তুলে বললেন,

—আশিস চা খেয়ে গেছে। আয়, তোকে খেতে দিই—বলেই আবার বললেন,—আজই আমি দিচ্ছি তোকে, এর পর তুই-ই আমার আশিষকে, আমাকে—আমার সকলকে খাওয়াবি, মা! এই নে চাবি—বলেই আঁচলের খুঁট থেকে চাবির গোছাটা খুলে দিলেন আশার হাতে।

আশা কপালে ঠেকালো চাবিগোছা। শাশুড়ী হেসে বললেন,

—চাবির গোছাকেও তুই প্রণাম করিস আশা!

—এ তো শুধু চাবি নয় মা, আপনার অন্তরের ঐশ্বর্য—আশীর্বাদ! এর মর্যাদা যেন রাখতে পারি আমি—

আনন্দে শাশুড়ীর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। ভাবলেন, এমন সুন্দর বৌ হয়েছে—যদি আজ আশিসের বাবা থাকতেন!

আঁচলে চোখ মুছে তিনি বধূর হাত ধরে খাবার-ঘরে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু আশা জেনেছে আশিস রাত্রে এসেছিল। সকালে চা খেয়ে আবার ল্যাবরেটরীতে ঢুকেছে গিয়ে। রাত্রে কেন সে ডাকেনি আশাকে? ডাকলে কি এমন ক্ষতি হোত? ফুলশয্যার দিনে সব স্বামীই তো বৌকে ডেকে কথা বলে। ইনি এমন কি যে, একবার ডাকলেন না! অভিমানটা গুমরে উঠবার আগেই কিন্তু আশার মনে হোল, সে ঘুমালো কেন? তারও কি জেগে থাকা উচিত ছিল না? স্বামীর প্রতি অভিমান করতে গিয়ে আশার নিজের উপর রাগ হয়ে উঠলো। ঘুমিয়ে যাওয়া খুবই অন্যায় হয়েছে আশার। আর আশার ঘুম কিছু বেশী। হয়তো তিনি ডেকেছিলেন, আশা জাগেনি...হয়তো ঘুমন্ত আশার মনেই ছিল না যে—আজ তার ফুলবাসর।

প্রাতঃরাশ শেষ করে আশা আবার নিজের ঘরে যেতে যেতে ভাবল—স্বামী সত্যি এসে পালঙ্কে শুয়েছিলেন কি না, বিছানাটা পরীক্ষা করে সে জানবে। সকালে লোকলজ্জার ভয়ে, ও তাড়াতাড়ি ঘরের বার হয়ে এসেছে। কিন্তু উপরে গিয়া আশা দেখলো—তার জন্য নব-নিযুক্তা ঝি পালঙ্কের বিছানা তুলে ঝেড়ে আবার পেতে দিয়েছে। ঘর ঝাট দিয়ে ফুলপাতাগুলোও সরিয়ে ফেলেছে। রাত্রের কোন চিহ্নই নেই সে-ঘরে। দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে একঝলক হাওয়া আশার কানে কানে নিরাশার বাণী ক'যে গেল! নাঃ, কিছুই বোঝা গেল না। জীবনের পরম শুভক্ষণটিকে এমন করে ব্যর্থ হতে দেখার দুঃখ ওর তরুণ মনে পাথরের মতো বাজছে। চোখদুটিতে সে-ব্যথার প্রকাশ যে-কেউ দেখলেই বুঝবে—কিন্তু ঘরে কেউ নেই এখন। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আশা দূরে ল্যাবরেটরীটা দেখতে লাগল। একতলা ঘর—লম্বা হল্, তাতে কয়েকটা যন্ত্রপাতিও কিঞ্চিৎ দেখা যায় জানালা পথে ; ঘরের মানুষটিকে দেখা যায় না। কে জানে কিসের গবেষণা উনি করেন!

আশা বিস্তর পড়েছে—বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, বাড়ীতে। বিজ্ঞান নয়, সাহিত্য। বিশ্বসভ্যতার সঙ্গে ওর পরিচয় সাহিত্যের মাধ্যমে। অবশ্য বিজ্ঞানের কোনো খোঁজই যে সে রাখে না, তা নয়। তবে সে খবর সংবাদপত্রের প্রবন্ধ মারফত। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকের সম্মান সম্বন্ধে কিছুই তার অজানা নেই, কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে নিজে বিজ্ঞানের কিছুই সে জানে না। বৈজ্ঞানিক স্বামীকে এ বিষয়ে সাহায্য করবার কোনো যোগ্যতাই নেই আশার। কেন যে উনি আশাকে বিয়ে করলেন! কোনো বিজ্ঞানের ছাত্রীকে বিয়ে করলেই ভাল হোত। আজকাল তার অভাব তো নেই। কিন্তু ভাবতেই মনে পড়লো—স্বামী ওকে নির্বাচন করেননি, নির্বাচন করেছেন শাশুড়ী। কে জানে, আশার অদৃষ্টে কী আছে।

করুণ-কোমল চোখদুটি ঘরের দিকে ফেরাতেই আশা দেখতে পেল, যে শোফাটায় সে ঘুমিয়ে ছিল, তারই হাতার উপর ঝক্‌ঝক্ করছে সোনা-ব্যান্ড-শুদ্ধ একটা রিস্টওয়াচ। পুরুষের রিস্টওয়াচ হ্যাঁ, আশার বাবাই দিয়েছেন এটা জামাইকে। আশা ত্বরিতে এসে ঘড়িটা তুলে দেখলো পৌনে তিনটা বেজে বন্ধ হয়ে গেছে! তাহলে এসেছিল, আশার পাশেই বসেছিল ঐ শোফাতে—ঘুমন্ত আশাকে দু'হাতে জড়িয়ে...হ্যাঁ, মনে পড়েছে আশার, এতক্ষণে মনে পড়েছে—ঘুমন্ত আশার ললাটে কে যেন নিবিড় স্নেহে চুম্বন করেছে। কপালটা ছুঁয়ে দেখলো আশা—স্পর্শ যেন লেগে রয়েছে এখনো। আশা বেশ বুঝতে পারলো—কাঁটা-ঘুরোবার কলটা টেনে রেখে, ঘড়িটা ইচ্ছে করেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পৌনে-তিনটার সময়। এই কাজ ওরই, ঐ বৈজ্ঞানিকের বিচিত্র বুদ্ধি। আশা ঘড়ির মাথাটা ঠেলে দিতেই সেটা আবার চলতে আরম্ভ করলো। পৌনে তিনটার স্বাক্ষর রেখে দিয়েছে ঘড়িতে!...মধুর হাসির সঙ্গে ওর চোখ ছেপে জল গড়িয়ে পড়ল ঘড়িটার উপর। ব্যান্ড-শুদ্ধ ঘড়িটা আশা সীমন্তে ছোঁয়ালো।

না, ব্যর্থ হয়নি। বিফল হয়নি তার ফুল-রজনী। আশার বেশ মনে পড়ছে—ওকে ডাক দিয়েছিল সে ঘুমের ঘোরে আশা কী বলেছিল মনে নেই। কিন্তু এখন পরিষ্কার মনে পড়েছে, সে ওর মাথাটা বুকে নিয়েই ওখানে বসে ছিল। স্বপ্ন নয়, সত্যিই!

আনন্দ যেন ডানা মেলে উড়তে চাইছে আশার বুকে! চঞ্চল পদে ঘরের মধ্যে খানিক ঘুরলো সে। এ-ঘরে এসে বড় অর্গনটার চাবি টিপে বাজলো আধ মিনিট, ওঘরে গিয়ে রেডিওর কাঁটা ঘুরিয়ে একটা ফরাসী গৎ শুনলো সিকি মিনিট—তার পর মনে পড়ল, শাশুড়ীর কাছে যাওয়া দরকার।

ওর জন্য নিযুক্ত ঝি কাছে-কাছেই আছে, ডাকলেই আসবে। কিন্তু আশা কাউকে ডাকলো না; আপন আনন্দে বারান্দার ফুলের টবগুলো ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ফুলগুলোকে আদর করে নীচে নেমে এল। শাশুড়ী কয়েকটি আত্মীয়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওকে দেখে বললেন,—এঁদের একটা গান শুনিয়ে দে তো, মা! ওঁরা বলছেন, কাল রাত্রে তোর গান শুনে নাকি ভুলতে পারছেন না।—হাসলেন শাশুড়ী। আশা ঝিকে ইঙ্গিত করলো যন্ত্র আনতে। যন্ত্র এলে আশা গাইতে আরম্ভ করলো শ্যামাসঙ্গীত—

"আর কিছু ধন নাই মা, শ্যামা, কেবল দুটি চরণ রাঙা..."

অপরূপ কণ্ঠ ওর! ভক্তি-সজল হৃদয়ে শুনলেন সকলে।

সংসারটা অন্য সব দিক দিয়েই ভাল। অভাব নেই, অশান্তি নেই। আদর-সোহাগ শাশুড়ীর কাছ থেকে অজস্র পাচ্ছে আশা। ওর জন্য নিযুক্ত ঝি-ও বেশ ভাল মেয়ে।

ভদ্রঘরের দুঃস্থা কন্যা, বালবিধবা। স্বল্প শিক্ষিতা। আশাকে নানা কাজে সে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু...

বড় একটা 'কিন্তু' থেকে গেছে আশার বিশেষ স্থানটিতেই। পুরো পাঁচটি দিন শ্বশুরবাড়ী ক'রে আশা বাবার সঙ্গে বাপের বাড়ী এল দু'চার দিনের জন্য। কিন্তু মনে মনে সে ভেবে রেখেছে মাস-দুই যাবে না শ্বশুরবাড়ী। স্বামীর গবেষণাটা শেষ হোক। সে যখন নিজে এসে নিয়ে যাবে তখন যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়ালো অন্য রকম। ওর বাল্য-সঙ্গিনীরা ক্রমাগত প্রশ্ন করতে থাকে—'বরকে কেমন লেগেছে,' কী কী কথা হোল তার সঙ্গে ; কবে ওর নামে বরের চিঠি আসবে...' ইত্যাদি। বানিয়ে গল্প আর কত বলা যায়! বিরক্ত হয়ে আশা তৃতীয় দিনেই শাশুড়ীকে চিঠি লিখে দিল, 'আপনার সেবায় ত্রুটি হচ্ছে মা—আমায় নিয়ে যান।' সেইদিনই শাশুড়ী গাড়ী আর বুড়ো দারোয়ান পাঠিয়ে ওকে বাড়ী নিয়ে এলেন। আশা আবার এসে উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলো, কখন আসবে স্বামী তার ঘরে।

না! ঐ ল্যাবরেটারীতেই আস্তানা আশিসের। বাইরে সে কখন বেরোয়, জানে না আশা। কোথায় শোয়, তাও জানে না। শুধু জানে, দুপুরে কোনো কোনো দিন এসে মা'র কাছে খেয়ে যায়। আশা তখন ওখানে থাকে না। অন্যদিন চাকর খাবার দিয়ে আসে ঐ ল্যাবরেটরীতেই। কী এক নিদারুণ গবেষণায় নাকি নিযুক্ত আছে আশিস—শেষ না-হওয়া পর্যন্ত নিষ্কৃতি নেই।...নিঃশ্বাসটা দীর্ঘতর হতে থাকে আশার। নিঃশব্দে আকাশপানে চেয়ে থাকে।

অভিমান কার ওপর করবে আশা! যার সঙ্গে বিয়ের কয়েকটা মন্ত্র ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ হোল না, তার উপর অভিমান করবে কোন্ অধিকারে? কে সে আশার! প্রশ্নটা মনে জাগলেও কিন্তু ওর চিরযুগের হিন্দু-নারী-মন বলতে থাকে, সে-ই আশার সব!

কিন্তু এভাবে দিন কাটানো যায় না। শাশুড়ীর সেবা নিখুঁতভাবে করার মধ্যে বন্ধুত্বের গৌরব যতই থাক, তরুণী-মনের পত্নীত্ববোধ তাতে পরিতৃপ্ত হয় না। ঝি চাকর-দারোয়ানের 'বৌরাণী' ডাক যতই মিষ্টি লাগুক, প্রিয়তমের 'নাম' ধরে ডাকার মতো তাতে অমৃত নেই। অতৃপ্ত আশা আশ্রয় খুঁজে পায় না! শাশুড়ী লক্ষ্য করেন—মাঝে মাঝে বলেন,

—ছেলেটা ওর গবেষণা নিয়ে বড্ড ব্যস্ত রয়েছে, বৌমা—তুই একটু বাইরে বেড়িয়ে আয় গে না? গাড়ী নিয়ে যা। সিনেমা দেখে আয়, না-হয় গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আয়।

আশা চুপ করে থাকে। দেখে, তিনি নিজেই কয়েকদিন ওকে নিয়ে কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর ঘুরিয়ে আনলেন। দু'একজন আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়িয়ে আনলেন। একগাদা মাসিক-সাপ্তাহিক কাগজের গ্রহক করে দিলেন। শেষে ওস্তাদী গান শেখাবার জন্য একজন মাষ্টার রেখে দিলেন—আশা একটা অবলম্বন পেল।

শাশুড়ী কিন্তু সত্যি জানেন না, পুত্রের সঙ্গে পুত্রবধূর কতখানি আলাপ-পরিচয় ঘটেছে। বেশী সময় বধূ একলা থাকে, এই ভেবেই তিনি গানের মাষ্টার রেখে দিলেন। কিন্তু ওঁর ধারণা, ল্যাবরেটরীর কাজ শেষ করে অধিক রাত্রে নিশ্চয় আশিস বাড়ীতে আসে। অতএব ভাবনার কিছু নেই। কারণ ছেলে তাঁর অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ—নিষ্পাপ নিষ্কলুষ চরিত্র তার।

—কাল অত রাত্রে গান করছিলি, মা—আশিস শুনতে চেয়েছিল বুঝি?

এই স্নেহপরায়ণা শাশুড়ীর অন্তরে তিলমাত্র ব্যথা দিতে চায় না আশা—চুপ করে রইল। গভীর রাত্রে একা-একা কেন যে সে গাইছিল, এঁকে বলে কি হবে। অনর্থক উনি

দুঃখ পাবেন। শাশুড়ী নিজেই আবার বললেন,

—তুই ওকে আরো সকাল সকাল আসতে বলিস্ না কেন, মা?

আশা এবারও উত্তর দিল না, নিঃশব্দে শাশুড়ীর পিছনে বসে পাকা চুল বাছতে লাগলো। শাশুড়ী যদি ওর মুখের কারুণ্য দেখতে পেতেন তো বুঝতেন, কী গভীর বেদনায় সে-মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি আবার বললেন,

—বলবি। বুঝলি?

—হুঁ।—আশার মধুর কণ্ঠে প্রায় কান্নার মতই বেরুলো 'হুঁ' শব্দটা।

কিন্তু শাশুড়ী লক্ষ্য করলেন না ; মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের জন্য চোখ বুঝলেন। আশা ওঁর মাথার পাকা চুল তুলতে তুলতে কখন উদাস হয়ে হাত-গুটিয়ে বসেছে, খেয়াল নেই। অন্তরের গভীর বেদনাকে প্রচ্ছন্ন করে এভাবে শাশুড়ীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে ওর ইচ্ছে করে না। মনে হয়, আশা কঠিন স্বরে তাঁকে জানিয়ে দেবে—কেন তিনি এমন উদাসী পুত্রের জন্য বধূ এনে একটা নারী-জীবন নষ্ট করলেন! কিন্তু কিছুই বলতে পারে না আশা। শাশুড়ীর এমন মাতৃস্নেহ এ-যুগে দুর্লভ—গল্পের বিষয়। আশা ভাবে, এঁকে দুঃখ না দিয়ে ধীর ভাবে সে কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখবে। অভাব কিছু নেই এখানে। লেখাপড়া গান-বাজনা নিয়ে আশা কাটাবে আরো কিছুদিন। শাশুড়ীকে সে কিছুই জানাবে না, বরং নিজেই একবার চেষ্টা করবে স্বামীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য।

ভাবতে ভাবতে আশা কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলো। উঠে পড়লো মার্বেলের মেঝে ছেড়ে। শাশুড়ী ঐ মেঝেতে শুয়েই ঘুমান কিছুক্ষণ দুপুরবেলা। বৈশাখের দুঃসহ গরম বাইরে তখনও আগুনের হল্কা ছুটিয়ে দিচ্ছে। আশা স্নানগারে ঢুকলো এসে।

স্নান সেরে নিজেকে পরিপাটি করে সাজালো—দর্পণে দেখলো একবার—হ্যাঁ, চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে। বেলাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আশা ঠিক করলো, সটান আশিসের ল্যাবরেটরী-ঘরে গিয়ে ঢুকবে। আশিস হয়তো ওকে চিনতেই পারবে না, বেশ মজা হবে! ও যেন কোথাকার কে—দেখা করতে এসেছে একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে, এই ভাবেই যাবে আশা। হাতের ভ্যানিটি-ব্যাগটায় ঝাঁকুনি দিয়ে আশা সটান চলে এল বাগানের পথে।

লম্বা রাস্তা—দু'পাশে নানান ফুলের গাছ—বাইরে থেকে কেউ দেখতে পাবে না ওকে। অতি নির্জন এই পথটুকু কী মনোরম—কী আবেশ-মাখা।

আশার অভিসার-পথ আনন্দে উদ্ভাসিত হচ্ছে। ওর অকথিত মনোবেদনা ভাষায় ব্যঞ্জিত হতে লাগলো দুপাশের ফুল-বল্লরীদের ওপর। কত কথাই না সে বলবে আজ তার প্রিয়তমকে!—কিন্তু, হয়তো লজ্জায় কণ্ঠে ভাষা জাগবে না, হয়তো কিছুই বলা হবে না! না, আশা বলার কথাগুলো সব গুছিয়ে নিচ্ছে মনের মধ্যে। বেশ সুন্দর ভাষায় সুন্দর ভঙ্গীতে সে জানাবে তার অভিযোগ—তার অন্তরের গোপন বেদনা।

নৃত্যচঞ্চল ওর ভঙ্গী যদি দেখে কেউ তো দেখুক! কিন্তু বাগানের এই বনপথে কোথাও কেউ নেই। মালীরাও এসময় এদিকে থাকে না। আশা চারদিক তাকিয়ে দেখলো—না, কেউ কোথাও নেই। নিঃশব্দে সে এসে দাঁড়ালো ল্যাবরেটরী-ঘরটার দরজার কাছে। উঁচু ঘর, কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল আশা—প্রকাণ্ড ঘরখানা দেখা যাচ্ছে।

ওদিকে, অনেকটা দূরে একখানা বড় গোল টেবিল ঘিরে কয়েকজনই, যুবক-প্রৌঢ় এবং

দুটি যুবতীও কথা বলছেন। বৈজ্ঞানিক আলোচনা। কারা ওরা? আশা ওদের কাউকে চেনে না। ওদের মধ্যে কে ওর স্বামী? আশা বুঝতে পারছে না। দু'জন যুবকের চুল-দাড়ি রয়েছে; একজনের মুখ সদ্য কামানো, চোখে চশমা। অপর জন প্রৌঢ়—কাঁচাপাকা চুল, বেশ সৌম্য মূর্তি। হয়তো উনি দিব্যেন্দুবাবু। আর একজন রোগা ফর্সা, হয়তো লম্বাও, কিন্তু মুখশ্রী খারাপ নয়। এর পর দুটি তরুণী। একজন কিছু স্থূলকায়া। অপরটা তন্বী, সুন্দরীই বলা যায়। কিন্তু সকলেই তাদের আলোচনায় নিবিষ্ট। আণবিক শক্তির ভয়াবহতা এবং তার কল্যাণকরী প্রয়োগ নিয়ে কথা হচ্ছে ওঁদের—আশা বুঝতে পারলো।

ল্যাবরেটরীর ওদিকে হয়তো বড় রাস্তা আছে, আর সেই দিকের দরজা দিয়ে এঁরা আসেন—আশা আন্দাজ করতে লাগলো দাঁড়িয়ে। এদিকের দরজাটা তাহলে 'প্রাইভেট'—অন্দরে যাবার পথ। হয়তো এঁরা সব রোজই আসেন—প্রতিদিনই হয়তো বিকালে এঁদের বৈঠক বসে। আশা দেখতে পেল, ওপাশের ছোট ঘর থেকে একজন চাকর ট্রে ভর্তি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। তন্বী তরুণীটি চা করতে আরম্ভ করলো। কথা চলছে ওদের, সেই সঙ্গে চা-ও। না, অপরিচিতা আশা ওখানে যেতে পারবে না। যাওয়া ওর উচিত হবে না। স্বামীর সঙ্গেও যখন ওর পরিচয় নেই, তখন ওখানে সে যাবে কোন্ ভরসায়? কী অধিকারে?

অভিমানিনী আশার অধিকারের কথাটাই মনে হোল বেশী করে। মনে হোল, এখন তো বেশ গল্প করবার সময় থাকে! সারা দিনরাত্রির মধ্যে আশাকে একটু দেখতে যাবার সময় হয় না। চমৎকার! এই বুঝি স্বামীর কর্তব্য!

কিন্তু কে ওর স্বামী? কোন্‌টি? আশা বহু চেষ্টা করেও অতদূর থেকে চিনতে পারছে না বিয়ের রাতে প্রায়-না-দেখা বরকে। ঐ লম্বামতনটিই হবে বোধহয়। কিন্তু ওঁরা তো সকলেই প্রায় লম্বা। তাহলে ঐ চুলদাড়ি...ঐ হবে নিশ্চয়। কিন্তু যদি না হয়...

নিজের স্বামীকে না চিনে আশা কাউকে 'স্বামী' ভাবতে যাবে কেন! না। ভাল করে জেনে নেবে আশা কোন্‌টি তার স্বামী।

কাছাকাছি কোন লোক পেল না আশা ; আর বেশিক্ষণ থাকতে ওর লজ্জা করছে ওখানে। চলে এল বাগানে। অজস্র মাধবী গুচ্ছ দুলছে ওখানকার ছোট গেটটাতে—তারই আড়ালে দাঁড়ালো।

অভিমানে অন্তরটা মুচড়ে উঠছে, কিন্তু চোখে ওর জল আসছে না। একটা জ্বালা যেন অনুভব করছে আশা সর্বেন্দ্রিয়মনে। কিন্তু তার চিরসহিষ্ণু অন্তর অকস্মাৎ কিছু করতে চায় না। ধীরভাবে নিজেকে ধরে আশা আবার চাইল ঐ একতলা ঘর খানার দিকে। দেখতে পেল—দু'পাশে ইঁটের কোণা দিয়ে সাজানো একটি সরু রাস্তা ঘরখানার দেওয়াল-বরাবর চলে গেছে ওপাশের আর একটা সিঁড়ির কাছে। ওটাও তাহলে এই ঘরে ঢুকবার পথ? দেখা যাক্, ওখানে গেলে ওদের ভাল ভাবে দেখা যায় কিনা। আশা চলে এল। ভেজানো দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। আশা এসে পৌঁছাল একটা ছোট ঘরে। সেখানে একজন লোকের থাকা-খাওয়া-শোয়ার সব ব্যবস্থাই রয়েছে। টেবিলে ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভ, কুকারও। ওপাশে দুটি আরামচেয়ার। পূর্ব-দক্ষিণে একখানা মেহগিনি কাঠের খাট, তাতে বিছানা! বাঃ, সবই ঠিক আছে অর্থাৎ দেখলেই বোঝা যায় ল্যাবরেটরীর মালিকটি এখানেই দিবা দিনরাত্রি যাপন করতে পারেন, এবং করেনও। পূর্বদিকের ছোট বারান্দায় একজন চাকরের

খাটিয়াও দেখতে পেল আশা। চাকরটার নাম কালিচরণ।

সে চায়ের ট্রে নিয়ে এ-ঘরে ফিরেই আশাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছে। আশা চাকরের কাছে নিজেকে অসম্বৃত না করে ধীরে ধীরে বলল,

—ঘরখানা পরিষ্কার কর না কেন, কালিচরণ?

—এজ্ঞে, দু'বেলা ঝাঁট দি,—তবে ওঁরা সব এসে বসেন কিনা। কাগজ-পত্তর—চিনা বাদাম, চানাচুর খান সব—আর চা হরদম করতে হয়...

—হরদম! কত কাপ চা রোজ খান তোমার বাবু?

—এজ্ঞে, বাবু বেশী খান না। খান সব ওনারা। বাবু দু'বেলা দু'কাপ।

—রান্নাও কর এখানে তুমি?

—এজ্ঞে, করি। মুরগী, আন্ডা সব তৈরী করতে হয় কিনা। বাড়ীতে তো হবার জো নেই। মা হতে দেবেন না।

—আচ্ছা, আমার জন্য এককাপ চা কর—বলে, বসলো আশা বিছানায়। ওর আশা যদি কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে আশিস আসে এ ঘরে তো দেখা হয়ে যাবে। ওদের কথ বেশ শোনা যাচ্ছে এ-ঘর থেকে। আশা বসে রইল। কালিচরণ ফুটন্ত জলে চা ছেড়ে স সম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও যেন আশাই করেনি আশাকে এখানে দেখবার। কিন্তু কালিচর জানে এ-বাড়ীর মালিক ঐ মেয়েটি। বলল,

—বাবুকে খবর দেব, বৌরাণী-মা?

—না, থাক্।

খবর দিতে বলাই উচিত ছিল আশার, কিন্তু লজ্জা এসে বাধা দিল। একান্ত অনালাপী স্বামীকে কেমন করে অকস্মাৎ ডেকে পাঠাতে পারে। তিনি কী মনে করবেন? আশার খুব ইচ্ছে করছে, কালিচরণ ডেকে আনুক আশিসকে। কিন্তু ডাকতে সে বলতে পারে না। যদি নিজেই কোনো কারণে এসে পড়ে আশিস তো, আশা সৌভাগ্য মনে করবে। কালিচর ভাল একটা কাপ বের করে চা তৈরী করে আনলো ট্রে-তে। আশা চায়ের কাপটা নিয়ে চিনি মেশাচ্ছে—শুনতে পেল সদলবলে ওঁরা সব বাইরে বেরিয়ে গেলেন কোথা।

কোথায় ওঁরা গেলেন কালিচরণ?—আশা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে দলটি।

—কি জানি কোথায় কী মিটিন্ আছে। —জবাব দিল কালিচরণ।

আশা দেখতে পেল তিনখানা মোটরে চড়ে ওঁরা সব অদৃশ্য হয়ে গেলেন। চায়ে আর রুচি নেই আশার। কাপটা হাতে নিয়ে সে ল্যাবরেটরী-ঘরে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই রইল আশা। কাপের চা কখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!

লেকের কাছে ক্লাব। সেখানেই সব নামলো এসে! বিশেষ একটা ব্যাপার ওঁদের আজ আছে, বেশ বোঝা যায়। ওঁরা সাতজন সবশুদ্ধ। পাঁচজন পুরুষ দুটি মেয়ে। এঁদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়। আশিসের বিজ্ঞানের প্রফেসার। বাকী সবাই ওরা বন্ধু। কিন্তু ক্লাবঘরে আরো বহু ব্যক্তি এসে জমায়েৎ হয়েছেন—আরো আসছেন।

নবীন বৈজ্ঞানিক আশিসের আবিষ্কার নাকি একটা বিস্ময় জাগাবে জগতে—তাই ওঁর সব আশিসকে অভিনন্দন জানাতে সমবেত হয়েছেন! আশিসের প্রফেসার দিব্যেন্দুবাবুই এর আয়োজনকারী। ভারতের এক বিশিষ্ট বাঙালী বৈজ্ঞানিক সভাপতিত্ব করবেন

দিব্যেন্দুবাবু আশিসের বাবার বন্ধু—তিনিই সভার উদ্বোধন বক্তৃতায় বললেন,

—আপনারা অনেক হয়তো জানেন না, আশিসের বাবা অমৃতবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন ছিলেন। তিনিও ছিলেন বৈজ্ঞানিক। আশিস যে ল্যাবরেটরীতে গবেষণা করে সফল হয়েছে, সেই ল্যাবরেটরী ওর বাবার তৈরী। তিনি ছিলেন আমার বন্ধু। এবং ঐ ল্যাবরেটরীতে আমিও তাঁর সঙ্গে গবেষণা করেছি। সে-দিনের কথা মনে হলে চোখের জল সামলাতে পারিনে। কিন্তু আশিসের সাতবছর বয়সেই অমৃত অমৃতলোকে চলে গেলেন—যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন, আশিসকে যেন আমি মানুষ করবার চেষ্টা করি...দিব্যেন্দুবাবুর আবেগময় কণ্ঠ আরো করুণ হয়ে উঠলো—কাউকে মানুষ করা কারও হাতে নয়, সবই ঈশ্বরের হাত বলে আমি বিশ্বাস করি। তাঁরই করুণায় আশিস যে আজ সাফল্য অর্জন করতে চলেছে, তাতে আমার আনন্দ সর্বাধিক। সকলে ওকে আশীর্বাদ করুন ও যেন বিশ্বের বৈজ্ঞানিক দরবারে ওর গবেষিত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এর পর আশিসকে বলতে অনুরোধ করা হোল—সে কী সম্বন্ধে গবেষণা করছে, এবং তার লব্ধ সত্য কোথায়, কবে সে প্রকাশ করবে। আশিস সকলকে যথারীতি সম্ভাষণ করে দাঁড়াবার পূর্বে, ওর হাতের ব্রীফ-কেস্‌টা টেবিলের একপাশে ঠেলে রেখে উঠে দাঁড়ালো, তারপর সকলের উদ্দেশে সবিনয় নমস্কার নিবেদন করে বলতে আরম্ভ করলো,

—বাবাকে আমার কিছুমাত্র মনে পড়ে না, কিন্তু তাঁর গবেষণাগার আমাকে শিশুকাল থেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আমার বৈজ্ঞানিক বৃত্তি পৈতৃক। আমার ঠাকুরদা ছিলেন মহাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়। তিনি আমাকে আঠারো বছরের রেখে স্বর্গে গেছেন। ঠাকুরদাই আমাকে শৈশব থেকে শিক্ষা দিয়েছেন—'আমাদের ঋষি-দৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ না হলেও এমন একটা দৃষ্টি তাঁরা লাভ করেছিলেন, তাকে জ্ঞানদৃষ্টি বা যোগদৃষ্টি যাই বলা হোক, সে দৃষ্টি অভ্রান্ত। শত-সহস্র বছর আগে তাঁরা যে-কথা বলে গেছেন, আজকের বৈজ্ঞানিক আধুনিক যন্ত্রযোগে তার পরীক্ষা ক'রে নির্ণয় করে যে—সে-কথা সত্য। অতএব বিজ্ঞানের সাধনায় ঋষিদের কথা সর্বদা মনে রাখবে...'আশিস একটু থামলো। ওর বলার ভঙ্গী মধুর। সবাই শুনছে। টেবিলটাকে ঘিরে সভাপতি, দিব্যেন্দুবাবু আশিস এবং তার বন্ধুবান্ধবরা। অপর সকলে একটু তফাতে বসে শুনেছে। আশিসের ব্রীফ-কেস্‌টা কখন যেন একটুখানি সরে এলো—কেউ লক্ষ্য করলো না। ওর মুখের চেন্‌টা কে-যেন টেনে, ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে কী একটা বের করে নিল।

লোকটা উঠে চলে গেল সকলের অন্যমনস্কতার সুযোগে। অত লোকের মধ্যে এই সামান্য কাজটুকু কেউ দেখলো না। আশিস বলছে,—তখন আমি বি. এস. সি. ক্লাশে, ঠাকুরদা একদিন কথায় কথায় বললেন,—ব্রহ্মা বললেন—"একোহহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়েয়—"অর্থাৎ এক আমিই বহু হব। একের এই বহুত্বই সৃষ্টি, এই বৈচিত্র্য সেই একেরই বিকাশ অথবা বিবর্তন। অতএব সৃষ্টির আদিতে ফিরে যেতে পারলে সেই নির্বিশেষ "এক"-কেই পাওয়া যাবে। যার পর আর কিছু নেই। আমার গবেষণার বিষয় সেই একের আবিষ্কার—একটু থামলো আশিস, দেখলো একবার চারদিকে তাকিয়ে—সবাই শুনছে ওর কথা!.বলতে লাগল,—বিশ্ববৈচিত্র্যের সেই পরম 'এক'-কে পরমাণুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে ধরা বড় সহজ নয়—অ্যাটম্-নিউট্রন-পজিট্রনের পারে যেখানে সেই 'এক' শুধু জ্যোতিস্বরূপ—শুধু নাদ-বিন্দুতে প্রকাশমান, আমাকে আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের

মাধ্যমে সেই কৈবল্য-বিন্দুতে পৌঁছাতে হবে! ব্যাপারটা অতিশয় জটিল। কিন্তু আপনাদের সকলের আশীর্বাদ আর আমার পিতৃসম গুরুদেব দিব্যেন্দু কাকাবাবুর বিরামহীন উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমি ঐ মহাতত্ত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। আমি যুক্তি এবং যন্ত্রযোগে প্রমাণ করতে পেরেছি যে, এক-ই 'বহু' হয়েছেন—এই বিচিত্র 'বহু'র পূর্ণ পরিণামও সেই 'এক'—সেই নাদ-বিন্দু—সেই শব্দব্রহ্ম সেই ওঁকার! আর্যঋষির চরণে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করে আমিও আপনাদের কাছে আজ স্বীকার করছি যে, তাঁদের আবিষ্কৃত সত্য অভ্রান্ত...।

সকলে হাততালি দিয়ে আনন্দ জানালেন। এর পর সভাপতি মহাশয় সংক্ষিপ্ত ভাষণে আশিসের বর্ণিত গবেষণার সাফল্য সম্বন্ধে সারা বিশ্বের বিস্মিত হবার আশা এবং জননী ভারতের গৌরবান্বিত হবার কথা ব্যক্ত করে সভা শেষ করলেন। অতঃপর কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা আছে। সকলে পাশের 'লন' এ বসলো গিয়ে। আশিসও এল। সে-ই খাওয়াচ্ছে সকলকে। অতএব সবাই এল কিনা, খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলো, ওর নিকট-বন্ধু নীতিশ অনুপস্থিত। অথচ নীতীশ তো এসেছিল ওদের সঙ্গেই। গেল কোথায়? এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে নর্মদাকে শুধুলো,

—নীতীশ কোথায় গেল?

—কি জানি! ছিল তো ওখানেই। হয়তো আমাদের প্লেটগুলো পাঠাবার তাদিগ করতে গেছে কিচেন্-এ।

হবে।—এতো লোককে চা-জলখাবার দেওয়াতে হবে, নীতীশ নিশ্চয় তারই তদ্বির করতে গেছে। বন্ধুর কাজ তো করবেই সে।

আশিস বসলো সকলের সঙ্গে। সভাপতি প্রশ্ন করলেন ওকে,

—কবে যাচ্ছ তুমি বোম্বাই? পরশু তো তোমার প্রবন্ধ-পাঠের দিন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি কাল 'এয়ারে' চলে যাব—সীট বুক্ করা আছে—বলতে গিয়েই আশিসের মনে পড়ে গেল, কথাটা এখনও সকলকে বলা হয়নি। আজই মাকে এবং আশাকে বলবে গিয়ে! আজ তার ছুটির দিন পরম শুভদিন—আজ সে আশার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলবে। বিয়ের পর সেই ফুলশয্যার রাত্রে ঘুমন্ত আশাকে দেখেছে আশিস, তারপর আর সময় হয়নি। ওর মুখখানা বিষাদিত হতে হতে আনন্দিত হয়ে উঠলো। আজ তার আবিষ্কৃত সত্য জগতের সম্মুখে জানাবার সুযোগ এসেছে -আশাকেও জানাবে সে-কথা।

—আপনার বউকে আজ এখানে আনা উচিত ছিল।—বলল নর্মদা।

—সে তো মার আঁচলেই ঘোরে। এ যাবৎ আমি-ই তাকে ভাল করে দেখিনি।

—দেখেছি আমরা। অতিমাত্রায় 'পতি-পরম গুরু' টাইপ!

—আমার জননীর নির্বাচন...গর্বে আশিসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—'পতি পরম গুরু' আর 'সতী-সীমন্তিনী'ই ভারতের আদর্শ...হাসল আশিস।

—কিন্তু আশিসদা...নর্মদা বলল—আমরা ভাবতেই পারি না—এতবড় মডার্ণ, শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক হয়েও আপনি মার নির্বাচনকেই প্রেফারেন্স দিলেন কি করে?

—মা'র থেকে সন্তানের বেশী মঙ্গল কেউ করে না, নর্মদা দেবী—মা বিশ্বমাতার মূর্তরূপ। মা'র নির্বাচনের প্রেফারেন্স দেব কি—মা'র নির্বাচন অমোঘ, অপ্রতিবাদনীয় আপনাদের ইংরাজি ভাষায়..

—থাক্, ধন্যবাদ! আপনার মাতৃভক্তিকেও ধন্যবাদ।—বলল নর্মদা।

হাসলো সবাই। দিব্যেন্দুবাবুও বসেছিলেন ওখানে। বললেন,

—আশিসের মা—আশিসের মা-বাবা একাধারে। অমন মা-ও কদাচিৎ মেলে। তোমরা তাঁর পূজারিণী বেশ আর অভিভাবিকা-মূর্তিই দেখেছ, তাঁর মাতৃরূপ দেখনি। দেখলে বুঝতে, তিনি শুধু আশিসের মা নন, আমাদেরও মা!

—জানি স্যার, আমরাও জানি। অমন মা কম আছে পৃথিবীতে!

—খাবারের আর চায়ের ট্রে এসে গেল বয়'দের হাতে। সকলেই জলযোগ করতে আরম্ভ করলেন। নীতিশ এসে পৌঁছাল। ঘামে গায়ের জামা ভিজে গেছে—কপালের ঘাম ঝরে পড়ছে চিবুকে। ব্যাপার কি! কোথায় ছুটোছুটি করছিল নীতীশ? আশিস হেসে বলল,

—তুই কি রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ি নামাচ্ছিলি নীতীশ?

সবাই হাসলো। নীতীশও হাসলো সেই সঙ্গে ; বলল হেসেই,

—মাংসের শিঙাড়াটা কেমন হয়েছে, বলুন তো স্যার?

—চমৎকার! কে তৈরী করলো? তুমি?—শুধুলেন দিব্যেন্দুবাবু।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই বৈজ্ঞানিক মিশ্রণ...

—ও একটা দ্রৌপদী, স্যার—রন্ধনে ও কালিচরণকে হার মানায়। প্রায়ই ল্যাবরেটারীতে ষ্টোভে মাংস রান্না করে, মোগলাই রান্না—বলল আশিস।

—তুই খাওয়াচ্ছিস—একবার সবটা ঘুরে দেখে আয়। সবাইকে বল, কার কী চাই—বুঝলি?—নীতীশ বলল আশিসকে।

—হ্যাঁ, যাওয়া উচিত।—আশিস উঠে গেল। ওর ব্রীফ-কেসটা পড়ে রইল ওখানেই। সবাই খাচ্ছে! মাংসের শিঙাড়া সত্যি ভাল হয়েছে। চেয়ে নিচ্ছে অনেকেই। আশিস সবাইকে বলে বেড়ালো,

—আমার বৈজ্ঞানিক সহপাঠী এবং সহকর্মী নীতিশ এই মাংসের শিঙাড়া তৈরী...উঁহু, রচনা করেছে। রন্ধনে ওর হাত কাব্যের মতো খোলে—কেন যে সে নীতীশ না-হয়ে নিত্যকালী হোল না...

আমরাও তাই ভাবছি!—হেসে বলল বন্ধুগণ। কাবেরী, কৃষ্ণা নন্দিতা, নর্মদা সবাই স্বীকার করলো নীতিশবাবুর রন্ধনের হাত নারীদের থেকে দক্ষ। রাঁধুনি বামুন হলে ওর মাইনে হোত শ'খানেক, বাবুর্চি হলে হোত হাজার...কেন যে ও বৈজ্ঞানিক হতে গেল!

আশিস ফিরে এল নিজের খাবার টেবিলে। নীতীশ চুপচাপ বসে আছে। মুখখানা লাল। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ওর। ক্লান্ত, বিষণ্ণ...

—শরীর খারাপ লাগছে, নীতীশ?—আশিস প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ...মাথাটা...

—চা খা। খোলা হাওয়ায় একটু বসলেই ঠিক হয়ে যাবে। রান্নাঘরে অতক্ষণ কেন থাকতে গেলি তুই? গরম সহ্য হবে কেন!

—না, ও কিছু না—বলে নীতীশ চা খেতে আরম্ভ করলো...কিন্তু ভাবছে। ক্রমাগত ভাবছে চুপচাপ! এদিকে পার্টিতে হাসির হুল্লোড় চলেছে। আশিসও সানন্দে যোগ দিয়েছে সেই হাসিতে, কিন্তু নীতীশ যেন নিবে গেছে। অথচ সবাই জানে নীতীশ বিশেষ বন্ধু আশিসের। নীতীশেব গবেষণা করবার মতো ল্যাবরেটরী বা আর্থিক সামর্থ্য নেই,—কিন্তু

সেও বৈজ্ঞানিক এবং সহপাঠী আশিসের। গরীবের ছেলে নীতীশ। কোনোরকমে টিউশ্যনি ক'রে এবং আশিসের সাহায্য নিয়ে এম-এস-সি পাশ করেছে, তারপর আর এগুতে পারেনি। কিন্তু বুদ্ধি তার অসাধারণ। সেও সুযোগ-সুবিধা পেলে আবিষ্কারক হতে পারতো। এখন দু'বেলা দুটো টিউশ্যনি করে, আর বাকী সময়টা আশিসকে সাহায্য করে। ঢাকুরিয়ার একখানা জীর্ণ বাড়ীতে ও থাকে একা। নিজেই রান্না করে খায়। বেশিরভাগ দিন খায় আশিসের বাড়ীতেই। লম্বা, ফর্সা—মুখশ্রীও মন্দ নয়। আশিসের থেকে বয়সে কিঞ্চিৎ বড়। আত্মীয়ের মধ্যে আছে ওর এক বিধবা পিসিমা—মাসে তাঁকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে হয় কাশীতে। বিয়ে ও করেনি। করবার ইচ্ছেও নেই। কারণ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার মতো কোনো সুবিধাই নেই ওর। বড় জোর মাষ্টার বা কেরাণী হতে পারে। কিন্তু ওর উচ্চাশা ওকে অত নীচুতে নামতে দিতে চায় না। নীতীশ ভাবে, যদি কখনো সুযোগ সে পায় তো দেখিয়ে দেবে—সে বড় হতে পারে।

ছেলের বন্ধু এবং ভালছেলে ব'লে আশিসের মা ওকে খুবই স্নেহ করেন! এখন কি, আশিস সম্বন্ধে বিশেষ-বিশেষ কথা উনি নীতিশকেই বলেন। নীতীশ তাঁকে মা বলে ডাকে। অবারিত দ্বার নীতীশের ওখানে। কিন্তু আশিস এই মাসখানেক অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল, আর নীতীশ তাকে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করছিল, তাই নীতীশ মা'র সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি। তবু একদিন ভেতরে এসে কথা বলে গেছে সন্ধ্যার দিকে।

পার্টি শেষ হোল। সবাই উঠলেন। আশিসও প্রফেসর দিব্যেন্দুকে প্রণাম করে নিজের 'কার'-এ উঠলো নীতীশকে ডাক দিল,

—আয়—

—থাক আশিস, শরীরটা খারাপ লাগছে। আমি রিক্সা করে বাসায় চলে যাচ্ছি। এই দিকে বাসা কাছে হবে। তুই যা...

নীতীশেব জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো আশিসের মুখাখানা। বলল,—যা,—যা, শুয়ে থাক্‌গে। সকালেই আসিস্! না-হলে আমি খুব চিন্তিত থাকবো। আমারও সময় নেই যে যাব তোর ওখানে। বোম্বাই রওনা হয়ে যেতে হবে সকালেই।

—আচ্ছা...নীতিশ চলে গেল।

আশিসও বাড়ী ফিরতে আদেশ করলো শোফারকে।

সেই আধো-অন্ধকারে গবেষণাগারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আশা—ওর অন্তরে বেদনার মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। স্বামী তার বন্ধু-বান্ধব এবং বান্ধবী নিয়ে এমন উৎসব করতে পারেন—এতো হৈ-হল্লা চলে এখানে আর নববিবাহিতা বধূর সঙ্গে সাক্ষাৎ কারবার অবসর হয় না! অবসর যথেষ্টই আছে—ইচ্ছারই অভাব। কিন্তু কেন? কিছুই বুঝতে পারছে না আশা! ওর বুক থেকে বড় একটা শ্বাস ঝরে পড়লো গবেষণাগারের অন্ধকার আকাশে। কিন্তু আশা অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল মেয়ে—ভারত-নারীর সহনশীলতার মূর্তি ও। প্রায় মাসখানেক তার বিয়ে হয়েছে, অথচ এখানে স্বামীর সঙ্গে একটা কথা হোল না—তাকে চোখে দেখা পর্যন্ত হোল না! ওর মতো তরুণীর মনে সে বেদনা দুঃসহ, তবু ও ধৈর্য্য ধরেই ভাবলো—শোবার ঘরখানা একটু গুছিয়ে বিছানাটা ঝেড়ে পেতে রেখে যাবে সে আজ।

সন্ধ্যার কালোছায়া নেমে আসছে সর্বত্র। সন্ধ্যাদীপ জ্বালার সময়! আশার অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জাগলো, এখানেই সে আজ সন্ধ্যাদীপ জ্বালাবে। কিন্তু প্রদীপ তো নেই!

কালিচরণকে বললো,

—কিছু ধূপ এনে দিতে পার, কালিচরণ? চন্দন-ধূপ!

—এজ্ঞে, আমি তো বাজারে যাবই—লিয়ে আসবো। আপনি থাকুন—ঘর খুলা রইল। আমি চট্ করে আসছি—কালী চলে গেল বাজার থলি হাতে।

আশা একা ল্যাবরেটরীর বড় হল্‌টায়। চারিদিকে নানান যন্ত্রপাতি, আলমারী আলনা—কত কি! আলো জ্বালা হয়নি—কালী জ্বেলে গেল না। কেমন যেন থমথমে ভাব ঘরখানায়—আশার ভয় ভয় করছে! কিন্তু এখানে খুব বেশী বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করা হয় বলে, সুইচ প্লেটের উপর লেখা রয়েছে 'সাবধান! বিপদ!' আশা আগেই ওটা পড়েছে, তাই আলো জ্বালাতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল। শোবার ঘরের বড় টেবিলটার উপর একটা শেড-দেওয়া টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে গেছে কালিচরণ, আর ওদিকের গেটের আর্চিং-এ মাধবীলতার ফুল-পাতার আড়ালে আর একটা আলো জ্বলছে। বাড়ীটার দুই অংশের দু'দিকে দুটো রাস্তা—সূর্য্য সাহা লেনের দরজাটায় বাস্তুবাড়ী আর এদিকের বড় রাস্তাটার নাম মনীরুদ্দীন স্ট্রীট—নম্বর কত কে জানে! ল্যাবরেটরীতে যাঁরা আসেন, তাঁরা এই মনীরুদ্দীন ষ্ট্রীট দিয়েই আসেন—আশা বুঝলো। এদিকে ল্যাবরেটরীর-বাড়ীর সম্মুখে হাত কুড়ি চওড়া আর হাত পঞ্চাশ লম্বা বাগান, তার পর গেট, তারপরই মনীরুদ্দীন ষ্ট্রীট, কিন্তু মনীরুদ্দিন ষ্ট্রীট জনবিরল পথ—আশা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে, কৈ কেউ তো পথ দিয়ে গেল না!

আশা গেটের আলোতে দেখতে পেল—আর্চিং-গেটের ওপর লতানো মাধবীলতাটায় অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে। কেমন যেন সাধ জাগলো ওর কতকগুলো ফুল তুলে আশিসের বিছানায় রেখে যাবে, আর চন্দন ধূপ জ্বেলে দিয়ে যাবে—তার অভিসারে আসার চিহ্ন! আশা গেটের কাছে এসে ফুল তুলতে আরম্ভ করলো! স্বপ্নের মতো সুন্দর মনে হচ্ছে নিজেকে—যেন রূপকথার রাজকুমারী মনে হচ্ছে ওর। আঁচল ভর্তি ফুল তুললো মৃদুস্বরে গান গাইতে গাইতে—তারপর অন্ধকার ল্যাবরেটরী পার হয়ে নীলাভ আলোতে আশিসের শোবার ঘরটায় ঢুকলো এসে। বিছানাটা এবার ঝেড়ে পাতবে—টেবিলে ফুলগুলো নামাতে যাচ্ছে আশা, হঠাৎ গেটে যেন কে ঢুকলো মনে হোল। জানালাপথে থাকিয়ে দেখলো আধো অন্ধকার পথ বেয়ে কে যেন ল্যাবরেটরীতে ঢুকলো এসে। আশিসই এল নাকি? আশা চকিতে সরে দাঁড়ালো একটা বড় আলমারীর আড়ালে।

ল্যাবরেটরীর অন্ধকার ঘরে ঢুকে আগন্তুক ডাক দিল মৃদুস্বরে,—কালিচরণ—কালী...

কেউ সাড়া দিল না। কোথায় গেছে কালিচরণ? হয়তো বাজারে আগন্তুক সটান এসে ঢুকলো শোবার ঘরে। হাতে একতাড়া চাবি। ল্যাবরেটরীর দিকের দেওয়াল ঘেঁষে বড় টেবিলটা, রাজ্যের জিনিস তার উপর—বই খাতা কলম, আর ওরই উপর দেওয়াল ঘেঁষে একটা ছোট তাক-এ বড় বড় মোটা মোটা বই। মাঝে খাটখানা তার এদিকে বড় আলমারীর আড়ালে আছে আশা! ল্যাম্পে শেড-দেওয়া, তাই আশা আগন্তুকের কোমর থেকে নীচের দিকটা দেখতে পাচ্ছে। সুন্দর স্যুট-পরা যুবক। নিশ্চয় আশিস। নইলে এমন স্বচ্ছন্নদভাবে কে আর ঘরে ঢুকতে পারে! তারপর হাতে চাবিও রয়েছে। আশা নিঃশব্দে দেখতে লাগলো আশিস কী করে।

টেবিলের উপর বই এর ছোট তাকটা দু'হাত দিয়ে সরিয়ে নিতেই পিছনে দেওয়ালে গাঁথা আয়রন-সেফ নজরে পড়ল। আশিস তোড়া থেকে একটা চাবি নির্বাচন করে তালা

খুলে ফেললো সেফ-এর। তার মাঝের ড্রয়ার টেনে বের করলো একটি চামড়ার কেস্। বেশ বড় এবং মোটা। হয়তো টাকাকড়ি আছে। টেবিলে সেটা নামিয়ে রেখে আশিস তালাটা আবার বন্ধ করছে।...

আঁচল ভর্তি ফুল নিয়ে আশা অপেক্ষা করছে আলমারীর আড়ালে। আলোটায় শেড্-দেওয়া থাকায়, আর আগন্তুক দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে সেফ বন্ধ করায় আশা তার মুখ দেখেতে পাচ্ছে না। কিন্তু শোবার ঘরে এমন সহজভাবে চাবি দিয়ে সে সেফ খুলছে, সে নিশ্চয় আশিস! আশার কেমন যেন উত্তেজনা এসে গেল। এই ঘরে মনোরম পরিবেশের একান্ত নির্জ্জনতায় আশা তার প্রথম মিলন ঘটাবে স্বামীর সঙ্গে?

—শুনছেন? শুনুন...আশা ডাক দিল মৃদুকণ্ঠে।

অকস্মাৎ অতর্কিত আহ্বানে আকস্তুক চমকে উঠলো—হাত থেকে পড়ে গেল চাবির গোছাটা ঝনাৎ করে! কিন্তু সে মুখ ফেরালো না। আশা আলমারীর আড়াল থেকে বেরিয়ে বলল,

—ভয় নেই। ভূত নয়। আমি আশা—

—ও...হ্যাঁ। কি...হেঁট হয়ে চাবির গোছাটা কুড়লো আগন্তুক।

—কী আবার! একমাস আমি এসেছি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করবারও সময় হয় না আপনার? এদিকে তো দেখি বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে খুব হৈ-হুল্লোড়! এই বুঝি গবেষণা?

নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা সেফের দিকে মুখ করে। আশা বলল,

—ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে হাত-ঘড়িটা দিয়ে এসেছেন। ঘড়িতে তো বছর লেখা থাকে না—ঘণ্টা-মিনিট কবে পার হয়েছে। ক'বছর আমি একা থাকবো!

আগন্তুক তথাপি নিশ্চল। আশা নিদারুণ উত্তেজনায় বলল—কথা বলছেন না যে? আমি কি এতই কুচ্ছিৎ যে, আপনি দেওয়ালের পানেই মুখ করে থাকবেন! কি হয়েছে? আমি কি অপরাধ করেছি? বৈজ্ঞানিকের বুকে কি বউ এর জন্য একটু মমতাও থাকে না।

আগন্তুক যেন ভাবছে, কি করতে হবে...কি বলতে হবে এই আবস্থায়...

আশা এগিয়ে এল এপাশে টেবিলের কাছাকাছি! আগন্তুক এতক্ষণে বই-এর তাকটা দু'হাত দিয়ে যথাস্থানে রাখতে বলল,

—আমি বড় ব্যস্ত আছি লক্ষ্মী আর দিন-পনেবো পরেই আমার কাজ শেষ হবে...

—কাজ পৃথিবীতে সবাই করে! আপনি একাই বিজ্ঞানের সাধনা করছেন না! কাজ আছে বলে আমার পানে তাকাতেও মানা নাকি? নাকি আর কোনো কারণ আছে ভেতরে? থাকে তো বলুন...আশার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল—আবেগ-মাখা কণ্ঠে বলল সে,

—আমার অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করে দিলাম আজ...যা হয় করবেন...আশা আঁচলের ফুলগুলো ঢেলে দিল ওর পায়ে!

নতজানু আশার নয়নাসার-বিগলিত মুখপানে তাকালো সে এতক্ষণে। নীলাভ আলোকোজ্জ্বল কক্ষে আশার অসাধারণ কারুণ্য-সুন্দর মুখশ্রী আবেদন বিহ্বল করে দিল যুবককে!

বিস্ময়-স্তম্ভিত কয়েকটি ক্ষুদ্র মুহূর্ত!...

আপনার অজ্ঞাতসারে হাতখানা ওর এগিয়ে এল আশার চিবুক স্পর্শ করতে, কিন্তু

অকস্মাৎ থেমে গেল...

—আমি—আমি আজই তোমার সঙ্গে দেখা করবো, লক্ষ্মীটি! এখন বড্ড ব্যস্ত আছি—ওখানে আমাকে অভিনন্দন দেবেন বন্ধুরা। তাঁরা অপেক্ষা করছেন।—আসি এখন—

চলে যাচ্ছে—আশা চোখের জলে আচ্ছন্ন চোখদুটো আঁচলে মুছে দেখলো, চলে গেল স্বামী চাবির তোড়া হাতে। চামড়ার কেস্‌টা নিতে ভুলে গেছে! আশা তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে বেরিয়ে এসে বলল,

—আপনার কেস্‌টা ভুলে যাচ্ছেন যে! বউ ভুললে চলে, বিজ্ঞান ভুললে তো চলে না।

আবার অসীম অভিযোগ ধ্বনিত হোল কণ্ঠে ওর—যুবক অন্ধকার ল্যাবরেটরী থেকে বাইরে বাগানে নামছে। মুখখানা বাগানের দিকেই। জায়গাটা অন্ধকার। আশা ভাল করে স্বামীকে দেখতে চাইলেও দেখা গেল না। যুবক ওখান থেকেই হাত বাড়িয়ে বলল,

—ও...দাও, ধন্যবাদ ত্বরিতে বেরিয়ে গেল গেটের বাইরে। তারপর মোড়ের মাথায়-দাঁড়ানো ট্যাক্সিতে উঠে চলে গেল।

আশা তখনো দাঁড়িয়ে ল্যাবরেটরীর সিঁড়ির ধাপে। কালিচরণ বাজার নিয়ে ঢুকলো। এই প্রেমাভিনয়ের কিছুই কালিচরণকে সে জানতে দিতে চায় না। নিজেকে সামলে শোবার ঘরে চলে এল আশা। কালিচরণ ভেতরে এসেই আলো জ্বালালো এ-ঘরটার—ধূপের গোছাটা দিল আশার হাতে। আশা ওর থেকে কয়েকগাছা ধূপ টেনে নিয়ে জ্বেলে দিল। বিছানাটাও ঝেড়ে পেতে দিল। তারপর কালিচরণকে বলল,

—আমি যাচ্ছি, কালিচরণ!

ভেতর দিকের বাগানের পথ ধরে অন্তঃপুরে ফিরছে সে।

অন্তরটা আনন্দে নৃত্য করছে যেন! আজ সে কথা বলেছে স্বামীর সঙ্গে। স্বামীও বলেছে আজই দেখা করবে। আশা আবেগ-বিহ্বল ভাবে ভাবছে, আজ তার পরম দিন! সে গিয়ে প্রস্তুত হবে স্বামীর জন্য। কিন্তু শাশুড়ী হয়তো জানতে পেরেছেন আশা এখানে এসেছে। এতক্ষণে লজ্জা অনুভব করলো আশা। নিত্য সন্ধ্যা প্রদীপ সে জ্বালে শাশুড়ীর পূজার ঘরে। তাড়াতাড়ি ফিরে দেখলো পূজা শেষ করে শাশুড়ী দাঁড়িয়ে আছেন। আশাকে দেখে আনন্দের হাসি হাসলেন তিনি। যেন বুঝিয়ে দিলেন হাসি দিয়ে যে, আশার অভিসার-যাত্রার কথা তিনি জানেন। সঙ্কুচিতা আশা কিছু বলবার পূর্বে তিনি বললেন,

—আমার কোনো অসুবিধা হয়নি, মা—যা, তুই কাপড় ছেড়ে আয়।

আশা আরো লজ্জিত হলো, ঘাড় নীচু করে তিনতলায় নিজের ঘরে গিয়ে উঠলো ; কিন্তু লজ্জিত হলেও মাতৃসমা শাশুড়ীর স্নেহভরা কথায় আশা পরম আশ্বাস লাভ করলো। বর্তমান যুগে এমন অসাধারণ শাশুড়ী সত্যি দুর্লভ। উনি কাপড় ছেড়ে আবার ফিরে যেতে বললেন পূজার ঘরে। আশা তারই আয়োজন করছে।

তেতলায় তিনখানা ঘর, দুটো শোবার পাশা-পাশি, একটা বসবার। বাকিটা ছাদ। কিন্তু তারই খানিকটা টালি-ছাওয়া বারান্দা দক্ষিণ দিকে। ওখানে টবের উপর নানান ফুলের গাছ, আর আছে একটা দোলনা টাঙানো। আশা ঐ দোলনটায় ব'সে আশিসের ল্যাবরেটরীর দিকে তাকিয়ে থাকে—বেশ দেখা যায় এখান থেকে ল্যাবরেটরীটা। সংলগ্ন স্নানঘরে ঢুকেও আশা তার আজকের বেশ ছাড়তে চাইছে না—এই বেশে সে তার প্রিয়তমের স্পর্শ...না-

না-না, আশার মনে পড়লো আশিস তাকে ছোঁয়ও নি। এ বেশ তার ব্যর্থ হয়েছে। আবার সে নতুন করে সজ্জা করবে। ভাবতেই কেমন যেন মুখখানা মলিন হয়ে উঠলো ওর। একটু ছুঁলো না কেন তাকে আশিস। কেউ তো ছিল না ওখানে! কালিচরণও না। অত নির্জন—অত সুন্দর পরিবেশ, তবু আশিস এমন করলো কেন? বৈজ্ঞানিক কি মানুষ নয়? নির্লজ্জের মতো আবেদন জানিয়েছিল আশা—এতক্ষণে ওর যেন লজ্জা করতে লাগলো। কিন্তু এখন আর করবার কিছু নেই। কাপড় বদলাতে-বদলাতে আশা ভাবতে লাগলো, কে জানে কি মনে করছে আশিস। হয়তো খুবই নির্লজ্জ ভবছে আশাকে।—যা ভাবে ভাবুক গে। আজ এলে ওর সঙ্গে আলাপের পর জানিয়ে দেবে যে, ঐভাবে স্মরণ করিয়ে না দিলে আশিসের হয়তো মনেই পড়তো না আশাকে।

গা ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে আশা নীচে নেমে এল। সমস্ত দেহখানা যেন গান গাইছে ওর। কিন্তু আশিস নিশ্চয় এখানে খেতে আসবে না। ওর রান্না তো ওখানেই করছে কালিচরণ—দেখে এল সে। আশা আজ বলবে যে খাবারটা অন্তত আশিস যেন বাড়ীতে এসেই খায় মুরগী, ডিম না-হয় যেদিন খাবে, ওখানেই খাবে।

—আশিস কি এখানে খেতে আসবে রে আজ? শাশুড়ী প্রশ্ন করলেন।

—কি জানি, মা—ওদের আজ কিসের পার্টি আছে। খুব ব্যস্ত সব।

শাশুড়ী আর কিছু বললেন না। ছেলে তাঁর পড়াশুনা নিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম করে—মাংস-ডিম না খেলে তার শরীর টিকবে না। তাই মা ওখানে বাড়ীর পুরাতন চাকর কালিচরণকে রেখে দিয়েছেন। কালিচরণ ভাল রাঁধতে পারে, আর আশিসকে মানুষ করছে ছোট থেকে। আশাকে বললেন,

—তা হলে আর কি আছে? যা গান-টান কর গে!

আশা তবু কিছুক্ষণ বসে রইল শাশুড়ীর কাছে খামোকা—লজ্জা করছে বলা মাত্র উঠে যেতে। শাশুড়ী আবার বললেন,

—আশিস বোধহয় কালই বোম্বাই যাবে। তোকে বলেছে কিছু?

—না, মা...বোম্বাই কেন, মা?

—ওর কী-সব গবেষণা নাকি সেখানে বৈজ্ঞানিকদের শোনাবে। তুই জিজ্ঞেস করিস নে কেন? আমি কি অত সব বিজ্ঞানের ব্যাপার বুঝি। ওর বাবা বিজ্ঞান বিষয়ে আমাকে কত-কি বলতেন, আমি কিছু বুঝতাম না!—হাসলেন মা—শেষে একদিন একটা মজার অঙ্ক দিলেন—

—কী অঙ্ক, মা?—আশা হাসিমুখে শুধালো।

—বললেন, 'দুই বাপ আর দুই ব্যাটায় তিনজন লোক কি করে হয়, বলো?'...

—তা কি করে হবে, মা। দুই আর দুই—চার...

—ঐ তো মজা! ধাঁধা একটা। শোন—তোর ঠাকুরদা আর তোর শ্বশুর—বাপ-বেটা, তোর শ্বশুর আর আশিস—বাপ-বেটা, তাহলে দুই বাপ, বেটা...কিন্তু ওরা হলেন...

—তিন জন—আশাই হেসে বলল,—বেশ তো মজার অঙ্ক, মা!—এমনি আরো কত-কি বলতেন উনি।...যা মা, ওপরে যা!...

হয়তো স্মৃতির বেদনা ঘনিয়ে এল মুখে ওঁর। আশা আর কথা বলল না। ওঁর পায়ে আর অল্পক্ষণ হাত বুলিয়ে চলে এল। ঝি ওর বিছানা পেতে রেখেছে। আশা আবার সাজ

করলো। ঝি-কে শুতে পাঠিয়ে দিল। সারা ছাদটাতে সুন্দর জ্যোৎস্না। রজনীগন্ধার ফুলগুলো টবে-টবে যেন চন্দ্রালোক ধরবার ফাঁদ পেতেছে। টালির ছাদে লতানো মালতীর গন্ধে বাতাস মন্থর-মদির। আশা ফুলসাজে সেজে দোলনটায় বসলো ট্যাবরেটরীটায় আলো জ্বলছে। হয়তো এখনো পার্টি চলছে তাদের। চলুক। বসে বসে গান গাইতে লাগলো।

—"পাশে এসে বসেছিল তবু জাগি নি..."

নিজের গাড়ীতে ফিরলো আশিস। ফেরার পথে প্রফেসর দিব্যেন্দুবাবুকে নামিয়ে দিতে হোল তাঁর রসা-রোডের বাড়ীতে। সুতরাং কিছু দেরী হোল তার। অন্যান্য বন্ধুরা যে-যার বাড়ী চলে গেছে। গাড়ী থেকে নামবার সময় বিদ্যেন্দুবাবু ওর পিঠ চাপড়ে আদর করে বললেন,

—বিজ্ঞান-আকাশের জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্ক হও...আমার আশীর্বাদ।

ল্যাবরেটরীটা অন্ধকারই রয়েছে। কালিচরণ আলো জ্বালেনি।—কালিচরণ—ও কালিচরণ...ডাক দিল আশিস। কালী জবাব দিল,

—যাই...

কিন্তু কালিচরণ আসার পূর্ব্বেই আশিস শোবার ঘরে ঢুকে শিলিং-এর আলোটার সুইচ টিপলো। আলোয় আলোময় হয়ে গেল ঘর। ধূপের গন্ধে বাতাস ভারী—বিছানাটা ভাল করে পাতা রয়েছে। মেঝেতে মাধবীগুচ্ছের ছড়াছড়ি। ব্যাপার কি! কে এসেছিল এখানে! আশিসকে বেশী ভাববার অবসর না দিয়েই কালিচরণ এসে দাঁড়াল।

—এসব কি, কালিচরণ? কে এসব করলো! ধূপ? ফুল—

—বউরাণীমা এসেছিলেন, দাদাবাবু!

—এখানে?

—এজ্ঞে—

বিস্ময়ের সঙ্গে অপূর্ব আনন্দের সুরে আশিস শুধু বলল,

—আচ্ছা, যাও। তুমি কি করছো?

—এজ্ঞে রান্না করছি।

আশিস আর কিছু বলল না, বিছানায় শুলো বিশ্রমের জন্য। কালিচরণ চলে গেছে। আশিস কিন্তু দেখতে পেল টেবিলের বইগুলো যেন ঠিকমত নেই। আশাই হয়তো নাড়াচাড়া করছে। মৃদু মৃদু হাসছিল আশিস—আপন মনে গাইতে লাগল,

—"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত-সুদূর—আমার সাধের সাধনা..."

মেঝে থেকে একমুঠো ফুল তুলে নিল আশিস গানটুকু গাইতে গাইতে—বুকে রাখছে, অকস্মাৎ দেখতে পেল—কোমল-সুন্দর মাধবী-গুচ্ছে কাদা লেগে রয়েছে। পুরুষের ভারী জুতার তলার কাদা। একি! কাদা কেন ফুলে? বৈজ্ঞানিক আশিস বিস্মিত হয়ে পরীক্ষা করছে—কাদাটা হাতে লাগলো ওর। কেমন যেন সন্দেহ জেগে উঠলো মনে। ত্বরিতে উঠে ঘরখানা তদারক করতে আরম্ভ করলো—

টেবিলের কাছে এসে বই-এর তাকটা দেখলো, সরিয়ে আয়রন-সেফের ডালাটা খুলে ড্রয়ার টানলো—চামড়ার ব্রীফ-কেসটা নেই!

চোখ দুটো কপালে উঠে গেল আশিসের! একি আশ্চর্য্য! কী হোল তার চামড়ার কেস্‌টা! বিবর্ণমুখে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে আশিস ডাক দিল,

—কালিচরণ?

কঠোর কঠিন আহ্বান-স্বর। উনুনে খোন্তা চালাচ্ছিল কালিচরণ, সব ফেলে ছুটে এসে দাঁড়ালো মাথা নীচু করে। আশিস বলল,

—বউরাণী কতক্ষণ ছিল এখানে?

—এজ্ঞে অনেকক্ষণ...

—আর কেউ ছিল? ওর কোন বন্ধু বা ওর ঝি...

—এজ্ঞে...না,...নীতিশ দাদাবাবু এসেছিলেন!

—নীতিশ?

—এজ্ঞে! আপনারা সব চলে যাবার পর বৌরাণী আমাকে ধূপ আনতে বললেন, আমি বাজারে গেলাম—ফেরার সময়...

—কী দেখলে...আশিস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। কালীমাথা নীচু করে বলল,

—দেখলুম...আমি তখনো গেটে ঢুকি নাই, হুজুর—হৈ বাইরে আমি রাস্তায় দেখতে পেলুম...নীতিশ দাদাবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্চিলেন, বৌরাণী তাঁকে ডাক দিয়ে কি-যেন একটা...

—দিলেন?

—এজ্ঞে! নীতিশ দাদাবাবু সেটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন..., কি হইছে হুজুর?

আশিস উদাস দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে রইল! কালীর প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরী হোল ওর। তারপর ধীরে ধীরে বলল,

—কিছু না সব ঠিক আছে। যাও, তুমি রান্না করো-গে।

কালিচরণ কিন্তু তার পরেও আধমিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে চলে গেল পাশের রান্নাঘরে। আশিস জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। উজ্জ্বল আলোতে ঝলসে যাচ্ছে যেন ঘরখানা! আয়রন-সেফটা খোলা, বইগুলো বিপর্যস্ত! আশিস আকাশের চাঁদটা মেঘের আড়ালে সরে সরে যাওয়ার খেলা দেখছে। চাঁদটা লুকিয়ে গেল মেঘে। হ্যাঁ, লুকিয়ে গেল! আশিসের জীবন-চন্দ্রিমাও লুকালো বুঝি। সবই পরিষ্কার হয়ে গেল কালিচরণের কথায়। নীতিশ এ কাজ করলো? নীতীশ! তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু—তার মার পুত্রসম স্নেহপাত্র! হ্যাঁ, অবিশ্বাসের আর কোনো কারণ নেই। তাই নীতীশ আর এল না এখানে। কিন্তু...আশিস এমুখো হতেই আলোর ছটা চোখে লাগল ওর—জলভরা ওর চোখ যেন জ্বলছে! আলোটা নিবিয়ে দিল। অন্ধকার! আশিস মাতালের মতো টলতে টলতে ল্যাবরেটরী-ঘরে এসে দাঁড়ালো—আরো জমাট অন্ধকার। যেন ভুতুড়ে বাড়ী। কিন্তু শোবার ঘরটা ওর সহ্য হচ্ছে না—যেখানে ঐ ধূপ ঐ ফুল-ছড়ানো মেঝে—ঐ রচিত শয্যা...না, আর ঢুকবেনা ও-ঘরে! স্তব্ধ আঁধারে একা দাঁড়িয়ে আশিস ভাবতে লাগলো, আগামী কাল 'এয়ারে, তার বোম্বাই যাবার কথা। সেখানে বিজ্ঞান পরিষদের অধিবেশনে সে তার গবেষণার সত্য শোনাবে—এই ঠিক আছে। কিন্তু...কী শোনাবে আশিস আর! কোথায় তার গবেষণা লব্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার! হয়তো নীতীশই এতক্ষণ রওনা হয়ে গেল তার নিজের নামে সেটা দাখিল করতে।

চক্রান্ত! দীর্ঘদিনের 'ডেলিবারেট্'—সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। এরই জন্য নীতীশ এমন করে তার সাহায্য করেছে গবেষণাগার কাজে। সব অন্ধিসন্ধি ভাল করে জেনে নিয়েছে, তার পর পূর্ণতা-প্রাপ্ত থিসিসটি চুরি করলো। ওঃ!

—'মা,—মা!'...আশিস যেন আর্তনাদ করে উঠলো অন্য একটা চিন্তায়। একি হোল! একি সর্বনাশ ঘটলো তার জীবনে? সব আলো যে নিবে গেল তার চোখে আজ!—তার থিসিস্ চুরি করতে নীতীশকে সাহায্য করেছে তার-ই মার নির্বাচিতা বধূ আশা! সে-ই নিজের হাতে নীতীশকে দিয়েছে ঐ থিসিস! সর্বনাশের আর বাকী কী আছে। থিসিস্ গেল, যাক্। 'ডক্টরেট' না-হয় নাই হোল আশিস। নাই-বা পেল বৈজ্ঞানিকের সম্মান। কিন্তু মুধুর গৃহকোণ যে তার অন্ধকার হয়ে গেল আজ। তার বিবাহিত বধূ বিশ্বাসঘাতিনী! ব্যাভিচারিণী...আশিস আর ভাবতে পারছে না।

—'উঃ!'—আর্তনাদ করে ল্যাবরেটরীর টেবিলটায় বুক রাখলো সে, মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে।

সমস্তই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে চোখের উপর। বরাহনগরেই কে-যেন আত্মীয় আছে নীতীশের। মাঝে মাঝে যায় সে সেখানে। আশার সঙ্গে নিশ্চয় তার আগের আলাপ আছে, তাই এমন অঘটন ঘটলো। আশা তার প্রেমাস্পন্দকে সাহায্য করলো এইভাবে। কিন্তু লোহার সিন্দুকের চাবি কোথায় পেল আশা। হ্যাঁ, মনে পড়ল, ওর ডুপ্লিকেট চাবি মার কাছে আছে। সেখান থেকে চাবি সংগ্রহ করা আশার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। মার আদরিণী বধূ সে! ওঃ?...

পার্টিতে কিছুক্ষণের জন্য নীতীশের অনুপস্থিতির কথা—তার পর তার অস্বাভাবিক ব্যবহার, তার অসংলগ্ন কথা, অসুখের অছিলা—সবই মনে পড়লো। আর মনে পড়লো এখানকার ধূপসুরভিত ঘর-ফুল ছড়ানো বিছানা...'উঃ'—আশিস আবার আর্তনাদ করে উঠলো।

—দাদাবাবু। দাদাবাবু?—কালিচরণ ডাকছে,—কী হোল, দাদাবাবু?

—নাঃ, কিছু না!—আশিস মাথা তুলে বলল,—মাথা ব্যথা করছে, কালিচরণ।

—মাথা টিপে দিই এসো, দাদাবাবু—শোও বিছানায়—

—না, যা তুই! যা...আশিস নিজেকে সামলে বসলো চেয়ারে। কালিচরণ বিহ্বলের মতো চাঁড়িয়ে রয়েছে। আশিস আবার ধমক দিল।

—যা-না এখান থেকে!

নিরুপায় কালিচরণ চলে যাওয়ার পর আশিস ডায়্যাল ঘুরিয়ে ফোন করলো দিব্যেন্দুবাবুকে। তিনি সাড়া দিতেই বলল,

—আমি আশিস, কাকাবাবু—আপনাকে এত রাত্রে ডাকছি, ক্ষমা করবেন!

—না-না, ক্ষমার কি হয়েছে? কী ব্যাপার, আশিস? তোমার গলা অমন করুণ কেন?

—সর্বনাশ হয়ে গেছে কাকাবাবু—থিসিস্ চুরি হয়ে গেছে।

—অ্যাঃ। চুরি?

দিব্যেন্দুবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন, বসে পড়লেন একেবারে। ঘুম-চোখেই উঠে এসেছেন নি। কিন্তু কী তিনি বলবেন আশিসকে। বললনে,

—চুরি কি করে হোল, আশিস? কোথায় ছিল? কাকে তোমার সন্দেহ হয়?

—সন্দেহ করার কিছু নেই, কাকাবাবু! ও গেছে, যাক্! কিন্তু আপনিই আমার বোম্বাই যাবার ব্যবস্থা করেছেন—আমার যা-হয় হোক, আপনার মাথাও হেঁট হবে!

—না-না, আশিস, ওর জন্য ভেবো না। আমি সকালেই বিজ্ঞান-পরিষদে 'টেলী' করে

দেবো—'অনিবার্য্য কারণে তুমি যেতে পারবে না'। কিন্তু চোরকে ধরতেই হবে, আশিস আমি পুলিসে খবর দিচ্ছি...

—না না, কাকাবাবু...আশিস কান্নাভরা গলায় বলল, পুলিসে খবর দেবেন না। ওর সঙ্গে পারিবারিক ব্যাপার জড়িয়ে রয়েছে...

—পা—রি—বারি—ক্...বিস্ময়ে ফোনের রিসিভার পড়ে যাচ্ছে হাত থেকে ওঁর.

—আ—জ্ঞে...হ্যাঁ। 'হ্যাঁ' কথাটুকু আটকে যাচ্ছে ওর গলায়। আশিস আবার কোনে রকমে বলল,—আপনি শোন-গে, কাকাবাবু, সকালেই 'টেলি' করে দিতে হবে বোম্বাই এ...ফোন ছেড়ে দিচ্ছে আশিস।

—শোনো আশিস—দিবেন্দুবাবু বললেন,—শোনো। কে সেই কাল্‌প্রিট? কে? কে চুরি করেছে?

—মাফ করুন, কাকাবাবু—আজ আর কিছু প্রশ্ন করবেন না!—

আশিস লুটিয়ে পড়লো টেবিলের উপর। হাতে রিসিভারটা। কালিচরণ আস্তে আস্তে এসে উঁকি দিয়ে দেখলো ওকে! একি! হোল কি? কাঁধের গামছাটা ঝেড়ে নিয়ে সে মাকে খবর দিতে গেল।

ঢং...সাড়ে বারোটা বাজছে দেওয়াল-ঘড়িটায়। দুটি কাঁটায় প্রায় একটি সরলরেখার সৃষ্টি হয়েছে। অমনি সরল হয়ে গেল থিসিস্-চুরির রহস্যটাও। কিন্তু না—ঠিক সরলরেখা তো হয়নি কাঁটা-দুটো! একটু বাঁকা রয়েছে। থিসিস-চুরির ব্যাপারটাও রয়েছে যেন বাঁকা রহস্যাবৃত! আশা—যাকে এখনো ভাল করে দেখেনি আশিস, যে কোনোদিন এখানে আসে নি, সে আজ এসেছিল এখানে। তৈরী হয়েই এসেছিল নীতীশের জন্য। আর, নীতীশ হয়তো চিঠি লিখে, অথবা টেলিফোনে—অথবা যে-ভাবেই হোক আশাকে অনুরোধ করেছিল তার চুরিতে সাহায্য করতে! তাই আশা ধূপ কেনার ছলনায় কালিচরণকে সরিয়ে নীতীশের সঙ্গে...নাঃ, আশিস আর ভাবতে পারে না।

মার নির্বাচিতাই শুধু সে নয়, মার আদরিণী পুত্রবধূ। মার স্নেহদুলালী! তার আজকের কীর্তি মাকে জানালে মার হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। না-না-না...যত ক্ষতি আশিসের হয় হোক, মার মনে সে ব্যথা দেবে না। নিশ্চল, নিঝুম পড়ে রইল আশিস টেবিলে মাথা রেখে...

—আশিস, বাপ আমার! কি হোল রে?—এই যে আমি এসেছি, আমি—মা তোর.

—'মা...মা—' আশিস দু'হাতে বাড়িয়ে মার কোলে মুখ লুকুলো! মা ওর মাথার স্নেহ-হস্ত বুলুতে বুলুতে—কালিচরণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন,

—তুই যা, কালিচরণ, যা এখান থেকে এখন—

কালিচরণ সরে গেল মাতা-পুত্রের পানে সকরুণ দৃষ্টি দিয়ে। কী হোল তার মনিবের কিছুই সে বুঝতে পারছে না। রান্নাঘরে এসে খাবারগুলোর দিকে চোখ দিয়ে ওর চোখ জলে ভরে এল।

—আশিস?...মা ডাকলেন,—কী হয়েছে, বল আমায়।

—আমার থিসিস্‌টা চুরি হয়ে গেছে ; মা—যাক্‌গে মা, তুমি দুঃখ পেও না।

—না, মাণিক! না! আমি দুঃখ পাব না। কিন্তু কি করে চুরি হোল?

—হোল, মা—হোক গে! তোমার আশীর্ব্বাদ তো চুরি করেনি কেউ?...মা! বালকের

মতো আর্তকণ্ঠে ডাক দিল আশিস! বলল,

—তুমি কিছু দুঃখ কোরো না, মা...আমি আবার গবেষণা করবো আবার লিখবো—

—না, মাণিক আমার, দুঃখ কি! কিন্তু—কে সে আশিস, কে চুরি করলো থিসিস্ তোর? বল, আমি জানতে চাই কি-ভাবে চুরি হোল। নিশ্চয় তোর কোনো বন্ধুই...

—হ্যাঁ, মা...হয়তো এতক্ষণ সেটা নিজের নামে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করছে। হয়তো...যাক্ গে, মা, যাক্—যেতে দাও...

—যাক্...মা চোখের জল আঁচলে মুছে বললেন,—তোর কোনো ক্ষতি হবে না, আশিস আমি মা তোর, আমার আশীর্বাদ অমোঘ হোক তোর জীবনে...

—হবে, মা—হবে...আশিস মার কোলে আরো ডুবে গেল।

মাতা-পুত্র স্তব্ধ হয়ে রয়েছে ওখানে। মুহূর্ত গুনছে দেওয়ালের ঘড়িটা মা নিজেই সামলে বললেন,—পুলিশে খবর দিবিনে তুই?

—না! হয়তো সে আমার বিশেষ বন্ধু—তোমারও স্নেহপাত্র হয়তো সে—

—ও—বুঝেছি আমি—আশিস। একটু থেমে বললেন,—শুনেছি শ্রীচৈতন্যদেব বন্ধুর জন্য নিজের লেখা ন্যায়শাস্ত্র গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছিলেন! তাতে ভগবান শ্রীচৈতন্যের গৌরব মলিন হয়নি আশিস! তোরও হবে না। তোরও গৌরব উজ্জ্বল হবে!

হ্যাঁ, মা—তোমার আশীর্বাদ ফলবেই!—কিন্তু মা—আশিস বলল,—আমার লোহার সিন্ধুকের ডুপ্লিকেট চাবিটা কোথায় রেখেছ তুমি?

—সে তো আমার পূজোর ঘরে বাক্সে আছে, আশিস! আমি দেখছি গিয়ে, ঠিক আছে কিনা—

—কিছু দরকার নেই মা! সে-চাবি হয়তো সেখানেই আছে।—তাহলে?—মা উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে আছেন। আশিস বলল,

—না, মা কিছু না! আজকাল বৈজ্ঞানিক যুগে চাবি খোলা কিছু কঠিন নয় মা—চোরে সেটা খুলতে পারে—আমি সকালেই বোম্বাই যাব, মা—ওখানে গিয়ে বলতে হবে যে অনিবার্য্য কারণে আমার থিসিস্ দাখিল করা সম্ভব হোল না এখন—

—তাই যাবি, বাবা...

চাঁদের হাসি ছড়ানো সন্ধ্যা—

রিক্সার ওপর যে লোকটা বসে আছে, সে কি মদ খেয়েছে! অথবা অত্যন্ত অসুস্থ ও? চোখদুটো লাল—মুখখানাও কেমন যেন—

মোড়ের দোকানদার ভাবছিল নীতীশের এলানো দেহখানা দেখে। ওকে চেনে এখানকার সকলেই। ঐ ভাঙা বাড়ীটার ওদিকের ঘরখানায় একাই থাকে। টিউশানি করে, আরো কি যেন করে—কেউ খবর রাখে না! হয়তো সিনেমায় অভিনয় করে।

এমন সন্ধ্যায় ওকে কদাচিৎ বাড়ী ফিরতে দেখা যায়। আজ ফিরলো হয়তো অসুস্থ বলে। নীতীশ ঘাড় তুলে দোকানীকে বলল,

—পাঁচ প্যাকেট কাঁচি—

—টিন-ই নিন না একটা—

দাম দিয়ে টিনটা নিয়ে নীতীশ রিক্সাওয়ালাকে চলতে বলল,

চলেছে রিক্সা। আরো খানিক এসে গলি—রিক্সা ঢোকে না! নীতীশ নামলো। ভাড়া দিয়ে টলতে টলতে ঢুকলো গলির মধ্যে, তারপর একতলার একটা ঘর খুলে ঢুকে পড়লো। আলো নেই। একটা মোমবাতি জ্বালালো ও! দেশী লণ্ঠন একটা আছে, কিন্তু কে জ্বালায়! হয়তো তেল নেই। নীতীশ দেখেনি গতকাল থেকে।

বড় ব্যস্ত ছিল সে। ব্যস্ত ছিল বিশেষ একটা কাজে।

মোমবাতির আলোতেই তক্তাপোষের উপর অর্দ্ধমলিন বিছানাটা দেখে নিল—সিগারেটের টিনটার ঢাকনা ঘুরিয়ে খুলে একটা বের করে ধরালো ঐ মোমবাতির শিখাতেই। তার পর শুয়ে পড়লো।

শুয়েই রইল খানিকক্ষণ। মোমবাতিটা প্রায় অর্দ্ধেক পুড়ে গেছে। অকস্মাৎ উঠে বসলো নীতীশ—পর পর তিনটে সিগারেট শেষ করে শেষেরটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে, বালিশের তলা থেকে বের করলো একটা কেস। সুন্দর শোভন কেস্‌টি। সোনালী অক্ষরে নাম লেখা—'আশিস আচার্য্য। উন্মনা হয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো সে কেস্‌টা, তার পর চেন টেনে খুলে ফেললো! ভেতর থেকে টেনে বের করলো একতাড়া কাগজ, টাইপ করা, ক্লিপ আঁটা 'থিসিস্।' পূর্ণাঙ্গ—পরিপূর্ণ। শুধু শেষের সইটা করা নেই। ডুপ্লিকেট কপিও রয়েছে। সহি করে দাখিল করে দিলেই হয়! কিসের থিসিস্ কী ওতে আছে—সবই জানা নীতীশের। থিওরী-র সবটাই প্রায় সে জেনেছে, শুধু প্র্যাক্‌টিস-এর কিছু অংশ জানা হয়নি। কারণ সকল সময় আশিসের কাছে সে থাকবার সময় পেত না কিন্তু তাতে কিছুই এসে যাবে না! সেও বৈজ্ঞানিক এবং প্রতিভা তাকে কিছু কম দেননি ভগবান!

ঐ থিসিসের সত্যতা প্রমাণ করতে পারলে একদিনেই নীতীশ বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যাবে! কাগজগুলোর পানে তাকিয়ে ওর চোখদুটো জ্বলে উঠলো একবার—বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলো সে কাগজের তাড়াটি। তারপর সবগুলো ভরলো কেসের মধ্যে। একখানা চাকু-ছুরি তুলে নিয়ে সোনালী নামটা চেঁচে তুলে ফেলছে—আর ভাবছে, এই 'থিসিস্' দাখিল করবে সে বিজ্ঞান পরিষদে—নিজের নামেই দাখিল করবে! অভাগা, অন্নবস্ত্রহীন নীতীশ রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের সম্মান লাভ করবে—বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-খ্যাতি লাভও বিচিত্র নয় তার পক্ষে এখন আর ...কিন্তু নামটা সহজে উঠছে না!

—"ধুত্তোর!'...নীতীশ ছুরিখানা ফেলে কেস্ থেকে আবার কাগজগুলো বের করলো. খাটের তলা থেকে ধুলিমলিন টিনের সুটকেস্‌টা টেনে বের করে চাবি খুলে রাখলো থিসিস্‌টি তার ভেতর। ডালা বন্ধ করে চামড়ার ব্যাগটা হাতে নিয়ে বাইরে এল। সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা আকাশ! নীতীশ নিঃশব্দে গলির ওদিকের একটা খাটা পাইখানার ময়লার ভেতর ফেলে দিল চামড়ার ব্যাগটা। ব্যাস সকালেই মেথর ওটা নিয়ে চলে যাবে!

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরলো নীতীশ। এতক্ষণে মনে হোল বেশী সময় নেই এখুনি ওকে পালাতে হবে! এরই মধ্যে হয়তো পুলিশ এসে খোঁজ করছে চোরকে। হয়তো নীতীশের কাছেও খোঁজ করতে আসবে পুলিশ। হ্যাঁ, আশিসের সব বন্ধুদেরই বাড়ী তল্লাসী হতে পারে—দিব্যেন্দুবাবুও বাদ যাবেন না।...ঘরে ঢুকে নীতীশ ভাবলো, আজ খোঁজ না-ও করতে পারে আশিস তার থিসিসের। সে তো জানে যে, ওটা নিরাপদ জায়গায় লোহার-সিন্দুকেই আছে...কিন্তু যদি খোঁজ করে? ত্বরিতে জামা-কাপড় গুছিয়ে নিতে নিতে নীতীশ ভাবলো, একখানা চিঠি সে লিখে রেখে যাবে এখানে। লিখলো তৎক্ষণাৎ :

"ভাই আশিস, কুম্ভমেলায় বহু ব্যক্তির হতাহত হওয়ার খবরে বিচলিত হয়ে আমি এলাহাবাদ যাচ্ছি। পিসিমা গেছেন ওখানে। কে জানে তাঁর কি হোল! শিগ্রি ফিরবো—নীতীশ।"

বড় বড় করে চিঠিখানা লিখে দেবদারু কাঠের আড়াই টাকার টেবিলে চাপা দিয়ে রাখতে গেল—অকস্মাৎ ঐ টেবিল থেকে কী একটা পড়লো ওব পায়ের উপর...কী ওটা! নীতীশ মোমবাতীর ক্ষীণ আলোতে দেখতে পেল 'ফটো'—আশার বাবার আনীত সেই ফটোখানা। চমকে উঠলো নীতীশ। বাঁ পায়ের উপর পড়ে ফটোটা যেন মিনতি জানাচ্ছে! নীতীশ এক দু'সেকেন্ড কিছু ভাবতে পারলো না, তারপর তুললো ফটোখানা—আশিসের মা ওকে দেখতে দিয়েছিলেন। নীতীশ নিজে দেখে আশিসকে বলেছিল,

—দ্যাখ ফটোখানা—

—মা যাকে দেখে আনবেন, তাকে আবার আমি দেখবো কি-রে?—আশিস বলেছিল।

—কিন্তু মা যদি তোর মনের মতো না আনতে পারেন। যদি কালো কুচ্ছিৎ কাউকে...

—চুপ কর, নীতীশ—মা প্যাঁচা আনলেও, সে আমার লক্ষ্মী হবে।

আশিসের কড়া জবাবে নীতীশ আর কিছু না-বলে ফটোখানা নিজেব পকেটে রেখে দিয়েছিল। তারপর হয়তো জামা খুলবার সময় টেবিলে রেখেছিল! এযাবৎ সেটা ওখানেই আছে! মোমবাতীর কাছে এসে ফটোটা দেখতে লাগলো নীতীশ! আজই শরীরিণী আশাকে দেখেছে সে। কী করুণ আবেদন জানিয়েছিল আশা!—

—'আমার অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করে দিলাম...যা-হয় করবেন...'

নীতীশ জানে আশার সঙ্গে আশিসের এখনো মিলন হয়নি। হলে নীতীশই সর্বাগ্রে সেটা জানতো। আর, হয়নি তাঁর প্রমাণ তো নীতীশ আজই পেয়েছে। আশা, নীতীশকেই 'আশিস' ভেবে ফুল ছড়িয়ে দিয়েছিলো—এবং, সেই অকল্পিত সুযোগটুকু গ্রহণ করেই নীতীশ নিরাপদে কেস্‌টা আনতে পেরেছে, এবং এখনো নিরাপদে রয়েছে। কিন্তু, এর মধ্যে যদি আশা বলে দিয়ে থাকে আশিসকে! না, নীতীশ জানে, আশিসের সঙ্গে আশার এখনো পূর্ণ-মিলন ঘটেনি। তবে আজই ঘটতে পারে—হয়তো...আর একটা কথা মনে পড়লো নীতীশের।

—'বউকে ভোলা যায়—বিজ্ঞান ভুললে কি চলে?"...

কী করুণ আবেদন! কী মরম-ভাঙা কথা...নীতীশ ভাল করে দেখলো ফটোটা। কয়েকটা মিনিটের জন্য সে আজ এই অপরূপার স্বামী সাজবার সুযোগ পেয়েছিল! অনায়াসে নীতীশ আজ ওকে স্পর্শ ক'রে—প্রেমাভিনয় করে...না না না, নীতীশ অতটা নীচ নয়। থিসিস্ চুরি করেছে বলে কী অতখানি নীচে নেমে যাবে নীতীশ? না। নিশ্চয় না!—ফটোটা বুক-পকেটে ভরলো নীতীশ।

পালিয়ে যাওয়ার বেশ পরেও নীতীশ থেমে রইল বেশ কিছুক্ষণ! নিশ্চল ওর মূর্তি। যেন পাথরের! হঠাৎ কোথায় একটা ঘড়িতে বারোটা বাজল। নীতীশ চমকে উঠে প্যান্টের পকেটে সিগারেটের টিনটা ভ'রে, সুটকেসটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো পথে। দরজায় শেকল টেনে তালা দিল বেরুবার সময়।

চলেছে নীতীশ প্রায়ান্ধকার পথ বেয়ে। চিন্তিত। চঞ্চল ওর চরণক্ষেপ—কিন্তু তবু ও

চলেছে। আশার অর্ঘ্য দেওয়ার ব্যাপারটাই স্বপ্ন দেখছে যেন—'বউ ভুললে চলে, বিজ্ঞান ভুললে চলে না!'

গভীর রাত্রির স্তব্ধ পল্লীপথ অতিক্রম করে নীতীশ একটা লাইট-পোস্টের নীচে এসে দাঁড়ালো—বুক-পকেট থেকে বার করলো ফটোখানা। আলোতে দেখলো; পকেটে রাখতে গিয়ে আবার ভাল করে দেখলো নীতীশ। আশা যেন বলছে—'বৈজ্ঞানিকের বুকে কি বউ-এর জন্য একটু মমতাও থাকে না?...মমতাও থাকে না!—'

'মনুষ্যত্বও থাকে না' কথাটা সে বলেনি। বলতেও তো পারতো! অসত্য হোত না সে-কথা। নীতীশ বিহ্বলদৃষ্টিতে চারিদিকে চাইল! জায়গাটা ফাঁকা কাউকে দেখতে পেল না।

না-না, মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ করবে না নীতীশ! 'না, তোমার কিছু আমি চুরি করবো না! কিছু না...কিছু না—' নীতীশ যেন ফটোটাকেই শুনিয়ে বলছে,—'দেবী! এক মুহূর্তের জন্য তোমার স্বামীত্বের অধিকার আমি চুরি করেছি—আর না, আর কিছুই আমি চুরি করবো না তোমার! তোমার কুমারী-প্রেমের প্রথম অর্ঘ্য আমি চুরি করেছি....আর না...

নীতীশ ফটোখানা বুকে ছুঁইয়ে পকেটে রাখলো। ওখানে দুটো রাস্তা দু'দিকে গেছে। নীতীশ যেটায় যাবে ঠিক করেছিল, সেটা ছেড়ে অন্যটায় হাঁটতে লাগলো—বালিগঞ্জের দিকে, আশিসের ল্যাবরেটরীর দিকে।

মনীরুদ্দিন ষ্ট্রীটের গেটে এসে দাঁড়ালো নীতীশ। হাতে সুটকেস। কিন্তু গেট বন্ধ। নিস্তব্ধ বাড়ীখানায় কোথাও আলো জ্বলছে না। হয়তো সব ঘুমুচ্ছে। তাহলে এখনো চুরির ব্যাপারটা জানাজানি হয়নি নিশ্চয়ই! হোলে পুলিশ আসতো—পাহারা বসতো, কত কী হোত তাহলে আশিসও আজ হয়তো বাড়ীতে শুয়েছে। নইলে এখানে একটা আলো অন্তত জ্বালা থাকতো। থাকে, জানে নীতীশ। কেউ তবে এখনো টের পায়নি চুরির কথা। ভালই হোল নীতীশ থিসিস্‌টা ভেতরে রেখে দেবে—কিন্তু চাবি কোথায়? ঢুকবে কেমন করে! নীতীশ গেটের কাছে এসে সুটকেস্‌টা নামিয়ে কাগজগুলো বের করলো, তারপর গেট ডিঙিয়ে ভেতরে যাবে—অকস্মাৎ...

—কে! কে ওখানে?—কালিচরণের কঠিন কণ্ঠস্বর।

কাগজের তাড়াটা চট করে বাঁ বগলে চেপে নীতীশ সুটকেস্ নিয়ে মুহূর্তে সরে গেল কোণের দিকে। কিন্তু দেখতে পেল ল্যাবরেটরীটা আলোতে আকীর্ণ হয়ে উঠলো তৎক্ষণাৎ। নিস্তব্ধ রাত্রে মার কণ্ঠস্বর ভেসে এল,

—কে এসেছিল কালিচরণ?

—এজ্ঞে, চোর হবেক...

—চোরের স্বপ্ন দেখছো নাকি তুমি ঘুমুতে ঘুমুতে? চুরি যা হবার, হয়েছে—আর কি চুরি হবে! আলো নিবিয়ে দাও। ছেলেটা একটু ঘুমিয়েছে এইমাত্র—

নীতীশ মার কথাগুলো সবই শুনলো দাঁড়িয়ে, বুঝলো, চুরির কথা প্রকাশ হয়ে গেছে এবং মা ঐ ল্যাবলেটরীতেই রয়েছেন। বেশ শুনতে পেল নীতীশ ল্যাবরেটরীর কোণে রাস্তায় দাঁড়িয়ে! হয়তো আশাও আছে ওখানেই।

আলোগুলো নিবে গেল ল্যাবরেটরীর। নীতীশ কি করবে! কি-ভাবে সে যাবে থিসিস্‌টা আবার ওখানে রেখে দেবার জন্য? না, কোনো পথ নেই। নীতীশ উন্মনা হয়ে হাঁটতে লাগলো জনহীন রাজপথে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ... একখানা খালি ট্যাক্সিতে চড়ে বসলো

নীতীশ। ড্রাইভারকে বলল, 'হাওড়া ষ্টেশন।' অনেকখন এসে খেয়াল হোল, থিসিস্‌টা বগলেই রয়েছে। সুটকেসে ভরলো সেটা। দীর্ঘপথ নিঃশব্দে ট্যাক্সিতে বসে আছে নীতীশ সুটকেসটা পাশে নিয়ে। একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে আর টানছে—মাঝে মাঝে চোখ দুটো তার উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, আবার নিবে যাচ্ছে আকস্মিকভাবে। কী যে ও ভাবছে ঠিক নেই! চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ওর। ভাবছে, এই থিসিস্‌টা চুরি করবার মতলব ওর মাথায় তিন চার দিন পূর্বেও ছিল না—অকস্মাৎ আশিস গবেষণায় সাফল্যের কথা শোনালো তার বন্ধুদের এবং দিব্যেন্দুবাবুকে ; দিব্যেন্দুবাবু সব শুনে বললেন,—"অসম্ভবকে তুমি সম্ভব করেছ। এ থিসিসের একটা ভগ্নাংশ পেলেও যে কোনো বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানপরিষদে স্থান পাবে। খুব সাবধান, যেন চুরি না যায়...'

চুরির কথাটা কিন্তু দিব্যেন্দুবাবুই বলেছিলেন। অনেক বন্ধুই ছিল সেখানে। কিন্তু চুরি করে ওটাকে কাজে লাগাতে নীতীশ ছাড়া অপর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, অত ভেতরের কথা কেউ আর জানে না। চুরির প্ল্যানটা কে জানে কেন, তখুনি মাথায় এসেছিল নীতীশের। তার এই পরিণাম। এর জন্য সে প্ল্যান করেছে, প্রোগ্রাম করেছে—এবং পার্টির দিন ওটা চুরি করবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করেছে। কিন্তু কে জানতো যে, আশার সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যাবে!

নীতীশ ভাবতে লাগলো—'থিসিস্' যে চুরি হয়েছে, সেটা আশিস এবং আর সকলে জানলেও, কে চুরি করেছে তা তো জানবার কথা নয়। আশা তাকে দেখেছে। কিন্তু 'নীতীশ' বলে তাকে চিনতে পারেনি আশা। 'আশিস' ভেবে সে-ই শেষকালে কেস-টা নীতীশের হাতে তুলে দিয়েছে। তখনি নীতীশ বলতে পারতো, সে আশিস নয়, নীতীশ। তার পূর্বেও বলতে পারতো আশার ভুল হচ্ছে, সে নীতীশ! কিন্তু আশার ভুল ভাঙাতে ওর ইচ্ছে হয়নি। কেন?

নিজেকে কঠোর প্রশ্ন করলো নীতীশ—কেন সে ভুল ভেঙে দিল না আশার? বলতে তো পারতো যে 'সে নীতীশ, আশিসের বন্ধু। এ বাড়ীতে তার অবারিত দ্বার। সে এসেছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে'...না, ইচ্ছে করেই বলেনি নীতীশ—থিসিস্‌টা চুরি করে পালিয়ে আসবার জন্য নয়—থিসিস্ সে ভুলেই গিয়েছিল মানসিক উত্তেজনায় ; নীতীশ আশার ভুল ভেঙে দেয়নি একমুহূর্তের জন্য তার স্বামী হবার প্রচণ্ড প্রলোভনে! তার অপরূপ সুন্দর নয়নাসার-বিগলিত মুখখানাকে একবার ছোঁবার আকাঙ্ক্ষায় একটি মধুর চুম্বন... না—না—না। নীতীশ এসব কি ভাবছে? চোর সে। শুধু থিসিস্ চোরই নয়— এক সতী বধূর স্বামিত্ব চুরি করে পালাচ্ছে সে। যখন জানবে আশা—জানবেই, হয়তো জেনেছে এতক্ষণ তার পুষ্পার্ঘ্য যে নিয়ে গেল সে ঘৃণিত চোর—সে বিশ্বাসঘাতক, সে বন্ধুদ্রোহী...

থিসিস্ চুরির থেকে যে এই চুরিটাই বড় হয়ে উঠলো এখন! আশা নিশ্চয় এতক্ষণ জেনেছে যে, যাকে সে স্বামী ভেবে অন্তরভরা প্রেম নিবেদন করেছে—সে চোর! হয়তো তার সেই আয়ত-সুন্দর চোখে ঘৃণার বহ্নি জ্বলছে এতক্ষণ!

কিন্তু সে যে 'নীতীশ', আশা তা জানবে কেমন করে? না, জানবে না। কারণ কোনো সময়ই নীতীশ তাকে মুখ দেখায়নি ; আর দেখলেও, আশিসের অত বন্ধুর মধ্যে নীতীশকে তার চিনে রাখবার কথা নয়। চিনতে পারলে, শেষের কথাটা সে বলতো না আসবার সময়—'বৌ ভুললে চলে...'

কী করুণ আবেদন! পূর্ণাঙ্গী এক তরুণীর কণ্ঠের ঐ কথাটুকু যেন সিদ্ধমন্ত্র! 'নীতীশ' নিজেকে আশিসের স্থানে বসিয়ে ভাবতে লাগলো—সে সত্যি আশিস হলে থিসিস্ খানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আশাকেই বুকে ধরতো চেপে। কিন্তু সে 'আশিস' নয়। দুর্ভাগ্য!.

না, দুর্ভাগ্য কেন? যা সে করেছে, করেছে! অনুতাপ কেন? সে বড় হবে। এই থিসিস্ সে দাখিল করবে বিজ্ঞান-পরিষদে। বিশ্বজোড়া নাম কিনবে বিশ্ব-বিদিত বৈজ্ঞানিক হবে—আশাকে দেখিয়ে দেবে—তার একমুহূর্তের ভুলের জন্য এক ভিখারী সম্রাট হয়ে গেল!

উত্তেজিত নীতীশ চেয়ে দেখলো হাওড়া ব্রীজ পার হচ্চে ট্যাক্সিখানা। ষ্টেশনে গিয়ে কোনো লাভ নেই। এখন কোনো গাড়ী ছাড়ার সময় নয়! নীতীশ ড্রাইভারকে বলল,—রোকো—

ব্রেক কষে ড্রাইভার প্রশ্ন করলো, ব্রীজের মাঝে কী করবে নীতীশ। নীতীশ বলল,—আভি কোই গাড়ী নাহি হ্যায়—তোম্ ভাড়া লে-লেও। হাম হিঁয়া পায়চারী করেগা...

চলে গেল ড্রাইভার টাকা নিয়ে। নীতীশ গঙ্গার জলের পানে তাকালো। সুটকেস্‌টা ওর হাতে। একজন রেলকর্মী আসছেন। নীতীশ তাঁকে প্রশ্ন করলো,—বর্ধমান লোক্যাল কখন ছাড়ে?

—সাড়ে চার বাজে।

এখন মাত্র দু'টো! নীতীশ পায়চারী করছে।

আশিসের অবসন্ন দেহ মার কোলে মাথা রেখেই এলিয়ে পড়েছিল। নিটোল নিবিড় ঘুম ঘুমোলো সে উষার আলো আসা পর্যন্ত। মা ওকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বধূ বাড়ীতে একা রয়েছে, সে-কথা ভেবেও মা আশিসকে ভেতরে যেতে বলেননি। কারণ আশিস অত্যাধিক ক্লান্ত ছিল। এত ক্লান্ত তিনি কখনো দেখেননি আশিসকে। ভোরে ঘুম ভাঙতেই আশিস দেখলো মাও রয়েছেন সোফাতে শুয়ে। কিন্তু তিনি আগেই জেগেছেন। আশিসকে উঠতে দেখে বললেন,

—আজই বোম্বাই যেতে চাইছিস তুই?

—হ্যাঁ, মা! এয়ার-এর টিকিট করা আছে—আজই যাবার টিকিট। জামা কাপড়ও সব গোছানো আছে আমার—

—বৌমাকে বলা হয়নি তো?

—না, মা—না! ওকে থিসিস্-চুরির কথা কিছু বোলো না। ছেলেমানুষ, অনর্থক দুঃখ পাবে।—আশিস যেন খুব বিব্রত হয়েই বলল কথাগুলো। মা বলিলেন,

—বেশ, চুরির কথা নাই বললি! বোম্বাই যাবার কথাটা তো বলতে হবে?

—আচ্ছা, মা, সে সব হবে এখন—বলে আশিস বাথরুমে ঢুকলো গিয়ে।

মা আর কিছু বললেন না। সন্তানের মানসিক অবস্থা অনুমান করে গভীর বেদনার্ত বুকে তিনি উঠে অন্দরে গেলেন। যাবার সময় কালীকে বললেন আশিস যেন ভেতরে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে যায়। খাবারও ওখানেই খাবে।

আশিস বাথরুমে স্নান করতে করতে ভাবছিলো—আশার সঙ্গে সাক্ষাৎ তার হয়নি,

আজও হবার কোনো কারণ ঘটছে না। কী ভাবে সেটা এড়ানো যায় সেই চিন্তাই করছিল আশিস। ওর আর আশাকে মুখ দেখাবার ইচ্ছে নেই। আশার মুখ দেখবারও ইচ্ছে নেই আর। যে স্ত্রী নিজের বিবাহিত স্বামীর সযত্ন অর্জিত সম্পদ অনায়াসে দান করতে পারে তার প্রেমাস্পদকে, সে আবার স্ত্রী কিসের! ভাবতে ভাবতে আশিসের মুখখানা কঠোর হয়ে উঠলো।...আশা নীতীশের পূর্ব-পরিচিতা বান্ধবী...আরো বেশী নিশ্চয়! যার জন্য সে থিসিস্‌টা তাকে দেবার ব্যবস্থা করতে এতবড় চক্রান্ত করেছে। ওর সঙ্গে আর কী সম্পর্ক আশিসের? নাঃ, আশিস দেখা করতে চায় না আশার সঙ্গে!

কিন্তু মা দুঃখ পাবেন। আশিস চিন্তা করলো মার কথা। পরক্ষণেই ভাবলো দুঃখ তো মা পাবেন-ই। হঠাৎ ওভাবে বধূ নির্বাচন করা ভুল হয়েছে তাঁর...না না-না, মার ভুলেও আশিসের অমঙ্গল হবে না। আশাকে সে পরীক্ষা করবে। পরীক্ষা করবে, আশা সত্যি কতখানি নেমেছে। কিন্তু কিভাবে করবে পরীক্ষা? আশিস মাথা মুছতে মুছতে চিন্তা করতে লাগলো—কোনোদিন সে আশার সঙ্গে আলাপ করেনি। ফুলশয্যার রাতেও না। ওর ঘড়িটা রেখে এসেছিল তার শয্যাগৃহে প্রবেশ করার চিহ্নস্বরূপ। সে-ঘড়ি আজও ফিরে দেয়নি আশা। ও-ও চায়নি। সেদিন নীলাভ আলোতে আশার ঘুমন্ত মুখখানা স্বপ্নের মতো মনে পড়ল আশিসের। খুব বেশিদিন নয়। মাসখানেক মাত্র। গবেষণার কাজে অতিশয় ব্যস্ত থাকার জন্যই আশিস দেখা করতে পারেনি আশার সঙ্গে। ভালই হয়েছে। এখন দেখা করার দরকার হবে না।

জামাকাপড় প'রে তৈরী হয়ে বেরিয়ে এল আশিস 'বাথরুম' থেকে। কালিচরণ জানালো মার আদেশ। আশিস নিজের ব্যাগ-বিছানা তাকে গাড়ীতে তুলতে বলে মা'র কাছে গেল।

মা পূজা শেষ করে খাবার ঠিক করছেন আশিসের জন্য। তাড়াতাড়িই উনি সব করেছেন। আশিস দেখলো আশা ওখানে নেই। ভালই। প্রণাম করলো আশিস মার ঠাকুরকে। তারপর মাকে। বেশ নির্মল ওর মুখশ্রী।

—আমি আবার থিসিস্ লিখবো, মা, তুমি বর দাও! তাহলেই হবে।

—হ্যাঁ, বাবা, আবার লিখবি—তবে আমার মনে হচ্ছে, ওটাও তোর যাবে না! তোর কোনো অমঙ্গল হবে না, মাণিক! মা সস্নেহে ওর মাথায় চুম্বন করলেন। তার পর একটু থেমে বললেন,

—আশা হয়তো দুশ্চিন্তায় ঘুমায়নি সারা রাত—ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর সঙ্গে দেখা কর, আশিস!

—ঘুমুচ্ছে তো ঘুমুক, মা—ওকে চুরির কথা কিছু বোলো না তুমি। ও যেন ব্যথা না পায়। আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আসবো...তোমার কাছেই তো রইল ও!—দাও, খেতে দাও—

—তা হয় না, আশিস—দেখা করতে হবে! আশা উঠেছে। নাইতে গেছে, এখুনি আসবে। রাত জেগেছিল তাই ভোরে উঠতে পারেনি।—বলে মা ওকে খেতে দিলেন।

আশিস যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। ভাবছে—কী করবে! ঠিক ঐ সময় আশা এসে দাঁড়ালো দরজার আড়ালে। আশিস মুখ ফেরালো না।

মা সরে গেছেন। আশা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। উপবাসিনী তাপসীর মতো মূর্তি

ওর—একরাত্রে যেন রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা! আশিস যদি মুহূর্তের জন্যও তাকাতো ওর মুখপানে, তাহলে তখুনি বুঝতো, উমার তপস্যাগ্নিতে ওর অন্তর পুতঃপবিত্র—ওর জীবন অলকানন্দার মতো নির্মল। কিন্তু তাকালো না আশিস...তাকাতে ওর ইচ্ছে করলো না!

আশা নীরবে এগিয়ে এল ওর পায়ের কাছে। আশিস ত্বরিতে সরে যেতে যেতে বলল,

—থাক্ থাক্—ও-সব অতিভক্তি...প্রণাম কেন আবার!—পাশ কেটে চলে গেল আশিস বাইরে। গাড়ী আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে। মা সেখানে পূর্ণঘট দেখিয়ে আশীর্বাদ করলেন ওকে। আশিস উঠলো গাড়ীতে। গাড়ী গলি পার হয়ে গেল। আশার মনে হোল, সূর্য সাহা লেন থেকে তার জীবনের সূর্য অস্ত গেল যেন! কিন্তু কেন? ও জানে না!...

জানালার রড্ ধরে সে দাঁড়িয়ে- চোখে জল নেই, নেই কোনো অভিমান, অহঙ্কারও! উদাস সে-দৃষ্টি অসহনীয় ব্যথায় স্তম্ভিত যেন। যেন নিষ্পাপ নিষ্কলুষ এক মানবী অকস্মাৎ অকারণে পাষাণে পরিণত হযে গেছে!

মা দেখলেন গাড়ীখানা অদৃশ্য হয়ে যেতে, তারপর পূর্ণঘট পূজার ঘরে রাখতে এসে দেখতে পেলেন আশার মুখ! মৃত না জীবিত, বুঝবার জো নেই। তাড়াতাড়ি ঘট নামিলে মা ওকে সস্নেহে ধরে প্রশ্ন করলেন,

—আশা, মা আমার! কি হয়েছে? হোল কি তোর?...

কম্পিত মুখখানা শুধু তুলে ধরলো আশা ওঁর বুকের উপর—জলহীন, জ্বালাহীন—জীবনহীন যেন এক প্রতিমার চোখ! বিস্মিতা মা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন,

—আশা! আ—শা...

—মা!...আশা এলিয়ে পড়লো ওঁর কোলে।

অবাক-আশ্চর্য হয়ে মা ওকে শুইয়ে দিলেন মেঝেতে। মাথাটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন,

—কি হোল, মা! 'প্লেনে'-এ গেল, তাই ভাবছিস?

উত্তর না পেয়ে আবার বললেন,—ভাবনার কি আছে রে? আজকাল আক্চার লোক প্লেনে যাচ্ছে-আসছে। ওবেলাই আমরা খবর পেয়ে যাব। আশা!...

—উঁ—এতক্ষণে আশার চোখের জলধারা জানিয়ে দিল, এক পাষাণ-মূর্তি মানবী হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। মা অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন ওকে এভাবে দেখে। এবার বললেন,

—চুপ কর, মা। আপনার জন বিদেশে গেলে কাঁদতে নেই। ওঠ্। উঠে বোস!

আশাকে ধরে বসিয়ে দিলেন তিনি! নিজের স্বামীর বিদেশে যাবার ক্ষণগুলো মনে পড়ছে তাঁর। কিন্তু এমন তো হয় না! এ যেন বাড়াবাড়ি। এতখানির কী হয়েছে? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বধূর মুখের পানে তাকালেন তিনি। আশা নতমুখে বসে আছে। চোখের জলে দুই গণ্ড প্লাবিত। মা ওকে প্রশ্ন করবেন কিনা ভাবছেন।

—তোদের কিছু কি হয়েছে, আশা? ঝগড়াঝাঁটি বা আর কিছু? আশা নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানালো—"না"।

মা বিব্রত বোধ করছেন। তিনি আবার বললেন,

—তবে এমন করছিস কেন, মা! 'প্লেনে'-এ যাওয়ায় যদি তোর এত ভয় তো, আগে বলিসনি কেন? ওর মনের অবস্থা ভাল নেই, মা! একটা বিশেষ কারণে ও খব চিন্তায়

রয়েছে। তাই আমি ওকে যেতে মানা করলাম না। ওর ভবিষ্যৎ তো দেখতে হবে! মান-সম্মান নিয়ে যে ব্যাপার, তাকে অগ্রাহ্য করতে পারা যায় না..

আশা চুপ করে মার পায়ে হাত বুলুচ্ছে—মা তার চোখের জল মুছে দিয়ে বললেন,

—যা, উঠে যাহোক কিছু কাজ করগে। মনকে বাঁধতে হবে, মা! অমন করলে কি চলে?...উঠিয়ে দিলেন আশাকে।

আশা কোথায় যাবে? কী কাজ করবে? কার কাজ করবে আশা! এ সংসারটা যেন একান্ত পর হয়ে গেল ওর কাছে এক মুহূর্তে। আশিসের কথাটা শত-বজ্রের মতো বিদীর্ণ করে দিচ্ছে বুক ওর। কী হোল? কী অপরাধ করেছে আশা, যার জন্য তার প্রণাম 'অতিভক্তি' রূপে প্রতিভাত হয় আশিসের কাছে! আপনার বিবাহিত স্বামীকে প্রণাম করা কি অতিভক্তি।

আশা যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছে—সংস্কৃত সাহিত্যে সে বিশেষ ব্যুৎপন্না এবং ইংরাজী সাহিত্যও তার ভালরকমই পড়া আছে। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি জানানোকে কেউ তো কোথাও অতিভক্তি বলেননি! আশিস কেন বলল?

তাহলে কি গতকাল ল্যাবরেটরীতে আশার যাওয়া এবং কথা বলাই তার অপরাধ হয়েছে? নির্লজ্জতা হয়তো হয়েছে আশার। কিন্তু তাতে তো কোনো অপরাধ হয় না! আশিস কি আশাকে অকারণ এতবড় আঘাত করবে! নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। কিন্তু কি সে কারণ?...

করবার মতো কিছুই কাজ নেই আশার। মার জন্য নিষ্ঠাবান রাঁধুনী-ঠাকুর নিযুক্ত আছে। আশার জন্য আর ঝি-চাকরের জন্য কয়েকখানা মাছ হয়তো আশা নিজের হাতেই রান্না করে—তাও সব দিন নয়। আশিস তো খুব কম দিনই খায় এখানে। যদি বা খায় তো, খাবার পাঠাতে হয়। ওখানে কালিচরণ তার জন্য মাছ-মাংস রান্না করে রাখে। শুধু ভাতটাই যায়। আশার জন্যও কালিচরণ তার রান্না কতদিন এনে দিয়েছে, কিন্তু আশা পছন্দ করে না। নিজের হাতে রেঁধে স্বামীকে সে খাওয়াতে পায় না—স্বামীর জন্য রান্না-করা বস্তুর প্রতি লোভ হবার মতো তার শিক্ষাই নয়। স্বামী আশার কাছে 'পরম দেবতা'! এই মন ওর মা বাবার দেওয়া মন—হোক সে-মন যতই প্রাচীনপন্থী—আশা তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে। ও শিক্ষা পেয়েছে নারী-জীবনের বল্লভ এবং বান্ধব একমাত্র 'স্বামী'!—এতটা প্রাচীন মতের জন্য বিস্তর বান্ধবীর ঠাট্টা বিদ্রূপ ওকে সহ্য করতে হয়েছে। ও গ্রাহ্য করে না! ও বলে,

—নিজে একনিষ্ঠ না হলে, স্বামীকে একনিষ্ঠ করার কোনো সম্ভাবনা নেই।...আমার মতে বিবাহিতা নারী স্বামীর অংশ, তার কোনো স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকা উচিত নয়।...

হাসে ওর বন্ধুরা ওর কথা শুনে। সবাই বলে,—

—দময়ন্তীর যুগে তুই জন্মালেই পারতিস! ডাইভোর্সের যুগে জন্মালি কেন?

আশা জবাব দেয়,—ডাইভোর্স-ওয়ালীদের দময়ন্তী যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে—

কিন্তু ওর মত আগ্রাহ্য হয়ে গেছে বর্তমান সমাজে। ওর মতো কার কি এসে যায়? বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাশ হচ্ছে ; এখনো তাতে কতকগুলো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পরবর্তী সংস্কারকালে একেবারে পশ্চিম গোলার্ধের অনুকরণ করা হবে...পড়ে আর হাসে আশা। ভাবে, ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব দাম্পত্য জীবনের জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী যাত্রা-পথকে এঁরা সংক্ষিপ্ত করে দিলেন আইন ক'রে।

কিন্তু একি হোল সেই আশার জীবনে! অকারণ একি বজ্রাঘাত। কিন্তু কারণ একটা কিছু আছে। নিশ্চয় আছে। আশা খুঁজে বের করবে, কী সে কারণ। একমাত্র অপরাধ তার, সে কাল ল্যাবরেটরীতে গিয়েছিল, আর কয়েকটা তুচ্ছ কথায় আবেদন জানিয়েছিল আশিসের কাছে, তার অন্তর-ব্যথা বোঝাবার জন্য। এতে কি এমন অপরাধ হয়! আশা তো সহজে যায়নি? আশিস তার সঙ্গে যথারীতি ব্যবহার করলে সে যেতোই না ওখানে। ওখানে তার কোনো কাজ ছিল না। মনের অশান্তিতে সে গিয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাতে হয়েছে কি?...আশা বারম্বার ভাবছে।

শাশুড়ী আড়াল থেকে দেখছিলেন ওর চিন্তিত বিষণ্ণ মুখ। কাজ কিছু করবার নেই, করতেও পারবে না। তাই বললেন এসে,

-যা, মা, উপরে যা। রেডিও শোন গে, না হয় গান কর-গে।

আশা জানে শাশুড়ীর মনও অতিশয় বিষণ্ণ। নিজে ধৈর্য্য ধরে ও রইল ওখানেই। কিন্তু ওর মনে হচ্ছে, বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়।

—ল্যাবরেটরীতে কে এখন থাকবে, মা!—আশা শুধুলো।

—কালিচরণ থাকবে। আর যদি দিব্যেন্দুবাবু আসেন তো, দেখাশুনো করবেন সব।

—আমি যাচ্ছি মা একবার ওখানে!

—যা-না, যা,—মা সানন্দে সম্মতি দিলেন।

আশা সটান চলে এল ল্যাবরেটরীতে। কালিচরণ আজ অন্দরে খাবে। বসে রামায়ণ পড়ছিল। আশাকে দেখে বলল,

—এজ্ঞে, ঘর খুলে দিব?

—হ্যাঁ—

আশা বলল কিন্তু ঘরে ঢুকতে ওর কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকছে আজ। এ ঘরে যেন ওর অধিকার নেই ঢুকবার। অথচ কাল সে অবাধে এই ঘরে কত কি করছে। কিন্তু কালী ঘর খুলতেই ঢুকলো আশা। ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা সব। বিছানাটাও ঝেড়ে পাতা। আশা নিঃশব্দে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

ঘুম নেই চোখে—আছে একটা অবসন্ন আর্ততা, যা ঘুমের থেকেও নিঝুম, মরণের থেকেও মর্মান্তিক।

পায়চারী করছে নীতীশ হাওড়া-ব্রীজের ওপর একা। হাওড়া ষ্টেশনের বড় ঘড়িটার পানে চাইছে মাঝে-মাঝে ; রাত শেষ হয়ে আসছে। সাড়ে তিনটে বাজলো...আর ঘণ্টাখানেক, তারপর ট্রেন ধরে নীতীশ চলে যাবে কলকাতার সান্নিধ্য হোতে—দূরে বহু দূরে বিজন কোনো স্থানে। কিন্তু..বুক পকেটে হাত দিল নীতীশ : কাঁপছে হাতখানা—টেনে বের করলো আশার কার্ড-সাইজ সেই ফটোটি—দেখলো...ছুঁড়ে ওটা ফেলে দেবে গঙ্গার জলে, কিন্তু মনে পড়ল—'বৈজ্ঞানিকের বুকে মমতাও থাকে না?'...ফেলে দিতে গিয়েও আবার ওটা দেখলো নীতীশ, আদর করে পকেটে রাখলো আবার। ও-ফটো সে ফেলতে পারবে না! নিজের মনেই বলতে লাগলো,

—তোমার এক-নিমেষের 'স্বামী' আমি হয়েছি—এই তো সুখ! এই তো সম্বল!..না, তোমাকে বুকের কাছ থেকে সরাবো না। তার থেকে থিসিস টাই

নীতীশ সুটকেসের ভেতর থেকে কাগজগুলো বের করে গঙ্গার জলে ফেলে দেবে—একটা ষ্টিমারের সার্চলাইট এসে পড়লো। তরঙ্গ সঙ্কুল জলরাশির ছন্দ-বিলাস—সৃষ্টির প্রবাহমানতার পরিপূর্ণ প্রকাশ যেন! উত্তাল উদ্দাম গঙ্গার অবাধ স্রোতধারা বয়ে চলেছে জোয়ারের উজান পথে ; নিম্নগামিত্বের সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে ও যেন আবার গোমুখী-গুহায় ফিরতে চায়। এই তো প্রবহমানতার লক্ষণ। নীতীশ ভাবতে লাগলো কাগজগুলো হাতে নিয়ে...নীচে যেতে যেতেও জলধারা উর্ধ্বগামী হয়, অন্তত হবার চেষ্টা করে। সেই-বা কেন করবে না? স্রোত অচেতন ; সে আবার ভাঁটার টানে নীচেই নেমে যাবে। কিন্তু নীতীশ মানুষ। সে খানিকটা উঠতে পারলে তাকে আর নামায় কে? একবার একটা খুঁটো পেলেই, একটুখানি উঁচুতে উঠতে পারলেই নীতীশ আকাশ-ছোঁয়া হিমালয়ে পরিণত হতে পারে।

কাগজগুলো পাছে জলে পড়ে যায় এই ভয়েই যেন নীতীশ ত্বরিতে সরে এল রেলিং এর কাছ থেকে। না, এ থিসিস্ সে নষ্ট করবে না। নীতীশ পুনরায় সুটকেস্ খুলে ভরলো সেগুলো সযত্নে, তারপর কলকাতার পানেই হাঁটতে লাগলো আবার। ওদিকে ষ্টেশনের বড়-ঘড়িটায় চারটে বাজলো।

নীতীশ তাকাল না—হাঁটছে। মোড়ের মাথায় খাবারের দোকানের দরজা খুললো...রাস্তায় জল দিচ্ছে...প্রথম ট্রাম আলো জ্বেলে এগিয়ে আসছে—নীতীশ দাঁড়িয়ে ওখানেই।

কিন্তু কোথায় যাচ্ছিল সে। মনেই পড়ছে না নীতীশের। হোল কি তার? হ্যাঁ, ও কলকাতার পানেই ফিরছিল। কিন্তু কেন? কলকাতায় সে তো আর ফিরতে পারে না! ঢাকুরিয়ার বাসাতেও না। সে চোর—চুরি করে পালাচ্ছিল। সে-ই যে চুরি করেছে, আশিস এটা অনায়াসে বুঝতে পারবে। আর,. .

আর একখানি মধুর মুখের প্রদীপের মতো সুন্দর দুটি-চোখে জেগে উঠবে অপরিসীম ঘৃণা—অপরিমেয় মৌন তিরস্কার। না-না-না, নীতীশ তা সহ্য করতে পারবে না! তার থেকে সে পালিয়ে যাক্ দূরে কোনো দেশে—যেখানে হুলিয়া করে পুলিশ তাকে ধরবে, আর একেবারে হাজতে পুরবে! ঐ মধুর চোখের ঘৃণা আর মুখের মৌন ভর্ৎসনা নীতীশকে সইতে হবে না।

নীতীশ ষ্টেশন-গামী ট্রামটায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। হাওড়া ষ্টেশনে তখনো ভিড় জমেনি। তবু বহু লোক, বহু বিচিত্র শব্দ। নীতীশ টিকিট কিনে নিঃশব্দে বর্ধমান গামী ট্রেনটার একটা কামরায় বসলো এসে। পাশেই সুটকেস্‌টি। সারারাত ঘুমায়নি। না, তার আগের রাতেও ঘুমায়নি নীতীশ। সুটকেসে মাথা রেখে চোখ বুজলো। তন্দ্রার মতো একটু ঘুম এসেছে ওর—না, ঘুম নয়, স্বপ্ন...আশা আত্মনিবেদন করছে আশিসকে নয়, নীতীশকে—ওকেই!...

—'আমার অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করে দিলাম—যা হয় করবেন...' ফুলগুলো ঢেলে দিল আশা ওর পায়ে...নীতীশ সযত্নে, সাদরে তুলে ধরলো মুখখানা...দু'হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে নিল বুকের মধ্যে। কত কি, কত যে কী কথা—আর অকস্মাৎ ঝনাৎ করে শব্দ। বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করলো কে একজন। তন্দ্রা ভেঙে গেল নীতীশের।

উঠে বসলো নীতীশ। কী মধুর স্বপ্ন! কী অপরূপ প্রিয়স্পর্শের অনভূতি!

স্বপ্ন না সত্যি? বিস্মিত নীতীশ বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল খানিক বাইরের দিকে। না, সত্যি নয়। আশাকে সে স্পর্শ করেনি!—নাকি করেছিল মনে তো পড়ছে না! হ্যাঁ, ছুঁয়েছিল সে আশাকে। তার আরক্ত সীমন্ত স্পর্শ করেছিল নীতীশ...না, করেনি। কিন্তু জাগরণে যা সে করতে পারেনি, ঘুমের মধ্যে তো তা করতে পারলো! তাব মন তাহলে অমনি মলিন! ঐ রকমই অভদ্র। অথচ জাগরণে নিজেকে বোধহয় সম্বৃত করেছিল সে। না-না, ছুঁয়েছিল সে আশাকে! এতক্ষণে মনে পড়ছে, ছুঁয়েছিল...ফটোখানা টেনে বের করলো নীতীশ পকেট থেকে। উষার আলোকে দেখলো,

—হ্যাঁ...তোমায় তো ছুঁয়েছি!—আঙুল দিয়ে আশার ছবির ললাট স্পর্শ করলো। 'ছুঁয়েছি!'...আপন মনে বসে ফটোটায় চুম্বন করলো নীতীশ।

কিন্তু একি করছে নীতীশ? একি অন্যায়? একি ন্যায়বিরোধী, নীতি-বিরোধী কাজ তার? থিসিস্ সে চুরি করেছে লোভে প'ড়ে—কিন্তু, বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি তার এই দুর্জয় লোভকে নিশ্চয় ক্ষমা করা যায় না!—যায় না!—যায় না। নীতীশ ফটোখানা সুটকেসের ডালার উপর ফেলে দিল। ওপাশের বেঞ্চে বসে ছিল এক যুবক দেখছিল নীতীশকে। বলল,

—কোথায় যাচ্ছেন নীতীশবাবু? কার ফটো ওটি? আপনার প্রিয়তমার? দেখি।

বলেই সে তুলে নিল ফটোটি। নীতীশ নির্বাক। মুখখানা যেন কেমন ছাই-এর মতো হয়ে গেছে তার। যুবকটি দেখছে ফটোখানা। কিন্তু নীতীশের ভয়ের কি আছে। এখনো তো কেউ জানে না যে, সে পালাচ্ছে! নীতীশ স্থির হয়ে একটা সিগারেট ধরালো। এতক্ষণ সিগারেটের কথাই মনে ছিল না ওর। বড় আরাম লাগছে টানতে।

—বাঃ, চমৎকার চেহারা তো! বরাত ভালো, নীতীশবাবু! রূপকথার কন্যা যেন...

—হুঁ—হাসলো নীতীশ। রূপকথাই বটে! রূপের কথা নয়, কথার রূপ।

—কথার রূপ! সে কি, নীতীশবাবু? বুঝতে পারলাম না।

অনেক কথা আছে যা রূপময়। তার রূপ থাকে। যেমন ধরুন 'বধূ' কথাটা বলতেই একখানি মধুর মিষ্টিমুখ মনে হবে। তেমনি।

—কিন্তু বধূর রূপও তো থাকে—হাসলো ছোকরা কথাটা বলে।

—সব বধূর না থাকতে পারে। 'বধূ' শব্দটাই রূপময়।—ব'লে নীতীশ জোরে টান দিল সিগারেটে। যুবকটি ওর পানে এক মিনিট চেয়ে বলল,

—কিন্তু ইনি রূপময়ী বধূ। ওখানেই যাবেন বুঝি?

—না। ওকে ছেড়ে যাচ্ছি—বলে নীতীশ বাইরে তাকালো।

—ও! তাই মনের অবস্থা এমন। আমি ভাবছিলাম নীতীশবাবুর হোল কি?

—আপনি এখন কি করছেন, রমানাথবাবু?—নীতীশ অকস্মাৎ প্রশ্ন করলো।

—কি আর করবো! খরচার অভাবে আই. এস্-সি. তেই ইস্তফা দিলাম। এখন বর্ধমানে 'হোমিওপ্যাথি' করি। ওষুধ কিনতে এসেছিলাম। ফিরেই ডিস্‌পেনসারী খুলতে হবে, তাই এই সাড়ে চারটের ট্রেন-ধরা—

—বর্ধমানেই আছেন তাহলে? চলুন, আমিও বর্ধমানে নামবো। যাব দেশের বাড়ীতে।—নীতীশ বললো।

—চলুন। অনেকদিন পর দেখা। আমার ওখানে একবেলা থেকেও যেতে পারেন। আপনি এখন কি করছেন?—রমানাথ প্রশ্ন করলো।

—বিশেষ কিছু না। গবেষণা করছিলাম। হাতুড়ে ওষুধ সম্বন্ধে গবেষণা। জড়ি-বড়ি!—নীতীশ জবাব দিল।

—বাঃ, বেশ তো! ও একটা ভাল লাইন, নীতীশবাবু— খুব ভাল জিনিস পাবেন ওর মধ্যে—

সোৎসাহে বলে উঠলো রমানাথ। বসলো ওর কাছে। কিন্তু নীতীশের ভাল লাগছে না। অনর্থক একটা মিথ্যা কথা বলে আবার অনেক মিথ্যা দিয়ে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে সত্য বলেছে। কিন্তু উপায় নেই। নীতীশের আপদ মনে হচ্ছে রমানাথকে। রমানাথ কিন্তু আত্মীয়তা জানিয়ে বলল,

—এবেলা আমার ওখানে শাক-ভাত দুটি খেয়েই যাবেন—

কেন যে রমানাথ এতোখানি আগ্রহ জানিয়ে ওকে নিমন্ত্রণ করছে বুঝতে পারছে না নীতীশ। রমানাথ কলেজের অতি অল্পপরিচিত সহপাঠি—চেনা-জানা আছে, এই পর্যন্ত। কিন্তু আজ রমানাথের হৃদ্যতা যেন অত্যধিক মনে হচ্ছে। নীতীশ বলল,

—আমি বর্ধমানে নেমে 'বাস' ধরে চলে যেতে পারবো। কোনো অসুবিধা হবে না। আপনার ওখানে কি জন্য যাব আর!

চলুন না একটুখানি! ওবেলা বাস ধরে যাবেন আপনি। আমার কিছু দরকার আছে। মানে, একটু স্বার্থ রয়েছে আমার।

—স্বার্থ আমার কাছে! আমি আপনার থেকেও দীন, রমানাথবাবু!

—জানি।—হাসলো রমানাথ।—গরীবের ছেলে না হোলে আপনি আজ বিখ্যাত না-হোক, বাংলার রত্ন বলে পরিচিত হতেন। আপনার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা অজানা নেই আমাদের—আবার হাসলো রমানাথ।

—ও দিয়ে কি হবে, রমানাথবাবু? বনে অনেক ভাল ফুল ফুটে শুকিয়ে যায়—

—হ্যাঁ, কিন্তু এমন অনেক ফুল আছে যা শুকিয়েও গন্ধ দেয় যেমন কেতকী।

—থাক্, রমানাথবাবু! নিজের প্রশংসা শুনতে ভাল লাগছে না! আপনার কি দরকার বলুন তো?

—শুনুন দাদা! আমার হোমিওপ্যাথির কারবার। কিন্তু শুধু হোমিওপ্যাথি দিয়ে পয়সা হয় না। তাড়াতাড়ি রোগ সারাতে হলে ঝাঁঝালো ওষুধ দিতে হয়। তাই আমিও কতকগুলো জড়ি-বড়ি রাখি, মানে তৈরী করি। কিন্তু 'ফরমূলা' তো জানা নেই! আপনি বৈজ্ঞানিক—ওষুধ-অরিষ্ট কি করে 'অ্যালকহল' দিয়ে প্রিজার্ভ করতে হয় আমাকে হাতে-কলমে শিখিয়ে দেবেন—

—ও, এই!—হাসলো নীতীশ—ও কিছু কঠিন না। আপনি কী কী তৈরী করেন?

—চলুন দেখবেন। নিম-নিশিন্দে-বাসক, কষ্টিকার-তালমূলী, শতমূল-অনন্তমূল সব রয়েছে আমার। একটা ভাল সালসা তৈরী করছি। আর একটা ম্যালেরিয়ার টনিকও। ওর সঙ্গে হোমিও-পোটেন্সি চেষ্টাও আছে আমার...

—যন্ত্রপাতি?

—তৈরী করেছি কিছু-কিছু নিজেই। আমার ল্যাবরেটরী দেখে হাসবেন আপনি।

—কিন্তু এভাবে মানুষের জীবন-নিয়ে-খেলা ঠিক হচ্ছে না, রমানাথবাবু।

নীতীশ যেন একটু কড়া ভাবেই বলল। হাসছিল রমানাথ ; ওর কড়া কথাটা শুনে

কিঞ্চিৎ দমে গিয়ে যেন একটু মনমরা হয়ে বলল,

—ওতে অনেক রোগী ভাল হয়, নীতীশদা...

—না, তারা আপনিই ভাল হয়। আপনার ওষুধে নয়!

—শতকরা নব্বইটা রোগী আপনিই ভাল হয়, নীতীশদা, ওষুধ উপলক্ষ। আপনি দেখবেন, আমি খারাপ কিছু দিই না রোগীকে। তবে ওগুলো প্রিজার্ভ করে রাখতে পারলে আমার সুবিধা হয়। নামও হতে পারে।

—চলুন, দেখা যাবে।—নীতীশ সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিল ওর দিকে।

—না, আমি খাই না।—বলল রমানাথ।

নীতীশ সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো। রমানাথ মোটা একখানা হোমিওপ্যাথি বই পড়ছে। লোক্যাল ট্রেন থেমে-থেমে চলেছে! হঠাৎ নীতীশ বলল,

—আপনার বাসায় কে কে আছেন? মা-বোন-স্ত্রী?

—না, ওসব কেউ না। একটা মেয়ে আছে 'কম্‌বাইন্ড'—কুক্-সারভেন্ট,...আই মিন...

—বুঝেছি।—নীতীশ বলল।—আশার ছবিখানা পকেটে রাখলো সে। ট্রেন বর্ধমান ষ্টেশনে ঢুকছে। নীতীশ সুটকেসটা হাতে নিয়ে বলল রমাকে,

—আপনার ওখানে যেতে পারলে ভাল হোত, কিন্তু আমার একটু তাড়া আছে।

—তাহলে কি আর বলবো, নীতীশদা ;—দুঃখের সঙ্গে জানালো রমানাথ।—গেলে সুখী হতাম!

নীতীশ সুটকেস-হাতে দাঁড়ালো। রমানাথও তার জিনিসগুলি নিয়ে নামবে। গাড়ী থামতেই নীতীশ নেমে পড়লো। আর কারও সঙ্গে দেখা হয় এটা সে চায় না। কিন্তু বর্ধমানে অনেকেই আসেন, অনেকেই চিনতে পারেন তাকে। নীতীশ তাড়াতাড়ি ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে মোটর-বাস ধরবার জন্য গ্রান্ড-ট্র্যাঙ্ক রোডের ধারে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু বাস আসতে দেরী হচ্ছে। ইতিমধ্যে রমানাথ সাইকেল-রিক্সায় আসছে। নীতীশ বলল,

—থামান—আপনার অনুরোধটা রক্ষা-ই করে যাই!—রিক্সায় উঠবে নীতীশ।

—আসুন আসুন—বলে রমানাথ সাদর আহ্বান জানালো ওকে। কিন্তু সে ভাবছে নীতীশের এমন ক্ষণে-ক্ষণে মত পরিবর্তনের কারণ কি? এমন তো ছিল না নীতীশ! কিন্তু কিছু সে বলল না।

সাইকেল-রিক্সা ওদের নিয়ে গেল বর্ধমান সহরের একটা পল্লীতে। জায়গাটা খুব স্বাস্থ্যকর বলে মনে হচ্ছে না নীতীশের। একতলা বাড়ী একখানা, সামনের ঘরের দরজায় সাইনবোর্ড 'হোমিও কিংডম।' ডাঃ রমানাথ, এম্ বি. (Homoeo)—সে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ও-পাশের দরজাও বন্ধ। রমানাথ ডাক দিল,

—কুমকুম!

—যাই।—ভেতরে পায়ের সাড়া পাওয়া গেল। দরজাটা খুলতেই রমানাথ বলল,

—ডিস্‌পেনসারিটা খুলে দাও, সঙ্গে লোক আছেন।—ওরা দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

ওদিকের দরজা খুলতেই রমানাথ সাদরে ডাক দিল নীতীশকে। নীতীশ ঢুকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখলো ঘরখানাকে আর মেয়েটিকে ; ওপাশের উঠানের দিকটাও।

—আমাদের হাত-মুখ ধোবার জল দাও। আর, চা করো।—রমানাথ বলল মেয়েটিকে।

চলে যাচ্ছে মেয়েটি। বয়স ধরা যায় না! বিশ-পঁচিশের মধ্যে ; রোগা-ফর্সা, মুখের গঠন

অপরূপ না হলেও সুশ্রী। কেমন একটা কামনীয় মাধুর্য্য আছে মুখে ওর। ও চলে যাওয়ার পর নীতীশ আবার ঘরখানা দেখলো। দুটো অল্পদামী আলমারী, শিশি-বোতলে ভরা। একটা টেবিল, তিনখানা চেয়ার আর একটা বেঞ্চি। হয়তো রোগীদের বসবার জন্য। ব্যস। একটা টুলে কতকগুলো বই, মাসিকপত্র, আর টেবিলের উপর ষ্টেথিসকোপ, থার্মোমিটার, ইনজেকশন-সিরিঞ্জ ইত্যাদি। একখানা চেয়ারে বসল নীতীশ, রমানাথ গেল ভেতরে। নীতীশ দেখতে পেল উঠানে মাটির গামলায় কি সব ভেজানো রয়েছে। হয়তে রমানাথের জড়ি-বড়ি বাসক-কন্টিকারী-ই হবে। ইতিমধ্যে দু-তিনজন রোগী এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ারে। নীতীশ অবাক হয়ে ভাবলো—চলে তো বেশ! এভাবেও মানুষ পয়সা রোজগার করে! এক রোগী বলল,

ডাগদারবাবু আয়া, বাবুজি?

—হ্যাঁ আতা হ্যায়।—নীতীশ জবাব দিল। কিন্তু সে ভাবছে—ক্রমাগত ভাবছে। কত কি ভাবছে, নীতীশ নিজেই জানে না। ভাবছে, বেশ আছে রমানাথ! অল্প রোজগার, কিন্তু অভাব তো বোধ করে না! আবার ভাবলো, নিশ্চয় বোধ করে অভাব নইলে আলকোহল মিশিয়ে ওষুধ তৈরী করে চালাবার চেষ্টা কেন করে সে! অন্তত, বড় হবার আকাঙ্ক্ষা রাখে। রমানাথ ফিরে ওকে হাত-মুখ ধুতে বলল এবং নিজে সে রোগী দেখতে আরম্ভ করলো। নীতীশ উঠানে গিয়ে দেখলো কুমকুম সব ঠিক করে রেখেছে। হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নীতীশ কিছু সুস্থ বোধ করে বলল, রমানাথকে,—

—বলো তো এবার তোমার কি ব্যাপার?

—আমি একটা কাজে যাচ্ছি, দাদা, ফিরে আসবো আধঘণ্টার মধে; তারপর কথা হবে। চলে গেল রমানাথ ষ্টেথিসকোপ হাতে। নীতীশ একা বসে রয়েছে। কুমকুম এসে বলল,—

—চা দেব আর আপনাকে?

—না। তুমি কোথা থেকে এসেছো, কুমকুম? কিভাবে আছ এখানে? মাইনে পাও না নাকি—?

—না, দাদা। আমি খুব ভাল জায়গায় ছিলাম না। রমাবাবু আমার চিকিৎসা করতে গিয়ে আলাপ হয়, তারপর ওঁর দয়ায় এখানে এসে আছি—হাসলো কুমকুম।

—ভালই আছ?

—হ্যাঁ, তা চলে তো যাচ্ছে, দাদা। আছিও বছরখানেক।—আপনি খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ। একটু বিশ্রাম করতে চাইছি।

—আসুন!—কুমকুম পাশের ঘরের বিছানা দেখিয়ে দিল ওকে।

ফোনে খবর পেয়ে দিব্যেন্দুবাবু এসেছেন ওকে 'সি-অফ' করতে। এসেছে আরো কয়েকটি বন্ধুও।—আশিস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো নীতীশ আসেনি। আসবে না, জানে আশিস। তবু শেষ পর্যন্ত আশা করছিল তার সন্দেহ মিথ্যে হোক—নীতীশ এসে তার থিসিস্‌টা ফেরৎ দিয়ে বলুক যে, ওটা পড়বার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। অথবা বলুক সে, ওটা সে ভিক্ষে চায়—

—আমি 'তার' করে দিয়েছি, আশিস, তোমার আর বোম্বাই না গেলেও চলতো।

—খুব খেটেছি, কাকাবাবু—দিনকয়েক বেড়িয়ে আসি।—আশিস বলল

বিদ্যেন্দুবাবুকে।

—হ্যাঁ, তা যাও। পুনা-ও যেও। দেখে আসবে সব ঘুরে-ফিরে।

—মা রইলেন, কাকাবাবু, আর ল্যাবরেটরীটা আপনি দেখবেন এসে মাঝে মাঝে। বাবার গড়া জিনিস যেন নষ্ট না হয়।

—আমি দেখবো আশিস, আমি সব খবর নেব—দিব্যেন্দুবাবু বললেন।

এক সহপাঠী হঠাৎ প্রশ্ন করলো,—নীতীশ আসেনি তো!

—না। কাল ওর শরীরটা খারাপ ছিল। কে জানে কেমন আছে!—আশিস জবাব দিল।

—আমি ওবেলা খবর নেব তার—দিব্যেন্দুবাবু বললেন।

—কিছু দরকার নেই। সামান্য অসুখ। সর্দি। হয়ত কালই ভাল হয়ে যাবে আপনি আবার ঢাকুরিযায় কিজন্য যাবেন।—আশিস ওঁকে থামাতে চায়। থিসিস্ নিয়ে নীতীশ যা করবার করুক, আশিস তাকে কোনোরকম অসুবিধায় ফেলতে চায় না। নীতীশ বড় হোক, বিখ্যাত হোক—তারপর একদিন আশাকে নিয়ে উধাও হয়ে যাক্ কোনো অজানা দেশে যেখানে আশিস যাবে না কখনো!

উদার হতে গিয়ে আশিস যেন আগুনের কুণ্ডে পড়ে জ্বলতে লাগলো। নীতীশকে কঠিন শাস্তি সে দিতে পারতো, কিন্তু দিয়ে কি হবে? সামান্য থিসিস। বিদ্যাবুদ্ধি আর অধ্যবসায় থাকলে যে কোনো মানুষ ও-বস্তু আয়ত্ত করতে পারে...কিন্তু নীতীশ চুরি করেছে আশিসের অন্তরলক্ষ্মীকে! চুরি করেছে তার চোখের ঘুম, তার চিত্তের শান্তি।

দিব্যেন্দুবাবু সকলের অজান্তে আশিসকে বললেন,

—খুবই দুঃখের বিষয়, আশিস—অমন সুন্দর থিসিস্টা চুরি হোল...

—যাক্-গে, কাকাবাবু—আপনার আশীর্বাদে আমি আবার অন্য কিছু নিয়ে গবেষণা করবো। ও-থিসিসের জন্য আমার কিছু দুঃখ নেই।

—তুমি যে এতো সহজে অতবড় আঘাত সামলাতে পেরেছ, এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!—বলে দিব্যেন্দুবাবু ওকে বিদায় দিলেন।

কিন্তু আশিস ভাবছিল—আঘাত সে কতখানি সামলেছে। যদি শুধু থিসিস্টাই চুরি হোত তো, সে আঘাত আশিস অনায়াসে সইতে পারতো। কিন্তু এ তো থিসিস্ চুরি নয়—তার বিবাহিতা বধূর 'অন্তর-চুরি'...আশিসের মুখখানা কেমন কালিমাঙ্কিত হয়ে উঠলো কথাটা ভাবতেই।

নিষ্ঠুর, নিষ্করুণ আঘাত করে এল আশিস আশাকে!...বলে এল 'অতিভক্তি!' সমস্ত প্রবাদ-বাক্যটা বলেনি। কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট। ওর ফল কি দাঁড়ালো, চেয়ে দেখলো না আশিস। কিছু না-বলে যে-অসৌজন্য দেখিয়ে চলে আসতে পারতো আশিস, তাতেই যে-কোনো বুদ্ধিমতী মেয়ে বুঝতো আশা-সম্বন্ধে আশিসের কোনো দরদ নেই। কথাটা কিন্তু না-বলে পারলো না আশিস! গতকাল থেকে যে-জ্বালায় সে জ্বলছে, তারই বহিঃপ্রকাশ ওটা!

কিন্তু বাড়ী থেকে সে কিছুদূর এসে ভেবেছিল, কথাটা বলা ভাল হয়নি! মাকে সে বলেছে—'বউ ছেলে মানুষ থিসিস্-চুরির কথা শুনলে দুঃখ পাবে—' এ কথাটা অবশ্য একটা কূটনীতির চাল। কিন্তু আশাকে মর্মান্তিক দুঃখ সে নিজেই দিয়ে এল!

দিল, কিন্তু দুঃখ আশা পাবে কি? যার অন্তরে অপর পুরুষের মূর্তি জাগ্রত, সে আশিসের

দেওয়া দুঃখ অনুভবই করবে না। তবু আশিস কথাটা না বলে পারেনি। হয়তো ব্যর্থ হয়েছে তার শর, তবু শরক্ষেপ সে করে এসেছে! শরটা যেন অতিরিক্ত বিষ-মাখানো। বিষ ঐ কথাটুকু!...

বন্ধুরা কেউ জানে না থিসিস্ চুরির কথা। তারা আনন্দ ধ্বনি করে বিদায় দিল ওকে। আকাশের বুকে অদৃশ্য হয়ে গেল আশিসের প্লেন। দিব্যেন্দুবাবু একটা ভারী নিঃশ্বাস ত্যাগ করে নিজের গাড়িতে উঠলেন এসে। আশিস তার পুত্রসম স্নেহপাত্র—তার এই ভাগ্য-বিপর্যয় ওকে অতিশয় ম্রিয়মাণ করে তুলেছে কিন্তু কি তিনি করতে পারেন! আশিস হয়তো আবার থিসিস্ লিখে পাঠাতে পারতো বিজ্ঞান পরিষদে। কিন্তু আশিস-ই সেটা চায় না। চোরকে ধরবার জন্যও কোনো উৎসাহ নেই তার। কেন! কারণ কি? আশিস বলল—'পারিবারিক ব্যাপার রয়েছে ঐ চুরির মধ্যে'—কথাটা অবাক করে দিয়েছে দিব্যেন্দুবাবুকে। তাঁর বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক আলোড়িত হচ্ছে ঐ 'পারিবারিক' শব্দটাকে ঘুরে ঘুরে। কিন্তু কিছুই তিনি স্থির করতে পারলেন না। আর একবার আকাশপানে চেয়ে দেখলেন প্লেনটা দেখা যায় কিনা নাঃ, বহু দূরে চলে গেছে আশিস এই কয়েক মিনিটের মধ্যে।

দিব্যেন্দুবাবু নিজের বাড়ী ফিরে এলেন। কালিচরণকে ফোন করছেন :

—হ্যালো...সাড়া এল।

—কালিচরণ?—দিব্যেন্দুবাবু প্রশ্ন করলেন

আজ্ঞে, না! আমি 'আশা' কথা বলছি। আপনি কাকে চান?

—ও, বৌমা!—দিব্যেন্দুবাবুর কণ্ঠস্বর স্নেহের কোমলতায় সুমিষ্ট হয়ে উঠলো।

—তুমি ওখানে রয়েছে? বেশ মা, বেশ। আমি কালীকে বলছিলাম, সে যেন ল্যাবরেটরীর দরজা-জানালা ভাবভাবে বন্ধ করে রাখে। আমি কাল কোনো এক-সময় গিয়ে দেখে আসবো। তুমি এটা করিয়ে রেখো, মা।

—হ্যাঁ, কাকাবাবু!—আপনি আজ আসবেন না?

—না, মা!—কেন? দরকার আছে কিছু?

—না, একবার শুধু এসে দেখে যেতেন? আশা যেন মিনতি জানাচ্ছে।

—আচ্ছা, মা! ওবেলা যদি পারি তো দেখবো। তোমরা কিছু ভেবো না। বৌঠানকে বোলো, দরকার পড়লে আমাকে যেন তৎক্ষণাৎ জানান।

—আচ্ছা কাকাবাবু বলবো—

—আর তুমি যেন যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করো না, মা—ওগুলো বড্ড বিপজ্জনক—

—না, কাকাবাবু!

—আচ্ছা মা, আসি—দিব্যেন্দুবাবু ফোন ছেড়ে দিলেন। আশা তখনো ফোনের রিসিভার-হাতে দাঁড়িয়ে। দিব্যেন্দুবাবুর সঙ্গে কথা সে বলেছে ফোনে আরো দু'-একদিন। কিন্তু সে-ফোন বাড়ীর ভেতরের ফোন। মুখোমুখী কথা বিশেষ হয়নি ওঁর সঙ্গে। আজ আশার মনে হোল এই পরিবারের একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী এই স্নেহশীল বৃদ্ধকে সে জানাতে পারে—তার প্রতি ওঁর প্রিয়-শিষ্যের নিষ্ঠুর ব্যবহার! কিন্তু...

'না।'...কী সব অন্যায় কথা ভাবছে আশা! 'ছি!...' আশা স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করবে! এ কথা ভাবতে ওর লজ্জা করলো না? নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে ফোন রেখে কালিচরণকে দিব্যেন্দুবাবুর আদেশ জানালো। নিজেই তদারক করলো সব দরজা-জানালা

বন্ধ করা হোল কিনা। আশিসের বিছানাওলো সযত্নে তুলে রাখলো পাট ক'রে। বইগুলোও গুছিয়ে রাখলো যথাসম্ভব। তারপর এলো ভেতরে, মার কাছে।

-আয়, খাবি। মা তাকে খেতে দিলেন। মাও খুবই বিমর্ষ। তবে আশা যেন ছ'মাস জ্বরে ভুগছে এমনি অবস্থা! মা হেসে বললেন,—

—তুই গেলিনে কেন বাপু ওর সঙ্গে?

আশা নীরবে নতমুখে নখ খুঁটতে লাগলো।

খেতে বসাই হোল মাত্র। প্রিয়-বিচ্ছেদে-বিধুরা এই দুটি নারীর কেউ আজ খেতে পারলো না। আশা কোনোরকমে খাওয়া শেষ করে তার নিজের ঘরে শুলো গিয়ে। ঘুম আসে না। আসবে না ঘুম। নিশ্চুপ পড়ে রইল বিছানায়।

কী ওর হয়েছে, ও জানে না! ওর তরুণ মনের আনাচে-কানাচে অনুসন্ধান করেও জানতে পারলো না, কোথায় ত্রুটি। কী তার অপরাধ। বার বার মনে হয় আশিসের তীক্ষ্ণ কথাটা :

—'থাক,—অতি ভক্তি...

'চোরের লক্ষণ' কথাটা তো বলেনি আশিস! তাহলে কি আশা বুঝবে যে, ঐ রকম প্রণামের বাড়াবাড়ি আধুনিক যুবক অপছন্দ করে বলেই আশিস ওকথা বলেছে? না-না-না, ওর মুখে যতটুকু দেখতে পেয়েছে আশা, তাতেই দেখেছে পুঞ্জীকৃত ঘৃণা, অসীম উপেক্ষা, অপরিমিত নিষ্ঠুরতা! তার চলে-যাওয়ার ভঙ্গীতে আশা দেখেছে হৃদয়হীনতার পৈশাচিক প্রকাশ! 'পৈশাচিক প্রকাশ' কথাটা ভাবতে আশার কষ্ট হচ্ছে। চোখের জল গড়িয়ে পড়লো ওর! কিন্তু সত্য। ঐ চলে-যাওয়াকে আর কোন শব্দ দিয়ে প্রকাশ করার মতো ভাষা জানে না আশা। কিন্তু আশার সংস্কারান্ধ সতী-মন তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলো। স্বামীর নিষ্ঠুরতা-সহ্য-করা সীতার আদর্শ!—আশা ভুল করবে না। সে বরং ধীরে ধীরে নিবে যাবে, তবু স্বামীর সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাববে না। কাউকে নালিশও করবে না। নিঃশব্দে নির্বাণ লাভ করবে আশা!

কিন্তু এই অসাধারণ মনের জোর কতদিন রাখতে পারবে আশা! হয়তো...হয়তো ধীরে ধীরে তার মনোবল ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যাবে! যখন সে আর পাঁচটা মেয়ের মতো স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হবে। সে কথাও ভাবলো আশা। ভাবলো বর্তমান যুগ এবং জগতের পরিপ্রেক্ষিতে। বর্তমান স্বামী-সমাজের অমানুষিক আচরণের জন্য। আশার অপরাধটা তো আশিস বুঝিয়ে দিয়ে গেলেই পারতো।

কিম্বা হয়তো আশার কোনো অপরাধ-ই নেই। কিছুই নয় ব্যাপারটা। অনর্থক সে ভাবছে এতো বেশী। পাছে সে বোম্বাই যেতে মানা করে তাই হয়তো আশিস নিষ্ঠুরের মতো চলে গেল। হয়তো প্রণামটাকেই 'অতিভক্তি' বলেছে। নইলে, কাল সন্ধ্যায় যে অমন নিশ্চল দাঁড়িয়ে শুনলো কথাগুলো--আজ সে ওরকম করবে কেন?...কথাটা ভাবতেই আশার মনে পড়লো, কাল আশিস আশার দিকে মুখ ফেরায়নি। দেওয়ালের দিকে মুখ করে ছিল সব সময়। শেষে এসেও ছোঁয়নি আশাকে। আর আজও ঠিক সেই রকম...মুখখানা দেখাতেই চায় না যেন। যদিও আশা আজ তাকে দেখে ফেলেছে এক নিমেষের জন্য! কিন্তু কেন! আশার মুখ কি এমন কুৎসিত যে...না. অন্য কোনো কারণ নিশ্চয় আছে!

কী সে কারণ, আশা যেমন করে হোক বের করবে! যদি না পারে তো আশিসকে সরাসরি প্রশ্নই করবে সে, যেমন কাল করেছিল। প্রয়োজন হলে মাকে মধ্যস্থ রেখেও প্রশ্ন করবে সে...আশার বিদ্রোহী অন্তর অশান্ত হয়ে উঠলো।

হিন্দুনারীর একটা বিশেষত্ব, সাত পাকের সঙ্গে সঙ্গে সে স্বামীকে ভালবেসে ফেলে। দেখা নেই, শোনা নেই, আলাপ নেই, পরিচয় নেই—রাতে একজন অদ্ভুত এক মুকুট পরে এলো...ক'নে তার চারিদিকে ঘুরে মালা পরিয়ে দিল...ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করে দিল তার পায়ে! এ ব্যাপার আর কোথাও আছে কিনা জানে না আশা। কিন্তু এদেশে এমন স্বাভাবিক আর কিছু নেই। প্রায় না-দেখা স্বামীর জন্য নিজের অন্তরের ব্যাকুলতাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আশা নিজের মনে বলল—শত-শতাব্দীর সংস্কার-সঞ্চিত এই যে অহেতুক প্রেম, একে অস্বীকার করার উপায় কি? আইন দিয়ে কি একে ঠেকানো যাবে! বিবাহ-বিচ্ছেদ-আইনের বন্যায় কি নিবে যাবে রক্তগত প্রেমবহ্নি? হয়তো যাবে! কারণ, সংস্কার-অর্জিত ধারণা মাত্র—তা স্বাভাবিক নয়।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই আশার। অকস্মাৎ রেডিওতে ঘোষণা করলো রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনানো হচ্ছে। আশা রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে অত্যন্ত ভালবাসে। কিন্তু কেমন যেন আজ উৎসাহ এল না ওর। মৃদুকণ্ঠে-বাজা রেডিওটা সে অন্যদিন জোর করে দেয়, আজ কিন্তু উঠে একেবারে বন্ধ করে দিল।

বোম্বাই-এ পৌঁছে আশিসের প্রথম কাজ তার নিরাপদে নামার সংবাদ মাকে 'তার'-এ জানিয়ে দেওয়া। সে কাজ চুকিয়ে আশিস একটা বড় হোটেলে আশ্রয় নিল। এর আগে বোম্বাই সে যায়নি কোনোদিন। দিনকয়েক থাকবে ; দেখবে ভারতের এই দিকটা।

কিন্তু দেখবে কে? আশিসের অন্তরের আগুন ক্ষণে ক্ষণে বেড়ে চলেছে। এমন অশান্ত মন নিয়ে মানুষ কিছুই করতে পারে না। হোটেলের নির্জন ঘরখানায় শুয়ে শুয়ে সে কত কি ভাবতে থাকে। ভাবতে থাকে—অত তাড়াতাড়ি বধূ নির্বাচন করা মার খুবই ভুল হয়েছে ; আবার ভাবে, তার গবেষণাটা শেষ হতে বেশী দেরী ছিল না—শেষ হওয়ার পর বিয়ের ব্যবস্থা করলেই মা ভাল করতেন। কিন্তু বিয়ে দিয়ে মা অন্যায়ই বা কি করেছেন? দীর্ঘদিন বাড়িতে একা রয়েছেন তিনি। ইদানীং আশিস গবেষণার জন্য ভেতর-বাড়ীতে যেতেই সময় পেত না। মার সঙ্গীর বড্ড অভাব ছিল, তাই তাড়াতাড়ি বিয়ে দিলেন—মা কি জানতেন যে অমন পদ্মফুলে পোকা ধরে আছে। মা কি করবেন? আশিসের অদৃষ্ট!

মার কাজের কোনো অন্যায়ই আশিসের চোখে ধরা পড়ে না। তবু আজ সে মার সমালোচনা মনে মনে করলো। কিন্তু তখুনি ওর মন পীড়িত হয়ে উঠলো এর জন্য। ভাবতে লাগলো...

আশা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। আর, ওরকম মেয়েদের বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণই হয়। ও মাকে একমুহূর্তে 'ক্যাপচার' করে নিয়েছিল ক'নে দেখার সময়। মা নিতান্তই সরলমনা স্নেহশীলা মা, তাই অমন অঘটন ঘটল।

সাতাশ দিন মাত্র তার বিয়ে হয়েছে, হিসাব করে দেখলো আশিস। এর মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল জীবনের সুখ সৌভাগ্যের। পত্নীর প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করার মতো তীব্র জ্বালা বোধহয় মানুষের জীবনে আর কিছুই নেই। আশিস পড়ে রইল বিছানায়—ওর শব-

বৎ দেহের অভ্যন্তরে চলছে আগ্নেয়গিরির আলোড়ন।

কিন্তু আশিস তার অসাধারণ ধৈর্য্যশীলা মার কাছে শিক্ষা পেয়েছে—ধৈর্য্যই দুঃখকে অতিক্রম করবার একমাত্র উপায়। কথাটা মনে হতেই জামা-কাপড় পরে সে বেরিয়ে গেল শহর দেখতে। বিজ্ঞান-পরিষদের দিকেই যাবে। যদি এর মধ্যে নীতীশও এসে থাকে থিসিস্ নিয়ে, এই চিন্তাটাও এল ওর মনের কিনারায়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাবলো, নীতীশ এতো কাঁচা ছেলে নয়। এতো তাড়াতাড়ি সে কিছু করবে না। অন্তত বিজ্ঞান-পরিষদের আগামী অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা করবে। কিম্বা হয়তো অন্যত্র, বিলাত বা আমেরিকায় পাঠাবে থিসিস্। অথবা এখানেই ওটাকে নিজের নামে চালাবার জন্য বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য প্রার্থনা করবে সে। সেও বিজ্ঞানের ছাত্র। প্রতিভাবান ছাত্র। তার পক্ষে ও থিসিস্ কাজে লাগানো কঠিন হবে না।

নাঃ, কাজেই লাগাক্ সে ওটা! বড় হোগ নীতীশ। আশিসের কিছুমাত্র দুঃখ নেই। যদি সে আশিসের জীবনটাকে এমনভাবে অগ্নিময় করে না দিত তাহলে আশিস নিজেই গিয়ে তাকে বলে আসত, থিসিসটা সে নিক্, আশিস তাকে ওটা দান করলো।

কিন্তু নীতীশ কি করেছে! কতখানি সর্বনাশ করছে সে আশিসের। তার বিবাহিতা...

আশিস আর ভাবতে পারলো না...একখানা ট্যাক্সিতে উঠে শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখবার জন্য রওনা হোল। কিন্তু মনের অশান্তি ওকে কোথাও কিছু উপভোগ করবার মতো সুযোগ দিচ্ছে না। অবশেষে একটা সিনেমা-হলে ঢুকে চুপচাপ বসলো এসে একখানা আসনে।

হিন্দী ছবি। হাসি, গান আর নানান তামাসায় ভর্তি ছবিখানা। শ্লীল-অশ্লীল সবই আছে, আর আছে এক বৃদ্ধ ডাক্তারের বিচিত্র জীবন-কাহিনী—যাঁর আইন মতে বিবাহিতা পত্নী সারা জীবন তাঁর কাছে খোরপোস আদায় করলেন, অথচ একটা দিনের জন্যও স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন না। শেষের সম্বলটুকুও শেষ দিনে মনিঅর্ডার করে নিসম্বল ডাক্তার শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন এক অনাথ-বান্ধব আরোগ্য-শালায়। আইন তখনও স্ত্রীর পক্ষে, তাই কর্তৃপক্ষ মৃতদেহ অধিকার করবার জন্য স্ত্রীকে খবর পাঠালেন। তিনি এসে একখানা শক্ত ভারী তার-বাঁধা গোল মালা (বীদ্) চড়িয়ে দিলেন স্বামীর জীর্ণপ্রায় বুকের উপর...। বসে বসে দেখলো আশিস।

চমৎকার! আইন তো অন্তর দেখে না। সারা জীবন যিনি পত্নীর বিচ্ছেদ সহ্য করেও তাকে টাকা পাঠিয়েছেন আইন মতো, তাঁর মৃতদেহে মাল্যদানের অধিকার আইন-ই দিয়েছে ঐ পত্নীকে। কিন্তু অধিকার মৃতের আত্মার পক্ষে যে কতখানি অপমানকর সে কথা কেউ কি ভাবে!

খোরপোষই হয়তো দিতে হবে আশিসকেও। হ্যাঁ, এ ছাড়া কি আর করবার আছে? অথবা, বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন চালু হচ্ছে এখন...কিন্তু আশিস ভাবতে ভাবতেও থামলো। আশা মার নির্বাচিতা বধূ—মার অঞ্চলের ধন; অবশ্য মা যদি তার চরিত্র সম্বন্ধে জানতে পারেন তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে ত্যাগ করবেন। কিন্তু কি মর্মান্তিক দুঃখ মা পাবেন ভেবে অস্থির হয়ে উঠলো আশিস। না-না, মাকে কিছু জানানো হবে না। মা যাতে কিছুই জানতে না পারেন তারই ব্যবস্থা করবে আশিস। থিসিস্ চুরি গেছে, চোর নিয়েছে—এতে আশার কোনোরকম সংস্পর্শ আছে, একথা আশিস কিছুতেই মাকে জানতে দেবে না। কিন্তু আশার

মুখ দেখতেও আর ইচ্ছে নেই আশিসের। অতএব বেশ কিছুদিন বাইরে-বাইরেই কাটাবে। ইতিমধ্যে ঘটনা কোন দিকে যায় দেখা যাক...

আশিস হোটেলে ফিরে মাকে চিঠি লিখলো। লিখলো :

এখানে সে খুব ভাল আছে, ভাল থাকবে। ভাল হোটেল! ভাল খাওয়া-দাওয়া কোন অসুবিধা নেই। এখানকার 'টাটা বিজ্ঞান মন্দিরে' কিছু গবেষণা সে করতে চায়, মা যেন অনুমতি দেন। একটা কিছু না-করে তার বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে নেই। কারণ সকলের কাছে সে হাস্যাস্পদ হয়ে রয়েছে। মা যেন বোঝেন আশিসের কথাগুলো...

আবার লিখলো : মার তো এখন একটা সঙ্গী হয়েছে—আশাকে নিয়ে মা মাস কতক থাকুন, এর মধ্যে আশিস কিছু একটা বড় কাজ করে ফিরবে মার চরণ-বন্দনা করবার জন্য। 'আশা মার খুব ভাল সঙ্গিনী হয়েছে' কথাটায় কোটেশন্ এবং আন্ডার-লাইন করে দিল সে। অশান্ত মনের বিদ্রূপ-ব্যঞ্জনা হয়তো। কিন্তু উত্তেজিত আশিস ভেবে দেখলো না, কাকে কি লিখলো। এ পত্র নিশ্চয় আশা পড়বে একথাও তার মনে এল না। আরও লিখলো, দক্ষিণ ভারতটাও সে একবার ঘুরে দেখবে। এদিকের বিজ্ঞানাগারগুলিও তার দেখা দরকার। তার বাড়ী ফিরতে দেরীর জন্য মা যেন না ভাবনে। সে প্রায় প্রতিদিন মাকে চিঠি দেবে।

চিঠিখানা এয়ার-মেলে রওনা করে দিয়ে, খেয়ে এসে শুলো আশিস। এতক্ষণে মনে পড়লো 'আশা মার ভাল সঙ্গিনী' কথাটায় আন্ডার-লাইন করেছে সে। কেন সে করলো এমন কাজ? মা এবং অতি বুদ্ধিমতী আশাও নিশ্চয় বুঝবে আশিস বিদ্রূপ করছে আশাকে এবং মার নির্বাচনকে।

বুঝুক। বোঝাই ভাল। আশিসের যেন একটা জ্বালাময় আনন্দ বোধ হচ্ছে ঐ কথাটুকু লিখতে পারার জন্য। কিন্তু ওর মাতৃভক্ত অন্তর পরমুহূর্তেই বুঝলো সে অন্যায় করেছে। মার নির্বাচনকে বিদ্রূপ করেছে, মার মঙ্গল-ইচ্ছাকে আঘাত করেছে। চিঠিখানা রওয়ানা হয়ে গেছে, নইলে আশিস হয়তো ও কথাটা কেটে দিত। এখন আর উপায় নেই। আশাকে তো চিঠি লিখবার কথা নয়। কিন্তু মা সন্দেহ করবেন, কেন আশিস বধূকে চিঠি লিখলো না। করবেনই। করুন। কী আর করা যাবে। আশাকে প্রেমপত্র লিখবার মতো সদিচ্ছা আর থাকার কথা নয় আশিসের। তবু সে ভাবলো, দিলেই হোত দু'লাইন লিখে যে, 'ভাল আছি ব্যস্ত আছি'। না ওকে চিঠি লিখে কলম কলঙ্কিত করবে না আশিস। যে যা ভাবে, ভাবুক! আশিসের কিছুই করবার নেই। মাও একদিন জানবেন সবই, আঘাত তিনি পাবেন প্রচণ্ড। কিন্তু কি আর যেতে পারে? সবই নিয়তির ইচ্ছাধীন। ভাবতে-ভাবতে আশিস কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল—উঠেই দেখলো বেলা হয়ে গেছে অনেকটা। মনে পড়লো এখনকার বিজ্ঞান-পরিষদের অধিকর্তার নামে বিদ্যেন্দুবাবু একখানা পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছেন তার হাতে। চা খেয়ে, পোষাক পরে আশিস দেখা করতে গেল অধিকর্তা ডাঃ চিন্তামনের সঙ্গে।

ওকে সাদরে গ্রহণ করলেন ডাঃ চিন্তামন ; কিন্তু বললেন,—

—এখানে নতুন কোনো গবেষকের জন্য স্থান করে দেওয়া এখন সম্ভব হবে না। তবে আপনি যদি দিল্লী যেতে চান তো, আমি সেখানকার অধিকর্তাকে অনুরোধ-পত্র লিখে দিতে পারি।

দিল্লীর গবেষণাগার কিন্তু তৈরী হয়নি এখনো, জানে আশিস। তবে তৈরী হবার সব ব্যবস্থাই হয়েছে। এখন থেকে ওখানে ঢুকলে কাজের সুবিধা হবে একথাও জানালেন ডাঃ

চিন্তামন।

আশিস বোম্বাই-এ থাকতে পারলেই খুশি হোত। কিন্তু অনর্থক বসে থাকার তো কোন অর্থ হয় না। তাই বলল,

—দিল্লীতেই যেতে হবে তাহলে। তবে বোম্বাই-এ দিন কয়েক থাকবার ইচ্ছে আমার।

—বেশ, দিন-পনেরো পরে যাবেন! বললেন ডাঃ চিন্তামন।

অতঃপর আশিস কী করবে ভেবে পায় না। হোটেলে শুয়েই কি কাটিয়ে দেবে দিনগুলো। অথবা এদিককার দ্রষ্টব্যগুলো সব দেখে বেড়াবে? ওর তরুণ অন্তর একটা সঙ্গিনীর জন্য ক্ষুধিত হয়ে রয়েছে। অথচ আশার ভালবাসা যদি সে পেত তাহলে আজ এখানে সে আশাকে নিয়েই তো আসতে পারতো! তার বিদেশ ভ্রমণ প্রিয়সান্নিধ্যে পূর্ণ আনন্দের অলকা হয়ে উঠতে পারতো! কিন্তু...ভাবতে গিয়েই আশিসের যেন একবার মনে হোল, বিয়ের পর আশার সঙ্গে ব্যবহারটা সে ঠিক ন্যায়সঙ্গত ভাবে করেনি। ফুলশয্যার রাত্রে গবেষণা—কাজের চাপে অতখানি রাত হয়ে গিয়েছিল—ঘুমন্ত আশার কাছে হাতঘড়িটা রেখে, তার সঙ্গে কথা না বলে চলে আসাও ঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সে বড় ব্যস্ত ছিল। ভেবেছিল বধূর সঙ্গে প্রেম করা পালিয়ে যাবে না। অন্যদিকে মনোনিবেশ করলে বিজ্ঞানে চিন্তাসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। একথা সে জানিয়েও ছিল মাকে, এবং আশা নিশ্চয় তা শুনেছে! তবু অতখানি দূরত্ব রক্ষা না করলেও পারতো আশিস। হয়তো এতে আশার প্রতি তার অবহেলাই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? আশা তো তার জন্য শয্যা-রচনা করে বসে ছিল না। সে অন্যের জন্যই অপেক্ষা করে! সামান্য সুযোগটুকুও গ্রহণ ক'রে সে নীতীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, আর—আশিসের জীবন সাধনার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি, তার গবেষণালব্ধ সত্যজ্ঞান অনায়াসে দান করেছে এক পথের কুকুরকে...

হ্যাঁ পথের কুকুর ছাড়া কি আর! আশিসের মা না থাকলে অভাগা নীতীশ কোথায় তলিয়ে যেতো, কে জানে। মা-ই তো তাকে সকল রকম সাহায্য করে স্নেহ মমতা দিয়ে, অর্থ দিয়ে—আশীর্বাদ দিয়ে এতোখানি এনেছেন! আশিসও তার জন্য কম কিছু করেনি কিন্তু নীতীশ কী করলো! নিশ্চয় সে আশার সঙ্গে পূর্ব থেকে পরিচিত—প্রেমাসক্ত ছিল। সে-ই হয়তো আশার বাবাকে খবর দিয়ে মার সঙ্গে দেখা করিয়ে, মাকে নির্বাচন করিয়েছে আশার মতো একটা অসচ্চরিত্রা মেয়েকে বধূরূপে। মা হয়তো প্রতারিতা হয়েছেন নীতীশের দ্বারা! আর নীতীশের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। সে ভালভাবেই জানে এর পরে আশিস কিছুতেই আশাকে গ্রহণ করবে না! অতএব বিবাহ-বিচ্ছেদ—অথবা খোরপোষ আদায়ের চক্রান্ত! তারপর আশাকে নিয়ে নীতিশের আরামে জীবন যাপন...চমৎকার অভিনয়টা কিন্তু করেছে ওরা! আশা এবং নীতীশ। বাঃ!...

'বাঃ'! শব্দটা প্রতিধ্বনি হয়ে শানিত ছুরির মতো ফিরে এল ওরই কানে।

স্বপ্নহীন ঘুম...নীতীশ যথেষ্ট সুস্থ বোধ করেছে। রমানাথ এসে না-ডাকলে আরও হয়তো কিছুক্ষণ ঘুমুতো সে। কিন্তু ক্ষিদেও পেয়েছে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে রমানাথের সঙ্গে খেতে বসল। কুমকুম দিল খাবার। ভাল রান্না করে কুমকুম। রান্নায় ওস্তাদ সে। নীতীশ প্রশংসা ক'রে প্রশ্ন করলো,

—ক'রকম মাংস রান্না করতে জান, কুমকুম?

—না, দাদা—রকমারি জানি নে। এই সাধারণ রান্না করতে পারি।—হাসলো সে।

—আচ্ছা, ফিরতি পথে তোমাকে মুরগী-মসল্লাম রান্না শিখিয়ে দেব। নীতীশ বললো।

—ফিরতি পথে কেন, দাদা? আজই হয়ে যাক্। ওবেলাই। থেকেই যান-না আজ দিন-রাতটা। কিই-বা এমন কাজ আপনার? কাল সকালে যাবেন।—বলল রমানাথ।

কুমকুমও যোগ দিল রমানাথের আবেদনে। নীতীশের মন্দ লাগছিল না। এখানে দু'একদিন থেকে যেতেও যেন তার আর আপত্তি নেই। বেশ নিরিবিলি পল্লীটা সামনেই বড় পুকুর, তার চারিদিকে বাগান। বড়ই মনোরম মনে হচ্ছিল। বর্দ্ধমান শহরের বাইরের দৃশ্য বড়ই চমৎকার। ভাবলো নীতীশ—বিদ্যাসুন্দরের বিচরণভূমি। হাসলো নিজের মনে।

—'আচ্ছা, থাকা যাবে, বলে জবাব দিল ওদের। কুমকুম শুধালো, তাপসীপুরে আপনার কে আছেন দাদা?

ছিলেন পিসিমা। তিনি কাশীতে। এখন আছে একতলা একটা বাড়ী—তিনখানা কুঠরী তার উঠানে একটা জামরুল গাছ...আর ইঁদুর-আরশোলা! হয়তো সাপও।—হাসলো নীতীশ কথাটা বলতে বলতে।

—চলুন কালই আপনার ঘরখানা গুছিয়ে দিয়ে আসি। বৌদি এসে যেন অসুবিধায় না পড়েন—কুমকুম হেসে বলল।

—বৌদি! নীতীশ কিঞ্চিত বিস্মিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো তার পকেটে রাখা আশার ফটোখানার কথা, এবং রমানাথের সঙ্গে গাড়ীতে আলাপের কথাও শুনেছে নিশ্চয় কুমকুম রমানাথের কাছে। কিন্তু কিছুই জবাব দিল না নীতীশ। কুমকুম আবার বলল,

—কখন তিনি আসবেন তাপসীপুরে? নাকি এখন আসবেন না?

—ওর মধ্যে অনেক বিদঘুটে ব্যাপার আছে, কুমকুম—ওসব কথা এখন থাক। নীতীশ [illegible]চনা বন্ধ করতে চায়। কুমকুমও কী যেন বুঝে আর কোনো প্রশ্ন করলো না, চামচেতে করে দই তুলে দিতে লাগলো নীতীশের পাতে। কিন্তু রমানাথ বলল,

—বিদঘুটে।

—নারী সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলোই প্রায় বিদঘুটে, রমানাথবাবু।

—তা যা বলেছেন। এই দেখুন না, কুমকুমকে নিয়ে আমার...

—এই—চুপ...কুমকুম ধমক দিল রমানাথকে।

নীতীশ নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলো। কুমকুমের ধমকটা ও যেন শুনতেই পায়নি, এমনি ভাব দেখালো নীতীশ। রমানাথ বলল,

—নীতীশদাকে আরো খানিক ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দাও ; উনি হয়তো মাসখানেক ঘুমান নি।—নাকি নীতীশদা?

মাসখানেক নয়, তিন দিন।—নীতীশ কুমকুমের হাতের পান নিতে নিতে বলল,—ঘুম জিনিসটা জীবের পক্ষে বড় আশীর্বাদ, রমাবাবু!

—হ্যাঁ নিশ্চয়! কিন্তু দুস্বপ্ন দেখলে ঘুম-ই সাংঘাতিক হয়ে ওঠে দাদা।

হাসলো রমানাথ। কথাটাকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য আবার বলল,—গান আছে "স্বপ্ন দি মধুর এমন..." কিন্তু স্বপ্ন এমন উৎকট রকমের কদর্য হতে পারে দাদা, যে মানুষকে সন্তিষ্ট করে ছাড়ে। হোমিওপ্যাথিতে...

—থাক্, রমাবাবু। নীতীশ বাধা দিল—আপনার হোমিও-বক্তৃতা থাক এখন। ও শুনলেই আমি দুঃস্বপ্ন দেখবো। একটু আরাম করে ঘুমুতে চাই।

—থাক্....লজ্জিত রমানাথ হাসলো।

কুমকুম ওঘরে আবার নীতীশের শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে এল। কিন্তু আশ্চর্য নীতীশ ঘুমুচ্ছে না, ভাবছে। ভাবছে গভীরভাবে। মাথাটা বালিশের মধ্যে গুঁজে নীতীশ ভাবছে—স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়...হয়। আজই সকালে ট্রেনে দেখা স্বপ্নটা কিন্তু সুখ-স্বপ্ন—মধুর, মধুরতম স্বপ্ন তার জীবনের। এর স্মৃতিটাই ভুলতে পারছে না নীতীশ, ভুলতে চাইছে না। কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্ন-ই। ওর মধ্য সত্যতা কোথায়! যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণই ওর মর্য্যাদা। না, ওর স্মৃতিও থাকে! দীর্ঘদিনই থাকে হয়তো। কে জানে। কিন্তু ট্রেনের স্বপ্নটা শুধু, বাস্তবে নীতীশ স্পর্শও করেনি আশাকে। না, করেনি। এখনো বেশ মনে পড়ছে তার। হাতখানা বাড়িয়েও কি-জানি-কেন—হয়তো নৈতিক দুর্বলতাবশে নীতীশ অতবড় সুযোগটা অবহেলা করেছে! হ্যাঁ, করেছে। নীতীশ ওকে ছোঁয়নি! ছুঁলেই পারতো। আশা তো আশিস ভেবেই এগিয়ে এসেছিল ওর কাছে! আলোও খুব কম—একেবারে নিবিয়েও দিতে পারতো নীতীশ সেটা। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি, স্বপ্নে সেটা ঘটে গেল। আশ্চর্য তো। এতে প্রমাণ হচ্ছে নীতীশের অন্তর উন্মুখ হয়ে রয়েছে আশার দিকে। হ্যাঁ, এতে আর সন্দেহ কি! জাগ্রত অবস্থায় নৈতিক দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারলেই নীতীশ একটা সত্যিকার 'ভিলেন'। হ্যাঁ 'ভিলেন'। নীতীশ আর ভদ্র নেই। নীতীশ আর নীতিবান নয়। না। জন্মগত অপরাধ-প্রবণতার কয়েকটা বিশেষ লক্ষণ ওর মধ্যে পূর্ণভাবেই প্রকট। কিন্তু নীতীশ ভদ্রবংশজাত, নীতীশ শিক্ষিত, নীতীশ আজন্ম নীতিবান—তবু এই পাপপ্রবণতা কেমন করে এল নীতীশের মধ্যে। লক্ষণগুলো বিশ্লেষণ করতে লাগলো নীতীশ—প্রথম, থিসিস্-চুরির কথা তার কল্পনাতেও ছিল না! দিব্যেন্দুবাবু যখন বললেন 'সাবধানে রেখো, চুরি না যায়' : তখুনি নীতীশের অন্তরে চুরির মনোবৃত্তি জাগ্রত হোল। কেন হোল? নীতীশের পাপপ্রবণতার জন্যই। দ্বিতীয়, চুরি করবার মতলবটা ঠিক হবার সঙ্গে চাবি-চুরিরও প্ল্যান তার মাথায় এসে গেল—পার্টির হুল্লোড়ের মধ্যে সেটা সে চুরি করবে। সবগুলোই চুরি করতে হবে, কারণ কালিচরণ ঘর বন্ধ করে বাজারে যেতে পারে। তৃতীয়, চুরির প্ল্যানটা এমনভাবে করেছে যাতে সন্দেহ বহু বন্ধুর উপর পড়তে পারে। কারণ সবাই তখন পার্টিতে ছিল আর নীতীশ ছিল বান্নার তদ্বিরে! এ-পর্যন্ত সাধারণ চোরের মতো কাজ করেছে নীতীশ। কিন্তু চুরি করতে ঢুকে ঘরের মধ্যে আশাকে দেখে মুহূর্তের জন্য বিচলিত হলেও কর্তব্য তখুনি ঠিক করে নিয়েছিল। বুদ্ধি এই প্রয়োগ ক্ষিপ্রতা পাকা অপরাধীর লক্ষণ—জানে নীতীশ। সে জানে তার মুখ দেখলেই আশার সন্দেহ হতে পারে তার উপর। তাই নীতীশ দেওয়ালের দিকেই মুখ করে রইল সর্বক্ষণ। ওই সময়টুকুর মধ্যেই ভেবে নিল কী তার করণীয়। কী ভাবে সে পালাতে পারে। বুদ্ধি সাহায্য করলো তৎক্ষণাৎ—'আশিস' হয়ে আশাকে ধোঁকা দিয়েই সরে পড়তে হবে। তখন যে কথাটুকু বলেছিল, তা অত্যন্ত চাপা গলায়। বিখ্যাত ডাকাতেও এত তাড়াতাড়ি এমন বুদ্ধি খাটাতে পারে কিনা কে জানে?

কিন্তু নীতীশের সন্দেহ হচ্ছে তার অপরাধী মনের প্রয়োগ-চাতুর্য্যে, তার পাপী মনের ক্রিয়া-সামর্থ্যে। নইলে থিসিস্টা পেলেই বেরিয়ে আসবে কেন? ঐখানেই যে নীতীশের

চুরি-বিদ্যায় সবটা কেঁচে গেল? আশার কিঞ্চিৎ মাত্র বুদ্ধি থাকলেই বুঝে নিতে পারতো থিসিস্‌টা ফেলে যে পালাচ্ছে, সে চোর ; সে 'আশিস' নয়। নিজের বৌকে দেখে কেউ অমন করে পালায় না, তা-সে তার যতই কাজ থাকুক। তার উপর নতুন-বউ। যে বউকে এক সেকেন্ড দেখে নীতীশ কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

কিন্তু থিসিস্‌টা না-নিয়ে-বেরুনো নীতীশের চুরিবিদ্যাবত্তার নৈতিক অধঃপতন। সে চোর নয়, এখনো চোর হতে পারেনি। এখনো সে ভদ্রলোক ছেলেই আছে... হ্যাঁ, এখনো সে ভদ্র, এখনো সে সুযোগ পেয়েও বন্ধুপত্নীর নারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে চলে আসতে পারে। নীতীশের চোখ-মুখ দৃঢ় হয়ে উঠলো অকস্মাৎ।

যা হবার হয়েছে। নীতীশকে ভদ্র থাকতে হবে, মানুষ থাকতে হবে। ভুল সে করেছে এক্ষুনি সংশোধন করবে। নীতীশ ফিরিয়ে দেবে আশিসের থিসিস্। তার সঙ্গে সমস্ত ঘটনা—দিব্যেন্দুবাবুর কথার সূত্র ধরে তার অপরাধী নিজের অধঃপতন এবং থিসিস্-চুরির ইতিহাস পরিষ্কার ভাষায় লিখে রেজেষ্টারী ডাকে পাঠিয়ে দেবে আশিসকে। এজন্মে আশিসকে আর মুখ দেখানো সম্ভব হবে না। না হোক, তবু আশিস জানবে মুহূর্তের প্রলোভনে নীতীশ অধঃপতিত হয়েছিল।

আর আশা?...ভাবতে গিয়ে নীতীশের মনটা যেন ধাক্কা খেল। কিন্তু আশাও নিশ্চয় এতক্ষণ জেনেছে যে ল্যাবরেটরীতে নীতীশ-ই তার পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করেছে। ঘৃণাই হবে আশার মনে। কিন্তু আশার কাছেও ঐ মুহূর্তটুকুর অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবে নীতীশ। এখনি লিখতে হবে, আর দেরী নয়। দুর্জয় প্রলোভন আবার হয়তো ওকে প্রতারিত করতে পারে। নীতীশ সুটকেশ খুলে কাগজ-কলম বের করলো।

সুন্দর কলম। মূল্যবান। অভিজাত স্বর্ণলেখনি। এরও একটা ইতিহাসে আছে। ভাবতে লাগলো নীতীশ কলমটা হাতে নিয়ে। ওর মতো গরীবের এতো দামী কলম থাকবার কথা নয়। ছিলও না। একদিন আশিসের মার কাছে কি একটা লিখতে তার সাড়ে বারো-আনা দামের ফুটপাত-মার্কা কলমটা বের করে লিখতে গিয়ে আর কালি বেরুলো না। ক্রমাগত ঝাড়তে লাগলো নীতীশ। মা বললেন,—

—কি হোল বাবা, নীতীশ?

—কম-দামী কলম, মা—খারাপ হয়ে গেছে।—বলে করুণ হাসি হেসে ছিল নীতীশ।

—তোর এতোগুলো ভাল কলম, আর আমার নীতীশ লেখে একটা ভাঙা কলমে! কেনরে আশিস?—মা কঠিন কণ্ঠে ধমক দিয়েছিলেন আশিসকে।

খুবই ভুল হয়ে গেছে, মা—বলে আশিস তৎক্ষণাৎ নিজের বুক-পকেট থেকে মূল্যবান কলমটা টেনে মার হাতে দিয়ে বলেছিল,

—তুমি নিজের হাতে এটা দিয়ে ওকে আশীর্বাদ করো, মা।

সেই 'মা' আর সেই 'আশিস'...ওঃ! কতখানি অমানুষের কাজ করেছে নীতীশ। ঐ স্নেহময়ী মার কাছে আর কোন মুখে যাবে নীতীশ। না, নীতীশের জীবনে আর ওখানে যাওয়া হবে না।

চোখে জল এল নীতীশের।

জলটা মুছতে গিয়ে আনন্দিত হোল। এখনও তার চোখে আসে। এখনো সে মানুষ আছে তাহলে? হ্যাঁ, আছে।

নীতীশ পত্র লিখতে আরম্ভ করলো।

বিশদভাবেই সব ঘটনা লিখলো নীতীশ : আশার ভুল করে 'আশিস' ভেবে তাকে পুষ্পাঞ্জলি-দেওয়া এবং নীতীশেরও আশিস রূপে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করার কথাও লিখলো। আরও লিখলো, প্রচণ্ড প্রলোভনে আশার অঙ্গ স্পর্শ করতে সে হাত বাড়িয়েছিল—অকস্মাৎ হয়তো তার পিতৃপুরুষের পুণ্য তাকে রক্ষা করেছে! নীতীশ বন্ধু পত্নীকে স্পর্শ করবার অভিশপ্ত ক্ষণটিকে ব্যর্থ করে বেরিয়ে আসতে পেরেছে তার নারী-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই। কিন্তু নীতীশ অপরাধী। এক বিরহাতুরা সতীর স্বামীত্ব চুরি করে নিজেকে ক্ষণিকের জন্য সুখী করতে চাওয়ার অপরাধে অপরাধী সে। নীতীশ লিখে চলল,...শ্রীভগবান নাকি শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশে শ্রীমতী তুলসীর সতীত্ব অপহরণ করেছিলেন। তিনি শ্রীভগবান, তাই রেহাই পেয়ে গেছেন। কিন্তু নীতীশ বিশ্বাসঘাতক, বন্ধুদ্রোহী! নীতীশ এক বালিকা বধূর স্বামীত্ব অপহরণ-লুব্ধ 'ভিলেন'! তার অপরাধ ক্ষমার অতীত আশিস যেন তাকে ক্ষমা না করে। যেন তাকে মমতা না করে! আর আশাকে যেন জানিয়ে দেয়, নীতীশ তার ঘৃণা পাবারও অযোগ্য।...

পত্র শেষ করে নীতীশ সেটা খামে মুড়ে থিসিস্-এর সঙ্গে রাখলো। তারপর সবগুলো একখানা মোটা খামে ভরে বন্ধ করলো, নাম-ঠিকানা লিখলো আশিসের। এখন রেজিষ্টারী করতে হবে। উঠছে—

—কোথায় যাচ্ছেন, দাদা?—কুমকুম প্রশ্ন করলো।

—এই চিঠিটা রেজিষ্টরী করে আসি।

—আজ তো আর হবে না, সময় চলে গেছে। কাল রবিবার! পরশু হবে।

—আজ না? কালও না? নীতীশের মুখ অত্যন্ত ম্লান।

—কেন দাদা! কি এমন জরুরী ওটা?

—হ্যাঁ, জরুরী ছিল, কুমকুম!—নীতীশ ফিরে এসে প্যাকেটটি সযত্নে রাখলো সুটকেসে। কুমকুম ভেতরে এসে বসলো চেয়ারে। বলল,

—আপনাকে কেমন যেন লাগছে, দাদা। কী ব্যাপার? বৌদির সঙ্গে ঝগড়া নয় তো?—হাসলো কুমকুম।

—বৌদি। বৌদি কে? আমার বিয়ে হয়নি, কুমকুম। যার ফটো তোমরা দেখেছে, সে আমার এক বান্ধবী। বউ নয়।

—ও, বান্ধবী। কুমকুম বলল,—তা বিয়ে তো হতে পারে?

নীতীশ উত্তর দিল—না। সে তখন ভাবছে আশাকে বন্ধুর স্ত্রী' বলে পরিচয় না দিয়ে সে 'বান্ধবী বললো কেন? এও তো অপরাধ-প্রবণতার লক্ষণ। তাহলে কি সত্যিই নীতীশ অপরাধী? সত্যিই কি নীতীশ কাল সন্ধ্যায় আশার প্রেম লাভের জন্যই আশিসের অভিনয় করেছিল? পালিয়ে আসবার জন্য নয় শুধু, মোটেই পালিয়ে আসবার জন্য নয়। নীতীশ আনন্দ বোধ করছিল আশার স্বামী হওয়ার চিন্তায়। হোক সে চিন্তা ক্ষণিকের জন্য, তবু সে ক্ষণ সত্য—সে ক্ষণ শিলালিপির ক্ষণলেখা...সে ক্ষণ ক্ষণ-স্বাক্ষর।

সে ক্ষণকে নীতীশ ভুলবে কি করে। নীতীশ শুধু অপরাধী নয়, নীতীশ অপরাধ প্রবণতার প্রশ্রয়দাতা ; মনের কদর্য্য প্রলোভনকে সে লালন করছে সস্নেহে। তাই ঐ স্বপ্নে আশাকে নিবিড়ভাবে...কিন্তু কোনটা স্বপ্ন? নীতীশ তো সত্যিই ধরেছিল আশাকে সে দিন

হ্যাঁ হ্যাঁ...ধরেছিল...

জিভটা শুকিয়ে গেছে নীতীশের ; কুমকুমকে বলল,

—একটু জল দাও, কুমকুম!

উদয়লগ্নে স্নান করা আশার অভ্যাস চিরদিন। স্নানকে সে বিলাস মনে করে না, পূজার প্রস্তুতি বলে জানে! কদাচিৎ ভোরে উঠে স্নান করা ওর বাদ যায়। আজও অতি প্রত্যূষে স্নান-ঘরে ঢুকছে সে। শাশুড়িও সকালেই স্নান সেরে পূজায় বসেন। হয়তো এতক্ষণ তিনিও উঠেছেন।...আশা নিজের মনে ভাবছিল গায়ে জল ঢালতে ঢালতে। ভাবছিল এই বিশাল প্রাসাদের অধিশ্বরী সে। কিন্তু কী সুখ তার রয়েছে এখানে! এর থেকে কোনো গরীবের ঘরে বধূ হলে সে এতোক্ষণ স্বামীর অফিস যাবার জন্য রান্না চড়াতো, ব্যস্ততার অন্ত থাকতো না। আর এখানে আজ কাজ খুঁজে ওকে কাজ করতে হয়। পূজার আয়োজনে কয় মিনিট-ই বা লাগে তার? এতোকাল ঝি চাকরেই করতো সব। আশা এখন ইচ্ছে করে সেগুলো নিজে করছে—ফুল তোলা, চন্দন ঘষা। খুবই ভাল কাজ, কিন্তু কার জন্য এসব করে আশা।

ভাবতেই মনটা ধাক্কা লাগলো। স্বামীর মঙ্গলের জন্যই করে। আশা হাতের নোয়াটা মাথায় ঠেকালো। ভাগ্যিস বাথরুমের ভেতর, নইলে কেউ হয়তো দেখে ফেলতো আর ঠাট্টা করতো আশাকে। হাতের নোয়া কে আর আজকালকার দিনে মাথায় ঠেকায়! শাঁখাই পরে না সব। সিঁদুরও প্রায় উঠে যাচ্ছে পরা। কিন্তু আশা অতটা আধুনিক হবে না। নিশ্চয় না।

স্নান সেরে মার পূজার সরঞ্জাম ঠিক করে দিয়ে আশা বেকার। ওর আর কিছু করবার নেই। গান করবে, না হয় বই পড়বে, অথবা চুপ করে বসে থাকবে। কিন্তু কিছু একটা না করলে ও টিকতে পারবে কি করে! মনের অশান্ত আবহাওয়াকে এভাবে এলোমেলো বয়ে যেতে দেওয়া খুবই খারাপ হচ্ছে। আশা ধীরে ধীরে ল্যাবরেটরী-ঘরে এসে উপস্থিত হোল—কালিচরণ দরজা খুলে দিল।

ওর শ্বশুরের তৈরী গবেষণাগার—ওর প্রিয়তম স্বামীর পাঠ-নিকুঞ্জ। না-না তপস্যাভূমি! আশা নিজের মনে সংশোধন করলো কথাটি। কী কঠোর তপস্যাই না করলো আশিস এখানে! গবেষণা তো শেষ হয়েছে, এখন তার কাজ চুকিয়ে আশিস নিশ্চয় এসে দেখা করবে আশার সঙ্গে। তখন বোঝা যাবে কেন সে আশাকে 'অতিভক্তি' কথা বলে গেল যাবার সময়। ওর আভ্যন্তরীণ অর্থ না জানলে চলবে না আশার! প্রণাম পছন্দ করে না তো, বললেই হোত সে-কথা!

আশা স্তব্ধ ল্যাবরেটরীর মাঝে দাঁড়িয়ে দেখছে যন্ত্রপাতিগুলো। সবই কিম্ভূতকিমাকার। কিছুই সে বোঝে না এসবের। কালিচরণকে শুধুবে নাকি কোন্‌টায় কি কাজ হয়? না। কালিচরণকে কোনো প্রশ্ন করলে এই বংশের অভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে, যার জন্য আশা খুব দরকারী প্রশ্নও করেনি কালীকে। সেদিন রাত্রে আশিস কেন ভেতর-বাড়ীতে গেল না, আশা অনায়াসে কালিকে শুধুতে পারতো। পারেনি, আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে। শাশুড়িও কিছু বললেন না আশাকে। কেউ কিছুই বলল না! অথচ আশা যেন আন্দাজ করছে কোথায় কি একটা গলদ হয়েছে। কি সেটা! কাউকে শুধুবার পাত্র পাচ্ছে না আশা!

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ঘরখানা কিছুক্ষণ দেখলো আশা। তারপর একটা 'ডাষ্টার' তুলে নিয়ে

যন্ত্রগুলো মুছতে আরম্ভ করলো। পরিষ্কার ঝকঝক্ করতে লাগলো সব। কালীকে বললো, মেঝেতে ঝাঁট দিয়ে ময়লাগুলো সাফ করে দিতে। বড় টেবিলের বই-কাগজ সব গুছিয়ে রাখলো। টেলিফোনের কলটাও মুছলো যত্ন করে। সাজালো সমস্তটা নিজের খুসী-খেয়াল-মতো। সেদিনের-আনা ধূপ থেকে কয়েকটা কাঠি নিয়ে জ্বালিয়ে দিল এখানে সেখানে। কতকগুলো ফুল সাজিয়ে রাখলো একটা কাঁচের মোটা টিউবে। ফুলদানি নেই এখানে। আজই কিনে আনবে আশা। সব শেষ করে নিজেই দেখছে নিজের কাজের পারিপাট্য—চমৎকার হয়েছে! আশিস যদি উপস্থিত থাকতো! সুদীর্ঘ শ্বাসটা আটকে যাচ্ছে বুকে ওর। হাতজোড় করে আশা উদিত সূর্যের পানে তাকালো—নমস্কার করবে!

হঠাৎ শুনতে পেল কে যেন বলছেন,

—কী ডিভোশ্যন! এ যুগেও এমন মেয়ে থাকে, বৌঠান?

আশা ত্বরিতে মুখ ফিরিয়ে দেখলো, অন্দরের দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে মা আর দিব্যেন্দু বাবু। মা হাসি-ছলছল চোখে দেখছেন ওকে। আশা তাড়াতাড়ি গিয়ে হেঁট হয়ে প্রণাম করলো দিব্যেন্দুবাবুকে!

—জন্ম এয়োস্ত্রী হও, মা!—অত্যন্ত প্রাচীন আশীর্বাদই করলেন তিনি। বললেন,

—তোমার মতো মেয়ের কাকাবাবু হওয়া ভাগ্যির কথা, মা! আমার নিজের মা-ই যেন তুমি, বয়স বদলে এসেছ! মাথায় হাত দিলেন তিনি আশার।

—আপনি একবার সব যন্ত্রগুলো দেখুন, কাকাবাবু—সব ঠিক আছে কিনা!

ঠিকই আছে, মা! তুমি যখন নিজে দেখছো তখন আমি আর কি দেখবো?

—না, কাকাবাবু! আশা আব্দার করলো,—আপনাকে আসতে হবে। আমার কিছু প্রার্থনা আছে—

—প্রার্থনা! কী মা? ছেলের কাছে যা চাইবে, পাবে। বলো—

—আপনি আমাকে কিছু 'বিজ্ঞান' পড়ান...মা আপনি অনুমতি করুন।

—পড়-না! ওঁর কাছে পড়বি তার আবার আপত্তি কি!

—কিন্তু মা!—দিব্যেন্দু বললেন,—বিজ্ঞান বড় কঠিন বিষয়। বিশেষত যে বিজ্ঞান নিয়ে আমরা কাজ করি—

আমাকে আপনি সহজ বিজ্ঞান কিছু শেখান—যা আমি শিখতে পারবো...

—বেশ, মা! আচ্ছা বলো তো—ওরা এর মধ্যে ভেতরে এসে বসেছেন চেয়ারে, আশা-ই দাঁড়িয়ে আছে! দিব্যেন্দু এক সেকেন্ড আশার পানে চেয়ে বললেন,

—তুমি একটা রেলগাড়ীর কামরায় আছ—গাড়ীটা ষ্টেশনে ঢুকছে। ষ্টেশনে দাঁড়ানো অন্য একখানা গাড়ী রয়েছে। তোমার নিজেকে স্থির, আর দাঁড়ানো গাড়ীটাকে চলমান মনে হবে। তোমার কামরার মধ্যে থেকে তোমার ভুল কি করে বুঝতে পারবে?

—বোঝা মুস্কিল, কাকাবাবু!—আশা হেসে বলল,—এতে কী প্রমাণ হয়, কাকাবাবু?

প্রমাণ হয় যে, সত্য সর্বদাই আপেক্ষিক। কারণ, যে ইন্দ্রিয় আর যন্ত্র দিয়ে তুমি সত্যটা নিরূপণ করবে, সেই যন্ত্রাদি সবই সত্যকে ততটুকু প্রকাশ করতে পারে—যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব। তার বেশী নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা আর পরীক্ষার মধ্যেই আমরা সত্যকে দেখি, কিন্তু সেইটাই একমাত্র সত্য নয়। আরো সত্য আছে, যা আমরা হয়তো আরো শক্তি অর্জন করে জানতে পারবো।

আশা হাসিমুখেই শুনছিল। ওর বোধশক্তি তীক্ষ্ণ, তবু বলল,

—বড় কঠিন লাগছে, কাকাবাবু! পারবো না হয়তো আমি...

—এটা খুব কঠিন নয়, মা, এ অতি পুরোনো কথা। আচ্ছা, তোমাকে আমি কিছু গৃহস্থালী-বিজ্ঞান শেখাবো।

—হ্যাঁ, তাই শেখাবেন! যা আমার কাজে লাগবে।—হাসলো আশা—আপনার জন্য কিছু খাবার আনি, কাকাবাবু!—আশা চলে গেল।

এতক্ষণে দিব্যেন্দুবাবু প্রশ্ন করলেন,—'চুরির কথা ও কি জানে, শুনেছে?

—না, ঠাকুরপো!—মা তাড়াতাড়ি বললেন,—ওকে কিছু বলবেন না! একেই তো মনমরা হয়ে আছে, তারপর থিসিস্-চুরির কথা শুনলে নিজেকে 'অপয়া' ভেবে আধমরা হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক! ওকে কিছু না-বলাই ভাল। আর বলে তো কিছু লাভ নেই? কিন্তু বৌঠান, আমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে—কে চুরি করলো ওটা?

—চোরকে খুঁজতে দূরে যেতে হবে না ঠাকুরপো! আমাদের নিতান্ত নিকট সে। আশিসের বিশেষ বন্ধু না হলে, ও-বস্তু কেউ চুরি করতে পারতো না।

—নীতীশের কথা বলছেন, বৌঠান?

—হ্যাঁ। কিন্তু যাক্। ওকেও ছেলের মতো ভালবাসতাম আমি! নিক্‌গে। ওর যেন ভাল হয়...

দিব্যেন্দুবাবুর মুখে ভাষা যোগাচ্ছে না।

—প্রমাণ কিছু পেয়েছেন, বৌঠান?—আবার আধমিনিট পরে শুধোলেন দিব্যেন্দুবাবু।

—প্রমাণ নিতেও ইচ্ছে করেনি, ঠাকুরপো! নীতীশ চোর, একথা মনে করতেও আমার নিজেরই লজ্জা হয়। ঈশ্বর প্রমাণ মিলিয়ে দিলেন। চুরির দিন রাত্রে আশিসকে এখানেই খাইয়ে খুম পাড়িয়ে আমি নানা কথা চিন্তা করছিলাম। আলো সব নেবানো ছিল। দেখতে পেলাম একটা সুটকেস-বগলে একজন লোক গেটের ওদিকে। আমি অন্ধকারে ছিলাম তাই চোখের জ্যোতি কিছু বেড়েছিল। ওদিকে রাস্তার আলোটাও গেটের খানিকটা আলো করে ছিল। দেখলাম সে সুটকেস নামিয়ে ফটক ডিঙিয়ে ভেতরে আসবার চেষ্টা করছে...

—কে! কে সে বৌঠান? নীতীশ?

—হ্যাঁ। অকস্মাৎ কালিচরণ চেঁচিয়ে ওঠায় নীতীশ পালিয়ে গেল।

—ওঃ!—ডাঃ দিব্যেন্দু একটু ভেবে আবার প্রশ্ন করলেন, কিন্তু চুরির পর আবার সে কি জানা আসতে চাইল?

—জানি না! হয়তো কোন যন্ত্র-চুরির মতলব ছিল ওর। আমি কালীকে আলো নিবিয়ে দিতে বলে সারারাত অপেক্ষা করছি, যদি সে আবার আসে। না, এলো না। নীতীশ চোর একথা কালিচরণকেও বলা যায় না, ঠাকুরপো। তার এতখানি অধঃপতন আমাকে চোখে দেখতে হোল।—মা গভীর শ্বাস ত্যাগ করলেন।

—সত্যি দুঃখের কথা, বৌঠান! সে আর আসেনি তো এখানে?

—না। সে আর আসতে পারবে না!

আশা জলখাবার নিয়ে এল ডাঃ দিব্যেন্দুর জন্য। তিনি সস্নেহে বললেন,—রন্ধন-বিজ্ঞান কতখানি শিখেছে, মা-মণি?

—কৈ শেখা হোল, কাকাবাবু? কাঁচকলার ঝোল কালো হয়ে যায় রাঁধবার সময়।

—আচ্ছা মা, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কী করলে কলার কষটা ঝোলের রস কালো করবে না।—খেতে আরম্ভ করলেন তিনি!

—শেখাবেন! কিন্তু আমার খুবই ইচ্ছে, ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন সম্বন্ধে কিছু জানা বিশ্বের সৃষ্টিরহস্য নাকি ওতেই লুকিয়ে রয়েছে।

—যতটুকু আধুনিক বিজ্ঞান জানতে পেরেছে, মা—তাতে মানুষের জ্ঞান যতই বাড়ুক আজও পূর্ণ হয়নি! হয়তো কোনদিন হবে না। কারণ মানুষের শক্তি সীমিত। তবু বিজ্ঞান যতটা জেনেছে সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে—তোমাকে আমি তা বোঝাবার চেষ্টা করবো। কখন তোমার সময়?

—সব সময়ই আমার সময়, কাকাবাবু। আমার কোনো কাজ নেই এখানে।

আশার কথার করুণ সুরে মা ওর মুখের পানে তাকালেন। সকরুণ মুখখানি। শীলে বাটনা-বাটা অবস্থায় এই কর্মিষ্ঠা মেয়েটিকে তিনি পছন্দ করে এনেছেন। ওর কোনো কাজ নেই এখন। নেই সংসারের কাজ, নেই সাহচর্য। বেদনায় অন্তর মুচড়ে উঠলো ওঁর, মুখে জোর করে হাসি এনে বললেন,

—কাজ তো বিস্তর করেছিস্ বাপের বাড়ীতে, এখন দিনকয়েক না-হয় বিশ্রাম করিস!

—বিশ্রাম করে-করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, মা!...

ওর কণ্ঠের আবেদন অসহনীয়তায় ঘরের আকাশকেও ভারি করে তুলেছে—মা এবং ডাঃ দিব্যেন্দু মুহূর্তে বুঝলেন এই তরুণীর বুকের অসহ্য বেদনা!

কিন্তু কিছুই ওঁদের বলবার নেই, কিছু করবারও নেই। এমন কোনো বস্তু ওঁদের কাছে নেই, যা দিয়ে ওকে কিঞ্চিৎ আনন্দিত করা যায়। ডাঃ দিবেন্দু বললেন,

—ওবেলা তোমাকে আমি খানকতক বিজ্ঞানের বই এনে দেব মা, অণুবিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রগুলোও বুঝিয়ে দেব। আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকতাবাদও বোঝাবো তোমায় ধীরে ধীরে।

আশা নিঃশব্দে শুনছিল। ডাঃ দিব্যেন্দু উঠলেন। যাবার সময় আবার ওকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন, ওবেলা বই নিয়ে আসবেন। এই স্নেহশীল বৃদ্ধ আপন কন্যার মতো যত্নে ওকে বিজ্ঞান পড়াবেন ঠিক করলেন মনে-মনে। কিন্তু একটা বিশেষ ব্যথা তিনি অনুভব করছিলেন.. । আশা পিছনে আসছে। মা এবং দিব্যেন্দুবাবু এগিয়ে যাচ্ছেন অন্দরের পথে। জনান্তিকে মাকে তিনি বললেন,

—আমার মনে হচ্ছে বৌঠান, গবেষণায় ব্যস্ত থাকার জন্য আশিস ওকে অবহেলা করছে—

—আমারও তাই মনে হয়, ঠাকুরপো। আশিস তো আপনার হাতে গড়া—এরকম যদি হয়ে থাকে তো, আশিসকে কি সমর্থন করবেন আপনি?

—না-না-না, বৌঠান—দিব্যেন্দুবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন.—কখনই ওকাজ সমর্থন করিনে আমি! অবশ্য আমাদের ভুলও হতে পারে...

—না, ভুল নয়! আশিস ওকে অবহেলাই করেছে, ঠাকুরপো! আমিও খুবই চিন্তিত আছি এই নিয়ে। মেয়েটা অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী। ব্যাগ ঝুলিয়ে বাজার করতে যাবার মেয়ে ও নয়। বন্ধুদের সঙ্গে পিক্‌নিক করতেও যাবে না! হয়তো আমার নির্বাচনের ভুল হয়ে গেছে।

—না।—দিব্যেন্দুবাবু বললেন,—এতো ভাল নির্বাচন হতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে, বৌঠান—ও বিজ্ঞান পড়েনি বলে আশিস হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তাই ও বিজ্ঞান পড়তে চায়...আশিস ওকে যথেষ্ট সঙ্গ দেয়নি—তাই ও বিজ্ঞান পড়তে চায়—

—এরকম হতে পারে, ঠাকুরপো! আপনার দাদা আমাকে বিজ্ঞান শেখাবার জন্য কত হাস্যকর ব্যাপার করতেন, আপনি তো জানেন।

—হ্যাঁ।—হাসলেন ডাঃ দিব্যেন্দু। বললেন,

—ওকে আমি বিজ্ঞানে ওস্তাদ করে দিচ্ছি, তবু কিন্তু আমি আশিসকে মাফ করতে পারছি না, বৌঠান! এরকম অসাধারণ স্বামীপরায়ণা মেয়ে আমি এ যুগে দেখিনি। আচ্ছা, আসি এবেলা—

ডাঃ দিব্যেন্দু গাড়িতে উঠে চলে গেলেন বাড়ী। কিন্তু বাড়ী গিয়েই তিনি আশিসকে পত্র লিখলেন তার মা-বৌ এবং ল্যাবরেটরীর শুভ খবর দিয়ে। ঐ সঙ্গে লিখলেন :

—আশাকে দেখে তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেছেন। এমন অপরূপ বধূ দুর্লভ। শিক্ষিতা বা সুরূপা অনেক মিলতে পারে, কিন্তু এমন 'ডিভোশান' কমই দেখা যায়। স্বামীর ব্যবহৃত জড় যন্ত্রগুলি পর্য্যন্ত তার কাছে—স্বামীর আদরের মূক সহচর! আশা যেন তাদের সঙ্গে আলাপ করে আস্বাদন করে বিরহ, অনুভব করে তাদের সুখ-দুঃখ...তিনি নিজের চোখে দেখেছেন আশাকে এই অবস্থায়।

অবশেষে তিনি লিখলেন, আশিস ফিরে এসে অন্য কিছুর গবেষণা করুক। দেরী যেন না-করে ফিরতে।

চিঠিখানা রওনা করে দিয়ে ডাঃ দিব্যেন্দু যেন কিঞ্চিৎ বোধ করলেন। কারণ তাঁর নিশ্চিত ধারণা আশার অন্তর-গভীর ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। পিতার মতো তিনি আশার কল্যাণ কামনা করতে লাগলেন।

আসন্ন সন্ধ্যা। কুমকুম প্রদীপ জ্বালাবার ব্যবস্থা করছে তুলসীমূলে। নীতীশ নিশ্চুপ পড়ে আছে উঠানের একখানা তক্তাপোষে। আকাশ মেঘলা। রমানাথ গেছে বাইরে রুগী দেখতে। কখন ফিরবে ঠিক নেই। মুরগী-মসল্লাম রাঁধবার সব ব্যবস্থাই অবশ্য করে গেছে সে, কিন্তু রান্না করবে কে? নীতীশ ক্রমাগত ভাবছে—কত যে কি ভাববে, নীতীশই জানে। ততোধিক আশ্চর্য্য, রমানাথ যে-কাজের জন্য নীতীশকে ডেকে আনলো বাড়ীতে, সে কাজের কিছুই হয়নি। হবার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে শাঁখ বাজালো কুমকুম। নীতীশ ভাবছে বাংলার সংস্কৃতি আজও নারীর আঁচলে গ্রন্থিবদ্ধ। কুমকুমের মতো মেয়েও সন্ধ্যা জ্বালে, শাঁখ বাজায়, প্রমাণ করে তুলসীমূলে। কুমকুম এসে প্রণাম করল নীতীশকে।

—কল্যাণ হোক—বলল নীতীশ।

—আপনি দেশে গিয়ে কি করবেন, দাদা?—কুমকুম শুধোলো।

—হোমিওপ্যাথি।—খামোখা বলে ফেললো নীতীশ। কিন্তু বলেই ভাবলো, কথাটা নেহাৎ সে মন্দ বলেনি! পল্লীর নিভৃত কোণে কিছুদিন নীতীশ কাটাবে—কাটতে বাধ্য সে। সে সময় হোমিওপ্যাথি করলে মন্দ কি? কিছু রোজগার তো ওকে করতে হবে। পাড়াগাঁয়ে ভাল টিউশ্যনি মেলে না।

—রমানাথের কি রকম রোজগার হয়, কুমকুম?—নীতীশ শুধোলো।

—তা, ভালোই।—বলে কুমকুম একটা বাঁশের মোড়ায় বসে বলল,—ভিজিট নেন এক টাকা। দাগ-পিছু ওষুধের দাম চার আনা। এক দাগ কি দু 'দাগ সত্যিকার ওষুধ—মানে দু'ফোঁটা, বাকী আট-দশ ভাগ জল,...বিশুদ্ধ জল।

হাসলো কুমকুম। বলল হেসেই,—আর ঐ-যে সাদা গুড়ো সুগার-অব মিল্ক ওটাও খুব চলে। পুরিয়া বেঁধে দেন। আর টনিক। নিম-বাসক-কষ্টিকারির সঙ্গে কুইনাইন মিশিয়ে কী যে এক বস্তু করেন দাদা, আপনার মুরগী মসল্লাম হার মানবে। ওটা রাঁধবেন কখন?

—তুমিই করো রান্না। আমার কাজে গা উঠছে না।—বলল নীতীশ।

—ওমা! সে কি?। সব ঠিক করা রয়েছে। রমাবাবু এসেই খেতে চাইবেন।

—আচ্ছা চলো তাহলে, কিছু রান্না করি—নীতীশ উৎসাহের সঙ্গেই উঠলো, কিন্তু রান্নাঘরে এসেই ওর সব উৎসাহ নিবে আসছে। কারণ কুমকুম খুব কাছাকাছি রয়েছে ওর। অল্পক্ষণ পূর্বে কুমকুমের প্রণাম-করা দেখে আশার কথাটাই মনে পড়েছিল ; কে জানে কোথায় যেন কি সাদৃশ্য রয়েছে! নীতীশ ভাবতে লাগলো...তেমনি সন্ধ্যা, তেমনি প্রসাধন-স্নিগ্ধা নারী, তেমনি নির্জন ঘর—গতকাল এমনি সন্ধ্যায় যা ঘটে গেছে তার জীবনে, আজও যেন তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

—আপনি কি যেন ভাবছেন, দাদা! নিশ্চয় সেই আপনার বান্ধবীর কথা।

—হাঁ, তার কথাই ভাবছি সারাক্ষণ!—বলল নীতীশ, এবং আরো বলল,

—তোমার সঙ্গে তার যেন খুব সামঞ্জস্য রয়েছে!

—তাহলে আমার কথাই ভাবুন, তার কথা কেন ভাবছেন আর?

—কিন্তু তুমি তো পর হয়ে গেছে!

—ওমা! কেন? রমাবাবুর কথা বলছেন? না, কিছু না। আছি তো আছি—যেদিন খুসি চলে যাব। ওর সঙ্গে তো আমার গাঁটছড়া বাঁধা নেই...

পরিষ্কার কণ্ঠে জানিয়ে দিল কুমকুম যে, সে 'কে'—এবং কী ধরনের নারী।

নীতীশ কিন্তু চুপ করে রইল। কুমকুমের কথা ওকে যেন পীড়িত করছে। কুমকুম বুঝতে পেরে বলল,—আমি কথার কথা বলছি নীতীশদা! আপনি সত্যি ভাবলেন? ছিঃ। রমাবাবু আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। তাঁর ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারবো না। এই যে মশলা-বাটা—

—হুঁ...

নীতীশ নিঃশব্দে নিল মসলা বাটা। কিন্তু কুমকুমের কথাগুলোর কোনটা সত্যি? আগেরটা না পরেরটা? নীতীশ ভাবছে...কুমকুম বলল,

—আপনার সেই বান্ধবীকে বিয়ে করে ফেললেই তো পারেন, নীতীশদা!

—না, বিয়ে তাকে করা যায় না। বিয়ের শেকলে প্রেম থাকে না, কুমকুম।

—কিন্তু শান্তি থাকে। সম্পর্ক থাকে একটা মানুষের সঙ্গে—মাটির সঙ্গেও। মেয়েদের পক্ষে বিয়ে-না-করে কারও সঙ্গে ঘর-করার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। যে কোনো মুহূর্তে সেই পুরুষটি পর হয়ে যেতে পারে। যে-কোনো দিন মেয়েটির পায়ের তলায় মাটি সরে যেতে পারে...

কুমকুমের কথাগুলো অকথ্য বেদনায় উত্তেজিত—নীতীশ শুধুলো,

—তুমি এরকম করে ভাবো, কুমকুম?

—হ্যাঁ, দাদা ভাবি।

—তুমি কতটা লেখাপড়া শিখেছ, কুমকুম?

—শিখেছিলাম! খারাপ ঘরে জন্মালেও আমার মা আমাকে লেখাপড়া নাচ-গান-বাজনা শিখিয়েছিল। এখানকার মেয়ে স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছি। মা এখানকার নামকরা বাঈজী ছিল ; কিন্তু ও-জীবন আমার ভাল লাগেনি, দাদা! কিছুদিন আগে যখন 'ওদের' উচ্ছেদ করবার কথা উঠলো—তখনি মা গেল মারা। আমি যে কী করবো, ভেবে পাই নি। সেই সময় হোল আমার অসুখ। তারপর...

—রমানাথ তোমাকে আরোগ্য করে এখানে আনলো?

—না! আলাপ হয়েছিল ওঁর সঙ্গে তখনই। তবে আমি এখানে তখন আসিনি। কলকাতা চলে গিয়েছিলাম, থিয়েটার বা সিনেমায় অভিনয়ের জন্য। ওখানে কিন্তু আমার সুবিধা হোল না, দাদা! অভিনয় ভালোই করেছিলাম, নামও হচ্ছিল—হঠাৎ একটা লোক, শ্যামল তার নাম, আমাকে এমন প্রলোভন দেখালো তার নতুন সিনেমা কোম্পানীতে নায়িকা সাজাবার জন্য যে, থিয়েটার ছেড়ে চলে এলাম তার সঙ্গে বেলেঘাটার ফ্ল্যাটে। সেখানে সেই শ্যামলবাবু পুরো তিনটি বছর আমাকে আট্‌কে রাখলো। সিনেমার কথা বললেই বলতো'—অত তাড়াতাড়ি ওসব কাজ হয় না।' শেষে আমি একদিন সকালে বেরিয়ে 'বাস' ধরে সটান হাওড়ায় এসে টিকিট কিনে চলে এলাম বর্দ্ধমান। তারপর এসে রমাবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম।

—সেই থেকেই আছ এখানে?

—হ্যাঁ...ওটা নেড়ে দিন, দাদা, ধরে যাবে—কুমকুম রান্নাটা দেখালো।

নীতীশ ওরই হাতে খোন্তাটা দিয়ে বলল,—তুমিই নাড়ো।

কুমকুমের জীবনের বিপর্য্যয়কর কাহিনীটাই ভাবছিল নীতীশ। বলল,

—শ্যামলের কাছে টাকাকড়ি কিছু পেয়েছিলে, কুমকুম?

হ্যাঁ, খুব বেশী না। হাজারখানেক ঐ তিন বছরে। আর গহনাও হাজার-তিন-টাকার। কিন্তু সে টাকা আমার হাতে নেই, দাদা! রমাবাবু তাঁর ডিসপেনসারী করতে খরচ করেছেন।

—তুমি দিলে কেন?

—আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন উনি, দাদা—নইলে আমি কোথায় যেতাম। নীতীশ বুঝলো কুমকুম খুব ভাল মেয়ে ; উদারতা তার যে-কোনো ভদ্রঘরের মেয়ের থেকে কম নয়।

নীতীশ অকস্মাৎ প্রশ্ন করলো,

—আচ্ছা, কুমকুম, তুমি অনেক ঘুরেছ! এপর্যন্ত কাউকে ভালবেসেছো তুমি?

—পৃথিতে যাকে 'ভালবাসা' বলে ; আমাদের তো হয় না, দাদা!

—কেন কুমকুম! তোমারও নারী-অন্তর, তোমারও মানুষের মন...

হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের ওসব হোতে নেই, দাদা! হলেও, মুখে স্বীকার করতে নেই।

—কেন?

—কারণ...খোন্তা নাড়তে নাড়তে হাসছিল কুমকুম। মৃদুমধুর—বলল,—ভাল যাকে বাসবো, সে যদি ঘৃণা করে তো বড়ই অসহ্য লাগে,—দাদা। আর, যে কোনো পুরুষ ঘৃণা

আমাদের করবেই—এটা পুরুষের স্বভাব। আমরা বিলাসের-ব্যসনের বস্তু—বধূর মর্য্যাদা তো পেতে পারি নে...

ওর কথার সুরে কেমন একটা মিশ্রিত অভিমান। কিন্তু কার উপর?—ভাবছিল নীতীশ। হয়তো রমানাথের উপরই আবার প্রশ্ন করলো সে.

—তুমি নিশ্চয় কাউকে ভালবেসেছ, কুমকুম—হয়তো রমানাথকেই...

—ভালবাসা অত্যন্ত গোপন ধন, দাদা—ওকথা কাউকে বলতে নেই।—হেসে বলল কুমকুম—এমন কি, যাকে, ভালবাসি, তাকেও না! বললেই ও মর্যাদা-হানি হয়...হ্যাংলা হয়ে যায় প্রেমটি। তাকে তখন আর প্রেম বলা চলে না।

—তুমি তো চমৎকার করে কথা বলতে পার, কুমকুম?

—শিখেছি! ওরকম না-বলতে পারলে চলবে কেন? ব্যবসায়ী মানুষ! কুমকুম যেন অতি অনায়াসে নিজেকে দেহ-ব্যবসায়িনী বলে পরিচয় দিল। কিন্তু কেন? নারীরা সাধারণত এসব কথা গোপন করে রাখতে চায়। কুমকুম যেন অন্য ধাতুতে-গড়া...অথবা আর কোনো কারণ আছে!

রান্নাটা আগুনে ফুটছে। কুমকুম মুখের ঘাম মুছে বলল,

—আপনি ঐ বান্ধবীর প্রেমে পড়ে গেছেন, না দাদা?

—না...কেন? বান্ধবী—বান্ধবী-ই!—নীতীশ তাড়াতাড়ি জবাব দিল।

—হ্যাঁ। কিন্তু প্রেমে-পড়া তো একটা রোগ-বিশেষ! রমাবাবু বললেন,—হোমিওপ্যাথিতে নাকি প্রেমে-পড়া-রোগীকে ভাল করবার ওষুধ আছে!—হাসলো কুমকুম! প্রেমে-পড়ার ওষুধ আছে!—হাসলো কুমকুম! প্রেমে-পড়ার ওষুধ থাকে নাকি?

—আছে, দাদা—হোমিওপ্যাথিতে প্রেমে-পড়া, ভূতে-পাওয়া, ডাইনী-লাগার ঔষধ আছে।

হাসছে কুমকুম ; নীতীশ বলল,—হোমিওপ্যাথি তুমি পছন্দ কর না?

—কেন! খুব পছন্দ করি। অতি অল্প পয়সায়, আর খেতে কোনো কষ্ট নেই তাছাড়া.. কুমকুম আবার হেসে বলল,—তাছাড়া, অত লাভ আর কোনো ব্যবসায় নেই। ওষুধ আর জল...মানে জল-ই ওষুধ!

—না কুমকুম, হোমিওপ্যাথি অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতি। ওর আবিষ্কর্তা মহাত্মা হ্যানিম্যান দধীচির মতো ঋষি ; নিজেকে নিঃশেষ করে হোমিও বিজ্ঞান তিনি পৃথিবীর রোগক্লিষ্ট মানুষকে দান করেছেন। আমি সত্যি হোমিওপ্যাথি আরম্ভ করবো—নীতীশ বললো।

—করবেন! প্রেমে যদি পড়ি কখনো তো, যাব আপনার ডাক্তারখানায়...হেসেই বলল কুমকুম। কিন্তু নীতীশ ওর কথাটা ধরে বলল,

—তুমি আগে বলেছ প্রেমে-পড়া গোপন ব্যাপার। আমার কাছে সেটা বলবে কি করে?

—ডাক্তারকে সব বলতে হয়, নইলে ওষুধ দেবেন কেমন করে? আর আপনি তো শুধু ডাক্তার নন— প্রেমে-পড়া ডাক্তার। তুমি আমাকে একেবারে রসাতলে পাঠালে, কুমকুম! কখন কার প্রেমে পড়লাম আমি?

—পড়েছেন!—হাসতে লাগলো কুমকুম। ওর তরল হাসি কিন্তু গরল ছড়াচ্ছে নীতীশের মনে। সত্যি কি সে প্রেমেই পড়ে গেছে আশার!

কুমকুমের হাতটা ধরে ধমক দিল নীতীশ। বলল,

—হেসো না। কিসে বুঝলে যে আমি প্রেমে পড়েছি?

নীতীশের মুখের পানে তাকিয়ে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল কুমকুম। তাকিয়ে রইল ওর চোখের পানে। তারপর আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল,

—প্রেমে পড়া কিছু অপরাধ নয়, দাদা—ওটা মানুষের হৃদয়ের একটা বৃত্তি—

—হোল, মানলাম 'বৃত্তি'! কিন্তু আমি কোথায় কার প্রেমে পড়লাম? তোমার?

—বেশ তো, পড়ুন না!—যেন আত্মরক্ষার জন্যই বলে উঠলে কুমকুম।

—কিন্তু রমানাথ...

—তিনি তো প্রেমে পড়েননি। প্রয়োজনে পড়ে আমাকে রেখেছেন আমিও রয়েছি।

নীতীশ আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল হাতখানা।

—প্রয়োজনে-পড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হয় না, কুমকুম?

—প্রয়োজনটা বাইরের বাস্তব ব্যাপার। তাকে অস্বীকার করা যায় না, দাদা? প্রেম অন্তরের উপলব্ধ সম্পদ, তাকে রূঢ় বাস্তবে আনতে নেই।—বলে কুমকুম চলে গেল ও-ঘরে। নীতীশ একা বসে কত-কি ভাবতে লাগলো।

অনেকক্ষণ আর এলো না কুমকুম। নীতীশ অবশেষে ডাক দিল,

—কুম্‌কুম...

সাড়া নেই। হোল কি ওর! নীতীশ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখলো বালিসে মাথা রেখে কুমকুম শুয়ে রয়েছে। কান্নায় তার সারা দেহ দুলে-দুলে উঠছে বারম্বার। অবাক নীতীশ এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে বলল,—কি হোল, কুমকুম? কেন কাঁদছো?

কুমকুম সাড়া দিল না। নীতীশ বিহ্বল হয়ে একটুক্ষণ থেমে রইল। তারপর সবলে ওকে তুলে ধরে নিজের কোলে ওর মাথাটা নিয়ে বলল,

—কী তোমার ব্যথা, বলো আমাকে! এখানে থাকতে তোমার ইচ্ছে নেই? কিম্বা...

—আপনি কেন এলেন!—কুমকুম বলল খানিকটা উত্তেজিত অভিমানে,—আমি বেশ ছিলাম! আমি প্রেমহীন জীবন যাপন করি, এই সত্য আপনি কেন জেনে নিলেন আমার মুখ থেকে! আপনি কি আমাকে 'প্রেম' দিতে পারবেন? না, পারবেন না! আপনার মন ঐ ধান্ধবী'তে বাঁধা আছে। আমি পথের এঁটো ঠোঙা,—আমাকে কুকুরে চাটবে! তারপর আমি গলে যাব ময়লা জলের নর্দমায়। আমাকে কেন 'সোনার প্রেম' শোনাতে আসেন আপনি!...

কুমকুমের চোখের জল শুকিয়ে গেছে!—জ্বলছে যেন চোখ দুটো। ওর উত্তেজিত আঁখিপল্লব অপরূপ দেখাচ্ছে! ওর অভিমান-স্ফুরিতাধর ঠিক আশার মতই চুম্বকমদির! নীতীশ অজ্ঞানের মতো আকর্ষিত হচ্ছে যেন। আগুনে পতঙ্গ-পড়ার-মতই প্রলুব্ধ সে...কিন্তু...

—'কুমকুম!'—বাইরে ডাকছে রমানাথ।

নীতীশ-ই গিয়ে দরজার খিল খুলে দিল। ফিরে এসে দেখলো, কুমকুম নিঃশব্দে নিজের কাজ করছে রান্নাঘরে।

নীতীশ বারান্দার বেঞ্চে বসে পড়ল। রমানাথ শুধলো,

—আপনার মুরগী-মসল্লাম রান্না হয়ে গেছে তো?

—হ্যাঁ।—বলল নীতীশ। তারপর বলল,

—আমার ইচ্ছে, তাপসীপুরে গিয়ে হোমিওপ্যাথি করি। আপনি যদি আমার জন্য কলকাতা থেকে কিছু ওষুধ আর দু'একখানা বই এনে দেন তো ভাল হয়। আমি আর যেতে চাই নে, কারণ আমি তো,বিশেষ কিছু জানিনা ও বিষয়ে। কত টাকা হলে হবে বলুন তো।

—শ'-খানেক।—বলে রমানাথবাবু একটা ফর্দ করতে লাগলেন মহা উৎসাহের সঙ্গে।

খাওয়ার সময় ঠিক হোল, সকালের ট্রেন ধরে রমানাথ কলকাতা গিয়ে বেলা একটায় ফিরে আসবে ওষুধ নিয়ে। কুমকুম সব শুনেছিল। নীতীশের শোবার ব্যবস্থা করে একটি ছোট্ট কথা বলল,

—আমি বধূ নই, বান্ধবী নই—আমি বাঁর বধূ...

—তোমাকে 'শুধু বধূর' সম্মান দিতে চাই আমি!

—তা হয় না নীতীশদা! আপনি পারবেন না।—চলে গেল কুমকুম। কিন্তু নীতীশ দেখতে পেল ওর চোখের কানায় কানায় জল।

রবিবার। তাই ডাঃ দিব্যেন্দুর ছুটি। তিনি সকালেই বেরুলেন আশাকে পড়াবার জন্য। কিন্তু পথে তাঁর মনে হোল, নীতীশের একবার খবর করা দরকার। সে চোর...কিন্তু নাও তো হতে পারে! নীতীশের প্রতি আবিচার করা হচ্ছে না তো! ড্রাইভারকে তিনি ঢাকুরিয়া যেতে বললেন।

মোড়ের মাথায় দোকানীদের জিজ্ঞাসা করতেই সে দেখিয়ে দিল কোন্ বাড়ীতে নীতীশ থাকে। ডাঃ দিব্যেন্দু গাড়ী থেকে নেমে গলির মধ্যে ঢুকে দেখলেন তালা ঝুলছে। পালিয়েছে নীতীশ! আর কোনো সন্দেহ নেই তার 'চুরি' সম্বন্ধে। তবু তিনি পাশের বাড়ীতে খবর করলেন,

—নীতীশ কবে গেছে এখান থেকে?

পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকই বাড়ীওয়ালা। তিনি বললেন,

—নীতীশ প্রায়ই বাইরে থাকে, কেউ তার খোঁজ করে না। তবে গতকাল অথবা পরশু, ঠিক মনে নেই—সে বাড়ী ফেরেনি।

—তালাটা কি খোলা যেতে পারে? শুধোলেন দিব্যেন্দুবাবু।

—আজ্ঞে, তা কি করে হবে! তাহলে পুলিস ডাকতে হয়।

—থাক্—বলে দিব্যেন্দুবাবু চলে এলেন। কিন্তু তার মনে আর কোনো সন্দেহই রইল না নীতীশের চুরি সম্বন্ধে। খুবই দুঃখিত হলেন তিনি। কিন্তু কি করা যায়।

আশিসের বাড়ীতে গাড়ী ঢুকতেই আশা এসে প্রণাম করলো। যেন সে অপেক্ষাই করছিল ওঁর জন্য। দিব্যেন্দুবাবু বললেন,

—চলো মা, ল্যাবরেটরীতেই পড়াবো তোমাকে।

—চলুন!—আশা এগোলো।

দিব্যেন্দুবাবু মার সাথে একটু কথা কয়ে যেতে চান।

—নীতীশ পালিয়েছে, বৌঠান! ওর ঘর দেখে এলাম আমি।

...হতভাগ্য হয়তো দেশত্যাগ করে যাবে, ঠাকুরপো! সে যদি আমার কাছে চাইতো 'থিসিস্টা' তো, আশিসকে বলে তাকে দিতাম আমি...

—আশিস নিজেই ওকে দিতে পারতো, বৌঠান...কি যে ভুল করলো নীতীশ!

মা চুপ করেই আছেন। কিন্তু দিব্যেন্দুবাবু বললেন,

—চোরকে ক্ষমা করা যায় না, বৌঠান! ওর আর মুখ দেখতে চাই নে!

—হ্যাঁ ঠাকুরপো! কিন্তু আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।

—কি কথা, বৌঠান?

—নীতীশ যদি ওটা নিজে না-নিয়ে কাউকে বিক্রি করে দেয়! অভাবী ছেলে! আর, নিজের নামে বের করবার সাহস নাও থাকতে পারে তো?

—তার জন্য কি করা যেতে পারে, বৌঠান!—দিব্যেন্দুবাবুর কণ্ঠ কঠিন শোনাচ্ছে!

—কোনো রকমে তাকে জানানো যায় না, ঠাকুরপো, যে—সে ওটা নিজেই নিক্। তার ভয়ের কোনো কারণ নেই। সে বড় হোক...সে নামী হোক—

—বৌঠান!—দিব্যেন্দুবাবু রুমাল বের করে চোখ মুছতে-মুছতে বললেন,—মাতৃ-অন্তর যে কত মহৎ তা আজ ভাল করে জানলাম...

—নীতীশকে আমি ছেলেরই মতো দেখি ঠাকুরপো! অপরাধী ছেলেকে মা ত্যাগ করে না!

—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে খবর হয়তো তাকে দেওয়া যেতে পারে, বৌঠান। কিন্তু...কিন্তু আমি 'মা' নই, আমি কঠিন বেত্রধারী মাষ্টার! যে-ছেলে এই মার বুকে এমন আঘাত করতে পারে তাকে আমি মাফ করি না...করতে পারি না...

—চলে যাচ্ছেন দিব্যেন্দুবাবু—, মা তাড়াতাড়ি বললেন,

—আমার বুকের ব্যথা আমি সয়ে যাব, ঠাকুরপো! আপনি খবর দিন। আপনি তাকে জানান, সে যেন ভয় না-করে। ওটা বিক্রী না-করে নিজেই যেন কাজে লাগায়—

—আমি ভেবে দেখবো, বৌঠান—বলেই চলে এলেন দিব্যেন্দুবাবু।

কিন্তু ভেবে তিনি কি দেখবেন আর? নীতীশকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না। আজন্মা কৌমার্য্য-ব্রতধারী কঠোর বিজ্ঞানসাধক তিনি; আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্য। তাঁর হাতে শিক্ষালাভ করে যে নীতীশ এতবড় অপরাধ...শুধু চুরি নয়, ঐ মায়ের অন্তরে আঘাত করতে দ্বিধা করলো না, তাকে ক্ষমা করা দিব্যেন্দুবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এতক্ষণে দিব্যেন্দুবাবুর মনে আর একটা চিন্তার জট-ও খুলে গেল। আশিস সেদিন ফোনে বলেছিল—'পারিবারিক ব্যাপার জড়িয়ে আছে এই চুরিতে'...তখন কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি দিব্যেন্দুবাবু। এতক্ষণে বুঝলেন বৌঠানই চান না যে নীতীশ জেলে থাক্। বেশ! কিন্তু তাকে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাতে হবে যে, 'তাকে ক্ষমা করা হোল!' না, এতবড় নৈতিক অপরাধ করতে পারবেন না দিব্যেন্দুবাবু।

আশা ল্যাবরেটরীতে দাঁড়িয়ে দেখছিল যন্ত্রগুলি—দিব্যেন্দুবাবু এসে ঢুকলেন। আশা এগিয়ে এসে বলল,

—কোথায় বসবেন, কাকাবাবু? ঐ বড় টেবিলটায়?

—না, মা, আগে তোমাকে যন্ত্রগুলোর কাজ কিছু বোঝাই। দেখ, কালিচরণ 'সুইচ-অন' করো তো।

অত্যন্ত ব্যস্তভাবে একটা জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ওকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন দিব্যেন্দুবাবু—

'—শোন—ল অব ট্রান্সফরমেশন অব্ মাস ইনটু এনার্জি...'

বেশ খানিকটা বলার পর অকস্মাৎ দিব্যেন্দুবাবু দেখতে পেলেন আশা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। নিজের ভুল বুঝে তিনি চাদরখানায় মুখ-ঘাড় মুছতে-মুছতে বললেন,

—আমার ভুল হয়েছে মা! তোমাকে গোড়া থেকে শেখাতে হবে। এসো, কতকগুলো সূত্র আজ বোঝাই তোমাকে...

—আমার মনে হচ্ছে, কাকাবাবু, আপনার মন যেন খুব চঞ্চল। কি হয়েছে, কাকাবাবু? শরীর ভাল আছে তো!

—হ্যাঁ মা, শরীর ভাল...ঐ বৌঠান মনটা খারাপ করে দিলেন। আমি তোমায় আজ কি পড়াব, ভাবি একটু। ততক্ষণ তুমি আমার জন্য একবাটি চা করে আনো।—চেয়ারে বসে পড়লেন ডাঃ দিব্যেন্দু।

আশা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল চা আনতে। দিব্যেন্দুবাবু ল্যাবরেটরীর চারদিকে চাইতে-চাইতে ভাবতে লাগলেন—চোরকে তার মা ক্ষমা করতে পারে, মাসি ক্ষমা করতে পারে—মাষ্টার পারে না। শিক্ষাগুরুর কর্তব্যের এমন অমর্য্যাদা করবেন না তিনি।

কিন্তু কি তিনি করতে পারেন। বৌঠান তো অপর কাউকে দিয়ে বিজ্ঞাপন লিখিয়ে কাগজে ছাপতে পারেন! না, তা ডাঃ দিব্যেন্দু হতে দেবেন না। তাড়াতাড়ি প্যাড বের করে তিনি বিজ্ঞাপন লিখলেন :

"ব্যক্তিগত : নীতীশ, তোমার কদর্য্য অপরাধ নিশ্চয়ই দণ্ডনীয়। অবিলম্বে এসে আত্মসমর্পণ কর—অন্যথায় গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। যদি না আস তো যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হবে।

—দিব্যেন্দু।"

তিনখানা কপি করে তিনটে কাগজে পাঠাবেন—কিন্তু আশা চা নিয়ে এল। তাড়াতাড়ি বিজ্ঞাপন-লেখাটা ড্রয়ারে ভরলেন তিনি। আশাকে বললেন,

—কয়েকটা ছোট যন্ত্রপাতি আনতে হবে, মা! ওবেলা আমি কিনে আনবো। এবেলা শুধু তোমাকে বুঝিয়ে দিই, বর্তমান বিজ্ঞান মানুষকে কোথায় এনেছে।...

আশা নিঃশব্দে বসে শুনতে লাগলো ওঁর বক্তৃতা। সহজ সুন্দর করে বললেন উনি বেশ কিছুক্ষণ। আশার খুবই ভালো লাগছে। ওর পাঠ-পিপাসু অন্তরে যেন ক্ষুধা জাগছে আরও। কিন্তু দিব্যেন্দুবাবু খানিকক্ষণ বলেই বললেন,

—এবেলা আর থাক্, মা তুমি ভেতরে যাও! আমার কিছু কাজ আছে এখানে।

আশা চলে গেল। দিব্যেন্দুবাবু ড্রয়ার টেনে বের করলেন বিজ্ঞাপনটি। সবুর সইছে না ওঁর। তাড়াতাড়ি নিজেই তিনটি 'কপি' করে সম্পাদককে চিঠি লিখে খামে মুড়লেন। তারপর কালিচরণের হাতে দিয়ে তিনটি বিখ্যাত দৈনিক কাগজে পাঠিয়ে দিলেন পর পর তিনদিন ছাপবার জন্য।

অতঃপর উঠলেন তিনি। ভেতর দিকেই গাড়ীখানা রয়েছে। তাই অন্দরে এসে, গাড়ীতে উঠবার আগে বৌঠানকে বললেন,

—বিজ্ঞাপন আমি লিখে পাঠলাম, বৌঠান। যদি সে আসে তো আমার সঙ্গে আগে তার দেখা করবার ব্যবস্থা করবেন।

—আচ্ছা, ঠাকুরপো! তাই হবে। কিন্তু নীতীশ তো এমন ছেলে ছিল না, ঠাকুরপো!

—ছিল না তো, হোল কি করে, বৌঠান! যে হতভাগাকে পুত্র-স্নেহে মানুষ করেছি, যার প্রতিভা দেখে গর্ব বোধ করতাম—সে কি-না...বৌঠান, আপনি তাকে ক্ষমা করলেন, আমি পারছি না! আমার মনে হচ্ছে...কি যে মনে হচ্ছে, বৌঠান, বলতে পারবো না!

চলে গেলেন দিব্যেন্দুবাবু। মা নিশ্চুপ খানিক দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ভেতরে গেলেন।

সাররাত ঘুম-জাগরণের ছায়াবাজি চলছে নীতীশের চোখে। কখন ঘুমিয়েছে মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ছে একখানা অভিমান স্ফুরিত কণ্ঠ। দুটি অশ্রুদীপ্ত আঁখিপল্লব। কিন্তু কার! কুমকুমের? না আশার? নাকি দুজনেরই? কার মুখখানা সারারাত দেখেছে নীতীশ?—কিছুতেই ও ঠিক করতে পারছে না, কার সে মুখ! নাকি দুটো মুখই এরকম? না তো! কিন্তু শোবার সময় নীতীশ কুমকুমকেই দেখেছে—হ্যাঁ, তাহলে কুমকুমকেই দেখেছে সারারাত স্বপ্নে।

দেখেছে আশাকেও। দেখেছে ল্যাবরেটরীর সিঁড়ি থেকে হাত বাড়িয়ে থিসিস্‌খানা নিল সে আশার হাত থেকে। তাহলে আশাই ছিল ওর স্বপ্নে সারারাত! কুমকুম নয়। না, কুমকুমকে কেন দেখবে সে?...উঠছে নীতীশ। মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে ওর। অকারণ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। স্বপ্ন তো বাস্তব নয়! স্বপ্নে-দেখার মূল্য কি? কিন্তু মূল্য আছে। নীতীশের মনে পাপ-প্রবণতার প্রকাশ ঐ স্বপ্ন। কথাটা মনে উদয় হতেই নীতীশ আবার বালিশে মাথা রাখলো।

এর থেকে কুমকুমকে স্বপ্নে-দেখা ভাল ছিল। কুমকুম বারনারী তাকে স্বপ্ন দেখার অধিকার সকলের আছে, এমনকি তার সঙ্গে প্রেম করলেও নিজেকে অপরাধী ভাববার খুব বেশী কারণ নেই। কিন্তু নীতীশ তো কুমকুমকে দেখেনি স্বপ্নে! দেখেছে আশাকে—এক সাধ্বী সতীর জ্বলন্ত মূর্তিকে—যে নীতীশের মতো দুরাত্মাকে 'নিজের স্বামী' বলে ভুল করেছে। নীতীশ তার স্বামিত্ব গ্রহণ করেছে, তাকে ছুঁয়েছে, তাকে ধরে...না, নীতীশ এসব কিছু করেনি...না, কিছু না!

—উঠুন! চা খান—কুমকুম-ই ডাক দিচ্ছে। আশা নয়, কুমকুম!

চমকে উঠলো নীতীশ। আকস্মিক আহ্বানটাও যেন আশার-ই নাঃ, নীতীশ তার ভুল সংশোধন করবে কুমকুমকে দিয়ে। কুমকুমের ওপর তার মোহটাকে বাড়িয়ে দিয়ে নীতীশ ভুলে যাবে আশার কথা। এ না-হলে নীতীশের অবস্থা ক্রমশ অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যেন।

ত্বরিত মনে কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে নীতীশ উঠে বসল। বলল,

—রমানাথ উঠেছে নাকি? কোথায় সে?

—তৈরী হয়ে রয়েছে। আপনার ওষুধ কিনতে যাবে। টাকা দিন-গে—

—ও, তাইতো!—নীতীশ তাড়াতাড়ি এসে সুটকেশ খুলে টাকার ব্যাগটা বার করলো, তারপর বাইরে এসে দশখানা দশটাকার নোট দিল রমানাথের হাতে। রমানাথ আর একবার গুণে নিয়ে বলল,

—আমি একটার ট্রেনেই ফিরতে চেষ্টা করবো, যদি না পারি তো, চারটের ট্রেনে—

চলে গেল রমানাথ ট্রেন ধরতে। নীতীশও হাতমুখ ধুলো—চা খাবে। কুমকুম হাসছে। বেশ-মৃদুমধুর হাসছে। নীতীশ শুধালো,

—হাসছো কেন কুমকুম? কি হোল?

—আমি ভেবেছিলাম আপনার হোমিওপ্যাথি-করা কথার-কথা। কিন্তু দেখছি সত্যিই আপনি ঐ কাজ করবেন! আশ্চর্য্য লাগছে—

—কেন, আশ্চর্য্য কেন?—নীতীশ তাকালো কুমকুমের পানে।

—মানে—হাসিমুখেই বলছে কুমকুম,—রমাবাবুর কাছে শুনলাম আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা ছাত্র। আপনি নাকি পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণ করেছেন।—চা খান। একটু হালুয়াও করেছি—দিলো কুমকুম।

—হাঁা, কিন্তু তাতে কি!

—আপনি পড়াগাঁয়ে গিয়ে হোমিওপ্যাথি করবেন, যার দৈনিক আয় বড় জোর এক থেকে দু'টাকা—তাও যদি চলে। আশ্চর্য্য নয়! এতে আমার কি মনে হচ্ছে জানেন?

—কি মনে হচ্ছে, কুমকুম?—নীতীশ প্রশ্ন করলো।

—আপনি জোর কোন আঘাত পেয়েছেন মনে। হয়তো প্রেমে বঞ্চিত হয়েছেন ; হয়তো সেই বান্ধবী আপনাকে...আমার অনুমান ঠিক কিনা বলুন?

—তুমি কথাটা শেষ কর, কুমকুম।—নীতীশ চা খেতে খেতে বলল।

—ওর আবার শেষ কি! আপনি তাকে পেলেন না, তাই এই বৈরাগ্য।

—তোমার অনুমান ঠিক নয়, কুমকুম! আমি তাকে বিয়ে করতে চাই না—আমি তাকে সুখী করবার যোগ্য নই, তাই তাকে যথাযোগ্য জায়গায় যাবার সুযোগ দিয়ে এলাম। 'আমাকে' ভুলে যাবার অবসর দিলাম!

—ওঃ! —কুমকুমের চোখ শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল।—আপনার প্রেমের মহিমাকে প্রণাম করি দাদা—সত্যি সে প্রণাম করলো নীতীশকে!—কিন্তু আপনি তো তাকে ভুলতে পারছেন না! আপনার গতি কী হবে!

—যা-হয় হবে!—বলে নীতীশ চা-খাওয়া শেষ করলো। কিন্তু কী নিদারুণ মিথ্যে কথা বলল নীতীশ। এই ঘটনার পর থেকে নীতীশ ক্রমাগত মিথ্যে কথা বলছে। অথচ এর পূর্বে মিথ্যে সে খুব বেশী বলতো না। নীতীশ ভাবতে লাগলো সিগারেট ধরিয়ে—এই মিথ্যে কথাটা বলে কুমকুমের শ্রদ্ধার আসন লাভ করলো—কুমকুমের হৃদয়-ভরা শ্রদ্ধাকে মিথ্যার মূল্যে ক্রয়-করা, এটা কি চুরির থেকেও গুরু অপরাধ—গুরুতর যেন!

—কিন্তু আপনি তাকে সুখী করতে পারেন না কেন, দাদা। কোথায় অযোগ্যতা আপনার।

—সে-কথা মুখে বলা যায় না, কুমকুম! প্রত্যেকের যোগ্যতা-অযোগ্যতা সে নিজে জানে।

নীতীশ কথাটা চাপা দিতে চায়, বুদ্ধিমতী কুমকুম বুঝলো। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল সে। নীতীশ উঠানের গামলাগুলো দেখছিল। বলল,

ওতে অ্যালকোহল মেশাবার কায়দাটা তো দেখানো হোল না রমানাথকে!

—থাক্, ওর জন্য ব্যস্ত কি? আপনাকে 'ওর' জন্যই তিনি ডাকেননি!

—তাহলে?—নীতীশ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো,—তাহলে কি জন্য ডাকলো?

—বেশী বুদ্ধিমানরা বেশী বোকা ব'নে যায়, দাদা, আপনি সেই বোকার দলে!—হাসলো কুমকুম!

—কেন কুমকুম?

—রমানাথবাবু গভীর জলের মাছ। বান্ধবীর ছবি-সমেত আপনাকে ট্রেনে দেখেই তিনি বুঝেছিলেন আপনি প্রেম-জীবনে আঘাত পেয়েছেন নিদারুণ, তাই সুযোগ গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন। সুযোগটা এই—হাসলো কুমকুম ক্লান্তহাসি—শ্যামলের কাছে আমি যে-অবস্থায় ছিলাম, রমাবাবুর কাছে তার থেকে ভাল থাকি না। বরং খারাপ। ওখানে কিছু টাকাকড়ি পেতাম, এখানে আমার যথাসর্বস্ব গেল। কিন্তু আমি এ-ক্ষতি স্বীকার করতে চেয়েছিলাম সমাজ-জীবনের মর্য্যাদা পাবার আশায়...বধূর সৌভাগ্য অর্জনের আকাঙ্খায়! কিন্তু...অল্প সময় থামলো কুমকুম—কিন্তু আমাদের 'জন্ম' আমাদের বঞ্চিত করেছে! 'কর্ম' আমাদের কারাবদ্ধ করেছে এক বিশেষ শ্রেণীতে। আর, 'ভাগ্য' আমাদের বিড়ম্বিত করেছে পুরুষের বিলাস-লালসার বহ্নিতে!

—ব্যাপারটা খুলে বলো, কুমকুম!

—আপনার অবস্থা অনুমান করে রমাবাবু আপনাকে এখানে ডেকে এনেই আমাকে আদেশ করেছেন, আপনার মাথাটি চিবিয়ে খেয়ে আমি আপনার ঘাড়ে চড়ে চলে যাই—কারণ, রমাবাবু আমাকে আর সইতে পাবছেন না।

—কারণ কি?

—কারণ আমি তার বধূ হতে এসেছিলাম। বিলাস-সঙ্গিনী হতে চাইনি। এবং তিনিও আশ্বাস দিয়েছিলেন আমার যথাসর্বস্ব অপহরণের সময়। এখন তিনি চান যে, আমি চলে যাই। তাই আপনাকে আশ্রয় করতে বলছেন। কিন্তু, দাদা...কুমকুম করুণ হাসলো। কান্নার মতো করুণ! বলল,

—আপনি ঐ বান্ধবীর প্রেমে ভরপুর আছেন! আপনার সর্বনাশ কেন করবো আমি? আর, করে আমার কী লাভ হবে? আপনার প্রেম তো আমি পাব না!

নীতীশ নিঃশব্দে বসে রয়েছে। কুমকুম একটু থেমে বলল,

—আপনি আজই চলে যান, দাদা—নইলে আপনি বিপদে পড়বেন...

—কী বিপদ, কুমকুম!—বিস্মিত নীতীশ প্রশ্ন করলো।

—রমাবাবু যদি আর ফিরে না আসেন তো, কি করবেন আপনি। অথবা যদি ফিরেই আপনার নামে আমাকে জড়িয়ে কোনো কলঙ্ক দেন তো, কি করবেন? যদি আপনাকে আমার সন্তানের পিতা বলে প্রচার করেন তো, কি করতে পারেন আপনি?

ভয়ে নীতীশের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠলো। এসব কি বলে কুমকুম! কিন্তু সে ধৈর্য্য ধরে সব কথা, সব পরামর্শ শুনে নিতে চায়। তাই প্রশ্ন করলো,

—এরকম মতলব তার আছে নাকি, কুমকুম? তুমি জানো?

—আমাকে বলবার মতো কাঁচা লোক তিনি নন, দাদা—আমি আন্দাজ করছি। ওর থেকে শ্যামল অনেক ভাল লোক ছিল। সে চরিত্রহীন, কিন্তু সমাজে সাধু সেজে, সমাজসেবক সেজে ভণ্ডামী করে না!

—রমানাথ ফিরবার পূর্বেই কি তুমি আমাকে চলে যেতো বলছো?

—না। তাতে আপনাকে 'চোর' অপবাদ দেওয়া বিচিত্র কিছু নয় তার পক্ষে। সে ফিরে এলে আমি জানাব যে, 'এতো তাড়াতাড়ি আপনাকে "ক্যাপচার" করা সম্ভব হোল না। দু'চারদিন পরেই আবার ফিরবেন, তখন আমি যা-করবার করবো।'—এই বলে ওকে

বুঝিয়ে দেব আমি। কিন্তু আপনি ওবেলা নিশ্চয় চলে যাবেন! কারণ রাত থাকলে কী যে হবে, আমি জানি না...

চলে গেল কুমকুম রান্নাঘরে। নীতীশ নিঃশব্দে বসে। কিন্তু কিছুই সে ভাবতে পারছে না। বুদ্ধিটা কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে ওর। ওর বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কে অপরাধ-বিজ্ঞানের যতটুকু ধরা আছে, তার কিছুই আজ কাজে লাগছে না। দীর্ঘক্ষণ নীতীশ চুপ করে বসে রইল। যখন উঠলো, তার সিগারেটের টিন খালি। নিঃশব্দে স্নান করে খেয়ে শুলো। এতক্ষণ প্রায় কোনো কথাই কয়নি সে কুমকুমের সঙ্গে। কুমকুমও। নীরবে দুটি প্রাণী যেন আপন-আপন চিন্তায় বিভোর।

কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর নীতীশের যেন কিছু চিন্তাশক্তি ফিরে এল।

—খাওয়া হোল, কুমু?— প্রশ্ন করলো সে ও-ঘরের কুমকুমকে।

—হ্যাঁ। ডাকছেন দাদা?—বলে কুমকুম এ-ঘরের দরজায় দাঁড়ালো এসে।

—রমানাথ ক'টায় ফিরবে?

—দেড়টায়। আর মিনিট কুড়ি পরেই। আপনার ভয় নেই, দাদা! আমি আপনাকে নিরাপদে বের করে দেব এখান থেকে।—কুমকুম এগিয়ে এল।

—কিন্তু কেন কুমকুম? কেন তুমি আমার জন্য এতটা করবে?

—আমার নিজের জন্যই করবো, দাদা!—মৃদু হাসলো কুমকুম। আপনাকে বিপন্ন করে লাভ তো কিছু নেই আমার, বরং লোকসান...আবার হাসলো কুমকুম। মৃত্যু-পাণ্ডুর হাসি!

কুমকুম চলে গেল। নীতীশও আর কিছু বলল না তাকে। কুমকুমের কথাগুলোই ভাবতে লাগলো। দরজা-খোলার শব্দে বুঝলো, কুমকুম সদর দরজাটা খুলছে! রমানাথ এলো হয়তো। কিন্তু রমানাথের বদলে কুমকুম ফিরে এল। বলল,

—আমি রমাবাবুকে বললাম 'আপনি ঘুমুচ্ছেন'। ঘুমিয়ে থাকুন।—চাপা গলায় বলেই চলে গেল সে।

নীতীশ চোখ বুজে পড়ে-পড়ে ভাবছে—একি বিপত্তি! একি দুর্ভাগ্য তার? অকারণ তাকে এক বারনারীর সাহায্য নিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে! ধিক!...কিন্তু নিজেকে ধিক্‌কৃত করবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হোল—'পাপের শাস্তি!' সে এক সতীর স্বামীত্ব চুরি করেছে। বিধাতার বিধানেই তার শাস্তি হবে। চুরি করেছে...হ্যাঁ, চুরি-ই করেছে। আশা তার ভুলের কথা জানার পরে নীতীশকে ঘৃণা না-করতে পারে, হয়তো লালন করতে পারে তার অন্তরে—নীতীশের ঐ মুহূর্তের দুঃসাহসের মাহমাকে, ঐ পাপ-প্রবণতার অতিমানবিক আবেদনকে। এমন হয়, এমন হয়েছে মানুষের জীবনেতিহাসে।...

চিন্তাটা করতে যেন ভয় পাচ্ছে নীতীশ। কিন্তু আনন্দ তো ওর কম হচ্ছে না। আশা যদি সত্যই তার ক্ষণিকের দুঃসাহসকে মুগ্ধহৃদয়ে লালন পালন করে তো ক্ষতি কি! 'ভিলেন' হয়েও তো নীতীশ আশার বুকে আসন রচনা করতে পারবে! আশার স্বপ্ন জাগরণের সঙ্গী হতে পারবে। হয়তো হয়েছে। হয়তো...

কুমকুম নিঃশব্দে ফিরে এসে চাপা-গলায় জানালো রমানাথ ওখানেই খেয়ে এসেছে। নীতীশকে জাগাতে বারণ করে নিজে সে শুয়েছে। বসলো কুমকুম ওর পায়ের কাছে। খুব আস্তে নীতীশ কথা বলল,

—তুমি মিথ্যে কথা কেন বললে, কুমকুম?

—ওরকম বলি আমরা। আমাদের জীবন মিথ্যার তেলমাখা মুড়ি! হাসলো কুমকুম মৃদুমধুর।—খুব হাল্কা আর খুব মুখরোচক দাদা!

—কিন্তু কিছু প্রয়োজনও হয়তো ছিল মিথ্যা বলার।

—হ্যাঁ, ছিল বইকি! আপনি জেগে আছে জানলে অনর্থক 'অনেক কথা' বলতে হোত।

নীতীশ আর কিছু বলল না। কুমকুমও না। বেশ কিছুক্ষণ ওরা বসে। অকস্মাৎ নীতীশ যেন একটা আবেগ অনুভব করলো কুমকুমের প্রতি। বলল,

—তুমি চলো, কুমকুম, আমার সঙ্গে চলো...হাতটা ধরতে যাচ্ছে নীতীশ ওর।

—না দাদা। ওতে কোন ভাল ফল হবে না।

—হবে। আমি সত্যি তোমায় ভালবাসবো!—নীতীশ ধবলো ওর বাঁ হাতের কব্জিটা।

—না, আপনার সেই বান্ধবীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো না আমি!—চলে গেল কুমকুম।

আরো কিছুক্ষণ পরে রমানাথ বেরিয়ে এল ও-ঘর থেকে। নীতীশকে বলল,

—সব-রকম ওষুধ আর যন্ত্র-ও এনেছি আপনার জন্য। কিন্তু কিঞ্চিৎ পড়াশোনারও তো দরকার...বই অবশ্য এনেছি আমি—

—পড়ে নেব!—বলল নীতীশ চা খেতে খেতে।

—শুধু পড়লে হবে না, কিছু হাতে কলমে শেখা দরকার।—রমানাথ বলল।

—বেশ, আমি ফিরে আসবো দু'চারদিন পরেই। তখন শেখা যাবে আপনার কাছে।

নীতীশ বিদায় নিল। রমাবাবু বাইরের রিক্সাতে ওর সুটকেস আর ওষুধ চড়াচ্ছে—

নীতীশ কুমকুমকে প্রশ্ন করলো যাবার সময়.

—কাল রাত্রে তোমার কান্নার মধ্যে কি ছিল, কুমকুম? রমাবাবুর কথামত অভিনয়, নাকি সত্যি তোমার হৃদয়ের ব্যথা!

—ওর জবাব নাই-বা দিলাম, দাদা! ও দিয়ে কি হবে আপনার?

—আমি জানতে চাই, কুমকুম! বলো, ওটা সত্যি না অভিনয়?

—অভিনয়! আমাদের প্রেম হয় না। অভিনয় করি।

জবাব দিয়েই সরে গেল কুমকুম ত্বরিতে। আজ আর কুমকুমের চোখে জল দেখতে পেল না নীতীশ।

এয়ার-মেলে দিব্যেন্দুবাবুর চিঠি পেল আশিস। নির্লজ্জ আশার অভিনয়-দক্ষতাই দীপ্যমান হয়ে উঠলো ওর কাছে। ভাবলো চমৎকার অভিনয় করতে পারে আশা। স্নেহশীল দিব্যেন্দুবাবুকে আচ্ছা ফাঁকি দিয়েছে। তাঁর কাছে এমন চমৎকার অভিনয় সে করেছে তার স্বামী আর সংসারের প্রতি একনিষ্ঠতার যে, বেচারা দিব্যেন্দুবাবু ওকে সাধ্বী সতী-সাবিত্রী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি। জড় যন্ত্রগুলিকে পর্যন্ত ঝেড়ে-মুছে, ধূপ দিয়ে, হয়তো ফুলমালা দিয়ে সাজিয়েও আশা 'কাকাবাবু'কে দেখিয়েছে যে সে একটা আদর্শ ভারতীয়-নারী। অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে তো! কিন্তু বুদ্ধি ঐরকম কাল্‌প্রিট্ ক্লাসের মেয়েদের বেশী হয়। এ তো জানা কথা।

কিন্তু কাকাবাবু যে-ভাবে পত্র লিখেছেন তাতে মনে হচ্ছে, তিনি হয়তো পর পত্রেই আশিসকে বাড়ী ফেরার তাগাদা দেবেন। পিতৃসম এই বৃদ্ধকে দুঃখ দেবার ইচ্ছে নেই

আশিসের। তা ছাড়া আর একটা কারণ—কাকাবাবুকে যাই আশিস লিখুক, মা-ও তা জানবেন। কারণ কাকাবাবু মাকে সে-কথা বলবেনই। অতএব আশিস এখন করবে কি? আশা তো তাকে বেশ বিপদে ফেললো দেখা যাচ্ছে! আশিকের জীবনে আত্মীয়-বিরোধের অশান্তিও আসতে আরম্ভ হোল পর পর! অথচ কিছু, বলার উপায় নেই। কিছু করবারও নয়। আশার সম্বন্ধে সব কথা জানালে, মাকে মর্মান্তিক আঘাত দেওয়া হবে—এবং এখন যা দেখা যাচ্ছে তাতে কাকাবাবুও কম দুঃখ পাবেন না। কী এখন করা যায়!

একখানা ট্যাক্সি নিয়ে আশিস বোম্বাই এর বিখ্যাত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে বের হোল। ওর ইচ্ছে আরও কয়েকদিন বোম্বাইএ থাকবে। কিন্তু এভাবে চিঠির আঘাত আসতে থাকলে মনঃস্থির করা মুস্কিল। চলেই যাবে নাকি দেশ ছেড়ে? বিলাত না হয় আমেরিকা ঘুরে এলে কেমন হয়। কিন্তু বিদেশে যেতে হলে মার অনুমতি আবশ্যক—আর, তাহলে বাড়ী ফিরতে হয় এবং আশার মুখ দেখতে হয়—এবং...দুত্তোর! আশিস তা পারবে না।

একেবারে শহরের বাইরে এসে আশিস বসলো এক জায়গায়। সিগারেটও খায়নি এর আগে, আজ এক প্যাকেট কিনেছে। একটা ধরিয়ে টানতে আরম্ভ করলো। ভাবলো এইরকম অবস্থায় মানুষ মদ খায়—থিয়েটারের নাটকে দেখেছে আশিস। সে না-হয় সিগারেট-ই খেল দু'একটা। মদ তো খাচ্ছে না, বেশ লাগছে নরম সিগারেটের ধোঁয়া। এমনি করে ধোঁয়ার মতো চিন্তাগুলো উড়িয়ে দেওয়া যায় না! না, চিন্তা ধোঁয়া নয়। চিন্তাকে চিতার সঙ্গে তুলনা করেছেন পণ্ডিতগণ।

ইচ্ছে করলে আশিস এখানে দু'একটা বন্ধু বা বান্ধবী যোগাড় করে নিতে পারতো। কিন্তু সেরকম ইচ্ছা-ই হয়নি ওর। মনের অবস্থা এমন একটা শীতলতায় এসে থেমে আছে, যেখানে চঞ্চল জল স্থির তুষারে পরিণত হয়ে যায়। আশিস ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবলো—কোনদিন কি গলবে তার জীবনের এই চির-তুষার—! কখনও কি আবার অলকানন্দা বইবে সেখানে? না! আশিস শুধু মার কথাই, মার বেদনার কথাই ভাবছে বেশী করে। মা একদিন নিশ্চয় জানবেন আশার কীর্তি। জানবেনই। সেদিন তাঁর স্নেহ-সমুদ্র সব শুষ্ক হয়ে যাবে আশার জন্য। কিন্তু নিজেও তিনি মরুভূমি হয়ে যাবেন। সেজন্যই আশিস মাকে কিছুই জানাতে পারছে না।

কিন্তু নীতীশের থিসিস্-চুরির ব্যাপারটা মা হয়তো আন্দাজেই বুঝে নিয়েছেন। নীতীশের অধঃপতনে মার মনের বেদনা অতলান্ত হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সে দুঃখ মা সামলে যাবেন। কারণ নীতীশের সঙ্গে মার রক্তের কোন সম্বন্ধ নেই। নীতীশের পাপ-প্রবণতার পরিপূর্ণ রূপ মা আজও কিন্তু জানেন না। তিনি জানেন না তাঁর আদরিণী বধূর অন্তর আগেই চুরি করে নীতীশ নির্মমভাবে ঠকিয়ে গেল মাকে!—এমনি মানুষ—এই মানুষের চরিত্র। ওর আবার নাম রাখা হয়েছে 'নীতীশ'! নীতি+ঈশ। 'হ্যাঃ'...

হেসে উঠলো আশিস।

—হোয়াটস্ দি ম্যাটার—ক্যা হুয়া? হাসলেন কেনো?

আশিস চেয়ে দেখলো একটা লোক হেঁটে আসছে রাস্তা দিয়ে। পোষাকে খুবই সে আধুনিক। প্রায় ইউরোপীয়। হাতে একখানা 'কেস'। হয়তো বাঁশী আছে ওর মধ্যে। কিন্তু তার ডান পা-টা বাঁ-পা থেকে খাটো। খোঁড়া লোক।

—আমাকে খোঁড়া দেখিয়ে হাসলেন, বাবুজি?—বলে সে এগিয়ে এল।

—না-না, নেহি!—আশিস খুবই বিপন্ন বোধ করছে।

—তোবে কেনো হাসলেন?—বলেই সে বজ্রমুষ্টিতে ধরলো আশিসের হাতখানা। কঠিন স্বরে বলল আবার,— কেনো হাসলেন বলুন, না হোলে...

আশিস বাংলা-হিন্দী ইংরাজী ভাষায় প্রাণপণ শক্তিতে তাকে বোঝাতে চাইল যে, তার খোঁড়া-পা দেখে হাসেনি। হেসেছে একটা ব্যক্তিগত চিন্তায়। কিন্তু খোঁড়া ছাড়বে না।

—কি সেই কারণ বোলেন? তোবে হামি বিশওয়াস করবে।

আশিস জানালো যে তার এক বন্ধু নাম নীতীশ। যার অর্থ 'নীতিমান হওয়া, নিষ্পাপ হওয়া।' অথচ সেই বন্ধু তার একটা মূল্যবান বস্তু চুরি করেছে। নামের অর্থের সঙ্গে কাজের অমিল দেখে আশিস হেসেছিল।

—ওঃ—ই তো বহুৎ দিখা যাতা, বাবুজী!—এতক্ষণে হাসলো লোকটি ; ছেড়ে দিল আশিসের হাতখানা। বসলো। বলল,

—কুস্তি তো করলেন বহুৎ! আব্ একঠো সিগারেট পিলাইয়ে! আপকো বাঁশি শুনা দেতা...

আশিস খুব বেঁচে গেছে! সিগারেটের প্যাকেটটা ওর হাতে দিয়ে বলল,

—সব আপ্ পিজিয়ে! হাম ও পি-তা নেহি।

—তব্ পাকেট্‌মে কাহে রাখা?—প্রশ্ন করলো লোকটি।

—মতলব খারাব রহা তো একঠো মাঙা। পিয়াভি একঠো...বললো আশিস।

—শুনিয়ে—আপকো মতলব সাফ হো যায়গা—বলে ব্যাগটা খুলে বাঁশী বের করে বাজাতে আরম্ভ করলো সে। বাজাচ্ছে। সন্ধ্যার শোণিমা-লাঞ্ছিত আকাশ...জনবিরল পরিবেশ...হাওয়া থাকলেও বাঁশীর সুর খুব মন্দ লাগছে না আশিসের। ভালই বাজায় সে। খানিকক্ষণ বাজানোর পর লোকটি বলল,

—কেমোন লাগলো?

'বহুৎ আচ্ছা' বলে আশিস উঠবে।—কিন্তু লোকটি ওকে ধরে বসিয়ে বলল,

—সিনেমাওয়ালাদের দরজামে বহুৎ ঘুরলো, বাবুজী, কোই সমঝাতে পারলো না। বহুৎ দুখ্‌মে ও-কাম ছোড় দিয়েছে! আভি আপনমনে বাজাচ্চে, সাধনা করছে! কোই গুণী আদমি মিল যায় তো, কদর হো যায়েগা!

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক!' বলে আশিস আবার উঠতে গেল—ওকে আবার বসিয়ে সে বলল,

—আপ্‌না বাংলা-মুলুকমে যাবে—একটা চিঠি-উঠি লিখে দিন-না। হামি ছিলো বহুৎ রোজ বাংলা-মুলুকমে—লেকিন, বাঁশী কোই ঠিক সমঝে না—

আশিস তাকে জানালো যে তার চেনা-জানা বাঁশী-সমঝদার কেউ নেই। বলেই আশিস উঠে পড়লো, সটান এসে গাড়িতে চড়ে তার হোটেলে ফিরলো। হোটেলের ম্যানেজার ওকে শুঁধুলেন,

—কোথায় গিয়েছিলেন? বেড়াতে?

—হ্যাঁ। কিন্তু এক বাঁশীওয়ালার পাল্লায় পড়ে প্রায় মার খাবার যোগাড়।

—ও, দয়ালচাঁদের খপ্পরে পড়েছিলেন বুঝি? হেসেছিলেন তাকে দেখে?

—হ্যাঁ। কিন্তু কি ব্যাপার? কে ঐ দয়ালচাঁদ?

—খেয়ালী সুরশিল্পী। সারা ভারত ঘুরে বেড়ায়—বাঁশী-ই ওর সঙ্গী। টাকা-পয়সা কিছু

পৈতৃক আছে। কিন্তু ওর খোঁড়া-পা দেখে কেউ হাসলে আর রক্ষা নেই। নইলে লোকটা খুব নিরীহ। ওকে আপনি বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, দিল্লী সর্বত্রই পাবেন। আর বহুরকম ভাষাও জানে ও। বাঁশীও ভাল বাজায়, কিন্তু।...

—কি?—আশিস আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলো।

—লোকটি বড় দুখী। ওর বিয়ে হয়েছিল ছোটবেলায়। তখন ছোট বয়সে বিয়ে চলতি ছিল। বড় হয়ে ও বৌ এর সঙ্গে দেখা করতে গেল—ওর খোঁড়া পায়ের চলন-ভঙ্গী দেখে বৌটা এত হেসেছিল যে, সে-বউ নিয়ে ও ঘর করেনি। সেই থেকে বাঁশীই ওর সঙ্গী। ওকে দেখে হাসবেন না।

—না!—আশিস ম্যানেজারকে অভিবাদন জানিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। কিন্তু ঐ খোঁড়া দয়ালচাঁদের ওপর একটা অসাধারণ সহানুভূতি জেগে উঠলো ওর অন্তরে। অঙ্গ-বিকৃতির জন্য লোকটার দুঃখের অন্ত নেই। নিজের বিয়ে-করা-বউ বিরূপ করেছে ওকে—ওর শিল্পীমন সহ্য করতে পারেনি সে বিদ্রূপ! তাই সব ছেড়ে বাউন্ডুলে হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। আহা, কী করুণ! ওর সঙ্গে আবার দেখা হলে আশিস ওকে সব শুধোবে।

ওর সঙ্গে নিজের জীবনের যেন কোথায় মিল খুঁজে পাচ্ছে আশিস! হ্যাঁ, মিলই তো। যথেষ্ট মিল রয়েছে। দয়ালচাঁদের বৌ তার খোঁড়া পা দেখে বিদ্রূপ করেছে। আর আশিসের বৌ কিছু না-দেখেই তাকে বিদ্রূপ নয়, বিষ খাইয়েছে—বিষাক্ত করে দিয়েছে আশিসের অন্তর।

নিঃশব্দে ঘরে শুয়ে-শুয়ে ভাবছিল আশিস।...দূরে কোথায় একটা রেডিও-যন্ত্রের গান ভেসে আসছে, এছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। কিছুক্ষণ আগে বাঁশী শুনে এল আশিস, গান আর এখন ভাল লাগছে না। কিন্তু উপায় কি! অপরের রেডিও তো সে থামিয়ে দিতে পারে না! ঘরের শার্সিগুলো বন্ধ করে যথাসম্ভব কম আওয়াজ আসার ব্যবস্থা করবে কিনা ভাবছে—পাশের কামরা থেকে একটি বালিকা এল।

—আপনি তো বাঙালী? বাড়ী কোথায়?—প্রশ্ন করলো আশিসকে।

—বাড়ী?—বলে আশিস দেখলো মেয়েটিকে। ফ্রক-পরা বছর দশেকের মেয়ে। বেশ দেখতে। ওকেই প্রতিপ্রশ্ন করলো আশিস,

—তোমাদের বাড়ী কোথায়, খুকী? কলকাতায়?

—হ্যাঁ। আমার বাবা গবর্ণমেন্টের অফিসার এখানে।—কিন্তু আপনি যে বাঙালী হয়েও আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না—কেন?

—আমি কি করে জানবো তোমরা এখানে 'বাঙালী' আছ?

—বা-রে। আমরা কতো বাংলা-কথা বলি। মা আজ সকালেই জোরে জোরে বললেন—'ঐ ছেলেটি বাঙালী মনে হচ্ছে, নন্দা।

—নন্দা বুঝি তোমার নাম?

—হ্যাঁ। নন্দিতা শান্তিনিকেতনী নাম। মা আমার শান্তিনিকেতনে পড়া মেয়ে কিনা! কিন্তু ও নাম আমার পছন্দ নয়।—বলল নন্দিতা।

—তোমার কী নাম পছন্দ?—ওর বব্-করা চুলে হাত বুলিয়ে শুধোলো আশিস।

—'মন্দাকিনী'—বলে হাসতে লাগলো নন্দিতা।

—দ্যুৎ। ও খুব পুরোনো নাম।

—না—'মন-দা-কিনি'! শুনুন মানেটা। মন মানে আমি, দা মানে খাঁড়া, কাটারী। আর, কিনি মানে খরিদ করি। কেমন!

—বাঃ, খুব তো মানে মুখস্থ করেছ!—হা-হা করে হেসে উঠলো আশিস।

—দেখুন-না কাণ্ডটা! এসেই বক্‌বক্ আরম্ভ করেছে—বলে একটি পূর্ণ-যৌবনা নারী—বাঙালী—এসে দাঁড়ালো। বললো,—পরশু থেকে বায়না নিয়েছে আপনার সঙ্গে আলাপ করবে। তা আপনি তো ঘরের ভেতরেই থাকেন! আমাদের খোঁজখবর কি নিতে নেই? অবশ্য, আমাদেরই উচিত আগে খোঁজ করা—কিন্তু আপনি তো সুযোগই দিচ্ছেন না!

আশিস এই অভিযোগের উত্তরে কী যে বলবে ভেবে পাচ্ছে না। অবশেষে বলল,—আমি জানতাম না যে পাশেই আমার দেশবাসী আছেন। কিন্তু, আপনারা তো নন্দাকে একবার পাঠালেই পারতেন! কি বলো, নন্দা?

—না, 'মন্দাকিনী' বলুন! 'নন্দা' আমি কিছুতেই হতে চাই নে। আমি কাল থেকে বলছি, 'মা, যেতে দাও, আলাপ করি'—তা মা ছাড়ে না!

—আচ্ছা, এবার থেকে দিনরাত বক্‌বক্ করো!—বলে মহিলা চলে যাচ্ছে।

—বসুন না, দিদি!—আশিস বলল,—তাড়া তো নেই আপনার?

—না ভাই, তাড়া নেই কিছু। উনি তো সেই রাত ন'টায় ফিরবেন।—বসল সে।

আশিস জানতে পারলো কথায় কথায়, এঁরা দিল্লীতেই থাকেন। সরকারী কাজে এখানে এসেছেন। দিন-দশ পরেই দিল্লী ফিরে যাবেন। বিদেশে একটি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় আশিস খুশী হোল খুবই। মহিলাটির নাম চন্দ্রিমা দেবী, ওঁর স্বামীর নাম, শ্রীপ্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়।

আলাপ-আলোচনায় আশিসের মন অনেক হাল্কা হয়ে আসছে, কিন্তু চন্দ্রিমা দেবীর সঙ্গে আশার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এ খবরও জানতে পারলো আশিস।

মনটা ভাল হতে-হতে খারাপ হয়ে গেল ওর।

সেদিন সন্ধ্যায় নামলো নীতীশ 'বাস' থেকে। গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক-রোডের পাশেই তাপসীপুর। সামনের ঘরগুলোতে কামার-কুমার-তাঁতীদের বাস—যাঁরা শিল্পী এবং ব্যবসা করেন। ভেতর দিকে চাক্‌রে-বাবু আর চাষী-বাসীর ঘর। গ্রামখানা খুব বড়, প্রায় দু-আড়াই হাজার লোকের বসবাস। পাকা বাড়ী—একতলা, দোতলা, তিনতালা অনেকগুলি। তবে মেটে বাড়ী এবং কুঁড়ের সংখ্যাই বেশী। এ ছাড়া ও-গ্রামে বড় মন্দির আছে মা-সর্বমঙ্গলার।

প্রাচীন ঠাকুরবাড়ী। তার ইঁট দেশলাই এর বাক্সের থেকে কিঞ্চিৎ বড়। ঠাকুরবাড়ীটি কিন্তু একেবারে গ্রামের মাঝামাঝি, বড় রাস্তার উপর। আর, ঐ মন্দিরের কাছে নীতীশের পৈতৃক ভিটে। রাস্তায় এপার-ওপর মাত্র।

গ্রামের এই জায়গাটাই জাঁকালো। ঐখানেই দু-তিনটে গোলদারী দোকান আছে, একটা কাপড়ের আর দুটো মনিহারী দোকান হালে হয়েছে। একজন অ্যালোপ্যাথী ডাক্তার ডিস্‌পেনসারী খুলেছেন বছরখানেক হোল; আর, একটি কবিরাজ আছেন ওখানে দীর্ঘদিন। সব মিলিয়ে ওটাকে 'হাটতলা' বলা হয়।

নীতীশের একতলা বাড়ীটা ওখানেই। তা-ই ভাড়া নিয়ে দোকান করবার জন্য বহুবার নীতীশকে অনুরোধ পত্র পাঠিয়েছে অনেকেই। ইদানিং গ্রামের যুবকরা ওখানে গ্রন্থাগার করবার জন্য বিনামূল্যে নীতীশকে ওটা দিতে বলেছে। নীতীশ ওর কোনোটাই করেনি। অকস্মাৎ এসে নিজেই উঠলো বাড়ীতে।

সদর দরজা খুলতেই কতকগুলো চামচিকে ঝটপট করে উঠলো। হাতের টর্চ টিপে নীতীশ দেখলো অবস্থাটা। তিনখানা ঘরের সামনেরটাই বড়। বসবার ঘর। আর পাশের দু-খানা শোবার। নীতীশ তার জিনিস রেখে আবার তালা দিয়ে কাছেই হাটতলায় গেল; একটা লণ্ঠন, একগাছা ঝাঁটা আর কেরোসিন তেল কিনে লণ্ঠন জ্বেলে ফিরলো। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল নীতীশ বসবার ঘরখানা বাসযোগ্য করে তুলেছে।

নীতীশ-যে গ্রামে ফিরেছে এ-সংবাদ তার বাল্যবন্ধুদের কেউ-ই জানতে পারেনি। কারণ তাদের সেদিন ফুটবল-ম্যাচ ছিল। আর, অত আকস্মিকভাবে নীতীশের গ্রামে ফেরার আশাও কেউ করে না। ওর বাড়ীর জানালায় আলোর ছটা দেখে লোকে ভাবলো, বাড়ীটা ভাড়া হোল হয়তো। নীতীশও চায় না যে, কেউ আসুক তার কাছে এখন। নিজের মনেই ভাবতে লাগলো...সে চোর নয়। সে ভদ্র, সে বড়-বংশের ছেলে! চোর হোলে কলকাতার এত কাছে সে কখনো থাকতে পারতো না। বহুদূরে পালিয়ে যেত। সে চোর নয় বলেই এতো কাছে রইল! আশিস তার গ্রামের ঠিকানা জানে, এমন কি পিসিমা থাকতে এসেছে এখানে দু-বার। আশিস মনে করলেই এখানে আসতে পারবে। অন্তত চিঠি লিখতে পারবে। যদি লিখে তো, নীতীশ তার জবার দেবে যে—মুহূর্তের ভুলের জন্য নীতীশের এই অধঃপতন। সে চোর নয়, পরনারী-লোভী শয়তান নয়, 'ভিলেন' নয়...

ঝাঁটাটা রাখলো নীতীশ ওপাশের বারান্দায়। এবার এক কলসী জল দরকার। পাতকুয়ো আছে, ওঘরে হাঁড়ি-কলসীও আছে ; কিন্তু জল তুলবার জন্য দাড়িটা খুঁজে পাচ্ছে না নীতীশ। কুয়োর কাছেই একটা জামরুল গাছ। দেখতে পেল তারই কাণ্ডে দড়িটা ঝোলানো। কেউ গাছে দড়ি বেঁধে কূয়োতে ঝুলবে নাকি!...

অকস্মাৎ কেন-কে-জানে নীতীশের ঐভাব মনে হল। হাসলো নীতীশ...কূয়োতে ডুবে-মরা এবং গাছে-দড়ি-বেঁধে মরা—এর যে কোনো একটাই মরবার পক্ষে যথেষ্ট। গাছে দড়ি বেঁধে কূয়োতে ডুববার কি দরকার? কিন্তু অনেক সময় দুটোই এক সঙ্গে করে মানুষ, মরণকে বেশী নিশ্চিত করবাব জন্য। বিষ খেয়েও কে নাকি নিজেকে রিভলভার দিয়ে মেরেছিল।...চিন্তাটা ওর মাথায় আসবার কোনো দরকার ছিল না। তবু এল! কেন এল। নীতীশ ভাবতেই বুঝলো—নিজেকে নিশ্চিন্ত 'ভিলেন' প্রমাণ করবার জন্য সেও দুটো কাজ একসঙ্গে করেছে। একটা—থিসিস্-চুরি, অন্যটা আশার স্বামিত্ব চুরি,...হ্যাঁ, দুটোই একসঙ্গে করেছে সে, ওর অন্তরস্থ ভদ্র শিক্ষিত নীতিমান নীতীশকে হত্যা করবার জন্য—হত্যাই করে ফেলেছে!...

নীতীশ চমকে উঠলো কুয়োর দড়িটা হাতে নিয়ে।

কিন্তু এ দড়িতে আর জল তোলা যাবে না। কতকাল-যে দড়িটা ঐ জামরুল গাছে টাঙানো আছে, কে জানে! রোদে জলে ওর আর কিছু অবশিষ্ট নেই, শুধু দড়ির আকারটাই রয়েছে। নীতীশও এখানে পড়ে থেকে এমনিই হয়ে যাবে! এমনি ভদ্র আকারধারী অকেজো আবর্জনা! নীতীশ আর 'নীতীশ' থাকবে না। তাকে দিয়ে আর ভদ্র সমাজের কোনো কাজই

হবে না!...

কিন্তু নীতীশ এসব কি ভাবছে!...নিজেকে সংযত করে নীতীশ দড়িটা ফেলে দিল। আবার বেরিয়ে গেল হাটতলায়। দড়ি এবং চিঁড়ে-মুড়ি-মিষ্টি কিনে ফিরলো সে এবার। রাত্রে তো কিছু খেতে হবে! কিন্তু তার আগে আর একটা কাজ করা দরকার। একদিকে একটুকরো তক্তা পড়ে ছিল, দেখলো নীতীশ। দোকান থেকে পান এনেছে দু'পয়সার, তার সঙ্গে এক-ঢেলা চুণ। নীতীশ সেই চুণটুকু দিয়ে তক্তাটায় লিখলো :

'হোমিও-বিজ্ঞান-মন্দির'

ডাঃ নীতীশ চট্টরাজ, এম. বি. (হোমিও)।

বাইরে টাঙিয়ে দিল সেটা।

অতঃপর জল তুলে হাতমুখ ধুলো। পিসিমার তোরঙ্গটা খুলে দেখলো, বিশেষ কিছু নেই। ওর মার আমলের বিছানা-বালিশ গাদা করা আছে একদিকে। ইঁদুরে বিস্তর তুলো কেটে বের করেছে। তার থেকে একখানা তোষক বেছে নিয়ে বিছানা পাতলো। এর পর খাবে। কিন্তু খাবার এখনও রাত হয়নি। হোমিওপ্যাথী বই খুলে নীতীশ পড়তে বসলো লণ্ঠনের আলোতে।

কতক্ষণ পড়ছে ঠিক নেই। হঠাৎ ওর মনে হোল, খুবই খিদে পেয়েছে। উঠে চিঁড়ে-মুড়ির সৎকার করে ফেললো। এবার শোবে, দরজা বন্ধই আছে। জানালাপথে বাইরে চেয়ে দেখলো হাটতলার সব আলো নিবে গেছে। তাহলে রাত অনেক হয়েছে নিশ্চয়। নীতীশও আলোটা নিভিয়ে দিল।

অন্ধকার...নিদারুণ অন্ধকার! যেন কালো মার্বেল-পাথর—যেন 'কৃষ্ণ্যাল'! যেন ওর কলমটার মতো কালো। কিন্তু অনেকক্ষণ আলোতে পড়ার জন্যই হয়তো অন্ধকার এতো বেশী বোধ হচ্ছে। নীতীশ চোখ বুজে শুলো।...

মশা কৈ?—মশা তো একটাও আসেনি! মশারা হয়তো এখনো টের পায়নি যে নীতীশ এখানে এসে রয়েছে। মানুষেও টের পায়নি। কাল সবাই জানবে নীতীশ গ্রামে এসেছে। 'হোমিওপ্যাথী' করবে। হাসবে অনেকেই। ঠাট্টা করবে বন্ধুরা। যা করে করুক! কিন্তু কেউ যদি না জানতো যে নীতীশ এসেছে তো বেশ হোত! নীতীশের কাছে খুব বেশী টাকা নেই। শ'খানেকও নেই। টাকা তার থাকবার কথাও নয়? যা ছিল, ভাগ্য-বলেই ছিল। টাকা থাকলে নীতীশ বহুদূরে কোথাও চলে যেতো কিছুদিন। কিন্তু কেন যাবে? নীতীশ চোর নয়। থিসিস্ সে নিয়েছে, কালই ডাকে ফিরিয়ে দেবে আশিসকে তার থিসিস্। কিন্তু...ঐ স্বামিত্ব-চুরি-করাটা ফিরিয়ে দেবে কি করে? সে চোর! চোর...চোর...

নিজেকে বিশ্লেষণ করা চিরদিনের স্বভাব নীতীশের—বৈজ্ঞানিক নীতীশ মনস্তত্ত্ববিদ্ও। ওর এদিককার প্রতিভা বন্ধুমহলে বিশেষ সমাদৃত। কিন্তু কি হোল তাতে? কী লাভ করলো নীতীশ! এতখানি প্রতিভার অধিকারী হয়ে সে একটা 'চোর' হোল। একটা নিকৃষ্ট অপরাধী হোল! না, নীতীশ কিছুতেই তা হবে না। হতে পারে না! কাল সকালেই...না, আজই এখুনি নীতীশ কলকাতা গিয়ে আশিসকে ফিরিয়ে দেবে তার থিসিস্, আর আশার পায়ে ধরে বলবে—'সেদিন সন্ধ্যার অমার্জনীয় অপরাধ সে স্বীকার করতে এসেছে। শাস্তি নিতে এসেছে!'...

উত্তেজিত নীতীশ উঠে বসলো। আলো জ্বালাতে গিয়ে দেখল, তেল এতো কম

দিয়েছিল যে—ও আলো আর জ্বলবে না। নিরুপায় নীতীশ সকাল হবার অপেক্ষায় পায়চারী করেছে। উত্তেজনায় ওর মানসিক উদ্বেলনের সঙ্গে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তরঙ্গায়িত হোতে লাগলো। যেন একটা তীব্র জ্বালার মতো বোধ হচ্ছে সর্বাঙ্গে, বিশেষ মাথায়। নীতীশ উঠানে নামলো। জামরুল গাছের দিকে এগুচ্ছে। চাঁদ উঠেছে—পাতলা অন্ধকারে সব-কিছুই বেশ দেখা যায়। আকাশের দিকে চাইল নীতীশ। কয়েকটা নক্ষত্র যেন দেখছে ওকে—চুরি করে পালিয়ে এসে গ্রামের অন্ধকার গৃহে লুকিয়ে-থাকা নীতীশকে! না-না-না, আগামী সন্ধ্যায় ঐ তারারা নীতীশকে দেখবে শুদ্ধ-অপাপবিদ্ধ নীতীশ রূপে! আজ সে চোর! না—চোরের অভিনয়কারী মাত্র, চোর নয়। কারও কিছু চুরি করেনি নীতীশ! দিনের প্রখর সূর্য্যালোকে সে ধুয়ে মুছে ফেলবে তার অভিনয়ের আবরণ মন থেকে, শরীর থেকে—সমস্ত জীবন থেকে! কিন্তু...

যার স্বামিত্ব সে চুরি করেছে, সে যদি ধুয়ে না-ফেলে নীতীশকে! সে যদি লালন করে নীতীশের ঐ দুর্বৃত্ততার ক্ষণিক স্মৃতি, ঐ দুঃসাহসিকতার বীর্য্য-দীপ্ত ক্ষণ-মহিমা! তাহলে নীতীশ একটা বন্ধু জীবনকে শুধু বিড়ম্বিতই করে এল না, সরল বালিকা-জীবনকে কীট-দষ্ট করে এল! এ অপরাধ অমার্জনীয়। এ অপরাধ অতি দানবীয়! 'নাঃ'—নীতীশ কি করবে ভাবতে পারছে না! মাথাটায় কেমন যেন উত্তাপ বোধ হচ্ছে। কেমন যেন জ্বালা ওর সর্বাঙ্গে! নীতীশ নতুন-কেনা দড়িটায় বেঁধে কয়েক কলসী জল তুলে মাথায় ঢাললো। শীত করছে।

বহুদিনের অব্যবহৃত কূপের অতি শীতল জল। বিষাক্ত। নীতীশ শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে পরনের কাপড় দিয়েই গা-মাথা মুছলো, তারপর একখানা লেপ টেনে এনে শুয়ে পড়ল গুটিয়ে। জ্বর হোল নাকি! হোক না, ওষুধ তো সঙ্গেই রয়েছে। ও এখন হোমিওপ্যাথ 'এম. বি। কিন্তু এম বি. তো সে পাশ করেনি...কখন করলো? করবে পাশ। পড়ছে নীতীশ হোমিওপ্যাথী। ওর মাথার মধ্যে হোমিওপ্যাথী-বইএ পড়া দু-লাইন কবিতা জাগছে :

"অ্যরমে মরণ-চেষ্টা, গভীর বিষাদ,
আর্সে অস্থিরতা, জ্বালা, তৃষ্ণা অবষাদ—"

ঠিক! ঠিক! ঐ লক্ষণটি তো হয়েছে এখন নীতীশের। কিন্তু অ্যরম খাবে না আর্সেনিক খাবে? দুটো লক্ষণই তো দেখা যাচ্ছে ওর শরীরে। না, অ্যরম নয়। মরণ-চেষ্টা জাগেনি তার! আর্সেনিক খাবে। তৃষ্ণা, জ্বালা অবসাদ সবই হচ্ছে। কিন্তু তৃষ্ণা কৈ...নাঃ, অ্যরম মেটালিকম-ই খেতে হোল—মরণ-চেষ্টা জাগছে বইকি ওর!...হ্যাঁ—নীতীশ চোর হয়ে গেল...নীতীশ পালিয়ে এল কলকাতার সমাজ থেকে। হয়তো এতক্ষণ পুলিশ তার খোঁজ করছে। হয়তো কাল সকালেই তাকে এসে ধরবে! না. তার চেয়ে মরণ ভালো। অনেক ভালো। নীতীশ অ্যরম-ই খাবেই! খুব হাই-পোটেন্সির অ্যরম খেয়ে নেবে এক ডোজ...

কিন্তু 'অ্যরম' তো ওষুধ। মরণ-চেষ্টা করা রুগীর জন্য ওষুধ ওটা! ও খেলে তো মরণ হবে না! মরণ চেষ্টা রোগটা ভাল হয়ে যাবে। না, নীতশ ও-রোগ আর ভাল করতে চায় না। ও রোগ তার থাক্!

কিন্তু নীতীশের কোন্ রোগটা হয়েছে? মরণ-চেষ্টা, আর বিষাদ, না-কি তৃষ্ণা...জ্বালা...অবসাদ, তৃষ্ণা জ্বালা বিষাদ...না, তৃষ্ণা বিষাদ মরণ...উহুঁ! মরণ তৃষ্ণা-অবসাদ...না-না-না—মরণ, বিষ বিষাদ...

নীতীশ 'বিষাদ' কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অচৈতন্য হয়ে গেল...

সকাল হয়েছে। সারা গ্রাম জেগেছে, হাটতলার দোকানীরা। কিন্তু কেউ জানেই না পরিচিতদের মধ্যে যে, নীতীশ গতরাত্রে বাড়ী ফিরেছে ; অনেকটা বেলা অবধি কেউ জানতেই পারলো না ; হয়তো জানতে পারতোই না দু'চারদিন। কারণ নীতীশ জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান। মাঝে মাঝে বলছে,—জল...আশা...কুমকুম। আশা...জল...। কথা অত্যন্ত অস্পষ্ট। শোনা যাচ্ছে না।

হাটতলায় এসেছেন গ্রামের অনেকেই। হাটবাজার করতে ব্যস্ত তাঁরা। হঠাৎ শম্ভু চক্রবর্তীর নজর পড়ল নীতীশের বাড়ীর দরজায় সাদামত কি-একটা লেখা রয়েছে। কী ওটা! বাজার থলি-হাতে কাছে এগিয়ে দেখলেন সাইনবোর্ডখানা।

কি ব্যাপার! নীতীশ এসেছে নাকি ফিরে? বিস্মিত হয়ে বারান্দায় উঠে ডাকলেন—'নীতীশ।' সাড়া নেই। অথচ অস্পষ্ট একটা শব্দ আসছে। কেউ গোঙাচ্ছে যেন। জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলেন, মেঝেতে তোষকে শুয়ে নীতীশ ছটফট করছে। শম্ভুবাবু ডাক দিলেন,

—নীতীশ—নীতীশ!

না, সাড়া দিতে পারলো না নীতীশ ; লাল দুটো চোখ মেলে চাইল শুধু। অনেক লোক জমে গেল এর মধ্যে। নীতীশ ঘরে অমন ভাবে পড়ে আছে কেন! নিশ্চয় খুব বেশী অসুখ তার। সকলে পরামর্শ করে একজনকে উত্তর দিকের পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে গিয়ে দরজা খুলে দিতে বললেন। তাই করা হোল। শম্ভুবাবু এবং আরো কয়েকজন নীতীশের বিছানার কাছে গিয়ে দেখলেন,

ভুল বকছে নীতীশ...

তার সুটকেশ এবং হোমিওপ্যাথির সরঞ্জামও লক্ষ্য করলেন ওঁরা। কিন্তু ওসব দেখবার এখন সময় নয়, তাড়াতাড়ি ওঁরা গ্রামের ডাক্তারটিকে ডেকে আনলেন। ডাক্তার দেখে বললেন,—জ্বর। তবে কেমন দাঁড়াবে এখন বলা যায় না—হয়তো খুবই 'সিরিয়াস' হতে পারে, না হয়, কিছুই না হতে পারে।

—ওকে বাঁচাতে হবে, ডাক্তারবাবু—ও আমাদের গ্রামের গৌরব। বলল ওর ছেলে বেলার বন্ধুরা! ডাক্তারবাবু বললেন,

—মরা-বাঁচা আমার হাত নেই। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে বাঁচাবার।

চিকিৎসা চলতে লাগলো। গ্রামের ছেলেরা পালা করে ওর সেবা করতে লাগলো—কিন্তু নীতীশ ক্রমাগত ভুল বকছে। কি যে বলে কে জানে!

—অন্ধকার... আশা... না-না, থিসিস... কুমকুম!... আরমেটালিকাম— আর্সেনিক— আর্জেন্টম্ নাইট্রিকাম...

ওর অস্পষ্ট কথার অসংলগ্নতা সকলকেই চিন্তিত করেছে, কিন্তু ওই কথার মধ্যেও সকলে অনুভব করতে লাগলো,—নীতীশের জীবনে গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে, যে-ঘটনা ওর এই সাংঘাতিক অসুখে মূলে। সহানুভূতিতে সকলের মন সজল হয়ে উঠছিল। সেবা-যত্নের ত্রুটি যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা করতে ওঁরা ত্রুটি করছিলেন না। এমন কি, ওর টাকা-য়সা কোথায় আছে, মোটেই আছে কিনা, না-জানায় বন্ধুরা ক্লাবের তহবিল থেকে ওর

জন্য খরচ করতে লাগলো। কারণ নীতীশ সত্যি ওদের গ্রামের সর্বজনপ্রিয় যুবক।

দু'তিনদিন নীতীশের একবারে জ্ঞান নেই। রোগ কোন্ পথ নেবে কেউ বুঝতে পারছে না। হঠাৎ একজন গ্রামবাসী একখানা খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখালেন—

"দিব্যেন্দু নামক জনৈক ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাচ্ছেন যে নীতীশ গুরুতর অপরাধে অপরাধী। সে যেখানেই থাক, অবিলম্বে এসে আত্মসমর্পণ না করলে গুরুতর অবস্থা ঘটতে পারে।"

ইনি-ওঁর মুখের পানে চাইতে লাগলেন ওঁরা। 'কী অপরাধ করেছে নীতীশ? কে এই দিব্যেন্দু? কী শাস্তি দিতে চান তিনি নীতীশকে?' ইত্যাদি বিস্তর প্রশ্ন জেগে উঠলো ওঁদের মনে। কিন্তু উত্তর পাবার কোনো আশা নেই, কারণ বিজ্ঞাপনে শুধু 'দিব্যেন্দু' নাম লেখা আছে। ঠিকানাও নেই যে, ওঁরা দিব্যেন্দুকে জানিয়ে দেবেন নীতীশ অত্যন্ত অসুস্থ। ঠিকানা অবশ্য কাগজের অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে, কিন্তু কে করে অত ঝামেলা একজন অপরাধীর জন্য! গ্রামের সকলেই জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন কী অপরাধ নীতীশ করতে পারে! খুন-খারাপি নয়তো! না,—তাহলে আত্মসমর্পণের কথা উঠতো না। চুরিও হতে পারে না। তাহলে পুলিশ-কেস হতো। তবে কি নারী-ঘটিতে কিছু? গ্রামে মাতব্বরগণ পরস্পর চেয়ে ব্যঙ্গ হাসলেন। বন্ধুর দলও কেমন যেন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লো নীতীশের জীবনরক্ষা সম্বন্ধে। তারা ঠিক করলো নীতীশকে বাঁচাবার চেষ্টা তারা নিশ্চয় করবে; কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ওরকম অপরাধীর সঙ্গে বেশী সংস্রব রাখা কেউ আর পছন্দ করছে না।

চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনও নীতীশ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে কাটালো। সেবা-যত্নের ত্রুটি হচ্ছে না কিছুই। কিন্তু যে আন্তরিকতা ছিল প্রথম দিকে, তা আর নেই। পাঁচ, ছয়, সাত দিন কাটলো। ডাক্তার বললেন—'বেঁচে যাবে। তবে মনে হচ্ছে কোথায় যেন ওর কী একটা বিস্মৃতি ঘটছে। কিছুতেই মনে করতে পারছে না!'

—হবে! কিংবা হয়তো অপরাধ এড়াবার জন্য বিস্মৃতির ভান করছে।

ভাবলো বন্ধুরা, এবং গ্রামের অন্যান্য লোকও। তবু তারা ওর সেবা এবং চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে যথাসাধ্য। তবে আগ্রহ এবং আন্তরিকতা ধীরে ধীরে কমতে কমতে প্রায় একেবারে শূন্য-ডিগ্রিতে এসে গেছে। কেউ কেউ বলল, নীতীশকে বিজ্ঞাপনের কথাটা বলা যাক্। কিন্তু ডাক্তার বললেন—'জ্ঞান সম্পূর্ণ না ফেরা পর্যন্ত ওসব কথা বলা চলবে না ভাল হোক, তারপর যা বলবার বলবেন আপনারা।' সকলেই সে-কথা মানতে বাধ্য হোল।

আটদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকার পর ন'দিনের দিন নীতীশের কিঞ্চিৎ জ্ঞান হোল। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছেনা কী তার হয়েছে, কোথায় সে রয়েছে—কবে সে এখানে এল! অনুচ্চ কণ্ঠে ডাক দিল নীতীশ,

—আমার কি হয়েছে? কোথায় আছি আমি? ক'দিন আছি এখানে?

—আপনার জ্বর হয়েছে। আছেন আপনার নিজের বাড়ীতে। আজ ন'দিন!

জবাব দিল সেবারত একটি ছেলে। নীতীশের থেকে অনেক ছোট। গ্রামের ক্লাবের মেম্বার। নীতীশ চাইল ওর পানে। বলল,

—তুমি কে! তোমার নাম?

—'চক্রধর'।—চিনতে পারছেন না আমাকে? আমি ধ্বজাধারীর ছোট ভাই।

—ও, চক্রধর! ধ্বজাধারীর ভাই! হ্যাঁ। জল দাও তো একটু! নীতীশ জল খেল। কিন্তু চক্রধর বলল তাকে,

—আপনি ভাববেন না। কিছু ভাববেন না! ভাল হয়ে আসছেন আপনি, আর কোন ভয় নেই! এ-যাত্রা বেঁচে যাবেন।

নীতীশ আর কিছু বললো না, চোখ বুজে ভাবতে লাগলো। ছেলেটি ওকে কিছু খাদ্য খাওয়ালো, তারপর অন্য একটি ছেলেকে 'ডিউটি' বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল ক্লাবের সকলকে খবর দিতে যে, নীতীশের জ্ঞান হয়েছে।

—'ভালই হয়েছে।'—বললো সব বন্ধুরা, কিন্তু বিজ্ঞাপনের খবরটা এখনি ওকে দেওয়া উচিত হবে না ভেবে কেউ এল না ওর কাছে। ধীরে ধীরে বন্ধুরা যেন সরে যাচ্ছে ওর কাছ থেকে। কে জানে কী মারাত্মক অপরাধ করেছে নীতীশ! আর ক'দিন তো পার হ'য়ে গেল! হয়তো এতক্ষণ দিব্যেন্দুরা পুলিসে খবর দিয়েছে। নীতীশের নামে পরোয়ানা এলেই সে খবর পাবে'খন...ভেবে ওরা চুপচাপ রয়ে গেল। তবে নীতীশের সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা ওরা ভালরকমই করে চলেছে।

নীতীশ দীর্ঘক্ষণ পরে আবার চোখ মেললো। সেবারত অন্য ছেলেটি শুধোল,

—কি? কিছু বলছেন?

—না-না আমার কিছু মনে পড়ছে না-তো! কি-ভাবে আমি এখানে এলাম?

—তা তো আমরা জানি না! আপনি ঘরে শুয়ে গোঙাচ্ছিলেন—; শম্ভুকাকা প্রথম দেখে আমাদের সবাইকে ডাকেন। কিন্তু ওসব এখন ভাববেন না—

—না...হ্যাঁ...আমি যেন আশাকে—না না, কিসব বলছি...কুমকুমকে...দূর! না, মনে পড়ছে না। কাকে যেন কী বলেছি, কী যেন...করেছি...কুমকুম...

—গুম-খুন!...

উত্তর না পেয়ে ছেলেটি আবার শুধোলো—'গুম-খুন' করেছেন?

নীতীশ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কথাটা যেন বুঝতেই পারছে না। ছেলেটি আরো কিছুক্ষণ জবাবের জন্য অপেক্ষা করে চলে গেল ক্লাবে।

ডিটেকটিভ বই-পড়া অতি উৎসাহী ছেলেটি ক্লাবে গিয়েই সকলকে জানালো যে, নীতীশের অস্পষ্ট কথায় জানা গেল সে কাকে গুম-খুন করে পালিয়ে এসেছে। সবাই এ-ওর মুখপানে চাইল। নীতীশের অকস্মাৎ গ্রামে আবির্ভাব, নিজের বাড়িতে চোরের মতো ঢুকে-পড়া এবং তার পরই এতোবড় অসুখ—নিশ্চয় এর পিছনে কোনো গভীর রহস্যের ইঙ্গিত করছে! তারপর 'দিব্যেন্দু' নামক ব্যক্তির বিজ্ঞাপন। খুন, চুরি অথবা নারী-ঘটিত কোনো সাংঘাতিক ব্যাপার আছেই নীতীশের এমন-করে-এসে অসুস্থ হয়ে পড়ার মধ্যে। অতএব 'গুম্-খুন' কথাটা শুনে ওরা কেউ অবিশ্বাস করতে পারলো না। কাগজের অফিসে গিয়ে যারা দিব্যেন্দুবাবুর ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে নীতীশের অসুখের কথা জানাতে চেয়েছিল, তারাও থেমে গেল। বলল,—যে-কদিন অসুস্থ আছে, থাক্ পড়ে। পুলিশ তো এসে ধরবেই! আমরা কেন আর ধরিয়ে দিতে যাই।

নীতীশকেও বিজ্ঞাপনটা দেখানো আর কেউ প্রয়োজন মনে করছে না। তবু একজন বলল—বিজ্ঞাপনে আত্মসর্পণ করবার কথা আছে। নীতীশ পথ্য পেলে ওকে আত্মসপর্মণ করবার অনুরোধ করবে তারা। কিন্তু অনেকের মত যে সে সময় অতীত হয়ে গেছে। হয়তো

পুলিস জেনেছে ব্যাপারটা। এবার থানায় গিয়ে ওকে আত্মসমর্পণ করতে হবে!

নীতীশের প্রতি স্নেহ-মমতা অন্তর্হিত হয়ে গেল সকলের! মানুষের নৈতিক জ্ঞান এমনি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যে, খুনীকে কেউ ভালবাসতে পারে না। তবু ওরা নীতীশের ওষুধ-পথ্যের জন্য ভালই ব্যবস্থা করলো। গ্রামের একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোককে রেখে দিল ওর সেবা যত্ন করবার জন্য। মেয়েটির নাম নাটেশ্বরী, ডাকনাম নাটু। বালবিধবা। সুশ্রী, স্নেহপরায়ণা।

নীতীশ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওর শরীর-মনে একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেছে যেন! চেনা যায় না নীতীশকে। উঠে বসবার শক্তি নেই। কিন্তু নাটু ওর খুব যত্ন করে। ওষুধ-পথ্য ঠিক সময়ে খাওয়ায়। বেশী কথা বলায় না। নিজের মা, বোনের মতই দেখে নাটু ওকে। বালিশে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দেয়। বেশী বই পড়তে দেয় না। নীতীশ বসে বসে শুধু ভাবে।

গ্রামের ছেলেরা কোথাও যাবার পথে নাটুকে প্রশ্ন করে,

—নীতীশ কেমন রয়েছে, নাটুদি?—পথ থেকেই প্রশ্ন করে তারা।

—অনেক ভালো গো দাদাবাবু—নাটু জবাব দেয়। চলে যায় প্রশ্নকারী। নীতীশ বলে,

—কে নাটু? কে ছিল?

—ঐ যে গো, ওপাড়ার রাজেন-দাদাবাবু।

—ভেতরে এলো-না কেন? ডাক্ ডাক্—

—আসবে না, বাবু! চলে গেছে। নিজের কাজ নিয়ে ঘুরছে সব!

নীতীশ নিঃশব্দে বসে ভাবতে থাকে, গ্রামের কেউ তাকে দেখতে আসে না! কেন আসে না? নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। কী সে কারণ? কিছুই ওর মনে পড়ে না। মনে করবার চেষ্টা করে নীতীশ : কোথা থেকে সে এখানে এলো, কখন তার অসুখ হোল? কিন্তু না, কিছুই মনে পড়ে না! আচ্ছন্নবৎ পড়ে থাকে সে। নাটুও তাকে বলে না কিছু।

ডাক্তার দেখতে এলেন। নীতীশ আজ অনেকখানি সুস্থ। শুধালো.

—আমার সারতে আর কতদিন লাগবে, ডাক্তারবাবু?

—সেরে তো গেছেন। এখন মনে করুন তো, কেন আপনি কলকাতা থেকে এলেন?

—কলকাতা থেকে! হ্যাঁ—কলকাতায় ছিলাম আমি—না? এলাম বাসে চড়ে।

—বাসে চড়ে কেন? ট্রেনে আসেননি?

—না...হ্যাঁ...না, বাসে চড়েই তো এলাম! আমার মনে হচ্ছে বাসে চড়ে এসেছি...

ডাক্তারবাবু নিরাশার সুরে বললেন,—আপনি কোত্থেকে কখন বের হয়েছিলেন, কেন হঠাৎ দেশে এলেন, ওখানে কি করছিলেন—সব মনে করবার চেষ্টা করুন। ধীরে ধীরে ভাবুন, বুঝলেন? আপনার কলকাতা থেকে এখানে চলে আসার মূলে কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?

—হ্যাঁ—না না, কি জানি। হ্যাঁ, আছে! আছে কারণ।

—কী সেটা?

নীতীশ ভাবছে...

ডাক্তারবাবু উত্তর না পেয়ে আবার বললেন,—কী সে কারণ? পালিয়ে এসেছেন? সরকার-বিরোধী কিছু? ব্ল্যাক মার্কেট? চুরি? জাল-নোট ছাপার ব্যাপার? কোন খুন-খারাপি? নারী-ঘটিত কিছু?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, নারী ঘ-টি-ত...নারী-নারী—চুরি-চুরি করে...না ডাক্তারবাবু, মনে পড়ছে না।

—মনে করবার চেষ্টা করুন। আস্তে আস্তে ভাবুন, কলকাতা থেকে তাপসীপুর কখন এলেন, কেন এলেন?

নাটুকে পথ্যাদির উপদেশ দিয়ে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। নাটু ওকে খাবার দিতে দিতে বলল,—ওসব এখন ভেবো না, দাদাবাবু। ভাল হও তারপর দেখা যাবে।

—হ্যাঁ, ভাল হই তারপর দেখা যাবে!—নীতীশ শুয়ে পড়লো চোখ বুজে।

নাটু ওকে হওয়া করতে লাগলো। মাথায় হাত বুলুচ্ছে।

কিন্তু নীতীশ ঘুমায়নি। সে ভাবছে। প্রাণপণ চেষ্টায় ভাবছে; স্বপ্নে-পাওয়া আশার বর-তনুর মধুর স্পর্শ ভুলতে পারছে না নীতীশ। সেই পরশটাই ওর মানসলোকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে—সত্য হয়ে উঠছে...ভাবছে...কোনো একটা মেয়েকে যেন সে ছুঁয়েছিল...তার মাথা কোলে নিয়ে,...হ্যাঁ, কি সব কথা হয়েছিল দুজনে।...

নীতীশ কলকাতায় পড়তো। না, পড়তো না, টিউশনী, না হোমিওপ্যাথি—না...বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের গবেষণা করতো। উঁহু, নীতীশ হোমিওপ্যাথি করতো...না না, করবে এখানে, এই তাপসীপুরে! তাই এল এখানে...না কোনো মেয়েকে যেন ধরেছিল নীতীশ...কার যেন অসম্মান করেছে...না...ও কার কি যেন চুরি করেছে...

চুরি করেছে! না তো। নীতীশ চুরি করতে পারে না। নীতীশ=নীতি+ঈশ। সে কেন চুরি করতে যাবে! নীতীশ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে এসেছে, এখানে। করবে চিকিৎসা। একটু ভাল হলেই আরম্ভ করবে। আবৃত্তি করলো,

—অ্যরমে গভীর চেষ্টা, অস্থিরতা জ্বালা—উঁহু, অ্যরমে...অ্যরমে...অ্য-র-মে...নাঃ, মনে পড়ছে না নীতীশের।

পাণ্ডুর মুখে নীতীশ জামরুল গাছটার দিকে চেয়ে রইল।

উঠানের সেই তক্তাপোষটায় শুয়ে ছিল কুমকুম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। প্রদীপও জ্বেলেছে রোজকার মতই। কিন্তু কেন আর ওসব করা? কার জন্য! রমানাথ কোনোদিন তাকে বধূর সম্মান, অন্তত আধা-গৃহস্থের সম্মান দেবে এমন বিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই। জীবন এবং যৌবন অনর্থক এখানে অপব্যয় করছে কুমকুম!

পাশ ফিরে শুলো। এ সময়-শুয়ে থাকবার কথা নয়, এবং শরীরও সুস্থ আছে ওর। কিন্তু শুয়েই ভাবতে লাগলো। রমানাথ 'কল'-এ গেছে বর্দ্ধমানের বাইরে কোন্ এক পল্লীগ্রামে। রমানাথের মতো হাতুড়ে হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের বাইরের কল পাওয়া খুবই আশ্চর্য্যের কথা। কিন্তু রমানাথ পায় এরকম। কতকগুলো বিশেষ ধরনের রোগের ও ভাল চিকিৎসা জানে, যার ওষুধ সাধারণ ডাক্তাররা জানেন না। যেমন ভূত-ছাড়ানো, পেঁচোয়-পাওয়া, মারণ-জারণ-বশীকরণ। সহরে এ-সব রোগ খুব কম হয়, কিন্তু পল্লীতে এরকম রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী,—তারাই রমানাথকে 'কল' দেয়, পয়সাও দেয়। মোদ্দা কথা, রমানাথের দৈনিক রোজগার আট-দশ টাকা। এর কম হলে সে খুবই খুঁৎখুঁৎ করে।

খুঁৎখুঁৎ করাটা ইদানিং বড্ড বেড়েছে রমানাথের—এই আট-দশ দিন। 'কুমকুম কেন চলে যেতে পারলো না নীতীশের সঙ্গে? কেন গেল না!'—এই রমানাথের অভিযোগ।

কারণ তার ধারণা, নীতীশকে কুমকুম নিশ্চয় জালে ফেলতে পেরেছিল, তবু সে গেল না নীতীশের সঙ্গে—কারণ কি? নীতীশ বিদ্বান-বুদ্ধিমান, এবং নিশ্চয়ই একদিন জীবনে উন্নতি করবে। তাপসীপুরে অজানা পল্লীতে কুমকুমকে নিজের বিয়ে-করা বৌ বলে পরিচয় দেওয়া নীতীশের পক্ষে কিছুই কঠিন হোত না। রমানাথের পক্ষে এখানে সেটা সম্ভব নয়—কারণ কুমকুম বর্দ্ধমানে জন্মেছে, মানুষ হয়েছে—তাকে এখানকার বহু লোকই চেনে। এখানে তাকে বধূর মর্য্যাদা দেওয়া রমানাথের পক্ষে অসম্ভব।

এতসব কথা গোপনে আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও কুমকুম গেল না নীতীশের সঙ্গে। অথচ কুমকুমের কাছ থেকেই রমানাথ জেনেছে যে, নীতীশ তাকে নিয়ে যাবার কথা বলেছিল—বধূর মর্য্যাদা দিতেও রাজী ছিল নীতীশ। রমানাথের বেশ মেজাজ-খারাপ হবার এই কারণ।

কিন্তু কুমকুম গেল না নীতীশের সঙ্গে। কেন গেল না, জানে কুমকুম। নীতীশকে দেবার মতো হয়ত তার কিছু থাকতে পারে, কিন্তু নীতীশের কাছ থেকে কিছুই তার পাবার নেই। কারণ নীতীশ দেউলে! তবু কেন কুমকুম ভাবছে নীতীশের কথা? কে জানে। কুমকুম না-ভেবে পারছে না। ভাবছে কুমকুম শুয়ে-শুয়ে।

তার ক্ষুদ্র জীবনের বেষ্টনীতে যে-কয়জনকে দেখেছে কুমকুম, তার মধ্যে নীতীশই একমাত্র পুরুষ, যে—নারীর মর্য্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে না। একমাত্র 'হৃদয়' ওই নীতীশেরই দেখলো কুমকুম—যে, প্রেমাস্পদকে সুখী করবার জন্য নিজের সব ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাকে মুছে দিয়ে পল্লীতে ফিরে এল হোমিওপ্যাথী করতে। নীতীশই তার জীবনে একমাত্র মানুষ যার নারীদেহের প্রতি লালসা অপেক্ষা নারীর অন্তরের প্রেমের প্রতি লোভ সমধিক! কিন্তু নীতীশের হৃদয় অন্যত্র বন্দী!

দীর্ঘ একটা শ্বাস ছাড়ল কুমকুম। চিৎ হয়ে আকাশের পানে তাকালো। নীল নিথর আকাশ অগণ্য-তারকাপুঞ্জ-ঝলমল। ঐ নির্মলতা তো কুমকুমের দেহে-মনে ফিরবে না আর! তবু নীতীশকে দেখে তার রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়েছিল :

—"নিমেষে ধৌত নির্মল-রূপে বাহিরিয়া এল কুমারী নারী—"

কিন্তু হৃদয়ে সে যতই 'কুমারী' থাক্, বাহিরের কৌমার্য্যই মূল্য পায়। এমন কি, বাহিরের কৌমার্য্য থাকলে হৃদয়ের কৌমার্য্য দেখতেই চায় না কেউ বড় একটা। সকলেই ভাবে, ও ঠিক আছে!

বাহিরে কৌমার্য্য হারালেও কুমকুম যেন এতকাল অন্তরে কুমারী-ই ছিল...হ্যাঁ ছিল!—এখন আর নাই নাকি। কেন থাকবে না! রমানাথের নির্দেশমত নীতীশের সঙ্গে গোটাগুটিই তো অভিনয় করেছে সে। হ্যাঁ, সবই অভিনয়! সেকথাও জানিয়ে দিল নীতীশকে যাবার সময় : কুমকুম কুমারীই আছে! কুমকুমরা বিবাহিতা হয় না—ওরা চিরকুমারী, ওরা আদ্যন্ত 'মিস'...

থিয়েটারের পোষ্টারে-লেখা কথাগুলো মনে পড়ছে—

'রাজকুমারী চিত্রা—মিস্ কুমকুম' বিজ্ঞাপন দিত থিয়েটারওয়ালা। থিয়েটারেই আবার ফিরে যাবে নাকি কুমকুম? গেলে মন্দ হয় না। রমানাথের কাছে আর থাকা যাবে না। টাকাগুলো তো নিয়েছেই, এখন গয়না ক'খানা আবার না নেয়! তাছাড়া সময় এবং বয়স—যার মূল্য কুমকুমের কাছে অমূল্য, তাই অনর্থক নষ্ট হচ্ছে। বধূর মর্য্যাদা কোথায়,

পাবে কুমকুম? এদেশে ওসব পাওয়া যায় না! অথচ কুম্‌কুম্‌ কোন্‌ পত্রিকায় এক ভাল লেখকের লেখায় পড়েছে—এই দেশেই বারনারীর একটা বিশেষ সম্মান ছিল। রাজসভাতেও নাকি তাঁরা আসন পেতেন, রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দিতে। এই দেশেই স্বর্গ-বেশ্যা উর্বশীকে রাজা-পুরুষরা বিয়ে করে...থাক্‌, এসব ভেবে লাভ কিছু নেই। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের-যুগ শুধু নয়, বর্তমান যুগ ব্যথা-জানাবার-যুগও। দরিদ্রের জন্য ব্যথা জানাও, বাস্তুহারার জন্য ব্যথার ক্রন্দনে কাগজ ভর্তি করে তোলো ; অন্ধ, কুষ্ঠ, মূক-বধিরদের জন্য চাঁদার খাঁতা খোলো—আর কুমকুমের মতো অভাগীদের জন্য বই লেখো, আইন করো, উচ্ছেদ করো তাদের বৃত্তির—বুক চাপড়ে বলো 'ট্রাফিক ওভার উইমেন'!—'কী অন্যায়, কী অবিচার!' বলে বলে লোকচক্ষে আরো ঘৃণিত করে তোলো তাদের জীবিকাকে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তোমরাই তো আসবে রাত্রির অন্ধকারে!...

ওরা না থাকলে তোমাদের চলে না, তবু 'ট্রাফিক ওভার উইমেন' বলে তোমরা চেঁচিয়ে ব্যথা জানাবে! তাদের বৃত্তির উচ্ছেদ ঘটাবে, কিন্তু তাদের সামাজিক সম্মান দেবার ব্যবস্থা করবে না। চমৎকার!

কিন্তু এসব ভেবে কি হবে? কুমকুম তো বক্তা নয় যে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে তার অভিমত ; লেখিকা নয় যে, কাগজ-ভর্তি করে লিখে জানাবে তার অভিযোগ। কুমকুম অসহায়া এক ঝড়ে-ওড়া পাতা—তার গতি আছে, স্থিতি নেই—তার মন আছে, মান নেই, মর্য্যাদা নেই—তাকে নিয়ে বিহার চলে, চলে না সামাজিক ব্যবহার!...

উঠে বসলো কুমকুম—রান্না কিছু করে নেবে। অনর্থক না-খেয়ে থাকায় লাভ কি? শরীরটা ভাল রাখতে হবে। আর শরীর স্বাস্থ্যই একমাত্র সম্বল তার রোজগারের। হ্যাঁ, এটাই তো কিনতে আসে সব।...হাসলো কুমকুম। হাসলো আর ভাবলো 'কুমকুমরা' হাসে কেন। অন্তত একা যখন থাকে তখন তো ওদের হাসবার কোন কারণই নেই। ওদের জীবনে এমন কিছুই ঘটা সম্ভব নয়, যার জন্য ওরা হাসবে। হাসি নিশ্চয় ব্যঙ্গ ওদের নিজেদের উপর। তবু ওরা হাসে। অপরকে খুশী করতে হাসে হাসুক—নিজের মনে হাসে কেন?

রান্নাঘরে এল কুমকুম। কী রাঁধবে! রমানাথ বাড়ী থাকলে অবশ্যই ভাল কিছু রান্না করতে হোত—নিজের জন্য কে আর অত করে! আলু-সেদ্ধ ভাত-ই আজ খেয়ে নেবে কুমকুম। চড়িয়ে দিল।

মুরগী-মসল্লাম রান্না করলো নীতীশ সেদিন। রান্না না ছাই। ওর কি রান্না করার মতো মন আছে। সেই বান্ধবীর কথাই ভাবে দিনরাত। কী আশ্চর্য্য ভালবাসে ও সেই বান্ধবীকে। অসাধারণ প্রেমিক ছেলে! বান্ধবীটি কেমন কে জানে? তবে একজনের হৃদয়ে যে অমন করে আসন নিতে পেরেছে, সে নিশ্চয়ই সামান্য নয়! ভাগ্যবতী মেয়ে। একজনের হৃদয় তো পেয়েছে! কুমকুমের দেখতে ইচ্ছে করছে সেই মেয়েটিকে। 'আশা' নাম শুনেছে সে নীতীশের কাছে। কিন্তু নীতীশ ওকে ছেড়ে দিয়ে চলে এল!...কে জানে আরো কী ব্যাপার আছে ভেতরে!...

নীতীশের মতো প্রেমিক পুরুষ আর দেখনি কুমকুম এযাবৎ। ওর জীবনে যে-কেউ এসেছে—প্রেমের ভান করেছে প্রচুর, কথা বলেছে বিস্তর—কবিতাও করেছে অনেক! সব ভুয়ো, মেকী, মিথ্যে! কিন্তু নীতীশ সেদিন ওর মাথাটা তুলে নিয়ে যে-কটা কথা

বলেছিল...নাঃ, কুমকুম খামোখা এতো সব ভাবছে। প্রেম ওদের জীবনে হতে নেই—হওয়া অপরাধ!...

ভাতের হাঁড়িতে আরো খানিক জল ঢেলে দিয়ে কুমকুম বাইরে এসে বসলো একখানা মাসিক কাগজ নিয়ে। পড়ছে। গল্পগুলোই পড়ে, আর সব বাদ দিয়ে যায় কুমকুম। কিন্তু আজ ও একটা শক্ত প্রবন্ধ পড়তে—পড়তে আরম্ভ করলো 'বৈদিক যুগে নারী' এক পঞ্চতীর্থের রচনা—সংস্কৃত শ্লোকে কণ্টকাকীর্ণ, টীকা ভাষ্যে সুদুর্গম—পড়ে চললো কুমকুম। কিন্তু কি পড়ছে। আধঘণ্টা পরে ওর মনে হোল, কৈ কিছুই পড়ছিল না সে, অথচ চার-পাঁচ পাতা পড়ে গেছে। দূর! এ আবার নাকি পড়ে? কুমকুম পাতা উল্‌টে একটা কবিতা বের করলো! পড়ছে—

চাঁদের আলোতে পথ ভেঙে তুমি এলে
বলাকার মত সাদা অঞ্চল মেলে ;
ওষ্ঠে তোমার রঙ পাকা ডুমুরের—
চোখের কাজল ডীপ্ ব্লু কুইঙ্ক-এর ;
হাসিতে তোমার জিলেট্-ব্লেডের ধার,
শাড়ীতে তোমার 'এরিয়ান কাল্‌চার'!...

কবিতাটি ভালই লাগছিল কুমকুমের। আধুনিক যুগের কবিদের ভাষা কিন্তু চমৎকার, এখন বামপন্থীযুগ চলেছে সাহিত্যে—বাংলা সাহিত্য একটা নতুন রূপ ধরছে যেন! কিন্তু ভাত-ধরার গন্ধ আসছে। ভাত নামাতে-নামাতে ভাবছে—কী চমৎকার উপমা! হাসিতে জিলেট-ব্লেড! বাপ্‌স সে কেমন হাসি...

হেসে ফেললো কুমকুম নিজেই।

বোম্বাই-এ আশিসের অবস্থান খুবই সুখের হয়ে উঠতে পারতো ঐ বাঙালী পরিবারটির সাহায্যে। কিন্তু কাঁটার মতো একটা চিন্তা সর্বক্ষণ আশিসের বুকে বিঁধে থাকে—ঐ মহিলাটি আশাকে জানে। কতখানি জানে, খোঁজ করতেও যেন ভয় হচ্ছিল আশিসের। কিন্তু সে ভয় করলে কি হবে ; নন্দার মা-ই আশিসকে সেদিন জানিয়ে দিয়ে গেল আশা তার খুড়তুতো বোন—খুবই নিকট আত্মীয়া, রঙ্গ করবার জন্য সম্পর্কটা প্রথমেই তিনি বলেন নি! অতঃপর আশিসের অবস্থাটা অনুমান করবার মতো।

আসিস সব সময় ভয়ে-ভয়ে থাকে, কখন চন্দ্রিমা দেবী আশার সঙ্গে আশিসের ভাব ভালবাসা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করবে। এতাবৎ সেটা হাতে পায়নি নন্দিতার জন্য। সে প্রায় সর্বক্ষণটি আশিসের কাছে থাকে—তার সঙ্গে বেড়াতে যায়। আশিসও ইচ্ছে করে ধরে রাখে ওকে। আলাপের পরদিনই নন্দা বলেছিল,

—আপনাকে 'দাদা' বলবো ভেবে রেখেছিলাম, কিন্তু মাকে আপনি 'দিদি' বলায় মা বলল যে আপনি আমার 'মামা, হন।

—হুঁ, তারপর কি হোল?—আশিস প্রশ্ন করলো।

—তারপর 'মা' হচ্ছে একবার 'ম'-এর আকার, কিন্তু 'মামা' দুবার। তাহলে 'মামা'...মনে ডবল 'মা'। কেমন?

—হ্যাঁ, 'ডবল মা'!—হাসি চেপে আশিস জবাব দিয়ে বলল,—তাইতো তুমি মামার

বাড়ীর আব্দার চালাচ্ছো—

—উহুঁ—না! আপনি তো 'মামা' হলেন না! 'মেসো' হচ্ছেন যে!

—ও! হ্যাঁ!—মেসো মানে কি হবে, নন্দা?

কথার মানে খোঁজা মেয়েটার যেন রোগ, একটা নেশা! খানিক চুপ করে থেকে বলে দিল,—মেসো—মে—সো—শো—শো মানে দর্শন ; প্রদর্শন...অর্থাৎ মে-শো মানে শুধু দর্শন...আপনাকে আমি মামা-ই বলবো, মেসো আমার পছন্দ নয়...

—তোর পছন্দতে সম্পর্ক বদলে যাবে নাকি!—বলে ওর মা এসে দাঁড়ালো।

আশিস হাসছে। কিন্তু চন্দ্রিমা দেবী বলল,

—হেসো না, ভাই। সব কথায় মানে খুঁজবে—আর খালি বক বক করবে। কী যে স্বভাব ওর!

—ভালই তো স্বভাব দিদি।

—না। কিন্তু এর কারণ কি জান? মার-পেটে-জন্ম ওর বাংলায় আর মাটিতে পড়েছে...

—বোম্বাই-এ!—আশিস হেসে বলল।

—না। বোস্টন-এ, আমেরিকায়। বড় হোচ্ছে বিলেত-দিল্লী-বোম্বাই-এ। বাংলায় ও গিয়েছিল বছর দুই আগে। মাসখানেক মাত্র ছিল। ওকে বাংলাভাষা শেখাবার জন্য কী কষ্ট আমাদের করতে হয়!

—হিন্দী তো রাষ্ট্রভাষা। সেটাই ভাল করে শেখান, দিদি।

—হ্যাঁ, হিন্দী ও শিখবে! কিন্তু বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলা রবীন্দ্রনাথের ভাষা—বাংলা আমাদের অন্তরের ভাষা, আশিস! সে ভাষা তো শিখতেই হবে, ভাই...চন্দ্রিমা দেবী বলেই যাচ্ছে।

হ্যাঁ নিশ্চয়!—আশিস বলল,—বাংলাভাষার প্রতি আপনার টান তো খুবই, দিদি।

—তোমার নেই নাকি?—বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করল চন্দ্রিমা দেবী।

—আমি বিজ্ঞান সেবক। আমার মনে হয়. ভাব-প্রকাশের যোগত্য থাকলেই—সেই ভাষা আমার আপনার। যেমন ইংবাজি...

—কিন্তু মাতৃভাষা মানুষের কাছে 'মা'—মা, দেশ মা, আর ভাষা-মা এক!

—উচ্ছ্বাসটা আমার কম, দিদি! ভাষাকে বাহন হিসাবেই দেখি আমি—মৃদু হেসে বলল আশিস।

—তোমার ভাবের বাহন মাথায় থাক্, ভাই, তিনি হয়তো গরুড় না-হয় বৃষবাহন—আমরা রবীন্দ্র-শিষ্যা, আমাদের ভাবের বাহন হংস। অর্থাৎ বাংলাভাষা। কিন্তু আশিস, একটা কথা শুধোবো?

—বলুন।—আশিস হেসেই বলল, কিন্তু মনে-মনে সে যথেষ্ট ভয় পেয়েছে।

—তোমার উচ্ছ্বাস কম, এখুনি স্বীকার করলে। আশার সঙ্গে তোমার মেলে কি করে তাহলে? সে অবশ্য উচ্ছ্বাস-প্রবণ নয়, কাব্য প্রবণ বলা চলে তাকে। তার সঙ্গে তোমার ভাব-ভালবাসা হয়েছে তো?

—আপনার কি মনে হয়, ভাব হয়নি?

—ঠিক তা নয়। তবে আশা অতি অসাধারণ মেয়ে। আমার মনে হয় বর্তমান যুগে ওর জুড়ি কম।

—কেন দিদি? কী সে এমন!—আসিস জেনে নিতে চায় আশা সম্বন্ধে চন্দ্রিমা দেবীর অভিমত।

—সে কেমন তা-তো বলে দিতে হবে না, ভাই! ও একেবারে প্রদীপের মতো, স্পষ্ট—খাঁটি ঘিয়ে জ্বলছে মন্দিরের কোণায়। ওকে তুমি আলেয়া বা ইলেকট্রিক আলো ভেবে কিছুতেই ভুল করতে পারবে না।

—আপনি তো ওর সম্বন্ধে খুব বড় সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, দিদি!—হাসলো আশিস।

—মোটেই না। সার্টিফিকেট ওর কোনো কাজে লাগবে না। ওকে চিনতে দু মিনিট দেরী হয় না! তুমি অল্পদিন ওকে দেখেছ, আর হয়তো তোমার গবেষণা নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলে, তাই আমার কথাটাকে 'সার্টিফিকেট' বলছো।

—না দিদি। আশা আমার মা'র নির্বাচিতা—আর, আমার মা ভুল করেন না!

—তাঁর নির্বাচনকে হাতজোড় করে নমস্কার করি আমি! শোনো আশিস, আমার থেকে প্রায় ষোল বছরের ছোট আশা, কিন্তু কী অসাধারণ তার ব্যক্তিত্ব! গতবার—বছর দুই আগে আমি যখন বাপের বাড়ী গেলাম, খোকাটা তখন পেটে—ওর বাবা আমাকে বিলাত নিয়ে যেতে যান। তাই কাকীমার কাছে, মানে আশার মার কাছে বলেছিলাম—'এসময় আমার অত দূরে দেশে যেতে ইচ্ছে করে না।' আশাওছিল সেখানে। সে আমার মুখপানে চেয়ে বলল,

—'সে কি, বড়দি! উনি যেখানে যাবেন তুমি সেখানেই যাবে। স্ত্রী স্বামীর ছায়া।'

—ছায়া কেন হতে যাব?—আমি প্রতিবাদ করেছিলাম আমার কথায়। তাতে ও বলল,

—'ও! ছায়া তুমি নয়? তাহলে স্ত্রী-ও নয়—তুমি মায়া মরীচিকা! তুমি তাকে দিক্ ভুল করিয়ে মজা দেখাবার জন্যই বিয়ে করেছ! ছিঃ বড়দি!...ওর সেই 'ছি, বড়দি', কথাটা আমি জীবনে ভুলবো না আশিস! আমি বললাম,

—আমার অসুবিধাটা দেখছিস নে আশা? তার উত্তরে আশা কিছু আর বলল না। কথাই কইল না। আমি আবার বললাম, কি করে যাব বল?

—'ছায়া হলে, যাবে। ছায়া কখনও কায়া-ছাড়া হয় না। মায়ারা, মরীচিকারাই কায়া ছাড়া থাকে।'

আমি বললাম আমার শারীরিক অসুবিধা ; তার উত্তরে ও বলল—'শরীরটা আর তোমার নয়। যাঁকে দিয়েছ, তিনি তা দেখবেন!'

আশিস নিঃশব্দে শুনছিল। বাইরে সে হাসি-মুখই দেখালো, কিন্তু ভেতরটা ওর পুড়ে যাচ্ছে! উঃ! কী অপরূপ সু-অভিনেত্রী ঐ আশা? বিলেত-আমেরিকা ফেরত শান্তিনিকেতন শিক্ষিতা চন্দ্রিমা দেবীকে মুগ্ধ করে দিয়েছে ; কিন্তু চন্দ্রিমা-দি যদি জানতেন আশার কীর্তি তো, সারা পৃথিবীতে ঘৃণা রাখবার জায়গা পেতেন না। চমৎকার অভিনয় করতে পারে আশা কিন্তু! সর্বদা সর্বত্র সে অভিনয় করে! কেমন স্বামীপরায়ণতাটি ফুটিয়ে তুলেছে এই চন্দ্রিমাদির কাছে! ওঃ!

—ওকে সঙ্গে আনলে না কেন, আশিস? আমি লিখে দেব আসতে?

না-না-না,—আশিস তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—আমার মা একা থাকবেন। মা'র আর কেউ সঙ্গী নেই, বড়দি!—বলে আশিস যেন আত্মরক্ষা করলো।

নন্দা-বেচারা এদের কথার মাঝখানে কোথাও ঢুকতে পারছিল না। জানালার কাছে

দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিল। এতোক্ষণে কাছে এসে বলল,

—আমারও তো সঙ্গী চাই একটা।

—আমিই তো রয়েছি।—বলল আশিস।

—উহুঁ।—মাথা নেড়ে বলল নন্দা,—আপনি তো মার সঙ্গেই কথা বলেন।—মা তুমি লিখে দাও না আশা-মাসিমাকে আসতে। খুব মজা হবে।

—দিল্লীতে গিয়ে লিখবো। চল, তোর মেসোমশাইও তো যাচ্ছে দিল্লী!

চন্দ্রিমা দেবী বলল—কিন্তু আশিসের এখন দিল্লী যেতেও ভয় করছে। বৈকালিক চা খেতে খেতে এইসব কথা হওয়ার পর চন্দ্রিমা দেবী বলল,

—চলো একটু বেড়িয়ে আসা যাক্—

—না, বড়দি! আমাকে একবার ডাঃ চিন্তামনের কাছে যেতে হবে।

মিথ্যা কথা বলল আশিস। নির্জলা মিথ্যে বলল। কারণ, ওর সব সময় ভয় করছে কখন চন্দ্রিমা দেবী আবার আশার কথা পাড়বেন! এখান থেকে পালাতে পারলে যেন বাঁচে আশিস! কিন্তু পালাবে কোথায় এঁরা দিল্লীরই লোক—ওখানেও আশিসকে চন্দ্রিমা দেবী ছাড়বেন না আশার কথা শুনতে। আশাকে ওখানে ডেকে-আনাও ওঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। এমন জানলে এ হোটেলে উঠতোই না আশিস। কী আর এখন করা যাবে!

ভাবতে ভাবতে পথ চলছে আশিস। ডাঃ চিন্তামনের বাড়ী নয়, সেখানে আজ কোনো কাজ নেই তার। কিন্তু কোথায় যাবে! অচেনা বোম্বাই। অপরিচিত মানুষ সব। আশিস বড়ই অস্বস্তি বোধ করছে। সেই দয়ালচাঁদকে পেলে বাঁশী শোনা যেত খানিক। ওর অন্তরের দুঃখটা অনুভব করছে আশিস। বিয়ে করা বৌ ঠাট্টা করায় লোকটার এই দুর্দশা। মানুষের জীবনে কত ব্যাপারই না ঘটে!

কিন্তু ঘটনার উপর কোনো হাত নেই মানুষের! চন্দ্রিমা দেবীর সঙ্গে এখানে এসে আলাপিত-হওয়া একটা ঘটনা। কিন্তু আশিসের কোনো হাত নেই তাতে। এ যেন নিয়তি। আশার চিন্তাটা ভুলে যেতে চায় সে—কিন্তু ভাগ্য ওকে ভুলতে দিচ্ছে না! সব ঘটনাই এমনি।

ভাবতে-ভাবতে চলছিল, হঠাৎ একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো—

—ও, স্যরি!—বলে সরে গেল লোকটি। আশিস চেয়ে দেখলো, দয়ালচাঁদ-ই। একেই বলে ভাগ্য! এমনি সব ব্যাপার যদি চাইবামাত্র পাওয়া যেতো!

—দয়ালচাঁদবাবু?—আশিস ডাক দিল জোরে। তৎক্ষণাৎ ফিরে দয়াল বলল,

—ক্যা? আপ্ পছান্‌তে? ও' আপনি সেই বাঙালী আছে। কী খবর?

—কোথা যাচ্ছেন?—আশিস প্রশ্ন করলো।

—আ-সেন, আপনাকে নিয়ে যাব জলসায়। আসেন-আসেন—টান দিল দয়াল ওর হাত ধরে। আশিসও চললো।

খানিকটা এসে এক বড় বাড়ী। দয়াল ঢুকলো আশিসকে নিয়ে। নাচ-গান বাজনার জলসা হবে। বিরক্ত লাগছে আশিসের। কিন্তু দয়াল ওকে ছাড়বে না। নিরুপায় আশিস বসে রইল। শেষ হলে ফিরবার পথে আশিস ভাবছিল—সমস্তক্ষণটা সে আশার অভিনয়-নৈপুণ্যের কথাই ভেবেছে-নাচ-গান কিছুই শোনা হয়নি।

এমন করে অন্তরে বিষ পুষে রাখলে সে বাঁচবে ক'দিন ; এর একটা ইতি করা দরকার।

কিন্তু কী সে করতে পারে। হোটেলে ফিরতেই চন্দ্রিমা-দেবী প্রশ্ন করলো,

—ডাঃ চিন্তামন কি বললেন, ভাই? কবে যেতে হবে দিল্লী?

—দিন ঠিক হোল না। আপনারা কবে যাচ্ছেন?

দিন সাত পরে। তোমাকে নিয়ে একসঙ্গেই যাব ভেবেছিলাম।

তা আর হোল কৈ! আমাকে হয়তো মাদ্রাজ যেতে হবে। কোথায় যে যাব, কে জানে! তাই ভাবছি বিলাত চলে যাই।

—তোমার মার মত চাই তো? আর, আশারও চাই। নাকি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

—না ও মার কাছেই থাকবে—বলে আশিস নিজের ঘরে এল।

অগাধ চিন্তায় ডুবে গেল আশিস। দিল্লী-ই ওকে যেতে হবে। কারণ ডাঃ চিন্তামান তারই ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু চন্দ্রিমা-দেবীর সম্পর্কটা যে ওখানেও যাবে!—এই আশিসের ভাবনা। অবশেষে পরদিন বাক্স-বিছানা বেঁধে আশিস মাদ্রাজ চলে গেল। চন্দ্রিমা দেবীকে বলে গেল—'দিল্লী পৌঁছে দেখা করবো।'

বোম্বাই ছেড়ে যেন বাঁচলো আশিস।

দিবেন্দুবাবুর বিজ্ঞাপন যথারীতি খবরের কাগজে বেরুনোর পর আরও কয়েকদিন কেটে গেল, নীতীশের কোনো খবর এল না। সে একখানা চিঠি লিখেও তো ক্ষমা চাইতে পারতো! কিন্তু ও সত্যিকার চোর, সত্যিকার অপরাধী। ক্ষমা চাইতে আসবে কেন? থিসিস্‌খানা সে নিশ্চয় নিজের কাজে লাগাবার ধান্ধায় ঘুরছে, অথবা এরই মধ্যে লাগিয়েছে কোথাও কিছু—এই ধারণা বদ্ধমূল হোল ডাঃ দিব্যেন্দুর মনে।

আশাকে পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে তিনি চিন্তা করেন—এই ল্যাবরেটরী আশিসের বাবা এবং তিনি তৈরী করেছিলেন। এখানে কত বিনিদ্র-রাত্রি কেটেছে তাঁদের বিজ্ঞানচর্চ্চায়। তারপর আশিসকে নিয়েও কত দিনকতক রাত তিনি এখানেই কাটিয়েছেন। এখন আবার তাঁর পুত্রবধূকে বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন এই ল্যাবরেটরীতেই। কিন্তু কী হোল! এ পর্যন্ত এই ল্যাবরেটরী থেকে ভাল কিছু বের হোল না। ল্যাবরেটরীর মূক-যন্ত্রগুলোকে যেন অভিশাপ দিতে থাকেন দিব্যেন্দুবাবু! জড় যন্ত্রগুলোকে ওঁর জঞ্জাল বলে মনে হয়।

আশা কিন্তু আশ্চর্য্য যত্নে রক্ষা করে চলেছে যন্ত্রপাতি। ঝাড়া-মোছা থেকে আরম্ভ করে সাজানো পর্য্যন্ত—দেখে মনে হয়, যেন পূজার নৈবেদ্য সাজাচ্ছে! ওর মতো শিক্ষানবীশ বৈজ্ঞানিকের কোনোই কাজে লাগে না এসব জটিল যন্ত্র। কিন্তু প্রতিদিন সে তাদের যত্ন করে যথাসাধ্য। দিব্যেন্দুবাবু দেখেন আর এই পরম নিষ্ঠাবতী বালিকাটির উপর 'অগাধ' স্নেহের-সমুদ্র উদ্বেল হতে থাকে তাঁর মনে। মনে মনে বলেন—'বৌঠানের নির্বাচন সত্যি আশ্চর্য্য!'

থিসিস্-চুরির কথাটা আশাকে সম্পূর্ণভাবেই গোপন করা হয়েছে। কারণ ওরকম একটা চুরির ব্যাপার জানলে আশা অত্যন্ত কষ্ট পাবে। নিজেকে 'অপয়া' ভাববে। কিন্তু দিব্যেন্দুবাবু সেদিন কথায়-কথায় বললেন,

—আশিসের চিঠিপত্র তুই পেয়েছিস্, মা? কবে সে আসবে, কিছু লিখেছে?

—না, কাকাবাবু! ওসব তিনি আপনাদের লিখবেন। আমাকে কেন?

'আমাকে কেন' এই ছোট্ট কথাটুকুর মধ্যে যেন পুঞ্জীভূত অভিমান জমাট বেঁধে রয়েছে।

কিন্তু ডাঃ দিব্যেন্দু সেটা এড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন,

—ও বোম্বাই থেকে মাদ্রাজ চলে গেছে। হয়তো কোনো সুবিধে পেয়েছে। কিন্তু মাদ্রাজে গিয়ে কি করবে সে, আমি বুঝতে পারছি না, মা!

—আমি তো আরো-ই বুঝবো না, কাকাবাবু।

—তুই নীতীশকে জানিস, মা? নীতীশ আশিসের বালাবন্ধু।

—না, কাকাবাবু। ওঁর কোনো বন্ধুকেই তো জানি না আমি...

ডাঃ দিব্যেন্দু আর কিছু বললেন না। পড়াতে আরম্ভ করলেন। বিজ্ঞানের প্রাথমিক পড়াগুলোই তাঁকে পড়াতে হয়। আশা খুবই বুদ্ধিমতী। কিন্তু বুদ্ধিটা তার সাহিত্য-বিষয়ক। বিজ্ঞানও বুঝবার চেষ্টা সে করছে প্রাণপণে। কিন্তু বড় কঠিন লাগে। বলল,

—আমি কি বিজ্ঞান শিখতে পারবো কোনোদিন, কাকাবাবু?

—কেন পারবি না, মা? মানুষ কী-না পারে? আমি তোকে ভাল বৈজ্ঞানিক করবো। অবশ্য, সময় কিছু বেশী লাগবে।

—আপনার কত সময় নষ্ট করছি।

—সন্তানের জন্যই তো বাবা-মা'র যা-কিছু মা। তোকে আমার সব বিদ্যে দান করে যাব।

—আপনার সব বিদ্যে আমার মাথায় ধরবে তো, কাকাবাবু! আশা হাসে।

—ঠিক ধরবে। শোনো, পদার্থকে ভাঙতে-ভাঙতে বৈজ্ঞানিক..

পড়ানো আরম্ভ করলেন ডাঃ দিব্যেন্দু।

কালিচরণ ট্রে-ভর্তি চা-খাবার নিয়ে এল। পিছনে মা। এসেই প্রশ্ন করলেন.

--আশিস মাদ্রাজ কেন গেল, ঠাকুরপো?

—সেই কথা তো আমিও ভাবছি, বৌঠান। হয়তো ওখানে কোনো সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু সে-কথা তার লেখা উচিত ছিল।

আমার মনে হচ্ছে, ঠাকুরপো—আশার পানে চাইলেন মা—বললেন,—আশিসের মন এখনও মেনে নিতে পারছে না দুঃখটা। আপনার কি মত?

—দুঃখ তো বড় কম নয়, বৌঠান! তাকে মেনে নেওয়া সহজও নয়। তবে আমার বিশ্বাস, আশিস ও-দুঃখ সয়ে যাবার শক্তি রাখে। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক্, বৌঠান। আমি আশিসকে আজ চিঠি লিখবো বাড়ী ফিরতে।

দুজনেই দেখছেন, আশার মুখখানা দুশ্চিন্তায় পাংশু হয়ে গেছে। পাতলা ঠোঁট দুটি যেন কাঁপছে ওর। মা বললেন,

—তোর এসব নিয়ে মাথা ব্যথা কেন! এসব আমাদের বৈষয়িক কথা, মা।

—কি হয়েছে, মা।—আশা ওঁর কোল ঘেঁষে এসে বলল,—আমি কি জানতে পারি না সে-কথা?

—না, মা! তুই ওসব কথা জেনে কি করবি? যা, ভেতরে যা!

আশা তবু আধমিনিট দাঁড়িয়ে থাকলো। দিব্যেন্দুবাবু বললেন,

—এমন কিছুই নয়, মা—আশিসের 'ডক্টরেট' নিয়ে ব্যাপার—

আশা আস্তে আস্তে চলে গেল। কিন্তু ওর অসাধারণ বুদ্ধি ওকে বুঝিয়ে দিল এরা কিছু একটা লুকোচ্ছেন আশাকে। কী সে বস্তু? কেন আশাকে লুকোনো হচ্ছে! অন্দরের পথে

আসতে আসতে আশা এই কথাটাই ভাবছিল। আশিসের অকস্মাৎ বোম্বাই যাওয়াকে সে গবেষণা-সংক্রান্ত কিছু বলেই মেনে নিতে চেয়েছে। কিন্তু তার যাবার সময়ের ব্যঙ্গোক্তি—'অতিভক্তি' বার বার যেন বুঝিয়ে দেয় আশিসের আকস্মিক গৃহত্যাগের মধ্যে আশাও নিশ্চিত জড়িত আছে। আজ সে বুঝলো আশিসের গৃহত্যাগের বড় কারণটা আশা-ই। নইলে মা বা কাকাবাবু অত করে তাকে কথা লুকোতে চাইবেন কেন? কিন্তু আশা কী অপরাধ কোথায় করলো! তাকে কি পছন্দ হয়নি আশিসের? অথবা সে মডার্ন নয় বলে, কিংবা রূপটা তার উর্বশীর মতো নয় বলে:..কত কি যে ভাবতে লাগলো আশা, নিরাকরণ হয় না।

অন্দরে ওর কোনো কাজ নেই। খবরের কাগজ সকালেই পড়া হয়েছে বিজ্ঞানের বই পড়তে এখন আর ভাল লাগবে না। করবে কি আশা? গানও আজকাল বেশী গায় না সে। ওর চিন্তা-বিক্ষিপ্ত মনকে কোথাও স্থির করতে পারছে না! ওর বিবাহিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও স্মরণ করতে লাগল।..

ঘড়িটা আজও পড়ে আছে তার কাছে। আশিস নেয়নি। আশার বাবার-দেওয়া ঘড়ি, তাই বুঝি নিল না। বাবার সম্প্রদান-করা আশাকেই নিল না...তা ঘড়ি! চোখ ফেটে জল আসছে ওর।

আশাকে ভিতরে-পাঠিয়ে মা বললেন দিব্যেন্দুবাবুকে।

—ওর কাছে কথাটা বলা আমাদের ঠিক হোল না, ঠাকুরপো! কিন্তু আশিসের কাণ্ড দেখে আমার মনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। আজ বিশ দিন সে গেছে—আমাকে দশখানা চিঠি লিখলো, কিন্তু আশাকে একখানাও না। আমি ধরতে পারছি না, কী এর কারণ!

ওদের ভাব-সাব হয়েছে কিনা, আপনি জানেন বৌঠান?

—না-হবার তো কথা নয়, ঠাকুরপো! আজকালকার লেখাপড়া-জানা ছেলে-মেয়ে আর আশা আমার অত ভাল মেয়ে!

মার কণ্ঠস্বর স্নেহে, সহানুভূতিতে অস্পষ্ট হয়ে উঠলো। আশার ব্যথা যেন তিনি নিজের অন্তরেই অনুভব করছেন! আবার বললেন,

—অমন মেয়ে আর দেখিনি, ঠাকুরপো—ও এ-যুগের নয়। ও যেন তপস্বিনী উমা। আপনি শুনলে অবাক হবেন, ঠাকুরপো, অত অল্পবয়সী মেয়ে—ভাল করে গয়না-কাপড় পরে না, স্নো-পাউডার তো ছোঁয় না একেবারে! ভাল খাবার পাতে দিলে খায় না। আমি গোপনে দেখেছি আশিসের একখানা ফটোর সামনে বসে থাকে, আর ঝরঝর করে জল ঝরে চোখ দিয়ে! কী হবে, ঠাকুরপো! মেয়েটা হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়বে...

—দিনকতক বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন, বৌঠান।

—ও যাবে না, ঠাকুরপো! সেদিন আমি বললাম—'মন-খারাপ করছে তো, যা, দু-চারদিন বাপের বাড়ী ঘুরে আয়!' তাতে বলল.

—'বাবা আমাকে আপনার সেবায় সঁপে দিয়েছেন, মা! সেখানে আমার তো আর কিছু কাজ নেই!'...শুনে আমি থ' হয়ে গেলাম।

—অসাধারণ মেয়ে!—বললেন দিব্যেন্দুবাবু।

—আপনি ওকে একটু 'সাধারণ' করে দিন, ঠাকুরপো—আমার ভয় করছে! মনে হয় ওর মনে তিলমাত্র ব্যথা দিলেও আশিসের কল্যাণ হবে না...

—সে কি, বৌঠান...দিব্যেন্দুবাবু যেন চমকে উঠলেন—ওসব বলবেন না।

—বলছি, ঠাকুরপো—ওর আশ্চর্য্য স্বামী-নিষ্ঠা দেখে আমার কেবলই মনে হয়, ওর চোখের জলে মা-মহাসতীর আসনও টলে যাবে! ওর সঙ্গে আশিসের বিয়ে আমি না-দিলেই ভাল করতাম, ঠাকুরপো!

—না, বৌঠান, ওসব ভাববেন না। আশিস খুবই ভাল ছেলে। আপনার নির্বাচনের উপর তার অগাধ শ্রদ্ধা। হয়তো ব্যস্ত আছে—মনও ভাল নেই তাই আশাকে চিঠিপত্র লেখেনি। আচ্ছা, আমি খবর নিচ্ছি।—উঠলেন দিব্যেন্দুবাবু। বেরিয়ে গাড়ীতে চড়লেন এসে। কিন্তু মনটা যেন তাঁর নিদারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। এত সুন্দর একটা মেয়ে, যাকে সুখী দেখবার জন্য তাঁর সমস্ত প্রাণ উদগ্র-উন্মুখ!—আশিস তাকে অবহেলা করছে। অকারণেই করছে। তার থিসিস্-চুরির জন্য আশা তো দায়ী নয় যে, তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে আশিস! কিন্তু থিসিসের কথা মনে হতেই সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ল নীতীশের উপর। সেই হতভাগ্যই এ বিপর্য্যয়ের মূলে। দিব্যেন্দুবাবুর ইচ্ছে করছে এখুনি পুলিসে খবর দিয়ে নীতীশকে গ্রেপ্তার করান। কিন্তু স্বয়ং বৌঠান রাধা! নইলে তিনি কী যে করতেন, কে জানে! কিন্তু আশাকে দেখতে হবে। ওর অসুখ হলে দিব্যেন্দুবাবুর চলবে না। আশা তাঁর স্নেহের একমাত্র অবলম্বন। চলতি গাড়ীখানা আবার ফিবিয়ে এনে তিনি আশাকে ডেকে বললেন,

—ওবেলা ভগবান-বুদ্ধ জন্মোৎসবে আমার নিমন্ত্রণ আছে, মা—তোকে নিয়ে যাব। পাঁচটা নাগাদ তৈরী থাকিস্।

—থাকবো, কাকাবাবু!

—একটু ভাল গয়না-কাপড় পরবি, বুঝলি? তুই অতবড় লোকের বাড়ীর বৌ—

আশা ক্ষীণ হাসলো, কোনো জবাব দিল না। দিব্যেন্দুবাবু চলে গেলেন।

—একটু-বেড়িয়ে-চেড়িয়ে আয় মা,—নইলে অসুখ হয়ে যাবে!—মা বললেন।

আশা চুপ করেই রইল। বিকালে দিব্যেন্দুবাবু এসে ওকে নিয়ে গেলেন বুদ্ধ জন্মোৎসবে। আশা লালপাড় একখানা সুতীর শাদা শাড়ী পড়েছে। কান গলা আর হাতের মণিবন্ধে বারোমেসে গহনা-ক'টা। বিশেষ কোনো সাজই করেনি সে। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসবে ঐ শুভ্র-শাড়ীতে সজ্জিতা আশাকে যেন শ্বেতপদ্মের মতই সুন্দর দেখাচ্ছে! অতো অল্প সাজে অতো অপরূপ রূপ দেখা যায় না। শ্বেতপদ্ম অর্পণ করলো আশা ভগবান বুদ্ধের চরণমূলে। কিন্তু পিছিয়ে-পিছিয়ে ফিরে আসবার সময় সকলেই দেখলো তার আয়ত নয়ন অশ্রু-প্লাবিত! প্রত্যেকের মনে প্রশ্ন জাগলো :

—কে মেয়েটি? কে এই অসামান্য ভক্তিমতী!

—ডাঃ দিব্যেন্দু রায়ের সঙ্গে এসেছেন। হয়তো ওঁর আত্মীয়া।

'আশা গান করবে' দিব্যেন্দুবাবু বলে রেখেছেন।

সে গাইতে লাগলো—

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর..."

ওর কণ্ঠের সঙ্গীত জনমনকে অভিভূত করে দিল একেবারে! এমন আশ্চর্য্য কণ্ঠ কমই শোনা যায়। ওখানে একজন ছিলেন, যিনি গ্রামোফোনে গান রেকর্ড করান। সভা শেষ হলে তিনি দিব্যেন্দুবাবুকে বললেন,

—ওঁর কণ্ঠ অপূর্ব। যদি দু-একখানা 'গান' রেকর্ড" করান তো, ব্যবস্থা করতে পারি,

স্যার—আপনি একটু বলুন না!

—গান 'রকর্ড' করাবি রে মা?—আশাকে প্রশ্ন করলেন দিব্যেন্দুবাবু। আশা চুপ করে রয়েছে। দিব্যেন্দুবাবু চান যে, আশা অন্য-কিছুতে কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হোক। তাতে ওর মনের ভার অনেক লাঘব হবে। তাই আবার বললেন,

—দে-না, মা, দু-একখানা গান 'রেকর্ডে'। দিবি? আমি নিজে সঙ্গে নিয়ে যাব—

—না, কাকাবাবু। আমার গান শুধু পুজোর জন্যে। ওকে বিক্রি করতে আদেশ করবেন না! যাঁর জন্য আমি গান শিখেছি, তিনি-ই আজও...আশার চোখ থেকে ঝরঝর করে জল নামালো!

—থাক্ মা থাক্ থাক্! বুড়ো ছেলেকে তুই খুব শিক্ষা দিলি! আর কখনও একথা তোকে বলবো না আমি...আয়...

সবাই অবাক হয়ে গেল। ভদ্রলোকটি বললেন,

—এমন কিন্নরকণ্ঠী উনি, স্যার...

দিব্যেন্দুবাবু কঠিন কণ্ঠে বললেন,

—ও কিন্নরী নয়, গৌরী! ও তপস্বিনী উমা!

আশাকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন দিব্যেন্দুবাবু। সবাই অবাক হয়ে গেল।

গাড়ী বাড়ী পৌঁছাতেই দিব্যেন্দুবাবু আশাকে নামিয়ে দিয়ে বললেন,

—যা, মা—তুই বিশ্রাম করগে! বৌঠানের কাছে একটু বসি আমি।

আশা উপরে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে তার উঠে-যাওয়া দেখলেন ডাঃ দিব্যেন্দু।

—এ মেয়ে অতি অসাধারণ, বৌঠান—ওকে আমরা বাঁচিয়ে রাখবো কি করে। আমার মনে হচ্ছে...কী যে মনে হচ্ছে, বৌঠান! ওঃ,...আশিস এতোটা বর্বর।

—আশিস আপনার-ই হাতে গড়া, ঠাকুরপো।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি শিব গড়তে বাঁদর গড়েছি। সে একটা মর্কট। একটা জান্তুবান। একটা একটা যাচ্ছেতাই।—উত্তেজনায় কথা বেরুচ্ছে না ওঁর—

রাগে মুখ.চোখ লাল হয়ে উঠলো দিব্যেন্দুবাবুর।

—কিছু কারণ কি জানতে পারলেন, ঠাকুরপো? আশা কিছু বলেছে আপনাকে?

—না বৌঠান, না। ও কিছু বলবে না।—সিঁড়ির পানে তাকিয়ে বললেন,

—আশা আবার আড়ি পেতে নেই তো?

—না, ঠাকুরপো—ও সে-মেয়েই নয়। আদেশ অক্ষরে পালন করবে। ওকে যেতে বলা হয়েছে—কোন কারণেই সে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

—হ্যাঁ, বৌঠান—আমার আবার ভুল হচ্ছিল ওর সম্বন্ধে।—হ্যাঁ, শুধু জানতে পারলাম, ওর সঙ্গে আশিসের কোনো কথাই হয়নি—

—কি করে জানলেন? আশা বলল আপনাকে?

—না। ওর আশ্চর্য্য কণ্ঠের গান শুনে সভার সবাই মুগ্ধ হয়ে গেছে। রেকর্ডে গান দিতে অনুরোধ করলেন একজন। তাতে ও আমাকে বলল—'যার জন্য আমার গান শেখা, তাকেই আজও'...অর্থাৎ আশিস ওর একটা গান অবধি শোনেনি!—কথাটা আশা মনের আবেগে বলে ফেলেছে বৌঠান। কিন্তু ওতেই বোঝা যায় তার মনের অবস্থা কী সাংঘাতিক! কি এখন করা যায়, বৌঠান!

—আমি কি বলবো, ঠাকুরপো! আমার শুধু মনে হচ্ছে অত তাড়াতাড়ি কনে পছন্দ-করা আমার ভুল হয়েছে। আশিসের হয়তো ওকে মনে ধরেনি।

—মনে ধরেনি। 'হোয়াট ডু ইউ মীন টু সে? মনে ধরেনি। কী বলছেন আপনি! এ কি বাজারের 'আম' খরিদ, নাকি ওর বিজ্ঞানের বকযন্ত্র! একটা মানুষের জীবন-নিয়ে খেলা চলবে নাকি!

—তাই চলছে, ঠাকুরপো!

—চলতে দেওয়া হবে না, বৌঠান! আর কিছুদিন এভাবে চললে, আশা-মা শুকিয়ে ঝরে যাবে। একটা ফুটন্ত গোলাপ...না-না, বৌঠান, গোলাপ ও নয়। ও নিষ্কলক শ্বেত শতদল, অগাধ জলশায়ী, যার ধারে-পাশেও অগাছা জন্মাতে পারে না। একটু থেমে বললেন,—আশিসকে আমি ক্ষমা করতে পারছিনে, বৌঠান!

—করবেন না! তাকে শাস্তি দিন আপনি। কিন্তু কেন এমন হোল, তা তো জানা দরকার, ঠাকুরপো?

—হ্যাঁ, সেই কথাই ভাবছি। 'থিসিস্-চুরি' আশিসের বাড়ী থেকে পালানোর কারণ হতে পারে না, বৌঠান! বোম্বাই তার না-গেলে চলতো। মাদ্রাজে তার কোনো কাজ নেই। আমাকে আবার লিখেছে, মাদ্রাজ থেকে সে নাকি কন্যাকুমারীর দিকে যেতে চায়।

—সে কি, ঠাকুরপো! আমাকে তো ওসব লেখেনি?

—লিখবে হয়তো পরে। কিন্তু এভাবে তার পালিয়ে-বেড়ানোর মূলে অন্য কিছু নেই। আশাকে নিয়েই কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু...

—কিন্তু কী, ঠাকুরপো!—মা সাগ্রহে চেয়ে আছেন উত্তরের জন্য।

—কালিচরণকে প্রশ্ন করে আমি জেনেছি বৌঠান, থিসিস্-চুরির দিন সন্ধ্যায় নীতীশ এসেছিল ল্যাবলেটরীতে একা—আশা তখন ছিল ওখানে। হয়তো আশা কথা বলেছে নীতীশের সঙ্গে।

—যদি বলে থাকে তো, কী ক্ষতি হয়েছে, ঠাকুরপো! নীতীশ তো ছেলের মতই ছিল—আশা তাকে কোনো-কিছু বলে থাকতে পারে—

—না। আমি আশাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, সে নীতীশকে চেনে না। আশা মিথ্যে বলবে, আমি বিশ্বাস করি না, বৌঠান! আমার অন্য সন্দেহ জাগছে মনে।

—কী, ঠাকুরপো...

ডাঃ দিব্যেন্দু চুপ করে আছেন। ঘরে একটামাত্র আলো যেন অন্ধকার ছড়িয়ে দিচ্ছে চোখে তাঁদের। মা বললেন,

—কী সন্দেহ, ঠাকুরপো? বলুন। এখানে অন্য কেউ নেই। বলুন!

—আশাকেও আমি প্রশ্ন করেছি, পার্টির দিনে সে কেন যায়নি, কোথায় ছিল সে তখন? আশা বলল, পার্টির খবর সে জানতো না। পরে শুনেছে। ঐদিন সন্ধ্যায় আশিস ল্যাবলেটরীতে এসে সেফ্ খুলছিল। আশা ছিল আলমারীর পাশে লুকিয়ে। সেফ্ থেকে একটা চামড়ার কেস্ বের করে টেবিল রেখে আশিস সেফ্ বন্ধ করে। কিন্তু যাবার সময় কেস্টা নিতে ভুলে যায়। আশা তখন ওকে ডেকে কেস্টি দেয় 'আশিস'-এর হাতে।

—এতে কী প্রমাণ হয়, ঠাকুরপো?

-প্রমাণ হয় যে, আশিস ল্যাবরেটরীতে আসেনি। এসেছিল নীতীশ। সেফ খেলার

পর আশাকে দেখে সে ভয় পেয়ে কেস্‌টা ফেলেই পালাচ্ছিল। কিন্তু আশা তাকে 'আশিস' ভেবে ডেকে সেটা দিয়েছে। আর আমার বিশ্বাস সেইটি-ই থিসিস্।

মা হাঁ করে চেয়ে আছেন ডাঃ দিব্যেন্দুবাবুর দিকে। বেশ দু-এক মিনিট কেটে গেল। দিব্যেন্দুবাবুই বললেন,

—আশিসের মনে আশার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ জেগেছে, বৌঠান।

—অ্যাঁ! বলেন কি, ঠাকুরপো! মা যেন আঁৎকে উঠলেন।

—হ্যাঁ, আশিস আর মানুষ নেই। সে একটা জানোয়ার, একটা 'ভিলেন'—একটা 'রাক্ষস'!—উঠে দাঁড়ালেন দিব্যেন্দুবাবু।

—কি এখন করবেন তাহলে!

—মুস্কিল, বৌঠান! ওর মনের যা অবস্থা এখন, আমাদের কারও কথা সে বিশ্বাস করবে না। ভাববে আমরা আশাকে ভালবাসি তাই এসব সাজিয়ে বলছি। ওর নিশ্চিত ধারণা, আশা নীতীশের সঙ্গে যোগাযোগ করেই থিসিস্‌খানা তাকে দিয়েছে...

—আমার কথাও বিশ্বাস করবে না, মনে হয়?

—না-করতেও পারে। পত্নীর চরিত্র যার অবিশ্বাস হয়, বৌঠান, সে আর মানুষ থাকে না, সে হয় তখন রাক্ষস!

—আপনি কি সব-কথা তাকে লিখে জানাবেন, ঠাকুরপো!

—না। আমি ওকে বাড়ী আসতেই লিখবো। আপনিও শুধু বাড়ী ফিরতে লিখবেন।

রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু দিবেন্দুবাবু আশার অন্য দিকটাই ভাবতে শুরু করলেন। তাঁর ভুল হচ্ছে না তো আশা-সম্বন্ধে! সত্যিই কি তার স্বামিনিষ্ঠা অতখানি অদ্ভুত! অত বেশী যুগাতীত! অত অসম্ভব রকম অবাস্তব! এ যুগে তো এরকম কোথাও দেখা যায় না! তবে কি কোথায় ভুল হচ্ছে তাঁর? আশা কি সত্যি ওরকম নয়!...বেশ খানিক চিন্তা করতে করতে নিজের বাড়ী পৌঁছালেন তিনি। ভাবছেন-ই...

আশার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহবশত তিনি ভুলও তো করতে পারেন। কিন্তু তাঁর ভুল হওয়া চলে না। তাঁকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। ডাঃ দিব্যেন্দু রায় ঘটনাটা অন্যদিক থেকে চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন:

নীতীশ এসেছিল চুরির দিন সন্ধ্যায়। চুরি করতেই সে এসেছিল, কিন্তু আশা কেন সেইদিন-ই গেল ওখানে! আর তো সে কোনদিন যায়নি। অপরকে কেউ নিজের স্বামী বলে ভুল করতে পারে না। আশা অতখানি ছেলেমানুষ নয়। প্রায় কুড়ি-বছর তার বয়স! নীতীশের হাতে সে থিসিস্‌টা স্বহস্তে তুলে দিয়েছে, দেখেছে কালিচরণ। কিন্তু আশা বললো যে, নীতীশকে চেনে না। মিথ্যে বলেছে আশা। নীতীশকে না-চিনতে পারে, আশিসকে সে নিশ্চয় চিনবে। চেনা তার উচিত। আশা নীতীশকে শুধু চেনে না নয়, ভালই চেনে। ভালবাসে তাকে। আশা ইচ্ছে করেই নীতীশকে সাহায্য করেছে থিসিস্ চুরি করতে। স্বামী-নিষ্ঠার অতখানি বাড়াবাড়ি দেখানোর মধ্যে 'অভিনয়' ছাড়া অন্য কিছু নেই, এমনও তো হোতে পারে।...

হঠাৎ একটা চিন্তা মনে আসতেই দিব্যেন্দুবাবু ফোন-এর ডায়াল ঘুরিয়ে ডাকলেন কালিচরণকে। সে সাড়া দিলে শুধুলেন,

—চুরির দিন, আশা চলে-যাওয়ার পর আশিসের, শোবার-ঘরটা কী অবস্থায় ছিল,

কালিচরণ? ঠিক ঠিক মনে করে জবাব দাও।

—এজ্ঞে, বইগুলো গুছান ছিল না। বিছানা ভাল করে পাতা ছিল, আর মেঝেতে—

—কী ছিল মেঝেতে?

—এজ্ঞে—ফুল ছড়ানো ছিল মেঝেতে, আর বিছানাতেও। আমি ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করেছিলাম।

—কতগুলো ফুল ছিল?

—এজ্ঞে, তা অনেক।

—হুঁ, আচ্ছা। হয়েছে।—ফোন ছেড়ে দিলেন ডাঃ দিব্যেন্দু।

স্ত্রীয়াচ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং...ভাবতে লাগলেন তিনি। কঠোর নীতিমান চিরব্রহ্মচারী ডাঃ দিব্যেন্দুর মুখখানা ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে উঠলো। দ্রুত একপাক ঘুরে এলেন তিনি বারান্দায়। পরিচারক খাবার তৈরী করে অপেক্ষা করছে—দিব্যেন্দুবাবু তাকালেন না। ভাবতে লাগলেন, অতটুকু একটা মেয়ে ডাঃ দিবেন্দুকে এমন করে ঠকিয়ে দিল! ওঃ...আশিস যখন এসেছিল তখন অনেক রাত। আশা তখন ছিল না। তাহলে ফুল কার জন্য? নিশ্চয় নীতীশের জন্য! কিন্তু আশার চোখ-মুখের অবস্থা? তার শীর্ণ-শুষ্ক আকৃতি? নিশ্চয় নীতীশের জন্যই! নীতীশকে তো সে আর পাচ্ছে না! নীতীশের বিপদের কথা ভেবে, এবং তার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা ভেবেও তো সে শুকিয়ে যেতে পারে! কিন্তু তার প্রতিটি কথা...ও-সব ভণ্ডামী। ওগুলো অভিনয়!...

কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠলেন ডাঃ দিব্যেন্দু। আশিস তাঁর হাতে গড়া ছেলে—অকারণ সে পত্নীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করবে না, অবহেলা করবে না! নিশ্চয় সে আরো বেশী কিছু জেনেছে, যা দিব্যেন্দুবাবু এখনও জানতে পারেননি।...

ভুল হয়েছে বৌঠানের। অমন আকস্মিকভাবে তাঁর বধূ-নির্বাচন-করা অন্যায় হয়েছে। আশিসের জীবনটাই এখন জ্বালাময় হয়ে উঠলো! ওঃ কী শয়তান মানুষ ঐ নীতীশ আর আশা! না. এ তিনি সহ্য করবেন না! আশাকে ওখানে, ওবাড়িতে রাখাই উচিত হবে না আর...

বৌঠান হয়তো বিশ্বাস-ই করতে চাইবেন না যে, আশার স্বামী-নিষ্ঠা আগাগোড়া অভিনয়। কিন্তু বৌঠানকে বোঝাতে হবে...

একটা অসতী মেয়ে ঘরে রেখে আশিসের জীবন যন্ত্রণাময় শুধু নয়, বিপন্ন করা চলবে না!...ভাবলেন ডাঃ দিব্যেন্দু! অতখানি সতীপনা আবার থাকে নাকি কোনো মেয়ের? অসম্ভব! ঐ বাড়াবাড়ি দেখে গোড়াতেই সন্দেহ করা উচিত ছিল তাঁর। মেয়েটার আশ্চর্য্য অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আশার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড প্রমাণ—তার ঐদিনই ল্যাবরেটরীতে আসা। প্রকাণ্ডতর প্রমাণ, থিসিস্‌টা হাতে করে নীতীশকে দেওয়া। প্রকাণ্ডতম হচ্ছে 'ঐ ফুল'! নীতীশের সঙ্গে বসে সে...কথাটা আর ভাবলেন না ডাঃ দিব্যেন্দু। আর কোনো সন্দেহ নেই আশার চারিত্রিক পতন সম্বন্ধে। বৌঠানকে সব কথা বলে বুঝিয়ে তিনি আশাকে বিদায় করে দেবেন বাপের বাড়ী!

* * *

পরদিন সকালে আশা ল্যাবরেটরিতে পড়বার জন্য অপেক্ষা করছে...ডাঃ দিব্যেন্দু এলেন না। আশা অবশেষে ফোন করলো। একজন চাকরকে দিয়ে ডাঃ দিব্যেন্দু বলালেন,

—'বলে দাও, খুব ব্যস্ত আছি, যেতে পারবে না।'

কথাটা মিথ্যে হবে, কিন্তু মিথ্যে তিনি বলেন না, তাই ডাঃ দিব্যেন্দু সত্যিই ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

জীবনটা 'অভিনয়' মনে করেছে আশিস। দিন-রাত ওর প্রায় অশান্তিতে কাটে। বোম্বাই থেকে মাদ্রাজে এল—ঘুরলো কয়েক দিন। দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য মন্দিরের অপরূপত্ব ওকে তিলমাত্র শান্তি দিল না। ধনুষ্কোটি সেতুবন্ধ, কন্যাকুমারী ঘুরে শেষে আশিস আবার ফিরে এল বোম্বাই-এ। কোথাও সে দু'দিনের বেশী অবস্থান করেনি, অতএব বাড়ীর চিঠিও পায়নি। কিন্তু বোম্বাই-এর হোটেলের পৌঁছে দেখলো পাঁচখানা চিঠি জমা আছে। মার তিনখানা, দিব্যেন্দুবাবুর একখানা, আর অন্য একখানা চন্দ্রিমা দেবীর—দিল্লী থেকে লিখেছে। লিখেছে, আশিস যেন দিল্লী পৌঁছেই দেখা করে ওর সঙ্গে।

বিছানায় নিঃশব্দে পড়ে রইল আশিস। মার পত্রের কথাই ভাবছে—মা অবিলম্বে বাড়ী ফিরতে লিখেছেন। কিন্তু দিব্যেন্দুবাবু লিখেছেন অন্য রকম। তাঁর এবারকার চিঠিতে আশার বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। তিনি লিখেছেন, আশিস বোম্বাই বা বাঙ্গালোর যেখানেই হোক কিছু গবেষণা করুক। সে যেন বসে না থাকে। যেটা চুরি গেল, তা নিয়ে আর চিন্তা করার আবশ্যক নেই। চিঠিতে গবেষণার একটা বিষয় সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ করেছেন, আশিস ভেবে দেখতে পারে। বাড়ীর সংবাদে লিখেছেন—তিনি প্রায় খবর নেন ; বৌঠানেরা ভাল আছেন।

আশিস ভাবতে লাগলো—এর আগের পত্রে আশার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেখা কাকাবাবুর চিঠির সঙ্গে এই চিঠিখানার এতোই বিস্ময়কর প্রভেদ যে, চিন্তা না করে পারা যায় না! আশা হয়তো বাপের বাড়ী গেছে। কিন্তু মা লিখেছেন আশা তাঁর কাছেই আছে। তবে কাকাবাবু আশার বিষয় কিছুই লিখলেন না কেন এ পত্রে! তবে কি কাকাবাবু আশার অভিনয় নৈপুণ্য ধরতে পেরেছেন? হয়তো পেরেছেন? কারণ ক্ষুরধার বুদ্ধি-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক তিনি! আর আশিস জানে কাকাবাবুর নৈতিক জ্ঞান প্রবাদবাক্যের মতো টনটনে। সে জ্ঞান পোড়া হাঁড়ির মতো বাজে। মাও টের পাবেন। দেরী নেই! বেশিদিন ওসব মেয়ে অভিনয় ঠাট বজায় রাখতে আর পারবে না।...

কিন্তু আশিস এখন করবে কি! বোম্বাইয়ে থাকবে নাকি? অথবা আর কোথাও গিয়ে কিছুকাল বাস করবে?—ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলো না।

পরদিন সকালে ডাঃ চিন্তামন-এর সঙ্গে দেখা করলো আশিস। তিনি বললেন যে, বোম্বাই অথবা বাঙ্গালোরের জন্য কিছু করা সম্ভব হোল না। দিল্লীতে নতুন একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন হচ্ছে অণুবিজ্ঞান বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য। আশিস যদি রাজি হয়, তিনি ওকে নেবার জন্য ওখানকার অধিকর্তা এবং ডাঃ চিন্তামন-এর বন্ধু ডাঃ সীতানাথকে চিঠি লিখে দেবেন।

আশিস অগত্যা রাজী হোল দিল্লী যেতে।

স্বাধীনোত্তর ভারতে নানা-বিষয়ক 'গবেষণা'-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দিল্লীর এই গবেষণাগারটি সেই নব প্রতিষ্ঠিতগুলির অন্যতম। এখনও এটা সাধারণ্যে বিশেষ নাম করতে পারেনি। নতুন একটা গবেষণাগারে প্রথম থেকে থাকলে হয়তো অনেক সুবিধে

হবে; কিন্তু ওর অসুবিধাটাও প্রচুর। বোম্বাই-এর কাছে ট্রম্বেতে যে পরমাণু চুল্লী হচ্ছে, সেখানেই থাকতে পারলে সুবিধা হোত আশিসের। অন্তত বাঙ্গালোর 'ইন্‌স্টিটিউট অব সায়ান্স'-এ যেতে পারলেও বেঁচে যেতো। কিন্তু হোল না। বিধাতা ওকে চন্দ্রিমা দেবীর খপ্পরে ফেললেন। দিল্লীর এই গবেষণাগার শেষ পর্য্যন্ত কতখানি কি হবে, এখনও জানা নেই। যন্ত্রপাতি মাত্র আসতে আরম্ভ করেছে। কাজ সামান্যই হচ্ছে। তবু আশিসকে ডাঃ চিন্তামন এখানেই পাঠালেন।

ডাঃ সীতনাথ আশিসকে গ্রহণ করলেন।

আশিস ঠিক করলো কিছুতেই চন্দ্রিমা দেবীদের সঙ্গে দেখা করবে না। আগে সে জেনেছিল চন্দ্রিমা দেবীর ঠিকানা। সে-ঠিকানা থেকে যতটা সম্ভব দূরে নিজের বাসা করলো আশিস। পড়াশুনো নিয়েই ব্যস্ত রইল। নব-নির্মিত গবেষণা-মন্দিরে ওর কাজ ঠিকমত চলছে না। কিন্তু যায় কোথায়? নিজের বাড়ী যাবার পথ বন্ধ! সেখানে আশা আছে। বিদেশে যাবার উপায় নেই ; মা ছাড়বেন না। বোম্বাই বা বাঙ্গালোরে সে চান্স পেল না! দিল্লীতে তার মনের-মতো কিছু না-পেলেও, কিছু একটা করবার মতো যোগাড় হয়েছে—আপাতত কিছুদিন সে এখানে কাটাবে। কারণ বেকার বসে থাকলে তার অবস্থা আর মানুষের মতো থাকবে না। অতঃপর সে ডাঃ দিব্যেন্দু এবং মাকে জানিয়ে দিল যে—সে দিল্লীতে রয়েছে, ভালই আছে। দু-একমাস পড়ে বাড়ী ফিরবে।

ডাঃ দিব্যেন্দু খবরটা পেয়ে খুসী হতে পারলেন না। কারণ দিল্লীতে গবেষণাসংক্রান্ত কাজ কেমন হচ্ছে, জানা নেই তাঁর। কিন্তু আশিস বাড়ী এসে মনমেজাজ খারাপ করে অসুস্থ হোক, এটাও চান না তিনি। থাক্ এখন মাসকতক!—ভেবে তিনি আশিসকে লিখে দিলেন আপাতত ওখানেই থাকতে।

আছে আশিস দিল্লীতে। নিতান্ত দরকার না-হলে বের হয় না। বই পড়ে, না-হয় যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা চালায় নিজের ঘরে। কিন্তু ভগবান যার প্রতি বিরূপ তার আর আশ্রয় কোথায়! সেদিন নিতান্ত দায়ে পড়ে আশিস দরজীর দোকানে গেছে স্যুট-তৈরীর অর্ডার দিতে। না গিয়ে উপায় ছিল না। ওখানে ধরলো তাকে নন্দিতা! সে তার মায়ের সঙ্গে এসেছিল পোষাকের মাপ দিতে। দেখেই চিনে ফেললো।

—মেসো-মশাই!

'কী জ্বালা।'...আশিস মুখ লুকিয়ে পালাতে চায়, কিন্তু নন্দিতা ধরলো এসে। রাস্তায় গাড়ীতে স্বয়ং ওর মা চন্দ্রিমা দেবী। ওঁরা কাজ শেষ করে ফিরছিলো। আশিস আর একমিনিট পরে গেলে কোনো গোল হোত না, এখন আর উপায় নেই।

—চলো কোথায় থাকো আগে দেখে আসি। পলাতক কোথাকার।...

—বড় ব্যস্ত আছি, বড়দি।

—রাখো তোমার ব্যস্ততা। ওঠো গাড়ীতে।—নন্দা, ধর তো, টেনে তোল ওকে।

অতঃপর আর উপায় রইল না। পোষাকের মাপ দিয়ে আশিসকে যেতে হোল চন্দ্রিমা দেবীর সঙ্গে।

নিজের অদৃষ্টকে নিন্দে করা আশার স্বভাব নয়, তার বিশ্বাস ঈশ্বর মঙ্গলময়। কিন্তু দিব্যেন্দুবাবুর সেদিনের ব্যবহারটা আশা বুঝতে পারছে না। তিনি চাকর দিয়ে বলে দিলেন

ব্যস্ত আছেন, আসতে পারবেন না। বেশ—কিন্তু রোজই কি ব্যস্ত! তারপর প্রায় হপ্তাখানেক কাটলো, দিব্যেন্দুবাবু তো এলেন না আশাকে পড়াতে। ব্যাপার কি? কেন এমন হচ্ছে। সবাই যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে আশার কাছ থেকে, আশার স্নেহ-পরিধি থেকে। এখনও আছেন মা—কিন্তু কে জানে, কবে তিনিও সরে যাবেন। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে।

আশা বেশ বুঝতে পারে, তার আসার পর এ বাড়ীতে একটা বড়রকম দুর্ঘটনা কিছু ঘটেছে। কিন্তু কী সেটা, কেউ ওকে বলে না। সকলেই—মা, কাকাবাবু, কালিচরণ, ঝি'রা—সকলেই সতর্কভাবে এড়িয়ে যায় ওকে। এতেই বোঝা যায় ঘটনাটা আশাকে নিয়েই। কিন্তু যাকে নিয়ে ঘটনা, তাকেই কিছু জানানো হচ্ছে না—এ কেমন ব্যাপার? আশিস তাকে পছন্দ করেনি, এইটাই বেশী করে মনে হয় আশার। তা ছাড়া অপর কোনো কারণও খুঁজে পায় না। কিন্তু তাতে কাকাবাবুর মতো প্রবীণ ব্যক্তিও আশাকে মনকষ্ট দেবেন! না। অন্য কোনো কারণ আছে, এবং সে কারণ নিশ্চয়ই খুব সাংঘাতিক।

কাকাবাবু গত পরশু এসেছিলেন ; সকালে নয় ; দুপুরে। মার সঙ্গে প্রায় একঘণ্টা কথা বললেন চুপি চুপি। আশ্চর্য্য যে, আশাকে একবার ডাকলেনও না! উনি চলে গেলে মা অবশ্য আশাকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি সংসারের কাজের কথা ছাড়া কিছুই বললেন না আর।...চিন্তা করতে করতে আশা অস্থির হয়ে উঠলো। ওর মনে হতে লাগলো মার পায়ে ধরে সে প্রশ্ন করবে—'কী সে করেছে কী তার অপরাধ।'

হঠাৎ আশার মনে হোল, তার বাবা কি কোনো যৌতুক দিতে অক্ষম হয়েছেন বলে এদের আক্রোশ। না, তাহলে মা বলতেন। আর আশা জানে বাবা সবই ঠিক-ঠিক দিয়েছেন। আর এঁরা এত বড়লোক যে, কারও দেওয়া গ্রাহ্যও করেন না।

কী মনঃকষ্টে যে আশার দিন কাটছে, তার অন্তরাত্মাই জানে! অবশেষে সে আজ মাকে বলে ফেললো,

—আমাকে আপনারা কিছু-একটা লুকোচ্ছেন, মা! আপনি আর কাকাবাবু। কী সে কথা? কেন লুকোচ্ছেন? আমাকে বলুন! নইলে আমি মরে যাব—

—না, মা ষাট্! মরে যাবি কেন! একটু থেমে বললেন, আশিস এতোকাল পরিশ্রম করে যে থিসিস্‌টা লিখেছিল সেটা চুরি হয়ে গেছে!—মা কঠিন হয়ে তাকালেন ওর পানে।

—চুরি!—পাংশুমুখে আশা বলল,—কখন চুরি হোল, মা—কোথায় চুরি হোল?

—ঐ ল্যাবরেটরীতে। পার্টির দিন সন্ধ্যাবেলা। তুই যেদিন ওখানে গিয়েছিলি। ঠাকুরপো বলছেন, তুই ওটা চুরি করে কাউকে দিয়েছিস...

—আমি! মা,...মা...বসে পড়লো আশা মাটিতে।

—হ্যাঁ, তুই দিয়েছিস্! কাকে দিয়েছিস বল, আশা? যদি সত্যি বলিস, আমি তোর সব অপরাধ মাফ করবো। বল! ভয় নেই—

আশার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। সে প্রায় হতজ্ঞান হয়ে পড়েছে। কিন্তু মা এবার কঠিন কণ্ঠে বললেন,

—তোকে অতখানি বিশ্বাস করা আমার ভুল হয়েছিল আশা—মা চলে গেলেন! আশা পাথরের মতো বসে রইল পাথরের মেঝেতে! নির্বাক নিস্পন্দ ওর দেহ। নিমেষহীন ওর চোখ 'দেবমূর্তির' পানে চেয়ে আছে।

মা বাইরে এসে দেখলেন ডাঃ দিব্যেন্দু গাড়ি থেকে নামছেন। মার অনুরোধ মতো তিনি

আজ আশাকে পড়াতে এসেছেন। মা সংক্ষেপে আশার সঙ্গে তাঁর এখুনি যে-কথা হোল, জানালেন দিব্যেন্দুবাবুকে। শুনে তিনি প্রশ্ন করলেন,

—এখন আপনার কি মনে হচ্ছে, বৌঠান?

—আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, ঠাকুরপো ; যে আশা চোর, আশা অসচ্চরিত্রা।...না, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না।

—আপনি ভুল করছেন, বৌঠান! ওর সমস্তটা অভিনয়। আশিসও আমাকে লিখেছে সেই কথা! আপনি আদেশ করেছেন তাই আমি আজ পড়াতে এসেছি, নইলে ওর মুখ দেখতাম না আমি! চলুন তো দেখি, সে কোথায়।

দুজনে এলেন পূজার ঘরে। আশা তেমনি নিস্পন্দ যেন প্রস্তর-প্রতিমা। চোখের দৃষ্টি স্থির—অনড়!

—আশা! আশা! আশা...সজোরে ডাকলেন মা,—আ-শা...

আশা নড়ে উঠলো। মূর্তির পানে চেয়ে হাতজোড় করে রইল দু-সেকেন্ড, তার পর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো মূর্তিকে।

দিব্যেন্দুবাবু ব্যঙ্গহাসি হাসছেন মার দিকে তাকিয়ে।

নাগিনীর মতো উঠে দাঁড়ালেন আশা। ভিজে চুলগুলো একবার এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরে গেল ওর। সতেজ কণ্ঠে বলল,

—আপনার ছেলেকে ছাড়া ও-কথার জবাব আর কাউকে দেওয়া যায় না, মা! তাকে ডাকুন, আমি জবাব দেব! ইচ্ছে করলে আপনি ডাঃ দিব্যেন্দু রায়ও সেখানে থাকতে পারবেন,...চলে যাচ্ছিল, কিন্তু থামলো অকস্মাৎ। বলল,—আর শুনুন, মা! যতদিন আমার এই কলঙ্ক মোচন না হবে, আমি আপনার পূজার ঘরে ঢুকবো না।

চলে যাচ্ছে আশা, মা তাড়াতাড়ি বললেন,

—তোর কাকাবাবু তোকে পড়াতে এসেছেন, মা!

—ওঁকে বলে দিন, আমাকে পড়াবার ওঁর আর কোনো অধিকার নেই।

চলে গেল। ঘরে যেন বজ্রপাত হয়ে গেল অকস্মাৎ! ডাঃ রায় স্তম্ভিতবৎ কিছুক্ষণ থেমে বললেন,—

—একি মেয়ে, বৌঠান! একি মেয়ে!

—এতবড় 'জোর যার মনে' সে দক্ষ-দুহিতা সতী! ঠাকুরপো, আপনারা নিদারুণ ভুল করেছেন...

মার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গেল অকস্মাৎ। বললেন আবার,—কালিচরণ খুব বিশ্বাসী, ঠাকুরপো—কিন্তু তারও তো ভুল না হলেও নীতীশ কী অবস্থায় ওটা আশার কাছ থেকে নিয়েছে, কালিচরণ জানে না। চাকরের কথার ওপর নির্ভর করে এক সতীর চরিত্রে কলঙ্ক!—ঠাকুরপো, আমি সহ্য করতে পারছি না! আপনারা কী করলেন, ঠাকুরপো।...

ডাঃ দিব্যেন্দু নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন!

সকাল। প্রতি সকাল-ই বিস্বাদ লাগে ডাঃ দিব্যেন্দু রায়ের কাছে। অথচ মাসখানের আগে তিনি প্রতিদিন এই সকালটির জন্য অপেক্ষা করতেন—আশাকে পড়াতে যেতেন। জীবনের প্রথম দিকে পড়া বিজ্ঞানের সূত্রগুলো আর একবার ঝালাতে হয়েছিল তাঁকে। যথাসম্ভব সহজ করে তাকে বোঝাবার ভাষাও খুঁজতে হয়েছিল—কিন্তু কী আনন্দই না ছিল সেই

জটিল বিজ্ঞানকে সহজ ভাষায় বলার মধ্যে!

মাসাধিক হয়ে গেল, আশা আর পড়ে না তাঁর কাছে। পড়ে না। পড়বে না। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, ডাঃ দিব্যেন্দুর আর তাকে পড়াবার অধিকার নেই। কী ক্ষুরধার সে ভাষা—কী মর্ম কঠিন সে মুখ। কিছুতেই ভুলতে পারছেন না ডাঃ দিব্যেন্দু রায়। মনে হল পাথরের এক প্রতিমা যেন অভিশাপ দিয়ে উঠলো অকস্মাৎ! প্রতি সকালে সে-অভিশাপ স্মরণ করে উনি। মানুষ যেমন ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করে, ঠিক তেমনি।

কিন্তু অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি গত রাত্রি থেকে ; কারণ অন্য কিছু নয়—বৌঠান গত সন্ধ্যায় ফোন করে বলেছেন যে ; আশার অবস্থা দেখে তিনি অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সে কঠিন হতে কঠিনতর পাথর হয়ে উঠছে দিন দিন। হাসে না, কান্নাও ভুলে গেছে। সে যেন একটা কলের পুতুল—নির্দিষ্ট কাজগুলি নির্দিষ্ট ভাবে করে যায় রোজ। কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু প্রাণ নেই, নেই কিছুমাত্র আবেগ বা উদ্বেগ। যেন যন্ত্র!

কথাটা শোনার পর থেকে ডাঃ দিব্যেন্দু আর স্থির হতে পারছেন না। তাঁর কেবলি মনে হচ্ছে আশার এই অবস্থার জন্য তিনিই দায়ী। তাঁর প্রথম চিন্তাধারাই হয়তো ঠিক ছিল, বিপরীত চিন্তা করে তিনি এমন সাংঘাতিক ভুল করলেন—যে আশাকে অসচ্চরিত্রা ভাবতে দ্বিধা করলেন না। আশার বিষয় আরো গভীরভাবে অনুসন্ধান করা তাঁর উচিত ছিল।

আশাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করছে তাঁর। গাড়ী আনতে বললেন। তারপর সকালে যেমন আসতেন আশাকে পড়াতে, তেমনি খান দুই বই হাতে বেরিয়ে এলেন—এসে পৌঁছালেন বৌঠানের কাছে। আশাও ছিল, কিন্তু ডাঃ দিব্যেন্দুকে গাড়ী থেকে নামতে দেখেই সে চলে গেল ওপরে।

—আশা চলে গেল কেন, বৌঠান? আমার উপর রেগে আছে।

না। রাগলে তো বেঁচে যেতাম, ঠাকুরপো! রাগ করে না—কিছুই করে না! সব সময় পুতুলের মতো উদাস-চোখে চেয়ে থাকে। না হাসি, না-বা কান্না!

—ওকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন, বৌঠান।

—যাবে না। আমি যেতে বলায় বলল—'আপনার চরণ ছেড়ে, আমাকে যদি কোথাও যেতে হয়, মা, তো—আপনার ছেলের কাছে, না-হয় পৃথিবী ছেড়ে! এ ছাড়া যাবার আমার জায়গা নেই!

—ঠাকুর-ঘরে ঢোকে না?

—না! আমি ডেকেছিলাম—আয় মা, ভেতরে আয়! তা বলল—আমি ভিক্ষা চাইছি মা, আমাকে দিয়ে আপনার আদেশের অসম্মান যেন না করান। আমি যাব না পূজার ঘরে! আপনার ঠাকুর যদি সত্যি হন তো তিনি বুঝবেন, কেন আমি যাব না।

—এ কি অসাধারণ মেয়ে, বৌঠান।—বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন ডাঃ রায়।—

—আমার বড় ভাবনা হচ্ছে, ঠাকুরপো—কোন্ দিন জীবন নিয়ে কিছু না-করে বসে! ও-বয়সের মেয়েদের জানেন তো—আত্মহত্যা করা ওদের খেলা!

—হ্যাঁ, বৌঠান, আপনার কথা খুবই সত্যি। ওকে কাছে কাছে রাখুন।

...থাকে। ছায়ার মতো আমার কাছে থাকে সব সময়। আমি পূজার ঘরে ঢুকলে বাইরে বসে থাকে। প্রসাদ দিলে হাত পেতে নেয় ; যেন কলের পুতুল। গানের যন্ত্রগুলোতে ধুলো জমেছে। রেডিওর চাবি খোলে না, মাসিক-পত্রের মোড়ক খোলে না—আলমারির ডালাও

খোলে না কাপড়-জামা বার করতে। ঐ খান-তিন চার সুতীর শাড়ী-ব্লাউজ এই এক-দেড়-মাস ধরে প'রে চলেছে। বললে বলে 'আমি ভিক্ষা চাইছি মা, আমাকে আদেশ করবেন না!'

—ল্যাবরেচরিতে যায় না?

—যায়। ঠিক যেমন যেত। যন্ত্রগুলো তেমনি করে ঝাড়ে-মোছে। ওর শ্বশুরের ফটোতে মালা পরায়—প্রণাম করে চলে আসে। ঐ একটু যা সময় আমার কাছ-ছাড়া হয় ও।

—শোয় কোথায়?

—আমার কাছে। আমার বড় পালঙ্কের পা-তলে গুটিয়ে শুয়ে থাকে। এমন আশ্চর্য্য মেয়ে আমি দেখিনি, ঠাকুরপো! শুনিনি কখনও।

ডাঃ দিব্যেন্দু নিঃশব্দে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন,

—আমার সঙ্গে কি ও দেখা করতে চায় না, বৌঠান?

—না। আমি বলেছিলাম, পড়া বন্ধ করলি কেন? তার জবাবে বলল, মা একটু থামলেন, তারপর বললেন—পরিষ্কার কণ্ঠে বলল,

'গুরুর প্রতি শিষ্যার আর শিষ্যার প্রতি গুরুর শ্রদ্ধা আর স্নেহ থাকা দরকার, মা। আমাদের পরস্পরের প্রতি সেটা আর নেই। উনি তো মাইনে নিয়ে পড়াতেন না, স্নেহ করে পড়াতেন। সে স্নেহের দাবী মুছে গেছে। উনি পরিবারের হিতৈষী—আমার স্বামীর গুরু। দূর থেকে ওঁকে প্রণাম জানাই।'...

—হুঁ—মেয়েটা ভুল করে এই বিংশ শতাব্দীতে জন্মেছে, বৌঠান। কিন্তু কিছু উপায় তো একটা করতে হবে? আশিস লিখেছে সে এখন বাড়ী আসতে পারবে না। অর্থাৎ ইচ্ছে করেই সে আসবে না।

—হ্যাঁ, আমিও লিখেছিলাম।—মা বললেন—তাতে আশিস লিখেছে, বড় রকম কী একটা বিষয়ে সে গবেষণা করছে ওখানে। সময় নেই এখন। হয়তো বিলাত পর্যন্ত যেতে হবে তাকে। আমার খুবই ভয় করছে, ঠাকুরপো। কিভাবে ওদের মিলন ঘটাতে পারবো, ভেবে পাচ্ছি না।

—বিজ্ঞান-কংগ্রেসে যোগ দিতে আমি দিল্লী যাব, বৌঠান। আশাকে শুধোন তো, সে আমার সঙ্গে যেতে রাজী আছে কিনা?

—আমার সঙ্গে ছাড়া সে কোথাও যেতে চায় না, ঠাকুরপো। সেদিন ওর বাবা এসে বললেন, তাঁরা পুরী যাবেন রথ দেখতে—আশা যদি যেতে চায় তো চলুক। ও বাবাকে জবাব দিল—'পুরী' পরমার্থ সব আমার এখানে, বাবা! আমি কোথাও যাব না। তোমরা যাও।'

—ওর সম্বন্ধে আমি সত্যিই কদর্য্য ভুল করেছি, বৌঠান!

ডাঃ দিব্যেন্দুর গলার স্বর ধরে এল।

একটু থেমে বললেন,—আশিস যখন বাড়ী ফিরছে না—তখন যেভাবে হোক আশাকে তার কাছে নিয়ে যেতে হবে আমাদের। ও যদি আমার সঙ্গে যেতে না চায়, তাহলে আপনাকেও যেতে হবে।

—হ্যাঁ, আমিও যাব। কারণ ওকে আমি একা ছাড়তে ভয় করি।—মা বললেন।

—ওকে বলুন তো, আপনি গেলে সে যেতে রাজী আছে কিনা?

—যাবে। আশাকে আমি ডাকছি।—মা ঝিকে বললেন আশাকে ডাকবার জন্য।

আশা এখান থেকে গিয়ে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ল্যাবরেটরীর দিকে মুখ করে। নিশ্চল প্রতিমার মতো অনড়! দূর থেকে মনে হয় একটা স্ট্যাচু সাজানো রয়েছে। দেখতে পাচ্ছিলেন ডাঃ দিব্যেন্দু এখান থেকেই।

আশা ভাবছিল...আজ আবার ডাঃ দিব্যেন্দু এসেছেন। কে জানে কী পরামর্শ করেছেন তিনি মার সঙ্গে। কিন্তু জানবারও ইচ্ছে নেই আশার। সে জানে সে নিরপরাধ। তার নিশ্চিত ধারণা আশিস স্বয়ং থিসিস্‌খানা তার হাত থেকে নিয়েছে। ঐ চামড়ার কেস্‌টাই থিসিস্ নিশ্চয়। কিন্তু কেন আশিস সেটা হাতে নিয়ে এখন অস্বীকার করছে, বুঝতে পারছে না আশা। আশিস ভুলে গিয়েছিল—আশা তাকে ডেকে 'ওটা' দিয়েছিল। আশার সঙ্গে অতি অল্প কথাই বলেছিল আশিস। কিন্তু যতটুকু বলেছিল—কথাগুলো পরিষ্কার মনে আছে আশার। ছুঁতে এসেছিল, ছোঁয়নি! কথাও বলেছিল—'আজ সে দেখা করবে'। তারপর ধন্যবাদ দিয়েছিল যাবার সময়। এত ব্যাপক এমন করে অস্বীকার করার অর্থ কি? আশিস কি অপর কোনো মেয়েকে ভালবাসে! তাই আশার নামে চুরির বদনাম জড়িয়ে তাকে এ-বাড়ী থেকে বিদায় করতে চায়? অথবা আশিসের অপর কোনো উদ্দেশ্য আছে, তাকে এভাবে বিপন্ন করার মধ্যে। এ তো রসিকতা নয়—একটা নারী-জীবনের জীবন মরণ সমস্যা।...

আশার ঐ থিসিসটা দেওয়ার সময় অন্য কেউ ছিল না ওখানে, যাকে আশা সাক্ষীস্বরূপ খাড়া করতে পারে। কালিচরণ বাজারে গিয়েছিল, আর সেই সুযোগে আশা প্রেমালাপটুকু করেছিল আশিসের সঙ্গে। আশিস একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল অমন আকস্মিকভাবে আশাকে দেশে। মুখ ফেরায়নি। ভাল করে কথাও বলেনি। কিন্তু যতটুকু বলেছিল—কিছু খারাপ তো বলেনি। অবশ্য তার পরদিন যাবার সময় 'অতিভক্তি' শব্দটা বলে গিয়েছিল। সবই স্পষ্ট মনে আছে! নিদ্রায় নয়, নেশায় নয়—সুস্থ সহজ অবস্থায় ঘটা এই ব্যাপারটাকে এমন অস্বাভাবিক করে তোলবার কারণ কি। আশার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে—আশিস অপর কোনো মেয়েকে ভালবাসে, যাকে পেল না বলেই আশার উপর তার আক্রোশ। তাই বিয়ের পর সে দেখা করলো না আশার সঙ্গে। আশা দেখা করলো তো, একটা কদর্য্য অপবাদ দিল আশার চরিত্রে!...চিন্তাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করে আশা।

—মা আপনাকে ডাকছেন, বৌরাণী।—ঝি বলল এসে।

আশা ধীরভাবে মুখ ফিরিয়ে একবার চাইল ঝি'র পানে, তারপর নিঃশব্দে নেমে আসতে লাগলো। ওর পদক্ষেপ অত্যন্ত সংযত—ওর সারা অবয়ব পাথরের মতো স্থির। এসে দাঁড়ালো আশা মার পেছনে। ওর মুখ জানালার দিকে ফেরানো। দিব্যেন্দুবাবু সমস্তক্ষণ নজর রেখেছেন।

—তোর কাকাবাবু যাচ্ছেন দিল্লী। তোর দিদি আছেন দিল্লীতে?—ওখানেই উঠবি গিয়ে। যা ওঁর সঙ্গে—উনি আশিসের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন...

—আপনার সঙ্গ ছাড়া আমি কোথাও যাব না, মা।—আশার কণ্ঠ সুস্পষ্ট।

—বেশ, আমিও যাব। তোদের কি হয়েছে, আমাকে জানতে হবে। নইলে তুইও মরছিস্। আমিও মরে আসছি।—আপনি ব্যবস্থা করুন ঠাকুরপো—আমিও যাব। যা, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নে। পরশু যেতে হবে।

—গোছানো আছে মা।

—গোছানো আছে কি। তোকে কি আমি ঝি'র মতো নিয়ে যাব?—মা অত্যন্ত রেগে উঠলেন—গহনা-কাপড় সব গুছিয়ে নে। যেমন তোর যাওয়া উচিত তেমনি সেজে গুজে যেতে হবে।

—সাজ-গোজ করবার দিন যদি পাই, মা—তো করবো। আশা অতি ধীরে বসে পড়লো ওঁর পায়ের কাছে। চোখদুটো তেমনি শুকনো, তেমনি মলিন। কিন্তু জল নেই—ওর অন্তরের উত্তাপে সব জল যেন শুকিয়ে গেছে।

ব্যথার পাহাড় ভেঙে পড়ছে ডাঃ দিব্যেন্দুর বুকে, কিন্তু তবু তিনি কিছু বলতে পারলেন না। মা-ও কিছু বলেছেন না আর। আশা বলল,

—আমার বড়দির বাড়িতে আপনি উঠবেন তো, মা?

—হ্যাঁ। তাছাড়া হোটেলে তো আমি উঠতে পারি নে, বাছা...

—তাহলে বড়দিকে লিখে দি'?

—দে—

আশা নিঃশব্দে চলে গেল, দিব্যেন্দুবাবুর পানে একবার তাকালোও না। অবাক হয়ে যাচ্ছেন ডাঃ দিব্যেন্দু রায়। বললেন,

—কালিচরণকে ও কিছু প্রশ্ন করেনি, বৌঠান?

—না, ও করবে না। ওর আত্মমর্যাদায় বাধে, ঠাকুরপো। সেদিন থেকে আমি ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা বলেনি ও।

ডাঃ দিব্যেন্দু আর কিছু বললেন না। কিন্তু মা বললেন আবার,

—নীতীশ ওটা আশার কাছ থেকে কি-ভাবে নিয়েছে, তা তো জানা যাচ্ছে না, ঠাকুরপো! 'আশিস চাইছে' বলেও তো নিতে পারে?

—আশাকে আপনি জিজ্ঞাসা করেননি, বৌঠান?

—না, আমার ভয় করে। ওর যা বলবার আশিসকেই বলুক। আমি ওর চরিত্র কোথাও দাগ দেখিনে, ঠাকুরপো! আশিসের থেকে ও আমার বেশী স্নেহের হয়ে উঠেছে এই ক'মাসে। আমার বিশ্বাস, আমার কোথাও ভুল হয়নি।

—কালিচরণ নীতীশকে ঠিকই দেখেছে, বৌঠান!

—তাতেই প্রমাণ হয় না, ঠাকুরপো, যে আশা চোর বা অন্য কিছু। একটা মেয়ের চরিত্র নিয়ে 'খেলা' চলে না! তুচ্ছ একটা চাকরের কথায় আমার ঘরের-লক্ষ্মীকে আমি অপমান করতে পারিনে। চলুন, আশিস কি বলে শোনা যাবে।

—হ্যাঁ, বৌঠান! সেই ভাল। তাহলে ওই-ই ঠিক রইল।

ডাঃ দিব্যেন্দু চলে গেলেন। মা আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে এসে দেখলেন, আশা চিঠি লেখা শেষ করে দাঁড়িয়ে আছে। বললেন,

—কাউকে দে চিঠিটা, ডাকে দিয়ে আসুক।

—আপনি পড়ুন, মা, কী আমি লিখিলাম—দেখুন!

—না, আমি কি দেখবো! তুই কি আমার মাইনে-করা বাঁদী নাকি যে, তোর খবরদারী করতে হবে সব কাজে!

—মা!—আশা ওঁর কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো এসে। মা ওর মুখপানে চেয়ে কাঁধে ধরে

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন,

—আমি জানি তুই পুজোর ফুলের মতো পবিত্র। ভয় কি রে, ভয় কি তোর? আমি কারও কথা বিশ্বাস করিনে, মা!

আশা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। মা আবার ওকে নাড়া দিয়ে বললেন,

—পুতুল হয়ে যাচ্ছিস্ যে, মা। কাঁদ। কাঁদ দেখি একটু। কেঁদে একটু মানুষের মতন হ'! আহাম্মক মেয়ে কোথাকার।—মা নিজেই কেঁদে ফেললেন।...

এতোদিন পরে আজ আশার চোখে জল এল।...

না! রমানাথের সঙ্গে ঘর করা আর সম্ভব হোল না।...ভাবছিল কুমকুম। ক'দিন থেকেই নানা বখেড়া চলছে রমাবাবুর সঙ্গে। কারণ অতি তুচ্ছ, কিছুই নয় বললেই চলে। কিন্তু রমাবাবু সেই-সব-তিলকে তাল করে কুমকুমকে গালাগালি দিচ্ছেন—মারবার জন্যও হাত তুলেছেন দু'একবার।

নাঃ! আর থাকা গেল না।...কিন্তু কোথায় যাবে কুমকুম! সে কি সন্ধ্যাবেলা সেজেগুজে রাস্তার ধারে দাঁড়াবে গিয়ে? না, ওতে আর পেট ভরে না। আর ভাবলেও, কুমকুম ও কাজ করতে পারবে না। কিন্তু কী করবে? অদৃষ্টের বহু দুঃখ আছে, তাই কুমকুম বধূর মর্যাদা পেতে এসেছিল রমানাথের মতো এক অতি স্বার্থপর মানুষের কাছে! ঝগড়ার মুখে সেদিন কুমকুম বলল,

—আমার টাকা ফেরত দাও! আমি চলে যাচ্ছি—

—টাকা ফেরত কিসের, হারামজাদী! তোকে এতোকাল ভাত-কাপড় দিয়ে পুষলাম কি অমনি-অমনি? টাকা কে ধারে তোর?

ওদের জাতের মেয়ে অত সহজে টাকা ছাড়বার পাত্রী নয়। কিন্তু কুমকুম কিছু আলাদা ধাতের! কেলেঙ্কারী সে করতে চায় না। টাকার মমতা ছেড়েই দিয়েছে কুমকুম—এখন যে ক'খানা গহনা আছে, তাই নিয়ে সরে পড়তে পারলেই সে বাঁচে! কিন্তু যাবে কোথায়?

নীতীশের কথা প্রায় ভুলে এসেছিল কুমকুম—ভুলেই যেতে হয় ওদের! প্রেম ভালবাসার কথা মনে পুষে রাখা ওদের পক্ষে পাপ। ভুলেই গিয়েছিল সে—কিন্তু ঐ রমানাথ-ই সেদিন মনে করিয়ে দিল—

—তখন বললাম যে, চলে যা তোর ঐ পেয়ারের নীতীশবাবুর সঙ্গে...

—নীতীশবাবু আমার পেয়ারের কি জন্যে হতে যাবে।—বলেছিল কুমকুম।

—হয়েছিল যে হারামজাদী! আমি কি দেখিনি মনে করেছিস? বলে রমানাথ যে-কথা বলেছিল, তারপর কুমকুমের বাক্যস্ফূর্তি হয়নি। চুপ হয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু রোজ রোজ এমন অশান্তিতে মানুষ বাস করতে পারে না। গতকাল রমানাথ বলেছে যে অবিলম্বে কুমকুম বাসা ছেড়ে দিক, কারণ রমানাথ তার বিবাহিতা বধূ আর কন্যাকে এখানে আনবে দেশ থেকে। যদি কুমকুম এর মধ্যে চলে না যায় তো, বউ-এর খ্যাংরা তাকে খেতে হবে!

ভয় পায়নি কুমকুম। ভয় পাবার মেয়ে সে নয়। 'বধূ' শব্দটার উপর ওর যেন কেমন মোহ আছে। রমানাথকে বলেছিল,

—বেশ, তার খ্যাংরা-ই খাব আমি। আনো তুমি তোমার বউকে। আমি দেখতে চাই, তোমার মতন শয়তানের বউ-এর ভাগ্যিটা আমার থেকে কতখানি ভালো...আনো তাকে।

আমি যাব না।

কুমকুম না-গেলে রমানাথ কিছু করতে পারবে না সহজে। কারণ কুমকুম প্রায় দু'বছর রয়েছে এখানে—পাড়ার সকলেই জানে। এমন কি কুমকুম ইচ্ছে করলে রমানাথকে আদালতেও নিয়ে যেতে পারে, জানে রমানাথ। তাই মিষ্টি করে বলেছিল,

—অনর্থক অশান্তি হবে, কুমকুম—তুমি চলে যাও। থিয়েটারে তো তোমাকে নিতে চাইছে—

কুমকুম আর জবাব দেয়নি। থিয়েটারে গেলে হয়তো ওর চাকরী হবে। কিন্তু ওর ইচ্ছে নয়। ওর মোহ আর নেই থিয়েটার বা সিনেমায়, আশ্চর্য্য বিচিত্র মানুষের মন। এই আধুনিক যুগে যখন ঘরের কন্যা-বধূরা চিত্রতারকা হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, সেই ভীষণ প্রগতির দিনে, সব সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কুমকুম অভিনয়ে আসতে চায় না। ওর আকাঙ্ক্ষা একটি ক্ষুদ্র গৃহকোণ, ছোট্ট নীড়—ধূপ-দীপ-শাঁখ, স্বামী-পুত্র-কন্যা—শাকান্ন হোক, শান্তির অন্ন চায় সে। কিন্তু কোথায় পাবে কুমকুম? ওদের যে এসব পেতে মানা। বিধাতার নাকি বিধান এটা।

চলেই যাবে কুমকুম। নিজের সামান্য জিনিসগুলো গুছিয়ে নিল। গহনাগুলো দেখে নিল, রমানাথ গিল্‌টির গহনা দিয়ে বদলে নিয়েছে কিনা। খান দুই মাসিক কাগজও নিল পড়বার জন্য ; তার পর বেরিয়ে এসে ট্রেন ধরলো। কলকাতায় যাবে। ওর আগের পরিচিতা বিন্দুদিদি আছে। তারই বাড়ীতে উঠবে এসে। মেয়ে-কামরায় চড়লো কুমকুম।

বর্দ্ধমানে গাড়ী দীর্ঘক্ষণ থামে। প্ল্যাটফর্মের লোক-চলাচল দেখেছে কুমকুম। কে জানে কতদিন পরে আবার সে বর্দ্ধমানে ফিরবে! ওর জন্মভূমি এই বর্দ্ধমান শহর। বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনেরও অনেকটা কাটলো এখানে। লতা বিতানে-ঘেরা বর্দ্ধমান, তরুবীথি-শোভিত বর্দ্ধমান—দীর্ঘকার কাকচক্ষু-জল-হিল্লোলিত বর্দ্ধমান!...কুমকুম একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।...হয়তো বর্দ্ধমান তার আর আসা হবে না।

অভিনেত্রীর জীবন-ই আরম্ভ করবে কুমকুম। এছাড়া ওর আর তো কোনো উপায় নেই। আর কোনো আশ্রয় নেই! এখন অভিনেত্রীর চাকরী একটা পেলে হয় ; নইলে ওকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হবে। মুখখানা করুণতর হয়ে উঠেছে কুমকুমের।

—কোথায় যাচ্ছেন? কলকাতা?—প্রশ্ন করলো এক সহযাত্রিণী।

—হ্যাঁ। —জবাব দিল কুমকুম। তাকালো মেয়েটির পানে। গহনা-কাপড়ে ঝলমলে। নব-বিবাহিতা বধূ হয়তো। কুমকুমও শুধালো,

—আপনি কোথায়?

—কলকাতা। শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি, ভাই।—হাসলো মেয়েটি। ওর হাতের কৃষ্ণচূড়ায় নাম লেখা 'পদ্মালয়া' দেখলো কুমকুম। বলল,

—ক'দিন বিয়ে হয়েছে?

—গত বছর। প্রথম যাচ্ছি বিয়ের পর। দ্বিরাগমনে।

—বর কি করেন?—কুমকুম সাগ্রহে শুধালো।

—চাকরী করেন। পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টে চাকরী।—মধুর হাসলো সে। কুমকুম ওকে আর প্রশ্ন করলো না ; দেখতে লাগলো। স্বামীর মাইনে এমন কিছু বেশী হবে না। সামান্য চাকরী। কিন্তু স্বামী গৃহে যাবার আনন্দ যেন আচ্ছন্ন রয়েছে মেয়েটির সারা দেহ-মনে।

এ জীবন কুমকুমের পাবার নয়! কুমকুম এমন একটা কাউকে পেল না তার জীবনে, যার উপর তার দাবী থাকবে—যার সঙ্গে দ্বন্দ্ব কলহ, এমন-কি মারধোরও। আপনার লোকের সঙ্গে হচ্ছে ভেবে সয়ে যেতে পারবে কুমকুম। শাকান্ন না পেলে উপোষ দিয়েও যেখানে অন্তরের পবিত্র শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। না, পেল না কুমকুম! কী এমন অপরাধ করেছিল কুমকুম তার আগের জন্মে। করেছিল বৈকি! না হলে, এমন হবে কেন?

কর্ণ বলেছিলেন—"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদারত্তং হি পৌরুষম্"। কিন্তু পৌরুষ কর্ণের যতই থাক, তিনি সূতপুত্রই রয়ে গেলেন! কী দুর্ভাগা জীবন। অতবড় বীর, অতবড় দাতা—আহা!

কর্ণের কথা ভাবতে-ভাবতে কুমকুম তার থিয়েটারের জীবনের কথাগুলো মনে করতে লাগলো। সামান্য একটা বছর। কিন্তু ওর স্মৃতি ভুলবার নয়! তারপর এলো শ্যামল—সেখানেও কুমকুমের জীবন-স্মৃতি প্রচুর...তারপর রমানাথের সঙ্গে...

—কী অতো ভাবছেন আপনি, দিদি?—পদ্মালয়া শুধালো।

—আমি তোমার দিদি? না ভাই, আমি ভাল মেয়ে নই। আমি বাজারের মেয়ে। আমার সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে নেই।

—ও!—পদ্মালয়া এক মুহূর্তের মধ্যে যেন নিবে গেল। দেখলো কুমকুম। দেখবার জন্যই কথাটা বলেছিল সে। দেখলো, কী নিবিড় ঘৃণা ওদের কুমকুমদের প্রতি। আঠারো বছরের একটা বাচ্চা বউ, তারও চিত্তে ঘৃণা জাগে কুমকুমের উপর এই-ই কুমকুমের জীবন।

নিশ্চুপ বসে রইল কুমকুম। পদ্মালয়াও আর কথা বলছে না ওর সঙ্গে। মাঝের একটা ষ্টেশনে তার স্বামী একখানা খবরের কাগজ ছুঁড়ে দিলেন পদ্মালয়াকে। কিন্তু পদ্মালয়া জানালাপানে তাকিয়ে। কাগজটা তুলে নিল কুমকুম। সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখা ওর একটা নেশা। খুলতে গিয়ে অন্য একটা বিজ্ঞাপন নজরে পড়লো 'একটি শিশু-প্রতিষ্ঠানে শিশুদের লালন-পালনের জন্য কয়েকজন সেবাপরায়ণা নারী দরকার। মাইনে এবং থাকা খাওয়া দেওয়া হবে।'

চেষ্টা করবে নাকি কুমকুম? ঠিকানাটা লিখে নিল সে। শিশু প্রতিষ্ঠানটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ওখানের চাকরীও পাকা। দেখা যাক-না, কুমকুমের বরাতে কি আছে।...

হাওড়ায় নেমে কুমকুম সটান চলে গেল সেই শিশু-প্রতিষ্ঠানে। কর্তৃপক্ষ জানালেন, ছাপা ফর্মে দরখাস্ত করতে হবে। কুমকুম ফর্ম নিয়ে লিখলো—'নাম কুমুদিনী চট্টরাজ, স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত নীতীশ চন্দ্র চট্টরাজ। পোষ্ট ও গ্রাম : তাপসীপুর, জেলা : বর্দ্ধমান।' দিল সে দরখাস্তটা 'ফাইল' করে। নিজের মনেই হাসছে কুমকুম। কিন্তু আশ্চর্য্য, ওর ডাক হোল 'ইন্টারভিউ' দেবার জন্য। ওকে দেখে এবং কথা বলে প্রীত হয়ে চাকরীটা সত্যিই দিলেন ওঁরা ওকে। মাইনে একশো টাকা।

ব্যস্। কুমকুম হাতে স্বর্গ পেল যেন। কোনো নোংরা জীবনে ওকে আর যেতে হবে না ; কিন্তু কুমকুম একটা নিদারুণ মিছে কথা লিখেছে। চাকরী করার কারণ সে লিখেছে—'স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয় না'। ছিঃ, এ কাজ কেন করল কুমকুম? কিন্তু ঐ রকম না লিখলে এখানে চাকরী হবার আশা ছিল না। চাকরী যে হবে, তা সত্যি ভাবেনি কুমকুম। তবু হোল। বেশ! কুমকুম যোগ দিল চাকরীতে।

ওরা পাঁচজন শিশুদের দেখবার জন্য ; কিন্তু শিশু, বালক এবং বালিকা প্রায় শ-খানেক।

আর, কী দুরন্ত সব। হোক। কুমকুম একটা সম্মানের জীবন পেয়েছে। সবাই ওকে 'মিসেস্ চট্টরাজ' বলে। খাতিরও করে বেশ। রমানাথের বলা 'হারামজাদী' ইত্যাদি কথাগুলো মনে পড়লে হাসে কুমকুম। আমোদ বোধ হয় ওর।

বেশ কাটাচ্ছে কুমকুম এখানে। বরাতগুণে চাকরীটা জুটে গেছে। এখন যদি একদিন রমানাথের সঙ্গে দেখা হয় তো বেশ হয়। তাকে দেখাবে কুমকুম যে, সে মানুষের মর্য্যাদা লাভ করেছে, মা'র মর্য্যাদাও।

মাসকয়েক কাটার পর কিন্তু কুমকুমের মন-খারাপ হতে আরম্ভ করছে। কারণ আর কিছু নয়, সহকর্মিণীরা প্রশ্ন করে—স্বামীর সঙ্গে কেন তার বনল না ; আর কোনো চেষ্টা সে করবে কিনা স্বামীর ঘর করবার জন্য' ইত্যাদি। কুমকুম তাই একদিন ঠিক করলো, মাসখানেকের ছুটি নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আসবে। এসে বলবে যে, স্বামীর ঘরই সে করে এল।

দরখাস্ত করে দিল কুমকুম। ছুটিও পেল। কিন্তু কোথায় যাবে কুমকুম? সহকর্মিণীরা উৎসাহের সঙ্গে ওর জন্য সিটি-বুকিং থেকে বর্দ্ধমানের টিকিট কিনিয়ে দিল—ষ্টেশনে এসে গাড়ীতেও তুলে দিল। নেহাৎ দায়ে পড়ে যেন কুমকুম বর্দ্ধমানেই নামলো এসে। অতঃপর সত্যি সে 'বাস' ধরে এল তাপসীপুর।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়—কুমকুম সটান্ গ্রামে ঢুকে একটা বাচ্চা ছেলেকে প্রশ্ন করলো,

—নীতীশবাবুর বাড়ী কোনটা খোকা।

—নীতীশদা? হৈ-যে। হৈ-হাটতলায়—সোজা চলে যান।

কুমকুম চলে এল সোজা-ই কিন্তু কোন্‌টা বাড়ী নীতীশের? অকস্মাৎ তার নজরে পড়ল—একটা বাড়ী থেকে একজন লোক বের হচ্ছে—চুল দাড়ী ভর্তি মুখ, চোখগুলো অত্যন্ত উজ্জ্বল। কে ও? কুমকুম ভাল করে দেখে চিনলো—নীতীশ!

চন্দ্রিমা দেবীর সঙ্গে দেখা হবার পর আশিসকে প্রায়ই যেতে হয় তার বাড়ী। ধরে নিয়ে যায় নন্দিতা। অবশ্য চন্দ্রিমা দেবীকে ভয় করলেও নন্দিতাকে বড়ই ভাল লাগে আশিসের। খুব স্ফূর্ত্তিবাজ মেয়ে নন্দিতা। গান-গল্প হাসিতে ভরপুর। ওকে নিয়ে আশিস হস্তিনাপুর, কুতুব-মিনার, এমন কি পাণিপথ, ভীমগদা পর্য্যন্ত ঘুরে এল। রোজই প্রায় আসে নন্দিতা। আর আশিসের কোনো কাজ নেই, যার জন্য বেড়াতে যাওয়া বন্ধ করবে। আশিস প্রায় বেকার এখানে।

আজও আশিস বেড়াতে যাবে নন্দিতাকে নিয়ে—কৃষি-প্রদর্শনী দেখতে যাবে ; পোষাক পরে অপেক্ষা করছে—নন্দিতার আসতে দেরী হচ্ছে। কী কারণ বুঝতে পারছে না আশিস। অথচ বেরুতেও পারে না নন্দিতাকে ছেড়ে। গতকাল বিজ্ঞান কংগ্রেসের মিটিং ছিল সন্ধ্যায়, নন্দিতার ওসব ভাল লাগবে না, তাই আশিস যায়নি। আজও যাবে না ঠিক করে রেখেছে। বিজ্ঞানকে ও এখন প্রায় বাদ দিয়েই চলেছে। মনের অবস্থা এমন এক স্তরে এসেছে যে, জীবনের কোনো আস্বাদই যেন নেই ওর কাছে। তার চেয়ে অবোধ বালিকা, নিষ্পাপ নন্দিতাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যেন অনেক ভাল।

চেনা গাড়ীখানা মোড়ের মাথায় দেখা যেতেই আশিস আনন্দিত হয়ে উঠলো। আসছে নন্দিতা, ওকে আর নামতে দেওয়া হবে না—আশিস-ই গিয়ে উঠবে ; ভেবে সে বেরুতে

যাচ্ছে—গাড়ীখানা এসে থামলো দরজায়। নামলেন স্বয়ং মা। ডাঃ দিব্যেন্দু, এবং পিছনে কে ও? আশা নাকি!

চমকিত হয়ে থেমে গেল আশিস। মা'র এভাবে খবর না-দিয়ে আসার কারণ কি? দিব্যেন্দুবাবু বিজ্ঞান-কংগ্রেসে যোগ দিতে এসেছেন হয়তো। কিন্তু এঁরা কেন? আধ-মিনিটেই কথাগুলো ভেবে নিয়ে আশিস মাকে এবং দিব্যেন্দুবাবুকে প্রণাম করলো। আশা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে, মাথায় অল্প একটু ঘোমটা। ওর কঠিন মুখখানায় কোনো ভাবের অভিব্যক্তি নেই।

—কী ব্যাপার মা! তোমরা এমন অকস্মাৎ?—বিস্মিত আশিস প্রশ্ন করলো।

—অকস্মাৎ নয় আশিস, আমরা গতকাল এসেছি। উঠেছি চন্দ্রিমার বাড়ীতে।

ডাঃ দিব্যেন্দু বললেন,—কাল তোমাকে বিজ্ঞান কংগ্রেসে দেখতে পাব ভেবে এখানে খবর দেওয়া হয়নি। আমি ওখানে যাওয়ায় এখানে আসতে পারিনি।

—আমার কংগ্রেসে যাওয়া হয়নি, কাকাবাবু। নন্দাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে নন্দা আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে যায়।—কিন্তু রাত্রে আমাকে খবর দিলেই আমি যেতাম।

—আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাই খবর দেওয়া হয়নি। চলো, বসা যাক্।

সবাই এসে বসলেন ভেতরে। আশা বসলো মার কাছে। দিব্যেন্দুবাবু আশিসের সামনা-সামনি বসলেন। মা এতক্ষণে বললেন,

—তুই আজ ছ'মাস বাড়ী-ছাড়া। তোকে আমি দেখতে এলাম।

—বেশ, মা—কিন্তু আমাকে খবর দিলে না কেন? আমি ষ্টেশনে যেতাম—

—তোকে খবর দিতে চন্দ্রিমাকে নিষেধ করা হয়েছিল। কারণ যেভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস, আমরা আসছি শুনলে আবার কোথাও চলে যেতে পারিস। শুনলাম এখানে তোর বিশেষ কোনো কাজ নেই। এখানকার গবেষণাগার হতে এখনও বহু বিলম্ব। কেন তুই বাড়ী ফিরছিস না, আশিস? কী কারণ—

মা কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন আশিসের পানে। আশিস মাথা নীচু করে একখানা বই উল্টোতে লাগলো।

—আমার কথার জবাব দে, আশিস। বিয়ের পর থেকেই তোর এই পরিবর্তন আমাকে খুবই ভাবিয়ে তুলেছে। বৌমার বিষয়ে তোর কি কোনো মন্দ ধারণা হয়েছে?

—'মা।'—বলে আশিস চুপ হয়ে গেল। মা আধামিনিট থেমে থেকে বললেন,

—বল। আমি শুনতেই এসেছি। একটা নিরপরাধ মেয়েকে বিয়ে করে এনে, কেন তুই এমন অমানুষের মতো ব্যবহার করছিস। অগ্নিসাক্ষী করে যাকে বিয়ে করেছিস—শতদোষ মার্জনা করবি প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তাকে এভাবে অবহেলা করবার কী তোর অধিকার? কী তার অপরাধ?

আশিস চুপ করে আছে দেখে দিব্যেন্দুবাবু বললেন,

—তুমি জবাব দাও, আশিস! অনর্থক একটা পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে—আর একটা নিষ্পাপ মেয়ের জীবন নষ্ট হতে বসেছে। বলো। জবাব দাও।

আশিস নিঃশব্দে বসে রয়েছে তখনো। বেয়ারা একখানা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম এনে দিল। আশা চা তৈরী করছে দু-কাপ—দিব্যেন্দুবাবু আর আশিসের জন্য। ঘরের অবস্থা স্থির

অবস্থা—থমথমে।

আশা চা তৈরী করে এগিয়ে দিল ওঁদের। মা বললেন,

—তুই চা খাবি নে?

—না, মা।—বলে আশা আঁচল দিয়ে মুখখানা মুছে বলল আস্তে,

—মা-কাকাবাবু! আপনারা অনুমতি করলে আমি ওঁকে কিছু প্রশ্ন করি।

—করো, মা। তুমিই প্রশ্ন করো।—দিব্যেন্দুবাবু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন। আশা ধীরে ধীরে বলল ;

—আমার অপরাধ নেবেন না। চরম অশান্তি না ঘটলে কোনো মেয়ে এভাবে স্বামীকে প্রশ্ন করতে আসে না।—আশা দাঁড়ালো আস্তে আস্তে ; বলল,—আমি আসবার পর থেকে আপনি বাড়ী-ছাড়া। এর কারণ কি আমি-ই? যদি তাই হয়, তাহলে কেন? কোথায় আমার অপরাধ, কি আমি করেছি—যার জন্য-আপনি বাড়ী-ছাড়া?

আশিস চায়ে চুমুক দিল, কথা বলল না। আশা বলল,

—আপনার থিসিস্ কী বস্তু আমি জানি না—অথচ আমি শুনলাম, আমি-ই নাকি সেটা চুরি করে অপর একজন কাকে দিয়েছি। এই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। আমি জানতে চাই, এ অভিযোগ কি আপনার?

—হ্যাঁ।—আশিস কঠিন কণ্ঠে বলল,—এবং প্রমাণ হয়ে গেছে যে—তুমি আমার আয়রন-সেফ্ খুলে আমার জীবনব্যাপী-সাধনার-ধন তোমার এক...বিলিয়ে দিয়েছে ইচ্ছে করে! চক্রান্ত করে।

—'আমি' দিয়েছি? কে তিনি? কাকে আমি দিয়েছি?

—তুমি খুব ভাল জান, সে 'কে'। পার্টির দিন সন্ধ্যাবেলা ল্যাববেটরীতে গিয়ে ফুল ছড়িয়ে তুমি এই উৎসব সমাধা করেছ—কঠিন দৃষ্টিতে চাইল আশিস—আগ্নিময় সে দৃষ্টি। আশা নতমুখে ছিল, কিন্তু আশিস বলল,—এদিকে তাকাও।

আশা ধীরে ধীরে মুখ তুললো। আশিস কঠিন স্বরে বলল,

—যাকে দিয়েছ থিসিস্খানা, তার সঙ্গে কতদিনের বন্ধুত্ব তোমার? কখন এই চক্রান্তটি করেছিলো।

আশা পড়ে যাচ্ছিল, টেবিলের কোণাটা ধরে ফেললো। মা ওকে ধরলেন জড়িয়ে। কিন্তু নিষ্করুণ কণ্ঠে বলে চলেছে আশিস...

—স্বামীর সাধনার 'ধন' অপরকে বিলেয়ে দিয়ে স্বামীকেই প্রশ্ন করতে আসতে তোমার লজ্জা করলো না।—তোমার অভিনয় নৈপুণ্যের প্রশংসা করি। সত্যি চমৎকার।

—আশিস!—মা ধমক দিয়ে উঠলেন,—হুঁসিয়ার হয়ে কথা বল। আমার ঘরের লক্ষ্মীর অসম্মান আমি সহ্য করবো না। খবরদার!

আশার পায়ের তলার মাটি সরে গেছে—ওর দাঁড়াবার আর অবলম্বন নেই। ওর অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা দেহখানা দু'হাতে ধরলেন মা। মুখপানে চেয়ে দেখলেন, সে-মুখ মৃতের মুখের মতো রক্তহীন,—যেন মোমের মুখ।

—আশা, আশা!—আশা? মা জোরে ঝাঁকি দিয়ে ডাকলেন দু'তিনবার, —জল খাবি?—টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে ধরলেন ওর মুখে। আশা দু'ঢোক জল খেল। মা ওর মুখ মুছে দিলেন আঁচল দিয়ে। বললেন,

—তুচ্ছ একটা চাকরের কথায় তুই আমার বধূর চরিত্রে অপবাদ দিস, এতবড় তোর আস্পর্দ্ধা? তুই ভেবে দেখলিনে, কখন কী অবস্থায় কেমন করে নীতীশ থিসিস্ খানা নিয়ে গেল? তোর নাম করেও তো সে ওর কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারে সেটা। তুই নীতীশের খোঁজ করেছিস?

আশা এর মধ্যে কিঞ্চিৎ সামলে নিয়ে। বলল,

—থাক, মা। ও নিয়ে আর কিছু ওঁকে বলবেন না। স্বামী হয়ে যিনি এত তুচ্ছ কারণে পত্নীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করেন—তাঁকে কি আর বলবো, মা!

—তুমি প্রমাণ করো যে, তুমি দাওনি থিসিস্খানা নীতীশকে—

—দিয়েছি।—আশা মার-কাছ-ছাড়া হয়ে, সরে এসে সোজাভাবে দাঁড়াল—কাকে দিয়েছি, জানি না, দিয়েছি একজনকে। এখানে আসার আগে পর্যান্ত জানতাম সেই লোকটি আপনি স্বয়ং। যাক্, এখন বুঝলাম তার নাম 'নীতীশ'। কিন্তু আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করছি না—করতে ঘৃণা বোধ করি আমি।...

—কি করছো তাহলে?

—আপনার অমানুষোচিত ব্যবহারগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে শুধু সহধর্মিণীর কাজ করে যাব। শুনুন। ভদ্রবংশজাত শিক্ষিত যুবক আপনি, একটা কুড়ি-বছরের মেয়েকে বিয়ে করে এনে তার সঙ্গে একটা কথা পর্য্যন্ত না-বলা কোন্‌দেশী স্বামীত্ব? ফুলশয্যার রাত্রে ঘুমন্ত স্ত্রীর সোফায় ঘড়ি রেখে দিয়ে সেটা আর ফিরিয়ে নিতে না-যাওয়া কোন্ রসিকতার পরিচয়? দীর্ঘ ছাব্বিশ দিনের মধ্যেও বউ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সময়াভাব—অন্দরে একবার আসবার মতনও সময়াভাব, বধূর প্রতি প্রীতির কি রকম লক্ষণ? একটা অপরিচিতা মেয়েকে স্বামী চিনবার সুযোগ পর্য্যন্ত না-দেওয়া কোন্ শিক্ষিত সমাজের স্বামীগৌরবের পরিচয়। বিবাহিতা পত্নীর প্রতি এই অবহেলার মূলে কোন রহস্য, জানবার অধিকার আমারও আছে! কিন্তু...চোখ দুটো যেন জ্বলছে আশার। কঠিনতর কণ্ঠে বলল,

—যে-স্বামী অকারণ পত্নীর সন্দেহ পোষণ করে, তার কাছে পরীক্ষা দিয়ে 'অযোধ্যার রাণী' হতে যাবার মতো 'সীতা' আমি নই। পরীক্ষা দেবার আগে আমি পাতাল-প্রবেশ করবো। কিন্তু মনে রাখবেন, এ ভুল আপনার ভাঙ্গবে। ভাঙ্গবেই। সেদিন আমার স্বামীত্ব গ্রহণ করবার যোগ্য হয়ে যান যেন আমার কাছে!

—আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা তুমি খুলে বলবে, আশা!—আশিসের কণ্ঠস্বর স্নেহময়।

—না!—আশা কঠিন ধমক দিল—আমাকে কোনো প্রশ্ন করবার আপনার অধিকার নেই। স্বামীর কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে সতীত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টাকেও আমি ঘৃণা করি। তাঁকে 'স্বামী' স্বীকার করতে আমার বাধে। মনে রাখবেন, আজ থেকে আমার স্বামীত্ব আপনাকে অর্জন করতে হবে। যদি না পারেন, আসবেন না। আমি এ-জন্মটা মার চরণ-সেবা করেই কাটিয়ে দেব।...

আশা বারান্দায় দাঁড়ালো গিয়ে।

মা একবার দেখলেন আশার চলে যাওয়া। তারপর আশিসকে বললেন,

—আমার চোখের সামনে তুই আমার ঘরের-লক্ষ্মীকে অপমান করলি, আশিস। বুঝলাম আমার উপরও তোর বিশ্বাস নেই। আমি জানতাম না, তুই এত নীচ্।

রাগে মার যেন কথা বেরুচ্ছে না—বললেন,—আমি ওর জন্য ওকালতি করতে চাই

নে আশিস। তার দরকার হবে না। তোকে আমি অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, 'চোখের জলে যেন তোর এই ভুল ভাঙ্গে!'

মা এসে আশার হাত ধরে টেনে নিয়ে বাইরের গাড়ীতে উঠলেন গিয়ে। দিব্যেন্দুবাবু আশিসকে বললেন,

—আশাকে আমরা সাত মাস দেখছি আশিস, তোমার মতো আমারও ভুল হয়েছিল। আমি সে ভুল সংশোধন করলেও, মা আমাকে মাফ করেনি আজও।

—আমি অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি, কাকাবাবু...

—প্রমাণ অকাট্য হয় না, আশিস। বিজ্ঞানের সূত্রই হোল 'সত্যও সীমিত'। তোমার সত্য-নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়গুলো সসীম, তাই তোমার জ্ঞাত সত্যও সসীম হতে বাধ্য। চলো, কংগ্রেসের সময় হয়েছে।

দুজনে বাইরে এসে দেখলেন, গাড়ীখানা মা আর আশাকে নিয়ে চলে গেল। নিরুপায় হয়ে ওরা ট্যাক্সি করে বিজ্ঞান-কংগ্রেসে গেলেন। আশিস ক্রমাগত ভাবছে কোথায় ভুল হয়েছে! ভুল যে হয়েছে, এ বিষয়ে আশিসের সন্দেহ নেই। আশার অসাধারণ তেজ, অনমনীয় দৃঢ়তা—তার সঙ্গে আপন জননীর কঠিন তিরস্কার আশিসকে বুঝিয়ে দিল সে অন্যায় করেছে, ভীষণ অন্যায় করেছে। আশা পরোক্ষে তাকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, আশিস ভদ্রসমাজের অযোগ্য। আশিস অপরিণামদর্শী। আশিস অনুপযুক্ত আশার স্বামীত্ব লাভের।...

এতোখানি যার মনের জোর, সে কি মেকী হতে পারে। না! আশার বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান তো করেনি আশিস! সত্যিই তো তাকে স্বামীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ সে দেয়নি।

থিসিস্‌খানা নিয়ে নীতীশ কোথায় গেল, তাও তো জানা হয়নি। নীতীশ, কি—কোথাও থিসিসটা দাখিল করেছে, এমন সংবাদও পায়নি আশিস। তাহলে ব্যাপারটা কি?

দিব্যেন্দুবাবু বললেন,

—নীতীশের ঢাকুরিয়ার বাসা খুলে একখানা চিঠি পাওয়া গেছে, যাতে সে এলাহাবাদ যাবার কথা লিখে গেছে।

এলাহাবাদ যাওয়ার কথা সত্যি নয়—কারণ, সেখানে গেলে হয়তো চিঠি লিখতো নীতীশ। কিন্তু গেল সে কোথায়? তার স্বগ্রাম তাপসীপুরেই গেল নাকি? কিন্তু চুরি যদি সে করে থাকে, তাহলে কলকাতার অত কাছে এবং আশিসের জানা জায়গায় থাকতে সাহস করবে কি করে? যাই হোক—নীতীশের খোঁজ করতে হবে ঠিক করে, আশিস বিজ্ঞানসভা শেষ হলে ডাঃ দিব্যেন্দুকে হোটেলে তুলে দিয়ে চন্দ্রিমা দেবীর বাসায় এসে শুনলো রাত্রি আটটায় 'এয়ার'-এ মা আর আশা কলকাতা চলে গেছেন।

খবরটা শুনে আশিস বাক্যহীন হয়ে গেল!

সন্ধ্যার আলোতে দেখলো কুমকুম অদ্ভুত-চেহারার নীতীশকে। একি সত্যি নীতীশ! বিশ্বাস করতে পারছে না কুমকুম। কিন্তু নীতীশ বেরিয়ে গেল একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে। হোমিওপ্যাথী ওষুধের ব্যাগ আর গলায় স্টেথিস্কোপ! কুমকুমের মনে হোল নীতীশ অত্যন্ত অসুস্থ। তবু কেন সে বেরুলো!...নীতীশের চোখ দুটো দেখে ভয় করছে কুমকুমের।

ঘরের বারান্দায় শাণ-বাঁধানো চেয়ারে বসলো কুমকুম—দরজায় তালা-বন্ধ করে গেছে নীতীশ। আশ্চর্য্য! কুমকুমকে এতো কাছে দেখে চিনলো না? একজন আধাবয়সী লোক যাচ্ছিলেন—কুমকুম তাকে প্রশ্ন করলো,

—নীতীশবাবু কোথায় গেলেন, বলতে পারেন?

—নীতীশ!—বলে থেমে গেলেন শম্ভু চক্রবর্তী।—আপনি কি কোনো রুগী?

—না। আমি তাঁর আত্মীয়া—আমাকে দেখেও উনি চলে গেলেন কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হোল ওঁকে। ওঁর কি অসুখ?

—হ্যাঁ, অসুখ নিয়েই এসেছিল এখানে মাস-সাতেক আগে। সে অসুখ ভাল হয়ে গেছে, কিন্তু তার পর থেকে ওর কেমন-যেন বিস্মৃতি ঘটেছে কোনো একটা ব্যাপারে। কোথাও খুন-জখম করে পালিয়ে এসেছিল মনে হয়!

—খু-ন?

—সেইরকম তো আন্দাজ করি আমরা। তবে এখন ও আর প্রকৃতিস্থ নেই। দিনরাত হোমিওপ্যাথী বই পড়ে। চিকিৎসা করে যত গরীব-দুঃখীদের। অবশ্য, চিকিৎসা খুবই ভাল করে। অনেক কঠিন রোগেও আরাম করলো এই ক'মাসে। কিন্তু কেমন-যেন আত্মবিস্মৃত—পূর্বের কথা কিছুই মনে করতে পারে না।

—সে কি! কিছু কি মনে করে বলতে পারেন না?

হ্যাঁ, বলে কত-কি! কিন্তু বোঝা যায় না, কি বলছে। আমরা ওর সঙ্গে আর খুব বেশী মেলামেশা করিনে, মা—বুঝছোই তো, খুনী আসামী! তুমি অপেক্ষা করো—ও এলেই বুঝতে পারবে।—

বলেই চলে গেলেন শম্ভুবাবু।

কুমকুম নিঃশব্দে বসে রইল সেই শাণের চেয়ারটায়। দু'দিনটি রুগী এল। গ্রামের গরীব লোক তারা, দেখেই বোঝা যায়। একটি মেয়ে, কোলে একটি শিশু। কুমকুমকে দেখে কাছে এসে শুধালো,

—ডাগদারবাবু কোথায় গেলেন?

—বাইরে। এখুনি আসবেন। তোমার হাতে কি?

—গাছের দুটি বেগুন। ডাগদারবাবুকে দেব। পয়সা তো নেই মা! উনিও চান না।

—উনি কেমন ওষুধ দেন?

—ভাল। খুব ভাল! আমাদের মা-বাপ! ওষুধ দেন, পয়সা নেন না। রাত দুপুরে রুগী দেখে বেড়ান।—কিন্তু মা, ওঁর খুব শরীর-খারাপ! খাওয়া-দাওয়া নাই, দিনরাত পড়া আর ওষুধ দেওয়া। আপনি বুঝি ওঁর...

—কে বলো তো?...কুমকুম হেসে শুধুলো।

—বউ—হেসে দিল মেয়েটি।—আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি এখনও—না?

—না—বলে কুমকুম ওকে আবার শুধালো,—ও নাকি আগের কথা কিছু বলতে পারে না?

—না, মা, তা কেন? কত-কি বলেন, আমরা বুঝি না। কিন্তু ওষুধ যা দেন, মা, এক দাগ কি দু'দাগেই ব্যামো সেরে যায়। ভদ্দরলোকেরা তো কেউ ওঁকে ডাকে না—উনি আমাদের গরীবদের বাড়ী-বাড়ী ঘুরে রোগী দেখে বেড়ান। নিজে রান্না করে খান—যে

যা দেন তাই সিদ্ধপক্ক, আর নাহয় মুড়ি-নারকেল।

—কে জানে, মা! ওকে কেউ ডাকে না, ওঁর সঙ্গে কেউ কথাও বলে না। গাঁয়ের—

কুমকুম ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছে না। আর কিছু প্রশ্ন না-করে বসে রইল। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে এল নীতীশ। এসেই আবৃত্তি করলো,

'—সতীর নয়ন-বহ্নি! জ্বাল্ তবে বহ্নিচক্র জ্বাল—
আশীর্বাদ পড়ুক এ শিরে...'

—হ্যাঁ, কার কি অসুখ? এদিকে এসো—এদিকে। দেখি হাতখানা—

—এই বেগুন দুটি আমার গাছে ফলেছে বাবা। প্রথম ফল।

—ও! প্রথম ফল প্রথম প্রেমের মতই অমৃত..না-না, বিষ! দাও! 'বিষষ্য বিষমৌষধম্'...তোমার খোকাকে দিচ্ছি 'ইপিকাক্ দু-শো, নাও। 'ইপিকাকে বিবমিষা লালা রক্তস্রাব—তিন দাগ। দুঘণ্টা অন্তর। বুঝলে? কাল খবর দিও—তুমি?...

নীতীশ পরের রোগীর খবর নিচ্ছে...পেট-ব্যাথাটা সারেনি এখনো? আচ্চা পেটব্যথা, ও আর কি এমন ব্যথা! ও কিছু না, জীবনের ব্যথা কত জানো?—জানো, বেঁচে থাকার ব্যথা কী ভয়ানক? জানো না!—হাঃ-হাঃ, পেটব্যথা! দেখি 'কলোসিন্থ-এ পেটব্যথা চাপে শান্তি হয়'...নাও, এক খোরাক—ব্যাস!...তোমার কি গো?...

কুমকুমের দিকে চাইল নীতীশ। কুমকুম কি বলবে! নীতীশই বলল,

—'সীতা আনিয়াছি। গৃহে! সীতা মোর মৃত্যু আশীর্বাদ' কি হয়েছে তোমার?...

—আমি কুমকুম। চিনতে পারছেন না? সেই মুরগী মসল্লাম...

—ও মাই গড্! কুমকুম কস্তুরী মৃগনাভী আমার ছিল নাকি? কৈ না তো! হ্যাঁ, আমার জীবনে 'আশা ছিল...আশা—বিষ—আশা নাগিনী! আশা-বহ্নি! বাট্...আই রিমেম্বার ইউ নাউ! কুমকুম...মুরগী-মসল্লাম, হ্যাঁ—আচ্ছা, কুমকুম, আমি অসুস্থ, দেখছো তো—তুমি বেগুনের মুরগী-মসল্লাম খাওয়াতে পার?

—হ্যাঁ। দেখি আপনার গা?—কুমকুম হাত দিল নীতীশের কপালে।

উত্তপ্ত অঙ্গ জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে যেন নীতীশের। কুমকুম নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক মিনিট, তারপর বলল,

—আপনার জ্বর হয়েছে, নীতীশদা—আসুন, শুইয়ে দিই।

—না। ও ম্যালেরিয়া অনেকদিন হয়েছে। ওষুধ খাইনি, আশা-বিষ খেয়েছি! এক সতীর স্বামীত্ব চুরি করা....আহা, না—আমি কারো কিছু চুরি করিনি—হ্যাঁ।—কুমকুম তোমার নাম? তোমাকে কোথায় দেখেছি বলো তো! নীতীশ চাইল কুমকুমের পানে।

—বর্দ্ধমানে। রমানাথবাবুর বাড়ীতে। মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ—কিন্তু তোমাকে তো আমি ছুঁইনি—তোমার স্বামীত্ব আমি চুরি করিনি! কারও কিছু চুরি করিনি আমি...আমি হোমিওপ্যাথ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করি গরীবদের। তুমি কেন এখানে এসেছ, কুমকুম? আমার কাছে কিছু পাওনা আছে?

—না, দেনা আছে! কুমকুমের চোখ জলে ভরে আসছে। বলল,—তোমাকে ভালোবাসতে এসেছি! তুমিই আমাকে বধূর সম্মান দিতে চেয়েছিলে...

—ও-ইয়েস্! চেয়েছিলাম নাকি? বেশ, তুমি নাও। আমার বধূ হবার যোগ্যতা তোমার আছে? আছে—আছে। গাঁয়ের কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না ; আমাকে ঘৃণা করে

ওরা—তুমি ভালবাসতে পারবে?

—হ্যাঁ। এসো তোমাকে শুইয়ে দিই।

দাও। ফুলশয্যা হোক তোমার সঙ্গে। কিন্তু ফুল এনো না—আমি সহ্য করতে পারবো না।

—কেন?—নীতীশের হাত ধরে বিছানায় নিয়ে যেতে-যেতে শুধুলো কুমকুম।

—জানো না? ফুল শুধু পুজোতে লাগে? অভাগার কবরে ফুল দিতে নেই! "গরীব-গোরে দীপ জ্বেলো না, দিও না কেউ ভুলে।"

নীতীশ কবিতা আবৃত্তি করেছে। কুমকুম ওকে শুইয়ে মাথায় জলপট্টি দিল। নীতীশ আবার আবৃত্তি করল,

—"শ্যামাপোকায় দাগা না পায়, ব্যথা না পায় বুলবুলে..."

—কি-সব বলছো তুমি?—কুমকুম ধমক দিল—'চুপ করো!'

—না।—"শত পুত্র সহস্র পৌত্রের চিতাবহ্নি জ্বলে মোর বুকে,

জ্বলে ভোগতৃষ্ণা অবিরাম—

আমার সোনার লঙ্কা দাউ দাউ করে দগ্ধ হয়ে যায়—

দগ্ধ হয় ব্যর্থ মনস্কাম—তবু আমি বেঁচে রবো?..."

—কি বলছো?

—রাবণ!—রাবণ—চুরি করে সীতার স্বামী হতে গিয়েছিল, স্ববংশে মরলে ব্যাটা?—পড়নি রামায়ণে?— "সীতা আনিয়াছি গৃহে—"

কুমকুম সুটকেস খুলে টাকা বের করে হাটতলায় গেল। কয়েকটা নিতান্ত দরকারী বস্তু কিনে ওখানকার ডাক্তারবাবুকেও ডেকে আনলো। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন,

—জ্বর খুব বেশী। কে জানে কিসে দাঁড়াবে!

—আঁ!—কুমকুমের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল—ভাল হবে তো, ডাক্তারবাবু?

—চেষ্টা করা যাক্! কিন্তু দামী-দামী ওষুধ দরকার। ওর তো টাকা-পয়সা কিছুই নেই—

—আমার আছে, ডাক্তারবাবু—আমার যা-কিছু সব টাকা, গহনা—দু'তিন হাজার টাকার গহনা—আপনি ওকে ভাল করুন, ডাক্তারবাবু!...কেঁদে ফেল্‌লো কুমকুম।

—আচ্ছা, মা, বুঝেছি! তোমাকে কি ও খবর দিয়েছিল?

—না। আমি হঠাৎ এসে পড়েছি।

ডাক্তার ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন। কুমকুম সমস্ত রাত্রি নীতীশের কপালে জলপট্টি দিল আর পাখার হাওয়া করলো। নীতীশ ক্রমাগত ভুল বকছে।

—ও—ও-ওঃ—বুকে হাত দিল নীতীশ।

—ব্যথা করছে বুকে?—কুমকুম শুধুলো।

—না, বুকে কেন? বুকে বিষ আছে? বিষস্য বিষমৌষধম্ 'Simili Similibus-Curantum' বুকে আশা—বহ্নি...ফুলবহ্নি,—ক্ষণবহ্নি—উঃ!—নীতীশ যন্ত্রণায় আর্ত হয়ে উঠলো।

তিনদিনের দিন ডাক্তার বললেন—'রোগটা ভাল মনে হচ্ছে না। আপনি অন্য ডাক্তার আনান।'

কুমকুম পাড়ার একটি ছেলেকে পাঠিয়ে বর্দ্ধমান থেকে বড় ডাক্তার আনালো। তিনি এসে পরীক্ষা করে বললেন,

—ডবল-নিউমোনিয়া। খুবই খারাপ অবস্থা! শুরু থেকে সাবধান না-হয়ে জ্বরের মধ্যে স্নান করেছে, ঘুরেছে—দুটো সাইড্-ই জখম...

ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে ডাক্তার চলে গেলেন, কিন্তু কোনো ভরসাই তিনি দিয়ে গেলেন না। নিরূপায় কুমকুম কী করবে, ভেবে পাচ্ছে না। বিশেষ কিছুই সে জানে না নীতীশের সম্বন্ধে। এ যেন নিয়তি! তাই নীতীশের এমন অসুখের সময় কুমকুম এসে পড়েছে। কিন্তু কী করবে কুমকুম। ওর কোথাও কেউ আত্মীয় আছে কিনা, সে জানে না। অবশেষে কুমকুম নীতীশের টিনের সুটকেসটা খুলে ফেললো ; যদি কারও চিঠিপত্র থাকে, যাতে ঠিকানা পেতে পরে। এ যাবৎ ওটা খোলা হয়নি মনে হয়। কাপড়-জামার তলায় কুমকুম পেল একখানা বড় খাম। সীল-করা। নাম লেখা : আশিস আচার্য্য—২৫, সূর্য্য সাহা লেন, কলিকাতা।' 'ইনি নিশ্চয় নীতীশের কোন আত্মীয়' ভেবে কুমকুম ঐ ঠিকানায় একখানা পোষ্টকার্ড লিখে দিল :

"মহাশয়, নীতীশ চট্টরাজ সম্ভবত আপনার বিশেষ পরিচিত। তিনি স্বগ্রাম তাপসীপুরে মৃত্যুশয্যায়। যদি সম্ভব হয় তো, অবিলম্বে এসে দেখা করবেন। ইতি : নিবেদিকা—কুমুদিনী।"

টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায় হাতের একগাছা চুড়ি বিক্রি করে কুমকুম ওষুধ আনালো। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে নীতীশের জীবন-দীপ নিবে আসছে। সে আর কথা বলে না, উপর পানে চেয়ে কি যেন ভাবে—মাঝে মাঝে শুধু একটি মাত্র কথা বলে :

—'আশা—আশা-বিষ! আশা বহ্নি!'...

একটা কুলুঙ্গীতে নীতীশের বান্ধবীর সেই ফটোখানা রয়েছে। কুমকুম জানে ঐ মেয়েটির নাম 'আশা'। ফটোটা এনে নীতীশকে দেখালো,

—দেখো তো!—চিনতে পারো?...

—না-না, এনো না! ও সীতা! নারী-চোর রাবণকে ও ধ্বংস করবে!... না, এনো না!—নীতীশ চিৎকার করে উঠলো,—কিন্তু মনে রেখো, রাবণ সবটাই চোর নয়! সে পাপীদের জন্য স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধতে চায়! সে সীতাকে-হাতে পেয়েও ভ্রষ্ট করেনি। সে পাপী হলেও কৃপার পাত্র! তার জন্য একটু কাঁদবে তোমরা, একটু কাঁদবে...

কুমকুম সত্যি কেঁদে ফেলে। নীতীশ বলতে থাকে,

কুমকুম আমাকে ভালবেসেছিল—জানো? কুমকুম একটা বাজারের মেয়ে, কিন্তু বাজারের মেয়েরাও 'মেয়ে'—তারাও ভালবাসতে জানে! তাদেরও প্রেম পবিত্র হতে পারে। তুমি বিশ্বাস করো না? উর্বশী অর্জ্জুনকে ভালোবাসলো, তুমি বিশ্বাস কর না! অর্জ্জুন সে-ভালবাসা নিল-না বলে অভিশাপ দিল উর্বশী...কুমকুম অভিশাপ দিল...

—না-না, কুমকুম তোমাকে অভিশাপ দেয়নি। না!—কুমকুম বার বার বলতে থাকে,—তুমি ভাল হও—কুমকুম তোমার সেবায় তার সারাজীবন শেষ করবে! ভাল হও তুমি...

কিন্তু ভাল হচ্ছে না নীতীশ! নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। কলকাতা থেকে আশিসবাবুও তো এলেন না! কুমকুম পথের পানে চেয়ে থাকে।

দুখানা মোটর এসে থামলো দরজায়। নামলেন কলকাতার এক বিখ্যাত ডাক্তার একখানা থেকে, অন্যটায় মা আর আশা। মা এসেই প্রশ্ন করলেন,

—তুমি কে মা? তুমি কি...?

—আমার পরিচয় এখন থাক্ মা—ওঁকে দেখুন! কুমকুম জবাব দিয়ে আশাকে দেখছে—হ্যাঁ—এরই ফটো! এরই নাম 'আশা'! ডাক্তার দেখলেন নীতীশকে। মাথা নাড়লেন তিনি! না, কোনো আশা নেই আর। বললেন,

—খুব দেরী হয়ে গেছে! এখন আর ওষুধ দেওয়া বৃথা।

—মা!—আশা আর্তকণ্ঠে ডেকে উঠলো।

নীতীশ আশার দিকে চেয়ে কি-যেন মনে করবার চেষ্টা করছে...

আশা গিয়ে নীতীশের কপালে হাত দিয়ে বলল,

—বলুন—কি বলতে চান বলুন। বলুন...

নীতীশ চাইল আশার মুখপানে। কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না। ও যেন মূক হয়ে গেছে। ডাক্তার বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আশা ভাবছে তার পবিত্রতার একমাত্র সাক্ষী 'মৃত্যুপথযাত্রী'। নীতীশের চোখে-মুখে জল দিয়ে সে আবার শুধলো,

—বলুন! কি বলছেন, বলুন...

না, নীতীশ কথা বলতে পারছে না।

বাক্যহারা আশিস কোনোরকমে বেরিয়ে এল চন্দ্রিমা দেবীর বাড়ী থেকে। কিন্তু সে ভাবছে, ক্রমাগত ভাবছে। কোথায় তার ভুল হয়েছে একটা। একটা সাংঘাতিক ভুল সে ধরতে পারেনি—কিন্তু কোথায় সে ভুল? কোনখানে?

নিজের বাসায় না-এসে আশিস আবার ছুটল ডাঃ দিব্যেন্দুর হোটেলে। বাসায় ফিরতে ওর মন চাইছে না—মা'র কঠিন তিরস্কার আশিসকে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে! তারপর আশার আশ্চর্য্য ভাষা :

"আমার স্বামীত্ব আপনাকে অর্জন করতে হবে। নইলে আসবেন না!" ওঃ, কী অসাধারণ জোরালো ওর মন! কী বজ্রকঠিন দৃঢ়তা। একবার একমুহূর্তের জন্য আত্মহারা হয়েছিল আশা কিন্তু পারক্ষণেই সহস্র সতী-শক্তিতে দক্ষ-যজ্ঞ বাধিয়ে দিল! এ মেয়ে অসতী? না-না-না!

আশার স্বামীত্ব সত্যিই ওকে অর্জন করতে হবে এবার। সে স্বামীর সাত-পাকের মালাবদলে নয়, সাত-সমুদ্রের জলতল থেকে মুক্ত তুলে আনতে হবে—নইলে আশাকে সে হারালো।

বোম্বাই-এর দয়ালচাঁদের কথা মনে পড়লো। তার বউ অঙ্গবিকৃতি দেখে হেসেছিল, তাই দয়াল তাকে নিয়ে ঘর করলো না। নির্বোধ দয়াল! প্রকৃতি তার মধ্যে অপরের হাসি-উদ্রেকের উপাদান দিয়েছেন—বউ-এর দোষ কি? ঐ সামান্য ব্যাপারে সংসার ছাড়লো দয়ালচাঁদ! আশিসই বা ওর থেকে বুদ্ধিমান কিসে? আশার সম্বন্ধে এবং নীতীশের বিষয়ে যথাযোগ্য না-করেই তো সেও সংসার ছেড়েছে প্রায়!...

হোটেলে এসে পৌঁছাল আশিস। ডাঃ রায় বললেন,

—কী ব্যাপার? এখুনি এলে আবার?

—মা বাড়ী চলে গেছেন, কাকাবাবু। মা আমাকে মাফ করবেন না।

—কেন করবেন! তুমি 'কালপ্রিট্'। তুমি—তুমি...আচ্ছা আশিস, কি দেখে তুমি আমার আশা-মার উপর সন্দেহ করলে? কী প্রমাণ?

—কালিচরণের কথা আমি অবিশ্বাস করতাম না, কাকাবাবু—কিন্তু?

—বলো, আর কি প্রমাণ তুমি পেয়েছিলে? বলো সব আমায়।

—মেঝেতে বিস্তর ফুল পড়েছিল—ভারী পায়ের জুতোয় সেগুলো পিসে গিয়েছিল—যাতে ছিল বাইরের কাদার দাগ...

—থামো থামো!—ডাঃ রায় চীৎকার করে উঠলেন, ইউ ফুল! ইউ ইডিয়ট্! ভালবেসে দেওয়া-ফুল কেউ জুতো দিয়ে মাড়ায় না, এইখানেই প্রমাণ হয় যে, মা আমার গঙ্গাজলের মত পরিষ্কার, পবিত্র। ওঃ,—ইউ আহাম্মক—ইউ জরদ্গব, ইউ জাম্বুবান...তোমার এই সাধারণ জ্ঞানটা হোল না!...

রাগে ডাঃ রায় টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করলেন। আশিসের মাথায় যেন চিন্তার বিদ্যুৎ রেখে গেল। কিন্তু ডাঃ রায়, আবার বললেন,

—গেট-আউট!—চলে যাও আমার সামনে থেকে! তুমি আমার 'মা'র অসম্মান করেছো। তুমি একটা 'ভিলেন'—একটা...একটা অতি নীচ! অতি বর্ব্বর...রাগে কথা বেরুচ্ছে না ডাঃ রায়ের মুখ থেকে।

—সবাই আমাকে তাড়াচ্ছেন, কাকাবাবু? কোথায় আমি দাঁড়াবো...

আশিসের কথাগুলো কান্নার মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু ডাঃ রায় বললেন,

—চোখের জল! চোখের জল ছাড়া তোমার আশ্রয় নেই। তুমি, তুমি 'ইডিয়ট্' তুমি একটা সতী মেয়ের চরিত্র নিয়ে, জীবন নিয়ে খেলা করবে?

—আমি তার কাছে দোষ স্বীকার করবো, কাকাবাবু।

—হ্যাঁ—যাও, এখুনি যাও—গো ইউ ম্যাস্ট। গো নাউ! যাও...

—সকালের 'প্লেন'-এ যাব আমি, কাকাবাবু!—আশিস প্রণাম করতে গেল।

—না, প্রণাম এখন নয়। আমার মায়ের হাত ধরে এসে প্রণাম করবে। সে-বেটির কাছে আমি অপরাধী হয়ে আছি। অল্ রাইট, সকালে যাবে। যাবেই—

ডাঃ রায় তৎক্ষণাৎ আশিসের যাবার ব্যবস্থার জন্য ফোন করলেন এরোপ্লেন-বুকিং-অফিসে। আশিসকে ওখানেই রাখলেন তিনি সে-রাত্রে। সকালে নিজে এসে তুলে দিলেন 'প্লেন'-এ।

আশিস কলকাতায় এল।

ট্যাক্সি করে বাড়ী পৌঁছে শুনলো মা এবং আশা গেছে তাপসীপুর। নীতীশের খুব অসুখ। আশিস এককাপ চা পর্যন্ত খেল না। তৎক্ষণাৎ ঐ ট্যাক্সিটা নিয়েই তাপসীপুর রওনা হোল।

দীর্ঘ পথ। বেলা শেষ হয়ে আসছে—অভুক্ত, অস্নাত আশিস প্রায় সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলো নীতীশের বাড়ীর কাছাকাছি। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে, হেঁটে এল সে নিঃশব্দে ঐ মিনিটখানেকের পথ—ট্যাক্সির আওয়াজে অসুবিধা হবার আশঙ্কায়। দেখলো, তাদের গাড়ী দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর বহু লোক বারান্দায় বসে-দাঁড়িয়ে।

ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছে না আশিস! এতো বেশী অসুখ নীতীশের?

কিংবা হয়তো এমন কিছু নয়—পল্লীগ্রামে ডাক্তার না পাওয়ার জন্য মাকে খবর দিয়েছে. কিন্তু অত লোক কেন? নীতীশ অবশ্য খুবই জনপ্রিয় এখানে, তাই গ্রামবাসীরা তাকে দেখতে এসেছে। কিন্তু সবাই কেমন যেন বিমর্ষ—বিষাদ-মলিন মুখ।

আশিস অতি ধীরে বারান্দায় উঠলো। কেউ কিছুই বললো না। বাইরে থেকেই দেখতে পাচ্ছে—ভেতরে নীতীশের জীর্ণ দেহখানা! তার দৃষ্টি সিলিং-এর দিকে—সে দৃষ্টিতে কোন ভাষা নেই, কোনো ভাব নেই।—সে যেন পাথরের চোখ! মাথার কাছে মা—পায়ের কাছে কে একজন অপরিচিতা। আর ওধারের জানালার রড ধরে আশা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে! আশিস ঘরে না ঢুকেই অবস্থানটা দেখে নিল।

—'মা' ;—ঘরে ঢুকে আশিস ডাক দিল।—

—আয়।—নীতীশ আমার আর নেই!—মা এতোক্ষণ কেঁদে ফেললেন—অভাগা ছেলে আমার, আত্মগ্লানি সহ্য করতে পারলো না—

—নীতীশ সত্যি নেই, মা!

—না! তুই যদি তখুনি ওর খোঁজ করতিস, আশিস...

ও অভিযোগের উত্তর আর কি দেবে আশিস—নিঃশব্দে চেয়ে রইল নীতীশেব মুখের পানে!

রাশি রাশি ফুল আনছে গ্রামের ছেলেরা নীতীশের মৃতদেহ সাজাবার জন্য। কুমকুম চীৎকার করে উঠলো,

—না! ফুল দেবেন না!—ফুল ও সহ্য করতে পারতো না।—না-না! ফুল আমি দিতে দেব না...

বিস্মিত আশিস প্রশ্ন করলো,—আপনি কেন এ কথা বলছেন, দিদি?

—ওর শেষ কথা 'গরীব গোরে দীপ জ্বেলো না, ফুল দিওনা কেউ ভুলে।..'

কুমকুমের মুখের সব-হারানো রিক্ততা—আশিস অসহায় চোখে দেখলো, তারপর শুধুলো,

—আপনি-ই কি মাকে খবর দিয়েছিলেন নীতীশের অসুখের? নীতীশ-ই কি বলেছিল ঠিকানা?

—না। আশিস আচার্য্য-র নামে একখানা সীল-করা খাম ছিল ওর বাক্সে, তাতেই ঠিকানা পাই...

—দেখি সে-খাম।

কুমকুম টিনের সুটকেস থেকে বের করে দিল সীল-করা খামটি।

আশিস শিরোনামাটা দেখলো, তারই নাম লেখা—সিল-করা ; রেজেষ্টারী করবার জন্যই সীল-করা হয়েছে, কিন্তু ডাকে পাঠানো হয়নি। খামের উপরে প্রেরকের নাম এবং তারিখও দেখলো আশিস : টাইপ-করা ক্লিপ-আঁটা থিসিস্‌খানা আর একখানা চিঠি রয়েছে।

চিঠিটা পড়ছে আর একবার করে নীতীশের খোলা চোখের পানে চাইছে আশিস—কিন্তু আশিস পড়তে পারছে না চিঠিখানা!...জল—জল—আর জল।

সাত সাগরের সমস্ত জল ওর চোখে।..

দীপ চাহে শিখা

বিজয়াদশমী!

এরকম আনন্দের দিন জীবনে কমই আসে! সর্বত্র আনন্দের ঢেউ—পথের দিকে তাকিয়ে তাই দেখছিল রমলা।

অসংখ্য ছেলেমেয়ের নানা রঙের পোশাক পরে পথ জুড়ে চলেছে প্যাণ্ডেলের দিকে। সেখানে রমলাই দিয়েছে হাজার টাকা চাঁদা।

টাকা তার আছে, দিয়েছে—বেশি কি আর দিয়েছে এমন? কিন্তু কেন দিল? না দেওয়াই তো উচিত ছিল তার। পাড়াতে সুনাম হবে, সকলেই বলবে—রমলা খুব দাতা, খুব ভক্তিময়ী, খুব পরার্থ পর মেয়ে।

কিন্তু কি দরকার এই সুনামের? খুব অন্যায় করেছে রমলা। অতগুলো টাকা দেওয়া উচিত হয়নি তার। না দিলেই ভালো হতো—এই সব কথাই ভাবছিল রমলা।

আজ চার-পাঁচদিন রমলার স্বামী বাড়িতে নেই। পুজোর কোনও আনন্দই জাগলো না ওর জীবনে। নিঃসঙ্গ দিন ক'টা শুধুমাত্র জানালা দিয়ে পুজো মন্ডপ দেখেই কাটিয়ে দিল। অবশ্য একবার সে গিয়েছিল মন্ডপে পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্যে। তবে সে আর কতক্ষণ?

কিছুই ভালো লাগছে না রমলার। স্বামীর আজ ফেরার কথা। গাড়ি গেছে স্টেশনে—হয়তো আধঘণ্টার মধ্যে এসে যাবে বিমল। আসুক। নইলে এভাবে একা কাটানো রমলার পক্ষে খুব কষ্টকর।

চাকর-ঝি যতই থাক—রমলা একা। স্বামী ছাড়া আর কেউ নেই—না পুত্র, না কন্যা। বহু চেষ্টা করেও সে সন্তানের জননী হতে পারলো না আজও। অদৃষ্ট!

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এর মধ্যেই প্রতিমা নিরঞ্জন আরম্ভ হয়ে গেছে। কত

রকমের আলো, কী অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত করে বিশ্বজননীকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা—দেখে আশা মেটে না। দেখছে সবাই—ছেলে-বুড়ো সকলেই।

মনের অবস্থা ভালো না থাকলেও রমলা তাই দেখছিল—বিশেষত দেখছিল ছেলে-মেয়ের দলকে। রঙিন প্রজাপতির মতো সুন্দর—মরসুমী ফুলের বিচিত্র বর্ণ—ঝরণার কাকলির মতো মধুর ওই শিশু-প্রবাহকে।

নিতান্ত বাচ্চা একটা ছেলে হাত দুটি বাড়িয়ে 'মা মা' করছে তারই দরজার কাছে। সুন্দর ছেলেটি। রমলার ইচ্ছে করছে, এক্ষুণি নীচে নেমে ওকে কোলে তুলে নেবে। কিন্তু ওই যে সুবেশা একটি তরুণী ছুটে এলো—তুলে নিল বাচ্চাটাকে! চুমা দিলো তার মুখে। দেখলো রমলা।

কী অপরূপ মাতৃত্ব ওই কাঁচাবয়সী মেয়েটার চোখেমুখে। রমলার প্রাণে তো অমন মাতৃত্ব জাগবে না—মা না হলেও বস্তু জাগে না। দূর হ'! রমলা সরে এলো জানালা থেকে।

সরে এলেই কি মন শান্ত হয়? না—রমলা চোখ মুছল। গাড়িটা এসে থামলো দরজায়। স্বামী এলেন—খবর শোনবার জন্যে উৎকণ্ঠিতা রমলা অপেক্ষা করছে—শুনতে পেল শিশুর কাকলি।

কে? এ বাড়িতে শিশুর কাকলি কেমন করে আসবে? আশ্চর্য! হ্যাঁ, শিশুই—কোলে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো বিমল।

একটি মেয়ে—দুধে-আলতায় রঙ—চমৎকার মুখশ্রী। গায়ে একটা লাল টুকটুকে সিল্কের ফ্রক—কচি হাত বাড়িয়ে বলছে মা, মা!

—কে? কার মেয়ে?

বলতে বলতে রমলা হাত বাড়ালো। খুকিও চলে এলো কোলে। গাল দুটি একটু টিপে হাসিমুখে রমলা আবার শুধালো—কোথায় পেলে? কার মেয়ে?

—মেয়ে এখন তোমারই। বলে, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিমল বললো—ওর মা মহাষ্টমীর দিন মহাযাত্রা করেছে। বন্ধুটি বিব্রত ওকে নিয়ে। কোথায় রাখবে, কি করবে ভাবছিল। তাই বললাম, আমাকেই দে—রমলাই ওকে মানুষ করবে—পারবে তো তুমি?

—পারবো না কেন? এমন ঘর আলো-করা মেয়ে—কি নাম?

—চিনি—চিন্ময়ী! তবে চিনিই ওকে বলে ওর বাবা।

—খুব ভালো। চিনি খুব ভালো নাম। তোমার বন্ধু তাহলে আবার বিয়ে করবেন, কেমন?

—তা করবে বৈকি! তার বয়স তো আমার থেকে বেশি নয়—বত্রিশ মাত্র।

—বেশ, তিনি যা খুশী করুন। তবে পরে তিনি এ মেয়ের ওপর তাঁর অধিকার দাবী করবেন না তো?

—না। সে তার সব অধিকার ছেড়ে দিয়েছে। ও এখন তোমার।

খুশীতে ঝলমলে হয়ে উঠলো রমলা! মেয়েটা তার গলায় দু'হাত জড়িয়ে পরম নিশ্চিন্তে বুকের ভেতরে শুয়ে রয়েছে।

কী কোমল স্পর্শ! কী অপরূপ আনন্দময় অনুভূতি! রমলার বুভুক্ষু বুক জুড়িয়ে গেল।

—তুমি জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নাও। আমি একে নিয়ে একবার মা-দুর্গার কাছে গড় করিয়ে আনি।

—যাও। আমার জন্যে কোনও চিন্তা নেই। যাও, প্রণাম করে এস।

রমলা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল চিনিকে বুকে নিয়ে! মাত্র মিনিটখানেক সময় লাগলো বিশ্বজননী দশভুজার পূজামণ্ডপে যেতে।

রমলা দেখলো, বিসর্জনের পূর্বে পাড়ার সব মেয়ে বিশ্ব-মায়ে বিদায়-পূর্ব জলযোগ করাচ্ছেন। বহু বিচিত্র-বেশ নারী-কুমারী-তরুণী-প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধারাও এসেছেন। বাঁড়ুজ্যেবাড়ির মেজগিন্নী সকলের সুপরিচিত এবং সকলের শ্রদ্ধাভাজনীয়া। রমলাকে দেখেই বললেন,

—এসো মা, এসো। বাঃ, কি সুন্দর মেয়েটি! কার মেয়ে?

—আমার স্বামীর এক বন্ধুর মেয়ে! ক'দিন আগে এর মা মারা গেছে।

—আহা! তাহলে কি হবে! কোথায় থাকবে মেয়েটি?

থাকবে আমার কাছেই। ওকে মানুষ করবার ভার আমিই নিলাম।

—খুব ভালো করেছো মা—ওর পরে তোমার নিজেরও ছেলেমেয়ে হোক।

কথাটা বললে মেজগিন্নী। স্বধর্মনিষ্ঠা ও স্বামীসেবায় এবং সকলের কল্যাণের কাজে সাধ্যমতো সাহায্যের জন্যে ইনি এই পাড়ায় খ্যাতিসম্পন্না। এঁর কথা

শুনে রমলার মনে অগাধ আশা জেগে উঠলো। এই চিনির পয়ে তার নিজের ছেলে-মেয়েও তো হতে পারে!

হয়ও তো এমন—অনেক ক্ষেত্রেই হয়।

রমলা দুর্গাপ্রতিমার কাছে প্রার্থনা করলো—মেজগিন্নীর কথা যেন সত্যি হয় মা। ও চিনিকে প্রণাম করালো এবং আর যা করাবার করালো। দীর্ঘক্ষণ পরে ঘুমন্ত চিনিকে বুকে নিয়ে ফিরে এলো রমলা।

—কেমন লাগছে? বিমল বললো।

—ভালো, খুব ভালো! ওর জন্যে কালই একটা বাচ্চা-গাড়ি কিনে দাও। আর কিছু জামা-কাপড়।

—জামা-কাপড় ওর আছে—এনেছি! গাড়ি কিনে নিও কাল!

—আচ্ছা!

চিনিকে বুকে নিয়ে ঘুমলো রমলা সেদিন।

পরদিন থেকেই রমলা আরম্ভ করলো মেয়ের জন্যে নানা ব্যবস্থা। তার রকমারি পোশাক তো নিলোই—নিজেও তৈরী করলো কত রকমের। রকমারি পুতুলে আর খেলনায় বোঝাই করে ফেললো বাড়িখানা। দোলনা থেকে প্যারাম্বুলেটার পর্যন্ত এলো—আর এলো একটা শক্তসমর্থ ঝি—যার মাই-দুধ চিনি খেতে পারবে। অর্থাৎ রমলা মেয়েটাকে সুন্দরভাবে মানুষ করবার জন্যে কোনো ত্রুটিই রাখলো না। নিজের মেয়েকেও অতখানি যত্নে কেউ মানুষ করে না। বলে না দিলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে, চিনি তার নিজের মেয়ে নয়।

পাঁচ বছর পড়তেই রমলা মহাসমারোহ করে হাতে-খড়ি দিল চিনির। মাষ্টার রাখল ভালো একজন, তাকে পড়াবার জন্যে। সেই সঙ্গে নাচ-গানও যাতে চিনি শিখতে পারে, তার ব্যবস্থাও করলো সে। অভাব তার নেই। স্বামী তার বিত্তবান, অতএব কোনও ত্রুটিই রাখলো না কোনোদিক থেকে।

ঠিক এই সময় রমলার হোল একটি মেয়ে। চিনির মতো সুন্দরি না হলেও মেয়ে তার ভালোই হয়েছে দেখতে। রমলা নাম মিলিয়ে মেয়ের নাম রাখলো মৃণ্ময়ী অর্থাৎ মিনি।

চিনি-মিনি বড় হচ্ছে। পাড়ার লোকেদের প্রায় সবারই ধারণা যে, ওরা দু-

বোন। মিনি দু'বছরের হতে না হতেই রমলার একটি পুত্র জন্মাল। রমলা নাম রাখলো হিরণ্ময়।

অতঃপর চিনি-মিনি-হিরণ শুক্লপক্ষের শশীর ন্যায় দিন-দিন বাড়তে লাগলো। চিনির বয়স সাত—মিনির দুই—হিরণের মাস-কয়েক মাত্র। ভালোই চলেছে ওদের জীবনযাত্রা।

হঠাৎ সেদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে চিনি দাঁড়ালো রমলার কাছে। মুখখানা শুকনো—চোখদুটো ছলছল করছে।

—কি হলো? রমলা জিজ্ঞাসা করলো।

—কে জানে?

—দেখি। রমলা গায়ে-গলায় হাত দিল, কপাল দেখলো। তারপর বললো—জ্বর। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। যাও, চুপ করে শুয়ে থাকগে।

চিনি এসে নিজের ছোট্ট বিছানায় শুয়ে পড়লো। জ্বর—বেশি জ্বর। চোখ লাল হয়েছে—মাথা ঘুরছে, সর্বাঙ্গ টলছে। রাত কতো কে জানে?

চিনি জ্বরের ঘোরে উঠে পড়লো। ওপাশে মা'র ঘরে যাবে। হঠাৎ পড়ে গেল বারান্দায়—মাগো!

চীৎকারটা শুনে তখনি ওর কাছে শুয়ে থাকা ঝি উঠলো। সে এসে দেখলো চিনি পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেছে। রমলাকে ডাক দিল সে। গভীর ঘুম থেকে জেগে রমলা বিরক্তির সুরে বললো,

—হলো কি?

—চিনি জ্বরের ঘোরে উঠে এসেছিল। হঠাৎ পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। জ্বর খুব বেশি। আপনি আসুন মা।

রমলা উঠে এলো। উঠে এলো বিমলও। চিনিকে তুলে আনা হলো তার বিছানায়। ফোন করে গৃহ-চিকিৎসককে ডাকা হলো। তিনি এসে বললেন—জ্বরটা খারাপ—সম্ভবত টাইফয়েড রূপ নেবে। পড়ে যাওয়ায় খুব খারাপ হয়েছে। ডান হাত চেপে পড়েছে, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে একে জ্বরাতিসার বলে—সাবধান থাকবেন।

ডাক্তার ওষুধ-ইনজেক্সন যা দেবার দিয়ে চলে গেলেন।

উঠে অবশ্য এসেছিল রমলা, তবে অনেক পরে। কারণ, হিরণের শরীর

ভালো নেই। তাকে ঘুম পাড়াতে অনেকটা রাত হয়েছিল সেদিন—ডাক্তার এলে পর তবে রমলা এসেছিল।

উঠতে দেরি হওয়ার জন্যে লজ্জিত হওয়া উচিত ওর, কিন্তু লজ্জার কোনো রকম চিহ্ন রমলার মুখে দেখা গেল না। বরং সে বিরক্তই হলো নিজের ছেলের শরীর ভালো নেই বলে—তারপর এই ঝামেলা! কেমন যেন অস্বস্তিতে ভরে তুলেছে ওর মন—তবু সে এলো, দেখলো চিনিকে।

অজ্ঞানে চিনি 'মা মা' করছে। মাথায়-কপালে হাত দিল রমলা। জ্বর খুব বেশি নেই—আঘাতের জন্যেই অচৈতন্য হয়ে গেছে চিনি।

ওষুধ-ইন্‌জেকশন চলতে লাগলো যথারীতি—জ্ঞানও হলো। কিন্তু ডান হাতটা নাড়তে পারছে না—কাঁদছে।

ডাক্তার দেখে বললেন—হয়তো হাতখানা চিরদিনের মতো অকর্মণ্য হয়ে যাবে।

এতবড় একটা বিপদের কথা চিন্তা করেনি বিমল বা রমলা। কিন্তু বিপদ আসার আগেই যখন আশঙ্কা হলো, তখন তাকে মেনে নিতে হয়। উপায় কিছু নেই, তবু বিমল চিনির বাবাকে খবর দিল।

চিনির বাবা এর মধ্যে দ্বিতীয়বার 'দার' পরিগ্রহ করেছেন এবং এই কয়েক বছরে দু'তিনটি পুত্র-কন্যার পিতাও হয়েছেন। তিনি লিখেছেন, চিনির সব ভার তুমি নিয়েছ। অতএব তার আর কিছু করবার নেই। আরও কারণ, সৎমা কখনও তার সেবাযত্ন করবে না...

আশ্চর্য এই যে চিনিকে চোখের দেখা দেখবার জন্যেও তিনি এলেন না একদিনের জন্যে।

বিমল খুবই দুঃখিত হলো। রমলা বললো—সৎমা হয় জানি, সৎবাবা হয় জানতাম না।

রমলার রাগ এইজন্যে যে, চিনির বাবা এসে ওকে নিয়ে গেলে তার বহু ঝঞ্ঝাট বেঁচে যেত। এই ফালতু ঝামেলা রমলা যেন সহ্য করতে পারছে না। কারণ চিনির অসুখ সারছেই না—দিনে দিনে বাড়ছে।

প্রায় তিন মাস পরে ডাক্তার জানালেন—চিনির ডান অঙ্গ অর্থাৎ হাত এবং পা অসাড় হয়ে আসছে। ওকে যেন নড়তে দেওয়া না হয়। নড়লে আর সারাবার উপায় থাকবে না।

ডাক্তার যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন অদূরে শায়িতা চিনি শুনছিল। 'হাত-পা যেন না নড়ে। নড়লে আর ভালো হবে না' ইত্যাদি সবই শুনলো চিনি। তার শিশু-মনে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ভাবলো তার হাত-পা অবশ হয়ে গেছে।

অর্থাৎ চিনি সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে গেল। ওর দ্বারা পৃথিবীর কোনো কাজই হবে না, অথচ বেঁচে থাকবে, আর তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য শুধু টাকাই নয়, বিস্তর হেফাজতের দরকার হবে। এর মধ্যেই তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে—ডাক্তার, ওষুধ, আর ঝি-চাকর-নার্সের বাড়াবাড়িতে।

এতসব বাড়াবাড়ি পছন্দ করছে না রমলা। কিন্তু বিমল এই সব ব্যবস্থা করেছে। চিনির অসুখ মাসখানেক পরেই রমলা প্রস্তাব করেছিল, তাকে কোনও ইনভ্যালিডদের হোমে দেওয়া হোক। খরচ যা লাগবে সবই দেওয়া হবে। বিমল সে প্রস্তাব গ্রহণ করেনি, বরং কথাটায় আপত্তি করেছিল।

বিমল সম্পন্ন ব্যক্তি। ব্যবসা তার ভালো চলে এবং চিনি আসার পর থেকে আরো ভালো চলছে। পৈত্রিক ভবন ছাড়া আরো দু'খানা বাড়ি এর মধ্যে করেছে বিমল, দু' মেয়ে অর্থাৎ চিনি-মিনির জন্যে।

রমলা এতটা পছন্দ করে না। যে রমলা একদিন চিনির জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিল আজ তার এই পরিবর্তন বিমলের চোখ এড়ায়নি। কিন্তু কিছু করবার ছিল না। জানা কথা এই রকমই হয়।

বিমল নিজে সব সময় চিনির তদ্বির করে। প্রতি সকালে সে তার কাছে এসে বসে—চা খাওয়ায়। অফিস যাওয়ার সময় তার সঙ্গে দেখা করে তবে যায়। অফিস থেকে ফেরার সময় প্রতিদিন সামান্য কিছু একটা আনে—খাবার, না হয় খেলনা, অথবা বই।

বই পেলেই চিনি খুশি হয়। তাই বেশির ভাগ দিন বই-ই আনে, বিমল। নানা রকমের বই—গল্প থাকে, বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী থাকে, দেশ-বিদেশের বহু তথ্যপূর্ণ ভ্রমণ কাহিনীও থাকে। আর থাকে ভারতের মহান পুরুষ ও নারীর জীবন-কাহিনী।

পড়ায় অত্যন্ত আগ্রহ চিনির। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ার পরেই তার এই অসুখ। পড়া এখন বন্ধ আছে, কিন্তু বিমল একদিন প্রস্তাব করলো—

—পড়তে চাস চিনি?

—হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ আমি পড়ব। পড়াবে না আমায়?

—নিশ্চয় পড়াব মা। যতটা তোর ইচ্ছে, ঘরে বসেই পড়বি।

পরদিন বিমল বন্দোবস্ত করলো প্রাইভেট পড়ার। কিন্তু বাদ সাধলো রমলা। বিরক্ত হয়ে বললো,

—এখন ওই ঘরটাতেই পাঠশালা খুলবে নাকি?

—না, তোমার কোনো চিন্তা নেই। ওকে আমি তিনতলার ছাদের ঘরে তুলে দিচ্ছি, সেখানেই ও থাকবে। ঘর একটা আছে, ছাদটা পাবে আর পাবে মুক্ত আকাশ।

এই বলে বিমল দু'জন চাকর দিয়ে চিনিকে তুলে আনলো চিলে-কোঠার সংলগ্ন ঘরটায়। আলো পাখা ছিল না, করিয়ে দিল। খাট-বিছানা, টেবিল-চেয়ার আলমারি সবই আনিয়ে দিল। আর দিল একটা চার-চাকার গাড়ি। রবার দেওয়া চাকা-যার ওপর বসে চিনি ছাদটার সর্বত্র ইচ্ছামতো ঘুরতে পারবে বাঁ-হাত আর বাঁ-পা দিয়ে প্যাডেল চালিয়ে।

একজন ঝি রাখলো সর্বক্ষণ তাকে দেখবে। সকাল-সন্ধ্যায় দু'জন মাষ্টার এসে পড়িয়ে যাবে। সব ব্যবস্থাই পাকা করে দিল বিমল, রমলার ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও। বিমল গ্রাহ্য করলো না তার কোনও কথা। চিনি বয়সে যতই ছোট হোক, বুদ্ধি তার কিছু কম নেই। সে দেখলো, বুঝলো এইসব ব্যাপার, আর মা-বাবার কথার মধ্যে জেনে ফেললো বিমল বা রমলা তার সত্যিকার বাবা-মা নয়।

অতটুকু মেয়ের মনে এই সত্যি কথাটা কম আঘাত করেনি। তবু বিমলের অগাধ স্নেহ-যত্ন ভালোবাসায় চিনির সয়ে গিয়েছিল সেটা। কিন্তু সেদিন হঠাৎ সে শুনতে পেল,

—ওকে দিয়ে হবে কি? ওতো আর ভালো হবে না। ডাক্তার বলেছে, ডান অঙ্গ ওর চিরদিনের জন্য অবশ হয়ে গেল। এখন সারাজীবন ওকে নিয়ে দগ্ধে মর।

—মরতে তোমাকে হবে না, রমলা। আমি ওকে এনেছিলাম, মরতে হয় আমিই মরবো। তোমার ইচ্ছে হয়তো দিনান্তে একবার ওর খবর নিও, ইচ্ছে না হয় তো নিও না। কোনও অনুযোগ আমি করবো না তা নিয়ে।

—বেশ, তাই হবে। যা খুশী করো গিয়ে। আমি কিন্তু ওই বারোমেসে রুগীর সেবা করতে পারবো না।

—না, তোমায় করতে হবে না। বলেই বিমল চিনির জন্যে চিলে-কোঠার সংলগ্ন ঘরটার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

চিনি এ জীবনে আর ভালো হবে না, এ সত্য সে জেনে ফেলেছে। ডান পা, ডান হাত সে নাড়তে পারে না—নাড়েও না। ডাক্তারের নিষেধ ছিল বরাবর। তাঁর আদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

এখন আর ডাক্তার আসে না।

চিনির ধারণা, হাত-পা নাড়লে সে বাঁচবে না। মরতে তার বড় ভয় করে। কে জানে, মরলে আরও কত কষ্ট হবে? আবার হয়তো কোন্ পাতানো মা-বাবার হাতে গিয়ে পড়বে; হয়তো খেতে পাবে না সেখানে সে—হয়তো মারধোর জুটবে বরাতে। তা শিশু-মনে এইসব নানা চিন্তার উদয় হয়। তাই মরতে তার ইচ্ছে নেই।

পড়তে চায়, কারণ তাছাড়া কিছু আর করবার নেই। আর সারাদিন, সারারাত শুয়ে শুয়ে কি কাটানো যায়? তাই বিমলের পড়ার প্রস্তাব চিনি সাগ্রহে গ্রহণ করলো।

টিউটর আসেন সকালে একজন—বিকেলে অন্য একজন। পড়ান তাঁরা চিনিকে—খুব যত্ন করেই পড়ান। এঁরা দুজনেই বৃদ্ধ—অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তাছাড়া সন্ধ্যায় আসেন একজন দিদিমণি—চিনিকে গান শেখান।

বিমল কোনো ত্রুটি রাখেনি চিনির জন্যে। পড়ানো এবং গান শেখানোর সব ব্যবস্থা করার পরে ছাদের ওপর একটা বাগান তৈরি করিয়ে দিল—দোলনা খাটিয়ে দিল—খাঁচার মধ্যে কয়েকটা পাখী রেখে দিল। দিন কয়েক হলো একটা টব সমেত কতকগুলো রঙিন মাছ কিনে এনেছে বিমল—সেটা রাখলো চিনির ঘরের একপাশে।

বলা বাহুল্য, এসব রমলার প্রীতিপদ নয়, কিন্তু বলা চলে না। বললেও শুনবে না বিমল। চিনিকে ও শুধু ভালোবাসে না, নিজের ছেলেমেয়ের থেকেও বেশি ভালোবাসে। অফিস থেকে ফিরে ও সটান চলে যায় চিনির ঘরে। ওকে আদর করে, তার জন্যে আনা কিছু উপহার দিয়ে তবে আসে নীচে।

একা চিনির জন্যে যা খরচ হচ্ছে, রমলার দুটো ছেলেমেয়ের জন্যে তা হয় না। ওরা কিছু চাইলে বলে,

—তোমার মাকে বলোগে, কিনে দেবে।

—বাবার কাছ থেকেও ওদের কিছু পেতে সাধ জাগে, বুঝলে? রমলা ঝঙ্কার দেয়।

—হ্যাঁ, বিমল শান্তস্বরে বলে—ছাদের ওই মেয়েটারও মা'র স্নেহ পেতে সাধ জাগে।

রমলা চুপ করে যায়। কারণ, বিমল অল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বেশি কথা সে বলে না, তবে যতটুকু বলে, নির্মম ভাষায় বলে। রমলা থই পায় না। সে যে চিনি সম্বন্ধে এতখানি উদাসীন, এ সত্য রমলার নিজের জানা। তাই নিজেকে সে ও বিষয়ে যথাসাধ্য এড়িয়ে রাখে, কারণ এটা অপরাধ।

নিঃসন্তান রমলার কোলে যেদিন চিনি এসেছিল, সেই দিনটা বিমল স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল একদিন কথা প্রসঙ্গে।

—নারীর আত্মীয়তা শুধু আত্মজনকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। পুরুষের আত্মীয়তা পৃথিবীর প্রতিটি পরমাণুতে। নারী এইজন্যে সীমিতা—অসীমের সন্ধান সে পাবে কি করে?

কথাটার এমন একটা জ্বালা ছিল যে, রমলা বেশ কিছুক্ষণ মূক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল,

—নারীর বিশ্বপ্রেম কি নেই বলতে চাও?

—আছে কোটিতে একটি। তুমি অন্তত তার মধ্যে পড় না।

রাগে লাল হয়ে উঠেছিল রমলা। কিন্তু কিছু সে বলতে পারে নি। ভেবেছিল, নিজের ব্যবহারটাকে কিছুটা উদার করে চিনির সম্বন্ধে খানিকটা স্নেহ সহানুভূতি দেখাবে সে। করেও ছিল কয়েকদিন সে-চেষ্টা; কিন্তু মনে যার স্নেহ নেই, বাইরের আচরণকে সে ক' দিন ঠিক রাখতে পারে? অল্প ক' দিন পরেই আবার চিনির সম্বন্ধে রমলা উদাসীন হয়ে উঠলো।

এই নিয়ে হয়তো বিমলের সঙ্গে রমলার মন-কষাকষি হতে পারতো, কিন্তু

হলো না। তার কারণ, বিমলের সতর্কতা। সে নিঃশব্দে রমলার সব কিছু সহ্য করে একাই চিনির জন্যে সব ব্যবস্থা করে যাচ্ছে।

চিনির ডান-অঙ্গ অবশ, তাই বাম হাতে তাকে লেখা অভ্যাস করতে হলো। অল্প বয়স তার, অসুবিধা হলো না। স্বল্পায়াসে তা আয়ত্তে এলো। বাঁ-হাতে ভালোই লিখে যায় এখন সে, ঠিক ডান হাতের মতোই স্বচ্ছন্দে।

গলা ভালো—গানও ভালোই শিখেছে চিনি। তার যথেষ্ট আগ্রহ—ভালোভাবেই পড়ছে। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করলো সে প্রাইভেটে তিন বছরের মধ্যে।

রমলার ছেলেমেয়েরাও বড় হচ্ছে। তারাও পড়ছে। বেসিক থেকে বড় স্কুলে পড়তে এলো তারা। মিনি পড়ে ক্লাস ফাইভে, আর হিরণ পড়ে ক্লাস টু-তে। ওদের জন্যেও এবার গৃহশিক্ষক রাখা দরকার।

রমলা নিজেই একজন শিক্ষিকাকে নিযুক্ত করলো। কিন্তু মিনি বা হিরণ তাঁর কাছে পড়তে রাজী নয়। তারা পালিয়ে আসে এবং একেবারে ছাদের ঘরে উঠে যায় চিনির কাছে।

—দিদি, ওই যে মাস্টারনী এসেছে, ওর কাছে পড়াশোনা হবে না।

—কেন? কেন রে?

—ওর কাছে পড়বো না। তোমার কাছে পড়বো।

—মা বকবেন। যাও পড়োগে।

—না, গল্প বলো। পড়া এখন থাক।

—মা বকবেন। বলে, চিনি বারবার মা'র বকুনির ভয় দেখায়। কিন্তু মিনি বা হিরণ শোনে না।

না যাওয়ার জন্যে রমলা ওদের বকাবকি করবে, জানা কথা। তথাপি চিনি খুবজোর করতে পারে না এইজন্যেই যে, ওই ভাই-বোন দুটি তাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে।

ওরা সব সময় চিনির কাছে থাকতে চায়। খেলা তো করেই। যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ওরা নানারকম গল্প শোনে—রূপকথা, বিজ্ঞানের কথা, বিচিত্র দেশ আর জন্তু-জানোয়ারের কথা। বহু রঙিন বই—বহু খেলনার পুতুল

আছে চিনির। সেগুলো মিনি আর হিরণ পায় ওর কাছ থেকে—এও একটা মস্ত প্রলোভন।

রমলা অবশ্য খুবই বিরক্ত হয়, কিন্তু উপায় নেই। ছেলেমেয়েদের দিদি-অন্ত প্রাণ। তারা সুবিধে পেলেই চলে যায় চিনির কাছে। তাতে রমলার একটা মস্ত সুবিধা ছেলেমেয়েদের ঝঞ্ঝাট তার কম হয়।

ওপরের চিলে-কোঠার সংলগ্ন ঘরখানা এবং তৎসংলগ্ন ছাদটি চিনির থাকবার এবং বেড়াবার জায়গা। সঙ্গী মাত্র মিনি আর হিরণ। তাই ওদের খুবই ভালো লাগে তার। আর মিনি হিরণও দিদির কাছ-ছাড়া হতে চায় না, গল্প এবং খেলনার লোভে।

বাবা অফিস থেকে ফিরে সর্বাগ্রে চিনির খবর নেবেন, এ তো স্বতঃসিদ্ধ। কোনওদিন এর ব্যতিক্রম হয় না। রমলার খুবই খারাপ লাগে সর্বাগ্রে চিনির খবর নিতে যাওয়া। অনুযোগের অন্ত থাকে না, কিন্তু বিমল গ্রাহ্য করে না। সে নিঃশব্দে তার কর্তব্য হিসাবেই এটা করে যায়। তার মনে হয়, ছোট্ট শিশু চিনিকে সে কন্যাস্নেহে রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই এনেছিল একদিন। সে কর্তব্য সর্বাবস্থাতেই মেনে চলতে হবে তাকে।

চিনি পড়ছে। বুদ্ধি তার প্রখর। পাশ করে চলেছে বারবার। গানও শিখছে ভালোই। বিমল ওকে একটা ভালো চাকরি জুটিয়ে দেবে, এই তার ইচ্ছে।

প্রফেসারি চাকরি হলেই ভালো হয়। তাই এম. এ. পরীক্ষার আগে বিমল তাক সাবধান করে দিল, সে যেন ভালোভাবে পাশ করতে পারে। ফার্স্ট ক্লাস পেলে খুবই ভালো হয়। তাহলে প্রফেসারি পাওয়া সহজ হবে! সেইজন্য বিমল দু'জন নাম করা প্রফেসর রেখে দিল চিনিকে পড়াবার জন্যে মোটা মাইনে কবুল করে। এই ব্যাপার দেখে রমলা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। মুখখানা বিকৃত করে বললো,

—নিজের ছেলেমেয়ের জন্যে একটা বুড়ো পণ্ডিত, আর কোথাকার কে তার জন্যে তিনশ' টাকা মাইনের প্রফেসর! লজ্জাও করে না!

—লজ্জা তোমারই পাওয়া উচিত রমলা। তুমি এতটা নীচ আমি জানতাম না। কিন্তু শোন, তোমার ছেলেমেয়ের ধনসম্পত্তির অংশ চিনি নেবে না। শুধু তাকে আমি একটু ভালোভাবে মানুষ করে দিতে চাই, যাতে সে তার ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্ট না পায়। এটুকুও তুমি সহ্য করবে না।

—অত কিসের জন্য। যথেষ্ট হয়েছে আর নয়। এখন বিদেয় করে দাও। যাঁর মেয়ে তিনি নিয়ে যান।

—আমি যখন এনেছি তখন আমারই মেয়ে। বিদেয় করা আর সম্ভব নয় এখন। অবশ্য ওর চাকরি হলে ও আপনিই চলে যাবে।

আপন সন্তানের জন্যে ভালো ব্যবস্থা কিছু করতে পারে না রমলা। অবশ্য একথা সত্য যে, মন্দ ব্যবস্থা কিছু নেই মিনি বা হিরণের জন্যে। কিছুমাত্র ত্রুটি রাখেনি বিমল। তাদেরও সুখ-সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ, পড়াশোনার ব্যবস্থা এবং পোশাক-পরিচ্ছদ সবই ঠিক আছে। অধিকিন্তু তারা বাড়ির বাইরে যেতে পারে, নানারকম খেলাধূলো আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেয়। চিনির সম্বল মাত্র ছাদের এই ঘরখানি, আর তারই সংলগ্ন কৃত্রিম উদ্যান, মাথার ওপর আকাশ, আর পড়ার জন্যে বই, মাস্টার এবং সঙ্গীতচর্চার সামান্য সরঞ্জাম।

ঈর্ষা বা হিংসার কোনো কারণ নেই, তবু রমলার ঈর্ষা জাগে। তার মনে হয়, ওই কোথাকার কে মেয়েটা এসে তার আপন সন্তানদের ন্যায্য প্রাপ্যটুকু কেড়ে নিয়ে, ভাগ বসাচ্ছে। ওকে বিদায় করতে পারলেই সুখী হয় রমলা।

আশ্চর্য মানুষের মন—বিশেষ করে নারীর মন। এই রমলাই একদিন চিনিকে বুকে নিয়ে গর্বভরে ঘুরে বেড়িয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশীকে সগর্বে বলেছে, চিনি তার নিজের মেয়ে। কিন্তু থাক্ সেকথা।

সংসারে যা হবার তাই হয় রমলার ঈর্ষা হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। বিমল চিনিকে আত্মজা দুহিতা অপেক্ষা কিছু কম স্নেহের চোখে দেখে না; বরং বেশি স্নেহ পড়েছে তার চিনির ওপর, এইজন্যে রমলা আরো ক্রুদ্ধ হয়।

তবু সবই ঠিকমতো চলেছে।

চিনি এম-এ পাশ করলো। খুবই ভালো ফল করলো সে। প্রফেসার হওয়া আশ্চর্য নয় এখন। কিন্তু চিনির বয়স অত্যন্ত কম, মাত্র তেইশ বছর। তাছাড়া তার দক্ষিণ-অঙ্গ পঙ্গু। তাই বিমল ভাবলো, যাক, আরো দু-এক-বছর। চিনি আরো কিছু পড়ুক— গানটা আরো ভালো করে শিখুক, তারপর দেখা যাবে।

ইতিমধ্যে তার নিজের ছেলেমেয়ে যথেষ্ট বড় হয়ে উঠেছে। তারা যথাক্রমে ক্লাস নাইন এবং ক্লাস সেভেনে পড়ছে। ওদের জন্যে ভালো টিউটর রাখা দরকার। তাই একদিন রমলা বললো,

—ভালো একজন মাস্টার এনে দাও মিনির জন্যে। এবার সে ক্লাস টেন-এ উঠবে। তোমার ওই বুড়ো পণ্ডিতের দ্বারা আর চলবে না। বুঝেছ?

—বুড়োরা খুব ভালো পড়ান রমলা। তাঁরা অভিজ্ঞ টিচার।

—তোমার এই বুড়ো মেয়েটির জন্যে যত ইচ্ছে বুড়ো অভিজ্ঞ টিচার রাখ। আমার মেয়ের জন্যে জোয়ান মাস্টার চাই।

কেন?

—কারণ আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি পালটেছে। পড়ার আর পড়ানোর রীতিনীতি বদলেছে। এমন কি বানানভঙ্গি এবং উচ্চারণভঙ্গিও বদলেছে। আমি চাই বর্তমান যুগের উপযোগী শিক্ষক।

—ভালো, তাই হবে। দিন-সাতেকের মধ্যে জোগাড় করে দিচ্ছি। বলে, বিমল তার অফিসে গেল যথারীতি। সেদিন বড়বাবু তাকে কিছুটা চিন্তিত দেখে বললেন,

—আপনাকে আজ যেন অন্যমনস্ক দেখছি স্যার?

—না...হ্যাঁ। একটা টিউটর জোগাড় করে দিন তো।

—কি রকম টিউটর চান?

—বর্তমান যুগের উপযোগী জোয়ান টিউটর।

—যে আজ্ঞে। আছে একটি আমাদের পাড়ায়! মা-বাপ-হারা ছেলে—খুবই ভালো ছেলে। নিজের চেষ্টায় পড়েছে—বরাবর বৃত্তি পেয়েছে। কোথায় যেন প্রফেসারির জন্যে চেষ্টা করছে। তাকেই বলে দেখি। মাইনে কত বলবো?

—যা তিনি চান তাই দেওয়া হবে। তবে মেয়েটাকে পাশ করাতে হবে।

—আচ্ছা। আমি কালই কি তাকে আনব এখানে?

—আনবেন।

বললো বিমল। কিন্তু তার খুব ইচ্ছে ছিল না। তবে রমলাকে থামাবার জন্যে ভালো একজন টিউটর না রাখলেই চলে না, তাই এই নতুন টিউটরকে আনতে বললো।

সন্ধ্যায় বাড়ি এসেই বিমল জানিয়ে দিল, কাল থেকে মিনি-হিরণের জন্যে নতুন টিউটর আসবেন। প্রতি সন্ধ্যায় এসে পড়াবেন দু'ঘণ্টা। সকালে অবশ্য ওই বুড়ো পণ্ডিতমশাই রোজ পড়াবেন।

—ওঁকে আবার কেন?

—ওঁকে জবাব দিতে পারবো না। যতদিন উনি থাকবেন, থাকুন।

বলে, বিমল চলে গেল রমলাকে আর কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই।

মিনি আর হিরণ শুনলো মা-বাবার কথাগুলো। তারা তখুনি ছাদে উঠে গেল।

হিরণ দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বললো,

—শুনেছিস দিদি, আমাদের নতুন মাস্টার আসবেন কাল।

—তাই নাকি? কেন? যাদববাবু চলে যাবেন?

—না, যাদববাবু বুড়ো হয়ে গেছেন। তাই মা জোয়ান মাস্টার আনছেন।

—বেশ তো! তবে উনি অনেকদিন আছেন—

উনিও থাকবেন। সকালে উনি পড়াবেন, আর বিকেলে তুমি পড়াচ্ছো তো! এবার থেকে ওই নতুন মাস্টার পড়াবেন।

—বেশ ভাই, খুব ভালো। নতুন মাস্টারের কাছে পড়বে।

—না। তোর কাছেই তো ভালো পড়ছি দিদি।

—তাতে কি! আমার কাছে তো তুই সব সময় পড়ছিস—পড়বিও।

—না। তোর মত কে আমাদের ভালো করে পড়াবে? কেউ না। কেউ অমন ভাল করে পড়াতে পারবে না—মাস্টার চাইনে আমাদের।

—কি সব কুশিক্ষা দিচ্ছ ওদের?

বলতে বলতে রমলা এসে দাঁড়াল।

চমকে উঠল চিনি। বলল,

—কুশিক্ষা দিচ্ছি না, মা। ওদের নতুন মাস্টার আসবেন, ওরা তাই বলেছে।

—আসবেই তো! তোমাকে আর পড়াতে হবে না। সন্ধ্যেটা গল্প শুনে রোজ ওরা নষ্ট করে তোমার কাছে।

—না মা। এরা পড়ে—পড়ে আমার কাছে।

—পড়ে কতো তা আমি জানি বাছা। শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না। তোমাকে আর পড়াতে হবে না। যা, যা, তোরা নীচে যা—

রমলা ধমক দিল মিনি আর হিরণকে।

হিরণ বললো,

—না, যাবো না। দিদির কাছে পড়বো—গল্প শুনবো, যা খুশী করবো। যাবো না—

—হিরণ! প্রচণ্ড ধমক দিল রমলা।

কিন্তু হিরণ অত্যন্ত দুরন্ত ছেলে। সে গ্রাহ্য করলো না দাবড়ানি। সটান টেবিল থেকে বই টেনে নিয়ে পড়তে বসল। বললো,

—দিদি, সেই ঘোড়ার গল্পটা পড়বো? সেই ঠ্যাঙ-ভাঙা ঘোড়া আর দরবেশ!

রমলা দেখলো ধমকে কোনো কাজ হবে না। হিরণের দেখাদেখি মিনিও বসে গেল পড়তে। সে একটা মোটা বই খুলে চীৎকার করে আরম্ভ করে দিল—

'নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে,
বাল্মীক, হে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি...'

রমলা নিঃশব্দে নেমে গেল। কোনো উপায় নেই এখানে তার। চিনি যেন যাদু করেছে তার ছেলেমেয়েকে। ওদের দিদি-অন্ত প্রাণ। দিদি ছাড়া ওরা কিছুই ভাবতে পারে না। দিদির সঙ্গে ভাগ না করে ওরা কিছু খাবে না। দিদিকে না দিয়ে কোনও জামা-কাপড় ওরা পরতে চায় না।

কে জানে এসব তাদের কে শিখিয়েছে? সম্ভবত ওদের বাবা বিমল।

রাগটা কোনোরকমে সামলে নিল রমলা।

পরদিন বড়বাবু পাড়ার সেই ছেলেটিকে এনে হাজির করলেন বিমলের অফিসে। তার নাম মিহির। সুন্দর চেহারা। বয়স বড়জোর ছাব্বিশ-সাতাশ। এসেই প্রণাম করলো বিমলকে। 'কল্যাণ হোক' বলে আশীর্বাদ করলো বিমল। নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করলো এবং শেষে জানালো যে তাঁর ছেলে-মেয়ে হিরণ আর মিনিকে প্রতি সন্ধ্যায় পড়াতে যেতে হবে।

নতুন মনিবকে দেখে মিহিরের মন্দ লাগলো না। সবিনয়ে বললো,

—কাল থেকেই কি আমি যাব স্যার?

—হ্যাঁ, কালই যাবে। ইচ্ছে করলে আজও যেতে পার।

—না স্যার, মাফ করবেন। আজ আমার ওই সময় একটা এনগেজমেণ্ট আছে।

—আচ্ছা। কাল বিকেল পাঁচটার সময় যাবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ; নমস্কার। বলে, চলে গেল মিহির।

চেয়ে দেখলো বিমল তার যাওয়া। সুন্দর শিক্ষিত ছেলে! বেশ লাগলো তাকে। রমলা নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে নতুন মাস্টারকে দেখে।

চিনির জন্যে আর মাস্টারের প্রয়োজন নেই। সে এখন কৃতবিদ্য। তার জন্যে একটা ভালো চাকরি করে দিতে হবে। সেজন্যে বিমল যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, করবেও।

উপস্থিত গান-বাজনাটা ভালো করে চিনিকে শেখানো হবে! তার জন্যে একজন ভালো ওস্তাদ দরকার। মাইনে অবশ্য অনেক দিতে হবে—দেবার মতো ক্ষমতাও আছে বিমলের! কিন্তু আপত্তি হবে রমলার। চিনির জন্যে আর কিছু খরচ করতে সে নারাজ। কিন্তু কিছু একটা করা অবশ্যই দরকার চিনির জন্যে, নতুবা খারাপ দেখায়।

পরদিন মিহির যথাসময়ে এলো। নমস্কার জানালো রমলাকে। রমলা প্রস্তুত ছিল তার জন্যে। ও চেয়ে দেখলো নতুন মাস্টারকে। বললো,

—খুব ভালোই হলো। ওদের পড়াবার ভার আপনার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।

—আমার দ্বারা যতটা সম্ভব তার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবে না মিসেস চৌধুরী।

—আসুন তাহলে।

বলে, রমলা মিহিরকে পড়ার ঘরে নিয়ে গেল। কিন্তু মিনি আর হিরণের দেখা নেই।

—মিনি! হিরণ! বলে, অত্যন্ত বিরক্ত, এমন কি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সজোরে ডাক দিল রমলা।

—যাই মা!

কোন্ এক দূর থেকে যেন একটি ভীত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। একটু পরেই মিনি, হিরণ এসে হাজির হলো।

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ? ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মতো রমলা গর্জন করে উঠলো।

এই তো আসছি!

—আসছিস তো! এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

—ছাদে।

—কেন গিয়েছিলি ছাদে? বলেছি না, মাস্টার মশাই আসবেন পড়াতে। খবরদার এ সময় কোথাও যাবিনে। যা, এক্ষুণি পড়তে বোস।

ভাই-বোন কেউ আর কথা কইলো না। নিঃশব্দে এসে তারা বসল।

—ওদের তাহলে দেখুন। পড়ান ভালো করে। কেমন?

—যে আজ্ঞে।

—বলে, মিহির তার কাজ আরম্ভ করলো।

আট-দশদিন পড়াচ্ছে মিহির। রমলা তার কাজে খুব খুশী। মিনি আর হিরণও খুব খুশী তাদের মাস্টার ভালো হওয়ায়। তাদের কাছে মিহির খুব ভালো মাস্টার। কারণ, মিহির বকা-ঝকা করে না। পড়া না হলে শুধু বলে—আরও সে ভালো করে পড়াবে'—তাই ভালো মাস্টার।

মিহির তার কর্তব্যকর্ম যথানিয়মে করে চলেছে। সেদিন এসে শুনলে, মিনি আর হিরণ মামার বাড়ি গেছে মায়ের সঙ্গে। ফিরতে দেরি হবে। বসে থাকবে, নাকি চলে যাবে ভাবছে। হঠাৎ সুমিষ্ট কণ্ঠের সুর কানে এলো।

কে গাইছে? এ বাড়িতে তো চাকর-ঠাকুর-ঝি ছাড়া আর কেউ নেই! কি জানি হয়তো পাশের বাড়িতেই হবে।

মধুমাখা সুরেলা গলা। কীর্তন গাইছে—সুললিত বিরহসঙ্গীত। শ্রীরাধার অন্তর-ব্যথা যেন মুক্তি পাচ্ছে ওই গানের সুরে-সুরে। মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনতে লাগলো মিহির তন্ময় হয়ে।

গান মিহির ভালোবাসে। সে গাইতে পারে না, বাজাতে পারে। গানটা শুনলো...শুনে বড় ভালো লাগলো তার।

নিশ্চয় এই বাড়ির কোথাও কেউ গান গাইছে, কিন্তু কোথায় তা জানা মিহিরের পক্ষে সম্ভব নয়।

বাড়িটা যথেষ্ট বড়। সামনে আর পিছনে বাগান আছে—ধারে-পাশে আরও অনেকের বাড়িও আছে। সুতরাং কোথায় গান হচ্ছে সঠিকভাবে জানা সম্ভব হলো না।

এর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা এসে গেল। মিহিরের ইচ্ছে করছিল, কে গান গায় ওদের জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু এই কৌতূহল প্রকাশ করা ঠিক হবে না ভেবে প্রশ্ন সে করলো না। পড়ানো সেরে চলে গেল।

গান শুনতে খুব ভালোবাসে মিহির। তবে সে-গান ভালো গলার হওয়ার

দরকার। এইজন্যে সে বাছা-বাছা সঙ্গীত-শিল্পীদের গান শোনে। বিশেষ ধরনের মিষ্টি গলা না হলে ওর তৃপ্তি হয় না। আজ যার গান শুনে এলো, সে সত্যিই সুকণ্ঠি—কিন্নরকণ্ঠি। ওপরের কোনো ঘরেই সে গাইছিল। কিন্তু কোথায়? কে সে? মিহির ভাবতে লাগলো।

পরদিন মিহির একটু আগেই পড়াতে এলো। ইচ্ছা, যদি আবার এই গান শুনতে পায়। তার ছাত্র-ছাত্রী এখনও আসেনি। গানও কেউ গাইছে না। দেখা হলো বিমলের সঙ্গে। তাকে বসতে বলে সে চা দেবার ব্যবস্থা করতে গেল।

এক কাপ চা আর কিছু খাবার প্রতিদিনই দেওয়া হয় মিহিরকে। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। আর স্বয়ং রমলাই এলো চা-খাবার নিয়ে। এটা ব্যতিক্রম। কারণ রমলা নিজে এর আগে কোনোদিন ওটা নিয়ে আসেনি।

মিহির কিছু বিস্মিত হলো, তবে কিছু মনে করলো না। রমলা চা আর জলখাবার দিয়ে মিহিরের পারিবারিক খবর নিতে লাগলো।

রমলার সস্নেহ প্রশ্নের উত্তর মিহির জানাল যে, তার পরিবার বলতে বিশেষ কেউ নেই। দূর পল্লীতে তার জন্ম। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর মামার বাড়িতে মানুষ। বর্তমানে মামা-মামীই তার অভিভাবক। এখানে মামার কারবার আছে। খুব বড় কারবার নয়, কোনোরকমে চলে। মামা-মামীই তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং এ পর্যন্ত যা করবার তাঁরাই করছেন।

সব কথা শুনলো রমলা মন দিয়ে। ইতিমধ্যে হিরণ ও মিনি এসে গেছে। তাদের পড়াবার জন্যে মিহিরকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল রমলা;

মিহির যথারীতি পড়ালো। কিন্তু একটা প্রশ্ন তার মনে আজ জাগছে, রমলা কি জন্যে তাকে এত প্রশ্ন করলো, নিজের হাতে চা-খাবার নিয়ে এলো? সে যে-ধরনের মেয়ে তাতে অকারণে কোনো কথা শুধোবে না, নিশ্চয়ই কোনো গূঢ়তর কারণ আছে। হয়তো তার সম্বন্ধে কোনও কথা, কিংবা কোনো বিরুদ্ধ মন্তব্য শুনেছে। কিন্তু বিরুদ্ধ মন্তব্য শুনে থাকলে রমলা নিশ্চয়ই অমন স্নেহসজল কণ্ঠে প্রশ্ন করত না—হয়তো দেখাই করত না।

সামান্য গৃহশিক্ষক মিহির। তাকে ছাড়িয়ে দিতে রমলার এক মিনিটও সময় লাগবার কথা নয়। তাহলে কি কারণ? ভেবে কুলকিনারা পেল না মিহির।

কয়েকদিন কেটে গেল। গান আর এর মধ্যে শুনতে পায়নি মিহির। ভেবেছে ও গান নিশ্চয় অন্য কোনো বাড়ি থেকে আসছিল। অথবা এই বাড়িতেই এদের কোনো আত্মীয়া এসে থাকবে। হয়তো ওই সুধাকণ্ঠ তারই।

ওপরের ঘরে কোনোদিন যায়নি মিহির। মিনি এবং হিরণ নীচের তলায় এসে তার কাছে পড়ে। মাঝে মাঝে রমলা দেখা করে। কথাও বলে, আবার যথারীতি চা-খাবারও খাওয়ায় মিহিরকে।

বিমলের সঙ্গে মিহিরের কদাচিৎ দেখা হয়। কারণ, বিমল এই সময় থাকে অফিসে। রবিবার বিমল বাড়িতে থাকলেও সেদিন ও পড়াতে আসে না।

সেদিন হঠাৎ মিহিরের টাকার দরকার হওয়ায়, বিকেলে গেল বিমলের বাড়ি, মাইনেটা চাইবে। দেখল গৃহস্বামী রয়েছে। ওকে বসিয়ে বিমল বললো,—মেয়েটার এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। ভালো করে যেন পড়ানো হয়। তোমাকে এর জন্যে আরও বেশি বেতন দেওয়া হবে।

—আজ্ঞে, পরীক্ষার দেরি আছে এখনও। মিনি যাতে ভালোভাবে পাশ করতে পারে তার জন্যে কিছু ত্রুটি করব না।

চা-খাবার খেয়ে, টাকা নিয়ে বেরুবে মিহির, এমন সময় হঠাৎ সেই অপূর্ব মিষ্টি গলার গান শুনতে পেল।

কে গাইছে, কোথায় গাইছে, জিজ্ঞাসা করতে পারলো না মিহির বিমলকে লজ্জায়। তাই শুধুলো,

—মিনি আর হিরণ কোথায়? তাদের দেখছি না তো!

—ছুটির দিন ওরা ওদের দিদির কাছে গান শেখে। তারা ওপড়ে আছে।

—ও! বলে, মিহির যথারীতি নমস্কার করে চলে এলো।

—সেইদিনই মিহির জানলো, এই গান তাহলে সেই দিদির গলার!

পরদিন যথাসময়ে পড়াতে এলো মিহির। ছাত্র-ছাত্রীও যথা নিয়মে পাঠ শুরু করে দিল। পড়াতে পড়াতে মিহির তাদের শুধুলো,

—গান কেমন শিখছ মিনি?

—শিখছি, তবে দিদির মতো নয়। কি মিষ্টি গলা দিদির, যেন কিন্নরী। গানের উপযোগী মিষ্টি গলা মিনির। সে তাই বাজনা শেখে। গীটার বাজাতে শিখছে সে।

—তোমার দিদি কি করেন? নীচে নামেন না কেন?

মিহির মিনিকে প্রশ্ন করলো, হিরণ আগে তার বদলে জানিয়ে দিল,

—জানেন স্যার, দিদি আমাদের জুয়েল। এম-এ পাশ ইংরেজীতে। ছোটদির সব খাতাপত্র দিদিই তো দেখে দেয়। তাই ওর ভুলচুক আপনি ধরতে পারেন না। দিদি সব ঠিক করে দেয়। আসলে দিদির বুদ্ধিটা নিয়ে ছোটদি আপনার কাছে মেধাবী ছাত্রী। ওর মেধা না কচু।

—হিরণ, ভালো হবে না বলছি। ভাইকে ধমক দিল মিনি।

এ রকম খুনসুটি ওদের প্রায়ই হয়। তাই মিহির বললো,

—তোমার খাতাও তো দেখে দেন তিনি?

—হ্যাঁ। দিদির কাছে আমরা সবাই সমান। দিদি তো আমাদের কাছে দেবী।

—দেবী!

—হ্যাঁ স্যার, দেবী। দেখলে আপনি বুঝতেই পারবেন না দিদি মানুষ।

—হবেও তাই। আমি তো তাঁকে দেখলাম না কোনোদিন।

—দেখবেন কি করে? দিদি তো নীচে নামতে পারেনা। তার ডান হাত, ডান পা অবশ। সব কাজ বাঁ-হাতে করে। ছাদের ঘরেই সব সময় থাকে দিদি। গান গায় আর পড়ে। পড়ে আর গান গায়।

—কৈ, গানও তো তেমন শোনা যায় না। ক্বচিৎ কখনও শুনেছি।

—শুনবেন কি করে? অনেক রাতে দিদি গান গায়। তখন তো আপনি থাকেন না।

—এতদিন তো তোমরা তার কথা কেউ বলনি আমায়?

—না, মা মানা করেন। বলেন, তোর দিদি আর মানুষ নেই, দেবী হয়ে গেছে। ওর কথা কাউকে বলিস না। মাও বলে না কাউকে।

ব্যাপারটা যে ঠিক কি, বুঝতে পারলো না মিহির। সে আশ্চর্য হলো কিন্তু তবে তার বলবার কিছু নেই। সে শুধু বুঝলো, মিনি আর হিরণের একজন দিদি আছেন ওপরে, তার ডান-অঙ্গ অবশ, অথচ তিনি বিদুষী এবং সঙ্গীতজ্ঞা। তাঁর খবর এতদিনেও জানা যায়নি।

যাঁর গলা এমন মিষ্টি, না জানি তিনি দেখতে কেমন! তিনি কি করেন সারা দিনরাত? কেমন করে কাটে তাঁর দিন রজনী?

নানা কথা ভাবতে লাগলো মিহির ওই না-দেখা মেয়েটির সম্বন্ধে। কিন্তু

মিনি আর হিরণের কথাতেই বুঝলো, এ বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন রমলা দেবীকে জিজ্ঞাসা করা চলে না। তিনি কিছু বলতে ইচ্ছুকও নন।

মিহির সামান্য গৃহশিক্ষক। তার দরকার কি অতসব পারিবারিক খবরে? কিছুই সে শুধলো না। শুধু ওই না-দেখা মেয়েটির দুর্ভাগ্যের জন্যে সে যেন খুবই দুঃখিত হলো।

চিন্ময়ী থাকে তেতলার ছাদের সংলগ্ন সেই ঘরে। দিন কাটে তার তেমনি ভাবে। বয়স তার কুড়ি পেরিয়ে গেছে। সে জানে, এ বাড়ি তার বাপের বাড়ি নয় এবং রমলা তার মা নয়, আর বিমলও তার বাবা নয়।

এ কথাটা তাকে জানাতে চায়নি বিমল, কিন্তু রমলা একদিন ঝগড়ার সময় বলে ফেললো। কান খাড়া করা ছিল চিনির। সে শুনলো তার মা রমলা তাঁর কেউ নয়, বিমলও কেউ নয় তার।

নিজের মা-বাপ বলে যাদের এতদিন জেনে এসেছে, সেদিন হঠাৎ যখন জানলো, তারা তার কেউ নয়, তখন তার মনের অবস্থা কি হয়েছিল তা অনুভব করা ছাড়া বোঝানো যাবে না কোনো ভাষা দিয়ে।

শুধু এটুকু বলা যায় যে, সেদিন চিনির চোখ ফেটে জল এসেছিল! আর সে-জল সারাদিন শুকোয়নি।

তবে চিনি খুবই শান্ত স্বভাবের, ধীরে ধীরে সামলে উঠলো।

সেই পুরাতন ইতিহাস এই ঃ

ষোল বছর বয়স তখন চিনির। স্কুল ফাইন্যাল দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। একজন বাড়তি গৃহশিক্ষক তাই রাখতে চেয়েছিল বিমল। রমলা আপত্তি করে বলেছিল,

—পরের মেয়ের জন্যে অত আদিখ্যেতা কিসের?

ওপরের ঘরে বসেই শুনতে পেল চিনি মা-বাবার কথা। কথা তো নয় ঝগড়া।

শুনতে পেল বিমল বলছে,

—পরের মেয়েকে নিয়েই তো ঘরে মেয়ে পেয়েছ। ওকে অত হেনস্তা করা কি উচিত?

—হেনস্তা কিসের! রাজকন্যার মতোই তো আছে। তুমি কি মনতে

চাও, ওই চিররুগ্না মেয়েটাকে কোলে নিয়ে আমায় বসে থাকতে হবে?

—না, না সেসব কিছু করতে হবে না। ওকে আর একটু লেখাপড়া শিখিয়ে দিই, নিজের পায়ে ও দাঁড়িয়ে যাবে।

—পা-ই নেই তার, তো পায়ে দাঁড়াবে। অনর্থক মাসে মাসে শ'খানেক টাকা বরবাদ! বলেই চলে গেল রমলা।

বিমল এল চিনির কাছে। পড়ার টেবিলেই বসে আছে চিনি। কথাগুলো সবই শুনেছে সে। কিন্তু সে যে কিছু শুনেছে তা জানাতে চায় না, যদিও সব কিছু জানবার জন্যে মন-প্রাণ তার ব্যাকুল হয়েছে। তবু চিনি দমন করলো আগ্রহ!

চিনির কাছে এসেই কিন্তু বিমল বুঝলো, ও তাদের কথা শুনেছে। মুখে তার আকুল আগ্রহ, অন্তরে অন্তরে ব্যথা, চোখে অসহায় চাউনি।

বিমল বুঝলো, ওর মনে ঝড় উঠেছে। এ পর্যন্ত সে জানে, তার স্নেহশীল বাবা এবং মা-বাপ। আজ এতখানি বয়সে যে যদি জানে এরা তার কেউ নয় তাহলে চিন্তাশীল মন কেমন হবে, অনুমান করা দুঃসাধ্য।

বিমল ব্যথিত হলো, কিন্তু নিরুপায়। শুধু বললো,

—কিছু ভাবিসনে মা। আমি তোর টিউটর রেখে দেবো।

—হুঁ! এ ভিন্ন, চিনি আর কিছু বলেনি সেদিন!

চিনির জন্যে টিউটর এলেন একজন মহিলা। রমলার অবশ্য খুবই রাগ সেজন্যে। কিন্তু বিমল কোনো কথা শুনলো না, মাসিক একশ' টাকা বেতনে সেই মহিলাকে নিযুক্ত করলো। ওঁকে জানাল, চিনি ভালোভাবে পাশ করলে বিমল তাঁকে পাঁচশ' টাকা পুরস্কার দেবে।

মহিলাটি শিক্ষয়িত্রী! সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা ও বধূ—সন্তানের জননী। তিনি অতি যত্নে চিনিকে পড়াতে লাগলেন। আসেন বিকেল পাঁচটার পর-দু-তিনঘণ্টা থাকেন এবং সব বিষয়ই পড়ান।

চিনি ছাত্রী ভালো। তাই ভালোই পড়তে লাগলো এবং যথাকালে 'ইনভ্যালিড' গাড়িতে চড়ে পরীক্ষা দিল—পাশও করলো ভালোভাবে।

খুব হয়েছে, এবার থামো। আর ওকে পড়াতে হবে না তোমায়।

—পড়াতে ওকে হবেই রমলা। আর কোনও কাজ করবার সুযোগ যখন ওর নেই।

—এত পড়িয়ে কি হবে? বিয়ে তো আর হবে না ওর!

—তার জন্যেই তো পড়াতে হবে। পড়াশুনা নিয়ে কাটাবে জীবনটা।

—মাসিক খরচ কত হবে ওর পেছনে হিসেব করেছ।

—করেছি। খরচ আমি করবো। বিমল বেশ গম্ভীরভাবে বলল—আশা করি তুমি বাধা দেবে না।

রমলা আর কিছু বলতে সাহস করলো না। কিন্তু মনে মনে রাগে ফুলতে লাগল।

ওদিকে গানের মাস্টারও আসছে। তার জন্যও গোটা পঞ্চাশ টাকা লাগে।

আয় অবশ্য আছে বিমলের। বড় ব্যবসা—মোটা আয়; কিন্তু রমলারও তো দুটো ছেলেমেয়ে হয়েছে। তাদেরও তো ভবিষ্যৎ আছে। ওই পরের মেয়ের জন্য এত কেন? তাছাড়া কি-বা কাজে লাগবে তাকে এত পড়িয়ে?

এত কথার কোনোটাই কিন্তু বলা হল না বিমলকে। সে অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ—চিনিকে সে নিজের সন্তানের থেকেও বেশি ভালোবাসে? বেশি কিছু বলতে গেলে হয়তো আরো বেশি কিছু খরচ করে বসবে চিনির জন্যে।

একেই তো বলে, 'ওকে চিকিৎসার জন্যে বিলেত পাঠাব। ওর জন্যে একখানা বাড়ি করে দেবো। ওকে দু'লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনে দেবো' ইত্যাদি।

যাকগে। আর বেশি ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। এইসব ভেবে রমলা চুপ করে রইল।

চিনি পড়ছে। এখন পড়াচ্ছেন একজন প্রফেসর। বিমল প্রতিদিন অফিস ফেরত ওর গাড়ি থেকে নেমেই সটান চলে যায় ওপরে চিনিকে দেখতে। কিছু-না-কিছু নিয়েও আসে তার জন্যে। হয়তো বই, নয়তো ফল-মিষ্টি, অথবা শাড়ি একখানা। কিছু না পেলে অন্তত একগুচ্ছ ফুলও নিয়ে আসে। খালি হাতে কোনোদিন আসে না বিমল। রমলা দেখে, দেখে রাগে গজগজ করে।

রমলার নিজের ছেলেমেয়েও বড় হচ্ছে। তাদের জন্যে তো এতটা স্নেহ-মমতা দেখা যায় না বিমলের। কথাটা রমলা একদিন বলেই ফেললো।

—পরের মেয়ের চিন্তায় তো ঘুম ধরে না, অথচ নিজের ছেলেমেয়ের জন্যে তুমি নির্বিকার।

—ওদের জন্যে তো তুমি আছ। বাড়ির সব ঝি-চাকর, আর ওদের

খেলার সঙ্গী-সাথী পাড়ার সব আছে! চিনির জন্যে একমাত্র আকাশের ঈশ্বর আর আমি ছাড়া কেউ নেই। তাই দেখতে হয় তাকে।

—ও! আমি বুঝি তার জন্যে কিছুই করিনি?

—কর, নিশ্চয় কর! যতখানি হেনস্তা করবার, কর। কিন্তু রমলা! আমি ওকে যেদিন এনেছিলাম, সেদিন তুমিই সর্বাগ্রে ওকে নিয়েছিলে বুকে তুলে।

—হ্যাঁ, নিয়েছিলাম। এখনও তো ফেলে দিইনি। ভালো চিররুগ্ন কাউকে নিয়ে দিন কাটানো কি কঠিন, তুমি বুঝবে? তুমি তো সকাল-বিকেল অফিস নিয়েই থাক, যত ঝামেলা আমাকেই পোহাতে হয়।

—ঝামেলা! না রমলা, ওর কোনও ঝামেলা নেই। একথা আমি বিশ্বাস করিনে। খেতে না দাও ও শুকিয়ে মরে যাবে, তবু তোমাকে কিছু বলবে না। চিররুগ্ন হওয়ার জন্যে ও নিজে দায়ী নয়।

—দায়ীর কথা বলছিনে বলছি, ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে, তারা দেখে তোমার অতিরিক্ত স্নেহ-মমতা চিনির ওপর। এটা ওদের ভালো লাগে না।

—এ কথাও সত্যি নয়। মিনি আর হিরণ দিদির জন্যে কি না করে! দিদিকে তারা এত ভালোবাসে যে দু-ঘণ্টা দিদির কাছে না গেলে তারা কাঁদে। এ প্রমাণ আমি বহুবার পেয়েছি। আর আমি যখন অফিস থেকে এসে ছাদে যাই চিনিকে দেখতে, তখন তোমার হিরণ-মিনিও সেখানেই বসে থাকে। তাদেরও কম স্নেহ করিনে আমি। তবে চিনির জন্যে একটু বেশি কিছু আনতে হয়। ছেলেমেয়ে বড় হলে তাদের জন্যেও আনব। এ নিয়ে হিংসা করো না রমলা! চিনি বড় দুঃখী। অভাগীর জীবন কেমন করে কাটাবে ভেবে রাত্রে আমার সত্যি ঘুম হয় না।

রমলা বুঝলো, আর বেশি কথা বাড়ালে ব্যাপারটা খারাপ হবে। তবু সে বললো,

—হিংসে কেন করতে যাব? তবে ও যখন আর সারবেই না, তখন আর বাড়িতে রাখা কেন? কোন ইন্‌ভ্যালিডদের আশ্রমে রেখে এসোগে।

—চেষ্টা করছি, দেখি যদি কোথাও পাই।

বলে, বিমল চলে গিয়েছিল।

এরপর রমলা কোনো কথা বলতে সাহস করেনি। তার ছেলেমেয়েরা বড্ড সেয়ানা। সব অবসর সময়টা তারা প্রায় ছাদে চলে যায় দিদির কাছে।

দিদি, দিদি আর দিদি! কিছু একটু ভালো খাবার দাও মিনিকে, অমনি বলবে, দিদিকে দিয়েছ মা? কোনও একটা খেলনা পেলে তৎক্ষণাৎ ছুটবে দিদিকে দেখাতে। দিদি যেন জীবন ওদের।

উপায় নেই রমলা এর কোনো প্রতিকার করতে পারে না—পারবেও না।

মিনি আর হিরণ তাদের মায়ের সহস্র নিষেধ সত্বেও চিনির কাছে যাবে, কোনো কথাই শুনবে না। নাজেহাল হয়ে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে এখন রমলা।

মাস্টার রাখা হয়েছে মিনি-হিরণের। খুব ভালো মাস্টার। দেখতে সুন্দর—স্বাস্থ্যবান। ভালো স্কলার—এসব শুনেছে রমলা মিহিরের সম্বন্ধে। তাই মিহিরের প্রতি তার স্নেহাধিক্য।

চা-জলখাবার প্রায়ই খাওয়ায় মাস্টারকে রমলা। সেদিনও খাওয়ালো।

মিনি-হিরণ ছিল না, গেছে রথের মেলা দেখতে। ফিরে এসে পড়বে। তাই বসে আছে মিহির।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরলো মিনি-হিরণ। কিন্তু এসেই চলে গেল ওপরে। যেতে যেতে বললো,

—দিদিকে সব দেখিয়ে আসি স্যার, বসুন।

হিরণের হাতে খেলনা। মিনির হাতে একটা সৌখীন পুতুল, আর পেছনে চাকরের মাথায় কতকগুলো গাছ, যা ওপরের ছাদের টবের জন্যে আনা হয়েছে।

ওরা চলে গেল। মিহির ভাবতে লাগল, কে এই দিদি? কেমন এই দিদি? সেই দিদিকে দেখার কি তার কোনও উপায় নেই?

অনেকক্ষণ পরে হিরণ আর মিনি ফিরে এসে পড়তে বসল।

নিজের সন্তানের ওপর দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর রমলার। তাদের শরীর, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সে সদা সজাগ। তাদের আরাম, বিরামের জন্যে কোনও ত্রুটি হতে দেয় না রমলা। পড়াশোনার দিকেও নজর আছে, তবে সেখানে খানিকটা ঈশ্বরের হাত, অথবা প্রকৃতির। হাত যারই বলা হোক, প্রতিভা সকলের সমান হয় না; অকর্মণ্য চিনি যে ভাবে পর পর ক্লাশ ডিঙিয়ে পাশ করে

উচ্চশিক্ষা লাভ করলো, মিনি বা হিরণ তা করতে পারছে না, এর জন্যে কার কাছে নালিশ করবে রমলা?

চিনির মতো বুদ্ধি তাদের নয়, তবু তারা পড়ছে এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মতো পাশও করে চলেছে। ভালো মাস্টার দিলে হয়তো ফল আরো ভালো হবে, তাই মিহিরকে আনা হয়েছে।

ওপরে থাকে চিনি। মিহির নীচে একটা ঘরে মিনি আর হিরণকে পড়ায়। চিনির সঙ্গে মিহিরের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং রমলা চায় না যে দেখা হোক। কেন চায় না তার কারণটা বোঝা কঠিন নয়। তবে তার সে গোপন কথা এখন গোপনই থাক, যথাকালে জানা যাবে।

বিমল কিছুটা বুঝেও, না-বোঝার ভান করে, অর্থাৎ বিশেষ আমল দেয় না। বাকি সব ভালোই চলছে!

মিনি এবার স্কুল ফাইন্যাল দেবে। পরীক্ষার আর দেরি নেই, তাই মিহির বললো একদিন রমলাকে,

—সকালে ঘণ্টাখানেক আমি এসে পড়িয়ে যাব।

—ভালো, খুব ভালো কথা। পরীক্ষা কবে?

—আরো মাস দুই দেরি আছে। তবে এখন থেকেই একটু দেখতে হবে।

—আসবে। সকালের চা-জলখাবার এখানেই খাবে তুমি।

—আচ্ছা।

মিহির পরদিন থেকে সকাল সাতটায় এসে নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়টুকু পড়াতে লাগলো মিনিকে। আবার সন্ধ্যার সময়ও যথারীতি আসে। সকালে যে অঙ্ক বা ট্রানস্লেশন দিয়ে যায়, বিকেলে এসে সেগুলো দেখে। আজও এসে বললো,

—কৈ, ট্রানস্লেশন দেখি।

মিনি খাতা বের করে দিল। পাতা উল্টে মিহির দেখতে পেল, সুন্দর হস্তাক্ষরে লাল কালিতে কয়েকটা জায়গা সংশোধন করা হয়েছে।

—কে এই সংশোধন করেছে? মিহির প্রশ্ন করলো।

—দিদি। উত্তর দিল মিনি।

—ও আচ্ছা। তাহলে এটা থাক এখন। অন্য বই আন।

কি বই আনব? ইতিহাস?

—হুঁ।

মিনি ইতিহাস পড়তে লাগলো। মিহির সংশোধন করা খাতাটা দেখছে। কি সুন্দর হস্তাক্ষর। আর সংশোধন য়া করেছে চমৎকার।

এই দিদিকে দেখবার জন্যে, জানবার জন্যে আগ্রহ তার অতিরিক্ত হয়ে উঠলেও স্বাভাবিক সংস্কার আর শালীনতার জন্যে সে কোনো প্রশ্নই কাউকে করতে পারল না। অথচ মন তার সব সময় জানতে চায়, কে এই অন্তরালবর্তিনী মেয়েটি? কেমন সে? কেন তাকে কোনো সময়ই প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না। সবই যেন তার কাছে রহস্যময়।

অবশ্য মিহির শুনেছে মেয়েটি অসুস্থ। ওপরেই থাকে, নীচে সে নামতে পারে না। কিন্তু নীচে যে একেবারেই নামে না তা তো নয়। নামালেই নামে। অর্থাৎ তাকে ধরে নামিয়ে আনতে হয়।

এমন কি গুরুতর অসুখ কে জানে? তবে মিহির সুযোগ পেলে একবার দেখতে চায় তাকে।

নিশ্চয় সুযোগ হয়ে যাবে কোনো একদিন, এই আশায় আছে মিহির।

এদিকে মিনির পরীক্ষা আসছে। সেটা শেষ হলে হয়তো মিহিরকে আর দরকার হবে না। তবে হিরণ এখনও আছে। তার জন্যে মাস্টার দরকার। হয়তো মিহিরকে আরো কিছুদিন থাকতে হবে হিরণের জন্যে। তবে কোনো নিশ্চয়তা নেই।

পরীক্ষার জন্যে একটু বেশি সময় পড়ানো দরকার, এই অছিলায় মিহির দু'বেলা যাচ্ছে পড়াতে। তার একান্ত আশা যদি কোনো রকমে ওপর তলার সেই না-দেখা মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়।

ওপরের ঘরে তো অনুমতি ছাড়া ওঠা যায় না। অনুমতিই বা চাওয়া যায় কি করে? কিন্তু মিহিরের মনে এক অদম্য পিপাসা জাগতে লাগলো সেই না-দেখাকে দেখার জন্যে —না-জানাকে জানার জন্যে। এ যেন একটা বিচিত্র বিস্ময়কর তাগিদ ওর মনের। বহু সময় সে নিজেকে বোঝাতে চায়, এটা অন্যায় চিন্তা—অনুচিত চিন্তা। অকারণ ক্ষোভ তার। কোনই কারণ নেই, যার জন্যে মিহির এত উতলা হবে। শুধু ওর গান শুনেছে, আর জেনেছে সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী—বিদুষী, কিন্তু পঙ্গু।

'পঙ্গু' কতখানি তা অবশ্য ভালো করে জানার সুযোগ পায়নি মিহির। শুধু

জেনেছে, মেয়েটির ডান-অঙ্গ অবশ। যা কিছু করে বাঁ-হাত দিয়ে। ডান হাত এবং ডান-পা দিয়ে কিছু সে করতে পারে না। এর কারণ নাকি ছোট বেলায় তার এমন অসুখ হয়েছিল, যার জন্যে তাকে প্রায় বছর খানেকের বেশি বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। অসুখ অবশ্য ভালো হয়েছে, কিন্তু ডান-অঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। এর বেশি আর কিছু বলতে পারেনি মিনি তাকে।

সহানুভূতি আকর্ষণের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। চিনির এই দুর্ভাগ্যকে আরো অনেক বেশি কল্পনা দিয়ে মিহির নিজের মনে মনে গড়ে তুলেছে একটি ছবি—অতি দুর্ভাগা একটি তরুণী মূর্তি—করুণ-কোমল।

এতখানি সহানুভূতি আসবার কথা নয়, তবু এসে গেল কয়েকটা কারণেই। মিনি আর হিরণের কাছে শুনেছে তার প্রশংসা। দেখতো ওর ওপর গৃহকর্ত্রীর বিরূপ মনোভাব। আরও লক্ষ্য করেছে মিহির, ওই না-দেখা মেয়েটি একটি আশ্চর্য প্রতিভা যেন! রূপ তার যাই হোক, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে সে অনন্যা।

সুযোগ কোনোদিন হয়তো হয়ে যেতে পারে মিহিরের ওই মেয়েটিকে দেখবার। এই আশায় সে অপেক্ষা করে।

মিনির পরীক্ষা চলছে এখন। ওটা শেষ হলেই হয়তো মিহিরকে জবাব দেওয়া হবে, এই কথা ভাবছে সে।

পরীক্ষা শেষ হলো! রমলা সেদিন মিহিরকে নিমন্ত্রণ করেছে মাত্র, খাওয়াবে। ভাবছে, ও বাড়িতে আজই তার শেষ দিন। কিন্তু না, রাত্রে রমলা পরম যত্নে তাকে খাইয়ে বললো,

—হিরণ তো পড়বে। তোমাকে আরো অনেকদিন থাকতে হবে এখানে! ওছাড়া মিনিকে আরো পড়ানো হবে। ওর বাবার ইচ্ছে, তুমি যেমন আছো, থাকো।

—যে আজ্ঞে। মিহির খুশী হয়ে বললো,

হিরণকে পড়াতে হবে! তাছাড়া মিনি যদি আরও উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চায় তো মিহিরই এখন তাকে পড়াবে। অতএব আরও বছর দুই অন্তত থাকা যাবে এ বাড়িতে। থাকার আর অন্য কোনো কারণ নেই, শুধু ওই না-দেখা মেয়েটিকে দেখার ইচ্ছে ছাড়া। কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য, কোনোদিন তাকে দেখতে পেল না মিহির।

পড়াতে যাচ্ছে হিরণকে। মিনি এখন আর পড়ছে না। তার পরীক্ষার ফল

এখনও বের হয়নি। তবে মিনি আসে, এসে বসে মিহিরের কাছে। বিকেলে বেশ সাজ-সজ্জা করেই আসে মিনি পড়ার ঘরে।

উন্নত যৌবন এখন সে। বয়স ষোল ছাড়িয়েছে—সুন্দরী এবং সুমার্জিত। মিহিরের হাতে গড়া মিনি। প্রায় চার বছর মাস্টারি করছে মিহির এ বাড়িতে। এখন বাড়ির লোকের মতো হয়ে গেছে সে। সুতরাং মিনি পড়ার ঘরে এখনও আসে, নানারকম প্রশ্ন করে, এটা যেন তার অধিকার।

সেদিন মিনি সিনেমায় যাবার প্রস্তাব করলো মিহিরের কাছে। কি একটা কাজে আসছিল সেই ঘরের দিকে রমলা। বললো,

—যাও মিহির। ওর সঙ্গী নেই—যাও একটু ঘুরিয়ে আনগে।

সিনেমা অবশ্য অনেকদিনই যায় মিনি। মিহিরকে কোনোদিন ডাকেনি। আজ হঠাৎ আমন্ত্রিত হয়ে মিহিরকে যেতে হলো। এর আগে মিনি যেতো তার স্কুলের সঙ্গীদের সঙ্গে—আজ যাবে মিহিরের সঙ্গে একা।

এর কোনো কারণ আছে, এমন সন্দেহ জাগেনি মিহিরের মনে। তার ধারণা, সাধারণ মেয়েরা যেমন যায়, মিনিও তেমনি যেতে চায়। অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকার কোন হদিশ সে পায়নি। এদিক দিয়ে মিহির হয়তো কিছু আহাম্মক শ্রেণীর যুবক। বিদ্যা এবং বুদ্ধি তার যথেষ্ট আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কূটবুদ্ধির একান্ত অভাব আছে। কোন মানুষ কি জন্যে কেমন ব্যবহার করে, জানবার চেষ্টাই সে করে না। আজও করলো না। সিনেমায় গেল।

সুন্দরী হয়ে উঠেছে মিনি এই ক' বছরে। যৌবনান্বিতা তরুণীর লাবণ্য তো আছেই, অধিকিন্তু আছে আধুনিক রূপসজ্জা। আর আছে বর্তমান যুগের সুনিবিড় চাটুল্য।

সব মিলিয়ে মিনি মনোহারিণী হয়ে উঠেছে। নৃত্যের ভঙ্গিতে চলে ফেরে। তাকে ভ্রখণ-সঙ্গিনী পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। তাই মিহিরও এই সৌভাগ্যকে সানন্দে বরণ করে নিল।

সিনেমা-ঘরের সীটে বসে ছবি দেখার বিরতির মধ্যে মিনি হঠাৎ বলে বসলো,

—দিদির কাছে গল্পটা শুনেছিলাম, নইলে কিছুতেই বুঝতে পারতাম না।

—তোমার দিদি কতটা পড়েছেন? জানা থাকলেও তবু শুধুলো মিহির।

—কতটা? ওরে বাবা! দিদি একেবারে বিদ্যের দিগ্‌গজ—এম-এ পাশ। এখন ডক্টরেট হবার জন্যে নাকি থিসিস্ লিখছে।

—গান-বাজনাও জানেন তো?

—হ্যাঁ। তবে ওস্তাদ কিছু না। গলা ভালো, তাই বাবা গান শিখিয়েছেন। আমি সুযোগমতো একদিন নিয়ে যাব আপনাকে গান শোনাতে ওপরে।

—ওপরে! তেতলায়?

—হ্যাঁ। দিদি তো নীচে নামতে পারে না। লিফ্‌ট নেই—আপনাকেই যেতে হবে।

—কোনোদিনই নামতে পারেন না নীচে?

—কোলে তুলে, না হয় স্ট্রেচারে তুলে নামাতে হয়। পরীক্ষার সময় বাবা সেইভাবেই দিদিকে নিয়ে যেতেন। তবে সে অনেক হাঙ্গামা।

—ওপরেই নাওয়া-খাওয়া করেন?

—হ্যাঁ। দিদির জন্যে সব আলাদা ব্যবস্থা আছে।

মিহির আর কিছু শুধোবার পেল না, যদিও অনেক কিছুই তার জানবার আছে। অনেকক্ষণ তার মনের মধ্যে ওই না-দেখা মেয়েটির কথাই জাগতে লাগলো।

মিনি নিশ্চয়ই একদিন মিহিরকে গান শোনাবার জন্যে ওপরে নিয়ে যাবে। সেই আশায় আশায় অপেক্ষা করে থাকবে সে। সিনেমা শেষ হলে মিহির আবার বললো

—এতখানি লেখাপড়া শিখেও তিনি ওপরেই বসে থাকেন?

—হ্যাঁ, কি আর করবে? বাবা ওর জন্যে একটা চাকরির চেষ্টা করছেন?

—চাকরি? কি করে চাকরি করবেন উনি?

—শিক্ষকতার কথাই ভাবছেন বাবা। আর দিদিরও তাই মত।

—তোমার মা'র কি মত?

—মা'র কোন মতামত নেই। মা ওর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

—সে কি? কেন?

—দিদি তো মা'র মেয়ে নয়, পালিত কন্যা। ওর মা নেই, আমার মা মানুষ করেছে।

—ও! দিদি তাহলে তোমার সহোদরা নন?

—সহোদরা না হলেও তাকে সহোদরা বলেই মনে করি।

উত্তরটা শুনলো মিহির, কিন্তু খুশী হতে পারল না। এই ক' বছরে সে একদিন জানতে পারেনি যে, ওপরের ঘরের সেই পঙ্গু-মেয়েটি তার ছাত্র-ছাত্রীর সহোদরা নয়। আজ জানার পর মিহিরের মনের গোপন কোণে যে আগ্রহ ছিল তাকে দেখবার পর সেটা একমুহূর্তে যেন সহানুভূতিতে শতগুণ হয়ে উঠলো।

মিনি বলেছে, একদিন মিহিরকে নিয়ে যাবে ওপরে তার দিদির কাছে। সেই দিনটি শীঘ্রই আসার জন্যে কায়মনে কামনা করতে লাগলো মিহির।

পঙ্গু একটি তরুণীর জন্যে একজন যুবকের মন বা অন্তর অনুক্ষণ পুড়ছে, দুনিয়ার কার তাতে কি এসে যায়? মিনি হয়তো কথাটা ভুলেই গেছে। প্রায় মাসখানেক আর এ বিষয়ে কথা হয়নি মিনির সঙ্গে।

না, মিনি ভোলেনি। শুধু সুযোগের অপেক্ষা করছিল। সেদিন বললো,

—আপনাকে সেদিন দিদির গান শোনাব বলেছিলাম, আজ শোনাব।

—কখন?

—সন্ধ্যেবেলা সাতটার সময় আপনি আসবেন কিন্তু। অসুবিধে হবে না তো?

—না, অসুবিধে কেন হবে?

—আজ রবিবার, যদি কোথাও এনগেজমেণ্ট থাকে আপনার তাই বলছি!

—না, তেমন কিছু নেই। আমি নিশ্চয় আসব।

সাতটার সময় মিহির এলো। মিনি তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মিহির আসামাত্র তাকে সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে গেল। মিহিরের বুকটা কেমন যেন করছিল ওই না-দেখা মেয়েটিকে দেখবার পূর্বে। ছাদের ওপর উঠে সে দেখলো, টবে-টবে ফুলগাছ সাজানো। প্রত্যেকটি গাছ সযত্নে লালিত—ফুলে-ফুলে ভরা। একধারে একটা জাল-দেওয়া খাঁচায় কতকগুলো ছোট পাখী। একটা বড় কাঁচের জলাধারে রঙিন মাছও রয়েছে একপাশে। অনেক কিছুই রয়েছে সাজানো, যা দেখলে অনেকক্ষণ প্রাণভরে দেখা যাবে।

এখানে যিনি থাকেন, তাঁকে অতি যত্নে রাখার কোনও ত্রুটি নেই। খুব

ধনী লোকের মতোই থাকেন তিনি এবং অবস্থার তুলনায় যেন কিছু বেশি আরামেই বাস করেন।

—দিদি! বলে, মিনি মিষ্টি ডাক দিল।

—আয়! তৎক্ষণাৎ সাড়া এলো একটা লতাকুঞ্জ থেকে।

—নমস্কার।

কথাটা বললো মিহির। উত্তরে প্রতি-নমস্কার করলো চিনি। ভালো করে ওকে দেখা যাচ্ছে না লতার আড়ালে। তবু হাতদুটো কপালে তুললো চিনি। মিহির দেখলো, ডান হাতটাকে সে বাম হাতে ধরে নমস্কার জানাচ্ছে।

—নমস্কার।

শব্দটা শুনলো মিহির। আশ্চর্য মিষ্টি গলা। এই শব্দটাই জানিয়ে দিল যে, চিনির সবটাই মিষ্টি। দেখলো ওকে মিহির, ছোট একটা বেঞ্চে বসে আছে। ওকে না তুলে আনলে ও কোথাও যেতে পারবে না। কাছেই একটা চামড়া বাঁধানো মোড়া—মিহিরের বসবার জন্য।

—বসুন। অনুরোধ করলো চিনি।

মিহির বসতে বসতে বললো,

—আপনার কথাই শুধু শুনে আসছি এই চার বছর ধরে। চোখে আপনাকে আজ দেখলাম।

—আজ আমার সৌভাগ্য। আমিও আপনার কথাই কেবল শুনে আসছি।

—এ অসুখ আপনার কতদিন হয়েছে?

—বহুদিন। আমার বয়স তখন মাত্র-আট বছর, তখন আমার খুব অসুখ করেছিল, যাকে বলে বাত-ব্যধি। একটা অঙ্গ—মানে, ডান-অঙ্গ অবশ হয়ে যায় তাতে। আমার তাই হয়েছে।

—আজকাল নানা রকম ওষুধ-ইন্‌জেকশন ইত্যাদি বেরিয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এ যুগে আর অঙ্গ অবশ্য বা ওরকম কিছু হয় না।

—কি জানি। কিন্তু আমার অসুখ বহুদিনের। এ কি আর ভালো হবে?

—ভালো রকম চিকিৎসা করালে আশা করি হয়তো ভালো হয়ে যাবেন।

চিনি চুপ করে রইলো।

মিনি ইতিমধ্যে একটা ট্রে-তে করে চা-খাবার আনলো—পরিবেশন করলো

মিহিরকে। চিনির কাছেও দিল চা-খাবার। চিনি ডান হাত নাড়তে পারে না, বাঁ-হাতে খাবে।

মিহির দেখলো, ওর এমন সুন্দর অভ্যাস হয়ে গেছে যে, ঠিকমতোই খেতে লাগল! মিনিও খাচ্ছে।

—হিরণ কোথায়? প্রশ্ন করলো চিনি।

...ও গেছে খেলা দেখতে।

—মা?

—মা তো বাপের বাড়ি গেছেন। আসবেন রাত্রে। বাবাও গেছেন। বাড়িতে এখন তুই আর আমি, আর মাস্টারমশাই।

চিনি আর কিছু শুধালো না। কিন্তু মিহির বুঝলো, মা'র অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই মিনি আজ মিহিরকে ডেকেছে চিনির সঙ্গে দেখা করাতে।

মানে তাহলে মা আছেন ব্যবধান।

উদ্দেশ্য কি হতে পারে, ভাববার এখন সময় নয়। তাই মিহির চিনির সঙ্গে কথা কইলো নানা বিষয়ে, জেনে নিল, কি ভাবে তার এই অসুখটা হয়েছে। ইতিহাসটা এই রকম ঃ শৈশবে তার টাইফয়েড হয়। দীর্ঘকাল তাকে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। এক পাশে শুয়ে থেকে ডান পায়ে অসহ্য ব্যথা হতো। ডান-অঙ্গ নাড়তে পারতো না সে। খুব কষ্ট হতো। একদিন শুনতে পেল, ডাক্তার বলছেন বাবাকে—ওর ডান-অঙ্গ অবশ হয়ে আসছে। এর আর কোনো প্রতিবিধান নেই! ওকে ডানদিকটা নাড়তে নিষেধ করবেন।

—তারপর?

—শুনলাম আমি ডাক্তারের সব কথা। যদিও আমার বয়স খুব কম, তবু বুঝতে পারলাম, আমার ডান-অঙ্গ অবশ হয়ে যাবে। বাবা-মা সব সময় বলেন, ডান হাত, ডান পা নাড়াবে না। ওঁদের কথামতোই ডান-দিক নাড়াতাম না। এখন আর নাড়তে পারিনে। একেবারে অবশ হয়ে গেছে ডানদিকটা আমার।

—ডাক্তার কি বলেন?

—কি আর বলবেন! বলেন, ডানদিকটা আর সচল হবে না।

—কোনও স্পেশ্যালিস্টকে দেখানো দরকার।

—হুঁ! বলে, অল্প একটু থামলো চিনি। পরক্ষণে ও হতাশার সুরে বললো—আর ওসব করে কি হবে? আর ভালো হবে না।

—না হবার মতো আমি তো কিছু দেখছিনে।

—না, বাবা চেষ্টার কিছু ত্রুটি করেননি।

—আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব।

চুপ করে রইলো চিনি। মিনি চা-খাবার দিয়ে কোথায় গেছে। মিহির দেখলো, চিনির ডান হাতটা একটু যেন দুর্বল—শীর্ণ। কিন্তু ওই শীর্ণতা ছাড়া আর কোনো লক্ষণ দেখতে পেল না! ওর মনে হলো, অসুখটা হয়তো এখনও সারতে পারে। কিন্তু তার জন্যে যে ব্যবস্থা করা দরকার তা সে করে কেমন ক'রে।

বাড়ির কর্তা সম্পন্ন বাড়ি। টাকা-পয়সার অভাব তাঁর নেই। মিহির একবার তাকে বলে দেখবে, চিনিকে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে পাঠাতে তিনি রাজী হবেন কিনা। যদি তিনি রাজী হন তো মিহির তার জন্যে ব্যবস্থা করবে বড় কোনো ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে।

চিনি যখন গাইছিল তখন মিহিরের মনে এই সব কথার আলোচনা চলছিল। সুতরাং সে তার গান ভালোভাবে শুনতেই পারলো না। গান শেষ হলে এক সময় বিদায় নমস্কার করে চলে এলো মিহির।

নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো তার মন। না দেখাই ভালো ছিল চিনিকে। দেখার পর থেকে মনের মধ্যে একটা দুর্জয় দুঃখানুভূতি ওকে অতিষ্ট করে তুলেছে। কিন্তু কি সে করতে পারে? ওর বাবা-মা যা করবার করেছেন। মিহিরের কি করবার আছে? তবে সে জেনেছে, ওর বাবা-মা সত্যিকার বাবা-মা নন। চিনির ওর দরদ তাঁদের যতই থাক, আপন সন্তানের ওপর যে দরদ তা নিশ্চয়ই নেই। তবু তাঁরাই ওর অভিভাবক। এখানে মিহির কে? কী তার অধিকার? কীই-বা তার সম্বল?

চিন্তা করে কোনও ফল হবে না, জানে মিহির। তবু চিন্তাটা ছাড়তে পারছে না। অবশেষে ঠিক করলো, চিনির বাবার সঙ্গে সে কথা বলবে এবং চেষ্টা করবে চিকিৎসার জন্যে চিনিকে বিদেশে পাঠাবার।

উপায় একটা করবেই মিহির। চিনিকে সারাতে হবে। কিন্তু তারপর? তারপর যাই হোক, সে কথা এখন না বলাই ভালো। যদিও মনের অতল

তলে একটা দুরাশা তার জাগছে। কিন্তু কেন? এমন একটা অথর্ব, পঙ্গু মেয়ের জন্যে এতটা ব্যাকুল হবার কি দরকার! তার গার্জেনরা দেখাবেন। এ রকম ভাবলেও মিহির কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারলো না।

চিনির সঙ্গে বিশেষ কিছু কথা হয়নি মিহিরের। প্রথম আলাপ এবং পরিচয়ের কথাতেই যেটুকু সময় সে পেয়েছিল তাতেই বুঝেছে চিনির জীবন অত্যন্ত করুণ।

যে কোনো রকমেই হোক, চিনির জন্যে চেষ্টা করবে মিহির। চেষ্টা অর্থে ওকে ভালোভাবে ডাক্তার দেখার ব্যবস্থা। কিন্তু মিহির ভেবে দেখলো, চিনির পালক-পিতা চেষ্টা যথেষ্ট করেছেন। তার পালিক-মা'র এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ নেই। এখানে কি করতে পারে সে?

পরদিন যথাসময়ে মিহির পড়াতে গেল ছাত্র হিরণকে। গিয়ে দেখলো, মিনির মা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। মিহির যেতেই তাকে বসিয়ে বললো,

—আজ মিনি আর হিরণকে নিয়ে একজিবিশন দেখিয়ে আনতে হবে।

—যে আজ্ঞে! কখন যেতে হবে?

—বিকেল চারটে নাগাদ হবে। ফিরে এসে তুমি এখানেই খাবে কিন্তু।

—আচ্ছা মা, মিনু কোথায়?

—আসছে। ততক্ষণ হিরণকে পড়াও।

হিরণ পড়ছে। রমলা চলে গেল। কিন্তু মিনি এখনও আসছে না। অবশ্য মিনির পরীক্ষা শেষ হয়েছে—পড়ার চাপ নেই। হয়তো মিনিকে ইচ্ছে করেই আসতে দেওয়া হয়নি। এই রকম কথা ভাবছে মিহির।

হিরণ একমনে বই পড়ছে। তার পাঠ্য-পুস্তকটা নিয়ে মিহির প্রশ্ন করলো,

—মিশর দেশ কোথায়? সেখানে কি বিখ্যাত?

—আফ্রিকায়! আর.....আর....

—আর নীলনদ! কথাটা বললো মিনি।

চেয়ে দেখলো মিহির ওর দিকে, সুন্দর সাজ তার অঙ্গে। এ পর্যন্ত এমন বেশে সে আসেনি কোনোদিন তার সামনে, তখনও দেখছে মিহির। মুখে একটু হাসিও লেগে রয়েছে মিনির। বললো,

—আজ যাচ্ছেন তো স্যার? কখন বেরুবেন?

—হ্যাঁ। চারটে নাগাদ বেরুলেই হবে। রাত দশটা অবধি তো একজিবিশন খোলা।

—অতখানি রাত অবধি মা থাকতে দেবে না। আটটার মধ্যেই ফিরতে হবে।

—বেশ তাই হবে। চারটের আগে কিন্তু একজিবিশন খোলে না।

—আমরা সাড়ে তিনটেয় বেরুবো।

—আচ্ছা! আমি তিনটের সময় আসব এখানে।

আরও কিছু কথার পর মিহির চলে এলো। সাড়ে তিনটে নাগাদ গেল আবার। হিরণ দশ মিনিটের মধ্যেই নেমে এলো। মিনির দেখা নেই, অবশেষে সে যখন এলো, ঘড়িতে তখন চারটে বেজে পাঁচ মিনিট। মিহির হাতঘড়িটা দেখিয়ে বললো,

—তোমারই দেরি হলো।

—তা হলো। চলুন।

প্রায় পাঁচ মিনিটের পথ ট্রাম লাইন। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে। হিরণও আছে সঙ্গে। তবে সে যাচ্ছে আগে আগে। পথে মিহির মিনিকে বললো,

—তোমার দিদিকে জানিয়ে এলে?

—হ্যাঁ দিদিকে না বলে কিছু করিনে আমরা।

—তাঁকে একজিবিশন দেখানো যায় না?

—যায়। তবে ওকে লোক দিয়ে নামাতে হবে। তারপর গাড়ি করে নিয়ে যেতে হবে—তবে তো! সে অনেক হাঙ্গামা।

—হ্যাঁ, তা তো বটেই!

—আমি দিদিকে বলে এলাম একজিবিশনে যাচ্ছি। জানেন স্যার, দিদি এত ভালো মেয়ে যে কি বলব! দিদির মনে কোনও আশা বা আকাঙ্খা নেই, যেন কলের পুতুল। ওই গান আর পড়া, পড়া আর গান নিয়েই আছে দিদি।

—অসহায় অবস্থা ওঁর। কি আর করবেন

—হ্যাঁ, কিন্তু আমরা চাই দিদি নীচে আসুক।

—আসেন না?

—না, মা আসতে দেয়না।

কথাটি শুনে চুপ করে রইলো মিহির। মিনি বললো,

—দিদির মনে খুব দুঃখ, কেমন যেন নিরাসক্ত ভাব তার।

—হ্যাঁ, তা তো হবেই।

অনেকক্ষণ আর কেউ কোন কথা বললো না। কেমন যেন গুমোট ভাব। এ রকম অবস্থায় বেশিক্ষণ চলা যায় না। তাই মিহির বললো,

—এই ছবিটার খুব নাম-ডাক শুনেছি। আশা করি খুব ভালো হবে।

—হ্যাঁ। আমাদের পাশের বাড়ির রাঙা বৌদি দেখেছে। বলে, খুব ভালো।

—সবার রুচি তো সমান না। আমাদের ভালো না-ও লাগতে পারে।

—তবে রাঙা বৌদি ভালো সমঝদার—সমালোচকও বটে।

—বল কি! লেখেন সমালোচনা?

না, লেখে না, কিন্তু ওর যুক্তিগুলো বেশ অকাট্য।

কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো মিনি। তারপর কি যেন ভেবে শুধুলে,

—তোমার দিদির যুক্তিও খুব ভালো—অকাট্য।

—হ্যাঁ। কিন্তু দিদি তো সিনেমা দেখে না।

—সিনেমা কি কোনোদিন দেখেননি?

—কৈ, কে দেখাবে? আমরা শুধু গল্পটা বলি দিদিকে।

—গল্প শুনে কি সিনেমা দেখার সাধ মেটে?

মিহিরের গলার স্বর করুণ। চুপ করে গেল দুজনেই। কিছুক্ষণ কাটবার পর মিহিরই আবার বললো,

—ওঁকে কি আনা যায় না নীচে?

—যাবে না কেন? বললাম তো, স্ট্রেচারে করে নীচে আনতে হয়।

—তাই আনা যাবে। তারপর গাড়ি করে...

—মা অত ঝামেলা করতে দিতে চায় না।

—তোমার বাবাকে আমি বলব।

—তা, বলে দেখতে পারেন। তবে বাবাও বেশ ভয় করেন মাকে। মিহির আর কিছু বললো না। আপন মনে কি যেন ভাবতে লাগল।

পরদিন রবিবার। মিহির চেষ্টা করে মিনির বাবার সঙ্গে দেখা করলো। চেষ্টা অর্থে আর কিছু নয়, ভদ্রলোক নানান কাজে ঘোরেন, তাই বার তিনেক গিয়ে সে দেখা পেল তাঁর। নমস্কার করে বললো,

—আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে আমার।

—আচ্ছা, বল।

—আমি আপনার পালিতা-কন্যা চিনির বিষয়ে সবিশেষ জানতে চাই। ওঁর ওই অসুখ কবে থেকে, কি ভাবে হলো, তার কি ভাবে চিকিৎসা হয়েছে?

—চিনির অসুখ খুব ছোট বেলায়। ওকে সারাবার চেষ্টা আমি কম করিনি।

—হ্যাঁ, সে কথা শুনেছি। তবু আর একবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

—না মিহির, আর কিছু করবার নেই। এখন ওর জন্যে একটা ভালো কাজ, যা সে বসে বসে করতে পারে, খুঁজছি।

—আমার মনে হয়, ওকে আপনার বিলেত পাঠানো উচিত চিকিৎসার জন্যে।

—সে কথা আমিও ভেবেছি, হয়তো পাঠাতামও। কিন্তু ভেবে দেখ, একা তাকে পাঠানো যায় না। সঙ্গে আমায় নিজেকে যেতে হবে।

—যাবেন। নইলে ওর জীবনটাই যে নষ্ট হয়ে যায়।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার নিজের কথাটাও ভেবে দেখ। খরচ আছে, মিনি বড়ো হলে, বিয়ে দিতে হবে। যাওয়া মানে সব কাজ কারবার বন্ধ রাখা। এ সবই তো ভাবতে হয়।

মিহির আর কি বলবে? চুপ করে রইলো সে। অনেকক্ষণ পরে মিনির বাবাই বললেন,

—আমি এ বিষয়ে অনেক ভেবেছি মিহির। কি করা যায়, কি করা উচিত ঠিক করতে পারিনি। অবশেষে ঠিক করলাম, ওর খাওয়া-পরার ব্যবস্থাটা অন্তত করে দিতে হবে। গান-বাজনা শিখিয়েছি, লেখাপড়াও ভালো শিখেছে। আর আমি কি করতে পারি বল?

—আপনি যথেষ্ট করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে ওর জীবন পূর্ণ হবে না।

—না, নিশ্চয় না। আমি সে চেষ্টাও করব, ভেবেছি। তবে কোথায় পাব এমন উদার মহান ছেলে, ওকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করবে? ইন্‌ভ্যালিড মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। আর—

—আর কি বলুন।

—ওর পক্ষে বিয়ে না করাই ভালো, কারণ শারীরিক অক্ষমতা। ওকে

যদি কেউ টাকার লোভে বা আর কিছুর লোভে বিয়ে করে, তাহলে তার পরিণাম হবে ওর জীবন দুর্বহ...মারাত্মক।

—কেন?

—কারণ ওকে বিয়ে করে সে সুখী হতে পারবে না, হেনস্থা করবে—অসম্মান করবে। সে অবজ্ঞা ওর পক্ষে হবে মর্মান্তিক। দীর্ঘদিন ইনভ্যালিড সেবা করা যায় না—এমন কি মাইনে-করা নার্সেরও ক্লান্তি আসে। ও তো হবে বৌ।

কথাগুলো ভাববার মতো। মিহির নিঃশব্দে ভাবছে। মিনির মা এসে পড়লো। কাজেই মিহির বিদায় নিয়ে চলে এলো।

চিনিকে দেখার আগে থেকেই তার কথা ভাবতো মিহির। দেখার পর ভাবনা আরো বেড়েছে। এত বেশি বেড়েছে যে, অন্য কোনো চিন্তাই তার মাথায় আসে না এখন।

অনেক ভেবে-চিন্তে মিহির ঠিক করলো, সে চিনিকে বিয়ে করবার প্রস্তাবই করবে। সে আশা করে, তার পালক-পিতা এই প্রস্তাব নিশ্চয়ই মেনে নেবেন। অবশ্য চিনির মতো ইনভ্যালিড মেয়েকে নিয়ে সংসারে বাস করা যে কতটা বিড়ম্বনা হবে, সে-কথাও মিহির চিন্তা করলো।

আকাশ-পাতাল ভেবেও কিন্তু মিহির নিজের মনকে স্থির করতে পারলো না। চিনির প্রতি তার সকল ইন্দ্রিয়, মন-প্রাণ যেন ছুটে যেতে চাইছে। এই আশ্চর্য অনুভূতি সে এড়াতে পারে না, যেমন করে হোক চিনিকে তার পেতে হবে। এই যেন জীবনে পরম অকাঙ্ক্ষা তার। এ ছাড়া যেন বাঁচতে পারবে না সে।

সেদিন যে কথাগুলি হয়েছে চিনির বাবার সঙ্গে, মিহির সেগুলি বার বার মনের মধ্যে আলোচনা করলো এবং ঠিক করলো, আগামী কাল সে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করবে।

মিহির উঠলো খুব ভোরে, কারণ যতটা সম্ভব সকালে তাকে যেতে হবে। মিহির বেরুলো। প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে মিনিদের বাড়ির। হঠাৎ তার মনে হলো, প্রস্তাবটা করা ঠিক হবে কিনা এবং করলে ওঁরা অন্য কিছু মনে করবেন কিনা? একবার ভাবলো না, যাবে না ওখানে। আবার ভাবলো, একবার যাওয়া তো যাক।

প্রাতরাশের সময় তখন। টেবিলে বসে মিনি আর হিরণ চা খাচ্ছিল।

মিহিরকে দেখে খুশী হয়ে তারা বললো,

—আসুন স্যার, আসুন। চা খাবেন?

—তোমার বাবা কোথায়?

মিহির প্রশ্নটা করলো। ওদিক থেকে মিনির মা আসতে আসতে বললো,

—উনি দিল্লী গেছেন। তুমি বস, চা খাও।

মিহির জানত না। জানলে হয়তো সে আজ আসত না। এখন আর কি করে!

মিনি উঠে গেল তার মা'র কাছে। এক কাপ চা আর কিছু খাবার দিল রমলা মিহিরের টেবিলে। মিনিকে কি ইঙ্গিত করতে সে চলে গেল। মিনি চলে যাবার পর রমলা বললো,

—তোমার তো এবার বিয়ে করা উচিত মিহির?

—বিয়ে!

—হ্যাঁ, বিয়ে! আর বেশি দেরি করা উচিত নয় তোমার।

মিহির কিছুটা আশান্বিত হলো এই ভেবে যে, তার প্রস্তাব সে রমলা দেবীর কাছেই পেশ করতে পারে। তাই বললে,

—বিয়ে করা যেতে পারে, তবে কাকে করবো তা তো ঠিক করা চাই।

—সেটা যদি তোমার ঠিক না হয়ে থাকে, তা আমরা করবো। বলে, অল্প হেসে রমলা বললো—আমার ইচ্ছে, তোমার হাতে-গড়া মিনিকে তুমি বিয়ে করো।

প্রস্তাবটা আকস্মিক, অতর্কিত এবং অগ্রহণযোগ্যও! চুপ করে রইলো মিহির কিছুক্ষণ। রমলা আবার বললো,

—তোমার হাতে মিনিকে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হতে চাই। হিরণ ছোট

—তোমাকে পেলে আমাদের কাজ-কারবারেরও সুবিধে হবে। তুমিই সব দেখতে পারবে।

নিঃশব্দে কথাগুলো শুনে গেল মিহির। তার কাছে এ একটা বড় রকমের প্রলোভন। এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে সে বিরাট ধনী হয়ে উঠতে পারে! কিন্তু...

চা খেল মিহির। কোনও কথা সে কিন্তু বললে না। রমলা আবার বললো,

—তোমার হাতে মিনিকে দেবার ইচ্ছে আমার বরাবরের। এতদিন বলিনি, কারণ মিনি এতদিন ছোট ছিল।

—আমাকে কথাটা ভেবে দেখতে দিন, মা।

—বেশ বাবা, ভেবেই বলবে।

মিহির চলে এলো।

নিজের ঘরে এসে ভাবতে লাগলো মিহির, কি করা যায়? মিনি অবশ্য খুবই ভালো মেয়ে এবং তাকে বিয়ে করতে কারও আপত্তি হওয়া উচিত নয়; কিন্তু মিহিরের মন তো মিনিকে চায় না। সে যার স্বপ্ন দেখে সে মিনি নয়, চিনি—অসহায় এক তরুণী—যাকে বিয়ে করে সংসার করা প্রায় অসম্ভব। তবু মিহির তাকেই চায়। এখন সে কি করবে?

বিষয়টা নানা দিক থেকে ভেবে মিহির ঠিক করলো, এ সম্বন্ধে মিনির বাবার সঙ্গেই কথা বলা উচিত। কারণ, রমলা দেবীকে সরাসরি জবাব দেওয়টা যেন কেমন বিসদৃশ বলে মনে হচ্ছে তার।

মিহির পরদিন দুপুরবেলা মিনির বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেল তাঁর অফিসে। এ অফিস তার পরিচিত। বেশি দেরি তাকে করতে হলো না।

মিনির বাবা ডাকলেন,

—এসো মিহির। কি খবর তোমার?

—খবর ভালোই স্যার। একটা কথা বলতে এলাম।

—বল।

—আমার গার্জেন তো এখন আপনিই। আপনাকে বলা উচিত। ব্যাপারটা আমার বিয়ে নিয়ে। হয়তো আপনি শুনে থাকবেন মা'র কাছে।

—হ্যাঁ, কিছুটা শুনেছি। তা, তোমার মতামত কি?

—সেটাই আমি জানাতে এসেছি স্যার।

—বেশ, বল।

বিমলবাবু অপেক্ষা করছেন। মিহির একবার ভেবে নিল। তারপর বললো,

—মা আমার হাতে মিনিকে দিতে চান। আশা করি আপনি জানেন।

—হ্যাঁ, জানি। তোমার হাতে মিনিকে দিয়ে আমরা সত্যিই খুব খুশী হব।

—আমার সৌভাগ্য! কিন্তু আমার একটা কথা আছে, যা মাকে আমি

বলতে পারব না। হয়তো আপনিও বলতে পারবেন না। কথাটা আমার নিজস্ব।

—কি কথা মিহির? বলতে আপত্তি আছে?

—আজ্ঞে না, সে কথাই বলতেই এসেছি। মিনি খুব ভালো মেয়ে। তাকে পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের কথা! কিন্তু আমি আপনার ওই পঙ্গু মেয়েটির কথাই ভাবছি।

—তার আর কি করা যাবে মিহির! সহানুভূতি, স্নেহ জানানো ছাড়া তো তার বিষয়ে আর কিছু করার নেই। অবশ্য তার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা আমি যথাসাধ্য করে যাব।

—শুধু খাওয়া-পরাই কি সব! ওতে কি মানুষের জীবন পূর্ণ হয়? বিশেষত! ওই রকম একজন প্রতিভাময়ী মেয়ের জীবন?

—না, নিশ্চয়ই না। কিন্তু কি করতে চাও?

—আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।

মিনির বাবা নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, কিন্তু তাঁর চোখে-মুখে আনন্দের দীপ্তি দেখছে মিহির। বেশ কিছুক্ষণ পরে বিমল বললেন,

—এ তার পরম সৌভাগ্য মিহির, কিন্তু তুমি কি এটা পারবে করতে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি দান-পণ কিছুই চাইছি না। শুধু ওর চিকিৎসার জন্যে আমাকে কিছু নগদ টাকা সাহায্য করতে হবে আপনাকে।

—সেটা কিছু বেশি কথা নয় মিহির।

—আমি চেষ্টা করবো তাকে ভালো করতে। যদি ভাল না হয়, যেমন আছে তেমনি থাকবে।

—তোমার জীবন তাতে বিষময় হয়ে না যায়।

—আপনি আশীর্বাদ করলে অমৃতময় হয়ে যাবে।

—আমি সত্যই আনন্দিত মিহির, তবু একটা দিন সময় দাও! আমি একটু ভাববো।

—যে আজ্ঞে, আমি কাল দেখা করবো।

মিহির বিদায় নিল।

ওখান থেকে বাড়ি ফিরে মিহির আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে, আর ভাবছে,

বিমলবাবু নিশ্চয়ই তার পঙ্গু মেয়ের জন্যে এই সুযোগ গ্রহণ করবেন। আবার ভাবলো, পঙ্গু মেয়েটি তাঁর নিজের মেয়ে নয়। তাঁর নিজের মেয়ে মিনির জন্যই আমাকে নির্বাচন করা হয়েছে। সেটা তাঁদের বিশেষ স্বার্থের ব্যাপার! বিমলবাবু এবং রমলা দেবী কি এতটা স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজী হবেন। ওঁদের চোখে মিহির সুপাত্র সে টিউশনি করে ভালো রোজগার তো করেই; তাছাড়া একটা ভালো কলেজে প্রফেসারিও যোগাড় করেছে এবং ডক্টরেট হবার জন্যে থিসিস লিখছে। হয়তো পেয়ে যেতে পারে। তাছাড়া সে কয়েকটা স্কুলের পাঠ্য-বই লিখেছে, যা বাজারে বেশ চালু। এই সব নানা কারণে মিহির সত্যই যোগ্য ও সুপাত্র। বয়স তার বত্রিশ—দেখায় ত্রিশের নীচে। চেহারাও তার অতি সুন্দর।

পাত্র হিসাবে মিহির যতই ভালো হোক, মিনির সঙ্গে তার বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য আছে এবং মিনিকে সে কোনোদিন প্রেমের দৃষ্টিতে দেখেনি। ছোট বোনের মতোই দেখে এসেছে এতদিন, আর যতটা তার জানা তাতে মনে হয়, মিনিও মিহিরের দিকে প্রেমের চোখে চায়নি। বড়দার মতো সে শ্রদ্ধা করে মিহিরকে। এ অবস্থায় রমলা দেবীর নির্বাচন খুব প্রশংসনীয় বলে মনে করে না সে। যদি দরকার হয়, এই কথাই বলবে বিমলবাবুকে এবং রমলা দেবীকেও।

যদি বিয়ে মিহিরকে করতেই হয় ওখানে, তো চিনিকেই করবে, অন্যথা ও বাড়িতে বিয়ে সে করবে না। মিনিকে বিয়ে করতে সে একান্ত নারাজ, এই কথা সে জানিয়ে দেবে। পঙ্গু চিনিকে নিয়ে জীবন-যাপন করা যে কতখানি কষ্টকর হবে, চিন্তাশীল মিহির তা বারবার ভাবলো। কিন্তু কে জানে, কেন চিনির প্রতি আকর্ষণ ক্রমশ দুর্বার হচ্ছে? ওর সবসময় মনে হচ্ছে, চিনিকে সে পেলে তার বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে। কেন যে এমন মনে হচ্ছে সে জানে না, মনকে বোঝাতেও পারলো না।

চিনিকে মাত্র একদিন চোখে দেখেছে মিহির, অবশ্য তার সম্বন্ধে আগ্রহ এবং মিনি ও হিরণ মারফত খবরাখবর নেওয়া অনেকদিন থেকেই চলছে—তার গানও শুনে এসেছে কিছুদিন যাবৎ। প্রাণের কোন গোপন তারে যেন দিবারজনী সেই গানের সুর ঝঙ্কৃত হয়, কে জানে কেন এই আকর্ষণ।

মিহির অনেক চেষ্টা করেও এর কারণ বার করতে পারলো না। অবশেষে ঠিক করলো, এই প্রেম নৈসর্গিক। একে অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতা শুধু নয়—

জীবনের বিড়ম্বিত করা। মিহির তা করবে না—সে চিনিকে বিয়ে করবে। তার দক্ষিণ-অঙ্গ অবশ, তা হোক। চিনি প্রায় ইনভ্যালিড—তাও হোক। চিনি তার প্রিয়তমা। তাকে যতটা সম্ভব সুখী করবে মিহির।

নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে চিনি। আর ভালো যদি নাও হয় তাহলেও চিনি তার বুকে থাকবে! এ বিষয়ে আর কোনও রকম দ্বিধা-দ্বন্দ রইলো না মিহিরের মনে। চিনিকে সে নিশ্চয়ই বিয়ে করবে।

দিন চার পাঁচ পরে মিহির আবার দেখা করলো বিমলের সঙ্গে। বিমল তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করলেন,

—কি ঠিক করলে মিহির?

—ঠিক করাই তো আছে স্যার! বিয়ে আমি চিনিকেই করব। অবশ্য এখন আপনার অনুমতি পেলেই হয়!

—আমার পক্ষে এ একটা সৌভাগ্য মিহির, তবে মিনির মা তোমাকে মিনির জন্য চেয়েছিল।

—তাঁর নির্বাচনে ভুল হয়েছে। মিনি আমার ছোট বোনের মতো। সে আমার বোনই থাকবে।

—হ্যাঁ, সে কথা সত্যি। যাক, তাহলে এখন সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলি!

—তার আগে আমাকে চিনির সম্মতি নিতে হবে স্যার। আপনি কি তাঁকে কোনো কথা বলেছেন?

—না! হয়তো মিনি বলে থাকবে। খুব সম্ভব বলেছে। ওর মা তোমার কথা শুনে বিরক্তই হয়েছে। সুতরাং একথা নিয়ে বাড়িতে বিশেষ আলোচনা হয়নি।

—আমি কি অনুমতি পাব চিনির সঙ্গে দেখা করবার?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। তাহলে এখনি চল।

—আমি সন্ধ্যার দিকে যাব। আপনি যেন বাড়িতে থাকবেন।

—থাকব। তোমাকে আমি তার কাছে পৌঁছে দেব। যদি সে রাজী হয় তাহলে আমার সম্মতি দেওয়াই রইল।

—রাজী কি হবেন না ভাবছেন?

—চিনি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে মিহির। নিজের অসহায়তা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সজাগ। শিক্ষিতা মেয়ে সে। কে জানে কি বলবে!

—বেশ, তাঁর মুখ থেকেই শুনব আমি সে কথা।

—আচ্ছা, খুব ভালো কথা। তুমি ক'টায় আসবে?

—বৈকাল পাঁচটায়। আমি এখন আসি।

মিহির প্রণাম করলো বিমলকে। তারপর সটান চলে এলো বাড়ি। বিমলের অফিসেই কথা বলে এলো মিহির।

বিকেল পাঁচটায় হাজির হলো মিহির বিমলবাবু বাড়ি। তিনি উপরে নিয়ে গেলেন তাকে ঠিক ছ'টার সময়, অর্থাৎ প্রায় একঘন্টা পরে। হয়তো চিনিকে সাজগোজ করবার সময় দেবার জন্যে, অথবা তাকে মনে মনে তৈরি হবার জন্যে বিমল এতখানি দেরি করলেন। মিহির গিয়ে দেখল, চিনি তার ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে আছে।

নমস্কার করলো মিহির। চিনি অতি বিষণ্ণমুখে মাথা নুইয়ে প্রতি নমস্কার করলো। বিমল বললেন,

—তোমরা কথা বল, আমি তোমার জন্যে এখানে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চলে গেলেন বিমল। এলো মিনি! বেশ হাসিখুশী ভাব তার। এসেই বললো,

—আগে দিদি একখানা গান গাইবে, শুনুন। তারপর আপনাদের কথা হবে।

—আচ্ছা!

চিনি কিছুটা ইতস্তত করছে। মিনি জোর করে ওকে ধরে বললো,

—গাইবি—গাইতে হবে। উনি তোর গান ভালোবাসেন। গা, দিদি।

—বাজনা?

—আমি বাজাচ্ছি।

মিনি আরম্ভ করে দিল একটা যন্ত্র নিয়ে। এ সঙ্গত নয়, কোনোরকমে গাওয়া চলে মাত্র।

চিনি আস্তে আস্তে গাইতে আরম্ভ করলো ঃ

সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারাদিনের তৃষা,
কেমন করে মেটাব গো—
খুঁজে না পাই দিশা।....

গান চলছে আর মিহির মনে মনে ভাবছে। সত্যি, সারাজীবন যেন সে ক্লান্ত হয়ে এই মেয়েটিকেই খুঁজছে। কিন্তু এই একান্ত অক্ষম অসহায়কে নিয়ে সে কি করবে! ভাবতেই মিহির নিজেকে তিরস্কার করলো। না, এ কথা সে চিন্তাই করবে না। একে নিয়েই সে জীবনের পথে পাড়ি দেবে।

চা এসে পড়লো। তৈরি করে দিয়ে মিনি চলে গেল। চিনি নতমুখে বসে আছে। মিহির বললো,

—আমার কথা শুনেছেন?

—হুঁ!

—আপনার মত কি?

চিনি চুপ করে আছে। প্রায় দু'মিনিট কথা বললো না সে। আবার মিহির প্রশ্ন করলো,

—এ বিবাহে আপনার অমত হবে কি?

—আমার অমত! চিনি একটু থামলো, তারপর ঢোক গিলে বললো, আমার এমন সৌভাগ্য কল্পনার বাইরে। কিন্তু আমি কারও জীবনকে বিড়ম্বিত করতে চাইনে। আপনি আমায় মার্জন করুন।

—সে কি! আমি জীবনে বিড়ম্বিত কেন হবো? ও বিষয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আপনার দেহটা বাদে বাকি সবই আমি পাব। প্রেম-ভালোবাসা—সেগুলো কি কিছুই নয়?

—তা বলছিনে, সেগুলো খুবই মূল্যবান। কিন্তু আধার ছাড়া কি আধেয় থাকে? দেহকে বাদ দিয়ে দেহাততী শুধু কল্পনার বিলাস মাত্র।

—আমি তো মনে করিনে। দেহ তো বাদ পড়ছে না। দেহটা একটু অপটু—অক্ষমতাও আছে। তাতে কি? যা আছে, আমি তাতেই জীবনভোর এবং জীবনের পরেও তৃপ্তি পাবো। তুমি রাজী হও চিনি। বিশ্বাস কর, তোমাকে না-পাওয়ার দুর্ভাগ্য আমার পক্ষে হবে মর্মান্তিক।

চিনি অতি বিস্ময়ে তাকিয়েছিল মিহিরের মুখপানে। অশ্রুসজল তার মলিন মুখ দেখে আস্তে আস্তে বললো,

—আপনার এই আশ্চর্য প্রেম আমি কেমন করে লাভ করলাম জানিনে। কেমন করে এই স্বর্গীয় প্রেমের সম্মান আমি দিতে পারব—এর মর্যাদা রাখতে পারব?

—তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তুমি শুধু শুয়ে শুয়ে আমায় ভালোবাসবে—আমাকে ভালবাসতে দেবে—আর আমার ভালোবাসা গ্রহণ করবে। এর বেশি কিছু চাইনে আমি তোমার কাছ থেকে।

তাতে কি আপনার জীবন পূর্ণ হবে—সংসার সজীব হবে?

না-হয় না হবে! এই পৃথিবীতে পুতুলকে ভালোবেসে জীবন কাটিয়েছে এমন মানুষের কথা শোনা যায়। ফুলকে ভালোবেসে ফুল হয়ে গেছে, এমন উদাহরণও আছে। তুমি রাজী হও চিনু।

—বেশ হলাম। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে।

—বল!

—সংসার করবার জন্য আপনি অন্য একজনকে বিয়ে করবেন, যে তার দেহ দিয়ে আপনার জীবনের অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করবে।

—না! এ অনুরোধ রাখার অর্থ, আমার প্রেমের ফাঁসি হওয়া। না, এ হবে না।

বলতে বলতে যেন স্বর্গীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মিহিরের মুখ। চিনি চেয়ে দেখছে এই মুখখানি।

এমন একটা অবাস্তব ঘটনা যে ঘটতে পারে, অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না। একটা ইন্‌ভ্যালিড মেয়েকে, তা সে যত রূপসী হোক, জেনে-শুনে-বুঝে কোনো শিক্ষিত ভদ্রসন্তান বিয়ে করতে চায় না। মিহির কিন্তু তাই চাইলো এবং নীচে এসে বিমলকে জানাল যে, সে চিনির সম্মতি পেয়েছে।

রমলাও ছিল সেখানে। মুখখানা বিকৃত করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বললো,

—তা ভালো! চিনির একটা কিছু গতি হলে আমরাও নিশ্চিন্ত হই।

কথাগুলোর মধ্যে স্নেহ-মমতার লেশমাত্র নেই, বরং কিঞ্চিৎ উষ্মা এবং ব্যঙ্গ রয়েছে। মিহির সুশিক্ষিত তীক্ষ্ণধী যুবক। সে রমলার মনোভাব বুঝে গেল, কিন্তু কিছু বললো না। ওরা আরো কিছু বলে কিনা শোনবার জন্য অপেক্ষা করছে। বিমল বললো,

—আচ্ছা, আমি তাকে একবার জিজ্ঞেস করে, পরে বিয়ের দিন ঠিক করব।

—যে আজ্ঞে। বিমলের কথার উত্তরে মিহির জানালো এবং নমস্কার করে বিদায় চাইল। রমলা কি যে ভেবে বললো,

—ওকে আমি অতি যত্নে মানুষ করেছি। ওর বিয়ে হলে আমার থেকে সুখী আর কেউ হবে না। তবে, আমি তোমার কথাও ভাবছি। তোমার জীবনটাও পঙ্গু না হয়ে যায়।

—যায় যাবে! আমার সে-দুঃখ সইতে হবে।

—বেশ! আমার আর কিছু বলবার নেই। আসছে মাসেই বিয়ে হোক।

—যে আজ্ঞে।

মিহির বিদায় নিল।

পথে আসবার সময় মিহির ভাবতে লাগলো, রমলা দেবী তাঁর মেয়ে মিনির সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সে সে-প্রস্তাব গ্রহণ না করায় রমলা দেবী যে অপ্রসন্ন হবেন, এ তো জানা কথা। তবে বিমলবাবু খুব খুশী হয়েছেন, এটা তাঁর চোখ মুখ এবং কথাবার্তায় বোঝা যায়। যাই হোক, মিহির বিয়ের পরই চিনিকে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে আসবে এবং যতটা তার ক্ষমতায় হয় চিনির চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। চিনি যে ভাল হবে এটা অবশ্য দুরাশা, তবু চেষ্টার ত্রুটি করবে না মিহির।

ভাবতে ভাবতে মনটা তার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু চিনির সঙ্গে আর একবার দেখা তার হওয়া দরকার। আজই হতে পারতো। কিন্তু মিহির সে ইচ্ছা জানায় নি বিমল বা রমলাকে। মিনির সঙ্গেও আজ দেখা হয়নি তার। মিনিও কি চটলো নাকি তার ওপর। হবেও বা! চটবারই তো কথা। মিনির কাছে চিনির মনের কথা কিছু হয়তো জানা যেতে পারতো, সেটা আর এখন হবে না।

নানা রকম চিন্তার মধ্যে দিন-রাত কেটে গেল মিহিরের। পরদিন বিকেলে কিন্তু সে আর স্থির থাকতে পারলো না। চিনিকে একবার দেখে আসা দরকার। তার মতের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা জানতে হবে।

বেরুলো মিহির। পথে ভাবছে, কি জানি চিনির সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি

সে পাবে কিনা? হয়তো পাবে না! মনটা তাই আলোড়িত হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছালো এসে।

সামনেই মিনি। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বললো,

—শুনে আমরা সবাই খুশী হলাম স্যার, আসুন, আসুন। বসুন।

—তোমার দিদির সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—স্বচ্ছন্দে। একবার কেন, বারবার....যতবার ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে!

—এখন কি যেতে পারি?

—হ্যাঁ। সোজা চলে যান ওপরে। দিদি ছাদের বাগানে একা বসে আছে।

—তুমি একটু সঙ্গে চল মিনি।

—ওরে বাবা! আমি কেন যাব? আমি এখন ব্যাডমিন্টন খেলতে যাচ্ছি। আপনি চলে যান ওপরে।

মিনি সত্যি-সত্যি বেরিয়ে গেল। মিহির ভাবছে, সে এখন কি করবে—ওপরে উঠে যাবে নাকি। এই সময় রমলা নামলো সাজগোজ করে। কোথায় যাবে! মিহিরকে দেখে বললো,

—কি খবর?

—চিনির সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই!

—চলে যাও না ছাদের ঘরে। আমি যাচ্ছি আমার বোনের বাড়ি। উনি এখনও ফেরেননি অফিস থেকে। তাতে কি হয়েছে? তুমি যাও ওপরে। বলেই, একটু থেমে চাকর রামকে ডেকে রমলা বললো—ছাদের ঘরে তোর বড়দিকে আর মিহিরকে চা-খাবার দিস।

রমলা চলে গেল।

মিহির আর কোনোরকম ইতস্তত করলো না। একটা শব্দ করে ওপরে উঠে এলো মিহির।

চিনি হেনা গাছটার ঝোপের আড়ালে বসেছিল। উঁকি দিয়ে দেখলো, তার বিষণ্ণ মুখে ক্ষীণ হাসি।

মিহির এসে বসলো চিনির কাছে একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে। মিনিট খানেক কোনো কথা নেই। চিনি নতমুখে বসে আছে। মিহিরই মুখ খুললো প্রথমে। আস্তে আস্তে বললো,

—আসছে মাসে তোমায় নিয়ে যেতে পারব?

ক্ষীণ হাসি হাসলো চিনি। হাসিটা তার অত্যন্ত মিষ্টি, কিন্তু বড্ড করুণ। মমতায় সারা মন-প্রাণ ভরে উঠলো মিহিরের। বললো,

—বিশ্বাস হচ্ছে না।

ওর দিকে তাকিয়ে চিনি প্রায় পাঁচ-সাত সেকেণ্ড দেখলো, তারপর মুখটা নামিয়ে আস্তে আস্তে বললো,

—আমার যেন স্বপ্ন মনে হচ্ছে! আমি কি সত্যিই জেগে আছি।

—হ্যাঁ। কিন্তু স্বপ্ন কেন মনে হচ্ছে তোমার?

—এতবড় সৌভাগ্য আমার কি হবে?

—হবে, হয়েছে। আমার ঘর আলো করে থাকবে তুমি।

—আমি তো পঙ্গু। আমাকে নিয়ে কি যে আপনি করবেন বুঝি না!

—তোমাকে আমার জীবনের সাথী করেই সারা জীবনটা কাটাব।

—পারবেন তো? দেখুন, আমি এখনও আপনাকে সতর্ক হতে বলছি।

—নিশ্চয় পারব। আর এ না হলে আমার পক্ষে বাঁচা সঙ্কট হবে।

—কেন? আমি কি এমন....

—তা জানিনে। আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমার অনন্তকালের সঙ্গিনী।

চিনি আর কিছু বললো না। বেয়ারা চা-খাবার নিয়ে এলো। একহাতে চা ধরতে অসুবিধা হয় চিনির। মিহির সাহায্য করছে। বললে,

—আমার বাঁ-হাতটা দিয়ে তোমার ডান-হাতের অভাব মেটাব।

—জানি না আমার অদৃষ্টে কোথায় এত সুখ লেখা ছিল?

চা তৈরি করে দিল মিহির চিনিকে। ওর ডান হাত অকর্মণ্য কিন্তু বাঁ-হাতের খুব ভালো কাজ সে করতে পারে। আজ কিন্তু বিশেষ কিছু করলো না। মিহিরই চা করলো, খাবার ঠিক করে দিল চিনিকে। খেতে-খেতে বললো,

—একটা গান গাইবে?

—গাইতে পারি, কিন্তু বাজাবেন তো?

হ্যাঁ। আমি অবশ্য খুব ভালো বাজাতে পারিনে।

—আপনি হারমোনিয়ামটায় হাওয়া দিন, আমি বাজাচ্ছি।

মিহির হাওয়া দিতে লাগলো। চিনি বাজাতে বাজাতে গাইলো ঃ

সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারাদিনের তৃষা,

কেমন করে মেটাব গো—
খুঁজে না পাই দিশা।....

গান শেষ হলে মিহির বললো,

—এই গানটাই তোমার বিশেষ প্রিয়, তাই না?

—হ্যাঁ। খুব ভালো লাগে আমার।

—বেশ, আর একটা গাও।

চিনি এবার গাইলো ঃ

এত প্রেম, সুখী এত ভালোবাসা
কেমনে আছে সে পাসরি।
সেথা কি বহে না মলয় সমীর—
সেথা কি বাজে না বাঁশরী?

অতি মধুর তার কণ্ঠস্বর। সন্ধ্যার আকাশকে যেন মন্দির করে তুলছে। মিহির গান শুনলো পরিতৃপ্ত হয়ে। বললো,

—তোমাকে ভালো করবার চেষ্টাও আমায় করতে হবে।

—ও আর হবে না। বাবা বিস্তর চেষ্টা করেছেন, কোনো ফল হয়নি।

—আমি তোমায় বিদেশে নিয়ে যাব।

—যাবেন, কিন্তু অনর্থক অর্থ নষ্ট হবে! ভালো আমি আর হবো না।

—না হও না-ই হবে। আমার বুকে লুটিয়ে থাকবে তুমি।

চিনি তাকালো এবং মৃদু হেসে আবার বললো,

—আমার 'আমি'-কে আমি সমর্পণ করলাম। এখন আপনার যা ইচ্ছে করবেন। আমার আশঙ্কা, আমি আপনার জীবন নষ্ট না করি।

—আমার জীবন সার্থক হয়ে উঠবে তোমার পরশে।

চিনি আর কিছু বললো না। মিহির আরও মিনিটখানেক বসে রইলো। হয়তো আরও কিছু কথা বলতে চায়। কিন্তু হিরণ এসে পড়লো। বললো,

—স্যার! আমাকে একটু পড়াবেন?

—আচ্ছা চল। পড়তে বসগে, আমি যাচ্ছি।

হিরণ কিন্তু গেল না। ওর ইচ্ছে, মিহিরকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

—আসুন স্যার!

হ্যাঁ যাই। চিনিকে বললে—আজ আসি তাহলে!

—আসুন।

মিহির ধীরে ধীরে নেমে এলো নীচে। এসে হিরণকে পড়াতে বসলো। কিছুক্ষণ পরে রমলা এলো, এসে বললে,

—কথা তো হলো। এবার বিয়ের সব ব্যবস্থা করি?

—হ্যাঁ মা। কথা পাকা!

পরদিন কি ভেবে মিহির গেল তার এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ি। সদ্য বিলেত ফেরত। এখনও খুব পশার জমাতে পারেনি। নাম সত্যব্রত রায়। উনি সব কথা শুনলেন মিহিরের মুখ থেকে। ভেবে বললেন,

—তাঁকে না দেখে আমি কিছু বলতে পারবো না। যদি দেখা যায়, রোগটা সারতে পারে, তাহলে তাঁকে বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব। তুই আমাকে একটা 'কল' দে।

—বেশ, আমি কালই 'কল' দেব তোকে।

পরামর্শ করে মিহির বাড়ি ফিরলো।

পরদিন সকালেই সে বিমলের বাড়ি গেল। রমলা এবং বিমল চা খাচ্ছিল। মিহিরকে সাদরে অভ্যর্থনা করে বসাল। চা দিয়ে প্রশ্ন করল,

—কি খবর মিহির?

—খবর ভালো। আমার এক বন্ধু বিলেত-ফেরত ডাক্তার। কাল তাকে বললাম চিনির অসুখের কথা। শুনে সে একবার দেখতে চেয়েছে। অনুমতি করেন তো আজই তাকে 'কল' দিই।

—বেশ তো দাও। কখন আসবেন তিনি?

—ফোন করে জিজ্ঞাসা করব?

—যাও, ফোন কর।

মিহির উঠে গিয়ে ফোন করলো ডাঃ সত্য রায়কে। ও বললো,

—এখন হাসপাতালে যাচ্ছি। বৈকাল চারটে-পাঁচটায় যাব ওখানে।

—আচ্ছা, তাই আসিস।

বলে, ফোন ছেড়ে দিল মিহির। এসে জানালো,

—বিকেল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে আসবেন ডাঃ রায়।

—কেমন ডাক্তার তিনি?

—তিনি অবশ্য বড় ডাক্তার এখনও হননি। তবে ধনীর ছেলে—বিলেতে বহু ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে। হয়তো কোনো ভালো ডাক্তারের কাছে আমাদের পরিচয় দিতে পারেন।

—আচ্ছা, খুব ভালো। দেখ চেষ্টা করে। তবে তার আগে চিনিকে তুমি বিয়ে কর।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

—আসছে মাসেই বিয়ে হবে। কেমন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে কথা তো পাকা আছে। আমি বিকেলে আসব ডাঃ রায় আসার আগেই।

মিহির চলে গেল বিকেলে আসবার কথা বলে।

বিকেলে একটু আগেই এলো মিহির। বিমল এবং রমলা অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। এই অপেক্ষা করার অবশ্য অন্য একটা কারণ আছে। সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।

ডাঃ সত্য রায় এসে পৌঁছল পাঁচটার কাছাকাছি। সাদরে তাকে অভ্যর্থনা করলো ওরা। নমস্কারাদি আদান-প্রদানের পর স্বয়ং রমলা বললো,

—আসুন, ডাঃ রায়! আমিই ইনট্রোডিউস্ করে দিই।

—ধন্যবাদ! চলুন।

ওকে নিয়ে উপরে এলো রমলা। সঙ্গে বিমল এবং মিহির। চিনি একটা সোফায় শুয়েছিল। পাশে ছিল সুসজ্জিতা মিনি। ও গাইছিল ঃ

ওগো সুন্দর! মনের গহনে তোমার মুরতিখানি
ভেঙে ভেঙে যায়—মুছে যায় বারে বারে
বাহির বিশ্বে তাই তো তোমারে টানে!

সুন্দর সুমিষ্ট গলা। সুন্দরী তরুণী মিনি। ডাঃ সত্য রায় দেখলো শুনলো তার গান। গানটা শেষ হলে রমলা ওদের পরিচয় করিয়ে দিল....চিনি তাঁর পালিতা কন্যা—মিনি আত্মজা।

এবার রোগিণীকে পরীক্ষা করবার কথা। কিন্তু চা-খাবার এসে পড়লো ডাঃ রায় সবিনয়ে বললো,

—আগে আমি রোগীকে দেখি।

—তাড়া কিসের! চা-টুকু খেয়ে তারপর দেখবেন! বিমল বললো।

—আচ্ছা।

ডাঃ সত্য রায় ছাদে-পাতা চায়ের আসরে এসে বসলো।

মিনি চা পরিবেশন করছে। চিনির রোগের ইতিহাসটা বলছে বিমল,

—আমার এক বন্ধুর মেয়ে চিনি। জন্মের পরেই মা মারা যায়। আমাদের তখন কোনও সন্তান ছিল না। তাই ওকে আমি নিয়ে আসি সন্তানস্নেহে মানুষ করবার জন্য এবং এতদিন আমরা তাই করেও এসেছি।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়! এ একটা অসাধারণ কৃতিত্ব এবং মানবতার পরিচয়। অসুখটা হলো কবে থেকে?

—ওর সাত বছর বয়সে টাইফয়েড রোগ হয়। ডানদিকের অঙ্গ পঙ্গু হয়ে যায় সেই অসুখে। আর সবই ওর ভালো। এমন শান্ত, বুদ্ধিমতী মেয়ে আর দেখা যায় না। আমার ছেলেমেয়ে তো 'দিদি' বলতে অজ্ঞান। ওর কোনও রকম অযত্ন ওরা সহ্য করতে পারে না। মিহির ওকে বিয়ে করবে জানতে পেরে ভাই-বোনে নাচছে আনন্দে।

—সত্যিই খুব ভালো ছেলে মেয়ে আপনার।

চা খাওয়া শেষ হলো। চিনি এতক্ষণ তার চেয়ারে বসে ছট্‌ফট্ করছে। তার এই অধীরতা অন্য আর কিছুর জন্য নয়, তাকে পরীক্ষা করে ডাক্তার কি বলেন তা জানবার জন্যে।

ডাঃ রায় এবার এলেন চিনিকে দেখতে। তার ডান-হাত এবং ডান-পা দেখলেন। আরো কি-সব দেখে পরীক্ষা করলেন। প্রশ্নও কিছু করলেন চিনিকে তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন,

—রোগটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে। চেষ্টা অবশ্য করা যেতে পারে, তবে ফল কি হবে বলা যায় না!

—চেষ্টার কোনো ত্রুটি তো করা হয়নি। এখন আরও কিছু যদি করা যায় তো দেখুন! বিমলবাবু বললেন কথাগুলো।

—চলুন, বাইরে যাই।

সত্য রায় স্টেথেস্কোপ কাঁধে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে রমলাও এলো। বিমল তখনও চিনির খাটের কাছে দাঁড়িয়ে। বললো,

—চিনু! কাঁদছিস কেন মা?

—বাবা! মিহিরবাবুকে বলো, আমাকে নিয়ে তাঁর কোনও কাজ সিদ্ধ হবে না! তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে অন্য মেয়েকে বিয়ে করুন।

—ও তো শুনবে না, মা। ও যদি তার মতে স্থির থাকে, তাহলে আমি তোকে দেব মিহিরের হাতেই।

—না বাবা, না! এতে তাঁর জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

—ও তো নির্বোধ নয়, মা। দেখি, ডাক্তারের মতামত শুনে সে কি বলে? কাঁদিস্‌নে। কথা দিলাম, তোর অমতে কিছু করা হবে না।

বিমল চলে এলো। মিহির এতক্ষণ বাইরেই ছিল—ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। স্বয়ং বিমল আর রমলা ডাঃ রায়কে নিয়ে যাওয়ায় সে আর ভিড় বাড়াতে চায়নি। এতক্ষণে ডাক্তারের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো,

—কি দেখলি সত্য? ভালো হবে?

—না।

পরিস্কার উত্তর দিল ডাঃ সত্য রায়! রমলা বললো,

—তাহলে বিলেত পাঠানোর আর কি দরকার?

—কিছু না। ওকে কেউ ভালো করতে পারবে না। কারণ, ডান-অঙ্গের সব নার্ভই শুকিয়ে গেছে। সে আর ঠিক হবে না। অকারণ খরচ করতে বলব না আমি। বরং আমার সাজেশন, সেই টাকাটা ওর নামে রেখে দিন। ভবিষ্যতে ওর কাজে লাগবে।

—তাহলে বিয়ে?

—ওর বিয়ে দিয়ে কোনো লাভ নেই। অক্ষমতা ওর কোনোদিন কাটবে না। সন্তানাদির আশা তো নেই-ই। স্বামী-সংসর্গও ওর পক্ষে কষ্টকর হবে। তারপর যদি সন্তান-সম্ভবা হয় তো ওকে আর বাঁচাতে পারা যাবে না। সেটা হবে ওকে নিজের হাতে হত্যা করা।

কথাগুলো যেন নিষ্ঠুর বজ্রের মতো বাজছিল মিহিরের বুকে। হতাশ দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল বন্ধু সত্যর পানে। বললো,

—এত দৃঢ় তোর অভিমত?

—হ্যাঁ। বলিস তো আমি লিখে দিতে পারি। ওকে বিয়ে করলে তোর নিজের যাই হোক, ওকে হত্যা করা হবে। আচ্ছা, আসি তাহলে। নমস্কার।

—না! আর একখানা গান শুনে যাও বাবা! মিনু, গা তো মা।

অতএব সত্য রায়কে বসতে হলো। গান গাইছে মিনি।

মিহির এবার বসলো চিনির কাছে। চিনির চোখে জল। বললো,

—আমায় ক্ষমা করবেন মিহিরদা। আপনার ঐ প্রস্তাব বাতিল করুন।

—না-না, চিনি। আমার প্রস্তাব ঠিকই আছে। ও বাতিল করা সম্ভব নয়। বিয়ে আমি তোমায় করবই। তাতে যাই হোক, আমাকে তুমি শুধু মেনে নিও। আমার আর কারও অভিমত নেবার দরকার নেই।

—কি আপনি করবেন আমাকে নিয়ে।

—বহুবার বলেছি তো, তুমি শুধু আমার অন্তর আলো করে থাকবে।

চিনির চোখে আবার জল এলো। এই প্রেম, এই স্বর্গীয় ভালোবাসার প্রতিদান সে দেবে কি করে? তবু বললো,

—আমার কিছু বলার নেই। আজ যেটুকু আমি পেলাম, তাতেই আমার জীবন ভরে থাকবে। এরপর আপনি যা ইচ্ছে করবেন। একটু থেমে বললো—আমার সিঁথিটায় একটু ছোঁয়া দিয়ে যান।

মিহির ওর সিঁথি স্পর্শ করলো। চিবুকে আঙুল দিয়ে আদর করলো। চোখে-মুখে একটা চুমা খেল। তারপর নিঃশব্দে চলে এলো বাহিরে।

সত্য রায় বেরুচ্ছে। মিহিরও তার সঙ্গে বেরিয়ে এলো। সত্য বললো,

—আচ্ছা, কি আহম্মকী করছিস তুই? ওকে বিয়ে করে কি হবে?

—কি জানি কি হবে। তবে, বিয়ে যদি করি ওকেই করব আমি।

—তোর হাতে আমার ছোট বোন শুক্তিকে দেব আমরা। ওকে বাদ দে মিহির।

—শুক্তিকে? অতবড় স্বপ্ন আমায় দেখাস নে সত্য। শুক্তির যোগ্য নই আমি।

—তুই যোগ্য কিনা আমরা দেখব। শোন্, বোকামী করিসনে। ওর অসুখ সারবে না কোনোদিন। আচ্ছা চললাম।

ডাঃ রায় চলে গেল।

সব যেন শূন্য করে দিয়ে গেল মিহিরের। শুধু শূন্যই করলো না, একটা আশাতীত আশা জাগিয়ে দিয়ে গেল তার মনে। শুক্তিকে সে বিয়ে করতে পারবে, এমন কল্পনা কোনোদিন করেনি সে।

উত্তেজিত মনটাকে একটু ঠান্ডা করবার জন্যে মিহির একটা পার্কে গিয়ে ঘসলো। ভাবতে লাগলো, শুক্তিকে কেন সে বিয়ে করবে? কেনই-বা সত্য ডাক্তার এমন প্রস্তাব দিল? কোন্ যোগ্যতা আছে মিহিরের, যাতে সে ওই লক্ষপতির পরমাসুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করতে পারে? অনেক ভেবেও কোনো কূল-কিনারা পেল না মিহির। অতঃপর ভাবলো, সে এখন অধ্যাপক। তাই হয়তো সত্য রায় তাকে তার বোনের জন্য নির্বাচন করেছে। কিন্তু না, এ কিছুতেই হতে পারে না।

চিনির মুখখানা মনে পড়ছে তার। আত্মসমর্পিতা ঐ তরুণী হয়তো তার অপূর্ণ আশা পূরণ হবার আশায় অধীর হয়ে রয়েছে। এই প্রলোভন মিহিরই তাকে দেখিয়েছে। এখন নিজে সে শুক্তির লোভে চিনিকে ত্যাগ করলে মানুষের ধর্মের মর্যাদা থাকে না। না, এরকম সে ঘটতে দেবে না। অশান্ত মনকে কিছুটা শান্ত করে বাড়ি ফিরলো মিহির।

পরদিন বৈকালে মিহির গেল সত্য রায়র বাড়ি। সত্য রায় তাকে অনুরোধ করে গেছে, তাই গেল সে।

সত্য তখন বাড়ি ছিল না। মিহিরকে অভ্যর্থনা করলো শুক্তি, সুবেশী সুন্দরী তরুণী। বললো,

—নমস্কার! আসুন। দাদা একটু বাইরে গেছেন। ঘন্টাখানেকের মধ্যে ফিরবেন।

—আচ্ছা। আমি তাহলে পরে আসব।

—না, বসুন। ততক্ষণ অন্ততঃ এককাপ চা খান।

—তা দিন। বলে, বসলো মিহির। এই আমন্ত্রণ সে উপেক্ষা করতে পারলো না।

বেয়ারা এলো। চা-খাবার এলো তার সঙ্গে। শুক্তি পরিবেশন করছে। মিহির এর আগে দেখেছে শুক্তিকে। তবে ঘনিষ্ঠ আলাপ হয় নি। আজ সে অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছে শুক্তির—এত নিকটে—ছোঁয়া যায় যেন।

শুক্তির সাজসজ্জা পরিপাটি। তার রূপৈশ্বর্যকে সে শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছে বর্তমান যুগের প্রসাধনের দৌলতে। তার সর্বাঙ্গ ঘিরে একটা সুমিষ্ট সৌরভ—দেহলতায় একটা হিল্লোলের মাধুর্য যেন মনোহারিণী। প্রলোভনটাকে জয়

করবার চেষ্টা করছে মিহির। কিন্তু এই দুর্জয় লোভ, এতটা আশা কেন দিল সত্য তাকে! তার জীবনে শুক্তির আশা সে কোনোদিনই করেনি।

চিনির উপর তার প্রেম কি নিছক সহানুভূতি? একটা করুণার ছদ্মবেশ। হয়তো, তাই। নইলে শুক্তিকে দেখে সে এতটা মুগ্ধ হবে কেন? কেনই-বা শুক্তির প্রতি এই আকর্ষণ তার? মিহির আত্মসমালোচনা করছে—আত্মবিশ্লেষণ করছে।

এবার মিহিরকে গান শোনাবে শুক্তি। তার আয়োজন চলছে অন্য একটা ঘরে। একজন ওস্তাদ, খুব সম্ভব শুক্তির গানের মাষ্টার, যন্ত্রগুলো ঠিক করছেন। ঘরে আরো দুটো মেয়ে রয়েছে। মাস্টারমশাই ডাকলেন,

—এসো শুক্তি।

—হ্যাঁ স্যার, যাই। আসুন মিহিরদা। দাদা না আসা পর্যন্ত গান শুনুন। গান তো ভালবাসেন আপনি?

—হ্যাঁ। চলুন।

আসরের একধারে এসে বসলো মিহির। শুক্তির গলা অসাধারণ কিছু নয়। তবে গান শিখছে ভাল ওস্তাদের কাছে। তার গানের মূর্চ্ছনায় একটা অব্যক্ত আনন্দ জাগে। সত্যি ভাল লাগলো মিহিরের শুক্তির গান। মনে মনে বললো, বেশ সুন্দর গায় তো শুক্তি?

—আপনি একখানা গান শোনান মিহিরদা।

—গান শোনাব? আমি?

—কেন?

—আমার গলা তো গর্দভের! তার ওপর গানের ব্যাকরণ আর স্বরলিপি দেখলেই ভয়ে আঁতকে উঠি। এর পরের কারণটা আরো করুণ।

—কেন?

—গান আমার দ্বারা হবে না। তাই বাজনা শিখতে গিয়েছিলাম—বেহালা। একদিন আমার গুরু রেগে আমার পিঠে ছড় দিয়ে এক চাবুক মেরেছিলেন—এখনও তার দাগ আছে।

মিহির তার আদ্দির পাঞ্জাবির কিছুটা তুলে দেখাল। সবাই হেসে উঠলো। শুক্তি কাছেই বসে আছে। মিহিরের দেহেরকান্তি সুন্দর, উজ্জ্বল। লুব্ধ হচ্ছে শুক্তি। সে ওই দাগটার উপর সযত্নে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হয়তো মুখখানা

নামিয়ে একটা চুমু খেয়ে নিল, কেউ তা টের পেল না। পেল শুধু মিহির। সে ত্বরিতে চাইলো শুক্তির দিকে। মুগ্ধা শুক্তি নিঃশব্দে তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবিটা ঠিক করে দিল।

মিহির বুঝলো, শুক্তি তাকে সর্বাঙ্গ দিয়ে চাইছে। এতটা সে আশা করেনি। এত সহজে, এত অনায়াসে শুক্তিকে পাওয়া সম্ভব বলে মনেই করেনি মিহির। ব্যাপারটা কি ঘটে গেল অন্য কেউ জানলো না। সত্য ফিরে এল।

—শুক্তি। সত্য বোনকে ডাকলো, বললে—মিহিরকে বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিস?

—না দাদা। পরিচয় তো আছেই। বাবা তো ভালোভাবে চেনেন ওঁকে।

—তাহলেও অনেকদিন পরে এসেছে মিহির। পরিচয়টা নতুন করে হোক। আয় মিহির, বাবার সঙ্গে দেখা করবি।

—চল, তাঁকে প্রণাম করে আসি।

সত্য মিহিরকে নিয়ে দোতলায় উঠে এলো। সত্যর বাবা ডাঃ গোপেন রায় বসেছিলেন একটা চেয়ারে। সারাজীবন অধ্যাপনা করেছেন, এখন অবসরপ্রাপ্ত। তবে অবসর তাঁর নেই। কতকগুলো পাঠ্যপুস্তকের লেখক তিনি—তারই সংস্কারের কাজে প্রায় লেগেই থাকেন। আজও একটু আগে একটা বই-এর প্রুফ দেখছিলেন তিনি।

সত্য নিয়ে এলো মিহিরকে ওঁর ঘরে। মিহির ওঁকে প্রণাম করতে ডাঃ রায় বললেন,

—তোমাকে দেখেছি তো! কি যেন নাম তোমার?

—মিহির।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিহির। এখন কি করছ?

—প্রফেসারি আর টিউসনি করি।

—কোন্ কলেজে?

মিহির কলেজের নাম বললো। ডাঃ রায় আবার বললেন,

—'বাংলার রূপকথা' বইটা কি তোমার লেখা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। পড়েছেন কি?

—না। পড়বার সুযোগ এখনও হয় নি। নাম শুনেছি। বইখানি নাকি ভালো হয়েছে।

—আমি কালই একখানা এনে দেব। একবার চোখ বুলিয়ে দেবেন দয়া করে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, দেব। সময় আমার খুব কম, তবু নিশ্চয় দেখব। বসো।

—আজ্ঞে না, আজ আর বসব না, অনেকক্ষণ এসেছি। নীচে ছিলাম। সেইখানেই চা খেলাম। এবার বাড়ি যাব।

—আচ্ছা। এবার এসো। আর হ্যাঁ, বিয়ে করেছ?

—আজ্ঞে না। এখনও অবসর পাইনি।

—এবার কর। আর দেরি করা ঠিক নয়। ছেলেমেয়ে মানুষ করতে হবে। আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখি!

মিহির আবার প্রণাম করলো এবং বিদায় নিল। সত্য সঙ্গে আছে। নীচে আসবে, সত্যর মা এসে পড়লেন। মিহির তাঁকেও প্রণাম করলো। মা বললেন,

—তুমি অনেকদিন আসো নি মিহির! কেন বাবা?

—সত্য বিলেতে ছিল, তাই আসিনি মাসীমা।

—তাতে কি! আমরা তো ছিলাম। আবার কবে আসবে বাবা?

—আসবো। হয়তো কালই আসবো।

উত্তর দিতে দিতেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো মিহির। কারণ, ওর মনে চিন্তার বান ডেকেছে। শুক্তিকে তার হাতে দেবার জন্যে এই বাড়ির সকলের অসীম আগ্রহ এবং স্বয়ং শুক্তির সম্মতি ওকে নিদারুণ চিন্তায় ফেলেছে। এখন কি করবে? কোন পথে এগোবে? চিনি, না শুক্তি? চিনিকে কি বঞ্চিত করা হবে না? এতখানি বঞ্চনা হয়তো অসুস্থ চিনি সহ্য করতে পারবে না। মিহিরের মানবত্ববোধ দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে।

পথে নেমেই মিহির একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লো। চা সে অল্পক্ষণ আগেই খেয়েছে। এখন দরকার নেই। তবু সে ঢুকলো। একখানা চেয়ারে এসে বসলো। বয় এসে বললো,

—কি দেব?

—চা। না-না, কফি। উঁহু, কোকো এককাপ। না.....

বয়টা বিস্মিত হয়ে মিহিরের মুখের দিকে চেয়ে আছে। চিন্তিত মিহির বললো,

—যা হোক কিছু দাও। কফি আর কিছু চাট! মানে; চপ আর কাটলেট।

বয়টা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে এনে দিল তার বরাদ্দ খাদ্য। মিহির আস্তে আস্তে খাচ্ছে, আর ভাবছে কি করা যায়? এই দুর্জয় প্রলোভন সে এড়াবে কি করে? শুক্তি কেবল শুক্তিই আসবে না, বেশ কিছু মুক্তো অর্থাৎ সম্পদও আনবে। তাই ইঙ্গিত দিয়েছেন ওঁরা। কিন্তু সম্পদ না-হয় নাই এলো।

শুক্তি নিজেই এত অতুলনীয় সম্পদ। না, এত সম্পদ রাখবার জায়গা নেই মিহিরের বাড়িতে। তার ছোট্ট ফ্ল্যাটে এত বেশি সম্পদ ধরবে না। তবে শুক্তির সঙ্গে হয়তো একটা বাড়ি আসবে—গাড়ি তো আসবেই। তবু মিহির কেন এত ভাবছে?

খোঁড়া, অকর্মণ্য চিনি, আর সোসাইটির সেরা মেয়ে শুক্তি। আকাশ-জমিন ফারাক। এই স্বয়মাগতাকে নিশ্চয় স্বাগত জানাবে মিহির। জানানোই তো উচিত তার। ভাগ্য যখন আসে, তখন তাকে আসতে দিতে হয়, নইলে ভাগ্যদেবী বিরূপ হন।

মিহিরের সৌভাগ্য আপনিই আসছে। একে কি অবহেলা করা ঠিক হবে? না, কখনও না।

চিনির ব্যবস্থা তার বাবাই করবেন। যা হোক কিছু করবেন। চিনিকে কি কাজে দেবেন কে জানে? কে জানে, চিনি তার অতবড় জীবনটা কেমন করে কাটাবে। জেনে তার কি দরকার? চিনির উপর প্রেম তো কিছুমাত্র নেই মিহিরের। যেটা আছে সেটা নিছক সহানুভূতি, করুণা মাত্র। ওর মূল্য নিশ্চয় কিছু আছে, যেমন কাগজের নোট, বিদেশে যা চলে না।

মিহির উঠে পড়লো। এটা একটা বড় রেস্টুরেন্ট। বহু লোক খাচ্ছেন। নারী-পুরুষ—সুসজ্জিত তরুণ-তরুণী। সেতো অনতিবিলম্বে নিয়ে আসবে শুক্তিকে এখানে। ভাবতে আনন্দ হচ্ছে।

আজ রবিবার। হয়তো মিহির আসবে, এই আশায় চিনি অপেক্ষা করছে। অন্তরের কোনো এক অজ্ঞাত কন্দরে একটা আনন্দ-নির্ঝর যেন মুখ খুলেছে। তারই কলকাকলি শোনা যায় গানের মত। গভীর গোপন এই অনুভূতি সম্পূর্ণ নতুন চিনির কাছে। পরিপাটি সাজসজ্জা করবার মতো সুদেহধারিণী

নয় সে। তবু ঝি-র সাহায্যে নিজেকে যথাসম্ভব সুন্দর করে সাজালো। দেখলো, একটা বড় আয়নায় তার প্রতিবিম্ব—খুশীই হলো নিজেকে দেখে।

না, মিহির এলো না। পাঁচটা বাজলো, বাজলো ছ'টা-সাতটা। না, মিহির এলো না। নৈরাশ্যতা অগ্রাহ্য করে চিনি ভাবছে, হয়তো কোনও কাজে আটকে গেছেন উনি। হয়তো শরীর ভাল নেই, হয়তো-বা আমার জন্যে গেছেন কোন ডাক্তারের কাছে। তাছাড়া আর কি হ'তে পারে। অন্য আর কিছু নয়, মিহির তো কথাই দিয়েছে তাকে।

মিহিরদা আসবে, দিদির সঙ্গে কথা কইবে। তাই মিনি বা হিরণ কেউ ওপরে আসেনি আজ। কোথায় তারা? চিনি ঝিকে বললো,

—হিরণ কোথায় মানদা?

—কি জানি। খেলতে গেছে হয়তো!

—মিনি?

—ছোটদি মামার বাড়ি গেছে। মাও সঙ্গে গেছেন।

—তাহলে হিরণও হয়তো মামার বাড়ি যাবে।

—হ্যাঁ। ওখানে মামাতো ভাইয়ের ছেলের ভাত। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া।

—বাবা কোথায়?

—তিনি ফিরে আবার কোথায় বেরিয়েছেন। হয়তো তিনিও গেছেন।

বাড়িটা তাই এতখানি নির্জীব। চিনি আর কোন প্রশ্ন করলো না। করতে ইচ্ছে করলো না তার। কেমন একটা ক্লান্তিতে অসুস্থ হয়ে উঠেছে তার দেহ মন। অবসাদের অবসন্নতা ওকে ঘিরে ধরেছে। সাজ-পোশাক যতটুকু করেছিল, সব খুলে ফেলে চিনি শুয়ে পড়লো। রাত তখন ন'টা। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কলধ্বনি শুনলো মিনি আর হিরণের। তারা ফিরে এসেছে! ভাই-বোনে ছাদে এসে ডাকলো চিনিকে।

—দিদি, ও দিদিভাই, ওঠ। তোর জন্যে খাবার এনেছি।

—খাবার?

—হ্যাঁ, মামাবাবু পাঠালেন। ওঠ, খেয়ে নে।

—আমার কিছু খেতে ইচ্ছে নেই মিনি।

—তা হবে না। আমরা খেয়েছি, আর তুই খাবি নে! এ হয় না।

—তবে আন।

ইচ্ছে না থাকলেও চিনি খেতে বসলো। কারণ, মিনি আর হিরণ তাকে অত্যন্ত ভালবাসে। না খেলে ওরা ক্ষুণ্ণ হবে। তাই খেতে হলো। মিনি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো,

—মিহিরদা এসেছিলেন দিদি?

—না।

—আসেননি! কেন রে?

—কি জানি?

—কিন্তু আমাকে কাল ফোনে বলেছিলেন আসবেন।

—হয়তো কোনো কাজে আটকে পড়েছেন।

—কি জানি! মিনি একটু থেমে বললো—ডাঃ সত্য রায় ওঁকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

—তাতে কি হয়েছে? আমার অসুখের ব্যাপার নিয়ে হয়তো কোনো আলোচনা করবেন?

—ও খুব সোজা-সরল লোক দিদি। তাই না! তোর কোনও বুদ্ধি হলো না।

—না। হাসলো চিনি 'না' কথাটা বলে। ছোট বোন বলছে, 'তোর কোনো বুদ্ধি হলো না।' তাই হেসে প্রশ্ন করলো—তোর বুদ্ধিতে কি বলে?

—বলছি। হিরণ, তুই ঘুমোগে যা।

হিরণ চলে গেল। মিনি একটু ভাবলো। পরে বললো,

—মা চায়, ডাঃ সত্য রায় আমাকে বিয়ে করুক।

—ভালোই তো!

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি চাই না।

—কেন?

—ডাঃ সত্য রায় ভালো বর সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোনদিন বনবে না।

—কেন? বনবে না কেন রে?

—ওর একটা বোন আছে, শুক্তি। খুব সুন্দরী মেয়ে। খুব নাম-করা সুন্দরী। গান গায়—নাচে। আর ছোঁড়াদের মাথা খেয়ে বেড়ায়। অবশ্য তারা ওদের সমাজের।

—সকলের সম্বন্ধে এমন খারাপ ধারণা কেন করিস মিনি? এ অন্যায়।

—করি, করতে বাধ্য হই। তুই কি জানিস বিছানায় পড়ে-পড়ে বই-পুঁথি ঘেঁটে এসব তথ্য জানা যায় না! ঐ শুক্তি সাংঘাতিক মেয়ে। ওকে যে বিয়ে করবে তার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

—তাতে তোর কি? কিন্তু সত্য রায় তো খারাপ লোক নন।

—কে জানে? ওরা খুব বড়লোক। অনেক টাকার মালিক। ঐ ছেলে, আর ঐ মেয়ে। বাবা বড় প্রফেসর—বৈজ্ঞানিক। ছেলে বিলেত-ফেরত ডাক্তার। বিলেত-আমেরিকাতেই ওদের ঘরবাড়ি হবার কথা। আমাদের দুর্ভাগ্য, ওরা ভারতে জন্মেছে।

—ওরা ঠিকই জন্মেছে মিনি। ডাঃ সত্য রায় ভাল পাত্র। যদি তিনি নেন তোকে, তো খুবই আনন্দের কথা।

—তোর মাথা আর মুন্ডু। ওরা কি মিহিরদা নাকি রে, আনন্দের কথা হবে?

—মিহিরদার ওপর তোর লোভ আছে মিনি? হাসছে চিনি।

—হ্যাঁ, ছিলই তো। কিন্তু তাতে কি? মিহিরদা তোকে ভালোবাসে, এই সত্যটা জানার সঙ্গে-সঙ্গে আমি ওকে ছেড়ে দিয়েছি। তোর জন্যে আমি এই স্যাক্রিফাইস করতে আনন্দ বোধ করছি দিদি। তোর জীবনে সোনার কাঠির স্পর্শ লাগুক—তুই মিহিরদার বুকে মাথা গুঁজে একান্ত নির্ভরতায় শুয়ে থাকবি। আমি তার শালী হব, বোন হয়ে যাব।

—মিনু! এতবড় ত্যাগ করেছিস তুই আমার জন্যে?

—হ্যাঁ। মিহিরদাকেও আমি বলেছি সে কথা। বলেছি, দিদিকে বিয়ে করুন আপনি। আমি আপনার বোন। আমাকে মা-বাবা এবং আপনি যোগ দেখে কোন পাত্রের হাতে দেবেন। আমি দিদির জন্যে আপনাকে ছেড়ে দিলাম।

—আমাকে নিয়ে কি যে তিনি করবেন, কে জানে? চিনির চোখে জল টলটল করছে।

—তুই ভাল হবি দিদি, নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবি। এ পর্যন্ত বাবা তোর জন্যে যে চিকিৎসা করিয়েছেন তা যথেষ্ট নয়। ইচ্ছে সত্ত্বেও বাবা কিছু করতে পারছেন না। মা খুব বাধা দেয়। বলে, ওর জন্যে আর কত খরচ করবে?

বিস্তর টাকা তো খরচ করলে ঐ ইন্‌ভ্যালিডটার জন্যে। বাবা মা'র কথা শোনেন, আর কাঁদেন।

—মা'র নিন্দে করিসনে মিনু।

—নিন্দে কিসের? যা বলছি সবই সত্যি। মা মিহিরদাকে ছাড়তো না, আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিতই। আমি রাজী হলাম না, সেটা মিহিরদাকেও জানিয়ে দিলাম। অবশ্য মিহিরদা তোকে চাইলো, তাই দিলাম।

—যথেষ্ট তুই করেছিস মিনি আমার জন্যে। যা, এখন শুতে যা।

মিনি উঠে যেতে-যেতে আবার বসলো। বললো,

—ডাঃ সত্য রায়ের বাড়িতে তার বোনের সঙ্গে মিহিরদার দেখা হওয়াটা আমি পছন্দ করছিনে দিদি।

—তা, তুই কি আর করতে পারিস? ওদের তো আগেও পরিচয় ছিল।

—ছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা শুক্তি যখন ছোট ছিল। এখন সে ঝলমলে শুক্তি। তবে ফোঁপরা-ফাঁপা—ওর মধ্যে মুক্তো নেই।

—মিনি, মানুষকে তুই বড় বেশী খারাপ ভাবিস। ছিঃ!

—তুই কি করে জানবি দিদি! পুঁথিতে এসব লেখে না। মানুষ খারাপ, স্বভাবতই খারাপ। ভালো হয়ে যায় কেউ কেউ—সেইটাই স্বভাবের বিকৃতি। খারাপ হওয়াটাই মানুষের স্বভাব।

—যাঃ! যতসব বাজে কথা। মুনি-ঋষি-যোগী-সিদ্ধসাধক সবাই খারাপ? সব মানুষই জঘন্য—না, তা মোটেই নয়।

—মুনি-ঋষির যুগ নেই এখন, দিদি! এ অ-মুনি-ঋষির যুগ। এরা ঋষি হয় না—রাসভ হয়, মুনি হয় না—মাতাল হয়, যোগী হয় না—যৌন-ক্ষুধায় পীড়িত চুল-দাড়িওয়ালা ভন্ড হয়।

—আচ্ছা, যা-হয় হোক্ গে! তুই এখন যা—শো গিয়ে। আর না যাবি তো শুয়ে পড় আমার কাছেই।

—সেই ভাল। নীচে আর যাব না।

মিনি চিনির পাশেই শুয়ে পড়লো। এমনি সে মাঝে-মাঝে থাকে। রমলাও জানে! কিছু বলতে গেলে তেড়ে আসবে মিনি। হাজার কথা শুনিয়ে দেবে মাকে। দিদিকে সে ভালোবাসে। তার কাছে শুয়ে থাকবে, কি বলার আছে? অক্ষম-অথর্ব দিদি তার! আদর, ভালোবাসা না পেলে সে বাঁচবে কি করে?

মিনির মতো স্পষ্ট। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী আর প্রাক্‌টিকাল মেয়ে। স্বপ্ন ওর নেই। কাব্য ও করে না জীবনকে নিয়ে। ডাঃ সত্য রায়কে ওর নানা কারণে অপছন্দ। সব থেকে বড় কারণ, সত্য রায়ের চরিত্র সম্বন্ধে তার অনেক খারাপ কথা জানা আছে।

শুক্তি সম্বন্ধে সব চিন্তাই শেষ করেছে মিহির। এখন তাকে বিয়ে করে ঘরে তোলাই বাকি! কথা অবশ্য আর অগ্রসর হয়নি। তবে কথা তো হয়েই আছে।

অকস্মাৎ কেন, কে জানে, চিনির কথা মনে পড়লো তার! কাল রবিবার ছিল। যাবার কথাও ছিল চিনির কাছে। যাওয়া হয়নি, অন্যায় হয়ে গেছে। না, অন্যায় কিসের? যেতে পারেনি, তার আর কি করার আছে? তবু জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তার। চিনি হয়তো অপেক্ষা করেছিল তার জন্য। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ছিল অপেক্ষা করে। ওখানে যাওয়া কমিয়ে দিতে হবে। যাবার কিইবা দরকার আর? না গেলেই ভালো।

আজই বিমলবাবুকে জানিয়ে দেবে মিহির যে, বিশেষ একটা কাজের চাপ পড়ায় সে এখন দু'চারদিন যেতে পারবে না। এই সংবাদটা যেন চিনিকে দেওয়া হয়। কিন্তু এর জন্য বিমলবাবুকে কেন? ফোন করে মিনিকে জানিয়ে দিলেই হবে।

মিহির বেরুলো তার নবপ্রকাশিত বইখানা নিয়ে। শুক্তির বাবাকে দেবে। পরিপাটি করে গোপেনবাবুর নামটা লিখেছে। একবার দেখলো, ভুল-ত্রুটি কিছু আছে কিনা লেখাটায়। না, ভুল নেই। সকালেই গেল মিহির। দুপুরে কলেজ আছে।

পথে একটা দোকানে ঢুকে নগদ পয়সা দিয়ে ফোন করলো বিমলবাবুর বাড়িতে। মিনিই ধরলো ফোনটা,

—হ্যালো! কে?

—আমি মিহির। খুব জরুরী একটা কাজ পড়ে যাওয়ায় কাল তোমাদের ওখানে যেতে পারিনি, মিনু। কিছু মনে করো না।

—কাল দিদি অনেক রাত অবধি অপেক্ষা করেছিল আপনার জন্য। আজ আসবেন তো?

—না। আজও যেতে পারবো না। কাজটা শেষ হতে দেরী হবে।

—ধ্যেৎ! কী এমন কাজ আপনার স্যার? যতসব বাজে কথা।

—বিশ্বাস কর, কলেজের একটা জরুরী কাজ পড়েছে আমার ঘাড়ে।

—বেশ, কবে আসবেন, বলুন।

—এই কাজটা শেষ করেই যাব। দিন-সাত তো লাগবেই।

—সা-ত-দি-ন। আপনাকে তাহলে হারালাম নাকি আমরা।

—ও-সব কি বলছ মিনু?

—অনেক দুঃখেই বলছি, স্যার। যখন আপনার অবকাশ হবে আসবেন।

—তুমি খুব চটেছ দেখছি!

—না স্যার, চটিনি। একটা গান মনে পড়লো।

—কি গান?

—শুনবেন? আচ্ছা, দিদির তরফ থেকে আমি শুনিয়ে দিচ্ছি শুনুন—

মিনি মিনিটখানেক নীরব থেকে তৈরী হয়ে নিল মনে মনে। তারপর ফোনেই গাইতে আরম্ভ করলো ঃ

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিও—
আমি চিরদিন হেথায় বসে আছি
তোমার যখন মনে পড়ে আসিও।

—শুনলেন? এটা দিদির কথা—কবিগুরু লিখেছেন।

—হ্যাঁ। এখন একটু ব্যস্ত আছি! প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, শীগগির গিয়ে সব গানটা শুনব।

—আচ্ছা স্যার, ধন্যবাদ। প্রাতঃ প্রণাম।

মিনি আগেই ফোন ছেড়ে দিল। কেমন যেন রাগ হচ্ছে তার। ফোনের সামনের চেয়ারটায় গোঁজ হয়ে বসে রইল মিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে।

নীচে থেকে রমলা ডাকলো,

মিনি, চা খাবি আয়।

—এখানে পাঠিয়ে দাও।

মিনি উঠলো না। প্রায় আধঘন্টা পরে মিহিরের কলেজে ফোন করলো। কলেজ সকালবেলা বন্ধ। দারোয়ান ধরলো,-

—হ্যালো, কি চাই?

—ওখানে কি প্রফেসর রায়—মানে, মিহির রায় রয়েছেন?

—আজ্ঞে না। এখন তো কলেজ বন্ধ—দশটায় খুলবে।

—আচ্ছা।

ফোন ছেড়ে দিল মিনি। আরো দশ মিনিট পরে ডায়াল ঘুরিয়ে ডাকলে ডাঃ সত্য রায়ের বাবাকে।

—হ্যালো! কে?

—আমি একজন ছাত্রী, স্যার। নাম মঞ্জুশ্রী পুরকায়স্থ। ওখানে কি আমাদের কলেজের প্রফেসর মিহির রায় আছেন?

—মিহির তো ছিল! একটু ধর, দেখি সে আছে কিনা?

—মিনি ধরে রইলো ফোন। মিনিট দুই পরে মিহির এসে ফোন ধরলো। বললো,

—হ্যালো! কে?

—আমি শ্রীমতি মিনি।

—ও! মিনু? কি খবর?

—খবর কিছু নেই, স্যার। আপনার জরুরী কাজটা কোথায় তাই জানলাম। একটু থেমে মিনিই আবার বললো—আচ্ছা স্যার, আপনাকে বিরক্ত করলাম। মাফ করবেন—নমস্কার।

মিহির চুপ করে আছে। মিনি ফোন ছেড়ে দিল। রাগে, দুঃখে তার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। যা সে আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটেছে। এখন দিদিকে কি বলা যাবে? আহা! বেচারা দিদি তার! কত আশা নিয়ে কাল সে অপেক্ষা করছে দীর্ঘক্ষণ। দিদি এই আঘাত সামলাবে কি করে? কেন এই আশা দিল মিহির তাকে? কেন? কেন? এ একটা ক্রিমিন্যাল।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে মিনি 'ক্রিমিন্যাল' কথাটা উচ্চারণ করলো। ওর মা শুনতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে শুধালো,

—কাকে কি বলছিস মিনি?

—তোমাকে....তোমাকেই বলছি ক্রিমিন্যাল।

—কারণ?

—কারণ তুমি আমাদের মা হবার যোগ্য নও। অন্যায়ভাবে তুমি আমাদের মা হয়েছ। তোমার শাস্তি হওয়া উচিত।

—যা, নালিশ করগে।

—হ্যাঁ করবো। তোমার নামে নালিশই করতে হবে।

—আমার অপরাধটা কোথায়?

—তুমি আমাকে, হিরণকে আর দিদিকে সমানভাবে ভালবাসতে পারনি, এই তোমার অপরাধ।

—কিসে প্রমাণ হয় রে?

—বিস্তর, অসংখ্য প্রমাণ আছে তার। দিদির ওপর তোমার ভালবাসা মেকি—ঝুটা! তুমি কি মনে কর দিদি আমাদের ফেল্‌না? নাকি খেলনা?

—এসব কি বলছিস মিনু! লোকে শুনলে বলবে কি? তোর দিদির বিয়ে হবে, তার জন্যে যা-কিছু করা সম্ভব সবই করা হবে।

—কিছু করা হবে না। দিদির বিয়ে হবে না।

—হবে না?

—না। দৃঢ়কণ্ঠে বললো মিনি—দেবো না দিদির বিয়ে। দিদি আমাদের দিদি হয়েই ঘরে থাকবে। আমরা তিন ভাই-বোন সমান অংশে ভাগ করে নেব বাবার যা-কিছু আছে। বাবাকেই আমি বলবো সে-কথা।

—বেশ তো! তাই নিবি। আমার ওপর অযথা দোষ চাপাস কেন?

—চাপাই কেন, তুমি দোষী তাই।

—আমি দোষী?

—হ্যাঁ। তোমার আপত্তিতেই বাবা ইচ্ছামত দিদির চিকিৎসার জন্য টাকা খরচ করতে পারেন নি। তুমি দিদির জন্য টাকা খরচ করতে নারাজ। তুমি মা হতে পারলে না মা—তুমি সৎমা।

চলে গেল মিনি। তার যতটা রাগ মিহিরের উপর ছিল, সবটাই ঝেড়ে দিয়ে গেল মা রমলার উপর। রমলা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে জানে, এরা ভাই-বোনে দিদিকে কি চোখে দেখে। সে ভালোবাসার এতই গভীর যে, নিজের মাকে 'সৎমা' বলতে বাধলো না! তবে এটাও বুঝলো রমলা, মিনির এই রাগের কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোথাও হয়তো এমন কিছু ঘটেছে, যার জন্য মিনির এই ক্রুদ্ধ-মূর্তি। কিন্তু কি সেটা?

দেখলো, মিনি উপরে চিনির কাছে গেল না। তার পড়ার ঘরে বসলো গিয়ে। খবরের কাগজটা নিয়ে পড়ছে। রমলা তখন আর কিছু বললো না।

তবে বলবে, জিজ্ঞেস করবে মিনিকে। মিনির পিঠের উপর ভিজে চুলগুলো পড়ে আছে। রমলা বললো,

—যা, ছাদে গিয়ে চুলগুলো শুকিয়ে আয়।

—না। ছাদে যাব না। ও-বাড়ির ঐ ছেলেটা বড্ড তাকায় আমার দিকে।

—কে? কোন ছেলেটা?

—ঐ যে আন্নাকালীর ভাই গন্নাকাটা—সেই বজ্জাত ছোঁড়াটা আবার কে?

—ও, ঋত্বিক! গন্নাকাটা হবে কেন? বেশ তো সুন্দর চেহারা তার।

—আহা! কিবা রূপ! ময়ূর একটা ওকে কিনে দিতে হবে—কার্তিক হয়ে যাবে।

—ওর মা আমার কাছে প্রস্তাব করেছিল তোর জন্য।

—ওর মুখে মুড়ো ঝাঁটা মারতেও ঘেন্না করে আমার!

—ঘেন্না তোর সবাইকেই করে। মিহিরের মত ছেলেকেও....

—মিহির! রাম বলো। রাম-রাম-রাম। মিহির মানে যদি সূর্য হয় তো জান মা, আমি সূর্যকে বলছি, তিনি ঐ নাম পরিত্যাগ করুন।

চলে গেল মিনি। এতক্ষণে রমলা বুঝলো ব্যাপারটা তাহলে মিহিরকে নিয়েই। তবে কি ব্যাপার কে জানে? মিনি চট্ করে ভাঙবে না। মিহির কাল আসে নি। মত বদলালো নাকি। হঠাৎ রমলার মনে পড়ে গেল ডাঃ সত্য রায়ের বোন শুক্তিকে। শুক্তি সকলের চেনা। কে জানে, কিছু অঘটন ঘটলো কিনা সেখানে।

ফোনে শুনিয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান। দিদির তরফ থেকে শোনাচ্ছি বলেছিল মিনি এবং করুণ আবেদনও জানিয়েছিল। তবু যায় নি মিহির সেখানে। রবি-সোম-মঙ্গলবার কাটালো, কিন্তু যাওয়া হয়নি। না যাওয়াটা যে অন্যায়, অপরাধ হচ্ছে, এ সত্য আজ আর বুঝতে চায় না মিহিরের মন। ওখানে আর না-যাওয়াই মঙ্গল তার পক্ষে। চিনি শীঘ্র না হোক, বিলম্বে তাকে ভুলে যাবে। মানুষ চিরদিন এসব মনে রাখে না। ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক, আর সেটাই তার পক্ষে মঙ্গলকর। অতএব আর সেখানে যাবে না মিহির।

কথাগুলো ভাবছিল মিহির সকালে চা খেতে-খেতে। হিসেব করে দেখলো,

চার-পাঁচদিন সে যায় নি চিনিকে দেখতে, বা তার সঙ্গে কোন কথা বলতে। অথচ পাকা কথা সে দিয়ে এসেছে বিয়ে করবার। ব্যাপারটা মানবিক দিক দিয়ে যতটা কুৎসিতই হোক, কেউ জানবে না। কিন্তু এর একটা সামাজিক দিকও আছে যা চোখ এড়িয়ে যাবে না। বিশেষতঃ রমলা আর বিমলের চোখ এবং মিনি, তাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না।

কলেজে কাজ আছে, এই মিথ্যা কথা বলে বেশীদিন আত্মরক্ষা করা যাবে না এবং মিনির মত মেয়ের পক্ষে তার কলেজে খোঁজ নেওয়াও কঠিন কিছু নয়। হয়তো এর মধ্যেই মিনি সেটা করেছে তলে তলে এবং মিহিরকে একটি আস্ত শয়তান ভেবে আর কোন উচ্চবাচ্য করেনি।

পুরুষের মনের একটা স্বাভাবিক ধারনাই হচ্ছে, সে কোন নারীর মনে শয়তানরূপে প্রতিভাত হতে চায় না। যে কোন পুরুষ প্রতিটি নারীর অন্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় দেবতার আসনে। প্রতিটি পুরুষের এই অনুভব বোধ আছে বলেই পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আজও কিছুটা দেবত্ব না হোক, মানবত্ব দেখা যায়। নইলে, পুরুষ জাতি এতদিনে পৃথিবীকে নরকে পরিণত করতো। নারীর অন্তরে নিজেকে উদার-মহানরূপে, শান্ত-শুদ্ধ বৃদ্ধরূপে— অন্ততঃ সাধারণ সংসারী পত্নী-পুত্র-প্রতিপালকরূপে প্রতিভাত হতে চায়। কোন নারীর চোখে নিজেকে হীন, নীচ এবং অনুদার রূপে দেখাতে চায় না সে। মিহিরও চাইল না। হয়তো আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করতো মিহির। তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো। এই বাড়ির মালিক দিবাকরবাবুর চাকর এসে জানাল,

—আপনাকে ফোনে কে ডাকছেন।

—ও, আচ্ছা, যাচ্ছি।

উঠলো মিহির। নিজের ফোন না থাকায় দিবাকরবাবুর ফোন-নম্বরটা সে দিয়েছিল শুক্তিকে। তাহলে শুক্তিই ডাকছে।

—হ্যালো, কে?

—আমি শুক্তি।

—ও, কি খবর?

—খবর! আজ বিকেলে আপনার সঙ্গে যে এন্‌এগজমেন্ট আছে সেটা বাতিল করতে হলো।

—কেন? হঠাৎ কি হলো?

—হঠাৎ নয়, আমার মনে ছিল না। আজ আমাদের প্রাক্তন ছাত্রী সম্মেলন। আমাকে সেখানে গাইতে হবে। চারটে-পাঁচটায় বেরিয়ে যাব ফিরবো রাত্রে। আশা করি, আপনি আমার এই বিস্মরণের জন্য কিছু মনে করবেন না।

—না-না, মনে করবার কি আছে? বেশ, বোটানিক বাগানে তাহলে যাচ্ছেন কবে?

—কাল যদি না-হয়, তো পরশু।

—সে খবর কখন পাব?

—কাল ফোনে জানিয়ে দেব। আচ্ছা, নমস্কার। ফোনটা ছেড়ে দিল শুক্তি।

মিহির বুঝলো, ওখানে যেন আরও কারা রয়েছেন। তাঁরা জোর তাগাদা দিচ্ছেন শুক্তিকে ফোনে কথা শেষ করতে। তাই অমন আকস্মিকভাবে ফোনটা ছেড়ে দিল শুক্তি।

মিহির ফোনে শুক্তির কথা শুনে খুবই আহত হলো।

আহত হবারই কথা। তবে, ওখানে হয়তো আরও বেশী জরুরী দরকার কিছু আছে তাই শুক্তি এমন করলো; ভেবে মিহির নিজেকে সান্ত্বনা দিল। তবু যেন তার মন পীড়িত হচ্ছে। সে আরও ভাবলো, শুক্তি তাদের প্রাক্তন ছাত্রী সম্মেলনের সভায় তো মিহিরকেও নিয়ে যেতে পারতো। পরমুহূর্তে আবার ভাবলো, হয়তো শুধু ছাত্রীরাই সেই সম্মেলনে থাকবে, পুরুষের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ।

কিন্তু এ যুগে এ রকম তো হয় না। সর্বত্রই নারী-পুরুষ আজ মিলেমিশে কাজ করছে। কিন্তু কোথায় এই ছাত্রী-সম্মেলন। খবরটা তো বললো না শুক্তি। তবে মিহির জানে, শুক্তি কোন্ কলেজে পড়েছে! জানে, যখন সত্য আর সে বন্ধুত্ব পালিয়েছিল তখন থেকে। শুক্তি ছিল তখন অনেক ছোট। লেডি ব্রাবোনে পড়তো শুক্তি।

দিবাকরবাবু ছাপাখানার ব্যবসা করেন। অমায়িক ভদ্রলোক, ছোট্ট পরিবার—সংখ্যায় মাত্র চারজন। স্বামী-স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে। ছেলের নাম অঞ্জন, আর মেয়ের নাম খঞ্জনা, অথবা খঞ্জনী। ছেলে পঁচিশে পড়েছে। মেয়ের বয়স হলো কুড়ি।

ছেলেমেয়ে নামে এই রকম 'ঞ্জ'-প্রীতি দিবাকরবাবুর, আর পত্নী রঞ্জিতা দেবীর। নিজের 'ঞ্জ' অক্ষরটা তিনি ছেলে আর মেয়ের নামে জুড়েছেন এবং

স্বামীকে আদেশ করেছেন,

—প্রেসের টাইপ 'ঞ্জ' যেন বেশী থাকে। কারণ, ঐ 'ঞ্জ'-টাই আমার 'লাক' মানে ভাগ্য।

—কেন? ঐটাই তোমার 'লাক' কেন? দিবাকরবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন।

এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীমতী রঞ্জিতা জানিয়ে ছিলেন,

—গৃহদেবতা শ্রীশ্রীকরঞ্জাক্ষ শিবের পূজো দিয়ে ছাপাখানা খুলে 'লাক' খুলেছে। ঐ শিবের নামের বিশেষত্ব 'ঞ্জ'।

কথাটা শুনে হেসেছিলেন দিবাকরবাবু। বলেছিলেন,

—তাহলে আমার নামেও একটা 'ঞ্জ' লাগিয়ে দাও।

—না, তা হয় না। আমার ছেলেমেয়ের নামে দিয়েছি—বৌ-এর নামেও থাকবে 'ঞ্জ'। আরও বলেছিলেন।

—হ্যাঁ, অবশ্যই থাকতে হবে তার নামে 'ঞ্জ'। আমরা তো 'ভঞ্জ' উপাধিকারী। তোমার নামে 'ঞ্জ' আছে। দিবাকর ভঞ্জ। এখন অঞ্জনা-মঞ্জুলা নামের মেয়ে চাই আমার বৌমার জন্য। খোঁজ কর এখন ঐ নামের মেয়ে।

হাসিটা সামলে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন দিবাকরবাবু। বলেছিলেন,

—তুমি খোঁজ কর।

মিহির ফোন ছেড়ে দিবাকরবাবুর ঘরেই রয়েছে। হঠাৎ বললো,

—খঞ্জনার বিয়ের চেষ্টা করছেন তো? কোথাও ঠিক হলো নাকি?

—না। খঞ্জনা এখন বিয়ে করতে চায় না, আরো পড়তে চায়। পড়ুক। তবে এবার ছেলের বিয়ে দেব।

—আমার হাতে একটি ভালো মেয়ে আছে।

—কি রকম মেয়ে?

—খুব ভাল মেয়ে। আমার ছাত্রী।

—তাই নাকি! বেশ, বেশ। ওরে সাগর, তোর মাকে জলদি ডেকে দে তো। মিনিটখানেকের মধ্যেই রঞ্জিতা দেবী এসে বললেন,

—কি ব্যাপার?

মিহির বলছে, ওর এক ছাত্রী আছে। খুব ভাল মেয়ে। অঞ্জুর জন্য

—কি নাম তার?

—মিনি....মৃন্ময়ী। খুব সুন্দরী, আর বুদ্ধিমতী—দেখবেন আপনারা?

—না! ও হবে না। ওর নামে 'ঞ্জ' নেই, সেই কারণে হবে না।

—কি ব্যাপার? 'ঞ্জ' চাই?

—হ্যাঁ। নামে 'ঞ্জ' দরকার, নইলে তুমিই তো একটা ভাল পাত্র। তোমার হাতে খঞ্জনাকে দিতে পারতাম। তোমার নামে 'ঞ্জ' নেই, তাই ওকথা তুলিনি।

—হা ভগবান! মা-বাবাকে গাল দিতে ইচ্ছে করছে কাকীমা। কেন যে তারা 'ঞ্জ' দিয়ে নাম আমার রাখেননি...

মিহির কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললো কথাগুলো। রঞ্জিতা দেবী তাকে বললেন,

—তা হোক! তুমি খুব ভাল ছেলে। তোমার বৌ ভাল হোক—ভালই হবে। খঞ্জনা বলছিল, ঐ বিমলবাবুর মেয়েকে নাকি তুমি বিয়ে করবে?

—না কাকীমা। আমি ওর কথাই তো বলছিলাম। ওরই নাম মিনি।

—ও হবে না। আমার জামাই-এর নামে 'ঞ্জ' চাই—বৌ-এর নামে তো চাই-ই।

—নাম নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন করছেন কাকীমা?

—বাড়াবাড়ি কিসের? 'ঞ্জ' হচ্ছে 'লাক্'! ও আমার চাই-ই। ও-ছাড়া আমার চলবে না।

চলে গেলেন রঞ্জিতা দেবী। মিহির দিবাকরবাবুকে জিজ্ঞেস করলো,

—এ কি রকম বাতিক কাকাবাবু?

—বাতিকের আবার রকম কি?

—হাসলেন দিবাকরবাবু। ইতিমধ্যে খঞ্জনা ঢুকলো ঘরে। মিহিরের কাছে এসে বললো,

—মিহিরদা, আমায় একটা সিলেবাস এনে দেবেন?

—হ্যাঁ, এনে দেব। কালই এনে দেব।

বাইরের বারান্দা দিয়ে ফিরছে মিহির। খঞ্জনা সঙ্গে আসতে আসতে বললে,

—মিনিকে নিলেন না আপনি?

—না। ওকে বোনের মত দেখি, যেমন দেখি তোকে।

—মিনি আমাকে বলেছিল, ওর সেই পঙ্গু বোন চিনিকে নাকি আপনি বিয়ে করতে চান। তাই মিনি আপনাকে ছেড়ে দিল। এ কি সত্যি মিহিরদা?

—হ্যাঁ। কিছুটা সত্যি। তবে চিনিকেও আমি নিতে পারলাম না খঞ্জনা। ও একেবারে অকেজো....

—হু! বেচারা খুবই আশা করেছিল আপনার কাছে। এখন হতাশ হয়ে যাবে খুব।

—ওটা সেন্টিমেন্ট! ভুলে যাবে অল্পদিনেই।

—সব ব্যাপার ভোলা যায় না মিহিরদা! যাক্ গে! আমার সিলেবাস এনে দেবেন কিন্তু কালই। কেমন?

—হ্যাঁ। নিশ্চয় আনব।

বলে, মিহির চলে এলো।

অপেক্ষা করে-করে চিনি এখন বুঝেছে, মিহির তাকে উপেক্ষা করলো, এড়িয়ে গেল! আশাহত চিনির চোখের জলটা সবে পড়েছে, মিনি এসে ধমকের সুরে বললো,

—খবরদার কাঁদবিনে।

—না! চোখ দুটো মুছলো চিনি। নিজেকে সামলাতে দেরী হচ্ছে তার।

মিনি দেখলো। বুঝলো যে, চিনির মনের অবস্থা করুণ থেকেও করুণ। দিদি তো চায় নি। কেন তাকে আশা দিল ঐ বর্বর শয়তানটা? দিদির মনটাকে এমন নির্মমভাবে পদদলিত করবার কি অধিকার আছে তার? অপেক্ষা করে-করে তার দিদি অসহায় হয়ে পড়েছে। মিনি ইনভ্যালিড চেয়ারটা ঠেলে বাইরে আনলো চিনিকে, খোলা আকাশের নীচে। অসীম নীল আকাশে পাখীরা উড়ছে। মিনি সেই দিকে তাকিয়ে বললো,

—ওরা কেমন উড়ছে দিদি। ওদের কোনও বন্ধন নেই। ওরা মুক্ত—ওরা স্বাধীন!

—সৃষ্টিতে কেউ স্বাধীন নেই মিনি। তবে ওদের জীবন অপেক্ষাকৃত ভাল। ওরা আশা করে না, তাই আঘাতও পায় না। আমি আহাম্মকের মত আশার ছলনায় পড়েছিলাম। যাক্‌গে, তুই ভাবিস নে। এ ভালই হলো। কিন্তু এর কারণটা জানতে ইচ্ছে হয় আমার।

—কারণ শুক্তি। সে ওকে হজম করে ফেলেছে!

—ভাল। সেখানেই তিনি ভাল থাকুন! আমি ওঁর ক্ষতি করতে যে পারলাম না, এর জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। এ খুব ভাল হলো মিনু।

—তোর মাথা হলো! তোর মুন্ডু হলো! তোর পিন্ডি হলো?

—কেন?

—জানিস, সোসাইটির কোন ছেলে ওকে বিয়ে করতে চায় না। অতএব অধ্যাপকের মেয়ে। অত অঢেল ধনসম্পত্তির মালিক ওরা। অমন সুন্দরী সঙ্গীতজ্ঞা, শিক্ষিতা, তাছাড়া বাক্‌পট্‌। সব রকমে হাই সোসাইটির যোগ্য মেয়ে শুক্তি। তবু মিহিরকে কেন ধরেছে জানিস?

—কেন? মিহির তো খুব ভাল পাত্র।

—হ্যাঁ, ভাল....আমাদের পাড়ায় ভাল, কিন্তু ওদের পাড়ায় নয়। ওখানে সব বিলেতী মরসুমী ফুল থাকে—গোলাপ—ডালিয়া—ক্রিসানথিয়াম, বুগেন ভিলিয়া; চম্পা, চামেলী, শিউলী, করবী, জবার দেশ নয়। বুঝলি!

—কিছুই বুঝলাম না।

মিহির ওখানে ভোমরা নয়, গুব্‌রে পোকা। তবু এরা মিহিরকে নিতে চায়। তার কারণ, শুক্তি এত বেশী বহির্মুখী মেয়ে, তোমরা পন্ডিতি ভাষায় যাকে "গোষ্ঠীযোজিকা" বল। ওর সঙ্গে যে যতই মেলামেশা করুক, বিয়ে কেউ করতে চায় না ওকে।

মিহির তাকেই বিয়ে করবে?

—করবে করুক। জীবনটা তার জ্বালাময় হোক। আমি দেখে খুশী হব।

—কিসব বলছিস মিনি? তোর উচিত ওকে সতর্ক করে দেওয়া।

—না। তাহলে ও ভাববে আমাদের স্বার্থ আছে, তাই শুক্তির নামে আমি বদনাম দিচ্ছি। জানিস দিদি, বইয়ের পোকা তুই, তোর কোন জ্ঞান-বুদ্ধি হলো না এখনও। এই মোহ যার হয় অর্থাৎ যখন কোন পুরুষ মোহগ্রস্ত হয়, তখন কারও কথা সে শোনে না। যে বলতে যাবে, সেই আহাম্মক। এখন মিহিরকে কোন কথা বলতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। অনর্থক আমি তার বিরাগভাজন হব! কি আমার দায় পড়েছে? তুই শুধু দেখে যা।

—শুক্তি কি সত্যিই এই রকম মেয়ে?

—তোকে মিথ্যে বলে আমার লাভ কি দিদি? তোকে খুশী করতে, তোর জীবনটা সফল করতে আমি মিহিরকে নিলাম না। এ কথা তোকে বলেছি। এখন বুঝলাম মিহির একটা পাজী, হতভাগা। ওর বিদ্যে-বুদ্ধি-রূপ-গুণ সবই কলঙ্কিত মনে হচ্ছে। ওর নাম পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারছি না। তুই ওর জন্যে মন খারাপ করিসনে দিদি—দোহাই তোর। তোর বরাতে এটা ভালই

হয়েছে যে, ঐ রকম একটা নরপশুর হাতে তুই পড়লি নে, তুই বেঁচে গেছিস দিদি।

রাগে ঠোঁট কামড়াচ্ছে মিনি। ঠিক এই সময় কে এসে খবর দিল,

—মাষ্টার মশাই এসেছেন।

—কে, মিহিরবাবু?

—হ্যাঁ। উনি আসতে চান এখানে।

—আসুন। ডেকে দে ওঁকে।

কথাগুলো বললো চিনি। আধমিনিট পরেই এলো মিহির। কাছের টুলটা এগিয়ে দিতে দিতে মিনি বললো,

—সুপ্রভাত! না-না, সু সন্ধ্যা। বসুন স্যার। আমি দেখি যদি চা-টা কিছু যোগাড় করতে পারি।

মিনি চলে যাচ্ছে। মিহির তাড়াতাড়ি বললো,

—চা পরে হবে। শোন, কথা আছে। বসো একটু।

—কথা? আমার সঙ্গে? না, আমার সঙ্গে কোন কথা থাকতে পারে না।

—আছে। খঞ্জনীকে নিশ্চয়ই চেন তুমি?

—হ্যাঁ। ওর নামেই ও চেনা। আমি তো পড়েছি ওর সঙ্গে!

—ওর দাদার নাম অঞ্জন। জানো তো?

—জানি। ওর মার নাম রঞ্জিতা। সব ওরা 'ঞ্জ'—উপাধি 'ভঞ্জ'। তবে 'খঞ্জ'নের কেউ গঞ্জিকাও খায় না। শুনেছি, ওর বাবা দিবাকর ভঞ্জ নাকি নম্বর ওয়ান সতরঞ্জ ব্যক্তি।

—তার মানে?

—মানে, তিনি নাকি রাজা যুধিষ্ঠীরের সঙ্গে সতরঞ্জ অর্থাৎ পাশা খেলতেন।

—ও! ওসব রঙ্গরস এখন বাদ দাও মিনু।

—দিলাম, দিয়েছি। ক'দিনই হলো ছেড়ে দিয়েছি। তবে কি জানেন স্যার, স্বভাব যায় না মলে। যে রঙ্গরসের সম্পর্কটা পাতাবার কল্পনা করে স্যারের সঙ্গে শ্যালীকার ভাষাটা ব্যবহার করেছিলাম, তা বাদ দিলাম। এখন আদেশ করুন স্যার।

চেয়ে দেখলো মিহির, চোখ-মুখ কেমন যেন অশান্ত উগ্র হয়ে উঠেছে মিহির—নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। অপরাধীকে কঠোর দন্ড দেবার সময়ে হয়তো

বিচারপতিদের মুখও এত বেশী কঠিন হয় না। মুখে হাসি টেনে বললো, মিহির,

—বসো মিনু। তুমি অকারণ আমার ওপর চটে আছ।

—না। আপনার ওপর কেন আমি চটতে যাব? মাইনে করা মাষ্টার ছাড়া আর কি আপনি? আপনি কি আমার প্রিয়তম প্রাণেশ্বর, যে চটে যাব? কি কথা আছে বলুন?

—এতটা উত্তেজিত কেন হচ্ছিস মিনি? অকারণে অশান্তি করিস নে। উনি কি বলতে চান শোন।

—শুনবি তুই। আমি ওঁর প্রেমে পড়তে যাইনি যে আবোল-তাবোল শুনতে হবে। শুনুন স্যার, বাড়িতে এসেছেন, চা একটু খাবেন তো?

—মাইনে করা মাষ্টারের পক্ষে সেটা খুব বেশী ধৃষ্টতা হবে না কি?

—না। আজ আপনি শুধু অতিথি। পূর্ব-পরিচয়ের সূত্রে এবং আমাদের শিক্ষাগুরু হিসেবে আপনার আপ্যায়ন করা আমাদের কর্তব্য। অনুগ্রহ করে চা একটু খান। আনবো?

—আচ্ছা, আনো।

মিনি চলে গেল। মিহির যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছে মিনির কথায়। কিন্তু মিনিকে সে চেনে। মিনি চিনি নয়। সে হয়তো মিহিরের এ ক দিনের জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে জেনে ফেলেছে, যাতে মিহিরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা অসাধ্য নয় তার পক্ষে, এবং মিহিরও বুঝছে সে স্বয়ং অপরাধী। মিনি চলে গেল। মিহির আস্তে আস্তে বললে চিনিকে,

—কেমন আছ?

কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইছে চিনির দেহখানা। সে অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করে সযত্নে মুখে হাসি টেনে নিয়ে বললো,

—ভালই।

—আমি ক'দিন আসতে পারিনি জরুরী একটা কাজের জন্য।

—কাজটা শেষ হলো?

—না। আরো ক'দিন দেরী হবে।

—হোক। কোন পড়াশুনার ব্যাপার, নাকি থিসিস কিছু?

—ঐ রকমই কিছু একটা। পরে জানাব।

চিনি আর কিছু শুধালো না। মিনি চা নিয়ে এলো।

—শোন মিনু, অকারণ আমার ওপর রাগ করো না। তোমার জন্য একটি সুপাত্র....

—থাক, থাক। আমাকে ঘুষ দেবার চেষ্টা করবেন না, স্যার। ও আমার হজম হবে না।

—ঘুষ?

—হ্যাঁ। আমাকে ঐ 'ভঞ্জ' পরিবার দেবার জন্য আপনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেছে, এ খবরও আমি জানি। জানিয়েছে ওদেরই মেয়ে খঞ্জনী।

—কি বলেছে সে?

—সে বলেছে, মা'র যে কি বাতিক বুঝি না। তোর নামে 'ঞ্জ' নেই বলে তোকে বৌ করবে না, মা। আর আপনি এই প্রস্তাবটুকু সম্বল করে সপ্তাহ খানেক এখানে না আসার লজ্জাটা ঢাকতে এসেছেন। ওটা ঘুষ ছাড়া আর কি? খান, চা খান। বোটানিক গার্ডেনে তো আপনার নিমন্ত্রণ হয় নি?

—তুমি তো দেখছি একটা সাংঘাতিক গোয়েন্দা! কোথায় পেলে এসব খবর?

—গোয়েন্দারা কিন্তু কোন সময় অত সহজে খবর ভাঙে না! তাদের কাজ গুপ্ত ভাবে করে যাওয়া।

—থাক ওসব কথা। তাহলে ওখানে বিয়ে করতে রাজী নও তুমি?

—ওর মা তো সটান জবাব দিয়েছেন। আবার ও-কথা কেন বলছেন?

—ওর বোন, বাবা, আর স্বয়ং অঞ্জনও চায় তোমাকে।

—ও-কথা থাক এখন, পরে আমি ভেবে বলব। নিন, চা খান। চলে গেল মিনি চায়ের ট্রে-টা রেখে।

চা খাওয়াচ্ছে চিনি। মিহির বললো চা খেতে-খেতে,

—ক'দিন আসতে পারিনি। আশা করি, তুমি আমার ওপর রাগ কর নি তো?

—না রাগ কেন করব? তবে, খুবই দুঃখ পেয়েছি। আসবেন কথা দিয়ে না এলে বড়ই নৈরাশ্য জাগে মনে।

তা ঠিক। মিনি আমার ওপর দারুণ রেগে আছে। ওকে ঠান্ডা করতে কিছু

ওষুধ জোগাড় করেছিলাম, কাজে লাগলো না দেখছি।

ওসব করবেন না। মিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে সব বোঝে।

—তাই তো দেখছি। পড়াশুনাতে খুব ধারালো না হলেও এদিকে তার বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। যাক, আমি জরুরী কাজটা শেষ করেই আসব। ভেব না তুমি।

—আচ্ছা, সেটা কবে নাগাদ শেষ হবে?

—একটু দেরী হতে পারে। এই ধর, মাসখানেক।

—এত বেশী।

—হ্যাঁ। কাজটা একটু জটিল। 'লোকসাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে গবেষণা করছি। দূর পল্লী অঞ্চলে যেতে হচ্ছে। তুমি নিশ্চয় বুঝবে, কাজটা কত কঠিন?

—হ্যাঁ, তা সত্যি! এ বিষয়ে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না তো?

—নিশ্চয় পারবে। তবে আগে 'লোকসাহিত্য সংগ্রহ' করে আনি। আচ্ছা, আসি আজ!

মিহির যথারীতি বিদায় নিল। অর্থাৎ ভদ্রভাবেই চিনিকে একটু ছুঁয়ে আদর করে চলে গেল। আনন্দে বিহ্বল চিনির অন্তরটা অনাস্বাদিত মাধুর্যে ভরে উঠতে চাইছে। বেশ কিছুক্ষণ উপভোগ করলো সে এই আনন্দানুভূতি। ভাবতে লাগলো, মিহির নিশ্চয় তাকে বঞ্চিত করেনি, করবেও না। এতটা ভালবাসা কখনও মেকি হতে পারে না। মিনির ধারণা ভুল। চিনির একান্ত অক্ষমতা সত্ত্বেও মিহির তাকে গ্রহণ করবে, এতবড় সৌভাগ্য সইবে কি করে চিনি? ঈশ্বর যেন তার সহায় হন। চিনি মনে মনে বার বার ঈশ্বরকে স্মরণ করতে লাগলো।

মিনি এলো অনেকক্ষণ পরে। এসে বললো,

—উনি কতক্ষণ গেছেন দিদি?

—প্রায় আধঘন্টা হলো।

—হুঁ।

মিনি বিরক্তির সুরে শুধু 'হুঁ' বলে চুপ করে রইল। পাশে রাখা যন্ত্রটার তারে টুটাং শব্দ করছে। চিনি প্রশ্ন করলো,

—কি ভাবছিস মিনু?

—ভাবছি, মানুষ কতরকম ছলনা করতে পারে? কত রকম ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে?

—মিহির কি ছলনা করছে। ছদ্মবেশ ধরেছে বলে তুই মনে করিস?

—হ্যাঁ করি। ওর অভিনয় পুরোপুরি জমতো যদি না থাকতাম। তুই অত্যন্ত সরল-মনা মেয়ে দিদি। পুরুষকে অত সহজে বিশ্বাস করতে নেই। বাইরের জগতের কোন অভিজ্ঞতা নেই তোর। তাই তোকে আমি সাবধান করতে চাই। মিহিরবাবুর আশা ছেড়ে দে তুই।

—ছেড়ে দেব? বিশ্বাস কর, আশা তো আমি কোনদিন করিনি মিনু।

—করেছিস। এখনো করে আছিস। এই আশাটা জাগিয়েছে তোর মধ্যে ঐ শয়তান মিহির। ও তার উদারতা আর মানবতা, আর সুমহান প্রেমের মহিমা দেখাতে চেয়েছিল তোকে বিয়ে করে! হয়তো বিয়ে তোকে করতো। কিন্তু হঠাৎ এই সত্য ডাক্তার আর তার বোন শুক্তি এসে গোল বাধাল। তোকে সে বিয়ে করবে না। নেহাৎ চক্ষুলজ্জাটা বাঁচাতে আজ এসেছিল। তাছাড়া এর আর একটা কারণ, শুক্তি আজ বাড়িতে নেই। সময়টা কাটাতে, আর তোকে আরও খানিকটা সান্ত্বনা দিতে সে এখানে এসেছিল। এই শয়তানটার আশা তুই ছেড়ে দে দিদি।

চিনি অবাক হয়ে ওর কথা শুনেছিল। বললো,

—তুই কি সত্যিই গুপ্তচর মিনি?

—হ্যাঁ তোর জন্যেই হতে হয়েছে। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক মিনি। 'বাংলার লোকসাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা' নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখব, আজ সে তোকে এই ধাপ্পা দিয়ে গেল! সে যে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখছে, যার নাম 'লোকসাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা', তার জন্য সে নাকি পল্লী-অঞ্চলে ঘুরে-ঘুরে সব উড়াদান সংগ্রহ করছে। মিথ্যুক কোথাকার!

—মিথ্যুক!

—হ্যাঁ, মিথ্যুক! দিবাকরবাবুর 'করঞ্জাক্ষ' ছাপখানায় একখানা বই ছাপা হচ্ছে। লেখক একজন অখ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি সারা বাংলা ঘুরে লোকসাহিত্য সংগ্রহ করে ছাপাচ্ছেন ঐ প্রেসে। তোর ঐ বঞ্চক-প্রেমিক মিহির সেই বইটার প্রুফ দেখে। ফর্মা প্রতি দশ টাকা পায়। এমন মতলব করেছে, ওই প্রবন্ধ থেকেই একটা বড় ধরনের থিসিস লিখে ফেলবে।

—তা হয়তো ফেলবে।

—তাতে তোর কি? 'বেল' পাকলে কাকের কিছু এসে যায় না। ও তোকে বিয়ে করবে না।

—আমায় বিয়ে না করুক ও ভাল থাক্।

রুষ্টস্বরে মিনি বললো—থাকবে না, থাকতে পারে না। ঈশ্বর ওর ভাল করতে পারবে না।

—অভিশাপ দিচ্ছিস মিনি?

—হ্যাঁ দিচ্ছি, আরো দেব। আমার অসহায় দিদিকে যে এমন করে বঞ্চনা করে, তাকে আমি অভিশাপ দেব....দেব....দেব।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো মিনি। তারপর উঠে চলে গেল। চিনি ভাবতে লাগলো, মিনির কী অসীম ভালবাসা! আশ্চর্য এই প্রেম। দিদির জন্য কত বড় ত্যাগ সে করেছে। তবু দিদি তার সুখী হলো না, হতে পারছে না। এই দুর্ভাগ্যকে মিনি মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু মিহির কি সত্যিই প্রতারণা করছে চিনিকে? মিনি তো রীতিমত গুপ্তচর-বৃত্তি শুরু করেছে তার পিছনে। আর মিনির বাহাদুরী যে, সত্য খবর সে কিছু জেনেছে মিহির সম্বন্ধে। অনেকক্ষণ চিন্তা করে চিনি ঝিকে বললো মিনিকে ডেকে দিতে।

মিনি তক্ষুণি এলো। চিনি বললো,

—সেই লেখকের লোকসাহিত্যের বই একখানা কিনে আনবি কাল, দেখব।

—তুই লিখবি দিদি! লিখিস তো সেই লেখক ভদ্রলোকটিকে ডেকেও আনতে পারি। তাঁর সঙ্গে কথা বলবি।

—আচ্ছা, আগে তুই একখানা বই আন তো। দেখি কেমন বই!

রাত হয়েছে। চিনিকে খাবার দেওয়া হলো। খেল চিনি। মিনিও খেয়ে এসে দিদির কাছে শুয়ে পড়লো। বললো,

—তোকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, দিদি। আমিই তোকে বিয়ে করব!

—আচ্ছা, তাই করিস। বেশ থাকব দুই বোনে।

হাসলো চিনি। মিনিও হাসলো! যতটা সম্ভব চিনির মনকে হাল্কা করতে চায় মিনি। হিরণ এখন এসব মানসিক রসঃরহস্যের কোন খবর জানে না। পড়া আর লেখা নিয়েই মেতে আছে সে। অতএব তার কথার কোনও আলোচনা হয় নি ইতিপূর্বে। আজ হঠাৎ মিনি বললো,

—হিরণ বড্ড বাড়াবাড়ি সুরু করেছে দিদি। খুব আনরুলি হয়ে উঠেছে।

—কেন? কি হয়েছে? কি করেছে সে?

—নিত্যই করছে। নানা রকম আন্দোলনের পান্ডা সে কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের লীডার। বাবা তো খুব ভাবনায় পড়েছেন।

—ভাবনা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তারপর?

—কাল কলেজে পুলিশ ঢুকেছিল। কাঁদানে গ্যাস ছেড়েছে। হিরণের চোখে লেগেছিল। কে জানে কবে জেলে যাবে?

—আমাকে তো এসব কথা আগে বলিস নি?

—তোকে বলে কি লাভ? আজ হঠাৎ বলে ফেললাম।

—বল্‌লি কেন?

হিরণের জন্য মা-বাবা খুব ভাবছে তাই। ....একটিমাত্র ছেলে।

—তাই তো! ভাবনার কথাই। এইজন্যই বাবা ক'দিন আমাকে দেখতে আসতে পারেন নি।

—না, তা নয়। তোর জন্য বাবার মন সব সময় কাঁদে। বাবার এখন সময় খুব কম। 'ইয়ার-এন্ডিং' চলছে। তাছাড়া বাবা ভেবেছিলেন মিহির আসে, তুই ভাল আছিস। তাই বাবা আসেন না। কাল আমি বাবাকে বলে দেব যে মিহিরের কথা সব ফাঁকা। ও বঞ্চক, প্রতারক। ওর নাম করতে ঘেন্না হয়।

—তুই মিহিরকে এতটা নীচ ভাবছিস কেন, মিনি?

—সে যা, তাই বলছি। আমি তো তার প্রেমে পড়তে যাই নি! তোর মত রঙিন চোখে তাকে দেখব না আমি।

—আচ্ছা ঘুমো—ঘুমো এবার।

—রাগ করলি দিদি?

—না রে! রাগ কেন করব?

—মেয়েরা একবার ভালবাসলে আর তাকে ভুলতে পারে না, দিদি। তুই ওকে ভুলতে পারছিস নে?

চিনি কোনও কথা বললো না। চুপ করে শুয়ে রইল। মিনি হঠাৎ বেড-সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দেখলো, চিনির দু'গাল বেয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়ছে নিঃশব্দে।

ওর অশ্রুসিক্ত মুখখানিতে চুমু খেতে-খেতে মিনি ডাকলো,

—দিদি!

চিনি ওর বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে চুপ করে শুয়ে রইলো।

ওর থেকে নামতে নামতে মিহির ভাবছিল, চিনিকে সে ধাপ্পা দিতে পারলেও মিনিকে ঠকাতে পারে নি। চিনি সরলা বালিকার মত তার যা কিছু ছিল সমস্তই সমর্পণ করে দিয়েছে মিহিরকে। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চিনির এতই কম যে, তাকে ঠকানো অত্যন্ত সহজ ব্যাপার! বিদ্যে তার যতই থাক এবং বুদ্ধি তার যতই তীক্ষ্ণই হোক, মানব-চরিত্র সম্বন্ধে তার কিছুই ধারনা নেই। চিনিকে এমন করে ঠকানো তার উচিত হচ্ছে না। চিনির জীবনকে এভাবে জ্বালাময়ী করে দেবার সমস্ত দায়িত্ব এবং পাপ—হ্যাঁ পাপই, সবই মিহিরের। মিহির অন্যায় করছে। সজ্ঞানে প্রতারণা করছে চিনিকে।

শিক্ষিত মার্জিত রুচির যুবক মিহির। বর্তমানে শুক্তির উপর মোহ তার যতই প্রবল হোক, চিনির আত্মসমর্পণ এবং অটল বিশ্বাস দেখে সে ভাবলো, দরকার নেই ভক্তিকে। মিহির চিনিকেই বরণ করে নেবে, জীবনে প্রথমে যা সে করতে চেয়েছিল।

কোথায় যেন একটা শঠতা তার মনকে নাড়া দিচ্ছে। প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ করছে, কি হবে তাকে নিয়ে। কোন্ কাজে লাগবে ও! ওর ওপর দরদ আর সহানুভূতিই যথেষ্ট। তার বেশী দিয়ে কেন মিহির তার নিজের জীবনটাকে বঞ্চিত করবে? বিশেষ করে, যখন সে এমন একটা সুযোগ পেয়েছে শুক্তিকে লাভ করবার।

চিন্তিত মিহির ফিরতে লাগলো বাড়ির দিকে। রাত তখন বেশী হয়নি। পথচারীরা ভিড় জমাচ্ছে ট্রামে-বাসে-ফুটপাতে। একখানা রিক্সা নিয়ে মিহির ফিরলো তার ফ্ল্যাটে। দিবাকরবাবুর বাড়িতে তখনও সঙ্গীতচর্চা চলছে—পল্লী সঙ্গীত। হয়তো সেই ভদ্রলোক, যিনি লোকসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন, তিনিই গাইছেন। মিহির অল্পক্ষণ কান পেতে শুনলো। ওই ভদ্রলোকটি বাংলার বহু বিচিত্র পল্লী-গাথা, গান এবং গল্পও সংগ্রহ করে ছাপাচ্ছেন। ঐ থেকে কিছু একটা করা যাবে ভেবে রেখেছে মিহির এবং সেই কথাই আজ সে চিনিকে বলে এলো? অবশ্য কে জানে, সত্যিই কিছু সে লিখতে পারবে কিনা?

বইটা সবে বেরিয়েছে! কাল একখানা এনে পড়ে দেখবে মিহির। না, কাল

হবে না সময় নেই। কাল শুক্তির সঙ্গে যেতে হবে ডায়মন্ডহারবারে বেড়াতে; অথবা দীঘা, বা আর কোথাও নিয়ে যাবে শুক্তি। কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে? 'আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী....' গানের লাইনগুলো মনে পড়লো মিহিরের।

বিছানার চাদরখানা ঝাড়তে ঝাড়তে মিহির ভাবছে, ছোট একটা চাকর রাখবে এবার সে। এই বিছানা ঝাড়া, জুতো বুরুশ করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া কাজগুলো তার আর এখন নিজের হাতে করা উচিত নয়।

এতদিন মিহির সব কাজই শ্রদ্ধার সঙ্গে করে এসেছে। নিজের কাজ নিজের হাতে করাই অভ্যাস তার। এতে তো অগৌরবের কিছু নেই। আগে সে কুকারে রান্না করে খেত। এখন খায় একটা মেসে! সেটা সময়ের অভাবের জন্যে। আজ হঠাৎ চাকর রাখার কথা কেন মনে হলো তার? হলো, কারণ শুক্তি! শুক্তি হয়তো কোনদিন তার ফ্ল্যাটে এসে যেতে পারে। তার চোখে এগুলো খুব খারাপ দেখাবে। কালই একটা চাকর রেখে দেবে মিহির। দিবাকরবাবুকে বললেই হয়তো কালই যোগাড় করে দেবেন তিনি।

শুয়ে পড়ল মিহির। চিনিকে বঞ্চনা করে আসার গ্লানিটা আর মনে পড়ছে না। এখন শুক্তির কথাই মনে জাগছে। কোথায় চিনি, আর কোথায় শুক্তি? ইন্‌ভ্যালিড, অক্ষম একটা মেয়ে, আর সোসাইটির সুন্দরী তরুণী শুক্তি— যাকে লাভ করবার জন্য বহু যুবকের রাত্রি নিদ্রাহীন হয়। চিনির কাছে আজ শেষ বিদায়ই নিল মিহির। ওখানে আর কোনোদিনই যাবে না। যাওয়া আর কোনোমতেই উচিত নয় তার পক্ষে। ঘুমলো মিহির চিন্তা করতে করতে।

উঠেই দাড়ি কামানোর তাগাদা! এখুনি শুক্তির কাছে যাবে। মিহিরকে নিয়ে কোথায় যাবে সে কে জানে? তবে মনে হয়, খুব দূরে কোথাও নয়। দু'—একদিনের মধ্যেই ফিরতে পারবে। পর পর তিনদিন ছুটি আছে— গুডফ্রাইডে, ইষ্টার স্যাটারডে, এবং সান-ডে, অর্থাৎ রবিবার।

তিনদিনের এই ছুটিটা উপভোগ করতেই যাচ্ছে মিহির শুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে। নাকি শুক্তিই যাচ্ছে মিহিরকে সঙ্গে নিয়ে। পার্টিতে আরও কে-কে যাবেন জানে? নিশ্চয় তার আরো বান্ধবী এবং বন্ধু থাকবেন। থাক না।

দাড়ি কামানো হলো। মুখখানা ধোবার আগেই দিবাকরবাবুর চাকর এসে জানাল,

—বাবু, ফোন।

—যাচ্ছি, যাও।

কিছুক্ষণ পর মিহির এসে ফোন ধরলো। বললো,

—হ্যালো! কে?

—আমি শুক্তি। কত দেরি হবে?

—এই আধঘন্টার মধ্যেই যাচ্ছি।

—তাহলে আরো একঘন্টা পরে আপনাকে আশা করতে পারি। এতটা পথ তো আসতে হবে।

—না, আমি ট্যাক্সি করে যাব। মিনিট পনের লাগবে।

—আচ্ছা, আসুন!

ফোন ছেড়ে দিল শুক্তি। দিবাকরবাবু প্রশ্ন করলেন,

—কোথায় যাবে তোমরা?

—কি জানি? কোথায় যেন বেড়াতে যাবেন ওঁরা সব! আমারও নিমন্ত্রণ আছে।

—ও! তুমি ফিরবে কবে?

—রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ।

মিহির চলে এলো। দেখতে পেল, খঞ্জনা এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করল,

—তুমি এমন চুপচাপ একলা এখানে দাঁড়িয়ে যে?

—কি আর করি! দোক্‌লা যোগাড় হয়নি।

—চেষ্টা কর। জুটে যাবে।

মিহির কথাটা বলতে-বলতে চলে এলো। ওর মনের মধ্যে শুক্তির তাগাদা প্রতিনিয়ত ওকে বিব্রত করছে।

ঘরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিল মিহির। জামা-কাপড় পরতেও বেশ কিছু সময় গেল। তারপর বেরিয়ে ট্যাক্সি খুঁজতে গেল খানিকটা সময়। হাত-ঘড়ি দেখলো একঘন্টারও বেশি সময় পার হয়ে গেছে।

ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বখশিসের লোভ দেখিয়ে মিহির প্রায় ছুটেই যখন এসে পৌঁছাল, তখন ডাঃ সত্য রায় পার্টিকে রওনা করে দিয়ে ফিরছে। মিহিরকে দেখে বললো,

—তুই এত দেরি করে এলি?

—কি করব বল? অনেকটা দূরে বাসা। ওরা এখন কোথায় সব?

চলে গেল তো। ট্রেনেই গেল সব। আমিই তাদের তুলে দিয়ে এলাম।

—কোথায় গেলেন ওঁরা?

—নালন্দা দেখতে। এখন আর ট্রেন নেই যে তুই যাবি।

—আমি পরের ট্রেনেই যাব। ঠিকানাটা দে।

—ঠিকানা নেই কিছু। বললো, ওখানে যে-কোন একটা হোটেলে উঠবে সবাই।

—কে কে গেলেন?

—বন্দনা, তার দাদা, অমিতাভ, মিনতি, মঞ্জু, শিবনাথ—তুই সকলকে চিনবিনে। যাক্ গে, তোর আর এদের সঙ্গে যেতে হবে না।

—থাক তাহলে।

কথাটা বললো মিহির, কিন্তু মনের ভিতর এমন একটা ধাক্কা তার লাগলো, যা সামলাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে। সত্যর কাছে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরলো না। ওখান থেকে সোজা হাওড়া স্টেশনে এলো, টিকিট কাটলো এবং সটান রওনা হলো নালন্দা দেখতে—একা।

অমন করে সেজেগুজে বেরিয়ে মিহির যদি বাসায় ফেরে তো খঞ্জনা কথা শোনাবেই, মিনিও ঠাট্টা করতে কিছু বাকি রাখবে না। অতএব যে কোনো প্রকারে দিন-তিনেক বাইরে থাকাই ভালো।

মিহির পৌঁছবে কখন কে জানে? পাশের বেঞ্চে বসা এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে টাইম টেবিল চেয়ে নিয়ে দেখলো—আজ আর তাকে পৌঁছতে হবে না, কাল পৌঁছবে। কয়েক ঘন্টার অবসর রিক্ত মন নিয়ে।

মনটা তিক্ত হয়ে যাচ্ছে মিহিরের। এত দেরি হলো শুরু ট্যাক্সির জন্য। এর থেকে বাসে এলে আগে আসা যেত। কিন্তু শুক্তি যদি ফোনে জানিয়ে দিত তাকে যে, তারা পাটনা যাবে, তাহলে তো সে সটান হাওড়া স্টেশনে গিয়েই ওদের ধরতে পারতো। শুক্তি তা জানালো না কেন? মধ্য কলকাতা থেকে পুরো দক্ষিণে গিয়ে, আবার উত্তর-পশ্চিম দিকে যাওয়ার সময় তো বড় কম লাগে না। শুক্তির এটা ইচ্ছাকৃত গোপনতা, নাকি সে এতটা খেয়াল করে নি?

গেছে ওরা কয়েকজন ব্যক্তি একসঙ্গে। বন্দনার দাদা বড় ইঞ্জিনিয়ার, অমিতাভ আমেরিকা-ফেরৎ বড় ডাক্তার, শিবনাথ কৃষিবিজ্ঞানী। আর কে-কে আছেন কে জানে? ভালো! দেখা যাক, কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় মিহির।

ট্রেন ছেড়ে দিল। রাত হলো অনেক; ঘুম হলো না মিহিরের। দু'চোখের পাতা এক করতে পারলো না সে নানান চিন্তার জন্য। সকালে সে নামলো পাটনায়। এখানে তার এক বন্ধু থাকে, নাম সন্তোষ। এরোড্রামে কাজ করে। বাসার ঠিকানা জানা ছিল। সে গেল সন্তোষের বাড়ি।

অনেকদিন পর দেখা দুজনে। বন্ধুকে স্বাগত জানাল সন্তোষ। বড় বাংলোর মতো বাসা সন্তোষের। আরামেই সে রইলো ওখানে। বৈকালে বেরুলো বেড়াতে।

নালান্দায় মিহির আর যাবে না। মনে মনে স্থিতাবস্তা এসে গেছে। তাই শনিবার সন্তোষ দেবের বাসায় থেকে রবিবার রাত্রে ফিরবে ঠিক করলো।

পরদিন সকালে মিনি একজন ভদ্রলোককে ডেকে আনলো। বছর পঞ্চাশ বয়স। সুশ্রী চেহারার মানুষটি এসে বিনীত অভিবাদন জানালেন চিনিকে। পরিচয় দিলেন তাঁর নাম প্রভাব পাঞ্জা।

পাঞ্জা মশাই মশাই জানালেন, তিনি সরকারে শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে কাজ করেন। দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে তাঁকে যেতে হয়। এই সুযোগটার সদ্ব্যহার করেছেন তিনি নানা স্থানের লোকগাতা সংগ্রহ করে। নিজের পয়সা খরচ করে এটা করা তাঁর পক্ষে অসাধ্য ছিল। দিবাকরবাবু তাঁর দেশের লোক-পরিচিত বন্ধু। তাঁরই উপর বইখানি ছাপার ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। দিবাকরবাবু তাঁর একজন পরিচিত পন্ডিত প্রফেসরকে দিয়ে প্রুফ দেখিয়ে বইখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর করে ছেপে দিয়েছেন। খবর পেয়ে প্রভাতবাবু মাত্র কাল কলকাতায় এসেছেন।

মিনির সঙ্গে দিবাকরবাবুর মেয়ের বন্ধুত্ব আছে। ওখানেই মিনির আলাপ হয়েছিল কাল প্রভাতবাবুর সঙ্গে। আজ ফোন করে এখানে আসতে আমন্ত্রণ করলো।

—খুব আনন্দ পেলাম আপনার আসায়। আপনার বইটা দেখতে চাই।

—এই নিন। অনুগ্রহ করে উপহার-স্বরূপ আপনি বইটি গ্রহণ করুন।

—ধন্যবাদ।

চিনি সাগ্রহে গ্রহণ করলো বইখানি।

সুন্দর ছাপানো, শোভন অলঙ্করণ আর মজবুত বাঁধাই-করা বই 'বাংলার লোকসাহিত্য'। একজন বিখ্যাত ব্যক্তির লেখা একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। চিনি তার এক হাত দিয়ে বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললো,

—ছাপা তো ভালোই হয়েছে। ভুল-টুল নেই তো?

—কি জানি? আমি এখনও দেখিনি। যিনি প্রুফ দেখেছেন, তিনি একজন প্রফেসর। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গেলাম—শুনলাম বাড়ি নেই তিনি। কোথায় বেড়াতে গিয়েছেন।

তিনি ফিরলে দেখা হবে নিশ্চয়।

—না! এবার হলো না। আমার তো আর ছুটি নেই। আজ রাত্রেই ফিরতে হবে।

প্রভাতবাবুকে চা খাওয়ালো মিনি। অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ভদ্রলোক। কথায় কথায় বললেন,

—সুদূর পল্লী অঞ্চলে কত যে কথা আর কথকতা আছে, কত যে প্রবচন আর পরীক্ষিত মিষ্টিযোগের ওষুধ, তন্ত্র-মন্ত্রের কত হদিস আছে তা বলার নয়।

—সব সংগ্রহ করেছেন?

—সব না, কিছুকিছু করেছি।

—আপনার এই বইখানা থেকে যদি কেউ থিসিস লেখে?

—লিখুন না! সানন্দে বললেন প্রভাতবাবু—খুবই তো আনন্দের কথা। লিখবেন আপনি। লিখবেন?

—চেষ্টা করব। অবশ্য আরো যোগ্যতম লোক যদি কেউ লেখেন তো ভালো হয়।

—আপনিই যোগ্যতমা। এই ক'মিনিটের কথায় বুঝেছি, আপনি লিখলে আমি সব থেকে বেশি খুশী হবো।

—যিনি প্রুফ দেখেছেন তিনি যদি লেখেন?

—তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কোনো কথাও হয়নি এখনও। তাছাড়া

এই বই নিয়ে এবং আরো নানা বই নিয়ে থিসিস তো যে কোনো লোক লিখতে পারে। তাছাড়া বই তো আমি বাজারে বেচবো।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

—আচ্ছা, আজ আসি তাহলে। আবার কলকাতায় এসে দেখা করবো।

—নিশ্চয় করবেন। আবার আপনি এলে আপনার কাছে পল্লীর গল্প শুনব।

—আচ্ছা, আচ্ছা, শোনাব খুব মজার মজার গল্প। অনেক কিংবদন্তীর গল্প শোনবার আছে।

হেসে বিদায় নিল ভদ্রলোক। মিনি এতক্ষণে বললো,

—এবার বুঝলি তো, মিহির তোকে কেমন ধাপ্পা দিয়েছে।

—যাক গে! তুই যা এখন। বইখানা পড়ি।

—পড়।

মিনি চলে গেল।

চিনি নিবিষ্ট মনে বইখানা খুলে দেখছে। ও কি প্রথম ভূমিকাটা পড়বে নাকি? না। আগে বইখানা পড়ে পরে ভূমিকা পড়লে ভূমিকার বক্তব্য ভালোভাবে বোঝা যাবে। চিনি পড়তে আরম্ভ করলো।

কত বিস্ময়কর কথা, কত আশ্চর্য কাব্যরস, কত মাধুর্যমাখা প্রেম-বিরহ-মিলনের ইতিহাস? কিন্তু সকলকে ছাড়িয়ে রয়েছে একটি পবিত্র-সুন্দর-আত্মা—যাকে ধরা যায় ছোঁয়া যায়-অনুভব করা যায়! সেটা হলো বাংলার বিশেষ-বিশেষ সাধন-ধারার সঞ্চিত আধ্যাত্মিকতা।

প্রতিটি গাথার মধ্যে কী এক অপূর্ব ঈশ্বরপ্রেম সদা জাগ্রত। ঈশ্বরবানুভূতিকে মজ্জাগত করতে না পারলে এমনভাবে এত সাবলীল ভঙ্গিতে তার প্রকাশ-ব্যঞ্জনা সম্ভব নয়। চিনি আরও দেখল, এই ছড়াগুলিতে 'মা' শব্দটা যেন সকলকে জুড়ে সকলকে ছাপিয়ে, সকলের হৃদয় নীপ্যমান।

পথের পথিক, দুয়ারের ভিখারী, নিরন্ন বা ধনী-রাজ-জমিদার সকলেই এই 'মা' শব্দটার কাঙালী। মা-মা-মা! এই মাতৃ-ভাব যেন আকাশে-বাতাস ছাড়িয়ে, এই নীল নভোতলে গিয়ে লয় হয়েও হচ্ছে না—ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে ফিরে ভেসে আসছে কানে 'মা-মা-মা'।

চিনি এই মাতৃ-ভাব নিয়ে একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখবে ঠিক করলো।

বইটা সারাদিন সে পড়েছে। রাত্রি হলো। তখনও কয়েক পৃষ্ঠা বাকি রয়েছে 'লোকসাহিত্য' শেষ হতে। মিনি এসে ধমক দিয়ে বললো,

—আর পড়ে না। এবার ঘুমো।

—এই অধ্যায়টা শেষ করে নিই।

—না। আর একটা লাইনও না।

বইটা কেড়ে নিল মিনি। শুইয়ে দিল চিনিকে জোর করে। তারপর আলো নিভিয়ে দিয়ে দিদির গলা জড়িয়ে ডাকলো,

—দিদি!

—বল।

—মিহিরবাবু বেড়াতে যাচ্ছিলেন শুক্তিদের সঙ্গে। তাঁরা কেমন বুদ্ধি করে ওকে বোকা বানিয়ে গেছেন শুনবি। ভারি মজা করেছেন।

—কী ব্যাপার রে?

—ওঁরা ফোন করলেন হাওড়া স্টেশনের পাবলিক ফোন থেকে। কিন্তু বললেন না ফোনটা কোথা থেকে করা হলো। মিহিরবাবু জামা-জুতো পরে ট্যাক্সি নিয়ে সটান গেলেন শুক্তিদের বাড়ি। গিয়ে শুনলেন, ওরা বহুক্ষণ রওনা হয়ে গেছেন—ট্রেনেও চড়েছেন। গেছেন নালন্দা দেখতে। তাই ট্রেনে উনি সটান নালন্দার দিকে যাত্রা করেছে। মোহটা কত বেশি বোঝ এইবার!

—হ্যাঁ, কিন্তু ওঁরা বললেন না কেন মিহিরবাবুকে হাওড়া স্টেশনে যেতে?

—শুক্তির কাজই তো এই! সে অমিতাভ নামক জনৈক আমেরিকা-ফেরত ডাক্তারকে পেয়েছে। ঘটক হচ্ছেন ওর দাদা, শ্রীসত্য ডাক্তার নিজে। অতএব সহজেই বুঝতে পারছিস দিদি যে, মিহির এখন বাতিল।

—বাতিল কেন?

—তোর মতো মুখ্যু মেয়েকে বোঝানো যাবে না বুঝলি!

—কেন?

—কারণ, মিহির তো কোনো একটা কলেজের সামান্য মাইনের প্রফেসর—না আছে বাড়ি, না আছে গাড়ি। তাকে শুক্তি বিয়ে করবে কেন? আর ঐ অমিতাভ—বিলেত-ফেরত লাখপতির ছেলে। বিলেত মার্কা পোশাক-পরিচ্ছদ, বর্ণে-অসবর্ণে একেবারে সাহেব লোক। তাকে পেলে মিহির তো তার কাছে একেবারে চাকর বনে যাবে।

চিনি চুপ করে ভাবছে। তাকে নীরব থাকতে দেখে মিনি বললো,

—ঘা খেয়ে মিহির হয়তো ফিরতে পারে। কিন্তু খুব সাবধান দিদি!

—কি সাবধান হব?

—ওকে নিবিনে কিছুতেই! ও বঞ্চক, ও ঠক, প্রতারক—বিশ্বাসঘাতক—

—চুপ কর মিনু।

—অসহ্য লাগছে? হায় রে, দুর্ভাগিনী নারীর প্রেম। তোর জন্য কান্না পাচ্ছে দিদি। এই স্বর্গীয় প্রেম তুই ঐ লোফার লোকটাকে কেন দিলি?...কেন দিলি? মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে আমার।

মিনি সত্যই চিনির বুকের ওপর মাথাটা ঠুকতে লাগলো। চিনি ওকে শান্ত করে ধীরে ধীরে বললো,

—লক্ষ্মী বোনটি, আমার প্রেম নিষ্কলঙ্কই থাক। এটাই তুই ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। আমি যেন কোনো অবস্থাতেই দ্বিচারিণী না হই।

মিনি অবাক চোখে চেয়ে আছে চিনির মুখের দিকে। চিনি আবার বললো,

—যেটুকু আমি পেয়েছি তা অতি সামান্য। তবু একদিন একমুহূর্তের জন্য উনি আমায় ভালোবেসেছেন। এই সত্য আমার জীবনে আমি অমর করে রাখব মিনু।

—হা ভগবান! এই আশ্চর্য প্রেমকে তুমি বঞ্চনা করলে প্রভু। এত নিষ্ঠুর তুমি?

—মিনি পাশ ফিরে শুলো কাঁদছে সে।

নালন্দার নাম কোন্ শিশুকাল থেকে শোনা। দেখবার ইচ্ছেটা খুবই প্রবল মিহিরের মনে। কিন্তু থাক, নালন্দায় সে আর যাবে না। শুক্তি যে ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়েছে, এটাই যেন এবার তার বিশ্বাস হলো। দেখা যাক, কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় মিহির।

বৈকালে বার হলো মিহির। শহরটা দেখে বেড়াচ্ছে সে। সন্তোষের ছেলেমেয়ের জন্য কিছু খেলনা কিনলো। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরল। সন্তোষ বললো,

—এবার বিয়ে কর মিহির। আর দেরি করলে ছেলেমেয়ে মানুষ করবি কখন?

—হ্যাঁ। এখনই বিয়ে করা দরকার। সম্প্রতি আমি সেই চেষ্টায় ঘুরছি।

—ঘুরতে হবে না। আমার এক শালী আছে তোর যোগ্য মেয়ে। করবি?

না। অসম্মান বোধ করিস নে। কারণটা শোন।

কথাটা বলে সে বিমলবাবুর বাড়িতে টিউশনি করার ইতিহাসটা বললো সন্তোষকে। বললো খুব ধর ভাবেই—ওকে চোখে কখনও দেখিনি। শুধু গান শুনেছিলাম, আর দেখেছিলাম ওর অপূর্ব প্রতিভার স্বাক্ষর ওর ভাই-বোনের খাতায়। ভাই আর বোন 'দিদি' বলতে অজ্ঞান। কে জানে, কেমন করে ঐ না-দেখা মেয়েটির দিকে মনটা ছুটতে চাইতো। অবশেষে একদিন দেখলাম। পঙ্গু, অকর্মণ্য একটা মেয়ে—কীটদষ্ট ফুলও ভালো তার থেকে।

—তারপর?

—ওকে কে জানে, কেন ভালোবেসে ফেললাম। ঠিক করলাম বিয়ে করব।

—ঐ ইন্‌ভ্যালিড মেয়েকে?

—হ্যাঁ। তারপর শোন। ওর পালক-পিতামাতার সম্মতিও পেলাম। আর পেলাম ওরও সম্মতি।

—ভাল। তারপর?

—হঠাৎ ব্যঘাত ঘটলো।

—আবার ব্যাঘাত কিসের?

—ব্যাঘাত আমার ডাক্তার-বন্ধু সত্য রায়। চিনিস তো তাকে?

—হ্যাঁ। সে তো বিলেত ঘুরে এলো।

—হ্যাঁ। তাকে ডেকে দেখালাম চিনিকে। সত্য ডাক্তার বললো—ও কোনোদিন ভালো হবে না। অনর্থক বোকামী করিস্‌নে। আমার বোন শুক্তিকে বিয়ে কর। প্রস্তাবটা খুব অতর্কিত এবং অতিশয় লোভনীয়।

—অবশ্যই। তাই করবি নাকি?

—ভাবছি।

—ভাব। ভেবে ঠিক কর। কিন্তু তুই একটা অন্যায় করেছিস মিহির। মারাত্মক অন্যায় করেছিস।

—কি অন্যায় করেছি?

—তুই এই মেয়েটিকে—চিনি না কি নাম বললি—বিভ্রান্ত করেছিস।

কেন তুই তার মনে একটা আশা জাগালি? তোর ও পাপ ক্ষমার অযোগ্য।

তীক্ষ্ণ, তীব্র ভর্ৎসনা করলো সন্তোষ মিহিরকে। নিঃশব্দে শুনলো মিহির। তারপর ধীরে ধীরে বললো,

—আমার অন্যায় আমি জানি সন্তোষ। এটা শুধু পাপ নয়, মহাপাপ তাও জানি। তবে মনে হয়, সে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। পড়াশোনাতেই তার ঝোঁক বেশি। তার জীবনের এই সামান্য ঘটনা সে নিশ্চয়ই ভুলে যাবে।

—না, যাবে না। যদি সে স্বাভাবিক সাধারণ মেয়ে হতো তো এই ব্যাপারটাকে আমলই দিত না, কিন্তু সে তা নয়। একটা ইন্‌ভ্যালিড মেয়ে সে বুদ্ধিতে প্রদীপ্ত, প্রতিভার অপরাজেয়, সঙ্গীতে মাধুর্যময়ী, অথচ যার জীবনে সফলতার কোনো আশাই ছিল না তার মনে তুই একটা সুখের নীড় রচনার স্বপ্ন জাগিয়ে দিয়েছিস। এ সে কোনোদিন ভুলবে না।

—কেন?

—কারণ, আর কেউ তার মনে এ আশা জাগাতে যাবে না। তোর মতো আহাম্মক আর কেউ নেই। ওকে প্রেম জানাবার পূর্বে তোর ভালো করে নিজেকে তৈরি করা উচিত ছিল।

—এখন আমি কি করতে পারি সন্তোষ।

—আমার কোনো সাজেশন নেই। ওকে বিয়ে করতে বলে তোর জীবনটাও পঙ্গু করতে বলব না আমি। অভাগী মেয়েটাকেই এখন সয়ে যেতে হবে ধীরে ধীরে! সইবার জন্যই হয়তো সে পৃথিবীতে জন্মেছে!

নিঃশব্দে ওর কথাগুলো শুনছে মিহির। সন্তোষ আপন মনে বলতে লাগলো,—মা নেই, বাপ নেই। ভাই-বন্ধু কেউ নেই। পরের বাড়িতে পঙ্গু, হয়ে সে পড়ে আছে। তোকে অবলম্বন করে সে লতার মতো জড়াতে চেয়েছিল। ছিঃ মিহির! এ তুই কি করেছিস? তুই এতখানি নিষ্ঠুর!

নিঃশব্দে দুজনের কয়েক মুহূর্ত কাটলো। সন্তোষের স্ত্রী এসে বললো,

—খাবে এস। আসুন মিহিরদা।

—চল।

দুজনে গিয়ে খেতে বসলো। সন্তোষ যথেষ্ট বলেছে। আর এ বিষয়ে কোনো কথা সে বলতে চায় না। মিহিরই বললো,

—আমি ওর কাছে অপরাধীই থেকে গেলাম সন্তোষ।

—হ্যাঁ। ঈশ্বর তোকে মার্জনা করুন।

—শুক্তি সম্বন্ধে কি করা যায় এখন?

—পারিস তো বিয়ে কর তাকে। তবে তোর কথা শুনে আমি যতদূর ভেবেছি শুক্তি তোকে বিয়ে করবে না।

—বিয়ে করবে না! কেন?

—না! কারণ, ওরা অত সহজে জড়ায় না নিজেকে। ওরা অনেক ভাববে, অনেক দেখবে, তবে আসবে। শুক্তি তো আর ইন্‌ভ্যালিড চিনি নয় যে, জলে ডুবিয়ে দিলেই গুলে সরবৎ হয়ে যাবে। যা, শো গিয়ে।

বলে, সন্তোষ চলে গেল তার নিজের কামরায়। ওর বৌ মলিনা বললো,

—আপনারা কি সব বলাবলি করছেন দাদা?

—ও কিছু নয়। তোমার ওসব না শোনাই ভালো!

—আমি কিন্তু জেনে ফেলেছি। প্রফেসর দেবব্রত রায়ের মেয়ে তো? বি. এ. পাশ করে বিয়ের চেষ্টায় ঘুরছে। ওকে বিয়ে করলে আপনি বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়ে যাবেন। কিন্তু সামলাতে পারবেন তো?

—বেসামাল হবার আশঙ্কা আছে নাকি?

—যথেষ্ট আছে! অমন বহির্মুখী মেয়ে আর দেখিনি। ওর পুরুষ বন্ধুর সংখ্যা সহস্রাধিক মেয়ে বন্ধুর সংখ্যা বিশ-পঁচিশটা মাত্র। ওর চোখের সুগন্ধি সুর্মা আর কাজলের দাম যোগাতে আপনার প্রফেসারির মাইনেয় কুলোবে না।

—বল কি? এমন! আমি তো দেখিনি কোনোদিন এ রকম কোনো কিছু।

—বিয়ে করার পর দেখতে পাবেন। এখন দেখাবার মতো বোকা মেয়ে শুক্তি নয়। যান, শুয়ে পড়ুন গে।

চলে গেল সন্তোষের স্ত্রী।

রাত হয়েছে। মিহির তার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে এসে শুলো। একটা চাকর রেখে দিয়েছে সন্তোষ মিহিরের জন্যে। সে এসে বললো,

—হুজুর! কাল চার বাজে যাইবেন তো?

—নেহি। কাল রাত সাড়ে আট বাজে মেল ট্রেনে মে যাব।

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

চাকরটা চলে গেল।

মিহির শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলো চিনির কথা নয়, শুক্তির কথা। সন্তোষের বৌ-এর বলা কথাগুলো আবর্তিত হচ্ছে তার মস্তিষ্কে।

কলকাতায় ঐ পাড়ার মেয়ে সন্তোষের বৌ। শুক্তিকে সে নিশ্চয় চেনে—খুব ভালো ভাবেই চেনে। এখন কি করবে। আলেয়া-শুক্তির পিছনে ঘোরা তার ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু শুক্তিকে অকারণ দোষ দেওয়া যায় না। বড়লোকের মেয়ে। হয়তো সে একটু বেশি খরচ করে। তাকে কী! শুক্তির সেটা গুণই। কৃপণ সে নয়। কেনই বা হবে? তার তো কোনো অভাব নেই। তবে তার বন্ধুর সংখ্যা সহস্র—এটা যেন বাড়াবাড়ি কথা বললো সন্তোষের স্ত্রী। এতটা সত্যি নয়।

এ যুগে মেয়েদের পুরুষ বন্ধুর সংখ্যা কিছু বেশি থাকে। তা থাক। তাতে ক্ষতি কিছু নেই। তবে, একটা কথার সমাধান হচ্ছে না। এই নালন্দা যাবার কথাটা মিহিরই বলেছিল একদিন শুক্তিকে। তখন অবশ্য শুক্তি সায় দেয়নি। অথচ সে এলো নালন্দা দেখতে, আর প্রস্তাবক মিহিরকেই বাদ দিল কেন সে? এই প্রশ্নই তার মনে বার বার উঁকি দিতে লাগলো।

পরদিন ট্রেনে উঠে সোমবার সকালে হাওড়ায় পৌঁছাল মিহির। ট্রেন থেকে নেমেই দেখতে পেল, পাশের প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে অমিতাভ হাত ধরে নামাচ্ছে শুক্তিকে।

শুক্তির দল পিছনের দিকে রয়েছে। মিহির আর ওদের দিকে তাকাল না। সুটকেশটা হাতে নিয়ে সটান চলে এলো হনহন করে। এবার বাস ধরে বাড়ি।

যথাকালে কলেজে গেল মিহির পড়াতে। ফেরার পথে একটা বই-এর দোকানে তার লেখা বই-এর খবর নিল। বিক্রি ভালোই হচ্ছে বাংলার রূপকথা। সে কিছু টাকা পাবে। তবে প্রকাশক জানালেন, আরও উন্নত ধরনের বই লিখতে হবে।

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে ক্লান্ত মিহির সেই 'লোকসাহিত্য' বইখানা পেল খঞ্জনার কাছ থেকে। সেই সঙ্গে খবর পেল, লেখক প্রভাতবাবু নাকি চিনির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। দেখা করে বাড়ি গেছেন। মিহির বললো,

—আমার সঙ্গে তার তো দেখা হলো না।

—না, কি করে হবে বলুন! আপনি তো নালন্দা বেড়াতে গিয়েছিলেন।

—হুঁ! বলে, মিহির চুপ করলো।

খঞ্জনা চলে এলো ওখান থেকে। মিহির ভাবতে লাগলো, প্রভাতবাবু কেমন লোক কে জানে? চিনির সঙ্গে কেন তিনি দেখা করেছেন! অবশ্য দেখা করাটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু আবশ্যকটা কোথায়? কি ভাবে তিনি পৌঁছলেন চিনির কাছে? নানা প্রশ্ন আন্দোলিত হতে লাগলো তার মনের মধ্যে। কিন্তু খুবই ক্লান্ত ছিল মিহির। ঘুমিয়ে পড়ল অল্পক্ষণের মধ্যে।

পরদিন খঞ্জনাকে প্রশ্ন করে জানলো, মিনিই ডেকে নিয়ে গেছে প্রভাতবাবুকে। মিনি যে কি রকম গুপ্তচর মেয়ে তা এরই মধ্যে টের পেয়েছে মিহির। তবু সেটা যাচাই করা দরকার। মিহির একটা ফোন করলো বিমলবাবুর বাড়িতে। অপর দিকে মিনি ধরতেই বললো,

—আমি মিহির। তোমরা সব ভালো আছ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভালো নিশ্চয় আছি। মন্দ কেন থাকব? আপনি নালন্দা নাকি কালিন্দী কি যেন দেখে এলেন। কেমন লাগলো?

—ভালো। সে একটা দেখবার মতো জিনিস। সে যাক, তোমার দিদি কি 'লোকসাহিত্য' বইটা পড়েছে?

—হ্যাঁ। পড়ে-পড়ে প্রায় মুখস্ত করে ফেলেছে। শুনুন—

'আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
উড়কী ধানের মুড়কি দেব পথে জল খেতে।'

শুনেছেন? কী মিষ্টি সব ছড়া! আর জানেন স্যার, উনিও খুব মিষ্টি।

—কে?

—ঐ প্রভাতবাবু। প্রভাতের পদ্মের মতো সুন্দর আর মধুময়। আর কী সুগন্ধি—আর, আর কি পবিত্র!

—ও! শুনে খুব খুশী হলাম। ওঁকে বিয়ে করবে নাকি?

—না! উনি সূর্যের মতো অনেক উঁচুতে। নাগাল পাবনা। আচ্ছা নমস্কার।

ফোন ছেড়ে দিল মিনি।

সিচুয়েশনটা সামলাতে পারছে না মিহির। যেন ভাগ্য তাকে কোথায় বিড়ম্বিত করছে। একটা অদৃশ্য বিরুদ্ধ শক্তি সর্বত্রই ক্রিয়াশীল। ক্রমশ চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলো মিহিরের মন।

চিনির কাছে যাওয়া এখন সম্ভব হচ্ছে না। কারণ মিহির যে শুক্তির দিকে ঝুঁকেছে, এ খবর আর কেউ না জানুক মিনি জেনে ফেলেছে এবং মিহিরের নাম তাদের আত্মীয়বর্গের তালিকা থেকে কেটে দিয়েছে। এ ভালোই হয়েছে। চিনি এখন সেই 'লোকসাহিত্যে'র লেখকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। হয়তো তাঁর সান্নিধ্য, তার সৎ-প্রেরণায় চিনি অবিলম্বে সুস্থ হয়ে উঠবে এবং মিহিরে কথা ভুলে যাবে।

যাক্, ভুলেই যাক চিনি মিহিরকে। কারণ, মিহির তো তাকে গ্রহণ করতে পারলো না। অনর্থক আশা দিয়ে ঐ অভাগী মেয়েটিকে বঞ্চনা করে মিহিরের মন আজ সত্যিই পীড়িত। এ ভালোই হলো। ভাগ্যই তাকে বাঁচালো।

ভাবছে মিহির চিনির বলা কথাগুলো। চিনি একান্তভাবেই আত্মসমর্পণ করেছিল মিহিরকে। সেই চিনি কি প্রভাতবাবুর মতো একজন স্বল্প-পরিচিত ব্যক্তিকে ভালোবাসবে? কে জানে, হয়তো হতেও পারে। এ ভালোই হলো। বাসুক ভালো তাকেই। পার তো বিয়ে করে সুখী হোক।

কিন্তু মিহিরের মন কোথায় যেন একটু অসুস্থ বোধ করছে! চিনিকে সে সত্যিই ভালোবেসেছিল। অথর্ব-অক্ষম-অযোগ্য জেনেও তাকে জীবনের সাথী করতে চেয়েছিল। এই সত্যটা মিহির হয়তো অগ্রাহ্য করেছে শুক্তির জন্য, কিন্তু চিনি অগ্রাহ্য করলো কি করে? হয়তো রাগে, হয়তো বা অন্য কোনও কারণে। যে জন্যেই হোক, চিনি তাকে ভুলে গেছে অথবা যতশীঘ্র সম্ভব ভুলবে।

সেদিন শুক্তির হাত ধরে নামতে দেখেছে অমিতাভকে। কিন্তু তাতে কি? ওরকম কারো হাত ধরে কোনো মেয়েকে নামানো তো বর্তমান যুগের এটিকেট। এতে খারাপ ভাববার বা চিন্তা করার কি আছে?

শুক্তির খবর ক' দিন নেওয়া হয়নি। একবার খবর নেওয়া দরকার। একটা ফোন করে আগেই জেনে নিতে হবে, ওখানে কি রকম পজিশনে আছে মিহির!

সত্য ডাক্তার নিজের মুখেই বলেছিল, শুক্তিকে দেবে তারা মিহিরের হাতে। সে-কথা তো ওরা প্রত্যাহার করেনি। অমিতাভ ঐ সমাজের ছেলে। শুক্তির সঙ্গে ওর দীর্ঘকালের পরিচয়। ওরা তো অনেক আগেই বিবাহিত হতে পারতো! না, অমিতাভর সঙ্গে সেরকম কোনো সম্পর্ক নেই শুক্তির।

মিহির আকরণ ভুল করছে শুক্তির সম্বন্ধে। অবশ্য সন্তোষের স্ত্রী মলিনার কথাগুলো মনে পড়লো তার।

মিহির ভাবলো, ধনীর দুলালী শুক্তি যদি হয়ই একটু খরচে মেয়ে, তো কি এমন এসে যাবে? মিহির এখন যথেষ্ট রোজগার করে। আরও বাড়তি আয় করবে সে উঁচু ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক লিখে; তার বই বাজারে বিক্রি হবে। লিখবে কিছু নোট বইও। প্রকাশক অনুরোধ করেছেন।

মিহিরের মনে নানা চিন্তার জাল বোনা হচ্ছে। কোনোটাই ঠিকমতো রূপ নিচ্ছে না। যেন ভাঙা-ভাঙা ঢেউ। মনটাকে একটু সুস্থ করা দরকার। আলনা থেকে বুশশার্টখানা টেনে নিয়ে গায়ে দিল সে। হাতঘড়ি পরতে পরতে বেরুলো একটু বাইরে। সিঁড়ির কাছে বারান্দায় খঞ্জনা জিজ্ঞাসা করলো,

—কোথায় যাচ্ছেন মিহিরদা?

—এই একটা পার্কে বেড়াব।

—আমি যাব সঙ্গে?

—এসো।

বৈকালিক প্রসাধন খঞ্জনার করাই ছিল। বেরুবার মুখে মাকে বললো,

—আমি মিহিরদার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি মা।

—আচ্ছা, যা!

খঞ্জনা আর মিহির নেমে এলো নীচে। কাছেই একটা পার্ক। কিন্তু খঞ্জনা বললো,

—উহুঁ! ওদিকে নয়।

—তবে কোন্ দিকে?

—বিপরীত দিকে, চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে। সরকারি শিল্প প্রদর্শনী দেখতে যাব।

—ও! তাই চল। কিন্তু সে তো অনেকটা দূর।

—আপনি একটা রিক্সা ডাকুন।

রিক্সা ডাকা হলো। উঠলো দুজনে। মিহির শুধালো।

—ওখানে কি কাজ আছে তোমার?

—না, শুধু দেখব। ভালো ভালো তাঁতের শাড়ি নাকি এসেছে।

—শাড়ি! বাঃ, কতগুলো শাড়ি হলো তোমার? নিশ্চয় ডজন দশ?

—না-না, দশ ডজন কোথায় পাব মিহিরদা? তবে বোধ হয় ডজন দুই হবে।

—ওখানে কিছু শাড়ী কিনবে নিশ্চয়?

—হ্যাঁ, যদি পছন্দ মতো পাই।

—শাড়ি কিনতে মেয়েদের এত উৎসাহ কেন খঞ্জনা?

—কেন আবার? গয়না তো অল্প পয়সায় হয় না। আজকাল যা সুন্দর সব শাড়ির ডিজাইন বেরুচ্ছে! গয়নার দরকার হয় না।

—সে কথা সত্যি! তাছাড়া সোনার বাজারের যা অবস্থা চট্ করে কেনা অসম্ভব।

এসে পড়লো দুজনে। ঢুকলো ভিতরে। দেখে বেড়াচ্ছে! একখানা ভালো শাড়ি পছন্দ করলো খঞ্জনা। দাম বলল পঁচাত্তর টাকা।

অত টাকা নেই খঞ্জনার কাছে। মাত্র পঞ্চাশ টাকা আছে। মিহির দিল বাকি পঁচিশ টাকা!

—নমস্কার! কে এই মেয়েটি?

মিহির তাকিয়ে দেখল শুক্তি। সঙ্গে অমিতাভ, শিবনাথ; নন্দিতা এবং বন্দনা।

শুক্তি এগিয়ে এসে দেখলো শাড়িখানা। মিহির বললো,

—নমস্কার। ও আমার বাড়িওয়ালা দিবাকরবাবুর মেয়ে! শাড়ির শখ ওর আর মিটছে ন! যাক্, আপনারা সব ভালো আছেন তো?

—হ্যাঁ, ধন্যবাদ। সেদিন আমরা আপনার জন্য লাষ্ট মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম।

—অনেক ধন্যবাদ। তবে আমার কিছু বলার আছে।

বলুন।

—আমাকে জানানো হয়নি যে, ফোনটা স্টেশন থেকে করা হচ্ছে। আমি প্রায় ছুটেই টালিগঞ্জ গেলাম। গিয়ে শুনলাম, আপনারা সদলবলে হাওড়া স্টেশনে রওনা হয়ে গেছেন বেশ কিছুক্ষণ আগে।

—আপনি এতবড় ভুল করবেন জানতাম না।

কথাটা নরম সুরে বলল শুক্তি। জবাবে মিহির উষ্ণ স্বরেই বললো,

—ভুল আমি নিশ্চয় করিনি। যখন আপনি ফোন করেন, তখন ট্রেনের

বাহাত্তর মিনিট বাকি ছিল। অতক্ষণ আগে আপনারা হাওড়া স্টেশনে যাবেন তা কেমন করে জানবো? টিকিট নিশ্চয় আগেই কিনেছিলেন। আর তা আগে না কিনলেও অসুবিধা হতো না।

—কয়েকটা মাল বুক করতে হয়েছিল।

—সেগুলো আপনার বাড়ির সরকারই করেছেন নিশ্চয়। আশা করি নিজে নিশ্চয়ই বুকিং অফিসে গিয়ে মাল বুক করেননি?

—আমরা একটু আগেই গিয়েছিলাম। শুক্তির সুর নেমে গেল। বললো, যাক! যা হবার হয়েছে। চলুন আষাঢ় মাসে পুরী যাই।

আষাঢ় আসতে অনেক দেরি আছে। ততদিন কে মরে, কে বাঁচে কে জানে? বেঁচে থাকি তো যাব।

শুক্তি বললো—তোমার নামটি কি ভাই?

শ্রীমতী খঞ্জনা ভঞ্জ।

স্কুলে পড় তো?

—না। এগারো ক্লাস পর্যন্ত পড়ে ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিলে কেন?

—মা বললো আর পড়তে হবে না। যক্ষিণী হয়েছিস, আরও পড়লে রাক্ষসী হয়ে যাবি। রান্না শেখ, লেপ-কাঁতা সেলাই করতে শেখ, আর ঘর-দোর ঝাঁট দিতে শেখ, শিবপূজা করতে শিখে নে ভালো করে।

—শিবপূজা কর তুমি?

—হ্যাঁ। ধ্যায়েনিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং.....

—থামো, থামো! আর বলতে হবে না। কোথায় শিবপূজা করো তুমি।

—কেন ঠাকুরঘরে। বাড়িতে আমাদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীকরঞ্জাক্ষ শিব আছেন।

—আচ্ছা-খঞ্জনা, তোমাদের বাড়ি গিয়ে একদিন তোমার শিবপুজো করা দেখে আসব।

—সত্যি যাবেন? যান তো খুবই খুশী হবো। বিশ্বাস হচ্ছে না কিন্তু।

—বিশ্বাস হচ্ছে না কেন?

—আপনারা তো ওসব মানেন না।

—কে বললে?

—আমার বন্ধু, মিহিরদার ছাত্রী মিনি বলে, ওপাড়ায় কোনো উৎসব নেই। পুজো ওরা করে না। ওরা বিয়ে করে, আর বিলেত যায়—বিলেত যায় আর বিয়ে কর।

সবাই হেসে উঠলো ওর কথা শুনে। মিহির চুপ করেছিল। সেও হাসছিল। বললো,

—তোমার বন্ধুর কথা সত্যি নয় খঞ্জনা। ওরা বিয়ের আগে বিলেত গিয়ে নিজেকে বিয়ের যোগ্য করে দেশে ফিরে বিয়ে করেন। যেমন এই ডাঃ অমিতাভসেন। ইনি আমেরিকা থেকে 'চেষ্ট স্পেশালিস্ট' হয়ে এসেছেন। আমরা আছি সেই কুপমণ্ডুক হয়ে।

—তাহলে বিয়ের যোগ্য তো আপনি হয়েও পারলেন না মিহিরদা?

—কৈ আর হতে পারলাম? জীবনটা বৃথাই কাটলো। চল খঞ্জনা, এবার বাড়ি চল।

—চললেন নাকি? শুক্তি জিজ্ঞাসা করলো।

—হ্যাঁ। ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

খঞ্জনা আর মিহিরকে সকলকে নমস্কার জানাল। শুক্তি বললো,

—নমস্কার! আর একদিন আসবেন।

—চেষ্টা করব, জবাবে মিহির বললো। আর দেরি না করে খঞ্জনাকে নিয়ে এগুলো বাড়ির দিকে।

ওর মনে যেন একটা জ্বালা রয়েছে। খঞ্জনাকে ধন্যবাদ দিল মিহির সুন্দরভাবে কথা বলার জন্য। বললো,

—ওদের খুব ভালো কথা বলেছ তুমি খঞ্জনা। কোথায় শিখলে এমন সব কথা?

—এগুলো সব মিনির কথা। ঐ শুক্তির ওপর মিনির কী রাগ মিহিরদা? ও বলে, শুক্তি মানে ঝিনুক। জানিস ওর পেটে মুক্তো নেই। সব বের করে নিয়েছে। বাচ্চা ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে এখন ও

—তুমি কি বললে?

—শুধালাম, বাচ্চা ছেলেটা কে?

—তার উত্তরে মিনু কি বললো?

—বললো, তিনি আমাদের মিহিরদা।

হাসছে খঞ্জনা। মিহির কিন্তু হাসতে পারল না।

চিনি সত্যিই একটা কিছু লিখবে 'লোকসাহিত্য' বইটা অবলম্বন করে। আধ্যাত্মিকতা নিয়েই লিখবে। কিন্তু এ বিষয়ে তার জ্ঞান যথেষ্ট নয়! তাই কয়েকটা ধর্মপুস্তক, যেমন—গীতা, চণ্ডী এবং আরো কিছু কিছু যোগবিজ্ঞানের বই আনিয়ে পড়বে। উদ্যোক্তা মিনি। সে দিদিকে সব রকমে সাহায্য করে।

চিনি বলে যায়, মিনি লেখে। মিনির হাতের লেখা খুব ভালো। মুক্তোর মতো গোটা-শোটা, এবং খুব দ্রুত সে লিখতে পারে। বর্তমানে দু'বোনের এটা একটা বিশেষ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ওরা এতে যথেষ্ট আনন্দও পাচ্ছে। যত অগ্রসর হচ্ছে, ততই যেন জ্ঞান-ভাণ্ডার খুলে যাচ্ছে ওদের।

আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান এমন একটা বস্তু যার ভিতর অনুপ্রবেশ ঘটলে আনন্দের সীমা থাকে না। চিনি-মিনিরও তাই হলো। বিশেষ করে চিনির মধ্যে জীবন সম্বন্ধে যে একটা হতাশার ভাব জেগেছিল, তা যেন ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। মেঘমুক্ত আকাশের মতো নির্মল হয়ে উঠেছে তার অন্তর। জীবন-দেবতার অনাস্বাদিত মাধুর্য-রস সে এখন উপলব্ধি করতে পেরেছে। দৈহিক কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে যে একটা মানবিক-চৈতন্য সুপ্ত থাকে, সেই মানসিকতা জাগ্রত হচ্ছে।

প্রায় মাসখানেক মিহিরের কোনো খবর নেই। খবরের জন্য এখন আর ওরা কোনো চেষ্টাও করে না। হয়তো শুক্তির সঙ্গে মিহিরের বিয়ে হয়েছে অথবা শীঘ্রই হবে, এ নিয়ে কিছুমাত্র আর মাথাব্যথা নেই মিনির। দিদির মন অনেক-খানি জুড়োতে পেরেছে এই 'লোকসাহিত্য আধ্যাত্মিকতা'। প্রবন্ধ লেখা ও আলোচনা এতেই সে সন্তুষ্ট।

জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে নানারকম বই-পুঁথি সে সংগ্রহ করে আনে দিদির পড়ার জন্যে এবং নিজেও পড়ে। মিনি অবশ্য চিনির মতো বিদুষী বা প্রতিভাময়ী নয়, কিন্তু সংসর্গ একটা বড় সহায় মানুষের উন্নতির। মিনিও যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠলো। এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে লাগল দিদির সঙ্গে।

সেদিন সকালে হঠাৎ প্রভাতবাবু এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে খঞ্জনা। সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁদের বসালো মিনি আর চিনি।

লোকসাহিত্য নিয়ে ওদের মধ্যে আলোচনা হলো এবং প্রবন্ধ যতটুকু

লেখা হয়েছে তা শোনানো হলো। শুনে প্রভাতবাবু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বললেন,

—এ একটা কাজের মতো কাজ হচ্ছে। দেখে-শুনে খুবই খুশী হলাম। তোমরা দুটি বোনই জুয়েল।

—আর কাকাবাবু বলেন, আমি নাকি একটা জন্তু! খঞ্জনা অভিমানাহত কণ্ঠে বললো।

প্রভাতবাবু বললেন—না, মা, তুই জীবন-রস। তোকে আমার শুকনো ঘরে রসের সঞ্চার করব। একটু থেমে আবার বললেন—শোন মা চিনু-মিনু, ওর বাবার সঙ্গে কাল রাত্রে আমার পাকা হয়ে গেছে। আমার ছেলের জন্য ওকে চেয়ে নিলাম।

খঞ্জনা সলজ্জ মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মিনি বললো,

—শুনে আমরা খুব আনন্দ পেলাম কাকাবাবু। এ আমাদেরও সৌভাগ্য। আপনার ছেলে কি করেন?

—সেও আমরা খুব আনন্দ পেলাম কাকাবাবু। এ আমাদেরও সৌভাগ্য। আপনার ছেলে কি করেন?

—সেও শিক্ষাবিভাগে কাজ পেয়েছে। সরকারি চাকরি। আগামী মাসেই মাকে আমার ঘরে তুলব। এখন যদি পাড়াগাঁয়ে যেতে ওর আপত্তি না হয়?

—কিরে খঞ্জনা! তোর আপত্তি আছে নাকি?

প্রশ্নটা করলো মিনি। খঞ্জনা জানালো,

—আপত্তি কেন হবে? পাড়াগাঁয়েও তো মানুষ থাকে। আমিও থাকতে পারব।

—বিয়ে আমি কলকাতাতেই দেব মা। তোরা সব যাবি। চিনিকেও নিয়ে যাব। দুঃখের বিষয় এবারও মিহিরবাবুর সঙ্গে দেখা হলো না আমার।

—কেন? কোথায় তিনি খঞ্জনা। শুধোলো চিনি।

—কে জানে? মিহিরদা দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়ে হয়তো বিলেত বা আমেরিকা কোথাও গেছেন পড়তে, না-হয় বেড়াতে। কোনো পাত্তা নেই তাঁর। ওদিকে শুক্তির বিয়ে হয়ে গেছে ডাঃ অমিতাভর সঙ্গে। বেচারা মিহির।

খঞ্জনার কথাগুলো শুনলো মিনি-চিনি। মিনিই বললো,

—'ছাড়িয়া মুখের গ্রাস'.....সেই ঈশপের গল্প আর কি! যাক্

গে। হয়তো বিলেতী ডিগ্রী কিছু নিয়ে ফিরবেন। স্টাডি-লিভ নিয়েছেন বোধহয়।

প্রভাতবাবু বাইরে মিনির বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন। নিমন্ত্রণ করলেন তিনি সকলকে এবং খঞ্জনাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।

মিনি তাকিয়েছিল চিনির মুখের দিকে। বললো,

—মেয়েদের মন একটা আশ্চর্য জিনিস দিদি।

—কেন?

—দাগ পড়লে আর মোছা যায় না। তুই আজও ঐ হারামজাদাটাকে ভুলতে পারলি নে!

ছিঃ মিনু! অমন করে গালাগালি দিস নে। উনি আছেন আমার মনে। থাকুন না, ক্ষতি কি?

—কেন থাকবে? কেন রাখবি তুই ঐ শয়তানটাকে মনের মধ্যে পুষে? মিনির চোখ দুটো জ্বলে উঠলো সামলে নিয়ে বললো—তোর এই স্বর্গীয় প্রেম ঊর্ধ্বগামী কর দিদি—ঈশ্বরকে উৎসর্গ কর। ঐ একান্ত অযোগ্য অর্বাচীনকে দিবি তোর এই পবিত্র প্রেম? ছিঃ!

চিনি কিছুই বললো না। একটু পরে মিনি আবার বললো,

—তোকে এতদিন বলিনি! আমি সব খবর রাখি, এখন শোন।

—বল।

—পাটনা থেকে ফিরে তিন-চারদিন পরে মিহিরদা নিমন্ত্রণপত্র পায় ডাঃ অমিতাভের সঙ্গে শুক্তির বিয়ের। জীবনটায় বীতরাগ হলো। আত্মহত্যা করা সম্ভব হলো না। আইন আছে, পুলিস আছে। তাই লম্বা ছুটি নিয়ে চলে গেছে হনলুলু—পড়তে। এটা শুক্তিকে না পাওয়ার জন্য মনঃক্ষোভ! তোর জন্য নয়, বুঝলি?

—হুঁ!

অন্তরের কোন এক আর্ততার আড়াল থেকে 'হুঁ' শব্দটা বেরুলো চিনির। কিন্তু মিনি সে-স্বর শুনলো না। তার আগেই সে রেগে ছিটকে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। অসহায় চিনি একা পড়ে রইলো উদাস হয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে।

প্রভাতবাবুর সঙ্গে খঞ্জনা বাড়ি পৌঁছালো। আজ সে মিনিকে এক নতুন

চোখে দেখছে। মিনি তার বন্ধু। কিন্তু আজ সে মিনির মধ্যে একটা বিদুষীর অস্তিত্বের আবিষ্কার করেছে। মাকে গিয়ে বললো,

—শোন মা, একটা খুব আনন্দের কথা শোন।

—কি, কি কথা রে?

—দাদার বৌ ঠিক করে এলাম।

—কাকে ঠিক করে এলি?

—মিনিকেই দাদার বৌ করব।

—না। তা হবে না, কিছুতেই না। ও-কথা একদম বলিস নে। ওর নামে 'ঞ্জ' নেই।

—আছে। মিনি কি নাম হয় নাকি। আমার নাম খঞ্জনা? ওটা ডাক নাম। যেমন আমার ভালো নাম 'কুঞ্জলতা', তেমনি মিনির ভালো নাম 'মঞ্জুশ্রী'।

—অ্যাঁ! বলিস্ কি? সত্যি?

—হ্যাঁ। এখন কি করতে চাও বল? দেরি করলে তোমার 'ঞ্জ' চলে যাবে অন্য কারও বাড়ি। যত তাড়াতাড়ি পার ওকে ঘরে আনো।

—খুব ভালো। ও মেয়ে তো দেখা। তুই ওর মাকে বল যে, আমরা মঞ্জুশ্রীকে বৌ করতে চাই। তাঁরা রাজী হলেই হবে।

—খুব ভালো! আমি এখনি বাবাকে গিয়ে বলছি।

খঞ্জনা বাবার কাছে গেল। ওকে দিবাকরবাবু বললেন,

—হাসছিস কেন রে খঞ্জনা? কি হলো?

—মাকে ঠকাতে হবে বাবা! মিনিকে আনতেই হবে দাদার বৌ করে আর ভঞ্জ যখন দাদার উপাধি, তখন 'ঞ্জ' তো থাকবেই ওর নামে।

—হ্যাঁ। তা এখন কি করতে চাস?

—তুমি বিমলবাবুকে ফোন করে বল তোমার প্রস্তাব। তোমার তো বিমলবাবু খুব চেনা।

—তাই তো রে! বড়ই মুস্কিলে ফেললি!

—মুস্কিল কিসের?

—আমি ছেলের বাপ। আগেই প্রস্তাবটা করব?

—আমি করছি। বললেন প্রভাতবাবু। তিনি ডায়েল ঘুরিয়ে ফোন করলেন। বিমলবাবু ফোন ধরে বললেন,

—আপনি নিশ্চয়ই দিবাকরবাবুর ছেলে অঞ্জনকে চেনেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে তো বিদেশ থেকে মুদ্রণ-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হয়ে এলো।

—হ্যাঁ। এখন আমার প্রস্তাব, আপনার ছোট মেয়ে মিনির সঙ্গে তার বিয়ে দিলে কেমন হয়? রাজী হবেন কি আপনি?

—কি বলছেন! রাজী হবো না কেন? এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।

—তাহলে প্রস্তাবটা আপনি দিবাকরবাবুর কাছে করুন।

নিশ্চয়ই করব। বাকিটা...

—বাকিটা আমি ঠিক করব।

বিমলবাবুকে প্রভাতবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন। ফোনটা তিনি রেখে দিতে গেলে খঞ্জনা বিমলাবাবুকে বললো,

—শুনুন কাকাবাবু। আপনি আজ বিকালে আমাদের বাড়ি এসে বাবা-মা'র কাছে প্রস্তাবটা করবেন। আর আমার একটা প্রার্থনা....

—বল। কি করতে হবে?

—আপনি মাকে বলবেন, আপনার মেয়ের ডাক নাম 'মিনি' ভালো নাম মঞ্জুশ্রী। নইলে সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

—ও! তাই নাকি? কেন?

—কারণ, আমার মা'র বাতিক, নামের মধ্যে 'ঞ্জ' চাই। না থাকলে সে মেয়েকে মা ঘরে নেবে ন। ওর নাম মিনতি না হয়ে মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুবালা হোক।

—আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে মা।

ফোনের এধারে হাসছেন বিমলবাবু এবং ওধারে আর সকলেই। প্রভাতবাবু বললেন,

—তোমার নাম কি তারই জন্য কুঞ্জলতা হয়েছে?

—হ্যাঁ। মা রেখেছেন কুঞ্জলতা। বাবা রেখেছেন মঞ্জুলতা, আর দাদু নাকি রেখেছিলেন গুঞ্জমালা। সব 'ঞ্জ'-এর ছড়াছড়ি। সবই আমাদের গৃহ-দেবতা শ্রীশ্রীকরঞ্জাক্ষ মহাদেবের কৃপায়।

—সত্যিই কৃপা। আমারও ছেলের নাম রঞ্জিতকুমার, আর আমাদের গ্রামের নাম রায়গঞ্জ। কি চমৎকার যোগাযোগ। উপাধি পাঞ্জা।

—ওই শুনেই মা তো অমন চট্‌পট্ রাজী হয়ে গেলেন।

বলেই খঞ্জনা পালালো।

দিবাকরবাবু আর প্রভাতবাবু হাসতে লাগলেন।

হনলুলুতে রয়েছে মিহির। কি একটা বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করছে। ভারতের খবর সে ভালোই রাখে। নিজেকে অতিশয় দীন মনে হয় তার।

চিনিকে হয়তো প্রভাতবাবু গ্রহণ করেছেন। যতটা শুনে এসেছে তাতে মিহিরের স্থির বিশ্বাস, প্রভাতবাবুই চিনিকে বিয়ে করবেন। এই কারণে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সে প্রভাতবাবুর সঙ্গে দেখা করেনি। মিনির মুখে প্রভাতবাবু যেটুকু গুণগাণ শুনেছেন তাই যথেষ্ট।

আজ নামকরা একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় একখানা বই-এর সমালোচনা পড়লো মিহির। লিখেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না একজন মনীষী। বইখানির নাম 'লোকসাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা'। লেখিকা চিন্ময়ী দেবী। প্রকাশক প্রভাতরঞ্জন পাঞ্জা, রায়গঞ্জ, ইণ্ডিয়া, মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র, ইত্যাদি।

প্রভাতবাবুর সেই সংগৃহীত লোক-গাথা থেকে তাহলে চিনিই লিখলো প্রবন্ধ, যা মিহিরের কল্পনায় ছিল। না, কল্পনাটা চিনিরই। এ ভালোই হয়েছে। চিনিকে গ্রহণ করেছেন প্রভাতবাবু। উপস্থিত হয়তো চিনি আরোগ্য লাভও করেছে।

যাক্! চিনির বিষয়ে আর কিছু ভাবনার নেই মিহিরের। সন্তোষের কাছে এখন বলতে পারবে সে নির্দোষ। প্রভাতবাবুর উদয় মিহিরের উপকারের জন্যই। এতটা ভেবেও কিন্তু মিহির তার ঈর্ষাটা জয় করতে পারলো না।

প্রভাতবাবু না এলে নিশ্চয় মিহির আবার চিনির কাছে যেতে পারতো। হয়তো তাকে জীবনসঙ্গিনী করতে পারতো। চিনি তাকে নিশ্চয় ভুলে গেছে। কিন্তু কৈ, মিহির তো তাকে ভুলতে পারছে না এত চেষ্টা করেও?

হিসাব করে দেখলো মিহির, প্রায় দু'বছর সে দেশ ছাড়া। এখানকার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অতঃপর দেশেই যাবে, নাকি ইউরোপ বা আমেরিকায় যাবে ভাবছে। নিজের দেশ ভারত থেকে অনুরোধ এসেছে যে, সে একটা সম্মানিত সরকারি কাজ পেতে পারবে। এখন তো আর দেশে যেতে তার

কোনো বাধা নেই। যাওয়া উচিত। দেশে তার কেউ না থাকলেও দেশমাতৃকা তো আছে। মনস্থির করল, দেশেই ফিরবে মিহির।

সঙ্গীহীন জীবনের বিড়ম্বনা বিস্তর। বিশেষত মিহিরের মতো কাব্যানুরাগী যুবকের পক্ষে। কিন্তু সঙ্গী অনায়াসে জুটিয়ে নিতে পারে। এখানেই তো শেলী, লোরা, ডোরা, ডালিয়া, কয়েকজনই রয়েছে। তাদের কাউকে বিয়ে করে দেশে ফিরলে কেমন হয়? তাহলে চিনির উপর একটা প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

কিন্তু মিহিরে চিন্তাশীল মন তৎক্ষণাৎ ভাবলো, চিনির উপর প্রতিশোধ কেন সে নেবে? চিনি তো কোনো অপরাধ করেনি! মিহিরই তাকে বঞ্চনা করেছে।

প্রতিশোধটা বরং শুক্তির উপর নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে শুক্তির কি এসে যাবে? কিছুমাত্র ক্ষতি সে অনুভব করবে না। বরং হাসবে। বলবে, স্বদেশে আর কোনো মেয়ে পেল না মিহিরদা। শেষে বিয়ে করলো এক বিদেশিনীকে। না, এরকম কিছু করবেনা মিহির।

মিস্ ডোরা হান্টার এসে অভিবাদন জানালো। মিহির তাকে অভর্থনাও করলো। বললো,

—এস মিস্ ডোরা। তোমার ক্যামেরায় আমার ছবি কি ধরেছে?

—হ্যাঁ, অনেকগুলো। প্রায় ডজনখানেক হবে। নানা ভঙ্গিতে।

—ওগুলো কি করবে?

—এ্যালবামে থাকবে আমার ভারতীয় বন্ধুর স্মৃতি হিসাবে।

—স্মৃতির মূল্য শুধু ব্যথা-বেদনায় ভরা। ওসব রাখতে নেই ডোরা।

—স্মৃতি তো মধুময়ই হয়।

—না, হয় না। সর্বত্র সকলের মনেই স্মৃতির বেদনা জড়ানো। ও রেখো না। রাখলে দুঃখ বাড়বে।

—এ দুঃখ মহান। এই দুঃখকে মানুষ ছাড়তে চায় না বন্ধু। তাই স্মৃতি রাখে মনে, ঘরের কোণে, দেশের প্রকাশ্য স্থানে, সাহিত্যে, ইতিহাসে, গল্পগাথায়। ডোরা কথাগুলো বললো আবেগময় কণ্ঠে।

মিহির বললো,

—দুঃখ, দুঃখই। তাকে মহান বলে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করো না। যে

স্মৃতি ব্যক্তিগত, তা সর্বত্রই দুঃখের। যখন আমি চলে যাব, তখন হনললুর স্মৃতি আমার মনকে পীড়াই দেবে ডোরা।

—তাই তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে চাও?

—ভুলতে পারলে তো ভালো হয়।

ডোরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো,

—ভোলা তো যায় না বন্ধু।

—না। কিন্তু ভুলে যাওয়াটা আমি আশীর্বাদ মনে করি।

—তুমি আমাদের সকলকে ভুলেই যাবে বন্ধু। এ সত্যটা এমন করে না বললেই তো ভালো হতো। ভুলে যদি ভালো থাক, তবে ভুলে যেও, কিন্তু যাদেরকে ভুলবে তাদের নাই-বা জানালে সে-কথা। তোমার মন শক্ত মন তাদের নাও হতে পারে।

ডোরার অনুযোগটা কোনদিক দিয়ে যাচ্ছে বুঝলো মিহির। বললো,

—তোমাদের কথা বলছিনে ডোরা। স্মৃতি ভোলা যায় না, তাই বলছি। সুস্থ কোনো মানুষের পক্ষে স্মৃতিকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। আর এই স্মৃতি বেদনাই বাড়ায়। একে পরিহার করা অসম্ভব। যাক্, এবার অন্য কথা বল।

—অন্য কথা কি আর বলব। তোমার যাবার দিন কি ঠিক হয়েছে বন্ধু?

—না। বোধহয় এই মাসের শেষের দিকে যাব।

—ভারতে?

—হ্যাঁ।

—গিয়ে নিশ্চয়ই বিয়ে করবে?

—না।

—বাকি জীবনটা কাটাবে কি করে?

—এ জীবনটা কুমার থেকে যেতে চাই।

—কেন?

—কারণ, আমি একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিলাম। একটি অসহায় ইনভ্যালিড্ মা-বাপ-হারা মেয়ে।

ভালোবেসেছিলে এক ইনভ্যালিড্ মেয়েকে?

—হ্যাঁ। তাকে 'ভালোবাসি' বলতে আমি গর্ববোধ করতাম। কিন্তু আমার সে গর্ব চূর্ণ হয়ে গেছে।

—কি জন্য?

—অন্য একটা মেয়ে আমাকে মোহগ্রস্ত করেছিল তার রূপযৌবনের হাত ছানিতে। তার অর্থগৌরব, তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা, তার কৌলিন্য, আমার এই পবিত্র প্রেমে পদাঘাত করেছে। আমি অমানুষ!

—সে-মোহ তো এখন ভেঙেছে তোমার?

—হ্যাঁ। কুকুরের মতো লাথি মেরে ভেঙে দিয়েছে সে।

—ভালো এখন সেই পবিত্র প্রেমাস্পদা ইনভ্যালিড্ মেয়েটিকে গ্রহণ করো গে!

—তার কাছে যাবার মুখ আমার নেই ডোরা। কোন লজ্জায় যাব। তার ওপর আর হয়তো আমার অধিকারও নেই। সে এখন হয়তো অন্যের অঙ্কশায়িনী।

ডোরা শুনে গেল। কিছু আর বললো না। তার নিজের যেটুকু আশা ছিল তা নির্বাপিত হয়ে গেছে। কাজেই একটু পরে সে বিদায় নিল।

মিহির ইচ্ছে করেই কথাগুলো বললো ডোরাকে। চিনির মধ্যে আশা জাগিয়ে সে অপরাধ করেছে। আর কারো মনে কোনো আশা জাগাবে না সে। সে এখন কঠিন-কঠোর বুক-ওয়ার্ম হয়ে যাবে। জীবনের রসকষ সবই ঢেলে দেবে পড়াশুনায়—পঠন-পাঠনে, শিক্ষায় আর শিক্ষকতায়। জ্ঞান অর্জনে, আর জ্ঞান বিতরণেই হোক এখন তার জীবনের স্থিতি।

মিহির যথারীতি দেশে ফিরবার আয়োজন করলো। নির্দিষ্ট দিনে রওনা হয়ে ফিরে এলো দেশে। স্বদেশের স্নিগ্ধ শ্যামলতা ওকে ডাকছে।

সমুদ্রতরঙ্গের দেশ হনলুলুকে ভালই লেগেছিল মিহিরের। কিন্তু দুয়ের মধ্যে তফাৎ অনেক। সেটা মোহ, যেন ঐ যৌবনের হাতছানি। আর এটা প্রেম, অবিনশ্বর, অবিস্মরণীয়।

দিবাকরবাবুকে চিঠি লিখেছিল ফিরে আসার সংবাদ দিয়ে। তার ফ্ল্যাট ঠিক করাই ছিল। এ যাবৎ ভাড়া দিয়ে আসছে সে ঠিকমতো। এরোড্রাম থেকে সোজা এসে সে উঠলো তার ফ্ল্যাটে।

মিহির ভেবেছিল, কেউ না এলেও অন্ততঃ খঞ্জনা আসবে অভ্যর্থনা করতে। কিন্তু কেউ এলো না। শুধু দিবাকরবাবু নীচে ছিলেন, বললেন,

—এস মিহির, এস। শরীর ভালো তো? ওদেশের শিক্ষা শেষ হলো?

—হ্যাঁ। শরীরও ভাল।

—আচ্ছা, এবার যাও, বিশ্রাম করো গে।

নিজের ফ্ল্যাটে এসে ঢুকল মিহির।

ছোট্ট ফ্ল্যাট মিহিরের। মাত্র দু'খানা ঘর নিয়ে সে থাকে। সবই ঠিক আছে যেখানে যা ছিল। শুধু ধূলো জমেছে সর্বত্র। ঝাড়ু দেবার কেউ তো নেই। ঘর বন্ধ না থাকলে দিবাকরবাবু ঘরখানা নিশ্চয় পরিষ্কার করিয়ে রাখতেন। যাক, এখন মিহির নিজেই সব করে নেবে। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই ক্লান্তিকর, বিরক্তিকর বটে।

বারান্দায় দিবাকরবাবুর চাকরটাকে হঠাৎ দেখতে পেল মিহির। তাকে দেখেই বললো সে,

—ঘরটা একটু ঝেড়ে-মুছে দিবি?

—আজ্ঞে দাদাবাবু, চাবি ছিলনি। পেলে করে রাখতাম। আমি এখনি সব করে দিচ্ছি, আপনি বারান্দায় এসে বসেন।

—না। আমি বাইরে যাচ্ছি। তুই ঝাঁট দিয়ে রাখ।

মিহির চলে গেল তার লাগেজগুলো তোলবার জন্য। ফিরে এসে দেখলো সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন দিবাকরবাবু পত্নী রঞ্জিতা দেবী। মিহির প্রণাম করলো তাঁকে। রঞ্জিতা দেবী বললেন,

—এস। বেশ ভালো ছিলে তো?

—হ্যাঁ। খঞ্জনা কোথায়?

—শ্বশুরবাড়িতে। ওর একটা খোকা হয়েছে।

—বাঃ! শুনে খুব সুখী হলাম। কোথায় শ্বশুরবাড়ি? আমি দেখতে যাব খোকাকে।

—যেও। খঞ্জনার শ্বশুরবাড়ি কলকাতায় নয়। পশ্চিম দিনাজপুর—রায়গঞ্জে।

—জামাই কি করেন?

—জামাই সরকারি শিক্ষাবিভাগে কাজ করে।

—বাঃ! আপনি কথামতোই কাজ করেছেন—'ঞ্জ' আছে।

হাসছে মিহির। কিন্তু গম্ভীর হয়ে রঞ্জিতা দেবী বললেন,

—হ্যাঁ। আর বৌ করেছি মঞ্জুমালাকে। মানে, তোমার ছাত্রী মিনিকে।

—বলেন কি! কৈ সে?

—বাপের বাড়িতে আছে। ওর দিদি কি একটা বই লিখে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেল, তাই দেখতে গেছে।

মিহির আর কিছু শুধালো না। রঞ্জিতা দেবীও আর কিছু বললেন না।

সংবাদপত্রে মিহির জানতে পারলো, বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লেখক-লেখিকাকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বাংলার চিন্ময়ী দেবী পুরস্কার পেয়েছেন দশ হাজার টাকা, 'লোকসাহিত্যে আধ্যাত্মিকতা' বইখানির জন্য।

কাগজে চিন্ময়ীর একটা ছবিও ছাপা হয়েছ তার সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ। তাতে চিন্ময়ী কুমারী কি বিবাহিতা কিছু লেখা নেই। শুধু লেখা আছে তার পঙ্গুত্বের কথা এবং সেই অক্ষমতাকে অতিক্রম করেও তার আশ্চর্য জীবনীশক্তির কথা, যার বলে সে এই পুরস্কার লাভ করলো।

চিনিকে অভিনন্দন জানানো উচিত। ভাবছে মিহির। জানাবার অধিকার কি আছে তার এখনও? প্রশ্নটা ঘুরে ঘুরে আসছে মনের মধ্যে।

নীচে মোটর থামার শব্দ শুনে জানলা দিয়ে দেখলো মিহির, মিনি নামছে।

একটু পরেই উপরে এলো মিনি। সটান মিহিরের ঘরে। ওকে দেখে মিহির বললো,

—এসো। ভালো আছো? বাড়ির সব ভালো?

—হ্যাঁ। আপনি ভালো তো? আপনার ওখানকার কাজ শেষ হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। কাগজে দেখলাম, তোমার দিদি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেল। খুব আনন্দের কথা।

—ধন্যবাদ।

মিনি আর কিছু বললো না।

মিহিরও অন্য কোনো প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ বোধ করছে। কিন্তু এবার মিনি চলে যাবে। তাই কিছু একটা বলা উচিত ভেবে মিহির প্রশ্ন করলো,

—প্রভাতবাবু কি কোনোরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন?

—কার জন্য?

—চিনির জন্য।

—চিনির জন্য? কি সব বলছেন আপনি? তিনি কেন চিনির জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে যাবেন?

—প্রভাতবাবু চিনিকে বিয়ে করেননি?

—আশ্চর্য মানুষ আপনি! কি আবোল-তাবোল বলছেন? আপনি ভেবেছেন, আপনার মেকি প্রেমের প্রতিশোধ নিতে দিদি বিয়ে করেছে প্রভাতবাবুকে! শুনুন, প্রভাতবাবু খঞ্জনার শ্বশুর—আমাদের পূজনীয় কাকাবাবু। বয়স তাঁর পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। বর্তমানে তিনি নাতির ঠাকুরদা হয়েছেন।

মিহিরের মুখখানা ছাই-এর মতো সাদা হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি বললো,

—আমি জানতাম না মিনু, কিছুই জানতাম না। আমায় মাফ কর তুমি।

—মাফ! মাফ আপনাকে কোনোদিন আমি করব না। না জেনে দিদির সম্বন্ধে এমন ধারণা করেন কি করে? আপনার মত শঠ-লম্পটকে ভালোবেসে আমার সুদ্ধ-সুন্দর, সতী-সাবিত্রী দিদি শীতের পদ্মের মতো ঝরে গেল। প্রেমের দেবতা যেন আপনাকে মাফ করেন। আমি করবো না-কোনোদিনও না।

চলে গেল মিনি সদম্ভে।

চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়লো মিহির। সমস্ত হৃদয়-মন তীব্র একটা আনন্দের মাদকতায় আচ্ছন্ন হয় উঠেছে। অপ্রতিরোধ্য তার গতি অবসন্ন করে দিয়েছে মিহিরকে।

এর জন্য মিহির মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বরং উল্টোটাই সে আশা করেছিল। নিজেকে সামলাতে যথেষ্ট সময় লাগলো তার।

এখন ইতিকর্তব্য স্থির করতে হবে। কর্তব্য তো স্থির করাই আছে—চিনিকে বিয়ে করা, আর কথাও পাকা হয়েই আছে। কিন্তু মিনি যা বলে গেল, কে জানে, চিনি যদি তাকে অবিশ্বাস করে, যদি আর মিহিরকে গ্রহণ করতে না চায়? চিন্তার কথা।

চিনি তো এখন সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা। কে জানে, কোন্ অজ্ঞাত রহস্য লুকানো আছে তার ভবিষ্যতে? হয়তো যোগ্যতম কোনো ব্যক্তি আসবেন চিনিকে গ্রহণ করতে। না, না, এসব কি ভাবছে মিহির।

মনকে তীব্র তিরস্কার করলো মিহির, মিনির কথাগুলো মনে করে ঃ'আপনার মতো শঠ-লম্পটকে ভালোবেসে আমার শীতের পদ্মের মতো ঝরে গেল'।

চিনি যে কেমন আকুল ভাবে অপেক্ষা করছে মিহিরের জন্য, তা এই কথা কটাতেই প্রকাশ পেল। চিনি তাকে ভোলেনি, ভুলবে না, ভুলতে পারে না।

চিনিকে একটা অভিনন্দন নিশ্চয় জানানো উচিত মিহিরের। উচিত ছিল তার অনেক আগেই এটা জানানো।

উত্তেজনায় উঠে পড়লো মিহির চেয়ার ছেড়ে। কয়েক পা এগুলো দিবাকরবাবুর ঘরের দিকে। ইচ্ছে, ফোন করবে। কিন্তু সরাসরি চিনির সঙ্গে কথা বলতে সাহস হলো না মিহিরের। ফিরে এসে চিনিকে চিঠি লিখতে বসল ঃ

কল্যাণীয়াসু,

আশা করি ভালো আছ। আমি কাল ফিরেছি। সংবাদপত্রে তোমার সাফল্যের সংবাদ পেয়ে পরম আনন্দ পেলাম। উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করে জীবন ও জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত কর। ইতি—

মিহির

চিঠিখানা লিখে বার দুই পড়ে ডাকে ছেড়ে দিল মিহির। তারপর যোগ দিল গিয়ে তার নবলব্ধ চাকরিতে।

চিনির সঙ্গে দেখা করতে যাবার দুঃসাহস মিহির অর্জন করতে পারছে না। যদিও জেনেছে, চিনির প্রেম অটুট, অভেদ্য ও অবিচ্ছেদ্য। তবু মনে হয়, মিহির নিজে অপরাধী, অবিশ্বাসীও। কোন্ মুখে সে যাবে?

মিহিরের ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন। ডাকে একখানা নিমন্ত্রণপত্র এলো। মিনি আর হিরণ তাদের দিদিকে অভিনন্দিত করবে, এ তারই নিমন্ত্রণ!

উত্তম সুযোগ। মিহির এই নিমন্ত্রণটা গ্রহণ করবে এবং যাবে চিনিকে দেখতে। এই অজুহাতে হয়তো চিনির সঙ্গে আবার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে পারে। না উঠুক, চিনিকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছে হয় তার। সেই ইচ্ছেটা অন্তত পূরণ হবে।

কে জানে, কেমন আছে চিনি? হয়তো আরো রোগা হয়ে গেছে সে। হওয়াই স্বাভাবিক! কারণ, পড়াশুনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয় তাকে।

খবরের কাগজে রবিবাসরীয় সংখ্যায় চিনির লেখা একটি ভালো প্রবন্ধ বেরিয়েছে। সেটা পড়েছে। যথেষ্ট পড়াশুনা না করলে ওরকম উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ লেখা যায় না।

চিনির প্রতিভা আছে। মিহির হয়তো তাকে আরো কিছুটা এগিয়ে দিতে

পারতো। শারীরিক অক্ষমতাকে নিজের সুস্থ-সবল দেহ-মন দিয়ে পূর্ণ করতে পারত। কিন্তু তা আর হবার নয়। তবু এই নিমন্ত্রণের সুযোগ গ্রহণ করবে মিহির।

মিহির উত্তর দিল পত্রটার। যাকে বলে আর. এস. ভি. পি.। লিখলো, সে যাবে। আসবেন লিখেছেন। কে আসবেন না গুণে একটা লিষ্ট করে খাবারের আয়োজন করতে হবে। মিহিরের নিমন্ত্রণ গ্রহণের পত্রটা দেখল মিনি।

সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠলো মিনির। বললো,

—শুনেছিস দিদি! তোর উনি আসছেন।

—কে?

—সেই শয়তান, সেই ভন্ড কাপুরুষটা। সেই মিহির নামক শয়তান জানোয়ারটা।

—ওসব কথা থাক মিনি। কি লিখেছেন তাই বল।

—লিখেছেন আসবেন। স্পর্ধা বটে। কোন সাহসে আসবেন তাই ভাবছি।

—নিমন্ত্রণ করেছিস তো! তাই আসবেন লিখেছেন। অপরাধটা কোথায়?

—আমাদের কর্তব্য, তাই নিয়ন্ত্রণ করেছি। এ বাড়িতে ওর ঢোকাই অপরাধ।

চিনি আর কিছু বললো না।

মিনি তাকিয়ে দেখলো চিনির দিকে। চিনি নিঃশব্দে চেয়ে আছে আকাশের পানে। সে সখেদে বললো,

'এত প্রেম সখী এত ভালোবাসা
কেমনে আছে সেপাশরি—
সেথা কি বহে না মলিন সমীর
সেথা কি বাজে না বাঁশরী!'

চিনির চোখে জল টল্‌টল্ করছে চেয়ে দেখলো মিনি। উঠে এসে ও দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো চিনিকে নিবিড়ভাবে। কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে বললো,

—আমি ওকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিনে দিদি।

—কেন পারছিস নে?

—তোর এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে যে তোকে এমনি করে বঞ্চিত করলো, তাকে ক্ষমা করা যায় না—যায় না দিদি।

শান্তকণ্ঠে চিনি বললো মিনিকে,

—করিস নে ক্ষমা। কিন্তু তার অপরাধ নেই!

—নেই!

—না।

—কেন?

—কারণ আমার মতো অক্ষম একটা মেয়ে কারও জীবনসঙ্গিনী হতে পারে না মিনু। তিনি ঠিক করেছেন। আমি বরং সর্বান্তঃকরণে চাইছি তিনি বিয়ে করুক; করে সুখী হোন। আমার ভালোবাসা আমার কাছে—আমারই থাক।

মিনি নির্বাক হয়ে রইল। নিঃশব্দে নীচে চলে গেল। বুঝলো, মিহিরের উপর চিনির কোনো অভিযোগ নেই, কোনো অনুযোগও নেই। আপন ভাগ্য নির্বিকার চিত্তে মেনে নিয়ে চিনি প্রিয়তমের সুখই চায়। আর কোনোদিন কোনো ব্যথা দেবে না মিনি চিনিকে; ঠিক করলো মনে মনে।

সেদিন ছাদের উপর আয়োজন করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রিতের সংখ্যা বেশি নয়। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবীর মধ্যে ডাঃ সত্য রায়, শুক্তি, অমিতাভও আছেন। আর বাইরের লোকদের মধ্যে কয়েকজন সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন। প্রধান অতিথি প্রভাতবাবু।

সবাই এসে পৌঁছলেন একে-একে। সব শেষে এলো মিহির। বসলো এক কোণায়।

উদ্বোধন সঙ্গীত হলো। আমোদ-প্রমোদ হলো। উপস্থিত ব্যক্তিদের ভাষণও যথানিয়মে ভাষিত হলো।

সব শেষে সভাপতি মিহিরকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

মিহির বললো—আমার কিছু বলবার নাই। এই পরিবারের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়। শ্রীমতী চিনির প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ওকে জীবনের সাথী করতে চেয়েছিলাম। সম্মতিও পেয়েছিলাম। তারপর কি কুক্ষণে জানি না, আমি মোহগ্রস্ত হই। সে মোহ আমার ভেঙেছে। আর আমি জানতে পেরেছি, আমার ওপর চিনির ভালোবাসা আজও অপরিমান। আমি অপরাধী। আপনাদের সকলের কাছে আমার অপরাধ স্বীকার করে মার্জনা চাইছি। আর সেই সঙ্গে প্রার্থনা করছি, আপনাদের সকলের শুভেচ্ছায় যেন আমি চিনির

যোগ্য হতে পারি—জীবনের, জন্মান্তরের সাথীরূপে, তাকে যেন লাভ করতে পারি।

চিনি পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। কথাগুলো সে সবই শুনলো। সকলেই চেয়ে আছে তার দিকে। কেউ কোনো কথা বলছে না। ডাঃ সত্য রায়ই হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠলো,

—থ্রি চিয়ার্‌স্ ফর.....

না, না, ইংরেজি নয়। বাংলায় বলা হোক, আমরা সর্বান্তকরণে দম্পতীর শুভকামনা করি।

আকাশ ছেয়ে মেঘ উঠেছে। চৈত্র-বৈশাখের কর রৌদ্রের পর মেঘমেদুর আকাশ। বৃষ্টি হতে পারে। তাই অতিথিদের মধ্যে কে একজন বললেন,

—বৃষ্টি আসছে। এবার চল সব। মধুরেণ সমাপয়েৎ তো হলো। এবার বাড়ি চল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এবার চল সব।

সবাই চলে যাচ্ছে! শেষে মিনিও যাচ্ছে। যাবার সময় সে মিহিরকে বলে গেল,

—আজ আপনাকে ক্ষমা করলাম।

মিহির এগিয়ে এসে ধরলো চিনির হাতখানা—দুর্বল, অসুস্থ হাত। সাদরে হাতটা টেনে নিয়ে বললো,

—বৃষ্টি আসবে, ঘরে এসো।

চিনি কোনো কথা কইতে পারছে না। অনেক চেষ্টা করে বললো,

—আমাকে দিয়ে কি কাজ হবে?

—না-হয় না হবে। তবু আপনার ধন কেউ ফেলে দেয় না। চল, তোমায় ঘরে নিয়ে যাই।

আর আপত্তি করলো না চিনি। হাত ধরেই ওঁকে ঘরে আনলো মিহির বললো,

—কাল আবার আসব।

বেরুচ্ছে মিহির। চিনি দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওকে একটু আলতো ভাবে ছুঁয়ে মিহির এগুলো। দৃষ্টি তখনও ওর পানে।

আকাশ জোড়া কাজল-কালো মেঘ। হঠাৎ তারই বুক চিরে নিমেষের চোখ ধাঁধানো একটা আলোর ঝলকানি। পরমুহূর্তে তীব্র বজ্রপাত—কক্কড়—কক্কড়—কড়াৎ।

চমকে উঠলো মিহির। চিনিও। পঙ্গু চিনি ভুলে গেছে সে পঙ্গুত্ব। ছুটে এসে সে ধরে ফেললো মিহিরকে।

—না-না। তুমি যেও না, যেও না।

বলে, চিনি আতঙ্কে দু'হাত দিয়ে সবলে জড়িয়ে ধরলো মিহিরজেক। মিহির আশ্চর্য হয়ে গেল। বললো,

—একি! তুমি ছুটে আসতে পারলে?

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য তো! কী করে এটা সম্ভব হলো চিনি?

—তাই তো ভাবছি।

—কোনোদিন তো ডান-অঙ্গে কোনও কাজ করনি?

—না। ছোটবেলায় ডাক্তারের নিষেধের পর থেকে ডান-অঙ্গ চালাবার চেষ্টাই করিনি। ভয় করতো।

—ঐ ভয়টাই তোমাকে এতকাল ভুগিয়েছে। বজ্র আজ তোমার ভয়ঙ্কর ভয়টুকু ভেঙে দিল। বজ্রকে ধন্যবাদ। এসো, আমরা ওই সূর্যদেবতাকে প্রণাম জানাই।

চিনি সত্যিই সুস্থ মানুষের মত দু'হাত তুলে নমস্কার জানালো সূর্যদেবকে।

আকাশে তখন বিদ্যুতের দীপ্তি মৃদু-মৃদু হাসছে।

জীবন-রুদ্র

আঁধার আকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠছে! রাত শেষ হয়ে গেল। গভীর একটা শ্রান্তি থেকে যেন জেগে উঠলো পৃথিবী—মানুষের ঘুম ভেঙেছে! মানুষের ঘুম ভেঙেছে সাইরেণের করুণ কান্নায়,এরোপ্লেনের কর্কশ আওয়াজে আর এ্যাটম্-বোমের মৃত্যু-রশ্মিতে। জাগ্রত প্রতীচ্য রণশ্রান্ত জন্তুর মত হাঁফাচ্ছে আর নব জাগ্রত প্রাচ্য জেগে উঠেই দেখছে—সে নগ্ন, সে নিরন্ন, সে শোষিত এবং শাসিত, তবু কিন্তু নিঃসংশয়ে বলা চলে—পৃথিবীর ঘুম ভেঙেছে।

ঘুম ভাঙা এই প্রভাতের একটি অম্লান সৌন্দর্য্য আছে—অমৃত-মধুর সঙ্গীত আছে, কিন্তু উপভোগ করবার লোক কোথায়? জীবন-রুদ্র জটাজুট আলোড়িত করে জেগে উঠেছেন—ঝড়-ঝঞ্ঝার উদ্দাম নৃত্যের আভাস আশঙ্কিত করে তুলছে মানুষের শান্ত জীবনকে—সেই কথাই ভাবছিল আলোকনাথ।

আলোকনাথ আজ ছাড়া পেয়েছে জেল থেকে—গ্রামের বাড়ীতে ফিরছে। মনে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগবার কথা, কিন্তু ওর আশাবাদী মন আজ নিরাশার অন্ধকারে। মানুষের জীবন জেগেছে—কিন্তু এ জাগরণকে অভিনন্দিত করবে কে? মাতা পৃথিবী সন্তানের মৃত্যুবাণে জর্জরিতা—অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা;—প্রিয়া প্রকৃতি তার অন্তরের গুপ্ত সম্পদ-হারা—বৈজ্ঞানিকের ক্ষুদ্রতম গবেষণাগারে বন্দিনী—আর আত্মীয়-পরিজন, গ্রাম,

দেশ আজ সর্ব্ব-সম্পদহারা নিরন্ন, বস্ত্রহীন, ভিক্ষুক—এই জাগরণকে অভিনন্দিত করবে কে আজ!

আলোকনাথ তথাপি মনের আশাকে উজ্জীবিত রেখে এগিয়ে আসছে। আর ক্রোশখানেক গেলেই গ্রাম—কিন্তু তার আগে ঐ রতনপুর গ্রামটা পার হতে হবে—ওরই পরে নদী—তারপর খানিকটা ফাঁকা মাঠ, তারপর দেখা যাবে চঞ্চলার তালীবন, আম্রকুঞ্জ আর উচ্চশীর্ষ শিবমন্দির! দীর্ঘ তিন বৎসর পরে আলোকনাথ আজ দেখতে পাবে সেই আজন্মের পরিচিত জন্মভূমি—আপনার অজ্ঞাতসারেই ওর পায়ের গতিবেগ বেড়ে গেল!

রতনপুর গ্রামটা এখনো ভালো করে জাগে নি। শীতের প্রত্যূষে—ধানকাটা শেষ হয়ে গেছে—চাষীর দল তাই হয়তো আরাম করছে বিছানায়—আলোকনাথ তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললো—তাহলে সুখে আছে গ্রাম, সুস্থ আছে দেশ, সুন্দর আছে তার আপন জন! ভাল—তার দেশের মানুষগুলি! গ্রামের মাঝামঝি এসে পড়লো আলোক—কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না; কেউ কি উঠে তামাকও সাজে না আজকাল আর? শীতের ভোরে খড়কুটো জেলে আগুন পোয়াবার রেওয়াজ কি এই তিনটা বছরের মধ্যেই উঠে গেছে! —কিম্বা?…

আলোকনাথ ভালো করে চেয়ে দেখলো গ্রামের ঘরগুলোর পানে—ও হরি—সবই যে ভাঙা ভিটে, পরিত্যক্ত শ্মশান, পরিজনহীন শবদেহ! কি হোল, এই এত বড় গ্রামটার হোল কি এই তিনটি বছরের মধ্যে! মন্বন্তরে মরেছে? নাকি, মারণাস্ত্রের আঘাতে উড়ে গেছে? অথবা—না, কিছুই ঠিক করতে পারছে না আলোকনাথ!

কর্কশ শব্দে দুখানা এরোপ্লেন উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে—তবে কি এখানটায় এরোপ্লেনের মাঠ তৈরী হয়েছে? হয়েছে তো কোথায় সেই মাঠ? আলোকনাথ কিছুই দেখতে পেল না কোনোদিকে! এগিয়ে

আসছে—ছোট গ্রামের ছোট জমিদারের পাকাবাড়ীর কাছে এসে পড়লো—গ্রামের মধ্যে এই একখানি মাত্র পাকাবাড়ী—কিন্তু কেউ তো নেই? নিস্তব্ধ, নিচালি বাড়াখানা যেন গভীর দুঃখে মহাসমাধি লাভ করেছে; ওর সাড়া পাওয়া যাবে না!

উঠে এলো আলোকনাথ বাড়ীর দাওয়ায়। পায়ের শব্দে কয়েকটা ইন্দুর ছুটে চলে গেল এদিক-সেদিক। দরজার কোণায় মাকড়সার জাল, —ঘরের মেঝেতে চামচিকের মল—দেওয়ালের গায়ে অব্যবহারের মালিন্য! কতদিন বোধ হয় এখানে মানুষ আসে নি! কেন? কোথায় গেল এত মানুষ? জমিদারবাবু, তাঁর স্ত্রী, পুত্র-পুত্রবধূ, অনূঢ়া কন্যা, ঝি-চাকর—গেল কোথায় সব! আলোকনাথ বাড়ীর ভেতরের উঠোনে এসে পৌঁছালো। বড় ইন্দারাটার পাশে জলতোলা দড়ি-বালতি পড়ে আছে, আর তার পাশে ডালিম গাছটায় চার পাঁচটা ছোট বড় ডালিম ঝুলছে। কেউ চুরি করতে আসে নি—আশ্চর্য্য!

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আলোক প্রায় দু'মিনিট; কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলেই এ রহস্যের কিনারা হবে না, তাই আবার সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে। নির্জ্জন, স্তব্ধ গ্রাম-পথ। বন্য লতায় গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটে রয়েছে। বুড়ো শিবতলার প্রকাণ্ড পদ্ম-করবী ঝাড়টায় থোকা থোকা ফুল—কণক ধুতুরো গাছগুলোর ফুলে ফুলে শিশির ভর্ত্তি হয়ে রয়েছে—ও শিশির নীলকণ্ঠের কণ্ঠের বিষ নাকি? ঐ বিষ খেয়ে এ গ্রামের সব লোকগুলো কি ধুলোতে মিশে গেছে? কিম্বা ঐ বিষ পান করে এরা রুদ্রের উপাসনায় চলে গেছে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট অজানা পথে—যেখানে থেকে তারা অমৃত নিয়ে ফিরবে রুদ্র-দেবতার চরণমূলে! তাদের জীবন-রুদ্র কি সত্যি জেগেছে!

কে জানে! বারোশ' বছরের পরাধীন জীবন-নাগ আজ দু'শ বছর ধরে খোলস ছাড়ছে বৈদেশিক সভ্যতাকে অঙ্গে লেপন করবার জন্য!

তাঁর জন্মগত সহজাত কবচকুণ্ডল ইন্দ্রকে দান করে সে দাতাকর্ণ হোল না —বিদেশীর কুহকে বিসর্জ্জন দিল সেই অমূল্য রত্ন—তারপর নিয়ে এলো পল্লবগ্রাহী পাশ্চাত্য শিক্ষা,—পরলো চোখ-ধাঁধানো পোষাকের পঙ্কতিলক, পাতঞ্জল-জৈমিনী-কণাদের উচ্চগ্রামে বাঁধা মনের সুরকে নামিয়ে আনলো সাইকোলজি আর সেক্সলজির গণ্ডীবদ্ধ পার্থিবতায়—বশিষ্ঠ, বাদরায়ণ, বুদ্ধের উদারনীতিকে ঠেলে দিল কুসংস্কারের বিস্মৃত রাজ্যে। আজ সে হৃতগৌরব, অপহৃত সম্পদ, অসহায়, তবু আত্মবঞ্চনার আরাম-প্রিয়তায় তার অবসাদ আসে নি—আত্মধিক্কারে সে এখনো জাগ্রত হোল না—আপনাকে সে আজো চিনতে চাইছে না—আশ্চর্য্য !

কিন্তু আশ্চর্য্য কিছুই নাই। মানুষের জীবন-রুদ্রের লীলা-নিকেতন। রুদ্র সুপ্ত থাকেন—জাগতে তাঁর বড় দেরী হয় কিন্তু যখন জাগেন তখন তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে উদ্দাম নৃত্যে প্রকম্পিত করে তোলেন পৃথিবী। জীবনের সেই রুদ্র যদি আজো না জেগে থাকেন তবে তিনি হয়তো আর জাগবেন না—দীর্ঘশ্বাস শূন্যে বিলীন হয়ে গেল আলোকের।

চঞ্চলার তালীবনের উচ্চচূড়ায় প্রভাত সূর্য্যের আলোলেখা পড়েছে, ঝিকমিক করছে। কিন্তু এখনো দূরে, অনেকটা দূরে চঞ্চলা গ্রাম। মাঝের নদীটা, তারপরে ফাঁকা ঐ মাঠগুলো, তবে চঞ্চলা গ্রাম। নদীতে জল মাত্র হাঁটু অবধি। ছোট মাছগুলো কি সুন্দর খেলা করছে স্বচ্ছ জলে! ওদের জীবন ঐ স্বচ্ছ জলের মতোই অপঙ্কিল। জীবন-সাধনায় ওরা মানুষের সভ্যতার পথকে পরিত্যাগ করেছে ; প্রকৃতির নিয়ন্ত্রিত পথেই ওদের যাত্রা, —তাই ওরা আজো অপ্রাকৃত হয়ে ওঠে নি !

আলোকনাথ নদীর এপারে এসে উঠলো। সাদা বালিতে ভিজে পা ভরে যাচ্ছে। বেশ আরাম লাগছে ওর এই বালুবেলায় হাঁটতে। ছেলেবেলার মত একটুখানি ছুটোছুটি করবে নাকি ? ঐ মাছগুলো যেমন করছে জলে খেলা! কিন্তু মাছগুলো প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে জীবনধারণ

করতে পারে, আলোকনাথ পারে না—কারণ সে মুক্ত নয়—সে নিজের প্রভু নয়, তার অন্তর তার স্বরাষ্ট্র নয়—তার বাহিরও নয় স্বরাজ। আলোকনাথ কোন্ লজ্জায় ছুটোছুটি করবে! হ্যাঁ, একদিন করতো যখন সে ছিল ছোট, ঐ মাছগুলোর মতই ছোট, অমনি অমলিন, অকলঙ্ক, অপরাধীন। অবন্তী থাকতো সঙ্গে। অবন্তী, রতনপুরের ঐ জমিদারের একফোঁটা মেয়েটা—বরাবর সে সঙ্গে থাকতো আলোকের। এই বছর তিনেকমাত্র নেই, মানে তার তের বছরের পর থেকে সে নেই আলোকের কাছে। না—আলোকই ছিল না তিনবছর। কিন্তু আজ যখন আলোক এল তখন অবন্তী গেল কোথায়! কে ছুটে এসে বলবে—জেল-ফেরৎ তোমার চেহারাখানা সুন্দর হয়েছে—ফটো তুলে রাখি।

—ফটো তুলে কি হবে?—আলোক গম্ভীর হয়ে শুধুবে।

—সৈনিকের চিত্র রাখতে হয়—ভারতের এটা আদিম দিনের নিয়ম।

অবন্তী নিশ্চয় ফটো তুলতো আলোকের। ছোট্ট এতটুকু একখানা ক্যামেরা ছিল ওর। তাই দিয়ে ও নদীর কিনারে-চলা পাখী শিকার করতো—মানে ছবি তুলতো। ওর বাবা উগ্র আধুনিক পন্থী—কিন্তু দাদা, বৌদি আর অবন্তী নিজে একেবারে সনাতন পন্থী অর্থাৎ বাপের যা হওয়া উচিৎ ছিল তাই হয়েছে ছেলেমেয়েরা—আর ছেলেমেয়েদের যা হওয়া উচিৎ ছিল, তাই হয়েছে বাপ্। কিন্তু সেই সনাতনী অবন্তী গেল কোথায়? ওরা কি দেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশে চলে গেছে? সারা গ্রামটাই কি চলে গেছে? চঞ্চলায় ফিরে সেখানকার লোকদের জিজ্ঞাসা করতে হবে। আলোকনাথ তাড়াতাড়ি চললো। ফাঁকা মাঠ—না শস্য, না বা শ্যামলাভা! শীতের দীর্ণ মৃত্তিকায় কদাচিৎ দু'একটা ঘাস। রুক্ষ গৈরিক মূর্ত্তি তবু কত সুন্দর। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত সুন্দর। হ্যাঁ—সন্ন্যাসী! অনেক যার ছিল, সে সব ছেড়ে এসেছে—ত্যাগের গৌরবে ললাট তার

দীপ্ত—নয়ন প্রশান্ত, অন্তর স্নেহ-কোমল—একটুখানি আঁচড় কাটলেই বসন্তের ফুলে আর গ্রীষ্মের রবিশস্যের প্রাচুর্য্য উপচে উঠবে—সন্ন্যাসী শুধু নয়—রাজর্ষি ও।

হাঁটতে লাগলো আলোকনাথ তৃষাদীর্ণ মাঠ অতিক্রম করে। চঞ্চলার প্রান্ত—দীর্ঘদিনের পর জন্মভূমি দেখার সৌভাগ্য—আলোকের অন্তর আনন্দে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। কিন্তু গ্রামের কোলাহল কৈ! নাকি এখনো ওদের শয্যাত্যাগের সময় হয় নি! গ্রামবাসীদের উঠবার সময় হয়েছে নিশ্চয়ই। পিছনের ঐ গ্রামটার মত এ গ্রামখানাও জনশূন্য হয়ে গেছে নাকি! আলোক ভাবতে ভাবতে গ্রামে ঢুকলো।

না—জনশূন্য হয় নি; লোকালয় রয়েছে; আস্তে আস্তে উঠছে তারা বিছানা থেকে। কেউবা দাঁতন করছে, কেউ কেউ যাচ্ছে মাঠের দিকে। আলোকনাথ সর্ব্বাগ্রে বাড়ী পৌঁছে তার মা'কে প্রণাম করতে চায়। অপর কারো সঙ্গে দেখা হলে কথা কইতে হবে—বয়োজ্যেষ্ঠ হলে হয়তো প্রণামও করতে হবে—আলোকনাথ সেটা চায় না। সর্ব্বাগ্রে ওর মা'র সঙ্গে দেখা হওয়া চাই—তাই সে এত ভোরে চলে এসেছে ষ্টেশনে নেমেই।

বনকচু গাছগুলো তখনও শুকিয়ে মরে যায় নি। পাতায় পাতায় শিশির পড়ে ঝলমল করছে মা'র হাসিমুখের মত। ওর মধ্যে দিয়ে পথ করে আলোকনাথ নিজের বাড়ীর কাছাকাছি চলে এলো—এর পর ডাক দেবে,—মা—মা!

কিন্তু এই তিনটে পুরো বছরের মধ্যে কত কি ঘটেছে! মা আছে তো ঠিক? আলোকের বুকখানা ধক্‌ধক্ করে উঠলো অমঙ্গল-আশঙ্কায়। কিন্তু সাহস সঞ্চয় করলো সে। মা নিশ্চয় বেঁচে আছে। মা না থাকলে আলোক গিয়ে দাঁড়াবে কার কাছে?—মা, মা!—আলোক ডাক দিল। দরজাটা ভাঙা, কোন রকমে বন্ধ করা আছে মাত্র। আলোক ঠেলে দিল

হাত দিয়ে। খুলে গেল দরজা। জীর্ণ কাঠ ভেঙেই গেল হয়তো। ওপাশে উঠোনটা ঘাসে জঙ্গল হয়ে গেছে। আলোক ভয়ে ভাবনায় এগুতে পারছে না আর। মা কৈ? মা! মা কি নেই!

নেই! দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, মহামারী কেটে গেছে এই তিন বছরের মধ্যে। কত রাস্তার কুকুর সোনার গদাতে বসেছে, আর কত ধনেজনে সম্পন্ন গৃহস্থ উচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আলোক জানে সে কথা। ভয়ে ভয়ে উঠোনের মাঝে এসে দেখলো, ঘরখানির দরজায় তালা বন্ধ। কেউ কোথাও নেই। সদর দরজাটা ওপাশ থেকে বন্ধ। বাড়ীর লোক যেন বাড়ী ছেড়ে কোথাও চলে গেছে বহুদিন—এই রকম মনে হ'ল, কিন্তু ছিল তো একমাত্র মা। মা কি চলে গেল, নাকি মরেই গেল? নাকি..... আলোক চিন্তাটা শেষ করতে পারছে না।

কিন্তু দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ভাবা যায়? আলোক ভাঙা ঘরের উদ্দেশেই প্রণাম করে আবার খিড়কীর পথে কচুবনে ফিরে এলো। তারপর ঘুরে সদর রাস্তায় আসতেই দেখা হোল মহিমের সঙ্গে। মহিমই ব্যাগ্র প্রশ্ন করলো,—কখন এলে বাবা আলোক? কবে ছাড়া পেয়েছ? এসে উঠলে কোথায়?

—এই আসছি! মা কোথায় মহিমকাকা? মা কি নেই?

আলোকের চোখের জল এবার উপচে পড়বে; মহিম কি বলে শুনবার জন্যই যা অপেক্ষা।

—নেই কেন? তোমার মা.....একটু ভেবে মহিম বললো—আছেন, স্বর্গে আছেন।

ধূলোয় আছাড় খেয়ে পড়লো আলোক। ওর আর কিছু নেই, কিছুই আর যেন ওর রহিল না। মহিম ওকে তুলবে, এক মিনিট তবু থেমে রইল মহিম; এর মধ্যে পাশের বাড়ীর শ্যামার মা, আর ও-পাড়ার অতুলবাবু এসে পড়লেন। সকলে মিলে তুললেন আলোকনাথকে।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

—ওকি! অত দুর্ব্বল হলে কি চলে? মা বাবা কারো চিরকাল থাকে না।

সেই পুরাতন সান্ত্বনাবাক্য। ওতে কোন কাজ হয় না। ওর শান্তিদায়িকা শক্তি বহুদিন নিঃশেষ হয়ে গেছে। মা বাবা চিরকাল থাকে না, কিন্তু দেশসেবার অপরাধে দণ্ডিত ছেলে মা'র মৃতুশয্যায় উপস্থিত হতে পারে না—এমন ব্যাপারও পৃথিবীর আর কোনো দেশে হয় না।

তবু আলোক আপনিই সান্ত্বনা লাভ করলো; আপনার মনেই ঠিক করলো, তার জীবনের যা কিছু বন্ধন আজ ছিন্ন হয়ে গেছে। এবার সে বেরিয়ে পড়বে—বেরিয়ে পড়বে পথে, যে পথ জীবন-সাধকদের শুদ্ধ পদরেণুতে পূতঃ, পরিকীর্ণ; যে পথে রুদ্রদেবতার আহ্বান শঙ্খ বাজে আর বাজে, যে পথ অনন্ত বন্ধনকে অস্বীকার করে, লাভ ক্ষতির ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে মহতোমহীয়ান জীবনের মহাবিপ্লবে ঝঙ্কারিত, সেই পথে।

মহিমের স্ত্রী-কন্যা-পুত্র সাদর আহ্বান জানালো ওকে। ওর স্নেহশীলা মা নেই, কিন্তু স্নেহের অভাব হোল না। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী থেকেই ডাক এল তাকে স্নানাহার করবার জন্য। কিন্তু আলোক কোথাও গেল না। উপবাসী থেকে মা'র শ্রাদ্ধ করলো বাড়ীতেই, স্বহস্তে রান্না করলো পিণ্ডাদি, পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্র বললেন,

"অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্……"

মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গভীর একটা ভাব জেগে উঠছিল আলোকের অন্তরে।…অদগ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, পিশাচ, যক্ষ রক্ষ, পন্নগ খগ, সকলের জন্যই শ্রাদ্ধের মধ্যে শ্রদ্ধার ব্যবস্থা করে গেছেন আর্য্যঋষি। পুরুষানুক্রমে এমন করে শ্রদ্ধা জানাবার অধিকার আর কোনো জাতিই হয়তো দেন নি উত্তরাধীকারীকে। কিন্তু শুধু শ্রদ্ধায়ই এই উত্তরাধিকার!

শুধু কি পিতৃপুরুষের নামের আর কাজের গৌরব নিয়েই বেঁচে থাকবে আর্য্যবংশধর। অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, সনক, সনন্দ কি আর জন্মাবেন না? অপুত্রক ভীষ্ম কর্ণ কি এমনি অযোগ্য উত্তরাধিকারী রেখে গেছেন?

না—না—না; আলোকের রক্ত যেন নেচে উঠলো 'না' কথাটা। শ্রাদ্ধ শেষ করে সে প্রণাম করলো সূর্য্যদেবতাকে পিতৃগণকে, পরে তার অন্তরস্থিত আত্মাকে যে আত্মা যুগযুগান্তরে গৌরবান্বিত ঐতিহ্যে আর ইতিহাসে অমর, অম্লান অনলস—যে আত্মার ক্ষুধা আজ রুদ্রদেবতার মন্দিরদ্বারে মরণজয়ী হবার সাধনা করবে, যে আত্মা রচনা করবে আগামী সহস্রাব্দির বেদ-পুরাণ-ইতিহাস-উপনিষদ!

পরদিন সকালে গ্রামের লোক দেখলো, আলোকের বাড়ীর দরজায় পূর্ব্ববৎ তালা ঝুলছে। আলোক নাই!

উত্তর কলিকাতার একটা সরু রাস্তাকে চওড়া করা হচ্ছে। দুপাশের বাড়ীগুলো ভাঙ্গা হচ্চে, কোনোটা পুরো ভাঙ্গা হয়েছে, কোনোটা আধভাঙ্গা, ইট, কাঠ, চুণ, সুরকী গাদা হয়ে আছে, তার সঙ্গে রাস্তা তৈরীর সরঞ্জাম ও রাত্রের বিপদ-সূচক লাল আলো-জ্বালা লণ্ঠন, বিপদ-জ্ঞাপক কাঠের সাইনবোর্ড ইত্যাদিতে স্থানটা গহন অরণ্যের মত। সন্ধ্যের পর ঐ জায়গার মানুষগুলিকে আরণ্যক প্রাণী মনে হয়। ওরা সত্যিই আরণ্যক, যাযাবর, জীবনের জাতি-কুলহীন অঙ্কুর।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ ঐ রাস্তাটার পাশে একটা পুরোনো ডাষ্টবীনের ধারে গোটা চার-পাঁচ ছেলেমেয়ে কি যেন খুঁজছে। এ রাস্তার বাসিন্দারা বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে অনেকদিন, কাছেপিঠে অলিগলিতে যারা থাকে তারাও এতদূরে কেউ ময়লা ফেলতে আসে না ডাষ্টবীনে। ওটা আজকাল শূন্যই থাকে। কিন্তু আজ ঐখানে সন্ধ্যাবেলা

শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায়

রাস্তা-মেরামতকারী মজুরগুলো খাবারের কয়েকটা ঠোঙ্গা ফেলে দিয়েছে, তারই ভেতর থেকে খাদ্যকণা সংগ্রহের চেষ্টায় ফিরছে ছেলেমেয়ে কটা। তিনটে ছেলে, চোদ্দ, দশ, আট বছরের আর দুটো মেয়ে, বারো আর নয় বছরের। বড় ছেলেটাই তাদের সর্দার,—ডাষ্টবীনটার ভিতর ঢুকে পড়ে সব ঠোঙ্গাগুলো বগলে নিয়ে সে বেরিয়ে এলো—বাকী কয়জন কাড়া-কাড়িই করতো কিন্তু সর্দার ধমক দিল—হট্—হট্ যাও! হামি সব ঠিক ঠিক দিয়ে দেবে।

বলে সে প্রথম দুটো ঠোঙ্গা দিল বড় মেয়েটাকে, একটা দিল ছোট মেয়েটাকে। বাকী দুটো ছেলেকে এক একটা করে দিয়ে সবকটাই নিজে নিল—খানিকটা তফাতে ভাঙ্গা একটা বাড়ীর ইটের উপর বসলো। গ্যাস-লাইটগুলো জ্বলছে, বেশ দেখা যাচ্ছে—জীবনটুকু বাঁচাবার জন্য ওরা সেই ঠোঙ্গাগুলোই চাটতে লাগল। ছোট মেয়েটার ঠোঙ্গায় হয়তো একটু বেশি খাদ্য ছিল, মাঝারি ছেলেটা এসে তার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে আলুর টুকরোটুকু জিভদিয়ে চেটে নিল এক নিমেষে, মেয়েটা কেঁদে উঠলো—এ্যাঁ—আমার—আমি দিবো না !!

চটাৎ করে একটা চড় পড়লো অপহরণকারী ছেলেটার গালে। চড় মারলো বড় মেয়েটা—কেন নিলি, কেন তুই নিলি ওর ঠোঙ্গা!

—বেশ করিছি—বলেই সেও মারল মেয়েটার পিঠে একটা চাপড়। সঙ্গে-সঙ্গে দুজনে কামড়া-কামড়ি, ঝটাপটি। ঐ এক কণা খাবারের জন্য ওরা মরেই যাবে হয়তো ঝগড়া করে। জীবনদেবতার ক্রুদ্ধ ভ্রূকটিকে ওরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে যে ব্যবধানটুকু, ওরা তার সদ্ব্যয় করে শুধু ডাষ্টবীন খুঁজে আর পকেট মেরে। ওরা জীবনের বিকৃতাঙ্কুর।

ঝগড়াটা হয়তো ভীষণাকার ধারণ করতো, কিন্তু দূরে একটা পুলিশ আসছে দেখা গেল, অমনি দৌড়, কে যে কোথায় গিয়ে লুকুলো কে জানে।

ভাঙ্গা বাড়ীগুলোর ইটের তলায় তলায় ওরা ভাঙ্গা ইটের মতই মিশে গেল। প্রায় দশ মিনিট, পুলিশ প্রবর চলে গেলেন সোজা, আবার ওরা বেরিয়ে এল সেই ডাষ্টবীনের কাছে। হয়তো ঝগড়াটা আবার লাগত কিন্তু বড় ছেলেটা এসে বললে মেজোটাকে—এই, ইধার আও; থোড়া কুছ দেখেগা, ইসমে কুছ নেই হুয়া। দুজনে ওরা চলে গেল কোন দিকে কে জানে। বাকী তিনটে ঐখানেই একটা ভাঙা বাড়ীর রকে শুয়ে পড়লো। ছোট মেয়েটি বললে শুয়েই—বড্ড খিদে পাচ্ছে।

—ঘুমো ঘুমো! বললো বড়টা!—ঘুমুলেই খিদে থাকবে না!

জীবনের এই নিষ্করুণতা আর নিঃসহায়তা দেখছিল আলোক একটা আধ ভাঙা বাড়ীর ভগ্নপ্রায় একটি কুঠরীতে শুয়ে শুয়ে। খবরের কাগজ পেতে ও শুয়ে আছে, গ্যাসলাইটের একটু আলো এসে পড়েছে সেখানটায়, সেই আলোকেই আলোক একখানা বই পড়তে চেষ্টা করছিল—বইটা মহা বিপ্লবী রাসবিহারীর ক্ষুদ্র জীবনী। ক্ষুদ্র জীবনী। ওঁর বৃহৎ জীবনী প্রকাশ করার কথা বাংলা দেশ ভুলে গেছে, ভারত মাতা হয়তো মনে রাখেন না তাঁর এই আজন্ম-বিপ্লবী স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক পুত্রটিকে? পুত্র হয়তো ভাগ্যদোষে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে নি, কিন্তু স্বাধীনতার তপস্যা-ভূমিতে সেই যে অগ্রজ, একথা কে আজ মনে রাখে? কীইবা মনে রাখে এই জাতি? কতটুকু? যে বাঙালী স্বরাজ সাধনার আদি মন্ত্রের উদ্গাতা, আজ সেই বাঙালী, উপেক্ষিত ভারতবাসীর কাছে, ভেদে বিভেদে বিষাক্ত, আত্মকলহে আত্মহত্যা করতে বসেছে! যে বাঙালী জীবনের সাধনায় জগৎ সভায় বরেণ্য হয়েছে, তাকে হীন করার জন্য আজ কত না প্রচেষ্টা প্রদেশান্তরে, কত না কুট কৌশল বড় বড় নেতার মস্তিষ্কে! বড় বড় বাণী আর উদার নীতিকথার আড়ালে বাংলাকে শোষণ করার সবরকম উপায় আর উদ্যোগ তাঁদের ব্যবহারে প্রকাশ—তবু বাঙালী

ওঁদেরই গুণগান করে, ওঁদের কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে কবিতা লেখে, ওঁদের পায়ে শ্রদ্ধার সহস্র প্রণতি জানায়।

রাসবিহারীর জীবন-কথা পড়তে পড়তে আলোক ভাবছিল, এত বড় বীর এই বাংলার সন্তান—অগ্রজ আমাদের, তার জন্য কি-কতটুকু আমরা করেছি? তাঁর মৃত্যুর সংবাদ কবে যেন কাগজের এক কোণায় পড়েছিলাম মনে আছে—ঐ পর্য্যন্তই। ভারতের অন্য প্রদেশের কাগজে সে সংবাদটুকুও ছাপা হয়েছে কি না কে জানে? এই জাতি, এই আমাদের জাতীয়তা! এরই গৌরবে আমরা বুক ফাটিয়ে চীৎকার করি—স্বরাজ দাও, নাহলে উপোস দিয়ে মরবো—অহিংস হব, অসহযোগ করবো!

দুড়দুড় একটা শব্দ। আলোকের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। পরক্ষণেই হুটপাট করে ঢুকলো দুটো ছেলে ওর সেই প্রায়ান্ধকার ভাঙা ঘরটুকুর মধ্যে। ঘরের কোণায় অন্ধকারে ওরা মিলিয়ে যেতে চাইছে, আলোক ব্যাপার কি, বুঝতে না পেরে মৃদু গলায় শুধালো—ক্যা হুয়া রে?

—চুপ! শালা পুলিশ! হাত ইসারায় ওরা বারণ করলো কথা কইতে। আলোক বাইরে উঁকী দিয়ে দেখলো, দুজন পাহারওয়ালা প্রকাণ্ড লাঠি হাতে খুঁজতে খুঁজতে আসছে, এখুনি এসে পড়বে এবং ঐ ছেলে দুটোর সঙ্গে অলোককেও ধরে নিয়ে যাবে। সে উঠে বসে হাতের বইখানা ওদের সুমুখে ধরে দিয়ে বললো—পড়ো পড়ো—আলেফ, বে—পে—তে

—আলেফ, বে, পে, পে

—পে নেহি—তে—পড়ো ঠিক্‌সে

—আলেফ—আলেফ—আলেফ—বড় ছেলেটা বার তিন চার বললো বটে। পুলিশ দুজন উঁকি দিয়ে দেখলো, মৌলুবী দুটো ছেলেকে

পড়াচ্ছে। নিঃশব্দেই চলে গেল তারা। অনেকটা দূর যাওয়া পর্য্যন্ত আলোক পড়াতে লাগলো—জীম্ চে হে খে দাল্

—জীম্ চে হে খে দাল……বেশ পড়ছে ছেলে দুটো। আলোকের মাথায় ভাগ্যিস একখানা গান্ধীটুপী ছিল, দূর থেকে তাকে মৌলুবীর টুপী ভেবেছে পুলিশ দুজন।

—কি হয়েছিল র‍্যা? এতক্ষণে আলোক জিজ্ঞাসা করলে বড় ছেলেটাকে।

—আপনাকে বহুৎ বুদ্ধি আছে বাবুজী। হইছিল কি জানেন, হইয়ো খাবার ওয়ালা—শালালোক ঝাঁপ বন্ধ করছিল; উসকো ঘরমে যাইলাম কুছ খাবার মাংনে; হাত বাড়ায়ে দুটো জিলিবী আউর চারঠো পুরি লিয়েছি আর ও শালা চিল্লাচিল্লি করে দিল, শালা পুলিশ লোকভি কুথাসে আইল—হামিলোগ ভাগলাম—ব্যাস্! আউর কুছ্ হইছিল না। আচ্ছা বাবুজি, সেলাম। আপ আজ জান বাঁচাই দিলে—বহুৎ বহুৎ সেলাম। আওরে দুধ-পুরিয়ার!

দুধপুরিয়ার হয়তো ছোটটার নাম। আলোক বড়টার নাম জানতে চাইলো।

—তোর নাম কি?

—হামার! হামার নাম আছে নওকিশোর। হামার মাই রাখিয়াছে। সেলাম।

ওরা চলে গেল বেরিয়ে। ঠিক স্কুলের ছুটির পর ছেলেরা যে আনন্দে বাড়ী যায়, তেমনি আনন্দেই যাচ্ছে। একটু আগে যে ওদের পুলিশ তাড়া করেছিল, সে কথা মনেই নাই হয়তো! আলোক চেয়ে দেখতে লাগলো, সেই রকটার কাছে গিয়ে নওকিশোর ডাক দিল—রাধা, এই রাধা উঠ, উঠ থা!

রাধা অর্থাৎ বড় মেয়েটা উঠে আবার ডাকলো ছোটটাকে—ঝুমনি

এ ঝুমনি সবাই ওরা উঠে পড়লো। নওকিশোর কোঁচড় থেকে বার করলো পুরি আর জিলেপি। আপন হাতে ভাগ করে দিল সকলের মধ্যে ; নিজে অবশ্য সিংহের ভাগই নিল।

কী অদ্ভুত জীবন ওদের! পরম আনন্দে ওরা সেই সামান্য খাদ্য ভাগ করে খেতে লাগলো। জীবনের রুদ্র ওদের ক্ষুধাদেবতা! সাম্য, মৈত্রী, প্রীতির বন্ধনে ওদের আবদ্ধ রেখেছেন। দুঃখে সুখে ওরা সমব্যথী সম অংশীদার। আলোক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো,—রাস্তার পাশের কলটার নাটখুলে ফেললো কিশোর, পেটভরে জল খেল সবাই, তারপর ঝুমনিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে নওকিশোর রকটার একদিকে শুয়ে পড়লো—ঘুম যা রে, এ ঝুমনি! আনন্দ বা নিরানন্দ দুঃখ বা অবসাদ ওদের কাছে একাকার। ওরা জীবনকে রক্ষা করে কেন? কি উদ্দেশ্যে? কে জানে!

শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে করতে কখন যে আলোক ঘুমিয়ে গেছে, কে জানে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বৃষ্টি নেমেছে, ছাট্ আসছে ঘরের মধ্যে। স্তিমিত গ্যাসের আলোতে দেখতে পেল—রক্ থেকে সেই নওকিশোরের দল উঠে একটা ভাঙা ঘরের কোনায় জড় সড় হয়ে বসছে গিয়ে। আলোকের কাছ অবধি এলে ওরা আর একটু ভাল ভাবেই থাকতে পারতো, কিন্তু এতটা আসতে হয়তো ভিজে যাবে।

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি! বহুদূরে সাবধানী আলোগুলোর লাল চোখ যেন হিংস্র জানোয়ারের চোখের মতই দেখা যাচ্ছে। আলোক আর ঘুমুতে পারবে না; গভীর রাত্রির নির্জ্জনতায় ওর চিন্তাশক্তি যেন তীব্র হয়ে উঠছে! জীবনকে জানবার সাধনায় ও যেন আজ শবসাধক

সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক কাপালিকের মত মহানগরীর এই মহাশ্মশানে তপস্যানিরত।

লম্বা একটা ছায়া ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ভাঙ্গাবাড়ীটার পাশের সরু গলি দিয়ে। কে আসে এত রাত্রে, এই দুর্যোগের মধ্যে? আলোক মাথাটা সরিয়ে আত্মগোপন করলো। ছায়া এগিয়ে আসছে; প্রেতের ছায়া, নাকি মানুষের? ধীরে, অতি সাবধানে বেরুলো একটা মূর্ত্তি গলি থেকে, আপাদমস্তক চাদর ঢাকা। কিন্তু ও নারী! নারী—সেটা বোঝা যাচ্ছে ওর চলন ভঙ্গীমায়, ওর পশ্চাতের নিতম্ব-দোলনে! নারী—এবং যুবতী। ও কাঁপছে যেন, জলে ভিজে হয়তো শীত লেগেছে, কিম্বা ওর অন্তর হয়তো কোন কারণে সিক্ত, করুণাক্ত হয়ে উঠেছে। আলোকের মনে হোল, হয়তো ও নিরাশ্রয়া, কিম্বা, অভিসারিকা, কিম্বা,—কিন্তু কিছুই ভাববার দরকার হোল না। নারী ধীরে এগিয়ে গেল ডাষ্টবীনটার কাছে—চাদরের ভেতর থেকে ছোট একটা পুঁটলি নামালো প্রথম ডাষ্টবীনের বাইরে শানবাধানো যায়গাটুকুতে, নির্নিমেষ নয়নে হয়তো দেখলো একবার, তারপর চলে আসছে, কিন্তু আবার ফিরে গিয়ে পুটলিটি তুলে ডাষ্টবীনের ভেতর অতি সাবধানে রেখে দিল। আলোক দেখলো,—ফিরে যাচ্ছে হতভাগী, গ্যাসের আলোতে ওর দুটো গাল চক্‌চক্ করছে জলের ধারায়। পুষ্পের মত পেলব, সুন্দর একখানি মুখ—আলোক নিমেষমাত্র দেখতে পেল।

চলে গেল মেয়েটা, গলিপথে ঢুকে পড়লো। আলোকও বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে গলিটার ভেতর ঢুকে অনুসরণ করলো তার। এ গলি, ও গলি পার হয়ে প্রায় দশ মিনিট হেঁটে সে এসে থামলো মস্তবড় একটা তিনতলা বাড়ীর খিড়কী দরজায়। ঠুকঠুক টোকা দিল—দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে পড়লো মেয়েটি।

ফিরে এলো আলোক। ফিরে এসে গেল ডাষ্টবীনটার কাছে।

পুটলিটি নড়ছে, ভালো করে চেয়ে দেখতে পেল, সদ্যজাত শিশু একটি। মুখখানা চমৎকার। গায়ের রঙ দূরস্থিত গ্যাসের মলিন আলোতেও পদ্মপাতার মত মনে হচ্ছে। ওকে বিসর্জ্জন দিয়ে গেল হয়তো ওর মা, জন্মদাত্রী ধাত্রী ওর!

আলোক ফিরবে কিনা ভাবছে, কোথা থেকে শঙ্খধ্বনি কাণে ভেসে এলো। আবার কে জন্মালো হয়তো—যাকে শুভ আবাহন জানাবার জন্য শঙ্খ বাজে—উৎসব জাগে!

ডাষ্টবীনের ছেলেটাও হঠাৎ কেঁদে উঠলো,—টুয়াঁ! বিকৃত শঙ্খধ্বনি ওর!

ওর আবির্ভাবের তূর্য্যনাদ ও নিজের কণ্ঠেই ধ্বনিত করলো। ওর জীবন দেবতার মন্দিরে উৎসর্গীত হবে না—শান্তির দেবতা, গৃহের অধি দেবতা ওকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু রুদ্র দেবতা ওকে কোল দেবেন—ওকে রক্ষা করবেন!

পুলিশ ডাকবে নাকি আলোক ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্য? ডাকাই তো উচিৎ মনে হয়।

পথে-পড়া এমনি কত ছেলেমেয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছে; আবার কত লক্ষ পথের ধূলায় মিশে গেছে—আলোক ভাবতে লাগলো এই ছেলেটার কি হবে! কী ওর নিয়তি? কিন্তু এমন করে আর বেশীক্ষণ পড়ে থাকলে ও তো এখুনি মরে যাবে। মরে না গেলেও জলে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে ওর নিউমোনিয়া হবে—তারপর দুচার দিন ভুগে মরবে; কিন্তু ভোগাবার জন্য ওর জীবনটুকুকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধবার তো কেউ নেই! স্নেহময়ী জননী ওকে ত্যাগ করে গেল, জগতের শ্রেষ্ঠ স্নেহ থেকে ও বঞ্চিত হোল; তথাপি ও বাঁচতে চায়। উঃ কি আকুলি-বিকুলি করছে বাঁচবার জন্য? একটু মুক্ত বায়ুতে শ্বাস নেবার জন্য কী প্রাণান্ত পরিশ্রম ওর! স্নেহ নাই, মমতা নাই, পিতৃ-মাতৃ পরিচয় নাই,

বাঁচার কোন আশা পর্য্যন্ত নাই, তবু ও বাঁচতে চায়। একেই বলে জীবনের বন্ধন, কঠোর, নিষ্ঠুর অনস্বীকার্য্য অনতিক্রম্য বন্ধন। কিন্তু ওকে স্নেহ দেবে আকাশ বাতাস, মমতা মাখিয়ে দেবে ধরণীর ধূলিকণা, রূপরস-গন্ধের আস্বাদ দেবে শ্যামা ধরিত্রী, সূর্য্যালোক, চন্দ্রকিরণ, অনন্ত নীলাকাশ—কিছু নাই কেন? আছে—সবই আছে—নাই শুধু স্বাধীন-ভাবে। পরাধীন জীবনের বন্ধনবেদনার দ্বিশতাব্দীর ইতিহাসের কলঙ্কিত মসীতে লিপ্ত হয়ে আছে সবই। সে কলঙ্ক স্খালিত না হলে শ্মশানচারী এই জীবনের রুদ্র গৃহবাসী হবেন না—গ্রহণ করবেন না পূজা।

আন্‌ম্যারেড্ মাদার্শ—ইল্‌লেজিটিমেট্ চাইল্ড;—অবাঞ্ছিত কিন্তু জাতির কি কেউ নয়? কেন: নয়? কার বিধানে নয়?—আলোক ভাবছে; বৃষ্টিটা আবার চেপে এলো—ভিজে যাচ্ছে ন্যাকড়ার পুটুলিটা, তার সঙ্গে কান্না—টুয়া···আর দেরী করতে পারে না আলোক, দুহাত বাড়িয়ে ওকে তুলে নিল—নিয়ে এল তার আস্তানায়। খবরের কাগজপাতা বিছানায় সযত্নে শোয়ালো তাকে, দেখলো, সুন্দর শাদা রং—যেন সাহেব বাচ্ছা! হবে! যুদ্ধের বাজারে বহু সাহেবই তো এদেশে বহু কেলেঙ্কারী করে গেছে—এই শিশু যে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী নয়, কে বলবে! রবীন্দ্রনাথের গোরার কথা মনে পড়লো, কিন্তু না, গোরা সত্যি গোরা! জাবালাপুত্র সত্যকামের কথা মনে হোল, মনে হোল পরাশর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কথা, মনে পড়লো ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথা। ঐতিহাসিক চন্দ্রগুপ্তের কথা এবং আরো অনেকের কথা হয়তো মনে পড়বে, ভারতের শতশতাব্দীর সঞ্চিত ইতিহাসে উদাহরণের অভাব নেই, কিন্তু ছেলেটা চিঁচিঁ করে চেঁচাচ্ছে। ওর ঠাণ্ডা লাগছে, হয়তো খিদেও পেয়েছে। আলোক তার শুকনো গামছা দিয়ে ওকে মুছতে গিয়ে দেখতে পেল, গলায় দাগ—ওকে গলাটিপে মেরে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছিল নিশ্চয়—ওর মা'ই সেই নিষ্ঠুর কর্ম্মের নিয়ন্ত্রী। কিন্তু মা নিষ্ঠুর হতে পারে নি—হতে পারে নি, তার প্রমাণ,

মা'র আঙ্গুলের দৃঢ়তা শ্লথ হয়ে গেছে, নাহলে ও মরেই যেতো। মারতে গিয়েও মা মারতে পারে নি। মা—সবসময়েই সে মা।' তবুও মানুষের বিধান, মাতৃত্বকে অতিক্রম করেও সে বিধান সন্তানের গলায় ফাঁসির আঙ্গুল বসিয়ে দেয়।

আলোক মুছে ফেললো ছেলেটার সর্ব্বাঙ্গ। চমৎকার রং, সুন্দর গড়ন—সবল, সুস্থ, প্রাণ-চঞ্চল শিশু। ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদছে। "ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাং"—হে মহাদেবী, মহাজননী, সর্ব্বভূতের ক্ষুধারূপে তুমিই বিরাজমানা,—খাদ্যরূপেও তুমি। ক্ষুধিতের খাদ্য যুগিয়ে দাও মা—আলোক প্রার্থনা করে উঠে পড়লো কিছু সংগ্রহের জন্য। কিন্তু এখনো রাত রয়েছে। কোথায় খাদ্য এই ভাঙ্গা বাড়ীর অরণ্যে? ইট-কাঠ-পাথরের মরুভূমিতে, মানুষের পরিত্যক্ত শ্মশানে খাদ্য কোথায়? তবু আলোক চেষ্টা করবে। বৃষ্টির মধ্যেই সে বেরিয়ে পড়লো!

যতদূর যায়, আশা ক্ষীণতর হয়ে আসে। কোথাও কেউ জেগে নেই। আধমাইল প্রায় এসে পড়লো আলোক। এতক্ষণ হয়তো কুকুর শেয়াল গিয়ে ছেলেটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। হয়তো তার জন্য বিশ্বমাতা কোনো খাদককে প্রেরণ করেছেন, যে ওকেই খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে; ওকে মুক্তি দেবে জড়-জগতের ক্ষুধা-তৃষ্ণার বন্ধন থেকে! হয়তো এতক্ষণে মুক্ত হয়ে গেছে সে!

আলোক ফিরতে লাগলো ত্বরা করে। পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল। যদি বেঁচে থাকে তো, ওকে কোনো আতুর-শালায় দিয়ে আসবে আলোক! ভোর হয়ে এলো। পূর্ব্বাকাশ অরুণের প্রকাশ-বেদনায় রাঙা হয়ে উঠেছে। অন্তরের অন্ধকার ভেদ করে আলোকের জীবন-রুদ্র জটাজাল মেলে ধরছেন। ধূসর-পিঙ্গল জটা, দীপ্ত মরীচিকাময়,—রহস্য যেন তাতে অবলিপ্ত। ভালো দেখা যায় না—তবু যেন দেখা যায়, আলোকের জননীর ক্রোড়ে আলোক—অসহায়, আর্ত্ততায় সন্তানস্নেহাতুরা

মাতা ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন—অন্ন দাও, দাও

আলোক সেদিনের কথা স্মরণ করতে পারে না, শ্রুতিতে জাগছে জননীর কণ্ঠস্বর—'বড় দুঃখে তোকে মানুষ করেছি আলোক, দেশজননীর সেবায় তোকে উৎসর্গ করে দিলাম!' —উৎসর্গ করে দিয়ে তিনি অমরলোকে চলে গেছেন। আলোক এরপর দেশমাতৃকার পূজাবেদীমূলে আত্মবলি দেবে। কিন্তু আরো অনেককে সে ঐ বেদীমূলে আনতে পারে —ঐ নওকিশোর, ঐ রাধিয়া, ঝুমনি, ঐ সদ্যজাত শিশুটি—তাদের সকলকে আলোক আনতে পারে তার আরাধনার আশ্রয়ে। ঐ শিশুটি দেশমাতার সন্তান—সম্পদ। ওকে অমন করে মরতে দিতে পারে না আলোক। আলোক প্রায় ছুটে এসে পৌঁছালো।

আশ্চর্য্য ব্যাপার! কোথা থেকে একটা ভিখারী মেয়ে এসে জুটেছে। শিশুকে কোলের ভেতর নিয়ে ঘুমপাড়ানি গান বলছে—'খোকা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো…" অদ্ভুত! খাদকের বদলে পালককে পাঠিয়ে দিয়েছেন বিশ্বমাতা! কিন্তু কে এই ভিখারিণী—কে তুমি! তুমি কোত্থেকে এলে?—আলোক প্রশ্ন করলো। মেয়েটা ভয় পেয়ে গেছে। শিশুটিকে আঁচল ঢাকা দিতে দিতে বললো,—আমি অপন্না গো, ভিখিরি!

—অপর্ণা? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কোথায় বাড়ী তোমার?

—বাড়ীঘর কি আছে বাবু? সে-সব অনেক কাল, সেই যুদ্ধুর বাজারে খোয়া গেছে! ছিলুম ঐ যে ঐ আঁধারপারা জায়গাটি, ঐখানে। ছেলেটার কাঁদন শুনে ছুটে এলুম!

—ও! কিন্তু ওকে নিয়ে কি করবে তুমি?

—তোমার ছেলে নাকি বাবু? তাহলে নাও,—মা কোথায় ওর? আছে? নাকি, নাই!

—আছে, কিন্তু সে আর আসবে না! তুমি ওকে মানুষ করতে পারবে?

—হাঁ, খুব—একগাল হাসলো অপর্ণা—কেউ ফেলে দিয়ে গেছে, নাকি বাবু? বুঝেছি! তাহলে ছেলে এখন আমার। ঘুমা-ঘুমা চু চু চু!

মাতৃত্বের স্বতঃপ্রকাশক অব্যক্তধ্বনি! স্নেহের বিগলিত অমৃত! আলোক মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলো—শীর্ণ-মলিন মেয়েটি! বয়স বাইশ কি বত্রিশ বোঝা যায় না—তবে তার বেশি নয়। একদিন ও সুন্দরী ছিল, সুরূপা ছিল, ছিল হয়তো সাধারণ গৃহস্থ ঘরের কন্যা, বধূ! কে জানে কোন দুগ্রহের ফেরে আজ ও পথে পরিজনহীন অবস্থায় পরের ছেলের মা হতে এসেছে। ওর মাতৃত্বের মধ্যেও সেই বিশ্বজননীর প্রকাশ! ধাত্রী ধরণীর সহিষ্ণুতায় সমাধিস্থ অনায়াস মূর্ত্তি! এই মাতৃত্বই মানুষকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেয়, পৃথিবীর সঙ্গে তার বন্ধন স্নেহের বন্ধন। প্রকৃতির শিক্ষায়তনে জীব প্রথম থেকে শিখতে পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কি—কোথায় তার স্নেহ-দয়া-মায়া,—ত্যাগ-ক্ষমা-তিতিক্ষার উৎসভূমি; কিন্তু আজকার বৈজ্ঞানিক যুগ একে অস্বীকার করছে, অপ্রাকৃত উপায়ে লালন করছে মানুষের ভ্রূণাঙ্কুরকে! কলে আর কৌশলে তৈরী মানুষ তাই যান্ত্রিক মানুষ,—সৈন্যদলে তার কাজ কলের কামানের কৌশলের সঙ্গে, সমাজে তার কাজ কলের মতই একঘেয়ে, শাশনতন্ত্রে তার কাজ স্বপ্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা, স্বৈরতন্ত্রে সে স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, অমানুষ! কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে—বিপ্লবী হয় তার প্রাকৃতিক মন, তার সহজাত সংস্কার, তার সাধারণ আলোবাতাসে আসবার আকুতি! তাই মানুষের শিক্ষা মানুষের রাজ্যে যতই বৈজ্ঞানিক হোক, ব্যক্তিগত মানুষকে পূর্ণ মানুষ করার দাবী বিজ্ঞান কোনদিন করতে পারবে না। পূর্ণ-মানুষ শ্রীকৃষ্ণ পিতা-মাতার স্নেহ-বিচ্ছিন্ন হয়েও নন্দ-যশোদার অগাধ স্নেহে সন্তরণ করেছেন, উদ্দাম আনন্দে মাঠে-ঘাটে-বাটে খেলা করেছেন,

—অন্তরের স্বতঃ উৎসারিত প্রেমের পথে অবাধে বিচরণ করেছেন—তাই তিনি পূর্ণ প্রকৃতির শিক্ষালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্র, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, সমাজ নীতিক, সাম্যবাদী।

—দুধ একটুক যোগাড় হয় না বাবু?

অপর্ণা বললে! আলোক জানে না, একফোটা দুধের জন্য মাতৃ অন্তর কেমনভাবে কাঁদে কিন্তু সে অনুভব করতে পারে। তার গর্ভধারিণীর অন্তরের উত্তরাধিকারী সে।—তাইতো! সকাল হয়ে এলো। দেখি যদি কোথাও কিছু পাওয়া যায়।

বলে আলোক ডাষ্টবীনটার দিকে অকারণে হেঁটে এলো খানিকটা। মনের অস্বস্তির আবেগ ওকে স্থির হতে দিচ্ছে না। বৃষ্টিটা আবার থেমেছে। আলোক আরো খানিক দূরে এসে দেখলো রকের উপর নওকিশোরের দল তখনও ঘুমিয়ে আছে। নিস্তব্ধ শান্ত ঘুম ওদের, নির্ভাবনায় নিবিড়! এখুনি উঠে কি খাবে, কোথায় যাবে কোনো চিন্তাই ওরা করে না। ওরা প্রকৃতির খাঁটি সন্তান। ওরা জীবনকে সত্যের আলোকে দেখতে শিখেছে, সে আলোক সূর্য্যের মত সত্য আলোক—চন্দ্রের ছায়াস্নিগ্ধ রহস্য যাতে একবিন্দুও নেই। যাতে নেই কল্পনার লেশমাত্র অনুরঞ্জন।

নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলো আলোক অকস্মাৎ; তার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে একটু দুধ যোগাড় করবার আর কি সব বাজে, আগ্‌ডম্-বাগ্‌ডম্ ভেবে সময় নষ্ট করছে সে! এখন কি ওসব ভাববার সময়? ভেবে লাভই বা কি! আলোক গট্‌গট্ করে অনেকদূর হেঁটে চলে এলো। হ্যাঁ—দুধ দোয়ানো হচ্ছে একটা গোয়ালে। আট দশটা গরু, মোষ, দু' তিনজন গোয়ালা দুধ দোয়াচ্ছে। ঠিকানা না জেনেও ঠিক এসে পড়েছে আলোক দুধওয়ালাদের কাছে। একেই বলে নিয়তি, ভাগ্যচক্র। আলোক একজনকে বললে—চার আনার দুধ দিতে পার ভাই?

—হুঁ—লেবে কিসে বাবু? বর্ত্তন কাঁহা?

পশ্চিমে গোয়ালা ওরা, বাংলা দেশে পশ্চিমের গরু মোষ এনে দুধের সঙ্গে বাংলার জল মিশিয়ে বাঙালীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাচ্ছে। ওরা হেসে কথা কয়, মিষ্টি করে ডাকে, দিব্যি গেলে বলে—'এ্যায়সা দুধ আউর কাঁহা নেহি মিলেগা!' বাড়ী বাড়ী গিয়ে দিয়ে আসে দুধ। বাংলার জননী আর শিশু ওদের আশাপথ পানে চেয়ে থাকে। কিন্তু বর্ত্তন তো নাই, দুধ নেবে কিসে আলোক! দূরে একটা পশ্চিমা পিত্তলের পাত্রে গরম চা বিক্রি করে যাচ্ছে! তার কাছে মাটির ভাঁড়, আলোক তাকে ডেকে চার পয়সার চা খেলো, আর বড় একটা ভাঁড় সংগ্রহ করলো! চার আনার দুধ এমন কিছু বেশী নয় আজকাল! জলে দুধে পোয়াখানেক হবে। তাই নিয়ে আলোক ফিরছে। পেটে গরম চা পড়ায় ওর শক্তিটাও বেড়েছে একটু।

মা ছেলেবেলায় আলোককে দুধ খাওয়াতে পারেন নি। কতবার দুঃখ করে বলেছেন, দুধের বদলে ভাতের ফেন খাওয়াতেন আলোককে। সেই মা আজ নেই, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে কেমন করে কে জানে, কটি টাকা তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর গোপন কুলুঙ্গীর মধ্যে। শ্রাদ্ধের পর সেই টাকা কয়টি নিয়েই আলোক বেরিয়ে পড়েছে। সেই টাকা থেকে চার আনা নিয়ে আজ দুধ কিনলো, মা স্বর্গ থেকে দেখুন—মা'র সঞ্চিত টাকায় আলোক একটি নিরাশ্রয় শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারছে। আলোককে দুধ না খাওয়াতে পারার দুঃখ মা'র যেন না থাকে আর। কিন্তু হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মা এদেশে ছেলেকে দুধ খাওয়াতে পারে না—কে তা দেখছে! কে খবর রাখছে, দ্রোণাচার্য্যের মত কত পিতা ছেলেকে পিঠুলি জল খাইয়ে বলে—দুধ খাওয়াচ্ছি। নিরন্ন ভারতের নির্য্যাতিত জীবন শতাব্দী ধরে তো এমনিই চলে এলো।

চল্‌কে উঠছে দুধটুকু। আলোক অতি সাবধানে হেঁটে এলো; দূর থেকেই দেখতে পেল নওকিশোরের দল ঘুম ভেঙে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে

তার আস্তানার কাছে। দেখছে হয়ত ছেলেটাকে ওরা। আলোককে দেখে সবাই ওরা পথ ছেড়ে দিল। অপর্ণা বললে—দুধ পেলে বাবু? দাও!

ততক্ষণ অপর্ণা তার শুকনো মাইদুধ ওকে চোষাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সদ্যজাত শিশুর পক্ষে মাইদুধ টানা কষ্টকর। তবু ছেলেটা চুপ করে আছে। বড়লোকের বাড়ীতে জন্মালে এই ছেলের জন্য কত কি ব্যবস্থা হোত। রাস্তা যার আশ্রয়, তার জীবনীশক্তিও অসাধারণ। প্রকৃতি এসব সূক্ষ্ম ব্যবস্থা করে রেখেছেন—যে প্রাণী যতখানি যত্নে সন্তান পালন করতে পারে, তার সন্তানের জন্য ততখানি স্নেহ মমতাই দরকার। বাঘের বাচ্চা দুমাসেই স্বাবলম্বী হয়, গরুর বাচ্চা পাঁচ সাত দিনেই, কিন্তু মানুষের বাচ্চার স্বাবলম্বী হোতে বহুবছর লাগে। কারণ মানুষ প্রকৃতির দানকে স্বাভাবিক জীবনের গণ্ডীতে বদ্ধ রাখেনি। সে ঘর বেঁধেছে, সে রান্নাকরা খাদ্য খেতে শিখেছে. সে আধুনিক যন্ত্রপাতির সহযোগে অনেকখানি অপ্রাকৃতিক হয়ে উঠেছে। তার সন্তান পুরোমাত্রায় প্রাকৃতিক নয়, অনেকাংশে অপ্রাকৃতিক।

দুধটা এগিয়ে দিল—ধারোষ্ণ দুধ কিন্তু এতখানা পথে আসতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; গরম করে নিতে হবে। নওকিশোর চট করে ঢুকে পড়ল ঘরে। আলোকের বিছানার জন্য পাতা খবরের কাগজখানা গুটিয়ে গোল করে ট্যাঁক থেকে দেশালাই বের করলো। আগুন জ্বেলে গরম করে দিল দুধ। এর মধ্যে অপর্ণা একটা পলতে তৈরী করে নিয়েছে। আলোক এবং আর আর সকলে দেখছিল। পলতে চুষিয়ে দুধ খাওয়ানো চলতে লাগলো। যেন একটা উৎসব হচ্ছে, এমনি সাগ্রহে ওরা দেখছিল। বেশ খাচ্ছে ছেলেটা। নবকিশোর মিনিট দুই দাঁড়িয়ে দেখে বললে—চল সব—এ ঝুমনি, আ—যা।

ওর দল চলে যাচ্ছে এবার। আলোক বললো অপর্ণাকে—আমি কিছু খাবার আনি তোমার জন্য, কেমন?

—হুঁ—অপর্ণা মুচকী হাসলো।

আলোক সে-হাসির কোনো অর্থ করতে চাইলো না, চলে গেল। যাচ্ছে গত রাত্রের দেখা সেই মস্ত বাড়ীটার পাশ দিয়ে। প্রকাণ্ড পাঁচ-তালা বাড়ী ফ্লাট্-সিষ্টেমে তৈরী হয়তো—হাজার পরিবার ওতে বাস করে। ওদের পারিবারিক বন্ধনকে এ বাড়ীতে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব। ওদের পল্লীজীবনের সাংস্কৃতিক সংযোগ, দোল-দুর্গোৎসব, ব্রত-পার্ব্বণ; তুলসীমঞ্চ, শঙ্খপ্রদীপ এখানে প্রবেশাধিকার পায় না। এখানে নীড়বাসী বিহঙ্গের মত ওরা একবৃক্ষে হাজার পাখীর মত আরণ্যক। জীবন এখানে স্বস্থ এবং সুস্থ নয়। অনাচার আর ব্যভিচার এখানে আশ্চর্য্যের বিষয় তো নয়ই, বরং অনায়াসলভ্য! কিন্তু এই ফ্লাট-শিষ্টেম্ চালু হয়ে গেল এদেশে। চালু হতে বাধ্য, কারণ এমনি করে হাজার ছিদ্র দিয়ে এদেশের মানুষের মনের প্রাচীনতম দৃঢ়তা ভাঙবার চেষ্টাই চলেছে আজ দুশো বছর ধরে। শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজ, জীবিকা, জীবনোপায়, জন্মহার সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত, আর সে নিয়ন্ত্রণ বৈদেশিকের সুবিধার জন্য। এদেশের সুপ্ত জীবন-রুদ্র আজ নেশায় আচ্ছন্ন,—মাঝে মাঝে শুধু স্বপ্ন দেখে, যেন সে জেগে উঠেছে।

উঠেছে জেগে;—জাগরণের শঙ্খধ্বনি আজ আকাশে-বাতাসে ঝঙ্কারিত; যুদ্ধোত্তর ভারতের শিল্প-সম্পদ, সমাজচেতনা, শাসন-নীতি সব কিছুর মধ্যেই জাগরণের ইঙ্গিত এবং সঙ্গীত। কিন্তু এই জাগরণ যাদের স্বার্থকে প্রতিহত করবে, তারাও চুপ করে বসে নেই। ভেদনীতির সঙ্গে বিদ্বেষের বিষে আর বিজাতীয়তার স্বৈরাচারে তাহা কলঙ্কিত করে দিচ্ছে পূতঃ গঙ্গোত্রীর স্বচ্ছ সলিল, মলয় বাতাসের স্বাস্থ্য সঞ্চায়ণ; অপবিত্র করে দিচ্ছে আহিতাগ্নিকে অনায়াসলভ্য, অন্যায়ভাবে লভ্য ধন-জন-যশ-ঐশ্বর্য্যের ইন্ধন দিয়ে।—এ জাগরণ তাই আত্মহত্যাকেই আশ্রয় করে রয়েছে—আত্মরক্ষার উপায় করতে সে এখনো সচেষ্ট হোল না।

বড়ো বাড়ীখানা পার হয়ে আলোক একটা বড় রাস্তায় পড়লো। সারিবন্দী মিলিটারী গাড়ী চলেছে—ছেদহীন শ্রেণী, উল্লাসে উদ্দাম ওদের চালকগুলো। লাল মুখ—মদ্যপানে স্ফীতচক্ষু ভোগের অবসাদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ওরা, তাই ভোগের অনুপান সংগ্রহেই চলেছে হয়তো, হয়তো এই শ্রেণীবদ্ধ অভিযান ভোগকেন্দ্রকে লক্ষ্য করেই পরিচালিত হচ্ছে। কয়েকদিন আগের একটা সংবাদের কথা মনে পড়ে গেল, চট্টলের সংবাদ, মহাদেবী যে চট্টলে লকলক লোলজিহ্বা বিস্তার করে অবিশ্রাম জ্বালিয়ে রেখেছেন ভারতের যুগার্জিত পুণ্যাগ্নি শতাব্দী-সঞ্চিত ধর্ম্ম-শিখা। কিন্তু সব চলে যাবে, সমস্তই নষ্ট হয়ে যাবে। শক-হূণ-তাতার, গ্রীক, পাঠান-মোগল, যা করতে পারেনি অস্ত্রবলে,—ইংরাজ বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে তাই করলো,—দেশটাকে সত্যরিক্ত, ধর্ম্মদ্বেষী, মনুষ্যত্ববিরোধী নীতিতে অভ্যস্ত করিয়ে সোণার খাঁচায় পুরে বুলি পড়াচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়েকটা তাঁবেদারের কণ্ঠে। বড় বড় বুলি, মোটা মোটা শ্লোগান, গালভরা ইংরাজী নাম—গণতন্ত্র, বিপ্লববাদ, ইন্‌ট্রিম গভর্ণমেণ্ট, কোয়ালিশেন, প্রপোজ্যাল, গ্রুপিং—কতকি! ওর ভেতরে ভেতরে ভেদ-নীতির ধ্বংসাগ্নি,—আত্মকলহের অচিকিৎস্য গরল, আত্মনাশের অদৃশ্য আঘাত!—চমৎকার!

খাবারের দোকানগুলো এখনো খোলেনি। ভেতরে তারা কচুরী সিঙাড়া ভাজছে। ভেজাল ঘি-এর বিশ্রী দুর্গন্ধ, মানুষের খাদ্যের মধ্যে প্রেতভোগ্য আবর্জনা! কিন্তু ওইগুলোই খেতে হবে—খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে। জীবন্মৃত করে বাঁচিয়ে রাখার আয়োজন সম্পূর্ণ করে এনেছে ওরা—নেশায় নিস্তেজ, অখাদ্যে অপদার্থ, বিলাসে ব্যাভিচারী জীবনের ক্লৈব্য-ক্লিন্ন বেঁচে থাকা—বন্ধনদশাকে বিলম্বিত করবার জন্য বাঁচিয়ে রাখা! কিন্তু ওরা জানে না, এদেশে বিষপায়ী নীলকণ্ঠ জন্মায়—নেশায় নির্জীব শিব শ্মশানে শুয়ে বিশ্বের কল্যাণের স্বপ্নে বিভোর

থাকে;—তাঁর ধ্বংসের শূল একদিন জাগবে—জাগবেই। সেই রুদ্র-দেবতার জাগরণের কাজটাই ওরা আপনার অজ্ঞাতসারে করে দিচ্ছে! ওদের নিয়তি, ওদের শতাব্দীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন নিকট হয়ে এলো—নিমিলিত আঁখি জীবনরুদ্র আজ চোখ মেলছেন—তাঁর বিশ্বধ্বংসী শূল উদ্যত হচ্ছে।

আলোক একটা দোকানের কাছে এলো। জিলিপী আর খান কয়েক কচুরী কিনলো—ঠোঙায় ভরে ফিরছে। ওর কাছে এখনো আছে কয়েকটা টাকা-পয়সা। আরো দু-দশ দিন চলে যেতে পারে, তারপর! তারপর কি? চিন্তা করবার কোনো দরকার নাই। আজকার দিন, এবং আজকার এই মুহূর্ত্তই পার করবার কথা। 'তার-পর' তার পরেই চিন্তণীয়। আলোক ফিরছে!

নওকিশোরের দল হৈ-হল্লা করে দাঁতন করছে একটা জলকলকে ঘিরে। ঝুমনির হয়তো ঠাণ্ডা লেগে জ্বরমত হয়েছে। নওকিশোর ছেঁড়া ন্যাকড়াটা ওর গায়ে ডবল করে জড়িয়ে দিল, ওর মুখ ধুইয়ে দিল, নিজের ছেঁড়া ফতুয়ার পকেট থেকে কাগজমোড়া একখানা সস্তা বিস্কুট বার করে দিল ওর হাতে। তার পর ওর হাত ধরে আসছে আলোকের আগেই।

—কিশোর!—আলোক ডাক দিল!

—হ্যাঁ বাবুজি! কুচ বোলতে হেঁ?—

—কোথায় যাবে তোমরা!

—দানা-পানি কুচ্ নাই তো বাবু! ঝুমনিকে বুখার হইল। উথাকে শোয়াবে, তব্ যাবে।

—কোথায়?

—কুছ্ দানা-পানির জুগাড় করতে হোবে না বাবুজি!

আলোক পকেট থেকে একটা সিকি বার করে দিল কিশোরের

হাতে। কিশোর হাত পেতে নিল, হাসলো অনাবিল সরল হাসি। হেসে বললো,—আপ বহুৎ দিলদার আদ্‌মী আছে বাবু। বহুৎ বহুৎ সেলাম! লেকিন একঠো বাত—উ জেনানাকো কাঁহাসে লে আয়া? উ তো আচ্ছা আদমী নেহি!

—ওকে তো আমি চিনি না! আপনি এসে ঐ বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসেছে।

—হামি জানে। সব হামি দেখিয়েছে রাতমে! লেকিন ঐ বদমাস ছোঁড়ী উ লেড়কাকো নিয়ে ভিখ মাঙবে। উস্‌কো বহুৎ সুবিস্তা হোয়ে যাবে। আউর থোড়া রোজ বাদ, উ লেড়কা জেরাসে বড়া হোনেসে গুণ্ডালোককো পাশ বিক্রী করে দেবে। গুণ্ডালোক উসকো পকেটমার বানায়েগা নেইতো, উসকো আঁখ বন্ধ করকে ভিখ মাঙায়েগা, নেইতো, হাতপা-কাটকর উসকো রাস্তামে ফেক্ রাখেগা—যেইসে বাবুলোক দুচার পয়সা ফেক্ দেনা—পয়াসা গুণ্ডালোক লে যায়গা উসকো দেগা রাস্তামে ঝুঠা খানেকো। হামি জানে—উ লেড়কা কভভি ভালো নেই রহেগা!

আতঙ্কিত হয়ে উঠলো আলোকের অন্তর। কিশোর আরো কিছু বলতে যাচ্ছে, আলোকই শুধুলো—আমি তার কি করতে পারি?

—কুছ নেহি! আপলোক কুছ কর নেই সেকেগা! আচ্ছা! মাগী দুচার মাহিনা রহে যাক—তব হাম ছিনাই লেঙ্গে উ লেড়কাকো। আচ্ছা বাবু, কোন্ মকানসে উ জেনানা, ওহি লেড়কাকো মাই আয়া রহে? বড় বাড়ীর কাছাকাছিই এসে পড়েছে ওরা। আলোক আঙ্গুল তুলে দেখালো—ঐ বাড়ী।

—ওঃ! উস্ বাড়ীকো জেনানা লোক রাতমে যাতা রহা চৌরঙ্গী মহাল্লামে! মেই দেখা রহা। মেই দেখা রহা উন্‌লোককো আনা-যানাকো! উঃ!

অন্তরটা যেন গভীর বিস্ময়ের আর্ত্ততায় স্তব্ধ হয়ে আসছে! বাংলার সতী নারীর সর্ব্বশেষ সম্বল অপহৃত হোল, অপমানিত হোল বাঙালীর শ্রেষ্ঠ গৌরবপতাকা। যুদ্ধের বিপর্য্যয় যুদ্ধোত্তর জগতের বুকে যে বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, বাংলার শ্যামল বুকেও তার সংক্রমণ যেন অতিরিক্ত মাত্রায় ঘটেছে! সহরে, গ্রামে—সর্ব্বত্র! বিবাহিত জীবনের বন্ধনে গিয়ে ওরা নিজেকে আজ নিষ্ঠাবতী করতে পারে না, সেখানে কালা-ধলার ব্যবধান—স্বাধীনতা-পরাধীনতার ব্যবধান,—ব্যবধান উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে, অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে, খাদ্য আর খাদক সম্বন্ধে। মানুষের উপর এটা অমানুষের প্রদত্ত লাঞ্ছনা বলে স্বীকৃত হবে না, অমানুষের দান বলে গৃহীত হবে! এই দান যে একজনের ঘরে অগ্নিদান, একজনের জীবনকে মৃত্যুদান, তা ওরা স্বীকার করবে না! কেন করবে? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। যারা বীর তারা ভোগ করবে; ভোগকরার জন্য তারা যে-কোনো পন্থার, যে-কোন অজুহাতের আশ্রয় নিতে পারে। যুদ্ধকাল বা শান্তির সময়, কিছুতেই আটকায় না! প্রবলের কাছে দুর্ব্বল এমনি অসহায়!

কিন্তু ভেবে ফল নাই! দুর্ভাগা ভারতের জীবনদেবতা আজো নিদ্রিত! আজো তার বুকে পরদেশীর কুঠারাঘাত সে অনুভব করে না! যেটুকু করে তাতে তার নিবিড় সুপ্তি শুধু ক্ষুণ্ণ, সামান্য ক্ষুণ্ণ হয় আর সে স্বপ্ন দেখে! ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধের প্রশস্ত পথ, ভাষায়-ভাষায় ঠোকাঠুকির স্ফুলিঙ্গ, প্রদেশে প্রদেশে কাটাকাটির তরোয়াল, ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়ার অন্ধকার জাহান্নম্! এসে পৌছালো আলোক তার আস্তানায়। অপর্ণা এর মধ্যে ছেলেকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ফেলেছে। আলোককে দেখে হেসে বলল,—ঘুমুচ্ছে! তুমি বসো বাবু! আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি।

আলোক কিছুই বললো না। কিশোরের কথায় জাগ্রত আতঙ্কটা তখনো ওকে চিন্তাশীল করে রেখেছে। অপর্ণা চলে গেল! খাবারের

ঠোঙাটা নামিয়ে রেখে আলোক তাকিয়ে দেখলো, রাস্তা তৈরীর কাজে লোক লেগে গেছে। বড় বড় লরী বোঝাই চুণপাথর, শাবল-কোদালী, কুলি মজুর এসে পড়েছে। এই আধভাঙা বাড়ীটাই হয়তো ভেঙে শেষ করবে ওরা। আলোককে এখুনি আস্তানা ওঠাতে হবে। কিন্তু ঐ শিশুকে কেমন করে তুলবে আলোক! কোথায় গিয়ে রাখবে! এমন করে নিজেকে কেন সে বিপদে জড়িত করতে গেল!

কিন্তু বিপদ কিছু ঘটবার পূর্ব্বেই অপর্ণা এসে পড়লো। মুখ ধুয়ে চুলগুলো বেশ করে গুছিয়ে কতকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে, বেশ দেখাচ্ছে ওকে! শাড়ীখানা পরিষ্কার থাকলে ভদ্রলোকের বউ বলেই মনে হোত! এসেই ছেলেটাকে তুলে নিয়ে আলোককে বলল—চলো বাবু! ঐ কোণায় একটা জায়গা আছে! ভালো জায়গা!

কথা না বলে আলোক চললো ওর সঙ্গে; মিনিট দু-এর রাস্তা! এসে দেখলো, ছেঁড়া একখানা কাঁথা ভাঁজ করে পাতা, তার উপর খোলা আকাশকে ঢেকে আছে একটি বকুল গাছ। চমৎকার আশ্রয়। শিশু-টিকে কাঁথায় শুইয়ে দিতে গিয়ে অপর্ণা বললো—এ্যা ভিজে!

রাত্রের বৃষ্টিতে কাঁথাখানা ভিজে গেছে কিন্তু শুকনো কাঁথা কোথায় আর পাওয়া যাবে এখন! আলোক কোন কথা না বলে ঠোঙাটা ওর সামনে রেখে আস্তে চলে যাচ্ছে, অপর্ণা বললো—যাবে কোথা বাবু?

—আসছি! অকারণে কথাটা বললো আলোক। ওর ফিরে আসবার আর ইচ্ছে নেই। ওর অন্তর বিরক্ত এবং বিষাক্ত হয়ে উঠেছে অপর্ণার হাসি দেখে। কারণে অকারণে মুচকী হাসি, মধুর ইঙ্গিত। যেন ও ঐ ছেলেটার মা আর আলোক বাবা—এই সত্যটা সর্ব্বাবয়ব দিয়ে ও প্রচার করতে চাইছে আলোকের কাছে। ছেলেটাকে বাঁচিয়ে তুলবার মত মাতৃত্ব ওর কোনো অবয়বে খুঁজে পাচ্ছে না আলোক। শুধু নিজেকে আকর্ষণীয় করবার জন্য ওর সকল চেষ্টা পরিমার্জ্জিত, প্রসারিত।

আলোক অনেক দূরে চলে এলো, একটা পার্কে বসলো একটা বেঞ্চে। বসেই রইল ঘণ্টা দু-তিন। কি সে ভাবছে আর কেন সে ভাবছে, নিরাকরণ নেই। অকস্মাৎ কে ডাকলো—কি হচ্চে—বাবুজি?

নবকিশোরের ছোট দলটি। হাতে দুটো ফজলি আম!

—এসো কিশোর, আম কোথায় পেলে?

—নিয়ে নিলাম! কত শালা বড়া আদমী আম খাইছে আর হামি খাবে না?

কিশোর এসে বসলো আলোকের পাশে, ছোট বন্ধুর মতই বলল, —খাইয়ে বাবুজি! বহৎ মেহনৎসে লিয়েছি শালা লোকের কাছ থেকে! এ ঝুমনি, শো যা, শো যা, বহিন্।

কিশোর ঝুমনিকে কোলে টেনে শুইয়ে দিল বেঞ্চেই। কিশোরের দেওয়া আমটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো আলোক; অনুভব করতে লাগলো সর্ব্বহারা ঐ হতভাগ্য বালকের আশ্চর্য্য প্রাণ-শক্তি—অদ্ভুত স্নেহ-বাৎসল্য আর অসাধারণ বন্ধুপ্রীতি! এ আম যেমন করেই কিশোর সংগ্রহ করুক—না গ্রহণ করলে মনুষ্যত্বের অপমান করা হবে। আলোক ছুরি বের করে আমটা কাটলো।

প্রকাণ্ড বাড়ীটার চারতালার এককোণে বড় একটা কুঠরী। মাঝারি রকমে সাজানো। নতুন ডিজাইনের খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলমারী, সেলুফ ইত্যাদি তো আছেই, কয়েকটা দামী ছবি আর ষ্ট্যাচুও আছে। বেশ ঘরটি, কিন্তু ঐ ঘরে বসে আছে এক বিষাদ প্রতিমা। এতো ক্লান্ত

যে বসে থাকা ওর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হচ্ছে, তবুও বসে আছে, কষ্টকে যেন সাগ্রহে বরণ করবার জন্যই। জীবনের উপর যেন ওর কিছুমাত্র মায়া-মমতা নেই, এবং জীবন যেন ওকে কঠোর বন্ধন থেকে মুক্তি দিলে ও বেঁচে যায়। কোণার দিকে ছোট্ট একটা রেডিও যন্ত্র,—তার থেকে মৃদুস্বরে গান ভেসে আসছিল—

"স্বপন যদি মধুর এমন, হোকনা মিছে কল্পনা—
জাগিও না, আমায় জাগিও না…'

সত্যি! স্বপ্নের মধুরতার মধ্যে যদি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারতো না জেগে! কিন্তু স্বপ্ন সব সময় মধুর হয় না! বীভৎস ভয়ঙ্কর হয়—নারকীয় ভীষণতায় কদর্য্য কুৎসিত হয়, সময় সময় এত বেশি ভয়ঙ্কর হয় যে মানুষ ঘুমুতে ভয় করে; ওর তাই হয়েছে। কয়েকদিন থেকে ওর ভালো ঘুম হচ্ছিল না,—কারণ ওর আত্মীয়রা ওকে একটা ভীষণ দুষ্কার্য্য করবার জন্য প্ররোচিত করছিল। জাগ্রত অবস্থায় মনের বল সঞ্চয় করে ও সে কাজ করতে সম্মত হোত, কিন্তু নিদ্রায় যখন ওর মনের স্নায়ুকেন্দ্র থাকতো দুর্ব্বল আর অসহায়, তখন সেই কার্য্যের কদর্য্যতা ওর চেতনার গভীরে যে আতঙ্কের, যে অন্ধায়িত নারকীয় দৃশ্যের ছবি আঁকতো তাতে ওর সর্ব্বাঙ্গ উঠতো কেঁপে কেঁপে। আকস্মিক ঘুম ভাঙার আঘাতে ও চীৎকার করে উঠতো। ওঘর থেকে তৎক্ষণাৎ ওর মা এসে সাহস দিত, —ভয় কি! অমন হয়।

কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনাটি গত রাত্রের গভীর দুর্য্যোগের মধ্যে সত্য হয়েছে। সত্য হয়েছে ওর জীবনে—ওর জাগরণে এবং স্বপ্নেও। সব শেষ করে এসে ও শুয়েছিল ঘুমুবার জন্য। কিন্তু স্বপ্ন—মধুর নয়, বীভৎস, কুৎসিৎ, কদর্য্য স্বপ্ন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল ওর চেতনায়। চমকে চেয়েছে, ভয়ে হাত-পা কেঁপে উঠেছে, পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে।—কিন্তু কাল ও চীৎকার করে ওঠে নি। ওর মনে হয়েছে, ওর কেউ আত্মীয় নেই,

চীৎকার করে কাকে ডাকবে। কেউ তো আপন জন নাই! যারা আপন বলে কাছে আসে তারা সবাই স্বার্থান্বেষী। নইলে অতবড় কদর্য্য কাজটা ওকে দিয়ে করালো কেমন করে!

—উঠেছিস! আয়, মুখ ধুয়ে দুধ খা!—দরজার বাইরে থেকে বললো ওর মা।

—হুঁ! বলেও কিন্তু বসেই রইলো। উঠবার কোন লক্ষণ নেই। ওর মা কাছে এগিয়ে এসে বললো আবার—অমন কত হয়, কত যায়। ওর কথা ভাবছিস্ কেন? আয়।

হাসলো মেয়েটা! হাসি নয়, একটা জ্বালার অন্তিম প্রকাশ যেন। যেন আকস্মিক ছিট্‌কে পড়া উল্কার প্রজ্বলন্ত মৃত্যু-হাসি! আস্তে বললো, —কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না মা—আর একটু ঘুমুবো!

শটান শুয়ে পড়লো ও বিছানায়। ওর মা আধমিনিট দেখলো, —কিছু না খেলে হবে না। খেয়ে নে, তারপর ঘুমুবি। শরীর দুর্ব্বল হয়ে যাবে যে!

—যাক্ গে! শরীরের দাম উসুল হয়ে গেছে। তোমাদের কাছ থেকেই তো পেয়েছিলাম এই শরীর—মন্বন্তরের মরণকে তাই দিয়ে ঠেকিয়েছি। ব্যাঙ্কের অঙ্কও কিছু বাড়িয়েছি—তোমাদের আর ভয় নাই মা। এবার এ শরীর যাক্—দেহটা বদ্‌লে নিই গে···বালিশে মুখ গুঁজে ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো!

—ছিঃ উৎপলা! কী সব যা-তা কথা বলছিস্! কী এমন হয়েছে তোর যাতে করে·····

—কিছু না মা—কিছু হয় নি! আমায় একটু ঘুমুতে দাও! তুমি যাও দেখি এখন!

অনুনয়ের সঙ্গে আদেশের অগ্নি যেন উৎপলার কণ্ঠে! ওর মা মন্ত্রশ্রান্ত হয়েই যেন চলে গেলো, যাবার সময় শুধু বলে গেলো।

—থাক্-ঘুমো!—ঘরের বাইরে গিয়ে বললো, এই বয়েসে অনেক দেখলুম বাছা! এ আর এমন নতুন কি! মানুষের কত হয়, কত যায়!

কিন্তু উৎপলা ওসব শুনতে পেল না—শুনতে চাইলো না। সে শুধু ভাবছিল স্বার্থান্বেষী পৃথিবীর কথা, স্বার্থপর মানুষের কথা, স্বার্থ-জড়িত সংসারের কথা! শুয়েশুয়েই ভাবছিল উৎপলা। তিনি-চারটে বছরের ঘটনাগুলো ওর জীবনের উপর দিয়ে ষ্টিম্-রোলারের মত চলে গেছে। ওকে থেঁতলে, পিষে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল—অথচ মেরে গেল না। ওকে বেঁচে থাকতে হবে—জীবনের রিক্ততাকে উপভোগ করবার জন্যই ওকে বেঁচে থাকতে হবে।

কিন্তু উৎপলাই একমাত্র নয়—আরো অনেকে, হাজার হাজার—কন্যা, বধূ, কুলনারী মহারণের মরণোৎসবের মধ্যে জীবনের উৎসবও সম্পন্ন করেছে! উৎসব! হাঁ, ক্লাবে, ক্যাম্পে—পানে—ভোজনে,—লীলায় বিলাসে পূর্ণাঙ্গ উৎসব। এই উৎসবের প্রেরণার পেছনে ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আত্মীয়তা—অর্থ! আরো ছিল আপনার জনের সমর্থন, আর আপনার পরাধীনতার অসহায়তা। কিন্তু এ সব ভেবে আর কিছু ফল নেই। যদি বেঁচেই থাকতে হয়, তবে এদিনের কথা ভুলে যেতে হবে। ভুলে যেতে হবে কবে কোন্ শ্বেতবরণ জন্তু উৎপলার শরীরের মাংস খুব্‌লে খেয়েছে, তীব্র পানিয়ে উচ্ছিষ্ট করেছে, কুৎসিৎ ভাষণে কলঙ্কিত করেছে।

কিন্তু ভোলা যায় না। প্রথম যৌবনের গোপন প্রেমের একটা কথা মনে পড়ে গেল উৎপলার। কথাটা বিকাশকে নিয়ে, ইচ্ছা ছিল বিকাশের উৎপলাকে বিয়ে করবে। বড় লোকের ছেলে বি. এ. পড়তো—স্বপ্ন দেখতো উৎপলাকে পাশে বসিয়ে কবিতার—

"এইখানে এই তরুতলে তোমায় আমায় কুতুহলে
এ জীবনের যেকটা দিন কাটিয়ে যাব প্রিয়ে—"

কিন্তু গরীব বাবা দিতে পারলো না উৎপলাকে বিকাশের হাতে। বিকাশ কোথায় আছে, কে জানে। উৎপলার ইচ্ছা করছে, আর আজ এই পর্য্যুষিত দেহমন নিয়ে একবার তার সঙ্গে দেখা করে আসবে। শুনে আসবে, সে কি বলে। সেদিন টাকার জন্য বিকাশের বাবা উৎপলাকে ঘরে নেয় নি। আজ উৎপলা অনেক টাকা দিতে পারে—অনেক হাজার টাকা। আজ কি বিকাশের বাবা টাকার সঙ্গে উৎপলাকেও নিতে পারে? না—উৎপলার টাকা হয়েছে কিন্তু তার বিনিময়ে দিতে হয়েছে সর্ব্বস্ব, যুগ যুগ ধরে যে শুচিতা রক্ষা করে এসেছে হিন্দুনারী উৎপলার সেই শুচিতা নষ্ট হয়ে গেছে। উৎপলা হত্যা করেছে তার সংস্কার-সংস্কৃতিকে, তার আভিজাত্যকে, তার জন্ম ক্ষেত্রকে।

কিন্তু এসবই ভুলে যাবে উৎপলা। ভুলে তাকে যেতেই হবে—নইলে সে বাঁচতে পারবে না। কোনো রকমে দিন কয়েক ঘরের মধ্যে থেকে, শরীরটা একটু ঠিক করে নিয়েই উৎপলা আবার বেরুবে শিকার সন্ধানে। বাজারের মেয়েতে আর উৎপলায় আজ তফাৎ শুধু সরকারী ছাড় পত্রের। —উঃ—টুঁ—য়া—টুঁয়া—! কোথায় যেন সদ্যজাত ছেলে কাঁদছে। উৎপলা সচকিত হয়েই কোলবালিশটা টেনে নিল—না—না; ওর ভুল হচ্ছে। ওর তো ছেলে নাই। ছেলে আবার কখন হয়েছে ওর। ওতো কুমারী—ওর ছেলে হোতে নেই। ওর মাতৃত্ব-কোমল অন্তর আকস্মিক বেদনায় রক্তাক্ত হয়ে গেল—উঃ-উঃ! উৎপলা বালিশে মুখ গুজলো।

শান্তিকামী পৃথিবী! চতুঃশক্তির বৈঠক হচ্ছে—কখনোবা তিন প্রধানের আলোচনা চলছে; যুদ্ধবন্দীদের বিচারের প্রহসনও চলছে ঐ সঙ্গে এবং আরো অনেক কিছু চলছে; তার সঙ্গে চলছে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের একটা অতি গুরুতর অধ্যায় রচনা। ইতিহাস কেমন

হতে পারে তাই নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে, এমন কি—ঘোষণা করেছেন—'স্বাধীনতা এসে গেছে'—এবার ভাগাভাগি হোক। গান্ধী মহারাজও বলেছেন—'স্বাধীনতা আর দূরে নহে; স্বাধীন হইবার জন্য প্রস্তুত হও' জহরলালজী রাষ্ট্রপতি হবার অনুমোদন পেয়েছেন—কাশ্মীরে যাবার জন্য তিনি বীর হুঙ্কার দিচ্ছেন; ওদিকে ভারতের দেশীয় রাজ্যের অলিতে গলিতে চলেছে অত্যাচার, উৎপীড়ন, অমানুষিক হত্যালীলা! ইংরাজের সহিত বাৎসল্য দিনে দিনে বেড়ে উঠছে ভাগ-বাঁটোয়ারার বানর বুদ্ধিতে—বিড়ালের ভাগে পিষ্টক কবে পড়বে কে জানে। ইত্যাকার যখন পৃথিবীর শান্তিময় অবস্থা তখন অশান্তির কথা লেখা অন্যায় হবে—তাই শান্তির খোঁজ করতে হোল। জিনিষ পত্রের দুর্মূল্যতা আর কালো বাজারের কসরতীতে মানুষগুলো যখন প্রায় হন্যে কুকুরের মত মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছে, তখন একদল চালাক মানুষ রাশিয়ার বুলি আউড়ে নেতা হয়ে উঠলো রাতারাতি—তারপর সুরু হোল ধর্ম্মঘট—গণ বিক্ষোভ, পিকেটিং এবং পকেটমারা। মানুষের লাঞ্ছনার অন্ত রইল না—দেশের মানুষেরই কথা বলছি! ধর্ম্মঘট করে মালিকদের জব্দ করতে গিয়ে ওরা জব্দ করলেন দেশবাসীকে বেশী। কারণ মালিকরা বহু অর্থ কামিয়ে বসে আছেন অনেক আগেই। যুদ্ধের বাজারে যখন মালিকদের কাছে একটি কর্ম্মী-মানুষের দাম ছিল লক্ষ টাকা—যখন ধর্ম্মঘট করলে মালিকরা শ্রমিকের পায়ে ধরতেও কসুর করতো না—তখন এদের দল ঘুমুচ্ছিলেন না,—জনযুদ্ধ করছিলেন। পাঁচটা পুরো বছরের যুদ্ধকালে কোথাও কোন ধর্ম্মঘট হয়েছে বলে শোনা যায়নি—হোল আজ—শান্তির আবহাওয়াকে বিষাক্ত করার জন্য। তাও একসঙ্গে একদিনে সবগুলো হলে হয়তো অচল অবস্থার সৃষ্টি হোতে পারতো, কিন্তু কায়দা করে একটার পর একটা করে ধর্ম্মঘট বাধানো হচ্ছে; আর শ্রমিকদের পাঠানো হচ্ছে দেশবাসীর সমর্থন এবং চাঁদা যোগাড় করতে। খবরের কাগজগুলিতে বড় বড় আর্টিকেল লিখে

ধর্ম্মঘটীরা জানাতে চাইছেন—আজ তাঁরা না খেয়ে মরতে বসেছেন। ধর্ম্মঘট একান্ত দরকার—না হলেই চলবে না। কিন্তু অশ্চর্য্য এই যে কিছুদিন আগে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন তাঁদের বেশ চলে যাচ্ছিল ঐ মজুরীতেই!

কিন্তু কেন এমন হচ্ছে! হচ্ছে কেন—ভাবতে গেলে বহু কথা এসে পড়ে। তার প্রধানতম হচ্ছে, স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুপণে অগ্রসর ভারতের চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করা, বিপর্য্যস্ত করা—বিপন্ন করা, বিলম্বিত করতে হবে স্বাধীনতার স্বীকৃতিকে—তাই রকমারী ফিকির, রহস্যঘেরা চক্রান্ত—রকম রকম বিভেদ-বিদ্বেষ-বিপ্লব-বুলেট্! অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করেই বেশ আছ—স্বরাজের স্বপ্নও মাঝে মাঝে দেখো—ওটা স্বপ্নেই থাক ওর বাস্তবরূপ তোমাদের দেখতে নেই—পাপ হবে!

উৎপলা আকাশের পানে চেয়েই শুয়েছিল—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—জয় হিন্দ, পুলিশ জুলুম বন্দ্ করো—ইত্যাদি ধ্বনির গম্‌গম্ শব্দ কাণে এলো। ওর শয্যা চার তলায়—প্রায় আকাশের কাছাকাছি, কাজেই ঠিক ঠিক ও ধরতে পারছে না শব্দটা কিসের। তবে একটা যে প্রশেসন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু উঠে বসে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখবার মতও মন বা শরীরের অবস্থা নয় ওর! শুয়েই ভাবতে লাগলো—দেশে জাগরণ এসেছে, এই কথাই বলছে সকলে। গণ-শব্দটার ইদানিং বহুল প্রচলন হয়েছে। নিতান্ত নিরক্ষরের মুখেও শোনা যাচ্ছে এই 'গণ'—কথাটা! খুবই আশা এবং আনন্দের কথা। গণমন জাগলেই বিদেশী শাসকের শোষণশক্তি রুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু স্বদেশী শাসক! উৎপলা তার জীবন দিয়ে অনুভব করেছে যুদ্ধের গ্লানি, যুদ্ধোত্তর কদর্য্যতা। কিন্তু উৎপলাও দেশের মেয়ে, দেশকে সেও ভালবাসে; দেশের স্বাধীনতার জন্য তার আকাঙ্ক্ষাও কিছু কম নয়। হতে পারে, উৎপলা আজ অপমানিতা, অনাদৃতা, অসহায়ভাবে লাঞ্ছিতা কিন্তু উৎপলার অপরাধ তাহিত কতখানি—ভগবান জানেন।

গোলমালটা নিকট হয়ে আসছে। সামনের বড়ো রাস্তা দিয়েই যাচ্ছে মিছিল। নিশ্চয় ধর্ম্মঘটের মিছিল। উৎপলা শুয়ে শুয়েই অনুমান করছে। ধর্ম্মঘট, শ্রমিক জাগরণ, শ্রমিকের দাবী—মজুরী বাড়াও! ওদিকে শাসকের আশ্বাস—ফসল বাড়াও; ধন বৃদ্ধি কর—সম্পদ বাড়ুক—শিল্পে এবং কৃষির খরচখাতে মোটামোটা অঙ্কের টাকা, আর বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞের বরাদ্দ হোক;—গৌরী সেনের টাকা যত খুসী খরচ হোক! কণ্ট্রোলের সঙ্গে কাঁচা টাকার যোগ-সাজশ করে চুরির পথে সদুপায়ে উপার্জ্জন চলুক। এখানে, এই আত্মজ্ঞানের পথে জাতিভেদ নাই, ধর্ম্মাভেদ নাই,—প্রয়োজনের স্বার্থে এই লুণ্ঠনের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠছে দিনে দিনে। নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্য তাই কমানো চলে না, খাদ্যদ্রব্য তাই অপচয় না করলে চলে না—আবার প্রচুর অর্থব্যয় করে বিজ্ঞাপন না দিলেও চলে না—অপচয় নিবারণ করো, অল্প খাদ্য গ্রহণ করো,—নষ্ট করিও না—দেশের প্রত্যেককে বাঁচতে দাও—চমৎকার! এর ইতিহাস আজ কালোবাজারের অন্ধকারে তলিয়ে রইল, কিন্তু দিন আসবে, সেদিন ঐ অন্ধকারকে বজ্রের আলোকে বিদীর্ণ করে আবিষ্কার করবে অনাগত ভবিষ্যৎ-সন্তান অন্ধকার এই স্বার্থলোভী শয়তানদের। সেদিন ওরা হয়তো ফাঁসিকাঠে ঝুলবার জন্য বেঁচে থাকবে না—কিন্তু ওরা যাদের জন্য এই সম্পদ আজ আহরণ করছে, তারাই তখন হবে ওদের বিচারক। তারা—ওদেরই সন্তানগণ!

সন্তান! চমকে উঠলো উৎপলা। আপনার সন্তান একদিন বিচারকের পদে আসীন হতে পারে, মা-বাবার কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারে, কেন তাকে পৃথিবীতে আনা হয়েছিল—পাপের পথে কেন তার জন্মদান করলো তার পিতামাতা! হ্যাঁ, নিশ্চয় কৈফিয়ৎ চাইতে পারে! উৎপলার কাছেও কি তার গর্ভজাত সন্তান কোনোদিন কৈফিয়ৎ চাইতে আসবে নাকি? না-না—সে তো এ পৃথিবীতে নেই আর!

উৎপলা নিজের হাতে তার গলা টিপে শেষ করে দিয়েছে। ভারী সুন্দর হয়েছিল সে—গলা টিপতে বড্ড মায়া করছিল উৎপলার, কিন্তু উৎসাহ দিচ্ছিল উৎপলার মা। উৎপলা শেষ পর্য্যন্ত শেষ করে দিল ছেলেটার নিশ্বাস। মনে পড়ছে—বেশ মনে পড়ছে, ঐ টুকু বাচ্ছা কি-রকম আকুলি ব্যাকুলি করেছিল—কি-রকম হতাশ চোখে অভিযোগ জানিয়েছিল—উঃ! পৃথিবীর সব আলো ঈশ্বর, তখন নিবিয়ে দিয়েছিলেন বর্ষা ধারা দিয়ে। বিদ্যুৎও জ্বলেনি একবার, কিন্তু উৎপলার মা, গর্ভধারিণী স্বয়ং দাঁড়িয়ে ছিল, একশ বাতির ইলেক্ট্রিক আলো জেলে। সেই আলোতে দেখেছিল উৎপলা ওর মুখ! কচি পদ্মফুলের মত মুখখানা—চীনা দুটি নীলাভ চোখ আর লতানো চুলগুলি! কেন দেখেছিল উৎপলা। ঈশ্বর দেখাতে চান নি তাই অত দুর্য্যোগ ছিল আকাশে, হয় তো শয়তানও চোখ বুজেছিল তখন কিন্তু জেগেছিল উৎপলার মা। আশ্চর্য্য! মা নিজে কিছুই করলো না—শুধু নির্দ্দেশ আর উপদেশ দিল। এমন কি, ঐ দুর্য্যোগের মধ্যেও বাইরের ডাষ্টবীন পর্য্যন্ত উৎপলাকে যেতে হোল অতরাত্রে একা। মা জানে ও কাজ বড় বেশী পাপের কাজ। নিজের হাতে ওকাজ না করে মা পাপটাকে এড়িয়ে গেল! কী চালাক মেয়ে মা! পাপটা হোল এখন উৎপলার—একার উৎপলার কিন্তু……উৎপলা মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে নিলো।

উচ্চ কলরোল আকাশে গিয়ে উঠছে। উৎপলার ঘরেও এসে পৌছালো। রুক্ষ, দুর্ব্বল দুঃখপীড়িতা উৎপলা বিরক্ত হচ্ছে, কিন্তু কিসের এতো গোল? দেখতে ওর আগ্রহটা ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগলো। মেয়েদের মনের চিরন্তন কৌতুহল ওকে উঠতে বাধ্য করলো বিছানা ছেড়ে। জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো উৎপলা। নীচে বড় রাস্তায় বিরাট মিছিল। বড় বড় সব অক্ষরে কত কি লিখে রেখেছে—তার মধ্যে কাস্তে-কুড়ুল বেশ স্পষ্ট। শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের মিছিল নিশ্চয়, কিন্তু ওর

মধ্যে অনেক মেয়েও রয়েছে। হবে—আজকাল তো শ্রমিকদের মধ্যে মেয়েরাও কম নেই। উৎপলা নিজেই তার একটা বড়ো প্রমাণ। গৃহকোণ-বাসিনী নারীকে আজ পথে বের করেছে পাশ্চাত্য সভ্যতা। সংসারের শৃঙ্খলা রক্ষায় যে ছিল কম্যাণ্ডার-ইন্-চিফ—বাহিরের বিশ্বে সে পদাহত পদাতিক হবার সাধনায় মেতেছে। যুগ-যুগান্তরের সংস্কৃতির বাহিকারূপে যে জন্ম দিত ভবিষ্যত-জীবন বর্ত্তিকার—সে আজ সংস্কার মুক্তির বিভ্রান্তিতে যন্ত্রদানবের পরিচর্য্যায় লেগেছে! জীবনের ধারাকে বহমান রাখবার জন্য যে-নারীর সৃজনীশক্তি সন্তান ধারণ আর পালনের সীমায় বন্দী ছিল—সে বন্ধনকে সে আজ অস্বীকার করছে লেবরেটরীর বৈজ্ঞানিক শক্তিবলে! হয়তো অদূর ভবিষ্যতে পুরুষায়িত এই নারীকুল পুরুষেই পরিণত হবে—কিম্বা পৌরুষশক্তিতে পৃথিবীকে যন্ত্র করে তুলবে! যান্ত্রিক করে তুলবে জীবনের ভ্রূণাঙ্কুরকে টেষ্টটিউবে—তার সূচনাও দেখা দিয়েছে!

কিন্তু উৎপলার অকস্মাৎ চোখ পড়লো ঐ মিছিলের পরিচালকের দিকে! বিকাশ—না? এত উঁচু থেকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। উৎপলা তাড়াতাড়ি ড্রয়ার টেনে বাইনোকুলার বের করলো। সুন্দর দামী বাইনোকুলার কোন এক বিদেশীর কাছ থেকে উপহার পাওয়া—মনে পড়লো উৎপলার নিজেকে পণ্য নারীর মত মনে হচ্ছে ওটা হাতে করে; অথচ একদিন ঐটা মহা সমাদরে সে উপহার গ্রহণ করেছিল তার কাছ থেকে! এবং আরেক জনের কাছ থেকে একটা ভালো ক্যামেরা। ঐ ড্রয়ারেই রয়েছে সেটাও। কিন্তু এ সব ভেবে মন খারাপ করে কি আর হবে। ঐ লোকটা বিকাশ কি না, দেখা দরকার। উৎপলা জানালায় এসে বাইনোকুলার চোখে দিল। চাকা ঘুরছে! হ্যাঁ,—বিকাশই! উচ্চকণ্ঠে সেই চীৎকার করছে—আমাদের দাবী—পুলিস জুলুম—বাকি লোকারণ্য থেকে ধ্বনিত হচ্ছে—মানতে হবে—বন্ধ করো! ইত্যাদি, বিকাশ তাহলে লীডার অর্থাৎ নেতা হয়ে উঠেছে! বাঃ ঐ

কাপুরুষ নারীলোভী কুকুরটাও নেতা হোল! কাদের নেতা ও? কোন হতভাগ্য নির্ব্বোধদের! কিন্তু নেতা মাত্রেই বুদ্ধিমান, আর বক্তা—এদুটো গুণ না থাকলে নেতা হওয়া চলে না। বিকাশের ছিল—ঐ দুটো-গুণই অত্যন্ত বেশী ছিল বিকাশের। কলেজে পড়বার সময়ই উৎপলা তাকে জেনে আকৃষ্ট হয়েছিল তার দিকে—তার পর আরো বহুদূর এগিয়ে যায় দুজনে।

হ্যাঁ ঐ তো, আজো ওর পাশে রয়েছে দুটি মেয়ে একটি কালো, বেঁটে, দাঁত উঁচু স্থূলাঙ্গী, প্রৌঢ়া, কিন্তু অন্যটি উৎপলা গভীর মনোযোগ দিয়ে বাইনোকুলারে কাচের ভেতর দিয়ে দেখতে লাগলো—হ্যাঁ, অপরূপ কিছু নয় তবে তন্বঙ্গী, গৌরাঙ্গী আর যুবতী। বিকাশের ভোগের যোগ্য সামগ্রী! নেতা বিকাশ—জয় হোক ওর নেত্রীত্বের!

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচ্‌কিয়া বাইনোকুলারটা নামিয়ে রাখলো উৎপলা। ওর আর দেখতে ইচ্ছে করছে না! কিন্তু এ দেশের মানুষগুলো কী নির্ব্বোধ! যে-ওদের সর্ব্বনাশ করে, ওদের সর্ব্বস্ব চুরি করে ওদের ঘরের বধূ-কন্যাকে অপমান করে, সেই হয় ওদের দলপতি। ওরা শক্তের ভক্ত। হুম্‌কীতেই ওরা জব্দ, ওদের জন্য ঈশ্বরের করুণা চাইতে হয়। ওরা নেতা বানায় তাকেই যে জোর গলায় প্রচার করতে পারে, সেই এক এবং অদ্বিতীয় নেতা। ওরা হাজার হাজার টাকা তুলে দেয় তার হাতে, যাকে একবার স্বীকার করে নেতা বলে;—তার পর আর বিচার করতে চায় না—বিবেচনা করে দেখে না, নেতার গুণ ওর আছে কি না? চিরদিনের ভক্তিবাদী অন্ধ চৈতন্য এই হতভাগ্য দেশ এমন পাথরের ঈশ্বরের পূজো ছেড়ে রাজনৈতিক নেতার পূজোয় মেতেছে। সে পূজোর অন্য মন্দির গড়তে ওরা সতত প্রস্তুত, নিজের জীবনকে বলি দিয়েও। প্রণাম আর পূজাতেই ওদের স্বাধীনতা লাভ হবে; কাজেই নেতার সব থেকে বড়ো ধূর্ত্তামী হচ্ছে রাজনৈতিক বুলিতে ধর্ম্মের কোটিং;—অর্থাৎ আবরণ

দওয়া! বিকাশও তাই করছে—উৎপলা শুনতে পেল 'জীবনকে আমরা সুন্দর করতে চাই, সুষমাময় করতে চাই, সার্থক করতে চাই—আমরা চাই ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করতে! কোনো জাতিকে পরের অধীন রাখা নিশ্চয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়—তাই আমাদের মধ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন গণদেবতা রূপে, গণচেতনার মধ্যে.....'

মিছিলটা দূরে চলে গেল, তার সঙ্গে বিকাশও। উৎপলা আর শুনতে পেল না—শুনতেও চাইলো না। অকারণে ঈশ্বরকে ডেকে কাকুতি জানাবার ও পক্ষপাতি নয়। ব্যাচারা ঈশ্বর সব সময় সকলের কাজের কৈফিয়ৎ দেবেন—শুনলে হাসি পায়। যুদ্ধের সময় হিটলার বলতো, 'ঈশ্বর জার্মেনীকে পৃথিবী শাসন করতে পাঠিয়েছেন'—জাপান আরো এক কাঠি বেশী বলতো—'তারা ঈশ্বরের পুত্র!' ইংলণ্ড-আমেরিকাও কিছু কম বলতো না। হাজার হাজার মানুষের হত্যার উৎসবেও ঈশ্বরকে ডাকতে ওরা লজ্জা বোধ করে না। যে-স্বদেশ রক্ষার জন্য ওরা ঈশ্বরকে ডেকে একাগ্রী বাণ ছাড়ে—সেই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একটু মুখ ফোটালেই ওরা ঈশ্বরকে ডেকে জেলে ভরে ঈশ্বর পরায়ণ অপরাধীকে! ভাগ্যিস্ ঈশ্বর ছিলেন—নইলে .....হাঃ হাঃ হাঃ!

হেসে উঠলো উৎপলা আপন মনে! ওর মা একটু আগে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছিল গোপনে। হাসি শুনে আতঙ্কিত হয়ে কাছে এলো। সস্নেহে বললো—কি হোলরে? হাসছিস?

—কিছু না! এমনি! উৎপলা সাম্‌লে গেল!

দুধের গেলাসটা উৎপলার ঠোঁটের কাছে ধরে ওর মা বলল—খা!

নিঃশব্দে খেল উৎপলা; খেয়ে আবার বিছানায় এসে শুলো। শুয়ে থাকতে বড্ড ভালো লাগছে ওর। কতদিন এমন করে একলা ঘরে আরামে যেন ও শুতে পায় নি! মা চলে গেলে উৎপলা ভাবলো,—বিকাশ নেতা হয়েছে। পয়সা আছে, গাড়া-বাড়ীও আছে—আসবে।

নেতা হতে হলে ওসব দরকার—তার পর বাকি সব আপনি জোটে! চিত্তরঞ্জনের মতন কে আর সর্ব্বস্ব বিলিয়ে নেতা হবে, বলো?—সেনগুপ্তের মতই কি সবাই নেতৃত্বের জন্য না খেয়ে মরবে? সুভাষের মত কেইবা রাজার ঘরে জন্মে ভিখারীর বেশে স্বেচ্ছানির্ব্বাসন নিতে যাবে দেশের জন্য? ওরকম করলে কি আর সংসারে বাস করা যায়? নেতা হয়ে দুপয়সা কামাতে হবে, টাকার তোড়ায়, ফুলের মালায় আর খবরের কাগজের ঢাকে আর চাটুকারের তোয়াজে ফুলে না উঠলে নেতা কি? মিল-ওনার আর মালটিমিলিওনিয়ার হবার ঐ তো বড়ো রাস্তা! বিশেষ এদেশে। কিন্তু ওসব ভেবে লাভ কি উৎপলার। চুলোয় যাক্! উৎপলা এখন নিজে কি করবে তাই ভাবা উচিৎ ওর। কী আর করবে উৎপলা! সিনেমায় অভিনয় করবে কিম্বা সেবিকা হয়ে যাবে হাসপাতালে। কিম্বা ভিক্ষে করবে—না হয় যোগিনী হয়ে বসবে!

ঊর্দ্ধে আলো-ঝলমল আকাশের পানে চেয়ে আলোক দেখলো, বেলা বেড়েছে, অফিসের বাবুরা প্রায় সকলেই চলে গেছে, ট্রাম-বাসের ভিড়ও কমে আসছে ক্রমশঃ। এবার ওকে এখান থেকে উঠে কোনো একটা কিছু করবার চেষ্টায় যেতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে? যেতে মোটে ইচ্ছে করছে না ওর। চাকরীর চেষ্টা করবার মত মন আর নেই; কার জন্য করবে চাকরী! মা নেই, মাতৃভূমির মুক্তির জন্য কারাবরণ করে ফিরে এসে ও মার পদধূলি নিতে পেলে না। মন যেন টন-টন করে উঠলো আলোকের—চোখদুটো জলে ঝাপসা হয়ে আসছে।

—আপ্ রোতে হেঁ বাবুজি! কাহে! কি হইছে আপনাগার, বাবু?

প্রশ্নটা করলো রামধনিয়া। ওদের দল এখনো বসে রয়েছে ওখানে, কেউবা শুয়ে। ঝুমনির জ্বর, তাই রাধিয়া আর রামধনিয়া তার কাছেই বসে আছে। একটা ভাঙা টিন, পোলসন্‌শ মাখনের খালি টিন কুড়িয়ে

এনেছে, তাতেই জল রেখেছে ঝুমনীর জন্য! মাখন যারা খাবার, খেয়ে গেছে, ফেলে দিয়ে গেছে ভাঙ্গা টিনটা! এমনি যেদিন ওরা চলে যাবে—চলে একদিন যেতেই হবে ওদের—সেদিন ফেলে যাবে খোসাটা মাত্র। আলোক রামধনিয়ার পানে চাইল, উত্তর দিল না কিছু, ভাবতে লাগলো। ঝুমনির জ্বরটা বেশ জোরে এসেছে, মাথায় জলপটি দিলে জ্বর একটু নামতে পারে। আলোক উঠে এসে ময়লা ন্যাকড়ার একটা ফালি ভিজিয়ে ঝুমনির কপালে জলপটি লাগিয়ে দিল। নাড়ী দেখলো ঝুমনীর, —প্রবল জ্বর।

আম খাইয়ে সেই ছেলেটা যে কোথায় গেল কে জানে, আলোক শুধুলো—কিশোর কোথায় গেল?

—ক্যা জানে, কুছ ধান্দামে গিয়া হোগা!—রাধিয়া বললো। বলার সুরে যেন আবেগ বা আত্মীয়তার লেশমাত্র নেই; অথচ আলোক গত রাত থেকে দেখছে, নওল কিশোরকে নিয়ে এরা কর্জনায় যেন একটি যাযাবর পরিবার! নওল কিশোর যেন ওদের বাড়ীর কর্ত্তা—কিন্তু রাধিয়া কেন অমন নির্লিপ্ত সুরে কথা বললো? কেন বললো, তা বুঝতে দেরী হোল না আলোকের। এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে, অথচ প্রত্যেকে স্বাধীন; আবেগ বা উদ্বেগ প্রকাশ করা ওদের কাছে বাহুল্য! ওরা সকলে পৃথক হয়েও এক, আর এক হয়েও পৃথক! পারিবারিক বন্ধনের সামাজিকতা ওদের নেই, অন্তরের দরদ ভাষায় প্রকাশ করতে ওরা অক্ষম—আপনাকে অপরের গলগ্রহ ভাবতে ওরা লজ্জিত। তাই নির্লিপ্তভাবটাই প্রকাশ পায় ওদের কথায়—কিন্তু সত্যি ওরা নির্লিপ্ত নয়, তার বড়ো প্রমাণ ঝুমনির জ্বরের এই শুশ্রূষা!

শুশ্রূষাতেই কিন্তু সারবে না—ওষুধ পথ্যেরও দরকার। কিন্তু কোথায় ওরা পাবে? ওদের জন্য ভাববার কেউ নাই; ওরা জন্তু থেকেও নীচে। গৃহপালিত পশুরও আশ্রয় থাকে, অসুখে ওষুধের ব্যবস্থাও থাকে, ওদের

তাও নেই। ওরা পরাধীন দেশের সন্তান, সর্ব্বহারার সন্তান—ওদের ভগবানও নেই! তবু ওরা ভগবানকেই ডাকে—ডেকে মরে। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের কবিতা :—

'বারেক ডাকিয়া দরিদ্রের ভগবানে, মরে সে নীরবে।'—হ্যাঁ নীরবেই মরবে। এদের নীরব মৃত্যুকে সরব করবার জন্য, সহস্র কণ্ঠে বজ্রঝঞ্ঝনা বাজিয়ে তোলবার জন্য কোনো জাতীয় ইতিহাস রচিত হবে না—জাগরণী গান গাওয়া হবে না!

কিন্তু এ সব ভাবা বৃথা। আলোক শুশ্রূষার ভার রাধিয়ার হাতে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। যদি কোনো পথ্য যোগাড় করতে পারে। তাছাড়া এমন করে এখানে বসে সময় কাটালে তারও চলবে না। জীবনের রুদ্র রূপকে যতদূর সম্ভব সে প্রত্যক্ষ করবে। পার্ক থেকে বেরিয়ে এলো আলোক। বিরাট প্রসেশন চলেছে রাস্তায়। ত্রিবর্ণ পতাকা, কাস্তে-কুড়ুল মার্কা পতাকা আর একরকম অদ্ভুত পতাকা—আলোক জানেনা, ঐ পতাকা কাদের জাতীয়তা-যজ্ঞের ঊর্দ্ধশিখা।

এই প্রবহমান জনস্রোতে আলোকও ভেসে পড়লো। ওদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চৈস্বরে ধ্বনি করলো কয়েকবার—বেশ মজাই লাগছিল প্রথমটা; কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই আলোক নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো। ওর যেন বড্ড ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। কিসের এই শোভাযাত্রা—কাস্তে কুড়ুলের সঙ্গে এদের কি সম্পর্ক এবং এরা কে—আলোক কিছুই জানে না, অনর্থক এদের সঙ্গে ঘুরে সময় নষ্ট করতে ওর ইচ্ছে হলো না—দল ছেড়ে চলে আসছে, হঠাৎ নজরে পড়লো, নওল কিশোর একটা কাস্তে-কুড়ুল মার্কা পতাকা নিয়ে দলের মধ্যে হাঁটছে।

—কী ব্যাপার? তুমি এ দলে?—আলোক গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

—হুঁ, বাবুজী, কুছ দানাপানির যোগাড় করতে হবে, সেই ফিকিরে আছি।

—মিলবে দানাপানি ?—এরা কারা ?

—ক্যা জানে ! তব্ ইন্‌লোক জরুর কুছ খানাপিনা করবে, সরবৎ, আইসক্রীম, লেবু, সন্দেশ-রসোগোল্লাভি খাবে। হামি ভি কুছ কুছ পাইয়ে যাবে।

—ও—আচ্ছা ! বলে আলোক বেরিয়ে পড়লো। কিশোরের হিন্দি-বাঙ্গালা মেশানো কথার অর্থ সে যা বুঝলো, তাতে মনে হলো, ঐ প্রসেশন কোথায় যায়, এবং কি করে, কিশোর তার কিছু কিছু খবর রাখে। আলোক ওদের সঙ্গে গিয়ে ব্যাপারটা ভাল করে জানতে পারতো কিন্তু শরীর-মনের ক্লান্তি এবং ভবিষ্যতের চিন্তা ওকে অন্য পথ ধরালো !

যাচ্ছে। অনেক দূর চলে এলো আলোক। আপনার মনেই হাঁটছিল। —রোদটা রাস্তার এইদিকে খুবই প্রখর ; অন্য দিকে বড় বড় বাড়ীর ছায়া পড়েছে ফুটপাতে। রোদের দিকটা ছেড়ে আলোক ছায়ায় হাঁটবার জন্য রাস্তা পার হয়ে এ-ফুটে আসছে—প্রকাণ্ড একখানা দোতালা বাস সবেগে আসছিল, আলোক অন্যমনস্কতার জন্য প্রায় চাপা পড়ে আর কি—ড্রাইভার কদর্য্য একটা গাল দিয়ে গাড়ী প্রায় থামিয়ে দিল—আলোক ছুটে এসে উঠলো এ-ফুটে।

বহুদিন কলকাতার পথে হাঁটেনি আলোক, অভ্যাস নাই ওর সতর্ক-ভাবে চলার—খুব বেঁচে গেছে। বুকটা এখনো ধক্‌ধক্ করছে আলোকের। বাসখানা সম্পূর্ণভাবে না থামলেও একজন নেমে পড়লো—একটি যুবক, উমাপদ মুখুজ্জ্যে।

উমাপদ ডাক দিল বাস থেকে নেমেই—আলোক !

অকস্মাৎ নাম ধরে ডাক শুনে আলোক সচমকে ফিরে দাঁড়ালো। উমাপদ হেসে এগিয়ে এসে বলল,—কিরে ? কেমন আছিস্ ? ছাড়া পেলি কবে ! এখন করছিস কি ?

—ছাড়া পেয়েছি গত মাসে, করছি রাস্তায় রাস্তায় পায়চারী, আছি বহাল তবিয়তে!

উত্তর দিতে দিতে আলোক ফুটপাতে উঠলো। উমাপদও উঠলো। আলোক খানিকটা সুস্থ হয়েছে এতক্ষণে, বললো—তোর খবর কি? কোথায় যাচ্ছিস?

—চাকরীতে! ভাল একটা চাকরী মিলে গেছে ভাই। ভাগ্যিস হরিজন বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ছিলাম।

—চাকরী! বাঃ! আলোকের কণ্ঠের সাবাস ধ্বনিটা ব্যঙ্গের কাছাকাছি, কিন্তু উমা বললো,

—জানিস—দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে, তার সঙ্গে বাংলাদেশে নানারকম পরিকল্পনার জন্য মস্ত মোটা টাকার বরাদ্দ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে হরদম চাকরীতে লোক বাহাল হচ্ছে, অবশ্য সাম্প্রদায়িক হারাহারিতে। কাষ্ট হিন্দুর বিশেষ কোন আশা নেই—হ্যাঁ, হরিজন হয়ে যেতে পারবি? তাহলে আজই একটা চাকুরী পেতে পারিস!—উমাপদ বলেই চললো,

—আয় আমার সঙ্গে; বলবি যে তুই হরিজন ক্লাসের লোক—উপাধিটা স্রেফ ছেড়ে দে—নাম বলবি 'আলোক দাস' জাতি যা হয় একটা বলে দিবি, 'হরিজন জাতি' বল্‌লেও হবে। কাজ বিশেষ কিছু নেই, শুধু খোসা-মুদী করতে শেখা, সে বিদ্যায় পাকা হলেই উন্নতি হবে। ওদের দলে থাকতে পারলেই উন্নতি—ব্যাস্। —ব্যাস্।—চল, যাবি?

আলোক মিনিট দুই কোন কথাই বলতে পারলো না, ভাবতে লাগলো। গ্রাম উন্নয়ন-পরিকল্পনার কথা সে কাগজে পড়েছে এবং তার জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ের কথাও অবগত আছে। এইসব পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে কি ভাবে কাজ চলছে, কি উদ্দেশ্যে কাজ হচ্ছে, সে সব কথাও আলোক জানে। ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য বিভাগের ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক তথ্য তার জানা হয়ে গেছে—কিন্তু আলোক সে সব ভাবছিল না—ভাবছিল এই

উমাপদর অধঃপতনের কথা। উমাপদ তার পাঠসঙ্গী—রাজনৈতিক জীবনেও উমা তার সাথী হয়েছিল, এমন কি সেদিন যখন আলোক ধরা পড়ে, তখনো উমাপদ তারই দলে—আর আজ সেই উমাপদ নিজেকে চাকরীজীবি ভেবে আনন্দ পায়! একটা ভাল চাকরী—যাতে অর্থ এবং অনর্থই বড় কথা, তাই পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়—এবং অপরকে সেই কাজ গ্রহণ করতে অনুরোধ করে' আত্মপ্রসাদ লাভ করে! কী ভীষণ দুর্গতি এই দেশের মানুষগুলোর হচ্ছে! উঃ! আজ বুঝতে পারা যায়, —গত আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে কত রকমের চাকরীর সৃষ্টি হয়েছিল এবং যুবশক্তি কিভাবে দাসত্বের নিগড় পরেছিল। মানুষের নৈতিক জীবনকে অর্থনৈতিক শোষণের দ্বারা এমন এক স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে যেখানে মানবত্ব বা দেশাত্মবোধ একান্তভাবে তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। আপনার দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ আজ এত বেশি আত্মহারা যে জাতিগত গৌরব, বংশগত মর্য্যাদা বা সংস্কারগত বিবেককে বিসর্জ্জন দিতে তার কিছুমাত্র বাধে না। লাভের লোভে নিজেকে সে আজ কুকুরের থেকেও নীচে নামিয়েছে—নীরন্ধ্র নরকে নামিয়ে দিয়েছে!

—যাবি! কথা বলিস না যে!—উমাপদ একটা দামী সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললো কথাটা। আলোক সিগারেট খায় না জানে, তবুও প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। আলোক গম্ভীরভাবেই বললো,

—না! স্বার্থের জন্য নিজেকে মিথ্যা পরিচয়ে পরিচিত করবার মত নির্লজ্জতা আমার নেই। বিশাল হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে আশ্রিত হয়েও যারা আজ বৈদেশিক বিভেদের সুবিধা গ্রহণ করবার জন্য নিজেকে বিশেষ কোন জাতি ভেবে গর্ব্বিত হয়, আমি তাদের দলের নই—সুবিধাবাদ আমার সয় না! তুমি যাদের হরিজন বলছো, তাঁরাও আমারই হিন্দুভাই। পৃথক একটা নাম সৃষ্টি করে আমি তাঁদের আত্মীয়তা হারাতে চাই না!

—কিন্তু নেতৃগণ সকলেই এর সপক্ষে।

—হ্যাঁ—লোকত্তর নেতাদের কথা আলাদা। কিন্তু আমি লোকায়ত্ত নেতার অন্বেষণ করছি! আজ ব্যষ্টির সুবিধা দেখতে গিয়ে সমষ্টির অগ্রগতি যে কতখানি ব্যাহত হচ্ছে সেটা ভেবে দেখছে ক'জন? ব্যষ্টিরও মঙ্গল হচ্ছে না।

উমাপদ আশা করতে পারে নি, বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোক এতবড় কঠোর মন্তব্য করবে। একটান সিগারেট টেনে দম ছেড়ে সে বললো আবার,—বিরোধ বিস্তর হলেও বর্ত্তমানে এই আমাদের পথ এবং আমাদের আশা।

—জীবনের রুদ্ররূপ যারা দেখেনি—তাদের কাছে আশা অনন্ত কিন্তু—মৃত্যুর শ্মশানে যারা শ্মশানচারী তারা ওসব কথার ন্যায়ের ফাঁকি ধরতে পেরেছে! যাঁরা আজ ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নিজেরাই ঈশ্বরের পর্য্যায়ে উন্নীত হচ্ছেন—মানুষের সুখ-দুঃখের ঊর্দ্ধে উঠছেন—আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অর্জ্জন করছেন, তাঁরা আমার নমস্য। কিন্তু এদেশে দরকার রাজনৈতিক নেতার—আধ্যাত্মিক গুরুর তো অভাব নেই! উপাসনা করলে কি ভাবে ভগবদ্দর্শন লাভ হয়, সে কথা জানবার অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতার দরকার হয় না, বেদ-উপনিষদ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে সে তত্ত্ব জানিয়ে গেছেন ভারতকে! ওদিকে রাজনৈতিক নেতাদের মুখে আধ্যাত্মিক বুলির সুযোগ বিদেশী শাসক গ্রহণ করতে ত্রুটি করছে না —বেশ দেখা যাচ্ছে—দেশের যুবশক্তি আজ ঐ আধ্যাত্মিক সুরের আশ্রয় গ্রহণ করেছে,—তার বড় প্রমাণ তুমি। তুমি মিথ্যা হরিজন পরিচয়ে চাকরী পেয়ে পরমার্থ লাভ করেছ—এমন বহুলোকেই করছে। কে করলো এই হরিজন জাতির সৃষ্টি? অথণ্ড হিন্দু কি জন্য বিভক্ত হোল? কার জন্য আজ প্রাদেশিক বিভাগ বণ্টন? হিন্দু-মুসলমান-শিখ-হরিজনে মারামারি-কাটাকাটি? তলিয়ে বুঝে দেখো, ইংরাজ নিজের সুবিধার জন্য যা করছে তাতে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছে কে! আগামী যুগের

ইতিহাস সেই সব লোকদের সমালোচনা করতে দ্বিধা করবে না। মনে রেখো, একটা জাতির জীবনে যাঁরা নেতৃত্ব করবেন, তাঁদের দায়ীত্ব কত বেশী—তাঁদের ভুল হওয়া কত মারাত্মক—তাঁদের ত্রুটি কত ক্ষমার অযোগ্য। তথাপি যাঁরা আজো দেশের নেতা, একদিন যাঁদের সুযোগ্য পরিচালনায় দেশ এতখানি এগিয়েছে—তাঁদের বারম্বার আমি নমস্কার করি! কিন্তু আজ দেশ চায় যোগ্যতম নেতা—যিনি জীবনকে রুদ্রের আহ্বানে সাড়া দিতে বলবেন। বজ্রের ঝঞ্ঝনায় এগুতে বলবেন! তোষণ এবং পোষণ নীতিকে যিনি ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করবেন।

উমাপদ কয়েক মিনিট কিছু না বলে সিগারেট টানতে লাগলো। আর একখানা বাস আসছে। ওতে চড়ে সে কর্ম্মস্থানে চলে যাবে—সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বললো—তাহলে যাবি না তো? আচ্ছা, আমি চললাম।

বাসে উঠে পড়লো সে। আলোক ফিরেও তাকালো না। এই সুবিধাবাদী লোকটির সঙ্গে কয়েকমিনিট কথা বলার জন্য ওর মনটা যেন খারাপ বোধ হচ্ছে! এর থেকে নওলকিশোরের দল কত ভাল, কত উজ্জ্বল!

আলোক একটা ডিম্বাকার পুকুরের কাছে এল—হেদুয়া! বসলো গিয়ে গাছের ছায়ায়। রাস্তার ট্রাম-বাস যথারীতি চলছে। মানুষের ভীড়ের জন্য মানুষের জীবন রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠছে ওখানে! এই নাগরিক সভ্যতার বিরুদ্ধে মন ওর বিদ্রোহ করেছে বরাবর। ওর নদীকূলের শান্ত পল্লীজীবন আজ আর ফিরে আসবে না; ওকে এই নাগরিক জীবনেই অভ্যস্থ হতে হবে! কিন্তু কেমন করে হবে! হবে একদিন, আর সেদিন খুব দূরেও নয়, কারণ ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ সবই সইতে পারে, সব নীচতাকেই আশ্রয় করতে পারে—তাই এদেশে এত ক্ষুধা, এত তৃষ্ণা জাগিয়ে রাখা হয়েছে। শ্বাপদ জন্তুর মত দীর্ঘদিন অনাহারে থাকার

পর, শ্মশানের মৃত দেহের সন্ধান দিয়েছে কে যেন তাদের। ক্ষুধায়, পিপাসার তাড়নায় ওরা ছুটছে—ওরা শব-খাদক শৃগাল। ওদের জন্য হাজার রকম অভাব সৃষ্টি করে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য দেবার সুমহৎ পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছে—আপনাদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে তাই খাবে ওরা!—আলোককেও যেতে হবে নাকি ঐখানে! না—আলোক যাবে না। প্রলোভনকে সে জয় করবে যেমন করে হোক! কিন্তু ক্ষিদে তার ইতিমধ্যেই ভয়ানক হয়ে উঠেছে। আলোক দীঘির ওপাশে তাকালো; কে একটা ভিখারিণী রাস্তার ধারে বসে—পাতা আঁচলে একটা কচি ছেলে। পয়সাও দিচ্ছে কেউ কেউ। আলোক আস্তে উঠে গিয়ে দেখলো, গত রাত্রের সেই মেয়েটি। শিশুকে আঁচল পেতে শুইয়ে সে জনগণের দয়া আকর্ষণ করবার দিব্যি সুব্যবস্থা করে নিয়েছে! বাঃ—বেশ বুদ্ধি তো! আলোক নিজের মনেই প্রশংসা করলো ওর—ঘৃণায়? নাকি গৌরবে?

পাঁচ হাজার একার জায়গা কেনা হয়ে গেছে নদীর ধারে। তিন চার খানা গ্রাম আর হাজার হাজার বিঘে ধানী জমি, তার সঙ্গে আম-কাঁঠালের ফলন্ত বাগান—মাছ ভর্ত্তি পুকুর—সব গেছে। জায়গাটায় নাকি গরু-ছাগল-ভেড়া ইত্যাদির চাষ হবে—আর গ্রাম উন্নয়ন স্কিমের কি-সব কাজ হবে। হবে অনেক কিছুই; হবার জন্য বিস্তর জায়গা পড়েছিল নদীর কিনারে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের নজরে পড়লো এই গ্রাম তিনখানা,—ভালো ভালো আমন ধানের জমিগুলো, গ্রামের মধ্যস্থ একটি প্রাচীন কালী মন্দির আর প্রাচীন বাস্তু ভিটে। ক্ষুদ্র জমিদার আর ক্ষুদ্রতম দীন প্রজাপুঞ্জের ক্ষীণতম আবেদন কারো কাণে পৌঁছলো না—গ্রামশুদ্ধ মানুষগুলো হণ্যে হয়ে কে-কোথায় চলে যেতে বাধ্য

হোল। সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে যাবার দিনে চোখের জল ওদের আগুনের চেয়েও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল কি না, কেউ খবর রাখে না—কারণ আজকার এই অতিমানবীয় যুগে চোখের জলের উত্তাপ নিতান্তই উচ্ছ্বাসের প্রলাপ। তাই গ্রামকে উৎসন্নে দিয়ে এই গ্রামোন্নয়ন। সমষ্টীর প্রয়োজনে ব্যষ্টির ত্যাগ আজ প্রয়োজনীয়, এই অজুহাতে ওদের জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর, পুকুর-বাগান, মন্দির-মসজিদ সব কেড়ে নিল অতিমানবের দল। ওরা নিঃসহায়, নিশ্চুপেই চলে গেল।

অবন্তীর বাবাও গেলেন। ছোট গ্রামের ছোট জমিদার তিনি; অতি মাত্রায় আধুনিকপন্থী মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে একবার বিলাত অবধি ঘুরে এসেছিলেন; নিজেকে অতিশয় বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ মনে করতেন। এ পর্য্যন্ত বহু টাকাই তিনি রাজসেবায় ব্যয় করেছেন এবং শেষে রায়বাহাদুরও হয়েছেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হোল না। প্রয়োজনের তাগিদে বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক,—তাঁর জমিদারী সমেত ঘরবাড়ী অপরপক্ষের দ্বারা ক্রীত হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে ভদ্রলোক পত্নী-কন্যাকে নিয়ে কলকাতা যাত্রা করলেন যে-কটা টাকা জমিদারী বিক্রির দরুণ পেলেন তাই সম্বল করে। অনেক পূর্ব্বেই একমাত্র পুত্র আগষ্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজদ্বারে অতিথি হয়েছে।

কিন্তু অনেকের ভাগ্যও ফেরে এইরকম বিপর্য্যয়ের মধ্যে। ঐ গ্রামেরই একটা ছোকরা—নাম সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী—গ্রামের পুরোহিত ঠাকুরের একমাত্র বংশধর—ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত পড়েই বুঝে নিয়েছিল যে বর্ত্তমানকালে পৌরহিত্য করবার জন্য আর বেশি বিদ্যার দরকার হয় না—কাজেই স্কুল ছেড়ে গাঁজা এবং তালের তাড়িতে বেশ লায়েক হয়ে উঠেছিল। এবং আনুষঙ্গিকভাবে গ্রামের দু'চারটি দুশ্চরিত্রা মেয়েদের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা ঘনায়মান হচ্ছিল বিশেষভাবে। পিতৃ বিয়োগের পর সিদ্ধেশ্বর বিঘে চার পাঁচ ধানী জমি আর প্রায় বিঘে পঞ্চাশ ব্রহ্মোত্তর

ব্রহ্মডাঙ্গার মালিক হয়ে পড়লো; হাতে এল গ্রামের যজমানগুলোও! বছরখানেক বেশ কেটে গেল, কিন্তু যজমানেরা অবিলম্বে বুঝতে পারলেন যে এরকম পুরুত দিয়ে ধর্ম্মের কাজ করানোতে অধর্ম্মই অনেক বেশি হচ্ছে—তাঁরা ভিন্ন গ্রাম থেকে পুরুত আনতে লাগলেন। গাঁজা-মদ-তাড়ির খরচে টান ধরায় সিদ্ধেশ্বর পৈতৃক ধানী জমিটুকু বিক্রী করতে বাধ্য হোল—বেশ চললো আবার দিনকতক। তারপরই এলো পঞ্চাশের মহামন্বন্তর। সিদ্ধেশ্বর অকূল পাথারে ভাসলো, তার পঞ্চাশ বিঘে ব্রহ্মডাঙ্গায় কোনো ফসল জন্মায় না—পাথুরে মাটি, সেখানে জন্মাতে ঘাসেরও ভয় করে, কাজেই কেউ সে-জমি কিনলো না। ঠিক এই সময় বরতাফেরে উন্নয়নপরিকল্পনার আওতায় পড়লো তার ব্রহ্মডাঙ্গা! বেশ চড়া দামই পেয়ে গেল সিদ্ধেশ্বর—হাজার কয়েক টাকা একসঙ্গে! উঃ! সে কি স্ফূর্ত্তি! সিদ্ধেশ্বর টাকার বাণ্ডিলটা নিয়ে বাড়ী ফিরবার পথে জামিদার বাড়ীর সামনে দিয়ে ফিরছে—জমিদারবাবু পত্নী আর কন্যাকে নিয়ে কলকাতা যাচ্ছেন। দাঁড়িয়ে গেল সিদ্ধেশ্বর—চোখাচোখী হয়ে গেল অবন্তীর সঙ্গে। উঃ! কী আশ্চর্য্য রূপ মেয়েটার! এত বড় হয়ে উঠেছে নাকি! অনেকদিন সিদ্ধেশ্বর ওকে দেখেনি! দেখে আজ একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু অবন্তীকে পাবার মত কোন যোগ্যতা নেই তার—সে জ্ঞানটুকু আছে সিধুর। তবে বুদ্ধি এবং বল তার কম নেই। তাছাড়া গ্রাম ছেড়ে যখন যেতেই হবে তখন ভয়ইবা কিসের? সিধু সবিনয়ে রায় বাহাদুরকে প্রশ্ন করলো—এই নটার ট্রেণেই যাবেন?

—হ্যাঁ! কালকার দিনটাও সময় আছে বটে, কিন্তু থেকে আর লাভ কি!

—সে কথা ঠিক! আমিও আজই যাব। এখন ক'টা বাজলো?

রায় বাহাদুর ঘড়ি দেখে বললেন—সাতটা কুড়ি—যাবে তো চলো; এখনো যথেষ্ট সময় আছে। তোমার সব গোছানো আছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! আমার আর গোছানো কি! আপনারা এগোন, আমি ষ্টেশনে গিয়ে মিট করছি।—অবন্তীকে শুনিয়ে সিধু 'মিট' কথাটা বললো! এরকম দুটো-একটা ইংরাজী কথা সে বলতে পারে। সিধু বাড়ী চলে যাবার পর রায়বাহাদুর ভাবলেন, জিনিষপত্র নিয়ে কলকাতা যাওয়া, সঙ্গে মেয়েছেলে, গাড়ীতে ভীষণ ভীড়, তার উপর মিলিটারীদের আনাগোনা—সিধু থাকলে সুবিধাই হবে। তিনি উল্লসিত হলেন সিধুর কথায়।

সিধু বাড়ী এসে পড়লো যেন ছুটেই। সন্ধ্যা হয়েছে কিন্তু সন্ধ্যাদীপ আর জ্বালাবার দরকার হবে না এ ভিটেতে। ভিটে এখন অন্যের। তাছাড়া সময় কৈ? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিধু পুরোনো ট্রাঙ্কখানায় কাপড় চোপড় ভরে নিয়ে, আর তার চামড়ার নতুন সুটকেশটাতে টাকার বাণ্ডিল এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি নিয়ে গৃহত্যাগ করলো। আজন্মের বাস্তুভিটে ত্যাগ করতে তার আধঘণ্টার বেশী সময় লাগলো না। আশ্চর্য্য! ও একবার ভেবে দেখলো না, জন্মভূমিকে সে জন্মের মত ত্যাগ করে যাচ্ছে। কিন্তু বাড়ী থেকে বেরিয়েই মনে পড়লো, ওর বাবার পূজোকরা শালগ্রামের নুড়িটা এখনো ঘরে আছে; কিন্তু কি হবে ওটা নিয়ে! অনর্থক বোঝা বাড়ানো, তথাপি সিধু কয়েক পা এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে এলো ঘরে—পেতলের ছোট সিংহাসনটা থেকে লাল কাপড় জড়ানো শিলাটুকু পকেটে ভরে আবার বেরিয়ে পড়লো।

ষ্টেশনে এসে দেখলো, গরুর গাড়ীতে রায়বাহাদুর সেই মাত্র এসে পৌঁছলেন। সিধু সোজা হাঁটাপথে চলে এসেছে। নিজের বাক্স সুটকেশ নামিয়ে সে রায়বাহাদুরের জিনিষ নামাতে সাহায্য করলো যথেষ্ট। গায়ে প্রচুর তার শক্তি এবং কাজে সে সত্যিই দক্ষ। এমন কি, তার কাজ দেখে অবন্তীও খুসী হয়ে বলে উঠ্‌লো—ভাগ্যিস সিধুদা এসেছিল, নইলে কে এত সব করতো বাবা!

—সত্যি মা, সেকথা সত্যি ! সিধু সত্যি ভাল ছেলে !

রায়বাহাদুর প্রশংসা করলেন। অবন্তী সানন্দে সিধুর কাঁধে হাত দিল নিচু প্লাটফর্ম্মে দাঁড়ানো গাড়ীতে উঠ্‌বার জন্য। বলল—তুমিও এই কামরাতেই উঠবে ত সিধুদা ?

—হ্যাঁ, উঠবো !—সিধু আনন্দে যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছে। অবন্তীর আহ্বান ওকে কী এক অপূর্ব্ব সোমরস পান করাচ্ছে যেন ! গাড়ীতে উঠে সিধু বসলো এক পাশে ! অবন্তীর বসবার যায়গাটা বেশ নিরাপদ এবং আরামপ্রদ হয়েছে তো ! সিধু লক্ষ্য করলো। হ্যাঁ, অবন্তী ভালই বসেছে। ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ী—বদল করতে হবে জংসনে ! সেই সময় সিধু কার্য্যসিদ্ধি করবে। কিন্তু অবন্তী যে ভাবে 'সিধুদা' বলে ডাকছে—তারপর ওকে বিপন্ন করতে যেন নেশাখোর সিধুর আত্মা আতঙ্কিত হচ্ছে ! সিধু বিড়ি বার করবার জন্য পকেটে হাত দিল। হাত পড়লো শালগ্রাম শিলাটার গায়ে ; চমকে উঠলো সিধু ! ওর মানবত্ব আকস্মিক আঘাতে জেগে উঠলো যেন।

অবন্তী জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। দূরে নদীর কাশবন আর তার ফাঁকে ফাঁকে বালুবেলা দেখা যায়। আজন্মের পরিচিত ক্রীড়াভূমি ! ওর ক্রীড়াসঙ্গী আলোক আজ কোথায় ? অবন্তীর বুক থেকে একটা সুদীর্ঘ শ্বাস বেরিয়ে এল। এ গ্রামে আর ওরা আসবে না—এ মাটীতে আর ওদের পা পড়বে না। জন্মভূমির মমতা মানুষকে কেমন করে আকর্ষণ করে, আজ অবন্তী তা ভালো করে বুঝতে পারছে। কার অভিশাপে ওরা আজ গৃহছাড়া ! শান্ত পল্লীর নিরীহ অধিবাসী ওরা—কারো কোনো ক্ষতি করবার কোন চিন্তাই কখনো জাগে নি ওদের মনে।

ওদের সমাহিত স্তব্ধ জীবন তবুও সংঘাতে ক্ষুব্ধ হোল—সর্ব্বহারা হয়ে গেল একদিনেই। পরাধীনতার অভিশাপ—বিদেশী বণিকের শোষণ-পরায়ণতা ওদের অকারণে গৃহছাড়া করলে।

চোখদুটো ছল ছল করছিল অবন্তীর। আলোকের কথা মনে হোতেই কিন্তু চোখের ভিজে পাতা শুকিয়ে উঠলো উত্তাপে। যেন জ্বালার জ্বলন্ত প্রকাশ সে চোখে।—'এই অভিশাপ আশীর্ব্বাদ হোক'—সহরের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে অবন্তী এই দেশত্যাগের অভিশাপকে আশীর্ব্বাদে পরিণত করবার ক্ষেত্র পাবে। যে ক্ষেত্র স্বদেশের শ্রেয়ঃ লাভের দিকে ওকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যেখানে আলোক সহস্র মূর্ত্তিতে কাছে এসে দাঁড়াবে—মৃত্যু যেখানে অমৃত হয়ে উঠবে।

—অবন্তী!—সিধু আস্তে ডাক দিল। অন্যমনস্ক অবন্তীর মনে হোল, বহু দূর থেকে কে যেন ডাকছে, যেন আলোকই ডাকলো তাকে।—হ্যাঁ—আমিও যাব—আস্তেই বললো অবন্তী। যেন স্বপ্নে কথা কইছে।

আত্মবিস্মৃতের এই কথাটুকু সিদ্ধেশ্বরকে বিচলিত করলো; কোথায় যাবে অবন্তী! সিধু তো তার কল্পনার কথা প্রকাশ করে নি এখনো! অবন্তী কি তার মনের কথা বুঝতে পেরেছে? ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হয়ে গাড়ীটা জংশনের নিকটবর্ত্তী হচ্ছে। সিদ্ধেশ্বরের ইচ্ছা কোনক্রমে অবন্তীকে ভুলিয়ে পশ্চিমগামী কোন মেলট্রেণে উঠতে পারলেই তার আকাঙ্খা পূর্ণ হতে পারে। তার পর বহুদূর দেশে কোথাও গিয়ে অবন্তীকে বিয়ে করে রায়বাহাদুরের কাছে খবর পাঠালেই চলবে। টাকা তো উপস্থিত হাজার পাঁচ আছে, বেশ কিছুদিন চলে যাবে দুজনের; কিন্তু মনের ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করতে বহু বাধা। প্রথম বাধা পকেটের শালগ্রাম শিলাটাই দিয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত কাজ ঠিকমত করে উঠতে পারবে কি না, সিদ্ধেশ্বর ভাবছিল। শালগ্রামটা গুরু শক্ত

মনকে যেন প্রথমেই খানিকটা দুর্ব্বল করে দিয়েছে! কিন্তু সিধু নারীহরণ কার্য্যে এই প্রথম হাতে খড়ি নিচ্ছে না, এর পূর্ব্বে দুচারটা গরীব ঘরের মেয়েকে নিয়ে সে এ কাজে পোক্ত হয়ে উঠেছে! একবার ধরা পড়ে শাস্তি পাবার মতও হয়েছিল, কিন্তু গ্রামের পুরোহিতের ছেলে বলে গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ কোনরকমে ওকে সে যাত্রা বাঁচিয়ে দেন। রায়বাহাদুরই বিশেষভাবে পরিশ্রম করেছিলেন তখন ওর জন্য! আজ সেই রায়-বাহাদুরের কন্যার উপরই সিধুর লোভ দুর্ব্বার হয়ে উঠলো।

এসব কাজে সিধু অতিশয় সাবধানী। সব দিক বাঁচিয়ে তবে সে কাজটা করতে চায়। হঠাৎ কিছুতে হঠকারিতা করবার মত লোক সে নয়। তাই আস্তে জিজ্ঞাসা করলো—সত্যি যাবে তো?

—কোথায়?—অবন্তী যেন আকস্মিক আঘাতে সঙ্কুচিতা হয়ে উঠলো। জংসন ষ্টেশনটা এসে পড়েছে। গাড়ী প্লাটফর্ম্মে ঢুকলো। গতি মন্থর হয়ে উঠলো ট্রেনের! যাত্রীরা যে-যাঁর জিনিষ গোছাচ্ছে, কারণ ওদিক-কার প্লাটফর্ম্মে কলকাতাগামী ট্রেণ দাঁড়িয়ে আছে, এ গাড়ীর প্যাসেঞ্জার-গুলো উঠার যেটুকু দেরী। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ও-গাড়ীতে গিয়ে চড়তে হবে। সিধু চাপা গলায় বলল,

—দূরে, অনেক দুর, হিমালয়। বদরিকাশ্রম, দিল্লী, কাশী—গয়া! ভূগোল পড়া বা দেশ ঘোরা নাই সিধুর, কোন্ জায়গাটা আগে পড়ে, তার খবর জানে না সে। কয়েকটা নাম-জানা বড় বড় জায়গার নাম করে দিল। কিন্তু অবন্তী শুধু শিক্ষিতা নয়, সুশিক্ষিতা। সিধুর বিদ্যা-বুদ্ধির কথা সে জানে, তাই হেসেই বললো—বেশ তো! আগে তো কলকাতা চলো।

জিনিষপত্র গুছাতে হবে—নামাতে হবে। রায়বাহাদুর সিধুকে ডাকলেন। হাতের চেটোর আড়ালে জ্বলন্ত বিড়িটা লুকিয়ে সিধু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জিনিষ নামাবার জন্য কুলি ডাকতে লাগলো।

খিড়িতে ছুটো টানও দিয়ে নিল এই ফাঁকে। জিনিষপত্র নামিয়ে ওদিককার প্লাটফর্ম্মে আসতে সিধু দেখতে পেল, পশ্চিম যাবার গাড়ী আপ্ পাঞ্জাব মেল ঠিক পরের প্ল্যাটফর্ম্মে এসে দাঁড়িয়েছে। কোন-রকমে অবন্তীকে ওতে তোলা যায় না? একবার তুলে ফেলতে পারলেই বহুদূর চলে যাওয়া যাবে। সিধুর অন্তরে প্রলোভনটা যেন দৈত্যের মত জেগে উঠছে। অবন্তী পিছনে আসছিল, সিধু আস্তে বললো, —যাবে দিল্লী? ঐতো গাড়ী।

—যাবো! কিন্তু আজ নয়—যেদিন লাল কেল্লায় ভারতের জাতীয় পতাকা উড়বে—বলেই হাসলো অবন্তী।

সিদ্ধেশ্বরের বিদ্যায় অত শক্ত শক্ত কথার অর্থ বোধ হয় না। সে বিশেষ কিছু না বুঝেই কলকাতাগামী গাড়ীর কাছেই এসে দাঁড়ালো। জিনিষ পত্র তোলা হল, অবন্তীও উঠে বসলো কামরায়। তাকে নিয়ে এখন পাঞ্জাব মেলে তোলা অসম্ভব। সে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে গেছে গাড়ীতে। কিন্তু সিধু কি ওদের সঙ্গে কলকাতাতেই যাবে? কেন! ওর হঠাৎ যেন মতলব ঘুরে গেল। কলকাতা তার যাবার কি দরকার? তার চেয়ে দিন কয়েক দেশ বিদেশ ঘুরে এলে বেশ তো হয়। কাশী, গয়া, হরিদ্বার! কি-জানি কেন, সিধু হঠাৎ রায়বাহাদুরের পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—আমি তাহলে চল্লাম! কাশীই যাব এখন, তার পরে যেখানে হোক।

বিস্মিতা অবন্তী ছুটে দরজার কাছে এসে বললো—সেকি সিধুদা! তুমি যে আমাদের সঙ্গে কলকাতা যাবে বলেছিলে?

—ওরকম কত কি বলি আমি—ওসব কথা কি ধরতে আছে! আচ্ছা, আসি।

কলকাতাগামী ট্রেণ ছেড়ে দিল। সিধু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে। পকেটে হাত দিয়ে শালগ্রামের ছুড়িটা

নাড়ছে ও। ওর পিতৃপিতামহের সংস্কৃত রক্তটা যেন শিল্পীর চাঞ্চল্য জাগাচ্ছে। প্রলোভনটাকে খুব সে সামলে গেছে এ যাত্রায়।

কলকাতায় বাড়ী পাওয়া প্রায় মোক্ষলাভের মতই সাধনার ব্যাপার হয়ে উঠেছিল সেই যুদ্ধের দিনে। রায়বাহাদুর প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি; তাছাড়া শ্বশুর বাড়ীর অর্থাৎ অবন্তীর মামাদের একখানা বাড়ী আছে। ঐ বাড়ীতেই এসে উঠলেন! নীচের দুখান ঘর কোনরকমে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হোল।

যুদ্ধের অবশিষ্ট তিনটা বছর উনি পত্নী এবং কন্যাকে নিয়ে ওখানেই বাস করতে বাধ্য হয়েছেন—কারণ বহু চেষ্টা করেও বাড়ী মেলে নি। অবন্তীর কিন্তু বিস্তর পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে এর মধ্যে। পল্লীবাসিনী অবন্তী সহরবাসিনী হয়েছে—সহুরে কায়দায় পেঁচিয়ে শাড়ী পরে কলেজ যায় এবং সহুরে রেষ্টোরেণ্টে খানাও খায়। যারা চিরকাল সহরে থেকে মানুষ, তারা সহরের বাহ্যিক চাকচিক্যে অত চট করে মজে যায় না, হঠাৎ-সহরে-আসারা যেমন যায়! এর প্রমাণ কলকাতার বনেদী বাসিন্দাদের মধ্যে অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যাবে। কলকাতার আদিম বাসীন্দারা এখনো লক্ষ্মী-ষষ্টির পূজো করেন, উচক্কার মত এখনো রাস্তায় বেরুন না—এখনো তাঁরা বাঙ্গালী কন্যা-বধূ, কিন্তু হঠাৎ-আসা পল্লীকন্যারা দুদিনেই মেম্‌সা'ব বনে যান। এত সহজে তাঁরা নিজেকে সহুরে করে তোলেন যেন এই সাধনায় না সিদ্ধিলাভ করতে পারলে পরমার্থই লাভ হোত না।

অবন্তীরও পরমার্থ লাভ হোল। রায়বাহাদুর একেই তো যথেষ্ট আধুনিক পন্থী, তারপর কলকাতায় এসে কন্যার রূপ এবং গুণের

প্রশংসা চতুর্দ্দিকে শুনে ভেবে নিলেন যে কন্যা তাঁর অসাধারণেরও অসাধারণীয়া। তৈরী করতে পারলে সে একখানা ওয়ার্লড্-ফিগারে দাঁড়াবে। তিনি যত-রকম আপ্-টু-ডেট হবার উপায় প্রচলিত আছে সবগুলোই ব্যবস্থা করে দিলেন অবন্তীর জন্য। মামাতো বোন রাগিনী অবন্তীর সমবয়সী। দুটিতেই বেশ আধুনিকা হয়ে উঠলো কয়েক মাসের মধ্যেই। রায়বাহাদুরও বিলাত ফেরৎ ঘুঘু ব্যক্তি। সম্বন্ধীর কারবারে যোগ দিয়ে কালোবাজারের কসরৎ চালিয়ে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জনও করতে লাগলেন। অর্থাৎ কলকাতায় এসে গ্রাম্য জমিদার রায়বাহাদুর বেশ ফুলে-ফেঁপেই উঠতে লাগলেন—অবন্তীও আধুনিকত্বের আলেয়ার পিছনে ছুটে চলতে লাগলো। অবন্তীর মা প্রথম দিকে বাধা দেবার চেষ্টা একটু করেছিলেন। কিন্তু ভাই, ভাই-বৌ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীর বাক্য-বাণে বিদ্ধ হয়ে তিনি নীরব হয়ে যান। বর্ত্তমানে অবন্তী পরিপূর্ণা আধুনিকা, মোটর বিলাসিনী বাঙ্গালী মেম্সাব্।

কিন্তু উন্নতি আরো নানা দিকে হয়েছে অবন্তীর। বাবার সঙ্গে বড় বড় অফিসারদের কাছে গিয়ে সে মোটা টাকার কন্ট্রাক্ট সই করিয়ে আনে। মামাতো বোন রাগিণীর সঙ্গে রাত দুটো অবধি রেষ্টুরেণ্টে খানা খেয়ে বাড়ী ফেরে। যুদ্ধের প্রয়োজনে আরো নানান কাজে নারী-নিয়োগের ক্ষেত্রে অবন্তী একটী বড় পাণ্ডা। কিন্তু দুর্নীতি এসব ব্যাপারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। অবন্তী বা রাগিণী তার আবহাওয়া থেকে বাদ গেল না। দেহ এবং মন যখন তাদের নিত্য কলুষিত হতে লাগলো মাংসলোলুপ পাশবত্বের বুভুক্ষার আগুনে—তখনো রায়বাহাদুর জানতে পারেন নি, কন্যা তাঁর কতখানি আধুনিকা হয়েছেন। যেদিন জানলেন পত্নীর মারফৎ, সেদিন তিনি বিপুল অর্থের মালিক—এই মন্দার বাজারেও লেকের ধারে আধবিঘা জমির উপর তিনতলা প্রাসাদ বানাবার প্ল্যান করছেন—কিন্তু খবরটা জেনে প্রায় দুমিনিট থ' হয়ে রয়ে

তাকে স্বহস্তে গলাটিপে হত্যা করার সময় ওর মনে হোল—কি যে ঠিক মনে হয়েছিল, উৎপলার মনে পড়ে না—শুধু মনে আছে, সে শুধু একটা যন্ত্রকে চিরদিনের মত বিকল করে দিচ্ছে না, একটা বিশ্বব্যাপিনী চৈতন্যশক্তির বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করছে। যন্ত্রকে বিকল করে দেবার চেষ্টা করলে যন্ত্র কিছুমাত্র প্রতিবাদ জানায় না—কিন্তু সেই একফোঁটা মাংসের ঢেলাটা সশব্দে প্রতিবাদ জানিয়েছিল—নিজেকে রক্ষা করবার জন্য অদ্ভুত চেষ্টা সে করছিল শেষ অবধি, শেষে অসহায় হয়ে আত্ম-সমর্পণ করলো উৎপলার বজ্রমুষ্টির তলায়—কিন্তু তখনো উৎপলা দেখে-ছিল, ঐ অতি ক্ষুদ্র শিশুর চোখে সে কী নিষ্ঠুর ঘৃণা—কী অসহায় আর্ত্ততার মধ্যেও ওর কচিঠোঁটে জীবনকে রক্ষা করবার অনমনীয় দৃঢ়তা! ও যেন কিছুতেই মরতে চায় না—কোন রকমেই বিকল হতে চায় না। উৎপলার তখুনি মনে হয়েছিল—ও যন্ত্র নয়—ও জীবন! অনন্ত ব্যাপিনী জড়-প্রকৃতির চৈতন্য-স্পন্দন ওর মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে—যেমন হচ্ছে এই সারা বিশ্বের প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে। ঐ প্রাণের ধ্বংস নেই—ও দেহ থেকে দেহান্তরে আশ্রয় করবে—আবার এই পৃথিবীর আকাশ বাতাসে চোখ মেলবে—হাসবে, কাঁদবে—আবার কোনো মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলবে—'গত জন্মে তার নিজের মা তার গলা টিপে…'—উৎপলা বালিশের উপর নেতিয়ে পড়লো; অজ্ঞান ঠিক হয় নি—অর্দ্ধমূর্চ্ছিত! এখনো ও বড় দুর্ব্বল। বড় বড় আদালতের বিচার এবং দণ্ড নয়—সামান্য একটা শিশুর ঘৃণা এবং দৃষ্টির বিচারই ও আজ সইতে পারছে না—মনটা ওর কতখানি অসহায়! ঐ শিশু যেন ওর বিচারকর্ত্তা। কি দণ্ড দেবে কে জানে?

কিন্তু ওর মা এসে পড়লো। ওর মা—একটা ডায়নামিক স্পিরিট—আশ্চর্য্য মেয়ে! দরকার মত কথা বলতে এবং বক্তৃতা দিতে ওর জুড়ি নেই। বালিশ থেকে উৎপলার মাথাটা তুলে তাকে বসিয়ে দিয়ে

বললো,—মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে অনেক কিছুই করতে হয় পলা—বুঝলি! এই পৃথিবীতে তুই একাই এ কাজ করিস নি। ইতিহাস ঘেঁটে দেখ—শত সহস্র ঘটনা পাবি এমন। এর জন্যে অতখানি হা-হুতাশ তুই করবি, জানলে—আমি তোকে অন্যত্র বিদায় করে দিতাম কী এমন হয়েছে যে তুই অমন করছিস দিনরাত?

—কিছু না মা, কিছুই না—উৎপলা এর বেশী আর কোন কথা বলে না।

—কিছু না তো অমন করছিস কেন? একটা জন্মেছিল গেছে। তাতে কি এমন ক্ষতি হবে তোর? ঐ যে বুড়ো নিম গাছটা—পঞ্চাশ বছর ধরে কত ফল ও ফলিয়ে এল—তার বীজের কটা গাছ হয়েছে?

—ও তার কোন ফলকে গলা টিপে মারে নি—উৎপলা বললো

—ও মারেনি, আর কেউ মেরেছে! সব ফলগুলোর বীজ বড় গাছ গজালে এই পৃথিবীতে নীমগাছ ছাড়া আর কিছুই থাকতো না; প্রকৃতি এ সব ব্যালান্স রেখেছে। মারার কর্ত্তা তুই নোস!

—জর-বিকারে মরলে একথা বলা তোমার মানাতো মা—প্রকৃতির ধ্বংস-লীলার দোহাই এ ক্ষেত্রে না দেওয়াই ভাল; কিম্বা প্রকৃতিই আমার মধ্যে রাক্ষসী প্রকৃতি সৃষ্টি করেছিল।

—অতসব আজগুবি কথা ভাবিস না উৎপলা। ওকে বাঁচিয়ে রাখলে সমাজে-সংসারে তোর বেঁচে থাকা চলতো না। দেশের একটা সমাজ আছে, নীতি আছে, ধর্ম্ম আছে, সে সব তো অগ্রাহ্য করতে পারি না বাছা! নিজের জীবনটাই আগে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

উৎপলা কিছুই বললো না, চুপ করে রইল। ওর মা আবার বললে —নিতান্ত ছেলেমানুষ তুই, বিয়ে করতে হবে, সংসার করতে হবে! স তো মিটে গেল। এখন আবার মানুষকে সমাজ-সংসারের দিকে

তাকাতে হবে। কিছু টাকাকড়িও হয়েছে—যাতে সব দিক ভাল হয়, তাই আমরা করলাম। নে, ওঠ, গরম জলে গা' মুছে কিছু খা দেখি।

উৎপলা তবু কিছু বললো না। ওর মা গরম জল আনতে গেল। বিছানায় বসে বসেই উৎপলা দেখতে পেল, দূরে একটা মাঠে অনেক লোক জমা হয়েছে। জাতীয় জীবনে আজ নিশ্চয় কিছু একটা বিশেষ দিন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির সঙ্গে নব প্রচলিত 'জয় হিন্দ' ধ্বনিও আকাশকে ভেদ করে ঊর্দ্ধে উঠছে কে জানে কোন্ দেবতার চরণতলের উদ্দেশে! উৎপলা ভাবতে লাগলো—এই যে জাতীয় জীবন এবং তার জাগরণ, এর মধ্যেও সেই শাশ্বত অমর প্রাণই স্পন্দিত হচ্ছে। জাতির আত্মারই জীবনাকাঙ্ক্ষা, নিজেকে এই নিরুপায় অসহায়তার মধ্যেও বাঁচিয়ে তুলবার জন্য প্রাণপণ প্রতিবাদ। ঠিক যেমন ওর শিশুটি প্রতিবাদ জানিয়েছিল—অসহায়তাকে অগ্রাহ্য করেও জানিয়েছিল প্রতিবাদ। উৎপলা অনুভব করলো—ভারতীয় জাতীয় জীবন অমনি অসহায় শিশু—তার এই প্রাণপণ প্রতিবাদ হয়তো অপর পক্ষের নির্ম্মম বেয়নেটের তলায় পিষ্ট হয়ে যাবে—হয়তো এই জাতীয়তাবোধ ঐ জাতীয় পতাকার সঙ্গে ডাষ্টবীনেই পড়বে গিয়ে! কিম্বা কে বলতে পারে—এই জাতীয়তাবোধ একদিন জাগ্রত পৃথিবীকে জানিয়ে দেবে—জীবন কখনো পরাভূত হয় না। সে অনন্তবার জন্মায়, অনন্তকাল ধরে সংগ্রাম করে এবং শেষে একদিন জয়ীই হয়। এই বিজয় লাভ তার পুরুষাকার দ্বারা অর্জ্জিত।

ওর মা গরম জল আর তোয়ালে নিয়ে এল। গা মুছে কিছু খাবে উৎপলা। খাবে! সে আর একবার ভাল করে বেঁচে থাকবে, বেঁচে দেখবে, জীবনকে সার্থক করবার জন্য কিছু সে এখনো করতে পারে কি না। রুদ্রের আহ্বান যেন জাগছে ওর অন্তরে—যে রুদ্র জীবনরূপে জগতের প্রতি প্রাণীর মধ্যে বাস করেন। উৎপলা বিছানা থেকে নেমে

জাতীয় পতাকাকে নমস্কার করলো—বললো—হে জীবনের জাগরণের প্রতীক, তোমাকে মাথায় তুলে সগৌরবে এগিয়ে চলবার শক্তি আমায় দান কর।

সিদ্ধেশ্বর সেই যে জংশনে অবন্তীদের ছেড়ে গেল, তারপর থেকে তার জীবনের গতি ভিন্নমুখে ফিরলো। সেদিন পশ্চিমগামী একখানা মেলট্রেনে উঠে সে প্রথম এল বেনারস—বাঙালীটোলায় তার বাবার এক বন্ধুর বাড়ী। পিতৃবন্ধু সযত্নে তাঁকে গ্রহণ করলেন এবং নানা সদুপদেশ দিয়ে কিছু একটা ব্যবসা করবার কথা বললেন। সিদ্ধেশ্বর এযাবৎ কারো সদুপদেশে কখনো কর্ণপাত করে নি, কিন্তু আজ ওর মনে হোল, জীবনটাকে নিয়ে এভাবে লটারী খেলার কোনো মানে হয় না। 'ঈশ্বর কৃপায় (ঈশ্বরকে আজ প্রথম স্মরণ করলো সিদ্ধেশ্বর) টাকা যখন অকস্মাৎ অসম্ভাব্যরূপে কিছু এসে গেছে তখন নিশ্চয় ঈশ্বরের ইচ্ছা, সিদ্ধেশ্বর ব্যবসা করে ধনী হবে। কিন্তু কাশীতে কোন্ ব্যবসা করা যেতে পারে, পিতৃবন্ধু সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। সিদ্ধেশ্বর এই সময় কাশী সহরটা ভাল করে ঘুরে জীবনের ভ্রূণাঙ্কুর সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করতে লাগলো। কাশী—মর্ত্ত্যের পবিত্রতম স্থান—বিশ্বেশ্বরের বিহারক্ষেত্র এবং ভারতের প্রাচীনতম নগরীর অন্যতম। কত পুণ্য যে নিত্য হেথা অনুষ্ঠিত হয় তার হিসাব রাখবার জন্য নিশ্চয় স্বর্গে একটা স্বতন্ত্র ডিপার্টমেণ্ট আছে; কিন্তু কত পাপ যে এখানে প্রতি মুহূর্ত্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার হিসাব রাখতে অন্ততঃ পাঁচটা আলাদা ডিপার্টমেণ্ট দরকার। কত রকমের পাপ, কত পুণ্যের ছলনা মাখা, পবিত্রতার মুখোস পরা পাপ এখানে চলছে, ইয়ত্তা নেই। সিদ্ধেশ্বর দিন কয়েক ঘুরে একদিন একটা বহু প্রাচীন,

প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের গলির মধ্যে এক আড্ডায় গিয়ে পড়লো। চমৎকার আড্ডা, নারী এবং পুরুষে ভর্ত্তি, নেশায় সেখানে সকলে নৈর্ব্যক্তিক। সিদ্ধেশ্বরকে তারা মুহূর্ত্তে আত্মীয় করে নিল।

আত্মীয় তারা করলো সিদ্ধেশ্বরকে, কিন্তু সিদ্ধেশ্বর সে আত্মীয়তা গ্রহণ করতে পারলো না। কি জানি কেন, ওর মনের মধ্যে একটা হতাশা দিনে দিনে আগুনের মত দীপ্ত হয়ে উঠছে। টাকাগুলো ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছে সিদ্ধেশ্বর কিন্তু শালগ্রাম শিলাটি এখনো ওর পকেটে পকেটে ঘোরে। মাঝে মাঝে মনে করে, কোথাও বসে একপাতা তুলসী দিয়ে পূজো করবে, কিন্তু সময় হয়ে ওঠে না—অথচ সময় ওর অফুরন্ত! যে আড্ডায় সিদ্ধেশ্বর গেল সেখানকার কদর্য্যতায় সিদ্ধেশ্বর বিশেষ অনভ্যস্থ নয়, এবং ইদানীং ওর মনের পরতে কার যেন একটা আহ্বানবাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়—'পশ্চিমে যাব সেই দিন যেদিন অভিযান হবে লাল···' কথাটা মনে পড়ার সঙ্গেই একখানি সুন্দর মুখও মনে পড়ে—অবন্তীর মুখ—আশায় উচ্ছ্বাসে দীপ্ত অরুণালোকের মত মুখখানা। সিদ্ধেশ্বর লেখাপড়া খুবই কম জানে। আপনার অন্তরের বিচিত্র রহস্যময়তা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ওর নাই—কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের সংস্কার সংস্কৃতির প্রভাব এবং এই জন্মের বংশগত অভ্যাস ওকে কোথায় যেন দুর্ব্বল করে তুলেছে; ওর মনের মধ্যে কোথায় যেন ব্রাহ্মণমন লুকিয়ে আছে। ওর মনের ব্রাহ্মণত্ব ক্ষমা-দয়া-ত্যাগেই নিবদ্ধ নয়—তপোনিষ্ঠায় বিশ্বামিত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ত্ব ওর মনের মাঝে ওতঃপ্রোত বিজড়িত। কিন্তু এত কথা সিদ্ধেশ্বর ভাবতে পারে না। ওর তবু অবন্তীর শেষ কথাটা মনে হয়;—মনে হয়, অবন্তী কি চায়—কি পেলে সে সুখী হয়—কেমন হ'লে অবন্তীর মনের মত সে হতে পারে!

আড্ডায় দিন আট দশ যাতায়াত করেই সিদ্ধেশ্বর ক্লান্ত হয়ে পড়লো। সর্ব্বদা কদর্য্য-বৃত্তি, কুৎসিৎ পরামর্শ—কুশ্রী জীবন! এখানে ওর ব্রাহ্মণ-মনে

গ্লানি জন্মাচ্ছে, ওর ক্ষত্রিয় মন বিদ্রোহ করছে—ওর সাধারণ মানুষমন পীড়িত হচ্ছে! একদিন গভীর রাত্রে সিদ্ধেশ্বর ঐ আড্ডায় একটা গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ব্যাপার দেখার পর বাকিটা আর দেখলো না—আড্ডা ত্যাগ করলো।

নিজের মনেই গান করছিল সিদ্ধেশ্বর গভীর রাত্রে। কাশী সহরের বুকের বহু বীভৎসতা সে এই কয়দিনেই প্রত্যক্ষ করেছে। ওর ধারণা, শিবের এই মোক্ষভূমে যতকিছু অশিব আড্ডা গেড়ে আছে। কাজেই লোকালয় ত্যাগ করে সে শ্মশানের দিকে কিঞ্চিৎ ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসলো। বসলো সিদ্ধেশ্বর—হয়তো শুয়েই পড়তো ঐখানে, কিন্তু ওর কাণে গেল কয়েকটা কথা—ফিসফাস কথা হলেও, সিদ্ধেশ্বর শুনতে পেল —'স্বরাজ, স্বাধীনতা, লালকেল্লা'। হঠাৎ একজন লোক এসে সিদ্ধেশ্বরকে ধরলো বজ্রহস্তে। ভয়ে চীৎকার করে উঠবার পূর্ব্বেই লোকটা বলল, —চুপ—কথা কয়েছ কি মরেছ! লোকটার হাতে ঝকমক করছে ছোরাখানা। ভয়ে সিদ্ধেশ্বর চোখ বুঝলো। কিন্তু আগন্তুক তার হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে উঠিয়ে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চললো—কোথায় কে জানে!

চলে এলো বহু দূর লোকটা অন্ধকারেই সিদ্ধেশ্বরের হাত ধরে। সহরের রাস্তায় চলেছে কি মাটির তলায় গুহায় মধ্যে চলছে, ঠিক বুঝতে পারছে না সিদ্ধেশ্বর। ভিজে মাটি এবং কাদায় ওর খুবই অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু ও এখন বন্দী। জীবনের উপর কেমন একটা নিস্পৃহ ভাব এসে পড়লো তার—মৃত্যুর হাত থেকে ওর আজ যেন রক্ষা নাই—কিন্তু কী তার অপরাধ? হয়তো এই লোকটা ভেবেছে যে তার কাছে প্রচুর টাকা আছে। টাকা সিদ্ধেশ্বরের আছে, কিন্তু আছে ব্যাঙ্কে। তাতে কি? চেক লিখিয়ে নিতে পারে ওরা। সিধু কিছু টাকা দেবার কথা লোকটাকে বলবে নাকি? কিন্তু ভয়ে তার গলা দিয়ে কথাই বেরুচ্ছে না।

ইতিমধ্যে একটা আলোকিত স্থানে এসে পড়লো ওরা। আলো কেরসীনের কিন্তু বেশ উজ্জ্বল। জনকয়েক লোক বসে আছে সেখানে। সিদ্ধেশ্বরকে দেখে তাদের মধ্যে প্রধানতম একব্যক্তি বললো,

—কোথেকে আনলে ওকে ?

—ব্যাটা গুপ্তচর ! লুকিয়ে কথা শুনছিল আমাদের।

—শুনেছে নাকি কিছু ?

—হ্যাঁ—বলেন তো এখুনি সাবাড় করে দিই। জন্মের মত টিকটিকি-জন্ম শেষ হোক।

—আগে ওর দেহখানা তল্লাস করো।

সিদ্ধেশ্বরকে উলঙ্গ করে ফেললো ওরা ; কিন্তু তার কাছে সামান্য কিছু টাকাপয়সা আর শালগ্রাম শিলাটি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। সিদ্ধেশ্বর এতক্ষণে সাহস সঞ্চয় করে কাতর স্বরে বললো—

—আমি গুপ্তচর নয়—সন্ন্যাস নেবার জন্য শ্মশানে গিয়েছিলাম।

—ওঃ। এই পাথরের নুড়িটি কিসের ?

—শালগ্রাম শিলা ! বহুদিন ওঁর পূজা করতে পারিনি—আপনারা যদি পূজা করেন তো নিন—আমি নিতান্তই পাপী-তাপী ব্রাহ্মণ।

—আমরা দেশ-মাতার পূজা করি—তিনি ছাড়া আমাদের কোনো ঠাকুর নেই। কিন্তু তুমি যদি একটা কাজ করতে পার তো তোমার মৃতদেহের সঙ্গে এই শালগ্রামশিলাটিকেও আমরা পুড়িয়ে দেব—পরলোকে গিয়ে পূজা করো।

সিদ্ধেশ্বর নিরুপায় : বললো—যে আজ্ঞে ! আমাকে যদি মরতেই হয় তো ওকে নিয়েই মরবো।

সবাই হেসে উঠলো।

সবাই দুপয়সা কামিয়ে নিয়েছে যুদ্ধের দৌলতে। কেউ আজ কর্ম্ম-হীন নেই—এবং কর্ম্মের মজুরীও যথেষ্ট বেড়ে গেছে। গভর্মেণ্ট রাশি রাশি টাকা ছাড়ছেন—টাকার ইন্‌ফ্লাশেন চলছে। বাড়লইবা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম—দু-আনার জিনিষ দু-টাকায় কিনতেও কারো আটকায় না। হাতে অজস্র টাকা—আরামসে খরচ করো!

কিন্তু টাকা তো আর চিবিয়ে বা গিলে খাওয়া যায় না। খেতে হবে চাল বা আটা। সে-খাদ্যের নাকি বড়ই অভাব; শুধু ভারতেই অভাব নয়, সারা পৃথিবীতেই নাকি খাদ্য-সঙ্কট লেগেছে! সে-সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভের জন্য বড় বড় মাথা মাথা ঘামাচ্ছেন। খবরের কাগজওয়ালারা ভাল একটা বিষয় পেয়ে কাগজ ভরাবার বিশেষ সুবিধা পেয়েছেন—এবং বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা গোপনে খাদ্য মজুত করে বিশেষ লাভের আশায় দাঁত মাজছেন। ঠিক এই অবস্থায় অবন্তীর রায়বাহাদুর-বাবা মেয়েকে নিয়ে কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে উঠলেন। কারণ অবন্তীর অবস্থা এখন দেখলেই বোঝা যায়। যদিও অবন্তী নিজে বিশেষ কিছু গ্রাহ্য করে না—তথাপি তার মা অতিশয় সন্ত্রস্থ এবং স্বামীকে সময় অসময় কেবলই ঐ কথাটা স্মরণ করাচ্ছেন। রায়বাহাদুর শ্যালকের সহায়তায় আরো লাখ কয়েক টাকা কামাবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। এ-হেন শুভ সময় এই বিপদপাত।

নানাদিক বিবেচনা করে রায়বাহাদুর অবন্তীকে কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। মা আর মেয়ে এক সঙ্গেই থাকবে, তারপর কোথাও কোন এক নিভৃত স্থানে ব্যাপারটা ঝেড়ে মুছে আবার শুদ্ধ পবিত্র হয়ে ফিরে আসবে! 'শুদ্ধ-পবিত্র'—কথাটা ভাবতে রায়বাহাদুরের মত অতি-নাস্তিক লোকেরও মনে ধাক্কা লাগলো, কিন্তু মনের জোরে তিনি সে ধাক্কা সাম্‌লে বললেন,—আমার পুরোনো বন্ধু শচীনকে চিঠি লিখেছিলাম—একখানা বাড়ীর জন্য, বাড়ী ঠিক হয়েছে, তোমরা চলে

যাও। মাস চার-পাঁচ থেকে চলে এসো। ভয়ের কিছু কারণ নেই—ওখানে এরকম হরদম হচ্ছে!

—হুঁ—বলে অবন্তীর মা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন আবার—ছেলে বা মেয়ে যাহোক একটা হবে তো। সেটাকে কি করবো?

—ফেলে দেবে। ওখানে সেরকম লোকও পাওয়া যায়। আমি শচীনকে লিখে সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছি!

—জ্যান্তই ফেলে দেব!—অবন্তীর মার গলার স্বরটা আতঙ্কিত যেন।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ; তার সঙ্গে আমাদের কোন পার্থিব সম্পর্কই থাকবে না।

ব্যাস্! রায়বাহাদুর নতুন কেনা বুইক্ গাড়ীখানায় চড়ে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু অবন্তীর মার চিন্তাধারা অন্যরকম। ভদ্রমহিলা কিছুতেই নিজেকে স্বামী বা কন্যার চিন্তাধারার সঙ্গে মেলাতে পারছিলেন না। নিদারুণ একটা আতঙ্ক, একটা বীভৎস অমঙ্গলের আভাস যেন পিশাচের মত তাঁর চোখের উপর নাচতে লাগলো। কিন্তু ওছাড়া অন্য উপায় নাই—অন্য আর কোনো পথেই অবন্তীর জীবনকে শুদ্ধ, শান্ত, পবিত্র, করে' গৃহবাসিনী কুলবধূর পর্য্যায়ে আনা যায় না। এই গোপনতার—এই হীনতার, এই চক্রান্তের আশ্রয় নিতেই হবে তাঁদের! ধিক্! মনটা যেন কেমন করুণ, কলঙ্কিত হয়ে উঠছে। আজন্ম সতীত্বের নিষ্ঠায় ওতঃ-প্রোতঃ আচ্ছন্ন তাঁর মানসলোক; কিন্তু আজ এই মনের গ্লানি তাঁকে নর-হত্যাকারিণীর পর্য্যায়ে নামিয়ে দিতে চায়। উঃ! ছেলেটাকে ফেলে দিতে হবে! জীবন্তই ফেলে দিতে হবে? তারপর সে মরে যাবে—কাশীশ্বর মহাকাল দেখাবেন—তার মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে অবন্তীর মা! উঃ! উঃ!

কিন্তু সন্তান-স্নেহ আরো ভয়ঙ্কর বস্তু! অবন্তীর ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিকে তাকিয়ে মা নিজেকে প্রস্তুত করলেন—প্রস্তুত করলেন সমস্ত পাপ

মাথায় তুলে নেবার জন্য, কিন্তু তবু তাঁর প্রাণের অন্তঃস্থলে জাগতে লাগলো একটি সূক্ষ্ম প্রার্থনা—ত্রাণ করো পরিত্রাতা!

যথা নির্দ্দিষ্ট দিনে অবন্তীকে নিয়ে যাত্রা করতে হোল তাঁকে! মেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণীতে বসে অবন্তী খবরের কাগজে চোখ ডুবিয়েছে। প্রশাধন-লালিত সুন্দর তার মুখের পানে তাকিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম্মের তরুণদল—অবন্তী নির্লিপ্ত বাহ্যিক, কিন্তু অন্তরের অহঙ্কার তার রূপকে আরো তীক্ষ্ণ, আরো উগ্র করে তুলছে। মাতৃত্ব সেই মুখের কোনো রেখায় ধরা যায় না—শুধু একটা গর্ব্বিত দৃষ্টির গোপন পুরে জেগে রয়েছে ভয়—এই রূপ, এই আকর্ষণ-শক্তি যদি ফুরিয়ে যায় তার! যদি একবার গর্ভ ধারণের পরই সে নধর সুন্দর কদলীবৃক্ষের মত শুষ্ক, পাণ্ডুর হয়ে যায়! না-না, এরকম অঘটন ঘটতে দেবে না অবন্তী—কিছুতেই না!

ওপাশের বেঞ্চে বসে ওর মা ভাবছে, মানুষকে এমন অসহায় ভাবে পাপের পথে এগিয়ে চলতে হয় কেন! কি এর কারণ, কার এই রহস্য! কোন দেবতার এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ! নিজে তিনি নিষ্ঠাবতী পত্নী—পবিত্র বংশে তাঁর জন্ম, আজন্ম সতীত্বের ঔজ্জ্বল্যে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তটি তাঁর ঝলোমল, তবু তাঁকে আজ এই অসতীত্বের, এই অভিশাপের অংশ গ্রহণ করতে হচ্ছে! কেন! কী পাপে! কোন জন্মের কি অপরাধে?

মা নিজেকে একান্ত অসহায় মনে করতে লাগলেন! সন্তান-স্নেহাতুরা জননী তিনি, তবু তাঁর মনে হতে লাগলো, কে সন্তান, কেইবা স্বামী! একদিন তো সকলকে ছেড়েই এই বিরাট বিশ্বের অনির্দ্দিষ্ট অজানা অনন্ত পথে পাড়ি দিতে হবে,—সেদিন কোথায়, থাকবে অবন্তী,

কোথায় বা থাকবে স্বামী-পুত্র-সংসার! তাঁর আজন্মের সংস্কার, অর্জ্জিত পুণ্যের প্রভাব তাঁকে বারম্বার বলতে লাগলো—এ কাজে যোগ দেওয়া তাঁর উচিত হচ্ছে না। যে কর্ম্ম যে করেছে. তার ফল সেইই পাবে। অবন্তীই ভোগ করুক তার পাপের ফল, তিনি কেন সহযোগিতা করে দায়ীত্ব গ্রহণ করতে যাবেন?—তিনি নেমেই যাবেন!

কিন্তু গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে! প্লাটফর্ম্ম ছাড়িয়ে গাড়ী ততক্ষণ ষ্টেশনের বাইরে এসে পড়লো। মুখ তুলে মা চেয়ে দেখলেন—অবন্তী নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরিয়েছে—নরম 'লেডিস সিগারেট'! গন্ধটা মা'র নাকে লাগছে এসে! কী বিশ্রী! ধ্বংশ হয়ে গেল; বাংলার সংস্কৃতির সবটুকুই বিধ্বস্ত হয়ে গেল। বাঙ্গালীর জীবন আজ ভূমিকম্পে টলছে। জীবনের রুদ্রদেবতা বুঝিবা ধ্বংসের লীলায় মেতেছেন! সুদীর্ঘ শ্বাসটা চেপে চেপে মা উচ্চারণ করলেন—'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি!'

পাঞ্চভৌতিক এই দেহটার জন্য মানুষের প্রয়োজন কত কম, অথচ এই দেহের তোয়াজ করবার জন্যই-বা কত রকম ব্যবস্থা করেছে মানুষ! সে বৈজ্ঞানিক হয়ে আজ কত সুখ, কত সুবিধার অধিকারী। আজ অনায়াসে আকাশে সে উড়ে বেড়ায়, একদিনের পথ এক ঘণ্টায় চলে যায়,—আঙুলের একটু ছোঁয়ায় আলো জেলে রাতকে দিনের মত করে তোলে; ঘরে বসে সে আজ শুনছে হাজার মাইল দূরের সঙ্গীত, —পড়ছে হাজার মনীষীর বাণী;—মানুষ আজ সত্যি স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করেছে মর্ত্ত্যে।

এত কিছু করছে, তথাপি, মানুষ দেবতা হলো না, মানুষই রয়ে গেল। তার বাহ্যিক আড়ম্বর যত বাড়ছে, অন্তরের প্রশারতা ততই কমে

যাচ্ছে। ঋষিযুগের যে মানুষ বনের বৃক্ষতলে বসে সারা বসুধাকে কুটুম্ব ভাবতে পারতেন, ভুবনত্রয়কে স্বদেশ ভাবতে পারতেন, এঁরা সারা পৃথিবী ঘুরে, সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করেও সেই ঔদার্য্য দেখাতে সক্ষম হচ্ছেন না। কেন? অন্তরের মানসপদ্ম এঁদের দিনে দিনে সঙ্কুচিত হয়ে গেল, তারই জন্য। এঁরা নিজেকে নিজের গণ্ডীতেই প্রতিষ্ঠিত রাখতে বদ্ধপরিকর—নিজেকে অন্যের প্রভু ভাবতেই সচেষ্ট, এবং স্বপ্রভুত্ব কায়েমী রাখবার জন্য সহস্র অত্যাচার করতেও প্রবৃত্ত। এই নীচতা, এই ক্ষুদ্রতা আধুনিক সভ্যতার দান—বিলাসী মানবের লীলাবিলাস।

আলোক নিশ্চুপে বসে ভাবছিল আপনার মনে। চাকরীর দরকার একটা। যে-কোন রকমের যে-কোন একটা চাকরী—হোক তা যত কম মাইনের—আলোক তাই পেলেই বর্ত্তে যায়। কিন্তু কম-সে-কম একশটা যায়গায় ঘুরেও কিছু হোল না। চাকরী যেখানে খালি আছে সেখানেও জাতিবিচার, সম্প্রদায় বিচার—তারপর গুণবিচার। প্রার্থীর প্রয়োজনের বিচার কেউ করেনা! সবার বড় তাদের কাছে কর্ত্তা-বিচার অর্থাৎ মুরুব্বির জোর। মুরুব্বি কেউ নেই আলোকের—কাজেই চাকরীর আশা তাকে ত্যাগ করতে হলো। কিন্তু করবে কি? পকেটের অবস্থা পাঁচ সিকায় এসে ঠেকেছে। যে-কোনো একটা হোটেলে ঢুকে একবেলা ভাত খেলেই পকেটখানি শূন্য হয়ে যাবে। আগামী কাল অনাহারে থাকতে হবে আলোককে!

কিন্তু ভীষণ-খিদে পেয়েছে ওর! কিছু না খেলেও ওর আর চলে না। আলোক উঠে একটা দোকানে গিয়ে দু আনার চিড়েগুড় কিনলো। পাখীর আহারের মত ছোট্ট একটু ঠোঙ্গায় দোকানী দিল চিড়েগুলি। জলে ভিজিয়ে বসে বসে বেশকরে চিবিয়ে খেল আলোক। ওর মনে হচ্ছে,—জেলে সে ভালই ছিল। খাবারের জন্য কোন ভাবনা অন্তত

করতে হোত না। খাবারের ভাবনা যে কত বড় ভাবনা, তা যেন আজ ভাল করে অনুভব করছে আলোক। কিন্তু ভাবলো,—ওর তো তবু এখনো পকেটে আঠারো আনা আছে! যাদের কিছুই নাই, অথচ—পত্নী-পুত্র-কন্যা হাঁ করে চেয়ে আছে মুখের পানে, তাদের অসহায়তা কতখানি ভীষণ! উঃ! আলোক শিউরে উঠলো কল্পনাতীত তাদের সেই দুরবস্থা ভেবে। অথচ বেশ জানা আছে—এই বিরাট দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের অবস্থা অমনি। পকেটে কিছুই তাদের নেই। কিন্তু খাবার লোকে বাড়ীভর্ত্তি! ওদের কী অবস্থা! কী দুরবস্থা! ওরা খাবারের যোগাড় করবে—নাকি স্বদেশের মঙ্গলের চিন্তা করবে! পেটে খিদে থাকতে কেউ কি কোনো রকম সৎ কাজ করতে পারে—নাকি সুবুদ্ধি মাথায় আসে তার? অসৎ চিন্তা এবং অসৎ উপায় তাদের একমাত্র অবলম্বন হয়; এবং এদেরও হচ্ছে।

আলোকের মনে পড়ে গেল,—হিমালয়বাসী একজন যোগীকে জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'প্রভু, এই দেশের কল্যাণ কিসে হবে! কি করে' স্বাধীন হবে দেশ?' উত্তরে যোগীবর বলেছিলেন—'মাত্র দুটি জিনিষ রক্ষা করলেই এ দেশের পূর্ব্ব অবস্থা আবার ফিরে আসবে। সে দুটি জিনিষ আর কিছু নয়—'বীর্য্য রক্ষা, আর সত্য রক্ষা!'

হায়রে কপাল! বীর্য্য রক্ষা করবার কি যো আছে এদেশে! অন্নাভাবে বীর্য্য তো শুকিয়েই গেল, যেটুকু আছে, তাকে পশ্চিমী সভ্যতার হাজার প্রলোভনে ফেলে নষ্ট করা হচ্ছে। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেকের মানসিক বিকৃত হচ্ছে। শিক্ষায়, সংস্কারে, আর সমাজহীনতায় মানুষগুলোকে জন্তুর পর্য্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হোল। আহার, নিদ্রা, মৈথুন ছাড়া আর কিছু ভাববার পর্য্যন্ত ক্ষমতা তাদের লোপ পেয়ে যাচ্ছে! মানুষকে বহির্মুখী করে তার মনের অন্তর্মুখীন সূক্ষ্ম শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। খাদ্যে, পানীয়ে, অসনে, বসনে,

আচারে, ব্যবহারে তাকে ভোগপ্রবণতায় নারকীয় গর্ত্তেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে—বীর্য্য রক্ষা হবে কিসে!

জীবনকে যাঁরা রুদ্রের আশ্রিত বলে চিনেছিলেন, এই ভারতের সেই ঋষি-বংশধরগণ আজ পশ্চিমী সভ্যতার ভোগকুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অথচ ভোগের উপাদানও ওরা পেল না, শুধু তীব্র, তীক্ষ্ণ আকাঙ্খাটা ওদের জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। রুদ্রদেবতার মত শ্মশানচারী হয়ে ওরা স্ববীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হতে আর কীভাবে পারবেন! বীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত না হলে তো সবই বৃথা যাবে! বীরপূজার আজ যে একটা আন্দোলন এসেছে দেশে—নেতাজী সুভাষের পুণ্যময় জীবনের আদর্শে যে বীরপূজার আয়োজন চলছে, তাও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে দুদিনেই। রুদ্রদেবতার এই সামান্য জটা আলোড়নের জাগর-মুহূর্ত্তটিতেই ক্ষুধা-রাক্ষসী লেলিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবেন ওঁরা। আর, সত্যরক্ষা! সে তো অনেক দূরের কথা—আজ পলিটিক্সের প্যাঁচে প্যাঁচে কেবল মিথ্যাচার—মিথ্যা ছাড়া তুমি কিছুতেই বড় হতে পারবে না। এমনি মজার এই পাশ্চাত্য পলিটিক্স। যে-দেশে রাজনৈতিক জীবনের সুস্থতা বজায় রাখবার জন্য সত্যাচারী সম্রাট শ্রীরামচন্দ্র প্রাণাধিকা পত্নীকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, সেই দেশেরই সন্তানগণ রাজনৈতিক জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান আজ মিথ্যাচারের কদর্য্যতায়। অনধিকারীর আয়ত্তে শক্তি রক্ষিত হলে রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক জীবন বিশৃঙ্খল হওয়া অবশ্যম্ভাবী জেনে শ্রীরামচন্দ্র শূদ্রককে হত্যা করতেও দ্বিধা করেন নি; আজ সেই দেশেই অনধিকারীর দলই নেতৃত্ব-নৈতিক ভাগ্যবিধাতা—শক্তির অধিকারী এবং বিশৃঙ্খলতার জনক! কিন্তু নিরাশার এই অন্ধকারেও মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে আলোকমালা—রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ—গান্ধী, জহরলাল, সুভাষ দেখা দেন। কেন? কেন এঁরা আসেন? ঈশ্বরের প্রয়োজন কি আজো আছে নাকি ভারতে? রাজনৈতিক স্বাধীনতা কি

সত্যি কোনদিন অর্জ্জিত হবে, তাই এই আলোকবর্ত্তিকা দেখিয়ে নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করে রাখা হয়? বিধাতার এসব কি ভবিষ্যৎ দয়ার প্রবোধবাণীর মতই সান্ত্বনাবাক্য? কিন্তু কৈ? সুদীর্ঘ দিন, রাত্রি, মাস, বৎসর কেটে গেল, স্বাধীনতা এখনো বহু বহু দূরে। আজকার রাজনৈতিক গগনের বিদ্যুৎঝিলিক দেখে যাঁরা দিবালোকের কল্পনা করছেন, তাঁরা মোহগ্রস্থ। এই আলোক, দিবালোক তো নয়ই, অধিকতর দুর্য্যোগ সৃষ্টির জন্য স্বেচ্ছায় ডেকে আনা বজ্রালোক।

আলোকের আশাবাদী মনটা অকস্মাৎ আর্ত্তনাদ করে উঠলো নিরাশায়। কিন্তু আবার মনে পড়লো—'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবেনা দিন?' এই যে দুর্যোগময়ী দীর্ঘ রাত্রি—এই রাত্রি কি ফুরাবে না? প্রভাত কি আসবে না তার আলোঝলমল দীপ্তি নিয়ে? স্বাধীনতার প্রসারিত সূর্য্যালোকে আবার কি হাসবে না মাতৃভূমির শ্যামল দুর্ব্বাদল? মহাকবির আপ্তবাক্য কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? না—না; ঋষিবাক্য কখনো ব্যর্থ হয় না। রাত্রির দীর্ঘ তপস্যার পর দিবসের রৌদ্রালোক আসবেই আসবে। আজ তার জন্য চাই আমাদের প্রস্তুতি! এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তটিতেই গাত্রোত্থান করে সন্ধ্যাবন্দনার আয়োজন করতে হবে প্রভাত সূর্য্যের অভ্যর্থনার জন্য। নিস্তেজ দেহ-মনকে আবার জাড্যমুক্ত করে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলতে হবে সম্মুখের উদয়-সূর্য্যের ঐ আশালোকের পানে!

আলোক নিজেই উঠে পড়লো—হয়তো মানসিক উত্তেজনায়; হয়তো মনের ভুলে! কিন্তু যাবে কোথায়? কিছুক্ষণের জন্য পেটে কিছু খাবার পড়েছে, তাই শরীরটা হয়তো সবল হয়েছে একটু; হাঁটতে পারবে, কিন্তু রাস্তায় শুধু শুধু ঘুরে বেড়ানোতে লাভ কি? তথাপি আলোক ভাবতে ভাবতে এগিয়ে পড়ল। এলো সেই মেয়েটির কাছে; ন্যাকড়ার ফালিতে বাচ্চাটা ঘুমুচ্ছে, আর অনেকখানি ঘোমটা টেনে মেয়েটি বসে আছে ডান হাতখানা বার করে! যেন মা কালী বরমুদ্রা দেখাচ্ছেন। না—না,

ওটা ভিক্ষামুদ্রা! ঐ মুদ্রা একদিন বরমুদ্রাই ছিল, কিন্তু সেদিন ছিল ভারতের গৌরবের সূর্য্যযুগ। আজ সেই বরমুদ্রা কৃপাপ্রার্থী ভিক্ষা-মুদ্রায় পরিণত হয়েছে; যে দাতা ছিল, সেই প্রার্থী হয়েছে, যে দেবী ছিল সে আজ দাসী! যে নারীর দাক্ষিণ্যে পরিপুষ্ট হয়ে ধর্ম্ম-জীবন, সমাজ-জীবন, পরিবার-জীবন ধন্য হয়ে যেত—সেই নারী-জীবনই আজ পথের মিছিলে নেমেছে, দিকভ্রান্তির দীর্ঘ আবর্ত্তে ঘূর্ণায়মানা হয়ে পড়ছে। সে স্বস্থ নেই এবং সুস্থও নাই। এই ভাঙনের গতিবেগ যে বিপর্য্যয় এনে দিল সর্ব্বসহিষ্ণু ভারতের অক্ষয় জীবনে, তাকে আবার স্ব-স্বভাবে ফিরিয়ে আনবার উপায় কিছু আছে কি!

বাচ্চাটা কেঁদে উঠলো। পাঁচ সাত আনা পয়সা এর মধ্যে পড়েছে সেই ছেঁড়া ন্যাকড়াটার উপর। মেয়েটি সেগুলো না তুলেই ছেলেটাকে কোলে নিল। ওর শুকনো মাই দুটির একটার বোঁটাটা দিল তার মুখে গুঁজে। আলোক আশ্চর্য্য হয়ে দেখছে,—কী সুন্দর মাতৃত্বময় চাহনি ওর! ও যেন সত্যিই ঐ ছেলেটির মা। হয়তো ঐ স্নেহের আধিক্যে, ঐ অপরূপ মাতৃত্বের আগুনে ওর সর্ব্বাঙ্গের রক্ত গলে গলে স্তন্য হয়ে ঝরবে ছেলেটার মুখে! মা—এই-ই মা! বিশ্বমাতার মাতৃরূপ!

মা—শব্দটা আলোকের অন্তরের আকাশে যেন সহস্র চাঁদের মত কিরণ বিস্তার করে দিল মুহূর্ত্তের জন্য! মা শুধু সন্তানের জন্মদাত্রী নন, তিনি সন্তানের ধাত্রী এবং পালয়েত্রী; তিনি শুধু ধারণ-ই করেন না, পোষণও করেন। জগজ্জননীর অংশভূতা তিনি; তিনি শুধু নারী নন, তিনি ঈশ্বরী। তাই ঋষি বলেছেন:

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা':

সর্ব্বভূতে তাই মাতৃরূপ দেখেছিলেন অর্য্যঋষি—বারম্বার নমস্কার নিবেদন করেছিলেন তাই বিশ্বের সেই মাতৃরূপকে। সর্ব্বভূতে তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তিরূপে জগজ্জননীকে দেখেই তাঁরা স্তুতি করেছিলেন,—কিন্তু

ভারতের সেই সনাতন, শাশ্বত মাতৃত্ব আজ নেমে এসেছে কোথায়? আলোকের চিন্তাশীলতায় কে যেন ঘা দিল লৌহ মুগ্দরের! যে দেশের পথের ভিখারীও গৃহস্থ-বাড়ীতে গিয়ে মাতৃ সম্বোধনে ভিক্ষার দাবী জানাতো—যে দেশের নারীকে মাতৃ সম্বোধন করা ঈশ্বরকে ভজনা করার অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হোত—যে দেশের শাস্ত্রকার মাতাকে বিশ্ব-জননীর সমান আসনে উন্নীত করে সগৌরবে জানিয়ে গেছেন—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'—আজ সেই দেশের ভবিষ্যৎ জননীগণ জননীত্বে দেউলিয়া হোল! পাশ্চাত্যের পার্থিব ভোগপ্রবণতা কেড়ে নিল ওদের সর্ব্বস্ব, ওদের মাতৃত্বের অহঙ্কার, ওদের পত্নীত্বের গৌরব, ওদের কর্ত্রীত্বের দাবী! অথচ ঐ পাশ্চাত্য সভ্যতাই বলে, নারীকে তারা নাকি স্বাধীকারে প্রতিষ্ঠিত করছে। আশ্চর্য্য বিড়ম্বনা! কোথায় তাদের স্বাধীকার! জীবন পথের জঞ্জাল ঘেঁটে ঘেঁটে কয়েকটুকরো রুটির যোগাড় করে 'ইকনমিক ইন্‌ডিপেনডেন্স' লাভই কি নারীর স্বাধীকারলাভ? গৃহ ছেড়ে, পত্নীত্ব হারিয়ে, মাতৃত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে জীবনকে উপার্জনক্ষম করতে পারলেই কি ওদের পরমার্থ লাভ হবে?

ওরা তাই করছে আজ। ওদের সব অন্তর্মুখ সৎ প্রবৃত্তিগুলি বহির্মুখ হয়ে গেল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, বিলীন হয়ে গেল অনন্তে। তথাপি আজকার মানুষ ওই সভ্যতাকেই আশ্রয় করেছে, অবলম্বন করেছে। ওরাই আবার তারস্বরে ঘোষণা করে—'নারীকে পরাধীন রেখেই নাকি ভারতের এই দুর্দ্দশা'—আলোকের হাসি পেয়ে গেল! ভারতের দুর্দ্দশার কতই না কারণ আবিষ্কৃত হয়েছে! কেউ বলেন, ভারতের দুর্দ্দশার করণ, নারীর পরাধীনতা; আবার কেউ বলেন, অস্পৃশ্যতা, আবার কেউ কেউ বলেন নাকি ধর্ম্মের গোড়ামীই ভারতের পরাধীনতার একমাত্র কারণ। কিন্তু এ সব গবেষণা করে লাভ কিছু নাই। ভারত আজ পরাধীন, এইটাই প্রত্যক্ষ সত্য, এবং সে পরাধীনতা শুধু রাষ্ট্রগত নয়, সমাজগত,

সমষ্টিগত—ব্যষ্টিগত, চিন্তাগত এবং চেষ্টাগতও। চিন্তার স্বাধীনতাও আমরা হারিয়েছি তাই চেষ্টার স্বাধীনতাও আমাদের নেই! এক একটা ধুয়া ধরে চলার মধ্যেই আজ স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা আবর্ত্তিত হচ্ছে।

মেয়েটা পয়সাগুলো এবং ছেলেটাকে নিয়ে উঠলো। আলোককে ও চিনতে পারেনি! আলোক পিছনে চলতে লাগলো; দেখবে, মেয়েটা কোথায় যায়!

সিধুর কথায় সবাই ওরা হাসলো দেখে সিধুর মনে আকস্মিক আশা জেগে উঠলো—এরা তাকে ছেড়ে দিতেও পারে। শালগ্রামের নুড়িটি ভাঙা টেবিলটার উপর পড়ে রয়েছে, সিধু কম্পিত হস্তে ডান হাতের একটি আঙ্গুল বাড়িয়ে স্পর্শ করলো সেটি। জীবনে যা করে নাই, আজ প্রাণভয়ে সিধু তাই করলো; প্রার্থনা করলো,—হে দেবতা, ত্রাণ করো। মনে মনে মানস করলো সিধু, এখান থেকে বেঁচে যদি সে যেতে পারে, তবে আগামী প্রভাত থেকে নিশ্চয় ঐ শিলার যথাবিধি পূজা করবে।

শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন, জগতে চার রকম ব্যক্তিরা তাঁর পূজা করেন—'আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ'—সিধু এখন আর্ত্ত, প্রাণ ভয়ে ভীত—জীবনের রক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ অসহায়। কিন্তু তার পিতৃপুরুষের সংস্কৃত রক্ত তার শিরায় শিরায় আজ ধ্বনিত হয়ে উঠলো, 'সঙ্কটে মধুসূদন'! রক্ষা করো প্রভু! জীবনে কোন দিন তোমায় ডাকিনি, আজ সর্ব্বশেষ দিনের এই মহামুহূর্ত্তে তোমায় শেষ ডাক ডেকে নিই; জানিনা, কাল আবার তোমায় ডাকবার সৌভাগ্য আমার হবে কি না।

কিন্তু যারা ওর কথা শুনে হেসেছিল, তারা অত সহজে ছাড়বার পাত্র

নয়। সিধুকে কাপড় পরে তৈরী হতে বলে তারা গোপন ভাষায় কি পরামর্শ করলো নিজেদের মধ্যে। ব্যাপারটা যে অত্যন্ত গুরুতর এবং বিপজ্জনক, তা যেন সিধু বুঝতে পারছিল। ভয়ে, ভাবনায় মুখ ওর শুকিয়ে উঠলো। চিরদিনের ডানপিটে ছেলে সিধু—কিন্তু তার ডানপিটেমীর সমস্ত স্পর্দ্ধা গ্রামের কয়েকটা নিরীহ মানুষের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল! কাশীর মত বিরাট সহরের বিশালকায় গুণ্ডাদলের মধ্যে পড়ে সিধু যেন আজ হতচেতন—হতাশ্বাস। দুহাত দিয়ে সে শালগ্রাম শিলাটি তুলে মাথায় রাখলো—যদি এই মুহূর্ত্তেই সে মরে যায় তো তার পিতৃ-পুরুষের এই পবিত্র বিগ্রহের স্পর্শ-সংযুক্ত হয়েই মরবে। এ জীবনে অনেক অসৎ কাজ সে করেছে, অনেক মানুষের প্রাণে ব্যথা দিয়েছে, অনেকের অনেক সর্ব্বনাশ সাধনও করেছে। আজ এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সেই সব কর্ম্মের স্মৃতি ওকে যেন আগুনে গালিয়ে নতুন রূপে ঢালছে। বুকের ভেতর কি যেন এক রকম করতে লাগলো ওর—ভয়ে নয়, ভয়ত্রাতার অভয়বাণীতে। আজন্ম নাস্তিক, অবিশ্বাসী সিদ্ধেশ্বরের অন্তরাত্মা যেন একটা আশ্চর্য্য আশ্রয় লাভ করছে, যে আশ্রয় জীবন এবং মৃত্যুকে জয় করে তাকে অমৃতে নিয়ে যেতে সমর্থ। যে আশ্রয়ে আশ্রিত হলে জীব মৃত্যুকে ঠিক জীবন লাভের মতই আনন্দময় ভাবতে পারে। সিধুর মনে হোল—ভগবানকে সে এভাবে তো কখনো ডাকে নাই—এরকম চিন্তাও কখনো করতে পারে নাই; তবু ওর মানসলোকে এ কার বাণী, কিসের চিন্তার তরঙ্গ—কোন্ আধ্যাত্মিক অনুভূতির আস্বাদ? লেখাপড়া প্রায় কিছুই সে জানে না, তাই বুঝতে পারলো না—তার দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে এক ত্যাগী-তপস্বী বংশের বীজ লুকিয়ে আছে—যাকে বলে সংস্কার, যাকে বলে cult, যে পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত অনুভূতি-প্রবণতা প্রত্যেক ভারত বাসীর অন্তরে আজো রয়েছে সুপ্ত হয়ে—যে সৎ বস্তুকে শক-হুণ-তাতার-মোগল থেকে আজকার শ্বেতদ্বীপবাসী পর্য্যন্ত ধ্বংশ

করবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেছে এবং এখনো করছে কিন্তু সক্ষম হয় নি। এর নাম ধর্ম্ম,—যা ধারণ করে থাকে জীবনকে—এবং মৃত্যুকেও। সিধুর অন্তরে আজ সেই বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে নাকি! বীজের নিয়ম—অঙ্কুরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার বাইরের আবরণ পচে গলে যায়—সিধুরও বাহ্যিক আবরণটা যেন গলে যাচ্ছে—দেহখানার উপর ওর যেন কিছুমাত্র মমতা জাগছে না আর! যায় যাক এই তুচ্ছ দেহটা! ভয়ের কী এমন আছে আর কেই বা আছে সিধুর যার জন্য মমতা জাগবে? যে কাজই ওরা করতে বলুক, সিধু করবে। কিন্তু কাজটা যদি খুব কদর্য্য হয়? সিধু নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করলো। অন্তরাত্মা বলে উঠলো—'এই জীবনে বিস্তর অন্যায় কাজ তুমি করেছ সিদ্ধেশ্বর, আর নয়। মৃত্যুর ভয়েও আর অন্যায়ের পথে এগিও না। তবে যদি কাজটা ভাল হয়—এই দেহের বিনিময়েও সে কাজ করে ভগবানের প্রসাদ অর্জ্জন করো।' কাজটা কি—শুনবার জন্য সিধু প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

পরামর্শ শেষ করে ওরা বলল—তাহলে তুমি তৈরী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—তৈরী! মরতে আর আমি ভয় করি না; তবে আমার একটি নিবেদন আছে। কোনো নীচ কাজে আমাকে পাঠাবেন না স্যর্।

—নীচ কাজ! নীচ কাজ কি হে? সুমহান কাজ আমাদের। মাতৃ-ভূমির উদ্ধারের জন্য, দেশ মাতার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য আমাদের অভিযান।

সিধু ঠিক ঠিক বুঝতে পারছিল না অত শক্ত সাধু বাংলা, তবু—

—আজ্ঞে কাজটা অধর্ম্মের না হলেই হোল। অধর্ম্মের কাজ আমি অনেক

করেছি। কত লোকের যে কত সর্ব্বনাশ করেছি তার হিসাব নাই। কিন্তু আজ এই মরবার দিনে অন্ততঃ একটা ভাল কাজ করে যেতে চাই।

—এর থেকে ভাল কাজ আর কিছু নাই! জানো, বারশো বছর ভারতবর্ষ পরাধীন। পরের শাসনে আর শোষণে ভারতবর্ষের কী দুর্দ্দশা হয়েছে, দেখছো তো! আমরা চাই ভারতকে স্বাধীন করতে;—স্বরাজ্য স্থাপন করতে ভারতে—আমরা সৈনিক! তুমিও হবে সেই মহান যুদ্ধ-যাত্রার একজন সৈনিক—আমাদের ধর্ম্ম-যুদ্ধের সৈনিক, যে যুদ্ধে মাতৃ-ভূমির মুক্তি লাভ হবে!

সিধু এবার বুঝলো কথাগুলো। আনন্দে ওর অন্তর ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে। মরবার আগে সে একটা কাজের মত কাজ তাহলে করে যেতে পারবে। বুকখানা ওর প্রশস্ত হয়ে উঠলো।

—যে আজ্ঞে! আমি তৈরী। বলুন কি করতে হবে? মরতে আমি একটুও ভয় করি না—কোথায় যেতে হবে আমাদের যুদ্ধ করতে!

ওর গৌরব এবং গর্ব্বদীপ্ত মুখের পানে তাকিয়ে দলের সেই লোকটি বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল আধমিনিট, তারপর বলল,—লাল কেল্লা! চলো? 'কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে যা'

ওরা বেরিয়ে পড়লো সিধুর হাত ধরে। সিধুর অন্তরে অনেকদিন আগে শোনা একটা কোমল স্বর যেন বারম্বার বাজতে লাগলো—'লালকেল্লা—জাতীয় পতাকা'.....কথাটা অবন্তীর মুখে শোনা। সিধু আজ সত্যই যাচ্ছে নাকি সেখানে! বাঃ!

উৎপলা সুস্থ হয়ে উঠলো সপ্তা দুইয়ের মধ্যে। কিন্তু এই কয়দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ক্রমাগত সে ভেবেছে। সকালেই এক সঙ্গে পাঁচখানা খবরের কাগজ ওর কাছে পৌঁছে,—যে কোনো একটা তুলে উৎপলা

মোটামুটি খবর গুলো সর্ব্বাগ্রে পড়ে নেয়, তারপর প্রত্যেকটি কাগজের সম্পাদকীয় এবং সাধারণ কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়তে চেষ্টা করে। বেশ দেখতে পাচ্ছে, প্রত্যেকটি কাগজের সুরে যেন বিস্তর তফাৎ! প্রায় প্রত্যেকেই বলেন—'নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র'—কিন্তু কাগজের লেখায় নিরপেক্ষতা দূরে থাক, সত্যকার জাতীয়তাবাদটাই ও খুঁজে পায় না। যেটা যখন পড়ে তখন তার মতটাই ঠিক বলে মনে হয়—আবার অন্য বিরুদ্ধ মতের কাগজখানা পড়লেই পূর্ব্বের কাগজের মতটা বাতিল হয়ে যায় ওর কাছে। তাহলে জাতীয়তাবাদ—যেটা সকলেরই একমাত্র আশ্রয়, সেই বস্তুটির অস্তিত্বটা রহিল কোথায়? সত্য নিশ্চয় এক রকমই হবে—পাঁচটা কাগজে পাঁচ রকম লিখলে সত্য বস্তু কোন্‌টি তা ধরা মুস্কিল! ওর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক অনেক সময় ভাবে—হয়তো সে ঠিকমত বুঝতে পারছে না। জাতীয়তা আজ দেশের জীবনে জেগেছে এবং সেটা যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি সমষ্টিগত। খবরের কাগজে নিশ্চয় সেই সমষ্টির মতটাই প্রকাশিত হয়—হওয়াই তো উচিৎ। কিন্তু বহু সময় বিরুদ্ধ মতবাদ ওকে ভাবিয়ে তোলে। তখন নতুন করে ভাবে সে—যাঁরা কাগজের কলমে সম্পাদকীয় লেখেন, তাঁরা দেশের মহাশক্তিমান লেখক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। লেখার গুণে যে-কোনো বিষয়কে সত্যের রূপ দিতে তাঁরা সম্পূর্ণ সক্ষম—তাই প্রত্যেকটি কাগজ পড়বার সময় মনে হয়, ওঁর কথাটিই সত্য; ওর বড়ে সত্য আর নাই!

কিন্তু উৎপলার নিজের একটা চিন্তাশক্তি আছে। সে ভাবে, এতখানি যাঁদের লেখনীর শক্তি—তাঁরা প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই অসাধারণ চিন্তাশীল, এবং তাঁরা প্রত্যেকেই সুনিশ্চিত জাতীয়তাবাদী—এ বিষয়ে সংশয় পোষণ করা শুধু অন্যায় নয়,—পাপ। তথাপি তাঁদের মতের একত্ব হয় না কেন? কিম্বা মতবাদ তাঁদের সর্ব্বত্রই এক, শুধু প্রকাশভঙ্গীর বিভিন্নতার জন্য উৎপলা ঠিক ঠিক ধরতে পারে না? কোন্‌টা ঠিক, উৎপলা-

অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারলো না। কিন্তু ওর মনে অন্য একটা চিন্তাও এলো—এই যে উচ্চ চিন্তাশীল লেখকশ্রেণী,—রাজনৈতিক জীবনে এঁদের স্থান কোথায়? যাঁরা বাংলার এবং ভারতের রাজনৈতিক জীবনকে জীবনদান করেছেন, রাষ্ট্রচেতনাকে আজো যাঁরা সস্নেহে লালন করেছেন বীর্যবান সাহিত্যের স্তন্যদানে—বর্ত্তমান রাজনীতিতে তাঁরা কে কোথায় আছেন? এবং বর্ত্তমান রাজনীতিকগণই বা তাঁদের কতখানি খোঁজখবর রাখেন? উৎপলা অনেক ভেবেও কোনো সাহিত্যিকের সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগ আবিষ্কার করতে পারলো না। হয়তো ওর অজ্ঞানতা, কিম্বা সত্যই সাহিত্যিকগণ পরোক্ষেই রাজনীতিকে পোষণ এবং পালন করেন—মা যেমন সন্তানকে পালন করেন অন্তঃপুরের অন্তরালে। কিন্তু মা অন্তঃপুরে লালন করলেও সন্তান মাকে ভুলে থাকে না—সিদ্ধির সর্ব্বাগ্রে সে মা'র চরণতলে গিয়ে প্রণত হয়। তবে বর্ত্তমান কালের এই রাজনীতির মধ্যে সাহিত্যিকের সেই সম্মানের আসন নেই কেন? ভাবতে ভাবতে উৎপলার মনে হোল—হয়তো আজও এ দেশের সে অবস্থা আসেনি—হয়তো এখনো দেশবাসী সাহিত্যিককে দেশগঠনকারী সংস্কারক, জাতীয় জীবনের হৃদ্‌পিণ্ড রূপে বুঝতে শেখে নি—কিন্তু একদিন শিখবে। একদিন, যেদিন জাতীয় জীবন সত্যই সিদ্ধিলাভ করবে, সেইদিন বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্র-শরৎ থেকে আরম্ভ করে আজকার ক্ষুদ্রতম লেখকটি পর্য্যন্ত জাতির চোখে মহান মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু সেদিনের দেরী আছে!

দেরী যে আছে, তা বুঝতে বাকি থাকে না, যখন দেখা যায় অসাধারণ শক্তিশালী লেখকও কাগজের সুরটি ঠিক রাখবার জন্য নিজের মতের বিরুদ্ধে লিখতেও বাধ্য হন। লেখকের লিপি-স্বাধীনতা কোথায় যে তিনি লিখবেন? সত্যিকারের নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী পত্রিকার তাই এতই অভাব। —এ অভাব পূরণ করা যায় না!

টাকা রয়েছে উৎপলার! অকস্মাৎ মনে হোল—সেও একটা কাগজ বের করে ফেলবে নাকি? একটা কাজের মত কাজও করা হবে এবং দেশ-সেবার সঙ্গে কয়েকজন শক্তিশালী লেখককে সুযোগও দেওয়া হবে। উৎপলা অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো: কিন্তু দৈনিক কাগজ বের করা এক বিরাট ব্যাপার—বিস্তর ঝামেলা এবং বিলক্ষণ অভিজ্ঞতার মধ্যে তাকে চালাতে হয়। বিকাশের কিছু অভিজ্ঞতা আছে এ বিষয়ে, কিন্তু বিকাশ তো এখন নিতান্ত পর হয়ে গেছে। তাছাড়া উৎপলাও তার কোনো সাহায্য আর নিতে চায় না। তার থেকে বড়ো কারণ, বিকাশ নিজেই এখন একটা দলের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। তার দ্বারা চালানো কাগজ কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাহলে উৎপলা এখন করবে কি? ওর যৌবনের শক্তি এই ক'দিন বিছনায় বন্দী থেকে যেন দ্বিগুণ জোরালো হয়ে উঠেছে। কিছু একটা কাজ তাকে করতেই হবে—কিন্তু কি কাজ!

—যা—পার্কে একটু বেড়িয়ে আয়!—ওর মা এসে বললো।

উৎপলাও যেন প্রস্তুতই ছিল—একটা কাজ পেয়ে বর্ত্তে গেল! বলল,

—হ্যাঁ—যাই—বলেই উঠলো সে। অসুখের পর আজই প্রথম বাইরে বেরুচ্ছে, তাই মা বললো—ঝি-টাকে সঙ্গে নিয়ে যা—কেমন?

—না, কিছু দরকার নেই!—বলেই উৎপলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো! মনে পড়ে গেল—এই অসুখের পূর্ব্বে বাইরে বেরুতে হলে অন্ততঃ পুরো একটি ঘণ্টা তার সাজ পোষাকে সময় লাগতো। আজ লাগলো এক মিনিট—চটি দুটো পায়ে দিতে যা দেরী। নিজেকে সাজিয়ে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করার জন্য কতই না চেষ্টা করেছে সেদিন উৎপলা! আজ আর যেন কিছুরই প্রয়োজন নেই। আশ্চর্য্য! ওর মনটা এই তরুণ বয়সেই এতখানি বৈরাগ্যে আশ্রিত হয়ে গেল নাকি? সত্যিই এটা বৈরাগ্য, নাকি শ্মশান-বৈরাগ্য!

ধীরে ধীরে সিড়ি বেয়ে নেমে উৎপলা পথে পড়লো। সুপরিচিত পথ আজ যেন একান্ত অপরিচিত বোধ হচ্ছে। বেশ লাগছে! অসংখ্য মানুষের ভিড় ঠেলে ধীরে ধীরে ও চলতে লাগলো যেন কিছুর সন্ধানে, কোনো বস্তুর প্রত্যাশায়।

সেই উৎপলাই কি আজ রাজপথে হাঁটছে যার চলার ভঙ্গিমা দেখবার জন্য হাজার তরুণ ফিরে ফিরে তাকাতো, প্রৌঢ়রা আফ্‌শোষ করতো, বৃদ্ধরা অকারণে পথ বাৎলে দিতে চাইতো, সে কি সেই উৎপলা? কৈ? কেউ তো বিশেষ তাকাচ্ছে না ওর পানে! যারা তাকাচ্ছে, তাদেরও দৃষ্টির মধ্যে কামনার বিশেষ উগ্রতা নেই যেন—যেমন পোলাও-কালিয়া-খাওয়া মানুষ ভরা পেটে ডালভাতের পানে তাকায়, এদের চাউনি ঠিক তেমনি। বাংলা দেশ কি বৈরাগ্য নিল নাকি এই ক'দিনের মধ্যে? না, না, বাংলাদেশ বৈরাগ্য নেয়নি, উৎপলা নিজেই আজ বৈরাগিনী সেজেছে —সাজতে বাধ্য হয়েছে। ওর রূপযৌবন ওকে রিক্ত করে রেখে গেছে একটা চামড়া-ঢাকা কঙ্কাল, যার পানে কৃপাদৃষ্টিপাত ছাড়া মানুষের আর কিছু করবার নেই। নিজেকে এতটা কৃপাদৃষ্টি ভাজন করতে কিন্তু কুণ্ঠিত হচ্ছে ওর তরুণ মন। মনের যৌবন ঠিকই আছে তাহলে! মন তো বুড়িয়ে যায়নি! উৎপলা ভাবতে লাগলো—ভাল সাজ-সজ্জা করে বেরুলে সে এই অবস্থাতেই বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো।—তার মন এখনও সতেজ, যৌবনের দীপ্তিতে প্রখর, দেহকেও সে আবার তৈরী করে নিতে পারবে পূর্ব্বের মতই, কিন্তু ঐ দৃষ্টির প্রসাদ যেন আজ ওর চোখে ঘৃণিত বস্তু হয়ে উঠলো! সাজগোজ করে নিজকে পণ্য-নারীতে পরিণত না করে আজ সে ভালই করেছে। ঐ দেহলোভী ভিক্ষুকদের কাছে একটু দৃষ্টির প্রসাদ আদায় করার জন্য কেন মেয়েদের এতখানি কাঙালপনা? কেন? কী এসে যায় ওটুকু না পেলে!

কিন্তু রাস্তায় চেয়ে দেখলো উৎপলা, বহু কিশোরী, তরুণী, যুবতী

চলেছে—প্রত্যেকের সজ্জিত রূপ চেয়ে দেখবার মতো—অথচ উৎপলা জানে, —সত্যিকার রূপসুষমা তাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে পনর আনা মেয়ের নাই। সে নিজে মেয়ে, তাই মেয়েদের অ-সৌন্দর্য্যের দিকটা তার ভাল জানা আছে। সেগুলোকে কেমন করে সামলে রাস্তায় চলতে হয়, কোন্ কৌশলে পুরুষের চোখে ধূলো দিয়ে নিজেকে অপরূপ রূপসী প্রমাণ করা যায়—তার সব বিজ্ঞানটুকুই উৎপলার আয়ত্তিভূত, কিন্তু আজ যেন সেই বিজ্ঞান উৎপলার কাছে নিষ্প্রয়োজন? কে বললো নিষ্প্রয়োজন? হয়তো আবার যেতে হবে তাকে তেমনি করে শিকার সন্ধানে, তেমনি মায়ার ফাঁদ পেতে ধরতে হবে মানুষকে, শোষণ করতে হবে তার সর্ব্বস্ব! কিন্তু না!—উৎপলার ঘেন্না ধরে গেছে! জীবনকে সে এই বয়সেই বেশ করে দেখে নিল;—দেখে নিল, মানুষ যতই সভ্যতার বড়াই করুক, সত্যকার মানবত্বে সে পশু থেকে তিলমাত্র এগোয়নি! শুধু তফাৎ, পশুরা আহার-নিদ্রা-মৈথুন যা কিছু করে প্রাকৃতিক ভাবে, সহজভাবেই তারা করে; আর মানুষ সেগুলোকে বুদ্ধিবলে আরো বিলাসের এবং ব্যসনের ব্যাপার করে তুলেছে! তার আহারের পারিপাট্যের জন্য, নিদ্রার সুকোমলতা বিধানের জন্য এবং আনন্দের আনুসঙ্গীকতার জন্য কত কত প্রাণ বলি হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই! মানুষের জীবন থেকে পশুজীবন খারাপ কোন্‌খানটায়, উৎপলা যেন বুঝতে পারছে না!—হ্যাঁ, মানুষের মধ্যে মানবত্ব বলে একটা পদার্থ আছে —দয়া-মায়া-ক্ষমা, সত্য, অহিংসা ইত্যাদি কতকগুলো ধর্ম্মও আছে ঐ মানবত্বকে বিকশিত করবার জন্য। কিন্তু পশুদের যে ওগুলো নেই তা কে বললো? পশুরা অবশ্য বড় বড় মন্দির, মসজিদ বা গির্জ্জা গড়ে ভগবানকে ডাকে না—কিন্তু ওদেরও ভগবান আছেন কি না, কে জানে! হয়তো আছে। পশুরাও মানুষের মতই ধর্ম্মাচারী আছে! খারাপ কিসে?

পার্কে এসে পড়লো উৎপলা। ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। বাবুরা

বেড়াচ্ছে—বন্ধুরা বসে গল্প করছে, তরুণরা তরুণীদের গায়ের গন্ধের আশায় ঘুরছে এবং ভিখারীরা ভিক্ষার আশায় ফিরছে। এর মধ্যে ফেরী ওয়ালারা বেশ ব্যবসাও করে নিচ্ছে। বেশ জায়গা, যেন ঈশ্বরের মানব-শিল্প-প্রতিভার একটি ছোট্ট মডেল! বিশ্বের বিরাট নক্ষত্রলোকের কোথাও যদি বড় রকম একটা এক্‌জিবিশন হয় তাহলে এই পার্কটিকে সেখানে পৃথিবীর মানুষের মডেলরূপে পাঠালে ঠিক মানিয়ে যাবে!

উৎপলা নিজের চিন্তায় নিজেই হেসে উঠলো! সেও তো সেই মডেলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তাহলে? হ্যাঁ, যাবে। পৃথিবীর মনুষদের মধ্যে সেও তো একজন! সেখানের কোন দেবতা বা দানব যদি তাকে কিনে নিয়ে যায়,—যেমন উৎপলা কংগ্রেস একজিবিশন থেকে একটা তীরন্দাজ মূর্ত্তি কিনে এনেছিল—তাহলে উৎপলা সেখানে গিয়ে কি করবে? কি আর করবে! তীরন্দাজ পুতুলটা যেমন আলমারীতে আছে, তেমনি থেকে যাবে উৎপলা! কিন্তু উৎপলা তো পুতুল নয়! তার খিদে আছে, তৃষ্ণা আছে—অসুখ আছে, আনন্দ আছে, অবসাদও আছে;—উৎপলা তো চুপ করে থাকতে পারবে না। ক্রেতাকে সে বলতে বাধ্য হবে—আমায় খেতে দাও—শুতে দাও।

উৎপলা কিসব বাজে বাজে ভাবছে! অকারণ এই আজগুবী চিন্তায় লাভ কি ওর! কিন্তু মানুষ আজগুবী চিন্তাও করে। খুব বেশীই করে। যে-কোন মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে—তার চিন্তার অর্দ্ধেক সময়ই এক রকম বাজে চিন্তায় ব্যর্থ হয়ে যায়। ঠিক ব্যর্থ নয়, এরও হয়তো স্বার্থকতা আছে। এইরকম বাজে চিন্তা করতে করতে মানুষ হয়তো সত্য চিন্তায় অভ্যস্ত হয়—সত্যকে আশ্রয় করে, তখন সে সত্যকে লাভও করতে পারে! সত্য—অর্থাৎ যা অপরিবর্ত্তনীয়—যা কল্যাণকর,—যা অগ্রগতির পথে পাথেয়। জীবন-দর্শন সত্যের ভিত্তিতেই তাই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু পূর্ণ সত্য তো কারো

চোখে প্রায় পড়েই না। সবাই দেখে আংশিক সত্য। অংশও সত্য হতে পারে, কিন্তু পূর্ণ সত্য নয়। হাতী দেখতে গিয়ে শুধু তার কাণটা দেখে এসে যদি বলা যায় যে হাতী কুলোর মত, তাহলে—কুলোর মত কাণ হাতীর একটা অংশ হিসাবে সত্য নিশ্চয়ই—কিন্তু আংশিক সত্য! পূর্ণ সত্য যে দেখবে, সে গোটা হাতীটাই দেখবে। উৎপলার বর্ত্তমান দেহ-মনকে যে দেখবে, সে আংশিক সত্যই দেখবে! আগে যারা উৎপলাকে দেখেছে, তারাও আংশিকভাবেই দেখেছে—উৎপলা নিজেও নিজেকে মাত্র আংশিকভাবে দেখছে। পূর্ণ উৎপলা এখনো অপ্রকাশ—কে জানে, কবে প্রকাশ হবে!

—দুটি পয়সা দাও মা—ছেলেকে দুধ কিনে খাওয়াব।

উৎপলার দার্শনিক চিন্তা মুহূর্ত্তে ছুটে গেল! চেয়ে দেখলো একটা ভিখারিণী, কোলে কচি একটি শিশু—হাত পেতে মেয়েটি ভিক্ষা চাইছে। কিন্তু উৎপলা যে তার ভ্যানিটি ব্যাগটা আনেনি। পয়সা তো নেই তার কাছে। দাতব্য উৎপলা কদাচিৎ করেছে জীবনে। কখনো কেউ ভিক্ষা চাইলে মুখ ফিরিয়েই চলে গেছে, কিন্তু আজ যেন···

—দাও মা, ছেলেটা সারাদিন কিছু খায় নি।

—আহারে !!!—উৎপলার আর বেড়ান হোল না; উঠলো!

মেয়েটিকে বললো—এসো আমার সঙ্গে!—পার্ক পার হয়ে ফুটপাতে নামলো উৎপলা। বিশেষ কিছু পাবার প্রত্যাশায় ভিখারিণী সানন্দে ওর পেছনে হাঁটছে। উৎপলা একবার ফিরে তাকিয়ে দেখে নিল,—কোলের ছেলেটা বেশ ফরসা! ব্যাটা ছেলে বোধ হয়—প্রশ্ন করলো:

—মেয়ে, না ছেলে তোমার?

—ছেলে!—একমাসও এখনো হয়নি মা—বড্ড কচি!

উৎপলা আর কিছু শুধুলো না, নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলো। কিন্তু ভাবছে, পথের ভিখারিণী, সেও তার ছেলেকে মানুষ করবে; বনের বাঘ,

সেও ছেলেকে আহার যোগায়—আর মানুষ,—সভ্য, শিক্ষিত, সমাজগত মানুষ অনায়াসে তার ছেলেকে ডাষ্টবীনে ফেলে দিয়ে আসে!—মানুষ নাকি সুসভ্য! কিন্তু সবাই তো আর ফেলে দেয় না—জীবনে যাদের বিড়ম্বনা জেগেছে, সেই হতভাগীরাই ফেলে দেয়; নইলে সন্তান যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ! শরীরের অভ্যন্তরের কোমলতম শয্যায় তাকে ধারণ করা হয়, পোষণ করা হয় শরীরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওজঃধাতু দিয়ে,—অসহ্য দুঃখের মধ্যে তাকে আনা হয় পৃথিবীর আলোকে, বুকের রক্তে তাকে বড়ো করে তোলা হয়—সে কি ফেলবার জিনিষ! সন্তান আনন্দের সৃষ্টি, যেমন এই বিরাট বিশ্ব ঈশ্বরের আনন্দের সৃষ্টি! অসহ্য ব্যথার আনন্দের মধ্যে সে আসে—এসে ধন্য করে জননী-জীবন। নারী তাই নিজ জীবনকে মাতৃত্বে অলঙ্কৃত করবার জন্য ধীরে ধীরে কেমন বিকশিত হয়ে ওঠে নিতম্বের নিবিড়তায়,—বক্ষের প্রাণপদ্মে, ধারণকুণ্ডের শোণিতস্রাবে। বিশ্বজননীই যেন প্রতি নারীর মধ্যে সৃষ্টিশক্তিকে আবর্ত্তিত করছেন। নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাই সন্তান-সৃষ্টি। এর বড়ো সৃষ্টি তার নাই—তার দ্বারা করা সম্ভব নয়—এবং চেষ্টা করাও উচিৎ নয়!

কিন্তু আধুনিক সভ্যতা এ সত্য অগ্রাহ্য করছে! নারীকে পুরুষের মত পাঠ দিয়ে, পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়ে বর্ত্তমানের মানুষ সৃষ্টিশক্তির শ্রেষ্ঠতম যন্ত্রটিকে বিকল, বিকৃত করে দিচ্ছে—উৎপলাকেও দিয়েছে! হ্যাঁ, দিয়েছে! উৎপলা আজ মাতৃত্বের বিকৃত রূপ—বিশ্বমাতার অবমাননাকারিণী অ-মাতা! চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসছে উৎপলার!

বাড়ীর দরজায় এসে গেল উৎপলা। সিঁড়ি ভেঙে আবার নেমে ভিখারিণীকে পয়সা দিতে আসতে ওর খুবই কষ্ট হবে, তাই তাকেও সে উপরে আসতে বললো! নিজের ঘরে আসতেই ওর মা দেখলো ভিখারিণীকে।

—এই—কে তুই! কি চাস?—মা'র কণ্ঠস্বরটা অত্যন্ত উগ্র। কিন্তু উৎপলা বললো,

—অমি ডেকে এনেছি; কিছু পয়সা দেব। আর আমার রাত্রির খাবার দুধ থেকে ওকে কিছু দাও—ছেলেটাকে খাওয়াক!—বলে উৎপলা পয়সার সন্ধান করছে। ওর মা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো উৎপলার কাণ্ড দেখে। এমনি করে উৎপলা যত রাস্তার ভিখিরীকে ঘরে এনে দানছত্র খুলবে নাকি? তাহলে তো ভীষণ মুস্কিল হবে! একটু রুক্ষ স্বরেই বললো উৎপলাকে,

—রাজ্যি শুদ্ধ ভিখারী-মেয়ে বসে থাকে ছেলে নিয়ে—কটাকে তুই দুধ দিতে পারিস উৎপলা! দে—দুটো পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দে! এই—যা!

মা নিজেই দুটো পয়সা দিতে যাচ্ছিল—তাড়াতাড়ি ওকে তাড়াবার জন্য চিন্তিত হয়ে উঠেছিল মা—কিন্তু উৎপলা নিঃশব্দে একটা টাকা আর একখানা ভাল তোয়ালে দিল ওকে,—বললো,—বসো, দুধ আনি!

নিজেই খানিকটা দুধ এনে দিল! বললো—খাওয়াও এইখানে! অতখানা দুধ অবশ্য খেতে পারলো না ছেলেটা—অবশিষ্টটুকু ভিখারিণীই খেয়ে নিল—তারপর আস্তে উঠে চলে গেল—'রাণীমা জয় হোক' বলতে বলতে! মা এতক্ষণ চুপ করেই ছিল, কিছুটা ভয়ে, কিছুটা বা মেয়ের বর্ত্তমান শরীর মনের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে। এতক্ষণে বললো,.

—এরকম তো তুই ছিলি নে পলা! ওরা চোর-ডাকাত বজ্জাত মেয়ে—ওদের দিয়ে লাভ কি?

—আছে লাভ! উৎপলা দৃঢ়কণ্ঠে বললো,—ও হাজার লোকের কাছে ভিক্ষা চাইবে, দেবে হয়তো বিশ জন। তাতেই ওর চলে যায় মা, বাকি ন'শো আশি জন না দিলেও ওর কিছু এসে যায় না। কিন্তু যে দেবে, তার মানসিক একটা সদ্‌বৃত্তির—দয়া বৃত্তিটার অনুশীলন হবে। না দিলে

মানুষের সে বৃত্তিটা ভোঁতা হয়ে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়—মানুষ অমানুষ হয়! কাজেই দান করায় লাভ দাতারই বেশি! না দিলে ওর ক্ষতি হবে সামান্য—আমার ক্ষতি হবে ভয়ঙ্কর।

—কিন্তু ওরা বজ্জাত মেয়ে। ওদের দিলে কুঁড়েমীর প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

—থাক মা! তর্ক করে লাভ নেই। পৃথিবীতে ওরাই শুধু বজ্জাত আর কুঁড়ে নয়, আমরাও অনেক বেশি বজ্জাত আর কুঁড়ে। গভীর রাত্রে একা ঘরে নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখো—ওর থেকে তুমি-আমি অনেক বেশী বজ্জাৎ। কিন্তু যাক্—আমি ঠিক করেছি—এইসব সর্ব্বহারা সন্তানদের জন্য—এই সব বজ্জাৎ মেয়েদের পুত্রকন্যার জন্য একটা আশ্রম করবো—যেখানে আন-ওয়ান্টেড্ এবং ইল্লেজিটিমেট চাইল্ড্ আশ্রয় পাবে; মানুষ হয়ে উঠবে!

—কী সব বাজে বক্‌ছিস উৎপলা! বিয়ে করতে হবে—সংসার করতে হবে তোকে!

—বিয়ে? সে হয়ে গেছে। আর সংসার তো তাদের নিয়েই করবো। তোমরা বাধা দিতে পারবে না; অনর্থক চেষ্টা কোরো না। আমি তোমাদের সঞ্চিত অর্থ কিছুই নেব না—টাকা আমি যোগাড় করে নেব অন্যভাবে।

—চাঁদা তুলে?

—হ্যাঁ—দরকার হয় চাঁদা তুলবো; চ্যারিটি শো করবো, চুরিও করতে পারি।

—চুরি!

—হ্যাঁ—চমকে উঠছো কেন? আমরা প্রত্যেকে এক একটি বড় রকমের চোর—ধরা পড়ি না, এই যা! আইনকে ফাঁকি দেবার কৌশল আমরা জানি; মানুষকেও ফাঁকি দিতে আমরা বিলক্ষণ পটু। নিজের

মনের গভীর অভ্যন্তরে খুঁজে দেখ—তুমি কতখানি চোর আর বজ্জাৎ তা টের পাবে। আইনকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করতে পারলে সেটা জাগতিক বিজ্ঞানে চুরি বলে গণ্য হয় না, হয় বুদ্ধি নামে প্রশংসিত! আমার চুরি হবে সেই বুদ্ধিবলের চুরি। ধরা পড়বো না, ভাবছো কেন?

মা চিন্তিত মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু উৎপলা আর কথা না বলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল! এবার রেডিওটা খুলে একটু গান শুনবে; কিন্তু মনে হোল, গান শুনবার বিলাসিতায় সে নিজেকে আর নামাবে না। মনকে সে এবার থেকে ঊর্দ্ধমুখিন্ করে রাখবে কখন সত্যের সূর্য্যালোক এসে পড়বে তার প্রাণপদ্মে—বিকশিত হয়ে যাবে শতদলে। উৎপলা ভাবলো—পদ্ম—বিকশিত হয়, তারপর আসে মধুকর, দিয়ে যায় পরাগরেণু—তারপর হয় পদ্মবীজ, তার থেকে আবার পদ্মলতা! এইই সৃষ্টির নিয়ম,—উৎপলা এই নিয়মসূত্রের কোন্‌খানটায় আছে? নেই! উৎপলা যেন খসে পড়েছে ঐ সৃষ্টি-সূত্র থেকে। ও মালায় উৎপলার ঠাঁই নেই! সৃষ্টির শক্তিকে সে বিকৃত করেছে, ধ্বংস করেছে নিজে হাতে। কিম্বা, কে জানে,—ধ্বংস কখনো হয় না সৃষ্টির বীজ। ধ্বংসটা আংশিক সত্য, পূর্ণ সত্য নয়! উৎপলা যাকে ধ্বংস করেছে বলে ভাবছে,—কে জানে সে এখনো সৃষ্টির বিচিত্র পথে পা বাড়িয়ে চলেছে কি না! এমন কি, ঐ ভিখারিণীর কোলের ছেলেটাই হয়তো সেই! —চমকে উঠলো উৎপলা! না—সে নয়! উৎপলা তাকে নিশ্চয়ই ধ্বংস করেছে নিজের হাতে। সে আর নেই। কিন্তু যদি থাকে—যদি ঐই সে হয়—তাহলে, তাহলে এবার সে তার জন্মদাত্রীর হাতের দেওয়া দুধ খেয়ে গেল—দেখে গেল জননীকে। ও নিশ্চয়ই সে, নইলে এত ভিখিরী আছে, কাউকে তো উৎপলা কখনো বাড়ীতে ডাকে নি! অস্থির হয়ে উৎপলা জানালায় দাঁড়ালো গিয়ে। কোথায় সে ভিখারিণী! কোন্ দিকে গেছে কে জানে! তাকে আর এই বিশ্বের জনসমুদ্রে খুঁজে মিলবে না।

কিন্তু কেন উৎপলা ভাল করে দেখলো না! কেন গলার সেই দাগটার সন্ধান নিল না!—উৎপলা অস্থির হয়ে উঠলো!

পিছনে পিছনে গোয়েন্দাগিরি করে আলোক সেদিন অপর্ণাকে ছেলে কোলে ঢুকতে দেখেছিল একটা চমৎকার জায়গায়। ভারতের সর্ব্ব-জাতির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকাণ্ড একখানা বাড়ী তৈরী হবার কথা—দেশের লোকের দান এবং দেশবাসীর সহানুভূতিতেই সে-বাড়ী তৈরী হবে, কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশে অত সহজে অত বিরাট কাজ হওয়া সম্ভব নয়—তাই বাড়ীখানা এক তালা পর্য্যন্তও উঠলো না। কিন্তু ভিত্তির তলায় বেশ একটু জায়গা আছে—ঠিক একটি ছোট কুঠরীর মত; অপর্ণা ঐ ঠাঁইটুকু খুঁজে বের করেছে। তার ছেঁড়া কাঁথাটাও পেতেছে। কোত্থেকে কয়েকটা টিনের কৌটো কুড়িয়ে এনে রেখেছে সেখানে। বেশ ঘরকন্না পাতিয়ে ফেলেছে সে ওখানে।

কিন্তু বড্ড অন্ধকার! আলোক দেখেছিল, অপর্ণা ছেলে কোলে আস্তে ঢুকলো,—তারপর অন্ধকারে আর তাকে দেখা গেল না। সে তক্ষুনি কাছের দোকান থেকে একটা ছোট মোমবাতি কিনে এনে জেলে ঢুকলো ঘরে। অপর্ণা তখনো কিন্তু আলোককে চেনে নি। বিস্ময়ের সঙ্গে ভয় মিশিয়ে বলেছিল—কে বাবা?—কি চাইছো?

—চিনতে পারছো না! এই ভোরেই যে আমি তোমার ছেলেকে দুধ এনে দিলাম!

—ও! বাবু!—অপর্ণা উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল—বসো বাবু! ও-মা। আমি চোখখাগী চিনতে নারছিলাম গো—বসো—বসো!

আলোক না বসেই তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ, পরে শুধুলো,—এ জায়গাটা কি করে বের কোরলে!

—আমি না বাবু, ঐ যে কিশোর ছোঁড়া—ঐ আমাকে এইখানে রেখে দিয়ে গেল। সকালের দিকে যা বিষ্টি, ভিজে যেতুম না হলে!

ও! তাহলে কিশোরের বুদ্ধিতেই অপর্ণা এমন ভাল জায়গাটা পেয়েছে। কিশোরের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল আলোকের। অপর্ণা এর মধ্যে ছেলেকে শুইয়ে ঢাকা দিয়ে বলল—দু-ভাঁড় চা আনি—বসো! —কতগুলি পয়সা ভিক্ষে পেয়েছো?—আলোক চায়ের কথা শুনে শুধুলো! —সওয়া পাঁচ আনা—বলে অপর্ণা দেখালো—একটা এক আনি—বত্রিশটা ডবল পয়সা আর একটা তামার এক পয়সা! আলোক বললো, —চা আমি খাব না, তুমি যাহোক খাও—আর খাবারও কিছু খাও! আমি এখন চললাম। কাল পরশু এসে আবার তোমায় দেখে যাব!

আলোক মোমবাতিটা ওকে দিয়ে চলে আসবে, কিন্তু অপর্ণা পরিষ্কার ভাষায় বললো—যাবে কিসের লেগে বাবু—তোমারও তো ঘর-বাড়ী নাই, মেয়েছেলেও নাই। আমি এইখানে বিছানা করে দিচ্ছি—খাও-দাও ঘুমোও!—হাসছে মেয়েটা কদর্য্য ইঙ্গিতের হাসি। ওর মাতৃত্ব নির্লজ্জ নারীত্বের কামনাময় কলুষতায় চঞ্চল হয়ে উঠছে! আলোকের রাগ হয়ে গেল অকস্মাৎ। বললো—ছেলে কোলে নিয়ে সারাদিনটা মা সেজে ভিক্ষে করলে—এখন আবার বাজারের বাইজীর ভণ্ডামী করতে লজ্জা করে না। তুমি না বলেছিলে ভদ্রলোকের মেয়ে, গৃহস্থের বৌ।

মাথা নামিয়ে তিরস্কার সইল অপর্ণা নিঃশব্দে। সত্যই ও গৃহস্থের বৌ ছিল একদিন—তাই আলোকের কথার উত্তর দিতে ওর বহুক্ষণ সময় লাগলো, কিন্তু উত্তর দেবার জন্য যখন মুখ তুললো অপর্ণা, তখন আলোক চলে গেছে; মোমবাতিটা মাটিতে পড়েও জ্বলছে এবং বাইরে আবার বৃষ্টি সুরু হয়েছে।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

অপর্ণা অসহায়! আলোকের তিরস্কারটা ওকে আর একবার মনে করিয়ে দিল, সত্যি ও বাংলার কন্যা—বধূ, গৃহস্থের বাড়ীর সকাল-সন্ধ্যার মঙ্গলদীপ—স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সন্তানের জননী! কিন্তু ওসব অতীতের কথা! রুদ্র বর্ত্তমানে ওকে সর্ব্বহারার বিড়ম্বনায় বিচ্ছিন্ন করেছে সেই স্বর্গাসন থেকে। এখন এই-ই ওর পথ—পিচ্ছিল, কর্দ্দমাক্ত, কলঙ্কিত পথ।

মোমবাতিটি সযত্নে তুলে অপর্ণা বিছানার একপাশে রাখলো। ছেলেটাকে অন্ধকারে একা রেখে চা আর খাবার আনতে যেতে সত্যি ওর ইচ্ছে ছিল না। আলোক মোমবাতিটা দিয়ে ভালই করে গেছে। অপর্ণা ধীরে বুকের নিশ্বাসটা চেপে বাইরে এলো বৃষ্টির মধ্যেই। কাছের একটা কলে হাতমুখ ধুলো—তারপর একটা দোকানে গিয়ে দু' আনার মুড়কী আর এক আনার চা কিনে ফিরে এলো। মোমবাতিটা অর্দ্ধেক শেষ হয়ে গেছে এর মধ্যে। ওটাকে নিবিয়ে রাখলো পরদিনের জন্য। বাইরের গ্যাসের আলো যতটুকু পাওয়া যাচ্ছিল, তাতেই মুড়কী আর চা খেয়ে সে এসে ক্লান্ত শরীর বিছিয়ে দিল ছেলেটার পাশে।

ছেলে নিয়ে ঘুম পাড়ানো ওর কাছে নূতন নয়। ওর নিজের ছেলে হয়েছিল—তাকে মানুষও করেছিল অপর্ণা। আজ কোথায় গেল সে ছেলে, সেই স্বামী, সেই সংসার! নিজের জীবনটুকু রক্ষার জন্যই অপর্ণা আজ সহরের এই আবর্জ্জনাময় কুণ্ডে পালিয়ে এসেছে। মানুষ নিজের প্রতি এতই মমতাপরায়ণ যে সংসারের সব কিছু গেলেও নিজকে বাঁচাবার প্রবৃত্তি তার কোনো সময়েই নষ্ট হয় না; সে প্রবৃত্তি যেমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত তেমনি মরণহীন। যেমন ব্যক্তিতে, তেমনি সমাজে—মানুষ সর্ব্বত্র নিজেকে বাঁচাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে রয়েছে। অপর্ণাও এ পর্য্যন্ত কোনো রকমে নিজকে বাঁচিয়ে এসেছে—হয়তো আরও কিছুদিন পারবে বাঁচাতে। হয়তো ওর মাতৃত্বশক্তির আওতায় রেখে এই অনাথ শিশুটিকে লালন করানোই

বিশ্ব-জননীর ইচ্ছা! কিন্তু কে এই অনাথ শিশু, কোথেকে এলো এবং কেনইবা অপর্ণাকে তার পালনের জন্য কোন্ এক সুদূর পল্লী থেকে এখানে এনে ফেলা হোল—অপর্ণা সে রহস্যের কিছুই কিনারা করতে পারে না। আলোকের কথাটা ভাবতে গিয়ে তার মনে হোল, ঐ বাবুটি বয়সে নিতান্ত তরুণ হলেও মানসিক দৃঢ়তায় অনেক বৃদ্ধ সাধু ব্যক্তিকেও ছাড়িয়ে যায়। অপর্ণার আবেদন সে অস্বীকার করাতে নারীচরিত্রের বিশেষত্ব ক্রোধ জাগা স্বাভাবিক, কিন্তু তার অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার কাছে যে কোন নারীর মাথা আপনিই নুয়ে পড়বে। অপর্ণা ঠিক করলো—ঐ বাবু যদি আবার কোনোদিন আসে অপর্ণাকে দেখতে তো অপর্ণা তাকে আর কোনোরকম আবেদন জানাবে না। নিতান্ত সহজভাবে মা-বোনের স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহেই তাকে গ্রহণ করবে। কিন্তু ঐ বাবু কি আসবে আর? অপর্ণাকে সে অতি কদর্য্য চরিত্রের এক পতিতা নারী ভেবেই আজ তিরস্কার করে গেল! অথচ অপর্ণা সত্যি পতিতা নয়—না, সত্যি নয় সে পতিতা ;—সে সত্যিই গৃহস্থের কন্যা—গৃহস্থের কুলবধূ! আজ অবস্থার বিপাকে তাকে যে ইঙ্গিত করতে হয়েছে, সেটা সত্যি তার সত্যরূপ নয়। কিন্তু কে সাক্ষি দেবে! ঐ মহান্ উদারহৃদয় ছেলেটি জেনে গেল—অপর্ণা কুৎসিৎ, কদর্য্য—অপর্ণা দেহবিলাসিনী বারনারী!

অপর্ণার সব গেছে। ঘরবাড়ী, স্বামীপুত্র—সোনার সংসার, সবই গেছে অপর্ণার—ফিরে আসবার কোনো আশাই আর নাই—তথাপি অপর্ণা সয়েছিল সেই বিরাট দুঃখ, কিন্তু আজ একজন মহান-উদার যুবকের চোখে নিজকে এতখানি হীন প্রমাণিত করার জন্য অপর্ণার অন্তরাত্মা অসহ্য বেদনায় আর্ত্তনাদ করে উঠছে!—মনে হচ্ছে, অপর্ণা আজই সত্যি সত্যি নিঃসম্বল হয়ে গেল!

আলোক রাগ দেখিয়ে ফিরে আসবার পথে ভাবতে লাগলো—ঐ মেয়েটারই শুধু দোষ নয়—দোষ এই দেশের, এই সমাজের এবং রাষ্ট্রেরও কিছু কম নেই। ওর অধঃপতন থেকে ওকে বাঁচাবার তো কেউ নেই-ই, ওকে আরো গভীর পঙ্ককুণ্ডে ঠেলে ফেলে দেবার জন্য সহস্র হস্ত উদ্যত হয়ে রয়েছে। ওকে ধমক দিলেই সব হোল না—বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে এই দেশের মানুষগুলোকে। কিন্তু কেইবা শুনছে! বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতির প্রত্যেকে ভাবে, সেই সব থেকে বেশী বুদ্ধিমান। প্রত্যেকে তারা অপরের বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যেতে চায়;—এই হামবড়ামীর ঔদ্ধত্য আজ বাঙ্গালীকে সত্যিই নিজ বাসভূমে পরবাসী করেছে। একদিন যে বাঙ্গালীর প্রতিভাবলে সারা ভারতবর্ষ চালিত হোত, আজ সেই বাঙালী কোথায়? কত নীচে? আপন মা-বোনের সম্মানটুকু রক্ষা করবার মত ক্ষমতাও তার নেই আজ! এমনকি, যে স্বাধীনতাস্পৃহা, যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বাঙ্গালী শিরার শোণিত ব্যয় করে গঠন এবং পোষণ করে এসেছে, লক্ষ জীবন বলি দিয়ে যাকে রক্ষা করেছে, আজ সেই সব বিশ্ববিদিত প্রতিষ্ঠান থেকে বাঙালীকে হেঁঠমাথায় হঠে আসতে হচ্ছে! প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালীর নেই—সেই বাঙ্গালী বিশ্বমৈত্রীর ধুয়া তুলে অহঙ্কারে ফেটে পড়তে চায়। কিন্তু কে শোনে তার কথা আজ! বাংলাকে বলি দেবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙালী স্বয়ংই সর্ব্বাগ্রে যাচ্ছে এগিয়ে। স্বল্প-সময়ের জন্য লভ্য ক্ষমতা, নাম, যশ লাভ করবার জন্য আজ কত দেশদ্রোহী যে এই দেশে কত ছদ্মবেশে রয়েছে, তার হিসাব রাখা যায় না—অথচ তারাই আছে পুরোভাগে। তাদের উচ্চতম কণ্ঠ-স্বরকে ছাপিয়ে সত্যচারীর ক্ষীণকণ্ঠ কারো কানে পৌছাবার আশা করা বিড়ম্বনামাত্র! নিজের দেশকে, নিজের সমাজকে, নিজের ধর্ম্মকে, নিজের আত্মীয়-স্বজনকে এমন করে ভুলে থাকার মতন মোহ গ্রস্থতা আর কোনো জাতের পক্ষে সম্ভব নয়। —এরা উচ্ছ্বাসেই ফুলে ওঠে, উচ্ছ্বসিত হয়ে

লেখে কবিতা, গায় জয় গান—কিন্তু ভেবে দেখবার চেষ্টাও করে না যে উচ্ছ্বাসের সত্যি কারণ ঘটেছে কি না। তলিয়ে সবকিছু বুঝে দেখবার মতন বুদ্ধি, বিশ্লেষণ-শক্তি বাঙালী হারিয়েছে—এক কথায়, বাঙালীর নিজস্ব চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু উপায় নাই—অনর্থক ওসব ভেবে সময় নষ্ট না করে আলোক বৃষ্টির মধ্যেই গতরাত্রের ডেরায় এসে দেখলো,—সে আস্তানাটা আজ ভাঙা হয়ে গেছে! বৃষ্টির মধ্যেই তাকে অন্য স্থানের অনুসন্ধানে যেতে হোল। কোথায় যাবে? এদিক-সেদিক খানিকটা ঘুরতে ঘুরতে ওর কাপড়জামা সম্পূর্ণ ভিজে গেল—শীত বোধ করছে ও!

শীতে কাঁপছে আলোক—আশ্রয় একটা চাই-ই এবং অবিলম্বে—কিন্তু কত শত, কত সহস্র নিরাশ্রয় এই বিরাট দেশে এমনি অসহায়ভাবে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরছে আজ! উঃ! একদিন এইদেশে একটি শিশুর অকাল মৃত্যু হওয়ার জন্য সম্রাট শ্রীরামচন্দ্রকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল প্রজাদের কাছে—একবার অজন্মা হওয়ার সম্ভাবনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতৃপুরুষকে ছুটতে হয়েছিল স্বর্গে—একটি ভিক্ষুকের অনশন মৃত্যুর জন্য নিজেকে নির্ব্বাসিত করতে হয়েছিল এই দেশেরই একজন রাজাকে। সেই অতীত গৌরবের যুগেই ছিল সত্যকার প্রজাতন্ত্র, সত্যপূর্ণ গণতন্ত্র। মনে পড়ে গেল বৌদ্ধযুগের কথা—ভগবান সিদ্ধার্থ জন্মেছিলেন কপিলাবস্তুতে—সেদেশ ছিল গণতন্ত্রবাদী! সেই সুপ্রাচীন যুগেও ভারতে চোদ্দটি গণতন্ত্রী রাজ্যের ইতিহাস পাওয়া যায়—তাদের সব ছিল, প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী, এমনকি ভোটদান এবং গ্রহণ পর্য্যন্ত! বর্ত্তমান যুগ যাকে গণতন্ত্র বলে চীৎকার করছে, ভারতের যুগযুগান্তের কষ্টিপাথরে তার স্বরূপ বহুদিন পূর্ব্বেই যাচাই করে দেখা হয়েছে; আজকার এই গণতন্ত্রবাদ সেদিনকার গণতন্ত্রবাদের ছায়া মাত্র—তথাপি আজকার মানুষরা নূতন একটা কিছু করেছে ভেবে অহঙ্কারে ফুলে যাচ্ছে। 'হিস্‌ট্রি রিপিট্‌স্ ইট্‌সেল্‌ফ্'—

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই যথানিয়মে ঘটছে! কিন্তু আজকার এই গণতন্ত্রের যুগে কোথায় সেই গণমন—যে-মন অকালমৃত্যু নিবারণ করবে, অজস্মা প্রতিরোধ করবে, অত্যাচার দমন করবে—আশ্রিতকে রক্ষা করবে! বর্ত্তমান পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মানুষ শুধুই 'থিওরী' রচনা করে; বাস্তবক্ষেত্রে সেই থিওরীর জটিলতা কোথায় কার্য্যকরী এবং কোথায় ব্যর্থ হচ্ছে; তা কয়জন থিওরী-নবিশ ভেবে দেখছে আজ!

—কোন্ হ্যায়? বাবুজি! আরে! এৎনা ভিঁজ গিয়া! আইয়ে, আইয়ে!

আলোকের চিন্তাসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সম্মুখে চেয়ে দেখলো, গলির মোড়ে গ্যাসপোষ্টের কাছে মাথায় একটা পাটের খালি বস্তা চড়িয়ে নওলকিশোর।

—কিশোর! এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে?

—ঝুমনিকো বহুৎ জোর বুখার বাবুজি! ম্যায় ডাঙ্গদার বোলানে গিয়া—তো উন্ লোক বলতে হেঁ—দো-রুপিয়া ভিজিট দেনা পড়ে গা! একঠো মেরা পাশ হ্যায়—আউর একঠো···

—আমি দিচ্ছি—আলোক মুহূর্ত্ত দেরী না করে তার আঠারো আনা থেকে টাকাটা বের করে নওলকিশোরের হাতে দিল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললো,

—ওষুধ কিনবার জন্য কিন্তু আর কিছু নাই আমার কাছে! শুধু ডাক্তার দেখালেই তো হবে না কিশোর! ওষুধও চাই!

—হুঁ! উ তো জরুর চাই! আপ্ ইঁহা জেরা খাড়া হো যাইয়ে, হাম উসকো বোলাকে ল্যায়েঙ্গে!

কিশোর মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়ে গেল গলির মধ্যে! পাঁচ মিনিট, সাত মিনিট করে প্রায় পনর মিনিট কেটে গেল, কিশোর ফিরছে না। শীতের কষ্টটা অসহ্য হয়ে উঠছে আলোকের। কিন্তু চিন্তাটাও সেই সঙ্গে উগ্র

হয়ে উঠছে মাথার ভেতর—এই দেশে একদিন কত আশ্রয়স্থান ছিল, কত আরোগ্যশালা ছিল—ভিষকগণ রোগীর চিকিৎসা করে নিজকেই কৃতার্থ মনে করতেন। তাঁরা পয়সা না পেলে রোগী দেখবেন না—একথা ভাবতেও ভয় পেতেন। বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে দেখা যায়—চিকিৎসকরা নিজেরাই অনুসন্ধান করতেন কোথায় কোন্ রোগী অচিকিৎসায় পড়ে আছে। অচিকিৎসায় কারো মৃত্যু হলে সেই জনপদের সমস্ত চিকিৎসকদের কৈফিয়ৎ দাবী করা হোত রাজার প্রতিনিধির তরফ থেকে! —কোথায় গেল সেই গণসভ্যতা, সেই হৃদয়ানুভূতি, সেই মমত্ববোধ। শুধু বিশ্বমৈত্রীর বুলি আওড়ালেই কি মোক্ষলাভ হবে? হায়রে আমার দুর্ভাগা দেশবাসী—বিদেশের চিন্তাশীল কয়েকজন ব্যক্তির বড় বড় থিওরী পড়ে তোমার দেশে তুমি ইজ্‌মের চীৎকার করে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে লজ্জা বোধ কর না! তোমার যা ছিল, তাকে নতুন ঢংএ সাজাবার কোনো চেষ্টাই তোমার নেই—অথচ বৈদেশিক চিন্তাকে স্বদেশে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার অধিকার এবং যোগ্যতাও তোমার নাই। তবু তুমি বিদেশের বুলি কপচাও কেন!

নওলকিশোর এসে পড়ল, সঙ্গে একজন বৃদ্ধ। দেখেই বোঝা যায়; ডাক্তার।

—আইয়ে বাবুজি—বলে কিশোরই এগিয়ে যেতে লাগলো। মাঝে ডাক্তার, পেছনে আলোক! হঠাৎ কিশোর ফিরে তার বস্তাটা আলোকের মাথায় তুলে দিতে দিতে বললো—আপ্ বহুৎ ভিঁজ গিয়া বাবুজি!

—তা হোক, কাপড় ছেড়ে ফেলবো—তুমি ওটা নিজেই নাও! আমার তো যতটুকু ভিজবার ভিজেছে! তুমি আর অনর্থক ভেজ কেন!

কিশোর কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে বস্তাটা আবার নিজের মাথায় নিয়ে হাঁটতে লাগলো। ডাক্তারের হাতে ছাতি—তিনি তারই একটু কিনারা আলোককে দিলেন।

যুদ্ধের আমলে একরকম আশ্রয়-কুটির তৈরী হয়েছিল ইঁটের গাঁথুনি করে গোল লম্বা এক ধরণের ঘর। সেগুলো ভেঙে ইট বের করে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সবগুলোই এখনো ভাঙা হয়ে উঠেনি। একটা মাঠের মধ্যে ঐ রকম দুটো ঘর—আলোক দেখেছিল, ঘরগুলোকে বড্ড নোংরা করে দিয়েছিল রাস্তার অধিবাসীরা। সেদিন সে ভেবেছিল—আশ্রয়স্থলকে এতখানি কদর্য্য করে তুলবার মত নৈতিক অধঃপতন আর কোনো দেশে হয় না;—কিন্তু আজ ঐ গোলাকার ঘরের একটায় সে নওলকিশোরের দলকে থাকতে দেখে ভাবলো—রাস্তার অধিবাসীরা নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এই অবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিল, নইলে শুচিতা-পবিত্রতার জ্ঞান তাদেরও আছে। সমাজ যে দেশে রাস্তার অধিবাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধিতেই সাহায্য করে, সেখানে এ ছাড়া আর গত্যন্তর কি? তা ছাড়া ওদের নৈতিক জ্ঞান দিয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করবার চেষ্টাই বা কোথায়?

ঘরখানা ধুয়ে পরিষ্কার করেছে কিশোরের দল। শুকনো ছেঁড়া বিছানায় ঝুমনি শুয়ে রয়েছে: একটা মোমবাতি জ্বলছে। কিন্তু ডাক্তার বাবু ঐ ঘরে ঢুকবার পূর্ব্বে বলে উঠলেন—ইস্। এসব যায়গায় বড্ড নোংরা থাকে। নাকে রুমাল দিলেন তিনি। আলোকের মনটা একেই উত্তপ্ত ছিল, তারপর এতখানি এসে ডাক্তারবাবুর থেমে যাওয়া দেখে প্রায় ধমকের সুরে বলল,—এই নোংরাতেও মানুষকে থাকতে হয়। আর তারা আপনারই দেশের মানুষ। চলুন—ঢুকুন ভেতরে।

ডাক্তার ওর মুখপানে চাইলেন; কিন্তু তাঁর ঢুকবার লক্ষণ দেখা যায় না।

—আপনি মাগনা আসছেন না স্যার। টাকা দেওয়া হবে আপনাকে; আসুন।

বলে আলোকই আগে ঢুকে পড়লো। কী ভেবে ডাক্তার আর কিছু না বলে ঢুকলেন ; ঝুমনিকে পরীক্ষা করলেন যন্ত্র দিয়ে। তারপর বললেন. —বেশ সুবিধা লাগছে না। নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে।

আলোক একটু বিচলিত হোল অতবড় রোগটার নাম শুনে, কিন্তু কিশোর অচঞ্চল কণ্ঠে বলল -হোবে তো কি হোবে—ভগবানজি মালিক। আপ দাওয়াই তো লিখ দিজিয়ে।

আলোক পকেট থেকে কাগজ পেনসিল বের করে দিল। ডাক্তার প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখছে, কিশোর বললো - হাম্‌লোক গরীব আদমি, জেরা আচ্ছা দাওয়াই দিজিয়ে—আউর সস্তাভি হোনা চাই।

আলোক হেসে ফেললো কথাটা শুনে। ডাক্তার ওর মুখের পানে একবার চেয়ে ওষুধ লিখে দিল এবং ব্যবহার করবার বিষয় আলোককে বুঝিয়ে দিল ; শেষে বলল কাল সন্ধ্যায় একবার খবর দেবেন।

ডাক্তার যাচ্ছে, কিশোর ডাক্তারকে পৌঁছাতে যাবে এবং ওষুধগুলোও নিয়ে আসবে ; আলোক শুধুলো—টাকার কি করবে কিশোর !

—ওহি দেনে ওয়ালা !—বলে কিশোর ঊর্দ্ধদিকে আঙুল বাড়ালো।

আশ্চর্য্য এই দেশের মানুষ। অশিক্ষিত এক ভিখারী বালক, জীবনে যে গৃহসুখ কখনো জানে না—পথে পথে যাযাবর-বৃত্তিতেই যার দিন এবং রাত্রি কাটে, তারও অন্তরে সেই সুমহান আত্মসমর্পণের অনুভাব। আশ্চর্য্য এই ঈশ্বর-প্রেমিক দেশ! এ দেশের জল-মাটি-হাওয়াতেও ঈশ্বর-প্রেম,—কিন্তু কোথায় সেই ঈশ্বর, যিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হবেন বলে বারম্বার শঙ্খধ্বনি করেছিলেন ? কোথায় তিনি, যিনি ধর্ম্মের গ্লানি সইতে পারবেন না, নিশ্চয়ই আসবেন, বলে অহঙ্কার করেছিলেন ?—কৈ তিনি। বর্ত্তমানের বিজ্ঞান তাঁকে আমল দেয় না, ভবিষ্যতের বিজ্ঞান তাঁকে নস্যাৎ করে ছাড়বে।

কিশোর এবং ডাক্তার চলে যাওয়ার পর রামধনিয়া উঠে একখণ্ড ছেঁড়া কাপড় দিল আলোককে! বললো—ছেড়ে ফেলো বাবুজি! নইলে তোমারও অসুখ হবে!—হুঁ—বলে আলোক নিজের কাপড় জামা ছেড়ে দিল! রামধনিয়া উঠে সেগুলো ঐ ঘরেরই একপাশে মেলে দিল শুকুবার জন্য! আলোক ভাবছে—তিনি নেই! একি সত্য? না—তিনি আছেন; প্রতি মানবের অন্তরেই তিনি আছেন; তেমনি জাগ্রত হয়েই আছেন! মানুষ যেমন বিশেষভাবে কান পেতে না শুনলে নিজের শরীরের রক্তচলাচল টের পায় না, তেমনি বিশেষ ভাবে শুনিনা বলেই মনে হয়, তিনি নেই। তিনি না থাকলে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিরাট পৃথিবীও থাকতো না—থাকতো না আলোক, থাকতো না রামধনিয়া, থাকতো না নওলকিশোর এবং থাকতো না ঐ কঠিন রোগশয্যাশায়িনী ঝুমনি! তিনি আছেন মানবের অন্তরে; তিনি—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়া রূপেন সংস্থিতা' যা দেবী তুষ্টি রূপেন সংস্থিতা,—পুষ্টি রূপেন সংস্থিতা—শান্তি রূপেন সংস্থিতা,—ক্ষান্তি রূপেন সংস্থিতা—মাতৃরূপেন সংস্থিতা,—তিনি না থাকলে এই তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষান্তি-শান্তি, দয়া মায়ার সেবাবৃত্তি কিরূপে থাকা সম্ভব হোত! তাঁকে নাই বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা আত্মবঞ্চনা। আপনার অন্তর খুঁজলেই শিরার শোণিতের মত তাঁকে অনুভব করা যায়। বুকের স্পন্দনের মত তাঁকে বুঝতে পারা যায়। মানুষের অন্তরের এই যে দয়া, মায়া, স্নেহ বৃত্তি, এই যে আশ্রিতকে রক্ষা করবার প্রবৃত্তি, আত্মত্যাগের মানসিক ঔদার্য্য—এ সকল তাঁরই বিভূতি,—এই যে শোকের ম্রিয়মানতা, আনন্দের দ্যোতনা, আশার আশ্বাস, এর মধ্যে তাঁরই অস্তিত্ব সুপ্রকাশ! তাই ঋষি বলেছেন, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম!'

কিন্তু এ যুগ যন্ত্রের যুগ; যান্ত্রিক সভ্যতার দানবীয় চীৎকারকে ছাপিয়ে মানব-ধমনীর শোণিত-স্পন্দের সূক্ষ্ম সঙ্গীত কর্ণগোচর হওয়া অসম্ভব প্রায়—বিরাট বিশ্বের সমস্ত কোলাহলকে অতিক্রম করে শব্দব্রহ্মরূপ

ওঙ্কারধ্বনি আজ কানে প্রবেশ করা অসম্ভাব্য, কিন্তু এখনো মানুষ করলেই তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে! কারও কি হয় না সে ইচ্ছা? প্রতি মানুষের অন্তরে যে দেবতার অধিষ্ঠান, দেশ, জাতি, এবং ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ যে মানব-অন্তর চিরন্তন মনুষ্যত্বরূপ দেবভূমিতে অধিষ্ঠিত, সেইটাই যে সর্ব্বমানবের ঐক্যভূমি, এ সত্য কি কেউ অনুভব করে না এই যন্ত্র-যুগে! দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে এই যে হানাহানি ঈর্ষা, অসূয়া এবং আত্মবঞ্চনা, এই সমস্তের সমূল ধ্বংস হয়ে যায়, যদি মানুষ সত্যি তার মনুষ্যত্বরূপ দেবভূমিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু কে তাদের নিয়ে যাবে? কোথায় সেই দেবতা-পুত্র মহামানব, যিনি সমস্ত মানব-লোককে জাতি-ধর্ম্ম-দেশকাল-নিরপেক্ষ ভাবে একই দেবভূমির আশ্রয়ে চালিত করে নিতে পারবেন! বুদ্ধ, খৃষ্ট, কবির, নানক কি আর আসবেন না এই দ্বেষ হিংসার অবসান ঘটাতে? সর্ব্বমানবের মিলনের রাখি বাঁধতে শ্রীচৈতন্য কি আর আবির্ভূত হবেন না? সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের পবিত্র সাধন-ভূমিতে কি শ্রীরামকৃষ্ণ আর একবার শঙ্খধ্বনি করবেন না? বড় দরকার আজ এই আত্মকলহ এবং আত্মবিরোধের বধ্যভূমিতে মানুষের গুরুরূপে একজন বিরাট মহামানুষের; একজন ঈশ্বরপ্রেরিত প্রফেটের বড়ই দরকার, যিনি সমস্ত মানবচেতনাকে সেই মহাচৈতন্যের শান্তি-ভূমিতে মহদাশ্রয় দান করবেন—পরিপ্লাবিত করে দেবেন মানুষের অন্তরলোক এক অপার্থিব আলোকের জ্যোতিলেখায়—যাঁর চরণাশ্রয়ে এক হয়ে যাবে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম!—এ কাজ এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, মেসিনগানের নয়। এট্যাম বোম ছেড়ে পৃথিবী ধ্বংস করা যেতে পারে, মানবের মৈত্রিবন্ধনের কাজে সে একান্ত অক্ষম। মানুষের অন্তরে অন্তরে যোগস্থাপন করতে সক্ষম একমাত্র মানবধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম স্নেহ-প্রীতিতে উজ্জ্বল, ত্যাগে-তপস্যায় বিবেকী, ক্ষমার ঔদার্য্যে আত্মসমাহিত এবং সেবার গৌরবে ধন্য। কোথায় সেই ধর্ম্মগুরু? কবে তিনি আসবেন? মনে

পড়লো, একজন এসেছেন, যিনি মহামানব, অহিংসাবাণীর উদ্গাতা, আত্মপ্রত্যয়ের মূর্ত্ত-রূপ এবং আশার অবিনশ্বর ইঙ্গিত! দেশ, কাল এবং জাতীর জীবনে তাঁর অমোঘ বাণী আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এনেছে এবং আনছে। আলোক তাঁর উদ্দেশে নমস্কার করে বললো কয়যোড়ে,—তুমিই যদি তিনি হও, তা হলে হে মানুষের মধ্যে সত্যতম মানুষ, তোমায় আমি নমস্কার করি—আবার নমস্কার! 'পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে!'

আজ সাত দিন সিদ্ধেশ্বর এক আশ্চর্য্য প্রব্রজ্যায় যাত্রা করেছে! ওর মনে হয়, ও যেন সন্ন্যাস নিয়েছে, গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করতে করতে তীর্থ পরিভ্রমণ করছে গুরু-ভাইদের সঙ্গে। সে তীর্থ ভারতের বড় বড় সহর, এবং দেশোদ্ধার-রূপ মহাধর্ম্মের সাধনক্ষেত্র। সেই মহাসাধনায় কবে ওরা সিদ্ধিলাভ করবে, তা কেউ-ই জানে না, কোনো জবাবই কারো কাছ থেকে পায় না সিদ্ধেশ্বর; তবু ওর মনে আশা জাগে,—একদিন সিদ্ধিলাভ হবেই এবং সেইদিন অবন্তীর মুখ থেকে পাওয়া তার গুরু মন্ত্রও সিদ্ধ-মন্ত্র হয়ে যাবে তারপর। বিজয়-গর্ব্বে সিধু যাবে অবন্তীর সমুখে—; বলবে তাদের যাত্রা-পথের ইতিহাস, অক্লান্ত সংগ্রামের মধ্যে অমিতবীর্য্যে এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস—ভয় ভীতি তুচ্ছ করে, মৃত্যুকে লঙ্ঘন করে অ-মৃত যাত্রার অমর ইতিহাস!

কিন্তু সিধু এমন করে ভাবতে পারে না;—ওর চিন্তাগুলো ভাষায় ঝঙ্কৃত হতে পারে না, শুধু মানস-লোকে বুদবুদ তোলে মাত্র। কিন্তু জীবনকে সে আরো গভীরভাবে দেখতে শিখছে! ওকে শিখিয়ে দিচ্ছেন ওরই এক গুরুভাই—কর্ণ-বিজয়! অপূর্ব্ব, অদ্ভুত, এক স্বরাট-যোগী, এই বিরাট যজ্ঞের বিশিষ্ট ঋত্বিক তিনি; উদার, মহান এবং আত্মচেতনায়

অধিষ্ঠিত সৌরতেজঃ সম্পন্ন পুরুষ, ; জীবনে তিনি নিজেকে শুধু সূর্য্যের মতই ক্ষয় করে আলোক দান করে এসেছেন—কর্ণের মতই নিঃশেষে নিজেকে দান করে এসেছেন; কিন্তু তিনি বিজয়ীও; তাঁকে জয় করবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকেও প্রতারক সাজতে হয়, বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকেও যুদ্ধ-বিরত বীরের হত্যাকারী হতে হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও সহায়ক হতে হয় সেই মানবত্ববিরোধী, বীর-ধর্ম্মবিরোধী নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে—এই কর্ণবিজয়ও সেই কর্ণ, বীর কর্ণ, দাতাকর্ণ, দেবতা কর্ণ—যিনি সগর্ব্বে ঘোষণা করেন, —'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্'

কিন্তু সিধু তাঁকে ঠিক মত বুঝতে পারে না! কারণ সিধুর বিদ্যার নিতান্ত অভাব,—তা' ছাড়া, সিধু এই দেশোদ্ধার মহাধর্ম্মে খুব অল্পদিন দীক্ষা নিয়েছে, তারও চেয়ে বড়ো কারণ, সিধু নিজকে অত্যন্ত দীন, অসহায় মনে করে! কিন্তু নিজেকে অসহায় মনে করা বীর-ধর্ম্ম নয়,—সেই কথাটাই সেদিন কর্ণ-বিজয় ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন—সৈনিক—এই বিশ্ব-ধ্বংসী শৌর্য্যশক্তির তুমিও একটি বিন্দু, একটি অমোঘ তীর, একটি মৃত্যুবাণ। তুমি দুর্ব্বল হলে এই অজেয় শক্তিও দুর্ব্বল হয়ে যাবে। সাবধান। তুমি শুধু একটি সৈনিক নও, তুমি সৈন্য-জীবনের অচ্ছেদ্য প্রবাহ!

—আমার মনে হয়, আমার মতন মুখ্যু মানুষ কি কাজে লাগতে পারে?

—মরণের কাজে। জীবনকে যারা পরিপূর্ণভাবে পেতে চায়, তারা সর্ব্বাগ্রে যাবে মরণের রক্ত-রাঙা পথে। মৃত্যুকে জয় না করলে জীবনকে পাওয়া অসম্ভব! সে জীবন তোমার একার জীবন নয়, তোমার দেশের জীবন, তোমার জাতির জীবন, তোমার প্রবহমান মানব-ধর্ম্মের জীবন। সিদ্ধেশ্বর, তোমার শালগ্রাম নুড়ির কাছ থেকে কি তুমি শুনতে পাও না—কত সাধনার পথে পথে গড়িয়ে গড়িয়ে ঐ নুড়িটা গোলাকার হয়েছে,

লক্ষণ-যুক্ত হয়েছে, তারপর সে পূজা পাচ্ছে তোমার কাছে! সাধনার পথে গড়াতে গড়াতে ঐ পাথরটা যদি ভাঙবার ভয়ে থেমে যেতো, তাহলে কি আজ সে পূজার স্বর্ণাসনে বসতে পারতো? তোমার অন্তর-পাথরকে ওমনি করে এগিয়ে নিয়ে চলো—পূজকের সংখ্যা অসংখ্য হয়ে উঠবে। তুচ্ছ একটা পাথর যদি নিজকে গোলাকার করে পূজা পেতে পারে, তো তুমি মানুষ, তুমিই বা কেন পারবে না! তোমার মুর্খত্ব জীবনের আলোকে জাগ্রত হোক—স্বাধীনতার আলোকে প্রস্ফুটিত হোক, দেখবে, বর্ণ-জ্ঞান-হীনতাই মুর্খত্ব নয়। অন্তরের ঐশ্বর্য্যই পাণ্ডিত্য! এই দুর্ভাগা দেশে বিদেশী-দত্ত বর্ণ-জ্ঞান শুধু দাসত্বের নিগড় দৃঢ় করবার জন্য; তুমি সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত আছ! সিধু, আমি সত্যি বলছি, তুমি আমাদের অনেকের থেকে ভাগ্যবান। তোমার অন্তর-শুচিতা বৈদেশিক সভ্যতার আঘাতে ভেঙে যায় নি। তোমার সাংস্কৃতিক চেতনা আবিল হয়ে ওঠেনি বলেই জন্মভূমির সবছেড়ে আসবার সময়ও তুমি ঐ তুচ্ছ পাথরের নুড়িটা ফেলে আসতে পারোনি; তুমি বর্ত্তমান শিক্ষার অপরিপূর্ণতায় আবিল নও বলেই তুমিই ভারতমাতার অপরিম্লান সন্তান। তুমি শুচি, শুভ্র, পবিত্র ভারতীয়!

সিধুর আনন্দ হচ্ছে। তার মত ভয়ঙ্কর খারাপ লোককে এই এত বড় জননেতা কি সব বলছেন? ঠিক বুঝতে না পারলেও উনি খুব ভাল কথা বলছেন সিধুকে, সেটা সিধু বুঝতে পারছে। কিন্তু সত্যি কি সিধু অত উঁচু লোক? কিন্তু কর্ণদাদা তো মিথ্যা বলেন না! সত্য এবং বীর্য্য রক্ষাই ওঁর জীবনের নীতি! কর্ণদাদা আবার বললেন,—এই দেশে শক হূন, তাতার এসেছে, জলদস্যু-স্থলদস্যু এসেছে, লুণ্ঠনকারী দিগ্বিজয়ী এসেছে, মোগল-পাঠান রাজত্ব করেছে, কিন্তু কেউ-ই এই দেশের শিক্ষা সংস্কৃতিকে, এই দেশের প্রবহমান জীবনধারাকে ভাঙতে পারে নি—তারাই বরং এই বিরাট দেশের সর্ব্বগ্রাসী সভ্যতার আওতায় পড়ে, প্রভাবিত

হয়ে এই দেশেই মিশে গেছে—কেও একত্রিত হয়েছে, কেউবা আশ্রিত হয়েছে, কেউ কেউ আপন অস্তিত্ব কোনোরূপে বজায় রেখে এই সভ্যতার উপর শ্রদ্ধাবান হয়ে পড়েছে—কিন্তু ইংরাজ বণিক প্রথম থেকে ঘা দিয়েছে এর শেকড়ে—সংস্কৃতিতে, শিক্ষায়, স্বভাবে। নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সে অভাব সৃষ্টি করেছে, এই সর্ব্ব-রত্ন-সমন্বিত মহাভূমিতে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য শিক্ষাকে করেছে বিকৃত শুধু নয় বিপরীতগামী ; ব্রহ্মচর্য্যের ত্যাগ-তপস্বীর শিক্ষাকে করেছে ভোগ-বিলাসী জুতোজামা-পরা বাবুর্য্যা, আর সাংস্কৃতিক সমস্ত গৌরবের সমাধি দিয়েছে সে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক সাহিত্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করে। একথা শুধু আমার কথা নয়, ওদেরই দেশের মহা মহা মনিষী মহামানবদের কথা—এডামস্ স্মিথ্ তাঁর ওয়েল্থ্ অব নেশন—গ্রন্থে বলেছেন, 'নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজ সাম্রাজ্যের প্রজাকে এমন করে শোষণ করে ক্ষয়িষ্ণু করা, শাসনের সুনাম বা দুর্নামের প্রতি এমন চরম ঔদাসিন্য পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত কেউ দেখাতে পারে নি! ওদেশ যদি ভূমিকম্পেও উচ্ছন্ন হয়ে যায়, তথাপি কোম্পানীর কিছু এসে যায় না'—এই কোম্পানীই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং এরাই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতকে করেছে সংস্কৃতিতে অবিশ্বাসী, শিক্ষায় বিদেশী আর স্বভাবে বিকৃত ; এ শিক্ষা না পাওয়ার জন্য তুমি দুঃখ করো না সিধু, তোমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হোক দেশমাতার বন্ধনমোচনের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা!

কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানলেও কর্ণদাদার এই কথাগুলো সিধু ভালভাবেই বুঝতে পারতো, কিন্তু না বুঝলেও তার মনের গভীর প্রদেশে একটা সুর-তরঙ্গ খেলা করতে লাগলো যেন—যেন মনে হোল, সিধু আর্য্য-ভারতের বিশুদ্ধ এক বংশধর। ইতিহাস সিধুর পড়া না থাকায় সে চিন্তাই করলো না যে বর্ত্তমান ভারতবাসী হিন্দুর অধিকাংশই বর্ণ-সাঙ্কর্য্যে উৎপন্ন। সিধু বললো,—এই দেশটা তো আমাদেরই ছিল কর্ণদাদা! এটা আমাদের

হাতছাড়া হয়েছে—সেজন্য এর ভালমন্দের সমস্ত চিন্তা তো আমাদেরই করা উচিৎ সকলের আগে!

—খুবই সত্যি কথা, সিধু! ভারত হিন্দুর দেশ; হিন্দুরা সেদেশে যুগযুগান্তর বাস করে আসছে। তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বভাব সমস্তই এই দেশের জল-মাটির উপযুক্ত করে তারা তৈরী করেছিল। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোথাও হিন্দুর সংখ্যা সামান্যই। ভারতের অকল্যাণ হলে, হিন্দুজাতিই লুপ্ত হয়ে যাবে; কিন্তু বিদেশী শাসক সে চিন্তা করেন না। হিন্দু লুপ্ত হলে তাঁদের কিছুই এসে যায় না—তাই ভেদ-বিভেদ-বিদ্বেষ-বহ্নি জেলে তাঁরা শাসনকার্য্য কায়েম রাখতে চান। কিন্তু যখন ভাবি, এই হতভাগা দেশের হিন্দুরাই সাহায্য করছে সেই ভয়ানক দেশদ্রোহকর কাজে, তখন আশ্চর্য্য না হয়ে পারি না। কেউ ভুলের জন্য করছে, কেউ-বা স্ব-ইচ্ছায় করছে, কেউ স্বার্থসিদ্ধির জন্য করছে!

—এর কি উপায় কর্ণদাদা?

—উপায় স্ব-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আবার শক্তিপূজার ব্যবস্থা করা—; আমরা এতকাল ধরে যে শক্তিপূজা করে এসেছি, তা নিরর্থক হয়েছে। নিরর্থক হয়েছে আমাদেরই ভণ্ডামীর জন্য! আমাদের হাজার বছরের কথা মনে করলে দেখতে পাই, অসহায় মানুষের উপর অত্যাচারীর শাণিত খড়্গ ক্রমাগত আঘাত করেছে, পীড়নে লাঞ্ছনায় চূর্ণ করেছে নিরীহ ভারতবাসীকে আর ভারতবাসী আর্ত্তনাদ করে শুধু ঈশ্বরকেই ডেকেছে—প্রতিকারের কোনো চেষ্টা করে নি! ঈশ্বরদত্ত আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তির সে অবমাননা করেছে। ক্ষতি সয়ে সয়ে, উৎপীড়ন সহ্য করে করে, অধিকার হারিয়ে হারিয়ে সে এখন এমনই অবস্থায় এসেছে যেখানে তার স্বাধীনতা দূরের কথা, স্বদেশ বলতেও কিছু নাই! স্বদেশে সে পরদেশী! তবু আজো এরা ভীরু কাপুরুষের মত শুধু তোষণ-নীতি নিয়েই বন্ধুত্বের মরীচিকার পিছনে ছুটছে—এখনো বুঝলো না যে অধিকার লাভ করে

করে, অত্যাচার করে করে অপরপক্ষরা আর এদের বন্ধুত্বের ভূমিতে নাই, অনেক উচ্চ ভূমিতে উঠে গেছে! তারা এই ভীরু কাপুরুষ ভারতবাসীকে তাদের দাস মনে করে আজ!

কিন্তু সিদ্ধেশ্বর বুঝতে পারছিল না কথাগুলো; কর্ণদাদাও আর বেশি বললেন না—শুধু বললেন,—তোমার সৎসাহসের আর উচ্চমনোবৃত্তির জন্য আমরা খুবই খুসী হয়েছি সিদ্ধেশ্বর। তুমি লেখাপড়া জানো না বলে দুঃখ করো না! যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কাজ শুধু আদেশ পালন—আদেশ দেবার অধিকার সেনাপতির, ধারভাবে আদেশ পালন করে চলো; একদিন তোমার মুক্ত কৃপাণের ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ সৈনিক জয়যাত্রা করবে! তুমি সৈনিক, তুমি বীর!

কর্ণদাদা কার্য্যান্তরে চলে যাওয়ার পর সিধু একা বসে ভাবতে লাগলো, সেদিন গভীর রাত্রে কর্ণদাদার আদেশে যে ভয়ঙ্কর কাজটা করবার জন্য সিধুকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সিধু নির্ভয়ে সে কাজে এগিয়ে গিয়েছিল বলেই কর্ণদাদা তার প্রশংসা করলেন, কিন্তু সে কাজ সিদ্ধ হয় নি! জীবনে এই দুটো কাজে সিধু ব্যর্থ হোল, একটা অবন্তীকে অপহরণ করা, অন্যটা কর্ণদাদার আদেশ পালন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে-কাজে বিফল হওয়া! কিন্তু বিফল হলেই বিচলিত হবার লোক কর্ণদাদা নন। তিনি সস্নেহে সিধুর পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন—বাঃ! বেশ সাহসী তো তুমি! তারপর সিধুকে তিনি নিজের দলেই রেখে দিলেন। সিধু এঁদের সঙ্গে এখানে সেখানেই ঘুরছিল। হঠাৎ টাকার টান ধরায় কর্ণদাদা চিন্তিত হয়ে পড়ায় গত কাল সিধু বললো,—আমার হাজার পাঁচ টাকা আছে। কর্ণদাদা আশ্চর্য্য হয়ে শুধুলেন—তোমার টাকা আছে? কোথায় পেলে?

—ব্রহ্মোত্তর জমি আর বাস্তু-বাড়ী বিক্রীর দরুণ টাকাটা পেয়েছিলাম।

সব শুনে কর্ণদাদার চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠেছিল,

বলেছিলেন,—এমনি করেই মানুষকে গৃহহারা, সর্ব্বহারা হয়ে যেতে হচ্ছে—উঃ !

সিধুর টাকা উনি নিলেন না, বলেছেন, দরকার যদি খুব বেশি হয় তো কিছু নেবেন ; এখনকার মত কিছু দিন চলে যাবে। কোথায় কিছু টাকা পেয়েছেন ! সিধুর দুঃখ হয়ে ছিল, কর্ণদাদা টাকাটা না নেওয়ার জন্য কিন্তু উনি তো বলেছেন, দরকার হলে নেবেন !

টাকা আর নিজের কাছে রাখতে চায় না সিধু। ওর মনের মধ্যে বিলাসের আর কোন আকাঙ্ক্ষাই বেঁচে নাই। ও এখন শুধু ভাবে, জীবনটা একটা বৃহত্তম মহত্তম কাজে ব্যয় করবার ক্ষেত্র সে ভাগ্যবলে পেয়ে গেছে ! এই ক্ষেত্র থেকে সে আর বিচ্যুত হবে না। সন্ন্যাস নিয়ে গিরিগুহায় ধ্যান-ধারণা করে ঈশ্বরলাভের স্বার্থপর তপস্যায় মন ওর বিমুখ হয়ে উঠেছে। ও এখন চায়, সকল মানুষকে নিয়ে বিরাট এক মহামানব-গোষ্ঠি গড়ে তুলতে, বিশাল এক মহাসমাজ-রাষ্ট্র গড়তে, একটা স্বরাট্ রাষ্ট্র গড়তে !

কিন্তু এসব কথা কর্ণদাদার মুখে শুনেই সিধু যতদূর সম্ভব বুঝবার চেষ্টা করে। ওর উপলব্ধিতে এদের ঠাঁই নাই, অনুভবে শুধু আভাস জাগে মাত্র ! এই অত্যাশ্চর্য্য অনুভবটা এসেছে কর্ণদাদার সাহচর্য্যে। জীবনে কোনোদিন স্বদেশ বা স্বাধীনতার কথা সিধু ভাবে নি। নেশা আর নারী ছাড়া কিছুই ভাবে নি সে। এবং ঐ দুটি বস্তুর জন্য সিধু না করতে পারতো এমন কাজ নেই ; ওর সর্ব্বনাশ করলো ঐ শালগ্রামের নুড়িটাই। ওইটাই দুর্ব্বল করে দিল ওর মন—হতভাগা পাথর !—সিধু চম্‌কে উঠলো, পকেটে হাত দিয়ে দেখলো, কাগজ জড়ানো লাড্ডুর মতন পাথরটা রয়েছে তখনো। বের করলো !

কী সুন্দর ! কালো উজ্জ্বল রঙ ঝকমক করছে ! আর কত সব চিহ্ন রয়েছে ওর গায়ে আবার ! চক্র—হ্যাঁ, এই চক্রেই নাকি দৈত্য দলন

হয়েছে, ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়েছে, রাষ্ট্র পালন হয়েছে! এই চক্র তো তুচ্ছ করবার বস্তু নয়! এই তো শক্তি,—কর্ণদাদা যা বলছিলেন!

সিধু উঠে গিয়ে নদীতে স্নান করলো, তারপর দুচারটা বুনো ফুল তুলে পূজা করতে বসলো সেই নদীর কূলে এক গাছতলায়! মন্ত্র সিধুর জানা, দিনকয়েক পুরোহিতের কাজ করা ছিল ওর;—পূজা করতে করতে সিধু তন্ময় হয়ে গেছে। এক গুরুভাই এসে ঠাট্টা করে বললো—পাথরের নুড়ির পূজা করে কি হয় সিধু? ওর কি প্রাণ আছে?

—নিশ্চয় আছে—সিধু দৃঢ়স্বরে বললো—দেশমাতাও মাটি আর পাথর দিয়ে গড়া—আমার এই নুড়ি সেই পাথরেই তৈরী; তাই শাস্তরে লেখা আছে, এই নুড়িতে যে কোন দেবদেবীর পূজা হতে পারে। মাটিই দেবতা!

গুরুভাই চুপ হয়ে গেল একেবারে।

নিজেকে নিঃসহায়ভাবে ঈশ্বরের পাদপদ্মে অর্পণ করেই মা অবন্তীকে নিয়ে কাশীতে পৌঁছেছেন। অবন্তীর সময় এখনো পূর্ণ হয়নি, তাই তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে মাস তিন। এই সময়টা তিনি যথাসাধ্য পুণ্য সঞ্চয় করবার বাসনায় পূজা-আরতি-মন্দির দেখে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু অবন্তীর ওসব বালাই নেই; সে নিশ্চিন্ত মনে গল্প করে, আড্ডা দেয়, বই পড়ে, ঘুমায়। শচীনবাবুর বড় বাড়ীতে ওরা উপরের দুটো কামরা নিয়ে আছে। একটা ঝি এবং একটি বাচ্চা ঠাকুরও আছে রান্নার জন্য। অসুবিধার কোনই কারণ নেই; শচীনবাবুর পরিবারবর্গ এদের মা-মেয়ের প্রত্যেকটি সুবিধার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন; অবশ্য অবন্তী সম্বন্ধে সব কথা একমাত্র শচীন বাবু ছাড়া বাইরের আর কেউ জানেন না। অন্য সকলে জানেন, অবন্তী বিবাহিতা, এবং শারীরিক সুস্থতা লাভের জন্যই পশ্চিমে এসেছে;

কিন্তু তার মা'র পুণ্য লাভের পিপাসা অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য কাশীতে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। ইতিমধ্যে যদি সন্তান-সম্ভাবনা নিকট হয়ে আসে তাহলে শচীনবাবুর মত মহান পিতৃবন্ধুর আশ্রয় ছেড়ে অন্যত্র না যাওয়াই ভাল! কল্‌কাতায় এখন নানা রকম অসুবিধা আছে অতএব সেখানে তাঁরা যেতে চাইছেন না। ব্যাপারটা কঠোর সত্য; কলকাতায় বর্ত্তমানে পত্নী কন্যা নিয়ে বাস করা সত্যিই বিপজ্জনক মনে করে সকলেই সে কথা বিশ্বাস করলেন। অবন্তীর মা নিশ্চিন্ত হয়েছেন!

সীমন্তের সিঁদুর অবন্তী দেয় না, জনৈকা সখী প্রশ্ন করায় অবন্তী জবাব দিয়েছে—সীমন্তোন্নয়নের পর নাকী সিন্দুর পরতে নাই। নিরীহ সখীটি এক বিধুবী মেয়েকে আর বেশী ঘাঁটাতে সাহস করেনি। অবন্তীর আদর-যত্ন ওঁরা বাড়িয়ে দিয়েছেন; এ অবস্থায় যা-যা প্রয়োজন, সবই ওঁরা করছেন। অবন্তী হেসে খেলে বেশ আছে! কিন্তু মা—অভাগী জননী গভীর রাত্রে ভাবেন, আর ভাবেন, দিন নিকট হয়ে আসছে; সেই ভয়ঙ্কর দিনে কী তিনি করবেন! আবার ভাবেন—ছেলেটাকে গোপনে কোনো আতুরশালায় পাঠিয়ে দেবেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, শচীনবাবুর পরিবারবর্গকে কি কৈফিয়ৎ দেবেন তিনি তখন! কত দুঃশ্চিন্তাই যে হয় মার···অবন্তী তখন নিঃসাড়ে ঘুমায়; মা হয়তো একবার গিয়ে দেখে আসেন কেমন সে রয়েছে। মৃদু আলোতে অবন্তীর সুন্দর মুখখানা আরো সুন্দর দেখায়। মা দেখেন আর ভাবেন, যে শুভ দিনের আগমনকে শরীর-মনের সকল আনন্দ দিয়ে বরণ করবার কথা, সেই দিনটির নিকটবর্ত্তিতা তাঁর অন্তরকে আকুল করে তুলছে আশঙ্কায়; আর্ত্তনাদ করছে হৃদয়। এই অবন্তীকে কি আবার সেই পূর্ব্বের অবন্তী করে তোলা যাবে! আবার কি তাকে বিবাহিত বধূজীবনের পবিত্রতম গৃহাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন তাঁরা! মা—মার অন্তর বিদীর্ণ করে কান্নার সুর জেগে ওঠে—না!

তবু চেষ্টা করতে হবে, যদি, যদি কোনো উপায়ে অবন্তীর বর্ত্তমানকে একান্তভাবে প্রচ্ছন্ন করতে পারা যায়, তাহলে, হয়তো টাকার জোরে ভাল ঘর-বর দেখে তাকে পাত্রস্থা করে দেবেন তিনি। কিন্তু প্রচ্ছন্ন করা প্রায় অসম্ভব। যে নবাগত আসছে, সে তার বিজয় দুন্দুভি বাজিয়ে আসবে; সে চলে গেলেও তার সুগভীর পদচিহ্ন রেখে যাবে অবন্তীর সারা শরীরে;—সে-সত্য প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে উঠবে যে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির চোখে! নিরাশায় মায়ের সারাদিনের সঞ্চিত পুণ্য ক্রন্দনে ঝরে পড়ে মাটিতে; সন্তানস্নেহাতুরা জননী বারম্বার বলেন—রক্ষা করো বিশ্বেশ্বর!

কিন্তু বিশ্বেশ্বরের দল আজকাল বধির হয়ে গেছেন; ঢাকঢোল, শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে আমরাই তাদের কাণ ভোঁতা করে দিয়েছি। আমরাই পূজার সার্ব্বজনীন মন্দিরে ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র-অন্তজ্যের অচলায়তন রচনা করে ভক্তের গভীর আহ্বানকে রুদ্ধ করেছি; ছুৎমার্গের কদর্য্যতায় অপবিত্র করেছি পবিত্রতম দেবতার পানভোজনালয়; দুই হাতের সমস্ত শক্তির শাণিত খড়্গো আমরা শুধু নিরীহ ছাগবলি দিয়েই স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটনের ব্যর্থ চেষ্টা করেছি, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সে কৃপাণ একবারও উত্থিত হয়নি। শক্তিপূজার ভণ্ডামী করে আমরা সুরাপানের অসুস্থতায় শক্তির শ্রেষ্ঠতম মাতৃরূপকে অবমাননা করেছি, লাঞ্ছিতা করেছি মাতৃজাতিকে; পাষণ্ডস্পর্শে অপবিত্র বোধ করেছি নারীর হিরন্ময়ী মূর্ত্তি! একবারও ভেবে দেখিনি,—নারীই জাতীয় জীবনে জননীরূপিনী ঈশ্বরী! তাঁর হিরণ্ময় দেহ-বিগ্রহ কোনো সময়েই অপবিত্র হয় না, কোনো কারণেই অশুচি হয় না! পরপুরুষস্পর্শের গ্লানি থেকে তাকে মুক্ত করে আবার পূজার বেদিতে ফিরিয়ে আনবার কোন প্রয়াস কি করেছি আমরা? তাদের আর্ত্ত অসহায় চীৎকারে বিশ্বেশ্বর বধির না হয়ে আর কতক্ষণ পারবেন? স্বাধিকারকে সঙ্কুচিত করতে করতে যে নির্ব্বোধ জাতি

অভিমানের অহঙ্কারে টিঁকি আর ভাতের হাঁড়ীতেই নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ করে ফেললো, আপনার নির্য্যাতীতা কন্যাবধূকে আপদ-বালাই ভেবে অসহায় রেখে পালিয়ে গেল, সেই ভীরু কাপুরুষদের আবার ভগবান কোথায়? তাদের দুহাতের ক্ষীণতম শক্তিতে শুধু ঢাকঢোলই বাজে, বিশাল মানব-লোকের বিরাটায়ত দেবতার একটি পদঙ্গুলিও সে বাদ্যে চঞ্চল হয় না। ছুঁৎমার্গে ক্লেদাকীর্ণ, কাপুরুষতায় কলঙ্কিত, সমাজদেহরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে স্বেচ্ছায় ছেদন করার মত নির্ব্বোধ, আর নিজেকে নির্ল্লজ্জভাবে গণ্ডীবদ্ধ করার মত স্বার্থান্ধ ধর্ম্মে ভগবান নেই,—তিনি থাকতে পারেন না। যে ভগবানের পদপ্রান্তে অনন্ত মানবস্রোত প্রণত হয়ে প্রবহমান হচ্ছে, যে ভগবানের পুণ্যময় পীঠস্থানে মানুষ ব্যতীত আর কোনো জাতি নাই, যেখানে পৌরুষমহিমা প্রজ্বলিত হোমশিক্ষা বিস্তার করে নারীর সতীত্ব, আর্ত্ত-অসহায়ের নিরাপত্তা, আশ্রয়প্রার্থীকে রক্ষা করতে সমর্থ, তিনি সেখানেই প্রস্থান করেছেন।

কিন্তু ভাবলে কি হবে! অবন্তীকে আবার সেই পূর্ব্বাশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে অসংখ্য অনন্ত বাধা। এই হতভাগা দেশে এমন কোন লোকই নাই যে অবন্তীর সব জেনেও তাকে সতী, বধূ, গৃহিনী এবং সহধর্ম্মিণীরূপে শ্রদ্ধা করতে পারে! কেন নাই? পৃথিবীর সব দেশে যা আছে, এই হতভাগ্য দেশে তা নেই কেন? শাস্ত্র?—না, শাস্ত্রের অনুশাসন যুগেযুগে পরিবর্ত্তনশীল,—তাছাড়া, উদার শাস্ত্রকার কোথাও বলেন নি যে আপনার অর্দ্ধঅঙ্গ ছেদন করে তোমাকে ক্ষয়গ্রস্থ হতে হবে। শুধু দেশাচার গণ্ডীবদ্ধতার নির্লজ্জ স্বার্থপরতা আর সুলভ নারীজীবনের উপর নির্ম্মম উদাসিতা! এর কি প্রতিকার নেই? কোনো পরশুরাম কি রুদ্র কুঠার হাতে এদের অহঙ্কার চূর্ণ করতে পারেন না আর একবার! কোনো বোধিসত্ত্ব, কোনো কৃষ্ণ-চৈতন্য কি আর একবার এসে এদের চৈতন্য দান করে জাতিত্বের গণ্ডীটা ভেঙে দিয়ে

যেতে পারেন না—কোন কল্কি কি অগ্নিময় কষা হাতে এসে জাতটাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন না,—ওরে রাজযক্ষ্মাগ্রস্থ মৃত্যুপথযাত্রী,—বাঁচবার উপায় কর!

চিন্তার সমুদ্র চঞ্চল হয়ে উঠছে মন্থন-তরঙ্গের ঘনায়মানতায়, এই চঞ্চল সমুদ্র মন্থনে প্রথম ওঠে হলাহল, তারপর ওঠে অমৃত, তখন হয় দেবাসুরে সংগ্রাম; সে সংগ্রামে সুকৌশলে অমৃত পান করে দেবতারা অমর হয়ে তবে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। পৃথিবীরও প্রত্যেকটি স্বর্গরাজ্য, স্বরাটরাজ্য প্রতিষ্ঠার এই-ই ইতিহাস। সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হয়েছে—গরল উঠেছে,—বিভেদ, বিদ্বেষ, বিষ, দলগত অবিবেচনার স্বার্থবুদ্ধি, তোষণ পোষণ নীতির পঙ্কিলতা দেখা দিয়েছে রাষ্ট্রে, সমাজে ব্যক্তিতে। এই মহাসমুদ্র মন্থন আর কতদিন চলবে কে জানে! অমৃত কবে উঠবে, কারো জানা নেই—তবু নেতৃত্বের মন্দার-পর্ব্বত ঘূর্ণিত হোক, গণমনের বাসুকীনাগ বিষ বর্ষণ করুক, আর সেই বিষ পান করুন আসমুদ্র হিমাচলের মানবদেবতারূপী নীলকণ্ঠ!

কিন্তু বিষপানের যোগ্যতা যে এই হতভাগ্য মানবদেবতা আজ হারিয়েছে! আজ কি আর আছে সে নীলকণ্ঠ! আজও কি সে শ্মশানে শিব রূপে অবস্থান করে, সকল মানুষের একত্বের আশ্রয় দান করে, সকলকেই এক মানবধর্ম্মে, জীবনধর্ম্মে এবং মৃত্যুধর্ম্মে দীক্ষিত করে! সকলকেই সমান অংশে বণ্টন করে দিতে পারে অমৃতভাণ্ড! না—তা যদি পারতো, তাহলে এই দুর্ভাগা দেশের এতখানি দুর্ভাগ্য হোত না। নীলকণ্ঠ নাই, বৃথাই উচ্ছ্বাসের চীৎকার! কিন্তু তাঁকে আনতে হবে; ঐ ব্যর্থ চীৎকার স্বার্থকতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এক শুভ প্রভাতের অরুণালোকে! সেদিনের দেরী আছে, কিন্তু আসবেই সে দিন! ঘুমন্ত অবন্তীর মাতৃত্ব-ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত মুখের পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে মা তাকিয়ে দেখেন আর ভাবেন এই সব কত কি!

আজ শচীনবাবু তাঁকে ডেকে গোপনে বললেন—আর মাস দুয়েকের মধ্যেই এসে যাবে। ছেলেটাকে মেরে ফেলাই কি ঠিক করেছেন! সকলকে মরা ছেলে হয়েছে, বললেই ল্যাঠা চুকে যায়।

চমকে উঠলেন সন্তানবতী জননী। মেরে ফ্যালা কি কথা! উঃ! মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো তাঁর প্রায় একমিনিট; সামলে বললেন,

—না—অতটা প্লাপ আমি করতে পারবো না! তাকে কোথাও রেখে দেবার ব্যবস্থা করুন। দোহাই আপনার মেরে ফেলবার কথা বলবেন না।

—কিন্তু ও ছেলে তো আপনাদের কেউ নয়! ওর উপর মমতা···

—ছেলে সব সময়ই ছেলে! সন্তান সব সময়ই স্নেহভাজন। আমাদের ব্যাধিগ্রস্থ বিধানের জন্য তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিতে হবে, এতো বড় পাপ আমার সহ্য হবে না। আপনি তাকে কোথাও সরিয়ে দিন!

—ভারী মুস্কিলের কথা! আচ্ছা, আমি দেখি আরেকটু চেষ্টা করে!

শচীনবাবু চলে গেলেন। মুখখানা অপ্রসন্ন! মা বুঝলেন, এই ব্যবস্থা করতে শচীনবাবুকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। বন্ধুত্বের মর্য্যাদা শুধু নয়, প্রচুর অর্থের পুরস্কারও লাভ হবে ভেবে শচীনবাবু একাজে হাত দিয়েছেন। কিন্তু হত্যার পথে মা তাঁকে কিছুতেই যেতে দেবেন না! মা জানেন, এ বিষয়ে অবন্তীর কোনো ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নাই, থাকলেও সেটা সে প্রকাশ করে না। কিন্তু মা নিজে যখন সঙ্গে রয়েছেন, তখন অবন্তীর সন্তানকে তিনি বাঁচাবেনই! একদিন হয়তো সেই সন্তান এই দুর্ভাগা দেশে রুদ্ররূপ পরিগ্রহ করবে। হয়ত তার পাশুপতাস্ত্রে পৃথিবীর পরিণতি হবে অন্যরকম। জীবন—যে জীবন অত দুঃখের মধ্যেও আসছে দেহবন্দী হয়ে, তাকে মুক্তির মোহানায় নিয়ে যাবার অমন কদর্য্য কার্য্যের অধিকার তাদের কারোরই নেই। যে আসছে, তার আসার সার্থকতা তিনিই জানেন, যিনি তাকে পাঠিয়েছেন! তিনিই দেখবেন তাকে। মা পুনর্ব্বার বধির বিশ্বেশ্বরের চরণ স্মরণ করলেন!

অবন্তী অকস্মাৎ এসে করুণকণ্ঠে বললো.—ভারী মুস্কিল হোল মা ওরা সব শুধুচ্ছে, তোমার বর একবার দেখতে আসছে না কেন? চিঠিপত্র দেয় না কেন? বরের নাম কি? থাকে কোথায়?

—হুঁ, তাতো বলবেই বাছা! তুই কি বললি?

—বরের নাম তো বলতে নাই; তাই বললাম না। আর বললাম, থাকে কলকাতায়। বাবা প্রতিদিন চিঠি লিখছেন, তাই সে আর লেখে না! কিন্তু সবাই কেমন সন্দেহ করছে যেন। কেউ বিশ্বাস করে না কথা আমার।

—যা বলেছিস তাই বলবি সবাইকে। এক রকমই বলিস যেন!

বলে মা নিশ্বাস ছেড়ে মন্দির দর্শনে বেরুলেন। মিথ্যার অগাধ সমুদ্রে শয্যা রচনা করেছেন তিনি, মন্দির দর্শনের পুণ্য কি সেখানে পৌঁছুবে? তবু উনি অভ্যাসবশতঃ চলতে লাগলেন। প্রতিদিনের মত স্নান পূজা শেষ করে বেরিয়ে আসছেন, অকস্মাৎ সিদ্ধেশ্বর!

—সিধু না? —মা বিস্ময়ের সঙ্গে শুধুলেন!

—হ্যাঁ কাকীমা, আমি! আপনি এখানে কোথায়!

—বিশ্বেশ্বর দর্শনে এসেছি বাবা! তুমি কোথায় রয়েছ?

কোথায় রয়েছে, সিধু জানাবে না। বলা নিষেধ আছে। অথচ মিথ্যা কথাও বলে না সে আজকাল। তাই দুইদিক বজায় রেখে বলল,—আমি তো ঘুরে ঘুরেই বেড়াই! কাকাবাবু, অবন্তী এরা ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ! অবন্তী এখানেই আছে। এসো একবার আজ বিকালে! ঠিকানা রাখ!

ঠিকানা মা দিলেন ওকে। সিধু বললো—আজ আর যাওয়া হয়ে উঠবে না। কাল পরশু যাব একদিন।

মা বাড়ী ফিরে অবন্তীকে সিধুর কথা বলতেই বুদ্ধিমতী অবন্তী মুহূর্তে এক মতলব খাড়া করে নিল মাথার মধ্যে। বলল,—আমার বরের নাম

যদি ওরা শুধোয় মা, তো বলো—সিদ্ধেশ্বর। আর সিধুদা যেদিন সেদিন ওকেই আমার বর এসেছে বলে চালিয়ে নিও! আমি সিধুদা আপত্তি করবে না।

মা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন অবন্তীর কথা শুনে। বললেন,—কিন্তু সিধু যদি স্বীকার না করে?

—ও করবে স্বীকার। আমি জানি! দৃঢ়স্বরে বললো অবন্তী। তার নারী-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে সিধুর বিদায়কালের মূর্ত্তিটা হয়তো আঁকা ছিল! সিধু তাবে চায়, এ খবর অবন্তীর ভালই জানা—কিন্তু অবন্তী এখনো ছেলেমানুষ, রূপগর্ব্বিতা, ধনবতী তরুণী, সে জানে না যে সিধু যে-অবন্তীকে চেয়েছিল, এ অবন্তী সে-অবন্তী নয়। তবু মা কিছুই প্রতিবাদ করলেন না আর। অবন্তী যদি সিধুকে তার বর সাজতে রাজি করতে পারে তো মন্দের ভাল।

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে পৌছাল নবকিশোর! বৃষ্টিটা জোর নেমেছে; আলোক প্রথমটা ভেবেছিল, বৃষ্টির জন্যই কিশোরকে ছুটতে হয়েছে, কিন্তু যে-কোনো সামান্য কারণ, অর্থাৎ বৃষ্টি, বজ্রাঘাত বা মৃত্যু-মহামারীর ভয়ে ছুটে আসবার ছেলে নয় কিশোর। মৃত্যুকে ওরা উপহাস করে সকল সময়। ওরা জীবনের রুদ্র রূপ।

আলোক কিছু প্রশ্ন করবার পূর্ব্বেই কিশোর ছেঁড়া কাপড়ের তলা থেকে বের করলো দুটো শিশি ওষুদে ভর্ত্তি, ছ'টা ইন্‌জেক্‌শন এম্পুলওয়ালা একটা কাগজের বাক্স আর একবোতল হরলিক্‌স্! আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই পঁচিশ ত্রিশ টাকার ওষুদ কিশোর কিনলো কি করে! আলোক বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, কিশোর নিজেই বললো—উ শালালোগ বহুৎ

বহুৎ রূপেয়া কামায়া বাবুসাব্—'ব্লিলিক মারকিট্' কিয়া পাঁচ বরষ উসি ওয়াস্তে কুচ ভাগা লিয়া হাম্।

—চুরি করলে কিশোর?

—আরে! চুরি কাহে বোলতা বাবুজি! ইস্ হরলিকস্‌কো দো-আড়াই রূপেয়া দাম থা আভি পাঁচ রূপেয়া লেতা হ্যায়। চুরি হাম কিয়া; না' উন্ লোক কিয়া? আউর দেখিয়ে, ঝুমনিকো ওয়াস্তে দাওয়াই মেরা দরকার। আপ কিয়া কহতে হ্যাঁয়—উ'লোক সব জিতা রহেগা আউর হামলোক মর যায়েগা?

খুবই সত্যিকথা—ওরা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে বিপুল অর্থের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নিয়ে; আর এরা, এই হতভাগ্য পথচারীর দল মরে যাবে? কেন? কোন্ অপরাধে? এই অসাম্যের, এই অত্যাচারের প্রতিকার করাকে এরা চুরি বলে না—বলে ন্যায্য অধিকার! কিন্তু আলোকের মনটা তবু খচ্ খচ্ করছে! শিশির ওষুদ ঢেলে সে ঝুমনীকে খাওয়ালো —কিশোর বলে চলেছে:

—রাতমে দাওয়াই দেনেকোবাস্তে জানলা একঠো থাকে না বাবুজি!

উস্ জানলা দিয়ে দাওয়াই চাইলাম হামি,পিস্‌কিপ্‌স্‌সন ভি দিলাম—উ কম্পাণ্ডারসাব্ দাওয়াই দিতে আসলো, তেঁইশ রূপেয়া মাংগলো! হামি বললাম,—দাওয়াই সব ঠিক ঠিক দিয়েছেন তো! উ বললো—হ্যাঁ। আর মেরা পাশ একঠো আজাদহিন্দ ওয়ালা নোট থা—ওহি দে কর তুরন্ত দাওয়াই সব হাত বাড়ায়ে লে কর ভাগলাম—এক লম্বা ছুট্ —ব্যস্।

—নোটখানা দেখে সে চিনতে পারলো না?

—উ বাবু দারু পিয়া রহা; ভাবলে কি, হামি একশো রূপেয়াকা নোট্ দিয়েছি। খুচরা ভাঙানি আনতে গিয়ে বাত্তিমে দেখবে—ইস্ বখৎ হাম ছুট লাগায়া।

অতি কদর্য্য চুরি—আলোক অস্বস্তি বোধ করছে। ওর মুখ পানে তাকিয়ে কিশোর কি যেন বুঝে বললো—হাম বহুৎ খারাপ কাজ কিয়া বাবুজি! বহুৎ খারাপ কাজ! লেকিন, দাওয়াই না মিলবে তো ঝুমনি মরে যাবে! উসকো মরণকো লিয়ে কোন্ দায়ী হ্যায়? কোন্ বিচার করতা হ্যায়?

আলোকের অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠলো কথাটা শুনে! এই নিরাশ্রয় নিঃসম্বল মানুষগুলোর মৃত্যুর জন্য সত্যি কে দায়ী? কে বিচার করে এদের অপমৃত্যুর? অনশন মৃত্যুর? কেউ নেই; তাই এরা আপনাকে বাঁচাবার তাগিদে শ্মশানচারী রুদ্র দেবতার আশ্রয়ে এসেছে, যেখানে, বিষ এবং অমৃত, ভাল এবং মন্দ, চন্দন এবং ভস্ম, পাপ এবং পুণ্য, জীবন এবং মৃত্যু, অভিশাপ এবং আশীর্ব্বাদ, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি সব একাকার—সব একমূল্যে ক্রীত এবং বিক্রীত হয়—অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের কোন প্রশ্নই জাগে না কারো মনে। ওর চিন্তিত মুখের পানে চেয়ে কিশোর আবার বললো—আউর দেখিয়ে বাবুজী, হামি উসকো নোট তো দিয়া—আউর নেতাজী সুভাষ চন্দর যব আ-যায়েগা তব্ উস্‌কো ভাঙনি রূপেয়াভি মিল যায়গা! বহুৎ জাস্তি রূপেয়া মিল যায়েগা! উস রোজ হামভি নেতাজীকো কহেঙ্গে, মেই বড়া দুঃখমে আপকো নোট দিয়া রহা।

আলোক যেন চমকে উঠলো! এ চিন্তা কিশোরও করে তাহলে? কোন্ এক শুভ প্রভাতে ভারতের গৌরবসূর্য্য জাতীয়-জীবনের পূর্ব্বাকাশে উদিত হয়ে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছেন তাঁর পুনর্দর্শনের আকাঙ্খায় এই পথচারী সর্ব্বহারা কিশোর বালকও অর্ঘ্যপাত্র হাতে দণ্ডায়মান! সে সরলমনে বিশ্বাস করে, নেতাজী আসবেন, তাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে—রাস্তায় কুড়িয়ে-পাওয়া কাগজের নোট আবার সোনার টাকায় রূপান্তরিত হবে!—কিন্তু সেদিন কি সত্যি আসবে?

—তিনি কি সত্যি আসবেন কিশোর ?

—হ্যাঁ; উ তো জরুর আ-যায়েঙ্গা ! আপ্ দেখ লিজিয়ে……

কিন্তু ঝড়ের বেগে এসে পড়ল কল্যাণী ! এদের দলের একটা মেয়ে ! আলোক তাকে আগে দেখেনি ; বাঙালীর মেয়ে বয়স বছর বারো ! গায়ের ছেঁড়া ফ্রক, তার নীচে পাতার ঠোঙায় ভর্ত্তি খাবার।

—ক্যা ল্যায়া কল্যাণ ?—কিশোর শুধুলো।

—অনেক খাবার ! বিয়ে ছিল এক বাড়ীতে নেবুতলায় ! নে, খা সব !

আলোক বসে দেখতে লাগলো। কুড়িয়ে-পাওয়া খাবার খেয়ে উদর পূর্ণ করবার পশ্চাচার- সাধনায় সে এখনো দীক্ষিত হয়নি—সিদ্ধি তো বহু দূরে ! কিন্তু এরা, বাকি ছেলেমেয়েগুলো আনন্দের আবেশে খেতে আরম্ভ করলো ! কল্যাণী অত্যন্ত ক্লান্ত, বলল,—সারা বিকাল থেকে জলে ভিজে দাঁড়িয়ে ছিলাম—আমি খেয়েছি ! তোরা সব খা, আমি

আলোকের কাছেই এক পাশে শুয়ে পড়লো সে ! কিন্তু তার ফ্রকটা ভিজে ! কিশোর উঠে ফ্রক্ খুলে নিল, একটা শতছিন্ন মলিন কাঁথা, হয়তো শ্মশানের থেকেই কুড়িয়ে পাওয়া—গায়ে দিল কল্যাণীর। কল্যাণী এত বেশী ক্লান্ত ছিল যে দুমিনিটেই ঘুমিয়ে গেল। আলোক ওর পাশে বসে বসে দেখতে লাগলো শ্যামবর্ণ মেয়েটি ! বাঙালী মেয়ের শান্ত শ্রী তার মুখে ! ভাল করে পরিষ্কার করে বার করলে ও যে-কোনো ভদ্র পরিবারের কন্যা বলে পরিগণিত হতে পারে ! ওর শ্রী এবং সৌন্দর্য্য ক্ষয় হয়ে গেছে পথে পথে ঘুরে—তবু ওকে দেখলেই বোঝা যায়, —ওর জীবনকণায় আভিজাত্যের ছাপ আছে—সংস্কৃতির দীপ্তি আছে।

—একে কোথায় পেয়েছো কিশোর ?—আলোক শুধুলো।

ওর এই অহেতুকে কৌতূহলের কোনই অর্থ হয় না, সে জানে; তবু প্রশ্নটা করে ফেললো। কিশোর ডালমাখা লুচিটা খেতে খেতে বললো।

—উ বহুৎ ভালা ঘরকা লেড়কী আছে বাবুজী—হুম! উস্‌কো মাইকো গুণ্ডালোক ছিনাকে লেকর ভাগা রহা। দশবিশ রোজ বাদ উস্‌কো মাই যব্ ঘুমকে ঘরমে গিয়া তব্ উসকো-সামনেকো দরয়াজা বন্ধ হো গিয়া; ব্যাস্! মাইজী আউর কিয়া করে……চলা আয়া রাস্তামে। লেকিন্ ইস্ লেড়কীকোবাস্তে বহুৎ রোতা রহা! আউর দুচার রোজ বাদ বাদ যাতাভি রহা আপনা ঘরকা নগিজ! একরোজ ইস্ লেড়কী আপনা মাইকো দেখ কর ছুট চলা আয়া, মাইভি উসকো লেকর হিঁয়া ভাগা! ব্যস! থোড়া রোজ বাদ ফিন গুণ্ডালোক ঐ জরুকো লেকে ভাগা… ই লেড়কী বহুৎ রোতা রহা! হামি লোক কিয়া করে, উসকো লে আয়া হাম্‌লোককো পাশ…তিন বরষ হো গিয়া!

—ওর বাপের বাড়ী তোমরা চেন না?

—নাহি। উ ভি ঠিক ঠিক কহনে সেক্‌তা নেহি! হামি লোক বহুৎ খুঁজিয়াছে। মিলা নেহি।

হায়রে দুর্ভাগা মেয়ে! আলোক মেয়েটির মুখপানে চেয়েই রয়েছে। বড্ড মমতা জাগছে ওর অন্তরে। অবন্তীর সঙ্গে মুখখানার হয়তো কোথাও মিল আছে। কিম্বা আলোকের মন কল্পনা করছে অবন্তীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য! কিন্তু কোথায় সেই হতভাগী মা! কেন তাকে ঘরে নেয়নি তার স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ি?—ভাবতে গিয়েই আলোকের অন্তর জ্বালা করে উঠলো। যে কাপুরুষের দল গুণ্ডার হাত থেকে নিজের পত্নীকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়নি, তারাই আবার ধর্ম্মের নাম নিয়ে, জাতিতত্ত্বের অহঙ্কারে সেই অসহায়া মা'র গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে! এই জাতিত্ব, এই ধর্ম্ম উচ্ছন্ন যাবে না তো যাবে কে? যাক্—নতুন ভাবে গড়ে উঠুক

আবার নব ধর্ম্ম, নব জাতিত্ব, নূতন সমাজ! এতে যদি হিন্দু ধর্ম্ম লোপ পেয়ে যায়, তাও ভাল,—মানবধর্ম্ম বেঁচে থাকবে! কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের কিছু মাত্র দোষ নেই—সে ধর্ম্ম বারম্বার বলপূর্ব্বক অপহরণ, ধর্ম্মান্তরিত করণ, বলপূর্ব্বক বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারের পরও নারীকে সমাজে নিষ্কলঙ্করূপে ফিরে আসবার ব্যবস্থা দিয়েছেন! সেই ব্যবস্থার কথা রুদ্রস্বরে ঘোষণা করে গেলেন দেবমানব কত কত মহাত্মা, অথচ কাজে তার কতটুকু হচ্ছে! হিন্দু সমাজ কত সহজে নিজের বূহ থেকে অর্দ্ধাংশ শক্তিকে বের করে দিতে পারে! কিন্তু তাকে ফিরিয়ে স্ব-শক্তি বৃদ্ধির উপায় জানা থাকা সত্বেও তার প্রয়োগ ক্ষমতা নেই! আশ্চর্য্য এই জাতির ধর্ম্মানুশাসনের ভ্রান্তবুদ্ধি! এমনি করে নিজেকে ক্ষয় করতে করতে সে আজ সংখ্যালঘুত্বের ক্ষীণতম বিন্দুতে পরিণত হোল,—এদিকে ঋজু, তীক্ষ্ণ শলাকার মত বেড়ে যাচ্ছে অন্যান্য সম্প্রদায়। পরিচয়ে, প্রচারে, আপনাপন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচণ্ড প্রয়াস প্রত্যেক ধর্ম্মেই আছে, নাই শুধু হিন্দুর! সে-চেষ্টা করলেও নাকি দূষনীয় হবে,—আশ্চর্য্য যুক্তি!

এই যে কল্যাণীর মা,—সে এখন কোথায়, কোন ধর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে? এমন শত শত কল্যাণীর মা করছে—হিন্দু কি আজো তা ভেবে দেখবে না! আরো কতকাল সে মৃত শবদেহের নির্ব্বিকারত্ব রক্ষা করবে?

আলোকের চিন্তাটায় আঘাত করে কিশোর বললো,—শো যাইয়ে বাবুজি! বাত্তি তো খতম্ হো-গিয়া!

আলোক দেখলো—মোমবাতিটা শেষ জ্বলা জ্বলে নিবে গেল! অন্ধকার!—আলোক কল্যাণীর কাছেই শুয়ে পড়লো। কিশোরের দল কে কোথায় শুয়েছে এর মধ্যে, অন্ধকারে আলোক কিছুমাত্র জানতে পারলো না! বাইরে বিরামহীন বৃষ্টি, আর ভিতরে ঝুমনীর রোগ-যাতনামাখা করুণ কণ্ঠস্বর! আলোকের ঘুম আসা প্রায় অসম্ভব!—

চিন্তার সমুদ্রে-ডোবা আলোকের কাণে ঝুমনীর আর্ত্তস্বর বারম্বার আঘাত করছে! ঝুমনীকে একবার দেখা উচিৎ! ওষুধও দিতে হবে, কিন্তু এই সূচীভেদ্য অন্ধকারে ঝুমনীর বিছানা পর্য্যন্ত যাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিশোর কোথায় শুয়েছে জানা নেই আলোকের! সে ডাক দিল, —কিশোর—কিশোর!

—হাঁ, বাবুজী!—বলে তৎক্ষণাৎ কিশোর উঠে পড়লো—ক্যা হায়?

—ওষুধ খাওয়াতে হবে; আলোটা জ্বালো একবার!

কিশোর মুহূর্ত্ত মধ্যে উঠে দেশালাই জেলে বিড়ি ধরালো, আধপোড়া বিড়িটা কাণেই গোঁজা ছিল ওর। সেই দেশলাইয়ের শিখাতেই আর একজনের কাঁথার এক টুকরো ন্যাকড়া ছিঁড়ে নিয়ে জ্বালিয়ে বললো, —আইয়ে বাবুজি; দিজিয়ে দাওয়াই!

আলোক উঠে গিয়ে দেখলো ঝুমনীকে। কিশোর ইতিমধ্যে আরো কয়েকফালি ন্যাকড়া জুড়ে দিয়ে ধুনি জেলেছে এই সাধন-ক্ষেত্রে। সত্যিই আলোকের মনে হোল—এই মহা শ্মশানে মহাযোগী মানব-মহারুদ্র যেন সাধনায় নিরত;—বিকারহীন, বীতরাগ-দ্বেষভয়! ঊর্দ্ধরেতা! ঝুমনীকে ওষুধ খাওয়াতে খাওয়াতে সে ভাবলো—একে বলে জীবন-সাধনা, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে জানা—মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে জানা! আলোকও এই সাধনায় নামবে। প্রায় নেমে এসেছে; দু'আনা এখনো আছে পকেটে; সেটা সকালেই খরচ করে দিয়ে আলোক নিশ্চিন্ত হয়ে জীবনের রুদ্ররূপের আরাধনা করবে।

বৃষ্টিটা জোরে এল। কিন্তু রুদ্রের রূপ দর্শন অত সহজসাধ্য নয়, কঠিন কঠোর এ সাধনা, বন্ধুর এ পথ, ভয়ঙ্কর এ পথের বিভীষিকা!

আলোক সকালে ঝুমনীকে ওষুধ খাইয়ে তার ট্যাঁকের দু-আনায় মুড়ি আনিয়ে সাতজনে ভাগ করে খেল—এক মুঠি ভর্ত্তি করেও সবাই পেল না। তারপর আলোক বেরুলো পথে।

সারাদিন পথে পথেই; কিন্তু সন্ধ্যায় উদর-অগ্নি যখন অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করলো তখন রুদ্রের সাধনা করা তার আর হয়ে উঠলো না। জীবনকে যারা সমাজ-সংসারে বদ্ধ দেখেছে, মনকে যারা ভালোমন্দ এবং শুচি অশুচির বিচারাধীন করে গড়েছে, বুদ্ধিকে যারা সৎ এবং অসৎ বুদ্ধিতে ভাগ করতে শিখেছে, রুদ্রের সাধনা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে কেমন করে? রুদ্রের দেখা পেতে হলে বিষ এবং অমৃত, চিনি এবং চিতাভস্ম, খাদ্য এবং অখাদ্য, বিষ্ঠা এবং চন্দন ভেদ রাখলে চলবে না। মনকে সম্পূর্ণরূপে ঘৃণাহীন, বুদ্ধিকে পরিপূর্ণভাবে সদসৎ-বিবেচনাহীন এবং অহঙ্কারকে একান্তভাবে আয়ত্তিভূত না করতে পারলে রুদ্রের সাধনা করা সম্ভব নয়।

আলোক একটা ডাষ্টবীনের ভেতর পড়ে থাকা পাকা পেঁপের অংশটি কিছুতেই খেতে পারলো না—এমন কি, পথচারীর দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত হয়ে সেটুকু তুলে নিতে পর্য্যন্ত পারলো না;—অফিসের একজন কেরাণী খাবার কিনে খেতে খেতে দেড়খানা লুচি সমেত ঠোঙাটা ফেলে দিলেন ফুটপাতের নীচে, আলোকের কাছ থেকে এক হাত তফাতে; আলোক কুড়ুতে পারলো না—ওদিককার ফুটপাত থেকে বাচ্চা একটা ভিখিরী ছেলে এসে সেটা নিয়ে খেয়ে ফেললো!

ওরাই জীবনরুদ্রের শব-সাধক!

আলোক ভাবতে ভাবতে ফিরে এলো ঝুমনীর রোগশয্যাপার্শ্বে। আধখানা লেবু, দুটো পেয়ারা আর গোটাকয়েক আঙুর রয়েছে; রামধনিয়া হাওয়া করছে ঝুমনীর মাথায়। আর কেউ তখনো ফেরেনি! আলোক রামধনিয়াকে সরিয়ে ঝুমনীর সেবার ভার নিল।

কিশোরের দল ফিরলো রাত নটার পর—কিশোর ফিরলো প্রায় এগারটায়। এসেই বললো—দিনভর কুছ খায়া নেহি বাবুজি ?

—না!!

—ও আচ্ছা, খা জাইয়ে !—কিশোর কতকগুলো খাবার বের করলো ময়লা কাপড়ের পুঁটলী খুলে—লুচি, শিঙ্গাড়া, রসগোল্লা, সন্দেশ—কিন্তু তার অনেকগুলি অর্দ্ধভুক্ত ; অবশ্য গোটাও আছে, কিন্তু বেশ বোঝা যায়, কোনো ধনীগৃহের উৎসব-ভোজের উচ্ছিষ্ট ওগুলি। আলোক তার মনকে হাজার বুঝিয়েও ওর এক কণাও স্পর্শ করতে পারলো না ; অথচ সে বারম্বার নিজেকে বলতে লাগলো—'এরা খাচ্ছে ঐ খাবার ! এরাও মানুষ, এরাও তার দেশবাসী ভাই, এরাও জন্মভূমিমাতার সন্তান ! আলোক কেন খেতে পারবে না ! সভার মাঝে বক্তৃতা দিতে উঠে যে নেতা-আলোক সিংহগর্জ্জনে ঘোষণা করেছে 'দেশের প্রত্যেকটি মানুষ তার ভাইবোন' সে-আলোক এই জীবন-দেবতার রুদ্ররূপ দেখেনি···। হয়তো কোনো নেতাই দেখেননি ; তাই তাঁদের নেতৃত্ব এদের কাছে ব্যর্থ হয় বারম্বার। এই জীবন-দেবতার সাধনভূমি থেকে যেদিন নেতা-রুদ্রের আবির্ভাব হবে সেই দিন দেশমাতৃকা সত্যিকার নেতা লাভ করবেন। উচ্চ রাজনীতির উড়োজাহাজে আকাশ ভ্রমণের আনন্দের সঙ্গে স্নৈথীন রাজনীতি চর্চ্চায় জীবনদেবতার পূজা দেওয়া যায় না—জীবন-দেবতার পূজা দিতে হলে জীবনকে সর্ব্বাগ্রে চিনতে হয়, তাকে লাভ করতে হয় ! আলোক কিন্তু তা পেরে উঠছে না ; নিরুপায় হয়ে সে ঝুমনীর জন্য বহু কষ্টে আহরণ বা অপহরণ করা দু'একটা ফল খেয়েই কাটায়। সারাদিন বসে ঝুমনীর সেবা করা এবং আড্ডা পাহারা দেওয়া ছাড়া কিশোর ওকে দিয়ে আর কোনো কাজ করানোর যোগ্যতা খুঁজে পায় না ওর মধ্যে। বলে,—আপ লিখা পড়া জানা আদমি, নেই শেকেগা।

অলোক নিরুপায় হয়ে ঝুমনীর খাদ্যে ভাগ বসাতে বসাতে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলো এই জীবনের শয়নে এবং পরিধানে, কিন্তু খাদ্যে এখনো সে সিদ্ধিলাভ করতে পারে নাই!

নতুন একটা কাজের প্রেরণায় উৎপলা অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ওর মা-বাবার সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করেও সে তার উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য দৃঢ় পদে এগিয়ে যেতে লাগলো—এবং বিশ্বমাতাও তার এই মাতৃমঙ্গলকার্য্যে সাহায্য করতে লাগলেন। এই বৈচিত্রময়ী পৃথিবীতে মানুষ কতখানি নীচে নেমে গিয়েও আবার কিরকম উগ্র গতিতে উপর দিকে উঠতে পারে, উৎপলা তার জলন্ত উদাহরণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তুলবে নিজেকে। সে ভাবে—পাঁকে তার জন্ম, অন্ধকার জল-তল ভেদ করে তাকে উঠতে হচ্ছে হাজার শৈবালের বাধাবিঘ্ন ঠেলে, কিন্তু তার গতি উর্দ্ধদিকে; সূর্য্যের জীবন-রশ্মি লাভের আশায় সে আপন অন্তরের রক্তশতদল বিকশিত করে দেবে—তার গন্ধ এবং মধু ছড়িয়ে দেবে সে সারা বিশ্বে।

উৎপলা সে-রাত্রি অনেক চিন্তা করে তার বিশেষ পরিচিত কয়েকজন ধনকুবের বন্ধুর নামের তালিকা প্রস্তুত করলো। সকালে উঠেই তাদের একজনকে ফোন করলো। তিনি উৎসাহ দিলেন উৎপলাকে এবং সাহায্যও করবেন, বললেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি কিন্তু উৎপলাকে নিরুৎসাহ করে দিলেন; বললেন যে এদেশে ওরকম কাজ করা এখন অসম্ভব, বাধা বিস্তর এবং বিপদও অনন্ত। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি উৎপলাকে এত বেশী উৎসাহ দিলেন যে উৎপলার সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়ে গেল। ইনি বিশেষ ধনী এবং বর্ত্তমানে আরও অনেক ধন অর্জ্জন করেছেন; সে ধনের পরিমাণ

এত বেশী যে টাকাকে ইনি আজকাল খোলামকুচির মত দেখতে পারেন। ইনি বললেন, এই পরম মঙ্গলকর কার্য্যের জন্য তিনি একখানা ভাল বাড়ী দেবেন, নগদও মোটা অঙ্কের টাকা দেবেন এবং আরও যে-কিছু সাহায্য দরকার, সবই করতে প্রস্তুত থাকবেন।

উৎপলা অপর বন্ধুদের তখন আর ফোন না করে এই ব্যক্তিকেই বৈকালে তার সঙ্গে দেখা করতে বললো। ইনি আসবেন বললেন, এবং যথা সময় এলেনও। খবর পেয়ে উৎপলা বাইরের ঘরে তাঁকে বসতে বলে প্রসাধনে লিপ্ত হোল; অসুখের পর আজই প্রথম; কিন্তু প্রয়োজন—তার কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রসাধনের প্রয়োজন আছে। ঐ ভদ্রলোকটিকে উৎপলা ভালই চেনে; এমন কি, যে বাড়ীখানি উনি দেবেন বলেছেন, কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত সেই বাড়ীতেও অনেকবার উৎপলা গিয়েছে। সে বাড়ীটী সহরের জল-আলো-যান-বাহন ইত্যাদির আবেষ্টনেই পড়ে অথচ সহর থেকে একটু দূরে—উৎপলার কাযের সম্পূর্ণ উপযুক্ত; তাই উৎপলা এ সুযোগ হারাতে চায় না।

সজ্জা শেষ করে উৎপলা এসে নমস্কার করলো। প্রতিনমস্কার করে উনি বললেন—উঃ! এতো রোগা হয়ে গেছ!

—হুঁ—উৎপলা কথাটা অগ্রাহ্য করবার জন্যই বললো হেসে, —বড্ড ভুগলাম এই অসুখটায়। তবে দুদিনেই সেরে যাব……যা খাচ্ছি আজকাল! আপনি কেমন আছেন?

—ভালই; আমি তো মোটা হচ্ছি দিন দিন।……উনিও হাসলেন।

অতঃপর উৎপলার কাজের প্লান সম্বন্ধে কথা হোল। উৎপলা তাঁর নিকট-সান্নিধ্যে ঘনিয়ে এসে বললো তার কাজের পরিকল্পনা। ভদ্রলোক অত্যন্ত খুসী হয়ে বললেন,—হ্যাঁ, এ একটা কাজের মত কাজ! ও বাড়াটা আমার আর কোনো কাজে লাগছে না! বিক্রী করলে লাখ

খানেক টাকা হোতে পারে কিন্তু টাকার এমন কিছু দরকার এখন নাই আমার; তোমার কাজেই বাড়ীটা লাগুক!

—পরে আবার কেড়ে নেবেন নাকি?—উৎপলা হেসে উঠলো!

—আরে ছিঃ! কি যে বলো! তবে হ্যাঁ, আমার একটি সর্ত্ত আছে! তোমার আশ্রমের নাম হবে আমার মা'র নামে। মা'র স্মৃতির উদ্দেশেই ওটা দিচ্ছি আমি।

উৎপলা প্রায় পুরো দু' সেকেণ্ড চেয়ে রইল ওঁর মুখের পানে। মা'র স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যেই তাহলে ইনি বাড়ীখানা দিচ্ছেন! আশ্চর্য্য! এঁর মধ্যেও মাতৃস্মৃতিরক্ষার জন্য তাগিদ আছে নাকি? আছে! আপন জননীকে সম্মান করে না, শ্রদ্ধা করে না, পূজা করে না অন্তরের নিভৃততম মন্দিরে, এমন শয়তান তাহলে নেই দেখছি ভগবানের রাজ্য! ভগবান কি সেরকম জীব সৃষ্টি করতে অক্ষম নাকি!—কিন্তু উৎপলা সে সব কথা গোপন করে শুধুলো,

—বেশ, তাই হবে! বাড়ীটা চিরদিনের জন্য দান করুন। আপনার মা'র নামটি কি?

—বিশ্বেশ্বরী! এই হতভাগাকে সাত বছরের রেখেই তিনি স্বর্গে গেছেন। গভীর রাত্রে তাঁর ছবিখানি দেখি আর মনে হয়,—বাবার কাছে কঠোর নির্য্যাতন ভোগ করতে করতে তিনি কি ভাবে জীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন—তখনো আমাকে বুকে চেপে বলতেন……তোর বাবা রাক্ষস, তুই যেন মানুষ হোস!

—মা'র কথাটা রেখেছেন আপনি নিশ্চয়ই!……উৎপলা কি ব্যঙ্গ করলো? কিন্তু উৎপলা কথাটা বলেই তাঁর মুখের পানে চেয়ে দেখলো, ঐ পরম পাষণ্ড লোকটার দুটি চোখই ছল ছল করছে, করুণ কোমল হয়ে এসেছে তাঁর ঠোঁটের হাসি!

—না পলা, মা'র কথা আমি রাখতে পারি নি! মানুষ আমি হইনি। হয় তো এ জীবনে হতে পারবো না। কিন্তু তুমি যাদের মানুষ করবে, তাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যি মানুষ হয়, আমার মা তৃপ্ত হবেন।

উৎপলা ওঁর উচ্ছ্বাসে আর কোনোরকম আবিলতা ছড়ালো না। সে বেশ বুঝলো, এই অতি পাষণ্ড মানুষগুলোর জীবনেও এক আধটা দুর্ব্বল স্থান এমনি থেকে যায়, যেখান দিয়ে ভাঙ্গন ধরে তাদের হিমাচলের মতন অহংকারের পাহাড়ে। সে একটু থেমে বলল—'বিশ্বেশ্বরী নিকেতন'—নাম দিলে কেমন হয়?

—চমৎকার!—ঐ নামই রাখ। প্রাথমিক খরচপত্র চালাবার জন্য আমি কিছু নগদ টাকাও দিচ্ছি, আর আমার একটি আত্মীয়ার ছেলেকেও আমি দেব তোমার নিকেতনে। তুমি কি এরমধ্যে দু' একটা ছেলে মেয়ে পেয়েছ?

—না—আপনার সেই আত্মীয়ার ছেলেটিই প্রথম আশ্রিত হবে।

—সে এখনো পৃথিবীর আলোকে আসে নি .....বলে হাসলেন ভদ্রলোক।

উৎপলা ইঙ্গিতটা বুঝেও বুঝলো না, মাথা নামিয়ে বললো,

—বেশ! এর মধ্যে আমি দু'একটা ছেলে মেয়ে যোগাড় করে এই সপ্তাহেই কাজ আরম্ভ করে দেব! চলুন, আপনার বাড়ীর কন্‌ডিসান একবার দেখে আসি।

দুজনে মোটরে উঠে গেল ওরা সহরের উপকণ্ঠের সেই বাগানবাড়ীতে। এখন আর এ যায়গা বিশেষ নির্জ্জন নেই। চারদিকেই নতুন বস্তি হয়েছে; নতুন বাড়ী উঠছে; কাজেই এটাও এখন সহরের মধ্যেই পড়ে গেছে। বেশ বড় দোতালা বাড়ী। বাগান এবং ছোট একটি পুকুরও

আছে এখানে। উৎপলা বাড়ীটায় ঢুকে ঘুরে ঘুরে সব কামরাগুলো দেখলো! এই বাড়ীতে পূর্ব্বে সে যখন এসেছে, বিলাসিনী বেশেই এসেছে—বাড়ী ঘোরার নোংরামী সেদিন তার কাছে কল্পনারও অতীত ছিল। উৎপলার মনে পড়লো, এই গৃহের কত উৎসব, নৃত্যগীত এবং আনুষঙ্গিক কতকিছুর কথা—সেই অভিশপ্ত গৃহে আজ জগতের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান, মাতৃমঙ্গল অনুষ্ঠিত হবে। এই পুণ্যকাজ এতখানি পাপে-ভরা ঘরে ঠিকমত সফল হবে কি? কে জানে। কিন্তু উৎপলা এতবড় সুযোগ হারাতে চায় না। সমস্ত দেখেশুনে সে আগামী কাল থেকেই কাজ আরম্ভ করে দেবার কথা বললো ওঁকে। উনিও সম্মতি দিলেন এবং নাম-রেজেষ্টারী থেকে আর আর যা কিছু করবার দরকার সমস্তই করিয়ে দেব—বললেন। উৎপলা মহোৎসাহে বাড়ী ফিরে এলো ওঁরই মোটরে। বাড়ী এসে শয্যায় শুয়ে ভাবতে লাগলো—উৎপলা ওঁকে শিকার ধরেছে, নাকি সাহায্য করছে ওর জননীর স্মৃতি-রক্ষার কজে! কিন্তু উৎপলা ভাবলো, উপায় যাই হোক, কাজের উদ্দেশ্য মহৎ —অতএব সে এগিয়ে যাবে।

মহা উৎসাহে চলতে লাগলো 'বিশ্বেশ্বরী নিকেতনের' কাজ। নাম জারী থেকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, প্রচার-কার্য্য, লিফ্‌লেট বিলি এবং খাতাপত্র তৈরী হয়ে গেল চার-পাঁচ দিনের মধ্যে। ছোট ছোট খাট্ বিছানা, মশারী এবং দোলানা-খেলনাও এসে গেল। উৎপলা ঐ বাড়ীরই দোতালায় একটি ছোটমত ঘর বেছে নিয়ে নিজের অফিস করলো—নীচে তলায় সাধারণ অফিসঘর হোল। দরকার হলে উৎপলা যাতে রাত্রেও এখানে থাকতে পারে, তারও বন্দোবস্ত করা হোল। উৎপলা উচ্চশিক্ষিতা

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে প্রতিষ্ঠান চালাবার মত সমস্ত শক্তিই তার আছে, কাজেই বন্দোবস্তও ত্রুটিহীন হয়ে উঠতে লাগলো! কিন্তু দরকার টাকার—প্রচুর টাকা দরকার এরকম একটা প্রতিষ্ঠান চালাবার জন্য এবং দরকার প্রপাগেণ্ডার। উৎপলা একা সামলে উঠতে পারবে না, ভেবে কয়েকজন ত্যাগী এবং শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলাকর্মীর আবশ্যকতা সে অনুভব করছে। একজন ধাত্রীও রাখা হয়েছে মাইনে দিয়ে!

তাছাড়া সব থেকে বেশি দরকার ছেলেমেয়ের, যাদের জন্য এই নিকেতন খোলা হোল; অথচ এই সাতদিনে একজনও আসে নি। উৎপলা জানে, এই হতভাগ্য দেশে বহু নারীই বিপন্না হয়, কিন্তু নিরাপদ আশ্রয়ে আপন সন্তানকে রক্ষা করবার মত মনোবৃত্তি এখনো তাদের জাগে নি····· লাজভয়, কুলভয়, সমাজভয় তো আছেই, সকলের উপর ভয় তাদের সেই অনাকাঙ্খিত সন্তানকেই। কে জানে, সেই সন্তান কবে তার কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করবে, কবে জাবালা পুত্র সত্যকামের মত আপন পিতৃপরিচয় জানতে চাইবে—কবে সে আপন সমাজ সংসারে প্রবেশের দাবী জানিয়ে নালিশ করবে তার জন্মদাত্রীর উপর?

কোনো নারীই এ পর্য্যন্ত উৎপলার আশ্রমে সন্তান দান করে গেল না। অথচ কত সন্তান রাস্তায় রাস্তায় পড়ে থাকে না খেয়ে মরে; নামগোত্রহীন হয়ে যদিবা সে বাঁচে তো চোর-ডাকাত-গুণ্ডা হয়ে ওঠে। এইতো সহজ সত্য!

যে আত্মীয়ার ছেলেকে উৎপলার সাহায্যকারী এখানে দেবেন বলেছেন, এখনো নাকি সে পৃথিবীর আলোকে আসে নি। ছেলেটি যে ঐ ভদ্রলোকেরই বিশেষ কেউ, এ বিষয়ে উৎপলার সন্দেহমাত্র নেই। মাতৃস্মৃতি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভদ্রলোকের অপর একটি উদ্দেশ্যও রয়েছে! তা থাক। তবু উনি প্রথমেই উৎপলাকে এভাবে সাহায্য না করলে উৎপলা এগুতেই পারতো না।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই উৎপলা এই সব কথা ভাবছিল, অকস্মাৎ নীচে থেকে খবর এলো, তার সাহায্যকারী ভদ্রলোক এসেছেন। উৎপলা ত্বরিতে যথাসাধ্য সাজপোষাক করে মুখখানা একবার আয়নায় দেখে নীচে নামলো। গিয়ে দেখলো, ভদ্রলোক দরজায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু তার মোটরে একটি মেয়ে·····তরুণী। যন্ত্রণায় মুখখানা বিকৃত দেখাচ্ছে, তথাপি বোঝা যায়, মেয়েটি পরমাসুন্দরী। উৎপলা নিমেষে বুঝলো ব্যাপারটা, কথা না বলেই ধীরে এসে মোটরে উঠে বসলো মেয়েটির পাশে; বললো—ভয় কি? এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে!

ভদ্রলোক কোন কথা না বলে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন। গাড়ী চললো নিকেতনের দিকে। ফুল স্পিড্···তবু যেন পথ ফুরোয় না; মেয়েটি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে। উৎপলা তা'কে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিচ্ছে। কোনোরকমে এসে পৌছালো ওরা বিশ্বেশ্বরী নিকেতনে এবং তার কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরেই মেয়েটি প্রসব করলো একটি মেয়ে···সুন্দর ফুটফুটে পদ্মকুঁড়ির মত মেয়েটি···যেন জীবনের আনন্দ-সঙ্গীত!

এই নিকেতনের প্রথম প্রাণ-পঙ্কজ ও, প্রথম জীবনাঙ্কুর! উৎপলা শঙ্খধ্বনি করে ওর অভ্যর্থনা জানালো—বললো,—তোমার জন্ম যে পঙ্কেই হোক, তুমি স্বয়ং পঙ্কজ!

ভদ্রলোক মেয়েটিকে নামিয়ে দিয়েই চলে গেছেন, উৎপলার বাড়ীতে তিনি খবর দিয়ে যাবেন যে উৎপলা আজ রাত্রে ফিরবে না! কিন্তু উৎপলা ভাবছে, উনি অত তাড়াতাড়ি না গেলেও পারতেন! অমন করে ছুটে পালিয়ে যাবার কি অত আবশ্যক ছিল! হয়তো ছিল ওঁর আবশ্যক! উৎপলা আর বেশি কিছু না ভেবে নবজাত শিশুটির যত্নে মনোনিবেশ করলো; কিন্তু তার বিশ্লেষাত্মক মনশ্চেতনা নিবিড় হয়ে উঠতে লাগলো বারম্বার শুধু একটা চিন্তাকে কেন্দ্র করে···ঐ ভদ্রলোক পালিয়ে গেলেন; হয়তো আত্মরক্ষা করলেন—কিন্তু এই

সন্তানের সত্যকার জনক কে, তা এই পৃথিবীর একটিমাত্র জীবিত প্রাণীই সঠিকভাবে অবগত আছে ; সে এই সন্তানের জননী ! আর যিনি অবগত আছেন তিনি জীবনের রুদ্ররূপী মহাকাল, ধ্বংসের প্রলয় শূল হাতে নিয়ে যিনি অবিশ্রান্ত সতর্ক প্রহরায় তৃতীয় নয়নের অগ্নি জেলে বসে থাকেন ; সৃজন, পালন এবং লয়ে যাঁর সমান ঔদাসিন্য, অথচ সৃজন, পালন এবং লয়ের যিনি এক এবং অদ্বিতীয় কর্ত্তা ! তাঁর জ্বলন্ত চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঐ ভদ্রলোক কোথাও পালাতে পারবেন না, কোথাও নিষ্কৃতি পাবেন না। সে বিচারালয়ে ব্ল্যাক্-মার্কেট অচল, ঘুষ অকেজো, মিথ্যা অস্তিত্বহীন।

উৎপলার নিজের কথা মনে হোল ; একদিন সেই মহাবিচারশালায় তারও ডাক পড়বে ! তাকেও প্রশ্ন করা হবে, কে সেই সন্তানের পিতা উৎপলা যার গলা টিপে ···! উৎপলা কচি মেয়েটার গা মুছতে মুছতে তার গলায় হাত দিয়ে আঁৎকে উঠলো যেন ! না-না, এ তার কেউ নয়, কিন্তু সে,—সেই গলায় নীল দাগওয়ালা ছেলেটা যদি এখনো বেঁচে থাকে কোনো রকমে এবং কোনো রকমে যদি উৎপলার এই 'নিকেতনে' এসে উপস্থিত হয় কোনো দিন···উৎপলা কি তাকে চিনতে পারবে না ? গলার সে দাগটা কি মিলিয়ে যাবে ? কে জানে, উৎপলা ঠিক জানে না, ওরকম অবস্থার দাগ কতদিন স্থায়ী হয় ! তবু উৎপলা আশা করতে পারে, সে একদিন আসবে ! কিন্তু তার আসবার কোনোই সম্ভাবনা নেই ;—উৎপলার বেশ মনে আছে, বর্ষারাত্রির দুর্য্যোগের মধ্যে নিজের হাতে উৎপলা সেই শিশুকে ডাষ্টবীনে ফেলে দিয়ে এসেছে—মৃত !

মৃত ! না, জীবন অমৃতময়—আত্মা অবিনশ্বর। এক দেহ থেকে সে মুক্ত হোতে পারে, কিন্তু অপর দেহে সে আবার বন্দীত্ব গ্রহণ করবে। জীবনের এই বন্ধন শাশ্বত। জীবন কখনও মরে না—সে অমর। কিন্তু তাতে উৎপলার কি ? ঐ দেহটা মাত্র উৎপলা তাকে দান করেছিল, সে

অনন্ত জীবনস্রোত অবলম্বন করেই উৎপলার দেহে এসে বন্দীত্বের বন্ধনে দেহাশ্রিত হয়েছিল, তার সেই দেহের লয়ের সঙ্গেই উৎপলার সঙ্গেও সব সম্পর্ক তার চুকেছে। তার কথা ভেবে আর লাভ কিছু নেই; কিন্তু তার অসংখ্য দেহধারণের একটা দেহ সে উৎপলার কাছ থেকেই পেয়েছিল, একথা তো সে তার স্মৃতিতে গেঁথে রেখে দিতে পারে! তাহলে তার স্মৃতির মালায় উৎপলাও থেকে যাবে—থেকে যাবে উৎপলার ভ্রূণহত্যার দানবীয় পাপ—মহাবিচারক তাকে ক্ষমা করবেন না সেদিন।

কিন্তু উৎপলা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে; অসংখ্য শিশুকে সে বাঁচাবে। অসংখ্য মাতাকে সে এই মহাপাপ থেকে রক্ষা করবে। মহাকাল কি তার জন্য কোনো পুরস্কারই দেবেন না উৎপলাকে?

লজ্জায় হেঁটমাথা করেই এ কয়দিন কাটাচ্ছে আলোকনাথ। সমস্তক্ষণ ঝুননীর রোগশয্যা-পাশে বসে থাকা, তাকে ওষুধ খাওয়ানো এবং তার জন্য অতিকষ্টে সংগৃহীত সামান্য ফলমূলের সিংহভাব গ্রহণ করে সবল সুস্থ জীবনকে রক্ষা করা নিশ্চয়ই লজ্জার বিষয়। ঝুমনীর খাদ্যে ভাগ বসাতে ওর কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই, কিন্তু এদের আনীত অন্য কোন খাদ্যই সে গ্রহণ করতে পারে না। জীবন-রুদ্রের এই মহাসাধনায় আলোক বুভুক্ষা-সিদ্ধ হতে তো পারলোই না, গলিত-গন্ধযুক্ত বা উচ্ছিষ্ট খাওয়াতেও সিদ্ধ হোল না। নওলকিশোরের দল ওকে কৃপার চক্ষে দেখে, আর বলে—ভদ্দর আদমী, আপ্ কভি ইয়ে চিজ্ খানে নাহি সেকেগা। ওহি-ফল-উল থোড়া খা জাইয়ে।

লজ্জায় মাথাটা আরো নুয়ে পড়ে আলোকের। নিজের পরিধেয় বস্ত্রের মালিন্য চোখে পড়ে; জীর্ণতা ওকে জানিয়ে দেয়, রাস্তার ভিক্ষুকের

পর্য্যায়ে সে নেমে গেছে; ওদের ছিন্নকন্থার আবরণে আর দুর্গন্ধময় আবেষ্টনে আলোক বারবার অনুভব করে, রুদ্রের সাধনায় সে ব্রতী হয়েছে। কিন্তু কবে সিদ্ধিলাভ হবে তার? সেদিন জোর করে এক টুকরো লুচি খেয়েই সে বমি করে ফেললো, পেটে যন্ত্রণা হতে লাগল তার। অতি কষ্টে সামলে সে কিশোরকে বললো,

—আজ তো ঝুমনী কিছু ভাল আছে, আমি একটু বাইরে গিয়ে দেখি, যদি কিছু হয়।

কিশোরের দল আবাহন বা বিসর্জ্জনের কোনো মন্ত্রই জানে না। ওরা শুধু বলল—বহুৎ আচ্ছা!

আলোক বেরিয়ে পড়লো, হাতে ছেঁড়া গামছায় বাঁধা তিনখানা বই নিয়ে। এই বই ক'খানিই তার পরম সম্পদ। এদের সে একদণ্ডের জন্যও ছাড়ে না! ঝুমনীর শয্যা-শিয়রে এরা ওর মনের খোরাক যুগিয়েছে, এবং রাত্রে উপাধানের কাজ করেছে। আলোক বেরিয়েই কিন্তু বুঝলো, পথচারীরা ওকে ভিখারীরও অধম মনে করছে, এড়িয়ে চল্‌ছে, যেন অস্পৃশ্য, অশুচী, কুৎসিৎ রোগগ্রস্থ মানুষ ও!

একটা কলের জলে হাতমুখ ধুলো, মাথার চুলগুলো জল দিয়ে একটু বসিয়ে নিল, তারপর আবার চললো। কিন্তু কোথায় যাবে? পথের খাবার কুড়িয়ে সে এখন খেতে পারে, কারণ এখন আর সে ভদ্র নেই, লজ্জার বালাই নেই আর, কিন্তু রুচি যে হচ্ছে না! মুখের কাছে ধরলেই মনে পড়ে যায় হাজার রোগের বীজাণুর কথা,—হাজার রকম কদর্য্যতার কথা। অথচ খিদেতে আলোকের নাড়ীগুলো পর্য্যন্ত জ্বলছে। মহা-বুভুক্ষার এই তো অনলশিখা,—এই তো রুদ্রের হোমানল! যে-কোন দ্রব্য এতে আহুতি দেওয়া যেতে পারে—বিষ্ঠা পর্য্যন্ত! কিন্তু আলোকের মন সাধনার ততখানি উচ্চস্তরে কেন উঠছে না! উঠছে না কেন?

রাগ হয়ে গেল আলোকের নিজের উপর। সে ঐ আগুনকে আরো জ্বলতে দেবে, আরো প্রবল করে দেবে, তার পর যা-কিছু হাতের কাছে পাবে, তাই দেবে ওতে আহুতি। আলোক হন্‌হন্‌ করে চলতে লাগল। মিশন রো—ডালহাউসী স্কোয়ার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্‌, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্‌—ক্রমাগত ঘুরছে আলোক—ঘুরছে; খাবারের গন্ধ নাকে লাগে, যেন অমৃতের আস্বাদ মনে হয়—চোখে দেখলে মনে হয়, সে স্বর্গের পথে চলতে চলতে উর্ব্বশী-মেনকাকে দেখছে! ওঃ! খাবারের মধ্যে এতো রূপ আর এতো রস আছে, কে জানতো! কিন্তু ওসব দেবভোগ্য বস্তু, আলোকের পুণ্যফলে শুধু দর্শনটুকুই দান করছে, আর ঘ্রাণ। ভোগের অধিকার নেই আলোকের। ঐ দুর্ব্বার ভোগস্পৃহাকে জয় করে আলোক রুদ্রের সাধনা করবে—ডাষ্টবীনের খাবার কুড়িয়ে খাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ডাষ্টবীনগুলো শূন্য না হলেও খড়কুটো আর ভাঙ্গা কাচের টুকরোতে ভর্ত্তি! খাদ্যকণাও নেই; কুড়ি পঁচিশটা ডাষ্টবীন খুঁজেও আলোক কিছুই পেল না। ডাষ্টবীনের উপরে চৌকোনা ফ্রেমের গায়ে সুন্দর সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে সে সুন্দরী সিনেমা তারকার সুন্দর মুখের ছবিতে থুতু ফেলতে গেল……গলা শুকিয়ে গেছে; লালারস বেরুলো না।

আবার হাঁটছে আলোক, ভাবছে, কেন সে থুতু ফেলতে গিয়েছিল ঐ ছবিটাতে এখুনি? এ কোন্‌ ধরণের মনোবৃত্তি? তার সাধনার অনুকূল না প্রতিকূল এই প্রয়াস? ঐ সিনেমা তারকার উপর তার রাগ না বিরাগের চিহ্ন ওটা? ঐ তারকাটি মানুষকে অভিনয়-রস পরিবেশন করে, বেশ আছে; খায়, শোয়, ঘুমোয় আপন সুকোমল শয্যাতলে। জীবনকে ওরা রুদ্রের প্রলয়ালোকে দেখতে পায়নি; ওরা জীবন-দেবতার নিষ্করুণ ভ্রূকুটির অগ্নিময় পথ চেনে না—ওরা আনন্দের পথে, আরামের পথে যাত্রা করেছে কোন্‌ দেবতার সাধনার জন্য, কে বলতে পারে! কিম্বা ওদের পথও এমন কঠিন, বন্ধুর, ভ্রূকুটি কুটিল, অগ্নিক্ষরা পথ? ওদের উপর

ঈর্ষা পোষণ করবার কোনো কারণই আলোকের নাই।—হয়তো ওরা আলোকের থেকেও ভয়ঙ্কর পথের যাত্রী···রুদ্রের পথের পথিক!—আলোক ফিরে গিয়ে সেই ডাষ্টবীনটার কাছে আবার দাঁড়ালো। ছেঁড়া গামছার কোণা দিয়ে মুছে দিল ছবির ধূলোগুলো। বেশ সুন্দর মুখ মেয়েটির, অবন্তীর মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে যেন। আলোক একটা চুমা দিতে গেল ছবির মুখে,—তৎক্ষণাৎ হেসে উঠলো আপনার মনে। তার অন্তরের এই চুম্বন-স্পৃহার দেবতা কে? কে এই আকাঙ্ক্ষার প্রেরয়িতা! তিনিও কি রুদ্র? আশ্চর্য্য! প্রায় তিনদিন উপবাসী, অনিদ্রায় অবসন্ন একজন পথের ভিক্ষুকের প্রাণেও সুন্দর মুখে চুম্বন-পিপাসা উদগ্র হয়? এর থেকে বেশি আশ্চর্য্য কী আছে আর? এ কোন্ দেবতার লীলা?—মনে পড়ে গেল,—

'পঞ্চশরে দগ্ধ করে
করেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছে তারে ছড়ায়ে—।'

ইনি রুদ্র নন—রুদ্রকোপানলে ভস্মীভূত পঞ্চশর। আলোকের উপাস্ত দেবতা রুদ্র—পঞ্চশরের সান্নিধ্যে এসে আলোক তার উপাস্তের অবমাননা করবে না। আলোক আবার ত্বরিতপদে হাঁটতে লাগলো! ইডেনগার্ডেন সংলগ্ন বড়লোকদের একটা ক্লাব—আলোক দেখতে পেল, একঝুড়ি আবর্জনা ফেলে দিয়ে গেল কাছের ডাষ্টবীনটায়। সে গিয়ে হাঁটকাতে লাগলো। একটা জ্যামের ভাঙা টিন। ওর ভিতর কিঞ্চিৎ জ্যাম আছে নিশ্চয়—সাগ্রহে কুড়িয়ে নিয়ে আলোক গঙ্গার ধারে এলো। একটা কাঠি কুড়িয়ে টিনের ভেতর থেকে বের করলো এক ড্যালা জ্যাম; কালো বিশ্রী,—নির্ব্বিচারে সেটুকু মুখে পুরে দিল আলোক, রুদ্র-দেবতার ক্ষুধানলে পরমাহুতি। কিন্তু হায়রে, অনভ্যস্ত দেবতা গ্রহণ করলেন না সেই হবি। দুর্গন্ধে নাড়ী পর্য্যন্ত মোচড় দিয়ে উঠলো আলোকের—পেট

কিছু নাই বলে বমি তার হোল না, কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণায় আলোক বসে পড়লো জলের ধারে। প্রায় পনর মিনিট লাগলো তার সামলাতে!

এই সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করবে? অসম্ভব! নিজের উপর নিদারুণ ঘৃণায় আর ক্রোধে অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠলো ওর! নাঃ, এ সাধনা সে ত্যাগ করবে—এখুনি! দেখতে পেল, অল্প দূরে বাঁধানো ঘাটে একজন লোক শ্রাদ্ধ করছে; মন্ত্র পড়াচ্ছে পুরোহিত! আলোক আস্তে হেঁটে এসে দাঁড়ালো ওখানে। শুনতে লাগল মন্ত্র:—

'ওঁ নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া—'

আমাদের শ্রাদ্ধে তাহলে নিরাহার, পাপী, ধার্ম্মিক সকলের জন্যই ব্যবস্থা ছিল—বাঃ! আবার শুনতে লাগলো:—

'ওঁ যে বান্ধবা বান্ধবাঃ বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥
অতীত কুলকোটিনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥'

এতো এতো সুন্দর ব্যবস্থা ছিল ভারতের ঋষিযুগে! আজো তার ভগ্নাবশেষ এই সব মন্ত্রে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—অতীতের কোটিকুল, সপ্তদ্বীপের অধিবাসী, পাপী, ধার্ম্মিক সকলের খাদ্যের জন্যই চিন্তা করতো যে ভারত-সন্তান, তারা আজ নিজের উদর পূরণের ব্যবস্থা করতে একান্ত অক্ষম। সোনার দেশ শোষিত হতে হতে সীসকে পরিণত হয়েছে। সীসকে নাকি বিষ আছে—সে-বিষ মানুষকে কুষ্ঠগ্রস্থ করে। সেই কুষ্ঠই হয়েছে আজ! সীসার অক্ষর সাজিয়ে সাজিয়ে চলছে আজ মিথ্যার প্রপ্যাগেণ্ডা। সত্যস্বরূপ শব্দব্রহ্ম বন্দী হয়েছেন তেল-কালির কদর্য্য প্রচার পত্রে—তাই 'মাদার ইণ্ডিয়া'র আবির্ভাব ঘটে, জনযুদ্ধের জয়-শঙ্খ বাজে এবং কালোবাজার মানুষের মৃত্যু-পথ আলো করতে পারে। পারে

আরো অনেক কিছুই করতে ; এই সীসক বড়ই সাংঘাতিক বস্তু—কিন্তু আলোক ভাববার সময় পেল না—শ্রাদ্ধকারী প্রণাম সেরে উঠে গেলেন। কয়েকটা কাক পরিত্যক্ত পিণ্ডকণার লোভে এসে বসেছিল, আলোকও ছিল সেই আশায়, কিন্তু আশ্চর্য্য, লোকটা সব পিণ্ডগুলো গুটিয়ে গঙ্গার কাদাজলে ফেলে দিলেন। কাকরা তাও খাবে—আলোক যদি কাক হতে পারতো!

কিন্তু কাক, চিল বা শৃগাল হওয়া তো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন নয়? আলোক প্রশ্ন করলো নিজকে ধমক দিয়ে উচ্চৈস্বরে। গঙ্গার হাওয়ায় ওর গলার আওয়াজটা ধ্বনিত হয়ে উঠলো 'ক্যাহুয়া' রবে। দিনে দুপুরে শৃগাল ডাকছে ভেবে পুরোহিত ঠাকুর এদিক-ওদিক চাইছেন নাকি? আলোক হাসলো। গলার আওয়াজটা ওকে শৃগালের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছে, পেটের খিদেটা কেনই বা পারবে না ওকে শৃগালে পরিণত করতে! মানুষ মৃত শবদেহ ভক্ষণ করে, মূত্র-বিষ্ঠাও হয়তো ভক্ষণ করে;—বামাচারী কাপালিক, পশ্বাচারী তান্ত্রিক, পিশাচ-সাধক পৈশাচিক তো এই ভাবেই রুদ্রের সাধনায় রত থাকেন—সাধনায় সিদ্ধিও লাভ করেন তাঁরা—আলোকও করবে!

কাদা থেকে কুড়িয়ে কয়েকটা তণ্ডুলকণা সংগ্রহ করলো সে—ধুলো জলে বেশ করে, তারপর খাবে—এই খাদ্যে তারও অংশ আছে,—'নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ—' যে নিরাহার, তার জন্যও এই খাদ্য নিবেদিত হয়েছে—আলোক চালের দানাগুলি মুখে দিল। চিবুচ্ছে সেই তোলা-খানেক চাল—শ্রাদ্ধকারী ভদ্রলোক ওর কাণ্ড দেখে একটা ডবল পয়সা ছুড়ে দিয়ে চলে গেলেন—বাঃ! আলোক কুড়িয়ে নিল, যেন সিদ্ধিই

লাভ করেছে সে এমনি আগ্রহভরে। মুখের কাদামাখা চালগুলো আর রুচি হোল না—থু থু করে ফেলে দিয়ে সে সটান চলে এলো কিছু কিনতে। দুই পয়সায় কি আর কিছু কেনা যায় আজ কাল? চানা ভাজা কিম্বা ছাতু কিম্বা বাদাম ভাজা পাওয়া যেতে পারে; আলোক কোনটা কিনবে?

ভাবতে ভাবতে ডালহাউসীর জেনারেল পোষ্টাফিসের কাছে লালদীঘিতে এসে পড়লো। আনারস কাটতে কাটতে ফিরিওয়ালা তার পাতা-শুদ্ধ মাথাটা দিল ফেলে, আলোক টপ্ করে কুড়িয়ে নিল। বেশ রুচিকর খাদ্য; যতটুকু ছিল তাতে আনারস, আলোক পরমানন্দে তাই খেল একখানা বেঞ্চে বসে বসে! পয়সা দুটো জমাই থেকে গেল এবেলা।—শুয়ে পড়লো বেঞ্চে।

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়—ঘুম ভেঙে উঠে বসলো আলোক! গামছা বাঁধা বই কখান মাথায় দিয়ে শুয়েছিল, সেইটি কোলে নিয়ে বসলো—বেশ লাগছে। একটি বৃদ্ধ আসছে এই দিকে; লম্বা, শিটকে মত, দাঁতগুলো প্রায় পড়ে গেছে, বয়স অন্ততঃ পঞ্চাশ—পরণে বেয়ারার কোট্—বুকে কোম্পানীর নাম লেখা।

—দেশলাই আছে হে?—প্রশ্ন করলো আলোককে!

—না!

—নাঃ—কেন? বিড়ি খাও না?

—না!

—ওঃ! সিগরেট খাও তো? লাটের জামাই—দাও শালাইটা দাও একবার—বলে লোকটা আধপোড়া বিড়ি বার করলো একটা। আলোক অবাক হয়ে বললো আবার—বলছি তো, দেশালাই নাই! পেটে ভাত যোটে না, আবার সিগরেট—হুঁ!

—তাই নাকি! তুমি তো আমার স্বগোত্র দেখছি! কদ্দুর পড়েছো! বি, এ?

আলোক চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। লোকটি আবার শুধুলো —এম্-এ—?

—হ্যাঁ—কিন্তু পড়া দিয়ে কি হবে? চাকরী আমি খুঁজছি না। আমি দেখতে চাই, এই দেশের মানুষের জীবন ক্ষুধা-রুদ্রের সাধনার পথে কতখানি এগিয়েছে!

—বটে—বটে!—মাথাটা সারাদিনের খাটুনিতে বেশ পরিষ্কার নেই ভায়া—তোমার কথাটা বুঝতে পারতাম যদি একটান ধোঁয়া পেটে পড়তো—চলো না, ঐ দিক পানে দেখি!

আলোকের হাত ধরে সে উঠালো—আলোকও উঠলো। লোকটি আবার বলল,—ক'দিন খাওনি?

—দিন তিনেক হবে।

—মাত্তর? তাহলে এই সবে আরম্ভ! আচ্ছা, এসো!

লোকটি হাঁটতে লাগলো—আলোক চলছে ওর পাশে। একটা বিড়ির দোকানের গায়ে ন্যারকেলের দড়িজ্বলা আগুনে আধপোড়া বিড়ি ধরিয়ে লোকটি বললো—আমি চক্কোর্ত্তি—জাতে ব্রাহ্মণ, বয়সে বড়ো এবং রোজগারে ষোল টাকা সওয়া বারো আনার লোক—তোমাকে 'তুমি' বলে ডাকবার আমার অধিকার আছে—কেমন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!—আলোক সবিনয়ে জানালো হেসেই। নিশ্চয় 'তুমি' বলবেন।

—চোদ্দ সালের জেল, তারপর আবার একুশ সালে, তার পর তৃতীয় দফায় একত্রিশ সালে ঘুরে এলাম—তখন গান্ধীজীর নন্‌কো-আন্দোলন কিঞ্চিৎ থিতিয়ে এসেছে—আর কলকাতা কর্পোরেশনে জেলফেরত লোকদের চাকরী হচ্ছে। শরীরটা প্রায় ভেঙে এসেছিল—দেশসেবার পুরস্কার স্বরূপ ভাল চাকরা একটা পেয়ে যেতে পারি, ভেবে ধরণা দিলাম সেঁথানে। চাকরীটা আমার নিশ্চয়ই হবে—সামান্য বেয়ারাগিরি চাকরী—

কারণ আমার বিদ্যে তখনকার সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত ; কিন্তু হোল না—সে চাকরী হোল সেই ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবুর শালার চাকরের সম্বন্ধীর ছোট ভাইয়ের ; কর্ত্তাদের জয়গান করে বেরিয়ে এলাম। তারপর পুরো সাতটি দিন কলের জল আর কুকুরের খাদ্যের অংশ কেড়ে কেটে গেল। অষ্টম দিনে এক বিলিতি কোম্পানীর অফিসের সামনে বাবুদের জন্য বয়ে নিয়ে যাওয়া টিফিনের মিছিল দেখছি, জিভ্ দিয়ে জল পড়ছিল কি না, মনে নাই—হঠাৎ একজন বেয়ারা—সেখানকার হেড্ জমাদার—সদয় হয়ে বললো—নোকরী মাংতা হ্যায় ?

—হ্যাঁ জি !—বলতেই সে আমাকে বড়বাবুর কাছে নিয়ে গেল। বললাম, লেখাপড়া মাত্র নামসই জানি—জেল ঘোরার কথা বললাম না—দেশসেবার পুরস্কার এদেশে ঘৃণা-লাঞ্ছনা—এই কদিন ঘুরেই সেটা চিনেছিলাম ! চাকরী হোল ; বাবুদের টিফিন বয়ে আনা, চা দেওয়া, তামাক সাজা, আর খোসামুদী করা। মাইনে সাড়ে সাত টাকা। যুদ্ধের বাজারে সেই মাইনে, মাগ্‌গি ভাতা ইদ্যাদিতে ষোল টাকা স' বারো আনায় উঠেছে—প্রায় ষোল বছর হোল !

আলোক অবাক হয়ে শুনছিল ! বহুবাজারের একটা গলিতে পৌঁছালো ওরা ! দোতালা বাড়ীর নীচে মোটর গ্যারেজ। মোটরও আছে, তার পাশেই হাত দুই খালি জায়গায় একখানি চ্যাটাই—, তেলচিটে একটি বালিশ।

—বসো ভাই—বলেই লোকটি বেরিয়ে গেল ! পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাটির ভাঁড়ে এক ভাঁড় জল এনে বলল—হাতমুখ ধোও। আমি চা আনি। আমার এখানে সব সাত্তিক বস্তু ভাই ; সব দেশী এবং খাঁটী মাটি মার দান। মাটির গেলাস-বাটি আর গাছের পাতা আমার আসবাব ! সব সাত্তিক !

নিঃশব্দে হেসে আলোক মুখটা ধুলো।—চক্কোর্ত্তি ইতিমধ্যে বাইরে দুখানা

ইট-পাতা উনুনে মাটির একটা মালসা বসিয়ে দিয়েছে—কাঠের কুচোর জ্বাল দিচ্ছে জলে। চা হোল, কাছের দোকান থেকে দু' পয়সার মুড়ি এনে তার অর্দ্ধেক আলোকের হাতের মুঠিতে দিয়ে চক্কোর্ত্তি বললো—পান করো—'সঙ্গে আছে সুধার পাত্র, অল্প কিছু আহার মাত্র—আর একখানি…'

—'ছন্দ মধুর' নয়, রুদ্রছন্দের কাব্য আছে আমার কাছে—আলোক চায়ের খুরিটা হাতে নিতে নিতে বললো—সে কাব্য জীবনের যন্ত্রণায় করুণ নয়, জীবনের সাধনায় কঠোর—তীক্ষ্ণ তরবারির মত! তামাক সাজার বেয়ারা হয়ে আমি বাঁচতে চাইনে চক্কোর্ত্তিদা—আমি বাঁচতে চাই তিক্ততার হলাহল পান করে—নীলকণ্ঠই আমার উপাস্য—বিষ এবং অমৃত যাঁর কাছে সমান।

—কথাগুলো তো তোর খুব বড় বড়!—কিন্তু শোন্—মানুষের জীবন বন্দী। বড্ড বেশী রকম বন্দী মানুষের জীবন—আচারে-বিচারে-ব্যবহারে শুধু নয়—মানুষের জীবনটা বন্দী তার মনুষ্যত্ববোধের কাছেই। এই বোধটাকে যদি ঘুচাতে পারিস, তবেই হবে রুদ্রের সাধনা। কিন্তু জীবন শুধুই ধ্বংসের রুদ্রই নন, তিনি সৃষ্টিরও শিব—তাই মহাশ্মশানের গলিত শব থেকেও শিবা-শকুনের উদর-অনল আহুতি পায়—পালিত হয়। শিব সেই বোধকে অন্তর্মুখীন করে বাহিরে শববৎ সুপ্ত থাকেন! সে সাধনা বড় কঠোর—চক্রবর্ত্তীদার কথায় যেন কোন্ মহাসাধকের সিদ্ধমন্ত্র!

আলোক কোনো কথা বলতে পারলো না। চক্কোর্ত্তিও আর কিছু না বলে চা খেল! তারপর বাইরে চলে গেল। আলোক বসে বসে চক্কোর্ত্তির কথাগুলোই ভাবছে। খিদের কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করেছে চা খেয়ে—চোখ বুজে শুয়ে রইল। কখন ঘুম ধরেছে চোখে। গভীর রাত্রি, চক্কোর্ত্তি ডাক দিয়ে বল্‌ল—ওঠ, খাবি নে?

আলু, কাঁচকলা আর পেঁয়াজ দিয়ে চালে-ডালে খিচুড়ী, লঙ্কার ঝালে আর হলুদ-না-দেওয়া সাদাটে রংএ তার আস্বাদ চমৎকার খুলেছে, যেন অমৃত। আলোক গো-গ্রাসে গিল্‌লো কয়েকবার। চক্কোত্তি ওর পানে চেয়ে বল্‌লো—'ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাং'—তিনি সকল প্রাণীতে ক্ষুধা রূপে বিরাজ করছেন। ক্ষুধারূপিণী সেই পরমাদেবী মানুষকে বিশেষ করেছেন চৈনন্যবুদ্ধি দিয়ে—নইলে কুকুর-শেয়াল-কাক-চিল থেকে আমরা তফাৎ কিসে?

—হুঁ! আজই গঙ্গার ধারে ঐ কথাটা ভেবেছিলাম আমি—আলোক বললো। —কিন্তু আমরা কি সাধনার দ্বারা অর্থাৎ খিদের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে কাক চিলের মত খেতে অভ্যস্ত হতে পারি নে দাদা? আমার মনে হয়, পারি।

—পারি—কিন্তু মনুষ্যত্ববোধকে বিসর্জ্জন দিয়ে তবে পারি। কিন্তু তার তো কিছু প্রয়োজন নেই। বরং তাতে প্রত্যবায় আছে। মানুষের জীবনকে মানুষের মত করেই বাঁচতে হবে—নইলে তুমি শেয়াল না হয়ে মানুষ হলে কেন? মানুষের মত মনুষ্যত্ববোধকে অবিকৃত রেখেই বাঁচাতে হবে নিজকে; চুরি করবে না, মিথ্যার আশ্রয় নেবে না—এগুলো খুবই সাধারণ কথা, কিন্তু এগুলো না পালন করলে তোমার মনুষ্যত্ববোধ ক্ষুণ্ণ হয়। এগুলো ক্ষুণ্ণ না করে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে যদি তুমি মরে যাও, তাহলেও রুদ্রদেবতার বিচারশালায় তুমি বলতে পারবে, 'প্রভু, তোমার দেওয়া মনুষ্যত্ববোধের কোনো বৃত্তিরই আমি অবমাননা করিনি'।

আলোক চুপ করে খেতে লাগলো। এই বয়োবৃদ্ধ এবং দুঃখে অভিজ্ঞ ব্যক্তিটির অহেতুক করুণার জন্য সে আজ সত্যি কৃতজ্ঞ। ষোল টাকা স'বারো আনার বেয়ারার মধ্যে সুমহান মনুষ্যত্বের এমন বিশাল বটবৃক্ষবীজ কিরূপে লুকিয়ে থাকতে পারে, সে ভেবে পাচ্ছে না। চক্কোত্তি ওর পানে চেয়ে আবার বল্‌লো—চাকরী প্রায় চৌদ্দ বছর করছি। এই বাড়ী

আমাদের অফিসের বড় বাবুর। ওঁরা তিন পুরুষ ধরে বড়-বাবুগিরি করছেন ঐ অফিসে—বনেদী বড় বাবুর জাত। ওঁর মা-বুড়ি সেই প্রথম দিনটি থেকেই আমাকে 'চক্কোত্তি' বলে ডাকেন। এই গ্যারেজের আশ্রয়টুকু দিয়েছেন থাকতে, আলু-পটল-কলাও দেন মাঝে মধ্যে। নইলে আমার মাইনেতে বেঁচে থাকা অসম্ভব হোত। বিনিময়ে আমি ওঁদের বাজার-হাট করে দেই দু' একদিন।

—আত্মীয় কি কেউ নেই আপনার ?

—আছে! তার জন্যই ভাবনা। বাপ মা প্রায় বালক বয়সেই গেছেন! মানুষ করলেন পিসিমা। দুঃখ-ধান্দা করেও সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়ালেন—তারপর অসহযোগ করে জেলে গেলাম, ফিরে দেখি পিসিমা বেঁচেই আছেন। দ্বিতীয় বার জেল-ফেরৎ দেখি তখনো তিনি বেঁচে—তৃতীয় বার দেখলাম, বেঁচে আছেন, তবে জীবন্মৃত। চোখ দুটি নষ্ট হয়ে গেছে। এখনো তিনি আছেন, কাশীতে রয়েছেন—মাসে দশ টাকা, বারো টাকা পাঠাতে হয়।

—তারপর আপনার থাকে কি চক্কোত্তিদা?—আলোক সবিস্ময়ে শুধুলো।

—থাকি আমি এবং আমার সত্যনিষ্ঠা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, মনুষ্যত্ববোধ। জীবনের রুদ্রসাধনায় এই আমার সহায়-সম্বল। কিন্তু আমি ভাল করে জেনেছি, এর বড়ো সম্বল আর নেই।

কথার রেশ যেন ছোট ঘরটায় গম্‌গম্ করতে লাগলো। নির্ব্বাক আলোক এই দীনতম ব্রাহ্মণের আশ্চর্য্য মানবতার কথা চিন্তা করে স্তব্ধ হয়ে রইল অনেকক্ষণ। চক্কোত্তি—হাত ধোও—বলে ওকে তাড়া দিল। তারপর সেই ছেঁড়া মাদুরে ওকে কোলের কাছে টেনে শুইয়ে নিজের ছেঁড়া কাপড় ঢাকা দিয়ে বলল—ঘুমো, কোনো ভয় নেই।

কয়েকদিন রাত জাগার জন্য ঘুম যেন জমা হয়েছিল আলোকের

চোখে ; ঘুমিয়ে গেল। উঠলো ভোরে। চক্কোর্ত্তি তারও আগে উঠে চা তৈরী করেছে। আলোককে হাতমুখ ধুতে বল্‌ল, তারপর চা এবং মুড়ি খাইয়ে বল্‌ল—ভাইটি, তিনদিন তুই না খেয়ে ছিলি, কাল তোকে যৎকিঞ্চিৎ খাওয়ালাম, আর আমার সম্বল নেই। এবার পথে নাম্। আবার যদি কখনো একাদিক্রমে তিনদিন উপোস থাস, তাহলে তোর দাদার এই দরজা খোলা রইল—নির্ভয়ে ঢুকে পড়িস্! আমার ভাণ্ডার আজ শূন্য হয়ে গেছে।

উদার এই মানুষটির মুখের পানে চেয়ে আলোকের চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো। আভূমি নত হয়ে ওঁর পদধূলি নিয়ে বল্‌লো আলোক—মনুষ্যত্বের মহাসাধনায় তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ দাদা। আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার একরাত্রির আতিথ্যের মর্য্যাদা আমি রাখতে পারি!

রাত্রে ভাল করেই খেয়েছিল আলোক—পকেটে দুটো পয়সা জমাও আছে, অতএব খাদ্য-প্রচেষ্টা ত্যাগ করে হাঁটতে হাঁটতে এলো গোলদীঘির ধারে। সামনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট প্রাসাদ—চেয়ে চেয়ে দেখলো কিছুক্ষণ ; জনৈক ভদ্রলোক খবরের কাগজ পাঠ করছিলেন ; আলোকের ইচ্ছা, মোটা হরপের খবরগুলো অন্ততঃ পড়ে নেবে, কিন্তু ওর নোংরা পরিচ্ছদ আর হয়তো গায়ের দুর্গন্ধ পেয়েই ভদ্রলোক কঠোর দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে উঠে চলে গেলেন। কাগজ পড়ার সখটায় রূঢ় ধাক্কা লাগলো আলোকের। পয়সা দুটো দিয়ে কাগজ একখানা কিনেই ফেলবে নাকি? কিন্তু দু'পয়সায় আজকাল কোনো কাগজই পাওয়া যায় না। বেঞ্চিটায় বসে পড়লো হতাশভাবে।

শ্রীকাঞ্চনী মুখোপাধ্যায়

পেটের খিদে থেকে মনের খিদে কিছু কম নয়, অবশ্য যার মনের খিদে জেগেছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরতলায় আছে বিরাট গ্রন্থাগার, আলোক একদিন তার ভোজে নিত্য অতিথি হোত—মনের খিদে মিটিয়ে নিত ঐখানে।

সেই সুখের দিনের চিন্তা করতে গিয়ে আলোকের মনে পড়ে গেল মা'র কথা—যে মা অনন্ত দুঃখ-যাতনা সহ্য করেও তাকে ঐ বিরাট বাড়ীটার সর্ব্বোচ্চ কোঠায় তুলেছিলেন! তিনি আজ নেই!—কিন্তু নেই কেন? তাঁর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি চিণ্ময়ী হয়ে অধিষ্ঠিতা আছে আলোকের অন্তরে—আছে এই শ্যামা ধরিত্রীর প্রতি শষ্পে, আছে এই জন্মভূমির প্রতি পরমাণুতে। রুদ্রের সাধনপথে আলোক যে দেহ লাভ করেছে সেই দেবীর কাছ থেকে, সেই দেহ এই মৃণ্ময়ী মাতৃভূমির মুক্তিসাধনায় উৎসর্গ করবে—চিণ্ময়ী জন্মভূমির পূজায় আহুতি দেবে!

উচ্ছ্বসিত আলোক উঠে পড়লো—কোথায় যাবে, ঠিক নেই। ওদিকে বেলা মধ্যাহ্ন। বর্ষার শেষ, শরৎ আগতপ্রায়। প্রকাণ্ড দিনটা কাটাতে একটা আস্তানার একান্ত প্রয়োজন মানুষের। কিন্তু আলোক কিশোরের আস্তানায় খালি-হাতে আর যেতে চায় না—পথে পথে ঘুরতে লাগলো—দেখতে লাগলো পথচারীদের। এমনি করে সায়াহ্ন নেমে এলো আকাশের বুকে। বৃষ্টি নামলো সজোরে; আলোক নিজকে সম্বৃত করে দেখলো, চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে সে দাঁড়িয়ে। অপর্ণার আস্তানাটা কাছেই। যাই না একবার, দেখে আসি—ভেবে এগিয়ে এল। দেখলো, অপর্ণা সেই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে ছেলে কোলে বসে আছে; সুন্দর সাদা তোয়ালে ঢাকা খোকা হাসছে।

রুক্ষ চুল, ময়লা কাপড়, দাড়ী গোঁফে ভর্ত্তি মুখ—অপর্ণা প্রথমটা চিনতে পারে নি, কিন্তু চিনলো অল্প পরেই।

—এসো দাদাবাবু-এসো—সাদর আহ্বান জানালো অপর্ণা। বাইরে

বৃষ্টি। আলোক ভিজে গেছে: আস্তে ঢুকলো সে ঘরটার ভিতর। কেরসীনের ডিবে জ্বলছে ঘরের মধ্যে। সেই আলোকে আলোক দেখলো ঘরের শ্রী-শৃঙ্খলা চমৎকার! এরাই গৃহলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী, কল্যাণলক্ষ্মী! কয়েকটি ছোট কাঁথা দড়িতে শুকুচ্ছে। একখানা ছেড়া পরিষ্কার শাড়ীও শুকুচ্ছে অপর্ণার। ভাঙ্গা টিন আর বোতলে কি-সব খাদ্যদ্রব্য। বাঃ! বেশ গৃহস্থালী গুছিয়ে নিয়েছে তো অপর্ণা! আলোক বসতে বসতে প্রশ্ন করলো,—দু'পয়সা আসছে তাহলে—কেমন?

কথাটায় কদর্য্য ইঙ্গিত থাকতে পারে। অর্পণা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে আস্তে বলল,—খোকাকে নিয়ে গেরস্তের বাড়ীতে গেলেই কিছু কিছু পাই দাদাবাবু। ছেলের মা যারা, তারা দেয়। এই দামী তোয়ালেটা সেদিন একটি মেয়ে দিয়েছে—ঐ কাঁথাটা দিল কাল একজন মেয়ে। আজ এই আধবোতল হরলিক্ পেয়েছি একটি মেয়ের কাছে।

—রান্নার কি ব্যবস্থা কর?—আলোক নিজের প্রশ্নটার কদর্য্যতা প্রচ্ছন্ন করবার জন্যই আত্মীয়তায় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো—তোমার শরীর তো খুব ভাল দেখছি না অপু!

—না—শরীর ভালই আছে দাদাবাবু? একবেলা রাঁধি, রাত্তিরে! এখুনি রাঁধবো। হ্যাঁ, কিশোর কেমন আছে দাদাবাবু? পাঁচ-ছ'দিন আসে নাই। ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ—ঝুমনীর জ্বর, তাই আসতে পারে নি। কিশোর তোমাকে রোজ দেখতে আসে?

—হুঁ, রোজ না, একদিন অন্তর আসে! ঐ তো আমাকে ভিক্ষে করার কায়দা শিখিয়ে দিল—এই ডিবেটাও ঐ-ই এনে দিয়েছে। বড্ড ভাল ছেলে কিশোর।

আলোক কথা না বলে চুপ করে রইল!

জীবনের এই অতি নিম্নস্তরে মনুষ্যত্বের যে পরিপূর্ণ বিকাশ সে লক্ষ্য

করছে, ইউনির্ভাসিটির মাষ্টার অব্ আর্টস্ হবার গ্রন্থেও সে তার খবর জানতো না। কিশোর এবং চক্কোর্ত্তিদা—আরো কত আছে—কে জানে! জীবন-সাধনার অতি নিম্ন স্তরে থেকেও মানুষ মানুষই থাকে—আবার অতি উচ্চ স্তরে থেকেও অমানুষ হয়ে যায়। জীবনের রুদ্র কোথাও শিব, কোথাও সাপ—আশ্চর্য্য!

উচ্ছৃঙ্খল জীবনটাকে এই কয়দিনেই শান্ত-সংযত করে এনেছে সিদ্ধেশ্বর। কর্ণবিজয় এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতার প্রভাব ছাড়াও তার শালগ্রাম-নুড়ির কৃতিত্ব এবিষয়ে কম নয়। নিজকে বাসনা-কামনা শূন্য কর্ম্ম-যোগী মনে করে সিদ্ধেশ্বর বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল। শালগ্রাম-পূজায় বসে সে এখন প্রায় এক প্রহর কাল অর্থাৎ পুরো তিনটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। ধ্যান এবং ধারণা সম্বন্ধে ওর গুরুভ্রাতাদের কিছু মাত্র জ্ঞান নেই, পূজার ব্যাপারও তারা কিছুই জানে না—কিন্তু হিন্দুর সহজাত সংস্কারবশে সকলেই ওর পূজাকে শ্রদ্ধা করে এবং ওকেও ভালবাসে। কর্ণবিজয় মাঝে মাঝে বলেন—হিরণ্ময়বপু শঙ্খচক্রধারী শ্রীভগবানের আবির্ভাব যাতে অবিলম্বে হয়, তারই প্রার্থনা করো সিধু। তিনি এসে এই বিরাট দেশটার সমস্ত ভেদ-বিভেদ-বিদ্বেষ দূর করে দিন! আর একবার পাঞ্চজন্য বাজিয়ে বলুন 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় পরোধর্ম্ম ভয়াবহ।'

সিধু উৎসাহ পায়—উদ্দীপিত হয়। সরলপ্রাণে কর্ণবিজয়কে প্রশ্ন করে—স্বধর্ম্মকে এতখানি উঁচুতে কেন ঠাঁই দেওয়া হয়েছে কর্ণদা?

—কারণ, স্বধর্ম্মের আশ্রয়ে যে মৃত্যু, সে মৃত্যু নবজীবনের উন্মেষ আনে। সে মৃত্যুর মধ্যে জীবনের ভ্রূণাঙ্কুর জাগ্রত হয়। আর পরধর্ম্ম আশ্রয়ে যে মৃত্যু তাকে বলে সিদ্ধ অপমৃত্যু।

কথাটা পরিষ্কার করে বোঝবার জন্য কর্ণদা বলে চললেন, —নিজেদেরকে পুরোপুরী ইউরোপীয় করে গড়ে তুলতে পারলে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং আত্মশোধনের শক্তি লোপ পেয়ে যেতো! তাতো আমরা পারলাম না। সে সাধনা করতে গিয়ে আমাদের ঐ অপমৃত্যু ঘটছে!

সিধুর আরো অনেক প্রশ্ন করতে ইচ্ছে যায়, কিন্তু কর্ণদা অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, এবং সিধুর বিদ্যাবুদ্ধি এতই কম যে প্রশ্নটা ঠিকমত না হলে উনি সিধুকে নির্ব্বোধ ঠাওরাবেন, তাই সিধু খুব ভেবেচিন্তেই প্রশ্ন করে। কিন্তু কর্ণদা শুধু যে শালগ্রামের নুড়ির বিষয়েই কথা বলেন, তা নয়, তাঁর চিন্তা সকল সময়েই ভারতের মুক্তিকে লক্ষ্য করে—শালগ্রাম উপলক্ষ্য মাত্র। উপলক্ষ্য নিয়ে কথা বলতে বলতে তিনি ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন—উদ্বেলিত হয়ে পড়েন। বিশাল তাঁর দুই চোখ বজ্রের আগুনে ঝক্‌মক্ করে ওঠে। সিধুরা স্তব্ধ হয়ে বসে শোনে সেই গুরু-গম্ভীর মেঘগর্জনবৎ মহাবাণী। সে বাণী উচ্চারিত হয় লোকালয়ের বাইরে, নিভৃত গিরিগুহায়—নীরন্ধ্র অন্ধকার নিশীথের আশ্রয়ে। দলে দলে মুক্তিকামী মানুষ এসে বসে—নীরবে শুনে যায় কথা—ইঙ্গিতমাত্রেই আদেশ পালন করতে উদ্যত থাকে।

কিন্তু কর্ণবিজয় কিছুদিন যাবৎ মৌনী রয়েছেন। কি একটা গভীর চিন্তা ওঁর মনকে যেন স্তব্ধ করে রেখেছে—যেন ভূমিকম্পে সীমাহীন সাগরবারি উদ্বেলিত হয়ে উঠবার পূর্ব্বাভাস। দলের সকলেই জানে, এ চিন্তা কিসের চিন্তা, কিন্তু কেউ কোন কথা বলে না। দেশে একটা হীন প্রচেষ্টা গোপনে চলছে, তারই সংবাদ এসে পৌঁছেছে কর্ণদার কানে। সে-প্রচেষ্টা ভারতের মুক্তি-সাধনা-যজ্ঞের আহুতি নয়, ভারতের বিভেদ-বিদ্বেষ-বহ্নির ইন্ধন। এর সুদূরপ্রসারী কুফল ভেবেই কর্ণদা

এতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কোনো উপায়ই তিনি দেখতে পাচ্ছেন না তাই নীরবেই রয়েছেন।

—আমাদের উপর কোনো আদেশ তো হচ্ছে না কর্ণদা?—সিধু সেদিন সাহস করে শুধুলো।

—আদেশ যিনি করবেন, তিনি তোমার ঐ নুড়ির মধ্যে অব্যক্ত রয়েছেন সিদ্ধেশ্বর—সমগ্র ভারতের সমবেত গণশক্তি আজো তাঁর ব্যক্তরূপ দেখতে পেল না। তাই ভাবছি, আমাদের শক্তি অতিমাত্রায় দুর্ব্বল হয়ে গেছে; কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গেছে! দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষকে উনি আদেশ দান করেন না—কর্ণদা একটুক্ষণ থামলেন, তারপর আবার বলতে লাগলেন,—যে বহিঃশক্তি এই ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার সমস্তটুকু আজ আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার বিজ্ঞানের মাইক্রস্কোপিক দৃষ্টিতে ওটা পাথরের নুড়ি-ই, এবং সেই মাইক্রস্কোপের ঠুলিই সে আমাদের সকলের চোখে পরিয়ে রেখেছে, জাতি-নির্ব্বিশেষে, ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে,প্রদেশ-নির্ব্বিশেষে ঐ একই ঠুলি সকলের চোখে—তাই ওটা পাথরের নুড়ি বলে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে,—আমরা নিজেরা করছি, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও করছে। অথচ ধর্ম্মপথ যদি ঈশ্বরলাভের পথ হয়, তাহলে ঐ পাথরের নুড়ি এবং ঐ বিশাল মন্দির, বা ঐ সুরম্য গির্জা, সবগুলোই সেই এক ঈশ্বরের কাছে যাবার রাস্তা। এই সত্য একদিন—খুব বেশি দিন পূর্ব্বে নয়, মাত্র দু' একশ বছর আগেও এদেশের মানুষরা বুঝতো। আজ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের ঠুলি চোখে দিয়া এরা জ্ঞানের সহজ দৃষ্টি হারিয়েছে—স্বভাবকে বিকৃত করে দেখছে—শ্বেত-সুন্দর সূর্য্যালোককে ত্রিকোণ কাচে খণ্ডিত করে দেখছে,—আর বহিঃশক্তি সেই সুযোগে আপনার আসন কায়েমি রাখবার আয়োজন করছে। আদেশ দেবার আজ দিন নয়, আত্মচেতনা লাভের দিন আজ। আজ বিজ্ঞানের ঠুলি খুলে জ্ঞানের সহজ দৃষ্টিতে দেখতে হবে সকল মানুষকে,—জাতি, ধর্ম্ম এবং সম্প্রদায়-সমন্বয়ের উর্দ্ধে যেখানে মানুষ

শুধু মনুষ্যত্ব-ধর্ম্মেই জাগ্রত হয়, সেখানেই আজ পৌছাতে হবে জ্ঞানের পথ দিয়ে, হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে, আত্মার আত্মীয়তা দিয়ে—কিন্তু……

কর্ণদা থেমে গেলেন। ওঁর কথাগুলো বেশ শক্ত খোসায় ঢাকা। খোসা ভেদ করে শাঁসে পৌছাতে সিধুর বিলম্ব হয়, তবু সিধু বুঝতে পারছে। বুঝতে পারে কোথায়, কোনখানে কর্ণদার অন্তর কাঁটার আঘাতে ব্যথাতুর হয়ে উঠছে। কর্ণদা কিছুক্ষণ থেমে বললেন—আদেশ কিছু দেবার নেই; তবে চোখমেলে দেখবার আদেশ দুচার দিনের মধ্যেই দেব তোমাদের; দেখবে, অকারণ আত্মকলহ, আত্মীয়বিরোধ, ভ্রাতৃহত্যা আর ভ্রান্ত নীতিতে দেশটা হয়তো রক্তরাঙা হয়ে যাবে। কিন্তু সেদিনও তোমার ঐ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পাথরের নুড়ি জাগবেন না—উনি সেদিনও আদেশ দেবেন না 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ—!' কেন দেবেন না, জানো। উর্ব্বসীর অভিশাপে ক্লীব অর্জ্জুন আজো অজ্ঞাতবাসে রয়েছে। আদেশ উনি দেবেন কাকে! কে শুনবে সেই পাঞ্চজন্যের গভীর আহ্বান?

কর্ণদার কথাটা যেন তাঁরই বেদনার্ত্ত অন্তরের অভিব্যঞ্জনা; যেন তিনিই অর্জ্জুন, ক্লীবত্বের দুঃসহ দুঃখে বৃহন্নলা হয়ে দিন যাপন করছেন—সম্মুখে প্রসারিত কুরুক্ষেত্র—তিনি নিরুপায়—তিনি বন্দী!

কর্ণদা চুপ করলেন। সিদ্ধেশ্বর এবং আরো সকলে চুপ করেই রইল। কিছুক্ষণ পর সিধু বললো—আমার একটি আত্মীয় কাশীতে এসেছেন। অনুমতি করেন তো আজ বৈকালে তাঁকে একবার দেখে আসি!

—বেশ তো, যাবে। তবে সাবধান, আমরা সন্ন্যাসব্রতধারী সন্তান। গৃহীর সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করো। কারণ, সকল সময় মনে রাখবে,—যে কোনো মুহূর্ত্তে তোমাকে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াতে হতে পারে—মৃত্যু বরণও করতে হতে পারে।

—হ্যাঁ, কর্ণদা, সেজন্য আমরা সব সময় প্রস্তুত।

বলে সিধু অবন্তীর মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। এই দলে মেশার পর থেকে ও কিছু কিছু পড়াশুনাও করছে এবং ওর সাজ পোষাক অত্যন্ত সাধারণ গৈরীকধারী সন্ন্যাসীর মত। এ পোষাক এরাই দিয়েছে, কিন্তু জমি বেচার মোটা টাকাটা পাওয়ার পর সিধু কাশী এসেই কাপ্তেনবাবুর মত এক প্রস্থ পোষাক তৈরী করিয়েছিল—সেগুলো আছে সেই পিতৃবন্ধুর বাড়ীতে। সিধু ভাবলো—সেখানে গিয়ে পোষাক বদল করে তবে যাবে অবন্তীকে দেখতে।

অবন্তী তার মানস-লোকের অধিষ্ঠাত্রী। অবন্তী তার জীবননাট্যের পটপরিবর্ত্তনকারিণী দেবী—অবন্তী তার জীবন-সাধনার রুদ্রাণী! সিধু তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে কোন বেশে, তাই নিয়েই ভাবলো অনেকক্ষণ ধরে। অবন্তী চায়, সিধু ভারতের মুক্তিসাধনা-যজ্ঞের সৈনিক হবে,—সে বেশ সৈনিকের বেশ—গৈরিক বেশ, কিন্তু সিধুর অন্তর অবন্তীর রূপে অবন্তীর মানসিক ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ; তার কাছে সন্ন্যাসীর রিক্ত-সর্ব্বস্ব রূপ নিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছা সিধুর মনঃপূত হচ্ছে না। অথচ সে নিজের কাছে সে-সত্য অস্বীকার করছে। কয়েকদিনের জপপূজার যৎকিঞ্চিৎ মনঃসংযোগ ওকে যে সামান্য শক্তি দিয়েছে, তাতেই সিধু অন্তরের অন্তঃস্থলে অহঙ্কারী হয়ে উঠলো। নিজেকে সে অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর সাধক ভাবতে শিখেছে এই কয় দিনেই। ওর মনশ্চক্ষে এখন মাটির পৃথিবী হিরণ্ময়ী। প্রত্যেক নারী ওর কাছে এখন সাধনপথের শক্তি-সঞ্চারকারিণী মহাশক্তি—এই কথাই ও ভাবছে। ওর অহঙ্কার ওর মনের অজ্ঞাতসারে ওকে কতখানি আচ্ছন্ন করেছে, ও জানে না। পাথরের নুড়ি পূজা করে সিধু ভেবেছে, তার অন্তরটাও পাথর হয়ে গেছে—কামনা, বাসনা সে জয় করেছে, আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চাভিমুখী করেছে, যে-আকাঙ্ক্ষা জীবনের রুদ্ররূপের সাধনাতেই লিপ্ত, সমাধিস্থ। ও জানে না,—হয়তো ওর অহঙ্কারই ওকে জানতে দেয় নি—কত বড় ভুল সে করেছে এবং আজ আবার করতে যাচ্ছে।

সে ভাবলো, সে এখন সকল কামনা-বাসনাশূন্য সন্ন্যাসী। নিজকে পরিপাটিবেশে সাজিয়ে সে তার মানসলোকের শক্তি-সঞ্চারকারিণী অবন্তীর আয়ত চক্ষের প্রচণ্ড প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েও অক্ষত হৃদয় নিয়ে ফিরে আসতে পারবে—নিজকে আজ পরীক্ষা করবে সিধু! পাথরের মূর্ত্তিটা ওর অন্তরের কথা পড়ে হেসেছিল কি না, কে জানে!

পিতৃবন্ধুর বাড়ী এসে সিধু তার সুটকেশ খুলে জরীদার ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী এবং শোয়েড্‌লেদারের জুতা পরে মাথার চুল আঁচড়াবার জন্য আয়নায় মুখ দেখলো, তখন তার নিজেরই মনে হোল,

—বাহা-বাহা সিদ্ধেশ্বর!

সন্ধ্যার সময় গিয়ে উপস্থিত হোল সে অবন্তীদের বাসায়। ওর মা বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখতে বেরুচ্ছিলেন, সিধুকে দেখে থেমে গেলেন। বাড়ীর অন্যান্য সকলেই বেড়াতে বেরিয়েছে, অবন্তীও গেছে তাদের সঙ্গে। এই শুভ সুযোগ মা ত্যাগ করলেন না। সিধুকে সাদরে ডেকে নিভৃতে বসালেন। কিন্তু অবন্তীর কথা বলতে তাঁর মুখ একান্তভাবেই সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে লাগলো। অথচ না বল্‌লেও চলে না। যে সুযোগ আজ উনি পেয়েছেন, সেটা হারালে ওঁকে আরো অনেক বেশী বিপদে পড়তে হতে পারে। শেষকালে উনি মন স্থির করে বললেন—অবন্তী বড্ড বিপদ ঘটিয়েছে বাবা সিধু! তুমি যদি ওকে বাঁচাও তবেই, নইলে মেয়েটাকে নিয়ে কি যে করবো!

—কেন? কি বিপদ হোল তার? সিধু আগ্রহে শুধুলো।

মা আর বলতে পারছেন না—কোনোরকম করে বললেন—

—অতবড় মেয়ে, এখনো বিয়ে হয়নি, এখানে সে পরিচয় না দিয়েও সবাইকে বলেছে, যে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। জামাই কলকাতায় কারবার করে। এরা তাই শুনে ওর বরকে দেখতে চায়, বলে, 'বর চিঠি লেখে না কেন,' ইত্যাদি!

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

—তাতে আর কি হয়েছে! আপনি বলে দিন যে বিয়ে হয়নি। সিধু ঘটনাকে অত্যন্ত সহজ ভেবেই গ্রহণ করে বললো—ও ছেলেমানুষ, বলেছে তো কি হয়েছে?

—না বাবা! বিয়ে হয়নি, বলা চলে না আর। তোমাকেই আজ আমি অবন্তীর বর বলে পরিচয় দিতে চাই—তুমি রাজি হও সিধু, লক্ষ্মী ছেলে, আমি বিপন্ন!

সিধু অবাক হয়ে চাইল ওঁর মুখের পানে;. একি স্বপ্নের আগোচর কথা ইনি বলছেন! অবন্তী—যার পায়ের নখে আলতা পরিয়ে দেবার যোগ্যতাও সিধুর নেই, ভাগ্যবশে সে সিধুর পরিণীতা পত্নী বলে পরিচিতা হবে এবং আজ রাত্রেই সিধুর সান্নিধ্যে এসে……সিধু আর ভাবতে পারছে না। মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে ওর!

চক্রধারীও যেন কূট চক্রান্তজাল বিস্তার করেছেন আজ। ওর মুখ থেকে কোনো উত্তর বেরুবার পূর্ব্বেই অবন্তীর দল কলহাস্য করে বেড়িয়ে ফিরলো। ঘরের মধ্যে মা'র কাছে সিধুকে বসে থাকতে দেখেই শচীনবাবুর ছোট মেয়ে অবন্তীকে শুধুলো—কে রে? কে?

—বর! বলে অবন্তী আধ হাত ঘোমটা টেনে পালিয়ে গেল; ওর মুখের হাসির আভাস আর লজ্জার সুকোমল সৌরভ বাড়ীশুদ্ধ লোককে মুহূর্ত্তে বুঝিয়ে দিল, অবন্তীর বর অবন্তীকে দেখতে এসেছে। মা'র আর কিছু করবার বা বলবার দরকার হোল না। তরুণীর দল—শচীনবাবুর দুই মেয়ে আর দুই বৌ আসরে প্রবেশ করলেন। সিধু জামাই-এর ভূমিকায় প্রথম কিছুক্ষণ মূক অভিনয়ই করলো কিন্তু উপায়হীন হয়ে শেষটায় সে কথাও বললো—'বিশেষ কতকগুলো কাজের চাপে সে অবন্তীকে দেখতে আসতে পারে নি!' আড়াল থেকে মা শুনলেন সিধুর কথা। আশ্বস্ত হলেন তিনি। শচীনবাবুও ঘরে ফিরে অবন্তীর বর আসার সংবাদ পেয়ে নিভৃতে মার সঙ্গে দেখা করলেন এবং সমস্ত শুনে

খুসী হয়ে বললেন,—এ খুব ভাল হোল। ছেলে বা মেয়ে যাই হোক, তাকে নিয়ে আর ব্যস্ত হতে হবে না।

বাঙ্গালী বাড়ীতে বর আসার সমারোহ ব্যাপার ত্রুটিহীন হয়ে উঠলো যথারীতি। অবন্তী বন্ধুকন্যা, ধনীকন্যা—কাজেই শচীনবাবুর বাড়ীশুদ্ধ সকলেই তার বরের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। অবন্তীর জন্য সিধু সামান্য যে ফল-মিষ্টি কিনে এনেছিল, তাই নিয়ে ওরা বিদ্রূপ করে বললো. —এ সব তো কাশীরই জিনিষ, কলকাতা থেকে কি আনলেন? ইলিশ মাছ কৈ—গলদা চিংড়ি?

—কাশী :বাবা বিশ্বেশ্বরের নিত্যধাম। এখানে কি জীবহত্যা করতে আছে?

—হত্যা কি মশাই! আপনি তো মরা জীব আনতেন।

—মরা জীব এখানে এলেই মুক্তি লাভ করে কালভৈরব হয়ে যায়। তখন সে পেটে গুঁতোগুতি লাগিয়ে দেবে যে!

সকলে হাসলো সিধুর কথা শুনে কিন্তু একজন বললো—দ্বারিকের খাবার, ভীম নাগের সন্দেশ, পুঁটিরামের রাজভোগ—এগুলো নিশ্চয় আনতে পারতেন—নাকি ওসব কণ্ট্রোল্ড ওখানে?

'কণ্ট্রোল্ড' কথাটা সিধুর খুব উপকারে লাগলো—বললো,—সব কণ্ট্রোল্ড মায় বার্থ পর্য্যন্ত!

—তাই বুঝি অবন্তীকে এখানে পাঠিয়েছেন!—হা হা করে হেসে উঠলো সবাই।—ভয় নাই! একসঙ্গে পাইকারী হারে দুটো-চারটে তো আর জন্মাবে না! হিঃ হিঃ হিঃ!

'বার্থকনট্রোল' কথাটা সিধুর শোনা আছে, ভাল করে ওর মানে সে জানে না। ওর রসিকতাটা যে এতখানি হাসির খোরাক যোগাতে পারবে, এটা সে বুঝতে পারে নি—এখনো ঠিকমত বুঝতে পারছে না। কিন্তু এঁরা সকলে অত্যন্ত বেশী হাসতে আরম্ভ করেছেন। রসিকতা

করতে বা তরুণীদের সঙ্গে আলাপ করতে সিধু অনভ্যস্ত নয়, কিন্তু সে-আলাপ গ্রাম্য নারীর সঙ্গেই এযাবৎ করেছে; আজ এতগুলি শিক্ষিতা তরুণীর সান্নিধ্যে তার ভয় হচ্ছিল, কি জানি, মান বজায় থাকে কি না। এদের হাসতে দেখে সে অতিশয় খুসি হয়ে বললো—হাসিও কন্‌ট্রোল্ড ওখানে।

আবার হাসির হররা উঠলো! এরকম অবস্থায় বাঙ্গালী মেয়েরা কারণে-অকারণে হেসে লুটোপুটি খায়। সিধুর ব্যাপারেও তার ব্যত্যয় হোল না। ওদিকে ভেতরের ঘরে মা সিধুর আলাপ ইত্যাদি শুনে খুসী হয়ে অবন্তীকে বললেন—সিধু তো বেশ সেয়ানা!

—বলেছিলাম তো! —হাসলো অবন্তী।

মা কি বুঝলেন কে জানে, বললেন—সবটা সামলাতে পারবি?

—হ্যাঁ! দরকার হয় ওকেই বিয়ে করে ফেলবো! —বলে অবন্তী মৃদু হাসলো আবার।

জানা ঘর বর মা আর অধিক কিছু বললেন না। এরকম একটা পরিণতি হলে অবন্তী সম্বন্ধে সব ভাবনাই ঘুচে যায়! তিনি বিশ্বেশ্বরের চরণে তারই প্রার্থনা করতে লাগলেন। আজ আর তাঁর আরত্রিক দেখতে যাওয়া হল না।

জামাই-আদরের কোন ত্রুটিই এঁরা হোতে দিলেন না! পরিপাটি করে সিধুকে খাইয়ে একটি সুন্দর সুসজ্জিত ঘরে সুকোমল শয্যায় তাকে শুতে নিয়ে যাওয়া হোল। এইবার অবন্তী আসবে, তারই ইঙ্গিত করে গেল একজন তরুণী—শ্লীল এবং অশ্লীল ভাষায়। সিধুর মস্তিষ্ক-কোটরে এতক্ষণে যেন একটা জ্বালা অনুভূত হচ্ছে। একা অসহায় সিধু—এখুনি অবন্তী আসবে এবং……সিধুর আনন্দটা এক অব্যক্ত অননুভূত ক্রন্দনের বেগে স্পন্দিত হয়ে উঠছে যেন। আত্মপ্রসাদটা আত্মবঞ্চনার তীক্ষ্ণ শলাকায় বিদ্ধ হচ্ছে যেন; যেন এই সুবিভীষণ প্রতারণা দ্বারা সিধু

নিজকে, নিজের বংশধারাকে, কর্ণবিজয়ের স্নেহকে এবং মাতৃভূমির মুক্তি-সাধনাকে প্রতারিত করছে—যেন তার শালগ্রাম শিলারূপী শ্রীভগবানকেও·····

সিধু পকেটে হাত দিতে গেল অভ্যাস বসে;—নাই! শালগ্রাম শিলা আজকাল থাকে পেতলের সিংহাসনে। দু'টাকা দিয়ে দিনকয়েক হল ঐ সিংহাসনটি সে কিনেছিল; আজ তিনি সিধুর পকেটে নাই! থাকলে হয়তো সিধুকে রক্ষা করতেন। কিন্তু সিধুকে ভাববার অবসর না দিয়েই অবন্তী এসে দাঁড়ালো বধূবেশে। বধূ—ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা তরুণী বধূ, বল্লরীর মত নতনয়না, আবার বিজয়িনীর মত বঙ্কিম-গ্রীবা—সিধু বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল মুহূর্ত্তকয়েক! অবন্তী! কী আশ্চর্য্য রূপসী অবন্তী!

নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে এনে কথা বলবার মত অবস্থা করতে সিধুর কয়েক মুহূর্ত্তই কাটলো। ইতিমধ্যে অবন্তী বেশ স্বচ্ছন্দে বসেছে তার পর্য্যঙ্কে—পার্শ্বে—একান্ত সান্নিধ্যে। বিবাহিতা বধূর অধিকার যেন বহুকাল থেকেই লাভ করে এসেছে সে সিধুর কাছে। সিধু নিজকে সম্বৃত করে সরে বসলো একটু; তারপর অতি নিম্নকণ্ঠে শুধুলো,

—এসব কি ব্যাপার অবন্তী? সত্যি কি তুমি এই ঘরে থাকবে আজ?

—হ্যাঁ! মা'র কাছে কি তুমি সব শোন নি সিধুদা?

—না—উনি বলবার সময় পেলেন না; তোমরা এসে পড়লে তখনই। আমি এখনো কিছু বুঝতে পারছি না। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বোধ হয়·····

—হ্যাঁ, বড্ড বিপদে পড়েছিলাম!—নির্ল্লজ্জা অবন্তীর মুখখানাও নামলো একটুখানি। লজ্জার এতবড় ধাক্কা কাটিয়ে কথা বলা যে-কোনো মেয়ের পক্ষেই লজ্জাকর, কিন্তু অবন্তী কইল,—গুণ্ডারা জোর করে আমায়

ধরে নিয়ে গিয়েছিল, প্রায় দু'মাস আটকে রেখেছিল, তারপর এই অবস্থা। এখন তুমি দয়া না করলে আমার কোন উপায় নাই সিধুদা……।

অবন্তীর কণ্ঠস্বরে কারুণ্য যেন ঝরে পড়ছে—ক্রন্দন যেন মূর্ত্তি ধরছে। কিন্তু সিধু! নির্ব্বোধ সে নয়; এই ব্যাপারে কতখানি দায়ীত্ব তার ঘাড়ে চাপান হচ্ছে, সেটা বুঝতে ওর কিছুমাত্র দেরী হোল না। ওর সমস্ত শরীরের রক্ত একবার উষ্ণ হয়ে উঠলো, তারপরই জমাট বেঁধে গেল। কঠোর পাষাণে পরিণত হয়ে গেল সিধু।

—সিধুদা!

সিধু নির্ব্বাক! অবন্তীর আহ্বান তার কাণে পৌছাল না।

ওয়াল-ক্লকটার টিক্‌টিক্ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই; প্রায় পনর-কুড়ি মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেল, সিধু নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ! অবন্তীর যেন কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো এতক্ষণে। সিধুদা কি তাহলে রাজি হবে না তার বরের অভিনয় করতে? কেন? সে তো সেই অবন্তী, একদিন যাকে নিয়ে সিধু দিল্লী-আগ্রায় পালিয়ে যেতে চেয়েছিল; যে অবন্তীর চোখের দিকে চেয়ে সিধু মরতেও প্রস্তুত ছিল—এ অবন্তী কি আজ সেই অবন্তী নয়?

না—কথাটা বুকের জমাট নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল অবন্তীর বুক থেকে। না—এ অবন্তী সে দিনের সেই অনাঘ্রাতা, অপাপবিদ্ধা অবন্তী নয়—সেই অনূঢ়া পল্লীকন্যা নয়—কৌমার্য্য-মণ্ডিতা শক্তি-স্বরূপিনী ষোড়ষী মূর্ত্তি নয়; সে আজ পথচারিণী বারবধূর ক্লেদাক্ত পথের অভিযাত্রিনী! স্ব-সন্তানের মাতৃত্বকেও স্বীকার করে নেবার যোগ্যতা তার নেই আজ! নিজের দিকেও তাকাতে যেন ভয় করতে লাগল অবন্তীর,—রূঢ় আলোটা কেউ নিবিয়ে দিতে পারলে বড়ো উপকার হয় ওর—কিন্তু ঘরে প্রস্তরবৎ উপবিষ্ট সিধু ছাড়া আর কেউ নেই।

সিধু—অন্তরের গভীরতম স্তরে যেন ধ্যানমগ্ন সিধু। যে প্রচণ্ড প্রলোভন ওর সম্মুখে, তাকে অস্বীকার করবার শক্তি ওর সজ্ঞান, সচেতন মনে নেই, কিন্তু ওর চির-জাগ্রত চিৎ-চেতনায় জেগে রয়েছে যে সাধক-সিধুর আত্মিক-ঊর্দ্ধমুখিনতা,—প্রলয়-পথের পরিব্রাজকতা—রুদ্র-জীবনের মুক্তি-প্রবণতা—সেই লোকোত্তর সাধক-চেতনা কঠোর ভ্রূকুটির সম্মোহন মন্ত্রে ওকে স্তব্ধ করে রেখেছে। ওর শালগ্রাম-শিলা সঙ্গে নেই কিন্তু স্বয়ং শালগ্রাম যেন ওর সহায়—ওর অন্তর দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে আলোড়িত, কিন্তু ওর অন্তর্যামী স্থির, অবিচল! ওর মানসপদ্ম মালিন্যমুক্তির আশায় গভীর পঙ্ক ভেদ করে সূর্য্যের সহস্র কিরণতলে দল মেলবে! আচ্ছন্নবৎ সিধু আধস্বরে উচ্চারণ করলো,—'নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর—'

—সিধুদা! —অবন্তী অত্যন্ত ভয়জড়িতকণ্ঠে ডাক দিল। সিধু চোখ মেলে দেওয়ালের টাঙানো বারানসীর বিশাল মন্দিরের ছবিটার পানে চেয়ে বললো আস্তে আস্তে—কণ্ঠে তার সীমাহীন ঔদার্য্য,

—তোমাদের বিপদ আমি বুঝেছি অবন্তী, কিন্তু আমি এখন প্রলয়-পথের যাত্রী। তোমাকে বৌ হিসাবে গ্রহণ করা এখন আমার আয়ত্তের বাইরে, সাধ্যের অতীত; তবু তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমার ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য, এই একরাত্রি আমি চুপ করেই রইলাম। রাত হয়েছে, তুমি শোও, আমি বারান্দায় পায়চারী করেই রাতটা কাটিয়ে দেব।

অবন্তী আশ্বস্ত হলো কিংবা আতঙ্কিত হলো, ঠিক বোঝা গেল না। সে বসেই রইল; সিধু উঠে যাচ্ছে, অকস্মাৎ অবন্তী চট্‌করে ওর হাত ধরে বললো,—বাইরে যেওনা সিধুদা, ওরা এখনো শোয় নি!···আর শোনো···

সিধু বসলো আবার; অবন্তীর পানে তাকালো তার কথা শোনবার জন্য!

—ছেলে বা মেয়ে যাহোক একটা তো হবে। ভাবনা তাকে নিয়েই। তোমার পিতৃপরিচয়ে সে যদি পরিচিত হোতে পারে, তাহ'লে সিধুদা

তাকে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার অধিকার তুমিই দিলে—এটুকু দয়া কি তুমি করবে না ?

অবন্তীর কণ্ঠস্বর কাঁদছে, যদিও চোখে তার ছলাকলাময়ী নারীর আতস-দীপ্তি—ঠোঁটে তার আবীর-পাণ্ডুর হাস্যলেখা। সিধু ওর কণ্ঠস্বরে ওর অন্তর যেন পড়তে পারছে! বললো—তোমার ভবিষ্যৎ কোথায় তোমাকে নিয়ে যাবে, সেটাই আমি ভেবে উঠতে পারছি না। আমি সকালে চলে যাব এবং আর হয়তো কখনো আসবো না। তারপর তুমি কি করবে অবন্তী ?

—কোথায় তুমি চলে যাবে সিধুদা ? কেন যাবে ?

—যাব মুক্তির পথে ;—মাতৃভূমির আহ্বান এসেছে ; আমি সৈনিক !

—বেশ তো, আমাকেও নিয়ে যাবে !

—তোমাকে ?—সিধু উঠে পায়চারী করতে লাগলো ঘরটায়। ভাবতে লাগলো, আজ কত আশা নিয়ে সে অবন্তীকে দেখতে এসেছিল। তাদের অভিযানের গভীর গোপন কথার আভাস দিয়ে অবন্তীকে সে জানাতো, অবন্তীই তার এই নবজীবনের জন্মদাত্রী—প্রেরণাময়ী—প্রত্যক্ষ দেবী স্বরূপিনী।

কিন্তু এ অবন্তী সে অবন্তী নয়—সে সত্য ওকে দেখামাত্রই অন্তরে জেগে ওঠে। এ অবন্তী বিলাসিনী শুধু নয়, বারবিলাসিনীর কদর্য্যতায় আপ্লুতা, আকণ্ঠ নিমজ্জিতা ব্যভিচারিণী। ওর মুখের মিথ্যায় ও পৃথিবীর যে কোনো ব্যক্তিকে প্রতারিত করতে পারে, সিধুকে পারবে না—কারণ সিধু জানে গুণ্ডা দ্বারা অপহৃতা লাঞ্ছিতা নারীর স্বরূপ কি—তার সত্যানুভূতি কোথায়, তার সঞ্জীবনশক্তি কতখানি। তথাপি ওর মুখের কথাটা সত্য বলে ধরে নিলেও ওর চলনে-বলনে-আচরণে যে পর্ব্বতপ্রমাণ অসামঞ্জস্য—ওর সকুণ্ঠ প্রকাশ এবং আকুণ্ঠ ব্যবহারের স্বীকৃতির মধ্যে যে কদর্য্য ব্যবধান, তাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই। বললো,

—তুমি কোথা যাবে? আমাদের চলার পথ রুদ্রদেবতার মন্দিরের পথ। মরণ সে সেথা সারাক্ষণ ওঁৎপেতে থাকে—ফাঁসির মঞ্চে আর ফুলমালঞ্চে কোনো তফাৎ সে পথে নেই, মৃত্যুর পথে অমৃত যাত্রা!···

সিধু আস্তে হেঁটে বারান্দায় দাঁড়ালো এসে। বিস্তীর্ণ নগরী নিদ্রাকাতর দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে। মহাকাল যেন ত্রিশূলহাতে নেশায় ঝিমোচ্ছেন। সিধু বললো—'নমো পিনাক হস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ—'

অবন্তী খাটের উপর আড় হয়ে শুয়ে—কে জানে, ঘুমিয়েছে কি না। সিধু অপলক দৃষ্টি মেলে ওর পানে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। অবন্তীর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে অবন্তীর অপরাধ কোথায়? প্রাকৃতিক নিয়মেই সে জননীত্বে উন্নীত হয়েছে; তার সমাজ, তার স্বজন তাকে রক্ষা করতে পারে নি—এরপর সেই কাপুরুষ স্বজন এবং কাপুরুষতম সমাজ তাকে ত্যাগ করে ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াবে; সাহঙ্কারে ঘোষণা করবে,—'তাদের ধর্ম্মে পতিতা নারীর ঠাঁই নেই।' কিন্তু এই সব লাঞ্ছিতা অপমানিতা নারী কি সত্যই পতিতা? সত্যই অস্পৃশ্যা? না—সিধুর অন্তরদেবতা বজ্রের স্বরে বললো—না। সিধু পা-টিপে ঘরে ঢুকে অবন্তীকে স্পর্শ করলো,—ঘুমুচ্ছে অবন্তী, ঘুমিয়ে গেছে। এত শীঘ্রি ঘুমুতে পারলো এমন একটা বিপর্য্যয়কর জীবনের আবেষ্টনের মধ্যেও! সিধুর আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে। কিন্তু না ঘুমিয়েই-বা অবন্তী করবে কি? কথা যা-যতটুকু হবার, হয়ে গেছে, এবার তো তার ঘুমোবারই কথা। শুতে পেলে সিধুও হয়তো এতক্ষণ ঘুমিয়ে যেত। কিন্তু এমন নিশ্চিন্তে অবন্তী ঘুমিয়ে গেল? রাত মাত্র সাড়ে বারোটা—দেওয়াল ঘড়িটায় দেখলো সিধু।

ওদের ঘুম পায়—এই সব সন্তান-সম্ভবা মেয়েদের। সব দুশ্চিন্তাকে অতিক্রম করেও ওরা ঘুমুতে পারে। সিধু জানে সে-তত্ত্ব। কিন্তু অবন্তী ঘুমুচ্ছে যেন জীবনের এই প্রথম আনন্দের ঘুম। ওর মুখের কোনো রেখায় চিন্তার এতটুকু মালিন্য নেই—দীপ্ত আলোকে সিধু দেখছে

লাগলো, শান্ত সুখ-সুপ্ত অবন্তীর সুন্দর মুখ হাসির দীপ্তিতে ঝলমল করছে। ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে। অন্তরের প্রলোভন দুর্ব্বার হয়ে উঠলো সিধুর—বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে তার চিন্তাধারা। নিজকে সবলে সংযত করে সে আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—'অহঙ্কারীকে ক্ষমা করো প্রভু!' বিজিত-ইন্দ্রিয় বিশ্বামিত্রও যে প্রলোভন এড়াতে পারেন নি—সিধু আজ সেই ভয়ঙ্করী মহামায়ার কূট- ক্রু বন্দী! নিজকে এতখানি অসহায় সিধুর আর কখনো মনে হয়নি। সিধু ত্বরিত পদে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো, আধো অন্ধকারে, অস্পষ্ট ছায়ালোকে। আকাশের বুকে কাল পুরুষের উজ্জ্বল নয়ন-বহ্নি যেন ওর দিকে তাকিয়ে—, সপ্তর্ষিমণ্ডল জ্বলজ্বল করছে—দূরে ছায়াপথে অগণ্য নীহারিকার অভিযান কে জানে কোন্ মুক্তির অনন্ত সম্ভাবনার উদ্দেশে! ওরাও বন্দী! মুক্তি-পথের সংখ্যাহীন ঘূর্ণনে ওরা সীমাহীন আকাশে বন্দী—আর নিম্নে ঐ গর্ভ-গৃহে বন্দী মানবাত্মা মুক্তির পিপাসায় অধীর, আকুল। কে জানে ঐ মানব-ভ্রূণাঙ্কুরে কী অনন্ত শক্তির বীজ নিহিত আছে? কে বলতে পারে, ঐ বিশ্বামিত্রকন্যা শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্রের নামেই নব-ভারতের নবতম নাম হবে কি না? কে বলতে পারে, জীবনের রুদ্ররূপ ঐ শিশুকে অবলম্বন করেই প্রকটিত হবেন কি না?—সিধু আশ্বস্ত হচ্ছে, কিন্তু আরাম পাচ্ছে না। ওর চিরদিনের সংস্কার-প্রবণ সনাতন মন যেন ঘৃণায় মুখ ফেরাতে চায়, আবার বর্ত্তমানের কর্ণধার প্রভাবিত সংস্কারমুক্ত সাধক-মন কারুণ্যে কোমল হয়ে ওঠে, আশায় আশ্বাসিত হয়। রাত্রি গভীর হতে হতে প্রায় শেষ হয়ে গেল—ভোরের পাখীর কূজন জাগলো সুপ্তোত্থিতের শ্রবণে। অবন্তী নিঃশব্দে উঠে চলে গেল ঘরের বাইরে। ওর মা এসে ডাক দিল—হাত মুখ ধোও বাবা সিধু!

রাত্রি প্রভাতের আলোয় মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু সিধুর বন্ধন কঠোরতর হচ্ছে। সিধু তাকে অস্বীকার করবে, নিজকে কঠিন করে বললো—

—আমি এখুনি চলে যাব কাকিমা!

কিন্তু চলে তাকে যেতে দেওয়া হবে না অত শীঘ্রি! মা বললেন, —তা কি হয় বাবা! যখন অতটা করলে তখন শেষ রক্ষে কর!

নিরুপায় সিধু উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল। কিন্তু এল তরুণীর দল—হাসি-গান-গল্পে সিধুকে অস্থির করে তুললো তারা।

সিধুর অন্তরাত্মা তারস্বরে চীৎকার করছে—মুক্তি দাও, প্রভু মুক্তি দাও!

কিন্তু মুক্তি গাছের ফল নয়—পুকুরের জল নয়, আকাশের আলো নয়। কবি বলেছেন—

'মুক্তি মুক্তি করিস রে ভাই, মুক্তি কোথায় মিলে?
চরকা ঘোরে তো ঘোরে নাকো টাকু রশি যদি হয় ঢিলে!'

সামান্য রশির ঢিলেমীতেই টাকু ঘুরবে না—মুক্তির সূতা তৈরী এমনি কঠিন কাজ। তথাপি ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার মাঝখানে শ্রীভগবানের চক্রচিহ্নবৎ চরকা-চিহ্ন অঙ্কিত করে চলেছে মুক্তিপথযাত্রীদল—সেই দুঃসহ অভিযানপথে—রশি তাদের যেন ঢিলে না হয়—টাকু যেন ঘোরে—মুক্তিযজ্ঞের সূত্র যেন প্রস্তুত হয়। কিন্তু কৈ? দীর্ঘকাল ধরে সূত্রযজ্ঞ তো চলছে, এখনো তো যজ্ঞসূত্র ধারণ সম্ভব হোল না—এখনো তো ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্যে জীবনরুদ্র ধৃত হলেন না—এখনো তো সত্যের শূল ঝলক দিয়ে উঠলো না ঈশানমূর্ত্তির বিষাণযন্ত্রের রণদামামায়!

অপর্ণার ঘরের দেওয়ালে কাগজে আঁকা একটা ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা, মাঝে চরকাচিহ্ন; কেরোসীনের আলোকশিখা বাতাসে দুলছে, সেই আলোতে পতাকাটিও এক একবার জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠছে, আবার

ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে। অত বড় একটা কাগজ পেয়ে অপর্ণা হয়তো ওটা কোন কাজে লাগাবার জন্য কুড়িয়ে এনেছে। আলোক শুধুলো,

—ওটা কোত্থেকে আনলে—ঐ পতাকাটা ?

—কিশোর টাঙিয়ে রেখে গেছে দাদাবাবু! বললো,—'ইস্ ঝাণ্ডা বরাবর উঁচা রাখ্‌খো !'

হাসলো অপর্ণা কথাটা বলতে বলতে। কিন্তু আলোক হাসলো না। হাসির কথা এটা নয়; ঐ ঝাণ্ডা উচ্চশির করে রাখাই সাধনা আজ ভারতবাসীর এবং সেই সাধনাতেই তাদের সিদ্ধিলাভ করতে হবে—করতেই হবে সিদ্ধিলাভ। মুক্তির সেই পরম দিনে জীবনের রুদ্র জাগবেন হয়তো নওল কিশোরের মধ্যেই—তাই নওল কিশোর আজ এই সর্ব্বনিম্ন স্তরের জীবন-সাধনার প্রধান পাণ্ডা;—তার ঝাণ্ডা উচ্চশির থাক !

আলোক নমস্কার করলো জাতীয় পতাকাকে; অপর্ণা ওর নমস্কার করা দেখে প্রশ্ন করলো—ওটি কি জিনিস দাদাবাবু? ঠাকুর !

—হ্যাঁ, আমাদের জন্মভূমির জাগ্রত মূর্ত্তি। ওর থেকে বড়ো ঠাকুর আজ আর আমাদের নেই !

কিন্তু আলোক নিজেই বুঝলো, অপর্ণা তার কথা বুঝতে পারছে না। অপর্ণা বলল,—ঠন্‌ঠনের কালীমার কাছে পরশুদিন বসেছিলাম। একজন একটি আধুলি দিল, আর একটি মেয়ে কোলের ছেলের কাঁথাটা দিয়ে গেল। আজ একজনের কাছে এই হরলিক্‌স্ পেলাম। মা-কালীর ওখানে বসলে আমি বেশী পয়সা পাই দাদাবাবু!

হায়রে অভাব-রাক্ষসী! কোথায় জাতীয় জীবন, আর কোথায় বা জাতীয় পতাকা! সব বিজাতীয় হয়ে গেছে এদের জীবনে। জীবনের সাধনায় এরা শিবও নয়, শবও নয়, এরা শ্মশানচারী প্রেত। আলোক নিঃশব্দে বসে ভাবছে, অপর্ণা এর মধ্যে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে উঠে গেল

বাইরে। চা আর চিড়ে কিনে আনলো। আলোকের কাছে এসে অতি কুণ্ঠার সঙ্গে বলল—দুটিখানি দেব দাদাবাবু!

—দাও!—খিদের কথাটা ভুলেই গিয়েছিল আলোক। ওর মনের আলোকরশ্মি ইতস্ততঃ ঘুরছে আজ সারাদিন, খিদের কথা মনে করবার সময় পায় নি। তা ছাড়া কাল সে ভালই খেয়েছিল। অপর্ণার দেওয়া চা আর চিড়ে খেতে খেতে আলোক দেখতে পেল, অপর্ণা কাঠকুচি এনে রেখেছে একটা ছেঁড়া বস্তায়, তাই কিছু বের করে বাইরে এক যায়গায় দুখানা ইট দিয়ে তৈরী উনুনটা জ্বালালো। একটা মাটীর হাঁড়ি চড়িয়ে দিল উনুনে। এদিকে বৃষ্টি নেমেছে।

—দুটি ভাত রাঁধবো দাদাবাবু; খেয়ে যাবে? অপর্ণার কণ্ঠস্বরে জননীর স্নেহ এবং ভগিনীর প্রীতি যেন উৎসারিত হচ্ছে। ঝুমনীর খাবারে ভাগ বসিয়ে আলোকের লজ্জাশীলতাও নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে। ওর সে সময় মনে হোল না যে সে ভাগ বসাচ্ছে এক ভিখারিণীর খাদ্যে!

—হ্যাঁ, বেশ তো, রাঁধো!—বলেই কিন্তু তার মনে পড়লো, জীবন-সাধনার কোন্ স্তরে সে এসে দাঁড়িয়েছে—কোন্ কদর্য্যতম স্তরে! কিন্তু না, কদর্য্য কেন? ভিক্ষালব্ধ অন্ন পবিত্র অন্ন এবং অন্ন দান করবে মাতারূপিণী অপর্ণা, অন্নপূর্ণা। অপর্ণার হাতের খাদ্য তার অন্তরকে পবিত্র করবে, শক্তিমান করবে।

অপর্ণা রান্না করতে গেল ডিবেটা নিয়ে। আলোক আধো-অন্ধকারে বসে ভাবতে লাগলো—'তোমাকে একদিন ঘৃণা করেছিলাম; জীবনের সাধনা কতখানি কঠোর, তখন জানতাম না। আজ দেখছি তুমি সত্যি অপর্ণা, নিজকে রিক্ত করে পর্ণমাত্র আহার্য্যে তুমি তপস্যা কর।'

আলোকের শীতবোধটা এতক্ষণ চাপা ছিল নানা চিন্তায়। অপর্ণা তার রান্নাশালা থেকেই বললো—আমার শাড়ীটা হয়ত শুকিয়েছে দাদাবাবু, ঐটা পরে তোমার ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলতো।

শ্রীকাকলী মুখোপাধ্যায়

আলোক প্রত্যুত্তরে কোন কথা না বলে অপর্ণার শাড়ীখানা দুভাঁজ করে লুঙ্গির মত পরে ফেললো। কাপড়-জামাগুলো একধারে গুটিয়ে রেখে দিয়ে চুপটি করে বসলো দেওয়াল ঠেস দিয়ে। বিড়ি সে খায় না—খেলে ভাল হোত; সময় কাটাবার একটা ভাল উপায় বিড়ি। অপর্ণার ঘরে যদি থাকে এক-আধটা বিড়ি তো আলোক আজ টানবে। কিন্তু অপর্ণা রান্না করছে। তাকে ডাকতে আর ইচ্ছা হোল না আলোকের।

অপর্ণাকে আলোক ডাকলে না, কিন্তু একটা চিন্তা তার অনুভূতিতে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। কত সহজে, কত অনায়াসে এই সামান্য কয়দিনেই আলোক এই সুদুঃসহ জীবন-সাধনায় অভ্যস্থ হয়ে উঠলো! নিজের ছেঁড়া-ময়লা কাপড়ের তো কথাই নাই, অপর্ণার পরিধেয় শাড়ী পরে স্বচ্ছন্দে বসে থাকতেও তার আর বাধছে না। অপর্ণার রান্না করা ভাত সে অমৃতবৎ গ্রহণ করতে পারবে, অপর্ণার উচ্ছিষ্ট বিড়ি পেলে সে এখন হয় তো টানতে পারে! জীবন-ধারণের সুকঠোর সাধনায় মানুষে কেমন করে জান্তব জীবনের সর্ব্বসহিষ্ণুতায় অভ্যস্থ হয়ে যায়, আলোক সেই কথাটাই অনুভব করছিল।—কিন্তু ডাষ্টবীনের উচ্ছিষ্ট! না—অতটা এখনো আলোক উঠতে পারে নি তার সাধনার পথে। ওটা নিশ্চয় খুব উচ্চতর অবস্থা এই সাধনার। ও অবস্থা লাভ হতে আলোকের দেরী হবে।

হোক—আলোক দেখবে, এই জীবন কেমন করে কোথায় তাকে নিয়ে যায়। মানব জীবনের কোন্ মহিমময় স্তর সেটা। ভাগ্যবলে সুযোগ-সুবিধা বেশ জুটে গেছে আলোকের। এই অপর্ণা, নওলকিশোর, রাধিয়া, রামধনিয়া আজ তার পরমাত্মীয়—গামছাবাঁধা বইগুলো মাথায় দিয়ে আলোক ভাবতে লাগল।

ভাবছিল কি ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঠিক নাই, অপর্ণার ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখলো, তার ছেঁড়া কাপড়-গেঞ্জী-পাঞ্জাবীতে সাবান ঘষে অপর্ণা ভিজতে দিয়েছে। ওকে উঠতে দেখে বললো,—ভোরবেলা কেচে

দিবো দাদাবাবু! বড্ড নুংড়া হইছে কাপড় চোপড়। বিহানেই শুকিয়ে যাবেক। উঠো, খাও!

মমতাময়ী নারী!—মাতা-কন্যা-বধূ! নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয়া হয়েও আজ আলোকের জীবন আলো করে দিল স্নেহ দিয়ে—সহানুভূতি দিয়ে। পুরুষ এদের জন্যই নিজের পৌরুষশক্তিকে জাগ্রত রাখে, মৃত্যুকে পরাজিত করে, জীবনকে বিজয়ী করে তোলে সংসারের কুরুক্ষেত্রে; এরাই মানুষের জীবনরথে পাঞ্চজন্য বাজিয়ে বলে—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ!' এরাই ঘোষণা করে, 'মামেকং শরণং ব্রজ!'

উঠে পড়লো আলোক। অপর্ণা তার ফুটো টিনে জল এনে ঘরের একটু যায়গা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিল। তারপর ভাত দিল একটি শালপাতার ঠোঙা খুলে—পরিপাটি করে সাজিয়ে ভাত, বেগুনপোড়া, আলুসেদ্ধ আর আচার! কোত্থেকে এসব যোগাড় করলো অপর্ণা, তা সেই জানে, কিন্তু আলোক খেতে বসে তৃপ্তিতে ভরে উঠলো। তার মা'র হাতের খাবারের কথা মনে পড়তে লাগলো ওর বারম্বার। এই অপর্ণাকে সে অতি কুৎসিত কথা বলে গিয়েছিল সেদিন। অনুশোচনা বাড়তে লাগলো আলোকের কিন্তু অপর্ণা বসে বসে ওকে খাওয়ালো—ঠিক তপস্বিনী অপর্ণার মতই ওর মুখকান্তি রুক্ষ সুষমার রশ্মি বিকীর্ণ করছে! কালো চোখে ওর বিশ্বমাতার স্নেহালোক। ছেলেটা কেঁদে ওঠায় অপর্ণা ত্বরিতে গিয়ে কোলে নিল, পিট চাপড়ে বলতে লাগলো—ঘুমা, ঘুমা, 'খোকা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো.....'মাতৃত্বের সুমহান ব্যঞ্জনা ওর সারা অবয়বে! কী আশ্চর্য্য নারীর এই মাতৃমূর্ত্তি!—কিন্তু আলোকের আরো আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে,—কোনো নারী আপন সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করতে চায়, আর কেউবা পথে কুড়িয়ে-পাওয়া সন্তানকে সযত্নে লালন করে—ঐ শিশুটির জীবনেতিহাসেই তার শিলালিপি ক্ষোদিত।

আহার শেষ করে আলোক হাত ধুলো ; বৃষ্টি তখনো বিরাম পায়নি, রাস্তায় জল জমে উঠেছে হাঁটু অবধি ! আলোক কি করে যাবে এবং কোথায় যাবে, ভাবছে ; অপর্ণা বললো,—এতো জল ঝড়ে যাবে কি করে দাদাবাবু ! তোমার কাপড় জামাও কাচা হয় নাই।

—হ্যাঁ—থেকেই যাই আর কিছুক্ষণ !—বলে আলোক নিশ্চিন্তে, যেন একান্ত আপনার জনের আশ্রয়েই শুয়ে পড়লো সেই ছোট্ট ঘরের একপাশে মেঝের উপরই। অপর্ণা খোকার পরিষ্কার তোয়ালেটা ওর গায়ে ঢাকা দিয়ে দিল !

একঘুমেই রাত্রি শেষ হয়ে গেছে ; সূর্য্যোদয় হয়েছে। আলোক উঠেই দেখলো, বৃষ্টি থেমেছে ; অপর্ণা তার জামাকাপড়গুলো কেচে শুকুতে দিচ্ছে বাইরের দেওয়ালে। ওকে উঠতে দেখে বললো—ঐ দিকপানে কল আছে দাদাবাবু, হাতমুখ ধুয়ে এসো।

প্রাতঃকৃত্য শেষ করে এসে আলোক দেখলো—অপর্ণা চা কিনে এনেছে, তার সঙ্গে মুড়ি। ওকে খেতে দিয়ে বলল—খোকার একটি নাম রেখে দাও তো দাদাবাবু !

—নাম ! ওর নাম থাক জীবন-রুদ্র !—আলোকের মুখ থেকে অকস্মাৎ কথাটা বেরিয়ে গেল !

—জীবন ! বেশ নাম। আমি 'জীবন' বলে ডাকবো।

—হ্যাঁ—আমি 'রুদ্র' বলে ডাকবো।

আলোক চা-মুড়ি শেষ করে বাইরে বেরিয়ে আসছে, অপর্ণা হেসে বললো—এখন বেরিও না দাদাবাবু, তুমি আমার শাড়ী পরে আছ।

আলোক লজ্জিত হয়ে বসে পড়লো আবার। একটা হকার কাগজ বিক্রী করতে করতে যাচ্ছে, অপর্ণা কাপড়ের খুঁট থেকে দু' আনি বের করে বলল—দাও একখানা ভাল কাগজ !—কাগজ নিয়ে দিল আলোকের

হাতে। বলল,—যারা ভিটে ছেড়ে চলে গেছে, তাদের কোন খবর আছে কিনা দেখতো দাদাবাবু!

আলোক নিঃশব্দে ওর মুখ পানে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ!

কিন্তু খবরের কাগজ-ওয়ালাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ! সমষ্টিগত-ভাবে কিঞ্চিৎ খবর দেবার ওঁরা চেষ্টা করেন, ব্যষ্টিগতভাবে এই বিরাট দেশের খবরাখবর দেওয়া প্রায় অসম্ভব, এবং সম্ভাবনার চেষ্টাও সঙ্কুচিত। আলোক অপর্ণার মুখপানে চেয়ে ভাবছে, কী আকুল আগ্রহ ঐ নারীর চোখে-মুখে! আপন আত্মজনের জন্য প্রাণ ওর কতখানি ব্যাকুল! কিন্তু যে দুর্ভাগারা গৃহ ছেড়ে চলে গেছে, তাদের উদ্দেশ পাওয়া যে আজ অসম্ভব, এ তত্ত্ব ওর বিরহী মন বুঝতে চায় না।

আলোক খবরের কাগজখানা পড়তে লাগলো। বড় বড় হরফে উড়োজাহাজের উচ্চ রাজনৈতিক সংবাদ—মাঝারি হরফে মন্তব্যের সঙ্গে মানসিকতা মিশিয়ে এক ভাবগ্রাহী উচ্ছ্বাস, আর সাধারণ হরফে অসাধারণ সব কথার স্ফুলিঙ্গ! খুব ছোট অক্ষরেও সংবাদ যথেষ্টই আছে। কিন্তু সেগুলো শুধু সংবাদ এবং সেই গুলোই আলোকের কাছে অধিক মূল্যবান বোধ হোল। কিন্তু অপর্ণাকে সান্ত্বনা দেবার মত কোনো সংবাদই সে খুঁজে পেল না।

নিরাশ হয়ে অপর্ণা উঠে চলে গেল—খোকাকে কোলে নিয়েই বেরিয়ে গেল। আলোক প্রায় দীর্ঘ একমাস যাবৎ সংবাদপত্র পড়তে পায় নি, আজ সে দুচোখ ডুবিয়ে সমস্ত কাগজখানা পড়তে লাগলো। তন্ময় হয়ে পড়ছে; বাইরে ভূমিকম্প হলেও সে টের পাবে না—সবটা শেষ করে এবার বিজ্ঞাপন পড়ছে। একটা বিজ্ঞাপনে ওর নজর আটকে গেলো।

'কর্ম্মী চাই:—বিশ্বেশ্বরী নিকেতনের জন্য প্রচারকার্য্যে অভিজ্ঞ সুশিক্ষিত এবং ত্যাগব্রতধারী কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা কর্ম্মী আবশ্যক।

আহার, বাসস্থান এবং যৎকিঞ্চিৎ হাতখরচ দেওয়া হইবে। সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করুন '

অনেকগুলো বিজ্ঞাপন পড়ার মধ্যে এটাও পড়লো আলোক। কিসের জন্ত এই নিকেতন, কি কাজ ওখানে হয়, কোনো কথাই লেখা নেই, তবে 'সুশিক্ষিত এবং ত্যাগী' কথা দুটোতে জানা যাচ্ছে, কাজটা ভাল কাজ! আলোক একবার যাবে নাকি ওখানে! সত্যি ভাল কাজ হলে কাজে লেগে যেতে পারে। এমন করে অপর্ণা বা ঝুমনীর খাদ্যে ভাগ বসিয়ে তার তো চালানো উচিত নয়।

বাইরে ভয়ঙ্কর গোলমাল শোনা যাচ্ছে। কতক্ষণ থেকে গোলমাল হচ্ছে কে জানে। বেলাই বা কতটা হয়েছে, আলোক টের পাচ্ছে না। অপর্ণা এখনো ফিরলো না, তার ঘরখানি শূন্ত ফেলে রেখে আলোক তো চলে যেতে পারে না; বিজ্ঞাপনটা পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়ে আলোক বসে বসে ভাবতে লাগলো, ঐ সাবানে-কাচা পরিষ্কার জামাকাপড় পরে সে আজই যাবে বিশ্বেশ্বরী নিকেতনে।

গোলমালটা অত্যন্ত নিকটে; যেন সহরের বিশাল জনসমুদ্র অকস্মাৎ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে অগ্ন্যুৎপাতে;—আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত আসছে। কী এ? এত চীৎকার, আর্তনাদ, উচ্চ ধ্বনি একসঙ্গে, এ কিসের প্রকাশ-পরিণাম! প্রলয় নাকি? উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলো অপর্ণা; মুখে তার ফেনা ঝরছে যেন, মাতালের মত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো খোকাকে কোলে নিয়ে—; একেবারে কোণার দিকে বসলো গিয়ে!

—কি হয়েছে—অপর্ণা?

—চুপ্!.....অপর্ণার আওয়াজ এবং ইঙ্গিত একসঙ্গে! নিদারুণ দুশ্চিন্তায় আলোক অস্থির হয়ে উঠলো, কিন্তু অপর্ণা ক্রমাগত নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ থাকতে বলছে। ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, বাইরের গোলমালটা যেন দূরে সরে যাচ্ছে; অপর্ণা এতক্ষণে খোকাকে

কোল থেকে নামিয়ে শোয়ালো ;—আলোকের কাছে সরে এসে বললো, —দাঙ্গা লেগেছে, দাদাবাবু, যুদ্ধ করছে! আর হয়তো বাঁচলাম না দাদাবাবু!

—যুদ্ধ! আলোক অবাক হয়ে চাইল ওর মুখপানে! যুদ্ধ কার সঙ্গে কে করবে! এদেশে যুদ্ধ করবার মত শত্রু কোথায়! ইংরাজ এদেশের সম্রাট, আর এদেশে বাস করে যারা তারা তো সকলেই শাসিত এবং শোষিত! ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করবার মত শক্তি বা সাহস কোনোটাই তাদের নেই, তবে যুদ্ধ কে কার সঙ্গে করছে! অপর্ণা নিশ্চয় ভুল শুনেছে। আলোক জিজ্ঞাসা করলো—কার সঙ্গে কে যুদ্ধ করছে?

—তা জানি না! দেখে এলাম হরদম চেঁচামেচি চলছে। আর কে যে কোন্ দিকে ছুটে পালাচ্ছে দাদাবাবু, উঃ উঃ!

আলোক কিছুই বুঝতে পারলো না। বাইরে গিয়ে দেখে আসবার কথা বলতেই অপর্ণা ওর কাপড় ধরে বললো—না দাদা, আমার মরতে ভয় নাই। কিন্তু তোমাকে ওখানে যেতে দেব না। তুমি খোকাকে দেখো, আমি যেয়ে খবর নিয়ে আসি!

অপর্ণা বেরিয়ে গেল খোকাকে রেখে। খোকা ঘুমুচ্ছে। আলোক ডাকলো—রুদ্র! আর কত ঘুমুবে! জাগো! জীবনের জয়গানে মাতিয়ে তোল তোমার মাতৃভূমির আকাশ-বাতাস। ক্রন্দনে মন্থিত হচ্ছে জনসমুদ্র, এবার হে নীলকণ্ঠ, এই মহাবিষ পান করে মিলনের অমৃত বণ্টন করে দাও! মানুষ অমর হোক!

ছেলেটা সত্যি জেগে উঠলো, কেঁদে উঠলো! নিরুপায় আলোক তাকে কোলে তুলে চুপ করাবার চেষ্টা করছে। হয়তো খিদেতে কাঁদছে ও। হরলিক্স্-এর বোতল থেকে গুঁড়ো বের করে আলোক নিজের বুড়ো আঙুলে লাগিয়ে ওকে চোষাতে লাগল। বিলাতী খাদ্যের

বিজাতীয়তায় ওর জীবনপদ্ম অপবিত্র হবে না—ও রুদ্র, ও শ্মশানচারী শব-সাধক, ওর কিছুতেই অপবিত্রতা নেই। ও চিরশুদ্ধ অগ্নি; ও জাতবেদস্; কিন্তু গোলমালটা আবার আসছে, এবার অত্যন্ত নিকটে। আলোকের ভয় করতে লাগলো। কোথায় অপর্ণা? বেলা দুটো-তিনটের কম নয়। অপর্ণা কি ঐ হাঙ্গামার মধ্যে পড়লো গিয়ে?

না—অপর্ণা ফিরে এলো, কিন্তু বিশেষ কোনো খবর আনতে পারলো না। বললো,—রাস্তায় কোনো মানুষ চলছে না দাদাবাবু। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে; আর লাঠি-ছুরি-বর্ষা হাতে দলে দলে সব গুণ্ডারা যাকে সামনে পাচ্ছে তাড়া করছে! আমি প্রায় কুড়ি-পঁচিশজনকে পালাতে দেখলাম!

—পুলিশ নেই?—আলোক শুধুলো!

—কৈ? দেখলাম না তো!—এখানে থাকা আর উচিৎ নয় দাদাবাবু!

—কোথায় যাবে? যাবার জায়গা তো নেই আমাদের!

সত্যি কথা! অপর্ণা বললো,—তুমি সকালে চলে গেলেই ভাল করতে দাদাবাবু; আমার কাছে এসে তোমার হয়ত বা প্রাণটা যায়। আমার যা হয় হবে।

—আমারও তাই হবে। অত ভাবছো কেন?—আলোক সান্ত্বনা দিল অপর্ণাকে!

কিন্তু চতুর্দ্দিক থেকে বিকট গর্জ্জনধ্বনি, তার সঙ্গে করুণ আর্ত্তধ্বনি আসতে লাগলো ওদের কানে। জনমানবশূন্য রাজপথপানে চেয়ে আলোক দেখলো, জীবন যেন রণে ভঙ্গ দিয়ে পশ্চাৎপদ হয়েছে। মৃত্যু যেন প্রতি মুহূর্ত্তে এগিয়ে আসছে গ্রাস করতে মানুষকে! রুদ্রদেবতার একি নিষ্ঠুর খেলা! নিয়তির একি ক্রূরতম বিবর্ত্তন-যাত্রা!

সন্ধ্যা নেমে এলো, রাজপথে আলো কোথাও জ্বললো, কোথাও

জ্বললো না। রাত্রির গভীর অন্ধকারকে ঘনায়িত করে নামলো শ্রাবণের বাদল-ধারা—দুর্য্যোগের তিমির রাত্রি বিদীর্ণ করে জ্বলে উঠতে লাগলো বজ্রালোক; ভীত শশক-শিশুর মত শুয়ে রয়েছে অপর্ণার কোলে বালক রুদ্র!

আলো জ্বলে নি অপর্ণার কুটিরে আজ, কিন্তু ক্ষুধা-রাক্ষসী দন্তবিকাশ করছে ওদের উদরে। খাদ্য সেই—শুধু খাদকের দল ঘুরছে হিংস্র হায়েনার মত। একি বিপ্লব! একি বিপর্য্যয় মানুষের শান্ত সমাহিত গৃহজীবনে! কিসের জন্য এই বিড়ম্বনা? কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির এই আত্মঘাতী নীতি?—কে এই বিদ্বেষ-বহ্নির প্ররোচক এবং কে প্রতিগ্রাহক? আলোক স্তব্ধ বিস্ময়ে ভেবে চলেছে, অপর্ণা নিঃশব্দে বসে আছে খোকাকে কোলে নিয়ে। মাঝে মাঝে বিকট আওয়াজ ওদের বিভীষিকা দেখাচ্ছে যেন, আবার ধীরে ধীরে রাত্রির স্তব্ধতা জাগিয়ে তুলছে ওদের প্রাণে জীবনের আশালোক!

রাত শেষ হোল, কিন্তু বিপর্য্যয় শেষ হোল না। অপর্ণা বহু চেষ্টা করেও একখানা খবরের কাগজ আজ সংগ্রহ করতে পারলো না আলোকের জন্য! সমস্ত দিন ঘরে বন্দী ওরা—খাদ্য যৎসামান্য যা-কিছু ছিল অপর্ণার, শেষ হয়ে গেছে গতরাত্রেই। আজ দিন ভোর উপবাস চলছে। আলোক মরিয়া হয়ে বেরুতে গেল, অপর্ণা পায়ে ধরে বলল,

—না—দাদাবাবু, না! রাস্তার অবস্থা দেখে ভিরমী লেগে যাবে তোমার—রক্ষে করো, যেও না।

আবার রাত্রি এল! বর্ষার বর্ষণ এবং শরতের সৌন্দর্য্য নিয়েই এল রাত্রি—নিবিড় তিমির ভেদ করে আকাশে ফুটে উঠলো তারার ফুল, কালপুরুষ তার ধনুকে তীর যোজনা করছেন……

—তীব্র, তীক্ষ্ণ ভেরীরব, হুইসিল, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধ্বনি! হুঙ্কারধ্বনি!

মানুষ যখন বীভৎস বিপ্লবে মত্ত হয়ে অমানুষ হয়ে যায়, তখনো তার সৌন্দর্য্যজ্ঞান অটুট থাকে! বিপর্য্যয়কেও বরণ করতে সে জয়ধ্বনি করে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেও সে মঙ্গলধ্বনি করে! আশ্চর্য্য! আলোক শুনতে লাগলো—ধ্বনিটা উত্তরপ্রান্ত থেকে দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত বয়ে বয়ে গেল ছাতে ছাতে, বিশাল একটি তরঙ্গবৎ! মৃত্যুর জন্য মানুষের এই প্রস্তুতির মধ্যেও ললিতকলার আশ্চর্য্য বিকাশ! জীবন এইখানেই জয়ী—এখানেই সে মৃত্যুকে পরাভূত করেছে আপন অন্তরের সুষমা দিয়ে। এখানেই সে অমর!

এই অমরত্ব তার পরাজয়ের গ্লানিকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে যুগ-যুগান্তর ইতিহাসের অভিশপ্ত দিনগুলিকে সে অভিনন্দিত করতে পারে তার বীরত্ব-শৌর্য্যের স্মৃতি সুষমা দিয়ে।

আবার উঠলো উদাত্ত ধ্বনি! হিল্লোলিত মহাসমুদ্র যেন তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে আলোড়িত হয়ে অমৃতমন্থন করছে; যেন ভূমিকম্পের ভয়াবহ বীভৎসতার মধ্যে এই মহা-ধ্বনির আশ্বাসবাণী—; প্রাসাদশীর্ষ থেকে সে ধ্বনি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে বয়ে যাচ্ছে সহরের কণ্ঠ থেকে উপকণ্ঠে, অন্ধকার পৃথিবী থেকে আকাশের জ্যোতির্ম্ময় বিস্তারে! চীৎকার, হোলাহল, মরণান্ত আর্ত্তনাদ সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে শৌর্য্যসম্পদে গরীয়াময় মানুষের জয়ধ্বনির এই আশ্চর্য্য মত্ত-সৌন্দর্য্য সত্যিই ভীষণ-মনোভিরাম! মানুষ এই অপূর্ব্ব মাদকতাতেই মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলে অকুণ্ঠিত পদে, অবিচল হৃদয়ে—অনাস্বাদিত অমৃতাশায়।

আবার কোলাহল; চীৎকার, গর্জ্জন, হুঙ্কার! ক্রম্—ক্রম্—ক্রম্! মারণাস্ত্রের গগনভেদী মরণোল্লাস! উঃ! কি এ? মানুষের ইতিহাসকে

কি আজ আগুনের অক্ষরে লিখছে বিধাতা, কিম্বা রুদ্র তাঁর জটাজাল মেলে অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করেছেন—কিম্বা……না, আলোক ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। এবার যেন খুব কাছে, মরণ যেন মুখোমুখী হয়ে উঠলো! অদ্ভুত! অপর্ণা কোণে বসে কাঁপছিল এতক্ষণ ঠক্ ঠক্ করে। অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললো—একে বাঁচাতে হবে দাদা, যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে। মরতে আমার এতোটুকু দুঃখু নেই, কিন্তু তোমাদের আমি বাঁচাবোই। তুমি একে ধরো—আমি দেখি বাইরে গিয়ে।

বিদ্যুৎবেগে ছেলেটাকে আলোকের কোলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল অপর্ণা। অসমসাহসিকা ওর শক্তিমূর্ত্তি আলোক দেখতে পেল না অন্ধকারে, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর শুনলো,

—দাদা, ভয় নাই!

যেন ভৈরবীর অভয়বাণী! আলোক আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করছে; গোলমালটা ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগলো—যেন বিশাল একটা মৃত্যু-তরঙ্গ কূলের উপরকার কয়েকটা জীবকে কৃপা করে রেখে দিয়ে গেল। আবার আসবে, যে-কোন মুহূর্ত্তে আসতে পারে। অপর্ণা ফিরে এলো। ছেলেটা দারুণ কাঁদছে কয়েক মিনিট ধরে। ওর খিদের কথা কারো মনে ছিল না এদের। অপর্ণারই মনে পড়লো প্রথম—ইস্! সেই বেলা দুটোতে খেয়েছে!

ঘরের মধ্যেই কাঠকুচি দিয়ে আগুন জ্বালালো অপর্ণা। জল গরম করলো। হরলিক্স যতটা আছে সবটা দিয়ে তৈরী করলো খাবার—তার প্রায় অর্দ্ধেক একটা ফুটো টিনে আলোককে এগিয়ে দিয়ে বাকিটুকু ছেলেকে খাওয়াতে বসল। আলোক সবিস্ময়ে শুধুলো—সকালে কি দেবে ওকে? তুমিই বা এখন খাবে কি?

—সকালে যদি ও বাঁচে তো খাবারও জুটবে। আমার এক-আধ

রাত না খেলে কিছু হয় না দাদা, তুমি খাও! লক্ষ্মীটি, আমায় দিও না; খাও, আমার মাথার দিব্যি, খাও!

মাতৃজাতির মহিমময় প্রকাশ! আলোক নিঃশব্দে টিনটা তুলে নিল। লজ্জায় ওর মরে যাবার কথা, কিন্তু মরণের কথা ও এখন চিন্তা করছে না; জীবনের রুদ্র সাধনায় ও এতো সহজে ব্যর্থ হবে না—ওকে সিদ্ধিলাভ করতে হবে। আলোক দুধটুকু আস্তে খেতে লাগলো। অপর্ণা ছেলেটাকে অনেকখানি দুধ খাইয়েও শেষ করতে পারলো না—অবশিষ্টটুকু নিজে পান করলো। এর মধ্যে বাইরের গণ্ডগোল কয়েকবার বেড়েছে, আবার কমেছে, ওরা খোঁজ রাখে নি। ধীরে ধীরে যেন এই বীভৎস পরিস্থিতিতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে আসছে। সত্যি, অতখানি আতঙ্কের মধ্যেও আলোক ঘুমিয়ে গেল! একেই বলে জীবন-রুদ্র! প্রেতায়িত শ্মশানেও তিনি শব—নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, সমাধিস্থ! জীবন এবং মৃত্যু তাঁর দুই চক্ষে নিদ্রিত আর জাগ্রত থাকে কিন্তু তাঁর তৃতীয় নয়ন—সে নয়ন জীবন-মৃত্যু অতিক্রমকারী অবিনশ্বর জীবনায়ন, ধ্বংসেই যাঁর সৃষ্টিশক্তির বীর্য্য-সঞ্চার, প্রলয়েই যাঁর পালনের মহতী ঔদার্য্য!

ঊষার আবির্ভাব অনন্ত আশ্বাস জাগিয়ে তুললো সহরবাসীর বুকে। আজ নিশ্চয় শান্ত মানুষের সহজ জীবন আবার ফিরে আসবে; কিন্তু কোথায়? আতঙ্ক আর আর্ত্ততা যেন গ্রাস করেছে সারা সহরটাকে! সারাদিন উপবাসী আছে আলোক এবং অপর্ণা, কিন্তু অপর্ণা আশ্চর্য্য মাতা! ছেলেটাকে সে উপোস থাকতে দেয়নি। দোকানপাট সমস্ত বন্ধ, রাস্তায় মানুষ কদাচিৎ দেখা যাচ্ছে, সেই শ্মশানপুরীতেও অপর্ণা বেরিয়ে কোত্থেকে এক ভাঁড় দুধ সংগ্রহ করে এনেছে। আলোক জিজ্ঞাসা করলো—কোথায় পেলে?

—পেলাম। ওপাশে গোয়ালারা থাকে; বেশি দিতে পারলো না, এইটুকু দিল।

গরম করে তাই বার দু'তিন খাওয়ানো হয়েছে ছেলেটাকে, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে আলোকের উদরে ক্ষুধাদেবী প্রচণ্ড হয়ে উঠলেন। অস্থির হয়ে সে অপর্ণাকে বললো,

—আমাকে যেতে দাও অপর্ণা! এমন করে সকলের না খেয়ে মরে লাভ কি?

—গেলেই তুমি খেতে পাবে না দাদাবাবু! খাবার কোথাও পাওয়া যাবে না; আমি সব দেখে এলাম।

আলোক তথাপি বেরিয়ে কিছুটা দূরে গেল। জনমানব শূন্য প্রেত-পুরীর মত দেখাচ্ছে সমস্ত রাস্তাটা! ভয়ভয় করতে লাগলো আলোকের। সে ফিরে এল আবার অপর্ণার আশ্রয়ে। রাত্রি গভীর হয়ে চলেছে; চীৎকার, কোলাহল এবং বন্দুকের আওয়াজ বারম্বার শ্রবণযন্ত্রকে পীড়িত করে তুলছে! মানুষ যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে এই তিনটা দিন ধরে। তবুও মানুষ অমর; মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে অবিশ্রাম চলেছে তার সংগ্রাম—আপনাকে উচ্ছিন্ন করে দিতে কিছুতেই সে চায় না—যেমন করে হোক, ভ্রূণবীজকে সে রেখে যাবে মৃত্যুচিতার ভস্মস্তূপেও! অপর্ণার কেউ নয় ঐ ছেলেটা, তথাপি অপর্ণা তাকে বাঁচাবে—ঐ ভ্রূণাঙ্কুরকে রেখে যাবে বিশাল মহীরুহে পরিণত হবার জন্য। ওর মা ওকে মৃত ভেবে ফেলে দিয়ে গেছে, কিন্তু অপর্ণা ওকে মরতে দেবে না—অপর্ণা ওকে অমর করে যাবে আপন মৃত্যু দিয়ে।

সত্যি মৃত্যু এসে দাঁড়ালো অন্ধকার ঘরটার দরজায়। প্রকাণ্ড যষ্টি তার হাতে—!

—কে? প্রশ্নটা আলোকের গলার স্বরে ফুটলো না, আটকে রইলো বুকের ধ্বক্‌ধ্বক্ আওয়াজের মধ্যে! টর্চ্চের তীব্র ফোকাস করে আগন্তুক দেখলো ওদের; আলোক ওর উদ্যত যষ্টি মাথায় নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে চোখ বুজেছে, কিন্তু যষ্টি পড়লো না—সশ্রদ্ধ অভিবাদন এলো কাণে,

—বাবুজি! আপ্ হিঁয়া হ্যায়! জয় ভগবান! হামি আপকে লিয়ে কেৎনা ঘুরলাম—জয় ভগবান। আপনে বেঁচে আছেন বাবুজি, বহুৎ বহুৎ খুস্ হইলাম! আউর অপর্ণা দিদি—তুমিভি তো ভালই আছ! কুছ ডর নেহি; আব্ গোলমাল থাম্ যাবে—কুছ ডর নেহি।

কিশোর! ঐ অদ্ভুত পথচারী বালক এই নিদারুণ বিপদ মাথায় নিয়ে আলোকের খোঁজ করেছে, অপর্ণাকে দেখতে এসেছে! আর আলোক? অপর্ণার আঁচল ধরে বসে কোটরাশ্রয় করে আছে আজ তিন দিন। ধিক্! আলোক লজ্জাতে অধোবদন হয়ে গেল; কিন্তু কিশোর ওসব লক্ষ্য করলো না, বললো—খানাপিনার বড়ি কষ্ট হইয়াছে বাবুজি? ক্যা করেগা! আভি তো কুছ মিলানে সেকেগা নেহি! উ লেড়কা ক্যা খায়া?

—দিনে দুবার দুধ খাইয়েছি কিশোর। খিদেতে ও হয়তো মরে যাবে।—অপর্ণা বললো।

—আহা! নেহি দিদি! হামি দেখ্ছে।

পর মুহূর্তেই ঘরে অন্ধকার করে কিশোর বেরিয়ে গেল। কোথায় গেল কে জানে! শ্মশানচারী শিব ও; ও কোনোদিন শবরূপ ধারণ করে না। ও সদা জাগ্রত, অতন্দ্র, অনলস, অভয়মন্ত্রের উদ্গাতা! কিন্তু আলোকের মন ওর স্তুতিগান করতে গিয়ে নিজের উপর অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠলো! নিজকে ও যেন ক্ষমা করতে পারছে না। ওর কাপুরুষতা ওকে শুধু লজ্জিত নয়, আত্মগ্লানিতে অবসন্ন করে তুলছে। আধঘণ্টা কেটে গেল ওর মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে! কিশোর ফিরে এলো—পাতার ঠোঙ্গায় ভর্ত্তি খিচুড়ী, মাটির গেলাসে এক গ্লাস দুধ। আলোক শুধুলো,

—এই ডামাডোলের বাজারে এ সব কোথায় পেলে কিশোর?

—আশ্রয় কেন্দর্ খুলিয়াছে বাবুজি। চলেন ত আপনাদের ওখানে লিয়ে যাব!

মানুষ বাঁচবার সাধনায় মেতেছে। বাঁচতে হবে, তাই একতা চাই, আশ্রয়-স্থল চাই—খাদ্য পানীয় চাই। চাই সঙ্ঘবদ্ধতা, সমাজচৈতন্য, ধর্ম্ম-সমন্বয়! কিন্তু কে করবে? করবে—এই আহবের আহুতিতে ভস্ম হয়ে যাবে কদর্য্য-কালিমার আবর্জ্জনাস্তূপ, শুধু থাকবে হিরণ্যগর্ভ মানুষ, মানবিক চৈতন্য, মানবীয় জীবন-বেদ!

দুধটা গরম, অপর্ণা তৎক্ষণাৎ ছেলেকে খাওয়াতে বসে গেল। ক্ষুধার জ্বালায় ছেলেটা ঘুমুতে পারছিল না—এতক্ষণে চুপ করে ঘুমুতে লাগলো। কিন্তু আলোকের কিছু খেতে রুচি হচ্ছে না। নিজেকে ওর অতখানি হীন এবং নীচ আর কোনোদিন হতে হয় নি, এমন কি ঝুমনীর খাদ্যে ভাগ বসিয়েও না, রুদ্রের হরলিক্স খেয়েও না; ডাষ্টবীনের খাদ্য-খুঁটে-খাওয়া নওলকিশোর ওর কাছে আজ শুধু দেবতা নয়—অভয়দাতা অমৃতময় মহারুদ্র, বিষপানকারী নীলকণ্ঠ!

কিন্তু অপর্ণা এগিয়ে এসে খাদ্য পরিবেশন করলো আলোককে। কিশোর বললো—হামি এক দফে বহুবাজার যাচ্ছে! হুঁয়া একঠো মাইজী আছেন, দেখে আসি।

—রাস্তায় বড় বিপদ কিশোর। কি করে যাবে?

—কুছ্ পরোয়া নেই বাবুজি! হামি উসব থোড়াই কেয়ার করে!

কিশোর চলে গেল, যাবার সময় আর একবার আশ্বাস দিয়ে গেল, সকালেই সে এসে তাদের আশ্রয়-শিবিরে নিয়ে যাবে। অপর্ণা ছেলে কোলে নিয়ে ঘুমিয়ে গেল, কিন্তু আলোকের মস্তিষ্কে অনন্ত চিন্তা—আত্ম-তিরস্কার—আত্মগ্লানি। দীর্ঘ—দীর্ঘ রাত্রি সে বসে রইল নীরবে—শুনতে লাগলো, মৃত্যুর তাণ্ডবের মধ্যে জীবনের বিজয়াভিযান-সঙ্গীত!

বিপর্য্যয়ের মধ্যে বিশ্বযন্ত্রের যন্ত্রী যেন নবতম সঙ্গীত-সাধনায় নিরত হয়েছেন; নব সৃষ্টির প্রেরণা মানুষকে নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত করছে—নূতন মন্ত্রে জাগ্রত করছে।

এই বিপ্লবময় অগ্নিদাহে উৎপলার কর্ম্মপদ্ধতি নিঃশেষে ভস্মসাৎ হয়ে যেত, কিন্তু তার সব-কিছু রক্ষা করে দিলেন সেই বন্ধু ভদ্রলোক। কে জানে, কোন্ কৌশলে তিনি উৎপলার বিশ্বেশ্বরী-নিকেতনের দরজায় পাহারা বসিয়ে, উৎপলার আশ্রম-বাসিনীদের জন্য খাদ্য পানীয় প্রেরণ করে এমন ভাবে সুরক্ষিত রাখলেন যে ঐ মহা তাণ্ডবের মধ্যেও উৎপলার নিকেতন অক্ষত হয়ে অধিষ্ঠিত রইল। উৎপলা এর জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু সে-ভদ্রলোক আজ পক্ষকাল উৎপলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি! কে জানে, কেমন আছেন তিনি! তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক উৎপলার মনে অন্য একটা চিন্তার উদয় হোল।

এই বিপর্য্যয়কর পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসছে—সহজ জীবন ফিরে আসছে আবার সহরের প্রাণ-কেন্দ্রে। এই ক'দিনে যা-কিছু হয়ে গেল, যেন স্বপ্ন, যেন অতীত ইতিহাসের বিভীষিকাময় স্বপ্ন একটা। কিন্তু এবার মানুষের সহজ-সমাজে উৎপলার এই নিকেতনের স্থান হবে কোথায়? এ নিকেতন এখনো যথেষ্ট প্রচার-গৌরব লাভ করেনি, এখনো দেশের নেতৃস্থানীয় কেউ একে অভিষিক্ত করেন নি আশীর্ব্বাদে। এ নিকেতন এখনো উৎপলার একার শক্তি ও সাহসের উপর ভর করে রয়েছে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। দেশের মানুষের সস্নেহ সমর্থন এবং সাহায্য না পেলে এরকম কাজ চলতে পারে না। উৎপলা প্রচুর শিক্ষা লাভ করেছে, এই সব কাজ করার কালো দিক এবং আলোর দিক সে জানে। ঐ বন্ধুলোকটি এলে সে পরামর্শ করতে পারতো এ বিষয়ে।

কয়েকদিন টেলিফোন করে উৎপলা ব্যর্থ হয়েছে, আজ আবার ফোন করলো! তার ভাগ্য ভাল, ভদ্রলোক বললেন যে তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই

আসছেন। সানন্দে উৎপলা প্রসাধনে নিরতা হোল। তার শরীর এর মধ্যে যথেষ্ট সেরে উঠেছে এবং চোখে-মুখেও সজীবতা ফুটে উঠেছে। আশ্চর্য্য এই যে, এতখানি বিপর্য্যয়ের মধ্যে উৎপলার মনে বিশেষ কোনো আঁচড় লাগেনি; এর কারণ, সে সব সময় মরবার জন্য প্রস্তুত ছিল। মরণ ওকে গ্রহণ করে নি, তাই জীবন ওকে নবজীবন দান করে গেল। উৎপলা আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে সহরের বাইরের এই নিকেতনের স্বাস্থ্যকর হাওয়ায়।

ঠিক তিন কোয়ার্টার পরেই এলেন ভদ্রলোক। উৎপলা অভিবাদন জানিয়ে শুধুলো—সকলেই বেশ ভাল আছেন আপনারা?

—হ্যাঁ, তোমাদের সব কুশল তো?

—হ্যাঁ! বলে উৎপলা তাঁর সঙ্গে নানা পরামর্শ করতে লাগলো। সব কথাই এই বিশ্বেশ্বরী নিকেতনকে কেন্দ্র করে এবং এর স্থায়ীত্বের ব্যবস্থার জন্যই—কিন্তু ভদ্রলোক একদৃষ্টিতে উৎপলার মুখের পানে চেয়ে আছেন। উৎপলা এঁকে চেনে, কোন্ মতলবে ইনি কি ভাবে তাকান, তার কিছু পরিচয় উৎপলার বিদিত। তাই ওঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিতটা ধরতে সময় লাগলো না; মুখ নামিয়ে উৎপলা ভাবলো—প্রসাধনের পারিপাট্যে সে নিজকে বিড়ম্বিত করেছে, নাকি তার স্বভাব-সৌন্দর্য্যেই এই লোকটিকে আকর্ষণ করছে!—যাই হোক্ উৎপলার চিন্তিত হবার কোনো কারণই নেই, তবু উৎপলা কেমন সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো।

ঠিক সেই সময়ে এলো একটি যুবক, বাইরে থেকেই বিনম্রভাবে বললো,—আসতে পারি কি?

—আসুন! উৎপলা যেন বেঁচে গেল তার দুশ্চিন্তা থেকে। ভদ্রলোক কিন্তু বিরক্ত হলেন এমন অতর্কিতে একজন অপরিচিত ব্যক্তির প্রবেশে। আপনার মনে বললেন,

—ভাল একটা বেয়ারা রাখা দরকার। এমন অকস্মাৎ কেউ যাতে না আসতে পারে।

—হ্যাঁ, কিন্তু চাকর-দারয়ান-বেয়ারা পাওয়া আজকাল বড্ড কঠিন। বলে উৎপলা আগন্তুককে বললো—কি চান আপনি ?

পুরানো খবরের কাগজটার ভাঁজ খুলে আলোক পেনশিল-মার্কা যায়গাটা দেখিয়ে বললো—এই বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি। কাজ কি খালি আছে এখনো ?

—হ্যাঁ, আছে! বসুন! আমরা দশ পনর জন লোক চাই! এই গোলমালের জন্য বড় কেউ আসছেন না। আপনি কি ও কাজ নিতে রাজি আছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! কিন্তু আমি খুব ত্যাগী মানুষ নই ; আহার, বাসস্থান ছাড়াও আমার আরো কিছু দরকার। দেখুন না, এই জামাকাপড়—, কোনোরকমে সাবান ঘষে এসেছি।

উৎপলা ওর পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল। সুন্দর সুগঠিত দেহে ওর অখাদ্যের অপুষ্টি, কিন্তু চোখে অপরিসীম উজ্জ্বলতা! ও যে অভিজাত বংশজাত, তা মুহূর্ত্তে বোঝা যায়—বললো,

—আমাদের ফাণ্ড খুব বেশি নয়, আপনাকে মাসিক পঁচিশ টাকার বেশি হাত-খরচ দিতে পারব না।

—বেশ, ওতেই হবে। এখন বলুন, কি এখানকার কাজ ? আমায় কি করতে হবে ?

উৎপলা ধীরে ধীরে বললো তার কাজের উদ্দেশ্য, তার কর্ম্মপন্থা, তার বাধাবিঘ্নের আশঙ্কা এবং অর্থ-সংগ্রহের উপায়। আলোক নীরবে শুনে গেল।

—তুমি লেখাপড়া কতদূর শিখেছ ?—বন্ধু ভদ্রলোক এতক্ষণ পরে শুধুলেন চুরুট টানতে টানতে।

—এম্-এ পাশ করেছিলাম। তারপর গবেষণা করবার

—থাক—থাক! ওর বেশি বিত্তের আমাদের দরকার নেই—উৎপলা হেসেই বললো।

—কাগজে-পত্রে এই কাজের কথা প্রচার করতে হবে, বক্তৃতাও দিতে হবে মাঝে মাঝে—পারবে তো?

ভদ্রলোক পুনরায় প্রশ্ন করলেন আলোককে। আলোক সবিনয়ে জানালো,

—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমার অভ্যাস আছে।

অতঃপর সব ঠিক হয়ে গেল; এমন কি, আলোক ঐ বাড়ীর নীচের তলার কোন্ ঘরটায় থাকবে, সে-ব্যবস্থা পর্য্যন্ত। সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নাই। সহরে সান্ধ্য-আইন থাকার জন্য ভদ্রলোককে উঠতে হবে, তিনি উৎপলাকে বললেন,

—তুমি কি বাড়ী যাবে না কি? যাও তো আমার গাড়ীতেই চলো, নামিয়ে দিয়ে যাব!

—হ্যাঁ, যাব—বলে উৎপলা আলোককে শুধুলো—আপনি কি আজ থেকেই থাকবেন এখানে?

—আজ্ঞে না। আমি যেখানে থাকি সেখানে একবার যেতে হবে। কাল আমি আসবো!

—তাহলে আসুন, আমাদের গাড়ীতেই চলুন—বলে আমন্ত্রণ করলো ওকে উৎপলা। আত্মরক্ষার এই সহজ উপায়টা সে অবলম্বন করতে বাধ্য হোল আজ। বন্ধুটির সঙ্গে একা-গাড়ীতে সে এই সন্ধ্যার অন্ধকারে যেতে চায় না। আলোক যেন বুঝলো তার অন্তর—শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে উঠলো মন তার এই নারীর প্রতি; কিন্তু বন্ধুটি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁর মুখখানা বিরক্তিতে কালো হয়ে উঠলো,—আলোক লক্ষ্য করে বললো—থাক, আমি হেঁটেই চলে যেতে পারবো। রাস্তার বিপদাপদকে আমার খুব ভয় নেই।

—কিন্তু আমার ভয় আছে। আপনি আজ থেকে আমার সহকর্মী; আপনার জীবন আমার কাছে এবং আশ্রমের কাছে মূল্যবান।—আসুন! —বলে উৎপলা স্বহস্তে গাড়ীর দরজা খুলে দিল আলোকের জন্য। নিরুপায় আলোক উঠে বসলো পিছনের সীটে—আর সামনের আসনে চালক বন্ধু এবং তাঁর পাশে উৎপলা!—গাড়ী চলছে!

সন্ধ্যার আলোছায়ামাখা শান্ত পথ—সুন্দর; কিন্তু নির্জ্জনতায় যেন মৃত-শক্তির কঙ্কালের মত করুণ! আলোক দেখছে আর ভাবছে। চাকরীটা নিল সে—না নিলেও খুব ক্ষতি হোত না; ঝুমনীর খাদ্য, অপর্ণার ভিক্ষা আর আশ্রয়কেন্দ্রের আতিথ্য যোগাড় করে সে এই কয়দিন মন্দ কাটায় নি। কিন্তু তার ঘৃণা জন্মে গেছে নিজের পৌরুষ শক্তির উপর। সে বুঝেছে, সে রুদ্র-জীবনের সাধক নয়। সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের সহজ জীবনের সাধনা করবে। এই পক্ষকালের ভয়কম্পমান ভীষণ জীবন ওকে কুকুরের থেকেও ঘৃণিত জীবের পর্য্যায়ে নামিয়েছে—অপর্ণার আশ্রয় যেন পক্ষপুট দিয়ে লালন করছে ওকে! সেই অপর্ণা অত্যন্ত অসুস্থ। জ্বরের ঘোরে ক্রমাগত ভুল বকছে আজ তিনদিন যাবৎ। তার ছেলে আজ সমস্ত দিন অনাহারে আছে—আলোক এক ফোঁটা দুধের যোগাড় করতে পারে নি; তাই ঐ বিজ্ঞাপন সে আবার বার করেছিল বইএর পুঁটলীটা থেকে। কিন্তু চাকরী হলেও পয়সা তো সে এখনি পাবে না! অপর্ণাকে ওষুদ দেবার এবং রুদ্রকে খাদ্য দেবার ব্যবস্থা কি হবে!

—আমায় দু-একটা টাকা আপনি আগাম দিতে পারেন?—আলোক বলে ফেললো। দুজনেই ওরা তাকালো পিছন ফিরে! আলোক আবার বললো—বাড়ীতে অসুখ, ছেলের দুধ চাই!

—আপনার ছেলে?—উৎপলা প্রশ্ন করলো!

—না—আমার বোনের। বোনেরও খুব অসুখ, হয়তো বাঁচবে না!

উৎপলা ব্যাগ খুলে পাঁচ টাকার একখানা নোট দিল আলোকের

হাতে! কৃতজ্ঞ আলোক মাথা নামিয়ে ধন্যবাদ দিল ওকে। এই নারীর মহিমান্বিত মুখে মাতৃত্বের অলৌকিক জ্যোতি মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল—আলোক দেখলো, এই প্রসাধনপুষ্টা বিলাসবতীর মধ্যেও সেই বিশ্বজননীর আবির্ভাব!—কিন্তু গাড়ী এসে দাঁড়ালো প্রকাণ্ড বাড়ীটার কাছে। আলোকের পরিচিত বাড়ী। উৎপলা নেমে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। আলোকও নামলো—কিন্তু কে এই নারী? কে এ? এই কি সেই দুর্য্যোগরাত্রির নায়িকা?

অনাহারে আর অখাদ্যে-কুখাদ্যে এই অসুখটা বাধালো অপর্ণা। আশ্রয়-কেন্দ্র ওকে আশ্রয় দিয়েছিল দিন সাতেক, কিন্তু তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং সাহায্যও আশানুরূপ এলো না সবক্ষেত্রে। কাজেই সক্ষমদের সরিয়ে দিতে হোল। অপর্ণা এবং আলোক পড়লো এই দলে। কয়েক দিনের অবিশ্রাম বিশ্রামলাভ এবং অবিরাম দুর্গত মানুষের মিছিল দেখতে দেখতে আলোকের চিন্তাশীল মন জরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তাই শেষটায় সে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল প্রায়; অকর্ম্মণ্য দেহমন যেন শামুকের মত গুটিয়ে গিয়েছিল ওর। কিন্তু অপর্ণা বরাবর ছিল সতেজ, সক্ষম! আশ্রয়-কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসেও সে দু-তিন দিন ভালই কাটালো—কিন্তু নিদারুণ খাদ্যাভাব ওদের জীবনকে পঙ্কিল করে তুললো; কদর্য্য করে দিল অনাহার এবং অভাবের তাড়নায়।

সেই রুক্ষ মলিন বেশ নিয়ে ওরা সহরের জনতার মধ্যে না গিয়ে ভালই করেছে। ওরা এসে আশ্রয় নিল সহরের বাইরে গঙ্গার ধারের বিরলবসতি একটা বড় গুদামঘরের ছাঁচকোলে। হাত দুই চওড়া এবং পঞ্চাশ-ষাট্ হাত লম্বা এই ছাঁচাটায় আরো দু' তিনটি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে—কেউ

কাউকে চেনে না ; চিনবার চেষ্টাও নেই কারো। আপন দুঃখের সাগরেই ওরা নিমগ্ন! অবসর ওদের সব সময়ই, কিন্তু সব সময়ই আহার্য্য-চেষ্টা অন্তরে জাগে। অপরের সঙ্গে আলাপ বা সুখ-দুঃখের অংশ ভাগ করে নিতে ওরা একান্ত বিমুখ।

অপর্ণা এবং আলোক এইখানে এসেছে আজ পাঁচদিন। প্রথম দুদিন অপর্ণা যা-কিছু খাবার কুড়িয়ে পেয়েছিল, তার সবই দিয়েছিল আলোককে, নিজে সে কি খেয়েছিল, সেই জানে ; হয়তো উপোস দিয়েছিল! তৃতীয় দিন গঙ্গার কাদাজল মিশিয়ে খেয়েছিল কতকগুলো পোকা-খাওয়া ছোলা —তারপরই এই অসুখ!

কাছের একজন দয়াবান মাড়োয়ারী সকালে এক ভাঁড় দুধ দিতেন অপর্ণাকে ; গত কালও সে দুধ এনেছিল, আজ আর উঠতে পারে নি। ছেলেটা উপবাসী রয়েছে! আলোক জানে না, সেই মাড়োয়ারীর বাড়ীটা কোথায়—এই কদিন একেবারে শ্মশানের শিব হয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু আজ মধ্যাহ্নে অপর্ণার অবস্থা আর রুদ্র-বালকের বিকট চীৎকার ওর শিবত্ব ভঙ্গ করলো—ওকে বুঝিয়ে দিল—ও শিব নয়, মানুষ।

নোটখানা হাতে নিয়ে আলোক তাড়াতাড়ি ফিরতে লাগলো। আর দেরী হলে যাওয়া হয়ে উঠবে না! বাজার খোলা নেই, কিছু খাদ্যের জন্ত এদিক-ওদিক ঘুরে একটা খাবারের দোকানও পেল সে। এক ভাঁড় দুধ আর কিছু খাবার কিনলো। এসে দেখে, অপর্ণা শান্ত হয়ে শুয়ে আছে ;—মরে গেছে নাকি? আলোক সভয়ে এসে হাত দিল ওর কপালে। না—অপর্ণা চোখ মেলে চাইল। জীবন যাদের রুদ্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে, তাদের মৃত্যু কি এত সহজে হয়! আলোক বলল,—ছেলেটা? রুদ্র কৈ?

অপর্ণা হাসলো ক্ষীণ-উজ্জ্বল হাসি ; বললো,—ওপাশের একটা মেয়ের

ছেলে মারা গেছে; তারই মাইদুধ খাচ্ছে সে! তুমি এসব কোত্থেকে আনলে দাদাবাবু?

—পেলাম এক যায়গায়—বলে আলোক বসিয়ে দিল অপর্ণাকে। ভাঁড় থেকে জল ঢেলে দিল ওর হাতে। মুখ-হাত ধুয়ে অপর্ণা যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য গ্রহণ করবে—ছেলেটা কোলে ফিরে এলো এক তরুণী। বলল,

—এই যে, তোমার বাবু এসে পড়েছেন। দুধ পেলে বাবু! পেলে তো দাও, খাইয়ে দিই। ছেলেটা খিদেতে মরে গেল যে! আমার মাইদুধ আর নেই; শুকিয়ে গেছে অনেক দিন।

অপর্ণাই বললো—দুধ রয়েছে, এই যে, দাও তো ভাই একটু খাইয়ে! মেয়েটি দুধ খাওয়াতে বসলো রুদ্রকে। সারাদিন না খেয়ে ছেলেটা নেতিয়ে পড়েছে। ওর কাঁদবার শক্তিও নেই আর। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে শুধু। কয়েক ঢোক দুধ খেয়ে তবে ও কেঁদে উঠলো। ওর জীবন যেন এতক্ষণে জাগ্রত হচ্ছে। কিন্তু সেই তরুণী মেয়েটা পাতার খাবারগুলোর পানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আলোক বুঝতে পারলো, বললো,—নাও! তুমি নাও কিছু এর থেকে!

ছেলেকে অপর্ণার কোলে দিয়ে সে খাবার নিল অঞ্জলি পেতে; তারপর উঠে গেল ওদিকে। ওখানে তার বুড়ি মা ধুঁকছে আর স্বামীটা বলছে কর্কশ কণ্ঠে—কি আনলি, দে; আমাকে আগে দে—দে বলছি!

—থাম্ না মুখপোড়া! তোর জন্যেই আনলাম!—মেয়েটি মুখ-ঝামটা দিল।

ওর থেকে ভাল সম্বোধন এবং ভাল ব্যবহার ওদের কাছে আশা করাই অন্যায়। জীবনের এই শব-সাধন ক্ষেত্রে ওরা কি 'প্রিয়তম' বলে সম্বোধন করবে, নাকি ওমর খৈয়াম আউড়ে বলবে—'খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে'.....! আলোক নিঃশব্দে শুনলো ওদের আলাপ। কিন্তু ওর ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। এই কদর্য্য নিরন্নতা আর কুৎসিত

পশু-মানবত্ব সে যেন আর সহ্য করতে পারছে না। ওর অন্তরটা দীর্ণ হয়ে হাহাকার করছে। বলছে,—হে দেবতা, মানুষের গৌরবটুকু তুমি রক্ষা করো—মানুষকে অমানুষ হতে দিও না—দানব করে তুলো না!

ওর চিন্তার মধ্যেই রুগ্না অপর্ণা খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেললো,—শোয়ালো তাকে। তার পর ঐ দুর্ব্বল শরীরেই দাঁড়িয়ে বললো—খাবার তো অনেক রয়েছে দাদা—তুমি কিছু খাও!

—হাঁ, খাই! আলোক অতি সামান্য একটু মুখে দিয়ে জল খেল অনেকটা। পিপাসাই ওর বেশি হয়েছিল। নিজকে খাদ্য দান করতে আজ যেন ওর প্রবৃত্তি হচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে, মানুষের জীবন শুধু অখাদ্যের আর অতি খাদ্যের দুটি স্তর ছাড়া আর কিছু নয়। অতিখাদকের দল অখাদ্যের আবর্জ্জনা ছড়িয়ে দিয়ে যায় পথের জঞ্জালে, অখাদকের দল তাই কুড়িয়ে খায়, খেয়ে বাঁচে। জীবনের এই দ্বিতীয় স্তর খুবই বড় স্তর; কিন্তু অতিখাদকের রক্তলোলুপ মাটিতে এই স্তর রক্তহীন পাণ্ডুর হয়েই বেঁচে থাকে। এদের জীবনের আর কিছু শ্রেয় নেই, আর কিছু প্রেয় নেই, আর কোন সাধনা নেই, শুধু বেঁচে থাকা, শুধু টিকে থাকা! কিন্তু কেন? কেন জীবন এমন করে নিজকে টিকিয়ে রাখতে চায়? কী মহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তার বেঁচে থাকার সাধনা! জীবন যদি আজ এই মুহূর্ত্তেই নিঃশেষ হয়ে যায় তো কার কি এসে যাবে! একটা এটোম্ বোম্ বা একটা অপ্রাকৃত শক্তি যে-কোন মুহূর্ত্তে জীবনকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে—মুছে ফেলতে পারে পৃথিবী থেকে, সে-সব জেনেও জীবন বাঁচবার সাধনা করে—মানব-জীবন থেকে দানব-জীবনে নেমে যায়, পশু-জীবনকে বরণ করে, তবু জীবনকে ছাড়ে না। আশ্চর্য্য!

জীবনের উপর মমত্ববোধটা যেন সম্পূর্ণরূপেই লোপ পেয়ে গেল আলোকের। জলটা খেয়ে ও শুলো, ক্লান্তিতে সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে আসছে। অপর্ণা বাকি খাবারগুলো পাঁচটা সমান ভাগে ভাগ করে ঐ

ছাঁচকোলের বাকি পাঁচজন মেয়েপুরুষকে দিল গিয়ে। ওরা এই অদ্ভুত সময়েও আশীর্ব্বাণী বর্ষণ করলো—রাণী হও মা, স্বামীপুত্তুর নিয়ে রাজরাণী হয়ে বেঁচে থাক।

বেঁচে থাকারই আশীর্ব্বাদ, কিন্তু তার সঙ্গে অতি-খাদ্যের ইঙ্গিতটুকুও আছে। অখাদ্যে বেঁচে থাকা কেউ চায় না; তবু অখাদ্যেই বেশী লোককে বেঁচে থাকতে হয়। আলোক চোখ বুজেই ভাবতে ভাবতে হয় তো ঘুমিয়ে পড়লো; উঠে দেখলো, সকাল।

চাকরীতে যেতে হবে তাকে; অপর্ণাকেও ওইখানে নিয়ে গিয়ে রাখলে কেমন হয়—অন্ততঃ ছেলেটাকে অনায়াসে রাখা যেতে পারে—ভাবতে ভাবতে আলোক মুখ হাত ধুলো; দোকান থেকে চা কিনে এনে অপর্ণাকে দিল, নিজেও খেল। ছেলেটার দুধ আজ অপর্ণা আনবে সেই মাড়োয়াড়ী ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে। সে বেরুচ্ছে, আলোক ছেলেটার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দেখতে লাগলো; অপর্ণা শুধুলো—কি দেখছো দাদাবাবু?

—না, কিছু না। আমার আসতে যদি দেরী হয় তো ভেবো না। এই টাকাটা রাখ!

একটা টাকা অপর্ণার হাতে দিয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল। ভাবতে লাগলো, এই টাকা কাল সে যার কাছ থেকে এনেছে—কে জানে, ঐ ছেলেটার জননী সেই কি না? আলোক ঐ ছেলেটার সারা অঙ্গে তাই অনুসন্ধান করছিল এতক্ষণ। কিন্তু হাসি পেল ওর; ছেলেটা জীবন-কণা, জীবন্ত মানব শিশু! যেই তার জননী হোক, সে নিজের জীবনে এখন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ তার জননীর সন্ধান করা মূর্খতা ছাড়া কি আর!

কিন্তু কিশোরের সন্ধান একবার করতে হবে, নইলে আলোকের মনুষ্যত্ব বলে গৌরব করবার আর কিছু থাকবে না। ঝুমনী কেমন আছে,

দেখতে হবে। আর চক্কোত্তিদা—কে জানে, তিনি জীবিত আছেন কি না!

নূতন চাকরী, দেরী হয়ে যাবার ভয়ে আলোক কিন্তু কোথাও যেতে পারলো না; সটান চলে এলো বিশ্বেশ্বরী নিকেতনে। উৎপলা তখনো আসে নি। আলোক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো বাড়ী, বাগান আর বাড়ীর তিনটি মাত্র অধিবাসীকে। একটি শিশু, তার মা, একজন ধাত্রী এই বাড়ীর বাসিন্দা। ধাত্রীমেয়েটির আপনার সজ্জারচনায় রত ছিলেন; শিশুটির মা আলোককে দেখে জিজ্ঞাসা করলো,

—সহর বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে? আপনি বাসে এলেন তো?

—সহর ঠাণ্ডা হয়েছে। আমি হেঁটেই এলাম।

—আমাদের বাড়ীতে আমার ছোটভাইটির খবর পাইনি; মা কেমন আছেন যদি একটু খবর এনে দেন!

—ঠিকানা দিন, খবর এনে দেব! আলোক বললো এবং ঠিকানাও লিখে নিল। বাড়ীটা চক্রবর্ত্তীদার বাসার কাছেই। উৎপলা এসে পড়লো। আলোককে দেখে বলল,

—এসেছেন? বেশ বেশ! আপনার বোন কেমন আছেন?

—কিছুটা ভাল।—বলে আলোক ওর সঙ্গে অফিসঘরে এল। এসেই বললো—আমাকে যদি রাত্রে এখানে থাকতে হয়, তাহলে আমার বোনকেও এখানে থাকতে দিতে হবে।

উৎপলা দু'মিনিট চুপ করে থেকে বললো,

—তাঁকে আনবেন, আমি দেখবো, কোনো কাজে লাগাতে পারি কি না।

অতঃপর ওদের কাজের কথা হতে লাগলো।

মুক্তি চাইলেই মুক্তি পাওয়া যায় না! কলকাতা থেকে কাশী, শুধু বেড়াতে আসা নয়, শ্বশুরবাড়ী আসা, সহধর্ম্মিণীকে দেখতে আসা,—সিধুর জরুরী কাজের সমস্ত ওজর তরুণীর দল হেসেই উড়িয়ে দিল। পরপর দুই রাত্রি তাকে বাস করতেই হোল ওখানে। দ্বিতীয় রাত্রিতে সিধু যথারীতি শয়নকক্ষে গেল গভীর রাত্রে। ইচ্ছা করেই সে রাতের কিছুটা কাটিয়ে দেবার জন্য বাইরের ঘরে এত বেশী দেরী করলো যে অন্য মেয়েরা বলতে বাধ্য হোল—এবার শুতে যাও ভাই! অবন্তী বসে আছে সেই সন্ধ্যে থেকে।

সিধু এসে দেখলো, অবন্তী বসে নেই, শুয়েই আছে কিন্তু ঘুমায় নি—জেগে রয়েছে। সিধুকে দেখে উঠে বসলো। ওর সুসজ্জিত তনিমার পানে চেয়ে দেখতে সিধুর লজ্জা বোধ হচ্ছে। ঐ নারী নিজকে সম্পূর্ণরূপে দান করবার জন্যই এসেছে আজ এ ঘরে—ও দান গ্রহণ করলে সে আপত্তি তো করবেই না—বরং অনুগৃহীত বোধ করবে। কিন্তু সিধু আজ সে সিধু নেই, সে অবস্থাও নেই ওই নারীর।

—আমি সারা দিন একটা কথা তোমায় বলবার জন্য বসে আছি সিধুদা!

—বলো—সিধু টেবিলের একখানা বই নাড়াচাড়া করতে করতে বললো,—বলো, কি কথা!

—বসো এইখানে—বলে অবন্তী উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে এলো। তারপর সিধুর হাত ধরে খাটে বসিয়ে এমন এক আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে তাকালো সিধুর পানে, যে-দৃষ্টি সিধু আর কোনো মেয়ের চোখে কখনো দেখেনি। যে-দৃষ্টিতে উর্ব্বশী আবেদন জানিয়েছিল অর্জ্জুনের কাছে,—এ হয়তো নারীর সেই চিরন্তনী দৃষ্টি!

—আমার কথা রাখবে তো সিধুদা?—তুমি রাখবে, আমার বিশ্বাস আছে!

অবন্তী ঘনিয়ে এলো সিধুর অঙ্গপানে! ওর দেহসৌগন্ধ সিধুকে কিন্তু সঙ্কুচিত করে তুলছে; তথাপি সিধু স্থির হয়ে বসেই বললো—কথাটা বলো তোমার।

—আমার অবস্থা তো দেখছো—অবন্তী ক্ষীণ-মধুর হাসলো—কিন্তু সিধুদা, এর জন্য আমি তো কিছুমাত্র দায়ী নই। বাবা বিশ্বেশ্বর জানেন, আমার কোনো অপরাধ নেই।

অবন্তী থামলো; সিধু চুপ করেই শুনে যাচ্ছে। অবন্তী আবার আরম্ভ করলো,

—আমাকে তুমি ভালবাসো, সেই জোরেই বলতে সাহস করছি! আমার যে-টুকু-যা হয়েছে, তাকে ক্ষমা-ঘেন্না করে যদি তুমি আমায় বৌ-হিসেবে গ্রহণ করো, তাহলে……তাহলে তোমাকে নিয়ে আমি এই কাশীতেই থেকে যাই। বাবা কিছু টাকা আর একখানা বাড়ী এখানে কিনে দেবেন আমাদের! তুমি রাজি হও সিধুদা, আমাকে তুমি বাঁচাও!

ওর কণ্ঠস্বরের করুণ আবেদন সিধুকে হয়তো বিচলিত করতে পারতো, কিন্তু ওর অঙ্গ-স্পর্শের অ-সৌজন্য,—ওর আশ্রয় লাভের উৎকণ্ঠাকে ছাপিয়ে উদ্দামতায় অভিব্যক্ত হচ্ছে। ওর সেই আবেদন অভিসার কুণ্ঠিতা কুলবধূর নয়,—নির্লজ্জা নটিনীর।—সিধু শালগ্রাম-শিলার জন্য পকেটে হাত দিল—নেই। কিন্তু সিধুর মনের আসনে তিনি রয়েছেন। আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় হয়ে উঠলো সিধু। সাধকের সুগম্ভীর কণ্ঠে বললো—আমি আজ মৃত্যু-পথের যাত্রী, অবন্তী! এই যাত্রাপথের মহামন্ত্র একদিন তুমিই আমায় দান করেছিলে—সেই মহেন্দ্রক্ষণটুকু স্মরণ করে তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি! কিন্তু তোমাকে পত্নীত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে আমি মুক্তির পথে চলতে পারবো না। আর যতটুকু দেখছি,—তোমার জীবনে তার প্রয়োজনও নেই। এক বৎসরের মধ্যে যদি তুমি বিবাহিত বধূ জীবনে না যেতে পার, তাহলে আমি এসে তোমার খবর নেব, তোমাকে আমার

পথে যাবার কথা বলবো ; সে পথ কঠিন, কঠোর মৃত্যুর পথ। যদি যেতে চাও, নিয়ে যাব তোমায়। বিবাহিত জীবনের গণ্ডীবদ্ধ পথ আমার নয়। আমি রুদ্রের সাধনারত সন্ন্যাসী।

সিধু থামলো। ওর কণ্ঠের কোমল স্বরও যেন আতঙ্কিত করে তুলছে অবন্তীকে। তথাপি অবন্তী আব্দার করার মত বললো—ওপথ ছেড়ে দাও সিধুদা, ও বড় ভয়ঙ্কর পথ! দাদা গেছে ; আলোকদা গেছে—ওপথ থেকে কেউ ফেরে না!

—সৈনিক ফিরে আসবার আকাঙ্খা নিয়ে যুদ্ধে যায় না অবন্তী। সে না ফিরবার জন্যই যায়। না-ফেরাতেই তার সার্থকতা। মৃত্যুতেই তার ব্রত উদ্‌যাপন!

অবন্তী চুপ করে রইল ; বেশ বোঝা যাচ্ছে, সে অত্যন্ত নিরাশ হয়েছে সিধুর কথায়। ওর নারীত্বের সমস্ত মোহপাশ এই অতি অশিক্ষিত চরিত্রহীন সিদ্ধেশ্বরের কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল, এ বেদনা তার পক্ষে কম নয়, কিন্তু তার চেয়েও বড় ব্যথা বাজছে ওর বুকে!

ওরই কণ্ঠের মন্ত্র নিয়ে সিধু আজ মৃত্যুপথযাত্রী, আর সে নিজে কোথায়, কোন্ অতল অন্ধকার গহ্বরে নির্মজ্জিত!—কয়েক মিনিট নীরবে ভাবলো অবন্তী, তারপর বললো,

—আমিও একদিন ঐ মন্ত্রের উপাসনা করতাম সিধুদা,—আজ জীবনের দুর্ভাগ্য আমায় বন্দী করেছে, বিড়ম্বিত করেছে ; তুমি আমাকে এই বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচাতে পারতে ; আমার জীবন আবার সমাজের বুকে ঠাঁই পেতে পারতো। তা না হোক, আমি সকল সময় কামনা করবো, তোমার পথ জ্যোতির্ময় হোক. তোমার সাধনা সিদ্ধি লাভ করুক।

অবন্তী থামলো ; ওর চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু নাকি? সিদ্ধেশ্বর অপলকে চেয়ে রইল ওর মুখপানে! এ কি সেই অবন্তী? সেই জংশন

ষ্টেশনের বজ্রগর্ভা অবন্তী! নারীর এই খড়্গহস্তা-বরদাত্রী মূর্ত্তি সিধুর বড় ভালো লাগে! কালিকার কল্যাণী মূর্ত্তি এ,—আদ্যাশক্তির অভয়া মূর্ত্তি! সিধু আস্তে আস্তে বললো,

—তোমার জীবনের গ্লানি আমি গ্রহণ করলাম দেবি, সমাজের বিষ আমি পান করলাম—আগামী কাল তুমি প্রচার করে দিও, তোমার স্বামী মুক্তির পথে মহাযাত্রা করেছে; আর সেই যাত্রায় তুমই সগর্ব্বে তাকে সাজিয়ে দিয়েছ!

গম্‌গম্ করছে ঘরখানা; রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে' যেন কার গভীর আহ্বান বাজছে বুকের রক্তের তালে তালে। অবন্তী চেয়েই রইল সিধুর মুখপানে। ও যেন ভুলে গেছে ওর বর্ত্তমান, ওর অনতিদূরস্থ ভবিষ্যৎ, ওর সমাজ, ওর সংসার, ওর আভিজাত্য! পূজারিণীর স্তবগানের মত বললো—তোমায় সাজিয়ে দেবার গৌরব আমায় দিলে সিধুদা—তোমার পত্নীত্বের সৌভাগ্যও দিলে আমায় - আশীর্ব্বাদ করো, তোমার যাত্রাপথেও যেন আমি অংশ পাই—অবন্তী পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো সিধুকে।

—শোও এবার, রাত হয়েছে—বলে সিধু বারান্দায় চলে গেল। অবন্তী শুলো না, বসে আছে। ঘুম যেন ওর চোখ থেকে কেড়ে নিয়েছে কে! কে যেন জ্বালিয়ে দিয়েছে ওর মনের সঞ্চিত সমস্ত আবর্জ্জনা, তারই আগুনে ওর অন্তরের সোনাটুকু ঝক্‌মক্ করে উঠছে বারম্বার। কিন্তু এই আবর্জ্জনা কি অল্প? সারা পৃথিবীর যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়েও একে দু'দশদিনে ভস্ম করা সম্ভব হবে না;—অবন্তীর মনে পড়তে লাগলো, তিলে তিলে নয়, মুঠো মুঠো করে সে এই আবর্জ্জনা কুড়িয়েছে; সারা অঙ্গে মেখেছে, অন্তরে সঞ্চিত করেছে। তার সাক্ষ্য রয়েছে তার সারা দেহে-মনে! কিন্তু ঐ যে বিষপায়ী নীলকণ্ঠ,—অকুণ্ঠস্বরে অবন্তীকে পত্নীত্বের গৌরব দিয়ে তার সামাজিক জীবনের সমস্ত হলাহল নিঃশেষে পান করে গেল, ওর আরাধনা করার মত কোন্ তপস্যা অবন্তীর আছে? ঐ

রুদ্রদেবতার শান্ত-শিব-মূর্ত্তির চরণতলে অবন্তী আজ নিজকে বিচূর্ণিত করে কৃতার্থ হতে পারলো না—তার ফণি-ফণা-সঙ্কুল পদচিহ্ন ধরে অনুগামিনী হতে পারলো না—তার বৈরাগ্যের ভস্ম অঙ্গে মেখে তার বিজন-কেতন ধরতে পারলো না—অবন্তী আজ সে-গৌরব পেয়েও পেল না। অবন্তী মাতৃত্বে বন্দী!

এই বন্ধনকে অস্বীকার করবার উপায় নাই। নারী-জীবনের এই শ্রেষ্ঠ বন্ধন, এই সাধনার বন্ধন থেকে কোনো নারীই মুক্তি মাগে না—মাগা অস্বাভাবিক—নারীত্বের বিকৃতি। তবু যদি আজ এই মুহূর্ত্তে অবন্তী মুক্ত হতে পারতো তাহলে ওই রুদ্র-দেবতার পদচিহ্ন ধরে সেও যাত্রা করতো মহাযাত্রা-পথে, যে পথ মৃত্যু-আকীর্ণ মহাজীবনের পথ—যে পথ মরণবিজয়ী অমৃতের পথ।

অবন্তী নিশ্চুপে ভাবছে, আর সিধু অপলক চোখ চেয়ে আছে বাইরের অন্ধকার রাত্রির পানে। রাত্রি—প্রকৃতিমাতার শান্ত-শুদ্ধ রূপ—মৃন্ময়ী ধরিত্রীর চিন্ময়ী মূর্ত্তি। অনন্ত আকাশতলে ঘূর্ণায়মানা বন্দিনী জননী ধরিত্রী সংখ্যাহীন জীবনাঙ্কুর অঙ্কে নিয়ে অনন্তের পথে যাত্রা করেছেন—কিন্তু আজো তাঁর অঙ্কে সেই মহত্তোমহীয়ান জীবন-ভ্রূণের আবির্ভাব ঘটলো না, যে ভ্রূণ বন্ধনকে মুক্তির খড়্গে ছেদন করতে সক্ষম—যে ভ্রূণ মৃত্যুকে অমরত্ব দিতে সক্ষম!—হয়তো একদিন আবির্ভাব ঘটবে তাঁর,—ধরিত্রী জননী আজো তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। প্রস্তুত হচ্ছে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর—যার আগমনী গান করে কবি বলেছেন :—

'তারই লাগি কাণ পেতে আছি :
যে আছে মাটির কাছাকাছি॥'—হয়তো তিনি আজ মাটির কাছাকাছিই এসেছেন।

কখন ভোর হয়ে গেছে। সিধু সম্বিত পেয়ে দেখলো, অবন্তী নেমে গেছে নীচে। সেও নীচে এলো। হাতমুখ ধুয়ে জলযোগ সেরে

বিদায়-দেখা করতে গেল অবন্তীর সঙ্গে। অবন্তী নীরবে প্রণাম করলো ওকে; সিধু ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করলো,—বীর-প্রসবিনী হও, তুমি মা হও সেই পুত্রের, যে পুত্র মৃত্যুকে পরাহত করবে!

বাইরের তরুণীদল শুনলো ওর আশীর্ব্বাদ। যেন অতীত যুগের সেই জলন্ত বাণীর জাগৃতি!

সিধু পথে নামলো। জানালাপথে অবন্তীর চোখ দুটি শুক তারার মত জ্বলছে—অবিকম্পিত—অপরিম্লান!

বুঝিবা অরুণোদয়ের ইঙ্গিত।

মহারুদ্র

ল না, পরম ঔদাসিন্যে দেখলো সমস্ত ব্যাপারটা। কে ঐ অদ্ভুত
কটি! ওকে যে পরম সাধুর থেকেও উঁচু মনে হচ্ছে। সাধু উঠে
কাছে এসে তাকালো ওর পানে, তারপর বলল,
—আপনার ডেরা কাঁহা?
—ডেরা?—বিস্মিত লোকটি আধপোড়া বিড়িটা আঙুল দিয়ে
ক হাসলো—বললো আমার ডেরা তামাম দুনিয়া!
—খানা-পিনা কাঁহা হোতা হ্যায়?—আবার শুধুলো সাধু।
চ —যাঁহা মিলতা হ্যায়— বলে উদাসীর মত লোকটা পোড়া বিড়িটা
া দিয়ে বলল, রাত ন' বাজা হ্যায়—আপকো ডেরা নেই হ্যায় তো
এ সাথ আ-যাইয়ে— বলেই উঠলো।
চলতে লাগলো সেই বাউণ্ডুলে লোকটা, পিছনে সাধু—কাঁধে কম্বল,
শ কমণ্ডলু আর আশা। কে জানে, কোথায় যাচ্ছে! সাধু
অ কথানি এসে প্রশ্ন করলো—কাঁহা লে যায়েগা?
বি —আ-যাইয়ে সাধুজী!—উত্তর হোল।
আরো পাঁচ-সাত মিনিট হাঁটার পর সাধু আবার প্রশ্ন করলো
ত ৎনা দূর হ্যায়?
উ —আ-যাইয়ে— সংক্ষেপে জবাব হোল।
সাধু আর কিছু শুধুলো না, চলতে লাগলো ওর পিছনে। দীর্ঘক্ষণ
চলেছে—বড় রাস্তা, গলি রাস্তা, পার্ক, মোড়—কত কি পার
চ এল, শেষে সাধু অধৈর্য্য হয়ে বলল,
ম —আভি দের হ্যায়? কাঁহা তোমহারা ডেরা?
ব —তামাম্ দুনিয়া— বলে হাসল লোকটা, বলল—আ-যাইয়ে—।
আ-যাইয়ে' কথাটার ওপর শ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে সাধুর। বলল,
—খালি আ-যাইয়ে বোলতা আউর চলতা, কাঁহা লে যায়েগা? তোমারা
শ্বশুরাকা ঘরমে?

—জী হ্যাঁ— বলে উচ্চহাস্য করলো এবার লোকটি— বলল, শুনিয়ে সাধুজী, হাম ভূতভি নেহি হ্যায়, ভগবান ভি নেহি হ্যায়—আপকো মাফিক আদমি হ্যায়—ডর কাহে? আ-যাইয়ে—আউর দশ মিনিটমে পৌঁছা যায়েঙ্গা! হুঁয়া খানাভি মিল সেকতা, আউর রাতমে শোনেকো জাগা!

চলতে লাগলো আবার। আশ্চর্য্য নিরাসক্ত লোক! সাধুর জটাজুট, সুন্দর বেশ, লোটা-কম্বল দেখেও ওর মনে কিছুমাত্র যে শ্রদ্ধাসঙ্কোচের ভাব জেগেছে, এমন তো মনে হয় না! অথচ কেন ডেকে নিয়ে যাচ্ছে? কে ঐ লোকটি? কি ও?

ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটছে দুজনে। রাত্রি প্রায় দশটা। শীতের হাওয়া দুজনকেই দখল করতে চায়, কিন্তু পথ-হাঁটার জন্য কাবু করতে পারছে না। অবশেষে যাত্রার শেষ হোল। ওরা এলো একটা মন্দিরের দরজায়। বেশ বড় মন্দির, অনেকখানি তার পরিধি—গঙ্গার কিনারে সারি সারি শিবালয়, এদিকে বিরাট দেউল—বেশ দেখতে!

—আ-যাইয়ে— বলল আবার লোকটা।

—চল— বলে সাধুও ঢুকলো ওর সঙ্গে।

গেটে ঢুকতেই একজন প্রশ্ন করলো লোকটিকে,—এত রাত্রে কোথা থেকে, কিশোর?

—এহি সাধুবাবাকে লিয়ে এলাম—থোড়া পরসাদ মিলবে জী?

—হ্যাঁ। এসো— বলে প্রশ্নকারী ওদের ভেতরে নিয়ে গেল।

মন্দির তখন বন্ধ হয়ে গেছে, কাজেই দেবমূর্ত্তি দেখা হোল না। সাধু প্রসাদ পেয়ে চত্বরের এক কোণায় কম্বল ঢাকা দিয়ে শোবার আয়োজন করছে, অকস্মাৎ পথপ্রদর্শক কিশোর এসে ওর কাছ ঘেঁষে বলল,—খবর আচ্ছা হ্যায় সাধুবাবা?

—কিসকা খবর? —সাধু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো।

—ওহি, আপলোককা আশ্রমকা?

—তুমি কি করে জানলে আমার আশ্রমের খবর ?

—হ্যাঁ, আমি সমঝে লিয়েছে। আপনাকে গুরুদেবকা সাথ আমি দু'রাত ছিল। গালে ওহি ঘো আঁচিল, ওহি আপনা-লোককা দস্তর হ্যায়। ও হামকো দেখলা দিয়া কর্ণবিজয় সাধুজী—আপনাকো গুরুজী। উ সাধুবাবা বহুৎ ভালা সাধু, দেশকা বহুৎ ভালা করতা থা।

সাধু বিস্মিত হয়ে উঠে বসে বললো—তুমি কে, তোমার নাম কি ? কর্ণবিজয়ের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা ?

নওকিশোর সব বলল—কেমন করে কর্ণবিজয়কে সে সাহায্য করেছিল কয়েকবছর পূর্ব্বে। সব শুনে সাধুরূপী সিদ্ধেশ্বর বলল, —আমার ভাগ্য যে তোমার সঙ্গে দেখা হোল। অবন্তী এখন কোথায় আছে, তুমি জান কি ? আর আলোক ?

—না, হামি খোঁজ লেবে। আউর আলোকদাদা কাঁহা, উভি নাহি জানে। আজ তো ঘুম যাইয়ে। কাল দিখা যায়েগা।

পরম নিশ্চিন্তে বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে ওখানেই শুয়ে পড়ল নওকিশোর। সাধুও শুলো, কিন্তু ঘুম তার আসছে না। কত কি ভাবছে ! সামনে স্রোতোচ্ছল গঙ্গার খানিকটা দেখা যায়। নিকটের রেলসেতুর ওপর একখানা ট্রেণ চলে গেল, তার শব্দ—রাতচরা পাখীর কণ্ঠস্বর—কত কি মিলিয়ে এক বিচিত্র জগৎ যেন প্রকাশিত হয়েছে ওখানে। কিন্তু সকলকে অতিক্রম করে সিধুর অন্তরে এক অজানা পুরুষের সৃষ্টিছাড়া সাধনার কথাই জাগ্রত হয়ে উঠছে, যিনি এখানে বিবাহিতা বধূকে ইষ্টদেবীরূপে আরাধনা করে রেখে বিচিত্র সাধনার ইতিহাস রেখে গেছেন।

সিধু এসেছে এদেশে বিবাহ-না-করা এক বধূর খোঁজে—সত্যি সে সিধুর কেউ নয়, কোনোদিনই কেউ ছিল না। তবু কেন এল সিধু ? সাধু সিদ্ধেশ্বরের এই কি সাধনা !

কম্বলে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো সিধু; শীতের দীর্ঘরাত্রি শেষই হয় না—অবশেষে অনেকটা রাত্রি থাকতেই উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতে মনস্থ করলো। চেয়ে দেখলো—নওকিশোর নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। আধপোড়া বিড়িটা তখনও কাণে গোঁজা। সিধু উঠে গেল।

সাতবছর স্বেচ্ছাবন্দী আলোকনাথ।

দৈনিক সংবাদপত্রের কয়েকটা পাতা ছাড়া পৃথিবীর আর কিছুর সঙ্গে ওর যোগ নেই। শ্যামবাজারের এক আধো-অন্ধকার কুঠরীতে নিঃশব্দে ও কাটিয়ে দিল অঞ্জনার প্রাইভেট টিউটার হয়ে আর ওর বাবার অভিধান-সঙ্কলনের সাহায্য করে।

অঞ্জনা এর মধ্যে পড়া ছেড়েছে, বিবাহিত হয়েছে এবং দুটি সন্তানের মা হয়েছে। কিন্তু ওর বাবার অভিধান-সঙ্কলন এখনো সম্পূর্ণ হয়নি বলে আলোককে তিনি বাড়িতেই রেখে দিয়েছেন। অমায়িক বৃদ্ধ ভদ্রলোক,—আপনার সৎ খেয়াল নিয়ে বেশ আছেন। তবে সম্প্রতি তাঁর স্বাস্থ্য আর ভাল থাকছে না, তাই একদিন আলোককে ডেকে বললেন,—তাঁর গবেষিত এবং সঙ্কলিত অভিধান এবার ছাপার ব্যবস্থা করা হোক। আলোক এই কাজটা শেষ করে ছুটি পাবে।

ভাল একটা ছাপাখানার সঙ্গে অবিলম্বে চুক্তি করা দরকার; ছাপাখানার খোঁজে তাই বেরুল আলোক।

সহরটা যেন আগাগোড়া নতুন লাগছে ওর চোখে। পুরো সাতটা বছর সে বাড়ীর বের হয়নি। অন্য যে-কোনো মানুষের পক্ষেই এভাবে গৃহবন্দী হয়ে দিন কাটানো অসম্ভব, কিন্তু আলোক অনায়াসে এই স্বেচ্ছাবন্দিত্বকে স্বীকার করেছিল। সংবাদপত্রের পাতায় ভারতের শত সহস্র দুঃখদুর্গতির সঙ্গে সম্মুখের প্রসারিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সহস্র

সুখসমৃদ্ধির আশ্বাস সে সমানভাবে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু যে নির্ব্বিকার মন নিয়ে সে এই সাতটা বছর কাটিয়েছে, বাইরে বেরিয়েই সেই নির্ব্বিকারত্ব রক্ষা করা যেন আর সম্ভব হচ্ছে না।

কী বিশাল, বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে এই সামান্য সাতটা বছরের মধ্যে! অবাক চোখে তাকিয়ে দেখলো আলোক—স্বাধীন ভারতের দিগন্তবিথারী আকাশ-বাতাস আর আলোক-পুলক ওকে যেন হাতছানি দিচ্ছে বাহির বিশ্বে বেরিয়ে আসতে। আনন্দের সাড়া সারা পৃথিবীতে! বাংলায় বাণীর আরাধনা-উৎসব বসন্তের আসন্ন আবির্ভাব ঘোষণা করছে—আলোক দু'চোখ ভরে দেখতে লাগলো, কচিয়ে ওঠা দেবদারু গাছের পাতাগুলো···শীতের ডালিয়ার বর্ণ-বৈচিত্র্য···কৃষ্ণচূড়ার আকাশ-ছোঁয়া রক্তাভা!

চলেছে আলোকনাথ শ্যামবাজার থেকে শিয়ালদার পথে। সেই পুরাতন কলিকাতা—তবু যেন নতুন লাগছে! সকালের সূর্য্যালোক পর্য্যন্ত আজ ওর চোখে নতুন। যে স্বল্পালোকে সে সাতবছর অবস্থান করেছে, তার স্নিগ্ধগম্ভীর পরিবেশ যোগাসনের যোগ্য হতে পারে, কিন্তু বাহির বিশ্বের আলোক-প্রাচুর্য্য যেন বরবধূর বাসকসজ্জা! অপরূপম্—পরিপূর্ণমানন্দম্— কিন্তু—

কোথায় যেন বাধা পেল আলোকনাথ। কী যেন ব্যথার রাগিণী মলিন করে দিচ্ছে এই আনন্দের শুভ্র-সুন্দর বেশকে। কী সেটা!

আলোক অগ্রসর হতে হতে ভাবতে লাগলো, সংবাদপত্রের মারফৎ দেশের খবরগুলো তার সবই প্রায় জানা—দুঃখ-দৈন্য এবং সুখ-শান্তির কোনোটাই অজ্ঞাত নেই, তারই প্রকট রূপ আজ চর্ম্মচক্ষে দেখছে আলোক। কী দেখছে!—

দেখছে স্তব্ধ হাহাকার—জমাট অশ্রু! প্রকৃতির রাজ্যে আনন্দ-সঙ্গীত, কিন্তু মানুষের অন্তরে কোথাও আনন্দের রেশ নেই। অথচ

আনন্দের দিন আজ, আজ বাণীবোধন-দিবস। দলে দলে সব ছাত্রছাত্রী চলেছে উৎসব-বেশে—ঘরে ঘরে পূজার আয়োজন হচ্ছে—শত সহস্র প্রতিমা সাজানো হচ্ছে পূজামণ্ডপে—তবু যেন কী অভাব, কী এক অপ্রকাশ্য বেদনা ওদের সব আনন্দকে পাথর-চাপা করে রেখেছে!

অন্তরের সুতীব্র অনুভূতি দিয়ে আলোক অনুভব করলো, উৎসবের বাহ্যিক প্রকাশ যতই চাকচিক্যময় হোক, আভ্যন্তরীণ উৎস যেন শুষ্ক—যেন নিরস! কেন এই বেদনা মানুষের?

শিয়ালদার কাছাকাছি বড় একটা ছাপাখানায় এসে পৌছাল আলোক। এক বিখ্যাত মুদ্রণালয়। অতি অল্প অবস্থা থেকে এই প্রেস আজ কলকাতা সহরের একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ম্যানেজারের সঙ্গে আলোকের পূর্ব্বপরিচয় থাকার জন্য সে প্রথমেই এখানে এসেছে। কিন্তু এখানে সেদিন চলেছে সরস্বতীপূজার আয়োজন।

আলোকের খেয়ালই ছিলনা যে আজ পূজার দিন—ছুটি, সমস্ত কাজ বন্ধ। প্রেসের শতাধিক কর্ম্মী পূজার আয়োজনে ব্যস্ত; স্বয়ং ম্যানেজারও রয়েছেন ওখানে। সুবৃহৎ প্রতিমা সুন্দরভাবে সাজানো হচ্ছে; পূজার দ্রব্যসম্ভারে মণ্ডপ পূর্ণ। আলোক দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

এ পূজা ছাত্রছাত্রীর নয়, মধ্যবিত্ত চাকুরিয়াদের চাঁদা থেকে এর ব্যয় নির্ব্বাহ হবে। আলোক দেখলো, আয়োজনে ব্যস্ত সকলেই—আমোদও করছে সবাই, তবু যেন তাদের আনন্দ নেই। কোথায় যেন কি একটা কাঁটা বিঁধে আছে মনের কোণে।

মধ্যবিত্ত আজ বিত্তহীন—সামান্য চাঁদা দিয়েও উৎসব করবার মত অবস্থা নেই তার আজ, কিন্তু করতে হচ্ছে এই উৎসব। মালিক হয়তো বেশী কিছু দেবে চাঁদা, কিন্তু কর্ম্মীদের সামান্য বেতন থেকে যৎসামান্য দেওয়াও যেন কষ্টকর ওদের পক্ষে। আলোক একজন কর্ম্মীকে প্রশ্ন করলো—

—এই উৎসবের ব্যয় কি প্রেস-মালিক দিচ্ছেন ?

—না। প্রেস থেকে ঘর, তেরপল, আলো আর লরী দেওয়া হবে। চাঁদাও কিছু দেবেন ওঁরা। বাকী সব আমাদের নিজেদের চাঁদা।

—আপনাদের চাঁদা কি, যে যেমন বেতন পান, সেই অনুযায়ী ?

—না। সব দু'টাকা করে।

—এ পূজা কি না করলেই হোত না ?

—বরাবর করা হয়। আগে মালিক মোটা চাঁদা দিতেন—প্রায় সবটাই দিতেন ওঁরা; এখন আর দেন না। তবু আমরা পূজা বন্ধ করিনি—

—আপনাদের দু'টাকা দেওয়া মানেই তো ক্ষতি!

—হ্যাঁ। কিন্তু উপায় কি ?— হাসলেন লোকটি।

আলোক আরো কয়েকটা প্রশ্ন করে জেনে নিল, এঁরা স্বেচ্ছায় চাঁদা দিতে বাধ্য হয়েছেন, অর্থাৎ এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে যে, মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানগণ নিতান্তই আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই দুটি টাকা দণ্ড দিচ্ছেন।

এই মর্য্যাদাই কাল হয়েছে। কিন্তু উপায় কি ? অভিজাত আর অনভিজাতদের মাঝামাঝি এই মধ্যবিত্তরা। দেশের সংস্কার-সংস্কৃতি এঁরাই রক্ষা করেন। এঁদের মধ্য থেকেই ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর জন্মান—এঁরাই রক্ষা করেন সমাজকে; কিন্তু এঁরাই আজ উৎসন্ন যেতে বসেছেন। বাঙালী মধ্যবিত্ত লোপ পাবে আর কয়েক বছরের মধ্যেই, এ আশঙ্কা করা অন্যায় হবে না।

তাহলে কি থাকবে শুধু উঁচুতলা আর নীচুতলা ? চিন্তা করতে করতে বার হয়ে আসছে আলোক, অকস্মাৎ পরিচিত ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি হেসে বললেন,

—কি খবর আলোকবাবু ? বহুদিন দেখি নি!

—হ্যাঁ, বিশেষ একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আজ তো আপনাদের পূজার দিন—কাজের কথা কিছু হবে কি ?

—কথা হবে না কেন ? কাজ আজ বন্ধ থাকবে, কথা হতে আপত্তি কি.? আসুন—অফিসঘরে আসুন !

সাদরে ডেকে নিয়ে গেলেন তিনি আলোককে। মস্ত বড় টেবিলে রাশীকৃত কাগজপত্র—টেলিফোন, টেবিল-ল্যাম্প—ব্লটিংপ্যাড, কলিং বেল। বসলেন তিনি, আলোকও বসল চেয়ারে।

—হ্যাঁ—তারপর কি খবর বলুন।—ওরে, দু'কাপ চা দিয়ে যা—

চাকরকে হুকুম করলেন। আলোক এখানে সম্মানিত, কারণ, উৎপলার আশ্রমে ম্যানেজার থাকাকালীন সে এই প্রেস থেকে বিস্তর কাজ করিয়েছে। বহু টাকা দিয়েছে এখানে—তাই তার এত খাতির। আলোক হেসে বলল,

—একখানা বড় বই ছাপাতে হবে—শব্দকোষ—প্রায় শতাধিক ফর্মার মত হবে। আর খুব শিগ্রি ছেপে দিতে হবে।

—বেশ তো। পাঠ্যপুস্তকের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। মার্চ্চ-এপ্রিলের মধ্যেই ছেপে দেব। কী সাইজ হবে ?

আলোক সাইজ, টাইপ ইত্যাদির বিষয় বলে দর ঠিক করলো; আগামী পরশু থেকেই কাজ আরম্ভ করা হবে—ব্যবস্থা করে বেরিয়ে এল। বেলা তখন প্রায় বারোটা। কোন্ দিকে যাবে একবার ভাবলো আলোক—বাড়ীই ফিরে যাবে—কিন্তু কি ভেবে শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকেই অগ্রসর হোল সে। কোনো কাজ নেই, তবু ও চলে এল ষ্টেশনে,—ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। দীর্ঘক্ষণ দেখলো আলোক মানুষের অবস্থা আর দুরবস্থা—বাস্তুহারার আর বাসাধিকারীর মানসিকতা ; স্বার্থ আর পরার্থ আর পরমার্থ যেন একাকার এখানে—এই যাত্রী-তীর্থে, এই জীবন-সঙ্গমে !

ষ্টেশন দেখতে বড় ভাল লাগে আলোকের। চিন্তার এতো বেশী খোরাক ও আর কোথাও পায় না। এ যেন এক জীবন্ত মহাকাব্য—প্রতি সর্গে অনন্ত বিচিত্র চরিত্র রূপায়িত হচ্ছে! দীর্ঘকাল পরে এই জনবহুল ষ্টেশনে এসে আলোক অনুভব করলো—স্বল্পান্ধকার গৃহকোণের গভীর প্রশান্তি আর বিশালায়ত এই জনবহুলতার বিচিত্র তরঙ্গের মধ্যে তফাৎ যতই বেশী হোক, অন্তর দুটিতেই রস আস্বাদন করতে পারে। শ্যামল অরণ্য আর তৃণহীন মরু মানবচিত্তকে সমান আনন্দই দিতে সক্ষম, যদি সে-আনন্দ গ্রহণ করবার মত শক্তি থাকে।

বাস্তুহারার বেদনা আর ব্যস্ত দম্পতির অভিসারযাত্রায় নিরপেক্ষ দর্শকের রসগ্রাহিতা সমানভাবেই তৃপ্ত হতে পারে—কিন্তু···এক জায়গায় এসে থেমে গেল আলোকনাথ—দেখলো একটা মেয়ে, জীর্ণ তার দেহ—শীর্ণকায়া—কিন্তু মুখখানা চেনা—

—অপর্ণা?— বিস্ময়ে যেন আঁৎকে উঠলো আলোক।

—হ্যাঁ, দাদাবাবু— বলে উঠে বসতে চেষ্টা করলো অপর্ণা।

কিন্তু আলোক ওকে ডাক দিয়েই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। অভাগীর জীবনের সঙ্গে আর নিজেকে জড়াতে চায় না আলোক—জড়িয়ে লাভ কিছু নেই। ও নিজের কর্ম্মদোষেই ফল ভোগ করছে। আলোক চলে যাবে—অকস্মাৎ কিন্তু অপর্ণা কোনোরকমে গড়িয়ে এসে পড়লো ওর পায়ের উপর।

—ছাড় অপর্ণা—ছাড়—

—চারদিন খাইনি, দাদাবাবু—

—তা আমি কি করবো?

—দাদাবাবু—ভগবান তোমাকে এনে দিয়েছেন!

—হবে— আলোক পকেটে হাত দিল; একটা সিকি অপর্ণার সামনে ফেলে দিয়ে চলে আসছে, অপর্ণা বলল,

—কোথায় আছ, দাদাবাবু— ?

—বলবো না— বলে নিষ্ঠুরের মত চলে এল আলোক। অনেকটা এসেছে—পিছন ফিরে দেখলো, অপর্ণা চেয়ে রয়েছে তার পানে। আলোক নিজেকে কঠোর হয়ে সংযত করলো—শ্যামবাজারগামী একটা চলতি ট্রামে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল আলোক—বসে চোখ বুজলো।

উৎপলার আশ্রম।

সরকার এবং সাধারণের দানে 'উৎপলাশ্রম' এখন বিরাট আকার ধারণ করেছে। বহু বিচিত্র বিভাগ ওখানে। বহু নারীর আশ্রয়স্থান। কিন্তু উৎপলা এই দীর্ঘ কয়েকটা বছর যেন ক্রমাগত নিবে আসছে। আলোকের পদত্যাগের পর থেকে ওর কী যে হয়েছে, কে জানে। সে-ই এখনো আশ্রমের সেক্রেটারী, কিন্তু সই করা ছাড়া আর কোনো কাজই সে করে না। অথচ আশ্রমটা বেশ বেড়ে উঠলো। এর মূলে অবশ্য আলোকেরই পরিকল্পনা, কিন্তু একে কার্য্যে পরিণত করেছেন বিকাশবাবু।

বিকাশ এখানে যোগ দেবার পর থেকেই এর উন্নতি। কেন কে জানে, উৎপলার নিকট উপেক্ষিত হওয়ার পর থেকে বিকাশ যেন শতবাহু দিয়ে এই আশ্রমটাকে সাহায্য করতে চায়। উৎপলাকে যেন সে দেখিয়ে দিতে চায়—আলোকের থেকে বিকাশের যোগ্যতা বহু সহস্রগুণ বেশী। যেন বুঝিয়ে দিতে চায়, চারিত্রিক শুদ্ধতা আর দার্শনিক মতবাদই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তু নয়। কর্ম্মনৈপুণ্যের কৌশলপূর্ণ প্রয়োগও একান্ত প্রয়োজন জীবন-যুদ্ধক্ষেত্রে।

উৎপলা কিন্তু ভেবেছিল, উপেক্ষিত হয়ে বিকাশ বিরুদ্ধে যাবে। কিন্তু হোল উল্টো—বিকাশ আশ্রমটাকে অভিজাত করে তুললো।

বর্ত্তমানে ওর নাম সহরের সকলের জানা। সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন খবরের কাগজের কলমে ওর নাম থাকে। আর মাসে অন্ততঃ একদিন কোনো-না-কোনো বিরাট ব্যক্তি ওখানে বক্তৃতা করেন। এমন একটা ব্যাপার এই আশ্রম আজ।

সেদিনও এমনি একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে। জনৈক বক্তা ভগবান বুদ্ধদেবের বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। বিরাট মণ্ডপ বিপুলভাবে সাজানো হয়েছে। ফুল-মালা-আলোতে পরিপূর্ণ সভাগৃহে বিচিত্রভূষণা নারীদের মূর্ত্তি ওকে পূর্ণশ্রী-মণ্ডিত করছে একে একে। উৎপলা কিন্তু এখনো এসে পৌছায়নি—তবে আসবে, জানিয়েছে।

মিঃ ম্যাকু সর্ব্বাগ্রে এসেছেন। এসেছে বিকাশ, আর মন্দার প্রডাক্‌সন্সএর মালিক মিঃ সাহা। আরো অনেকে এসেছেন পরিচিত এবং অপরিচিত। সভাটা সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়—বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য—শুধু প্রচার এবং অর্থসংগ্রহ।

উৎপলা এলেই বিশিষ্ট অতিথিকে মাল্যদানের ব্যাপারটা পাকা করা হবে। কে মাল্যদান করবে, এখনো ঠিক হয়নি। মিঃ ম্যাকুর কন্যা মারাঠী ঢংএ শাড়ী পরে অপেক্ষা করছে—তার ইচ্ছা, সে-ই মাল্যদান করে। কিন্তু উৎপলার সম্মতি আবশ্যক, তাই মিঃ ম্যাকু অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন।

উৎপলার গাড়ী এসে পৌছাল অবশেষে। নামালেন তাকে মিঃ ম্যাকু এবং বিকাশ। নমস্কারাদির আদানপ্রদানের পর উৎপলা বলল, ভগবান বুদ্ধের একটি আইভরি-মূর্ত্তি সে উপহার দেবে বক্তাকে।

মূর্ত্তিটি ছোট, কিন্তু বড় সুন্দর। কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, প্রশ্নের উত্তরে উৎপলা জানালো—তার জনৈক বন্ধু বার্ম্মা থেকে এটি পাঠিয়েছেন।

—কে এই বন্ধু? প্রশ্নটা বিকাশের মনেই উঠলো সর্ব্বাগ্রে, কিন্তু মুখে সে কথা বলা সম্ভব হোল না। কারণ, উৎপলা যতটা বলবার বলেছে, অধিক কিছু প্রশ্ন করে জানতে গেলে সে চটে যাবে।

সময় হয়ে এলো—মান্যবর অতিথিও আসছেন। মিঃ ম্যাকুর কন্যা মালা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। অকস্মাৎ উৎপলার বিস্ময়কে অতিক্রম করে যে এসে পৌছাল, উৎপলা তাকে চেনে—সে সিদ্ধেশ্বর। সাধুর বেশ, হাতে কাঠের কমণ্ডলু।

উৎপলা নত হয়ে নমস্কার করে ওকে বসতে বলল, কিন্তু অতি বিস্ময়ে ভাবতে লাগলো—এ কোথা থেকে এল এবং কেন এল? মান্যবর অতিথিও এলেন, এবং মাল্যদানাদির পর বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আড়াই হাজার বছরের অতীত দিনকে যেন মূর্ত্ত করে তুললেন বক্তা। অতি চমৎকার তাঁর বলার ভঙ্গী—নির্ব্বাক হয়ে শুনছিল শ্রোতাগণ। উৎপলা কিন্তু মাঝে মাঝে সেই সাধুর পানে চাইছিল—কেন এল সিদ্ধেশ্বর আজ এখানে? এ প্রশ্নের কোনো মীমাংসা করতে পারছিল না সে। সভা শেষ না হলে ওকে প্রশ্ন করার অবকাশও পাওয়া যাবে না। তাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সভা শেষ হোল—সকলে বিদায় গ্রহণ করলেন; শুধু বিকাশ, ম্যাকু আর উৎপলার যাবার দেরী আছে। উৎপলা সটান সাধুজীর কাছে এসে প্রশ্ন করলো,

—আপনার নাম সিদ্ধেশ্বর—না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—অবন্তীর খোঁজে এসেছেন কি?

—হ্যাঁ। জানেন কি তার কোনো খবর?

—জানি। কিন্তু সে খবর এখানে বলার নয়।

—বেশ, আপনার বাড়ীতে যাব।

—যাবেন ? তাহলে আমার গাড়ীতে উঠে বসুন গে।

সাধু আর কোনো কথা না বলে উৎপলার গাড়ীতে এসে উঠল; চোখ বুজে বসে রইল।

অনেকক্ষণ পরে উৎপলা এসে ওর পাশে বসে ড্রাইভারকে বাড়ী যেতে আদেশ করলো।

পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে উৎপলা ঐ সাধুবেশী সিদ্ধেশ্বরের পানে। ওর বিষয়ে অনেক কথাই জানে উৎপলা—অবন্তীর কাছেই শুনেছে। শুনেছে, অসাধারণ ত্যাগী আর মানবত্ববোধে বিশ্বাসী এই সিদ্ধেশ্বর। গাড়ীর স্বল্পালোকে জটাজুটমণ্ডিত গৈরিকবাস সিধুকে দেখতে দেখতে উৎপলার মনে পড়লো—সিদ্ধার্থ সাধুদর্শনের পর গৃহত্যাগ করেন। সেই দিব্য পুরুষের জীবনালোচনাই সভায় শুনে এল উৎপলা। কিন্তু সাধু-দর্শনের পর সিদ্ধার্থের অন্তরে যে ভাব উদয় হয়, উৎপলার তো তা হবার কথা নয়। তবু যেন তার মানবীয় চেতনায় কিঞ্চিৎ দৈবী ভাব সে অনুভব করছে। প্রশ্ন করলো সিধুকে,

—আজকাল কোথায় আশ্রম আপনাদের ?

—ভারতের সর্ব্বত্রই আমাদের শাখা রয়েছে। তবে আমি এখন থাকি যমুনোত্তরী যাবার পথে একটা গুহায়।

—ওখানেই সাধনা করছিলেন বুঝি ?

—হ্যাঁ। কিছুদিন একান্তভাবে নির্জ্জনবাস না করলে নিজকে অন্তর্মুখী করা যায় না— সিধু যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বললো এই কথা।

—আশা করি, সে সাধনায় আপনি সিদ্ধ হয়েছেন ?

—না, পলা দেবী, সিদ্ধ হওয়া অত সহজ নয়। ওটা অভ্যাস মাত্র। কিন্তু আরোপিত ব্যাপার—আসে, আবার চলেও যেতে পারে।

—ইংরাজী ভাষায় কিন্তু বলে, অভ্যাস প্রকৃতিরই সমকক্ষ—

—হ্যাঁ—যতক্ষণ সেটা বজায় থাকে, কিন্তু তার পরিবর্ত্তনও সম্ভব; এই দেখুন না, আমি-ই শৈশবে ছিলাম দুরন্ত, যৌবনের প্রথমদিকে চঞ্চল এবং চরিত্রহীন—বিলাসী; নাস্তিকও ছিলাম মনে হয়—এখন বিলাসিতা ছেড়েছি, চরিত্রও হয়তো শুধরে নিতে পেরেছি; কিন্তু মনকে আজও পরিপূর্ণভাবে অন্তর্মুখীন করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। বাসনা-ত্যাগ কি আজও হয়েছে আমার? জানি না, এখনো আসক্তির মূল কতটা রয়েছে কে জানে!

—অবন্তীর খোঁজে আসা কি আপনার আসক্তির জন্য? বৈরাগ্যবান পুরুষ আপনি—

—ঠিক তা মনে হয় না। শাস্ত্র-নির্দ্দেশ আর গুরু-আজ্ঞা—'সাত থেকে বারো বছরের মধ্যে একবার জন্মভূমি আর নিকট আত্মীয়দের খোঁজ করে দেখবে, তার পর সন্ন্যাস নেবে'। অবন্তীকে ছাড়া আমার আর কোনো আত্মীয় কোথাও নেই, জন্মভূমি তো ছেড়েই এসেছি—

—আপনি কি এখনো সন্ন্যাস নেননি?

—না। আমি এখনো ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নিয়ে রয়েছি। সন্ন্যাস নেব এবার, অবশ্য অবন্তীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবো। কোথায় আছে সে?

—সে ভাল আছে। খুবই ভাল আছে। আছে এক মন্দিরে।

—মন্দিরে!— সিধুর কণ্ঠে বিস্ময়।

—হ্যাঁ—দেবমন্দির নয়, শিশুদেবতার মন্দির। শিশু-বিশ্ববিদ্যালয়, অথবা বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয়— হাসলো উৎপলা কথা বলতে বলতে।

—সে কোথায়? কি হয় সেখানে?

—কলকাতা থেকে শ'খানেক মাইল দূরে একটা জায়গা। ওর নাম 'মানবক-মন্দির'। হাজার বিঘে জমির উপর ঐ মানবক-মন্দির স্থাপন করা

হয়েছে। ওখানে মাতাপিতৃহীন অনাথ শিশুদের মানবতার আদর্শে পালন করা হয়। অবন্তী ওর অধ্যক্ষ। পরিকল্পনাও তারই।

—ভালই তো পরিকল্পনা। জায়গাটা দেখতে পারি নে?

—নিশ্চয় পারেন। আজ রাতটা থাকুন, কাল সকালে আপনাকে নিয়ে যাব ওখানে। মোটরেই যাওয়া যাবে।

—কতগুলি ছেলেমেয়ে আছে?

—প্রায় শ'খানেক। যাদের কেউ কোথাও নেই এমন শিশুই ওখানে ঠাঁই পায়। ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত রাখার নিয়ম, তারপর স্বাধীনভাবে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। খাঁটি ভারতীয় প্রথায় ওদের মানুষ করা হচ্ছে—দেখলে আনন্দ পাবেন আপনি।

—কালই যেতে আপনার অসুবিধা হবেনা তো?— সিধু সঙ্কোচের ভাবে শুধুলো।

—না। আমারও যাওয়ার দরকার একবার ওখানে।

—ওর আয় কি? কি ভাবে চলে ঐ শিশু-বিশ্ববিদ্যালয়?

—সরকারী-বেসরকারী দান আর ওখানকার জমির ফসল, কারুশিল্প বিক্রী ইত্যাদিতে চলে যায়। কর্ম্মীরা সকলেই অবৈতনিক, খাওয়া-পরা ছাড়া আর কিছু নেন না। অর্থাৎ ওটা সম্পূর্ণভাবে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

—বেশ—চলুন দেখি। যদি সত্যি ভাল কোনো কাজ করছে অবন্তী, তো আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। আচ্ছা, আলোকের খবর জানেন?

—না। দীর্ঘদিন জানি না কিছু। কোথায় যে ডুবে গেল অতবড় আলোসূর্য্য, ভগবান জানেন!— উৎপলার কণ্ঠস্বরে অতি বিষাদময় সুর ধ্বনিত হোল। সচমকে চাইল সিধু ওর মুখপানে, কিন্তু গাড়ীর ভিতরটা আলোকিত নয়—মুখ দেখতে পেল না, শুধু শুনতে পেল উৎপলার সুদীর্ঘ শ্বাস-শব্দটা।

গাড়ী বাড়ীর কাছে এসে পড়েছে। উৎপলা নিজেকে কঠোরভাবে সংযত করে সিধুকে নামতে বলল। সুন্দর সুসজ্জিত প্রাসাদ, উজ্জ্বল আলোকদীপ্ত—সিধু দেখলো, তারপর ধীরে ধীরে বলল উৎপলাকে,

—আমার কি পরিচয় আপনি দেবেন এখানে?

—কেন? অবন্তীর স্বামী।

—না। বলবেন আমি আলোকের বন্ধু—আপনার পরিচিত।

—আচ্ছা, তাই হবে। তবে পরিচয় দেবার খুব বেশী কেউ নেই এখানে। আমার বুড়ী মা আছেন। আসুন।

সিধু নেমে উৎপলার সঙ্গে সেই সুরম্য হর্ম্যে প্রবেশ করলো।

আলোক অস্বস্তি অনুভব করছে অন্তরে। অপর্ণার সঙ্গে দেখা হওয়াটা যেন একটা অসম্মান—অথচ কেন এমন মনে হচ্ছে, ও ঠিক বুঝতে পারছে না। মনে পড়লো, এক নিতান্ত দুর্দ্দিনে ঐ অপর্ণাই তার বান্ধবীর কাজ করেছে। সদ্যোজাত পরিত্যক্ত একটা শিশুকে নিয়ে যে মাতৃত্বের মহিমময়ী মূর্ত্তিতে সে প্রকটিত হয়েছিল, তাই দেখে আলোক বিশ্বজননীর দর্শন পেয়েছে,—ভেবেছিল। কিন্তু উৎপলার আশ্রমে অপর্ণার কীর্ত্তি এবং সুহৃদবাবুর সঙ্গে অপকীর্ত্তির কথাটাও আলোক জানতে পেরেছে খবরের কাগজ মারফৎ। সুহৃদবাবু কিছু টাকাও নিয়ে সরে পড়েছিল, তাই পুলিসে খবর দেওয়া হয়; ওরা ধরা পড়ে এবং খবরের কাগজে সবিস্তারে সে কাহিনী ছাপা হয়—আলোক

পড়েছে সে সংবাদ। সেই মাতৃরূপা অপর্ণার অধঃপতনের কাহিনী জানে বলেই হয়তো আলোকের মনে এই অসম্মানের ভাব জাগছে।

ট্রামের বেঞ্চে বসে বসে আলোক চিন্তা করছিল—নারীর শতসহস্র রূপের কথা। ঐ তুচ্ছ অপর্ণাই কত বিচিত্ররূপে দেখা দিল তার সুমুখে! কিন্তু অপর্ণা সত্যি কী, তাকি আজও জানে আলোক? জানা সম্ভব নয় কোনোদিন। হয়তো অপর্ণার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল ঐভাবে চলে যাওয়ার, তাই ওটা ঘটেছে। আলোকের সহিষ্ণু মনে আবার অপর্ণার প্রতি সহানুভূতি জেগে উঠছে।

ফিরে যাবে নাকি আলোক আবার শিয়ালদহ ষ্টেশনে? না,—অপর্ণার যা হয় হোক, আলোক কী করতে পারে! অপর্ণার দুর্ভাগ্য অপর্ণা ভুগবে, যেমন আলোকের দুর্ভাগ্য আলোককে ভুগতে হচ্ছে। —এর নাম কর্ম্মফল। আলোক শ্যামবাজারের মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে পড়লো।

ছাত্রী অঞ্জনার মেয়েটা ওর বড় নেওটা; কিন্তু আলোক বাড়ীর বার হয় না, তাই কোনো উপহারই তাকে এপর্য্যন্ত দেওয়া হয়ে ওঠেনি; আজ কিছু একটা খেলনা কিনে নেবে ঐ বাচ্চা মেয়েটার জন্য। আলোক একটা দোকানে প্লাষ্টিকের সস্তা দুটো পুতুল কিনলো আর একটা ঝুমঝুমি। নিতান্ত সামান্য বস্তু, তবু ওর মন যেন পরম পরিতৃপ্তি লাভ করছে। ঐ বাচ্চা মেয়েটা হয়তো আধঘণ্টার মধ্যে এই সুন্দর রঙিন খেলনা দুটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে, কিম্বা ছুঁড়ে ফেলে দেবে, অথবা দান করে দেবে অন্য কাউকে। তবু ওকে এই সামান্য উপহার দেওয়ার যে একটা তীব্র আনন্দ আছে, সেটা যেন আজই প্রথম অনুভব করলো আলোক। অঞ্জনা ওর কেউ নয়, তার মেয়ে আরো তফাৎ—কিন্তু সে শিশু, বিশ্ব তার আপনার, তাই শিশুকে 'দেবতা' বলা হয়েছে। আলোক খেলনা ক'টি নিয়ে বাড়ীর পথে হাঁটতে লাগলো।

ঐ শিশুদেবতার সূত্র ধরে একটা সংবাদের কথা মনে হোল আলোকের। খবরটা কাগজে পড়েছিল। এই ক'বছরের ওর যা-কিছু বাস্তব জ্ঞান সবই কাগজের মারফৎ। মনে পড়ল, কোথায় যেন একটা শিশু-বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা পড়েছিল সে। মাঝে মাঝে তার রিপোর্ট কাগজে বের হয়, দেখেছে। কিন্তু জায়গাটা ঠিক কোথায়, মনে করতে পারলো না—শুধু মনে পড়ল, উৎপলা ঐ শিশু-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছে।—যাক্ গে···

বিরক্ত আলোক খেলনা নিয়ে বাড়ী ঢুকলো। অঞ্জনার কন্যা অচিরা দু'হাত বাড়িয়ে কোলে এসে পড়ল ওর। তিন বছরের বালিকা—খেলনার তার অভাব নেই, কিন্তু আলোকের হাত থেকে প্রথম উপহার বলেই কিনা কে জানে, ওর যেন আনন্দ সহস্রগুণ বেড়ে উঠলো।

—'মামা—মামা,—মা—মামা দিয়েছে' —বলে চীৎকার করছে।

—হ্যাঁ—মামা দিয়েছে, —বলে হাসল অঞ্জনা— বলল আলোককে,

—এত বেলা অবধি কোথায় ছিলে, দাদা! আমি ভাবলাম, বহুদিন বাড়ী থেকে বের হওনি, কলকাতার পথঘাট ভুলে বাড়ী হারিয়ে ফেলেছো—

—হ্যাঁ, সেইরকমই অবস্থা—দেখলাম, নতুন রাস্তায় ছেয়ে গেছে সহরটা—পথ ভুল হওয়াই উচিত ছিল!

—হোল না কেন?

—এই বাচ্চাটার জন্যে— বলে আলোক মেয়েটার গালে চুমু দিল।

—ও-ই তাহলে তোমাকে বেঁধেছে, দাদা?— হাসলো অঞ্জনা,— কিন্তু সাতবছর তো ও ছিল না, মাত্র তিন বছর এসেছে—

—আগের চার বছরের যে-কোনো মুহূর্ত্তে আমি পথ ভুলে চলে যেতে পারতাম, অঞ্জু! পরের তিন বছর আমি বাড়ীর বাইরে যেতে চাইনি।

—তা জানি। বেলা হয়ে গেছে, স্নান কর—বাবা খেয়ে শুয়েছেন।

আলোক স্নান করতে চলে গেল বাথরুমে। দীর্ঘ সাতবছর এই বাড়ীতে আছে সে। প্রাইভেট টিউটার হয়ে ঢুকেছিল, কিন্তু আজ কেউ জানিয়ে না দিলে কারও জানবার ক্ষমতা নেই যে আলোক এ বাড়ীর ছেলে নয়। সকলেই জানে, সে অঞ্জনার দাদা। অসাধারণ বিদ্বান, বুদ্ধিমান আর চরিত্রবান—অবিরাম পড়া আর লেখা নিয়ে কাটায়, তাই বিয়ে করার ফুরসৎ হোল না। অথচ পাড়ায় এবং পরিচিতদের অনেকেই অঞ্জনার বাবার কাছে প্রস্তাব করেছেন আলোকের বিয়ের জন্য। অঞ্জনাও গোপনে গোপনে তার দু'দশটি বিশেষ সুন্দরী আর শিক্ষিতা বান্ধবীকে ডেকে এনে আলাপ করিয়ে দিয়েছে আলোকের সঙ্গে। কিন্তু কৈ, আলোককে কেউ বাঁধতে পারলো না!

সাত বছর কাটিয়ে দিল আলোক বৃদ্ধ ঐ ভদ্রলোকের কাজে সাহায্য করে। তবে একটা বিরাট কাজ ওঁরা করেছেন—এই সান্ত্বনা। বৃদ্ধ বার বার বলেন,—আলোক না এলে এ-কাজ তাঁর কোনোদিনই শেষ হোত না। নিজের পুত্র নেই, আলোক তাঁর পুত্রের কাজই করছে। শিষ্য এবং পুত্র সে একসঙ্গে। অত্যন্ত স্নেহ করেন তিনি আলোককে। এমন কি, তাঁর অন্তরের ইচ্ছা, আলোক বিয়ে করে সংসারী হলে তিনি নিজ বাসগৃহের একাংশ আলোককে দান করবেন এবং কিছু নগদ টাকাও। কিন্তু আলোক সব প্রলোভন এড়িয়েই যাচ্ছে। কোষ-গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ না হওয়ায় বৃদ্ধ আলোকের বিয়ে সম্বন্ধে বেশী চাপ দেন নি, এবার দেবেন—ভেবে রেখেছেন। কন্যাকেও অবহিত করে রেখেছেন এ বিষয়ে। কিন্তু অঞ্জনা বড় বেশী আশা করে না। আলোক এক আশ্চর্য্য ধাতুতে গড়া—এ সত্য অঞ্জনা খুব ভাল জানে।

অঞ্জনার শ্বশুরবাড়ী কলকাতাতেই। স্বামী ব্যবসাদার মানুষ—তাঁর নিজের অফিস আছে, কলকাতায় নিজস্ব বাড়ীও আছে। তবে অঞ্জনাকে

শ্বশুরবাড়ীতে ঘর করতে হয় না। বাপের একমাত্র কন্যা বলে তিনি ওকে পিত্রালয়েই থাকতে দেন, নিজেই এসে দু'দশদিন থেকে যান এখানে। অঞ্জনা কদাচিৎ শ্বশুরবাড়ী গিয়ে দু'পাঁচদিন কাটিয়ে চলে আসে। এ ব্যবস্থাটা আপাততঃ চলেছে যতদিন অঞ্জনার বাবা পৃথিবীতে আছেন।

স্বামী সুশিক্ষিত এবং নানাগুণশালী, সুতরাং অঞ্জনা সুখী হয়েছে; কিন্তু মানুষের অন্তরে কোথায় যেন একটা অসুখের অন্ধকার থাকবেই, এ যেন বিধিলিপি—তাই আলোকের জন্য ওর মন কাঁদে। অমন একটা অপরূপ দাদা পেল অঞ্জনা, অথচ তাকে সংসারে বাঁধতে পারলো না—এ ওর বড় আফশোসের বিষয়। বহুবার বহু চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় রেগে ও সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে। এখন শুধু বলে—'দাদা চিরকুমার সভার সভাপতি!' কিন্তু আজ আবার ওর মনে আলোকের জন্য চিন্তা জেগে উঠেছে বিশেষ একটা কারণে। ওর বান্ধবী করবী খুব ভাল মেয়ে—বাংলায় এম. এ. পাস করেছে, যথার্থ সুন্দরী আর সত্যিকার বুদ্ধিমতী। অঞ্জনা বহু আশা করে করবীকে নিমন্ত্রণ করেছে আজ সন্ধ্যায়—ইচ্ছা এবং আশা, যদি আলোক তাকে পছন্দ করে। করবী এতদিন কলকাতায় ছিল না, দিল্লীতে ছিল মামার বাড়ীতে।

আলোক বাথরুমে স্নান করছে আর অঞ্জনা ভাবছে, খাবার সময় দাদাকে বলবে সন্ধ্যায় তার আরতির সময় উপস্থিত থাকতে। আজ সরস্বতী পূজা—দাদা এখনো পূজা করেনি—করবে নিশ্চয়। ওর বাবা পূজা ক'রে, খেয়ে বিশ্রাম করছেন। আলোক বেরিয়ে এল।

—পুষ্পাঞ্জলি দেবে তো, দাদা—

—হ্যাঁ, চলো—ফুল-বেলপাতা কিছু রেখেছিস তো?

—কে জানে, আছে কিনা। তুমি তো বল, মানস-উপচারেই ভাল পূজা হয়।

—আমি বলি নে, শাস্ত্র বলেন—চল্—

প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ঘরটায় কাঠের চৌকীর উপর বহু পুস্তক সাজিয়ে তাতেই পূজা করা হয়েছে। মূর্ত্তি এ বাড়ীতে আনা হয় না। অঞ্জনার বাবার মত্—বর্ত্তমান কালের মূর্ত্তি ঠিক ধ্যানানুগ হয় না, তাই উনি পুস্তকের ওপর বাণীর আরাধনা করেন। নিতান্ত অনাড়ম্বর আরাধনা। পাড়ায় অনেক বাড়ীতে মূর্ত্তি আনা হয়—ঢাকঢোল বাজে; রেডিও আর এ্যাম্প্লিফায়ারে কান প্রায় ফুটো হবার যোগাড় হয় এ বাড়ী। কিন্তু নিঃশব্দে পূজা করে; সন্ধ্যায় শুধু অঞ্জনা একটা-দুটো গান গায়, ওর বাবা স্তোত্রপাঠ করেন—ব্যস্ এই পর্য্যন্ত। কিন্তু একটা গম্ভীর-সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয় ওখানে—যারা দেখে, তারা ভাবে অসাধারণ পূজা! আলোক এই সাত বছর এই পূজার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে।

—আজ পূজার সময় তুমি ছিলে না দাদা, বাবা খুব দুঃখ করছিলেন—

—আটকে পড়েছিলাম রে—ফিরতে দেরী হয়ে গেল। আরতির সময় নিশ্চয় থাকবো।

—হ্যাঁ, তা তো থাকবেই। আজ আমার একটি পুরোনো বান্ধবী আসবে, দাদা—খুব ভাল গাইতে পারে।

—বেশ তো, মায়ের নাম গাওয়াবি তাকে দিয়ে।

—হুঁ, তোমার লেখা সেই গানটা ওকে দিয়েছি আমি—ও নিজে সুর দিয়েছে।

—কোন্ গানটা?

—সেই—"শুভ্র চরণ-পঙ্কজ-করে অন্তর করো নিরমল—
পদকুঙ্কুম-রঞ্জনে মম রক্তিম কর হিয়া-তল—"

—বেশ, শোনা যাবে— বলে আলোক পূজা করতে আরম্ভ করলো। দীর্ঘক্ষণ ধ্যানস্থ রইল আলোক, তারপর পুষ্পাঞ্জলি দিল মন্ত্র পড়ে; প্রণাম করলো।

—চলো, খাবে এবার— বলল অঞ্জনা।

—তোর বর আজ আসবে শুনছিলাম না ?

—কি জানি—আসতে পারে বিকালের দিকে।

অকারণ এমন দু'একটা কথা বলে আলোক অঞ্জনার সঙ্গে। হয়তো খুব অকারণ নয়—ওকে মনে করিয়ে দেয় যে বাবা-দাদা ছাড়াও আর একজন আছে, যার কথা অঞ্জনার ভাবা দরকার।

আলোক বলল,—সে আসবে কিনা, সঠিক জানিস নে তুই ?

—আসবে তো লিখেছে। তার বেশি আমি কি করে জানবো! চলো, বেলা তিনটের কাছাকাছি—খিদে পেয়েছে আমার।

—তুই এখনো খাসনি ?

—তোমাকে ফেলে খেতে হবে নাকি ?

—আহা! চল—চল—ভাইবোনে একসঙ্গে খাব—

আলোক তাড়াতাড়ি আর একবার প্রণাম করলো সরস্বতীকে, তারপর উঠে খেতে গেল। খেতে খেতে সে ভাবছিল, পৃথিবীর সব আত্মীয়কে হরণ করে এক নিতান্ত অনাত্মীয়ের অঞ্চলতলে যিনি ওকে বেঁধেছেন, তাঁকে নমস্কার—বারম্বার নমস্কার!

চঞ্চল নদীস্রোত···

সকালের স্নিগ্ধ আলোকে ঝলমল দিগ্‌দিগন্ত। দূরে বাঁশবন আর আমবাগানের শ্যামলাঙ্গ গাঢ় হয়ে ফুটে উঠেছে জননীর স্নেহের মত।

সিদ্ধেশ্বর দু'চোখ মেলে দেখছিল বাংলামা'র এই স্নিগ্ধসুন্দর রূপ। পাশে বসে আছে উৎপলা—গাড়ী তীরবেগে চলেছে নদীকিনারের বাঁধা

রাস্তা দিয়ে। সিধু কেমন যেন সম্বিৎহারার মত বসে আছে; মন যেন ওর হারিয়ে গেছে প্রকৃতির এই রহস্যময় শ্যামলাভায়। কথা কইল উৎপলা,—ঐ-যে কলাগাছ দেখা যাচ্ছে,—ঐটি আশ্রম।

—ও— সিধুর যেন চমক ভাঙলো। চেয়ে দেখলো কয়েকটি বাড়ীর ছাদ আর টালী দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে কলাগাছও।

উত্তরদিকে অজয় নদ, তারই কূলে এই আশ্রম। নির্জ্জন-নিঃস্তব্ধ স্থানটি—দূরে মেঘের গায়ে যেন ছায়ার মত কোন্ পাহাড়ের ইঙ্গিত দেখা যায়, ধ্যানস্তম্ভিত যেন কোনো যোগিরাজ! সিধু স্থানটির সৌন্দর্য্য দেখে সত্যি মুগ্ধ হোল। উৎপলা বলল,

—জায়গাটা প্রাচীন দিনের তপোবনের মত মনে হচ্ছে না?

—হ্যাঁ, যদি সব রকমে তপোবন হয় তো আনন্দের কথা।

—হওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। অবশ্য বর্ত্তমান যুগোপযোগী করে।

—পশ্চিমী প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা দরকার, নইলে সব-কিছুই বরবাদ হয়ে যাবে— বলে সিধু একটু থেমে আবার বলল,—ওদেশের সবই যে খারাপ, একথা আমি বলছিনে—আমার বক্তব্য, আমাদের জীবন মূলতঃ অন্তর্মুখী, ওদের বহির্মুখী—এই তফাৎটা যেন বজায় থাকে। কিন্তু আমরা যুগোপযোগী হতে গিয়ে ওদেরই অনুকরণ করে বসছি; যুগটা যেন একান্তভাবে ওদেরই। কিন্তু তা নয়। এদেশের যুগ এবং যুগধর্ম্ম এদেশের জলমাটির যোগ্য হতেই হবে। নইলে সবই ব্যর্থ।

আর কোনো কথা বললো না উৎপলা। গাড়ী গেটে দাঁড়াতেই আশ্রমের কয়েকটি মেয়ে এসে অভ্যর্থনা করলো ওদের। সিধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে চারদিক—অবন্তীকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। হয়তো বিশেষ কোনো কাজে ব্যস্ত থাকবে ভেবে, কোনো প্রশ্নও উৎপলাকে করলো না সিদ্ধেশ্বর। নিঃশব্দে নেমে ভেতরে এল।

সুন্দর আশ্রম—স্বাস্থ্যকর স্থান এবং সবই সুরুচিপূর্ণ। ঘুরে ঘুরে দেখলো সিদ্ধেশ্বর উৎপলার সঙ্গে। অধিবাসিনীরা যে যার কাজে নিযুক্ত, —কিন্তু আশ্চর্য্য, অবন্তীকে কোথাও দেখা গেল না!

মন্দিরের মত একটি ঘর দেখে সিধু শুধুলো,—এখানে কি হয়?

—উপাসনা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে সমবেত উপাসনা হয়।

—সুন্দর ব্যবস্থা। কিন্তু কোনো বিশেষ ধর্ম্মমতে নিশ্চয়ই?

—না। শুধু সার্ব্বজনীনভাবে ঈশ্বরের নামগান হয়— বলল উৎপলা।

সিধু ব্যাপারটা নিয়ে তখন আর কোনো আলোচনা করলো না। দেখতে পেল, ওপাশে দাঁড়িয়ে অবন্তী।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে অবন্তী, যেন মাটির প্রতিমা। তার আয়ত চোখ অর্দ্ধনিমিলিত—উদাস। যেন কিছুই দেখছে না। সিধু ক্ষণেক তাকিয়ে রইল ওর পানে, কিন্তু অবন্তী তাকালো না। জানলা-পথে বাহিরের পানে চেয়ে রয়েছে। অজয়ের কিনারায় কাশফুলের হিল্লোল দেখছে যেন অবন্তী!

অবন্তীকে ডাকতে কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছে আজ সিধুর। উৎপলা কখন সুট্ করে গৃহান্তরে সরে পড়েছে, সিধু জানতে পারেনি। এ ঘরে অবন্তী আর সিধু ছাড়া অন্য কেউ নেই। সিধু কি ডাকবে অবন্তীকে? হ্যাঁ, ডাকাই তো উচিত; কিন্তু লজ্জার আড়ষ্টতা ওকে বাধা দিচ্ছে। সে বাধা জোর করে সরিয়ে সিধু বলল,—অবন্তী!

—উঁ!··· অবন্তীর উত্তরটা যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল।

কোমল-সুন্দর মুখশ্রী অবন্তীর—সিধু তাকিয়ে দেখলো। কী বলবে? এতো কাণ্ডের পর এই নির্জ্জন নদী-সৈকতের আশ্রম-আবাসে যে নিজেকে সমাধিস্থ করতে এসেছে, তাকে বলবার কি আছে? কিন্তু কিছু বলতেই হবে; কিছু বলবার জন্যই এসেছে সিদ্ধেশ্বর। চেয়ে দেখলো ভাল করে, অবন্তীর সর্ব্বাবয়ব অপরূপ সুষমামণ্ডিত—

সুন্দরী অবন্তী অনবদ্যাঙ্গী হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে রূপে কোথাও চাপল্য নেই।

—ভাল আছ, অবন্তী?— সিধু অতি সাধারণ প্রশ্নই করলো অবন্তীকে।

—হ্যাঁ— বলে অবন্তী এগিয়ে এল ওকে প্রণাম করতে।

—থাক্, থাক্— বলে সিধু আবার প্রশ্ন করলো,—এখানে কতদিন আছ?

—অনেক দিন— বলে অবন্তী উঠে দাঁড়ালো প্রণাম সেরে।

এর পর আর কথা চলে না। দুজনেই চুপচাপ মিনিটখানেক। কিন্তু কথা কিছু বলতেই হবে। সিধু পরিপূর্ণরূপে অবন্তীর অভিমত জানতে চায়।

—এখানে যদি ভাল থাক আর এই কাজে আত্মার তৃপ্তি বোধ কর, তাহলে খুব ভাল কথা, অবন্তী—আমি সেই খবরটাই জানতে এলাম। এখানে নরদেবতার, শিশুদেবতার সেবায় কি তুমি জীবন উৎসর্গ করতে পারবে? যদি পার, আমি আশীর্ব্বাদ করে যাব।

অবন্তীর মুখখানা লাল হতে হতে কালো হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ কথা বললো না অবন্তী, তারপর ধীরে ধীরে বললো,

—আমার গোটা জীবনটাই ভুলময়, সিধুদা! আজও তার সংশোধন করতে পারছি নে। কেমন করে পারবো, তাও জানি নে।

—কেন একথা বলছো, অবন্তী?— সিধু প্রশ্ন করলো সোদ্বেগে।

—বলবো, কেন। এইমাত্র এলে। স্নানাহার কর। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার অনেক। ওবারের মত না-বলে পালিও না যেন।— ক্ষীণ হাসলো অবন্তী।

—না, তোমার কথা শুনতেই আমি এসেছি— বলে সিধু নদীর পানে চাইলো।

—এসো, তোমার থাকবার ঠাঁই দেখিয়ে দিই—বলে অবন্তী এগুলো।

—আমার সঙ্গে তোমার কী পরিচয় এখানে জানানো হবে, অবন্তী ?

—কিছু না। তুমি এখানে শুধু একজন দর্শক—'ভিজিটার'—হাসলো অবন্তী।

দুজনেই অল্পক্ষণ চুপচাপ, অবন্তী-ই কথা বলল অতঃপর,

—তুমি নিরপেক্ষ দর্শকই তো রইলে চিরদিন, সিধুদা !

—এটা কি তোমার অভিযোগ অবন্তী ?

—না-না— অবন্তী যেন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো,—পাপ আমি অনেক করেছি, সিধুদা—কিন্তু তোমার মহিমাকে আমি কোথাও ক্ষুণ্ণ করবো না। তোমার ওপর কোনো অভিযোগ আমার কখনো নেই। আমি প্রতি সন্ধ্যায় প্রার্থনা করি, আগামী জন্মে যেন তোমার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হতে পারি। এই জীবনে শিশু-সেবার কাজ নিয়ে কি সেই যোগ্যতা অর্জ্জন করা যাবে না, সিধুদা ?

অবন্তী এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেললো, কিন্তু সিধু চুপ করে আছে। অবন্তী যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হয়ে আবার বললো,

—তুমি হয়তো জন্মান্তর আর প্রার্থনা কর না, সিধুদা,—কথাটা বলে আমি কি অপরাধ করলাম ?

—না—না অবন্তী, অপরাধ কিছু নয়। জন্মান্তর কারো হাতে নেই। তবে আমাদের সাধনা—নিষ্কাম সাধনা। আবার জন্মাবার কামনা করা নিষিদ্ধ আমাদের ধর্ম্মে। কিন্তু সে কথা থাক্। আমার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হবার আকাঙ্ক্ষা না করে তুমি নিষ্কামভাবে এই সেবাব্রতে আত্মবিলুপ্তি ঘটিয়ে দিতে পারলে আমি আরো সুখী হব। এ কাজ ঈশ্বরের কাজ বলে গ্রহণ কর। মনে কর, তোমাকে দিয়েই সৃষ্টিকর্ত্তা এ কাজ করাচ্ছেন। তুমি যন্ত্র মাত্র—

—ওসব পুঁথীর কথা, সিধুদা— হাসলো অবন্তী,—আমি তো ওভাবে গঠিত হইনি। আমার অন্তর বিলাসের আর ব্যসনের

আস্তানা। আজ যে এই জনহিতকর কাজ আরম্ভ করেছি, এর কতটা আত্মবঞ্চনা আর আত্মতৃপ্তির জন্য, তা খুঁজে বের করতে অঙ্ক কষতে হবে। তাতে যে সেবাব্রত আছে, তার নিষ্কামত্ব হয়তো ভগ্নাংশে এসে দাঁড়াবে।

—তা হোক, তবু এটাকে আশ্রয় করে তুমি কর্ম্মযোগে উন্নত হতে পার, অবন্তী! যদি তুমি সত্যি একাজেই জীবনপাত করতে চাও তো, একে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ এবং তাঁরই কাজ বলে গ্রহণ করলে বেশী তৃপ্তি পাবে।

—দেখি। এসো ভিতরে— বলে অবন্তী ওকে একটা পাকাঘরের মধ্যে আনলো। এটা গেষ্ট-হাউস। থাকবার সব ব্যবস্থাই আছে। তবে খুব ক্ষুদ্র আকারে।

সিদ্ধেশ্বর ঐ ছোট ঘরটার এক কোণায় কাঁধের কম্বলটা বিছিয়ে পাতল। কমণ্ডলুটা রাখলো একপাশে, তারপর বসল কম্বলের উপর।

—তুমি তো আতপান্ন খাও?— অবন্তী শুধুলো।

—না অবন্তী, এখানে ওসব ঝামেলার দরকার নেই। যা হয়, দেবে।

—এখানে অসুবিধা কিছু নেই। স্বপাক খাবে তো?

—না, অবন্তী—আলুভাতে ভাত। নিরামিষ। তুমিই রান্না করে দিও—

—আমি?— অবন্তী যেন চম্‌কে উঠলো,—আমার হাতের রান্না খাবে তুমি?

—হ্যাঁ,—কেন? একটু থেমে সিধু বলল,—মানুষের দেহে ভগবান থাকেন, অবন্তী! মানুষ কখনো ঘৃণার পাত্র নয়। আর তুমি তো জান, আমার প্রথম যৌবন কিভাবে কেটেছে! এক শালগ্রামের নুড়ি-ই আমাকে এই অবস্থায় এনেছেন। তোমাকেও আনতে পারেন। হয়তো আনছেন!··· তুমিই রান্না করবে।

অবন্তী আর কিছু বললো না, ধীরে ধীরে চলে গেল। কিন্তু সিধুর উদার হৃদয়ের অপরূপ মহিমা ওকে অশ্রু-পঙ্কিল করে তুলছে! হতভাগিনী সে, এমন অসাধারণ পুরুষের সেবার সৌভাগ্য পেয়েও পেল না। নিঃশব্দে অবন্তী গিয়ে আতপতণ্ডুলের জন্য কাছের গ্রামে লোক পাঠাল। উৎপলা হেসে বলল,—ও তো বলল, সিদ্ধ চাল খেতে আপত্তি নেই—

—না, পলাদি, ওর ধর্ম্ম কোথাও আর ক্ষুণ্ণ করতে চাই নে।

—তোর এই কথাতেই বোঝা যাচ্ছে, ওকে তুই আর নীচে, সংসারের বন্ধনে নামাবি না, কেমন?

—নীচে ওকে কেন নামাবো, পলাদি! নিজে ওর পায়ের ধূলো হতে পারলাম না বলে কি ওকেও ধূলোতে নামাবো!

—না,—তোর এই গৌরব অটুট থাক্!— পলা যেন আশীর্ব্বাদ করলো।

অবন্তী রান্নার আয়োজন করতে গেল সিধুর জন্য। এ অধিকার পেয়ে ও যেন কৃতার্থ হয়ে গেছে। এক কোণের একটা বারান্দা গোবর দিয়ে নিকুলো অবন্তী—ছোটবেলায় বাড়ীতে এইভাবে ঘর-নিকোনো শেখা আছে ওর। তার পর বাসন ধুয়ে-মেজে কাঠের জ্বালে রান্না করতে বসলো স্নানপূতঃ শুচি হয়ে। ঠিক যেন পূজার ভোগ রান্না করছে কোনো মন্দিরের সেবিকা। উৎপলা সমস্তটা দেখলো—ভাবলো, সিধুকে সংসার-আশ্রমে আর হয়তো নামাতে চাইবে না অবন্তী। ভালই হোল। এই শিশু-আশ্রমটা ওরই গড়া, ওরই হাতে থাকলে ভালভাবে চলবে। নইলে উৎপলাশ্রমের মত এটাও বিলিতি-মার্কা হয়ে বিলাসের কেন্দ্র হয়ে পড়তে পারে। তবু অবন্তীর জন্য দুঃখ হচ্ছে উৎপলার। ঐ অসাধারণ সন্ন্যাসী স্বামী আজও ওকে নিয়ে ঘর বাঁধবার জন্য ফিরে ফিরে আসে, আর দুর্ভাগিনী অবন্তী ইচ্ছা সত্ত্বেও

যেতে পারে না তার সঙ্গে। কিন্তু অবন্তীর তবু তো আছে স্বামী সিদ্ধেশ্বর—সাধু হয়েও তো সে মনে রাখে অবন্তীকে। উৎপলার কে কোথায় আছে !…

জীবনের রুদ্র যেন জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে জাগছে এখানে। সিধু চেয়ে দেখলো আঙিনার দিকে—অপরূপ দৃশ্য। প্রায় শতাধিক বালক-বালিকা দুই সারিতে পৃথক্‌ভাবে দাঁড়িয়ে স্তোত্রপাঠ করছে। বেদ থেকে আহরিত স্তোত্র—সমবেত কণ্ঠের মধুর ধ্বনি—চমৎকার শোনাচ্ছে সিধুর কাণে। নির্ব্বাক বিস্ময়ে ও শুনলো কিছুক্ষণ। 'সুন্দর !'

নিজের মনেই কথাটা উচ্চারণ করলো সিধু। স্তোত্রপাঠ শেষ হতেই তাদের ছুটি হয়ে গেল। নিয়মবদ্ধভাবে বালকরা একদিকে আর বালিকারা অন্য দিকে চলে গেল। সিধু বুঝলো, এক আশ্রমে অবস্থান করলেও এদের বাসস্থান পৃথক্ এবং দূরে দূরে।

বেলা অনেকটা হয়েছে—অবন্তী হয়তো রান্না শেষ করে ফেললো। সিধু তার পূজা শেষ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল অকস্মাৎ। এতক্ষণ ঐ শিশু-দেবতাদের কণ্ঠকাকলি ওকে কেমন যেন মুহ্যমান করে রেখেছিল। সম্মুখের শালগ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করে সিধু উচ্চারণ করলো—ওঁ ধ্যেয়ং সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণং সরসিজাসন…

পূজাশেষে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেল সিধু। কতক্ষণ কেটেছে কে জানে ! চোখ মেলে চেয়ে দেখলো, এক অপরূপদর্শী বালক ওর মুখপানে তাকিয়ে রয়েছে। স্বয়ং নারায়ণ নাকি ! বিস্মিত সিধু বিহ্বল হয়ে উঠেছে, কিন্তু তখুনি বুঝতে পারলো, নারায়ণ নন, এই আশ্রমেরই এক বালক। কিন্তু কী চমৎকার চেহারা ! রূপ যেন উথলে উঠছে ওর অঙ্গে। নিষ্পাপ

নিষ্কলুষ মুখকান্তি। আয়ত-বিশাল চোখে বিস্ময়ের সমুদ্র! কে এ? কেন সিধুকে দেখছে এভাবে? কি ওর নাম?

প্রশ্নগুলো আকস্মিকভাবেই জেগে উঠলো সিধুর অন্তরে। কিন্তু ছেলেটিকে কিছুই প্রশ্ন করলো না সিধু—ওর সরল-সুন্দর চাহনি সিধুর অত্যন্ত ভাল লাগছে—কে জানে, প্রশ্ন করলে পালিয়ে যাবে কিনা! সিধু আবার চোখ বুজলো ছেলেটা কি করে দেখবার জন্য। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে চোখ খুলে দেখলো, ও তেমনি নির্নিমেষ চোখে সিধুকে দেখছে। ওর চোখে পরম বিস্ময়, যেন সিধুর মত কাউকে ও কখনো দেখেনি! এবার কিন্তু সিধু আর কথা না-বলে পারলো না। বলল,

—তোমার নাম কি খোকা?

—জীবন— বলেই ছেলেটি এসে সিধুকে প্রণাম করলো ভূমিষ্ঠ হয়ে।

—কল্যাণ হোক— আশীর্ব্বাদ করলো সিধু ওর মাথায় হাত দিয়ে। বলল,—কতদিন এখানে আছ তুমি? কি পড়? কোন্ স্কুলে?

—অনেকদিন আছি। আপনি কে? আপনাকে তো কখনো দেখিনি? আপনি কি 'রুদ্র'?

—না বাবা,—আমি সামান্য মানুষ। রুদ্রকে নিয়ে কি করবে তুমি?

—রুদ্রকে দেখবো। রুদ্র কোথায় আছে, জানেন? আপনি দেখাতে পারেন?

—না বাপ্,—রুদ্রকে দেখতে হলে সাধনা করতে হয়।

—আমি করবো সাধনা—আপনি শিখিয়ে দিন— বলে ও যেন পদ্মাসনে বসবার চেষ্টা করতে লাগলো। হাসি পাচ্ছে সিধুর! কিন্তু এই অপরূপ সুন্দর বালকের দীর্ঘ-পিঙ্গল কেশজালে আচ্ছাদিত কোমল মুখশ্রী যেন কৈলাসবিহারী মহেশ্বরের বালকরূপ—এমনিই মনে হচ্ছে সিধুর। মিষ্টস্বরে বলল,

—আরো বড় হলে সাধনা করবে। এখন থাক্—

—আমার অনেক বছর বয়স হোল—

—আরও বছর দশ পরে সাধনা করবে— বলে সিধু ওর পিঠে হাত দিল।

—আরো দশ বছর!— চোখ বিস্ফারিত করে চাইল জীবন ওর দিকে; বলল,—না, আপনি আমাকে আজই সাধনা শিখিয়ে দিন···

সিধুর পাশেই এসে বসলো জীবন; ঠিক সিধুর মতই পদ্মাসনে বসতে চায়—এবং আশ্চর্য্য যে, অতি অনায়াসে সে পদ্মাসন করে নিল। 'সমকায়-শিরগ্রীব' হয়ে বসে পড়ল জীবন—যেন কত কালের অভ্যাস!

আশ্চর্য্য হয়ে সিদ্ধেশ্বর প্রশ্ন করলো,

—এভাবে বসতে শিখলে কোথায় জীবন?

—আপনাকে দেখে—আপনি যে বসেছেন! আপনাকে বসতে দেখে শিখলাম।

—আশ্চর্য্য ছেলে তো!— নিজের মনেই বলল সিধু; তারপর জীবনকে বলল,—বল—

"প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥

জীবন অতি অনায়াসে আবৃত্তি করে গেল শ্লোকটা। উচ্চারণ ঠিকমত না হলেও, তার মুখে ঐ স্তোত্রটুকু অপরূপ মিষ্ট বোধ হচ্ছে সিধুর। কে এই বালকরূপী! সিধু মুগ্ধবিস্ময়ে ওর পানে চেয়ে ভাবতে লাগলো, এমন চেহারা তো সচরাচর চোখে পড়ে না! এ যেন একটা অসাধারণ আবির্ভাব। জীবনকে প্রণাম করতে বলে সিধু ওর পিঠের ওপর চোখ বুলিয়ে দেখলো সুগৌর পৃষ্ঠদেশের লাবণ্য, হাত দিয়ে অনুভব করলো তার পেলবতা—যেন নবনীত কোমল দেবদেহ! সিধুর ইচ্ছে করছে ওকে কোলে তুলে আদর করতে, কিন্তু অকস্মাৎ অবন্তী আবির্ভূত হয়ে বলল,—খাবার আনবো?

—হ্যাঁ, আনো।

—যা জীবন, তোদের খাবার ঘণ্টা পড়ছে—অবন্তী বলল।

—যাই— বলল জীবন, কিন্তু ওর মন যেতে চাইছে না।

অবন্তী হেসে বলল আবার,

—তোর কি খাবার ইচ্ছে নেই, জীবন ?

—না মাসিমা, আমি খানিক পরে খাব।

কিন্তু সিধু অন্যের সাক্ষাতে খায় কিনা অবন্তীর জানা নেই, তাই সে সিধুর মুখপানে চাইল। সিধু ব্যাপারটা বুঝে বলল অবন্তীকে,

—তোমাদের শৃঙ্খলার যদি ব্যাঘাত না হয় তো ও থাক্; ওকে বড় ভাল লাগছে আমার। যেন কতকালের আপনজন মনে হচ্ছে।

—ওকে যে দেখে সে-ই ঐ কথা বলে। ছেলেটা এমন মায়াবী!

বলে চলে গেল অবন্তী খাবার আনতে। জীবন অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালো—ওর পরণের হাফ্ প্যাণ্টটার বেল্ট কষে নিয়ে বলল,

—আপনাকেও আমার খুব ভাল লাগছে। আপনাকে 'আপনি' বলতে ইচ্ছে করছে না। খু-ব—খুব আপনার মনে হচ্ছে, বাবা-জ্যেঠা-কাকার মতন।

—বেশ তো বাবা, আমাকে 'তুমি' বলবে।

—তাহলে তুমি আমাকে ঐসব শিখিয়ে দাও, ঐ পূজো আর সাধনা—আর···

—বলছি তো, আর একটু বড় হও—তখন শিখবে—

—তখন! সে অনেক দেরি। আমি আজ-ই শিখবো—মানে, আজ থেকেই। বড় কি হব আবার! আমি খুব বড় হয়েছি। আর, ছোট থাকলে ও-সব শিখতে নেই নাকি ?

ভাতের থালা নিয়ে অবন্তী এসে উপস্থিত হোলো। কী অসীম যত্ন করে যে ও আজ রান্না করেছে সিদ্ধেশ্বরের জন্য, তা জানেন শুধু ওর

অন্তর্য্যামী। এই অধিকার পেয়ে অবন্তী যেন ধন্য হয়ে গেছে। সিধুর খাওয়ায় পাছে তিলমাত্র ব্যাঘাত হয়, এই আশঙ্কায় সে জীবনকে বলল,

—তুই এখন বাইরে যা জীবন—খাওয়া হলে আবার আসবি।

—না না, ও থাক্— সিধুই বলল,—ওকেও আমার খাবার থেকে কিছু দাও।

—সেকি! না। ওর খাবার ওখানে রয়েছে। তুমি খেতে বসো। —বলে অবন্তী ধরে দিল ভাতের থালা সিধুর সামনে। আতপান্ন, শাক-ভাজা, দুটো তরকারী, গাওয়া ঘি, ডাল। সিধু বলল,

—অনেক তো রেঁধে ফেলেছো! এতো বিলাসিতা আমার অভ্যাস নেই, অবন্তী!

—একদিনেই অভ্যাস হয়ে যাবে না— বলে অবন্তী যেন প্রতিবাদ করবার জন্যই বলল,— আর তোমার যে এখনো মায়া-মোহ আছে, তা ঐ ছেলেটার দিকে টান দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে। ওকে তো ভালবেসে ফেললে, দেখছি!

—হ্যাঁ। কিন্তু ও তো শিশুদেবতা—ওর মধ্যে বিশ্বদেবের শিশুমূর্ত্তি দেখছি আমি।

অবন্তী আর কিছু বললো না। সিধুকে আর কিছু বলে তার খাওয়ার অসুবিধা ঘটাবে না সে। কিছু না বলে দেখতে লাগলো। সিধু অন্ন-নিবেদন করলো উপাস্য দেবতাকে, তারপর কিছু ভাত ডাল তরকারী একটা খালি পাত্রে নিয়ে জীবনকে বলল,

—এসো, প্রসাদ নাও—

দু'হাত পেতে প্রসাদ নিল জীবন, কিন্তু বলল হঠাৎ,

—তুমি খেলে না তো, প্রসাদ হোল কি করে? কে খেল যে, প্রসাদ!

—ঠাকুর খেলেন। এই ইনি— সিধু শালগ্রামের মূর্ত্তিকে দেখালো।

—কখন খেলেন, দেখতে তো পেলাম না! ওঁকে দেখা যায় না নাকি?

—দেখা যায়, জীবন! কিন্তু ওঁকে দেখবার সাধনা করতে হয়। তুমি কি করবে সে সাধনা?

—হুঁ—করবো। কি করতে হবে, বল—জীবন যেন অধীর হয়ে উঠেছে।

—বলবো। এখন ভক্তি করে ওঁর প্রসাদ খাও।

সিধু আহার আরম্ভ করলো; জীবন, কেন-কে-জানে, হয়তো সিধু আর অবন্তীকে একান্তে আলাপ করতে দেবার জন্য, অথবা সিধুর সমুখে আহার করতে লজ্জা বোধ করার জন্য প্রসাদের থালাটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। অবন্তী এতক্ষণ কিছু বলেনি। এইবার আস্তে বলল,

—ওকে চেলা করবে নাকি তুমি?

—না অবন্তী, চেলা করার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু ওর মধ্যে একটা আশ্চর্য্য বস্তু দেখছি—ওর শারীরিক গঠনে সাধুর লক্ষণ রয়েছে।

—যাঃ— যেন ব্যঙ্গ করে উঠলো অবন্তী— জীবন শুনতে না পায়, এমনি আস্তে বলল—ঝির ছেলে, বাপের ঠিক নেই—ওর আবার লক্ষণ!

—এরকম অনেক হয়েছে, অবন্তী। দেবর্ষি নারদ, মহাত্মা বিদুর, ব্রহ্মর্ষি সত্যকাম···ঈশ্বর কোন্ দেহ আশ্রয় করে কি ভাবে অবতীর্ণ হন, কেউ জানেনা, অবন্তী!

—হবে— অবন্তী যেন লজ্জিত হয়ে নিজেকে সামলে বলল,— কিন্তু ওকে সাধু বানাবার আমাদের ইচ্ছে নেই। ওর খুব বুদ্ধি; একটু দুরন্ত, তবে অবাধ্য নয়—ওকে আমরা উচ্চশিক্ষা দিয়ে মানুষ করতে চাই।

—তোমার ধারণায় সাধুরা কি অমানুষ, অবন্তী?

অবন্তী আবার লজ্জিত হোল, কিন্তু ওর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ওকে সাহায্য করলো তৎক্ষণাৎ। বললো,— অমানুষ বলছি না, কিন্তু পাহাড়-পর্ব্বতে কৃচ্ছ সাধন করে মানুষের কী কল্যাণ করেন তাঁরা?

—তুমি জানো না, অবন্তী! তাঁদের ঐকান্তিক কল্যাণ-কামনা বিশ্বাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে ধরিত্রীর অঙ্কে মঙ্গলপ্রসূ শুভাবির্ভাব সম্ভব করে। জগতে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু আমি ওকে বন-জঙ্গলের সাধু করতে চাইছি না। আর, আমারও বা তোমার চাওয়াতেই যে কিছু হবে, তা নয়। কী হবে, তা যিনি হওয়ান তিনিই জানেন।

—তাহলে?

—তাহলে, কিছু না—উচ্চশিক্ষা দিলেই মানবশিশু মানুষ হয় না, না দিলেও অমানুষ হয় না। পরশু রাত্রে নওকিশোর নামে একটি পথের-মানুষ মানুষকে দেখে আমার মনে হোল, মানুষের জীবন যেন তাতে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এমন নিরাসক্ত নির্মল জীবন আমি কমই দেখেছি।

—কোথায় দেখলেন আপনি নওকিশোরকে?— বলে উৎপলা এসে ঢুকলো ঘরে। বলল, অফিসে কয়েকটা জরুরী কাজ ছিল, তা চুকিয়ে এলাম। নওকিশোর আমার কলকাতার আশ্রমে ছিল। কোথায় দেখা হোল তার সঙ্গে আপনার?

—একটা পার্কে। ওর তো কোনো আস্তানা নেই, তবে কালী-মন্দিরে ও বোধ হয় খুব বেশী যায়। অসাধারণ ছেলে ও!— বলে সিধু উৎপলার পানে চেয়ে আবার বলল,

—আপনার আশ্রম সে ছাড়লো কেন?

—ওকে আমরা চাকর রাখিনি। আলোকবাবুর কাছে আসতো। এই জীবনের মা অপর্ণাকেও চিনতো সে। মাঝে-মধ্যে আসতো, আবার চলে যেতো। সত্যি, অনাসক্ত নির্বিকার ঐ নওকিশোর। আবার যদি দেখা হয়, আমার কাছে তাকে আসতে বলবেন তো—

—আচ্ছা— বলে সিধু আহার শেষ করলো।

অবন্তী নিজের হাতে ওর থালা-বাটি উঠিয়ে নিল। গোবর দিল উচ্ছিষ্ট জায়গাটায়। ইতিমধ্যে জীবন বাইরে খেয়ে হাত ধুয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। উৎপলা দেখলো। জীবনকে বলল,

—যাও জীবন, খেয়ে নাও গিয়ে।

—আমি তো প্রসাদ পেলাম। আর খাব না।

—তাহলে রান্নাঘরে বলে এসো যে, খাবে না।

জীবন চলে গেল। এতক্ষণে সিধু অবন্তীকে প্রশ্ন করল,

—ও কে অবন্তী? কোথায় পেলে ঐ ছেলেটিকে?

—উৎপলাদির কোলকাতার আশ্রমে একটা ঝি ছিল, তারই ছেলে ও।

—অ্যাঁ! ঝির ছেলে?— বিস্ময়ে যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেল সিধুর।

—হ্যাঁ, ঐরকমই আমরা জানি— বলে হাসলো অবন্তী; বলল, —ওর মা ঝি ছিল; ওর বাবা কে, তা তো জানি না। হবে হয়তো কোনো মহাজন—চলেগেল অবন্তী!

উৎপলা বলল,

—অপর্ণা পালিয়ে যাওয়ার পর জীবনকে আমার কাছেই রেখে-ছিলাম। এই আশ্রম তৈরী হবার পর ওকে এখানে আনা হয়েছে। কিন্তু এখানে কোনো ছেলে বা মেয়ের তো পিতৃপরিচয় নেই, সবাই পথের কুড়োনো শিশু···

—ওর পিতৃপরিচয়ের তো কোনো প্রয়োজন নেই, উৎপলা দেবী! বিশ্বপিতাই ওর পিতা।

—হ্যাঁ। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে পিতৃপরিচয় একান্ত দরকার সাধুজী!— হাসলো উৎপলা।

—কিন্তু ওরই জন্য কেবল ভাবছেন কেন? এতোগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে কারোই তো নেই সে-পরিচয়।

—না। কিন্তু ওর জন্য কেন জানি না, বিশেষ একটা চিন্তা আছে আমার,—হয়তো ওর সুন্দর চেহারা আর আশ্চর্য্য মেধার জন্য!

—ওর মা'র পরিচয়?

—অপর্ণা ওর মা নয়—এর প্রমাণ না থাকলেও, তার কাজে যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। কে জানে, কে ওর মা-বাবা!— উৎপলা যেন অসহায় বোধ করছে।

—যদি একান্ত প্রয়োজন বোধ করেন, উৎপলা দেবী, এবং আপত্তি না থাকে, তাহলে আমার নামটা ওর বাবা হিসাবে লিখে দিতে পারেন—

উৎপলার চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বলল,

—আপনার কাছে এই আশাই আমি করেছিলাম। কিন্তু অবন্তী ওর মা হতে চায় না—

—অবন্তী আমার বিবাহিতা পত্নী নয়, এখন হতেও চায় না আর। যে-কেউ এখন জীবনের 'মা' বলে পরিচয় দিতে পারে অথবা না-ও পারে। মার পরিচয় অনাবশ্যক।

—আমাকেই ও 'মা' বলে। বেশ, পিতৃপরিচয়ের কলমে আপনার নামটাই তাহলে লিখে নেবো।

—নেবেন।

দুজনেই অকস্মাৎ দেখতে পেল, অবন্তী হাসছে দরজায় দাঁড়িয়ে।

গৃহহারা মানুষের মিছিল! বীভৎসতার বাস্তব রূপ—অখাদ্যে কুখাদ্যে শীর্ণদেহে জীর্ণবস্ত্রে মানবস্রোত পীচঢালা পথ অতিক্রম করে

চলেছে অন্ন আর আবাসের দাবী নিয়ে—"মান্‌তে হবে, আমাদের দাবী মানতে হবে…"

কর্কশ কণ্ঠ ওদের কালিমাময় করে তুললো আকাশ-বাতাস!

ওরা চলেছে অভিযাত্রিক—তীর্থে নয়, তপস্যায় নয়—শুধু দেহের সঙ্গে প্রাণকে আবদ্ধ রাখবার জৈব তাগিদে। ওদের দেখলে সৃষ্টিকর্ত্তারও লজ্জা জাগবে, যদিও এ সৃষ্টি তাঁর নিজেরই পরিকল্পনা।

হ্যাঁ, নিজের সৃষ্টি-কল্পনাতেও স্রষ্টা দুঃখ পান মাঝে মাঝে। বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করে সীতার দুঃখে কেঁদেছিলেন, একথা বিশ্বাস করতে বাধে না; অবিশ্বাস হয় না যে, অভিমন্যুর হত্যা-ব্যাপার লেখবার সময় ব্যাসদেবের নয়ন অশ্রুসজল হয়েছিল, শ্রীগণেশও কলম থামিয়ে কান্না রোধ করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্ম নাকি নির্ব্বিকার—শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বিকার চিত্তে অর্জ্জুনকে নিয়ে অন্যত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন—স্নেহের ভাগিনেয়ের নিধন তাঁর কাছে যেন কিছুই নয়; এইজন্যই তিনি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—", ওঁর কিছুতেই কিছু এসে যায় না। সর্ব্বত্র সব জেনেও তিনি নিশ্চল নির্ব্বিকার। এ চরিত্র ভারতের। মহাভারতেই এ চরিত্র আছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিস্ময় এই চরিত্র। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। ধ্বংসের মধ্যেই তিনি নবসৃষ্টির প্রেরণা পান—ইচ্ছা করেন, আদেশ করেন। তাই মহাভারতীয় যুদ্ধের ধ্বংসের ইতিহাসে তিনি স্বয়ং কর্ত্তা, যদিও কর্তৃত্ব বা অকর্তৃত্ব ওঁর কিছুই নেই কোনোদিন।

আজও ভারতের তথা বাংলার ধ্বংস হয়তো ওঁর মনে নবসৃষ্টির প্রেরণা জাগাচ্ছে, জোগাচ্ছে নব অভ্যুদয়ের অবতরণ-পিপাসা। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির বুদ্ধিজীবী মানুষ এই ধ্বংসকে কি ভাবে গ্রহণ করবে, কে জানে! তাঁর চোখে যা কাব্য, তাঁর সৃষ্ট জীবের কাছে তা জীবন—মহিমময় মানুষ-জীবন!

কিন্তু কোথায় মহিমা! ক্লেদপঙ্ক-ক্ষরিত বিষাক্ত মানবভ্রূণ ওরা—দুর্ব্বার জৈবস্রোত যেন আকস্মিক বাধায় উচ্ছল হয়ে উপচে পড়ছে অরণ্য-পর্ব্বতে, মরু-প্রান্তরে—অস্থানে-কুস্থানে। উপায় নাই। জীবনকে ধরে রাখবার তাগিদ জীবের স্বতঃসঞ্জাত। তাই ওরা দাবী জানায় বাঁচবার—বাঁচিয়ে রাখতে চায় ওদের স্রোতোধারা…

চলেছে ওরা বিশাল রাজপথ অতিক্রম করে। অনশনে অবসন্ন হয়তো কেউ পথের পাশে বসে পড়লো; কেউ-বা পড়ে গেল পথের মাঝেই—কেউ হয়তো পতিতকে তুললো, কেউ-বা ওর উপর দিয়েই পা চালালো। কেউ 'আহা' বলল, কেউ-বা কিছুই বলল না—তবু ওরা চলেছে জীবনের জন্য জীবনকে বলি দিতে। মৃত্যু-সঙ্কটকে অতিক্রম করতে ওরা মরণের মুখেই ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে!

তিনকোণা পার্ক একটা—শ্যামল ঘাসে সুন্দর, রূপময়। সহরের বড় তিনটি পথ ওর তিনদিক দিয়ে চলে গেছে জন-জীবনের কর্ম্মব্যস্ততায়, বিলাসের কেলি-নিকুঞ্জে আর নির্জ্জনতার নদীসৈকতে। মাঝের এই পার্কটি যেন ঐ তিন ধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম। ওর মাঝে কবেকার এক রাজপুরুষের মর্ম্মরমূর্ত্তি মার্ব্বেলের বেদীর উপর খাড়া রয়েছে। বিড়ি টানছে নওকিশোর ঐ বেদীতে বসে। নিরাসক্ত চোখে তাকিয়ে আছে ঐ মিছিলটার দিকে। অবাধ জনস্রোত যেন নদীস্রোতের মতই চলছে। কিশোর মুখের ধোঁয়ার মতই ঐ মিছিলটাকেও ধোয়ার মত দেখছে—যেন কিছুই এমন দ্রষ্টব্য নয়। অথচ দেখবার অন্য কিছু নাই বলে ওটাই দেখা।

বিড়িটা প্রায় শেষ হয়ে এল। এবার উঠবে হয়তো, হয়তো ঐ মিছিলেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, কিম্বা বিপরীত পথ ধরে চলে যাবে নির্জ্জন নদীসৈকতে—কে জানে! পূর্ণ একটা টান দিল সে বিড়িতে।

—অপুর্ণাদি··· বলে উঠে দাঁড়ালো অকস্মাৎ। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পার্কের কিনারায় এসে ডাক দিল— অপু-র্ণা দিদি—!

—কে ?— চাইল ওর পানে অর্দ্ধ-উলঙ্গ একটা শীর্ণকায়া নারী।

হ্যাঁ, অপর্ণাই। কিশোরের ভুল হয়নি! ওর চোখের দৃষ্টি শ্যেনতীক্ষ্ণ।

—হামি কিশোর আছে। কোথাকে ছিলে তুমি এদ্দিন, অপুর্ণাদিদি ?

—সে অনেক কথা ভাই, কিশোর— বলতে বলতে পার্কের অনতিউচ্চ রেলিং ডিঙিয়ে অপর্ণা ভেতরে এসে দাঁড়ালো মিছিল ছেড়ে। বলল,

—তুমি কোথায় আছ, কিশোর ?

—হামি! হামি তো বরাবর আসমানকো নীচুমে থাকি, অপুর্ণা-দিদি!

বাংলাভাষায় জ্ঞানবুদ্ধি অনেক বেড়েছে কিশোরের, তাই ও এখন অপর্ণাকে 'অপুর্ণা' বলে সংশোধন করে নিল। অপর্ণা অকস্মাৎ ওখানেই বসে পড়ে বলল,

—ক'দিন যে খাইনি, কিশোর—কিছু খাওয়াতে পার ? আর তো হাঁটতে পারি না!

—হুঁ—লেকিন ইখানে তো কেউ কুছ্ বিক্রী করছে না, বহিন! চলো উধার।

—কোথায় ? আমি ঐ মিছিলের সঙ্গে যাব, ঠিক করেছি— অপর্ণা বলল।

—উস্‌মে গিয়ে কি হোবে ? কুছ না। চলো হামারা সাথ। আ-যাও, হামি পকড়কে লিয়ে যাব। দুটো রূপেয়া আছে হামার কাছে।

—দু' টাকা! কোথায় পেলে কিশোর ? চাকরী করছো নাকি ?

—নাহি। চাকরী-নোকরী হামি করবে না। উ বড়ি খারাব কাজ। মোটঘাট বইছে—আউর ঐসব সিনেমাবলাকো পোষ্টার, ওহি হাম

সাঁটে—ওহি কাম পাকড় লিয়া— কিশোর পার্কের একপাশে-পড়ে-থাকা বাঁশের মইখানা আর একরাশ ছাপা পোষ্টার দেখালো। অপর্ণা হেসে বললো,—ও-ও তো নোকরী!

—নেহি। খুসী হোবে, তো ছোড়্ দেবে ও কাম। কৈ-কো নোকর নেহি হাম। আ-যাও বহিন! ও কাম বহুৎ আচ্ছা কাম— হাজারমে দু'-দু'-রূপেয়া— বলে কিশোর টেনে তুললো অপর্ণাকে। বলল,

—ইস্‌পেলেনেড্‌মে আ-যাও—কুছ খেলা দেগা, তব্ ঠিক হো যায়গা।

বাঁশের হাল্কা সিঁড়িটা কাঁধে আর কাগজগুলো বগলে নিয়ে কিশোর আবার বলল,—এহি টিনোয়া তু লে, অপুর্ণাদিদি—

অপর্ণা আটার টিনটা নিয়ে চলতে লাগলো ওর সঙ্গে। কিছুটা হেঁটে শুধুলো,—তুমি থাক কোথায়, কিশোর? রাত্রে তো কোথাও শুতে হয়! আর কে আছে সেখানে?

—হামি থাকবার জাঘা কুছ করি নাই। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী আউর কালীঘাট—ই তামাম হামার থাকবার ঠাঁই। রাতমে যাঁহা খুসী শো যাই।

এমন মানুষ কেউ থাকে বা থাকতে পারে, অপর্ণার জানা নাই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল,

—ঐ মিছিলের সঙ্গে গেলে খাবার-থাকবার জায়গা মিলবে, কিশোর। আমাকে তুমি ওখানে পৌঁছে দিও আবার—

—ডাণ্ডা ভি মিল্ সেকতা— বলে হাসলো কিশোর; বললো,— বহুৎ আচ্ছা। আও, কুছ খা লেও— বলে চৌরঙ্গীর মোড়ের মাথায় বাঁশের মইটা নামিয়ে কিশোর কাছের একটা দোকানে তেলেভাজা-মুড়ি কিনে আনলো একঠোঙা; দিল অপর্ণার হাতে। দিয়েই বলল,

—জাস্তি মৎ খাও, পেটমে দরদ হোগা।

কিন্তু অপর্ণা গোগ্রাসে গিলতে লাগলো খাবারগুলো। এমনকি, কিশোরকেও কিঞ্চিৎ ভাগ দেবার কথা ওর মনে হোল না। কিশোর নির্ব্বিকারচিত্তে একটা বিড়ি ধরিয়ে দেখছে ওর খাদ্য-চিবোনো!

—ক'রোজ খায়া নেহি, অপুর্ণাদিদি?— কিশোর প্রশ্ন করলো।

বাঁ-হাতের দুটো আঙ্গুল দিয়ে দেখালো অপর্ণা, দু'দিন। কথাও বলবার সময় নাই ওর। কিন্তু গলা শুকিয়ে গেছে, খাদ্য গলছে না গলা দিয়ে, তাই বললো,—জল···

—হ্যাঁ, পানিভি লা' দেবে।— বলে কিশোর বিড়ি-মুখেই উঠে গেল।

কিন্তু কাছাকাছি জলের কল নেই। বিপন্ন কিশোর ভাবছে, কী করা যায়! সহরের অগণ্য পথচারী কেউ লক্ষ্যই করলো না, জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে একটা লোক জল খুঁজছে আর খানিক দূরে জলের জন্য হা-পিত্যেস করে বসে আছে এক নারী। জল পেলনা কিশোর; কাছেই একজন পিতলের কলসী-ভরা চা বিক্রী করছিল, তাই কিনে আনলো এক ভাঁড়—দিল অপর্ণার সুমুখে ধরে। অপর্ণা বলল,

—তুমি চা খাবে না, কিশোর?

—নেহি। তোম্ খা লেও। হামি দোসরা দফে খাবে।

চা-মুড়ি বেশ আরাম করেই খাচ্ছে অপর্ণা। খাদ্য এমনি বস্তু যে, এই কয়েক মিনিটে ওর মুখশ্রী সুশ্রী হয়ে উঠেছে। ক্ষুধারূপিণী জগৎজননী যেন আহুতি পেয়ে তুষ্ট হয়েই ওকে আবার যৌবন-সুষমা ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি জানাচ্ছেন—বর দিচ্ছেন! তৃপ্তির একটা মাধুর্য্যে ওর সর্ব্বাঙ্গ ভরে উঠছে, দেখলো কিশোর।

কিন্তু ওর দেখার মধ্যে কোনো আগ্রহ নেই, নেই কিছুমাত্র ঔৎসুক্যও। অপর্ণা খাওয়া শেষ করবার আগেই দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে চাইতে আরম্ভ করেছে—এতক্ষণ নিশ্চুপ ছিল অপর্ণা, এবার প্রায়-খালি ঠোঙাটা ওদের পানে ছুঁড়ে দিয়ে ভাঁড়ের বাকী চা-টুকু শেষ করলো।

—চলো, আব, কাঁহা যায়েগা ?— প্রশ্ন করলো কিশোর।

—তোমার সঙ্গেই যাব। ওখানে, ঐ মিছিলে আর যাবনা আমি।

—হামার সঙ্গে!— বিস্মিত কিশোর বলল,— হামি কোথায় লিয়ে যাবে ? হামার কি ঘর-বাড়ী আছে যে, তুমাকে লিয়ে যাবে—!

—তাহলে কোথায় যাব আমি ? ঐ মিছিলে যেতে তো তুমিই মানা করছো—

—কুছ কাম পাকাড় লেও, অপুর্ণাদিদি ! এ্যায়সে দিনগুজরান হোবে না। কুছ কাম করো—

—কাম পেলে তো করবো ! দাও-না একটা কাজ জুটিয়ে।

কিশোর কোথায় কাজ পাবে ! একটু বিপন্ন বোধ করাই স্বাভাবিক তার পক্ষে, কিন্তু নিজেকে কিশোর কদাচিৎ বিপন্ন বোধ করে। অপর্ণার জীবনের ইতিহাসের অনেকটাই তার জানা, তাই রুক্ষস্বরে বলল,

—কাজ তো তোমারা ছিল, অপুর্ণাদিদি—তখন ছোড় দে-কে ভাগা কাহে ?

চুপ করে রইল অপর্ণা। খানিক পরে বলল করুণ কণ্ঠে,

—সে যা হবার হয়েছে, কিশোর ! এখন কোনো কাজ না পেলে খাব কি ?

—ও ভগবান জানে— বলে কিশোর বাঁশের মইখানা আর কাগজগুলো, এবং আটার বালতিটাও নিয়ে চলে যাবে—অপর্ণা তাড়াতাড়ি এসে বালতিটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিতে নিতে বলল,

—আমাকে ফেলে গেলে চলবে কেন ? আমি কোথায় যাব ? বাঃ !

জড়িয়ে ধরলো অপর্ণা ওর হাতখানা। কিশোর বিপদ বুঝলো। অপর্ণা যেন তার উপর একটা দাবী জানাতে চায়, এমনি ভাব। সহস্র

জনতাপূর্ণ রাজপথ। এখুনি যদি অপর্ণা চীৎকার করে ওঠে যে কিশোর তাকে পথে বসিয়ে পালাচ্ছে, সে কিশোরের বিবাহিতা বা ঐরকম কিছু, যা বলা অপর্ণার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়—তাহলে এখনি লোক জমবে, পুলিস আসবে এবং দুজনকেই হাজতে যেতে হবে।

—আরে, চিল্লাও মৎ— বলে কিশোর ওকে ধমকে থামিয়ে দিল। কিন্তু অপর্ণা ততক্ষণে ওর হাত থেকে আটার বালতিটা কেড়ে নিয়েছে।

কাছেই রাস্তার ওপর ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ডে একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে; তার ড্রাইভার আদ্যোপান্ত দেখছিল ব্যাপারটা। এতক্ষণে সে বলল,

—এ—তুমি কাম করবে? হামারা ভাইকা দুকান আছে, রুটি-মাংসকা দুকান—হুঁয়া ঝি-কা কাম কর্ সেক্‌তা। খানা-পর্‌ণা, আউর···

মাহিনার কথাটা হয়তো বলতো ড্রাইভারটি। কিন্তু কিশোর বলল,

—হ্যাঁ জি—ভগবানজি আপ্‌কো ভালা করে! লে যাইয়ে ইস্‌কো।

—আও। ওহি মোড় পর মেরা ভাইকা দুকান— সস্নেহে ডাক দিল সে।

—যা অপুর্ণাদিদি! কাম তো ভগবান মিলা দিয়া। যাও। আব্ খুসী হো—

অপর্ণা নিঃশব্দে ড্রাইভারের খোলা দরজা দিয়ে ট্যাক্সির সীটে বসলো এসে। বেশ আনন্দিতই বোধ হচ্ছে ওকে। কিশোর তেমনি নির্ব্বিকার; শুধু ট্যাক্সির নম্বরটা দেখে নিল, এবং প্রশ্ন করলো ওর নাম, আর দোকানের ঠিকানা। ট্যাক্সিতে ষ্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার বলল,

—অমর সিং। হামারা ভাইকো দোকানকা নম্বর তেয়াল্লিস, রাজ রোড···

ব্যস্, চলে গেল ট্যাক্সি অপর্ণাকে নিয়ে। এই মুহূর্ত্তে যে ফুটপাতে তেলেভাজা-মুড়ি চিবুচ্ছিল, ট্যাক্সির সীটে পরমুহূর্ত্তেই রাজরাণীর মত পা ছড়িয়ে বসল সে! নির্ব্বিকার শিবের মতই দেখলো নওকিশোর।

—দুনিয়া খোদাকো খেল! আলোক-দাদাবাবু বোলতেন—সব তামাম ভগবান্‌জিকা খেল হ্যায়—বাঃ!

আটার বালতিটা হাতে তুলে মইখানা টানতে টানতে চললো চির-উদাসী কিশোর বাড়ীর দেওয়ালে-দেওয়ালে সিনেমার পোষ্টার লাগাবার জন্য।

আলোক গানের আসরে বসলো এসে। না-বসে উপায় নেই। কারণ অঞ্জনাকে কোনো কারণেই ক্ষুণ্ণ করতে চায় না ও। আর অঞ্জনা সত্যি বড় ভাল মেয়ে। এমন শান্ত-স্নিগ্ধ নারী-চরিত্র বর্ত্তমান যুগে বিরল। ওকে পেয়ে আলোকের সহোদরার অভাব পূরণ হয়েছে।

আসরটি অনাড়ম্বরভাবে সাজানো—অঞ্জনা আড়ম্বর পছন্দ করে না। পূজাবেদীর সামনে মেঝেতে সতরঞ্চের ওপর সাদা চাদর—মাঝে একখানা বড় থালায় গোড়ে মালা, আর তার দু'দিকে দুটি ধূপদানে ধূপ পুড়ছে। এর বেশী কোনো সজ্জা নেই। ঐ আসরের একপাশে মেয়েদের আর অন্য পাশে পুরুষদের বসবার ঠাঁই। হারমোনিয়াম, সেতার, বাঁয়া-তবলা। একটা বেহালাও।

অঞ্জনার বাবা ঐ আসরের একধারে তাকিয়ে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। তাঁর পাশে আরো দুজন ভদ্রলোক ঐ পাড়ারই। অঞ্জনার স্বামীও এসে বসলো। ওপাশে কয়েকটি তরুণী; সবাই অঞ্জনার বান্ধবী। আলোক আসতেই অঞ্জনার বাবা ওকে ধরে পাশে বসালেন। গান আরম্ভ হোল। সংস্কৃত স্তোত্র গান করলো অঞ্জনা—চমৎকার গাইল।

—এর পর করবী গাইবে— বলে অঞ্জনা যে মেয়েটির দিকে চাইল, আসরের সেরা রূপসী সে। অনবদ্যাঙ্গী। গায়ের রং থেকে পায়ের গঠন

পর্য্যন্ত নিখুঁৎ। সেতার বাজাচ্ছিল করবী। সুন্দর বাজায়! অঞ্জনা সেতারখানা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে হারমোনিয়ামটা ঠেলে দিল ওর দিকে। করবী একবার চাইল সবার পানে হাসিমুখে, তারপর আরম্ভ করলো গাইতে।

কিন্তু এইসব অপরূপ সুন্দরী মেয়েরা, বিশেষ করে সহরের মেয়েরা তাদের রূপের প্রশংসা এতো বেশী পায় যে, তারা খুব ভাল জানে, তারা সুন্দরী। এতে তাদের অন্তরে যে আত্ম-অহমিকা জাগে, করবী তার ব্যতিক্রম নয়। নিজেকে সুন্দর-সংযত করে সে বসেছে। অপরূপ ভঙ্গিমায় গ্রীবা বাঁকিয়ে গাইতে লাগলো একটা হিন্দী ভজন। রূপের তুলনায় স্বর মিষ্ট না হলেও, ভালই গায় মেয়েটি। শোনবার মত গান ওর। নির্ব্বাক হয়ে শুনে গেল সকলে। অঞ্জনা আবার অনুরোধ করলো,

—আর একটা গা, করু···

একমিনিট থেমে করবী আবার গান ধরলো। আবার একটা হিন্দী গান—তার বাণী থেকে সুর বেশী। খেলিয়ে খেলিয়ে গাইতে লাগলো গানখানা, যেন পোষা পাখীকে উড়িয়ে দিয়ে আবার হাতের মুঠিতে ধরে আনছে। ভালই সাধনা করেছে করবী সঙ্গীতের। সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনলো। কিন্তু আলোক যেন কিছু বিমনা। অথচ আলোকের জন্যই আজকের আসরটা ডেকেছে অঞ্জনা। বরাবর সে চেয়ে ছিল আলোকের দিকে—করবীর গান শুনে আলোকের অন্তর কতখানি মুগ্ধ হয়, তাই দেখবার জন্য। কিন্তু আলোকের কোনো সাড়াই পাওয়া যাচ্ছে না! অঞ্জনা অন্য একটি মেয়েকে বলল এবার,

—তুই একটা গা ভাই, চৈতালী—

চৈতালী নামে মেয়েটি শ্যামলাঙ্গী; কিন্তু খুবই সুশ্রী। ওর দেহের গঠন দীর্ঘ, কোমল—লোমরাজিতে চারুদর্শন। বড় বড় চোখে ও চেয়ে ছিল সুসজ্জিত পুস্তক-প্রতিমার পানে। ধীরে যন্ত্রটা ধরে গাইতে লাগল

বিদ্যাপতির একটি পদ। বড়ই মিষ্টি ওর গলা, আর গায় অত্যন্ত দরদ দিয়ে। ওর শিল্পানুভূতি দরদে পরিপূর্ণ। সবাই খুসী হোল গানটি শুনে। কিন্তু আলোক তখনো উন্মনা।

—দাদা একটা গাইবে এবার— অঞ্জনা বলল আলোককে লক্ষ্য করে।

—না। ওঁদের একখানা বাংলা গান গাইতে বল না! যে-কোনো বাংলা গান—

আলোকের জবাবটা যেন কেমন রুক্ষ শোনালো সভার মধ্যে। অঞ্জনা কিন্তু জানে—হিন্দীগান যতই ভাল হোক, দাদা বাংলা গানই ভালবাসে। ক্ষুণ্ণস্বরে সে বলল,

—করবী পশ্চিমে থেকে হিন্দীগানই শিখেছে। চৈতালীর বাবা তাকে শিখিয়েছেন চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি। আমি-ই তাহলে 'রবীন্দ্রনাথ' গাই?

—হ্যাঁ। গা— আলোক বলল যেন আদরের সুরে, শ্যামাসঙ্গীত গা না একখানা? গা—"শ্মশান ভালবাসিস বলে"··· আলোক নিজেই ধরে দিল, সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জনাও গাইতে লাগলো। গুরু-শিষ্যার সঙ্গীত-চর্চ্চা অঞ্জনার স্বামী মুগ্ধ হয়ে শুনছে। বলল,

—আলোদা না এলে অঞ্জনা এতো সুন্দর হোত না— কথাটা বলল এক বন্ধুকে। বন্ধুটি ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে এখানে আসে। বড়লোকের ছেলে, নাম বিজয়। ভাল গাইতে পারে। তাই অঞ্জনা ওকেও নিমন্ত্রণ করেছে আজ। বিজয় বলল,

—আলোদা তোমাদের একটা সম্পদ। কিন্তু ওঁকে বাইরে আনবে কবে? এতাবৎ ঘরেই তো রইলেন!

—বাইরে ওঁকে নিয়ে আসতে পারে অঞ্জনা, আর কেউ পারে বলে আমার তো ধারণা নেই।

—অঞ্জনা দেবীকেই বল, ওঁকে বাইরে আনতে।

—চেষ্টা চলছে। —বলে হাসলো অঞ্জনার স্বামী।

আলোকের কণ্ঠস্বর এমন কিছু অসাধারণ নয়; কিন্তু সঙ্গীতে জ্ঞান প্রখর, আর দরদ দিয়ে ভাবকে মূর্ত্ত করে তোলে। তাই ওর কণ্ঠে ভক্তিমূলক গান অপরূপ শোনায়। অঞ্জনার নারীকণ্ঠ-যোগে স্বরলহরী যেন গন্ধর্ব্বরাজ্য করে তুললো আসরটাকে। অঞ্জনার বাবা শ্যামাসঙ্গীত ভালবাসেন। বললেন,

—আর একটা গাও, বাবা! রামপ্রসাদী গাও—

আলোক আরম্ভ করলো—"আমি কি তোর কেউ নই, শ্যামা···"

অঞ্জনাও গাইছে ওর সঙ্গে। কিন্তু অন্য যারা এসেছে এখানে আজ, তাদেরই বেশী সুযোগ দেওয়া উচিত। করবী যেন কিছু অসন্তুষ্ট হয়েছে। উসখুস করছে সে। ওর যেন ভাল লাগছে না। ওর অপরূপ রূপের খাতিরে সর্ব্বত্র ও যে-প্রশংসা পায়, এখানে যেন তেমন কিছু হোল না। উপরন্তু ওর হিন্দীগানকে অগ্রাহ্য করেই আলোক যেন বাংলাগানের ফুলছড়ি ঘোরাচ্ছে। ওকি আবার গান নাকি! ঐ সেকালে রামপ্রসাদী উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত-মজলিসে কোণঠাসা হয়ে থাকে। কিন্তু এসব কিছু বলা চলে না। করবী চুপ করে রইল গান শেষ হওয়া তক। শেষ হতেই বলল,—আমাকে এবার যেতে হবে অঞ্জনা— উঠে দাঁড়ালো।

—ওমা, সেকি রে? এখনি যাবি কি!

—হ্যাঁ। অন্য এক জায়গায় এন্‌গেজমেণ্ট আছে।

—কিছু জল খেয়ে যা, আয়— অঞ্জনাও তার সঙ্গে উঠে গেল।

পাশের ঘরে গিয়ে খাবার দিল অঞ্জনা। বলল একটু ম্লান স্বরে,

—আলোদার লেখা গানটা তুই গাইলি না কেন করবী?

—ওঁর খোসামুদি করতে ওঁর গান গাইতে হবে নাকি!

—না ভাই, এমন কথা আমি বলছি না— অঞ্জনা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েই বলল,—খোসামুদি কেন করবি তুই! তা ছাড়া আলোদা

তো একটা 'ভ্যাগাবণ্ড'—না আছে চাল, না বা চুলো। ওর আবার কে খোসামুদি করবে?—সন্দেশ আর একটা দিই?

—থাক্, থাক্! আমি কারো চাল-চুলোর কথা বলছিনে, অঞ্জু! সকলেরই কি বাংলাগান ভাল লাগতে হবে? আমি হিন্দীগানই ভালবাসি।

—নিশ্চয়ই। তা ছাড়া হিন্দীগানই ক্লাসিক। বাংলা গান তো গানই নয়!

—ঠাট্টা করছিস?

—না ভাই। আমার দাদা অত্যন্ত সেকেলে হয়ে গেছে, তাই স্বীকার করছি! ওর জন্য একটা সেকেলে বৌ দেখবো আমি··· পুণ্যিপুকুর-পড়া!

—তা ভাল। ওঁর বৌ হবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছে নেই। তোর মনে যদি ওরকম কোনো ইচ্ছে জেগে থাকে আমার সম্বন্ধে তো দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমার ওঁকে মোটে ভাল লাগেনি।

—তোর স্পষ্ট সত্যিকথা শুনে খুব খুশী হলাম, করবী। —বললো অঞ্জনা।

জলযোগ শেষ করে করবী চলে যাচ্ছে। বলল,

—তোদের চাকরকে সঙ্গে দে। আমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসবে। রাস্তাটা সরু গলি—একা যেতে ভয় করছে আমার।

অঞ্জনা চাকর রামচন্দ্রকে বললো করবীকে তুলে দিয়ে আসতে। এ-ঘরে ফিরে এসে সে দেখলো, স্বামীর বন্ধু বিজয়বাবু গাইছেন। বেশ কিছুক্ষণ গান চললো এর পর। কিন্তু অঞ্জনার যেন আর উৎসাহ নেই। এ উৎসব-আসর শেষ হলেই যেন ভাল হয় এবার। চৈতালীকে দিয়ে শেষ গান গাইয়ে অঞ্জনা শেষ করে দিল উৎসব। সকলকে জলযোগ করিয়ে বিদায় দিল। রইল ওর বাবা, ওর স্বামী, আর আলেকি।

—চলো বাবা, এবার তোমরা খাবে।— অঞ্জনা বলল।

—তোর মুখখানা মেঘলা কেন রে, অঞ্জু? হয়েছে কি?— আলোক প্রশ্ন করলো।

—তোমার শ্যামাসঙ্গীত সবাই ভালবাসে না, দাদা···

—তাতে কি হয়েছে? কারো ভালবাসা আদায় করবার জন্যে তো আমার গান নয়, আমার গান আমার অন্তরের সম্পত্তি। সে শুধু বিলোবার জন্য।

—হ্যাঁ, সবাই সে দান কিন্তু নিতে চায় না···

—তারা দুর্ভাগা, অঞ্জনা—ওদের জন্য দুঃখ বোধ করিস্। ঠাট্ বজায় রাখতে দরদহীন অবোধ্য ভাষায় যারা গান গেয়ে বাহবা পেতে চায়, তাদের ওপর করুণা জাগুক তোর—আশীর্ব্বাদ করি···

অঞ্জনা এসে প্রণাম করলো আলোদাকে। তার পর বাবাকেও। ওর মুখশ্রী নির্ম্মল হয়ে উঠেছে। ওর স্বামী হাসছে বসে বসে। বলল,

—তুমি খুব নিরাশ হয়েছ, অঞ্জনা, কিন্তু ঐসব আতসবাজীকে দিয়ে আলোদার ওপর পরীক্ষা কেন চালাও তুমি···

—না, আর চালাবো না।—বাবা, চলো খাবে।

সকলে উঠে গেল ওঘরে।

* * *

নিজের সম্মান রক্ষা করতেই যেন উঠে চলে গেল করবী! কিন্তু বড় রাস্তায় এসে দোতালা বাসের লেডীস্ সীটে বসে সে যখন ব্যাপারটার আদ্যন্ত ভেবে দেখলো, তখন মনে হোল—আলোক তার কোনো অসম্মান করেনি। বাংলাগান গাইতে অনুরোধ করা অসম্মান নয় এবং বাঙালী মেয়ে হয়ে করবী একখানা বাংলাগান গাইতে পারবে না, এও খুব শ্লাঘার কথা নয়। কিন্তু করবী সর্ব্বত্র এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এযাবৎ পেয়ে এসেছে যে, অতি তুচ্ছ কারণেও ওর অন্তরে ঘা লাগে এবং পরে

বুঝতে পারে যে অকারণ ও ব্যথিত হয়েছে। আজকের ব্যাপারটা কিন্তু কিছু অন্য রকম।

অঞ্জনা তার দাদার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিল করবীকে। খুব বাড়িয়েই বলেছিল নিশ্চয়, কারণ করবী আলোকের মধ্যে অসাধারণ কিছুই দেখতে পেল না। অতি সাধারণ একটি যুবক। দেখতে অবশ্যই ভাল, সবল-সুস্থ-সুন্দর পুরুষ। কোনো মেয়ে ওকে বিয়ে করতে অরাজী হবে, মনে হয় না। কিন্তু তার জন্য নিজের আত্মসম্মান নষ্ট করতে করবী অন্ততঃ রাজী নয়। অবশ্য তিনি যখন বংলাগান গাইতে বললেন, তখন গাইলেই হোত একটা। পর পর দুটো হিন্দীগান না গাইলেই চলতো। কিন্তু করবীর ধারণা হয়েছিল, হিন্দী গানই তিনি পছন্দ করবেন। কিন্তু এখন এসব ভেবে কি আর হবে! করবী ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল আলোকের চিন্তা মন থেকে!

চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিতে গিয়েই কিন্তু করবী অনুভব করলো, ঐ পুরুষটির মধ্যে একটা আকর্ষণ-শক্তি আছে—অতি তীব্র সে শক্তি। অত সহজে ওকে ঝেড়ে ফেলা সহজ নয়। ওর মুখ থেকে একফোঁটা প্রশংসা পাবার জন্যও লোলুপ হওয়া যায় হয়তো। এমন গভীর আবেগময় কণ্ঠ করবী আর শোনেনি কখনো! হোক সে কণ্ঠ মিষ্টতায় কম; কিন্তু তার বাণী-ব্যঞ্জনায় বীণা না থাকলেও বেদনা আছে, আছে অনুভূতির সজল স্নিগ্ধতা। মেঘের কালো রূপের মত সে স্বর স্নিগ্ধ-গম্ভীর।

অকস্মাৎ আলোকের সম্পূর্ণ অবয়বটা মনে পড়ে গেল করবীর—যখন সে এসে বসলো, উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে দেখলো সকলকে—করবীকেও। হ্যাঁ, করবীকেও দেখেছিল সে। করবীর মনে হয়েছিল, এরই জন্য আজকের আসর যেন! ব্যাপারটাও সত্যি তাই। অঞ্জনার শেষের কথায় বুঝেছে করবী। কিন্তু এখন বুঝলো—ওরকম পুরুষকে শ্রদ্ধা করা যেতে পারে, ভালবাসা যায় না।...

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

অতঃপর করবী নিশ্চিন্তে বাসের গদীতে হেলান দিয়ে বসলো। শীত-বসন্তের মাঝামাঝি, তবু রাত্রের চলতি বাসে ঠাণ্ডা আসছে। করবী স্কার্ফটা গলায় টেনে দিল ভাল করে।

এই বাসে ওর বালিগঞ্জের বাড়ীর দরজায় গিয়ে নামতে পারবে। ট্রামে চড়লে বদল করতে হোত। ভালই হয়েছে। আর কোনো এন্‌গেজমেণ্ট নাই ওর আজ। পাড়ায় একটা সরস্বতী প্রতিমা এনেছে, সেখানে গিয়ে গান গাইতে পারে দু'একখানা। আর, নয়তো শুয়ে ঘুমুবে। কারো জন্য ওর অপেক্ষা করতে হবে না! ওর পঞ্চবিংশতি বছরের জীবন এখনো সম্পূর্ণ একলা। স্কার্ফটা আরো নিবিড়ভাবে চেপে ধরে করবী ভাবতে লাগলো—অঞ্জনার চেষ্টাটা শুভই, তার মধ্যে সত্যি করবীর জন্য মঙ্গলপ্রচেষ্টা রয়েছে, এবং অনেক আশা করেই অঞ্জনা আজ করবীকে ডেকেছিল ওখানে। নইলে শুধু গান গাইবার জন্য কলকাতা সহরে গায়িকার অভাব নেই।

করবী যেন অকস্মাৎ অনুভব করলো, নিজের গরিমা দেখাবার জন্য অমন চট্ করে উঠে না এলেও পারতো সে। দু'একটা কথা কয়ে আলোককে আরো একটু বুঝবার চেষ্টা সে করলো না কেন? হয়তো আলোক তার হিন্দীগান পছন্দই করেছে, হয়তো আলোকের মনে করবী সম্বন্ধে ভাল ধারণাই রয়েছে, কিম্বা হয়তো করবীর আকস্মিক উঠে-আসায় তার সম্বন্ধে ভাল ধারণাটা নষ্ট হয়ে গেল আলোকের মনে। খুবই বোকামি করেছে করবী! কিন্তু এখন আর উপায় নেই।

ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দরজায় এসে নামলো সে। বড়রাস্তার ওপরেই ওদের বাড়ী—নিজস্ব নয়, ভাড়াবাড়ী। তবে ওর বাবার অবস্থা খারাপ নয়, ওর দাদাও ভাল রোজগার করেন। করবী আদরিণী মেয়ে—সুন্দরী এবং শিক্ষিতা বলে বাড়ীর গৌরব।

কিন্তু ওর বিয়ে দেবার আয়োজন হচ্ছে না। ঘর মেলে তো বর মেলে না—এমনি ভাব। মাসকতক পশ্চিমে থেকে করবী তার আভিজাত্যে আরো নতুন অলঙ্কার ধারণ করেছে। ওর ইচ্ছে বিলেত-ফেরৎ কাউকে বিয়ে করে। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে বিলেত-ফেরৎ আর না হলেও চলবে। শিক্ষিত মার্জিত-রুচি স্বাস্থ্যবান কাউকে পেলেই ওর বাবা-দাদা বিয়েতে মত দেবেন। কিন্তু করবীর ইচ্ছাটা এখনো উঁচু তারে বাঁধা রয়েছে। তাই ও আলোককে এত সহজে এড়িয়ে এল; কিন্তু আসার পর বুঝলো, বর হিসেবে আলোক অযোগ্য নয়। যদিও মুখে করবী সেটা স্বীকার করে না।

দোতালায় উঠতেই ওর বৌদি প্রশ্ন করলেন,

—কেমন দেখলি, করবী?

—কাকে?

—সেই আলো না অলকানন্দা!

—তোমার লিঙ্গ ভুল হচ্ছে, বৌদি। অলকানন্দা স্ত্রীলিঙ্গ। আমি যাকে দেখে এলাম, সে পুরুষ। অবশ্য সু কি কু, বিবেচ্য।

—বিবেচনাটা কখন করবি?

—শনৈঃ শনৈঃ— বলে করবী হেসে চলে যাচ্ছে, বৌদি বললেন,

—অঞ্জনা যার কথা অত করে বলে গেল, তাকে অত সহজে আমরা নাকচ করবো না। তোর দাদা ওকে দেখতে যাবে।

—কী— করবী দৃঢ়কণ্ঠে বলল,— দাদাকে মানা কোরো। আজকাল-কার বোনেদের জন্য পাত্র দেখতে যাবার আগে বোনের সম্মতি আবশ্যক। অঞ্জনা ভাল বলবেনা কেন! অঞ্জনার দাদা তিনি। নিজের ঘোল কেউ টক বলে না, বুঝলে বৌদি? তোমার দাদার সম্বন্ধেও তোমার ঐ অভিমত হবে নিশ্চয়।

—হবেই তো। অঞ্জনার দাদাকে তুই নাকচ না করলে—আমার দাদা···

—বদল-বিয়ে আমি পছন্দ করি না— চলে গেল করবী।

ও যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছে। চিন্তাশীলতাও আছে ওর। বর্ত্তমান যুগের মেয়েদের বিবাহ-সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ লিখবে, ঠিক করলো। আজই লিখবে। ওদের একটা মাসিক কাগজ আছে, নাম 'যুগনারী'; করবী শুধু তার নিয়মিত লেখিকা নয়, রীতিমত পরিচালিকাদের একজন। 'যুগনারী'তে একটা প্রবন্ধ লেখবার উপাদান অন্ততঃ পাওয়া গেল, ভেবে করবী আনন্দিত হোল। এখুনি লিখতে বসবে। ওর আর তর সইছে না। আজ সরস্বতীপূজা—অনধ্যায়। কিন্তু বালিগঞ্জে ওসব শাস্ত্রের ধার ঘেঁষেও যায়না কেউ। করবী কাপড় ছেড়ে বেশ 'ঈজি' হয়ে লিখতে বসলো—"বর্ত্তমান বাংলায় শিক্ষিতা নারীর বিবাহ-সমস্যা"—কেটে লিখলো 'শিক্ষিতা কন্যা'—আবার কেটে লিখলো 'শিক্ষিতা তরুণী'। কিন্তু এটাও পছন্দ হচ্ছে না। শেষে শুধু 'বিবাহ-সমস্যা' লিখে প্রবন্ধ আরম্ভ করলো।

ওর মত শিক্ষিতা মেয়ের কোনো-কিছু লিখতে বসলে আটকাবার কথা নয়; কিন্তু আটকে যাচ্ছে। সব সময়ই মনে হচ্ছে যেন নিজের কথাটাই প্রকাশ করে ফেলছে করবী। নিজের অন্তরের দৈন্য—স্বামি-লাভের জন্য আত্মার ক্ষুধা···নাঃ, এরকম লেখা চলবে না! করবী সমস্ত প্রবন্ধটা কেটে আবার আরম্ভ করলো বেশ তেজগর্ভ ভাষায়। কিন্তু একি! সবটাই পুরুষদের উপর বিজাতীয় বিদ্বেষ, বিশেষ করে আলোকের উপরই যেন বিষটা গিয়ে পড়ছে। নাঃ, এও হোল না! করবী একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে শুয়ে পড়লো সেদিনকার মত।

সকালে স্নান সেরে সত্যিই সে লিখলো একটা প্রবন্ধ। লিখলো সে:

"বর্ত্তমান সমাজে মেয়েদের বিবাহ একটা বড় সমস্যা। লেখাপড়া শিখতে শিখতে তাদের বয়স তো বাড়েই, উপরন্তু তাদের মনটা দৃঢ় হয়ে ওঠে এবং বিচারশীলতা বেড়ে যায়। এরকম অবস্থায় বাবা-দাদার

পছন্দকরা বরকে ঠিক সহজভাবে যারা গ্রহণ করতে পারে না—এবং অনেকেই পারে না,—তাদের মনে দুর্ভাগ্যের একটা কালো মেঘ জমে ওঠে। অপরপক্ষে বর্ত্তমান সমাজে নিজে দেখেশুনে পছন্দ করে বিয়ে করার সুযোগও ঠিকমত পাচ্ছে না নারীগণ; কারণ পুরুষের দিকটা ঔদার্য্যে এখনো সুপ্রতিষ্ঠ হয়নি। তারা আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির আস্বাদ পেতে চায়—বিয়ে করতে হলেই বাইশ হাত জলে পড়ে গিয়ে। কদাচিৎ কেউ এগিয়ে আসে। এরকম সমাজে যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে। মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না, আর যদি বা হচ্ছে তো অপাত্রে, এবং এইভাবে রাশি রাশি নারীজীবন বলি দেওয়া হচ্ছে। দিন দিন শিক্ষিতা কুমারী-মেয়ের সংখ্যা বাড়ছে। অথচ তাদের কর্ম্মশক্তিকে ঠিকমত কোনো কাজেও লাগানো হচ্ছে না। এইভাবে দেশের নারী-শক্তি না-সৃজন-পালনে, না বা অর্থকরী উপার্জ্জনে লাগছে। একে অপচয় ছাড়া কি আর বলা যায়…"

দীর্ঘ প্রবন্ধটা শেষ করে করবী বেরিয়ে পড়ল ওদের 'যুগনারী' সম্পাদিকার বাড়ীর উদ্দেশে। এই প্রবন্ধটি তাঁকে মনোনীত করিয়ে এই মাসের কাগজেই ছাপাতে হবে। বেশী দূর নয়—পায়ে হেঁটে চলেছে করবী। পথে সীমার সঙ্গে দেখা। সীমা ওর পরিচিতা। বয়সে অনেক বড়—কুমারী।

—কোথায় যাচ্ছ, সীমাদি?— করবী প্রশ্ন করলো।

—দীপ্তিদির বাড়ী। যাবি তুই? তাহলে আয়, দুজনে একটা রিক্সা নিই।

—দীপ্তিদির বাড়ীতে যে আমিও যাচ্ছি, তা তুমি বুঝলে কেমন করে সীমাদি?

—তোর হাতে ঐ-যে কাগজ—ওটা নিশ্চয় গল্প, না হয় প্রবন্ধ—দিতে যাচ্ছিস। আয়, রিক্সাতে শুনতে শুনতে যাব।

সীমা রিক্সা ডেকে করবীকে ওঠালো। নিজেও বসে বলল,

—পড়্, কী লিখেছিস।

—এখন থাক্, সীমাদি—ওখানে তো পড়তেই হবে, তখন শুনবে। এখন তোমাকে একটা প্রশ্ন করি—বি. এ.-এম. এ. পাস-করা মেয়েরা তো প্রায় দেখি কুমারী থাকছে—যেমন ধর তুমি একজন, আমি একজন, —আমাদের চেনা আরো শ'খানেক জন। এই সমস্যার সমাধান কী, বলতে পার ?

—ঐ বুঝি তোর প্রবন্ধের বিষয় ?

—হ্যাঁ, শুধু সমস্যা। কিন্তু সমাধানের ইঙ্গিত আমি দিতে পারিনি।

—এখন সমস্যাটাই ছেপে দে, পরে সমাধান আর কেউ লিখবে।

হাসলো সীমা কথাটা বলতে বলতে। তারপর একটু ভেবে বলল,

—দেশের গতি আর নারীর প্রগতির সঙ্গে পুরুষের মনোগতি তাল রাখতে পারছে না, করবী! তারা চায় উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী বউ, সতী বউ, সখী বউ—কিন্তু শিক্ষিতা নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তারা মানতে চায় না। এদিকে শিক্ষায় যে স্বাতন্ত্র্য পায় মেয়েরা, তাকে খর্ব্ব করতেও রাজী নয় কোনো মেয়ে। এই দ্বন্দ্ব দিন দিন বাড়ছে—কাজেই…

—ওটা তো সমস্যা, সীমাদি—সমাধান কী, তাই প্রশ্ন আমার।

—চল্ দেখি, দীপ্তিদি কি বলেন!

রিক্সা এসে পৌঁছালো দীপ্তি দেবীর বাড়ীতে। ইনি এম.এ., বি.টি., বিলাত-ফেরৎ এবং চিরকুমারী। বয়স কত ধরা যায় না। ধনীকন্যা এবং দীর্ঘকাল কোনো স্কুলে ভাল চাকরী করে এখন অবসর নিয়ে 'যুগনারী' বার করেছেন। মেয়েদের কাগজ, তাই লাভ না হলেও লোকসান হয় না। কারণ বর্ত্তমান প্রসাধন-শিল্পের যুগে মেয়েদের এই

কাগজে শাড়ী-চুড়ি, তেল-সাবান, স্নো-ক্রীমের যে বিজ্ঞাপন আসে, তাতেই কাগজের খরচ উঠে যায়।

দীপ্তি দেবী বিচক্ষণ সম্পাদিকা—তাঁর মতামত প্রায় য়ুরোপীয়, এবং বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ করে বলবার শক্তি রাখেন উনি। বেশ হাসিখুশী ভাব—সব সময়ই তরুণী সেজে অবস্থান করেন। ওঁকে ঘিরে বেশ একটি নারীচক্র গড়ে উঠেছে। প্রায় সকলেই কুমারী। বিবাহিতা যে দু'চার জন আছেন, তাঁরা অতি-বৃহৎ কারো স্ত্রী বা কন্যা—প্রায়ই 'লেডী' পর্য্যায়ের কিম্বা রাণী-মহারাণী পদ-সমৃদ্ধা। বাংলার এবং ভারতের সমস্ত নারীপ্রতিষ্ঠানের প্রগতিমূলক সংবাদ এঁরা রাখেন এবং সম্পাদকীয়তে মতামত ব্যক্ত করেন।

দীপ্তি দেবী মৃদু হেসে স্বাগত জানালেন সীমা আর করবীকে। ওখানে আরো তিনটি মেয়ে রয়েছে—একজন টাইপিষ্ট, অন্য দুজন সহ-সম্পাদিকা। ওদের অফিস বেলা আটটা থেকে বারোটা আর বিকাল চারটা থেকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। মাঝে ঘণ্টা চার ছুটি। ফাল্গুনের কাগজ বের করতে হবে, তাই দীপ্তি দেবী খুব ব্যস্ত। বললেন,

—প্রবন্ধ-কবিতা কিন্তু আছে নাকি, করবী?

—হ্যাঁ। কিন্তু, শুনতে হবে—

সকলে পাশের ঘরে এসে বসলো। সহ-সম্পাদিকা দুজনও। করবী পড়তে আরম্ভ করলো তার প্রবন্ধ। দীপ্তি দেবী একটা সরু সিগারেট বের করে ধরালেন। এটা ওঁর অভ্যাস, সবাই জানে। পড়া চলতে লাগলো। দীপ্তি দেবী নিঃশব্দে শুনে গেলেন সবটা।

—সমস্যাই আছে শুধু, দীপ্তিদি—সমাধানের কিছুই আমি লিখতে পারিনি।— করবী কুণ্ঠিত হাস্যে জানালো।

—ঠিক আছে, সমাধানের ব্যবস্থা আর কেউ করবে। দে ওটা।

করবীর হাত থেকে প্রবন্ধটা নিয়ে 'অ্যাপ্রুভ্‌ড্‌' লিখে সহ-সম্পাদিকার হাতে দিলেন তিনি, বললেন,—এখুনি প্রেসে পাঠিয়ে দাও।

বেয়ারাটা বাইবে ঝিমুচ্ছিল। তাকে ডেকে, লম্বা খামে মুড়ে ওটা প্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। প্রেস দূরে—দশটাব আগে তাব অফিস খোলে না, অতএব তাড়ার কিছু নেই।

—এ মাসে রান্নার বিষয় তুমি কিছু লিখলে না, সীমা?— দীপ্তিদি বললেন।

—কৈ আর হোল! মাথায় কিছু আসছে না আর—

—চার পাঁচ দিন সময় আছে। যদি পার তো দাও কিছু লিখে।

—এমাসে 'বান্না' প্রবন্ধটা না হয় বাদ যাক্, দীপ্তিদি—আমি অন্য একটা কথা বলতে এলাম।

—কি?— দীপ্তিদি সাগ্রহে শুধুলেন।

—পথে-পড়া ছেলেমেয়েদেব জন্য কোথায় যেন আশ্রম হয়েছে একটা, খবর জানেন?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমাদের উৎপলা কবেছে সে আশ্রম। কেন? কী ব্যাপার!

—একটা ছেলেকে ওখানে রাখা যায় না? কিছু টাকাও না-হয় দেওয়া যাবে তার জন্য।

—তা, পলাকে বলে দেখতে পারি। কার ছেলে, কোথায় পেলে তুমি?

আধমিনিট উত্তর দিলনা সীমা। মুখশ্রী ওর করুণ হয়ে উঠলো। বলল,

—পথে-পড়া বলেই তার পরিচয় থাক্, দীপ্তিদি। যদি পারেন তো উৎপলাকে বলুন ফোনে। ওকে নিয়ে আমি কিছু বিপদে পড়েছি। মাত্র চার বছর বয়স—কেউ নেই তাকে দেখবার। রাস্তায় পড়ে থেকে সে মারা যাবে।

—আছে কোথায় ?

—ছিল এক বুড়ির কাছে। সে আজ দিন চার পাঁচ দেহ রেখেছে— বলল সীমা— ছেলেটা পথে পথে ঘুরছিল এঁটো পাতা চেটে। নওকিশোর নামে একজন পশ্চিমা ওকে আমার কাছে এনে দিল কাল সন্ধ্যায়। আমি ঐ বুড়ির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, তাই নওকিশোর আমাকে চেনে। বুড়িটাও পশ্চিমা ছিল।

—আচ্ছা, দেখছি— বলে দীপ্তি দেবী ফোন করলেন উৎপলাকে। উৎপলা তখনো বাড়ী ফেরেনি। ওর মা বললেন বিকালে ফোন করতে।

সীমা যেন অতিশয় বিপন্ন বোধ করছে। দীপ্তি দেবী বললেন,

—ঘণ্টাকতক রাখ গিয়ে। আমি চারটের সময় পলাকে আবার বলবো— বলেই দীপ্তি দেবী নিজের মনেই যেন বললেন,

—কুমারী জননীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে দেশে—প্রতিকার কী, প্রতিরোধ করে কে ?

করবীও কথাগুলো শুনলো ওঁর।

সিনেমা-শিল্পে 'মন্দার প্রডাক্সন' একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে এই ক'বছরে। পর পর কয়েকটা জনপ্রিয় ছবি তৈরী ক'রে এই প্রতিষ্ঠানটি বেশ বড় হয়ে উঠলো। অনেকে বলছেন, এঁরা বাংলার সিনেমা-শিল্পের গৌরব রক্ষা করেছেন। এঁদের সবথেকে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে নতুন নতুন অভিনেত্রী আমদানী এবং তাদের ট্রেনিং দিয়ে ভাল অভিনয় করানো। ট্রেনিং এঁরা কতখানি দেন, তা ভগবানই জানেন— কিন্তু সত্যি যে সুন্দরী নায়িকা নির্ব্বাচন করতে পারেন তা স্বীকার করতেই হবে। বর্ত্তমান বাংলায় এঁদের ছবি মানেই 'হিট' এবং 'হাউস ফুল'।

ইকনমিক ক্রাইসিস্ যতই চলুক দেশে—সিনেমা-গৃহের দরজায় লাইন লাগে, ডবল দামে টিকিটের ব্ল্যাক-মার্কেট চলে, এবং ধারে-পাশের চায়ের দোকানগুলো ভর্ত্তি হয়ে যায়। 'মন্দার প্রডাক্‌সন' এর মধ্যে আরো দুটি নতুন হাউস তৈরী করিয়েছেন এবং তাঁদের নতুন ছবি 'জরদ্গব' এই নবনির্ম্মিত প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবার বিজ্ঞাপন সাড়ম্বরে ঘোষণা করছে। নায়িকা নাকি অসূর্য্যম্পশ্যা রাজকুমারী—যাকে দেখলে রূপকথা ভুলে যেতে হবে। এবার নায়কও নাকি আনা হয়েছে এক অতি-অভিজাত পরিবার থেকে—যার বাবা মদ খেতে-খেতেই মহাসমাধি লাভ করেছেন।

হাউসগুলো সাজানো হচ্ছে—আজই 'জরদ্গব' ছবির মুক্তি-দিবস। 'মন্দার প্রডাক্‌সন'-এর অর্দ্ধেকের মালিক মিঃ সাহা একবার দেখতে বেরুলেন। কোথায় কেমন কি হচ্ছে, খবর নেওয়া দরকার। কিন্তু আর্টের কাজ নিজে দেখে তৃপ্ত হবার সঙ্গে কেউ সঙ্গী থাকলে অনেক বেশী ভাল লাগে, বিশেষতঃ যদি সেই সঙ্গী নারী হয়। তিনি মোটরে উঠেই এই কথাটা ভেবে গাড়িখানা সটান উৎপলার বাড়ীতে নিতে আদেশ করলেন। এই পরম অভিজাতা নায়িকাকে উৎপলাই সংগ্রহ করে দিয়েছে। অতএব নিশ্চয় তারও আগ্রহ রয়েছে হাউস-দেখা বিষয়ে।

কিন্তু উৎপলাকে আগে একটা ফোন করে দিলে সে তৈরী হয়ে থাকতে পারতো—ভেবেই, মিঃ সাহা গাড়ী থামিয়ে একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে ফোন করে দিলেন উৎপলাকে। বললেন যে তিনি আসছেন পনর মিনিটের মধ্যে।

উৎপলা সিদ্ধেশ্বরকে নিয়ে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ফিরেছে। শরীর-মনের অবসন্নতা তখনো ওর দূর হয়নি। অন্য কেউ হলে নিশ্চয় সে যেতে

পারবে না বলে জবাব দিত; কিন্তু মিঃ সাহাকে ওরকম জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। উৎপলা এই কয়েকটা বছরে মিঃ সাহার জালে বিশেষরূপে জড়িয়ে গেছে। অবশ্য তাতে ওর আর্থিক এবং সামাজিক বহু বিত্তই লাভ হয়েছে, কিন্তু উৎপলার স্বাধীনতা যেন বন্দী ওই মিঃ সাহার কাছে। তাই সে যাবার সম্মতি দিয়েছে ফোনে।

কিন্তু মনটা বিশেষ অপ্রসন্ন। তবু ওকে তৈরী হতে হবে। অতখানি পথ মোটরে আসার পরিশ্রম বড় কম নয়। উৎপলা স্নান করে তৈরী হতে যাবার পূর্ব্বেই শুনতে পেল মিঃ সাহার গাড়ী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। মুখখানাকে বিশ্রী করলো একবার উৎপলা।

বসবার ঘরে ঢুকে মিঃ সাহা দেখতে পেলেন সাধুবেশী সিদ্ধেশ্বরকে। কেন! উৎপলার বাড়ীতে সাধু কেন? ওর কি গুরু-টুরু কেউ আছে নাকি! কথাগুলো নিজের মনে আওড়াবার সঙ্গে তিনি এসে বসলেন একখানা চেয়ারে। সিধু একপাশে কম্বলের আসনে বসে আছে। মিঃ সাহা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,

—আপনি কি উৎপলা দেবীর কোনো আত্মীয়?

—আমি গৃহত্যাগী। আত্মীয়-অনাত্মীয় কিছু নেই আমার; বিশ্ব আমার আত্মীয়।

—ওরে বাপ্—একেবারে বিশ্ব-বান্ধব!— বিদ্রূপ করলেন 'মন্দার 'প্রডাক্‌সন'-এর মালিক।

—আমি বিশ্বের বান্ধব হতে পারিনি, আমার অযোগ্যতা,— বিশ্বকে আমার বান্ধব মনে করি— বিদ্রূপটা অগ্রাহ্য করে অতি মিষ্টভাষায় বলল সিদ্ধেশ্বর।

মিঃ সাহা চুপ করে রইলেন একমিনিট, তারপর আবার কথা বললেন,

—তা বেশ। আশ্রম কোথায় আপনার?

—আমি অনাশ্রমী, বাবা! যে দেবতা প্রতি গৃহমধ্যে অধিষ্ঠিত, তাঁরই দুয়ারে আমার আবাস।

—কিন্তু সব গৃহমধ্যে তিনি না থাকতে পারেন— কথা বলতে বলতে হাসলেন মিঃ সাহা।

—তিনি থাকেন— বললো সিধু,— শুকনো শিলায় তাঁর হিরণ্য-জ্যোতি বিকশিত, শ্যামল শস্যে তাঁর মরকত-কান্তি বিভাসিত—মানুষের দেহরথে তিনি বামনমূর্ত্তি! তিনি নাই, এমন কিছু হতে পারে না, বাবা! তিনি ঠিকই থাকেন, থাকেনা শুধু তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস··· সিধুর কথা শান্ত-শীতলতায় অভিসিঞ্চিত।

—সে-বিশ্বাস আসবে কিসে?— তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলেন মিঃ সাহা।

—তাঁর কৃপায়। তিনি করুণা করে জীবাত্মার মধ্যে সেই পরম ক্ষুধা জাগিয়ে দেন।

—কৈ? আমাদের তো পরম ক্ষুধা দূরে থাক্, সাধারণ ক্ষুধাও বোধ হোল না তাঁর জন্য! তাহলে কি বুঝতে হবে, আমাদের জীবাত্মাই নেই?

সিধু এই বিদ্রূপটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য চুপ করে রইল। কিন্তু উত্তর দিল উৎপলা। কখন সে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়, ওঁরা দেখেননি। বলল,

—জীবাত্মা না থাকলে জীবন থাকে না, মিঃ সাহা! কিন্তু আমাদের জীবাত্মা জৈববৃত্তিতে সমাধিস্থ। কবর খুঁড়ে তাকে বের করতে সময় আর সাধুসঙ্গ দুটোই দরকার। বিদ্রূপের শ্যাওলা চাপা দিয়ে জীবনকে মনোরম করা যায়, জীবাত্মার আবিষ্কার করা যায় না। জীবনের কঙ্কাল যেদিন দেখবেন, জীবাত্মা সেইদিন আবিষ্কৃত হবে—

তীক্ষ্ণ আঘাত করলো উৎপলা। কিন্তু মিঃ সাহার 'লেডী' সম্বন্ধে অশেষ ধৈর্য্য। আঘাতটাকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে বললেন,

—জীবাত্মা যদি থাকে তো, তাকে চিরদিন কবরস্থ রাখলে ক্ষতি কি, পলা দেবী!

—সে প্রেতত্ব পাবে। জীবনকে যতই সুন্দর করুন, আত্মার ভূতযোনি আপনাকে বিভীষিকা দেখাতে কসুর করবে না—মৃত্যু তার আদি রূপ, আধি আর ব্যাধি তার অনুচর, পরলোক তার পরিণাম। দম নিয়ে বলল,—চলুন, কোথায় যেতে হবে—?

—ওঃ, আপনি দেখছি এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন এরই মধ্যে!

—না, ওঁর শিষ্য হবার যোগ্যতা নেই আমার। ওঁর কিঞ্চিৎ সেবা করতে পেয়েছি, এই ভাগ্য!—চলুন—

ওঁরা বেরিয়ে যাচ্ছেন—মিঃ সাহা যেন কি ভেবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন,

—আপনিও আসুন-না সাধুজী আমাদের সঙ্গে?

—আজ্ঞে না, আমার পক্ষে ওসব অনাবশ্যক!— বলে সিদ্ধেশ্বর চোখ বুজলো।

মিঃ সাহা গাড়ীর দরজায় উৎপলাকে তুলে দিতে দিতে শুধালেন, —খুব বড় সাধু নাকি ইনি?

—উনি শুধু 'সাধু'। মানবাত্মা যেখানে নির্মল-নিরঞ্জন, উনি সেখানকার মানুষ—

মিঃ সাহা আর কিছু না-বলে গাড়ীতে চড়লেন।

উৎপলার আগ্রহ কিছুমাত্র নেই; কিন্তু মিঃ সাহা তাঁর নতুন হাউসে নতুন ছবি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন—অতএব মুখখানা যথাসাধ্য প্রসন্ন করে বলল,

—'জরদ্গব'—ছবির নাম! কী ব্যাপার? গল্পটা কি?

—চলুন, দেখলেই বুঝবেন। বাংলা গল্পের একটা অসাধারণ বস্তু! প্লট আমার নিজের, সংলাপের অধিকাংশও আমার।

—তাহলে কাহিনী-সংলাপ-চিত্রলিপিতে আপনারই নাম ?

—না না, পলা দেবী, ওরকম নাম নিয়ে কি হবে আমার ? ওসব তো আমার দরকার নেই। ওর জন্য কিছু টাকা দিয়ে একজন নামকরা লেখকের নাম কিনে নেওয়া হয়েছে। মানে—আমার ডাইরেকশন-মত সে লিখেছে।

উৎপলা আর কোনো প্রশ্ন করলো না। অপ্রয়োজনীয় ওর পক্ষে। তবে মিঃ সাহার সিনেমা-শিল্পে উৎপলার যথেষ্ট স্বার্থ জড়িত আছে। সে-সব কথা বাইরে অপ্রকাশ্য, তাই এখানেও আলোচনা করা হোল না।

মিঃ সাহা সিনেমা-গৃহের দরজায় গাড়ী থামবার পূর্ব্বেই দেখলেন, লাইন দিয়ে লোক টিকিট কিনছে। আনন্দে চোখ জলে উঠলো ওঁর। বললেন,

—বাঃ! ছবিটা লোক টানবে, মনে হচ্ছে। মোটা টাকা পাবলিসিটিতে খরচ করবো এর পর—এখন নতুন ছবির নামেই তো দেখছি খুব ভিড়!

—এ ছবি চলবে নিশ্চয়— বলল উৎপলা।

—কেন ? কি হিসেবে বললেন ?

—যা একটা অদ্ভুত নাম দিয়েছেন!—'জরদ্গব।' চমৎকার!

—হ্যাঁ, পলা দেবী। নামটাই আদত। নাম খুঁজে বের করতে আমাকে দু'এক রাত জেগে ভাবতে হয়। পুরোনো-পচা নাম আমি পছন্দ করিনে।

দুজনে নেমে ঢুকলেন ভেতরে। উৎপলা সটান গিয়ে একটা আসনে বসে পড়ল। মিঃ সাহা একটু এদিক-ওদিক ঘুরে তদারক করে এসে বসলেন। হাউস ফুল।

শো আরম্ভ হোল।

হালকা হাসির ছবি। শিব থেকে শবকে পর্য্যন্ত বিদ্রূপ করা হয়েছে ; শেয়ালও বাদ যায়নি। মানুষের প্রচলিত বিশ্বাসকে গোঁড়ামী এবং অন্ধ সংস্কার আখ্যায় অভিহিত করে গোটা গল্পটা গড়া ! সমাজের স্থবিরত্বকে আঘাত করবার জন্যই যেন ছবিখানা দেখানো হচ্ছে। হাসির খোরাক সবটাতেই।

আনন্দের জন্য মানুষ আসে এখানে, হোক সে আনন্দ হালকা হাসিতে বা ইতর ঘটনা-বিন্যাসে আকীর্ণ। দুর্দ্দিনের দুঃখের কশাঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য যেন মানুষ হুল্লোড় করে এসে ঢোকে এইরকম ছবির শো-হাউসে। এখানেও তাই হয়েছে। কিন্তু উৎপলা খুশী হচ্ছিল না। এ কি! মানুষের রুচি-বিকার ওকে যেন কুণ্ঠিত করছে। নীচের তলায় যখন দর্শকগণ হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, তখন উৎপলা ওপরের সোফায় বসে ভাবছে—বাংলাদেশে ছায়া-ছবি এখন এই পর্য্যায়েই নেমেছে তাহলে! হয় ক্রাইম-ড্রামা, না হয় হাসির গল্প! মানুষকে আনন্দ দেবার মত সুস্থ-সুন্দর গল্প এখন চলে না বাজারে! ক্লাসিক তো বাদই দিতে হয়েছে। ভাল গান থাকলে এক শ্রেণীর লোক ছবিকে ভাল বলে, কিন্তু সেরকম ছবিও তো খুব বেশী পয়সা পায় না। মানুষের মন এতখানি হালকা হোল কি করে? চিন্তাশীলতা কি চলে গেল বাঙালীর ?···

ছবি শেষ হোল। মিঃ সাহা একবার কাউণ্টারে গিয়ে বিক্রীর অঙ্কটা জেনে নিয়ে হাসিমুখে এসে বললেন,

—রিপোর্ট খুব ভাল। সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন।—চলুন—

—চলুন— উৎপলা উঠে এসে গাড়ীতে বসলো।

পথে মিঃ সাহা ছবির সাফল্য সম্বন্ধে বহু কথাই বললেন, কিন্তু উৎপলা কোনো সাড়া দিল না। ওর যেন মনে হচ্ছিল—এইসব হালকা ছবি পরিবেশন করা অপরাধ। মানুষকে এতে মানবত্ববোধ থেকে

বিচ্যুত করা হয়। ধর্ম্মকে বিদ্রূপ করে পয়সা রোজগার করা হতে পারে, কিন্তু নিজের ধর্ম্ম তাতে বজায় থাকে না।

বাড়ীতে ঢুকেই উৎপলা সটান চলে গেল উপরের ঘরে। মিঃ সাহা এসে বসলেন ড্রইংরুমে। সিধু কম্বলের উপর বসে রয়েছে, দেখলেন।

—আপনি সেই থেকে বেরুননি সাধুজী?

—না— সিধু উত্তর দিল।

—আপনার আশীর্ব্বাদ নিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের ছবি খুব ভাল উত্‌রেছে। এই টাকাটা প্রণামী দিচ্ছি, নিন— বলে মিঃ সাহা একগোছা নোট ফেলে দিলেন সিধুর আসনে। অনেকগুলো দশ টাকার নোট।

—এ আমি নিয়ে কি করবো?— সিধু ব্যাকুল-বিপন্ন ভাবে চাইল।

—কেন? আপনার আশ্রমে খরচ হবে।

—আমার তো আশ্রম নেই।

—আপনার নিজেরও তো দরকার? টাকাটা রাখুন।

—না, ধন্যবাদ। টাকার আমার প্রয়োজন নেই।

—আমি দিয়েছি, আর তো ফিরিয়ে নেব না?

—আপনি কোনো জনকল্যাণ-আশ্রমে দান করবেন। আমার অনাবশ্যক!

—অনাবশ্যক! টাকা বস্তুটা এত তুচ্ছ নয়, সাধুজী। লোটা-কম্বলও কিনতে হয়। ভিক্ষে করা থেকে অযাচিত দান নেওয়া ভাল।

—না— সিধু বললো,—অযাচিত সেই দানের মধ্যে থাকে দাতার অহঙ্কার। তার বদান্যতার প্রকাশ-গর্ব্ব। তাকে পাপ বলে মনে করি।

—পাপ!

—হ্যাঁ। আমার জন্য এই পাপ আমি আপনাকে করতে দেব না। এই দান আপনার দয়াবৃত্তি থেকে নয়, আপনার ধনগৌরব দেখাবার

জন্য। একে স্বীকার করলে আপনার পাপকে আমার প্রশ্রয় দেওয়া হবে। আমি মুষ্টিভিক্ষার মালিক। যাঁরা সৎ গৃহস্থ, ভিক্ষাদান করাকে যাঁরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ-প্রাপ্তি বলে মনে করেন, তাঁদের দরজায় দাঁড়িয়ে ভগবানের নাম শোনাই—দেহরক্ষার জন্য যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করি।

—এই বিশাল প্রাসাদটি বুঝি সৎগৃহস্থের বাড়ী, আর উৎপলা দেবী সেই সৎগৃহস্থ—কেমন?

—আমি উৎপলা দেবীর কাছে দান গ্রহণ করতে আসিনি, দান করতে এসেছি তাঁকে ভগবানের নাম। তিনি ধনী হলেও এই 'নামধন' তাঁর নেই।

—বেশ তো। আমাকেও কিঞ্চিৎ নাম ধন দিয়ে দক্ষিণা গ্রহণ করুন।

—আপনাকে আমি নামদানের যোগ্য পাত্র মনে করি না। আর নামদানের দক্ষিণা টাকায় দেওয়া যায় না, সে দক্ষিণা দিতে হয় শ্বাসে-শ্বাসে নাম জপ করে।

—আমি পারবো না, মনে করছেন?— মিঃ সাহা আর বিদ্রূপ করতে পারছেন না। সাহস করছেন না। যতটা সম্ভব নিজেকে নীচু করেই তিনি ঐ কথা বললেন এবার।

—পারা-না-পারার কথা নয়, আপনার এখনো সময় হয়নি। ঈশ্বর করুন, যেন সে-সময় আপনার এই জন্মেই হয়।— সিধু চোখ বুজলো নিঃশব্দে।

পৃথিবীর একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছেন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা। সে পরিবর্ত্তন শুধু মানবজগতে নয়, প্রকৃতির রাজ্যেও। ঋতু যেন যথাযথ সময়ে হচ্ছে না। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি গা-সওয়া হয়ে গেছে।

ভূমির উর্ব্বরতা ক্রমেই কমে আসছে এবং নানা নৈসর্গিক উৎপাত আকস্মিক সম্ভব হচ্ছে।

মানবরাজ্যে মহামারী তো চলছেই—দুর্ঘটনার সংখ্যাও দিনে দিনে বাড়ছে। কোথাও ভূমিকম্প, কোথাও জলপ্লাবন, কোথাও অগ্নিভয় শুধু নয়, মানুষের তৈরী বৃহৎ শিল্পগুলিতেও যেন পাইকারী হারে ঘটছে দুর্ঘটনা—খনিতে ধ্বস নামা, ট্রেনে কলিসন, সেতুর পতন, মোটর-বাসের বিপর্য্যয় যেন নিত্যকার ঘটনা। একে আরো ভয়াবহতা দিয়েছে দুর্নীতির অভিশাপ, দস্যু-তস্করের উপদ্রব, তার সঙ্গে সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংসা, জাতিগত-ভাবে জিগীষা।

এমনি একটা সময় আসবার কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। কলি যত প্রবল হবে, ততই নাকি এসবের বাড়াবাড়ি চলবে। তাহলে শেষ পর্য্যন্ত কোথায় দাঁড়াবে মানুষ! কলির তো এখনো বহুবৎসর পরমায়ু! ভাবছে আলোকনাথ।

কোষগ্রন্থ ছাপার কাজ আজ আরম্ভ হবে—সেখানেই যাচ্ছে আলোক। 'কপি'র তাড়া বগলে এসে ট্রামে উঠলো। চিন্তা ওর নিত্যকালের সঙ্গী। কলির কথা ভাবতে ভাবতে কলকাতার কথা এসে পড়লো ওর চিন্তার পরিধিতে। সুবিশাল মহানগরী। কত লোক, কত বিচিত্র মানবজীবন! কত বিরাট মানব-মহিমা—কত ক্ষুদ্র মানব-চেতনা!

ট্রামের বেঞ্চে বসে ভাবছে আলোক—এই মহিমময় মানবজীবনের আদিম দিন থেকে এপর্য্যন্ত কত মহাপুরুষ, কত অবতারকল্প, কত সত্যদর্শী ঋষি এলেন—কত কি ভাল শেখালেন, কত পথ নির্দ্দেশ করলেন ভূমানন্দ লাভের জন্য—মানব-চেতনাকে ভাগবতী চেতনায় উন্নীত করবার জন্য—কিন্তু কি করলেন! মানুষের জৈব চেতনা কতটুক উন্নত হয়েছে? আজও তো মানুষ তেমনি কাম-ক্রোধ-লোভ

তেমনি ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ! শুধু তাই নয়। স্বস্বার্থকে মানুষ আজ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় মহিমান্বিত করে একজন আর-একজনকে শোষণ এবং শাসন করতে চায়। অপরের অগ্রগতি রোধ করে নিজের গতিকে বেগবান করতে চায়···

আরো অনেক কিছু ভাবতো আলোক, কিন্তু ট্রামে অকস্মাৎ একটা গোলমাল উঠলো—দেখা গেল, এক পকেটমার ধরা পড়েছে। পকেটমার এক স্ত্রীলোক—চড়-চাপড় তার অঙ্গে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না আরোহী ভদ্রলোকদের পক্ষে, তাই শুধু কথার অজস্র আবিলতা বর্ষিত হচ্ছে মেয়েটির উপর; কিন্তু সত্যই মেয়েটি অপরাধী কিনা, কেউ যেন আর জানতেই চান না। একটা হুল্লোড় হৈ-চৈ অবস্থা। আলোক এগিয়ে এসে দু-একটা প্রশ্ন করে জানতে পারলো, জনৈক আরোহীর মনিব্যাগ খোয়া গেছলো; সেটি খোঁজ করবার জন্য সবাই যখন চেষ্টা করছেন এবং সকলের দেহ-তল্লাসী করবার কথা উঠেছে, তখন ঐ মেয়েটির সীটের তলায় ব্যাগটি পাওয়া যায়। ব্যাগ যে-ই অপহরণ করুক, সেই মেয়েটিকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে। মেয়েটি ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে।

এতগুলো লোকের কথার বিরুদ্ধে সে কিছুই বলতে পারছে না। দেখেই মনে হয়, অভাবগ্রস্ত ঘরের যুবতী—কিন্তু তার সরল সুন্দর চোখেমুখে অপরাধীর লক্ষণ ধরা যায় না; বিপন্না বলেই বোধ হয়।

—ও যে ব্যাগটা নিয়েছিল, তার কি কোনো প্রমাণ আছে?—আলোক প্রশ্ন করল।

—ওর সীটের তলায় ব্যাগটা গেল কেমন করে, মশাই?— বললেন একজন। অন্যজন বললেন বেশ রাগতঃ স্বরেই, —ধরা পড়ার ভয়ে সীটের নীচে ফেলে দিয়েছে। আমরা সবারই পকেট অনুসন্ধান করবার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ ঐ সীটের তলায় পাওয়া গেল।

—তাতেই প্রমাণ হয় না যে, ও চোর। পকেটমার এতো নির্ব্বোধ হয় না যে নিজের সীটের তলায় বামাল ফেলবে। নিশ্চয় কেউ ওর সীটেব তলায় ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়েছে—আপনাবা একটু বিবেচনা করুন···

আলোকের কথায় সবাই কিঞ্চিৎ যেন চিন্তিত হোলেন। আলোক আবার বলল,

—ব্যাগটা প্রথম কে দেখতে পান ওখানে?

—ইনি— বললেন একজন ভদ্রবেশীকে দেখিয়ে প্রথম বক্তা।

আলোক বলল,

—এঁর নজরটা ওখানেই সর্ব্বাগ্রে গেল কেন? মেয়েটির প্রতি সন্দেহের কোনো কারণ পূর্ব্বে তো ঘটেনি। এতো ভীড়ের মধ্যে সীটের তলায় ছোট ব্যাগটা উনি কি ভাবে দেখতে পেলেন?

সকলেই কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন সেই ব্যাগ-দেখা লোকটির পানে। সে লোকটিই এতক্ষণ বেশী গালাগালি দিচ্ছিলেন। আলোকের কথায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বললেন,—আমার হঠাৎ নজব পডল ওদিকে।

—বেশ, আপনি কোথায় উঠেছেন ট্রামে?— আলোক প্রশ্ন করলো।

—শ্যামবাজারের মোড়ে, পাঁচ-রাস্তায়।

—তুমি কোথায় উঠেছ?— আলোক এবার প্রশ্ন করলো মেয়েটিকে।

—ট্রাম-ডিপোতেই আমি উঠেছি, তখন ট্রামে কোনো লোকই ওঠেনি।

—আপনি কোথায় উঠেছেন?— এবার আলোক প্রশ্ন করলো ব্যাগের অধিকারীকে।

—আমিও শ্যামবাজারের মোড়ে উঠেছি।

—তাহলে দেখা যাচ্ছে— [redacted]য়েটি আপনার ট্রামে ওঠবার আগে থেকে উঠে [redacted]ই ভদ্রলোক প্রায়

আপনার সঙ্গেই ট্রামে উঠেছেন। তখন ট্রামে ভিড় হয়েছে এবং আপনার পকেট-মারার খুবই সুযোগ ঘটে গেছে। মেয়েটি ছিল সীটে বসে—আপনার পকেট-মারা কি করে তার পক্ষে সম্ভব হয়? যাদুবিদ্যা নিশ্চয় ঐ মেয়েটি জানে না?

আলোকের কথা বলার ভঙ্গীতে সকলেই হেসে উঠলো।

—আমি বলিনি যে এ-ই চোর— বলল ব্যাগ-দেখা লোকটি— আমার নজর ওখানে পড়লো, তাই আমি সকলকে দেখিয়ে দিলাম যে ঐখানে ব্যাগ রয়েছে··· বলতে বলতে ব্যাগ-দেখা লোকটি স্যুট করে নেমে গেলেন।

—এই—থামুন, যাবেন না— চীৎকার করে উঠলেন ট্রামের সকলে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! লোকটি রাস্তার ভিড়ের মধ্যে অন্য এক চলতি বাসে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সকলেই বুঝলেন, উনিই চোর। মেয়েটি থরথর করে কাঁপছিল। আলোক সস্নেহে বলল, —বসো—তুমি বসো, তুমি চোর নও—

এতক্ষণে হু-হু করে চোখের জল নেমে এল তার। ছুটে এসে আলোকের পায়ের উপর পড়ে বলল,—আপনি ভগবান—আপনি আমার বাবা···আপনি···

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে আলোক আবার বসিয়ে দিল তার সীটে। নিজের আসনে তার আর বসবার দরকার নেই, কারণ ট্রাম প্রায় তার নামবার কাছাকাছি এসে পড়েছে; দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো—বহু স্থানেই এরকম হয়, সত্যি অপরাধী ধরা পড়ে না, অন্য এক নিরপরাধ শাস্তি ভোগ করে। ক'দিন আগে কাগজে পড়েছে, চেহারার সাদৃশ্য দেখে একজন সাধুকে পুলিশ চোর সন্দেহে হু'মাস হাজতে রেখেছিল। অকারণ নিরপরাধ ব্যক্তিকে হাজতবাস করতে হোল হু'মাস। এমন কত হয়—কত হচ্ছে।

আত্মবিস্মৃত আলোকনাথ কখন ট্রাম-ষ্টপ্‌টা পার হয়ে গেছে; একেবারে শিয়ালদহ ষ্টেশনের মোড়ে এসে গাড়ী দাঁড়ালো। বহু ব্যক্তি নামলেন, আলোকও নামলো। ওকে আবার খানিক পিছিয়ে যেতে হবে। নিজের উপর খুবই বিরক্ত হচ্ছে আলোক—নিরুপায় হয়ে ফিরছে, অকস্মাৎ ট্রামের সেই মেয়েটি একেবারে কাছাকাছি এসে বললো,

—আপনি কোথায় যাবেন, দাদা?

—ঐ ছাপাখানা। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

—আমি চাকরীর খোঁজে যাচ্ছিলাম। আপনি আমাকে খুব বাঁচিয়ে দিলেন!

—ওর জন্য আবার ধন্যবাদ কেন? কোথায় চাকরী? কি চাকরী করবে তুমি?

আলোক প্রশ্নের সঙ্গে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখলো মেয়েটিকে। নিতান্ত কচি মেয়ে—বয়স আঠার-উনিশ। শ্যামলা সুশ্রী। চোখদুটি আয়ত এবং উজ্জ্বল। দরিদ্রঘরের কুমারী কন্যা। আলোক বলল,

—লেখাপড়া কতটা শিখেছ? কাজ কিছু জান?

—আই-এ পাশ করেছি। টাইপ জানি। আমাদের বড় কষ্ট, দাদা! বাড়ীতে ছোট ছোট তিনটি ভাইবোন। বাবা-মা আছেন। কিন্তু কোনো রোজগার নেই বাবার। কী ভাবে যে সংসার চলবে, জানি না!

আলোক চুপ করে রইল। এরকম শত-সহস্র রয়েছে এই বাংলাদেশে। কী সে করতে পারে এর জন্য? চাকরীর ক্ষেত্রও জানা নেই আলোকের, যেখানে ওর জন্য একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। বলল,

—আমি নিতান্ত দীনহীন ব্যক্তি, বোনটি! আমার তো কোনো ফার্ম্ম জানা নেই, যে তোমার কোনো কাজ জুটিয়ে দেব! তবু তোমার ঠিকানাটা দাও,—যদি কিছু করতে পারি, চেষ্টা করবো।

—জয়ন্তী। তেত্রিশ বাই তিন বাঁশবেড়িয়া লেন—লিখে নিন, দাদা!

আলোক নোটবুকে ওর নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে আবার বলল,

—আমার নাম আলোক। কোনো কাজ যদি পাই তো তোমাকে লিখবো—এখন যেখানে যাচ্ছ, যাও··· বলে সে নিজেই চলে গেল।

কথা বাড়িয়ে বা হৃদ্যতা দেখিয়ে লাভ নেই। তাই একটু নিষ্ঠুরের মতই চলে গেল আলোক। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেদিন অপর্ণাকে দেখার পরও আলোক এমনি নিষ্ঠুর হয়ে চলে গিয়েছিল। সে কি সত্যি নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে? তার মনের দয়াবৃত্তি কি শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন!

ওপাশের ফুটপাতে উঠে আলোক তাকিয়ে দেখলো, এপাশের ফুটপাতে মেয়েটি তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথায় ও যাবে, ও যেন জানে না—এমনি হতভম্ব ভাব। কিন্তু আলোক কিছুই করতে পারে না। দুটো টাকা দিলে ওর বিশেষ কোনো সাশ্রয় হবে বলেও মনে হয় না। আর এমন ক'জনকে আলোক দান করতে পারে! নিজেকে কঠিন করে আলোক জনারণ্যে লুকিয়ে গেল।···

বিরাট সেই ছাপাখানার কর্ম্মচক্র আবর্ত্তিত হচ্ছে। মেসিনের শব্দ আর মানুষের গুঞ্জন মিলে এক অপূর্ব্ব জগৎ যেন এখানে। আলোক অফিসে ঢুকে নমস্কার জানালো ম্যানেজারকে।

—আসুন— স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন ম্যানেজার।

—আজ থেকেই আমাদের কাজটা ধরুন তাহলে— আলোক বলল।

—হ্যাঁ, দেখি আপনার 'কপি'— ম্যানেজার হাত বাড়ালেন।

কিন্তু আলোক ঐ অফিস-ঘরে অন্য একজনকে দেখছে তখন। ওপাশের একটা টেবিলে একটি তরুণী নিবিষ্টমনে প্রুফ দেখছে। আলোক মুহূর্ত্তে চিনতে পারলো, তরুণীটি করবী। করবীও চাইল ওর পানে। তৎক্ষণাৎ কাগজ-কলম নামিয়ে এসে নমস্কার করে মৃদু হেসে বলল,—আপনি এখানে!

—হাঁ, কিছু ছাপাবার আছে। আপনার কি ?

—আমাদের 'যুগনারী' কাগজ এখানেই ছাপা হয় যে। আমার একটা লেখা আছে এ মাসে, তারই প্রুফ দেখতে এসেছি।

—ওঃ—ভাল।— আলোক কথা কেটে নিজের কাজে মন দিতে চায়। কিন্তু করবী আবার বলল,

—অঞ্জনাদির বাবার সেই কোষগ্রন্থ বুঝি ?— হাসলো করবী।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আপনি কেন ঐ কোষগ্রন্থের জাঁতিকলে এতকাল বদ্ধ আছেন, বলুন তো ?

—জাঁতিকলে আট্‌কালে ছাড়ানো মুস্কিল··· হাসলো আলোকও।

—আপনার পক্ষেও ?

—হ্যাঁ। আমিও মানুষ। কিন্তু আমার সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা তো খুব কম !

—মোটেই না। আপনার অনেক খবর জানি আমি। আপনার কাজ শেষ করুন, আমিও প্রুফটা দেখে নিই। কালই আমাদের কাগজ বের হবে, তাই একটু তাড়া আছে। ছাপা হলে আমার প্রবন্ধটা শোনাবো আপনাকে—

করবী আবার তার টেবিলে বসলো গিয়ে। আলোক তার কপি ম্যানেজারকে বুঝিয়ে দিল। ম্যানেজার ওকে প্রশ্ন করলেন,

—আপনি কি এখন এই কোষগ্রন্থই সঙ্কলন করছেন ?

—হ্যাঁ। যিনি সঙ্কলন করছেন, আমি তাঁকে সাহায্য করি। কাজটা ভাল কাজ, তাই আমার ভাল লেগেছে।

—হ্যাঁ, নিশ্চয় ভাল কাজ— বললেন ম্যানেজার।

করবী প্রুফ-দেখা শেষ করে ম্যানেজারের হাতে দিয়ে, বলল আলোককে,

—চলুন, কোথায় যাবেন এখন ?

—বাড়ী ফিরবো— বলে আলোক উঠলো। করবীও আসছে সঙ্গে।

—সেদিন গানের আসরে হয়তো আপনার বিরক্তির কারণ হয়েছিলাম— বলল করবী।

—না—কেন ? বিরক্তির কোনোকিছু তো হয়নি।

—আমার হিন্দী গান—

—হোলই বা। তবে আপনি তো হিন্দুস্থানী নন। আপনার মুখে হিন্দী উচ্চারণ বিকৃত হচ্ছিল। কিন্তু তাতে কি ? বিরক্ত হবার তো কিছু নেই—

—আপনি বাংলা গান বেশী ভালবাসেন—

—হ্যাঁ, আমি কায়মনোপ্রাণে বাঙালী। নিজেকে সকলেই কিছু বেশী ভালবাসে। আচ্ছা, নমস্কার—

আলোক ট্রামে উঠলো।

বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয় সরকারী সাহায্যে যতটা না হোক, সাধারণের সাহায্যে খুবই পরিপুষ্ট হচ্ছে। দেশের ধনী ব্যক্তি, বিশেষ করে মহিলাগণ একে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করছেন। এর আভ্যন্তরীণ কারণ অনুসন্ধান না করেও বোঝা যায় যে, এইরকম একটি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শুধু অনাথ শিশুদের জন্যই এই প্রতিষ্ঠান ; সাধারণভাবে দেশের সকল ছেলেমেয়ে এতে স্থান পায় না—পেতেও চায় না। এদিক দিয়ে ব্যাপারটা যেন জাতিচ্যুত অবস্থায় রয়েছে। অথচ উপায় নাই। কারণ ঐরকম শিশুদের জন্যই ঐ বিদ্যালয় গড়া হয়েছে।

এই শিশুরা বিশ্বের শিশু। জাতি-কুল-পরিচয়হীন সর্ব্বদেশের শিশুদের জন্যই এই বিদ্যালয় ; সুতরাং সকল দেশের নরনারীর সহানুভূতি

পাবার যোগ্যতা এর আছে—এইজন্য অবন্তী সারা পৃথিবীর মানবহিত-ব্রতীদের কাছে একে সাহায্য করবার জন্য আবেদন পাঠায়। সাহায্যও আসে প্রচুর। দেখতে দেখতে প্রতিষ্ঠানটি প্রকাণ্ডকায় হয়ে উঠলো। এতে এখন তিনশো শিশুর স্থান হতে পারে। সুতরাং সীমা যে ছেলেটির কথা বলেছে, তাকে নিতে কোনো অসুবিধা হবে না। উৎপলা ছেলেটিকে নিয়ে সীমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে। সীমা এল।

—এসো। ছেলেটিকে পেলে কোথায় তুমি?— প্রশ্ন করলো উৎপলা।

—এক পশ্চিমা বৃদ্ধা ওকে পালন করতো। সে মারা যাবার আগে নওকিশোর নামে একজন পশ্চিমাকে আমার ঠিকানায় ছেলেটিকে পৌঁছে দিতে বলেছিল—

—তোমার ঠিকানা সেই বৃদ্ধা তাহলে জানতো?

—হ্যাঁ— বলে সীমা একটু কুণ্ঠার হাসি হাসলো। উৎপলা আর এ বিষয়ে প্রশ্ন করলো না; ছেলেটিকে ভাল করে দেখতে লাগলো। সুন্দর শিশু, সবল সুস্থ। ঘরের এ-কোণা থেকে ও-কোণায় খেলা করে বেড়াচ্ছে। কে জানে, কী ওর পরিচয়! কিন্তু পরিচয়ের কি আবশ্যক? ও-যে অখণ্ড মানব-স্রোতের অংশ, এতে তো বিন্দুমাত্র সংশয় নেই; ওর সামাজিক পরিচয় নাই-বা থাকলো। বনের বাঘ-সিংহের তো কোনো সামাজিক পরিচয় থাকে না—ব্যাঘ্রজননী কি নির্দেশ করে দিতে পারে, কোন্ বাঘটি তার সন্তানের পিতা? পারাবত-জননী কি খবর রাখে, তার কোন্ সন্তানটি কোন্ পিতার ঔরসজাত?

কিন্তু মানুষ পারাবত বা ব্যাঘ্র নয়—সে মানুষ। মান এবং হুঁস তার আছে। তাই সে সমাজ সৃষ্টি করেছে। সে-সমাজে পিতৃপরিচয় অবশ্য প্রয়োজনীয়। তবুও বর্ত্তমান জগতে পরিচয়হীন শিশুর সংখ্যা কম নয়; তাদের পরিচয় হবে 'বিশ্ব-শিশু' বলে। কে জানে তাদের মধ্যে

'মহর্ষি সত্যকাম' জন্মাবেন কিনা! মানুষ হবার শিক্ষা পেলে ওরা মানবজগতের সম্পদ বাড়াবে। উৎপলা বেশ খানিকক্ষণ ভাবলো। তারপর বলল,

—কিছু টাকাও দেবে শুনলাম—

—হ্যাঁ, আপাততঃ শ'-পাঁচেক দিচ্ছি আমি—। সীমা হ্যাণ্ডব্যাগ খুলল।

—না—এখানে না। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি ওখানে গিয়ে ছেলেটিকে ভর্ত্তি করে টাকা দিয়ে এসো। খাতায় শিশু-দাতার সহি থাকা দরকার। ভবিষ্যতে কেউ যদি কোনোদিন এই শিশুর মা-বাবা বলে দাবী করে তো তোমার ডাক পড়বে। আজই তুমি যেতে পার।

সীমা ওর কাছ থেকে যাবার এবং ফিরবার ট্রেনের খবর জেনে নিল। চিঠিও একখানা লিখে দিল উৎপলা।

উৎপলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সীমা সটান এসে উঠলো হাওড়ার গাড়ীতে। ছেলেটা হাফ-প্যাণ্ট আর লাল জামা পরেছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। ওর নধর-সুন্দর রূপ দেখে গাড়ীর একটি মহিলা বললেন,

—চমৎকার চেহারা হবে আপনার খোকার। কী সুন্দর গঠন!

সীমা তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলো। কথার স্বীকৃতি ও দিতে চায় না। একটা কমলালেবু বের করে খোকার হাতে দিলেন সেই ভদ্রমহিলা; বললেন,

—খাও— ওর চিবুকে একটা চুমা খেলেন তিনি। শুধুলেন,—আর হয়নি?

—না— এবার জবাব না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু সীমা ওঁকে জানাবে যে, ছেলেটা ওর নয়; কি ভাবে জানাবে ভাবছে—ভদ্রমহিলা আবার প্রশ্ন করলেন,

—কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?

—অজয়— সীমা জবাব দিল।

—অজয় ? অজয় তো নদী। কোনো ষ্টেশনের নাম তো 'অজয়' নেই।

—ঐ অজয়ের কিনারেই যাব আমি— বলল সীমা— ওখানে আমার এক আত্মীয় আছেন—জায়গাটার নাম জানি না। প্রথম যাচ্ছি।

কত মিথ্যাই না বলতে হয়! কিন্তু এরকম মিথ্যা বর্ত্তমান যুগের যুগলক্ষণ। এ না-হোলে মানুষের চলবার উপায় নেই। সীমার মনে এর জন্য কিছু গ্লানি আসা সম্ভব নয়—এলোও না। বলল,

—আপনি কোথায় যাবেন ?

—চেঞ্জে। মাস-দুই থাকবো।

—ছেলে-মেয়ে ?

—নাই, ভাই !— স্বরে অকথিত কারুণ্য তাঁর— হয়নি, যায়ও নি। একেবারে ঝাড়া-হাত-পা রয়ে গেলাম !

কথাগুলো বলার সঙ্গে চোখের কোণা অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো তাঁর। কী মর্ম্মন্তুদ দুঃখ যে তিনি পাচ্ছেন, তা ঐ 'ঝাড়া-হাত-পা' কথাটাতেই প্রকাশ। কথা ক'টি বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন যেন নিজের মনোবেদনাটা সামলাবার জন্যই। সীমা যথেষ্ট শিক্ষিতা এবং বুদ্ধিমতী। সন্তানহীনা এই নারীর অগাধ বেদনার কথা অনুভব করলো সে। যে সন্তানকে সে বিসর্জ্জন দিতে চলেছে, সেই সন্তানের জন্য এই নারীর অন্তর্বেদনা দেখে ওরও যেন অন্তরের কোথায় মোচড় দিয়ে উঠলো। কয়েক মিনিট চুপ করে রইল সীমা, তার পর বললো,

—দত্তক নেবার ইচ্ছে আছে আপনার ?

—না ভাই, নিজের যখন হোল না, তখন ওসব কেন আর! তা ছাড়া আমার ইচ্ছে থাকলেও আমার স্বামীর ওতে মত নেই।

তিনি বলেন,—নিজের রক্তে চোর-ছ্যাঁচোড় হলেও সহ্য হয়; পরের আপদ কাঁটার মত বুকে ফুটবে দিনরাত! ওতে দরকার নেই।

—আপনার যে-রকম সন্তানের জন্য আকাঙ্ক্ষা দেখছি, তাতে দত্তক নিলে ভাল হোত। অবশ্যি এখনো আপনার ছেলে হোতে পারে।

—না, সে-সব আশা নেই। আমরা ওর জন্য অনেক কাণ্ড, যোগযাগ করেছি। দত্তক সম্বন্ধে তো আমার স্বামীর মত্ বললাম। কিন্তু কেন? আপনার সন্ধানে ভাল ছেলে কেউ আছে নাকি?

—হ্যাঁ—তা যোগাড় করে দিতে পারি আমি।— বলল সীমা।

ভদ্রমহিলা ছেলেটার সুন্দর মুখপানে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে শেষে তাকে কোলে নিয়েই ওপাশের বেঞ্চে গেলেন উঠে।

এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ক্রমাগত গোল্ডফ্লেক সিগারেট টানছিলেন। স্ত্রীকে কাছে আসতে দেখে ধোঁয়ার ভেতর দিয়েই তাকালেন। বললেন,

—কি?

—শোনো— বলে মহিলাটি বসে পড়লেন ওঁর পাশে। তার পর দুজনে কিছুক্ষণ কথা হোল অতি আস্তে। ছেলেটাকেও দেখলেন ভদ্রলোক—কোলে নিলেন; বেশ হাসিমুখ তাঁর। বললেন,

—এটাকে যদি পাও তো, দেখ—

খোকাকে ওঁর কোলে রেখেই মহিলাটি ফিরে এলেন সীমার কাছে। আমতা-আমতা করে বললেন,

—তোমার খোকাকে বড্ড ভাল লাগছে, ভাই। ওইরকম একটি যদি পাই—

—ওকেই নিতে চান আপনি?— সীমা সকৌতুকে প্রশ্ন করলো।

—তা কি করে হবে? তুমি কি এ ছেলে দেবে আমায়?

—দেব। যদি ওকে আপনাদের পছন্দ হয় তো, নিন ওকে। যত্ন করে মানুষ করবেন। ও ভাল-লোকের ছেলে; মা-বাবা নেই, আমি ওকে শিশু-বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলাম।

—ও তাহলে তোমার ছেলে নয়?

—না। আমি কুমারী। ও যার ছেলে তাকে আমি জানতাম। ভাল বংশ। ওর বাবা একজন দেশবিখ্যাত ব্যক্তি। কিন্তু ওসব কথা থাক্। যদি আপনি ওকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন তো, নিন ওকে। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসবো ওর 'মাসিমা' হয়ে। আপনার স্বামীকে বলুন।

উৎপলার লেখা চিঠিখানা হ্যাণ্ডব্যাগে রয়েছে। মুখ মুছবার জন্য রুমাল বের করতে গিয়ে একবার দেখলো সীমা। ভদ্রমহিলাটি ইতিমধ্যে স্বামীর কাছে গিয়ে বসেছেন। হয়তো সব বৃত্তান্ত বলছেন স্বামীকে। স্বামী কিন্তু অত সহজে রাজী হলেন না। তিনি নানারকম সন্দেহ প্রকাশ করছেন। বলছেন যে, এভাবে গোপনে ছেলে নিলে শেষে হয়তো ছেলেচুরির দায়ে পড়তে হবে। হয়তো যাঁর ছেলে তিনি জানেনই না যে, সীমা তাকে বিক্রী করে দিল—ইত্যাদি নানা সন্দেহে দোদুল্যমান হয়ে ভদ্রলোকটি কী করবেন, ঠিক করতে পারছেন না। অবশেষে স্ত্রী ফিরে এসে সীমাকে স্বামীর সন্দেহের কথা বললেন। শুনে সীমা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ; তারপর বলল,

—আপনাদের সন্দেহ হয় তো, থাক্,—তবে আমি আপনার দুঃখ দেখে প্রস্তাবটা করেছিলাম। ছেলেটা যে আমার নয়, এবং ওর কেউ নেই—তার প্রমাণ আমি এখুনি দিতে পারি।

—কি প্রমাণ?— মহিলা প্রশ্ন করলেন।

—আমার কাছে বাংলার দেশবিখ্যাত সমাজকর্ম্মী উৎপলা দেবীর চিঠি আছে। ঐ ছেলেটিকে তিনি শিশু-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে

নেবার জন্য ওখানকার সেক্রেটারী অবন্তী দেবীকে অনুরোধ-পত্র দিয়েছেন ; এই দেখুন— বলে সীমা চিঠিখানা বের করে দিল।

নাম-ছাপা চিঠির কাগজ। উৎপলার নামও জানা মহিলাটির। চিঠিটা পড়ে স্বামীকে দেখালেন তিনি। এখন স্বামীর আর অমত্ নেই। তিনি রাজী হলেন।

গাড়ী বর্দ্ধমান পৌছাবার পূর্ব্বেই সীমার সঙ্গে ওঁদের সব ঠিক হয়ে গেল কথা। সীমা উৎপলার চিঠিখানা ওঁদের দিল এবং তার পিঠে সহিও করে দিল। নিজে একখানা কাগজে ছেলেটিকে ওদের দেওয়ার কথাও লিখে দিল। অর্থাৎ অতি গোপনে ছেলেটি বিক্রী হয়ে গেল বিনামূল্যে। সীমা শুধু ওঁদের পশ্চিমের ঠিকানাটা জেনে নিয়ে বর্দ্ধমানে নেমে পড়ল।

গাড়ী দাঁড়িয়ে। ছেলেটা জানালা দিয়ে হাত বাড়াচ্ছে সীমার দিকে। সীমা বলল,

—ঐ তোমার মা—যাও, ওঁর কোলে যাও···

—না··· ছেলেটা কেঁদে উঠলো অকস্মাৎ।

ওকে ভোলাবার জন্য, হয়তো-বা আরো বিশেষ কোন কারণে সীমা একঠোঙা সীতাভোগ-মিহিদানা কিনে দিতে যাচ্ছে খোকার হাতে— ভদ্রমহিলা যেন বিব্রত হয়ে বললেন,

—ওগুলো দিও না, ভাই। শুনছি বর্দ্ধমানে বড্ড বসন্ত লেগেছে··· না না—দিও না—

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সীমা প্ল্যাটফর্ম্মে। নিজেকে সামলে বলল,

—না দিদি, ঐ-তো কত লোক খাচ্ছে, দেখুন···

—তা থাক। ওসব বাজারের মিষ্টি আমি ওকে খেতে দেব না। এস খোকন, কমলা খাও—

বলে ছেলেটাকে টেনে নিলেন জানালা থেকে। গাড়ী ছেড়ে দিল। সীতাভোগের ঠোঙাটা ফেলে দিলেই সীমার 'ঝাড়া-হাত-পা'—তার পর

পরবর্তী ট্রেনে কলকাতা গিয়ে নিশ্চিন্তে ওর কুমারী-জীবন যাপন করতে পারবে। লোক্যাল ট্রেনও ঐ ওপাশের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। একখানা টিকিট কিনতে যা দেরী! টাকাগুলোও খরচ হোল না সীমার।

কিন্তু হাতের ঠোঙাটা! ওটা সে ফেলবে কোথায়? কি করে ফেলবে? ঝাড়া-হাত-পা হতে গিয়ে একঠোঙা খাবারেই কি আটকে গেল সীমা!

গাড়ী-চলে-যাওয়া খালি প্ল্যাটফর্মের জনবিরল পাথরে দাঁড়িয়ে সীমা যেন পাথরের মূর্ত্তির মত স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে। ছেলেটার অসহায়-করুণ মুখখানা ওর বুকে কেটে-কেটে বসছে যেন। কোথায় ঝাড়া-হাত-পা সীমার! শালপাতার ঠোঙায় যে ওর চিরবন্দিত্ব ঘটলো! বিক্রীত বস্তুর উপর আর কোনো স্বত্ব নেই, তাই সীমা ছেলেটাকে মিষ্টিটা দিতে পেল না—বিদায়ে শেষ মিষ্টান্ন!

অকস্মাৎ রেললাইনের উপর ঠোঙাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সীমা—কয়েকটা চিল তৎক্ষণাৎ পড়লো খাবারের উপরে। কিন্তু সীমা দেখতে পাচ্ছে না—ওর চোখের জল হু হু করে নামছে এখন। বহুদূরে-চলে-যাওয়া গাড়ীটাও দেখতে পাবে না আর—সীমা এখন ঝাড়া-হাত-পা!! হ্যাঁ, কুমারী সীমার জীবনে আর কোনো গ্লানি নেই!...

ওপাশের লোক্যালটা ছেড়ে চলে গেল—সীমা তখনো দাঁড়িয়ে!

অনাবৃষ্টির উৎপাত চলেছে বাংলা-বিহারে। খাল-বিল সুধু নয়, নদী-নালা কূপ-পুষ্করিণী সব শুষ্ক। জলের অভাবে মানুষ ছটফট করছে; তার সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে মহামারী। বাংলায় এই অবস্থা যেন আরো শোচনীয়ভাবে প্রকট। হিমালয়ের যোগাশ্রমে থেকে খবর পেল সিধু।

প্রায় চার-পাঁচ মাস হোল সে অবন্তীর আশ্রম ঘুরে এসেছে। অবন্তী ভালই আছে, দেখে এসেছে সিদ্ধেশ্বর। ঐ শিশু-বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েই সে তার বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে, এই কথাই অবন্তী জানিয়েছে সিদ্ধেশ্বরকে। কিন্তু ওখানে যে বালকটিকে সিধু দেখে এসেছে, তার কথা ক্রমাগত মনে পড়ছে। সর্ব্বস্ব-রিক্ত সন্ন্যাসী সে, তবু ঐ বালকের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ যেন অনুভব করে সিধু। সেই ছেলেটিকে একবার দেখতে গেলে হয় না! সিধুর চিন্তাটা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এল যে, বাংলায় না গিয়ে যেন উপায় নেই।

গুরু কর্ণবিজয় আশ্রমের সব ভার সিধুর উপর ছেড়ে দিয়ে দূর হিমালয়ে পরিব্রজনে বের হয়েছেন। কবে ফিরবেন, অথবা একেবারেই ফিরবেন কিনা, জানা নেই। এ আশ্রমে আর যে দু'তিনজন সাধক আছেন, তাঁদের মতি-গতি ভাল দেখছে না সিধু। আশ্রম বলতে ছোট কয়েকটা কুঠিয়া—আর ভিক্ষান্ন; এর জন্য মোহ কিছুই নেই; সিধুর এখানে সময় কাটাতে ভাল লাগছে না।

অপর একজন গুরুভ্রাতার উপর আশ্রমের ভার দিয়ে সিধু বেরিয়ে পড়লো—কলকাতা যাবার ট্রেন ধরলো এসে। মেলগাড়ী দ্রুত চলেছে। ভোর হোল একটা বড় ষ্টেশনে। সিধু জানালা দিয়ে একখানা বাংলা খবরের কাগজ কিনে পড়তে লাগল।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা···কংগ্রেসের বলবৃদ্ধি ··অন্নবস্ত্র-আবাসের প্রাচুর্য্য, তার সঙ্গে বেকার-সমস্যা, ক্ষুধার অন্ন যোগাতে না পারায় পত্নী-পুত্রকে হত্যা করে নিজের আত্মহত্যা · অর্থাভাবে কন্যা-বিক্রয়··· চুরি-ডাকাতির অসংখ্য ইতিহাস···মানুষের ভয়াবহ পাশবিকত্বের প্রাচুর্য্য; ঠিক তারপরই জলনিমজ্জিতকে রক্ষা করবার জন্য জীবন দান··· অগ্নি-নির্ব্বাণের জন্য আত্মবলি—বিচিত্র-বিস্ময়কর। বহুদিন খবরের

কাগজের খবর রাখেনি সিধু। ওর উপর সিধুর আগ্রহ কম। কিন্তু আজ একদিনের কাগজেই এতো বেশী বৈচিত্র্যময় সংবাদ ওকে যেন বিস্ময়মুগ্ধ করে দিল। ভাবতে লাগলো—মানুষের জগতে অমানুষ এবং অতি-মানুষের লীলা যেন গ্রথিত হয়ে রয়েছে এই কাজগখানার প্রতি কলমে। জীবন কী বিচিত্র! ততোধিক বিচিত্র মানুষের জীবন-লীলা,—জীবন-সম্ভোগ।

কিন্তু ঐ কাগজেই আর একটা খবর পাঠ করলো সিধু। দেশের এক সর্ব্বজন-পরিচিত পরম শ্রদ্ধাভাজন দেশনেতা সাধু সম্বন্ধে সকলকে, বিশেষ করে, নারীদিগকে সাবধান করেছেন এক মহতী জনসভায়। তিনি বলেছেন—ভারতে কমপক্ষে আশী লক্ষ সাধু আছে। তারা অপরের আয়ের উপর বাস করে—ভাল খায়, ভাল থাকে, অথচ কোনো কাজ করে না। মানুষের ধর্ম্মনিষ্ঠার দুর্ব্বলতাই তাদের প্রতিপালন করছে।

আশী লক্ষ! সিধু সংখ্যাটা নিজের মনে আবৃত্তি করলো। হাঁ, সাধুবেশী আশীলক্ষ লোক থাকা অসম্ভব নয় এদেশে।

কিন্তু সাধু কোথায়! সাধু কয়জন? অসাধুতা ঢাকবার ছদ্মবেশই তো বেশী দেখা যায়। সিধু এই বার-চোদ্দ বছর ধরে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তাতে ওরও বিশ্বাস, সাধুবেশী অসাধুর সংখ্যাই অধিক। দেশনেতা সকলকে সাবধান করেছেন সাধু সম্বন্ধে—ঠিকই করেছেন।

সিধু কাগজখানা উল্টে বিচারালয়ের ব্যাপারগুলো পাঠ করতে আরম্ভ করলো—সাধুর আশ্রম নিয়ে মামলা···সাধুর ছদ্মবেশে লোভী ব্যক্তির নিষিদ্ধ বস্তুর কারবার···সাধুবেশী প্রতারক—উঃ! এই সাধুত্ব!

নিজের গৈরিক বাস আর কাঠের কমণ্ডলুটার পানে তাকালো সিধু। ঝোলায় শালগ্রাম, গলায় মালার গোছা, কপালে তিলকফোঁটা। সিধুর মনে হোল, গাড়ীশুদ্ধ লোক যেন তার পানে সন্দেহের দৃষ্টিতে

তাকাচ্ছে। তার সাধুবেশ যেন অসাধুত্বের দ্যোতনা করছে ওদের সকলের অন্তরে। অকস্মাৎ সিধু কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

কিন্তু ওরা কেন তাকে সন্দেহ করবে? সিধু তো সত্যি কোনো অসাধুর কাজ করেনি। টিকিট কিনেই তো সে গাড়ীতে উঠেছে এবং এপর্যান্ত কারো সঙ্গে কথাই বলেনি। তবু সিধুর মনে হচ্ছে, ওরা যেন সবাই সন্দেহ করছে সিধুকে।

—আশ্‌রম্‌ কাঁহা, সাধুজী— জনৈক যাত্রী প্রশ্ন করলো চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে।

—হরদ্বোয়ার··· সিধু জবাব দিয়েই মুখ ডোবালো খবরের কাগজে।

—আপ্‌ বাঙালী হ্যায়?—বাংলা কাগজ পড়ছেন যে?

—হ্যাঁ— অন্য এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলল সিধু।

—কাঁহা যাতা?—কোথায় যাচ্ছেন আপনি?— আবার প্রশ্ন হোল।

—কলকাত্তা।

—শিষ্য আছে ওখানে?

—না, আমি শিষ্য করবার যোগ্যতা পাইনি এখনো। কলকাতায় দরকার আছে কিছু।— জবাব দিয়েই সিধু উঠে বাথরুমে ঢুকলো গিয়ে।

ওর ঝোলা-কম্বলের পানে সকলেই তাকাচ্ছে। ওর চেহারাখানা এখন সত্যি সাধুর মত। চুল-দাড়ি, গায়ের বর্ণ এবং দেহের জ্যোতি দেখে ওকে মিথ্যে সাধু মনে করবার কারণ নেই—গাড়ীর লোকগুলো যেন ভাবছে। সিধু বেরিয়ে এল পাঁচমিনিট পরে। কম্বলের আসনখানা কোণার দিকে পাতা। তার ওপর আসন করে বসে ও এবার চোখ বুজ্‌বে। কিন্তু গাড়ীর লোকেরা অত সহজে ওকে নিষ্কৃতি দেবে না। একজন হাত বাড়িয়ে বলল,

—দেখুন তো, প্রভু, আর কতদিন ভুগতে হবে?

—হামি ওসব জানে না— সিধু বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে জবাব দিল।

—ঈশ্বর কি সত্যি আছেন? তাঁকে পাওয়া যায়?— প্রশ্ন করলো অন্যজন।

—যিনি পেয়েছেন, তিনি বলতে পারেন, বাবা! আমি এখনো পাইনি।

—কি আনন্দে আপনি ঘুরছেন তাহলে? পরের মাথায় হাত বুলিয়ে রাবড়ী খাবার জন্য, কেমন?— কথাটা বললো এক তরুণ বাঙালী। বাঙ্কের উপরে সারারাত শুয়ে কাটিয়েছে, এখন ঘুম ভাঙার পর ও শুয়ে-শুয়েই প্রশ্নটা করলো সিধুকে। সিধু ওর পানে চেয়ে বলল ধীরে,

—পরের মাথায় হাত বুলোবার সুযোগ আপনারা দেন কেন, বাবা? এই তো আপনাদের দেশনেতা উপদেশ দিয়েছেন, সাধু-সম্বন্ধে সাবধান হবেন—

—আমরা সাবধান আছি। গেরুয়া দেখলেই বুঝি, সে একটি চোর।

—অতটা ভাল নয়, বাবা! আপনি জানেন না, এমন জিনিষও থাকতে পারে।

—তাই নাকি!— বিদ্রূপ করে উঠে বসলো ছোকরা; বলল,

—তাহলে আপনি সত্যি সাধু! বেশ, বলুন তো মানুষ মরলে কোথায় যায়?

—মরেই সেটা জানতে হবে, বাবাজী—কারো মুখের কথায় বিশ্বাস হবে না।

গাড়ীর অধিকাংশ যাত্রীই বাঙালী। সিধুর কথা শুনে সকলেই হেসে উঠলো। কিন্তু বাঙ্কের ছোকরা নেমে এসে সিধুর মুখোমুখী বসে বলল,

—আপনাদের যোগশাস্ত্র কি বলে?

—শাস্ত্র বহু এবং বিচিত্র, বাবাজী! সে-সব আপনিও পড়ে নিতে পারেন। আমার ও-বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। শাস্ত্র আর শস্ত্র আমি এড়িয়ে চলি।

—তাহলে আপনার অবলম্বন কি শুধু বস্ত্র, এই গেরুয়া বস্ত্র?—বিদ্রূপ করে হাসলো সে।

—হাঁ বাবা, আপনি ঠিকই ধরেছেন। তবে এখনো পুরোদস্তুর গেরুয়া নিতে পারিনি। ত্যাগ-বৈরাগ্য এখনো অভ্যাস হয়নি। এখনো লোকালয়ে আসতে হয়, আপনাদের সঙ্গে কথাও বলতে হয়।

—প্রণামীও নিতে হয় আশ্রম চালাবার জন্য— কঠোর বিদ্রূপ করলো ছোকরা।

—হ্যাঁ, জীবন রক্ষার জন্য ভিক্ষা করতে হয় বৈকি। তবে আমি মানুষের কাছেই ভিক্ষা চাই…

—শেয়াল-কুকুরের কাছে ভিক্ষা চাওয়া যায় নাকি?

—হ্যাঁ, চাওয়া যায়—পাওয়া যায়। যাঁরা খবরের কাগজে আগে দানের খবর পাঠিয়ে দান করেন, যাঁরা দানটাকে ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট মনে করেন—যাঁরা দান করে ভাবেন, তিনি না দিলে ভিখারীর আর গতি ছিল না, ভেবে দেখবেন—'তাঁরা' কি!

যুবকটির বিদ্রূপবাক্যে অনেকেই তার উপর বিরক্ত হচ্ছিলেন। অনর্থক একজন সাধুর সঙ্গে এরকম কলহের কি দরকার! বিশেষতঃ সিধুর মিষ্ট বাক্য আর বলার সুন্দর ভঙ্গী ভাল লাগছিল অনেকের। কিন্তু যুবকটি বলল,

—আপনি তাহলে ওরকম কারো কাছে দান গ্রহণ করেন না?

—না। আমার প্রয়োজন অত্যন্ত সামান্য, আকাশবৃত্তিতেই তা চলে যায়। আর, কোনো খবরের কাগজে নাম ছাপার মত সাধুও নই আমি—

—আপনি তাহলে নিজেকে দীনাতিদীন মনে করেন?

—না, দীনতার ভান আমি করিনে। সোনার থালায় অন্ন না হলে রুচি হয় না, অথচ শিষ্যদের উপদেশ দেন 'তৃণাদপি সুনীচ' হতে,

এরকম দীন আমি নই। বিশ্বরাজের রাজত্বে তাঁর নাম নিয়ে পড়ে আছি—এপর্য্যন্ত কোনো অভাব আমার হয়নি, এবং আশা করি হবে না। কারণ জীবনধারণের জন্য আমার স্বল্পই প্রয়োজন; আর, সেটুকু তিনিই সংগ্রহ করে দেন···

—সাধারণ মানুষের দান-প্রবৃত্তিকে ভাঙিয়ে তো?

—দান-প্রবৃত্তি যাঁর আছে, তিনি দান করে আনন্দ পান বলে করেন। ভাঙিয়ে খাবার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু, আপনার সঙ্গে অনর্থক আর কথা কাটাকাটি করতে ইচ্ছে নেই। অনুগ্রহ করে মাফ করবেন।

সিধু পদ্মাসন করে বসে শ্বাস টানলো—হয়তো প্রাণায়াম করবে। সবাই দেখতে লাগলো ওকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ীর বেঞ্চিতে সিধু স্থির হয়ে গেল। যেন জড় মূর্ত্তি। ওর শ্মশ্রু-কেশমণ্ডিত সুন্দর মুখমণ্ডল যেন জ্যোতির্ম্ময় মনে হচ্ছে। সবাই বলল,

—সত্যি কিছু আছে এঁর মধ্যে!

দীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা সিধু নিশ্চল, যেন পাথরের মূর্ত্তি। সর্ব্বাঙ্গে কেমন একটা প্রসন্ন জ্যোতি; গায়ের লোমগুলি পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে রয়েছে! সমাধিস্থ সিধু। গাড়ী চলছে, থামছে; আবার চলছে। গরমের দিনের বেলা অনেক হোল। প্রায় সকলেই কলকাতার যাত্রী—সবাই যে-যার খাবার ব্যবস্থা করছে। সিধু ঠিক একভাবে বসে। সেই যুবকটি এতক্ষণ পরে বলল,

—মনে হচ্ছে, ইনি সত্যি যোগী। আপনারা অনুমতি করেন তো পরীক্ষা করি।

—কি পরীক্ষা?— প্রশ্ন করলো কয়েকজন।

—সিগারেটের আগুন ফেলে দেব ওর গায়ে—

—না না, ওরকম করবেন না— বলতে বলতে কিন্তু সেই যুবকটি হাতের জ্বলন্ত সিগারেট সিধুর জানুতে চেপে ধরলো। সিধু

নির্ব্বিকার। প্রায় আধমিনিট সিগারেটটি ধরে থাকার পর তুলে নিল যুবক। পরবর্ত্তী একমিনিটে মস্ত একটা ফোস্কা হয়ে গেল ওখানে। সিধু তখনো একভাবে বসে। সবাই যুবককে তিরস্কার করছে, কিন্তু যুবকটি কারুকে কিছু বললো না, আর একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো।

আরো প্রায় একঘণ্টা পরে সিধুর সমাধি ভাঙলো। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে রইল সিধু কিছুক্ষণ, তারপর জানুর উপর ফোস্কাটা দেখে হাসলো একটু আপন-মনে। একটা ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়ালো; সিধু নেমে জলকলে গিয়ে জল নিয়ে এল কাঠের কমণ্ডলুতে। বসল আসনে।

—এই ছোকরা আপনার গায়ে আগুন চেপে ধরেছে— বলল এক ক্রুদ্ধ যাত্রী।

—নারায়ণ ওঁকে আশীর্ব্বাদ করুন— বলে সিধু হাসলো আবার।

—আমি ইচ্ছে করে আগুন চেপে ধরেছি আপনার গায়ে— যুবকটি বলল।

—বেশ করেছেন, বাবা! আমার শরীর আপনাকে কিছু আনন্দ দিতে পেরেছে, নারায়ণ আমাকে এই সৌভাগ্য আজ দিলেন!

—কিন্তু এ আনন্দ পৈশাচিক, সাধুজী!— যুবকের কণ্ঠে অনুতাপের অশ্রু-মালিন্য।

—হোলই বা। নারায়ণ ওকে একদিন দৈবী আনন্দে পরিণত করবেন!

গাড়ীটা দাঁড়িয়ে ছিল, তাই সকলেই শুনতে পেল এই কথোপকথন। বিস্মিত যুবকটি বিহ্বল হয়ে বলল,

—আমাকে অভিশাপ দেবেন না আপনি?

—শাপ বা বর দেবার আমি তো কর্তা নই, বাবা! যিনি কর্তা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি—আমার নশ্বর শরীরের সামান্য অংশ পুড়িয়ে আপনার বিশ্বাস আসুক তাঁর অস্তিত্বে—তাঁর অপার করুণায়! ··

সিধু ঝোলা থেকে একমুঠি ছোলা বের করে রাখলো একটা তামার বাটিতে। কমণ্ডলুর জল দিয়ে ধুয়ে নিবেদন করছে ভগবানকে।

—আমি কিছু খাবার কিনে দিলে আপনি খাবেন, সাধুজি? কলা, আম বা অন্য ফল?— যুবকটি প্রশ্ন করলো।

—না বাবা! আমার ওসব কিছু দরকার নেই। এই চানা-ই আমি প্রসাদ পাব। আপনারা আনন্দে খাওয়া-দাওয়া করুন—

—আমার মত পাষণ্ডের কাছে আপনি কিছু নেবেন না, না সাধুজী?

—ওকি কথা, বাবা! আপনি পাষণ্ড কেন হবেন? আর, আমার ও-সব বিচারের তো অধিকার নেই। তাঁর রাজ্যে যণ্ড আছে, পাষণ্ড আছে—চোর আছে, সাধুও আছে—রাজা আছে, ভিখারী আছে। আমার সে বিচারে কি কাজ? তাঁর প্রয়োজনে তিনি ও-সব করেছেন। আচ্ছা বাবা, এবার আমি পূজা করি—

সিধু পূজা করতে লাগলো আপন-মনে তার ঝোলার শালগ্রামের। গাড়ী আবার চলছে।···নিবেদিত ছোলা চিবিয়ে জল খেল সিধু। তার পর বসে আছে। গাড়ীর সবাই দেখছে ওকে। কিন্তু কেউ এখন কথা বলছে না। বাংলার সীমায় এল ট্রেন। একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই একটি স্নিগ্ধবর্ণা পূর্ণবয়স্কা যুবতী গাড়ীতে উঠেই ওকে দেখে ছুটে এল,

—সিধুদা— প্রণাম করলো মেয়েটি।

—হ্যাঁ। তুমি কোত্থেকে নির্মলা?

—এই, রামপুরিয়া থেকে। ওখানেই ছিলাম···কলকাতা যাচ্ছি।

কালবৈশাখীর রুদ্রলীলা যেন ঋতু-পরিবর্ত্তন করছে; বৈশাখ শেষ হোল, জ্যৈষ্ঠের অর্দ্ধেক—একফোঁটা বৃষ্টি নেই। অসহ্য গরমে মানুষ অতিষ্ঠ। টেম্পারেচার পঞ্চাশ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করছে তাপমাত্রার। অন্ন-বস্ত্র-আবাসের সঙ্গে অসহনীয় জলকষ্টে জীবজগৎ উৎপীড়িত। মহারুদ্রের বিশ্বধ্বংসী শূল উদ্যত হয়েছে যেন!

হ্যাঁ, অন্ন-বস্ত্রের অজানা আতঙ্কে বিশ্ববাসী ত্রাহি-ত্রাহি রব করছে—এদিকে শান্তির বাণী নিয়ে ভারতের জননেতা বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন! কিন্তু অণুশক্তির ধ্বংসমুখী শক্তি-পরীক্ষার বিরাম নেই। কে জানে, জগতের কারণ-সমুদ্রে কী বিপ্লব সৃজন করছে এই পরীক্ষা-প্রয়াস, এই অমানবোচিত শক্তি-লিপ্সা!— আলোক প্রুফ-দেখা শেষ করে ভাবছিল কথাগুলো।

বেলা দুপুরের দাবদাহী রৌদ্রের পানে তাকানো যায় না—ফ্যানের হাওয়া উত্তাপে অস্বস্তিকর। খসখসের জলভেজা অঙ্গ উষ্ণ হতে হতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, বরফের ঠাণ্ডা বিরক্তিকর বোধ হয়—এ কি অবস্থা! ষাটবছরের বৃদ্ধগণ বলছেন—এমন গরম কখনো দেখেন নি। এ যেন পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বাভাস, অথবা অসাধারণ কিছু একটা বিবর্ত্তনের আগমনী সংকেত! কী এটা, কেউ বুঝতে পারছে না।

মানুষ চলেছে ধ্বংসের পথে, নাকি নবসৃষ্টির প্রেরণায়? কে জানে, একদিন অতি অকস্মাৎ এই দৃশ্যমান জীবজগৎ নষ্ট হয়ে যাবে কিনা, অথবা এই সৃষ্টিতেই নবজীবন-ভ্রূণ নতুন কোনো রূপ নিয়ে আবির্ভূত হবে কিনা! পৃথিবীর জীবনেতিহাসে এমন ধ্বংস আর সৃষ্টি অনেকবার হয়েছে বলে শোনা যায়। কিন্তু এ-সব ভাববার কি দরকার? যা হবার, হবে।

আলোক প্রুফগুলো গুটিয়ে ম্যানেজারের হাতে দিল। এবার ফিরবে। কিন্তু বাইরের নিদারুণ রৌদ্র ওকে নিরস্ত করছে।

—এখন যাবেন না, বাইরে বেরুনো যাচ্ছে না— বললেন ম্যানেজার।

—বহু লোকই তো বেরিয়েছে। দেখি, কেমন গরম— বলে আলোকনাথ বেরিয়ে পড়ল পথে। বিরল-ট্রাম বড় রাস্তা, বাসও দীর্ঘক্ষণ পরে পরে। নিতান্ত প্রয়োজন না থাকলে এসময় কেউ ঘরের বার হয় না। কিন্তু এ সহরে নিতান্ত প্রয়োজনওয়ালা মানুষ অত্যধিক। অন্নচিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটছে এরা দিগ্‌বিদিকে। তাই এই অগ্নিময় পথেও মানুষের ভিড় চলেছে। আলোক বাইরে বেরিয়ে দেখলো— পথে অপেক্ষাকৃত কম লোক চললেও, যথেষ্ট মানুষ রয়েছে—রয়েছে ফেরিওয়ালা, ফল-সরবৎ বিক্রেতা, আর রয়েছে ভিখারী-ভিখারিণী, আশ্রয়হীন শিশু, অসহায় বিকলাঙ্গ মানুষ!

মানব-জীবনের এক করুণতম রূপ যেন প্রকটিত হয়ে উঠেছে এই রৌদ্রতপ্ত রাস্তার দু'পাশে। দোকানের টাঙানো মাংসের চিম্‌সে গন্ধের সঙ্গে ডাষ্টবীনের দুর্গন্ধ মিলে মানবলোককে নরকলোকে পরিণত করেছে! এ দৃশ্য দেখবার মত; দেখলে জীবনদর্শন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

মোড়ের মাথায় ছায়াশীতল একটা বড় গাছের তলায় ছেঁড়া চ্যাটাই বিছিয়ে তাস খেলছে জন চার পাঁচ ছোকরা। ওরই কাছে রাস্তার উপর পুরোনো-নতুন বই বিক্রীর আশায় বসে আছে একজন—দু'আনা-চার আনার বই 'লক্ষ্মীর পাঁচালী', 'শতনাম' ইত্যাদির সঙ্গে 'কামসূত্র'ও আছে তার মধ্যে। দুটো সরবতের দোকান পাশাপাশি—বরফজল-মেশানো ঘোল, পানখিলি—আবার গরম চা-ও রয়েছে একটা পিতলের কলসীতে। বিক্রীও হচ্ছে সব রকম।

বিচিত্র এই জায়গাটি—এই বৃক্ষতল। লোম-ওঠা কুকুর, ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়া, মালিকহীন গরু জল খাচ্ছে একটা সরকারী জলাধারে।

ওদিকে এঁটো ঠোঙা কুড়িয়ে চাটছে দুটো উলঙ্গ বালক। জীবনের রুদ্র যেন এখানে মূর্তিমান—এখানে সৃষ্টির সৌম্য শান্ত সুবাস নেই, আছে বীভৎস পূতিগন্ধ! কিন্তু এও জীবন। একে অস্বীকার করা চলে না।

ট্রাম আসবার অপেক্ষায় আলোক দাঁড়ালো ওখানে। অকস্মাৎ তাস-খেলার দলের একটা লোক তাসগুলো ফেলে দিয়ে ছুটে এসে ওকে প্রণাম করলো—

—গোড় লাগি দাদাবাবু! ভালো আসেন?

—হ্যাঁ, কিশোর। কোথায় আছ তুমি?— আলোক প্রশ্ন করলো।

—হামি তো থাকে, যাঁহা রাত হোয়, হুঁয়াই—চোর-গুণ্ডা-বদমাস্‌কো সাথ, আউর সাধু-সন্ত-ভগবানজীকো পাশ! আপ্ কাঁহা হ্যায়, দাদাবাবু?

—শ্যামবাজারে। তুমি এখন কি করছো কিশোর?

—ওহি সিনেমা-পোষ্টার লাগাতে হেঁ।— কিশোর দেখালো দেওয়ালের পোষ্টারটা।

"ক্ষণ-স্বাক্ষর—আগামী শুক্রবার শুভমুক্তি"—পড়লো আলোক। বলল,

—ওতে বেশ রোজগার হয় তোমার?

—হ্যাঁ, চলা যাতা হ্যায়, দাদাবাবু; উ কাম হরবখৎ মিল্‌তা—আউর কাম বনা দিয়া তো ছুট্টি! পয়সা ভি হ্যায়, আরাম ভি হ্যায়—

—তাহলে ভালই আছ। বেশ— বলে আলোক ট্রামে উঠবার জন্য অগ্রসার হচ্ছে।

—একঠো বাৎ হ্যায়, দাদাবাবু!— আলোককে আট্‌কালো কিশোর।

—বল— দাঁড়িয়ে গেল আলোক। ট্রামটা সবেগে চলে গেল।

—সেই অপুর্ণা-দিদি ছিল না?— হিন্দি-বাংলা মিলিয়ে কিশোর বলে চললো— একরোজ অপুর্ণা-দিদিকো সাথ হামার দেখা হইছিল।

হামি তাকে এক ড্রাইভারের ঘরমে চাকরী করতে দিয়েছিল। উ অপুর্ণা-দিদি সেই বাবুকো সাথ পশ্চিম চলিয়ে গেল। বেশ রাণীকো মাফিক সাজ করে দেশ ছোড়কে ভাগ্‌লো অপুর্ণা-দিদি—

—তা ভালই তো— আলোক হাসলো কথাটা শুনে।

—হুঁ, ভাল—লেকিন বাত হচ্ছে, উসকো সেই লেড়কাঠো কাঁহা আছে, দাদাবাবু?

—তাকে নিয়ে কি করবে তুমি?

—হারামজাদী লেডকাঠো ছোড দিয়ে গেল, বাবুজী!

—যাক্‌গে, ও নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন? নিজের কাজ কর।

আলোক চলে যাচ্ছে; কিন্তু ট্রাম আসবার দেরী আছে। কিশোর বলল,

—ঠিক—ঠিক, দাদাবাবু, দুনিয়া খোদাকো খেল! —আপ্‌কো ঠিকানা দিয়ে যান, দাদাবাবু।

আলোক ঠিকানা দিল ওকে।

ট্রামে উঠে কিন্তু আলোক ভাবতে লাগলো অপর্ণার কথা। অপর্ণার ছেলে নয় জীবন, এ সত্য আলোক ভালই জানে। কিন্তু অপর্ণা শেষে দেশ ছেড়ে চলে গেল! যাক্, ভাল থাকলেই ভাল। কিন্তু অপর্ণার জীবনের শেষ পরিণতি জানবার জন্য ওর চিরপিপাসু অন্তর উন্মুখ হয়ে উঠলো। কী অদ্ভুত এই অপর্ণার জীবনেতিহাস! কত বিচিত্র ঘটনার আবর্তে সে চলেছে তার জীবন-তরণী বেয়ে! ও-ই একাই একটা মহাকাব্য হয়তো, হয়তো তারও বড়। ও নিজেই একটা জীবন-দর্শন! যদি আবার কখনো দেখা হয় অপর্ণার সঙ্গে, তো আলোক ভালো করে জেনে নেবে তার কথা—তার মর্মের ইতিহাস।

কিন্তু কি হবে জেনে? প্রতিটি জীবনেই রয়েছে এমন অভিজ্ঞতা। এমন বৈচিত্র্য না থাক্, বিস্ময় তাতে কিছু কম নেই। জীবনের

রুদ্র কালের স্রোতে এক মহান পরিণতির পথে অগ্রসর হচ্ছেন—তিনি মহারুদ্র। তাঁর আদিতে শিব, অন্তে শব। তিনি শিবরূপে মঙ্গলময় আনন্দ, আবার শবরূপে নির্ব্বিকার ব্রহ্ম। জীবনে এই সত্য-উপলব্ধিই সাধনার শেষ কথা।

ট্রাম শ্যামবাজারের মোড়ে আসতেই নেমে পড়লো আলোক। আজ ওর একটা নিমন্ত্রণ আছে চা-পার্টিতে। নিমন্ত্রণ দীর্ঘদিন ও গ্রহণ করেনি, কিন্তু এটা অগ্রাহ্য করা গেল না। সেই-যে প্রেসে দেখা হয়েছিল করবী দেবীর সঙ্গে, তারপর থেকে নানা ছলছুতায় করবী ওর সঙ্গে আলাপ ক'রে, আলোচনা ক'রে বন্ধুত্ব জমিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। খানিকটা কৃতকার্য্যও হয়েছে এ বিষয়ে, অন্ততঃ করবী তাই মনে করে। একদিন 'যুগনারী' সম্পাদিকা দীপ্তি দেবীর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিয়েছে আলোকের। একটা ছোট প্রবন্ধও আলোক লিখেছিল 'যুগনারী'তে। এইসব নানা সূত্র ধরে আজ 'যুগনারী'র পঞ্চবার্ষিক জন্মদিনে, চায়ের আসরে আলোকের নিমন্ত্রণ। 'যুগনারী' অবশ্য বৈশাখে জন্মেছিল। কিন্তু জন্মোৎসবটা একটু দেরী করে হচ্ছে, কারণ দীপ্তি দেবী সহরের বাইরে গিয়েছিলেন।

আলোক ওখানে যাবে, নাকি ফোন করে যাবার অক্ষমতা জানাবে, ভাবছিল। অঞ্জনা এসে ধুতি-পাঞ্জাবী দিয়ে বলল,

—যেতে হবে, নইলে আমি যাব কার সঙ্গে?

—তুই আমায় এ-সবের মধ্যে কেন টানছিস, অঞ্জু! তোর দাদা বিয়ে করবে না। বৃথা চেষ্টা করিস নে— বলল আলোক।

—বিয়ে না করলে কি চা খেতে যেতে নেই?

—চা-খাওয়াবার অন্তর্নিহিত শুভেচ্ছাটা তোর অজানা নয়, এমন কি ওতে তোরও চক্রান্ত মেশানো আছে, সন্দেহ করি।

—বেশ, আছে আমারো চক্রান্ত মেশানো। কোনো বোন তার দাদাকে সন্ন্যাসী হতে দিতে চায় না। চলো, কাপড় পর শিগগির—

—সন্ন্যাসী আমি কখনো হব না, অঞ্জু! তবে বিয়েও আমি করবো না। আমি বেরিয়ে পড়বো দেশে দেশে—দেখে বেড়াবো জীবনের শিব, জীবনের শব—জীবনাতীতের সম্ভাবনা!

—বেশ, তা-ই করবে। আপাততঃ ওঠো।

আলোক আর কথা বাড়ালো না; উঠে বেশ বদল করলো। তারপর ট্যাক্সি করে দীপ্তি দেবীর বাড়ী গেল অঞ্জনাকে সঙ্গে নিয়ে।

'লনে' আসন পাতা হয়েছে। করবী, সীমা, দীপ্তি দেবী এবং আরো তিন-চারটি তরুণী বসে। পুরুষ কেউ নেই আলোক ছাড়া।

সকলেই বসেছে, হঠাৎ গেটে গাড়ী দাঁড়ালো; নামলো উৎপলা, বিকাশ, মিঃ সাহা আর বরুণ নামক জনৈক যুবক—সুন্দর চেহারা, সোনার বোতামের উপর হীরাগুলো ঝকমক করছে। উৎপলা আকস্মিক-ভাবে আলোককে দেখে শুধু তাকিয়ে রইল। বিকাশ প্রসন্ন হেসে বলল,

—আলোক, তুই এখানে! এতোকাল পরে?

—কাল অখণ্ড, বিকাশ! ওর পরিমাপ নেই। মরজগতে দেখা না হলে, অমর জগতেও দেখা হতে পারে— হাসলো আলোক কথাটা বলে।

—অবশ্য। তবে সৌভাগ্য যে আমরা সবাই মরজগতেই আছি—কেমন?

—ঠিক বলা যায় না। কে জানে, অ্যাটোম বোম্‌এ আমাদের স্থূল দেহের ধ্বংস হওয়ার পর সূক্ষ্মদেহে এই চায়ের আসর বসিয়েছি কিনা!

সবাই হেসে উঠলো কথাটা শুনে। কিন্তু আলোক না হেসে বলল,

—পৃথিবীর সব মানুষগুলো একসঙ্গে একসেকেণ্ডে যদি স্থূলদেহ ত্যাগ করে, তাহলে তাদের ক্রিয়াশীলতা হয়তো সূক্ষ্মদেহেও ঠিক

তেমনি থাকবে। এই আমরা সব—এই চায়ের আসর, এই কথাবার্ত্তা, প্রেম-মান-অভিমান—

—এর কোনো প্রমাণ আছে, আলোক ?

—প্রমাণ সিনেমার ছবি। অভিনেতা-অভিনেত্রী, সাজসজ্জা সব ধ্বংস পেলেও ফিতেটা আলোতে ফেললেই সব জীবন্ত দেখা যায়।

—যা বলেছেন— মিঃ সাহা কথা বললেন এবার— আমার প্রথম ছবির অনেকেই দেহ রাখলেন, কিন্তু তাঁরা আজো চিত্রগৃহে আনন্দ দিচ্ছেন মানুষকে। কিন্তু আমাদেরকে কেউ এমনি করে ফিল্মএ তুলে রাখছেন নাকি ?—সবাই হাসছে কথা শুনে !

—রাখছেন হয়তো। মহাকালের ষ্টুডিওতে কে জানে কোন্ ডিরেক্টার কোন্ ক্যামেরাম্যানের সাহায্যে ফটো তুলে রাখছেন আমাদের—হয়তো অমরজগতে সেটা আমরা নিজেরাই দেখে খুসী হব, কিম্বা অশ্রু বিসর্জ্জন করবো— আলোক বলল।

বরুণের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন দীপ্তি দেবী। ধনীর পুত্র। বিলাত ঘুরে এসেছেন সম্প্রতি। কিছু লেখার অভ্যাস আছে, —এই যুগনারীতে বেরিয়েছে দু'একটা। করবীর দিকে কিঞ্চিত আগ্রহ বেশী। করবী-ই নিমন্ত্রণ করিয়েছে ওকে এখানে।

আলোক নমস্কার জানিয়ে বলল,

—নতুন কি লিখছেন ?

—মিঃ সাহার সিনেমার জন্য একটা গল্প লিখছি চিত্রলিপির রূপে। আপনাদের কোষগ্রন্থ শেষ হোল ?

—হ্যাঁ, ছাপাও প্রায় হয়ে এল শেষ। এবার একবার ছুটি নিতে হবে।

—ছুটি ? কোথায় যাবেন ?

—নিজের ভেতর। অনেকদিন ওখান ছেড়ে বিদেশে এসে রয়েছি !

—মানে—আত্মানুসন্ধান? সেল্‌ফ্‌ রিয়েলিজেশ্যন।

—কতকটা…

—'সোঽহং' হয়ে উঠবেন নাকি?— করবী অকস্মাৎ বলে ফেললো।

—না, ওতে কোনো আরাম নেই। ও একটা ভুলের আত্মপ্রসাদ। আমি জীব আর জীবনের বহুত্বতে বৈচিত্র্য দেখে আনন্দ পাই। আর, আনন্দের জন্যই সাধনা।— আলোক এক-কথায় জবাব দিল।

কিন্তু এসব আধ্যাত্মিক কথা চলতে দিলেন না দীপ্তি দেবী। তিনি সরাসরি নারী-সমস্যা পাড়লেন এবং সেইটাই অতঃপর আলোচিত হতে লাগলো। করবী-বরুণ-বিকাশ বহু কথা বললেও, আলোক একেবারে চুপ করে রইল সর্ব্বক্ষণ। দীপ্তি দেবী শুধালেন,

—আপনি যে চুপ করে আছেন?

—কারণ, নারী-সম্বন্ধীয় সবকিছু আমার মা'র সঙ্গেই চুকেছে। আর কোনো রূপেই ওঁদের ঘাড়ে করতে চাইনে।— হাসলো আলোক।

চায়ের আসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোক ট্যাক্সি ডেকে অঞ্জনাকে নিয়ে বাড়ী চলে গেল। করবী যাবে বরুণের বিরাট মোটরে। বরুণ অপেক্ষা করছে, কিন্তু করবীর যেন হুঁস নেই। সে বেশ বুঝতে পারল, আলোকের অন্তরে সে একটু আঁচড়ও কাটতে সক্ষম হয়নি। এতক্ষণ ধরে নিজেকে নানাভাবে সে প্রকাশ করতে চেয়েছে—আলোক নির্ব্বিকার ছিল। বরুণকে আজ এখানে ডেকে আনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল তার—আলোককে দেখানো যে, রূপে-গুণে-জ্ঞানে বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই করবীকে লাভ করতে চায়। করবী

বুঝলো, সে উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। কোন্ দিক দিয়ে গেলে আলোককে কিঞ্চিৎমাত্রও প্রভাবিত করা যায়, এ যেন ঠিক বুঝতে পারছে না করবী। অথচ কি এমন দরকার! বরুণ রূপে-গুণে এবং ধন-মর্য্যাদায় আলোকের তুলনায় ইন্দ্রস্বরূপ, তবু করবীর নারীমন কেন-কে-জানে আলোকের পানেই ছুটতে চাইছে—বিয়ে করবার জন্য নয় নিশ্চয়, বিমুগ্ধ করবার জন্যই। কিন্তু আলোক এপর্য্যন্ত সবকিছু এড়িয়ে গেল। প্রবন্ধ দু'একটা সে লিখেছে 'যুগনারী'তে, কিন্তু কোনোটাই সমস্যা নিয়ে নয়। সেগুলো প্রাচীন ভারতনারীর কাহিনী, কিম্বা সংস্কারকে ধরে রাখবার ক্ষমতায় চিরযুগের নারীর শক্তি—এইসব অসমস্যাময় ইতিহাস মাত্র। ওতে আলোককে বুঝবার কোনো সাহায্য হয় না। কে জানে, আলোক কখনো কোনো নারীকে ভালবেসেছিল কিনা। এই বিচিত্র-চরিত্র পুরুষটিকে যেন বুঝতে চাইছে করবীর গোপন অন্তর। কিন্তু কোনো দিক দিয়েই সে সুবিধা করতে পারছে না।

—চলুন তাহলে— বরুণ আহ্বান করলো।

—হ্যাঁ, আমি একটু মার্কেটে যাব। আপনার অসুবিধা হবে না?

—না। কিছুমাত্র না— বরুণ সাগ্রহে বলল।

করবী গিয়ে গাড়ীতে উঠলো বরুণের। উৎপলা এবং মিঃ সাহাও চলে গেছেন। দীপ্তি দেবী এবং সীমা তখনো লনে বসে। সীমা সকলের চলে যাওয়ার পর বলল,

—আপ্-এ খুব গরম পড়েছে, না দীপ্তিদি?

—হ্যাঁ—কেন?

—খোকাটা ওদিকে আছে। একবার দেখে আসতে ইচ্ছে করে।

—তা যাও। গরম পড়েছে তো কী হবে। ওখানেও মানুষ রয়েছে।

—আমার যাওয়ার জন্য নয়। ওর কোনো অসুখ-বিসুখ না হয়!

—যাঁরা ওকে নিয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় সে বিষয়ে ভাবছেন।

—পরের ছেলেকে ঠিক নিজের মত করে কি নেওয়া যায়, দীপ্তিদি?

—তা কি করে জানবো, ভাই?— দীপ্তিদি হেসে বললেন— নিজেরও হয়নি, পরেরও নিইনি—তবে কেউ নিলে তাকে ভালবাসে, মনে হয়।

—হয়তো বাসে। কিন্তু নিজের ছেলেকে যারা নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করে, তাদের দুঃখের তুলনা নেই, দীপ্তিদি!

—নির্ম্মম হলে আবার দুঃখ কি?— হাসলেন দীপ্তি দেবী— নির্ম্মম হতে না পারাই দুঃখ। ত্যাগ করার পর আর তার কথা মনে করা কেন? দত্ত ধনে যেমন কোনো স্বত্ব নেই, ত্যক্ত সন্তানেও তেমনি স্বামিত্ব রাখা উচিত নয়। মমত্ববোধই দুঃখের সৃষ্টি করে, সীমা!

—ওটা দার্শনিক তত্ত্ব, দীপ্তিদি। মমতা-মাতৃত্ব দর্শনের তত্ত্বে আবদ্ধ নেই।

—না,—থাকলে ঐসব মা'দের দুঃখের লাঘব হোত।

—দর্শনের তত্ত্ব মানুষের সৃষ্টি। মাতৃত্ব ঈশ্বরের দান, তাকে অস্বীকার করা অসম্ভব দীপ্তিদি!

সীমার কথায় দীপ্তি দেবী আর কিছু বললেন না। সীমাই আবার বলল,

—ছেলেটাকে ওভাবে ছেড়ে দিয়ে আমি কি ভুল করেছি, দীপ্তিদি?

—না, ওকে যদি ওঁরা মানুষ করেন তো ভুল কেন হবে? ছেলেটি পিতৃপরিচয় পাবে—সমাজের একজন হতে পারবে। তার সত্যি-মা যখন জানবে সে-কথা, তখন আনন্দ তার কম হবে না— মৃদু হাসিমুখেই দীপ্তি দেবী বললেন।

—কিন্তু সে ছেলেতে তার মার আর কোনো স্বত্ব নেই। সে ছেলে কোনোদিন জানবে না, কোন্ অভাগী জননী তার জন্য হাহাকার করছে অবিরাম···

বলতে বলতে সীমার চোখদুটো ভিজে এল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সম্বরণ করতে সে উঠে গেল বাগানের ম্যাগনোলিয়া গাছটার কাছে। মিনিটখানেক পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থেকে বলল,

—একটা ফুল ফুটেছে, দীপ্তিদি—

—নাও, তুলে নাও ওটা—

—না দীপ্তিদি, থাক্। গাছকে ফুল-ছাড়া করা, ছেলেকে মা-ছাড়া করার মতই···

—তুমি দিনকয়েক বাইরে ঘুরে এসো, সীমা—নইলে অসুস্থ হয়ে পড়বে— দীপ্তি দেবী বললেন। সীমাও ধীরে ধীরে এসে বলল,

—আজই যাই—যাই রাত্রের ট্রেনে; সকালে পৌঁছাব। ওখানে ওকে একবার দেখে, চলে যাব দূর কোনো দেশে—সিমলা, না-হয় নৈনিতাল—

—হ্যাঁ, তাই যাও। তবে ছেলে দেখতে নাই-বা যেতে!

—যাব, দীপ্তিদি···যাই একবার। মিনিট-কয়েক থেকেই চলে যাব অন্যত্র··· সীমার চোখে সীমাহীন বেদনা। দীপ্তি দেবী বুঝলেন; বলবার কিছু নেই, তবু বললেন,

—মায়ায় জড়িও না, সীমা। ওতে দুঃখ বাড়বে। উপায় যখন নেই তখন সয়ে যেতে হবে। ওখানে তোমার না যাওয়াই ভাল।

—আমার মিষ্টির ঠোঙাটা ওকে ওরা ছুঁতে দেয়নি দীপ্তিদি!···

বলতে বলতে সীমা অসহ্য বেদনায় অধীর হয়ে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। দীপ্তি দেবী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,

—যাও, ওকে দেখ গিয়ে—

নিজেকে সামলে নিল সীমা। উঠে দাঁড়ালো। তার পর বলল,

—জীবনের অন্ধকার দিকটা ঢেকে আলোতে দাঁড়ানো সবার পক্ষে সহজ হয় না, দীপ্তিদি!

—না, তা হয় না ; আবার অনেকের পক্ষে হয়ও। তোমার মত কোমল-মনা মেয়ের অন্তরে এটা খুবই বড় আঘাত। ছেলেটাকে তুমি নিজের কাছে রাখলেই পারতে—

—তা সম্ভব ছিল না, দীপ্তিদি—তবে বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয়ে না দিয়ে, ওদের কাছে দেওয়া আমার ভুল হয়েছে। যদি উপায় কিছু করতে পারি তো ওকে নিয়ে আসবো।

সীমা চলে গেল।

সহরপ্রান্তের একতালা বাড়ীটার দরজা-জানালা সব বন্ধ। হয়তো পক্ষকাল পূর্ব্বে এ-বাড়ী জনহীন হয়েছে। ফলের বাক্স আর কাপড়েব সুটকেস নিয়ে সীমা হাঁ করে তাকিয়ে রইল বাড়ীর পানে। ওব সাইকেল-রিক্সওয়ালা কাঁধের গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে শুধোলো,

—ক্যা করেগা, মাইজী? ই মকান তো বহুৎ রোজ খালি হো গিয়া।

—হুঁ— সীমা নিশ্চুপ বসে ভাবতে লাগলো। তারপর পাশের বাড়ীতে শুধোলো,

—এঁরা কোথায় গেলেন—এই যাঁরা এখানে ছিলেন?

—তা জানি না। এখানে বিশ্রী গরম আর জলের অভাব হওয়ায় ওঁরা চলে গেছেন দিন পনেরো হোল। পয়সাওয়ালা লোক! কষ্ট করবেন কেন?

—কে কে ছিলেন ওঁরা?— সীমা আবার প্রশ্ন করলো।

—ওঁরা স্বামী-স্ত্রী, আর একটি ছোট বাচ্চা। তাছাড়া চাকর-ঠাকুর ছিল।

—ছেলেটির কি নাম?

—নাম? ভাল নাম তো জানি না। ওকে 'কড়ি' বলে ডাকতেন, শুনেছি।

—'কড়ি'!—সীমার কণ্ঠে বিস্ময়। কড়ি দিয়েই কিনেছে যেন ছেলেটাকে! কিন্তু কড়িও নেয়নি সীমা। তবু সীমা আর কোনো প্রশ্ন করলো না। কোনো হোটেলে গিয়ে দিনটা কাটাবে ভেবে রিক্সওয়ালাকে হুকুম করলো যেতে। রিক্সা চলছে, অকস্মাৎ সীমার মনে পড়লো, এখানে একটা ভারতব্যাপী-নাম-করা সাধনাশ্রমে নির্মলা থাকে। নির্মলা ওর শৈশব-বান্ধবী। সীমা আশ্রমে যেতে বলল রিক্সওয়ালাকে। দীর্ঘ পথ—চড়া রোদ। রাত জাগার জন্য সীমার চোখ লাল হয়ে আছে। অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে তার রোদে। রিক্সা গিয়ে পৌছাল আশ্রমের বড় গেটে। সীমা নেমে নির্মলার সাক্ষাৎ চাইল।

—তিনি তো নেই এখানে। পরশু চলে গেছেন কলকাতা।

সীমা হতাশ হয়ে ওখানেই মহুয়াগাছের তলায় বসে পড়ল। ওর যেন বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে না! কী কুক্ষণে সে বের হয়েছে! কী সে করবে এখন?

আশ্রম থেকে দুটি মেয়ে বেরিয়ে এসে ওকে দেখে বলল,

—নির্মলাদি নেই, তাতে কি হয়েছে? আসুন আপনি। আমরা তো আছি—

—অ্যাঁ, আপনারা আজকের দিনটা থাকতে দেবেন আমায়?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। দু'চার দিন থাকুন না! আসুন—

সীমার সুটকেস আর ফলের চুবড়ী ওরাই বয়ে নিয়ে গেল। সীমাও গেল আশ্রমের ভিতর। ওখানকার মোহান্ত-মহাশয়ের সঙ্গে

তখন অবশ্য দেখা হোল না সীমার, কিন্তু সে এখানের সকলের ব্যবহারে বিশেষ তৃপ্তি বোধ করলো। স্নানাদি সেরে কিছু প্রসাদ পেয়ে সীমা বিশ্রাম করতে করতে ভাবতে লাগলো—এ জীবন সত্যি আরামের! এখানে যেন একটা নিবিড় নিশ্চিন্ততা জমাট হয়ে রয়েছে। পারে তো, দু'চার দিন থেকে যাবে সীমা এখানে।

বিকালে আশ্রম-কন্যারা সীমাকে সমস্ত আশ্রমটা দেখালো। বেশ বড় আকার। থাকেনও অনেক লোক। যোগী, ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণী। নির্ম্মলা এখানে ছিল কয়েক বছর। সম্প্রতি সে কলকাতা গেছে—কবে ফিরবে, জানায় নি। হয়তো এখানে আর ফিরবে না!

নির্ম্মলা ফিরবেনা শুনে সীমার মনটা দমে গেল। ফিরবেনা কেন নির্ম্মলা? প্রশ্নটা ওর অন্তরকে বিচলিত করে তুললো বেশীরকম। তাহলে নির্ম্মলা কি এখানে এমন কিছু পেয়েছে বা দেখেছে, যাতে তার থাকা সম্ভব হোল না? সীমা ভাবতে লাগলো।

সন্ধ্যায় এখানকার মোহান্তের সঙ্গে দেখা হোল সীমার। পঞ্চাশের নীচেই বয়স। সৌম্য-সুন্দর বরবপু যোগীজনোচিত বেশে সুসজ্জিত। অঙ্গে চন্দনগন্ধ। কথা কমই বলেন তিনি। যা বলেন, তা আধ্যাত্মিক রাজ্যের চিরদুর্ব্বোধ্য তত্ত্বকথা। বাইরে থেকে বেশ একটা শান্ত পরিমণ্ডল দৃষ্ট হয়। কিন্তু এতটা শান্তি যেন কেমন অসহ্য হচ্ছে সীমার! সীমা একশো এক টাকা দিয়ে প্রণাম করলো মোহান্তকে। অস্পষ্ট একটা আশীর্ব্বাণী উচ্চারিত হোল তাঁর মুখ থেকে। সীমা বলল,

—আমি এখানে আশ্রয় পেতে পারি প্রভু?

—হাঁ, কাহে নাহি? তুমি তো ব্রহ্মচারিণী আছ, কুমারী?

—হ্যাঁ— সীমা মাথা নীচু করে বলল,— নাহলে কি থাকা যায় না?

—যায়। কিন্তু যে যেমন অবস্থায় আসে, তাকে সেইরকম ভাবেই সাধনা করতে হবে তো? কুমারীরা ব্রহ্মচারিণী থেকে ধর্ম্মসাধন করবেন।

—যদি কোনো পতিতা-পথভ্রষ্টা আসেন ?— সীমা প্রশ্ন করে বসল।

—পতিতা ?—না, এখানে কোনো পতিতাকে স্থান দেওয়া হয় না।

—তাহলে ভগবানের 'পতিতপাবন' নাম কেন ?— সীমা কঠিন কণ্ঠে বলল।

—তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে আমি। এখানকার নিয়ম এই।

সীমা আর কিছু বললো না। চুপ করে খানিক বসে রইল, তারপর উঠে গেল তার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে। ও যাবার সময় মোহান্ত বললেন,

—দীক্ষা দেওয়ার পর তোমাকে আশ্রমের আইনকানুন জানানো হবে।

—সীমা নিজের ঘরে এসে আকাশ-পাতাল ভাবলো। ভাবলো, সাধু-সম্বন্ধে সাবধান হওয়ার কথা কাগজে পড়েছে; পড়েছে সম্প্রতি কয়েকটি আশ্রম-সংক্রান্ত মামলার কথা—আর দেখেছে সে নিজেই—প্রায়ই আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীগণ গৃহত্যাগ ক'রে আশ্রমকেই সংসার বানিয়ে নেন। টাকা-পয়সা তো আসেই, নারীও কম আসে না! হয়তো সে-টাকা ওঁরা সৎকাজেই ব্যয় করেন। কিন্তু সৎকাজ করবার জন্য সংসারেও তো বহু সদ্‌ব্যক্তি আছেন, দেশের সরকার আছে আর আছে বহু সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। আধ্যাত্মিকতার পথে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরলাভ করবার চেষ্টায় যাঁরা সন্ন্যাসী হন, তাঁদের ওসব সৎ-অসৎ কর্ম্ম থেকে সরে থাকাই তো উচিত। সীমার যেন মনে হোল, এখানে ধর্ম্ম না হয়ে ধর্ম্মের বিলাস চলছে। চলছে সস্তা শাস্ত্রবিধির বাহ্যিক চাকচিক্য। দানের মাধ্যমে, সেবার আবরণে এখানে যেন আত্মপূজার আয়োজনই সুপ্রচুর।

কিন্তু সীমা কি এদের প্রতি অবিচার করছে না? অপরাধী হচ্ছে না এরকম কথা ভেবে! এদের সম্বন্ধে কিছুই তো জানেনা সীমা এখনো। কিন্তু সীমা সন্ধ্যাবেলা দেখেছে, যে-দুটি মেয়ের সঙ্গে একঘরে

ওকে থাকতে দেওয়া হয়েছে—তাদের তেল-চিরুণীর মধ্যে সুগন্ধি স্নো-সাবান, তাদের বালিশের নীচে অসাধুপাঠ্য উপন্যাস। সীমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের কাছে এই-ই যথেষ্ট ওদের বুঝবার পক্ষে। কিন্তু তবু সীমা কিছু ভাবলো না; রাত্রে খাওয়াব পর শুযেছে। মনের অশান্তিতে ঘুম আসেনি। দেখল, একটি মেয়ে উঠে কাপড় বদল করে বেরিয়ে গেল। সীমা যে ঘুমায়নি, তা সে টের পেল না। আরও কিছুক্ষণ পরে দেখলো, দ্বিতীয় মেযেটিও কাপড বদলাচ্ছে। সীমা হঠাৎ একটু শব্দ করে ফেলতেই মেয়েটি বলল,—ঘুমান, সীমাদি। মাঝরাতে আমাদের প্রাণায়াম করতে হয়, তাই যাচ্ছি একটু বাইরে। ···

সীমা নিঃসাড় পড়ে রইল, কিন্তু তখনো ঘরের মধ্যের প্রসাধন-গন্ধ ওর নাকে সঞ্চারিত হচ্ছে। সীমার মনে হতে লাগলো, শ্বাসের সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা সাপ যেন ঢুকছে ওর বুকের ভিতর!

সিদ্ধেশ্বরের কাছেই বসল নির্ম্মলা। গাড়ীর সমস্ত লোক ওদের দেখছে। এতক্ষণ সিদ্ধেশ্বর সম্বন্ধে সঠিক কারো কিছু জানা হয়নি; এবার ওর পরিচিতা মেয়েটিকে প্রশ্ন করা যেতে পারবে ভেবে গাড়ীর অনেকেই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। নির্ম্মলা কিন্তু অতি নিম্নকণ্ঠে কথা বলছে সিধুর সঙ্গে। গাড়ী না চললে ওর হয়তো কিছু কথা শোনা যেতো। সবাই দেখলো, নির্ম্মলা শ্রীমন্দিরের প্রসাদী পেঁড়া বের করে সিধুকে প্রসাদ দিল। মাথায় ঠেকিয়ে মুখে দিল সিধু কণিকামাত্র। চলন্ত গাড়ীতে কথা কিছু জোরে না-বললে শোনা যায় না, কিন্তু নির্ম্মলার কথা কেউ-ই শুনতে পাচ্ছেনা আরোহীগণ। জংশন ছেড়েছে গাড়ী

অনেকক্ষণ। অন্য কোনো বড় ষ্টেশনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষাকালে ওরা নির্ম্মলাকে হয়তো প্রশ্ন করবেন সিধুর সম্বন্ধে। কিন্তু নির্ম্মলার কথাই শেষ হচ্ছে না! অবশেষে আসানসোল এল গাড়ী। কিন্তু মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের খরতাপে মানুষের মন ভগবানকে দেখলেও বিদ্রূপ করবে—এমনি অবস্থা! সবাই চুপ করে রইল।

বর্দ্ধমানে বেলা অনেকখানি পড়ে এসেছে। সবাই চা-জল খেতে চান—কেউ নামলেন, কেউ-বা কামরা থেকেই চায়ের ভাঁড় অথবা কেল্‌নারের খাদ্য কিনলেন। সিধু এবং নির্ম্মলা নির্ব্বাক। ওদের সব কথাই ফুরিয়ে গেছে নাকি! সেই মুখর যুবকটি এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে ছিল কোনোরকমে; এবার বলল,

—আমাকে কিছু উপদেশ দেবেন, সাধুজী?

—উপদেশ? কি উপদেশ দেব, বাবা? উপদেশ দেবার তো আমার ক্ষমতা নেই।

—ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু। ভগবানকে লাভ করবার উপায় যদি আমাদেরও থাকে ··

—উপায় সকলেরই আছে, বাবা! কিন্তু আমি তার কি বলবো! আপনি যদি তাঁকে লাভ করতে চান তো তিনিই সে-উপদেশ দেবেন। মানুষের উপদেশে কিছু কাজ হয় না। আপনার অন্তরে যিনি আছেন তিনিই আপনাকে পরিচালনা করেন, এবং সেই 'তিনি' আপনারই স্বরূপ এবং তাঁরও নিজরূপ। তাঁকে ধরুন—অপরের উপদেশে কি হবে!

—শাস্ত্রে সাধু-মোহান্তের কথা তো শুনতে বলা হয়, সাধুজী!

—আপনার ইচ্ছে হয় তো শুনবেন, বাবা, আমি ওসব বলবার মত কিছু নই।

সিধু একেবারে কেটে বাদ দিল কথা-বলা। জানালার দিকে মুখ বাড়ালো। সূর্য্য পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে, তাই পিছনের দিকটায় ছায়া

ঘনিয়ে আসছে, যদিও উত্তাপের প্রচণ্ডতা এখনো কমেনি। এত গরম বহু বৎসর হয়নি এদেশে। এ যেন অস্বাভাবিক একটা তাপতরঙ্গ। রুদ্রদেবতার ধ্বংসকরী মহাশূল যেন দগ্ধ করে দেবে বিশ্বচরাচরকে। মানুষের প্রস্তুত অণুশক্তির প্রয়োগ-পরীক্ষার এটা পরিণাম কিনা, ভাবছেন অনেকে।

উৎপলার বাড়ীতেই এসে উঠবে সিধু, ঠিক ছিল। কিন্তু ওকে নির্ম্মলা টালীগঞ্জে তার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চায়। নির্ম্মলার বাড়ীতে অন্য ভাড়াটে থাকলেও, একখানা কুঠরী সে নিজের জন্য রেখেছে। ওখানেই উঠবে গিয়ে। কিন্তু সিধু নির্ম্মলাদের আশ্রমটি সম্বন্ধে যে-সব কথা শুনলো তাতে নির্ম্মলার সান্নিধ্য ওর আর ভাল লাগছে না। অথচ নির্ম্মলা তার গুরুভগ্নী এবং দীর্ঘদিনের পরিচিত। বহু ব্যাপারেই সে জড়িত ছিল গুরু কর্ণবিজয়ের অবলম্বিত সাধনপন্থায়। সেই নির্ম্মলার এই অবস্থা দেখে দুঃখই পেল সিধু। কিন্তু উৎপলাকেই বা কতটুকু জানে সিধু? নারীচরিত্র চির দুর্জ্ঞেয়। তবু সিধুর মন উঠছেনা নির্ম্মলার বাড়ীতে যাবার জন্য। অবশ্য নির্ম্মলা-যে তার অবস্থান-আশ্রম সম্বন্ধে খোলাখুলি খারাপ কিছু বলেছে, তা নয়। যতটুকু বলেছে, তাতেই সিধুর ধারণা হয়েছে—ওখানে ভাল থেকে মন্দই বেশী হয়। গাড়ী হাওড়ার কাছাকাছি হতেই সিধু যেন জোর করে নির্ম্মলাকে বলল,

—উৎপলা দেবীর বাড়ীতেই আমাকে যেতে দাও, নির্ম্মলা—ওখানেই তো আমার কাজ রয়েছে—

—তাহলে আমাকে কি তুমি ত্যাগ করছো, সিধুদা?— নির্ম্মলার কণ্ঠে কাকুতি।

—ত্যাগের কথা তো ওঠেনা, দিদি! তোমাকে নিরাপদ হতে বলছি।

—তুমি সঙ্গে গেলে আমার অসুবিধাটা কম হয়। ওখানে যারা আছে তারা অন্ততঃ ভাববে যে, আমি আমার গুরুভাইএর সঙ্গে তীর্থে গিয়েছিলাম।

—ঐ সঙ্গে আরো অনেক কিছু তারা ভাবতে পারে, নির্ম্মলা! তাদের ভাবা তুমি রুখতে পারবে না। আমি সঙ্গে গেলে সে-ভাবনা ওদের বাড়তেও পারে।

—আমি অবশ্যি তোমার সঙ্গে দেখা হবার আশা নিয়ে বের হইনি— নির্ম্মলা অসহায়ের অবলম্বন-স্বরূপ আর্ত্তচোখে তাকালো— তবে ঈশ্বর যখন দেখা করিয়ে দিলেন তোমার সঙ্গে, তখন মনে হচ্ছে, তুমি সঙ্গে গেলেই ভাল হয়।

—তুমি-যে ঐ আশ্রমে ছিলে তা তো জানে সকলেই—

—হাঁ, তা জানে। তাতে কোনো ক্ষতি হবে না, সিধুদা! ও আশ্রমের নাম এত বেশী আর ব্যাপক যে, বাইরে থেকে ওকে লোকে 'বৈকুণ্ঠ' মনে করে।

—অনেক আশ্রম সম্বন্ধেই একথা খাটে, নির্ম্মলা— সিধুর কণ্ঠে হতাশ্বাস যেন।

—ভাগ্যের উপর হাত নেই, সিধুদা! নইলে আমি ওখানে যাব কেন?

চোখের জল মুছবার জন্য আঁচলটা দিল নির্ম্মলা চোখে। গাড়ী প্লাটফর্ম্মে ঢুকছে। সিধু নিশ্চুপ বসে। নামবার আয়োজন করার ইচ্ছে হচ্ছেনা তার। মনে হচ্ছে, গাড়ীটা যদি এমনি চলতেই থাকতো তার জীবনভোর তো, বেশ হোত! নামলেই যেন একটা অঘটন ঘটে সিধুর জীবনে। ভগবান যেন সিধুকে এইসব অসহায়া নারীদের কাজে লাগাতেই সৃষ্টি করেছেন।

চিন্তাটা মনে উদয় হতেই সিধুর ঈশ্বর-বিশ্বাসী অন্তর এক অনাস্বাদিত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। ঈশ্বরের প্রয়োজনে সে লাগতে পারছে, এর থেকে জীবনের সার্থকতা আর কি হতে পারে? কাশীতে ঈশ্বর অবন্তীর জন্য সিধুকে ব্যবহার করেছেন, কলকাতায় করেছেন উৎপলার জন্য—আজ আবার ট্রেনের এই কামরায় জগৎকর্ত্তা সিধুকে ব্যবহার

করছেন নির্ম্মলার জন্য! এই তো সিধুর সৌভাগ্য। সিধু বোঝা-মালা গুছিয়ে নিতে নিতে বলল,

—চল, তোমার ওখানেই যাওয়া যাক্···

আনন্দে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল নির্ম্মলার চোখ থেকে। নিজের সামান্য জিনিষ ক'টা হাতে নিতে নিতে সে বলল এতক্ষণে,

—তিনি সত্যি আছেন, সিধুদা ··

—হ্যাঁ, তিনি আছেন। নইলে তাঁর নামে অশ্রুপাতে এত আনন্দ কেন?

—অশ্রুই কি আনন্দের প্রকাশ, সিধুদা? হাসি তাহলে কি?

—হাসি জীবনেব ব্যঙ্গ-বিকৃতি।—চলো—

নির্ম্মলা নামাব পর সিধু তাব ঝোলা নিয়ে নেমে এল প্লাটফর্ম্মে। অতঃপর টালিগঞ্জ যেতে হবে, কিন্তু গাড়ীর সেই যুবকটি সামনে এসে বলল,

—আপনাদের ঠিকানাটা দিন—আমি দেখা করবো।

—দেখা করার সুবিধা হবে না, বাবা, আমি দু'একদিনের মধ্যে এখান-সেখান ঘুরে আমার কাজ সেরেই চলে যাব পশ্চিমে।

—আপনার কাছে আমি দীক্ষা নিতে চাই, সাধুজী!

—আমি দীক্ষা দিই না, বাবা—মাফ করবেন।— সিধু এগোলো।

পিছনের নির্ম্মলা পাশাপাশি এল ওর। কিন্তু যুবকটিও আসছে কাছেই। কোনো কথা তাই কইল না সিধু বা নির্ম্মলা। বাইবে বেরিয়ে নির্ম্মলা একখানা ট্যাক্সি ডেকে চড়ে বসল।

—টাকা আছে তো ভাড়ার?— প্রশ্ন করলো সিধু।

—হ্যাঁ— হাসলো নির্ম্মলা। —উঠে বসো।

ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে ওদের নিয়ে, তখনও সেই যুবকটি দেখছে ট্যাক্সিখানাকে। ট্যাক্সির নম্বরও নিশ্চয় টুকে নিয়েছে সে। সিধু ঠিক করলো, খানিকদূর গিয়েই এ ট্যাক্সি ছেড়ে অন্য টাক্সি করে টালিগঞ্জ যাবে। কারণ ঐ যুবকটি গোয়েন্দা অথবা অন্য কেউ, ঠিক বুঝতে পারছে না সিধু। এসপ্লানেড পৌঁছেই সিধু ছেড়ে দিল ট্যাক্সি। একখানা চলতি বাসে উঠে ওরা টালিগঞ্জে পৌঁছাল। বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে কিছুটা হেঁটে যেতে হবে। যেতে যেতে নির্ম্মলা প্রশ্ন করলো,

—'হাসি'কে জীবনের ব্যঙ্গ কেন বললে, সিধুদা?

—কারণ, সত্যি হাসি দুর্লভ, নির্ম্মলা! মানুষের হাসি তার ভুলের প্রকাশ।

—যেমন?

—যেমন ধর, কেউ আয়নায় নিজের রূপ দেখে হাসলো যৌবনকালে; কিন্তু বার্দ্ধক্যের জীর্ণদেহ আয়নায় দেখে সে প্রথম হাসিটা ভুল বুঝে হাসবে, আবার দ্বিতীয় হাসির ভুল বুঝবে মৃত্যুর পর—যখন সে দেখবে তার বিদেহী সূক্ষ্ম দেহ। কিন্তু এই তিন দেহের কোনোটাই হয়তো তার দেহ নয়—

—আমি সাধারণ হাসির কথা বলছি, সিধুদা— নির্ম্মলা বলল,—আজ দেড় বছর আমি ওখানে ছিলাম, একদিনও সত্যি করে হাসিনি। অথচ আমাকে রোজই বহুবার হাসতে হোত ওদের কাছে—ওগুলো কি জীবনের ব্যঙ্গ?

—ওটা তুমিই ভাল বুঝবে, নির্ম্মলা।—কতদূরে বাড়ী তোমার?

—ঐ তো, মোড়ের ঐ দোতালাটা।

দুজনে এসে উঠলো বাড়ীর দরজায়। এ বাড়ীতে যাঁরা ভাড়াটিয়া থাকেন, তাঁরা চেনেন নির্ম্মলাকে। মাসে মাসে ভাড়ার টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠান। কাজেই নির্ম্মলার কোনো অসুবিধা হোল না। চাবি বের করে নিজের ঘরটা খুলে সে সিধুকে বসতে বলল। ছোট ঘর একতালায়। পাশে [redacted]। ঘরটা বাড়ীর পিছন দিকে। অর্থাৎ বাড়ীর মধ্যে খারাপ ঘরটাই নির্ম্মলা নিজের জন্য রেখেছে। একখানা তক্তাপোষ, একটা আলনা আর দুটো জলচৌকী মাত্র সম্পদ ঘরখানার। ধুলো জমে আছে। নির্ম্মলা একটা জলচৌকী বের করে সিধুকে বসতে দিয়ে ঝাঁট দিতে আরম্ভ করলো ঘরে। কিন্তু বাড়ীর একটি প্রৌঢা মহিলা এসে ওর কাছ থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে বললেন,

-যাও, তুমি গা-হাত ধোও। ওঁকেও ধুতে বল। আমি ঘর সাফ [redacted]ছি।

[redacted]য়ান্ধকার কক্ষটির জানালা খুলে দিতেই কিঞ্চিৎ আলো এসে পড়ল [redacted] সিধু কলতলায় গিয়ে স্নান সেরে এল, তার পর ঐ ঘরেরই একপাশে কম্বল বিছিয়ে পূজাতে বসল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে—সুইচ টেনে দিল নির্ম্মলা।

পূজায় কিন্তু মনঃসংযোগ হচ্ছে না। নির্ম্মলা এখানে কী সম্পর্ক স্থাপন করলো সিধুর সঙ্গে, জানেনা সিধু। নির্ম্মলাকে শুধুতেও ভুলে গেছে। হয়তো নির্ম্মলা এখানে সিধুকে তার স্বামী বলেই পরিচয় দেবে—কিম্বা কী বলবে, কে জানে! যা বলে বলুক, নির্ম্মলাকে নিরাপদ করবার জন্যই এসেছে সিধু এখানে। কিন্তু অন্য একটা চিন্তা সিধুকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তুলছে। সম্মুখে তার পিতৃপুরুষের অর্চ্চিত শালগ্রামশিলা—যে শিলাখণ্ড আপনার অসীম শক্তিতে চরিত্রহীন, লম্পট, গঞ্জিকাসেবী সিদ্ধেশ্বরকে আজ 'সাধু সিদ্ধেশ্বরে' পরিণত করেছে, সেই শিলাখণ্ডে নারায়ণের ধ্যান করতে করতে সিধু ভাবছে,

আধ্যাত্মিকতার অধঃপতন অগাধ অসীম হয়ে উঠলো ভারতে আজ। ধর্ম্ম যে জাতিকে স্মরণাতীত কাল থেকে ধারণ-পোষণ-পালন করে আসছে—সেই ধর্ম্ম আজ শুধু গ্লানিযুক্ত নয়, অবলুপ্ত হতে চলেছে। যে তপোবন-জীবন ভারতীয় মহিমার চিরোজ্জ্বল চন্দ্র-সূর্য্য—সেই জীবনেই আজ নেমেছে অমাবস্যার অন্ধকার। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম আর অনাচার অকথ্য হয়ে উঠছে দিকে দিকে। অথচ সিধু গুরুদেব কর্ণবিজয়ের মুখে বহুবার শুনেছে, ধর্ম্মই ভারতকে ধারণ করে আছে—চিরদিনই থাকবে। এ-ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম এবং মানবাতীত ভাগবতী ধর্ম্ম। কিন্তু আজ ধর্ম্মস্থানে তথা ধার্ম্মিক নামে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে একি দেখছে সিধু! শুধু প্রচার আর প্রলোভনের মাধ্যমে মানুষকে প্রলুব্ধ করার আয়োজন—রিরংসা-বৃত্তির নগ্ন রূপ—কাম-ক্রোধ-লোভ চর্চ্চার চমকপ্রদ মায়াজাল! রাষ্ট্রনেতার মুখের 'সাধু থেকে সাবধান থাকা'র বাণীটি যেন একান্তভাবে সত্য হয়ে উঠলো সিধুর কাছে।

ধর্ম্মের গ্লানি দূর করবার জন্য যুগে যুগে ঈশ্বরের অবতরণের কথা কি বিশ্বাস করবেনা সিধু আজ? অথবা আশা করবে, তিনি নিশ্চয় অবতরণ করবেন! কিন্তু কখন করবেন আর অবতরণ! ভারতীয় ধর্ম্ম নির্ব্বাণ-লাভ করতে চলেছে! মানুষ পশুত্বের নিম্নতম গহ্বরে নেমে যাচ্ছে ক্রমশঃ—হিংস্র হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্ত্তে। যদিও ভারতরাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে আজ সারা পৃথিবীর কল্যাণ-যজ্ঞে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত, তবু দেখা যাচ্ছে—ভারতীয় মানবধর্ম্ম যেন ক্ষীণতর হচ্ছে প্রতিদিন। প্রমাণ, সংবাদপত্রের যে-কোনো দিনের আইন-আদালত সংবাদ। এই তো অবস্থা! অথচ সিধুর ধর্ম্মমত এই যে, সমগ্র ভারতে এক বিরাট অধ্যাত্ম-চেতনা জাগ্রত হয়ে সারা পৃথিবীর মানুষকে দৈবীভাবে পূর্ণ করবে—মানুষ দেবভাবাপন্ন হবে। কিন্তু 'জীব শিব হবে' কথাটাতে কি আর বিশ্বাস করা যায়?

জীবনের রুদ্ররূপ দেখেছে সিধু, কালরূপী রুদ্রকেও দেখে আসছে এই ক'বছর—এখন কে জানে কবে ধ্বংসের মহারুদ্র জাগ্রত হয়ে প্রলয় ঘটিয়ে দেবেন পৃথিবীতে। জীবশূন্য হয়ে যাবে জগৎ। জীবনের জটিলতা আবার আরণ্যক সারল্যে লালিত হবে কোটি কয়েক বছরের পশ্চাদপসরণে!

আত্মরক্ষার জন্য মানুষ সমাজনীতির প্রতিষ্ঠা করেছে আদিমযুগে, রাজনীতিও ওরই প্রেরণায়, অর্থনীতি তারপর ধীরে ধীরে প্রভাবিত করেছে মানবজগৎকে। কিন্তু ধর্ম্মনীতি মানুষের চিরযুগের সম্পদ—বিধাতার করুণার দান। একে কেউ আবিষ্কার করেনি, কেউ প্রতিষ্ঠিত করেনি। মানবধর্ম্ম মানুষের স্বভাবজ। আজ সেই স্বভাববৃত্তিকে রাজনীতি-সমাজনীত-অর্থনীতির জটিলতায় আবর্ত্তিত হতে হচ্ছে অবিরাম। এর পরিণাম কি—কে বলবে?

দীর্ঘশ্বাস পড়ল সিধুর একটা। কিন্তু কী সে করতে পারে! কেই-বা কী করতে পারে? মহাকালের রুদ্ররূপ দেখবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। বেদনামথিত হৃদয়ে সিধু পূজা শেষ করলো।

—একটু জল খান— বাড়ীর সেই বৃদ্ধা মহিলাটি বললেন এতক্ষণে।

—আচ্ছা দিন— সিধু হালুয়ার পাত্রটা নিল; ওতে দু'টুকুরো আম আর একটা রসগোল্লা। নিবেদন করে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করলো সিধু। মহিলাটি বললেন,

—রাত্রে কি সেবা হয়, বাবা?

—কিছু নিয়ম নেই, মা! নিরামিষ খাই আমি। রুটি-ডাল, না-হয় চিঁড়ে-মুড়ি বা ছোলা-ভিজে—

—খানকতক লুচি করে দেব, বাবা?

—না মা, লুচি কেন? আর, খাঁটি ঘি তো পাওয়া যায় না! থাক্—

—না বাবা, ঘি খাঁটি বলতে পারবো না। তাহলে ডাল-রুটিই দেব?

—হ্যাঁ, মা!

মহিলাটি চলে গেলে সিধু ঘরখানা দেখলো। দেখলো, নির্ম্মলা চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার পাশে। সিধু ডাক দিল,

—নির্ম্মলা!

—যাই—

নির্ম্মলা আসতেই সিধু নীচু গলায় প্রশ্ন করলো,

—এদের কাছে তোমার-আমার কী সম্পর্ক—?

—ওরা ভেবে নিয়েছেন, তুমি আমার গুরুদেব।

—তাতে সুবিধে হবে?

—খুব অসুবিধে হবে না।

—বেশ।

উৎপলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সেদিন অঞ্জনার। শুধু পরিচয় মাত্র, অন্য আলাপ বিশেষ কিছু হয়নি। যেটুকু জেনেছে অঞ্জনা উৎপলার সম্বন্ধে তা এই-যে—উৎপলা কুমারী—সে একটা মহিলাশ্রমের কর্ত্রী এবং আরো নানা সমাজসেবার কাজে আত্মসমর্পিতা। অর্থ এবং সম্মান তার প্রচুর। মন্দার-প্রডাক্‌সনের মালিক মিঃ সাহা তার বন্ধু এবং বিকাশবাবু বন্ধুর কিছু হয়তো বেশী—হয়তো কোনো আত্মীয়। কিন্তু উৎপলার সঙ্গে আলোকের সম্পর্ক কী, কিছুই জানতে পারেনি অঞ্জনা। অকস্মাৎ ঐ চায়ের আসরে আলোককে দেখে উৎপলার চোখেমুখে মুহূর্ত্তের জন্য যে মিলন-ব্যঞ্জনা সে লক্ষ্য করেছে, তারই

অনুভূতি ওর প্রখর নারীমনে একটা আশ্বাস জাগাচ্ছে এই কয়দিন। আজ হঠাৎ বলল,

—আচ্ছা দাদা, ঐ উৎপলা মেয়েটি তো তোমাকে ভালই চেনে, মনে হোল।

—মানুষকে চেনা কি অত সোজা রে, অঞ্জু? উৎপলা কতটুকু চেনে আমায়?

—আমি দর্শনশাস্ত্র পড়ছি না এখন— অঞ্জনা রেগে বলল,— আমি বলছি যে, ঐ উৎপলা তোমাকে শুধু চেনে নয়, রীতিমত ভালবাসে। অর্থাৎ···

—অর্থাৎ?— আলোক ঔৎসুক্য দেখালো যেন চোখে।

—অর্থাৎ তুমি রাজী হলে, ও তোমাকে বিয়ে করতে পারে।— হাসল অঞ্জনা।

—ও বহুপূর্ব্বেই মহাকালকে বিয়ে করেছে, জানিস অঞ্জু! ওর জীবন কালস্রোতে-ভেসে-যাওয়া ফেনপুঞ্জ—বিরাট-বিশাল-শুভ্র-সুন্দর···

—শুধু ফেনপুঞ্জ! ওর তাহলে দাম কি? অঞ্জনা বিদ্রূপ করে উঠলো।

—তুই আজও মানুষ হলি নে, অঞ্জনা! তোকে এত লেখাপড়া শেখানো হোল, এত ভাল বরের হাতে দেওয়া হোল—দুটো বাচ্চার মা হলি, এখনো তুই অবোধ রইলি! বর্ত্তমান জগৎটা ফেনার জগৎ—ফাঁপার জগৎ।, 'ফেনা'ই চলছে আধুনিক জগতে, দেখতে পাচ্ছিস না? যত ফাঁপা হবি, ততই নাম-যশ-অর্থ। অর্থে ফেঁপে ওঠ্, যশে ফেঁপে ওঠ্—বিদ্যা না থাক্, বক্তৃতায় ফেঁপে ওঠ্—কাজ না কর্, কাগজে-কলমে ফেঁপে ওঠ্। ফাঁপা চাই—'পুঞ্জীভূত ফেনা' হওয়া চাই! বর্ত্তমান কালস্রোত এমন একটা জায়গায় এসেছে, যেখানে ভূরি-ভূরি ফেনা—

—অর্থাৎ কালসমুদ্রের মোহনায় এসেছে, কেমন ?— অঞ্জনা হেসে বলল,—তাহলে আর দেরী নেই, সবই সমুদ্রে মিশে যাবে—মানে, প্রলয় হবে, নয় কি ?

—এতক্ষণে কিঞ্চিৎ বুদ্ধির কথা বললি। কিন্তু স্রোত সমুদ্রে মিললেও অনেক ফেনা মোহনার মুখে জমা হয়ে থাকে। তার সাদা রং বিবর্ণ হয়ে যায়, স্রোতের পঙ্কিলতাটুকু সঞ্চয় করেই সে জমে পাথর হতে চায়; তাতে সৃষ্টি হয় বিকৃত জীব-জীবন—অবশ্য সে অনেক পরের কথা···

—উৎপলা দেবীকে তাহলে তুমি শুধু 'ফেনা' বলছো ?

—বলবার দরকার কি ? আমি 'সোনা' বললেও সে যা আছে, তাই থাকবে।

—তোমার ধারণার কথা শুধোচ্ছি—

—নারী সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা আমি ছেড়ে দিয়েছি অনেককাল।

—আর, পুরুষ্ সম্বন্ধে ?— হাসলো অঞ্জনা কথাটা বলে।

—আমার প্রয়োজন নেই, অঞ্জু!

—জগৎ সম্বন্ধে ?

—তারই-বা প্রয়োজন কোথায় ?

—তাহলে কী সম্বন্ধে তোমার প্রয়োজন, দাদা ?

—কিছু না, অঞ্জনা! একটা নির্ব্বিকার নিশ্চেষ্টতা আমাকে অধিকার করছে ক্রমশঃ। একে ঔদাসীন্য মনে করিস না—

—কী তাহলে ?— অঞ্জনা কঠিন হয়ে তাকালো আলোকের পানে।

—এও তো একরকমের সাধনা। নিরপেক্ষ দ্রষ্টার আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিচারশীল মনকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে যে শুদ্ধ মন—যে-মনে আমিত্বের অধ্যাসও নেই, সেই মনে অধিষ্ঠিত থাকার সাধনা এটা—

—এতে কার কি লাভ হবে, দাদা ?

—লাভ-অলাভের খতিয়ান তো এতে নেই, বোনটি! তা করলেই তো মনকে বিচারশীল হতে হয়। আর লাভ-অলাভের কর্ত্তা কি তুই-আমি? না কি অন্য কোনো মানুষ? স্বীকার করি, মানুষ বহুকিছু করেছে এই শত শতাব্দীতে। কিন্তু সে লাভ করেছে, কি লোকসান করেছে, কে বলবে সে কথা? তার সরল আরণ্যক জীবনকে তার জটিল আণবিক জীবনের ঘূর্ণিতে এনে সে লাভ করেছে কি অলাভ করেছে, সে জানে না। অতীত দিনে আধুনিক জগৎ যেমন কল্পনার বস্তু ছিল পক্ষিরাজ-ঘোড়া আর পাতালপুরীর রাজকন্যার স্বপ্ন নিয়ে, আজকের বর্ত্তমান জগৎও তেমনই কল্পনা দিয়েই অতীতকে ধারণা করে—বল্কলবাসা ঋষিকন্যার কক্ষে অযুত ঘৃতকুম্ভের হোমাগ্নি-আয়োজনের চিন্তাধারায়। এ-দুয়ের মধ্যে লাভ-অলাভের প্রশ্ন অবান্তর। সে-দিন সে ছিল, আজও সে আছে—এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। লোকসান খেয়ে খেয়ে মানবস্রোত তো দেউলে হয়ে যায়নি?

—তার চর্ব্বি-জ্বালানো প্রদীপ আজ 'নিওন লাইট' হয়েছে, দাদা!

—চর্ব্বি-জ্বালানো মানুষটি নিওন-জ্বালানো দোকানী থেকে কম সুখী ছিল, বলা চলে না।

—কথাটা কিন্তু কোথা থেকে কোথায় চলে এলো। তোমার সঙ্গে কথা-বলার এই মুস্কিল। আমার প্রশ্ন ছিল, উৎপলা দেবী বিয়ে করলেন না কেন?

—সে-কথা উৎপলা দেবীকেই শুধোবে?

—ওর সঙ্গে কোথায় আবার দেখা হবে আমার?

—ওর বাড়ী গেলেই হবে।

—কোথায় বাড়ী? জান তুমি ঠিকানা? ওর শিশু-বিদ্যালয় দেখতে চাই আমি।

—তোমার বরের সঙ্গে যাবে। ঠিকানা ফোন-গাইডে আছে।— যা, চা দে এককাপ। খামোখা কতকগুলো বকালি!

—তুমি বুঝি যাবেনা উৎপলার বাড়ী?

—না। আমার কোনো কাজ নেই ওখানে।

—নিরপেক্ষ দর্শক হিসেবে?— বিদ্রূপ করলো অঞ্জনা হাসি দিয়ে।

—ওখানে দর্শনীয় কিছু নেই—শুধু ফেনা! আমি জলের স্রোত দেখবো, তরঙ্গ দেখবো—

—বিচার করছো তুমি, দাদা— অঞ্জনা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে বলল।

আলোক তাকালো ওর মুখপানে। তারপর হেসে বলল,

—তুই আমার যোগ্যা শিষ্যা। সত্যি বিচার করা হয়ে গেল এবার। আমি হার মানলাম। কিন্তু আমি তো এখনো সিদ্ধিলাভ করিনি, সাধনা করছি। যা, চা দে—

—হার স্বীকার করলেই হবে না, আমায় নিয়ে যেতে হবে উৎপলা দেবীর বাড়ী।

—আচ্ছা। কবে যাবি?

—আজই। উনি বাড়ী আছেন কিনা, তুমি ফোন করে জেনে নাও।

—এত ব্যস্ত কেন রে, অঞ্জু?

—ওঁর সঙ্গে কথা বলবো আমি। আমার মনে হচ্ছে, উনি তোমায় খুব বেশী ভালবাসেন—অবশ্য তোমার সঙ্গে কোনো কথা আমি ওঁর হতে দেখিনি। কিন্তু…

—কিন্তু?

—উনি যেন তোমাকে দেখেই পরম আনন্দ পাচ্ছিলেন। যেন ভাবছিলেন, উনি তোমার মধ্যে একটা বিশেষ আশ্রয় পেয়েছেন। প্রত্যেকটি কথা বলে উনি তোমারই মুখপানে তাকাচ্ছিলেন, তোমার

সমর্থন আছে কিনা জানবার জন্য। অথচ দেখলাম, ওঁর সঙ্গে যারা এলেন, মিঃ সাহা বা বিকাশবাবু, উনি তাঁদের গ্রাহ্যও করেন না।

—আমি চুপ করে ছিলাম বলেই হয়তো ওর আগ্রহ বেশী হয়েছিল, অঞ্জনা।

—এরকম হয় না, দাদা। তোমার সমর্থন যেন ওঁর বুকের শ্বাস বলে বোধ হচ্ছিল। অন্ততঃ আমি একবার অনুসন্ধান করবো, উনি তোমায় কি ভাবে দেখেন।

—দেখে কি হবে ?

—অন্ততঃ জানা হবে উনি সবটা ফেনা নন ; ফেনার ভেতর হয়তো বাহিত হয়ে আসছে একখণ্ড হীরে—

—হীরক অদাহ্য, অদ্রবণীয়। অলঙ্করণে তার শোভা, অন্ন-পানীয়ে সে মূল্যহীন, অঞ্জনা !

—আমি না-হয় অলঙ্কার রূপেই ওকে ব্যবহার করবো।—এসো, চা খাও।

অঞ্জনা চাকরের হাত থেকে ট্রে নিয়ে চা তৈরী করলো ; দিল আলোককে। ওর বড় মেয়েটা খেলা করছিল, এতক্ষণে এসে বসল আলোকের কোলে ; বলল,

—মামা, খাব টা···

—খাও।— আলোক একটা বাটিতে ঢেলে খানিক দিল ওকে। অঞ্জনা বলল,

—আমি কাপড় বদলে আসি। ট্রামেই যাওয়া যাবে তো ?

—না, ট্যাক্সি করবো।— যা—কাপড় পর। বাবার মত্ নিয়ে আয়—

—বাবা অমত্ করবেন না— চলে গেল অঞ্জনা কাপড় পরতে।

অঞ্জনার মেয়েটা কোলে বসে চা খাচ্ছে আর কথা বলছে কত কি ! শিশুর মুখের আধো-উচ্চারিত অসংলগ্ন কথা চিরদিন মানুষকে আনন্দ

দিয়েছে। এই আধো-উচ্চারিত কথা, এই অর্দ্ধস্ফুট জ্ঞান একদিন পরিপূর্ণ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠবে পূর্ণত্বে—সেদিন এই শিশুর মধ্যেই কত ছলাকলা, কত কামনা-কলুষতা, কত কর্ম্ম আর ধর্ম্মসাধনার জাগরণ ঘটবে তার ইয়ত্তা নেই। আজকের এই নিষ্পাপ শিশুর আনন্দ-প্রতিমা ভবিষ্যতের কেমন মানবত্বে রূপ নেবে, কেউ জানে না। অথচ সকলেই জানে, এই শিশুর মন একদিন মননের জটিলতায় নিবিড় হয়ে উঠবে। অতি নিকটের নিত্য ঘটনা বলেই মানুষ অনুভব করেনা এই সত্য গভীরভাবে। আলোক ভাবছে···এই শিশু-জীবন হয়তো আগামী শতাব্দীর এক অতিমানবীয় যুগ-জীবন হবে। যে-ভাব, যে-চিন্তা আলোকদের আমলে আবিষ্কৃত হয়নি, এদের জীবনকালে সেইসব চিন্তা জগৎকে প্রভাবিত করবে—গঠন করবে নতুন এক পৃথিবী, কিম্বা হয়তো পৃথিবীর শেষ 'ইজ্‌ম্' এসে গেছে আলোকদের আমলেই। এবার অ্যাটম-বোমার ধ্বংস-শক্তির মধ্যে জাগরণ হবে এক মহাশান্তিময়-ইজ্‌ম্‌এর, যার অবাধ ক্রমোন্নয়নে থাকবে শুধু প্রকৃতির ধীর হস্ত—নির্ম্মম, নিখুঁৎ, নিশ্চিত পরিণাম!

আগামী সহস্রাব্দীর সেই পরিণামটা কল্পনা করতে গিয়ে আলোকের মস্তিষ্কে একটা 'প্লট' এসে গেল অকস্মাৎ। একটা বিশেষ ধরণের চিন্তাধারা, যার সম্পূর্ণ রূপ তখনো ও ধরতে পারছে না। এ যেন বহু-দূরবর্ত্তী পর্ব্বতচূড়া—কুয়াশাচ্ছন্ন, কিন্তু নির্ভুল। আর একটু পরিষ্কার ভাবে দেখতে পেলেই আলোক ঐ ছবিটা আঁকবে, ঠিক করলো। কোষগ্রন্থ-সংকলনে দীর্ঘদিন কেটেছে, বহুদিন সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বাইরে রয়েছে আলোক—আর একবার ঢুকবে নাকি ওখানে?—চিন্তাটা মনে আসতেই আলোক হেসে উঠলো।

—কি হোল, দাদা? আমি কিছু বেশী সাজসজ্জা করেছি নাকি?—অঞ্জনা এসে দাঁড়ালো কাছে।

—না। আগামী শতাব্দীতে এই মেয়েটার জীবন কিরকম জগতে এসে দাঁড়াবে, তাই কল্পনা করে হাসি পেল— আলোক হাসতে-হাসতেই জবাব দিল অঞ্জনাকে।

—আগামী শতাব্দীর দেরী আছে, দাদা! বৌদ্ধাব্দ আড়াই-হাজার, খৃষ্টাব্দ মাত্র উনিশশো-পঞ্চান্ন—ততদিনে ও বুড়ী হয়ে যাবে···

—বুড়ী হলেও দেখবে সে-যুগ—আর, থাকবে ওর তরুণ সন্তানদল! আগামী শতাব্দীতে জীবনের দেবতা হয়তো নিষ্করুণ মহারুদ্রের রূপে প্রতিভাত হবেন, হয়তো সে-জীবন হবে অতিমানবিক, কিম্বা পারমাণবিক—হয়তো, সেদিন সবাই হয়ে যাবে যান্ত্রিক—অথবা জৈব, কিম্বা জীবাঙ্কুর···

—যা-হয় হবে। চলো এখন— চাকরকে ডেকে অঞ্জনা মেয়েটাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে বলল।

ছোটটা ঝিব কোলে আছে। আলোক পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়েই বেরিয়ে এল।

—চল, রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সি ডেকে নেব— বেরুলো দুজনে।

—ফোন করেছ?

—না, কি দরকার? উৎপলা বাড়ী না থাকে, ফিবে আসবো।

ষ্ট্যাণ্ডে এসে ট্যাক্সি চড়ে চললো ওরা। মোড়ের মাথায় প্রকাণ্ড হাউসে 'জরদ্গব' ছবির ভীড় চলছে। লম্বা লাইন দিয়েছে সব টিকিট কিনবার জন্য।

—এই ছবিটা একদিন দেখতে হবে, দাদা— অঞ্জনা বলল।

—তোর বরের সঙ্গে দেখবি গিয়ে।

—তোমার সঙ্গেই দেখতে হবে। ও বড় বাজে সমালোচনা করে।

—স্বামী-নিন্দা ভারতনারীর পক্ষে পাপ···

—হোক্‌গে! সত্যিকথা বলার পুণ্যে পাপটা কেটে যাবে— হাসল অঞ্জনা।

—চল, তাহলে আজকেই তোকে ছবিটা দেখিয়ে দিই।—এই ড্রাইভার, রোখো—

আলোক ট্যাক্সি থামিয়ে নামালো অঞ্জনাকে। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সটান এসে বেশী দামের টিকিট কিনে বসল দোতালার আসনে। অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে ছবিখানা ওর তরল হাসির আবেদনে। মানুষ যেন ভারী কিছু আর চিন্তা করতে চায় না—হালকা আমোদ, ইতর রসিকতা আর সস্তা গল্পই ওদের প্রিয় আজ। এর চেয়ে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পের যুগ হয়তো চিন্তাশীল ছিল—চেতনশীল ছিল আত্মানুসন্ধানে।

আলোক নিশ্চুপ বসে রইল সমস্ত সময়টা। অঞ্জনা ছবি শেষ হলে শুধোলো,

—কেমন লাগলো, দাদা?

—আমার কিছু লাগে না, অঞ্জনা—শুধু দেখি। এই যুগকে দু'চোখ ভরে দেখছি। আগামী যুগ দেখতে যদি বেঁচে থাকি তো দেখবো—আমি নিরপেক্ষ, নির্ব্বিকার!

—এই নিরপেক্ষ দর্শন দিয়ে তুমি একটা গল্প লেখ-না, দাদা—ভাল হবে।

—লিখতে গেলে পক্ষপাত এসে যেতে পারে, অঞ্জু! সাধারণ মানুষ তার সৃষ্টির উপর স্নেহশীল হতে বাধ্য।

—না, তুমি হবে না। যদি হও তো, আমি সেটা ধরিয়ে দেব। তোমার কাছে যে-শিক্ষা আমি পেয়েছি, তাতে ও-কাজ আমি করতে পারবো—বিশ্বাস কর তো?

—করি। কিন্তু কী হবে লিখে? দরদী মনের সৃষ্টিই মানুষের দরদ আকর্ষণ করে, অঞ্জনা!

—কিন্তু, আগামী যুগ হয়তো অনাসক্ত মনের সৃজন-শক্তিকেই অভিনন্দন দেবে।

—সে-দিন সত্যি বিশ্ব-সাহিত্য রচিত হবে, অঞ্জনা—যুগসাহিত্য সে-দিনই রূপ পাবে জগতে!

—এমন সাহিত্য কি হয়নি জগতে সৃষ্টি?

—হয়েছে। বাল্মীকির মন দরদী মন—সে সৃষ্টি প্রতি মানবের অন্তরে প্রত্যক্ষ বেদনার রস ঘনীভূত করে তোলে। কিন্তু ব্যাসের মন অনাসক্ত স্রষ্টার মন—সে-সৃষ্টির বিরাট বৈচিত্র্যে প্রত্যক্ষ দরদ খুঁজে পাওয়া যায় না। বাল্মীকি সীতার পিতা, ব্যাস দ্রৌপদীর কেউ নন, শুধু স্রষ্টা; বাল্মীকির রাবণ প্রত্যক্ষ অভিশাপ, ব্যাসের দুর্য্যোধন অপ্রত্যক্ষ বিপ্লব; বাল্মীকির সৃষ্টিতে স্রষ্টা সর্ব্বত্র সহানুভূতি নিয়ে চলেছেন,—ব্যাসের সৃষ্টিতে তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

—তাহলে রামায়ণকে তুমি ছোটো করছো?

—না, অঞ্জনা। আমার ছোট-বড় করবার কোনো অধিকার নেই। দুটিই মহান সৃষ্টি, দুটিই মানব-অন্তরের অপরিসীম ঐশ্বর্য্য। আমি শুধু দরদী সৃষ্টি আর অনাসক্ত সৃষ্টির তফাৎ দেখছি, ঠিক অনাসক্ত দ্রষ্টার মতই। রামায়ণ বা মহাভারত, কোনোটার উপরই আমার পক্ষপাতিত্ব নেই। আমি দেখছি, মহাভারতের যুগ অনাসক্তির যুগ। সঞ্জয় থেকে শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত সকলেই অনাসক্ত স্রষ্টা। এই সৃষ্টির যেন আবার প্রয়োজন হয়েছে পৃথিবীতে। নিস্পৃহ, মোহ-মমতাহীন হয়ে মানুষের জীবনকে সাহিত্যে রূপায়িত করার দরকার আজ। আজ চলেছে দরদহীন পৃথিবীতে মেকী সাহিত্যের কদর—জাতিতত্ত্বে বিচ্ছিন্ন পৃথিবীতে একজাতিত্বের বাগ্মিতা-রূপ অশ্বডিম্ব—পঞ্চকল্যাণের পশ্চাতে পঞ্চাশৎ অকল্যাণের আস্ফালন! কিন্তু শিগগির হয়তো এমন একদিন আসবে, যেদিন নিরাসক্ত ঋষিদৃষ্টি মানুষকে

সত্যজ্ঞান দিয়ে দেখিয়ে দেবে—জীবন কী? জীবনের রুদ্রদেবতার কোথায় অবস্থান।

অঞ্জনা হাসিমুখে শুনছিল; এতক্ষণে বলল,

—তুমি লেখ দাদা ঐরকম কিছু—

—লেখার আসক্তিটাই ওখানে বাধা, অঞ্জনা! দ্রষ্টা হলেই স্রষ্টা হয় না। স্রষ্টাকে এখানে অনাসক্ত হতে হবে।

—আমি জানি তুমি স্রষ্টা, এবং অনাসক্ত,—লেখ তুমি।

—তোর মধ্যে পৃথিবী-জননীর আবেদন শুনছি! আমি না লিখলেও হয়তো কোনো লেখক লিখবে সে সাহিত্য, যা হবে অনাসক্ত লেখনীর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য।

'জরদ্গব' ছবির অসাধারণ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মিঃ সাহা নতুন একটা কিছু করবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছেন। এই উদ্দেশ্যে উৎপলার বাড়ীতে চায়ের আসরে আলোচনা-সভা বসেছে তাঁদের। বিকাশ, বরুণ, মিঃ সাহা একদিকে আর উৎপলা একা অন্য দিকে। অপর কেউ উপস্থিত নেই; কারণ এসব বৈষয়িক ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয়। বরুণ গল্প-লেখক হিসাবে বর্ত্তমানে দলের লোক, আর অন্য সকলেই কোম্পানীর অংশীদার। মিঃ ম্যাকু এখনো পৌছাননি।

—বর্ত্তমান জগৎ সিনেমার জগৎ; যুগের চিন্তা আজ ওরই মাধ্যমে অভিব্যক্ত হচ্ছে।— বিকাশ বলল।

—যুগের চিন্তাকে অতো খাটো করে দেখতে ব্যথা বোধ করি আমি— উৎপলা বলল।

—তোমার ব্যথা-আনন্দে কিছু যায়-আসে না, উৎপলা! কথাটা সত্যি।— বিকাশের কণ্ঠ দৃঢ়।

—না— উৎপলার স্বর দৃঢ়তর— সত্যি নয়। যুগঋষি শ্রীঅরবিন্দ সিনেমা দেখে যোগসাধনা করেন নি। বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন সিনেমা দেখে প্রভাবিত হন নি। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে ভারতের শ্রেষ্ঠ জননায়ক শ্রীনেহেরু বা স্যার রাধাকৃষ্ণন্ তোমাদের সিনেমার চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হন—এই কথা তুমি বলতে চাও?

—না, আমি জনসাধারণের কথা বলছি।

—জনসাধারণের একটা অপরিণামদর্শী অংশ তোমাদের সিনেমা-শিল্পের ক্রীতদাস। তাদের বিলাস-বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে তোমরা দু'পয়সা করে খাচ্ছ—এই মাত্র সিনেমার দাম। এর জন্য এত বাড়াবাড়ি প্রশংসা করার কি দরকার!— হাসলো উৎপলা; বলল,—সিনেমা-শিল্প বিকৃত জীবনের ছায়া—জৈবধর্মের প্রকাশ মাত্র। ও দিয়ে ব্যবসা হয়, টাকা রোজগার হয়, আর কতকগুলো তরুণ-তরুণীর জীবন জ্বালাময় করে তোলা হয়। সুস্থ-সুন্দর মানবত্ব দিয়ে 'সিনেমা' হচ্ছে না—হচ্ছে, জীবনের বিকৃতি দিয়ে, না-হয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ দিয়ে।

—সিনেমায় কি মানবতার আবেদন থাকেনা বলছো?— বিকাশ প্রশ্ন করলো।

—থাকতে দাও কোথায়? 'জরদ্গব' পয়সা আনে, 'জলদর্চ্চি' হয়তো হতাশ করবে তোমাদের। মানুষের ক্লান্ত মনকে আড়াই ঘণ্টার মেকী আনন্দে মশগুল রাখ তোমরা ছবির জৈব নেশায়—জীবনের ধ্যান তাতে থাকে কতটুকু? যা-বা থাকে, তাও বিকৃত জীবন—অসত্য জীবন, অবাস্তব, না-হয় অতিবাস্তব জীবন। একে যুগের চিন্তা বলে চালাতে যাওয়া মিথ্যার উপাসনা।

চা ঢেলে দিল উৎপলা সকলকে। ওর কথার স্ফুলিঙ্গ যেন বিদ্ধ করছে শ্রোতাদের। কী যে চাইছে উৎপলা, ওরা কেউ বুঝতে পারছে না। বরুণ বলল,

—মানবতার আবেদন যাতে আছে, এমন গল্প কি আপনার পছন্দ হবে?

—কে লিখবে সে গল্প? ভুয়ো, মেকী মানবতার গল্প আমি চাই না। বক্তৃতা-সার কতকগুলো চরিত্র, সেবা-সঙ্ঘ আর চাঁদা-আদায়ের খাতা দেখিয়ে মানবতা ফোটানো যায় না,—পথের পাশের ভিক্ষুককে পয়সা-দেওয়া দেখিয়েও না,—নিরাশ্রয়া অবলাকে আশ্রয় দিয়ে তাকে সিনেমার জাহান্নমে ঠেলে দেওয়াতেও না···

—কিসে ফোটে তাহলে?— প্রশ্নটা করলো বিকাশ; প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ রয়েছে কণ্ঠে তার।

—কিসে ফোটে, আমি জানি না। তবে ওগুলোতে ফোটে না, এটা নিশ্চয়।— উৎপলা সংযত কণ্ঠেই বলল,— কিসে হয় তা জানেন শিল্পী, সাহিত্যিক, স্রষ্টা—স্রষ্টা যিনি জীবনের—এবং শিল্পের···

—আলোক হয়তো এর জবাব দিতে পারে। সেদিন দীপ্তি দেবীর চায়ের আসরে কথাটা উঠলে, তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারতো! কি বল?— সুস্পষ্ট বিদ্রূপ এবার বিকাশের ভাষায়।

—আমাদের পরিচিতের পরিধিতে যদি কেউ এর জবাব দিতে পারে, তাহলে আলোকই সেই ব্যক্তি, বিকাশ! তাকে বিদ্রূপ করে ছোট করা যায় না। সে যে তোমার থেকে অনেক বড় তা তোমার ঈর্ষাই প্রকাশ করে দিচ্ছে। দীর্ঘকাল তাকে দেখিনি আমরা, তোমার মুখে তার নামও শোনা যায়নি—আজ হঠাৎ তার কথা কেন তুললে?

—তোমার মনে তার ঠাঁই কোথায় তাই জানবার জন্য।— বিকাশ হাসছে।

—তোমাকে বহুদিন পূর্ব্বেই জানিয়েছি, আলোককে আমি ভালবাসি। সে ভালবাসার মহিমা তুমি বুঝবে না বলে, তোমাকে আর বেশী কিছু বলতে চাই না। শুধু জেনে রাখ, আলোকের অসম্মান আমি সহ্য করবো না··· উৎপলার কণ্ঠ সতেজ।

—যাক্, যাক্—যেতে দিন, যেতে দিন— মিঃ সাহা থামাতে চাইলেন— আলোকবাবু সত্যি অসাধারণ ব্যক্তি, এ সত্য আমি একমুহূর্ত্তে বুঝেছিলাম। আপনি যদি তাঁকে ভালবেসে থাকেন, উৎপলা দেবী, তাহলে নিশ্চয় আপনার প্রেম অপাত্রে অর্পিত হয়নি।

—অর্পণ আমি কিছু করিনি, মিঃ সাহা, আমার ভালবাসা আমার নিজের জন্যই। সূর্য্যকে আমরা কী দিতে পারি? তাকে ভালবাসা আমাদের পক্ষে অনিবার্য্য—আমার জীবনে আলোক সেই সূর্য্য! এ সত্য বিকাশ জানে, আজ আপনারাও জানলেন।

—কথাটা আমিও জানতাম— মিঃ ম্যাকু কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন; বললেন।

—আপনি জানতেন! আপনি তো মানব-চরিত্রের রিরংসার দিকটাই দেখতে জানেন! মানুষ যে সুস্থ-সুন্দর প্রেমের গৌরব বহন করে, এ সত্য আপনার জানার কথা নয়। মিঃ ম্যাকু, আপনারই কদর্য্য সন্দেহ থেকে আমাকে মুক্ত করতে আলোক চলে গেছে, জানেন? আলোকের-আমার সম্পর্ক নিয়ে মিথ্যা কুৎসা আপনার মনঃকল্পিত কদর্য্যতা!

কথার উষ্মা উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। আলোচনা-সভা আঘাত-প্রতিঘাতের যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠছে। উৎপলা কাউকে খাতির ক'রে কথা কোনোদিন বলে না। আজও বলবে না, এ জানা কথা। মিঃ সাহা বিজ্ঞ এবং বয়স্ক; সব দিক বজায় রেখে বললেন,

—এসব ব্যাপার ব্যক্তিগত। আমাদের এখানেই থামা উচিত, পলা দেবী! আমি প্রস্তাব করি, আলোকবাবুকে আহ্বান করে তাঁর পরামর্শ আমরা গ্রহণ করবো।

—আহ্বান আপনারা করতে পারেন, আসবেন কিনা, তিনি জানেন— উৎপলা বলল আস্তে।

মিঃ ম্যাকুর অপমান-বোধ অত্যন্ত কম; কিম্বা বোধ থাকলেও বহিঃপ্রকাশ নেই। উৎপলার কথাটাকে লুফে নিয়ে দন্তহীন মুখের হাসি ফুটিয়ে চীৎকার করলেন,

—নিশ্চয় আসবেন। আমি গিয়ে ডেকে আনবো। আপনি ঠিকানাটা দিন—

—ঠিকানা জানি না আমি— উৎপলা চায়ের বাটি এগিয়ে দিল মিঃ ম্যাকুকে।

—সেকি! সেদিন অতক্ষণ কথা বললেন তাঁর সঙ্গে?

—না। আলোকের সঙ্গে কোনো কথা কইনি আমি। এমনকি ওর সঙ্গিনীর সঙ্গেও না। শুধু করবীর কথায় জানলাম, মেয়েটির নাম অঞ্জনা। আলোকের বোন।

—খুবই শিক্ষিতা মেয়ে মনে হোল— বরুণ বলল।

—আলোকের বোন হতে হলে ওর কমে হয় না, বরুণবাবু··· উৎপলা হেসে বলল।

—কিন্তু, বোন ভাইএর যোগ্যা হয়ে নাও জন্মাতে পারে, পলাদি!— বরুণ হাসল।

—এইজন্যই ঈশ্বর ওকে সহোদরা দেননি। ও-বোন পাতানো বোন।

—পাতানো! তাহলে বান্ধবী বলুন — বরুণের চোখে বিদ্রূপের আমেজ।

—না— উৎপলা যেন গর্জ্জন করলো— আলোকের বোন পাতানো হলেও বোন। যে তাকে দাদা বলবে—তার বোন হবার যোগ্যতা থাকতে হবে, বান্ধবী হবার নয়। অবশ্য, বোন বান্ধবীও—কিন্তু আগে বোন, তারপর বান্ধবী। আপনি আলোককে চেনেন না, বরুণবাবু! তার সান্নিধ্য পেলে আপনার সাহিত্য-জীবন সুন্দরতর হতে পারে,—পারেন তো আলাপ করবেন।— শেষের দিকে উৎপলার স্বর স্নেহমণ্ডিত।

—তাহলে ঠিকানার কি হবে?— মিঃ ম্যাকুর যেন সর্ব্বনাশ হয়েছে, এমনি ভাব।

—কিছু না,—দীপ্তি দেবীকে ফোন করলেই হবে। করবীও বলে দিতে পারে ঠিকানা।

—তাহলে আমি এখুনি দেখি··· বলেই মিঃ ম্যাকু চলে গেলেন ফোন করতে।

উৎপলা হাসলো ওর যাওয়ার পানে তাকিয়ে। বরুণ বলল,

—মানুষ যা চায়, আমাদের সেই রকম ছবি পরিবেশন করতে হয়, পলাদি···

—মানুষ কী চায়, আপনি ঠিক জানেন না। পোলাও না পেলে, পোড়া মুড়িতে সে পেট ভরায়! আবার, পোড়া মুড়ি পোলাওএর থেকে ভালবাসে, এমন বিকৃত-রুচির লোকও আছে পৃথিবীতে। এই মানুষই একদিন বেদ-উপনিষদ-ব্রহ্মবিদ্যা-পরাবিদ্যা চেয়েছে, আজও এই মানুষ বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব আলোচনায় আনন্দ পায়, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে, আত্মতত্ত্ব অধিগত করে, আবার 'জরদ্গবের' মত ভাঁড়ামীর ছবি দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে—পকেট খালি করে পয়সা ঢালে। কিন্তু চায় সে কী, তা এতে জানা যায় না—

—আপনি কী দিতে চান তাদের?— মিঃ সাহা প্রশ্ন করলেন এবার।

—ঐ আড়াই ঘণ্টায় বিশেষ কিছু দেওয়া যায় না। পর পর কয়েকটা ছবি যদি তৈরী করা যায়, তাহলে হয়তো জীবনের সুরভিত অর্ঘ্য ওদের দান করা যেতে পারে। মানবত্ববোধের নীতিকথা নয়, মানবজীবনের সাবলীল সত্যরূপ—যা প্রেমে মহান, ক্ষমায় সুন্দর; লোভে-পাপে পথভ্রষ্ট হলেও, কুন্তীর মত জননী, কর্ণের মত করুণাময়, রাবণের মত প্রতাপশালী, রামের মত বীর্য্যবান দুর্য্যোধনের মত আত্মমর্য্যাদাশীল,—যার জীবন নীতির বক্তৃতায় নয়, জীবনের নিত্য দিনে বিকশিত হয় শতদলের মত—যার গন্ধ যুগের পর যুগ বিস্তৃত হয়ে চলে, যার আবেদন অন্তহীন কালে অনশ্বর···

উৎপলা আরো বলতো, কিন্তু অকস্মাৎ নিজেকে সংযত করে নিল। ওর কথা-বলার ভঙ্গী আলোকের কাছে শেখা। যখন কথা বলে, নিজেকে যেন ঢেলে দেয় কথার মধ্যে। তাই ওর বলার ভঙ্গী সকলের ভাল লাগে। কিন্তু মিঃ ম্যাকু ফিরে আসছেন হাসিমুখে; বললেন,

—ঠিকানা পেলাম আলোকের। ও তো সেখানে প্রুফ-রিডারের কাজ করে—অতি সামান্য বেতন পায়। খাওয়া, থাকা আর যৎকিঞ্চিৎ হাত-খরচ। ওকে ডেকে আনা কঠিন কি?

—পয়সার মাপকাঠিতে অবশ্য কথাটা সত্যি— উৎপলা বলল,— বেশ, ডেকে আনবেন! কিন্তু মিঃ ম্যাকু, আপনি আলোক সম্বন্ধে অত হীন ধারণা পোষণ করেন কেন? বনের বাঘ উপোস থাকে, তবু সে বাঘ—চিড়িয়াখানায় তাকে ডেকে আনা যায় না দৈনিক মাংসের বরাদ্দ দেখিয়ে। আলোক মাত্র প্রুফ-রিডার—এ কথা বলতে আপনার লজ্জা করলো না! মানুষকে সম্মান করবেন— উৎপলা উপদেশ দিল।

—না—না, আই মিন্— মিঃ ম্যাকু আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাইছেন, —আমি কথাটা কিছু ভেবে বলিনি···ওখানে করবী নামে সেই মেয়েটি

বললেন আমাকে—বললেন যে, অঞ্জনার বাবার কোষগ্রন্থ ছাপার কাজে সাহায্য করেন আলোকবাবু···

—হ্যাঁ, হয়তো করেন—তাতে তাঁকে অশ্রদ্ধা করবার কি আছে? প্রুফ-রিডাররাও মানুষ। আর আলোক যে কাজে সাহায্য করে, সে কাজ তার যোগ্য কাজ নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ,—তা তো বটেই— মিঃ ম্যাকু দন্তহীন হাসি দিয়ে নিজেকে ঢাকলেন।— আমি আজ-ই যাব সন্ধ্যায় ওখানে;—কালই ওকে ধরে আনবো এখানে।

—যাবেন— উৎপলা আর কিছু না বলে আর একবাপ ক'রে চা দিল সকলকে।

অতঃপর ঠিক হোল যে, আগামী কালও আবার আলোচনা হবে। 'জরদ্গব' বহু টাকা এনেছে, তাই এবার মহান একটা কিছু করবার জন্য এঁদের চেষ্টা। কিন্তু ঐ সঙ্গে সাধারণ কিছুও করতে হবে, নইলে ব্যবসা চলে না—তাই মিঃ সাহা বরুণকে হাতে রেখেছেন। বরুণ হালকা হাসির গল্প ভালই লিখতে পারে, যদিও সে গল্প বিদেশী গল্পের চুরি; কিন্তু বাজারে চললেই মিঃ সাহা খুসী।

মিঃ সাহা, ফাইন্যান্সএ আট্‌কে গেলেই, উৎপলার কাছে টাকা ধার করেন; কাজেই তাঁর সিনেমা-শিল্পে উৎপলার সমর্থন অত্যাবশ্যক। তাছাড়া ভেতরে আরো গভীর যোগ আছে ব্যবসার, যা সাধারণের জানার কথা নয়। তাই উৎপলার মতের এত মূল্য মিঃ সাহার কাছে। নইলে তিনি যা মনে হয়, করতেন। একটু ভেবে বললেন,

—আমার ইচ্ছে একটা 'জুভেনাইল ছবি'ও করি আমরা—

—ভাল করে একটাই করুন, যাতে শিশু-বৃদ্ধ-যুবক সকলেরই আনন্দ হয়— উৎপলা বলল।

সবাই উঠছে—গেটে একখানা গাড়ী দেখে থামলো সব। নামলো সাধু সিদ্ধেশ্বর আর গেরুয়াধারিণী নির্ম্মলা। নির্ম্মলাকে এরা কেউ চেনে না। উৎপলা হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করলো।

—আসুন, আসুন! কবে এলেন কলকাতায়?

—কাল। ইনিই উৎপলা দেবী, নির্ম্মলা, বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয়ের কর্ত্রী।

—কর্ত্রী নই, সাধুজী— উৎপলা সহাস্যে প্রতিবাদ করলো,—কর্ত্তা তিনিই, যাকে আমি জানি না—আপনি যাঁর ধ্যান করেন, আর এই বিশ্বচরাচর যাঁর নাম-গান করে···বসুন!

—বড় সুন্দর বললেন তো!— নির্ম্মলা হেসে হাত ধরলো উৎপলার।

—বলাটা আমার সুন্দর হয়, ভাই—করাটা অমন সুন্দর হয় কৈ? তাহলে তো বেঁচে যেতাম!

—শুনলাম, বহু ভাল কাজ করেন আপনি?

—একটিও না। ভাল কাজ করার ভান করি। আমি জানি যে ভান করছি, এই আমার গৌরব।—আপনি কোথায় থাকেন, নির্ম্মলা দেবী? কলকাতায়?

—না। ছিলাম বাংলার বাইরে একটা আশ্রমে। ওখানে থাকার অসুবিধা হোল, তাই চলে এলাম। আবার কোথায় যাব, ভাবছি।

—কতদিন গৃহ ছেড়েছেন?

—গৃহ বলতে যা বোঝায় তা কোনোদিন ছিল না। একখানা বাড়ী অবশ্য আমার আছে টালিগঞ্জে, তবে সেটা একজন দান করেছেন আমায়। আপাততঃ তার আয়েই খাই আর বেড়াই এখানে-সেখানে। সিধুদা এলেন, তাই আমিও বললাম—চলো, দেখা করে আসি—

—বেশ বেশ—খুব ভাল করেছেন। ইনি বুঝি আপনার গুরুভাই?

—হ্যাঁ। তবে গুরুভাই বললে যথেষ্ট বলা হয় না। আমি ওঁর শিষ্যারই মতন—এমনকি অনেকে ওঁর শিষ্যা বলেই জানেন আমায়।

মিঃ সাহা জোড়হাতে নমস্কার করেছেন সিধুকে। এতক্ষণে বললেন,

—আমাদের 'জরদ্গব'-মুক্তির দিনে আপনার চরণ-দর্শন করেছিলাম। আজ আবার সেই সৌভাগ্য হোল। একদিন দীনের বাড়ীতে পদার্পণ করতে হবে!

—আমাকে আপনার বাড়ী যেতে বলছেন? বেশ তো, যাব। কেন বলুন তো?

—কোনো কারণ নাই এমন। শুধু আপনার পবিত্র স্পর্শ পাবে বাড়ীখানা। আমি সিনেমা চালাই—অকাজ-কুকাজ অনেক করেছি জীবনে; কিন্তু আপনারা—যাঁরা সত্যি বড়, সত্যি মহান, সত্যকার সতী আর সত্যকার সাধিকা—তাঁদের চরণে আমি সব সময় প্রণতি জানাই। অবন্তী দেবীকে আমি মূর্ত্তিমতী 'সতী' মনে করি। আমি শুনেছি, আপনি তাঁর আত্মীয়—তিনি তো এখন পরম শুভব্রত নিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন!

মিঃ ম্যাকু এতক্ষণ কথা বলবার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। এবার বাগ পেয়ে বললেন,

—অবন্তী! আহা-হা—দেবী দ্রৌপদী একেবারে!

সবাই হেসে উঠলো কথাটা শুনে। মিঃ ম্যাকু তৎক্ষণাৎ বললেন,

—আই মিন্ বৃহন্নলা—বৃহন্নলা···

আর একচোট হাসির উচ্ছ্বাস জাগলো সকলের। শুধু সিদ্ধেশ্বর হাসেনি। চুল-দাড়ীর আড়ালে মুখখানা ঢেকেই রেখেছে। বলল,

—অবন্তী···অবন্তী-ই; প্রাচীন এক নগরীর নাম—যার কথা ইতিহাসের পাতায় অক্ষর অক্ষরে পড়া যায়। অবন্তী পুরাতত্ত্বের বস্তু! ওকে আর টানবেন না এখানে।

একি দরদ! একি সীমাহীন স্নেহতরঙ্গ! উৎপলা অকস্মাৎ যেন বিহ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু আত্মসম্বরণ করলো উৎপলা। কে জানে

অবন্তীর সঙ্গে এই সাধুর সম্পর্কের কথা এরা কেউ সম্যক জানে কিনা। কিন্তু নিজেকে বাইরে সংযত করলেও অন্তরের অভ্যন্তরে উৎপলার নারী-হৃদয় যেন ক্রন্দন জুড়েছে। মনে হচ্ছে, অবন্তীর কিছু না-থাকলেও সব আছে—আছে অপার্থিব প্রেমপূত এক মানবহৃদয়। আর কী চাই! উৎপলার সব থেকেও কিছু নেই। উৎপলা চিরবঞ্চিতা। অগাধ ঐশ্বর্য্যের মাঝে উৎপলা পঙ্কশায়িনী—পূজার অর্ঘ্য হবার যোগ্যতা-হারানো ভূপতিত মলিন পুষ্প!

কিন্তু এত চিন্তা অন্তরতলে অবরুদ্ধ করে উৎপলা সিধু আর নির্ম্মলাকে নিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকলো, বাকী সকলকে বিদায় দিয়ে। নিজের নিভৃত কক্ষে সিদ্ধেশ্বরকে বসিয়ে উৎপলা নতজানু হয়ে প্রণাম করলো।

—প্রণাম কেন?— হাসলো সিধু কথাটা বলে।

—প্রণাম আপনার সাধুত্বকে নয়; আপনার সুমহান প্রেমকে প্রণাম করি।— হাসলো উৎপলা…

সুরভিত বায়ুতে শ্বাস নিতে নিতে ঘুমিয়ে গেল সীমা। ট্রেনের রাত্রি-জাগরণ, মানসিক ক্লান্তি আর দিনের শারীরিক পরিশ্রম সব মিলে ওকে নিবিড় ঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখলো। ঘুম ভাঙতেই দেখলো, সকাল।

তাড়াতাড়ি উঠে প্রাতঃকৃত্যটা সমাধা করেই সীমা বেরিয়ে পড়বে। এখানে ওর আর থাকবার ইচ্ছে নেই। কলকাতায় ফিরে ছেলেটার খোঁজ করবার জন্য কী পন্থা অবলম্বন করবে, তাই ভাবছিল সীমা। ওর পরিচিতা মেয়ে-দুটি স্নানাদি করে এসে বললো,

—সকালের প্রার্থনায় যোগ দেবে[redacted]

—না ভাই, আমার সময় হবে না [redacted] এখুনি যেতে হবে।— সীমা জবাব দিল।

—যেতে হবে!— ওরা পরস্পরের মুখপানে চাইছে হাসিমুখেই। একজন বলল,

—যেতে হবে? কোথায় যেতে হবে? এখানে যে থাকবেন বলছিলেন?

—না, থাকা চলবে না। যে কাজের জন্য এসেছিলাম, তা যখন হোল না, তখন থাকবো আর কি জন্যে?— সীমা স্নান করতে চলে গেল একা।

ফিরে দেখলো, ঘরে কেউ নেই। সবাই প্রার্থনা করতে গেছে তাহলে। সীমা কাপড়-জামা প'রে, তার সুটকেস আর বেডিং নিয়ে বেরুলো বাইরে। ফলের চুপড়ীটা এখানেই দান করেছে সে। গেটে আসতেই দেখল, দুজন গেরুয়াধারী দরজা বন্ধ করে পাহারা দিচ্ছে। সীমা বলল,

—গেট খুলুন, আমাকে যেতে হবে—

—আপনি নির্ম্মলার ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন, বলেছিলেন যে?— সবিনয়ে ওকে জানালো সন্ন্যাসীদের একজন।

—না, আমি আজই কলকাতা চলে যাব— সীমা বলল।

—তা কি করে হবে? আপনি একলা—এভাবে তো যাওয়া হবেনা আপনার!

—আমাকে যেতেই হবে। আমি একা আসা-যাওয়া করি। ঘরের কনে' বৌ নই আমি। গেট খুলে দিন।

—না, আপনি এখন যেতে পারবেন না।

—কারণ?— সীমার কণ্ঠে ক্রোধের সুস্পষ্ট প্রকাশ।

—'কারণ' আমরা জানি না। আপনি ঐ অফিসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন।

সীমা ওদের আর কিছু না বলে ফিরে এল 'অফিস' নাম-দেওয়া একটা পাকাঘরে। সেখানেও দুজন সন্ন্যাসীবেশী যুবক। সীমা বলল,

—আমাকে সকালের 'ডাউন' ধরে কলকাতা যেতে হবে। গেট খুলিয়ে দিন—

—তা হয় না। আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন না-জানা পর্য্যন্ত আপনাকে ছাড়া হবে না।— বললেন এক সন্ন্যাসী।

—মানে? আমাকে আপনারা আট্‌কে রাখবেন!

—হাঁ, যতক্ষণ আপনার সব-কিছু না-জানা যাচ্ছে। কারণ আপনি মহিলা—হয়তো রাগ করে চলে এসেছেন, কিম্বা অন্যকিছু—যান, ঘরে বসুন-গে। নির্ম্মলা ফিরে আসুক।

—আমার উপর কিসের সন্দেহ আপনাদের?

—সন্দেহ নানা কারণে ঘটে। আপনি সুন্দরী। অল্প-বয়সী। অলঙ্কার, অর্থ আছে সঙ্গে। আপনাকে আমরা একা ছেড়ে দিয়ে বিপন্না করতে পারি না। যদি প্রয়োজন হয়, আমাদের কেউ আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবে। আপনার নিরাপত্তা দেখা আমাদের কর্ত্তব্য।

—আমার মনে হচ্ছে, আমি এখানেই নিরাপদ নই।— সীমা সরোষে বলল।

—আপনার যা-খুসী মনে হতে পারে। আপনি যখন আমাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছেন, তখন আপনার ভাল-মন্দের ভার এখন আমাদের, অর্থাৎ আশ্রমের সকলের। এই আশ্রম জগৎ-কল্যাণের জন্যই প্রতিষ্ঠিত। এখানে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনার বান্ধবী নির্ম্মলা দেবী এখানে থাকেন। একটা জরুরী কাজে তিনি

কলকাতা গেছেন। তিন-চার দিনের মধ্যে ফিরবেন। যান, ঘরে যান আপনার—

—আপনারা যেতে দেবেন না আমায়?—সীমা অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে।

—না—গম্ভীর গলায় বললেন সন্ন্যাসী,—নির্ম্মলা না-আসা পর্য্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে যেতে চান তো, পুলিশের হাতে দেব আপনাকে। তাঁরা আপনার সম্বন্ধে যা ভাল বোঝেন, করবেন।

—বেশ, ডাকুন আপনি পুলিশ। আমি যাবই। দেখি, কী করতে পারেন! আর জানবেন, আমি বড় সহজ মেয়ে নই—এমন অনেক মেকী আশ্রম দেখা আছে আমার··· সীমা ক্রোধে ফুলছে কথা বলতে বলতে।

—বেশ তো। এটাও দেখুন তাহলে— নীরসকণ্ঠে বললেন সাধুজী।

সীমার পরিচিতা সেই মেয়ে-দুটির একটিকে ডাক দিয়ে তিনি বললেন,

—এঁকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও তো, শর্ম্মী · বড় রেগে উঠেছেন উনি।

শর্ম্মিষ্ঠা নামে সেই মেয়েটি এসে হাত ধরল সীমার; বলল,

—আসুন। নির্ম্মলাদি এলে, দেখা করে তারপর যাবেন। তাড়া কি?

—থাক্, আপনাকে দরদ দেখাতে হবে না—সীমা টেনে নিল হাতখানা।

—দরদ আমাদের নেই। আমরা মায়া-মোহ-মুক্ত সন্ন্যাসিনী—বলল শর্ম্মিষ্ঠা।

—তা জানি। বালিশের তলায় 'বিশুদ্ধ উপন্যাস' দেখে বুঝেছি—সীমা বিদ্রূপ করল।

—দেখেছেন নাকি ?— হেসে দিল শর্ম্মিষ্ঠা— আরো দু'এক দিন থাকলে পরিশুদ্ধ আসন-প্রাণায়ামও দেখতে পাবেন। চলে আসুন, অনর্থক কথা বাড়াবেন না।

সীমার হাতখানা যেন জোর করে ধরে টান দিল শর্ম্মিষ্ঠা। সীমার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে রাগে। কিন্তু কী সে করবে এখানে! বলল,

—আপনাদের গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি।

—তাঁর সঙ্গে যখন-তখন দেখা হয় না— শর্ম্মিষ্ঠাই জবাব দিয়ে সীমাকে টেনে নিয়ে চললো। সীমার হাতে স্যুটকেসটা রয়েছে, বেডিংটা পড়ে রইল ওখানেই। ক্রোধে-ক্ষোভে আত্মজ্ঞান-হারা সীমা যেন যন্ত্রচালিতবৎ খানিকটা গিয়ে থামলো···

—চলে আসুন, সীমা দেবী! এ আশ্রমে রাত্রিবাস করলে কেউ আর এখানে দীক্ষা না-নিয়ে ফিরে যেতে পারেন না, বিশেষ তিনি যদি নারী এবং যুবতী হন। নির্ম্মলাদি জানেন এ তত্ত্ব। আমরাও জানছি ভাল করে। চলুন, কোনো উপায় নেই এখন আর!— হাসছে শর্ম্মিষ্ঠা।

—তুমি তাহলে এদের সহযোগী ?— সীমা সক্রোধে শুধালো।

—আমি শিষ্যা, অতএব সহযোগী। কিন্তু আপনি অতখানি ঘাবড়াচ্ছেন কেন! এখানে সত্যি ধর্ম্মসাধনা হয়। অনন্ত বিশ্ব জুড়ে যে নাদব্রহ্ম রয়েছেন—জগৎপ্রপঞ্চের যে ধ্বনিব্রহ্ম, আপনাকে আজই সেটা শুনিয়ে দেবেন আমাদের শ্রীগুরুদেব। দেখবেন, জীবনে কী অসীম তৃপ্তি পাবেন!

—জোর করেই দীক্ষা দেওয়া হয় এখানে ?

—না। তবে বিকারী রোগীকে জোর করেই ওষুধ খাওয়াতে হয়। যদি স্বেচ্ছায় আপনি না দীক্ষা নেন তো, কী আর করা যাবে! সদ্‌গুরুরা পাপী-তাপীকে তরাবার জন্য এরকম করে থাকেন।— হাসছে শর্ম্মিষ্ঠা।

আশ্চর্য্য হয়ে সীমা ভাবতে লাগলো—এই শর্ম্মিষ্ঠার বয়স বড়জোর পঁচিশ বছর হবে। সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী। কথাবার্ত্তায় মনে হয়, যথেষ্ট শিক্ষিতা। সে কেন এখানে এভাবে আত্মসমর্পণ করেছে! আর, কেনই-বা সীমাকে এখানে রাখবার জন্য এদের সাহায্য করছে? কিছুই ঠিক করতে পারলো না সীমা। চেয়ে দেখলো, বিরাট এই আশ্রমের প্রায় মধ্যবিন্দুতে সে রয়েছে। বৃক্ষলতার বেষ্টনীতে বড় রাস্তা তো দেখা যায়ই না—কোনোখানে কোনো বসতবাড়ীও ওর চোখে পড়ল না। চীৎকার করলে কোনো ফল হবার সম্ভাবনা নেই। অবস্থা বুঝে সীমা নিঃশব্দে অনুগমন করলো শর্ম্মিষ্ঠার। শর্ম্মী বলল,

—আপনার সম্বন্ধে প্রায় সবই আমাদের জানা হয়ে গেছে, সীমা দেবী! আপনি পরলোকগত জাষ্টিস স্যার চন্দ্রচূড় ঘোষালের দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রীর কন্যা। আপনার বাবা আপনার জন্য একলক্ষ টাকা আর দুখানা বাড়ী রেখে গেছেন। একটায় আপনি থাকেন, অন্যটা ভাড়া খাটে। আপনার বৈমাত্রেয় ভাই হাইকোর্টের বড় অ্যাডভোকেট। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। জীবনে আপনি বিপন্না হয়ে কিছুদিন আত্মগোপন, মানে 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে' বাস করেছিলেন। সে বিপদ অবশ্য সামাজিক। খালাস হয়ে আবার সমাজে এসে বাস করছেন। লোকে জানে, আপনি বিলেত গিয়েছিলেন পড়তে···এসব জানা হয়ে গেছে—হাঃ হাঃ হাঃ—

—এসব খবর কোথায় শুনলেন আপনি?— সীমা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

—আপনি আসার পরই আমাদের কলকাতা আশ্রমে 'টেলি' পাঠান হয়। সেখান থেকে সব সন্ধান নিয়ে সকালে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন।

—তিনি এত শিগ্রি এত খবর কি করে জানলেন?— সীমা নির্ব্বোধের মত প্রশ্ন করল।

—আপনার সম্বন্ধে খবর জানা খুব সহজ। আপনি বিখ্যাত লোকের কন্যা, আপনি সমাজ-সেবিকা; 'যুগনারী'র লেখিকা, নিজেও একজন যুগনারী।

হাসির উচ্ছ্বাসে বিশ্ব বিদীর্ণ করে দিচ্ছে শর্মিষ্ঠা যেন! বলল,

—আপনার সেই তরুণ বন্ধুটি কি খুব সুন্দর ছিলেন? নাকি ভাল গাইতে পারতেন, অথবা আরো অনেক গুণ ছিল তাঁর?…

সীমা জবাব দিল না। একটা নিমগাছের ছায়ায় ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুরন্ত গ্রীষ্মে জল খুঁজে ফিরছে কাঠবিড়ালী, দেখলো সীমা; অনুভব করলো, ঐ কাঠবিড়ালীর যে ক্ষমতা আছে, সীমার এখন তাও নেই। সে বন্দিনী। কিন্তু সীমা ঠিক বুঝতে পারছে না, কেন তাকে বন্দী করা হচ্ছে!

—আমাকে আটকাবার উদ্দেশ্য কি, শর্মিষ্ঠা? আমার দাদা বৈমাত্রেয় হলেও, আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন। তিনি আমার সন্ধান করতে ত্রুটি করবেন না; আর আমি যে এইদিকে এসেছি, তা অনেকেই জানে।

—জানে, তাতে কি? আপনাকে তো ধরে রাখা হবে না। আপনি শুধু এখানে আশ্রয় নেবেন শিষ্যত্বের—ব্যস্, আপনার তন্-মন-ধন সবই তখন এদের হবে। ইহকাল এবং পরকাল একসঙ্গে এখানে বাঁধা পড়ে!

—কিন্তু আমি যদি তা না চাই?

—না চাইবার কোনো কারণ নেই। আর, করবেন কি আপনি, সীমা দেবী! বিয়ে আর আপনার হওয়া সম্ভব নয়। যদিই-বা হয় তো, সসম্মানে হবে না। কারণ, অনেকেই আপনার বিষয়ে নানা কথা বলে। টাকা আপনার আছে, তা দিয়ে আরামে বাস করতে পারেন। কিন্তু একা। শুধু প্রবন্ধ লিখে বা জনসেবা করে মানুষ বেশীদিন টিঁকতে পারে না। অন্ততঃ আপনার মত বিলাসী মেয়েরা পারে না। এখানে থাকুন, কোনো অসুবিধা হবে না—সবই এখানে ভাল। কিছু টাকা আশ্রমে

দান করলে আপনার সম্মান হবে রাণীর মত। সবাই খাতির-যত্ন করবে। সকলের গুরু-বোন হয়ে দিব্যি থাকবেন। আসুন, রোদ লাগছে।

—নির্ম্মলাদি কতদিন আছেন এখানে?— চলতে চলতে শুধোলো সীমা।

—তা প্রায় অনেকদিন। তাঁকে এনেছিলেন তাঁরই একজন গুরুভাই। অবশ্য গুরুভাইটি ভেতরে ভেতরে এখানকার লোক, নির্ম্মলাদি জানতেন না। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ওঁদের গুরুদেব কর্ণবিজয় না বর্ণচোরা, কী যেন নাম তাঁর, হিমালয়ে চলে গেছেন। নির্ম্মলাদি নিরাশ্রয়া হয়ে গুরুভাইটির সঙ্গে এখানে এসে পড়েন।— একটু থেমে শর্ম্মিষ্ঠা আবার বলল,— প্রথম প্রথম নির্ম্মলাদিও খুব চোটপাট দেখাতেন এখানে। তারপর সাধনভজন পেয়ে বেশ আছেন। মাসে মাসে, পঁয়ত্রিশ টাকা আসে ওঁর নামে কোত্থেকে যেন—সবই আশ্রম পায়।

—কলকাতা কেন গেল সে হঠাৎ?

—গুরুদেব পাঠিয়েছেন একটা বিশেষ কাজে।— হাসলো শর্ম্মিষ্ঠা।

—কি এমন বিশেষ কাজ?

—সে-সব আমাদের জানার কথা নয়, তবে আমি কিঞ্চিৎ জানি। কাজটা হচ্ছে—খুব নাম-করা এক ডাক্তার, বহু টাকার মালিক, অকস্মাৎ পত্নী-পুত্র হারিয়ে এমন মানসিক অবস্থায় এসেছেন যে, যথাসর্ব্বস্ব কোনো সদ্‌গুরুর সিদ্ধ-আশ্রমে দান করে সন্ন্যাস নিতে চান। নির্ম্মলাদিকে তিনি চেনেন, তাই চিঠি লিখেছিলেন তাঁকে এখানকার ভিতরের খবর জানবার জন্য। আমাদের শ্রীগুরুদেব তাই সরাসরি নির্ম্মলাদিকে পাঠালেন, সেই ডাক্তার ভদ্রলোককে এখানে এনে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করে শান্তি দেবার উদ্দেশ্যে…

—এইটা বুঝি সদ্‌গুরুর সিদ্ধাশ্রম!— সীমার কণ্ঠে তীব্র বিদ্রূপ।

—নয় কেন? দু'দিন থাকলে আপনিও স্বীকার করবেন, ইহলোক এবং পরলোকের সেতু-বন্ধনকারী এমন আশ্রম আর ভারতে অথবা পৃথিবীতে কোথাও নেই।

—তোমার কথার মধ্যে যেন একটা বিদ্রূপের রেশ ব্যঞ্জিত হচ্ছে, শর্ম্মিষ্ঠা! এই আশ্রম সম্বন্ধে তোমার সত্যি মনোভাবটা বলবে আমায়?— সীমা বসে পড়ল।

—শনৈঃ দিদি, শনৈঃ সবই জানবেন। এখানে আমরা 'অষ্টনায়িকা' ছিলাম, আপনাকে নিয়ে 'নবদুর্গা' হলাম। আর একটি এলে একেবারে 'দশ-মহাবিদ্যা' হয়ে যাব··· হাসতে হাসতে সীমার গায়ে ঢলে পড়ল শর্ম্মী।

—তুমি এখানে কি ভাবে এসেছ, শর্ম্মিষ্ঠা? আধ্যাত্মিক ক্ষুধা তো তোমার মধ্যে কিছুমাত্র আছে বলে মনে হয় না— শর্ম্মিষ্ঠার হাসি কিঞ্চিৎ থামলে সীমা শুধোলো ওকে।

—আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নেই আমার মধ্যে! আপনি কিছু বোঝেন না। নির্ম্মলাদির পরেই এখানে আমি আধ্যাত্মিক বক্তৃতায় পারদর্শিনী মেয়েদের মধ্যে। অবশ্য সে-সব বক্তৃতা-ই। কিন্তু জানেন? এখানের অধ্যাত্মরাজ্য—মানবরাজ্য, এমন কি পশুরাজ্য পর্য্যন্ত আকৃত। দিনকতক থাকলেই দেখবেন, এ একেবারে ব্রজধাম!

—এ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কে? একে চালান কারা?

—তার কি ঠিক আছে কিছু। বহু ধনী ব্যবসাদার আছেন এর পরিচালনায়। অবশ্য প্রতিষ্ঠাতা আমাদের শ্রীগুরুদেব। কিন্তু যাঁরা এর পিছনে আছেন, তাঁরা দেশের বড় বড় মহাজন···

—এটা কি তাঁদের বাগানবাড়ী বলতে চাও?

—নাঃ, তোমার সঙ্গে পারা গেল না! বলতে কিছুই চাই না। যা খুসী তুমি বুঝে নাও। এটা আশ্রম—শ্রমসাধ্য কিছু করতে হয় না,

এই সুবিধা। সকালের প্রসাদ মালপো ভোগ রয়েছে, এসো, সৎকার করি দুজনে।

দুজনের সম্পর্ক কখন 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে এসেছে কেউ টের পায়নি।

শর্ম্মিষ্ঠা একটা ঢাকা-দেওয়া খাবারের থালা বের করলো। প্রচুর সুখাদ্য রয়েছে তাতে। একটা ছোট প্লেটে দিল কতকগুলো সীমাকে।

—চা খাও তো তুমি? আনতে বলছি।—শর্ম্মিষ্ঠা খেতে খেতে বাইরে গেল।

সীমা ভাবতে লাগলো—কী আহাম্মুকী কাজই না সে করে ফেলেছে এখানে এসে। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। বেশী কিছু করবার চেষ্টা করলে সীমা আরো বিপদে পড়তে পারে। অতএব নির্ম্মলার ফেরা পর্য্যন্ত নিঃশব্দে অপেক্ষা করবে সে—ঠিক করলো।

কিন্তু যার খোঁজে এখানে এসেছে সীমা, সে কোথায়? সেই খোকা! ওর নাম দিয়েছে নাকি 'কড়ি'। সীমা কোনো নাম দেয়নি ওকে; দেবার সুযোগ হয়নি সীমার। 'খোকা' বলেই চালিয়েছে এতদিন। 'কড়ি' নামটা কি আর থাকবে তার? সীমা তাকে হারালো—তাকে বিশ্বের জনস্রোতে হারিয়ে ফেললো সীমা। কোন্ এক অপুত্রক দম্পতী তাকে মানুষ করবে, মা-বাবা ডাক শুনবে তার মুখে—সীমা জানতে পারবে না। ভালই হোল···

কিন্তু সীমা ছেলেটার কোমল স্পর্শ ভুলতে পারছেনা কিছুতেই। এই ক'মাস ধরে চেষ্টা করে পারেনি সে ভুলতে। সীমা এখানে বন্দী হয়ে গেল। তাকে খোঁজার আর পথ তো খোলা রইলনা সীমার কাছে!

বন্ধন-বেদনাকে আচ্ছন্ন করে সীমার মনে সন্তানহারা মায়ের গভীর বেদনা বজ্রনির্ঘোষে জানাচ্ছে—সে ব্যথা আছে, থাকবে ··সে অমোঘ!

আলোক গেছে দপ্তরীর বাড়ী কোষগ্রন্থ বাঁধানোর কাজে। অঞ্জনা এসে দেখলো, ওর টেবিলে একখানা চিঠি পড়ে রয়েছে। খোলা চিঠি। পড়ল অঞ্জনা,

"আলোক, অকস্মাৎ সেদিন তোকে চায়ের আসরে দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে আনন্দ বোধ করেছি। এমন করে তুই কাণা-গলিতে আত্মগোপন করে আছিস, তা কে জানতো! যাই হোক, একটা বিশেষ প্রয়োজনে তোকে আমার দরকার। যদি আজ সন্ধ্যার সময় আমার বাড়ী আসিস তো সব কথা জানাব। আশা করে রইলাম তোর আসার।

ইতি—বিকাশ।"

বিকাশকে সেদিন দেখেছে অঞ্জনা দীপ্তি দেবীর চায়ের আসরে। কিন্তু আলোকের সঙ্গে তার কতখানি পরিচয়, তার খোঁজ করেনি অঞ্জনা, কারণ ওর মনটা উৎপলার সঙ্গে আলোকের সম্বন্ধ-নির্ণয়েই ব্যস্ত রয়েছে এই ক'দিন। অকস্মাৎ বিকাশের কাছ থেকে কেন এই চিঠি এল! চিঠিখানা ডাকে আসেনি, কেউ দিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ বিকাশবাবুর বাড়ীর বেয়ারা। খামের উপর লেখা 'আরজেণ্ট'। ঠিকানাটা খুব পরিষ্কার হাতে লেখা; কতকটা মেয়েলী হাতের মনে হয়।

টেবিল গোছাতে গোছাতে অঞ্জনা ভাবতে লাগলো, এতদিন আলোক রয়েছে এখানে—এতো স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে, যেন মনেই হয় না, আলোক তার প্রাইভেট টিউটার। অথচ আলোকের সম্বন্ধে কত কম খবরই রাখে অঞ্জনা! কিন্তু কিই-বা দরকার অত খবর রাখার? পুরুষ-মানুষের কত বন্ধু থাকে, কত বান্ধবী থাকে। কত জায়গায় কতরকম কাজে ঘুরতে হয় তাদের—মেয়েদের অত খবর রাখা চলে না। আলোক তার দাদা, এই অঞ্জনার গৌরব!

—এই যে, আপনি আছেন দেখছি— মিঃ ম্যাকু নমস্কার জানালেন।

—আসুন। কি খবর?— অঞ্জনা প্রতি-নমস্কার করে স্বাগত জানালো ম্যাকুকে।

—আলোক কোথায়? এখনো আফিস-টাইম হয়নি বুঝি?

—আফিস কিসের? দাদা বেরিয়েছেন একটু বাইরে। বসুন। কার আফিসের কথা বলছেন?

—আলোক এখানে চাকরী করে তো? থাকে কোথায়? মেসে?

—এখানে চাকরী করেন তিনি, কে বলল আপনাকে? এটা তাঁর বাড়ী। তিনি আমার দাদা হন। কোত্থেকে এসব আজগুবি খবর সংগ্রহ করলেন আপনি!

অঞ্জনা যে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে, মিঃ ম্যাকু বেশ বুঝলেন। কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে মিঃ ম্যাকুর বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, বিশেষ সুন্দরী মেয়েদের সম্বন্ধে। তৎক্ষণাৎ অঞ্জনাকে প্রসন্ন করবার জন্য বললেন,

—আই সি-ই-ই-ই—! আপনি তার বোন! ওঃ, এক্সকিউজ মি প্লিজ। আমি দীপ্তি দেবীর কাছে শুনলাম যে, আলোক আপনার বাবার লেখা-লেখি, বই-ছাপা ইত্যাদি কাজে সাহায্য করে। তাহলে আমি ভুল শুনেছি—

—না, ঠিকই শুনেছেন। আমার বাবার সব-কিছু তিনিই দেখেন, কারণ তিনিই দেখবার অধিকারী। তবে চাকরী নয়, উত্তরাধিকার।

কথায় উত্তাপ এখনো যথেষ্ট অঞ্জনার, কিন্তু সে সংযত হল। বলল,

—সেদিনও আপনি দাদার সম্বন্ধে কী একটা রিমার্ক করেছিলেন। ব্যাপার কি বলুন তো? আমার দাদাকে আপনি এত হীন চোখে দেখেন কেন?

—না—না—না, নিশ্চয় নয়। একি কথা বলছেন, অঞ্জনা দেবী! একি বলছেন? আপনার দাদা আমাদের উৎপলাশ্রমের সেক্রেটারী

ছিলো—সে আমার বিশেষ স্নেহপাত্র। আর, তাকে আমাদের দরকার বলেই আজ এখানে এসেছি। কোথায় সে? ডাকুন—

—তিনি বাড়ী নেই। ফিরতে দেরী হবে। কী দরকার, আমায় বলতে পারেন।

—হ্যাঁ, আপনাকে বলতে আপত্তি কিছু নেই। এক কথায়, আমরা একটা ভাল গল্প চাইছি মন্দার-প্রডাক্সনের পরবর্ত্তী ছবির জন্য। আলোক যদি গল্পটা লেখে, আমি একবার দেখে অ্যাপ্রুভ করে দেব,—না-লিখবে কেন! সে তো লেখে—লিখুক—ভাল টাকা পাওয়া যাবে—মানে, পাইয়ে দেব আমি—বুঝলেন। তাকে এই খবরটা দিয়ে আপনি উৎপলা দেবীর কাছে যেতে বলবেন, আজই সন্ধ্যায় যেন যায়, কারণ, জানেন তো, বিস্তর গল্প-লিখিয়ের ভিড় আজকাল। আমি-ই আলোকের কথাটা পেড়ে রেখেছি ওখানে—

প্রতিমার মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে অঞ্জনা শুনলো মিঃ ম্যাকুর কথা—ভেতরে কর্ম্মরত ঝি'কে ইঙ্গিত করে সে একগ্লাস জল আর মিষ্টি আনতে বলেছে। ঝি আসতেই তার হাত থেকে খাবারটা নিয়ে মিঃ ম্যাকুর সামনে ধরে দিতে দিতে বলল,

—বিস্তর লিখিয়ের ভিড় যদি তো, দাদাকে আর খোঁজেন কেন? দাদা তো গল্পের-তাড়া-বগলে সিনেমা-ওয়ালাদের দরজায় ধন্না দেন না! তিনি লেখেন অত্যন্ত কম, প্রকাশ হয় তার থেকেও কম—

—তার-ই জন্য তো ওকে চাইছি। কম লেখে, আর ভাল লেখে। আমাদের সকলের ইচ্ছে, এই গল্পটা আলোক লিখে দিক।

—আমি জানাব আপনার কথা দাদাকে—

—হ্যাঁ, পাঠিয়ে দেবেন একবার ওখানে—

—পাঠিয়ে দেব কি করে মশাই! তাঁর খুসী হয় তো যাবেন। আমি খবরটা দেব।

—আপনি অনুরোধ করতে পারবেন না?— মিঃ ম্যাকু উঠতে উঠতে বললেন।

—অনুরোধ কেন, আদেশ করতে পারি। বোনেরা যা করতে পারে, আমিও তাই পারি। কিন্তু এখানে করবো কেন? তিনি ভাল মনে করেন তো যাবেন ওখানে।

—বলবেন, উৎপলা দেবী তাঁকে ডেকেছেন একবার—

—তাহলে 'মন্দার প্রডাক্‌সন' নয়, উৎপলা দেবী ডাকছেন?

—ওই একই কথা। উৎপলা 'মন্দার প্রডাক্‌সন'এর ডিরেকটার-বোর্ডের সদস্যা। ওঁরই বাড়ীতে আলোচনা হবে আজ সন্ধ্যায়। আচ্ছা, নমস্কার—

মিঃ ম্যাকু বেরুলেন পথে। খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে বললেন,

—বলবেন, খাঁটি মানবতার আবেদন আছে, এমন একটা গল্প আমরা চাই।

আবার নমস্কার করে চলে গেলেন মিঃ ম্যাকু। অঞ্জনা কোনো জবাব দিল না আর। নিঃশব্দে টেবিলটা গোছাতে গোছাতে ভাবছে—আলোক এখানে আসবার আগে কী একটা আশ্রমে চাকরী করতো। ওখানে থাকতেই লিখতো মাসিক কাগজে। একটা বইও বের করেছিল। তারপর এখানে এই সাতবছর, কোষগ্রন্থই তাকে সংকলন করতে দেখেছে অঞ্জনা।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে দাদা 'জলদর্চ্চি' বইখানাও লিখলো, কী অসাধারণ পরিশ্রম করেছে দাদা! এই মাসখানেক মাত্র বেরিয়েছে বইখানা। কল্পনাতীত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে এর মধ্যে; বৎসরের সেরা বই বলে সুখ্যাত হয়েছে।

তাই আজ দাদার ডাক পড়েছে উৎপলার দরবারে। কিন্তু এই ম্যাকু লোকটা দাদার উপর এত ঈর্ষ্যাপরায়ণ কেন, ভেবে পাচ্ছে না

অঞ্জনা। নিশ্চয় এমন কোনো ব্যাপার ভেতরে আছে, যাতে এই লোকটা দাদাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু কথাটা আর ভাববার সময় হোল না অঞ্জনার; রান্নাঘর থেকে ডাকলো ঝি ওকে কী একটা তরকারী ধরে যাবার ভয় দেখিয়ে। অঞ্জনা তাড়াতাড়ি গিয়ে জল ঢাললো কড়াতে। এখন আর ওর সময় নেই, বাবার স্নান-পূজার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আলোক এল অনেক বেলায়; রোদে মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে।

—ছাতাটা হোল কি তোমার! হারিয়েছ?— অঞ্জনা বলল ওকে দেখামাত্রই।

—সাত বছরের পুরোনো ছাতা, কাপড়টা শিক থেকে ছেড়ে গেছে, দেখিস নি?

—না, আমি আর দেখি কোথায়? দেখবে তোমার বৌ এসে এবার। দেখ-গে, কবে আমি সেলাই করে রেখে দিয়েছি তোমার ছাতা— অঞ্জনা গম্ভীর মুখে বলল।

—তাহলে আমায় দিসনি কেন?

—যাবার সময় আমায় বলে গিয়েছিলে? আর, সাত বছরের ছাতা হলেও, ব্যবহার করেছ কবে তুমি? তোমার তো ধুতি-পাঞ্জাবীগুলোও সাত বছরের!

আলোক কথা না বলে হাসলো একটু। অঞ্জনা বলল,

—ঐ ছাতাটা তোমাকে কে যেন দান করেছিল, দাদা—সে খুবই নির্ব্বোধ লোক নিশ্চয়—

—কেন, নির্ব্বোধ কেন সে?

—তোমাকে ছাতা দেওয়া মানে ছাতার অপমান। ছাতাখানা আজও কত সুন্দর আছে, আর তুমি রোদে ঘুরছো! কোথায় গিয়েছিলে? দপ্তরীর বাড়ীতে এত দেরী হবার তো কথা নয়।

—না-রে, বইএর দোকানগুলোতে খবর দিতে হোল যে 'মহাকোষ' বের হয়েছে। তাছাড়া কাগজে বিজ্ঞাপনও দিতে হোল···এইসব কাজে দেরী হয়ে গেল। যাই, স্নানটা করে আসি— আলোক স্নান করতে চলে গেল বাথরুমে।

অঞ্জনা ওর খাবার ঠাঁই ঠিক করতে করতে দেখতে পেল, একখানা 'মহাকোষ' আলোক হাতে করে এনে রেখেছে ওর বাবার টেবিলে। বাবা শুয়েছেন। তাড়াতাড়ি অঞ্জনা বইখানা দেখলো এসে। বিরাট গ্রন্থ, পঁচিশশো পাতার বই। বাঁধানোও তেমনি মজবুত। মূল্য পঁচিশ টাকা।

—ওরে বাপ! কে কিনবে এত দামী বই।— আপন-মনে বলল অঞ্জনা।

—ওর কমে দেওয়া যায় না, অঞ্জু। দাম যথেষ্ট কম করা হয়েছে। কিনবে লাইব্রেরী, আর দেশের যারা জ্ঞানপিপাসু— আলোক বাথরুম থেকে ফিরে বলল।

—বেশ। বসো, খেতে দিই।—তোমার 'জলদর্চ্চি' কেমন বিক্রী হচ্ছে, দাদা?

—ভালই। আবার এডিসন দিতে হবে শিগ্রি— হেসে বলল আলোক।

—'জলদর্চ্চি'র নায়িকা অবন্তী—নারী, না, নগরী—দাদা?

—দুটোই— হেসে বললো আলোক— নারী-নগরী-নাগরী-নায়িকা একাধারে—

—অসাধারণ চরিত্র, দাদা। এটা কি তোমার অনাসক্ত মনের সৃষ্টি?

—সেটা তো পাঠকরা বলবে রে— ভাত মাখতে মাখতে বলল আলোক।

—বলছে! হ্যাঁ, শোনো—সেই ম্যাকু-ভদ্রলোক এসেছিলেন সকালে। বললেন যে, ওঁদের নতুন ছবির জন্য একটা মানবতার

আবেদনওয়ালা গল্প চাই। তাই তোমাকে উৎপলা দেবী ডেকেছেন। আজই সন্ধ্যাবেলা যেতে হবে সেখানে।

—আজ সন্ধ্যাবেলা আমাকে বিকাশের ওখানে যেতে হবে, অঞ্জু। মিঃ ম্যাকুকে তুই জানালি নে কেন?

—আমি কি করে জানবো, তুমি আজ সন্ধ্যায় কোথায় যাবে? অবশ্য আমি তোমার টেবিলে বিকাশ বাবুর চিঠি দেখেছিলাম। কিন্তু তোমার ওখানে যাবার সম্মতি তো আমি জানতাম না···

—আচ্ছা, ফোন করে উৎপলা দেবীকে জানিয়ে দেব। আর কি খবর?

—আর কিছু না। বিকাশ বাবু তোমার বন্ধু তো?

—না, সহপাঠী।— আলোক খেতে আরম্ভ করলো। অঞ্জনাও আর বলল না কিছু।

খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম করে আলোক; ঘুমায় না। অঞ্জনা এর মধ্যে খেয়ে এসে বলল,

—উৎপলার বাড়ী যাবার সময় আমায় নিয়ে যেও।

—ওখানে কি জন্যে যাব আমি?

—উনি ডেকেছেন তোমায়, বললেন মিঃ ম্যাকু। মোটা টাকা পাওয়া যাবে।

—টাকা কি হবে? টাকা রোজগারের ফন্দি তো আমি করিনে, দিদি!

—ওঁরা একটা ভাল গল্প চান···

—ওঁরা সেটা যে-কোনো বেহেস্ত্ থেকে নিতে পারেন।

—বেহেস্ত্ কেন?— অঞ্জনা তাকে প্রশ্ন করলো।

—ওদের গল্প বেহেস্ত্ থেকেই আসে—না-হলে ওদের পয়সা হয় না।

—আমার বড্ড ইচ্ছে, তোমার গল্প সিনেমার ছবিতে দেখি।

—ওটা মেয়েলী ইচ্ছে। যা, গরমের দিন—খানিক শুয়ে বিশ্রাম কর-গে।

আলোক তাড়িয়ে দিল অঞ্জনাকে প্রায়। অঞ্জনা কিন্তু তার নিজের ঘরে এসে অনেক কথাই ভাবতে লাগলো। আলোকেব সঙ্গে এই অর্থহীন কথা বলার উদ্দেশ্য ওর, উৎপলার প্রতি আলোকের মনোভাব জানা। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না অঞ্জনা। আলোক যেতে চায় না উৎপলার সান্নিধ্যে! কেন? অঞ্জনা নিরাকবণ করতে পারছে না কারণটা। করবী সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছে অঞ্জনা। কারণ, করবী সেদিন বরুণকে ডেকেছিল আলোকের মনে ঈর্ষ্যা জাগাবার জন্য। করবী এতো ছোট, জানতো না অঞ্জনা! ওকে দাদার বৌ করা যায় না। কে তবে হবে দাদার বৌ? দাদার গল্পের নায়িকা অবন্তী—কে সে? সে কি আছে পৃথিবীতে? অথবা ওটা দাদার কল্পনা মাত্র? কিন্তু, কী আশ্চর্য্য চরিত্রের মেয়ে অবন্তী! কিন্তু···অবন্তী-চরিত্রের মেয়েও দাদার বৌ হবার যোগ্য নয়—ভাবছে অঞ্জনা ··

'জলদর্চ্চি' বইখানা আবার টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। কত, কী ভাবছে অঞ্জনা। নিজের জন্য ওর কোনো চিন্তা নেই। সুস্থ এবং স্বস্থ হয়ে দিব্যি শান্ত-জীবন যাপন করতে পারে। অথচ আশ্চর্য্য, নিতান্ত অনাত্মীয় আলোকের জন্য চিন্তার ওর অবধি নেই। আলোককে পরিপূর্ণ সুখী না করতে পারলে অঞ্জনার যেন সর্বই ব্যর্থ হচ্ছে! কী ভাবে সেটা হয়? কতটুকু কী করতে পারে অঞ্জনা আলোকের জন্য! অবিলম্বে আলোককে সংসারী না করতে পারলে, সে হয়তো সন্ন্যাস নেবে। কারণ বাবাকে বলেই রেখেছে আলোক যে, কোষগ্রন্থটা বের করে দিয়েই সে ছুটি নেবে—বেরুবে ভারত-ভ্রমণে। ঐ ভ্রমণে বেরুনোটাই সন্ন্যাস নেওয়ার সামিল। কিছু কি করা যায়না দাদা চলে যাবার পূর্ব্বে?

মনের উত্তেজনায় উঠে বসলো অঞ্জনা। ছোট বাচ্চাটা ঘুমুচ্ছিল—তাকে একবার দেখলো, তার পর ঘড়ি দেখলো সাড়ে-তিনটে। বড়-দিনের বেলা, শেষ হতে দেরী হবে। অঞ্জনা এ ঘরে এসে দেখলো, আলোক কী একটা বই পড়ছে।

—আমি তোমার সঙ্গে বিকাশবাবুর ওখানে যেতে পারিনা, দাদা?

—না। আলোক কঠিন জবাব দিল— সেখানে তোর কী কাজ?

—ঘরের ভেতর ভাল লাগে না, বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে···

—আজ হয়তো তোর বর আসবে। যাবি তার সঙ্গে বেড়াতে—

—তুমিই-বা নিয়ে গেলে? সে তো আসবে রাত্রে।

—আমি তাকে বিকেলে আসতে বলে দেব।

—অর্থাৎ, তুমি নিয়ে যেতে চাও না—কেমন?

—না। আমাকে অস্থানে-কুস্থানে ঘুরতে হবে।

—কুস্থানে?···

—হ্যাঁ—বিকাশ কুস্থান-ই। সেখানে তোকে আমি নিয়ে যেতে চাই নে···যা, চা দে—

নিজের প্রয়োজনেই বিকাশ ডেকেছে আলোককে। কড়েয়া রোডের প্রকাণ্ড বাড়ীটার দরজায় পৌছাতেই, বিকাশ নিজে এসে হাত ধরে নিয়ে গেল ভেতরে। বিশাল বাড়ী, সুসজ্জিত। বিকাশ বেশ ধনী হয়ে উঠেছে এর মধ্যে।

—তারপর আলোক, তোর সঙ্গে একযুগ পরে দেখা সেদিন!

—হ্যাঁ, দীর্ঘদিন পর। তা আজ আবার আমাকে কী দরকার হোল?

—বলছি। বোস, চা খা। প্রয়োজন আমারই ব্যক্তিগত।

আলোক অপেক্ষা করতে লাগল বিকাশ কী বলে শুনবার জন্য। চা-খাবার এল। খাওয়াও চলছে, বিকাশ কোন কথা বলছে না তার প্রয়োজন সম্বন্ধে। শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেই চলেছে আলোককে। কোষগ্রন্থটা কী ব্যাপার, কত ছাপা হোল, কী পেল আলোক ওতে, ইত্যাদি। অনেকক্ষণ ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করার পর আলোক বলল,

—তোর কথাটা এবার বল, বিকাশ। আমার বেশী সময় নেই।

—হ্যাঁ শোন, পরশু আমাকে দিল্লী যেতে হবে সরকারী কাজে। ওখানে দিন সাত থেকে ফরেন-এ যেতে হবে—

—রাষ্ট্রদূত হয়ে নাকি!

—ঐরকমই কিছু। তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—আমাকে! কেন বিকাশ? সেক্রেটারীর কি দেশে এতই অভাব হোল?— হাসল আলোক।

—না, সেক্রেটারী হয়ে নয়। সঙ্গী হয়ে যাবি। খরচ অবশ্য আমার। বিনিময়ে আমি কিছু চাইব তোর কাছে।

—কি?— বিস্মিত আলোক তাকালো বিকাশের পানে।

—আমাদের একটা এয়ার-সার্ভিস আছে, জানিস তো?— বিকাশ ধীরে ধীরে বলল,—ঐ সার্ভিসটায় তোকে যেতে হবে আমার সঙ্গে। পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরবি, দেশ-ভ্রমণের এতবড় সুযোগ আর হয় না। ঐ আমোদজনক কাজের সঙ্গে লিখবি একটা ভাল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—

—সে কাহিনী কি তোর নামে প্রকাশ করতে হবে, বিকাশ?— আলোক হাসলো কথা বলে।

—না-না-না আলোক, নিশ্চয় না। তোর নামেই সবকিছু হবে। আমার দরকার অতি সামান্য··· একটু থেমে বলল—শোন—

বিকাশ অল্প হেসে একটু কেসে আবার আরম্ভ করলো—উৎপলাশ্রম ছাড়ার পর তোর এতদিন কোনো খবর না পাওয়ায় আমরা ভেবেছিলাম, তুই সন্ন্যাস নিয়েছিস—না-হয়···তোর ভাল-মন্দ কিছু একটা হয়েছে! কিন্তু দেখা গেল, তা নয়। তুই বাহাল-তবিয়তেই আছিস— হাসলো বিকাশ আবার···

বিকাশের এতখানি ভনিতা করে কথা বলার কী কারণ, আলোক ঠিক বুঝতে পারছে না। তথাপি চুপ করেই রইল সে বাকীটা শুনবার জন্য।

—তুই ঠিকই আছিস, আলোক, তোর যেমন থাকা উচিত তাই—

এ নিয়ে আমার কিছু মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু একটা ব্যাপার ঘটে গেছে আমার জীবনে—

—আমি-ই কিছু ঘটালাম নাকি?— আলোকের কণ্ঠে ক্ষীণ বিদ্রূপ।

—হ্যাঁ, পরোক্ষে তুই এর মূলে। তুই হয়তো জানিস না, উৎপলাকে আমি ভালবাসি—আমি চাই, সে সুখী হোক—

—হোক-না, কেউ তো বাধা দিচ্ছে না— আলোক বললো,—অবশ্য আমি জানতাম না যে, তোর সেই দেহগত কামসর্ব্বস্ব ভালবাসা তুই আজও বহন করে চলেছিস অন্তরে।

—করছি বহন— বিকাশ আবার হাসলো একটু— ইতিহাসে এর প্রমাণ আছে, আলোক! এমন হয়··· হাসল বিকাশ আবার।

—নিজেকে ঐতিহাসিক করতে যাস-নে, বিকাশ! আমি জানি, বহু নারীর সঙ্গে বহু ব্যাপারে জড়িত তুই ছিলি। এখনো আছিস। উৎপলা সেই নারীস্রোতের একটা বড় তরঙ্গ মাত্র—তবু মেনে নিলাম, তুই তাকে আজও ভালবাসিস—বেশ, এখন বল—আমার এখানে কোথায় স্থান?

—উৎপলা তোকে ভালবাসে। অবশ্য সে ভালবাসা একটু উঁচু-দরের, একটু 'সাব্লাইম'—দেহের আবেদন থেকে মনের আবেগ সেখানে অনেক প্রবল; তবু এটা ঠিক যে, নিছক মনের আবেগ নিয়ে মানুষ সুখী হতে পারে না···

—তোর কথা সত্যি হলেই-বা আমি কি করতে পারি, বিকাশ—?

—তুই উৎপলাকে বিয়ে কর—কথাটা বলে বিকাশ তাকালো আলোকের পানে।

—অবাক করছিস, বিকাশ!—আলোক বলল,—প্রেমের মহিমার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকতে, উৎপলা দেবী আমার কাছে মানবতার আবেদনওয়ালা গল্প চেয়ে পাঠান কেন! তোকে দাঁড় করিয়ে দিলেই তো সেটা হতে পারে?

—কথাটা তুই বিশ্বাস করলি নে, আলোক?

—বিশ্বাস করা কঠিন, বিকাশ—খুবই কঠিন এ যুগে। অবশ্য আমি মানি, খুব খারাপ মানুষও একদিন খুব ভাল হতে পারে। শয়তান 'দেবতা' হয়ে যেতে পারে। সে-হিসেবে এই দীর্ঘকাল উৎপলার জন্য অপেক্ষা করে তোরও হয়তো এইরকম তার সম্বন্ধে মনোভাব হওয়া সম্ভব। কিন্তু বিকাশ, নিজেকে ফাঁকি দিয়ে কোনো ভাল কাজ করা চলে না। তোর বঞ্চিত মনের বেদনার এই আধ্যাত্মিক প্রকাশ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী—এটা ঈর্ষ্যার অন্য রূপ।

—কি করে বুঝলি?—বিকাশ প্রশ্ন করলো।

—বুঝতে দেরী লাগে না, বিকাশ! এতকাল ধরে উৎপলার প্রতি তোর এই মোহ, আমি 'প্রেম' বলতে চাই না—তোকে বঞ্চিতের বেদনায় বিকৃত করে তুলেছে! তুই চাইছিস, উৎপলার অন্তরে একটা মহান আদর্শ-প্রেমিকের আসন গ্রহণ করতে,—ব্যাপারটা সত্যি 'প্রেম' হলে খুব আনন্দের হোত, বিকাশ! কিন্তু সত্যি নয়—

—কেন সত্যি নয়? তোর সন্দেহ কিসে, আলোক? আমি অনেকদিন থেকেই একথা ভাবছিলাম। তোর খোঁজ না পেয়ে চুপ করে ছিলাম এতদিন—

—আমার খোঁজ পাওয়া খুব কঠিন ছিল না, বিকাশ। বাড়ী থেকে না বেরুলেও কাগজে-পত্রে আমি বের হয়েছি বহু বার! অন্ততঃ খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে তুই আমার সন্ধান করতে পারতিস। কিন্তু, যাক্ সে কথা। তোর এই মনোভাব যে সত্যি, অর্থাৎ 'সিন্‌সিয়ার' নয়, তার প্রমাণ তুই নিজেই দিয়েছিস। তুই বললি যে, উৎপলা আমাকে যেভাবে ভালবাসে সেটা 'সাব্লাইম' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, অতএব তোর কথামতই বিবাহ-বন্ধন এতে অনাবশ্যক। তবু তুই চাইছিস যে, আমি তাকে বিয়ে করি। এর থেকে মহৎ কিছু তোর কল্পনায় এলোনা কেন, বিকাশ?

—আর কি মহৎ থাকতে পারে, আলোক?

—আছে। মহত্তর হচ্ছে, তাকে তার ভাবরাজ্যে নিশ্চিন্তে থাকতে দেওয়া। আর মহত্তম হচ্ছে, তোর নিজে তাকে বিয়ে করে আমার প্রতি তার অহৈতুকী প্রেমটাকে তোর প্রতি দাম্পত্য-প্রেমে পরিণত করা··· হাসলো আলোক।

—আমি ওকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করেছিলাম, আলোক—

—এ কাজ প্রস্তাবে হয় না, বিকাশ! উৎপলাকে আমি যতটুকু চিনি, তাতে জানি যে, আমার প্রতি তার শ্রদ্ধা সে কোথাও গোপন করবে না। তুই এইটা জেনে তাকে বিয়ে করতে চাইলে, সে নিশ্চয় রাজী হোত।

বিকাশ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। দীর্ঘদিন পূর্ব্বে উৎপলা তো তাকে এই কথাই বলেছিল যে—আলোকের প্রতি তার প্রেম জেনেও যদি বিকাশ রাজী থাকে তো, উৎপলা তাকে বিয়ে করতে সম্মত আছে।

বিকাশ তখন রাজী হয় নি, প্রত্যাহার করেছিল তার প্রস্তাব। মনে পড়ল বিকাশের। বলল,

—আমি যাকে বিয়ে করবো, সে অন্যকে ভালবাসে—এটা কেমন করে সহ্য হয়, আলোক ?

—হাঃ হাঃ হাঃ— আলোক অজস্র হাসিতে উচ্চকিত করে দিল জায়গাটা ; বলল,— এতক্ষণে ধরা পড়ে গেলি, বিকাশ ! উৎপলাকে তুই কিছুমাত্র ভালবাসিস নে। এমনকি, কোনো মোহও নেই তার প্রতি তোর। তুই চাইছিস, উৎপলা যে-জাহান্নমে ইচ্ছে যাক, তার অন্তরে তুই প্রতিষ্ঠিত থাকবি। অনেক পুরুষ আছে, যারা নারীকে মনোগতভাবে জয় করেই নিজেকে কৃতার্থ বোধ করে ; তাদের পৌরুষ তৃপ্তি পায়। তুই সেই শ্রেণীর…… একটু থেমে আলোক আবার বলল,— এইসব পুরুষরা অপর মেয়েকে অসতী করতে যতখানি পটু, নিজেদের স্ত্রী-কন্যাকে সতী দেখতে তার শতগুণ অধিক মনোবিকার-গ্রস্ত। এ এক রকমের ব্যাধি। উৎপলাকে তুই কিছুমাত্র বিশ্বাস করিস না, অথচ তুই তাকে দেখাতে চাস যে— তুই একটা মহান প্রেমিক। প্রেম রাজনীতি বা অর্থনীতি নয়, বিকাশ, প্রেম মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুমহান বেদনা—তার স্থিতি আত্মায়,—তার প্রকাশ অশ্রুতে !

বিকাশ চুপ করে রয়েছে, মুখখানা বেশ গম্ভীর। আলোকও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,— আমাকে নিয়ে এই অভিনয় তোর না করাই ভাল, বিকাশ ! বিয়ে আমি করবো না, ঠিক করেছি। আর, উৎপলাও আমাকে শুধু শ্রদ্ধা করে—আমাকে বিয়ে করার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই তার, আমি জানি। তুই যদি এখনও বিয়ে না করে থাকিস তো, অনায়াসে তাকে করতে পারিস।

—সে বলে যে, সে তোকে ভালবাসে।

—হ্যাঁ, কিন্তু সে ভালবাসা বৈষয়িক নয়। আমার চরিত্রের কোনো একটা দিক তার ভাল লেগেছে, সেইটুকু অবলম্বন করে তোকে উৎপলা পরীক্ষা করে নিলো। তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাই পরীক্ষায় 'ফেল' করলি।

—কিন্তু বিয়ে করার পরও যদি জানি যে, সে তোকেই চায়?— বিকাশ বলল স্বীকৃতির সুরে।

—বলবে না। অত বোকা মেয়ে নয় উৎপলা।— হাসলো আলোক; বলল হেসে,— বিয়ে তুই ওকে করতে চাস না, বিকাশ, এ আমি জানি। ওকে তোর জন্য কাঁদাতে চাস তুই! কিন্তু বয়স হয়েছে। আর এ ছেলেমানুষী কেন! আমরা দুজনেই ত্রিশ পার হয়েছি। তুই এবং আমি-ও। বিয়ে যদি করতে হয় তো আর দেরী নয়, অবিলম্বে যাকে হোক করে ফেল—

আলোক উঠলো। ওর মুখের হাসিটা সরল-সুন্দর। ধীরে ধীরে আসন ছেড়ে দু'পা চলে আসতেই বিকাশ বলল ত্বরিত কণ্ঠে,

—শোন আলোক, তোর অসাধারণ বুদ্ধি সম্বন্ধে চিরদিনই আমি শ্রদ্ধা পোষণ করি; কলেজ-লাইফ থেকেই। কিন্তু আজ একটা জায়গায় তুই ভুল করছিস।

—কোথায়?— আলোক ফিরে দাঁড়লো।

—আমি সত্যি চাই, উৎপলা সুখী হোক—

—তুই নিজে তাকে সুখী করতে পারিস, বিকাশ! তার গত জীবনের সব ভুলে, তোরও গত জীবনের সব কথা তাকে ভুলিয়ে সুস্থ-সবল প্রেম দিয়ে তাকে তুই সুখী করতে পারিস। অপর কেউ তা পারবে না।

—কেন?

—কারণ, উৎপলা আর তোর মধ্যে একদিন নিবিড় সৌখ্য ছিল— দুজনে দুজনের জীবন নিয়ে অনেক খেলা খেলেছিস। মনে হয়, আজ

যৌবনপ্রান্তে দুজনে নীড় বাঁধলে, ভালই কাটবে তোদের। কারণ, এ প্রেম চপল হবে না, স্থির এবং স্থায়ী হবে।

—প্রেম হবে?— প্রশ্নটা করার সঙ্গে হাসল বিকাশ।

—'প্রেম' মানে আধ্যাত্মিক কিছু নয় এখানে। ম্যারেজ-কনট্রাক্ট। জীবনরথ চালাবার পক্ষে যথেষ্ট। বর্ত্তমান যুগের চুক্তিবদ্ধ বিয়ে তো গোপী-প্রেম নয়, বিকাশ! সীতা-সাবিত্রী গল্পের ব্যাপার এখন। কাম মানুষের আদিম প্রবৃত্তি; বিয়ে তাকে আইনের চারুতা দেবার ব্যসন মাত্র। তাকে সুরুচিপূর্ণ করে সমাজ-গঠনের জন্য বিয়ের বন্ধন মানুষ স্বীকার করছে আজ। নইলে বিচ্ছেদের মামলা এত বেশী হোত না আদালতে। যাক্, আমি চললাম, বিকাশ—একটু বিশেষ কাজ রয়েছে।

—শোন, আর একমিনিট— বিকাশ বললো,— তোর 'জলদর্চ্চি' যদি আমরা 'ছবি' করি তো তোর আপত্তি হবেনা তো?

—না। কিছুমাত্র না। অবশ্য আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। অনর্থক আবেগ বা অকারণ কথা জুড়ে গল্পকে 'কমার্শিয়াল' করা চলবে না।

—না। আমরা ভাল ছবিই করতে চাই।

—'ভাল'র সংজ্ঞা পাত্রভেদে ভিন্ন, বিকাশ!—আচ্ছা, চললাম।

আলোক চলে গেল বেরিয়ে। বিকাশ ভাবতে লাগলো।··· অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী আলোক; এত শক্তির অধিকারী হয়েও কেমন আশ্চর্য্যরকম নির্লিপ্ত! বিকাশের কাছে এ এক পরমাশ্চর্য্য। কিন্তু বিকাশ দীর্ঘদিন থেকে চেনে আলোককে। দেশমাতার মুক্তি-সাধনায় যখন আলোক জেলে গিয়েছিল, তখনো সে ছিল যেমন নির্ব্বিকার, আজও তেমনি আছে। অথচ ইচ্ছে করলে ধনে মানে সে বিকাশ অপেক্ষা অনায়াসে অনেক বড় হতে পারতো। কিন্তু বিকাশের ধারণা ছিল, আলোক উৎপলার সম্বন্ধে আগ্রহশীল। আজ সে-ভুলটাও

ভাঙলো বিকাশের। আলোক সর্ব্বত্র নিরাসক্ত। তার লেখার মধ্যেও। 'জলদর্চ্চি'র প্রত্যেকটি সমালোচনা লেখকের একান্ত নৈর্ব্যক্তিকতা স্বীকার করেছে। বিকাশ নিজেও এই মত্ সমর্থন করে। 'জলদর্চ্চি' বর্ত্তমান সাহিত্যে একটা বিশেষ সৃষ্টি…

কথাটা মনে উদয় হতেই বিকাশের অন্তরে আর একটা চিন্তা খেলে গেল। আলোক তার সহপাঠী—আলোক সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, দেশ স্বীকৃতি দিচ্ছে তার—এখন বিকাশ একটা বড়রকম সভার আয়োজন করে আলোককে যদি সম্বর্দ্ধনা জানায় তো, উৎপলার চোখে বিকাশ কিছুটা উদার বলে পরিচিত হতে পারে। আলোকের গৌরবে-যে বিকাশ গৌরব অনুভব করে, এটাও প্রকাশ করা হয়—এমন কি, বিকাশের অনসূয়ত্ব প্রমাণিত হতে পারে অনায়াসে।

চিন্তাটা মাথায় আসামাত্র অনেকগুলো কথা একসঙ্গে ভেবে নিল বিকাশ…কিছু টাকা খরচ হবে। হোক। নিজেকে অনসূয় এবং উদার প্রতিপন্ন করবার এমন সুযোগ বিকাশ ছাড়বে না। উৎপলাকে বিয়ে করবার ইচ্ছে বিকাশের সত্যি নেই ; কিন্তু কোনো নারীর চোখে হীন হয়ে থাকবে, এটা সহ্য হয় না বিকাশের। আলোককে নিয়ে যে-খেলা সে খেলতে চেয়েছিল, তা হোল না ; কিন্তু আরো সহস্র রকম খেলা জানা আছে বিকাশের !

ড্রাইভারকে ডেকে গাড়ী আনতে বলল বিকাশ, উৎপলার ওখানে যাবার জন্য। নিজেও পোষাক পরতে গেল।

উৎপলা তার বাড়ীতে সিধু আর নির্ম্মলাকে পেয়ে বিপুল আনন্দ বোধ করলো। এতখানি আনন্দের কারণ,—অবিরাম বৈষয়িক ব্যাপার, এবং সেই সংক্রান্ত ব্যক্তিদের সান্নিধ্য ওর বর্ত্তমান মানসলোকে বিরক্তিকর।

অতি সামান্য একটু পরিবর্ত্তন ঘটলো এই দুজন আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ পেয়ে। কিন্তু এই সামান্যকেই অসামান্য মনে করলো উৎপলা।

উৎপলাকে বলল সিধু তার আগমনের কারণ। সেই জীবন নামে ছেলেটিকে নিয়ে যেতে চায় সে দীক্ষা দিয়ে সন্ন্যাসী করবার জন্য। কারণ সিধু ওর মধ্যে সন্ন্যাসের লক্ষণ দেখেছে। উৎপলা কথাটা শুনে কিঞ্চিৎ বিচলিত হলেও, ভাবলো যে, যদি সত্যি জীবন সাধক হয় তো মন্দ কি? কিন্তু জীবন যেতে চাইবে কিনা, জানতে হবে। বলল,

—ওর গার্জেন হিসেবে আপনার নামই লেখা হয়েছে খাতায়, তবে সম্পর্কে 'পিতা' বলে লেখা হয় নি। ইচ্ছে করেই লিখিনি আমরা।

—দরকার হয় তো লিখে নেবেন— বলল সিদ্ধেশ্বর।

—ও যদি আপনার সঙ্গে চলে যায় তো, আর কিছু করার দরকার হবে না। তাহলে ভোরেই ওখানে যেতে হয়। ট্রেনে গেলেই সুবিধা।

—বেশ— সিদ্ধেশ্বর বলল,— ট্রেনেই যাওয়া যাবে ভোরে।

ভোর পাঁচটার ট্রেনে রওনা হয়ে ন'টার মধ্যেই পৌছে গেল উৎপলা, নির্ম্মলা আর সিদ্ধেশ্বর। নির্ম্মলা সম্বন্ধে অনেক তথ্যই উৎপলা জেনে নিয়েছে এর মধ্যে, তবে খুব বেশী ভেতরের কথা নির্ম্মলা ভাঙেনি। সে বলল যে, কলকাতার এক প্রতিষ্ঠাবান ধনী ডাক্তারকে তাদের শ্রীগুরুদেবের কাছে নিয়ে যেতে এসেছে নির্ম্মলা; কিন্তু ডাক্তার ভদ্রলোকটি কলকাতায় নেই—কোথায় বেরিয়ে গেছেন, কেউ জানে না।

—কী নাম সে ডাক্তারের?— উৎপলা প্রশ্ন করলো নির্ম্মলাকে।

—ডাঃ গুহ।

নির্ম্মলার মুখ থেকে কথাটা বের হবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপলা যেন আঁৎকে উঠলো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করে বলল,

—ডাঃ গুহ খুব নামকরা ডাক্তার; ধনীও খুবই। কিন্তু তিনি কেন আশ্রমবাসী হবেন? বয়সও খুব বেশী নয় তাঁর। কিছু ব্যাপার ঘটেছে নাকি?

—উনি লিখেছেন— নির্ম্মলা সংযতভাবেই বলতে লাগলো,— পর পর কতকগুলো দুর্ঘটনা ঘটায় ওঁর মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে খুব বেশী। জীবনটা আনন্দহীন হয়ে উঠেছে। তাই চাইছেন কোনো সদ্‌গুরুর আশ্রয়। মানে, বৈরাগ্য জেগেছে আর কি!

—শ্মশান-বৈরাগ্য!— বলে হাসলো উৎপলা।

—চেনেন নাকি ডাঃ গুহকে?

—উনি খুব বিখ্যাত ডাক্তার সহরের। ওঁকে প্রায় সকলেই চেনে— বলে উৎপলা ও-আলোচনা বন্ধ করে অন্য কথা পাড়লো। কিন্তু নির্ম্মলা ভাবতে লাগলো—ডাঃ গুহকে উৎপলা কতখানি চেনে? চিন্তার জন্য কথায় সে যোগ দিতে পারছিল না ঠিকমত।

নিজের অতীত জীবন অনুসন্ধান করতে গিয়ে নির্ম্মলা এমন একটা জায়গায় এসে পৌছাল যেখানে ডাঃ গুহ একজন বিশেষ ব্যক্তি। কিন্তু সে দীর্ঘদিনের কথা। ডাঃ গুহ তখন সবে পাশ করেছেন আর নির্ম্মলা সপ্তদশী কুমারী। চিন্তাটা মনের পরতে আসতেই কেমন যেন লাল হয়ে উঠলো সে বাহ্যাভ্যন্তর।

'বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয়' অর্থে বিশ্বের শিশুদের বিদ্যালয়, যে শিশুদের ওপর কারো দাবী নেই এবং যে শিশুগণ কোনোদিন কারো কাছে দাবী জানাবে না। তথাপি জীবনের পিতৃপরিচয় কেন রাখতে চেয়েছে উৎপলা, সে এক রহস্য। এখানে কোনো বালকবালিকার কোনোই পরিচয় রাখা হয় না—না পিতার, না বা মাতার। শুধু যিনি শিশুকে দিয়ে যান, তাঁরই নাম-ঠিকানা এবং কোথায় শিশুটিকে পেয়েছেন, তাই লেখা থাকে। যদি কোনোদিন কেউ শিশুর উপর দাবী জানায় এবং

উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারে তো সে-শিশুকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এরকম ঘটনা এখানে এপর্য্যন্ত ঘটেনি। তবু উৎপলা চেয়েছিল, জীবনের পিতৃপরিচয়ে থাক্ সিদ্ধেশ্বরের নাম। কিন্তু অবন্তী লেখেনি সে পরিচয়। কারণ সিদ্ধেশ্বরকে কোনো হাঙ্গামায় জড়াতে চায় না অবন্তী।

সেই সিদ্ধেশ্বরই আজ এসে জানাল যে, জীবনকে সে নিয়ে যাবে হিমালয়ে। সেখানে যোগধর্ম্মে ওকে দীক্ষিত করে 'সন্ন্যাস' দেবে। কথাটা শুনে অবন্তী দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বলল,

—নিজেকে কেন তুমি আবার মায়ায় জড়াতে চাইছ, সিধুদা?

—মায়া নয়, অবন্তী, ভারতে সত্যকার সাধুর অভাব ঘটেছে। ঐ ছেলেটার মধ্যে সাধুর লক্ষণ দেখেছি আমি। ওকে আমি সত্যকার সন্ন্যাসী করতে চাই—এই ভারতে আবার সন্ন্যাসধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য।

—কিন্তু সিধুদা, জীবনকে মোটেই ভারতীয় বলে মনে হয় না। ওর আকার-আকৃতি সবই বৈদেশিক—ওর মধ্যে সাধুর লক্ষণ কিভাবে থাকবে! ও নিশ্চয় কোনো শ্বেতাঙ্গের ঔরসজাত। অবশ্য ওর আচার-আচরণ সবই ভারতীয়।

—আমার সে কথা মনে হয়েছে, অবন্তী! কিন্তু তবু আমি দেখেছি ওর মধ্যে সাধুর অসাধারণ লক্ষণ রয়েছে। অন্ততঃ আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

—তোমার ইচ্ছে হয় তো নিয়ে যাবে। কিন্তু সিধুদা, তোমার সাধনপথের কোনো বিঘ্ন না হয় ভেবেই আমি সম্পূর্ণভাবে তোমাকে মুক্তি দিয়েছি; নইলে আজ আমাকে এখানে এসে পরের ছেলে মানুষ করার কাজ করতে হোত না। তুমি আমাকে সেদিনও গ্রহণ করতে চেয়েছিলে। কিন্তু যে আধ্যাত্মিক জীবন তুমি লাভ করেছ, একটা বিদেশী ছেলে মানুষ করতে গিয়ে তা যেন পণ্ড না হয়ে যায়—

—আমার উদ্দেশ্য খারাপ নয়, অবন্তী! ফলাফল ভগবানের হাতে।

—বেশ, তুমি চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি একটা কথা বলি—একটু থামলো অবন্তী, তার পর বলল,— উৎপলাদি ওকে এনেছেন, খুবই স্নেহ করেন তিনি ওকে। অপর্ণা নামে কে একটা ঝি নাকি ওর মা, অন্ততঃ তাই আমরা জানি। বাবার সম্বন্ধে কারো কিছু জানা নেই। ও যদি সত্যি সাধক হয়, সন্ন্যাসী হয় তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু উৎপলাদির মত্ দরকার। আর—

—আর কি?

—আমি ওকে আরো দু'একবছর পালন করি। তারপর তুমি নিয়ে যেও। আগামী ফাগুনে ওর পরীক্ষা—সেটা দিয়ে নিক। এর মধ্যে আসন-প্রাণায়াম তুমি আরো কিছু শিখিয়ে দাও। সেগুলো অভ্যাস করুক এখন।

কথাটার যৌক্তিকতা অনুভব করলো সিদ্ধেশ্বর। অন্য কেউ ওখানে ছিল না; অবন্তীকে সিধুর সঙ্গে একা কথা কইতে ছেড়ে দিয়ে উৎপলা গিয়েছিল নির্ম্মলাকে নিয়ে বিদ্যালয় দেখাতে। সব দেখে নির্ম্মলা বলল,

—এ একটা ভাল কাজ, পলা দেবী! বর্ত্তমান যুগের মেকী ধর্ম্মাশ্রম থেকে এ কাজ অনেক বেশী মহৎ। কিন্তু এরকম এই একটামাত্র বিদ্যালয় তো যথেষ্ট নয়?

—না, এরকম শত শত হওয়া দরকার। কিন্তু করে কে? সরকারী সাহায্যও হয়তো পাওয়া যায়, তবু দেশের মানুষ উদ্যোগী হয় কৈ! আমাদের ইচ্ছে, এরই গোটাকয়েক ব্রাঞ্চ করি—হয়তো করা হবে।

—'হয়তো' কেন? আপনি করুন। কিন্তু এদের নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কী করা হবে?

—আমরা চাই দেশের একদল ভালো সন্তান তৈরী করতে। এমন এক সৈনিক-গোষ্ঠী আমরা তৈরী করতে চাই, যারা হবে যুগোত্তর জীবনের স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা! হিংসায়, দ্বেষে, দ্বন্দ্বে-যুদ্ধে হত-আহত আর্ত্ত-ব্যথিত পৃথিবীর মাতৃ-অন্তরকে আমরা সেই সন্তান উপহার দেব, যারা শান্তি-সৌম্য-সৌভ্রাত্রের বিজয়গানে পূর্ণ করবে আগামী দিনের পৃথিবীকে…

উৎপলা কথাগুলো বললো দীর্ঘদিনের একখানা চিঠি থেকে। কৃষ্ণার লেখা সে চিঠিখানি। কৃষ্ণা ছিল উৎপলার কলকাতা-আশ্রমের একজন কর্ম্মী। অত ভাল কর্ম্মী উৎপলা কমই পেয়েছে। আজ যদি সেই কৃষ্ণা থাকতো!…ভাবতে ভাবতে উৎপলা বলল,

—এ আইডিয়া অবন্তীর। কিন্তু তারও পূর্ব্বে আমার একটি বান্ধবী ছিল কৃষ্ণা নামে, সে-ই এর বীজ বপন করে যায় আমার এবং অবন্তীর মধ্যে।

নির্ম্মলা কিছু বলবার পূর্ব্বেই সিধু আর অবন্তী এসে দাঁড়াল। উৎপলাকে ওরা জানালো যে, জীবন আরো কিছুদিন থাক্ এখানে। এর মধ্যে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা ওর হয়ে যাবে। সিধু আজই কয়েকটা বিশেষ নিয়ম শিক্ষা দেবে জীবনকে, যেগুলো এই সময়টায় সে অভ্যাস করবে। উৎপলা শুনে বলল,

—কিন্তু ওকে সাধু তৈরী করে কী লাভ হবে?

—লাভ-অলাভের কথা জানি না, উৎপলা দেবী— সিধু স্নিগ্ধস্বরে বলল,— ও সাধু হবে, ওর সেই লগ্নে জন্ম। অবশ্য গোড়ার দিকে অনেক বাধাবন্ধ আছে, কিন্তু শেষ অবধি সাধু ওকে হতে হবে। যে লক্ষণ আমার শরীরে শৈশবে দেখে আমার ঠাকুরদা আনন্দ করতেন, আমি জীবনের মধ্যে সেই লক্ষণ দেখেছি। খুব স্পষ্ট লক্ষণ। আমি বিশ্বাস করি, ওর ফল ফলবেই।

—বেশ, ফলবে। কিন্তু আমরা কেন জোর করে সেটাকে আগিয়ে আনতে চাইছি! যার যা হবার হবে, স্বাভাবিক ভাবে—এইটাই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

উৎপলার কথায় সিধু আরো দমে গেল। ওর মুখের পানে চেয়ে গভীর দুঃখ জাগছে অবন্তীর অন্তরে। সে কিছু রুদ্ধস্বরে বলল,

—কাউকে সাধু বা অসাধু বানাবার তুমি কর্ত্তা নও, সিধুদা! তোমার নিজের সাধন-ব্যাপারেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। জীবন কী হবে, তা দেখবেন জীবনের ভাগ্যবিধাতা। অনর্থক কেন তুমি মোহগ্রস্ত হোচ্ছ! নিজের গুহায় গিয়ে তপস্যা কর-গে যাও। বর্ত্তমান যুগে সাধু-জীবনের কোনো মূল্য নেই…

—মূল্য না-থাকাই সাধুজীবন, অবন্তী! কিন্তু তোমার তিরস্কার আজ আমার সত্যি ভাল লাগলো। এই তো তোমার সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম! আমি কে ওকে সাধু বা অসাধু বানাবার? যিনি আমার মধ্যে এই সংকল্প জাগিয়েছেন, তিনিই তোমার মধ্যে একাজ করার বিপদ আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনিই উৎপলা দেবীর মধ্যে বাধা দান করলেন। বেশ, আমার আশ্রমেই আমি ফিরে যাব। যদি কখনো তোমার ইচ্ছে করে, অবন্তী, তাহলে চলে যেও—আমার ঠিকানা তোমার জানাই আছে— সিধু থামলো।

কিন্তু যাকে নিয়ে এতো ব্যাপার, সেই জীবন কোথায় ছিল আড়ালে দাঁড়িয়ে। অকস্মাৎ সামনে এসে পরিষ্কার কণ্ঠে জানাল,

—আমাকে যাবার অনুমতি দাও, মা—আমি সাধুই হতে চাই—

—আর একটু বড় হলে তোমার মতের মূল্য হবে, জীবন, এখন থাক্। পড়াটা শেষ করে নাও।—যাও এখন— উৎপলা বলল ওকে।

নিঃশব্দে চলে গেল জীবন। উৎপলা দেখলো ওর চলন-ভঙ্গিমা, যেন মার্চ করে যাচ্ছে কোনো সৈনিক।

—ওর মধ্যে সাধুর লক্ষণ কী দেখলেন আপনি? ও তো একটা পালোয়ান গোছের ছেলে। যুদ্ধে গেলে সৈনিক হতে পারবে।

—হ্যাঁ, সৈনিকই হবে ও। যুদ্ধের নয়, শান্তির সৈনিক। স্বাস্থ্যের প্রতীক ও, শান্তির দেবতা হবে—ও হবে আগামী যুগের পূর্ণ মানুষ—সিধু বলল হেসে।

—পূর্ণ মানুষ?— উৎপলার কথার সুরে বিস্ময়।

—হ্যাঁ, ওর মধ্যে পূর্ণ-মনুষ্যত্ব লক্ষ্য করেছি আমি। ওর জন্ম, ওর অজ্ঞাত জীবনেতিহাস—ওর অপরিচয়ের গ্লানিকে ছাড়িয়ে, ও সূর্য্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে জীবনে। ও জীবনরূপী রুদ্র, কালের মহিমময় স্রোতে ভেসে এসেছে মহাকালের মহিমা প্রকাশ করতে…

—আপনার কথা সত্যি হোক— উৎপলা বললো; তারপর বলল,—যদি একবছর পরে ওর মধ্যে দেখি সেরকম কিছু, তাহলে আপনার হাতে দেব আমি ওকে।

—আর না, আমাকে মাফ করবেন। আমি আর কোনো বিষয়ে নিজেকে জড়াতে চাই না। অবন্তী আমাকে সামলে দিয়েছে। আমি আজই চলে যাব আমার গুহাতে। এর পর অজানা এক ঈশ্বরের চিন্তায় আমার জীবন শেষ করবো, উৎপলা দেবী—মানুষের মধ্যে আর আমার ফিরে আসার ইচ্ছা নেই। অবন্তী আমাকে মুক্তি দিয়েছে। আর তো কোনো বন্ধন আমার রইল না—জীবনকে নিয়ে আর জড়ানো কেন!

উৎপলা কিছুই বলতে পারলো না। জীবনকে সিধুর সঙ্গে ছেড়ে দিতেই সে প্রথমটা রাজী হয়েছিল প্রায়; কিন্তু এখানে এসে তাকে দেখে, তার 'মা' ডাক শুনে উৎপলার মনটা অন্যরকম হয়ে গেল। না, জীবনকে সে ছেড়ে দিতে পারে না।

ওখানে খাওয়া সেরে দুটোর 'ডাউন' ধরে ওরা আবার কলকাতায় ফিরে এল। সিধু আর নির্ম্মলা গেল টালিগঞ্জ।

উৎপলা নিজের বাড়ীতে ফিরে দেখলো, বিকাশ, মিঃ সাহা আর বরুণ বসে আছেন তার অপেক্ষায়।

পথশ্রমে ক্লান্ত উৎপলা গৃহে ফিরেই ওদের দেখে খুসী হতে পারলো না। কিন্তু সে জানতো, ওঁরা আসবেন আজ সিনেমা-সংক্রান্ত কথার আলোচনা করতে; তাই জোর করে মুখে হাসি টেনে বলল,

—বসুন সব, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি—ওপরে চলে গেল উৎপলা।

কিন্তু হাত-মুখ ধোবার পূর্ব্বেই সোফায় সে শুয়ে পড়লো গিয়ে। কী যে এক মানসিক ক্লান্তি ওকে আচ্ছন্ন করছে, ও জানে না। কেন এই ক্লান্তি, ও বুঝতে পারছে না। এ যেন যুদ্ধজয়ের পর সৈনিকের শ্রান্তি। না না, যুদ্ধ কবে করলো উৎপলা! ওর ভাগ্যই ওকে সর্ব্বত্র বিজয়িনী করেছে। জীবন-যুদ্ধলক্ষ্মী ওর জন্য 'জয়মাল্য' সাজিয়েই রেখেছিল—কিন্তু শুধুই তো জয়মাল্য? কী পেল উৎপলা এই বিজয়ের পুরস্কার? কোথায় তার রাজ্য, রাজপুত্র, রাজসিংহাসন! এ যেন কোম্পানী-দত্ত 'রাজা' উপাধি—রাজ্য নেই, কোম্পানীর সম্মান যোগাতেই গলদঘর্ম্ম হতে হয়!

কী আছে আজ উৎপলার? না স্বামী, না বা পুত্র-কন্যা—নাই একটা স্নেহের অবলম্বনও! জীবনকে নিজের কাছে রেখে দিনকয়েক উৎপলা স্নেহের ক্ষুধা মিটিয়েছিল। কিন্তু মিঃ সাহা, মিঃ গায়েন, বিকাশ এবং সমাজের বহু ব্যক্তিই ঐ পথে-পড়া ছেলেটার 'মা' সাজা সহ্য করতে চায় না। জীবন অপর্ণার ছেলে—চরিত্র-ভ্রষ্টা একটা ঝি'র পুত্র! কিন্তু কে চরিত্রবতী? কেই-বা ঝি নয়? সংসারে সকলেই তো ঝি-চাকরের কাজ করছে। কেউ টাকার গোলামী করে, কেউ-বা সম্মানের, কেউ

আবার ও-দুটোর সঙ্গে রিপুর কৃতদাস—তবু জীবন সমাজগতভাবে ঝি'র ছেলে এবং তার কোনো পিতৃপরিচয় নেই। পিতৃপরিচয়ও সংগ্রহ করেছিল উৎপলা, সাধু সিদ্ধেশ্বরের সম্মতিতে। কিন্তু এখানে বহু ব্যক্তিই জানে—জীবন অপর্ণার পুত্র। সিধুকে ওর বাবা হতে হলে—অপর্ণার স্বামী হতে হয়। অকলঙ্ক সিধুর চরিত্রে এই অপবাদ দিতে চায়নি অবন্তী, এবং উৎপলাও। তাই সিধুর সম্মতি পেয়েও উৎপলা বা অবন্তী খাতায় লেখেনি সিধুর নাম জীবনের 'বাবা' হিসেবে।

কিন্তু আজ যখন সিধু নিয়ে যেতে এল জীবনকে একটা মহান জীবন-পথে চালাবার জন্য, তখন উৎপলা বাধা দিল কেন! কেন ছেড়ে দিল না জীবনকে সিধুর সঙ্গে? নিজের চিন্তায় নিজেই বিস্মিত হোল উৎপলা। ভাবতে লাগলো—জীবন চোর হবে অথবা সাধু হবে,. তাতে উৎপলার কি এসে যায়? কিছুমাত্র না। বরং সিধুর সঙ্গে জীবনকে ছেড়ে দিলে, একটা ভাল পথে তাকে এগিয়ে দেওয়া হোত। নিজের কাছে তো তাকে রাখতে পারলো না উৎপলা! চাকরের মত রাখলে অবশ্য কারও আপত্তি করবার কথা ছিল না। কিন্তু উৎপলা তা পারে নি। সন্তানবৎ ওকে মানুষ করতে গিয়ে উৎপলা সব থেকে বেশী আঘাত পেয়েছে তার মা'র কাছে! নইলে সামাজিক মর্য্যাদাকে হয়তো উৎপলা অগ্রাহ্য করতে পারতো। পারিবারিক অশান্তি অবিশ্রাম দগ্ধ করছিল উৎপলাকে, তাই ওকে বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয়ে দিতে বাধ্য হোল সে। এমন কি, ঐ বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয়টি জীবনকে রাখবার জন্যই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ কথা বললে বেশী বলা হয় না। কিন্তু, জীবনকে নিয়ে এতো ওর ভাবনা কেন?···

অকস্মাৎ উঠে পড়ল উৎপলা। নীচে ওঁরা সব বসে আছেন, দেখা করতে হবে। বাথরুমে ঢুকে মুখ-হাত ধুয়ে, কাপড় বদলে উৎপলা নীচে এল। বসবার ঘরে ঢুকবার পূর্ব্বেই শুনতে পেল, বিকাশ বলছে,

—'জ্বলদর্চ্চি' এক বৈরাগী মনের অনাসক্ত সৃষ্টি। সিনেমার ছবিতে চাই বেগ-আবেগ—অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত, হাসি-অশ্রুর নিবিড় প্রকাশ। ওতে তার কিছু নেই। তবু আপনারা কেন যে ও-বই করতে চান, জানি না! উৎপলাকে খুশী করার জন্য যদি হয় তো, আমার কিছু বলবার নেই।

—ওতে ভাল ড্রামা তৈরী হতে পারে, বিকাশবাবু— বরুণ বলল,— বেগ বা আবেগ অথবা অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত চিত্রনাট্য-লেখকের কাজ।

—কিন্তু জাতি-কুল-পরিচয়হীন সন্তান দিয়ে গল্পের আরম্ভ— মিঃ সাহা বললেন,— এ বস্তু ভারতবর্ষে, বিশেষ বাংলাদেশে চলবে বলে মনে হয় না। 'সেন্সর' হয়তো আট্‌কে দেবে। আর, সেন্সর ছাড়লেও, জনসাধারণ চাইবে না—

—তবু আপনি ঐ বইখানা কেন ধরতে চাইছেন?— বিকাশ প্রশ্ন করলো।

—কারণ,— মিঃ সাহা বললেন— গল্পটা নানা দিক দিয়ে অসাধারণ; ওতে ঘটনার অভিনবত্বের সঙ্গে চরিত্রের অজ্ঞাত দিক চমৎকার ফুটেছে। কুমারী মাতার বাৎসল্য সত্যবতীকে স্মরণ করায়, কুন্তীকে কৃপার চক্ষে আনে আমাদের—বিদুর-জননীর অপ্রকাশ মাতৃত্ব ব্যথা জাগিয়ে তোলে! নারী-জীবনের এমন অসাধারণ প্রকাশ আমি আর দেখিনি। ওদিকে এক ভীষ্মবৎ নির্ব্বিকার যোগী—অনাসক্ত দ্রষ্টা। অন্যদিকে এক শ্রীকৃষ্ণবৎ পুরুষ নিয়তির মত নির্ম্মম, নিজের বংশনাশকে যিনি আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত করেন···

—আপনি তো খুব রসজ্ঞ পাঠক, মিঃ সাহা!— বরুণ বলল প্রশংসা করে।

—না, এমন কী আর। তবে, দীর্ঘদিন নাটক নিয়ে কারবার করছি··· মিঃ সাহার সলজ্জ কণ্ঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপলা এসে বসল আসনে। বিকাশ বলল,

—তুমি কি 'বিশ্ব-শিশুদের' দেখতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। সেই সন্ন্যাসী ওখান থেকে একটি ছেলে চান শিষ্য করবার জন্য—

—নিলেন? কাকে নিলেন?

—দিইনি। উনি জীবনকে চান। বলছেন যে, জীবন বড় সাধু হতে পারবে—

—সেই ঝি'র ছেলেটা?— কথার সঙ্গে বিকাশ হেসে উঠলো তীব্র ভাবে।

—ওর মা ঝি, বাবা হয়তো রাজাধিরাজ। হয়তো বড় কোনো ঋষি, হয়তো পরাশর! এখানে এমনও তো কেউ থাকতে পারেন, যাঁর বাবা রাজাধিরাজ হলেও, মা হয়তো নগরের আবর্জ্জনা—হয়তো পণ্যনারী···! — উৎপলার স্বর তিক্ত।

—তুমি চটে যাচ্ছ, উৎপলা, আমি হেরিডিটির কথা বলছিলাম···

—তোমার বা আমার, অথবা আমাদের কারো সেটা জানা নেই বিকাশ! সাধু সিদ্ধেশ্বর বলছিলেন যে, জীবনের শরীরে সাধু হবার লক্ষণ আছে। ঝি'র ছেলে ঋষি নারদ, মহাত্মা বিদুর। জেলেনীর ছেলে বেদব্যাস। জবালার ছেলে সত্যকামও তো জবালোপনিষদের রচয়িতা! এ-সব হয় সব দেশে, সকল সময়। কিন্তু যাক্,—এখানে কী কথা হচ্ছিল?

—'জলদর্চ্চি' বইখানাই আমরা চিত্রায়িত করতে চাই— মিঃ সাহা বললেন।

—আলোকের সঙ্গে কথা বলা দরকার— উৎপলা মৃদু কণ্ঠে বলল।

—হ্যাঁ, আমার দেখা হয়েছে আলোকের সঙ্গে। তার অমত্ নেই। সে চায় যে, তার গল্প এবং চরিত্রগুলি যথাযথ রাখতে হবে— বিকাশ বলল।

—ড্রামা তৈরী করতে হলে অনেক অদল-বদল করতে হবে — বরুণ বলল।

—তা হোক, মূল গল্প ঠিক থাকা দরকার। মেকী হাসি বা নাকী কান্না অথবা খামোখা বিয়োগান্ত বা মিলনান্ত করা চলবে না, এই তার মত্।

—তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হোল তার ?— উৎপলা প্রশ্ন করল।

—আমার বাড়ীতে। তাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

—কেন ?— উৎপলার কণ্ঠে প্রভূত বিস্ময়— তুমি কি ছবির গল্পের জন্য তাকে ডেকেছিলে ?

—না। আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে।— হাসল বিকাশ কথাটা বলে ; বলল,— আলোক আমার সহপাঠী, বন্ধু। আজ আমি রাজনীতিক, সে লেখক। কিন্তু একদিন আমরা একসঙ্গে দর্শন আলোচনা করতাম···

—এখানে কি সে আসবে বলেছে ?

—না, ওরকম কোনো কথা আমি শুধোইনি তাকে। সে ব্যস্ত ছিল।

—মিঃ ম্যাকু তাহলে যাননি বোধ হয়— উৎপলা নিজের মনেই বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় গিয়েছিলাম— বলতে বলতে ম্যাকু প্রবেশ করলেন। বসতে বসতে বললেন,—আমার কথার বেঠিক হয় না, পলা দেবী ! তাছাড়া এটা আপনার কাজ। আমি সকালেই গিয়েছিলাম তার কাছে। সে বাড়ী ছিল না। ওখানে অঞ্জনা নামে যে-মেয়েটি থাকে, তাকেই বলে এসেছি। আলোক নিশ্চয় আসবে এখুনি।— মিঃ ম্যাকু কথাগুলো বলে গেলেন।

—না এলেও ক্ষতি নেই। সে আমাকে কথা দিয়েছে, 'জলদর্চ্চি'র ছবি করতে তার আপত্তি নেই। টাকাকড়ির কথা কিছু অবশ্য কইনি আমি। তবে, বইটার স্ক্রীন-রাইট কিনলে তো তাকে টাকা দিতে হবে ?

—নিশ্চয়। দশ হাজার টাকা আমরা দেব ও-বইএর জন্য—মিঃ সাহা বললেন।

—দশ—হা-জা-র! না-না-না, মিঃ সাহা, অত টাকা কেন দেবেন? দু'হাজার পেলেই আলোক বর্ত্তে যাবে। থাকে তো একটা কাণাগলির আধভাঙা বাড়ীতে, এক খেয়ালী লোকের সেক্রেটারী হয়ে! প্রাইভেট মাষ্টার ছিল ঐ মেয়েটার। ওকে অত টাকা কেন দিতে হবে অনর্থক?···

মিঃ ম্যাকু সজোরে এবং সবেগে বলে গেলেন কথাগুলো। মিঃ সাহা নিঃশব্দে চেয়ে আছেন উৎপলার পানে। বিকাশও নীরব। বরুণ যেন গায়ে-পড়া ভাবেই বলল,

—দশ হাজার টাকা খুব বেশী দাম।

—আরে না-না-না, কোম্পানীর অতখানি লোকসান আমি কিছুতেই হতে দেব না। দশহাজার টাকা একটা গল্পের দাম! একি রবীন্দ্রনাথের গল্প!— আবার বললেন মিঃ ম্যাকু।

—মিষ্টার ম্যাকু!— মিঃ সাহা ধীরকণ্ঠে বলতে লাগলেন— খেঁদী নামে একটা মেয়েকে, যার গুণের মধ্যে সে খুব কুৎসিত আর ঝগড়াটে—আপনি চারহাজার টাকা দিইয়েছেন 'জরদ্গব' ছবিতে ঝি'র পার্ট করবার জন্য। আর, একজন সত্যকার সাহিত্য-শিল্পীকে দশহাজার টাকা দিয়ে সাহিত্যকে সম্মানিত করতে আপনি এত নারাজ কেন, জানতে পারি কি?

—না-না না···নারাজ নয়, আমি ন্যায্য মূল্য দিতে চাইছি। অর্থাৎ, আমার মতে ও-গল্পের দাম দু'হাজারের বেশী নয়। অবশ্য উৎপলা দেবীর মত্ ফাইন্যাল বলে বিবেচিত হবে।

—না— উৎপলা বলল,— ছবির জন্য আমি 'জলদর্চ্চি' নির্ব্বাচন-ই করিনি। বাংলাদেশে ও-বইএর ছবি করবার মত সাহসী কোম্পানী আজও গজিয়েছে বলে আমার জানা নেই। ওর চরিত্রগুলো অসাধারণ

উলঙ্গ, গল্পটা অস্বাভাবিক আবেগহীন। ও যেন বৈশাখী সূর্য্যের প্রখর তাপ—কোথায় মাটি ফাটছে, দেখবে না; কোথায় জল শুকোলো, জানতে চাইবে না—তৃষ্ণায় কে কার বুকের রক্ত পান করলো, দরদহীন হাতে লেখক লিখে গেছে। বঞ্চিত প্রেম আর ক্ষুধিত মাতৃত্ব ওখানে নিয়তির মত অনিবার্য্য। মানুষ ও-বইএ মহাভারতের চরিত্রের মত. পুতুল—এক নিষ্করুণ চক্রই সব-কিছু চালনা করে! ও বই চলবার মত মন আজও তৈরী হয়নি দেশের!

উৎপলার কথার পর আর 'জলদর্চ্চি' সম্বন্ধে আলোচনা হবার কথা নয়, কিন্তু বিকাশ কিছু বলতে চায়; তার পূর্ব্বেই মিঃ সাহা বললেন,

—আমরা একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারি। কিছুদিন আগে একখানা ছবিতে বিধবা তরুণীর তীর্থযাত্রা-পথে প্রেম করার কাহিনী চলতে দেখলাম—

—মানবতার দিক থেকে চলাই তো উচিত। বিধবা হলেই সে বিষাক্ত হয় না। তারও অন্তরে অমৃত থাকতে পারে।— বলল উৎপলা,— কিন্তু মিঃ সাহা, 'জলদর্চ্চি' বহু-টাকার ব্যাপার। লোকসান খেলে কোম্পানীর ক্ষতি হবে—

—না, একেবারে লোকসান খাবার ভয় নেই। অবশ্য ছবিটার 'ট্রিটমেণ্ট' খুব ভালভাবে হওয়া দরকার। আলোকবাবু নিজে ভার নিলেই ভাল হয়। বরুণবাবু তাঁর সঙ্গে থাকবেন— মিঃ সাহা তাকালেন উৎপলার দিকে।

—আমার আপত্তি নেই। তবে আলোক কি করবে তা সে-ই জানে!

—চলুন না, যাওয়া যাক্ ওঁর ওখানে একবার— বললেন মিঃ সাহা।

—যাবেন?— বরুণ বলল— গেলে মন্দ কি হয়?

—বেশ তো, চলুন। আমি বাড়ী চিনে এসেছি। যেতে অসুবিধা হবে না।— মিঃ ম্যাকু বললেন।

মিঃ ম্যাকুর কথার পর সবাই চুপচাপ। উৎপলাকেই কথার জবাব দিতে হবে। কিন্তু সে বসেই রইল চুপ করে। বিকাশ বলল,

—অকস্মাৎ এক অপরিচিত বাড়ীতে উৎপলার যাওয়া ঠিক হবে না—

—না, বিকাশ! অপরিচিত নয় অঞ্জনা— উৎপলা হাসলো।

—তবে?— বিকাশের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ।

—আমার সাহস হয় না— উৎপলা মলিন হাসলো— পৃথিবীতে ঐ একটিমাত্র মানুষ, যার দৃষ্টির সামনে আমি পদ্মের মত বিকসিত হতে পারি। আবার, ঐ একটি মাত্র মানুষ, যার প্রখর কিরণ থেকে আত্মরক্ষা করতে আমাকে পাতার আড়াল খুঁজতে হয়।

—জলেও বাস করতে হয়— বিকাশ বিদ্রূপ করলো।— কিন্তু কেন উৎপলা?

—মানুষের অন্তরের আত্মপ্রকাশকে বিদ্রূপ করো না, বিকাশ, ওতে নিজের আত্মার অসম্মান করা হয়। আলোক তোমার বা আমার কাছে অতি তুচ্ছ একটা প্রাইভেট মাষ্টার বা প্রাইভেট সেক্রেটারী, অথবা একটা দরিদ্র সাহিত্যিক—কিন্তু দীপের শিখার দাহিকা-শক্তি কিছু কম নয়, বিকাশ! তোমার গলার হীরের বোতামের থেকে তার দীপ্তি অনেক বেশী, তোমার প্রাসাদের থেকে তার পায়ের ধূলো মূল্যবান—এ সত্য তুমিও জানো।

—আলোক সম্বন্ধে তুমি কিছু বেশী উচ্ছ্বাস-পরায়ণা, পলা! এর কারণ, তুমি তাকে অহেতুক একটা প্রেমের চোখে দেখ। আলোক মহৎ, আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু তার ভয়ে তোমার লুকিয়ে থাকবার তো কোনো হেতু দেখি নে?

—ভয়ে নয়, বিকাশ, ভালবাসায়। আমার ভালবাসা শুকিয়ে যাবার ভয়ে ওর কাছ থেকে আমি দূরে থাকতে চাই…

—এমন ঠুনকো ভালবাসার দাম কী, উৎপলা?— বিকাশ যেন রূঢ় হয়ে উঠলো।

—তুমি বুঝবে না, বিকাশ! ভালবাসা ঠুনকোই হয়। প্রেম ফুলের মত কোমল। এ তো কাম নয় যে, দেহ নিষ্পেষিত করে অর্ঘ্য দিতে হবে! একে সযত্নে সাজিয়ে রাখতে হবে পুকুরের পদ্মের মত দূরে দূরে। রাত্রে বুজে-থাকা পদ্মের প্রভাত-জাগরণ তুমি দেখনি, বিকাশ—মধ্যাহ্ন-সূর্য্যেও দেখনি তুমি পদ্মকে! তুমি দেখেছ—গোলাপ, শীতের অন্ধকার রাত্রেও যার অভিসার অনায়াস। কিন্তু থাক্ এসব কাব্য। আমার আত্মপ্রকাশের এটা স্থান, কাল, পাত্র নয়…

—আলোককে তুমি তো বিয়ে করলেই পার, উৎপলা!

—বিয়ে? না বিকাশ, বিয়ে করলে তোমাকেই করতাম। বর হিসাবে তুমি-ই বরণীয়।

—আলোক শুধু স্মরণীয়?— বিকাশের হাসিটায় ব্যঙ্গ বিচ্ছুরিত।

—হ্যাঁ। কিন্তু আলোচনাটা ব্যক্তিগত হচ্ছে, বিকাশ। তোমরা চাও তো, যাও আলোকের কাছে। আমি যদি কখনো যাই, তো একা যাব। অভিসারিকার মত যাব। 'জলদর্চ্চির' চিত্ররূপের জন্য আলোকের সঙ্গে আমি আলাপ করতে যাব না। আমি আজ ক্লান্ত আছি…উঠলাম—

উৎপলা উঠে চলে গেল। বিকাশ চুপ করে রয়েছে। মিঃ ম্যাকু বললেন,

—চলুন না, আমরাই চলুন যাই ওর বাড়ী। এই তো শ্যামবাজার?

কেউ কোনো কথা কইল না।

চৌরঙ্গীর পথে আসতে আসতে আলোকের অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল, বড় একটা সুটকেস তার দরকার বাইরে যাবার জন্য। বাস থেকে

নেমে পড়ল। রাস্তা পার হয়ে এ-পারের দোকানে আসছে, হঠাৎ ডাক শুনতে পেল,

—আলোক—ও আলোক—আলোক···

তাকিয়ে দেখলো এক শ্মশ্রুকেশধারী গৈরিকবাস সাধু ডাকছেন। কাছে এসেই চিনতে পারলো—সিদ্ধেশ্বর, পাশে এক মহিলা। ওরা ট্যাক্সিতে রয়েছে। দেখেই বোঝা যায়, ট্রেনের ক্লান্তি সর্ব্বাঙ্গে।

—কি রে সিধু? কোত্থেকে?

—আয়, উঠে বোস, আলোক—টালিগঞ্জে আয় আমাদের সঙ্গে। ওখানেই কথা হবে। আমরা অনেক দূর থেকে আসছি— বলতে বলতে সিধু হাত ধরে টেনে নিল আলোককে ট্যাক্সির মধ্যে। ট্যাক্সি চলতে লাগলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আলোক বলল,

—কবে এলি তুই কলকাতায়? কেমন আছিস?

—আছি ভালই। বলছি সব কথা। এই মেয়েটির নাম নির্ম্মলা, আমার গুরুভগ্নী। আমরা গিয়েছিলাম··· বলে সিদ্ধেশ্বর বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয় সংক্রান্ত কথা বললো আলোককে। সব শেষে বলল,

—অবন্তী ওখানে ভালই আছে, আলোক! সে-ই আমায় ফিরিয়ে দিল।

—খুব ভাল করেছে, সিধু! সত্যিই সহধর্ম্মিণীর কাজ করেছে সে। তোর আর কিছুতে জড়ানো উচিত নয়। —বলে আলোক আকাশপানে চেয়ে রইল গাড়ীর জানালায় মুখ বাড়িয়ে। নির্ম্মলা নিশ্চুপ বসে ছিল। এতক্ষণে বলল,

—সিধুদা ওঁর সাধনার বীজ কোথায় রাখবেন ভেবে ঐ ছেলেটিকে নিতে চেয়েছিলেন···

—সাধনার বীজ আকাশে-বাতাসে থাকে, নির্ম্মলা-দিদি! ঋষিযুগের সাধন-মহিমা আজও এদেশের প্রতি পরমাণুতে রয়েছে, তাই সিধুর

পকেটে শালগ্রাম-শিলা ঢুকে তাকে সাধু করে—তাই অবন্তীর বঞ্চনার বেদনা অন্নপূর্ণার মাতৃমহিমায় বিকসিত হতে চায়! সহুরে অবন্তী সহধর্ম্মিণী হয়ে ওঠে, নাগরী অবন্তী নারীত্বের বিজয়নিশান উড়ায়। সাধনার বীজ সঞ্চিত রাখতে এখানে মহারুদ্র যুগে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন—যাঁর দৃষ্টি সত্যদৃষ্টি···শুভদৃষ্টি···পাষণ্ড সিধুকে যে-দৃষ্টি পরম পথে চালনা করেছে—

—আমার প্রশংসা করছিস, আলোক?

—না সিধু, কারও নিন্দা-প্রশংসার বাইরের এ কথা। এদেশের জল-মাটিতে যা জন্মায়, তার কথাই বলছি। এখানে বেশ্যা হয় ব্রতচারিণী, স্বৈরিণী হয় সহধর্ম্মিণী! এদেশে লাম্পট্যের মধ্যে থাকে স্বর্গীয় প্রেম—দস্যুতার মধ্যে দাতাকর্ণের মহত্ব।

—কিন্তু আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে, আলোক! সেই জল-মাটি-হাওয়ার জোর যেন কমে আসছে। ক্রমশঃ যেন আমাদের মানবধর্ম্মও বিসর্জ্জন দিতে চলেছি···

—ও কিছু না। মহাকাল জেগে রয়েছেন সর্ব্বদা— আলোক বলল,—ধর্ম্ম ছাড়া এদেশের আর কোনো সম্বল নেই, সিধু! এদেশের যা-কিছু গৌরব সব ধর্ম্ম নিয়ে। ত্রিশরণ মন্ত্র বা পঞ্চশীলের কথা ঐ ধর্ম্ম থেকেই এসেছে। সাময়িক গ্লানি এখানে জাগে, কিন্তু সেটা একান্ত সাময়িক। তার প্রয়োজন শুধু ধর্ম্মকে যুগোপযোগী করবার জন্য। পৃথিবীতে ভারতবর্ষ ধর্ম্ম ধরেই টিঁকে থাকবে শুধু নয়, সগৌরবে গুরু হয়ে থাকবে মানুষের।

পথ শেষ হোল। গাড়ী এসে থামলো নির্ম্মলার বাড়ীর দরজায়। নির্ম্মলা সাদর আহ্বান জানালো আলোককে নামবার জন্য। কিন্তু আলোক বলল,

—আপনারা ক্লান্ত। এখন আর আমি গিয়ে কি করবো! আজ যাই, আর একদিন কথা হবে—

—না, আমরা হয়তো আজই রাত্রের গাড়ীতে চলে যাব। আসুন আপনি—

আলোক আর কথা বাড়ালো না, ঢুকলো ওদের সঙ্গে ভেতরে। ভাল গাড়ীতে ভাল ক্লাশে এসেছে ওরা, খুব বেশী ক্লান্ত তাই হয়নি। শুধু গরমের জন্য শরীর কিছু অবসন্ন। কিন্তু সিধু সন্ন্যাসী মানুষ, কৃচ্ছ্র সাধন ওর করায়ত্ত। বাথরুমে ঢুকে মগ-কতক জল ঢেলেই ও বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। নির্ম্মলাও স্নান করে কাপড় ছেড়ে এল। আলোক চুপচাপ বসে একখানি গীতার পাতা উল্টাচ্ছিল। সিধুর ঝোলার সম্পদ ওই গীতাটি। পূজা করে। পাঠ করে সময় সময়।

—তুই কি কোনো আশ্রমে থাকিস, সিধু? কিম্বা গুহাতে?—

—আশ্রমেই থাকতাম। এখন থাকি দূর-পাহাড়ে, একটা কুঁড়ে বেঁধে। চণ্ডীপাহাড় নাম। যদি কখনো যাস, ওখান হয়ে আসিস, আলোক! স্থানটি খুব মনোরম। তোর পছন্দ হবে। কিন্তু তোর ঘর-সংসার কি, আলোক? বিয়ে তো করেছিস?

—না। বিয়ে আর করবো না— আলোক বলল হেসে।

—তাহলে কি সন্ন্যাস নিবি শেষটায়?

—না সিধু, সন্ন্যাস আমার ধর্ম্ম নয়। আমি শুধু দেখে যাব পৃথিবীতে কত দেবাত্মা মানব আছে, আবার মানবরূপী দানব আছে! আমি দেখবো, মহাকাল কেমন করে জীবনকে জন্ম-জরা-মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মহামানবতার পথে নিয়ে চলেছেন! দেখবো,—আণবিক অস্ত্রের ধ্বংসের অন্তরালে কেমন করে বিশ্ব-কল্যাণের সঞ্জীবনী লুকিয়ে থাকে! এই আমার সাধনা।

—ও খুব বড় সাধনা, আলোক! কিন্তু, ওগুলো ক্ষুরধার চিন্তার রাজ্য। অধ্যাত্ম রাজ্য অন্য-একটা ব্যাপার—যেখানে মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান অসীম হয়ে যায়—

—হ্যাঁ, সিধু! কিন্তু সে-জ্ঞান সাধারণ মানুষের কাজে লাগে না। নিরাকার ব্রহ্মধ্যানে ব্যক্তিগত ব্রহ্মানন্দ লাভ হতে পারে, সমষ্টিগত লাভ ওতে খুবই কম। তাই বলে আমি তোকে নিরুৎসাহ করছি না। যে পথে তুই চলেছিস, তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু আমার পথ ভিন্ন। আমি অনন্তকাল ধরে বিশ্বলীলা প্রত্যক্ষ করতে চাই সাধারণ জীব আর জগতের মধ্যে। অতীত যুগের সঙ্গে অনাগত যুগের সেতুবন্ধনটি কেমন অপরূপ কৌশলে হয়ে যাচ্ছে, তাই আমি দেখবো—যিনি ঐ সেতুবন্ধন রচনা করেন, তাঁকে না-দেখলেও আমি ক্ষতি বোধ করি না। আমি অভিনয় দেখছি, নাট্যকারকে নাই-বা দেখলাম!

—আমি তোকে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে পারবো না, আলোক। আমি বিশ্বাস করি তোর সাধনা আরো মহান, আরো উচ্চাঙ্গের। কিন্তু এও সত্য যে, অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণশীল সাধুদের ব্যক্তিগত কল্যাণচিন্তা পৃথিবীর সমষ্টিগত কল্যাণও প্রসব করে—

—হ্যাঁ, করে। সেই কথা এখানে এসেই বলেছিলাম। আজও ঋষিযুগের সাধনশক্তি এদেশের আকাশে বাতাসে কল্যাণ-প্রস্থ হয়ে রয়েছে বলেই, এদেশের এত গৌরব। স্বাধীন ভারতে এইজন্যই কল্যাণরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করে, পঞ্চশীলের পরিকল্পনা হয়—মানুষের আত্মঘাতী যুদ্ধোন্মাদনাকে নিরস্ত করতে শান্তির বাণী বহন করে চলে ভারত দেশে দেশে। কিন্তু মহাকাল কী যে করবেন—বলা যায় না, সিধু! তিনি নিয়তির মতই নিষ্ঠুর। মূর্তি তৈরী করতে ছেনীর ঘা দিতে তিনি কার্পণ্য করেন না—

সিধু নিঃশব্দে বসে রইল। আর কোনো কথা বলবার মত নেই যেন তার। আলোক এবার উঠবে; ওকে যেতে হবে শ্যামবাজার—অনেকদূর রাস্তা, কিন্তু সিধু হঠাৎ বলল,

—একটা অনুরোধ আছে, আলোক! রাখবি?

—কি ? বল !—আলোক অপেক্ষা করতে লাগল।

—জীবন নামে যে ছেলেটি থাকে ঐ শিশু-বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমি তাকে দীক্ষা দিয়ে সাধনার পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। উৎপলা দেবী দিতে চাইলেন না। কে জানে কেন, তিনি পছন্দ করেন না ওর সাধু হওয়া। কিন্তু ছেলেটার মধ্যে অসাধারণত্ব লক্ষ্য করেছি আমি। ওকে সুযোগ দেওয়া দরকার। আমার অনুরোধ, তুই ওকে মানুষ করবার ভার গ্রহণ কর। ও একটা অসাধারণ মানুষ হবে।

—হাঃ-হাঃ-হাঃ— আলোক হেসে উঠলো। বলল—তোর সাধন-ভজন কিছুই হচ্ছে না, সিধু, বৃথা ঘুরে মরছিস। জীবন কী হবে বা না-হবে, তা নিয়ে তোর অত মাথাব্যথা কেন ? কে কী হবে তা কেউ জানে না। জীবনকে যিনি জননীর গর্ভে এনে এতবড় করেছেন, তিনিই ওকে মানুষ বা অমানুষ, যা খুসি করবেন। তোর বা আমার ইচ্ছেতে কিছুই হয় না, সিধু—ঐ পাতাটিও পড়ে না। এ বোধ তোর হয়নি আজও ? কী তবে করছিস বনে-জঙ্গলে ঘুরে ?

—আমি ওর মধ্যে সাধুর লক্ষণ দেখেছি, আলোক— সিধু আত্মসমর্পণ করছে যেন।

—বেশ, ওর সাধু হবার হয় তো, যিনি লক্ষণ দিয়েছেন, তিনিই সেটা করবেন। এখানে তোর আমার কর্তৃত্বের মূল্য কি ? তুই চেষ্টা করেছিলি, এই যথেষ্ট। এখন নিজের গুহায় গিয়ে সাধনা কর। তোর যে পথ, সে পথে আত্মকর্তৃত্ব অহঙ্কারের দ্যোতক। অবন্তীকে আমি আজ প্রণাম জানাচ্ছি, কারণ সে সত্যি তোর সহধর্ম্মিণীর কাজ করেছে তোকে ফিরিয়ে দিয়ে। তোদের দেহজ কাম আজ প্রেমজ পরাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সিধু ! আজ অবন্তী তোর সত্যকার সাধন-সঙ্গিনী।

সিধু নির্নিমেষ চোখে চেয়ে ছিল আলোকের পানে। কথা শেষ হলে বলল,

—এমন করে আমি হয়তো বলতে পারবো না, আলোক—তবে তোর এই কথাই আমি সারা অন্তর দিয়ে অনুভব করছি—সন্ন্যাস না নিয়েও তুই সাধক, তুই চির সন্ন্যাসী! অবন্তীকে আমি কখনো স্পর্শ করিনি। আমি জানি, অবন্তী দুশ্চারিণী, অবন্তী অসতী। কিন্তু ঐ অবন্তীই আমার জীবনে আজ ইষ্টদেবী হয়ে উঠলো, আলোক—

সিধুর কথা আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে গেল। আলোক হেসে বলল,

—নিজেকে নিস্পৃহ কর, সিধু, শুধু দেখে যা সেই বিশ্বনিয়ন্তার ধ্বংস আর সৃষ্টি, সৃষ্টি আর ধ্বংস! অবন্তী কী হবে তা আমরা জানতাম না। তুই কী হবি, তুই কি জানতিস? মানব-জীবন এমন অজ্ঞাত এক রহস্য-পারাবার যার কূল নেই, পার নেই। এই দৃশ্যমান জীবনেই যখন এত রহস্য, এত দুর্গমতা—তখন জীবনের পর জীবনকে জানার সাধনা কত কঠিন, কত মহৎ, কত আনন্দময়—অনুভব কর, সিধু! মুক্তি নিয়ে কি হবে? এই বিশ্বলীলা প্রত্যক্ষ করার মধ্যে কি আনন্দ নেই?

সিধু চুপ করে রইল। নির্মলা নিশ্চুপ বসে শুনছিল ওদের কথাবার্ত্তা। আলোকের কথায় ওর অন্তরে অনেক ভাবের আলোড়ন জেগেছে। এতক্ষণে বলল,

—বিশ্বলীলা প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে নিজেকে যে জড়িয়ে ফেলতে হয়, আলোকদা···

—কিছুটা পড়তে হবেই। তবে পাঁকাল-মাছের মত থাকার চেষ্টা করতে হয়। দেহে যদিও পাঁক লাগে, মনকে রাখতে হবে নির্মল। সাধনার এটা গোড়ার কথা, দিদি! আপনারা এই পথে চলছেন, আমি এ বিষয় কি বলবো? আমার ধারণা, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস রেখে নিজেকে নিস্পৃহ এবং নির্ব্বিকার করতে পারলেই সাধনা হয়, সিদ্ধি

হয়। সবই লাভ হয়। এর জন্যে গিরিগুহা বা বন-জঙ্গল হাতড়ে বেড়ানো নিরর্থক। অনশন বা অর্দ্ধাশনেরও প্রয়োজন নেই। বিশ্বলীলায় তিনি থাকুন বা না-থাকুন, লীলা তো প্রত্যক্ষ! সেটা দেখতে জানলে যে আনন্দ লাভ হয়, আপনাদের ভূমানন্দ থেকে তা কম কিসেব?—হাসলো আলোক— অবশ্য 'ভূমানন্দ' কি, আমি জানি না। কিন্তু সিধু, অনন্ত বিশ্বের সৃজন-পালন-লয়ের কর্ত্তাকে তুই কয়েকটা প্রাণায়ামের 'দম' টেনে আর কয়েক হাজার 'নাম' জপ করে জেনে ফেলবি—এই-বা কেমন দুঃসাহস?

—সত্যিই দুঃসাহস, আলোক, তাঁব কেউ ইতি করতে পারেনি!

—এ নিয়ে আর কথা বাড়াবো না, সিধু, তবু এইটুকু বিশ্বাস কবি যে, কে কী হবে—কেউ জানে না। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিতে ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ হয়তো একে আমার মানসিক দুর্ব্বলতা বলবে। বলুক। তবু এটা সত্য যে, সৃষ্টিলীলায় কিছুর উপর কারো হাত নেই।

আলোক উঠলো। নির্ম্মলা এসে প্রণাম করলো ওকে। নিঃশব্দে আশীর্ব্বাদ করে সে বেরিয়ে যাচ্ছে, নির্ম্মলা অতি সংক্ষেপে বলল আলোককে তার আশ্রমবাসের কাহিনী। আলোক সব শুনেও চুপ করে রয়েছে।

নির্ম্মলা কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থাকার পর বলল,

—আমার আর কলকাতায় একদণ্ড থাকার ইচ্ছে নেই। কিন্তু যেখানে ছিলাম, সেখানেও ফিরে যেতে ইচ্ছে করি না। আমি কী করবো, আলোকদা? কোথায় থাকবো আমি? —নির্ম্মলার কণ্ঠে কাতরতা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

—এতবড় বিশ্বরাজ্যে থাকবার অভাব হবে না, নির্ম্মলাদি! বিশেষতঃ তুমি অর্থহীন নও। আপাততঃ এখানেই তুমি থাকতে পারবে কিছুদিন—

—না, আলোকদা, এখানকার ঠিকানা সেই আশ্রমের লোকেরা জানে। আমাকে তারা এখানে থাকতে দেবে না। যদি ওখানে ফিরে না যাই তো, ওদের আশ্রমের গুপ্তকথা ফাঁস হবার ভয়ে আমাকে ওরা কী না করতে পারে?

—বল কি, নির্ম্মলাদি!

—কিছু বেশী বলছি না।

আলোক শুধু চুপ করে রইল দীর্ঘক্ষণ। নির্ম্মলা ওর উত্তরের প্রত্যাশায় বসে থেকে শেষে অধীর হয়ে বলে উঠলো,

—আমি তাহলে অবন্তী দেবীর বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয়ে যোগ দিই গিয়ে—

—না— আলোক বলল,—না নির্ম্মলা, ওকাজ তোমার নয়। তুমি নারী হলেও ঠিক 'মা' নও; নায়িকাও নও তুমি, তুমি সাধিকাও নও। তোমার মধ্যে রাজনীতির সাধনা লক্ষ্য করেছি, ধর্ম্মনীতির সাধনাও লক্ষ্য করলাম। এখন তুমি সমাজনীতিতে গেলেও একই ফল হবে। তুমি পাশ করতে পারবে না। তোমার ঐ আশ্রমে ফিরে যাওয়াই উচিত।

—আমাকে আবার ওখানে যেতে বলছেন!

—হাঁ। ওখানে যতটা ক্ষতি তোমার হবার, তা হয়েছে। এবার ওখানে থেকেই আত্মসংশোধন কর কিছুদিন। তার পর ঈশ্বর যেমন করাবেন, তাই করবে।

—কেন একথা বলছেন, আলোকদা!— নির্ম্মলার চোখ অশ্রুপঙ্কিল হয়ে উঠলো।

—তুমি অকালে ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে বাহাদুরি দেখাতে গিয়েছিলে, নির্ম্মলা, তাই তোমার পতন ঘটলো এভাবে। ভোগ পূর্ণ না হলে ত্যাগ করা যায় না। তোমার এখনো সময় হয়নি। ওখানেই তুমি ফিরে যাও—

নির্ম্মলা আর কিছু বলল না। আলোক চলে যাওয়ার পর সামান্য

জলযোগ করে ওরা শুয়ে পড়ল। ভোরে উঠেই রওনা হয়ে গেল যে যার ঠিকানায়।

আশ্রমের কামরায় সীমা একাকিনী। বেশ বুঝতে পারছে যে তাকে বন্দী করা হয়েছে, যদিও বাইরে থেকে বুঝবার কোনো উপায় নেই যে সে বন্দিনী। খাবারের থালাটা পড়ে আছে। সীমা খায়নি। বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছে—সীমা শোবে কিনা, কে জানে! নিশ্চুপ বসে বসে ভাবছে। রাত দশটার বেশী।

কেন এরা সীমাকে বন্দী করলো! সীমার সঙ্গে এখনো বড় জোর শ'খানেক টাকা আছে, আর যে সামান্য অলঙ্কার এবং হাতঘড়িটা রয়েছে তার মূল্য চার-পাঁচশো টাকার বেশী নয়। এতো অল্পের জন্য এরা নিশ্চয় একজন নারীকে বন্দী করবে না—সীমা ভাবছে, আর একটা বস্তু আছে, সীমার রূপ-যৌবন এবং সতীত্ব। সতীত্ব কথাটা মনে পড়ার সঙ্গেই সীমার হাসি পেল। কিন্তু সীমা তো এখনও দ্বিচারিণী হয়নি!—তার সতীত্ব সে রক্ষা করবে। তার নারী-মর্য্যাদার হানি ঘটতে দেবেনা সীমা—যা হবার হোক!

সীমা আহার্য্য স্পর্শ করলো না, চুপ করে শুয়ে পড়লো বিছানায়—ভাবলো, সে কিছুতেই ঘুমুবে না। কিন্তু কখন ঘুমিয়ে পড়েছে! দূরের ট্রেনের আওয়াজে ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখলো, ভোর। পশ্চিমগামী ভোরের ট্রেন জংশন ষ্টেশনে দাঁড়ালো এসে। সীমা উঠে বসলো বিছানায়। না-খাওয়ার জন্য শরীর অবসন্ন। মনের জোরে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল আশ্রমের বাগানে।

উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আশ্রম। সুমুখের গেটে দুজন সন্ন্যাসী দাঁতন করছেন গাছের ডাল দিয়ে। সীমা বুঝলো, দাঁতন করবার সঙ্গে

গেট পাহারা দিচ্ছেন ওঁরা। সীমা খানিক দূরে দূরে বেড়াতে লাগল। গেটের সামনে থামলো একটা সাইকেল-রিক্সা; নামলেন সুটপরা এক ভদ্রলোক। দুটো সুটকেস আর প্রকাণ্ড একটা বেডিং তাঁর সঙ্গে। সেগুলো নামিয়ে, ভাড়া চুকিয়ে তিনি গেটের ভেতর এসে প্রশ্ন করলেন,

—নির্ম্মলা দেবীর সঙ্গে এখন দেখা হবে তো?

—না। তিনি কলকাতা গেছেন। আসুন, ভেতরে আসুন—

স্বাগত জানালেন সন্ন্যাসীরা। ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে কিঞ্চিৎ কাছাকাছি আসতেই সীমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো—সীমা চেনে ঐ ভদ্রলোকটিকে। উনি-ই ডাঃ গুহ! সীমা কেমন-যেন অভিভূত হয়ে উঠলো। সে ছুটে পালিয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় পালাবে? চারিদিকে সুদৃঢ় সুউচ্চ প্রাচীর। অভিমন্যুর মত সীমা এই আশ্রম-ব্যূহে ঢুকে পড়েছে। নির্গমনের পথ জানা নেই। এখানে সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত হয়ে ওকে অপমৃত্যু বরণ করতে হবে!

ডাঃ গুহ এইদিকেই আসছেন। সন্ন্যাসী দুজন বয়ে আনছেন তাঁর সুটকেস আর হোল্ড-অল। সীমা একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়ালো। কিন্তু ডাঃ গুহ ওকে দেখে ফেলেছেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন,

—সীমা! তুমি এখানে?

—হ্যাঁ— নিরুপায় সীমা স্খলিত কণ্ঠে জবাব দিল ঝোপের আড়াল থেকেই।

—নির্ম্মলার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

—না, আমি আসার আগেই নির্ম্মলাদি কলকাতা চলে গেছেন।

—তুমি এখানে কেন এসেছ, সীমা? এমনি বেড়াতে?

—হ্যাঁ— বলে সীমা পাশ কেটে চলে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ডাক্তার গুহ তাঁর সঙ্গী সন্ন্যাসী দুজনকে বললেন,

—এর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আপনারা আমার জিনিষগুলো নিয়ে যান যেখানে যাবার, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

—ওর সঙ্গে পরে কথা বলবেন। আসুন, মুখহাত ধুয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে কিছু খান···

—না— ডাঃ গুহ যেন ধমক দিলেন ওদের— আগে ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। যান আপনারা—

সন্ন্যাসী দুজন কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন—তবু কিন্তু তাঁরা যাচ্ছেন না। ডাঃ গুহর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। সরোষে বললেন,

—ও আমার বিশেষ পরিচিতা। আত্মীয়া। ওর সঙ্গে কথা বলবো, সেখানে আপনারা সঙ-এর মত দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন? যান—

সন্ন্যাসীরা আর কিছু বলতে সাহস করছেন না—চলে যাবেন—কিন্তু একজন বললেন,

—কোনো আশ্রমবাসিনীর সঙ্গে বিনা অনুমতিতে কথা বলা নিষিদ্ধ।

—বলেন কি! কেন? কতদিন থেকে ও আপনাদের আশ্রমবাসিনী?

—বেশিদিন না হলেও, ও আশ্রমের কন্যা—আপনি গুরুজির অনুমতি নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন। আমরা এখানকার আইনের দাস।

—আচ্ছা। চলুন— ডাঃ গুহ বললেন,—আপনাদের আইনটাই দেখা যাক্—

ওরা সবাই এগিয়ে গেলেন। একটা ঝোপের আড়াল হয়ে গেলেন সবাই। সীমা এবার এসে তার কুঠরীতে ঢুকবে—শর্ম্মিষ্ঠা এল—

—তোমার সঙ্গে ঐ ভদ্রলোকের পরিচয় আছে নাকি?

—হ্যাঁ। কিন্তু উনি কেন এখানে এসেছেন?

—জানি না। হয়তো আশ্রয় নেবেন এখানে।— বলে শর্ম্মিষ্ঠা হাসলো।

—উনি তো আশ্রমবাসী হবার মত লোক নন— সীমা বলল।

—আজকাল আশ্রম বহু এবং বিচিত্র, সীমাদি! এইটাই হয়তো ওঁর উপযুক্ত আশ্রম—

সীমা আর কথা বললো না, হাতমুখ ধুতে গেল। ফিরে দেখলো, প্রসাদী প্রাতরাশ নিয়ে শর্মিষ্ঠা অপেক্ষা করছে। সীমা ফিরতেই বলল,

—রাত্রে খাওনি কেন, সীমাদি? ভয়ে?

—না। ভয় কিছু করি না। প্রবৃত্তি হয়নি। সব খাদ্য রুচিকর হয় না, শর্মিষ্ঠাদি!

—ক'দিন না-খেয়ে থাকতে পারবে?

—কেন! এখানে থাকতেই হবে, এমন তো কথা নেই। চলে যাব।

শর্মিষ্ঠা আর কিছু বললো না, হাসলো শুধু। সীমা প্রাতরাশও গ্রহণ করলো না। শর্মিষ্ঠা দেখলো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে; তার পর বলল,

—নির্মলাদি না-আসা পর্য্যন্ত তুমি যেতে পাবে না। না-খেয়ে থাকবে কি করে? খেয়ে নাও। খাবারে বিষ তোমাকে দেওয়া হয়নি।

—অমৃত দিলেও আমি খাব না।—নিজের বিছানাটায় বসলো সীমা।

—তোমার যা-খুসী কর— বলে শর্মিষ্ঠা চলে গেল বেরিয়ে। সীমা আকাশ-পাতাল ভাবছে বসে-বসে!

ডাঃ গুহ কেন এলেন এখানে! সীমা-যে এখানে এসেছে, তা তো ডাঃ গুহর জানবার কথা নয়। কারণ, দীপ্তিদি ছাড়া সে খবর অপর কেউ জানে না। আর, সীমা যেদিন নওকিশোরের কাছে খবর পেয়ে খোকাকে ঘরে এনেছে, সেইদিন থেকে সে আর নিজের ঘরে বাস করেনি; একটা মেয়ে-বোর্ডিংএ থাকতো। তার ঠিকানা কারো জানা নেই। তবে ডাঃ গুহ জানলেন কি করে যে, সীমা এখানে এসে রয়েছে!

কিছুই ঠিক করতে পারছে না সীমা। অথচ ডাঃ গুহ যখন এখানে এসেছেন তখন কিছু একটা ব্যাপার ভেতরে রয়েছে, এই ওর ধারণা

হোল। নির্ম্মলাদি নাকি কোন্ এক ডাক্তারকে আনতে কলকাতা গেছেন। তাহলে কি সেই ডাক্তার এই ডাঃ গুহ? প্রশ্নটা মনে জাগার সঙ্গেই উত্তর পেল সীমা—ইনি ছাড়া কে আর হবেন? নির্ম্মলাদি তো ভালই চেনেন এই ডাঃ গুহকে!

চেনে সীমাও। খুবই ভাল চেনে। বালবিধবা নির্ম্মলা কুমারী-পরিচয়ে কলকাতায় পড়তে এসে বিপন্না হয়—ডাঃ গুহ তাকে বিপদ্‌মুক্ত করেন। কর্ণবিজয়ের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দলভুক্ত অবস্থাতেই ঘটে নির্ম্মলার জীবনে এই বিপর্য্যয়। সীমা তখন হেসেছিল প্রচুর, বিদ্রূপ করেছিল বিস্তর। কিন্তু কে জানতো, ঐ ডাক্তার গুহ আবার তারও জীবনে আবির্ভূত হবেন অন্য রূপে! হ্যাঁ, নির্ম্মলাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সীমা পড়লো ডাঃ গুহর ফাঁদে—ধনী অভিজাত পরিবারের কন্যা সীমা! শিক্ষিতা, সুন্দরী সীমা—খ্যাতিমান পিতার কন্যা সীমা ডাক্তার গুহকে ভালবাসলো, কী দেখে কে জানে! কিন্তু ডাঃ গুহ শুধু তার জীবনটাকে জ্বালাময় করে দিয়েই সরে দাঁড়ালেন। ··না, তাঁর হাসপাতালে ঠাঁই দিয়ে সীমাকে বিপদ্‌মুক্ত করতেও চেয়েছিলেন তিনি! কিন্তু সীমা ঐ হাসপাতালের ঝি রুক্‌নীর সঙ্গে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। তারপর তিন-চার বছর কেটেছে—কতদিন, ঠিক মনে নেই সীমার। মনে হয়, এক যুগ—সীমা আর ডাঃ গুহর ত্রিসীমানা মাড়ায় নি। অকস্মাৎ আজ ডাঃ গুহকে দেখে ওর মনে হচ্ছে, সবই নিয়তি। হয়তো আরো কিছু বিরাট দুঃখ আছে সীমার কপালে, তাই এখানে ডাঃ গুহর আবির্ভাব!

অকস্মাৎ ঘরের দরজা ঠেলে শর্ম্মিষ্ঠা ঢুকলো, সঙ্গে ডাঃ গুহ। সীমা সোজা হয়ে বসে তাকাল ওদের পানে। শর্ম্মিষ্ঠা চলে গেল। ডাঃ গুহ কোমল কণ্ঠে বললেন,

—শুনলাম, তুমি নাকি কাল থেকে কিছু খাওনি?

—না— সীমা জবাব দিল,— খেতে ইচ্ছে করে না আমার।

—বেশ, এখানে খেতে হবে না। তোমার বিছানা বেঁধে নাও। আমরা এখনি যাব।

—কোথায় ?— সীমা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো।

—যেখানে হোক, চল। আমি তোমায় নিয়ে যেতেই এসেছি। অবশ্য আমি জানতাম না যে, তুমি এখানে আছ। বিস্তর খোঁজ আমি করেছি তোমার। তুমি তো বাড়ীতে ছিলে না ?

—না, আমি একটা মেয়ে-বোর্ডিংএ থাকতাম। কিন্তু কেন আমার খোঁজ করলে ?

—নওকিশোরের মুখে খবর পাই যে রুক্নী-ঝি মারা গেছে। ছেলেটাকে সে তোমার কাছে পৌছে দিয়েছে। কোথায় সে ?

—জানি না— সীমা আকাশের পানে চাইল। বুকের ব্যথা ওর আর কেউ বুঝবে না!

—জান না ?— ডাক্তার গুহ পাংশু হয়ে গেলেন— জান না কি, সীমা ?

—না। জানি না— সীমা সরোষে বলল,—আজ আবার তার খোঁজ কেন ? পিতৃপরিচয়হীন একটা জঞ্জাল—কি হবে তার খবর নিয়ে ?

—সীমা— ডাক্তার গুহর স্বর আটকে যাচ্ছে— সে বেঁচে আছে তো সীমা ?

—জানি না — সীমা আবার বলল একই কথা।

নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে রইলেন ডাঃ গুহ প্রায় মিনিটখানেক, তার পর বললেন,

—হাজার শিশুকে আমি হত্যা করেছি, সীমা— তাদের আত্মার আর্তনাদ আমাকে জীবন্তে নরক-যাতনা দিচ্ছে। একটাকে তুমি হত্যা করতে দাওনি, যেটা আমার নিজের। সীমা, সত্যি বল—সে কি বেঁচে

নেই? যদি বেঁচে থাকে তো, আমি আজই পৃথিবীর কাছে প্রচার করবো—সে আমার সন্তান··· বল সীমা—

ডাক্তার গুহর কণ্ঠের করুণ মিনতি সীমাকে তিলমাত্র বিচলিত করতে পারলো না। নিঃশব্দে সে বসেই রইল। ডাক্তার গুহ বুঝলেন, ছেলেটা বেঁচে নেই। চোখের কোণে জল এল তাঁর। ধরা গলায় বললেন,

—নওকিশোর আমাকে খবর দিয়েছে, সে তোমার কাছে ছিল··· সত্যি ছিল, সীমা?

—ছিল— সীমা এতক্ষণে বলল,—কিন্তু আমি তাকে কেমন করে রাখতে পারি? যে সামাজিক মর্য্যাদা পেলে, তাকে আমার কাছে রাখা আনন্দময় হোত—তার থেকে আমাকে বঞ্চিত করার পর আজ আবার প্রশ্ন কেন!

—সে কোথায় আছে?

—জানি না। তাকে আমি এক অপুত্রক দম্পতির হাতে দান করে ফেলেছি। সে এখন কোথায়, আমি জানি না। তার খোঁজে এসেই আমার আজ এই অবস্থা!

—সে তাহলে বেঁচে আছে? বেশ, চল, আমরা খোঁজ করবো। দেশে দেশে খুঁজব তাকে। চল সীমা, ওঠ—আজই যেতে হবে, এক্ষুনি।

—তোমার সঙ্গে কোন্ অধিকারে যাব আমি? কে তুমি আমার!

—চল—ঐ মন্দিরে আজই তোমাকে সব অধিকার দিচ্ছি, এসো। ওঠো—

সীমার হাত ধরে ওঠালেন তাকে ডাক্তার গুহ। সীমা কাঁপছে আবেগে-উদ্বেগে—আশা-নিরাশার উচ্ছ্বসিত ছন্দে! বলল,

—সন্তান-স্নেহ তোমারও আছে তাহলে?

—ওর থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই, সীমা! জীব-জগতে ওর মত শক্তিশালী কিছু নেই আর। পুরুষ বা নারী প্রেম করতে পারে যেখানে-সেখানে, যার-তার সঙ্গে, যতবার ইচ্ছে—সে সম্পর্ক সামাজিক, পাতানো। সন্তান-স্নেহ প্রাকৃতিক, স্বভাবজ। প্রতি জীবের মধ্যে ওর আবেদন অনিবার্য্য ; ওকে অস্বীকার করা নিতান্ত মূঢ়তা।

—এ সত্য এতো দেরীতে বুঝলে কেন! নতুন কিছু ঘটেছে নাকি তোমার জীবনে?

—হ্যাঁ! সামান্য একটু ঘটেছে। তুমি জানো না, অবন্তী নামে একটি অসাধারণ তরুণীর দিকে আমার আকর্ষণ ছিল, যাকে বিয়ে করবার জন্য তোমাকে এড়িয়ে চলছিলাম এতদিন। সে একজনের বাগ্‌দত্তা, এই জানতাম। কিন্তু বছর তিন-চার তার কোনো খোঁজ পাচ্ছিলাম না। অনেক কষ্টে জানতে পারলাম, সে একটা শিশু-বিদ্যালয় স্থাপন করে দেশের পরিত্যক্ত সন্তানদের প্রতিপালন করছে। সেখানে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করলাম—

সুটকেসটা গোছাতে গোছাতে মৃদু হাসছিল সীমা—ডাঃ গুহর কথার শেষে বলল,

—বিয়ে করতে চাইল না সে তোমার মত বরকে? আচ্ছা মেয়ে তো!

—না সীমা, শোন। সে বাগ্‌দত্তা যাঁর সঙ্গে, তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন। অতএব সেই অবন্তী অপর আর কাউকে বিয়ে করবে না; শুনে, অবাক হয়ে গেলাম। বর্ত্তমান যুগে এমন অসাধারণ নিষ্ঠা শুনেছো কোথাও?

—না। এ যদি সত্যি হয় তো, অবন্তীর চরিত্র এযুগের নয়। কিন্তু তাতে তোমার কি?

—শোনো—তার আশ্চর্য্য সতীধর্ম্মে আমি মুগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলাম···

—তুমি মুগ্ধ হলে?— সীমা যেন বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ করছে!

—সীমা! সৃষ্টির জীবের মধ্যে শুধু মানুষেরই আত্মজ্ঞান (self-consciousness) আছে বলেই সে মহৎ। মানুষ যতই দুরন্ত-দুর্বৃত্ত হোক, সে অমৃতের পুত্র। আদর্শের মহত্ত্বে তার শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। কিন্তু শোনো—প্রশ্ন করলাম, তাকে সন্ন্যাস নিতে দিলেন কেন? উত্তরে সে কি বললো জানো? বললো,—'আমার স্বামী সৃষ্টির মানসস্রোতে মহত্ত্বের বীজ বপন করছেন! আমাকে গোটাকতক সন্তান দেওয়ার থেকে সে-কাজ অনেক বড় কাজ'—

—ওরে বাপ! এই রকম বলল?— সীমা অবাক চোখে তাকালো।

—হ্যাঁ— আরো বলল—অতি সহজ কথায় বলল,—'আমার স্বামীর বিরাট মহৎ পিতৃত্বের আমি সমান অংশীদার—আমি মা! আজ এখানকার একশো সন্তান আমাকে "মা" বলে—একশো কোটি সন্তান আমাকে একদিন "মা" বলবে! আমার স্বামী হবেন তাদের পিতা।'—

—অসাধারণ মেয়ে! কিন্তু তোমার পরিবর্ত্তনটা হোল কোথায়, আর কেমন করে?— সীমা সুটকেসে চাবি বন্ধ করে শুধোলো।

—আমি কিছু টাকা দিতে চাইলাম তার আশ্রমের জন্য। শুনে সে বলল,— 'আমার পবিত্র কাজে আপনার পাপার্জ্জিত অর্থ গ্রহণ করে একে কলুষিত করবো না। আমি যে সন্তানদের পালন করি, আপনি তাদের হত্যাকারী—

—চলো সীমা— ডাঃ গুহ হোল্ড-অলটা নিলেন। বেরিয়ে এল সীমা ওর পিছনে।

আশ্চর্য্য যে, সাধুরা কেউ কিছু এখন বললেন না। শুধু শর্ম্মিষ্ঠা একটু হাসলো ক্ষীণ হাসি।

* * *

সীমা পথে যেতে যেতে ভাবছে—সবই এক অদৃশ্য শক্তির খেলা! অবন্তীর কাছে আঘাত পেয়ে ডাঃ গুহর এই পরিবর্ত্তন সীমার জীবনে

এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। ছেলেটাকে অবন্তীর কাছে দিয়ে এলে, সীমা আজ তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হোত না। কিন্তু এও বোধহয় সেই করুণাময়েরই লীলা। উচ্চশিক্ষিতা, ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী সীমার মনোরাজ্যে আজ কয়েকটা ঘটনার পারম্পর্য্য যেন বিস্ময় জাগাচ্ছে। এখানে তার আসার মূলে রয়েছে ছেলেটার অনুসন্ধান; কিন্তু তাকে অবলম্বন করেই এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল। ঐ আশ্রমে সীমা এল—ওখানে নির্ম্মলা থাকলো না; সীমাকে ওরা আট্‌কালো, নইলে ডাঃ গুহর সঙ্গে সীমার দেখা হোত না—সবই যেন কোন্ অদৃশ্য হস্তের পরিচালনা! দূরে মন্দিরের চূড়ার উদ্দেশে সীমা করজোড়ে নমস্কার জানাল।

—হ্যাঁ, প্রণাম কর, সীমা! আমি ওসবে বিশ্বাস করি না। কিন্তু তোমরা হারিও না ঈশ্বর-বিশ্বাস। তোমাদের মধ্যে তিনি থাকলেই আমাদের পথেও আলো পড়বে—ডাঃ গুহর কণ্ঠস্বর আবেগে অশ্রুময়।

—তোমার পরিবর্ত্তনটা অত্যন্ত আকস্মিক! এ টিঁকবে তো?—সীমার প্রশ্নে কৌতুক।

—আকস্মিক নয়, সীমা! দীর্ঘ সাতবছর ধরে আমি অবন্তীকে প্রার্থনা করে এসেছি। ওর স্বামিনিষ্ঠা, ওর সতীধর্ম্ম, ওর সন্তানবাৎসল্য—নারীর মহত্ত্বের প্রতি আমার অন্তরের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিল। মনে পড়ল—সন্তানের প্রতি মমত্ববোধে তোমার দু'চোখের দৃষ্টি-কারুণ্য, তোমার সতীনিষ্ঠার জাগ্রত মহিমা—তোমার প্রেমের অবিনাশী শক্তি! মনে হোল, তুমিও ঐ অবন্তীর জাত। এক তুচ্ছ সন্ন্যাসীর জন্য তার অপূর্ব্ব ত্যাগ-বরণ আমাকে বার বার বলেছে, তুমিও ঐ অবন্তীরই অংশ—ঐ সর্ব্বত্যাগিনী সহধর্ম্মিণী—আমার পাপের সব বৃত্তান্ত জেনেও তুমি আমায় ভালবাস! অবন্তীর রূপৈশ্বর্য্যে আমার আর লোভ নেই—তার অন্তরের ঐশ্বর্য্য আমি তোমার মধ্যে লাভ করবো।

—আমি যেন তোমাকে তা দিতে পারি— সীমার চোখে জল এসে গেল।

সিদ্ধেশ্বরের কাছে বিদায় নিয়ে আলোক বাড়ী ফিরলো। অঞ্জনা অনুযোগ করলো, এত রাত্রি পর্য্যন্ত দাদা ছিল কোথায়। আলোক বলল,

—পথে বেরুলেই পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, অঞ্জনা! দেরী হয়ে যায়।

—ওঁরা সব এসেছিলেন—মিঃ সাহা, মিঃ ম্যাকু, বরুণবাবু—তোমার বইটার ছবি করবেন—

—উৎপলা আসেনি নিশ্চয়।

—না, তিনি আসেন নি। আমি ওঁদের বললাম, ও বইএর ছবি করা খুব শক্ত। তবু যদি ওঁরা করতে পারেন তো, দাদা যাতে দেন 'স্ক্রীণ-রাইট' তা আমি করবো। মিঃ সাহা দশহাজার টাকা দেবেন বলেছেন ওর জন্য ; তোমাকে থাকতে হবে সঙ্গে।

—তুই ঠিকই বলেছিস, অঞ্জু, তবে সঙ্গে থাকা আমার সম্ভব হবে না। আমি দু'চার দিনের মধ্যেই ভারত-ভ্রমণে বেরুবো। তোর কাছে আসবার আগে ঐ সঙ্কল্পই আমার ছিল। হঠাৎ তোকে পেয়ে আট্‌কে গিয়েছিলাম এখানে। এবার বেরুতে হবে। আর দেরী নয়। ওঁরা আবার কখন আসবেন বললেন ?

—কাল সকালে। তোমাকে বাড়ী থাকতে বলেছেন। উৎপলাদিও আসবেন হয়তো।

—না, তিনি আসবেন না।

আলোক খেতে বসল।

—কেন দাদা?— অঞ্জনা আশ্চর্য্য হয়ে শুধোলো,—উৎপলাদি এ বাড়ীতে আসতে চাননা নাকি?

—না, বাড়ীতে আসবেন না কেন? আমার সঙ্গে দেখা করতে চান না।

—কারণ?

—এমন অনেক ব্যাপার আছে, অঞ্জু, যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সবেতেই কারণ খুঁজতে যাওয়া মানুষের মূঢ়তা। তুই দেখিস, উৎপলা দেবী আসবেন না।

খেয়ে শুয়ে পড়লো আলোক। কিন্তু অঞ্জনা দীর্ঘক্ষণ ভাবলো, কেন উৎপলা আসবে না তাদের বাড়ী। কেন সে আলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায় না! অঞ্জনা জেনেছে, আলোক কিছুদিন উৎপলার আশ্রমে চাকরী করেছিল, কিন্তু তাতে আলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উৎপলার সঙ্কোচ কেন? আলোকই-বা কেন চায় না উৎপলার সান্নিধ্যে যেতে? মানব-মনের এই মহারহস্য যেন অবাক করে দিচ্ছে অঞ্জনাকে।...

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল অঞ্জনা।

পরদিন সকালেই এলেন মিঃ সাহা, মিঃ ম্যাকু এবং বরুণবাবু। উৎপলা সত্যি আসেনি। আলোক কোনো কথা বলবার পূর্ব্বে অঞ্জনা বলল,

—দাদা থাকতে পারবেন না আপনাদের ছবির ব্যাপারে। কিন্তু আমি থাকবো।

—সে তো খুব আনন্দের বিষয়।— মিঃ ম্যাকু-ই বললেন তাড়াতাড়ি।

—কিন্তু আলোকবাবু না থাকলে চিত্রনাট্য-রচনায় অসুবিধা হবে— বরুণ বলল।

—আলোকবাবুর থাকা খুবই দরকার— মিঃ সাহা বললেন,—কারণ বইখানা শক্ত বই। ওকে চিত্রে রূপদান করতে লেখকের সাহায্য অনিবার্য্য।

—কিছু না, মিঃ সাহা— আলোক বললো,— এদেশের চিত্রপ্রযোজক আর পরিচালকদের কাছে লেখকের মর্য্যাদা কতখানি, আমি জানি। জানি তাঁরা সর্ব্বজ্ঞ—সবজান্তা। তাঁরা বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎএর লেখারও সংশোধন করবার দুঃসাহস রাখেন! আমি তো নগণ্য!— হাসলো আলোক।

—লেখকই সৃষ্টি করেন— বরুণ বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু প্রযোজক, পরিচালক তা স্বীকার করেন না। তাঁরা কিছু বলেন না, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখান যে তাঁরাই সব। অতএব আমার না-থাকলে কিছু ক্ষতি হবে না। আর হোলে, এ বই নেওয়া এখন বন্ধ থাক্। কারণ আমি দীর্ঘদিনের জন্য বাইরে যাব—আমি দেখতে চাই জননী ভারতের বর্ত্তমান রূপ!

—না না, বইখানার 'রাইট' আমি নেবই। ওটা বেহাত হতে দেওয়া হবে না। একখানা ভাল ছবি আমি করতে চাই। লাভের জন্য নয়—চিত্রশিল্পও যে সত্যকার শিল্প, সিনেমাও যে শ্রেষ্ঠ কলা হতে পারে—তাই প্রমাণ করবার জন্য। টাকা আমি অনেক রোজগার করেছি, আলোকবাবু, হয়তো আরো রোজগারের পিপাসাও আছে—কিন্তু, জীবনে ভাল কিছু করলাম না, এ চিন্তা সময় সময় অসহ্য ঠেকে! বইখানা দিন আপনি আমাদের। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ওকে যথাযোগ্য রূপ দেবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না—

—'বর্ত্তমান জগৎ' সিনেমামুখী জগৎ, মিঃ সাহা— আলোক বললো,—ওতে ভাল অনেক কিছু করা যায়—মানুষের চরিত্রকে মানবচেতনায় জাগরিত করাও সম্ভব সিনেমার মাধ্যমে। যদি সত্যি ভাল কিছু করবার ইচ্ছে জেগে থাকে আপনার তো, আমার কিছু নিবেদন আছে—

—বলুন, বলুন—আমি আদেশ বলে মনে করবো আপনার কথা।

—না, অতোটা কিছু করতে হবে না— হাসলো আলোক— আমার অনুরোধ খুব ছোট, খুব সরল—লক্ষ্য রাখবেন, ছবি দেখে যেন মানুষের

অন্তরে সামান্যও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা জাগরিত হয়। দৃশ্যমান্ জগতের অন্তরালে যে অদৃশ্য-শক্তি—তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা যদি-বা না জাগে, তার অস্তিত্বে বিশ্বাস অন্ততঃ হোক মানুষের—এই লক্ষ্য হওয়া উচিত। জীবনকে দেখানোই 'জীবনায়ন' নয়, মিঃ সাহা, জীবনের অয়ন অর্থাৎ বিস্তারেই থাকে 'জীবনায়ন'—

—শেষের কথাটির একটু ব্যাখ্যা করে দিন—বরুণ অনুরোধ করলো।

—জীবনের বিস্তার অর্থে প্রতি জীবনের সঙ্গে প্রতি জীবনের যোগ, অখণ্ড জীবন-স্রোতকে ধারণা করা—যে জীবন-স্রোত ছিল, আছে, থাকবে; যার লক্ষ্য নিজেকে সুস্থ-স্বস্থ-শান্তিময় করা— আলোক একটু থেমে আবার বলল,

—জড়বিজ্ঞান মানুষকে বহুদূর এনেছে, কিন্তু অ্যাটম বোমের আতঙ্ক থেকে তো মানুষ রেহাই পেল না! ধনতন্ত্র গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র বা শ্রমিকতন্ত্রবাদে মানুষকে কোথাও পরা-শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। মানুষ 'তন্ত্র' গড়ছে আর ভাঙছে—কোথাও স্থির হতে পারছে না; কোনো 'বাদ'ই শাশ্বত বলে মানতে পারছে না। কারণ, বর্ত্তমান যুগ অধ্যাত্মবাদ-বর্জ্জিত এক অতিবাস্তব যুগ—যার আবেদন শুধু জীবনের দৈনন্দিনতার আয়োজনেই পরিসমাপ্ত হচ্ছে। জীবন-দর্শনের অভাবে জীবানাদর্শ জাগছে না পৃথিবীতে···

সাগ্রহে শুনছিল বরুণ কথাগুলো। মিঃ সাহাও বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। কিন্তু মিঃ ম্যাকু যেন অধীর হয়ে উঠছেন ক্রমশঃ। তিনি একবার বইখানা নাড়লেন, কলমটা খুললেন—ব্লটিং-প্যাড্‌খানায় আঁচড় কাটলেন, অতঃপর অকস্মাৎ বলে উঠলেন,

—আই অ্যাড্‌মিট্, আই অ্যাড্‌মিট্—এসব কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীত হচ্ছে। ওসব কথা সাহিত্যে মানায়, ব্যবহারে লাগে না।

—ব্যবহারে লাগাবার জন্যই সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া উচিত, মিঃ ম্যাকু, নইলে রূপকথা নিয়ে মানুষ খুসী থাকলেই পারতো— আলোক বলল,— আপনাদের সময় আমি নষ্ট করতে চাই না। আমার বই যদি নিতে চান তো, ঐ একটি অনুরোধ আমার—কোথাও আমার আদর্শবাদকে ক্ষুণ্ণ করা চলবে না; কারণ আমি বিশ্বাস করি—জড়বাদে মানুষ বাঁচবে না, সে বাঁচবে অধ্যাত্মবাদে। বাস্তবতায় তার জীবনের প্রসার নয়, তার জীবনের প্রসার আদর্শের দৃষ্টিতে এবং সৃষ্টিতে; আয়ু, আরোগ্য, বিজয়-ই তার একমাত্র কাম্য নয়—তার কাম্য পরা শান্তি, পরম শান্তি—

—মানুষ চায় আনন্দ—এন্‌টার-টেন-মেণ্ট দরকার— মিঃ ম্যাকু বললেন।

—সে আনন্দ স্বাস্থ্যকর হতে হবে। 'জরদ্গব'-এর জব-বিকারগ্রস্ত আনন্দকে আমি 'আনন্দ' বলি না। হাসি থেকে অশ্রুতে আনন্দ বেশী, যদি সে অশ্রু মানবাদর্শের মহিমা প্রকাশ করে···

—অশ্রুতে আনন্দ! কী সব বাজে··· মিঃ ম্যাকু বলতে গেলেন।

—থাক্ ওসব তর্ক এখন— মিঃ সাহা যেন ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন মিঃ ম্যাকুকে।

অতঃপর চুক্তিনামা সই হয়ে গেল। চেকখানা হাতে দিলেন মিঃ সাহা; আলোক নিঃশব্দে সেটা এগিয়ে দিল অঞ্জনার হাতে। অঞ্জনা বলল,

—চিত্রনাট্য লেখা হলে আমি শুনবো সমস্তটা, এই কথা রইল।

—হ্যাঁ—আপনাকে শুনিয়ে যাব আমি— বরুণ বলল কথাটা।

ওদের যাবার সময় আলোক আবার বলল,— যদি সত্যি মানুষের কিছু ভাল করতে চান, মিঃ সাহা, তাহলে দর্শকদের অন্তরে কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক ক্ষুধা জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন—ও থেকে ভাল আর কিছুতে হয় না।

মিঃ ম্যাকু সজোরে বললেন,—ধর্ম্ম করবার জন্য কেউ ছবি দেখতে আসে না, মশাই—ওসব কথা মঠে গিয়ে বলবেন।

আলোক শান্তস্বরে বলল,—মঠ মাঠ মন্দির মানবহৃদয়—সর্ব্বত্র বলবো, মিঃ ম্যাকু—অন্নজলের ক্ষুধা আপনিই জাগে, যৌনক্ষুধা জাগে যৌবনকালে স্বাভাবিকভাবেই ; কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষুধা জাগিয়ে না দিলে জাগে না। এই সেই পরম ক্ষুধা, যা জীবনকে করে জ্যোতির্ম্ময়, মৃত্যুকে করে অভীঃ··· আচ্ছা, নমস্কার—

সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেলে অঞ্জনা হেসে বলল আলোককে,

—মিঃ ম্যাকু কাল বলেছিলেন যে, বইখানা তিনিই ধরিয়ে দিচ্ছেন। আজ দেখলাম, উনিই বেশী বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। এ কী ব্যাপার, দাদা ?

—অনসূয় হওয়ার অভাব, বোনটি ! শাস্ত্র সর্ব্বাগ্রে মানুষকে অনসূয় হতে উপদেশ দিয়েছেন। অপরের লাভে আনন্দ না করতে পারিস, অন্ততঃ দ্বেষ করিস না—একেই বলে অনসূয় হওয়া।

—মিঃ ম্যাকু তোমার উপর কেন অত অসূয়, দাদা ?

—স্বভাব— হাসলো আলোক ; বলল,—কালই আমি বেরুবো ভারত-ভ্রমণে, ব্যবস্থা কর।

—অত তাড়া কেন, দাদা ! বেরুনো কি পালিয়ে যাচ্ছে ?— অঞ্জুর কণ্ঠে বিষাদ স্পষ্ট।

—হ্যাঁ রে, পালাচ্ছে বইকি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত পালিয়ে যাচ্ছে। এই দেশভ্রমণ করবো ভেবে সাতবছর করা হচ্ছে না—সাতটা বছর পালিয়ে গেল !

—আরো সাত দিন না-হয় যাবে ?

—তাতে কার কি লাভ হবে, অঞ্জু ? আর তোর দাদা সন্ন্যাস নিচ্ছে না। মরেও যাচ্ছে না। বেঁচেই সে রইল—পৃথিবীর কোনো প্রান্তে সে থাকবে মহারুদ্রের আবির্ভাব দেখবার জন্য !

অঞ্জনা চুপ করে রইল। বেশ বোঝা যাচ্ছে, সে প্রসন্ন হতে পারছে না। আলোক চলে যাবে, এ যেন অসহ্য তার কাছে। সে চেয়েছিল, সর্ব্ববন্ধনহীন আলোককে সংসারের বন্ধনে বেঁধে দিতে। আলোক অস্বীকার করলো সবই। তবু যে অপার্থিব স্নেহ সে পেয়েছে আলোকের কাছ থেকে, তাতে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা ওর সহনাতীত। শুধু সান্ত্বনা, আলোক বেঁচে থাকবে—থাকবে তার যোগ্য ভূমিতে। বলল,

—চিঠিপত্তর আমায় দেবে না, দাদা!

—না। আমার অন্তরের স্নেহ তুই সর্ব্বক্ষণ অনুভব করবি, অঞ্জু! চিঠি লিখে কি হবে?

—সাধারণ মানুষের বস্তুর দিকে লোভ বেশী, দাদা! চিঠি সেই বস্তু, যা আত্মীয়ের কুশলবার্ত্তা আনে।

—তুই সাধারণের থেকে কিছু বেশী হবি—তুই জানবি, অ-কুশল কিছুতে নেই। সবই এগিয়ে চলেছে এক মহা-মঙ্গলের পানে ··

—অ্যাটম বোমও?— ব্যঙ্গ করলো নাকি অঞ্জনা!

কিন্তু আলোক সহাস্যে বলল,

—হ্যাঁ, অ্যাটম বোমও। অ্যাটম বোমের আতঙ্ক মানুষকে তার অনিবার্য্য ধ্বংসের চিন্তায় আতঙ্কিত করে তুলেছে। মানুষ সাবধান হবার চেষ্টা করছে আজ। আজ সে ভাবছে, অ্যাটম বোমের প্রভাবে যদি তার পরবর্ত্তী বংশধরকে বিকলাঙ্গ বা বিকৃতবুদ্ধি হতে হয়, তবে কার জন্য করছে সে এই রাজ্যবিস্তার! মানুষ আজ বুঝতে চাইছে, অঞ্জনা—মোক্ষো ধীর্জ্জিনং—মোক্ষ-বিষয়িনী জ্ঞান ছাড়া আর সবই 'অজ্ঞান'। বিজ্ঞান ব'লে মানুষ যাকে নিয়ে বড়াই করেছে এতদিন, তা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়—কল্যাণ তাতে যথেষ্ট আছে, কিন্তু সে কল্যাণ একান্তভাবেই পার্থিব। পেনিসিলিন আবিষ্কারের মধ্যে রোগ-আরোগ্য

করবার কল্যাণ-চিন্তা নিশ্চয় আছে—কিন্তু রোগ-এড়ানোর বিলাসটাই তার মূলে কাজ করছে বেশী। আয়ুকে বাড়াবার জন্য বিজ্ঞানের সাধনা জীবনকে দীর্ঘকাল ভোগ করবার ইচ্ছা-প্রসূত। জড়বিজ্ঞান ওর বেশী এগুতে পারেনি। কিন্তু ঐ সব সাধনাই চলেছে এক মহামঙ্গলের পানে, যার পূর্ণতা প্রকাশ পেলে দেখা যাবে—সবই কল্যাণময়, সবই অখণ্ড আনন্দদ্যোতক!

—সবাই তখন ঈশ্বর-বিলাসী হয়ে উঠবে?

—ঈশ্বর-বিলাসই শ্রেষ্ঠ বিলাস, অঞ্জু! ঈশ্বরকে হাত-পা-ওয়ালা জীব কেন ভাবছিস! ঈশ্বর একটা ভাব, আইডিয়া—যার অখণ্ড জ্ঞান অমৃতত্বের বীজকে রক্ষা করে। জীবন-সাধনার মূল উদ্দেশ্য সেই বীজকে বপন করা, বর্দ্ধন করা—ফলপ্রসূ করা—

—থাক্ দাদা, এসব বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব। যাও, স্নান কর, খাবে—

—হ্যাঁ, থাক্।

আলোক স্নান করে খেল। তার পর বেরিয়ে গেল কাজে।

পরদিন বিছানা আর সুটকেস নিয়ে হাওড়ায় ওকে তুলে দিয়ে এল অঞ্জনা পশ্চিমগামী একটা মেল-ট্রেনে। ফেরবার পথে ওর স্বামীকে বলল,

—দাদাকে প্রণাম করতেও ভুলে গেলাম আমি আজ!

—চোখের জলের থেকে প্রণাম বড় নয়, অঞ্জনা! প্রণাম নাই-বা করলে?

—হ্যাঁ। কিন্তু দাদাকে আমি কী দিতে পারলাম এই সাত বছরে!

—তোমার দাদা আলোক—সূর্য্য! তার কাছ থেকে শুধু পেতে হয়, দেবার কিছু নেই।

অঞ্জনা চোখের জলটা গড়িয়ে পড়ে যেতে দিয়ে উচ্চারণ করলো,

—ইদমর্ঘ্যং ওঁ আলোকায় নমঃ···

পরম জননীর পূজা-উৎসব হবে অবন্তীর শিশু-বিদ্যালয়ে। অবন্তী আয়োজন করছে—আড়ম্বরহীন আনন্দের আয়োজন। জগতের মাকে নিজের মা বলে যাতে শিশুরা চিনতে শেখে, তারই লক্ষ্য আয়োজনের সর্ব্বত্র। সব শিশুই শুনছে, বলছে, ভাবছে—মা আসছেন। মা'র আগমন-সংবাদটি এমনভাবে জানানো হয়েছে ছেলে-মেয়েদের যে—কেউ বুঝতেই পারছে না, এ একটা পূজার উৎসব। এ যেন সত্যকার মা-ই আসবেন ছেলেমেয়েদের দেখতে—তাদের আনন্দ দিতে, আশীর্ব্বাদ করতে।

অবন্তী-ই এই ভাবটি প্রচার করেছে বিদ্যালযের সর্ব্বত্র। নিখিল বিশ্বের জননীকে একান্তভাবে এই আশ্রমবাসীদের জননীরূপেই যেন এখানে দেখতে চায় ওরা। মা যাদের জন্ম থেকেই অদৃশ্য, মাকে যারা চেনেনা-জানেনা, তাদের অন্তর মায়ের আগমন সংবাদে অবিশ্রান্ত উল্লসিত হয়ে রয়েছে। যে-ঘরে মাকে আনা হবে, সেই ঘরখানা বার বার ঘুরে আসছে ওরা।

অবশেষে নিখিল চিত্ত নন্দিত করে 'মা' এলেন। সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী পূজার উৎসব সানন্দে সম্পন্ন হোল। বিজয়া-দশমীর আয়োজনে ব্যস্ত অবন্তী।

আয়োজনের ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু অবন্তী নিজের কথাও ভাবে। ভাবে বাল্য-কৈশোর-যৌবনারম্ভ! এই অজয় নদের কূলেই কেটেছে ওর

জীবনের সেই মধুর দিনগুলি। এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়, ভাল করে দেখলে আবছা দেখা যায় ওর পরিত্যক্ত পৈতৃক ভিটা—ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম। এই শিশু-বিদ্যালয়ের জমিটা ওর পৈতৃক জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল; তাই পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে অবন্তী এই স্থানটিই নির্ব্বাচন করেছে ওর জীবনের সর্ব্ববৃহৎ আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজের জন্য। ভাবতে থাকে—ওর জীবন-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের। আলোক, সিদ্ধেশ্বর, উৎপলা বা ডাঃ গুহ শুধু নয়—ওর বিরাট জীবন-নাটকে বহু বিচিত্র চরিত্রের সম্মিলন ঘটেছে; কত দেশী, কত বিদেশী বন্ধু—কত ঘটনা আর অঘটন নিয়ে ওর জীবন! তার পর শিশু-বিদ্যালয় যেন উপন্যাসের উপসংহার। করুণ হাসে অবন্তী কথাটা মনে হতেই। আগের দিনে, বঙ্কিম-যুগে প্রতি উপন্যাসের শেষে একটা করে 'উপসংহার' অধ্যায় থাকতো। উপন্যাসের চরিত্রের কার কী হোল, কে কোথায় গেল—তাই লেখা থাকতো উপসংহারে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ওর আর চলন নেই। অধুনাতন কালে পাঠককেই ভেবে নিতে হয়, কার কী হওয়া উচিত। এটা নাকি আর্ট।

হতে পারে! কিন্তু অবন্তী তবু ভাবে, যে জীবন সে অজয়কূলে আরম্ভ করেছিল আলোকের সাথীরূপে, সেই জীবনের শেষ পরিণাম এই অজয়কূলেই শিশু-বিদ্যালয়ের পরিচালিকা রূপে শেষ হবে। কোথায় আলোক, কোথায়-বা সিদ্ধেশ্বর! কোথায় গেলেন ডাঃ গুহ, যিনি অবন্তীকে বিয়ে করবার জন্য সর্ব্বস্ব দিতে চেয়েছিলেন, কারণ অবন্তীর সতী-গৌরব তাঁকে অভিভূত করেছে। 'অবন্তী বর্ত্তমান যুগের সীতা-সাবিত্রী।'—ক্ষীণ হাসলো অবন্তী।

ওর জীবনকাব্য যদি কেউ কখনো অধ্যয়ন করে, তো কি পাবে? পাবে অনেক কিছু। পাবে সব থেকে বড় একটা তত্ত্ব, যে তত্ত্ব সাধারণ নারী-জীবনে পাওয়া যায় না—সেটা এই যে নারী কাকে ভালবাসে,

তা সে নিজেই জানে না। অবন্তী কাকে ভালবাসে, অবন্তী কি তা জানে?

উত্তরটা মনের গভীর থেকে উঠতে-উঠতেই যেন ঘোলাটে হয়ে গেল মনটা। নাঃ, ঠিক ধরা গেল না! মনে পড়ল, আলোকের লেখা 'জলদর্চ্চি'র কয়েকটা কথা:

"আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বাদ দিলে প্রেম মানবজীবনে কদাচিৎ আবির্ভূত হয়। সাধারণ ভাষায় যাকে প্রেম বলা হয়, সেটা দৈহিক মিলন-পিপাসারই তীব্রতম রূপ—কাব্যে আর কথা-সাহিত্যে যাকে 'প্রেম' নাম দেওয়া হয়েছে। এ শুধু সন্তান-লাভের আকুতি। এ প্রেম নির্দ্দিষ্ট কোনো একজনের সঙ্গে না হলে, অন্যজনের সঙ্গে হতে কোথাও বাধে না। এ শুধু সমাজ-চেতনার সাধারণ প্রকাশ মাত্র; মানুষ এর স্রষ্টা। কিন্তু সন্তান-বাৎসল্য প্রাকৃতিক, তার অনিবার্য্যতা অনস্বীকার্য্য। সন্তান শরীর-মনের অংশ, সন্তান আত্মার অভিন্ন প্রকাশ! সন্তান-স্নেহ সমাজ-চেতনায় বাধিত হয় না, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিচ্ছিন্ন হয় না—কুক্কুরী-মাকরী-মানবীর মধ্যে তার দুর্ব্বার ধারা সমান খরতর।"

কথাগুলো 'জলদর্চ্চি'র নায়িকা অবন্তীর মুখে বলিয়েছেন আলোদা। কিন্তু আশ্চর্য্য, এতো নাম থাকতে আলোদা তাঁর বইএর নায়িকার নাম 'অবন্তী' রাখলেন কেন? রাখলেন, তাঁর সাহিত্যে অবন্তীকে অমরত্ব দেবার জন্য। কিন্তু এর কি প্রয়োজন ছিল! ছিল। 'জলদর্চ্চি'র নায়িকা অবন্তী চিরকুমারী নগরী—শত সম্রাটের সে প্রেয়সী, লক্ষ সন্তানের সে জননী—কুন্তীর মতই মহিয়ময়ী মা! কিন্তু তার সঙ্গে শিশু-বিদ্যালয়ের এই অবন্তীর মিল কোথায়? হ্যাঁ, মিল আছে এই শিশু-বিদ্যালয়ের শিশুদের 'মা' হওয়ার মধ্যে।

'জলদর্চ্চি' বইখানা চিত্রায়িত হচ্ছে। আগামী কোজাগরী পূর্ণিমার দিন মিঃ সাহার 'মন্দার' চিত্রমন্দিরে সে-ছবি প্রদর্শিত হবে।

যাবে অবন্তী দেখতে। উৎপলা বার বার বলেছে তাকে যেতে। কারণ বইটা আলোদার লেখা, আর ওতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছে শ্রীমান জীবন। এ ছবি অবন্তীর না দেখলেই চলে না!

উৎপলা নিজে এসে জীবনকে নিয়ে গেল ঐ ছবিতে অভিনয় করতে। 'জ্বলদর্চ্চি'র নায়ক একুশ বছরের এক বালব্রহ্মচারী—তারই চরিত্র অভিনয় করবে জীবন। উৎপলাকে প্রশ্ন করেছিল অবন্তী, কেন সে জীবনকে দিয়ে অভিনয় করাতে চায়? উত্তরে উৎপলা স্বীকার করেছে যে—'সিদ্ধেশ্বর বলে গেছে, জীবন সাধু হবে।'

সত্যি সাধু ওকে হতে দেবে না উৎপলা, তাই অভিনয়ে সাধু-ব্রহ্মচারী বানিয়ে ফাঁড়াটা কাটিয়ে দিতে চায়। কেন উৎপলার এত আশঙ্কা জীবন সম্বন্ধে? জীবনকে অত্যন্ত স্নেহ করে উৎপলা—হয়তো ছোটবেলায় পেয়েছিল অপর্ণার ঐ ছেলেটাকে, তাই স্নেহ এত প্রবল। কিন্তু জীবনকে কিছুতেই অপর্ণার ছেলে বলে মনে হয় না। কে জানে কার ছেলে জীবন! উৎপলাও তো জানেনা জীবন কার ছেলে। জীবনের সন্ন্যাস নেবার ফাঁড়াটা যদি কেটে যায় তো যাক্ ঐ অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। কারণ, অবন্তীও চায় না যে, জীবন সন্ন্যাসী হোক। অথচ সিদ্ধেশ্বর ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সন্ন্যাসী করবার জন্যই। না, সন্ন্যাসী হয়ে কি হবে? গাঁজা খাবে আর চুরি-ডাকাতি করবে তো!

না-না-না···অবন্তী চিন্তাটা ঘুরিয়ে নিল। সব সন্ন্যাসীই গাঁজা খায় না। সিদ্ধেশ্বরের মত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীও আছে। আছে এবং থাকবে। 'জ্বলদর্চ্চি'র মধ্যে আলোদা বলিয়েছেন যুবনাশ্বের মুখে:

"এই ভারত সনাতন সাধকের দেশ। এখানকার আকাশে-বাতাসে অনাদিকাল থেকে সিদ্ধ সাধকের সৎচিন্তা চিরজাগ্রত রয়েছে। তার প্রভাব থেকে অতিবড় বর্ব্বরও নিস্তার পায়না বলেই এখানে ডাকাতরা করে কালীপূজা; মাংস ভোজনের আগে ছাগশিশুকে নিবেদন করতে যায়

মানুষ দেবমন্দিরে ; মদকে বলে কারণ-বারি ; শিশু এদেশে 'ভোলানাথ' ; নারী এখানে নারায়ণী। এই ভারতের প্রতি ধূলিকণায় আছে ঋষি-পদরেণু, যার শক্তি বিজাতীয় বিধর্ম্মীকেও প্রভাবিত করে সত্যধর্ম্মে, মানবধর্ম্মে। বারনারীর অন্তরেও এদেশে তৎকালীন স্বামিনিষ্ঠা স্বতঃ জাগ্রত। বৃদ্ধা বেশ্যা এদেশে তপস্বিনী। পতিতা এখানে পরম প্রেমময় ভগবানকে পাবার জন্য প্রেমে-ভক্তিতে পূজারতা! তাই আশা করবো, একদিন এই ভারতের বাণী পৃথিবীর বাণী হবে—পরম বাণী হবে মানুষের!"

আপনার মনে চিন্তা করতে করতে অবন্তী অফিস-ঘরে এসে দেখলো চিঠি এসেছে। খামের চিঠিখানায় তারই নাম লেখা শিরোনামা, বাকী সব শিশু-বিদ্যালয়ের। আগে সাধারণ চিঠিগুলো পড়ে নিল অবন্তী ; কারণ খামে ওকে চিঠি লেখার মত ওর কেউ আছে বলে মনে পড়ে না। কে জানে, কী খবর থাকবে! শেষে খুলল, আশ্চর্য্য হয়ে পড়তে লাগলো চিঠিখানা :

"কল্যাণীয়াসু,

অবন্তী, দীর্ঘকাল তোমার খবর জানি না, আশা করি ভাল আছ। যে সুমহান কাজে জীবন উৎসর্গ করেছো, ঐ কাজই অনাসক্ত ভাবে করে চল—ওতেই তোমাব চরম সিদ্ধি লাভ হোক্, এই কামনা করি।

তোমার-আমার সম্পর্ক মানব-জগতের নয়, অবন্তী, এ বন্ধন আত্মার! অনাদিকালের আত্মীয়তার এই বন্ধন আমাদের মুক্তির আনন্দে চির-জ্যোতির্ম্ময়! তাই যে-দিন তোমার দৈহিক আবেদনের আকর্ষণে আমি গৃহত্যাগ করেছিলাম—সেইদিনই সঙ্গ নিয়েছিলেন আমার পরম-দেবতা, একটা কাগজের মোড়কে বাঁধা আমার পৈতৃক বিগ্রহ রূপে। আজও তিনি সঙ্গেই এবং আজও প্রতিক্ষণে আমাকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, তোমার-আমার সম্পর্ক দেহগত নয়! আত্মার অর্দ্ধাংশ

তুমি—আমার সাধনার পরম সহায় তুমি! তোমাকে আশ্রয় করেই আমার জীবন-দেবতাকে আমি লাভ করবো। তোমার সঙ্গে কোনোদিনই আমার বিচ্ছেদ নেই!

তোমার দৈহিক স্পর্শ না পেয়েও, তোমার স্বামিত্বের গৌরব আমি লাভ করেছি, অবন্তী! এ-যে আমার কত জন্মের তপস্যার ফল, আমি জানি না। তোমার দেহ আজ আমার চোখে চিন্ময়, তোমার প্রেম আজ আমার অন্তরে পরম ঐশ্বর্য্য!

নারীর দৈহিক পবিত্রতা অথবা পতনের মূল্য মানবীয় ধর্ম্মে যাই হোক, অবন্তী, অধ্যাত্মধর্ম্মে আত্মা চিরনির্ম্মল, আর আমি তোমার সেই নির্ম্মল আত্মার অর্দ্ধাংশ—এই সত্য প্রতিক্ষণ অনুভব করি, আর বিশ্ব-দেবতাকে প্রণাম জানাই! আমার গৌরব, আমি যোগ্যা সহধর্ম্মিণী লাভ করেছি।

দেবতাত্মা হিমালয়ের দূর-দুর্গম অঞ্চলে চলে যাব আগামী কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়—লোকালয় থেকে বহু বহু দূরে, যেখানে ঋষিগণের অধ্যাত্মচিন্তা জমাট হয়ে আছে বরফের সঙ্গে, যার গলিতধারা জাহ্নবী-জলে বয়ে চলে তোমাদের মর্ত্ত্যলোকে। সেই সুদূর আর যেন আমাদের দূর মনে না হয়, অবন্তী—প্রেম আমাদের নিকটতম করে রাখুক সর্ব্বক্ষণ—দুটি জীবন আমাদের এক হোক প্রেম-দেবতার চরণমূলে—এই প্রার্থনা তাঁর চরণে।

ইতি—সিদ্ধেশ্বর"

চোখের কোণা অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো অবন্তীর। কুমারী অবন্তী, পতিতা অবন্তী, পাতকী অবন্তী এক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সহধর্ম্মিণী। এ গৌরব যিনি ওকে দান করলেন, তিনি মানবরূপী প্রেমদেবতা—তিনি সর্ব্ব ক্ষেমঙ্কর শিব, তিনি চিরজ্যোতির্ম্ময় জলদর্চ্চি—যিনি বিষ্ঠাতেও সমান স্নেহে কিরণসুধা দান করেন! সিধুর উদ্দেশে প্রণাম জানাতে

গিয়ে অবন্তীর মনে হোল—প্রণামের আগে সিধুর স্বাক্ষরকে সে পরিপূর্ণ রূপেই গ্রহণ করবে সীমন্তে। পূজামণ্ডপে এসে অবন্তী প্রতিমার চরণারবিন্দ থেকে কিঞ্চিৎ সিঁদুর নিয়ে সীমন্তে লেপন করলো।

সব শিশুরা জেনেছে, 'মা' আজ চলে যাবেন। বিষাদমলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে তারা বাইরে। অবন্তী এসে বলল তাদের,

—মা আমাকে তোদের 'মা' করে রেখে যাচ্ছেন! আবার আসছে বছর আসবেন। আমি তো রইলাম তোদের মা—কাঁদছিস কেন সব!

শিশুরা কী সান্ত্বনা পেল কে জানে, কিন্তু অবন্তী যেন ও-কথা না বলে পারলো না। ওর সঙ্গে যোগ করলো,— আগামী কোজাগরীর দিন তোদের কলকাতা নিয়ে যাব 'সিনেমা' দেখাতে—

—মা পয়সা দিয়েছে?— একটা বাচ্চা মেয়ে প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ, মা টিকিট কিনে দিয়ে যাবেন।— হাসলো অবন্তী।

ট্রেন থেকে নেমে জীবন এসে ঢুকলো। অবন্তী ওকে কিছু বলবার পূর্ব্বেই দীর্ঘক্ষণ ধরে জীবন প্রণাম করলো প্রতিমাকে, তার পর অবন্তীকে। অবন্তী আশীর্ব্বাদ করে প্রশ্ন করলো,

—কেমন ছিলি, জীবন! কোথায় থাকতিস কলকাতায়? পলাদির বাড়ীতে?

—না, একটা ভাল বোর্ডিংএ আমায় রেখেছিলেন মা। অভিনয় ভালই তো করলাম, মাসিমা! সবাই খুব প্রশংসা করলো—কিন্তু ও তো শুধু অভিনয়—

—তা হোক। তোকে কি করে মানালো একুশ-বছরের ব্রহ্মচারী?

—তা মানাবে না কেন? আমি তো খুব লম্বা; আর ওঁরা চুলদাড়ী দিয়ে মেক-আপ করে দিতেন। আমি-ই 'আমাকে' চিনতে পারতাম না। ছবিটা 'রিলিজ' হলে দেখবেন—আমাকে নাকি চমৎকার ব্রহ্মচারী মানিয়েছে!

—এই কোজাগরীতে তো হচ্ছে 'রিলিজ'? তা, তুই চলে এলি কেন?

—ভাল লাগলো না, মাসিমা। শুনলাম, আমি সত্যিকার সন্ন্যাসী হয়ে যাবার ভয়ে, মা আর আপনি যোগ-সাজস করে আমাকে অভিনয়ের সন্ন্যাসী করে দিলেন। তাতে আমার ভাগ্যিটা নাকি বদলে যাবে; না, মাসিমা?

—না বাবা, ভাগ্যি কি আর বদলায়! তোমার যা হবার, তুমি তাই হবে। এসো, প্রসাদ নাও।— অবন্তী ওকে প্রসাদ দিল। জীবন নিল দু'হাত পেতে। অন্য সব শিশুদের থেকে সে অনেক বড়, তবু এখনো শিশুই তো! ওকে দিয়ে উৎপলা অভিনয় করালো। কে জানে, কেমন হবে সে অভিনয়! তবে জীবন বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী বুদ্ধি রাখে। কিন্তু উৎপলার কেন এত চিন্তা জীবনের জন্য? কথাটা আবার ভাবলো অবন্তী। জীবনের বয়স বড় জোর চৌদ্দ হতে পারে, দেখায় অবশ্য আঠারো বছরের মত। শরীর এবং স্বাস্থ্য অসাধারণ ভাল তার। মনেই হয় না যে, সে বেঁটে বাঙালী। কিন্তু কি হবে এসব ভেবে!···

কিন্তু না-ভেবে পারে না অবন্তী। জীবনকে অবলম্বন ক'রে ওর চিন্তা ওরই জীবনের অলিতে-গলিতে ঘুরতে লাগলো; বাল্যের অজয়-কূলে নয়—বারাণসীর বিপর্য্যয়কর দিনে, কলকাতার কলঙ্কিত রাত্রিতে, বোম্বাইএর বিভ্রান্ত পথে। মনে পড়তে লাগলো কত ঘটনা কত অঘটন—কত কথা কত অকথিত আনন্দ-বেদনার অক্ষয় মুহূর্ত্ত! কিন্তু সব ছাপিয়ে ওর শুধু মনে পড়তে লাগলো—এক নারীলোভী যুবকের ক্ষুধিত দৃষ্টি কেমন করে ধীরে ধীরে এক অপার্থিব প্রেমদৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে! সেই দৃষ্টি-স্মৃতিই আজ অবন্তীর জীবনে শিলালিপি—না—অবন্তীর জীবনের স্পন্দন সেই দৃষ্টি! সে দৃষ্টি ওর প্রিয়তম স্বামী সিদ্ধেশ্বরের।···ভাবতে গিয়ে

আনন্দে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো অবন্তীর। মনে হোল, ঐ অপরূপ বধূ-গৌরব লাভ করবার জন্য নারী সব লাঞ্ছনা সহ্য করেও স্বামীর ঘরে আত্মসমাহিতা থাকতে পারে—থাকতে পারে আত্মস্থা হয়ে। একজনের অন্তরের বন্ধনে বাঁধা থাকাই নারীর চরম এবং পরম আশ্রয়। নারীর জীবনে ওর থেকে বড় আশ্রয় আর কিছু আছে বলে মানেনা অবন্তী।

বর্ত্তমান যুগের বিপর্য্যয়কর সভ্যতা নারীকে আজ বহির্মুখী জীবনে এনেছে। কিন্তু তার অন্তর-জীবন আজও অন্তর্মুখী—হয়তো চিরকালই সে অন্তরে অন্তর্মুখী থাকবে। নইলে অবন্তীর মত বহু-বিলাসিনী আজ সীমন্তে সিঁদুর পরে সাধু সিদ্ধেশ্বরের চরণমূলে অর্ঘ্য অর্পণ করতো না। কিন্তু থাক্ এখন এসব চিন্তা…

নিজেকে সম্বরণ করলো অবন্তী। চিন্তাটা ঘুরিয়ে নিল অন্য দিকে। প্রতিমা-বিসর্জ্জন শেষ হয়ে যাওয়ার পর ছেলেমেয়েরা খেয়ে যে-যার 'সীটে' শুয়েছে—অধিক রাত্রে অবন্তী জানতে পারলো, জীবন তখনো খায়নি। পূজর ঘরে একা বসে আছে। বিস্মিতা অবন্তী তৎক্ষণাৎ পূজার ঘরে গিয়ে দেখল—শূন্য বেদীর সম্মুখে পদ্মাসনে বসে রয়েছে জীবন—বাহ্যজ্ঞানহীন পাথরের মূর্ত্তি যেন। একি ব্যাপার! জীবন কি অভিনয়ের যোগী হতে-হতে 'সত্যি যোগী' হয়ে উঠলো! কিন্তু দুশ্চিন্তাটাকে সবলে সরিয়ে অবন্তী কাছে এসে ক্ষীণ প্রদীপালোকে দেখলো জীবনের মুখ—ধ্যানস্তিমিত এক বালব্রহ্মচারী যেন! অবাক বিস্ময়ে অবন্তীর কণ্ঠে আকস্মিকভাবে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো,

—জীবন · !

—অ্যাঁ— চোখ মেলে চাইল জীবন। যেন কোন্ অতীন্দ্রিয় রাজ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে সে অকস্মাৎ। অবন্তী ধীরে ধীরে বলল,

—এসব কি বাবা, জীবন! রাত হয়েছে। খাওনি এখনো—

—হ্যাঁ, যাই—জীবন উঠে পড়ল। কিন্তু ও টলছে। অবন্তী আলো দেখিয়ে দেবার আগেই জীবন অদৃশ্য হয়ে গেল। রাত জ্যোস্নাময়। অবন্তী দেখতে পেল, জীবন খাবার ঘরে না-গিয়ে তার শোবার ঘরে ঢুকলো গিয়ে। হয়তো আজ আর খাবেনা কিছু। থাক্। ওকে কিছু বলতে আর ইচ্ছে নেই অবন্তীর এখন। চলে এল অবন্তী নিজের ঘরে। শুয়ে-শুয়েও ভাবতে লাগলো—কার ছেলে এই জীবন! কোথায় পেল ও এমন প্রকৃতিগত অনাসক্তি? আশ্চর্য্য তো! কিন্তু জীবন কার ছেলে, জানা সম্ভব নয়। স্বয়ং উৎপলাই জানে না। অপর্ণা যে ওর মা নয়, তা প্রমাণ হয়ে গেছে অপর্ণার পালিয়ে-যাওয়ার মুহূর্ত্তেই। কারণ, প্রেম মানুষের জীবনে পাত্রবিশেষেই আবদ্ধ নয়, পাত্রান্তরে তার স্ফুরণ হতে পারে পুনর্ব্বার। কিন্তু রক্তমাংসজাত সন্তানের প্রতি মমতা অমোঘ, অক্ষয়। অপর্ণা সেই অনিবার্য্য স্নেহকে অস্বীকার করে গেছে। জীবনের পিতার খোঁজ পাওয়া অসম্ভব জেনেই, উৎপলা চেয়েছিল সিদ্ধেশ্বরকে তার জন্মদাতারূপে পরিচিত করতে। সিদ্ধেশ্বরও রাজী ছিল, কিন্তু তাতে অবন্তীকে জীবনের মাতৃত্ব স্বীকার করতে হবে। কারণ অবন্তী সিদ্ধেশ্বরের সহধর্ম্মিণী, এক এবং অদ্বিতীয়া—অথচ জীবনের বিষয় কিছুই অবন্তী জানে না। জীবনের জন্মের জটিলতা এমনি দুর্গম যে, অবন্তী তার মা-রূপে পরিচিতা হতে সাহস করেনি।

কিন্তু জীবন কি সত্যি সন্ন্যাসীর মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে? যদি তাই হয় তো, কোথায় পেল সে এই রক্তধারা? কে তার পিতা! সিদ্ধেশ্বর নিশ্চয় নয়। হলে, সে-কথা সিদ্ধেশ্বর অনায়াসে প্রকাশ করতো অবন্তীর কাছে।··· ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে অবন্তী।

জীবন কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকে নিদ্রাহীন চোখে চেয়ে আছে। আকাশ আলোকিত ক'রে রয়েছে একাদশীর চাঁদ। জানালাপথে দেখছে

জীবন, অজয়ের সাদা বালুবেলায় পড়েছে চন্দ্রকিরণ—শারদ-তরঙ্গিণীতে প্রতিফলিত হচ্ছে শত চন্দ্র—কাশবনে বয়ে চলেছে স্নিগ্ধ সমীর। জীবন দেখছে—এই বিশ্বপ্রকৃতি যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ওকেও সৃষ্টি করেছেন! তিনিই ওর পিতা-মাতা। এ ছাড়া জীবনের আর পিতৃপরিচয় নেই। কিন্তু মানুষের সমাজে পিতৃ-পরিচয় যে একান্ত দরকার, সেই সত্য জীবন এবার কলকাতার বোর্ডিংএ থেকে ভালভাবেই অনুভব করে এল। আর উপলব্ধি করে এল—মানুষের জীবন কোথাও শান্ত নয়, সুস্থ নয়, স্বস্থ নয়। সর্ব্বত্রই মানুষ অশান্ত হয়ে ছুটছে কিসের পানে, সে জানে না। তার বহির্মুখী চিত্ত বাইরের শত-সহস্র ব্যাপার নিয়ে মত্ত থেকে মানবত্বকে অস্বীকার করে চলেছে প্রতিক্ষণ। তার অন্তর্মুখী মন অনন্তের অভিসার-পথকে অগ্রাহ্য করে চলেছে প্রতিমুহূর্ত্তে।

কথাগুলো ঠিক এই ভাষাতেই ভাবছিল জীবন—কারণ, 'জলদর্চ্চি' ছবিতে অভিনয় করবার সময় এই ভাষাই ও ব্যবহার করেছে। ওর কচি-কোমল মনে সেই অপরূপ ভাষার আবেদন অবিশ্রান্ত ঝঙ্কার তুলছে কাব্যের মত; ওর স্বপ্নাতুর চিত্তবৃত্তিতে ব্রহ্মচর্য্যের বিশুদ্ধ জীবনানন্দ যেন গৈরিক রঙের ছোপ ধরিয়ে দিল!

অভিনয়ে যদি এই হয়, তাহলে সত্যকার সন্ন্যাস-জীবন কি! কতখানি তার মাধুর্য্য! কি ভাবে সে-জীবনে যেতে পারে জীবন?··· ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল সাধু সিদ্ধেশ্বরের কথা—তিনি ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সঙ্গে করে; যেতে দিলেননা মা আর মাসিমা।···

উঠে জীবন নদীধারে বেড়াতে চলে গেল ভোর না হতেই।

কোজাগরীর দিন ট্রেনে সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে অবন্তী আসবে কলকাতায়। সবশুদ্ধ প্রায় একশো বিশ জন ওরা।। কিন্তু যাবার সময় জীবন জানালো, সে যাবে না। অবন্তী বিস্মিত হয়ে শুধোলো,

—কেন জীবন? যাবি না কেন?

—না মাসিমা, অনেক সিনেমা দেখে এলাম এই ক'মাস! নিজের অভিনয়টা আর দেখবার ইচ্ছে নেই। তাছাড়া ও আমি 'প্রজেকশুনে' দেখেছি আগেই।

—লোকে কি বলে, শুনবি না? তুই নাকি ভাল অভিনয় করেছিস—

—হ্যাঁ, কিন্তু ওটা তো অভিনয়, মাসিমা—ও ভণ্ডামী। আমি তো সত্যি সাধু নই!—জীবনের কথার সুরে বেদনার অভিমানটা কিন্তু অবন্তী ধরতে পারল না; হেসে বলল,

—মানুষের জীবনটাই অভিনয়, জীবন!

—না, মাসিমা! জলদর্চ্চির সংলাপে আমি বলেছি—"'মানুষের জীবনই সত্য—লোভে-পাপে ক্রোধে-কামে তার মলিনতা ঘটতে পারে, কিন্তু প্রেমে সে সত্য—সে নিষ্কলঙ্ক—সে অনভিনেতা···সে অতিমানব···"

—ওসব আলোদার কথা, জীবন, তুই ওর মানেই বুঝবি না!—তাহলে যাবি-না তুই?

—না। আমি ঐ কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করবো, মাসিমা। কলকাতা আমার ভাল লাগে না। আপনারা যান—

জীবনকে আর বেশী পিড়াপিড়ি করলো না অবন্তী। যেতে মন নাই তো, থাক্। সদলবলে সে চলে গেল কলকাতা।

ওদের জন্য 'সীট রিজার্ভ' রাখা হয়েছে। গিয়ে বসলো সেখানে। 'জলদর্চ্চি' আরম্ভ হোল পর্দ্দায়।

অপরূপ সুন্দর ওর প্রত্যেকটি চরিত্র। ভাব এবং ভাষা তারই যোগ্য। নিমেষহীন চোখে দেখছে সকলে। একুশ বছরের এক

বালব্রহ্মচারী নবোঢ়া বধূকে চোখের জলে ভাসিয়ে, চলে গেল পথে—পরিব্রজ্যায়! অশ্রুসজল হয়ে উঠলো দর্শকদের চোখগুলি।

বিরতি।

আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহ। অবন্তী, উৎপলা, সীমা ব্যালকনির গদী-আঁটা চেয়ারে বসে। বহু দর্শকই রয়েছেন ওখানে, যাঁরা টিকিট কিনে 'শো' দেখতে এসেছেন। ওঁদের একজনের বাচ্চা ছেলে একটা—হাফ-প্যান্ট পরা সুন্দর ছেলেটি! অন্ধকারে এতক্ষণ সে চুপ করে বসে ছিল—আলো জ্বলতেই ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল সামনের সরুমত জায়গাটায়। উৎপলাদের দিকেই দৌড়ে এল ছেলেটা। চমৎকার দেখতে ও, তাই সকলের নজর পড়ল ওর পানে। কে একজন বলল, —আইসক্রীম খাবে, খোকা?

জবাব না দিয়েই ছেলেটা উৎপলার কোলের কাছে এসে পড়ল।

—কে ছেলেটি? কার ছেলে? ও খোকা! শোনো, শোনো··· সীমা ওকে ধরতে গেল।

নাঃ, ছেলেটা ছুটে পালালো ওর মার কাছে। আধাবয়সী একটি মহিলা সীমার দিকে তাকিয়েই যেন পাথুর হয়ে গেলেন। ছেলেটাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে আঁচলে ঢেকে তিনি পাশের স্বামীকে বললেন কি যেন। আধমিনিটের মধ্যেই ওঁরা উঠে গেলেন ওখান থেকে। সীমাও তৎক্ষণাৎ বেরুতে চাইল; কিন্তু, ওর ভাগ্য—ছবির দ্বিতীয়ার্দ্ধের জন্য আলোও নিবলো ঠিক সেই সময়। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সীমা উৎপলার ঘাড়ের উপর।

উৎপলা সস্নেহে ওকে তুলে দেখলো, চোখের জলে ওর দু'গণ্ড ভেসে যাচ্ছে। ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলো,

—কি হোল, সীমা! কী হোল?

—ঐ ছেলেটা আমার খোকন—আমার…

বহু চেষ্টা করেও সেই দম্পতীকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

*　　*　　*

করুণায় বিগলিত-হৃদয়া উৎপলা সারারাত্রি ঘুমুতে পারেনি সীমার অশ্রুপঙ্কিল মুখখানা মনে ক'রে। বিনিদ্র রজনীতে ও শুধু ভেবেছে—দীর্ঘ কয়েকবৎসর পূর্ব্বের এক তমসাময়ী দুর্য্যোগ রাত্রি—ভাঙা ইমারৎ… ডাষ্টবীন…বিরলবর্ষণ বিদ্যুদ্দীপ্ত আকাশ…সদ্যোজাত শিশু! নাঃ! উৎপলা এতকাল পরে আবার ওসব কথা মনে করে কেন? চিরকুমারী উৎপলা তার শিশু-আশ্রমে শতাধিক শিশুকে পালন করে—তাদের সকলের 'মা' সে। তার ক্ষুধিত মাতৃত্ব ওখানেই তৃপ্তিলাভ করবে—ভাবছে, কিন্তু উৎপলার জ্বালাময় দেহখানা যেন ক্রমাগত ক্ষুব্ধ হতে হতে গুম্‌রাতে আরম্ভ করেছে—ঐ শিশুদের সঙ্গে উৎপলার দেহের, রক্তের, মাংসের কোনো সম্পর্ক নেই;—ওরা শিশু, ওরা স্নেহ পাবার দাবী রাখে—কিন্তু, সে স্নেহ কর্ত্তব্যে বন্দী, করুণায় আত্মসচেতন—মানবত্বের মনোবিলাস। আত্মহারা মাতৃত্বের তো ওখানে প্রকাশ হবে না!…

ভোর হলেই উঠে পড়বে উৎপলা, কিন্তু ভোরের দিকেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙলো ঝি'র ডাকে। ঝি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ডাকছে উৎপলাকে। কী ব্যাপার! উৎপলা তাড়াতাড়ি উঠে প্রশ্ন করতেই জানতে পারলো, অবন্তী কি একটা জরুরী চিঠি পাঠিয়েছে। চোখে-মুখে জল না দিয়েই উৎপলা চিঠি খুললো—

"পলাদি, রাত্রে এখানে ফিরেই জানতে পারলাম, জীবন চলে গেছে। কোথায় গেল, জানি না। সে নিজে যে-চিঠি লিখে রেখে গেছে, তাও তোমার কাছে পাঠালাম। রাত্রের ট্রেনেই লোক পাঠাচ্ছি তোমার কাছে। এর পর কী করা দরকার, অবিলম্বে জানাও।

ইতি—অবন্তী"

ওরই মধ্যে জীবনের লেখা একটা চিঠি রয়েছে। উৎপলার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে যেন। জীবন লিখেছে :

"শ্রীচরণকমলেষু,

মা,-মাসিমা! আপনাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে নিবেদন করছি,—আমি মাতাপিতৃ-পরিচয়হীন বালক। পৃথিবীতে আমার কেউ নাই, কিছু নাই—এই সত্যজ্ঞান আমাকে সব সময় ডাক দিচ্ছে তাঁর চরণ-পানে, যিনি বিশ্বজগতের পিতামাতা! আপনাদেব অগাধ স্নেহ-ভালবাসা আমাকে আট্‌কে রাখতে সমর্থ হোল না—ক্ষমা করবেন। অভিনয়ের মিথ্যে সন্ন্যাসী হয়ে থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি চলে যাচ্ছি সেই সাধুবাবার কাছে, যিনি আমাকে বিশ্বদেবতার দুয়ারে পৌছে দিতে চেয়েছেন। আমি জানি, বাবা আমায় চরণে ঠাঁই দেবেন। আমার অকৃতজ্ঞতা মার্জ্জনা করবেন।

প্রণত—জীবন"

চোখের জলেই উৎপলার রাত্রি জাগর-ক্লান্ত চোখদুটো ধুয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন! কে জীবন উৎপলার? যাক্ গে না! কেন উৎপলা তার জন্য কেঁদে মরছে? না-না-না! জীবন যে উৎপলার জীবনাপেক্ষা প্রিয়—জীবন যে উৎপলার···কে জানে জীবন তার কে!

—গাড়ী আনতে বল, এখুনি বেরুতে হবে—বলে উৎপলা তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য শেষ করে বেরিয়ে পড়ল শিশু-বিদ্যালয়ের পথে। কিন্তু কি হবে সেখানে গিয়ে? জীবন তো সেখানে নেই! দীর্ঘশ্বাস চাপতে গিয়ে উৎপলার বুকের ব্যথাটা দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠলো। গাড়ীর আসনে শুয়ে পড়ল উৎপলা।···

ভাগীরথী বহে ধীরে

গ্রামটা খুব বড়, তাই বহু বিচিত্র জীবনের সমাবেশ হয়েছে ; ধনী আর দরিদ্র শুধু নয়, রোগী, ভোগী, বিলাসী, বদমাইস ; মানুষ, অমানুষ সব রকমই আছে এখানে। এদের সবার চোখের উপর দিয়ে অজয় নদ বয়ে চলেছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হতে ; বর্ষায় কোনো কোনো বছর ডুবিয়ে ভাসিয়ে কিছু কিছু মানুষ-গরু-ছাগল কেড়ে নিয়ে এদের বুঝিয়ে দিয়ে যায়—মানুষ কত তুচ্ছ,—বড়র সঙ্গে ছোটর তফাৎ খুব বেশি নয়। কিন্তু বন্যার জল আবার নেমে যায়—আবার এরা যে যার স্বরূপ প্রকাশ করে। এমনি করেই চলছিল—অকস্মাৎ এলো তেরশো পঞ্চাশ সালের মন্বন্তর।

চাল পাওয়া যায় না—ডালও তথৈবচ। কাজেই বজরা, জনার, তার সঙ্গে কচুর শাক, ওলের গোঁড়া সেদ্ধ করে চলতে লাগল আহার ; কিন্তু কয়েকদিনেই ফুরুলো জনার বজরা—তখন শাক-পাতা-ডাঁটা, সঙ্গে হয়ত এক মুঠি খুদ বা এক ছটাক গমভাঙা—এর পরে শুধু ডাঁটা আর পাতা সেদ্ধ—তারপর অর্দ্ধাহার। মানে, সাধুভাষায় অর্দ্ধাহার অনেক দিন আগেই হয়েছে—এখন হোল গ্রাম্য ভাষায় অর্দ্ধাহার। অনাহার যেদিন যার ঘটল সে সেদিন জীবনের মায়া কাটালো। দলে দলে লোক পালাতে লাগল সহরে—যদি কোথাও একমুঠো খাবার পায়—। যারা পালাতে পারল না—তারা মরলো—মরবার আগেই অর্দ্ধেক হাড়-

মাংস কুকুর শেয়ালে খেল—সে এক নতুনতর দৃশ্য! সভ্য মানুষের চরম সভ্যতার নিদর্শন ট্রেণ-ষ্টিমার-প্লেন যখন যুদ্ধের কাজে ব্যস্ত—তখন বাংলা দেশে ঘটে গেল এই মহামারী—। মহাকালের জয় হোক!

সবাই কিন্তু মরলো না—যারা রইলো বেঁচে তাদের মধ্যে দু' একজনের কথাই বলি। শঙ্কর বাগ্‌তী আর রাজু ডোম। অনেক কৌশল খাটিয়ে, অনেক ফিকির ফন্দী করে ওরা দুজনায় বেঁচে আছে এবং শীগ্‌গির মরবার কোনো লক্ষণ নেই। ওদের সঙ্গে বেঁচে আছে রাজুর সোমত্ত বোন ময়না। একেবারে নিরেট লোহার মত শরীর—রংটাও ফর্সা—আর বেশি লম্বাও নয়, বেঁটেও নয়। ভদ্দর লোকের ঘরের এক-খান শাড়ী পরিয়ে দিলে কার সাধ্য বলে যে ও ডোমের বাড়ীর মেয়ে।

ময়না বেঁচে আছে—এবং তার ভাইকে বাঁচতে সাহায্য করছে। নইলে রাজু হয়ত বহুদিন আগেই ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেত। রাজুর আর কেউ নাই ঐ বোনটি ছাড়া। ওদের ঘর গাঁয়ের পূর্ব্ব পাড়ায় আর শঙ্করের ঘর উত্তর দিকে। গ্রামটী বেশ বড—আগেই বলেছি। কাজেই, রাজুর ঘর থেকে শঙ্করের ঘরে যাতায়াত করতে পনের ষোল মিনিট লাগে—তাও সোজা সুজি রাস্তায় গেলে—গাড়ী চলা রাস্তায় ঘুরে গেলে আরো বেশি সময় লাগবার কথা। গাড়ীচলা রাস্তায় ওরা কেউ-ই যাতায়াত করে না—সুড়ি রাস্তাটাই হিক্‌স হয়ে গেছে।

কাজকর্ম্ম রাজু যে কিছু করতে পারে না, তা নয়। কিন্তু কাজ এখন করাচ্ছে কে! আর যদি বা করায় তো মজুরী তো দেবে পয়সা! পয়সা চিবিয়ে খাওয়া যায় না। ও দিয়ে কিছু কাজ দেবে না এখন! তার চেয়ে ময়না ভালো রোজগারের পথ ধরেছে। অজয়ের ওপারে হাউই-জাহাজের ইষ্টিশান হয়েছে—নদী পেরিয়ে ও যায় সেখানে। ফিরে আসে কোনোদিন রাত বারোটায়, কোনোদিন বা আসেই না। কিন্তু চাল আনে, ময়দা আনে, চিনি, নুন, কেরসিন তেল—যা কিছু

পাওয়া যায় না গাঁয়ে, সবই আনে ময়না! বাজুর আশ্চয্য লাগে! কোথা পায় ময়না এসব! মজুরীর বদলে ওরা নাকি চাল-ডাল-আটাই দেয়। খুব ভালো লোক তো ওরা! বাজুও খাটতে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ময়না নিয়ে যায় নি। বলে,—উখেনে বিটাছেলের কিছু কাজ নাই দাদা, বিবাক সব ম্যায়ালোক কাজ করছে—তুমি কিসের লেগে যাবে?

ওরা তাহলে মেয়েদের দিয়েই কাজ করায়। রান্নাবান্নার কাজ—, ঘর দোর ঝাঁটপাট দেওয়ার কাজ, না-হয়তো ছেলেকে দুধ খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানোর কাজ—এই সবই করায়। পুরুষদের কাজ তো আর ওসব নয়! শক্তি সামর্থ্যের কাজগুলো করবার জন্য পাঞ্জাবী কুলি আছে—পশ্চিমা পালোয়ান আছে—ওরা নিজেরাও আছে! রাজু এই সব ভেবে মন খাঁটি করে থাকে। এ গাঁয়ের আর একটা মেয়ে যায় ওখানে কাজ করতে—বারুণী।

ওরা এক সঙ্গেই যায় রোজ সকালে, চপল চঞ্চল দুটী মেয়ে, দুটি ঝর্ণাধারা যেন। গান করতে করতে যায়। ময়না আরম্ভ করে:—

সুকাল বিলার বাওড় লেগে জলে জাগে ঢেউ লো—

জলে জাগে ঢেউ।

বারুণী পরের কলিটা ধরে দেয়—

পথ আগুলে কালো ছোঁড়া—সঙ্গে যে নাই কেউ লো—

সঙ্গে যে নাই কেউ।

তারপর দুজনে এক সঙ্গে ধরে—

কাঁখের কলস ছল্‌কে উঠে—ছোঁড়া পাছু পাছু ছুটে,

পাছা ভারী, চলতে নারি—একি জ্বালার ফেউ লো—

জলে লাগে ঢেউ!

বেতের ঝোড়াটা মাথায় নিয়ে সরু আলপথে দুলতে দুলতে ওরা চলতে থাকে। এই যে কবাল ভীক্ষাহীনতার কঠিন ভ্রূকুটি—ওরা যেন

গ্রাহ্যই করে না তাকে! ওদের উচ্ছল দেহতরঙ্গ, উদ্দাম যৌবন আর উচ্ছৃঙ্খল গান যেন জোয়ারের জোরে উজানে চলেছে! অজয়ের বালুবেলায় নেমে বারুণী খোঁপার ভেতর থেকে বিড়ি-দেশলাই টেনে বার করে বলে—লে ময়না—দুটান টেনে লিয়ে নদীতে নামবো।

—হুঁ—কুথাকার বিড়ি র‍্যা—মহাদ্যাব মারখা?—বেশ মুটা তো, কড়া হবে?

—এক টান টেনেই ছাখ—বারুণী দেশালাই জ্বালতে যায়। নদীর খোলা হাওয়ায় দেশালাই জ্বালা সোজা নয়—একটা কাশ-ঝোপের আড়ালে গিয়ে দু'তিনটা কাঠি খরচ করে বিড়িটা ধরায় ও। তারপর ফিরে এসে ময়নার মুখে মুখে ঠেকিয়ে ওর বিড়িটা ধরিয়ে দেয়। ময়না হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে বলে—দূর থেকে লুকে মুনে করবে—চুম খেলি আমার তু।

বারুণী বলে—ধুর ছুঁড়ি! শাড়ীটো দেখতে পাবে যে লো! বিটাছেলে মনে করবে কেনে?

—করলে বেশ হোতো কিন্তুক।

—আমি বিটাছেলে হলে তুর দাদা আমার সঙ্গে আসতেই দিতো না তুখে!—বারুণী কথাটা বলে বিড়িতে টান দিল।

ময়না চুপ করে রইল একটু ক্ষণ। তারপর বলল—দাদাকে নিয়ে ভারী মুস্কিল ভাই। লিখাপড়া জানা লুক, বুঝলি, আমাকে শুধোয়, 'কি কি কাজ কত্তে হয় রে ময়না! পল্টনদের সঙ্গে কথা বলতে তুর ডর লাগে না রে? আর কোন্ কোন্ গাঁয়ের মেয়েলুক আসে উথেনে খাট্‌তে?'—এই সব শুধোয়; কি যে বলি!

—কি বলিস? বারুণী অলস ভাবে প্রশ্ন করল!

—কি আর! যখন যা মুয়ে আসে দি বলে! কি যে করি, তা তুই-ও জানিস—আমি-ও জানি!

—ভাগ্যিস এই কাজ পেইছিলুম—না-হলে মরেই যেতে হোত কবে! বেঁচে থাকলে বাপের নাম ভাই ময়না, আমরা ছুটো লুক—আমাদের অত পুণ্যগিরিতে কি কাজ! আগুতে বাঁচি—তা বই তো পুণ্যি!

—হুঁ—যা বলেছিস! ই কাজ না কল্লে আমিই বাঁচতুম, না, দাদাই বাঁচতো! থাকি চুপ করে আখুন!

—বাবাকে আমিও লুকুই সব কথা—মা কিন্তুক জানে। সিদিন কি হোল জানিস—ঘরে এসে কাপড়টো ছাড়ছি—মা দেখতে পেল গায়ের দাগটো—হারামজাদ্দারা যা সব বজ্জাত্!—মা শুধুলো, এমনি করে দাগ করে?—আমার এমন হাঁসি লাগছিল!

—কি বললি মাকে?

—বললুল—চাল-ডাল দেয় তো! অত-সত দেখতে গেলে চলে না।

—লে চল—বিলা হইছে! আচ্ছা ভাই, ঐ আঁটকুড়োরা আমাদিগে নিয়েই ফষ্টি-নষ্টি করে—যব যায় না কেনে!

—ঘর আবার কুথা লো! হুঁ—তুই-ও যেমনি—উ খালভরাদের আবার ঘর!

—চ—চ—উঠ্।

—তাড়াতাড়ি কেনে লো! গেলেই তো কিছু কাজ নাই!

—তা হোক! চ ভাই, ইখেনে বসতে আমার ভাল লাগছে না; দাদা আবার নদীতে হাতমুখ ধুতে আসে!

ময়না উঠে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে বারুণীও। তাড়া করবার কোনো দরকার ছিল না—যে লোকগুলির সুনজরে ওরা আয়েসে পোষিত হচ্ছে—এক আধ ঘণ্টা দেরী হলে তারা কিছুই বলবে না। তবু ময়না তাড়া দিল—ওর দাদা এদিকে আসতে পারে; ওর বাহারে'-শাড়ী আর খেমটা-ধাঁচের খোঁপা দাদাকে ও দেখাতে চায় না।

ওদের দেহ-বিলাসিনী বলা চলে না—দেহ নিয়ে বিলাস করতে শেখে নি ওরা। দেহ-পসারিণী বললেও ওদের দেহটাকে অতিরিক্ত সম্মান দেওয়া হয়—। ওরা দেহোপজীবিনী। এই দেহটাই ওদের আজকার উপজীবিকা—বাঁচবার উপায়। শক্ত, সুদৃঢ় আর সুস্থ দেহটা আছে বলেই ওরা আজও খেয়ে বেঁচে রয়েছে, ওদের স্বল্পসংখ্যক আত্মীয়কেও খাওয়াতে পারছে। নদীর ওপারের বনটায় পাণ্ডবেশ্বরের মন্দির; ঐ দিকে তাকিয়ে ওরা প্রণাম করলো। ওদের দেহটা খুব বিক্রী হয়। কত লোকের যে হোল না, তারা তো মরেই গেল না খেয়ে। ভগবান ওদের উপর সদয় আছেন। ভগবানকে ধন্যবাদ!

অজয়ের মাঝস্রোতে এখন জল হাঁটুর উপর ওঠে। পরণের শাড়ীখানা গুটিয়ে আনতে আনতে ওরা স্রোতে পা ফেলছে আস্তে। বারুণী হাসতে হাসতে বললো—অতোটো তুলিস না লো—কেউ দেখতে পাবে।

দেখুক গা—ভারী তো বয়ে যাবে—বলেই ময়না একবার পিছনপানে চাইল। তার দাদা যদি নদীতে মুখ ধুতে এসে থাকে! না, কেউ কোথাও নাই।—বাঁ দিকে রেলের পুলের উপর ঝম্‌ঝম্ শব্দ করে ভোরের ট্রেনখানা যাচ্ছে! লোকগুলো সব জানালা পথে ঝুঁকে দেখছে ওদেরকে। লজ্জায় ময়না কাপড়টা খানিক নামিয়ে দিল—ভিজে গেল নীচের দিকের শাড়ীটা!

—মর আঁটকুড়োরা—দেখতে লাজ লাগে না!

—তুরই বা লাজ কিসের অত র‍্যা! কুথাকাব কে যায়, দেখুক গা-না। খামুখা কাপড়টো ভিজুলি!

—কাল থেকে ভাই, ছেঁড়া লুগা পরেই আসবো; নদী পার হয়ে উপারে যেঁয়ে কাপড় ছাড়াবো।

—তা-বই ছেঁড়া লুগাটো রাখবি কুথা? বারুণী কৌতুহলী হাস্তে মুখের পানে চাইল ময়নার।

—কেনে, ঐ করবী গাছে মিলে দিয়ে যাব—শুকুবে। যাবার সময় নিয়ে যাব!

—বাহা! খুব বুদ্দি! যত হা'ভেতে মড়াখেকোর দল রাখবে তুর লুগা! কাপড়ের অভাবে নাংটো বেড়াইছে ছাশের লুক—তুর লুগাটিকে লিবে নাই—ঠাকুরের কাপড় বলে রেখে দিবে!

—হুঁ—নিয়েই যাব সঙ্গে তা'লে!

—ঐ ছিডা টিনা! হারামজাদী কুথাকার! তাহালে ঢুকতে দিবে ঠিকেদার সায়েব?

কথাটা সত্যি! পরিষ্কার বেশভূষার জন্যই ওদের খাতির। ওদেরকে ভদ্র মেয়ের পর্য্যায়ে ফেলা হয়েছে। ময়না উত্তর খুজে না পেয়ে চুপ করে রইল। বারুণী বলল—তাথেকে ঠিকেদারকে বল—আর একখানা কাপড় কিনে দিক—আমিও বলব ঘুষ-সায়েবকে! পরশু তো হাট আছে, একখানা করে কাপড় আর গামছা কিনে লিব!

—হুঁ—ময়না আর কোনো উত্তর দিল না! নদীটা পার হয়ে করবী বন! কবে কোন্ মহাপুরুষ এইখানে শ্মশান-সাধন করতেন, তিনিই জবা আর করবীর গাছ লাগিয়েছিলেন এই নদীর কিনারে; আজ সেটা মাইল খানেক জুড়ে জঙ্গল হয়ে গেছে। ওর মাঝ দিয়ে মানুষ-চলা সুড়িরাস্তা। মানুষ ঢুকলে দূর থেকে দেখাই যায় না যে কেউ যাচ্ছে! দিনের বেলা কোনো ভয় নাই, কিন্তু রাত বেশী হলে এই যায়গাটা পেরুতে একটু ভয়ভয় করে ওদের;—ভূতের ভয়, চোরের ভয়, আর লম্পটের ভয়। যদিও লম্পটকে ভয় করা আর ওদের উচিৎ নয়—তবু ভয় করে। বারুণী বলল,

—ইখানটোকে কেটেকুটে ফেলে কেনে যে ঘর বানায় না—ডর লাগে ভাই ইখানে আমার।

—চ—চ; আমাদের আবার ডর কিসের! থুকাথুকা ফুল রইছে কেমন—লে দুচারটো!

ময়না ফুল ভালবাসে। কয়েকটা করবীগুচ্ছ ভেঙে ও খোঁপায় গুঁজলো। বারুণীও গুজলো একটা গুচ্ছ, বলল—কাল ঘুষ-সায়েব কি বলছিল জানিস? বলছিল যে যুদ্ধু থামলে আমাগে ওব ঘরকে নিয়ে যাবে—কলকাতা। উ খালভরার কথা যেন বিশ্বেস করছি আমি আর কি! যি কদিন আছিস বাবা, লে—আবার মিছ্‌কথানি কেনে!

—তু কি বল্লি?—ময়না হাসতে হাসতে শুধুলো।

—বল্লুম, হুঁ বাবু, এতো কুপাল কি আমার হবে! লিয়ে যাও তো যাব।

—আমাকেও বলছিল ঐ রকম। উসব বলে হারামজাদারা—ঝুনে করে, আমরা বিশ্বেস করছি।

—কি জন্যে যে অত মিছ্‌মিছেনি কথা কয়? আবার বলে কি জানিস? পূজোর সুময় আমাগে কানের দুল কিনে দিবে আর একটো সিলিকের শাড়ী কাপড়।

—উঃ বাবা র‍্যা! বলিস কি লো! তুর কুপালে যে ঘুষ-সায়েবের রাণী হবার লিখন দেখি।

—হুঁ—দেখছিস কি! ইদিকে একটোর বেশী দুটা লুগা নাই। দেয় তো ভারী—চাল আর ডাল।

—তবু দেয়।—ময়না একটা নিশ্বাস ফেললো।—দাদাকে খাওয়াতে পারছি বারু—নাহলে দাদা ঠিক মরে যেতো। লিখাপড়া জানা মানুষ—খারাপ কাজ কর্ত্তে লারে—খারাপ কথা শুনতে লারে—দাদাকে নিয়ে যে কি মুস্কিল!

—তা বেটে ভাই। তুর দাদা আবার একটো আলাদা মানুষ। ভদ্দর লোকের ঘরে জন্ম লিলেই ভাল হোত ওর—তুখে কিন্তুক ভালোবাসে ভাই ময়না—দাদাই তুর মা-বাপ!

—বাবাকে আমার মুনেই পড়ে না, মাকে একটু আধটু। দাদাই তো আমার সব। দাদার লেগেই সুংসার—দাদার লেগেই ইসব কত্তে হচ্ছে!

করবী বনটা শেষ হযে গেল। ওপাসে ফাঁকা মাঠ—তার পর দেখা যাচ্ছে হাওয়া-জাহাজের মস্তবড় উঠোনটা। কোনো প্লেন উঠছে, কোনোটা এইমাত্র নেমে ধুঁকছে—ঠোঁটের পাখাটা ঘুরছে এখনো বন বন করে। দুটো উড়ে ওদের মাথার উপর দিয়েই চলে গেল সবেগে! রেল লাইনের উঁচু আল-ধারে মানুষচলা সুড়ি রাস্তা—তাই ধরে ওরা চলতে লাগল! যাবে ওপাশের কারখানায়।

—আর একটো চুটি খেয়ে লে—উখেনে আবার চুটি খেলে বকে—বলে—মুয়ে নাকি গন্ধ লাগে!

—সিগরেট খাস না?—ময়না শুধুলো!

—হুঁ—কিন্তুক জলপানা লাগে সিগরেট! উ আবার খায় নাকি! কড়া চুটি না হলে শানায় না ভাই আমার।

বড় একটা বাব্‌লা গাছের পাত্‌লা ছায়ায় বসল দুজনে। আঁচল আড়াল দিয়ে বিড়ি ধরালো—বেশ লম্বা একটা টান দিয়ে বারুণী বলল—কাল যখন ফিরলুম না—এনেকটো রাত তো হইছিল—দেখি কি—কিষ্টে হারামজাদা বসে রইছে—মাকে বলছে, 'বারুকে উখেনে যেতে দিব না আমি—উখেনের লুকরা সব কেমন লুক, কে জানে।, মা বললে—'খাটতে না গেলে চলবে কেনে বাছা—তুমি যদি খাইতে পাত্তে, তাহলে না হয় বলতে। তুমারই এক বিলা জুটে না—বারু খাটতে যায়—তুসের খুদকুঁড়ো আনে, তাই বেঁচে আছি।' হারামজাদা

তাতে বল্লে কি জানিস! বলে, 'আমার বউ—আমি যদি না যেতে দি?'

—তু কুথা ছিলি তিখন? ময়না সাগ্রহে শুধুলো! বারুণী বলল—আমি নাছ দুয়োরেই শুনতে পেলুম কিষ্টের কথা—দাঁড়ালুম—বলছে, 'উ তো বেশ্যেগিরি করছে উখেনে—যেতে আমি দিব না।'

—উ কি করে জানলো?—ময়না যেন চমকে উঠে ভয়ে ভয়ে প্রশ্নটা করলো।

—কে জানে গা! আমি বাইরে না থেকে ঢুকলাম ঘরে—ঝুড়িটো নামাইয়ে দিয়ে বললুম—খুব বেশ্যেগিরি করবো—না করলে খাব কি রে হারামজাদা? বলে সেই 'ভাত দিবার ভাতার নয়, কিল মারবের গোসাঁই।' বেরো ঘর থেকে!

—তা বই?

—মারতে আসছে খালভরা! বলে, তুখে খুন করবো হারামজাদী! আমি না সেই মেয়ে! একটো খাজুরের ডাল নিয়ে সপাসপ্ ঘাকতক দিলুম ঠুকে! পালাবার পথ পায়না! যাবার সুময় বলে গেইছে—নদীধারে আমাকে পেলে হয়—এতক্ষুণ বলি নাই ভাই—ডর লাগছিল!

—হুঁ—দাদাকেও বলে দিবে নাকি তেবে!

—দেগ্‌গো! দিলে আর কি করবি! দাদা কি আর না বুঝেছে ভাই!

—নাঃ দাদা আমর উসব খবর রাখে না। শুনলে বড্ড দুঃখু পাবে। হয়ত ঘর ছেড়ে চলেই যাবে কুনো দিকে!

—কি আর করবি ময়না! খুসীর সয়দা তো আমরা করছি না বোন! ভগবান দেখছে। পাপ আমরা করি নাই। আমাদের গতর ছিল, কাজ পেলে করতুম। কাজ কৈ! কি করবি আর?

—হুঁ—ময়না বড্ড বিমর্ষ হয়ে পড়ল!

—চ—উঠি। আজ একটুস্ সুকাল সুকাল বেরুস ভাই ময়না, কিষ্টেকে ডর লাগে আমার!

—ছাড়লে তো!—বলে ময়না উঠলো। মাথার চুলে গোঁজা আছে আয়না আর ছোট চিরুণী, কিন্তু প্রসাধন করতে আজ ভুলে গেল ওরা দুজনেই। বিক্রিতব্য যৌবনকে সাজিয়ে না নিয়ে গেলে ক্রেতার দল অনুযোগ করতে পারে—অবহেলা করতে পারে—দর কম দিতে পারে, জানে ওরা, তবু কারো মনেই হল না রূপসাধনার কথাটা।

লাইনের ওপাশে জোলডাঙ্গা কলিয়ারীতে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট চলছে—মজুরগুলো পথের ধারে বসে ঝিমুচ্ছে আর মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে—গান্ধীজি কি জয়—মজুরী বাড়াও—ইনকিলাব—জিন্দাবাদ!

কদিন থেকে দেখে যাচ্ছে ময়নারা—কিন্তু আজ যেন গোলমালটা বেশি। পুলিসও এসেছে, ঘোড়ায় চড়ে দারোগাই বোধ হয়। ভয়ে ভয়ে পাশ কাটিয়ে ওরা কারখানার দিকে এগুলো। খড়ের চাল দেওয়া সাময়িক সব ঘর—দেখতে খুব সুন্দর—নতুন সোণারংএর খড় চালের উপর সূর্য্যের আলোয় জ্বলছে—বেশ দেখতে লাগে। পথটা দুভাগ হয়ে গেছে এইখানে। ডান দিকে গেল ময়না আর বাঁদিকে বারুণী। ময়না খুব আস্তে হাঁটছে আর বারুণী চলছে নৃত্যছন্দে—দেখে মনে হয়—ওর যেন কোনো দুর্ভাবনাই নাই।

* * *

শাওণ মাসের আজ পনরই, আর পাঁচ-সাত দিন পরেই ঝুলনের মেলা বসবে। হুঁ—মেলা আর এ বছর বসেছে। বসাবে কে? কেই-বা দেখতে আসবে মেলা? মানুষগুলো যে রকম ভাবে মরছে—মেলা দেখবে—একেবারে শমন-সদনেই যাত্রা করছে ওরা। রাজুর হঠাৎ গানের কলি গুণগুনিয়ে উঠলো মনে—

গেলি সব শমন-সদনে—ও ভাই শমন-সদনে,
চাল না পেয়ে চলে গেলি কী অভিমানে? ও ভাই শমন-সদনে।
বাবুর ঘরে ছিল রে চাল—বেচে দিল পেয়ে দালাল,
গাঁয়ের লোকের চোখের উপর নিয়ে গেল চাল-ধনে—শমন-সদনে।
কেউ পেলি নে খুদের কুঁড়ো—মবলি ছেলে, মবলি বুড়ো···
যোযান মেযে খাবার চেয়ে বিচ্‌লি সতীত্ব-ধনে—সমন-সদনে।

গুণ গুণ গুণ গুণ—গানটা তৈরী হয়ে উঠলো। আবো দু'একটা পরকলি লাগাতে পাবলে বেশ হয়। বাজু দেওযালে টাঙানো একতারাটা নিয়ে টুং টুং টুং-টুটুং করে বাজাতে বাজাতে মহা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। আরো একটা লাইন মাথায এসে গেল ওব, গাইল—

পথেব ধারে আস্তাকুড়ে—মরে তোবা বইলি পড়ে,

ওরে দেখলো না কেও···মিল আব জুটছে না মাথায। 'শমন-সদনে'র সঙ্গে মিলুতে হবে। রাজু মহা ভাবনায় পড়ে গেল। ময়না থাকলে চট্‌পট্ একটা জুগিযে দিতে পারতো। কিন্তু সে তো আসবে সেই রাত্তিরে। ততক্ষণ কি আব অপেক্ষা করা যায়? বাজু অস্থির হযে মিল খুঁজছে। ওব পরিচিত শব্দের অতি ক্ষুদ্র ভাণ্ডাবটি হাতড়ে হাতড়ে ফিবছে রাজু। 'সদনে-মদনে' দিলে বেশ মিল হয়—না—'বদনে' আবো ভালো—উৎসাহিত হয়ে উঠলো···।

একটি ফোঁটা জলের টোপা কেউ দিলনা বদনে—
গেলি সব শমন-সদনে···টুং-টুং-টুং।

—সাঙাৎ।

—এসো, ভাই, এসো। তোমাকেই খুঁজছিলাম।

—কেনে হে?

—গায়েন বাঁধলুম একটো। শুন তো কেমন হইছে। বলেই রাজু

সমস্ত গানটা গাইল! উৎসাহে শঙ্করও যোগ দিল ওর সঙ্গে! দুজনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইল বার তিন চার। রাজু খুব খুসী হয়ে উঠেছে, কারণ সাঙাৎও গাইছে। গানটা ভাল হয়েছে তাহলে!

—চা খাবে সাঙাৎ? খাও-না ভাই! আমি অখুনো চা খাই নাই!

—বেশ তো, বানাও! চা-চিনি সব আছে ঘরে?

—হুঁ—ময়নার দৌলুতে কিছুই অভাব নাই! কিন্তু বড্ড খাট্‌ছে ভাই মেয়েটা! সেই ভুর বেলা গেইছে—আসবে সেই রাত দুপুর করে! যোয়ান দাদা আমি—বসে বসে খাই। এত কষ্ট হয় সাঙাৎ!—হুঁ—শঙ্কর আর কিছু বলল না। রাজু কয়েকটা শুকনো তাল মোচা, পাতা, জেলে একটা মাটির ভাঁড়ে জল চড়িয়ে দিল উনুনে। চা, চিনি, চা-ছাঁকনী, দুটো এনামেলের গেলাস বার করল।

—দুধ কুথা পাবে হে সাঙাৎ? শঙ্কর প্রশ্ন করল!

—আছে! টিনের কোটোতে দুধ আছে। দাঁড়াও, দেখাইছি!—বলে রাজু একটা জমাট দুধের টিন বার করলো। তার থেকে খানিকটা দুধ একটা বাটিতে নিয়ে গরম জল অল্প মিশিয়ে নাড়া দিল একটা কাঠিতে করে—দেখছো সাঙাৎ? একদম খাঁটি গাইয়ের দুধ—শুঁকে দেখ!

—হুঁ হে! তাইতো! ময়না এনেছে?

—আর কোথা পাব নইলে? ময়নার আমি দাদা, আর দাদা কি খেতে চায়—দাদা কি ভালবাসে—দাদার কি চাই—এই সবই ওর ভাবনা! আর কিছুটি যদি ভাবে বোনটি আমার!

—হুঁ—অত কষ্ট করে মানুষ করেছ!

—কষ্ট ভগমান করেছে ভাই, আমি আর কি! তাও তো আজ আমাকেই খাওয়াইছে। নইলে তো মরেই যেতুম।

—হুঁ—শঙ্কর চুপ করে রইল। রাজুর উচ্ছ্বাস আরো খানিক

চলতো হয়ত, কিন্তু চায়ের জল ফুটে উঠেছে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে চা ছেড়ে দিল! গুণগুনিয়ে গান গাইছে—

"শমন-সদনে—ও ভাই শমন-সদনে"—গায়েনটি কেমন লাগল ভাই সাঙাৎ!

—বেশক্! তেবে ঐ যে বলছো, 'যোয়ান মেয়ে খাবার চেয়ে বিচলো সতীত্ব-ধনে'—ঐটুকু খুব ভাল! আর দিনকাল যা পড়েছে ভাই, উরকম না করলেই বা কি করে আর—তাই বলছিলুম কি·····

শঙ্কর থামলো! রাজু চায়ের গেলাসটা ওর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল—বলো সাঙাৎ!

—হুঁ—ময়নাকে উখেনে আর যেতে দিও না তুমি। সুমত্ত মেয়ে—উখেনের লুক সব ভাল নয়!

—কেনে? কি করে জানলে? কিছু খারাপ শুনেছ নাকি?

—হুঁ—কিষ্টে কাল রেতে আমাকে বলতে এসেছিল যে উওদিকে যাওয়া বন্ধ করতে হবে! ঐ কিষ্টের বৌটাও যায় কিনা—ঐ বারুণী।

—হুঁ—হুঁ—যায়। উই তো রোজ ভোবে এসে ময়নাকে জাগায়; এক পথেই যায় দুজনায়।

—কিষ্টে বলছে যে উরা—ময়না আর বারুণী ভাল কাজ করে না; কিষ্টে খবর লিয়ে এসেছে! তোমাকে বলতে লাবুছে—আমাকে যেয়ে বললে।

চায়ের গেলাসটা মুখ থেকে নামিয়ে রাজু বলল—মিছে কথা! কোথা শালা কিষ্টে?

—তোমার কাছে আসতে লারছে উ। ডর লাগে তোমাকে! তবে কথাটো মিথ্যেও লয় হে সাঙাৎ! উত্তেজনায় রাজু দাঁড়িয়ে উঠলো!

—ময়না ইরকম খারাপ কাজ করছে? কোন্ শালা বলে?—কৈ

কিষ্টে? কোথা কিষ্টে? আসুক তো শালা আমার লজরে। কেটে কুটিকুটি করবো উওকে!

রাজুর বুকের পাটা রাগে ফুলে উঠছে। শঙ্কর একটুক্ষণ থেমে বলল—বসো সাঙাৎ। অত রাগ করবের কি হোল! কিষ্টে বললেই তো আর কিছুই হবে না! আমাদের হুঁসিয়ার হ' দরকার—তাই বলছি!

হুঁ—হুঁসিয়ার। হুঁসিয়ার কি হব! ময়না আমার কোলের মেয়ে—ময়না আমার বুকজুড়োন ধন—ময়নার নামে কলংখ দেয় কোন হারামজাদা;···রাজুর রাগ পড়তে চায় না। শঙ্কর আরো খানিক চুপ্‌টি করে বসে থেকে উঠে যাচ্ছে, রাজু বলল—চললে নাকি?

—হুঁ—যাই। ময়নাকে কিছু বলো না আখুন, বুঝলে! শঙ্কর বেরিয়ে গেল মাঠের দিকে।

শঙ্করের সঙ্গে রাজুর বন্ধুত্ব অনেক দিনের। সেই যখন তারা গরুবাগালি করতো গাঙুটি পালে। গাঁয়ের সব লোকের গাই গরু আর বাছুর চরাতে নিয়ে যেত পালে—তারপর সন্ধ্যাবেলা ফিরে জীবন যোগীর "নাইট-ইস্কুলে" পড়তে যেত! গাঁয়ের বাবুরা করেছিল ঐ নাইট ইস্কুল—এখন আর চলেনা সে স্কুল—বছর দুই হোল বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু রাজু আর শঙ্কর পড়েছিল ঐ ইস্কুলে। পড়াশুনো করা থেকে শঙ্কর বেশি ভালবাসতো গাদাগাদি খেলা; রাজু কিন্তু সত্যি পড়তো; চার পাঁচ বছরে রাজু রামায়ণ মহাভারত পড়তে শিখেছিল—তারপর বামুনদের তারণ ঠাকুরকে বলে একখানা মনসামঙ্গল, একখানা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ আর একটা বাদাবাদি তরজা কিনে আনিয়েছিল কলকাতা থেকে। ঝুলনের মেলাতে সে-বছর কিনেছে একটা 'হারু ঠাকুরের পাঁচালি'—আর গোপাল উড়ের গান। বইগুলি মহা যত্নে ন্যাকড়ার ফালিতে বন্দী হয়ে আছে। সময় পেলেই রাজু খুলে পড়ে।

তাছাড়া একটা উড্‌পেনসিলও আছে ওর। ঐ তারণ ঠাকুর দিয়েছিল। বেশ লোক তারণ ঠাকুর; রাজুর গায়েন বাঁধা শুনে খুব উৎসাহ দেয়—আর বলে—কলকাতায় নিয়ে ছাপাবে ঐ গায়েন। তা উ পারে। তারণ ঠাকুর নিজেও পদ্য ছাপায়। কতদিন আসে নাই ঘর। পূজোতে এলে একবার সব গায়েনগুলোন্ ঠাকুরকে দেখাবে রাজু! উড্‌পেনসিলে লিখে টিনের বাক্সতে ভরে রেখেছে। আজকারটাও লিখবে ভেবে কাগজ পেন্‌সিল বার করেছিল, কিন্তু গায়েন লিখতে আর মন সরছে না। গানের রস গাঁজিয়ে উঠেছে—তাড়ির নেশা লেগেছে যেন রাজুকে। ময়না! ওর আদরের ময়না কি তাহলে সত্যিই দেহ বিক্রী করে চাল-কলাই-চিনি-আটা নিয়ে আসে? না—না—না, রাজু কিছুতে বিশ্বাস করে না এ কথা! কৈ, ময়নাকে দেখে তো সে কথা মনে হয় না! যেমন ছিল ময়না, তেমনি আছে, বরং রোগা হয়ে গেছে। একখানা ছেঁড়া কাপড় পরে ময়না যায় খাটতে—গায়ে একটা পেতলের গয়নাও নাই—ময়না করবে নচ্ছারী! ছিঃ! রাজু কি সব ভাবছে! হতে পারে না—হতে পারে না! রাজু বসল। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! যাকগে! চা আজ আর খেতে চায় না রাজু। না, চা খাবেনা কেন! ময়না এসে শুধুবে—চা খেয়েছিলে দাদা?—এসেই শুধুবে, আজ কি রাঁধলে দাদা? এসেই হেসে হেসে বলবে—আজকে বেশি খাটুনি ছিল না দাদা—খুব জিরিইছি। খিচুড়ি রাঁধবো—। ময়না—আমার কত কষ্টের মানুষ করা বোন ময়না—খালি দাদা, আর দাদা। দাদা ছাড়া কিছু জানে না ময়না। না—মনটাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না রাজু। যদি সত্যি হয়—। সত্যি যদি ময়না দেহ বিক্রী করেই চাল-ডাল-আটা সংগ্রহ করে—তাহলে, তাহলে রাজু এই কয়মাস ঐ পাপার্জিত অন্নে জীবনরক্ষা করে এসেছে! ধিক—ধিক! রাজুর অর্দ্ধশিক্ষিত—স্বল্প-জাগ্রত মন ধিক্কারে জ্বালাময়

হয়ে উঠলো? বেরিয়ে পড়ল রাজু কুঁড়ে থেকে। ঘরে শিকলটা টেনে দিল, কুলুপ আর দেওয়া হল না। অথচ ঘরে অনেক মূল্যবান সম্পত্তি রয়েছে; খুবই মূল্যবান বস্তু—চাল দশ বার সের—আটা আধমণ খানেক—চিনি প্রায় তিনচার সের—যা এ গাঁয়ের কারো বাড়ীতে হয়তো পাওয়া যাবে না।

রাজু গট্‌গট্ করে খানিকটা চলে গেল। কিন্তু কোথায় যাবে? কার বাড়ী যাবে রাজু? তারণ ঠাকুরের বাড়ী যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঠাকুর থাকে কলকাতায়; আসবে সেই পূজোর সময়। নাঃ, কোথাও যাবে না রাজু। গাঁয়ের লোক হয়তো ময়নার কথাটা নিয়ে জটলা পাকাচ্ছে। রাজুকে দেখলে মুখ টিপে হাসবে তারা, না-বেরুনোই ভালো। ঘরেই ফিরে এল। কয়েকটা কাঠিমুঠি জেলে আবার চায়ের জল চড়ালো।

বিশ্বাস করে না—না, রাজু কিছুতেই বিশ্বাস করবে না ওকথা। ময়না কখনো খারাপ নয়—হতে পারে না।—চা তৈরী করে রাজু আস্তে খেতে লাগল। ময়না এসেই শুধুবে—চা খেইছিলে দাদা?—ভাতের কি তরকারী রেঁধেছিলে দাদা?—আরো কত কি শুধুবে, রাজু বলবে,—হুঁ খেইছি। আরো বলবে,—আর একটো ভালো গায়েন বেঁধেছি ময়না, শোন! রাজু শোনাবে—। রাজু গাইতে থাকবে; ময়না শুনবে।

"শমন-সদনে, গেল সব শমন-সদনে" গাইতে গাইতে নীচের কলিতে এসে পৌছাল রাজু—"যোয়ান মেয়ে খাবার চেয়ে বেচলি সতীত্ব-ধনে—শমন-সদনে"—চমকে উঠলো রাজু! এ কি লিখেছে সে! এ কোন সর্ব্বনাশা কথা তার গানের বাণীতে গাঁথা হয়ে গেছে! গানটা থামিয়ে রাজু আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল; যেন তারই গানের ঐ কলিটা তীক্ষ্ণ বর্শাফলকের মত আকাশ

থেকে নেমে তার মর্ম্মকোষে বিদ্ধ হয়ে গেছে। গানের ঐ লাইনটা যেন সত্যের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। রাজু আবার অস্থির হয়ে উঠলো। না—ঘরে থাকা অসম্ভব আর! চায়ের গেলাসটা নামিয়ে. রাজু উঠে পড়ল—দরজায় তালাচাবি দিল—তারপর গ্রাম-পথ বেয়ে চলতে লাগল। কিন্তু যাবে কোথায়? কোথায় গিয়ে শান্তি পাবে আজ রাজু? মাথাটা কেমন দপ্‌দপ করছে। ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! আশপাশের কিছুই দেখছে না রাজু, সামনেও কিছু না; শুধু ঐ কলিটা "যোয়ান মেয়ে খাবার চেয়ে বেচ্‌লি সতীত্ব-ধনে"—ডগডগে রক্তের অক্ষরে লেখা—নিজেরই লাল-নীল পেনসিলটার লেখা মোটা মোটা অক্ষর, বড় বড় অক্ষর—কাঁকড়া বিছের মত লেজ-তোলা দাঁড়াওয়ালা আখর রাজুকে দংশন করছে নিষ্করুণ ভাবে! ছুটে যদি পালাতে পারতো রাজু!

শঙ্করের ঘর যাবে? না—শঙ্কর আবার সেই কথাই বলবে। তার চেয়ে বারুণীর বাবার সঙ্গে দেখা করবে? শঙ্করদেব পাড়াতেই ঘর বারুণীর, আর কিষ্টরও ঘর ঐ কাছেই। রাজু গট্‌গট্ করে চলে আসছে—কে যেন ডাকলো—রাজু, ওরে ও রাজু! নাটু মোড়ল বারান্দায় তামাক খাচ্ছিল, ডাকছে রাজুকে! রাজু ছাড়িয়ে এসেছিল নাটুর বৈঠকখানা—ফিরে তাকিয়ে দেখলো—বললো—ডাকছো না কি মোড়ল?

—হ্যাঁ—আয় এখানে।

রাজু ফিরে এল। দাঁড়ালো মোড়লের সামনে। হুঁকোতে একটা সুখটান দিয়ে নাটু কলকেটা নামিয়ে দিল মাটিতে—লে, খা। যাবি কুথাকে?

কলকেটা তুলে দুটো টান দিয়ে রাজু বললো—যাব একবার বারুণীদের উদ্দিকে। কি বলছো?

—বলছিলোম কি, বুনটোকে উখেনে যেতে দিস কেনে? ওরা কি লোক ভালো? শেষ কালে দেখিস, কুনদিন বুন আর ঘরেই ফিরবে না। যেতে দিস্ না উখেনে—বুঝলি?

—গতর খাটাইয়ে খাবে—তাও তুমাদের সইছে না মোড়ল! কেনে ইসব কথা বলছো বল দেখি!

রাজু কলকেটা নামিয়ে দিল মাটিতে। নাটু বললো—গতর খাটাবার আর যায়গা নাই রে, যে ঐ সব কাজ করতে হবে? অত কষ্ট করে বুনটোকে মানুষ করলি কি ঐ কর্ম্ম করাবার লেগে! আচ্ছা আহাম্মক তু কিন্তুক রাজু!

রাজু চুপ করে রইল। রাগ তার খুবই হয়েছে কিন্তু বিষাদে সর্ব্বেন্দ্রিয় যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে! শারীরিক সমস্ত সামর্থ্য যেন লুপ্ত হয়ে গেছে ওর! নাটু আবার বলল—আমার ঘরেই পাঠিয়ে দিস কাল থেকে, বুঝলি। পাটকাজ করবে—রোজ একসের চাল আর নুন, তেল, ডাল সব আমিই দিব; উখেনে যেতে হবে না। হোক্?

—না মোড়ল—ময়নাকে যে তুমি কি চোখে দেখ, তা জানি আমি। ভালো চাও তো চুপ কর। আমার বুন। আমি তার লেগে ভাববো। তোমার অত কথায় কাজ কি—রাজু আর দাঁড়াল না—চলে গেল যেন ছুটেই। নাটু মোড়ল তার কাঁচা-পাকা দাঁড়িতে হাত বুলুতে বুলুতে আপনার মনেই বলল—আচ্ছা, দেখ্ লেঙ্গা! কলকেটা তুলে নিয়ে নাটু শুঁকে দেখলো, তামাকটা পুড়ে গেছে, ডাক দিল,—ওরে হরু, কলকেটা বদল করে দে।—একটা পাকুড় গাছের পাশ থেকে বেরিয়ে এল কিষ্ট। বাব্‌রি চুল তেল না পেয়ে রুক্ষ হয়ে জট্ বেঁধে গেছে। কালো কুচকুচে দেহের হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে—বেজায় রকম ঢেঙা লাগছে, যেন শুকনো প্যাকাটি। চোয়ালের দু'খানা হাড় এত উঁচু হয়ে উঠেছে যে গালের মাংস ভেতরে ঢুকে

গেছে—শুধু বড় বড চোখ দুটো জ্বলছে, খিদেতে না হিংসায় কে জানে! মোড়ল বলল—কিষ্ট যে রে—কোথা গেইছিলি! আয়, কলকেটা সাজ দেখিনি।

কথা না কয়ে কিষ্ট কলকে সাজতে বসল। নাটুই বললো আবার, —তুর বৌটোও যায় নাকি রে উখেনে? ঐ হাউই জাহাজের কারখানায়?

—হুঁ—বলে কিষ্ট কলকের আগুনে ফুঁ দিতে লাগল। মোডল ওর তোবড়ানো গালের পানে চেয়ে বলল—যেতে দিস কেনে তু? তু হারামজাদার কিন্তুক আক্কেল নাই। বিয়েলি বৌ—যেতে দিবি কেনে? ময়না ছুঁড়িটোব কথা আলাদা। ওর দাদা আখুনো বিয়েই দিলে না আঠারো বছবের বুনের; কিন্তু বারুণী তুব বৌ—তু ছাড়িস কেনে? বেকুফ্, কোথাকার! নিজের বৌকে কে আবার পরের ঘরে পাঠায় র‍্যা—!

—যেতে কি আব আমি দি গুলা? ওর মা হাবামজাদি বড্ড বজ্জাৎ। বল্লেক কি, জানো, বল্লেক—খুব কববেক যাবেক! তু খালভরা প্যাটে ভাত দিতে পারিস না—খাবেক কি র‍্যা-মুখপুড়া!

—কেনে? তুর রুজগারপাতি নাই কিছু?

—না! ঘর ছাইবাব আর কারো দরকার লাগে না। মরেই গেল সব। ঘর আর ছাইয়ে কি করবেক। তা বই, জনমজুরও কেউ খাটায় না—আর যদি খাটায় তো দেয় পয়সা—চাল নাই।

মোড়ল কলকেটা হুঁকোয় বসিয়ে গোটা কতক টান দিল ঘনঘন। তারপর বলল—যা দিন কাল পড়েছে কিষ্ট। চাল আর পাবি কুথা? হ্যাঁ, তবে আমি বুদ্ধি করে চাল কিছু রেখেছিলোম। বেচে দিলে টাকা পেতুম অনেককটি, কিন্তু তুবা সব না খেয়ে মরতিস? হ্যাঁ, দেখ্—শুন—একদিন অন্তর এসে একপাই করে লিস, বুঝলি—আর

আমার ঐ যে ভসকাজুড়ির ক্ষেতটা—উখেনের ক'টা আল ভেংছে গেল-বছর—যা, আজ থেকেই লেগে যা, কাজ করবি, খাবি। ভাবনা কি! ধান হলে আমি কিন্তুক বাবা দুটাকা সের-করা দাম ধরে তোমার ভাগের থেকে উশুল করব। ই বছর যা বর্ষা—সব তোর শোধ হয়ে যাবে—যা, লেগে যা।

কিষ্ট হাতে স্বর্গ পেল। একদিন অন্তর আধসের চাল দেবে মোড়ল! যথেষ্ট হবে দুজনের পক্ষে! ওর সঙ্গে কমলীলতা, হিঞ্চের শাক—শামুক-গুগলি-কাঁকড়া, পায় তো দুটো চুনোপুঁটি—বেশ হবে! কিষ্ট মোড়লকে প্রণাম করে বলল—রাজা তুমি বাবা। তোমার হিল্লে পেলে আর ভাবনা কি! আজই নিয়ে আসবো শালীকে!

—হুঁ, নিয়ে আয়। আমার পাঁদাড়-দিকে গোয়ালের পাশের লাঙ্গল রাখা ঘরটায় থাকবি দুজনায়। আর দেখ—ঐ ময়না ছুঁড়ির দেমাকটো ভাঙতে হবে—বুঝলি!

—হুঁ গুলা—উই হারামী তো যত লষ্টের জড়। ওকে দেখেই বারুণীকে নিয়েছে ঘুষ-সায়েব—ঐ শালীই তো বজ্জাৎ বেশি? বাজু শালা বুনকে কিছু বলেও না।

—নারে—না। তুর বারুণী ছুঁড়িটোও খুব সুন্দর দেখতে। আর বয়েসটা কি! আঠার-কুড়ি, এই তো বাবা বজ্জাতি করবার সুময়। দুটোকেই, বুঝলি—টিট করা যাবে। বারুণী না গেলে ময়নাও যেতে পারবে না। একা-একা গেলেই একদিন নদীর মানাতে ধরে আচ্ছা করে—বুঝলি—! নাটু তাকালো কিষ্টের দিকে। কিষ্ট ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়েছে, বলল—ময়নাকে লিবে তুমি গুলা? উ আর কতক্ষণের কাজ! বলতো আজকেই আমি ধরে এনে দিই?

—বলিস কিরে! আজকেই পারিস?

—খুব খুব! কলকেটো ছাড়ো গুলা আর একবার।—কিষ্ট সাহস

পেয়ে বলল কলকের কথা। নাটু কলকেটা হুঁকো থেকে নামিয়ে বলল, —সাজতো আর একবার ভাল করে। কিছু খাস নাই আখুনো—লয়? ওরে হরু, এক আঁচলা মুড়ি দেত বাবা কিষ্টকে—দে—।

হরু নটনাথের বছর আটদশ বয়সের পুত্র। মা নাই—নাটু বিপত্নীক। বাড়ীতে আছে বিধবা বোন—নাটুর ছোট। সেই সংসার দেখা শুনা করে। নাটুর অল্প সম্পত্তি—চোদ্দ-খানা লাঙ্গলের চাষ—গরু-বাছুর-মোষ-ছাগল-ভেড়ায় ঠাসা তার গোয়াল। কিন্তু নাটুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এই সম্পন্ন গৃহস্থের সাতাশ বছরের বধূ হরুর মা গত বছর উদ্বন্ধনে মরেছে। নাটু সেই থেকে গাঁজা খেতে ধরেছে সন্ধ্যাবেলায় এক ছিলেম করে। নাটুর কিছুই অভাব নাই শুধু গৃহের লক্ষ্মীটি ছাড়া।

রাজু যেন উল্কার মত চলেছে। নিতান্তই ছোট জাতের ঘরে জন্মেছে রাজু, বোনের ব্যাপারটা ও অনায়াসেই অগ্রাহ্য করে যেতে পারতো। ওদের সমাজে এ সব ঘটনা ঘটে থাকে আর ওরা দেখেও দেখে না, কিন্তু রাজু এক আধটু লেখাপড়া শিখেছে। নিজেকে ও অন্যের চাইতে উঁচু মনে করে, আর মনে করে তার বোন তারই মত হয়েছে। কারণ রাজু বোনটাকেও কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছে নিজেই। ওদের জাতের কোনো মেয়েই লেখাপড়া জানে না। রাজু আশা করে, রূপশার বেনের ডোমের একমাত্র ছেলে মকর ডোমের সঙ্গে বিয়ে দেবে ময়নার। 'মকর আর ময়না' চমৎকার মানাবে! ওদের অবস্থা ভাল, জমিজিরাৎ কিছু আছে, তাছাড়া মকর ভাল লাঠিয়াল, রূপশার বাবুদের বাড়ীতে পাইকের কাজ করে—বেশ শৌখীন ছেলে সে। বিয়ের সবই ঠিক আছে—বিয়েও হয়ে যেত

অনেকদিন—মাঝখানে গোল বাধলো ঐ মকরকে নিয়েই। রূপশার বাবুদের সঙ্গে সারসার বাবুদের দাঙ্গা বাধলো—মকর সেই দাঙ্গায় কয়েকটা লোককে জখম করে। পরে আদালতে তার দু'বছর জেল হয়। এখনো সে জেলে আছে। এই আশ্বিন মাসে খালাস পাবে;—তারপর অঘ্রাণেই বিয়ে দেবে রাজু ময়নার। দেবেন ডোম বারবার বলে পাঠায়—দেখো বাবা রাজু, ময়নাকে যেন আমার হবেই দিও। ছেলেটা এই আশ্বিনেই ফিরে আসছে!

ময়নাও জানে সব কথা। সেই ময়না অন্যায় কাজে উপার্জ্জন করে পরকালের পথ তো নষ্ট করছেই—ইহকালকেও অগ্রাহ্য করছে! মকর যদি জানতে পারে—তাহলে কি আর বিয়ের আশা থাকবে। তাছাড়া—এমন অন্যায় কাজ করতে দেবেই বা কেন রাজু। রূপশা গ্রামটা কাছেই—কোশখানেকের মধ্যে। দেবেন ডোম যে-কোনদিন শুনতে পারে ময়নার নচ্ছারির কথা। হয়তো শুনেইছে এর মধ্যে! রাজু তাহলে মুখ দেখাবে কেমন করে লোকের কাছে? বড় একটা তমাল গাছের ঘন ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়লো রাজু। রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল—এখন রোদ ঝিকমিক করছে। জলভেজা তমালের পাতাগুলো রোদে চিক্‌চিক্ করছে! সুন্দর দেখাচ্ছে। আহা! কি সুন্দর গাছ! রাজুর গান মনে পড়ল।

—না পোড়ায়ো রাধার অঙ্গ না ভাসায়ো জলে,
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরই ডালে॥

হ্যাঁ, মরলে এমন গাছে যদি কেউ দেহটা টাঙিয়ে দেয় তো সার্থক হয় মরণ। রাধার সোনার অঙ্গ এই কালো কেষ্টবরণ গাছে মানাবে ভালো। ময়নার অঙ্গটাও সোনার বরণ। ডোমের মেয়ে কে বলবে! ও তো রাধারই মত সুন্দর। গাঁয়ে ক'টা মেয়ে আছে অত সুন্দর! নাই। বোনের সমস্ত শরীরটা চোখের উপর ভেসে উঠলো। এতটুকু

একফোঁটা বোন—তাকে অতবড় করেছে রাজু! তিলতিল করে বড় করেছে—পাখি যেমন করে ডিমে তা' দেয়, ঠিক তেমনি করে। আঠারো বছরের রাজু চার বছরের বোনকে মানুষ করে আঠারো বছরের করেছে! চোদ্দ বছর ধরে রাজু ওর মা-বাপ-ভাই হয়ে আছে! ওর সাধের ময়না—ওর আদরের ময়না—ওর জীবনাধিক প্রিয় ময়না!—রাজুর নিশ্বাসটা আগুনের মত গরম।

কোথায় যাবে রাজু! কার বাড়ীতে? না, গাঁয়ের সবাই হয়তো ময়নার কথা নিয়েই কাণাকাণি করছে আজ। সবাই অবজ্ঞা করবে রাজুকে। রাজু সইতে পারবে না। না; কোথাও যেয়ে কাজ নাই; বাড়ীতেই ফিরে যাবে রাজু। কিন্তু রাজু যেন কোথায় যাবে বলেই বেরিয়েছে? হ্যাঁ, মনে পড়ছে, বারুণীদের বাড়ী একবার যাবে, ভেবেছিল। রাজু চলতে লাগল।

অল্প কয়েক পা দূর। বারুণীর মা বেড়ায় কাপড় টাঙিয়ে দিচ্ছিল শুকুতে। রাজুকে দেখে বলল—এসো রাজু—অমন উস্কো-খুস্কো—গা' ভাল আছে তো?

—হুঁ—রাজু বেড়ার মধ্যে ঢুকে উঠোনে গিয়ে বসল একটা মাচুলিতে। বারুণীর বাবা কোথায় গেছে। বারুণীর ছোট ভাইটা তালের খুঙ্গিতে কেঁচো ভর্ত্তি করছে, মাছ ধরবে। গাঁদা গাছের ঝোঁপ-গুলো আর দোপাটির জঙ্গলটার মাঝখানে একটা ডালিম গাছ। বড় বড় ডালিম ফলে রয়েছে, দু' একটা ফেটে গেছে। রাজু সেই দিকে তাকিয়ে রইল। কাপড় মেলে দিয়ে বারুণীর মা ঘরে ঢুকে বলল, —বড্ড শুকনো লাগছে যে রাজু তুখে?

রাজু চুপ করে থাকলো খানিক—তারপর বলল—বারু আর ময়নাকে নিয়ে গাঁয়ের সব শালারা কি সব বলছে, শুনছো?

—শুনবো কি আবার! অত শুনতে গেলে প্যাট চলে না বাছা।

খেতে দিবার বেলা কেউ তো নাই—কথা বলবার বেলাই আছে! যা যার খুশি বলে লিক। উসব গিরাহ্থি করিস কেনে?

—কিন্তু উসব কথা যদি সত্যি হয় তো·····

—সত্যি হয়তো কি হবে! যে বাজার পড়েছে! এক গরাস খেতে পেলে বাঁচি—তা বই উসব কথা শুনবো। আমরা বাবা ছোটো লুক—আমাদের উসব শুনলে চলে না কো···হু!

—তা হলে সব সত্যি?

—কি সত্যি?

—এই সব, যা ওরা বলছে?

—সত্যি হলে কি করবো বাবা, বল। গাঁয়ের কেউ খাটালি পায় না। ময়না আর বারুণী যে পেইছে, এই কত্কেব। নাহলে তো না খেয়েই মরতাম আমরা। সত্যি হলেই বা করবো কি?

—তুমি জানো তা হলে!—রাজু উঠতে উঠতে বললো—পেটের মেয়েকে বেউশ্যেগিরি করতে দিলে?

—হুঁ—দিলুম। না দিলে না খেয়ে মরতে হোত। তুখেও মরতে হোত—বুঝলি? ভাগ্যিস ময়নার দেহটো সোনার আর বয়েসটো কাঁচা—নাহলে, যার যত মুরোদ, জানা গেইছে।

রাজু ওর সঙ্গে আর কথা কইল না, বেরিয়ে পড়লো। বারুণীর মা আপন মনে গজ গজ করতে লাগল—হুঁ, বলে সেই 'বিষ নাই তার কুলোপানা চক্কর।' ঐ কাজটি না পেলে তুর বুন এদ্দিন ভাগাড়ে শুকুতো। তু ছুঁড়াও যেতিস সঙ্গে। ক'বেল ছোঁড়া কুথাকার। বারুণীর মা নিজের কাজে মনোযোগ দিল। চাল উলিয়ে মুড়ি ভাজবে সে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাজুর কথা একদম ভুলে গেল। রাজু কিন্তু ভোলে নাই। বারুণীর মায়ের সেই কথাটা ওর মাথার দাহ্য পদার্থে দেশলাই জেলে দিয়েছে। জ্বলন্ত শিখা মাথায় নিয়ে রাজু রাস্তায় চলেছে যেন।

তারণ ঠাকুরের ভাঙা ভিটে। গাঁয়ের মধ্যে এই একটামাত্র লোক রাজুকে ভালবাসে—রাজুকে বড় দাদার মত মানে। মনের সব দুঃখ রাজু ওর কাছে উজাড় করে দিতে পারে। কিন্তু তারণ তো বাড়ীতে নেই—আছে কলকাতায়। তবুও রাজু ঢুকে পড়ল। গরীব বামুনের সাত পুরুষের ভিটে। উঠোনে বড়-বড় ঘাস—তার মাঝে একটা পুরানো জবা গাছ আর একটা ভাঙ্গা তুলসীমঞ্চ। তুলসী গাছটা কিন্তু বেশ সতেজ আর ঝাড়ালো। মঞ্চের ছোট্ট কুলঙ্গীতে গতকাল সন্ধ্যায় জ্বালা বাসি প্রদীপটা একটা কাক খুঁটে খাবার চেষ্টা করছিল, তারণের বৌ সেটাকে তাড়াবার জন্য বাইরে আসছে—প্রদীপটা কাকে তুলে নিয়ে পালাতে পারে। রাজুকে দেখেই বৌটা মাথায় কাপড় তুলে দিল। রাজুই কাকটাকে হাততালি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে বলল—দিদি ঠাকরোণ কৈ বৌমা? ডুব দিতে গেইছে?

—হুঁ—ঘোমটার মধ্যে বলেই বৌ আরো ঘোমটা টান্‌লো। কালোকোলো ঢেঙা মেয়ে; দেখতে এককালে ভালো ছিল; কালো না, শ্যামলাঙ্গীই ছিল ও, কিন্তু এখন দুঃখে দৈন্যে হয়ে গেছে যেন পোড়া কাঠ। হাতে দুগাছা শাঁখা—রং উঠে সাদা হয়ে গেছে—নোয়া আছে বাঁহাতে গাছা তিনচার—ঝুন ঝুন করে তাই বাজে। পরণে আধ ময়লা কাপড়খানা খাটো, মাথায় ঘোমটা দিতে গিয়ে পিঠখানা উদোম হয়ে গেল। রাজু এর মধ্যে উঠোনে বসেছে। বৌটা সন্তর্পণে তুলসীতলায় এসে প্রদীপটা তুলে নিল—পিতলের প্রদীপ, কালো হয়ে গেছে ক'দিন মাজা হয়নি বলে। আগে নিত্যি মাজা হোত। এই দিন কতক বড্ড কষ্ট যাচ্ছে ওদের। চাল নাই, টাকাও নাই।

পরশু একবেলা জুটেছিল, কাল সন্ধ্যেতে খেয়েছে শুশ্‌নী শাক আর জনারের ছাতু—আজ এখনো উনুন ধরেনি! রাজু ঘরটার দিকে তাকিয়ে বলল—উনুন জ্বাল নাই বৌঠাকরোন, বিলা তো এনেক হোল!

—হু—জ্বালি—বৌ সরে চলে গেল ঘরের ভিতরে। রাজু বুঝলো—তারণ ঠাকুর বাড়ীতে নাই, কাজেই রান্নার তাড়া নাই। এরা হয়তো বেলা করেই রান্না চাপায়। সে উঠোনে বসে তুলসীমঞ্চের ধারে পাশের ঘাসগুলো ছিঁড়তে লাগল। যায়গাটা বড্ড জঙ্গল হয়ে রয়েছে। একটু পরিষ্কার করে দেবে—এই ইচ্ছে। ঘাসের মাঝে মাঝে দুতিনটে দুপুরে-ফুলের গাছ আপনা-আপনি গজিয়েছে। ঠিক ভর্ত্তি দুপুর বেলায় ওর লাল ফুলগুলো ফুটে যায়। এর মধ্যেই আধফোটা হয়ে এসেছে; তাহলে দুপুর হতে আর দেরী নাই। রাজু উঠোন থেকে বলল,—বিলা হোল বৌঠাকরোণ, উনুনে আগুন দাও!

বৌঠাকরোণ কোন জবাব দিল না। বৌঠাকরোণ রাজুর সঙ্গে কথা কোনো দিন বলে না—ঐ হুঁ—হ্যাঁ—এর বেশি নয়। কাজেই রাজু নিশ্চিন্ত মনে ঘাস ছিঁড়ছে। উনুন না-ধরাবার কারণটা ও আন্দাজই করতে চাইছে না। আবার খানিক পরে বলল—

—ঠাকুরের চিঠি আসে নাই বৌঠাকরোণ?

কোন জবাব পাওয়া গেল না। রাজু উঁকি দিয়ে ঘরের মেঝেতে তাকালো—ছেঁড়া আঁচলটা বিছিয়ে বৌটা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে। হোল কি? অসুখ করেছে নাকি! ভাবছে রাজু—ইতিমধ্যে দিদি এসে পড়ল। তারণ ঠাকুরের দিদি—বিধবা, ঠাকুরের থেকে বছর আষ্টেকের বড়; মা-বাবা মারা যাবার পর দিদিই সংসারের কর্ত্রী। চান করে এসেছে—ছেঁড়া কাপড়টা নিংড়ে মেলে দিতে দিতে বলল,—রাজু যে রে, কতক্ষণ এলি?

—এই আসছি দিদি ঠাকরোণ—তা বৌঠাকরোণ শুয়ে কেনে?

—কে জানে, দেখি। গাঁয়ে কোথাও চাল পেলুম না রাজু, কিনতেও পেলুম না!—দিদি ছেঁড়া কাপড়খানা লোহার তারে শুকুতে দিয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করল।

—চাল তো আছে আমার ঘরে চাট্টি—বেশি লয়, সের পাঁচ-ছয়—দিব এনে ?

—তু কুথা চাল পেলি ? ও, ময়না পায় বুঝি উখেনে ?

—হু—রাজু জবাব দিল, কিন্তু মনে লাগল ধাক্কা একটা। ময়না চাল পায়। পায় আরো অনেককিছু। কেমন করে পায়, তা এই দিদিঠাকরোণ নিশ্চয় জানে না।

—চিঠিপত্তর কিছুই পাই নাই রাজু। টাকাপয়সা কিছু হাতে নাই। বড্ড মুস্কিলে পড়েছি !

—ও ! চিঠি আসবে। দাদাঠাকুর হয়ত সুময় করতে পারে নাই—রাজু বলল—যা খাটুনি ঠাকুরের !

—কে জানে ! কি হোল বৌ ? পেটবেদনা ?

—হুঁ—বউটা আরো ভালো করে শুলো ! কাল থেকে ও খালি জল খেয়ে আছে। পেটে আর কাঁহাতক বেদনা না করে ! বাইশ বছরের বৌটাকে দেখতে লাগে যেন বিয়াল্লিশ বছরের। ছেলেপিলের কোনো বালাই নাই। ভাগ্যিস নাই—থাকলে খাওয়াতো কি ! ভগবানের দয়া ! ঈশ্বর ওকে বাঁজা করে দিয়েছেন !

রাজু ঘাস ছেঁড়া বন্ধ করে বলল—ঠাকুর টাকা পাঠায় নাই, দিদি ঠাকরোণ ?

—না রে—আজ কুড়ি দিন চিঠি নাই, টাকা না হয় ঝক্ মারলো—ভুলেই গেইছে হয়ত !

—না দিদিঠাকরোণ, ভুলবের লুক লয় দাদাঠাকুর। টাকা পায় নাই হয়তো ! আচ্ছা, আমি চাল কটা ঝট্ করে লিয়ে আসি ! উনুনটো ধরাও তুমি ! আমি আজ এইখানেই পেসাদ পাব—রাজু উঠে চলে গেল।

হয়তো একমুঠো জুটতেও পারে ঐ রাজুর দয়ায়। উনুনটা ধরাবে

নাকি! রাজু যদি চাল না আনে! থাক, রাজু চাল আসুক—তারপর না হয় উনুন ধরানো যাবে। দিদি চালার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসেই রইল। বৌটা ঘরের ভেতর কাতরাচ্ছে। বেদনাটা হয়ত খুব জোরালো হয়েছে ওর, দিদি কী করতে পারে! ঘটিবাটি যা ছিল সব বাঁধা দিয়েছে, না হয় বেচে ফেলেছে—এখন যা আছে তার দাম হয় না। তবু সকাল থেকে দু'আনা পয়সার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করে নি। নাঃ, কোথাও কিছু পাওয়া গেল না! রাজু যদি চাল আনে তো ধরাবে উনুন—না আনলে আর কি জন্যে ধরাবে? দিদি বাইরে থেকেই বলল—জলটা খেতে যে মানা করলুম রে হারামজাদী, খেলি কেনে! বৌ চুপচাপ। সাত চড়ে ওর রা বেরয় না! আপনার দুর্ভাগ্য আর দুঃখের চাপে ও আত্মসমাহিতা হয়ে গেছে। ময়লা বালিশটা পেটে ঠেসে দিয়ে আরো ভাল করে শুলো।

বসে থাকা চলে না—দিদি উঠলো। রাগে-অভিমানে চোখে জল আসছে দিদির। রাগ আর অভিমান করবার একমাত্র পাত্র, ভাইটি—ঐ তারণ ঠাকুর। নিজের মনেই বলল—যত জ্বালা হইছে আমার! দিব্যি কলকাতার নিমতলায় বাবু বসে আছে—আর আমি আখুন মরি ওর বৌকে নিয়ে। নিয়ে যাক—নিয়ে যাক এসে। আমার আর সামর্থ্য নাই!

দিদি উঠে উনুনে কয়েকটা শুকনো কাঠ দিয়ে আগুন ধরালো। জল চড়িয়ে দিল খানিকটা, তারপর কি দেবে, ঠিক করতে পারছে না। দেবার মত নাই কিছুই—!

দিদিঠাকরোণ—রাজু ডাক. দিল এসে—সুকাল থেকে চা খাই নাই দিদিঠাকরোণ—টুক্‌চেক বানাও তো, খাই!

সের তিনেক চাল, সের খানেক ডাল, একটা ঠোঙায় সের খানেক চিনি—কিছু চা, একটিন জমাট দুধ, রাজু একটা ঝুড়িতে ভরে নিয়ে এসেছে—নামিয়ে দিল।

দিদি ডাকল,—উঠো তো বৌ—উঠো, চা খাও দেখি একটুকু—দেখ, পেট-বেদনা ভাল হবে! ই দুধ তো আমি ছোঁব না—তুমরা খাও। লাও, উঠো।

শুয়ে-শুয়েই বৌটা দেখলো জিনিষগুলো। গরম চা একটু খেতে পেলে হয়তো ওর পেটব্যথা ভাল হতে পারে। কিন্তু উঠতে পারছে না—বড্ড দুর্ব্বল লাগছে। দিদি বলল—জল ফুটছে—উঠো!

বৌ উঠল—টিনটা কাটবো কি দিয়ে?

সুপারী কাটা জাতি দিয়েই কেটে ফেলল শেষটায়। দিদিকে দুধ-না-দেওয়া লাল চা একটু বেশি চিনি দিয়ে তৈরী করে এগিয়ে দিল,—তারপর ঐ জমাট দুধ দিয়ে অন্য একটা পাত্রে খানিকটা চা তৈবী করে বাজুকে অর্দ্ধেক দিয়ে বাকিটা খেতে আরম্ভ করলো। বেশ লাগছে। গরম গবম চা—খালি পেটে হলইবা—দুধ তো আছে, হোক না জমাট দুধ—বেশ লাগছে!

দিদি ভাতের জল চাপিয়ে দিল উনুনে। রাজু বলল—আলু আব কাঁচকলাও আছে দিদিঠাকরোণ—লিয়ে আসি। ও আবাব বেরিয়ে গেল। দিদি বৌটাকে বলল—কে কখন কি ভাবে উপ্‌গার কবে, দেখ। খোকাকে কত বকতুম রাজুকে অত আস্কারা দেবাব জন্যে। আজ কিন্তুক রাজুই দিলো একমুঠো চাল।

বৌ তখন চাল ধুয়ে হাঁড়িতে ছাড়বার উপক্রম করছে—চুপ করে রইল। কথা প্রায় কয় না—কথা না কইতে হলেই ও যেন ভাল থাকে। দিদি কিন্তু আবার বলল—আজ যদি খোকার চিঠি না পাই, তাহলে মাথা খুঁড়ে মরবো আমি। আমি আর পারবো না—পারবো না এমন করে। গাঁয়ের অর্দ্ধেক লুক মবে গেল। খবরের কাগজে চাকরী করিস—খবর তো দিব্যি পাস—কুন নিশ্চিন্দি বসে আছিস?

—টাকা পায় নাই হয়ত—বৌ অতিশয় ভয়ে ভয়ে বলল।

—পায় নাই তার আমি কি করবো! কি খইব তুদিকে—লাজ লাগে না ছোঁড়ার।

ভাইএর উপর বোনের এই ক্রুদ্ধ গর্জ্জন পনেরো বছর ধরে শুনে আসছে বৌ। ও জানে এই ভাইবোনের মান-অভিমানের কথা। চুপ করে বসে উনুনে জাল ঠেলে দিতে লাগল।

—তু' হারামজাদী একটো চিঠি লিখ দেখি। লিখ, যে আমরা না খেতে পেয়ে মরে গেলুম—লিখ আজ!

—তুমি তো লিখছোই। আমি লিখ্‌লে বেশি কি কাজ হবে আর?—বৌ একটা ছুঁচসুতো নিয়ে দিদির ছেঁড়া কাপড়টা শেলাই করতে বসে গেল। আনমনে কাজ করলে ওর ব্যথাটা কম লাগছে!

—রাজু এলে তরকারি দুটো বানিয়ে দিয়ে যাই একবার ডাকঘর। দেখি, আমার কি জুড়োবার যো আছে!

বৌ চুপচাপ শেলাই করে চলছে। রাজুর কিন্তু আসতে দেরী হচ্ছে—না আসে তো না আসুক—চাল তো পেয়েছে। শুধু ভাতই একমুঠো খাব। চল্লুম আমি।—দিদি উঠে ডাকঘর চলে গেল ভাইএর কোনো চিঠিপত্র এসেছে কিনা দেখতে।

বৌ শেলাই করছে আর ভাবছে, কুড়ি দিন চিঠি নাই—শরীর ভাল থাকলে হয়। বেঁচে তো আছি আমরা এখনো—এসে যেন দেখতে পায়—! বৌটার যেন কান্না পাচ্ছে! শ্বশুর-শাশুড়ী মারা যাবার পর থেকে ও একটা দিনও স্বাচ্ছল্য পায় নি। দুঃখ-অভাব-অনটন—এই ওর কপালের লিখন! ওর একমাত্র সান্ত্বনা, ওর স্বামী ওকে ভালোবাসে—আর সেই ভালবাসাটুকুর জন্যে ও এত দুঃখ নির্ব্বিচারে নিঃশব্দে সয়ে আসছে এতো দিন ধরে। স্বামী টাকা পেলে নিশ্চয় পাঠাতো—পায়নি—তাই পাঠাতে পারে নি—এই ওর বিশ্বাস। স্বামীর শরীর ভালো থাকার জন্যই তাই ওর যত চিন্তা। ও নিজে

একেবারে লেখাপড়া জানে না—নইলে হয়ত নিজেই লিখতো একখানা পোস্টকার্ড। পরকে দিয়ে নিজেদের না-খেয়ে-থাকার কথা লেখাতে ওর মন যায় না। কেন যে ও লেখাপড়া শেখেনি! কতবার ওর স্বামী চেষ্টা করেছিল শেখাতে। তখন যদি শিখে নিত! দুঃখ হয় এখন—কান্না পায়!

—দিদি কৈ বৌঠাকরোণ! এই শোল মাছ একটো পেয়ে গেলুম পলুই চেপে! লাও, রাঁধো দেখিনি!

রাজু একটা বড়মত শোল মাছ উঠানে ফেলে দিল আঁচল থেকে। মাছটা লাফাচ্ছে ঘাসের জঙ্গলে। আলু আর কলার চুপড়িটা দাওয়ায় নামিয়ে রাজু বলল—বঁটিটো দাও বৌঠাকরোণ—মাছটো বুনাই! আমড়া গুটাকইক হলে বেশ টক্ হোত বৌঠাকরোণ—আনবো নাকি কিষ্টের ঘরে যেঁয়ে!

—থাক্‌গে—তেঁতুল আছে। বলে বৌ আঁশবঁটিটা বার করে উঠোনে ফেলে নিলে। রাজু মাছটা কুটতে আরম্ভ করলো। উনুনের জ্বালটা ঠেলে দিয়ে বৌটা আলুকলাগুলো কুটবে কিনা ভাবছে—দিদি ফিরে এল; হাতে একখানা বই—এই লাও গো, লাও; চিঠি নাই, পত্ত নাই, টাকা তো নাই-ই; এই লাও, বই লাও, ধুয়ে ধুয়ে জল খাও!—দিদি খুঁটি ঠেশ দিয়ে বসে পড়ল। কোনোকিছুতে ওর আর মন নাই। রাজু মাছ কুটতে কুটতে বলল—দাদাঠাকুরের বই? কি বই? ডাকে এলো নাকি দিদিঠাকরোণ?

—হুঁ! ঐ বই-ই আসে। তাও যদি জানতুম, বই লিখছে, টাকাও আসছে—তাও বা হোত। উ সব করে কি যে হয়?

—আহা-হা! তুমার ই কথা বলা ঠিক লয় দিদি। গাঁয়ের লুক না বুঝুক—তুমার বুঝা উচিত।—রাজু মাছ কুটে দিয়ে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে এসে বইটা খুললো। তারণ ঠাকুরের লেখা নতুন বই—"কদম ফুল"—

পড়তে লাগল রাজু। সব বুঝতে পারছে না—তবু পড়ছে। রান্না হল—দিদি খেল—বৌ ভাত বেড়ে দিল রাজুকে। রাজু বই পড়ছে।

—ও রাজু খেয়ে লে। তু যে দেখছি খোকার বড় দাদা হলি। খেয়ে নিয়ে পড়বি—ওঠ। দিদি বলল।

দিদির তিরস্কারে রাজু চান না করেই খেতে বসল। খেয়ে ঐ চালার এক পাশে শুয়ে বইটি বুকের উপর চাপিয়ে আবার পড়তে লাগল। বৌ ঘরের ভেতর শুয়েছে—দিদি বাইরে চালায় সপ্ পেতে শুয়ে আছে। রাজু একধারে শুয়ে বই পড়ছে। পৃথিবীর কোনো ভাগ্যবান সাহিত্যিক রাজুর মত এমন একনিষ্ঠ পাঠক পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

*　　*　　*

রাজু বই পড়ছে তন্ময় হয়ে। তারণ ঠাকুরের লেখা "কদম ফুল"। বইটার মধ্যে ডুবে গেছে রাজু। বিশ্বসংসারের কিছুই ওর মনে নাই। ময়না—ময়নার কথাও না। সবকিছু ভুলে রাজু পড়ছে—"ঘন শ্রাবণের ধারায় ধারায় ফুটছে অজস্র কদম ফুল—বাদলের ঝাপটায় ঝরছে তাদের পাঁপড়ি—গাছের ডালে ফুলগুলো গোল পাথরের নুড়ির মত ঝুলছে—আর এই বিরাট সহরের বুকে ঠিক অমনি ফুলের বীথিকার মত মরণের বীথিকায় মরছে অজস্র, অগুণতি মানুষ—পার্কের কোণায়, ডাস্টবীনের কিনারায়—ড্রেণের পাশে সারি সারি পড়ে আছে মৃত্যুমলিন মানুষের কঙ্কাল। ক্ষুধিত কুকুর ওদের মাংস খেতে ভয় করে—ভাবে, কঙ্কালটা কুকুরকেই বা কামড়ে দেবে! বৃষ্টির ঝাপটাকে উপেক্ষা করে, বাদলের সৃষ্টি-শক্তির আবেদনকে অগ্রাহ্য করে যারা সহরের

আবর্জনা কুড়ুতে এসেছিল—তারা বেশ আরামের মৃত্যু বরণ করে নিল শান-বাঁধান ফুটপাতে। ওদের দিকে যারা চেয়ে দেখলো তারা, 'আহা' বলবার অবকাশ পেল না—কারণ, তাদেরও সময় সন্নিকট হয়ে আসছে।

ঐ মরণের বীথিকাতেই আবার জীবনের জয়গান। একটা অল্পবয়সী চাষার মেয়ে রাতদুপুরে একটা মেয়ে প্রসব করলো শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কোণায়। তার গর্ভের রস-রক্তগুলো চর্ব্বণ করবার লোভে দুটো কুকুর লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে! জ্যান্তই খেয়ে ফেলবে হয়ত বাচ্চাটাকে। রুগ্না মা শীর্ণ হাত দিয়ে তাড়াতে পারছে না কুকুরগুলো,—কিন্তু জীবন কোথাও পরাজিত হয়নি। সমস্ত দুর্য্যোগ আচ্ছন্ন করে ঐ সদ্যজাত শিশুটাই চীৎকার করে উঠলো—টুঁ—য়াঁ—টুঁ—য়াঁ! ভূতের আদুনাসিক আওয়াজের চেয়েও ভয়ঙ্কর সেই কান্না—কুকুর দুটো ছুটে পালিয়ে গেল!—ওপাশ থেকে একটা বুড়ি আসতে আসতে বলল,—কি ছাওয়্যাল র‍্যা—বিঠি হোল?

—হুঁ—বলে ঐ শীর্ণ হাতদুটো চেপে ধরলো শিশুকে। ঝর ঝর ঝরছে শ্রাবণের বারিধারা—ঝর ঝর ঝরছে পার্কের কোণার কদম গাছের ফুলরেণু, আর ঝর ঝর ঝরছে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের চোখের জল!—ভগবানের জয় হোক—আমরা ভাগ্যবান—এই জীবনেই দুটো মহাযুদ্ধ—আর একটা মহামন্বন্তর দেখে নিলাম! দেখে নিলাম—খিদের জ্বালায় মানুষ কেমন করে মানুষের মাংস খায়—কেমন করে জ্যান্ত মানুষকে কুকুর শেয়ালে ছেঁড়ে, কেমন করে···হ্যাঁ—আরো অনেক বেশি দেখলাম আমরা—দেখবেন নাকি? দেখুন—ঐ বুড়িটা সদ্য প্রসূতি ঐ চাষার মেয়েটার মা। দেশের ঘরে খেতে না পেয়ে গর্ভিণী মেয়েকে নিয়ে সহরে এসেছিল। মেয়ের স্বামী কোথায় পালিয়েছে, কে জানে? বুড়ি শিশুটিকে তার আঁচলের খুঁট দিয়ে মুছে সাফ্

করলো—ওর মা'র মাইছুধ দু'এক ফোটা যদি থাকে তো খাওয়াবার চেষ্টা করলো—নাই! প্রসূতি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে শান-বাঁধান ফুটপাতের উপর। ওর ছোট বোনটা—বয়স বছর সতের-আঠারো, পার্কের রেলিংএ ঠেশ দিয়ে ঝিমুচ্ছিল। বয়সের গুণে এখনো দেখতে মন্দ নাই সে—বুকের কাঁচুলিটা অর্দ্ধ-আবৃত করে এই গভীর রাত্রে বসে আছে—যদি কারো নজরে পড়ে এই আশায়। নাঃ, নজর কারো পড়ছে না। অথচ দিদিকে একছটাক দুধ খাওয়ানোর দরকার। উঠলো মেয়েটা। বুড়ি বলল—চল্লি কুথাকে?

—দেখি একটুকুন দুধ যদি পাই!

গলির মোড়ের ক্ষীরের দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করতে যাচ্ছে—মেয়েটা এসে বলল—দুধ দিবে গো একটুকুন!

—বেরো—যা নোংরা কাপড় হারামজাদীর!

—দুধ টুকচেক দাও—দিদিকে খাইয়ে ভাল কাপড় পরে আসছি

মিথ্যে বললো মেয়েটা, কাপড় ওর নাই কিন্তু।

দোকানী একটা মাটির ভাঁড়ে এক ভাঁড় দুধ দিয়ে বলল—চট করে আসবি। কথা না কয়েই চলে গেল মেয়েটা। চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল—পরণে সেই ছেঁড়া ময়লা কাপড়। দোকানী রেগে বলল—বেরো হারামজাদী! কাপড়ের গন্ধে ভূত পালাচ্ছে!

—কাপড় যে নাই বাবু! বলে মেয়েটা করুণ চোখে তাকালো দোকানীর পানে।

—নাই! কেতাখ করেছ!—বলে দোকানী ওকে দিল একখানা বড় রঙিন গামছা। মেয়েটা সেই আধো-অন্ধকারে ফুটপাথে ওর ছেঁড়া শাড়িটা ছেড়ে পুটলি করে ফেললো। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের কোটরে সেদাকে গুঁজে দিয়ে ঢুকলো গিয়ে দোকানীর ঘরে। সুপুষ্ট সুন্দর যৌবন—দীর্ঘ অনাহারেও জীবনের আর যৌবনের জয় ঘোষণা করছে।

ভেতরের বিদ্যুতের আলোতে ওর শ্যামলাঙ্গ ঝলমল করে উঠলো। ক্ষীরওয়ালা ওর দিকে তাকিয়ে নিমেষহারা। মেয়েটা বলল—কিছু তো খাই নাই আজ—এক গেলাস জল দিবে তো?

মুগ্ধ দোকানী একটা পাতার ঠোঙায় দিল কয়েকটা সন্দেশ, খানিকটা রাবড়ী, এক গ্লাস জল। অত ও খেতে পারবে না—বলল,—মা আর দিদিকে দিয়ে আসি গা।

—নাঃ, তুই আর যেতে পাবি না। খা তুই, আমি দিয়ে আসছি!

দোকানিটার সম্মুখে এমন বারনারীর মত বসে থাকতে ওর লজ্জা করছিল খুবই—কারণ ও সত্যি তো আর নির্লজ্জা নাগরিকা নয়—সরমকুণ্ঠিতা পল্লীবালা ও।

গ্রহের ফেরে আজ নাগরিকা সেজেছে।—কিন্তু খিদে পেয়েছে ভয়ঙ্কর, দোকানী চলে যেতেই ও একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিল। শুকনো গলা দিয়ে ঐ ছানার ছাতু গলছে না—আটকে যাচ্ছে। এক ঢোক জল খেতে যাবে—দোকানী ফিরে এল—দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে তাকালো মেয়েটার দিকে। নির্লজ্জ, নিঃসঙ্কোচ চাওনি—ক্রীত দ্রব্যের উপর ক্রেতার দরদী পরখ! খাদ্যের উপর খাদকের লোলুপ দৃষ্টি! মেয়েটা হাঁটুদুটো, জড় করে কুঁকড়ে গেল। এ-আর-পির ভয়ে বিজলী বাতি ঘোমটা ঢাকা থাকে—দোকানী বাতির ঘোমটাটি টেনে খুলে দিল—একশ' বাতিব আলো ঠিকরে পড়ছে মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গে, কোথাও এতটুকু লজ্জা লুকোবার জায়গা নাই—সবনিগুণ্ঠ নিরাবরণ—নির্ম্মম নির্লজ্জতা!

—আলোটা নিবিয়ে দাও কেনে গো?—মেয়েটা ভয়ে ভয়ে বলল।

—না; দেখবো না তোকে?—বা রে!—খা, খেয়ে নে চট্ করে।

আর কথা চলে না। ক্রীত দ্রব্যকে ক্রেতা দেখতে চায়। দ্রব্যের কিছু বলবার অধিকার নাই। মেয়েটা কিন্তু খেতে পারছে না। পিছন

ফিরে বসতে গেল। দোকানী ওকে ঘুরিয়ে একেবারে সটান দাঁড় করিয়ে দিল—ইঃ, লজ্জাবতী আমার! দাঁড়া ভাল হয়ে!

একেবারে আলোর সম্মুখে—স্পষ্ট দুটো ক্ষুধিত চোখের বিদ্ধদৃষ্টির বক্তাক্ততায় ওর অন্তর আলুণ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু ক্রেতার তা দেখলে চলে না। মেয়েটা কিন্তু খেতে পারছে না? মুখ থেকে সন্দেশের ছানাটা পড়ে যাবে ওর! পেটে ক্ষিদে হাতে খাবার—কিন্তু সামনে ওকেই খাবার জন্য হিংস্র দানব দাঁড়িয়ে! আশ্চর্য্য কৌতুক বিধাতার! ওর রূপের শিখা দুর্ব্বল হয়ে গেছে—কাঁপছে কদম-কেশরের মত—ভীরু দীপশিখার মত।—ক্ষীর-ননীপুষ্ট দোকানীটা ওকে সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল—খাচ্ছিস না যে?

—হুঁ—ওর নগ্ন কণ্ঠস্বর নির্লজ্জ হতে পারছে না।

বাইরে কারা যাচ্ছে—পাষের জুতোর ভারী আওয়াজ। পুলিস না কি! দোকানী আলোটা চট্ করে নিবিয়ে দিয়ে দরজার ফাঁকে উঁকি দিল। মেয়েটা এর মধ্যে সন্দেশটা খেয়ে জলের গ্লাসটা হাতড়াচ্ছে। পুলিশ নয়—দুটি ছোক্‌রা—হযত থিয়েটার ফেরৎ!

—"তরুর একটা নাচের দাম লাখ টাকা—চমৎকার মাইরী!"

—"হ্যাঁ—আর গলাটাও কী মিষ্টি—কাদের মেয়ে রে?—ভদ্দলোকের মেয়ে?

—"হ্যাঁ রে—বি, এ পড়ে? আজকাল তো ভদ্দলোকেরাই চ্যারিটি শো করে!"

—"ওঃ, আচ্ছা—ওর মা-বাপ এ্যালাও করে তো!"

—"নিশ্চয়! বাপ হয়তো সঙ্গে করে নিয়েই যায়—করবে আর কি ভাই! যা বাজার! চালের মণ ৪০৲ টাকা। খেতে তো হবে! কাজেই···বুঝলি?"

—"হুঁ....."

ওরা চলে গেল নেবুতলার দিকে। দোকানী আলোটা জ্বালিয়ে দেখলো, মেয়েটা জলের গ্লাস খুঁজে না পেয়ে ক্ষীরের কড়াটায় হাত ডুবিয়ে ফেলেছে।

—কি করলি হারামজাদী—দিলি নষ্ট করে ক্ষীরটা? দশটা টাকার জিনিষ!

ভয়ে মেয়েটা কেঁপে উঠলো। দশ টাকা! সর্ব্বনাশ করেছে যে সে। যদি দোকানী চেয়ে বসে দশ টাকা! কাঁপতে কাঁপতে বললো, —দেখতে পাই নাই!

—দেখতে পাও নি! এখন কে দেবে এর দাম? রোজ একটাকা হিসেবে দশ দিনে শোধ করতে হবে—বুঝলি?

হুঁ—মেয়েটা ওদিকে গিয়ে জলের গেলাসটার দিকে হাত বাড়ালো।

—তুই খা—খেয়ে হাতের ক্ষীরটা ধো। আমি দুটো পান নিয়ে আসি মোড় থেকে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মেয়েটা আরো একটা সন্দেশ খেল—জল খেল। তার পর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল, কোথাও একটু শোবার মত যায়গা যদি পায়।

চৌকী রয়েছে একটা। কিন্তু দোকানী যদি আবার বকাবকি করে ওখানে শুলে—তাই বসেই রইল। দোকানী ফিরছে না। বাইরে সে তালা দিয়ে গেছে; মেয়েটার বেরিয়ে পালিয়ে যাবার উপায় নাই। বসেই রইল; কিন্তু ঘুম আসছে। ঐ খানেই শুয়ে পড়ল শেষটায় মেঝেতে।

দোকানীটা ফিরছে। সদ্যজাত শিশুটাকে একটা গ্যাসপোস্টের কাছে সাজিয়ে রেখে বুড়ি কান্না জুড়েছে—দে বাবা দুটো পয়সা; দা-ও বাবা একটুকু ফ্যান—মেয়েটা মরে গেল বাবা গো··· !

ঐ শিশুটা ওকে ভিক্ষা পেতে সাহায্য করবে এবার। ছেলেটাকে দেখিয়ে বুড়ি পথচারীদের দয়া আকর্ষণ করবে। হাসলো দোকানীটা। তাকিয়ে দেখলো—ওর মা খানিকটা দূরে সেই কদমগাছটার তলায় মরার মত শুয়ে আছে। গলিতে গলিতে ভিক্ষুকদের চিৎকার উঠছে—'দাও মা একবাটি ফ্যান—দাও বাবা দুটি পয়সা!'

তামার এক-পয়সা পাওয়া যায় না আজকাল। যারা কালেভদ্রে একটা পয়সা দান করতো তারা ডবল পয়সা দিতে চায় না। আধ-পয়সাও নাই বাজারে। দিতে হলে দুটো পয়সাই দিতে হয়—অতএব কিছু না দেওয়াই ভাল! দাতারা হাত গুটিয়েছে।

রাত অনেকখানা—দোকানী ফিরে এসে দেখলো, মেয়েটা ঘুমিয়ে গেছে। দূরে ঐ বৈঠকখানার মোড়ে গিয়েছিল সে চরস-ভরা বিড়ি কিনতে। মৌজ ভাল হয়। দেবী হয়ে গেছে একটু তাই। ডাক দিল —"এই ছুঁড়ি, ওই। ঘুমুলি যে বড়?"—সাড়া নাই। ঘুমকাতর দেহখানা গামছাঢাকা পড়ে আছে। বেড়ালের ইঁদুর ধরার মতন ওর একখানা হাত ধরে দোকানী সটান বসিয়ে দিল ওকে ঝাঁকি দিয়ে, —"ওঠ হারামজাদী—ঘুমুবার লেগে তোকে ডাকা হয়েছে, না!"

মেয়েটার বড় বড় চোখ দুটো খুলেই আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাগে দোকানী ওর গালের মাংসটা ধরে মুচড়ে দিল—'উ-উঃ বাবাগো! ছাড়ো-ছাড়ো!'

ওর দেহকে ও বিক্রী করে দিয়েছে আজকার মতন—কিম্বা বন্ধক দিয়েছে।

শাঁখ বাজলো কোথায়? কে আবার জন্মালো? ঐ ভিখারিণী মেয়েটা জন্মেছে খানিক আগে—এখন আবার কোন্ বড়লোকের বাড়ীতে এল কোন্ নবজাতক! তাকে শঙ্খধ্বনি দিয়ে আবাহন জানানো

হচ্ছে। মরণের বীথিকায় জীবনের সেই চিরন্তন জয়গান! বন্যা-মহামারী, দুর্ভিক্ষ-রাষ্ট্রবিপ্লব, ভূমিকম্প-উল্কাপাত সব ছাপিয়ে জীবনের জয়গান বাজে—তাই জীবন অবিনশ্বর! আজকার রাতের অন্ধকার গর্ভে আগামী প্রভাতের ভ্রূণ রয়েছে। শ্রাবণরাত্রির এই দশ ঘণ্টার দীর্ঘ সাধনা আগামী কালের দৃপ্ত দিবার জন্মদানের জন্যই;—কিন্তু কে এসব অনুভব করবে? কে, কে!

কোথায় সেই কবি—সেই সাহিত্য-শিল্পী, যিনি আজ রাত্রের অন্ধকারকে রূপ দিয়ে যাবেন ভাষায়—লিখে রেখে যাবেন আগুনের অক্ষরে। এই মৃত্যু-ইতিহাসের এই ক্ষুধালেখ। শুনিয়ে যাবেন আগামী-কালের আগমনী-সঙ্গীত—কোথায়, কোথায় তিনি, জীবনের জয়গানে যাঁর কাব্য জাগ্রত থাকবে—জাগ্রত করবে মহাভারতকে—মহামানবকে —মহান সত্য-সূর্য্যকে!

দুপাশের ফুটপাতে মরণের বীথিকা সাজানো। জীবনের মূল্য আজ লঙ্গরখানার দু'আনা পয়সায় এসে নেমেছে—না, তার থেকেও নীচে—চেয়ে-পাওয়া একবাটি ফেনের ফেনায়। কিন্তু আশ্চর্য্য! ঐ পার্কেই আজ বিকেলে একটা বিরাট জনসভা হয়ে গেছে সাহঙ্কারে বক্তারা বলেছে—"ওদের বাঁচাতে হবে—ওদের যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে—আমরা চল্লিশ কোটি ভারতবাসী আছি—ভয় নাই—ভয় নাই"—ইত্যাদি। বিস্তর চীৎকার আর হাততালি পড়েছিল তখন। খদ্দরের চাদর উড়িয়ে চোখের চশমা মুছে মাইক্রোফোনের সুউচ্চ কণ্ঠে ওরা শুনিয়ে গেছে অভয়বাণী—জীবনের ঐ দেবতারা, ঐ জননায়কেরা, ঐ জন্ম-অভিজাতরা! ওদের জয় হোক! ওরা চেষ্টা করছে। ওরা দুর্গত-জনের দুঃখ নিবারণের জন্য "চ্যারিটি শো" করছে, চাঁদা আদায় করছে—চাল-ডাল-নটেশাক-বাজরা ঘেঁটে ওল-কচু-কলা দিয়ে ভিটামিন-খাদ্য তৈরী করে দিয়েছে—যা খেলে তক্ষুণি বমি হয়ে যাবে, আর না

হয়তো পেটে চড়া পড়ে যাবে—তারপর ভেদবমি হবে; তারপর যা হবার—হবে মরণ! না-না, ওরা বাঁচাচ্ছেও! ওদের হিতাকাঙ্ক্ষাটাকে বিদ্রূপ করতে নাই—করা পাপ—কিন্তু, ওরা বুঝলো না কেন যে ওদেরই মধ্যে কারো কারো লোভ—ওদেরই লোলুপতা এই বিরাট দেশটার খাদ্য সব গোলাজাত করে রেখে দিয়েছে। ওরাই ষাট টাকা মণ চাল বিক্রী করছে আর সেই বিপুল লভ্যাংশের যৎকিঞ্চিৎ খরচ করছে চাঁদা দিয়ে, লঙ্গরখানা খুলে! শতকরা আশী জনের মৃত্যু ঘটিয়ে ওরা পনের জনকে আধমরা করছে—পাঁচজনকে বাঁচিয়ে তুলে বলছে—ওরা মহাপুণ্যের কাজ করল। ওরা সেই চালের গোলাগুলো ভেঙে দিতে পারে না—খুলে দিতে পারে না? না, পারে না; ওরাই যে সব খাবে! —ঐ বড় বড় পেটওয়ালা মোটরচাপা বাবুরা তা নইলে খাবে কি? ওদের বড় পেট অ-ভর—গরীবের ক্ষুদকুঁড়োতেও ভাগ বসায়। এবার আর ভাগ নয়—সবটাই নিয়েছে! নিক্—বেঁচে থাক ওদেরও এবার শ্রমিকের কাজ করতে হবে—নইলে করবে কে আর? যাদের শ্রমে এতকাল পায়ের উপর পা দিয়ে ওরা সরু বালাম চাল আর সোনামুগের ডাল খেয়ে এসেছে, তারা আজ শুকিয়ে মরলো। ক্ষেতে তারা রেখে এসেছে সোনার ফসল—কচি ধান—কাঁচা মুগ,—কচি কচি লাউকুমড়ো—আলু-বেগুন-পটল! ওরা গিয়ে তুলবে আর খাবে। তুলতে পারবে তো? আহা! ওদের অভ্যাস নাই। গাছ ছিঁড়ে না যায়!

বৃষ্টি এল—শাওন মেঘের একটানা ঝমঝম্। যে যেখানে পারে আশ্রয় নিয়েছে; আর নাই আশ্রয়। কাছের ঐ বাফেলওয়ালটার মধ্যে লোক ঠাসা। কোথায় যাবে এই সন্ধ্যপ্রসূতি? বুড়ি উঠলো একটু আচ্ছাদনের জন্য। কচি মেয়েটা কঁকিয়ে উঠছে! ওর মাকে একটা কিছু উপায় করতেই হবে! বুড়ি অনেকটা দূরে চলে গেছে! নতুন-মা হামা

দিয়ে পেটের ছেঁড়া কাপড়টুকু খুলছে। টুংটুংটুং—রিকসা গাড়ীর আওয়াজ। মলিন গ্যাসের আলোতে দেখা গেল, সুবেশা একটা মেয়েকে কোলে জড়িয়ে একটা ফচ্‌কে ছোঁড়া যাচ্ছে রিকসাতে। গায়ে বর্ষাতি—মেয়েটায় গায়ে বস্ত্রের অনাবশ্যক প্রচুর্য্য। চলে গেল রিকসা! নতুন-মা ন্যাংটা হয়ে পরণের কাপড়টা খুলে খুকীকে ঢাকা দিল—তারপর নিজে হাঁটু গেড়ে ওর উপর ঢাকা হয়ে রইল! ওর মেয়ে; নিজে মরে গিয়েও মেয়েটাকে ও বাঁচাবে। মহাকাল প্রহরা দিচ্ছে ওদের। ওরা এখনো বাঁচতে চায় বাঁচাতে চায়, আত্মজদের—আপনার জনদের! বর্ষাধারায় ওদের জীবনের জয়গান চলছে! সদ্যজাত শিশুকে আচ্ছাদিত করে উলঙ্গ নূতন মা জাগে! কড়কড় করে বজ্র-বিদ্যুৎ ওদের কটাক্ষে দেখে চীৎকার করে উঠলো—"জয় হোক—তোদের অপরাজেয় জীবনের জয় হোক!"

*　　*　　*

উঃ—মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে নিল রাজু। কী ভয়ঙ্কর! রাজু যেন সইতে পারছে না।

—উঠলি রাজু! বাপ্‌রে বাপ্! চল্ উঠ—বিলা গেল যে রে!—দিদি ডাক দিল।

—হুঁ—উঠি! কি চুমৎকার বই যে নিখেছে দিদিঠাকরোণ—উঃ! হু! নিখা যদি পড়তে হয় তো এই নিখা! কিন্তু শ্যাষ হোল না দিদি—!

—ঐ তাল বাগড়োটো কেটে দে দিকিনি। জল গরম করি—চা খাব! তা-বই পড়িস বসে-বসে।

রাজু উঠলো। বঁটি দিয়ে শুকনো একটা তাল-বাগড়ো কেটে খণ্ড খণ্ড করে দিল। সেগুলো উনুনের কাছে ফেলে দিয়ে রাজু ভাবছে, বইটা শেষ পর্য্যন্ত এখনি পড়বে কিনা। কিন্তু পড়ার আর ফুরসৎ হোল না। দিদি বলল—ময়না আসে কখন রে ?

—রাত হয়। কুনো দিন দুফর রাত হয়, কুনো দিন বা আরো বেশি।

—ইকা আসে নাকি ?

—না! ঐ বারুণী—উও যায় যে!

—ও—দিদি উনুনে জ্বাল ঠেলে দিল। সন্ধ্যার দেরী নাই। বৌটা উঠে কাপড় কাচতে যাবার উপক্রম করছে। গামছাটা টেনে নিয়ে উঠানে নামলো। দিদি বলল—গরম চা একটুস খেয়েই যাও···।

—এসে খাব—বৌ চলে গেল পুকুরে। দিদি চা তৈরি করছে। রাজু কিন্তু আবার ময়নার কথাই ভাবছে। ঐ ক্ষীরের দোকানী আর সেই ভিখারী মেয়েটার কথার সঙ্গে ময়নার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে ওর মগজে। ময়নাই যেন ঐ ক্ষীরের দোকানীর ঘরে। হ্যাঁ, ময়নাই তো। এমন কত ময়না—কত সহস্র ময়না—কত লক্ষ লক্ষ ময়না আর বারুণী তলিয়ে গেল—মিলিয়ে গেল! রাজুর বোন ময়নাই শুধু নয়—আরো অনেক লোকের বোন, বৌ, মেয়ে। যাক্! রাজু যেন সমুদ্রে কূল পাচ্ছে! ওর উষ্ণ মস্তিষ্কটা ঠাণ্ডা হাওয়া পাচ্ছে একটু! ময়নাই শুধু নয়—আরো অনেকেই তাহলে গেছে। গানটা আবার মনে পড়ছে। শুনাবে তারণ ঠাকুরকে—শুনাবে—"গাঁয়ের মেয়ে খাবার চেয়ে বিচলি সতীত্ব-ধনে—শমন-সদনে"—

ওর শ্রদ্ধা জাগছে নিজের উপর। ও মা লিখেছে সেটা সত্যি—নিষ্করুণ সত্যি। আর তারণ ঠাকুর বলে—'সত্যই ধর্ম—সত্যের

উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। লেখককে সবার আগে সত্যের পূজারী হতে হবে। সাহিত্য সত্য হলে তবেই আবার সবাই হবে সত্যশীল, সত্যব্রত, তবেই ফিরে আসবে সত্যযুগ!'

তারণ ঠাকুরের ভাষাটা রাজু ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারে না,—কিন্তু ভাবটি ঠিক বুঝতে পারে—নিজেও চেষ্টা করে ঐ রকম ভাষায় বলবার—কিন্তু পেরে ওঠে না। তারণ ঠাকুরের মুখের ভাষা রাজুর বেদবাক্য। সেই তারণ ঠাকুর লিখেছে—"ভিখিরী নয়, গাঁয়ের একটা মেয়ে সহরে এসে জাত দিল—কুল-মান সবই দিল, কি জন্য? না, এক মুঠো খাবারের লোভে।"

সিপ্ সিপ্ করে চা খেতে খেতে রাজু ভাবছে, ভাবছে—ময়নাও জাত দিল; দিক্—দিলেই আর করছে কি বাজু! না খেয়ে তো মারাই যেত এ্যাদ্দিনে। ময়না তবু বাঁচিয়ে রেখেছে। কত মেয়েই তো জাত দিচ্ছে এই আকালের বাজারে। ময়নাও দিল। দিকগে। রাজুর মনটা সহনশীল হয়ে আসছে। কত ভদ্রলোকের মেয়ে—কত বড় বড় লোকের ঝি-বৌ—না, নাঃ বড়লোকেরা কেন যাবে ওসব করতে! চাল যাদের নাই—খাবার যারা যোগাড় করতে পারে না—তারাই যায়। যেতে বাধ্য হয়!

—চল্লুম দিদি-ঠাকরোণ—রাজু বইটা বগলে নিয়ে উঠলো।

—চল্লি! যা—কাল একবার আসিস—দিদি উত্তর দিয়ে দেখলো, রাজু বইখানা নিয়ে যাচ্ছে। কিছুই বলল না। বই ও নেয় প্রায়ই, তাছাড়া আজ যা উপকার করেছে রাজু! দিদি সম্মতি দিল। বাইরে বেরিয়ে রাজু ভাবল—যাবে কোন দিকে। বাড়ী ফিরে যেতে মন চায় না। একটু পচাই মদ গিলে আসবে নাকি? না, তার থেকে শঙ্করের ঘর গেলে টুকচেক তাড়ি পাওয়া যাবে। সেই ভাল!

শঙ্করের ঘরটাও কাছেই। রাজু চললো সেই দিকে। শঙ্কর মস্ত

একটা গুণী লোক বলে খ্যাত। ওর বাড়ীতে মা-মনসার পূজো তো আছেই ; তাছাড়া ও আবার দুটো ভূত পোষে। শ্যাম রায় আর কালো রায় সেই ভূত দুটোর নাম। গাঁয়ের মুচি-ডোম-বাউরী-বাগদীদের মধ্যে যার যত রকম অসুখ-বিসুখ হয়—সবাই ঐ শঙ্করের বাড়ীতেই এসে ধর্ণা দেয়। শঙ্কর মন্তর পড়ে—ঝাড়ফুক্ করে—চিম্‌টে বাগিয়ে নানান্ রকম অঙ্গভঙ্গী করে' অসুখ ভাল করে দেয়। ভালো অবশ্য সবাই হয় না—এমন কি, ভালো যারা হয় তারা আপনা আপনিই হয়—তবু শঙ্করের উপর অগাধ ওদের বিশ্বাস। শঙ্করের ঘরে তাই সকাল-সন্ধ্যা ভিড় লেগেই আছে। দুপুর রাতে শঙ্কর নাকি ঠাকুর পুকুরের পাড়ে পবন রায়ের বেলতলায় যায়। সেইখানেই থাকে কালো রায় আর শ্যাম রায়—তাদের পূজো করে' গভীর রাত্রে ফিরে আসে শঙ্কর। সে-সময় ওর মাথায় নাকি রণ চাপে—মানে, ওর সামনে কেউ পড়লে তার নাকি মৃত্যু অবধারিত। ঘরে ওর বৌ জবা ততক্ষণ বসে বসে ঝিমোয়। কিন্তু ঘুমুতে পারে না। শঙ্করকে ওর বড্ড ভয়। শঙ্কর না জানি কি মন্ত্রের জোরে ওকে কোনো দিন ভেড়াই-বা করে দেয়। শঙ্করের ভয়ে বৌটা ইচ্ছে সত্ত্বেও কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না। কারণ, ওর বিশ্বাস—শঙ্কর মন্ত্রের জোরে সব কিছুই জানতে পারবে। সেই শঙ্কর রাজুর বন্ধু। আজকের বন্ধু নয়—বহু দিনের। ছেলেবেলায় জীবন যুগীর পাঠশালার বন্ধু, বড়-বাগানের গরুর পালের বাথানে, পার্ব্বতী পুকুরে চুরি করে মাছ ধরার সময়, আর লুকিয়ে পচাই মদ খাবার জন্য ক্ষেতের ধান চুরি করবার দিনের সাঙাৎ ওর শঙ্কর। তার বাড়ী রাজু যখন-তখন যেতে পারে।

শঙ্কর মনসা-ঘরে বসে তামাক খাচ্ছিল। রাজুকে দেখে বলল, —এসো সাঙাৎ।—রাজু বিনা বাক্যব্যয়ে বসল। কলকেটা তুলে নিয়ে

টানতে লাগল। দুটো মেয়ে, একটা আধ-বুড়ি আর একটা কমবয়সী, শঙ্করকে বলছে—তুমি যদি ভাল না কববে তাহলে যাব কুথাকে ?

—তার আমি কি জানি! দ্যাখ্ দেখিনি বাবু। আমি উসব কত্তে পারবো না বলেছি তো!

—কেনে ?

—এনেক খবচা! তিনটি গণ্ডা টাকাব কমতি লয়। পাব তো লিয়ে এসো গা—যাও।

—অত কুথা পাব শঙ্কর-মামা? কম বয়সী মেয়েটা বলল—এই সাত টাকা লাও—আর নাই!

—হবেক না—হবেক না। শ্যাম বায, কালো রায আমাব বাবা লয়। বুঝলি, পূজো না করলে ঘাড আমাব মটকে দিবেক—জানিস্। একটো পাঁঠাব দাম পাঁচ-ছ টাকা। হয় কি কবে।

—আর তিন টাকা দিব। লাও ধবো। তাই কানেব ফুল বিচতে হোল!

—আনো গা যাও। লিযে এস আবো তিন টাকা—তা বই দেখছি, কদ্দুর কি হয়!

রাজু বিশেষ কিছুই বুঝলো না। সাতটা টাকা শঙ্কবেব পায়ের কাছে বেখে ওরা চলে গেল। যাবাব সময আবাব বলে গেল—আখুনি আস্ছি। বুঝলে শঙ্কবমামা ?

—কি বেটে হে সাঙাৎ? কিসেব লেগে এত ধড়-পাকড কচ্ছে ?

—আর বল কেনে! যত সব অঘটন ঘটছে আজকাল। ঈশ্নেকে ভূতে পেয়েছে, শাঁকচিরুনীতে। এতকাল তো মেয়ে লুককেই ভূতে পেত বাবা—আজকাল আবার বিটাছেলেকেও ভূত লাগল!

—কুথা হে? কুন ভূত ?

—ঐ—যে। নদীর উথেনে শিমুল গাছের কাছে, শরমানার ধারে—ঐখানে বাহ্যে করতে গেইছিল। ধরেছে অমনি! তুমি শালা ভূতের আস্তানায় যেতে গেলে কেন! দেখ আখুন ঠেলা!

—কি করছে কি?

—করবেক কি আবার? যা করে! লুক চিনতে পারছে না। যাকে যা খুসী গালমুন্দ দিচ্ছে—এই সব!

—ছাড়াতে পারবে তো?

…হুঁঃ কি তুমি বলছো সাঙাৎ! আমার কাছে শাঁকচিরুণী! হুঁঃ, কত শালার বাঘাভূত ভাগাইয়ে দিলুম।

তাড়ির ভাঁড়টা উঠানেই রয়েছে—ভর্ত্তি। এখনো শঙ্করের সেবা হয় নাই। রাজু আড় চোখে একবার তাকালো সেই দিকে, বলল, —আজই লাগবে নাকি তাহলে?

—হুঁ! কি আর করি! 'দাও মামা—ছাড়ায়ে দাও মামা'—দেখছো না—কি রকম কাঁদছে ছুঁড়ি। ওর চোদ্দপুরুষের মামা যেন আমি! হুঁ! বেকলে পড়লে সুবাই মামা বলে! টাকা না আনলে হাত লাগাচ্ছি না বাবা—সি যাই বল—মামাই বল, আর মাসীই বল! এসো, দুটো প্যাজবড়া আছে—তাই দিয়েই হোক।

দুই বন্ধু কয়েক মিনিটেই তাড়িটুকু শেষ করে দিল। রাজুই খেল বেশি। ইতিমধ্যে ঈশানের বৌ আর মা ফিরে এসে আরো তিনটি টাকা দিল শঙ্করকে।

—আচ্ছা, যা—হবেক, হবেক! আজ রাত্তিতেই দিচ্ছি চিট্ করে দেখি কেমন শাঁকচিরুণী।—শঙ্কর বলল।

মনসা-ঘরে প্রণাম করে শঙ্করকেও প্রণাম করলো ওরা। তারপর সজল চোখে চলে গেল। শঙ্কর বলল—আমাকে তো ইবারে যেতে হবেক সাঙাৎ। পবন রায়ের তলায় যাব!

—যাও—রাজু উঠলো। ঘরেই ফিরে যাবে সে এবার। ঈশানকে ভূতে পেয়েছে! বড্ড মন খারাপ হয়ে গেল রাজুর। ঈশান ওর কেউ নয়—তবে ছোঁড়াটা ভাল। বেশ গলা ওর। রাজুর অনেক গান একতারায় সে গাইতে পারে। আর অনেক গ্রাম্য ছড়া ওর মুখস্থ আছে। যদি না সারে ঈশান তো দুঃখের কথা। একবার দেখে গেলে হয়! ঈশানের বাড়ীর দিকেই চলল রাজু। বেশি দূর নয়। গিয়ে দেখল, ঘরে উঠোনো একটা গরু বাঁধবার খুঁটো—তাতে গরুর যে দড়িটা রয়েছে, সেইটে নিজের গলায় বেঁধে ঈশান চেঁচাচ্ছে—খড় দিলি না হারামজাদি—আমিও দুধ দিব না! দুধ দিব না! খোল দে, জল দে—কাঁচা কাঁচা ঘাস দে—দে শালিবা মাড দে—দিবিনা টে?

ও বাবা, এতো শাঁকচিরুণী নয়, এযে গোভূত! রাজুকে দেখেই ঈশান বলল—কে! কে রে হারামখোর! দেখে যা—দেখ, আমার দুধের বাঁট দেখ। দিব না—দুধ দিব না। ঐ ভাতারখাকীকে দিব না দুধ। আমাকে খেতে দেয় না! খড় দেয় না, খোল দেয় না, ভুষি দেয় না!

ঈশানকে তাহলে গোভূতে পেয়েছে! রাজু আর এগুলো না। রুগ্ন শীর্ণ ঈশান—দুইদিনের মধ্যেই মরবে নিশ্চয়। গাই-গরুটা দিন কয়েক আগে বিক্রী হয়ে গেছে। তাকে বেচে ফিরে আসার সময়ই এই কাণ্ড। ওর মা দাওয়াতে বসে কাঁদছে। আর বৌটা গেছে জল আনতে কাছের ঐ ডোবাতে। রাজু বলল—সাঙাৎ ভাল করে দিবে—ভাবছো কেনে তুমি! তেবে ইনি গোভূত লয় তো? রাম রাম!

—খবরদার—খবরদার! তু শালা, কুন শালা ওঝা র‍্যা শালা? খবরদার···ঈশান চেঁচিয়ে উঠলো। ঠিক গরুর শিং নাড়ার মতন ভঙ্গী করে তেড়ে এল রাজুকে। রাজুরও তখন কিঞ্চিৎ নেশা জমেছে। বলল—চুপ কর ঈশ্‌নে। পাঁচনের বাড়ীতে তুমার গোভূতের গুষ্টির ছাদ্ধ করবো—জানিস্!

ঈশান নিজেকে গরুর মতই বেঁধে রেখেছে খুঁটোয়। কাজেই গরুর দড়ি-ছেঁড়ার মত ভঙ্গিতে লাফাতে লাগল, আর গালাগালি দিতে লাগল। ওর মা বলল—কি করবো বাবা রাজু? ভাল কি আর হবেক বাছা?

—হুঁ—হুঁ, ভাল হবে না তো কি আবার!

ঈশানের বৌ ফিরে এল। গাঁয়েরই মেয়ে। রাজু ভালই চেনে তাকে—বলল—তু একটুস যত্ন কর গুলাপী, বুঝলি? যা, দড়া খুলে ঘরে লিয়ে যা।

—আমাকে তো দুচোখে দেখতেই লারছে! মারতে আসছে, দেখ-না রাজু দাদা!

সত্যি! গোলাপীকে দেখে ঈশান আরো চেঁচাতে লাগলো। গালাগালিগুলো অশ্রাব্য একেবারে। গোলাপীর চরিত্রের উপর কদর্য্য কলঙ্ক বর্ষিত হচ্ছে। ওর মা রাজুকে বললো—ই ব্যামো কি আর ভাল হয় রাজু? হে মা কালী, কি কল্লি মা!

বুড়ী ভীষণ চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিল অকস্মাৎ। গোলাপী জলের কলসী নিয়ে—মর মুখপুড়া, মর—বলে কুঁড়েতে গিয়ে ঢুকলো। রাজু আর কিছু না বলে চলেই এল বাইরে। তখনো গোলাপীর চীৎকার শোনা যাচ্ছে—কদর্য্য অশ্লীল কথা—"ভাত দিবার মুরোদ নাই ভাতার হবার আশ্।"

রাজু আর শুনতে চাইল না। তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে আসছে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে—পথ অন্ধকার। হঠাৎ ওর গা-লাগবার আশঙ্কায় কে একটা মেয়ে পাশকেটে দাঁড়াল। নাটকরঞ্জার জঙ্গল ওখানটায়। কাঁটাঝোপ—বাসকলতার গাছ—তারই কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো মেয়েটা—কে? কে যায়?

—আমি—বলে উত্তর দিল যে, রাজু তাকে চেনে। বোরেগীদের

কুন্তিবালা। যাচ্ছে নিশ্চয় গুপী-রক্ষিতের বাড়ী। রক্ষিতের রক্ষিতা ও,—জানে গাঁয়ের সবাই। বক্ষিত জাতে তাঁতি। এই সুতোর আক্রা বাজারেও আধ-হাত চওড়া কস্তাপাড় কাপড় কুন্তিকে ও পরিয়ে রেখেছে। গুপীর নিজের হাতে বোনা কাপড়। আঁচলটা প্রায় তার দুহাত। অন্ধকার, তাই রাজু দেখতে পেল না—কিন্তু ওকে দেখেছে গাঁয়ের সবাই। রাজু বলল—কুন্তি দিদি নাকি? কুথা যাবে গো?

—যাব—চল—রাস্তা দে। কুন্তি পাশ কেটে চলে যেতে চাইছে। রাজু সুড়ি পথ আগলে বল—ক'টাকা করে দেয়? নাকি চাল দেয়?

—কি দরকার তুর সি খবরে! ছাড়—পথ ছাড রাজু। দেরী হয়ে গেল!

—ও বাবা গো! চল্লি তো আসনাই করতে, তার আবার দেরী! চল, আমার কাছে চল্—দু'সের চাল দিব—অড়হর ডাল—চিনিও দিব—চল দেখিনি!

অন্ধকারে কুন্তির আবছা মূর্তিটা রাজুর উষ্ণ মস্তিষ্কে কেমন যেন বিভ্রমের সৃষ্টি করছে। সম্মুখে তার লাবণ্যবতী তরুণী, রাজুর আকাঙ্ক্ষা তার দিকে অকস্মাৎ কেমন মত্ত আবেগে প্রসারিত হয়ে যেতে চায়। রাজু হাত বাড়িয়ে দিল কুন্তির দিকে। ত্বরিতে আরো খানিকটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে কুন্তি বলিল—আস্পর্দ্ধা! রেজো!

—আরে থাম্ বিটি, থাম্। তুখে আর অজানা নাই কারু! ধুমকাছিস্ কেনে! আয়!

রাজু সত্যিই ধরে ফেলল কুন্তিতে দুহাত দিয়ে। লঘু নারী-দেহ, অতি ক্ষুদ্র রাজুর সবল বাহুর কাছে! কুন্তি চেঁচিয়ে উঠতে পারে। আর চেঁচালেই কাছের পোদ্দার বাড়ী থেকে লোক বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু আশ্চর্য্য! কুন্তি চেঁচাল না! পড়ে যাবার ভয়েই রাজুর গলাটা যেন ধরেছে, ঠিক এমনি ভঙ্গিতে আঁকড়ে রইল। রাজু হনহন করে খানিকটা এসে ওকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বলল—আয়, চলে আয়!

সত্যি আসছে। সত্যিই আসছে কুন্তি! বৈষ্ণব ঘরের সোমত্ত, সুন্দর মেয়ে—আসছে! রাজুর অবাক লাগল। কিন্তু ওর হাত ধরে এগিয়েই আনছে রাজু। বেশি দূর নয়—ঘরের কাছে এসে পড়েছে। পাড়ার যে কটা মানুষ এখনো বেঁচে আছে তাদের কারো কোন সাড়া পাওয়া যায় না। রাজু দরজা খুললো। কুন্তি ঢুকেই বলল—কৈ চাল?

—আছে। কিন্তু আগুতেই চাল দিব নাকি তুখে! বাঃ! বেশ তো মাইরী!

—না, আগুতে কেনে! দিবি তো? চাল কুথা পেলি রাজু? ময়না এনেছে! লয়? আমাদের আজ চার-পাঁচ দিন ভাত হয় নাই! ছুটো ভাইটো ভাত-ভাত করে আধ মরা হয়ে গেল! চল রাজু—যা করবি কর তা' পরে দে চাট্টি চাল! ময়না এসে পড়বেক না তো? ময়না এত চাল কুথা পায় রাজু? আমাকে সঙ্গে লিয়ে যেতে বলিস কেন্নে?

রাজু লণ্ঠন জ্বালছিল! জ্বালা হয়ে গেছে। সেই আলোতে দেখলো কুন্তির মুখ। অনাহারে শীর্ণ, তবু সুন্দর। হ্যাঁ—ময়নার থেকে সুন্দর। চাট্টি চালের জন্য এসেছে রাজুর কাছে আত্মবিক্রয় করতে। শুধু মুঠো কয়েক চাল, আর কিছু নয়!

—ময়না আবার এসে পড়তে পারে রাজু!

হ্যাঁ, ময়না এসে পড়তে পারে। না, ময়না এখন আসবে না। অনেক রাত হয় তার। রাত হয় এই চাল সংগ্রহ করবার জন্যই। ওর বিক্রীত দেহের মূল্য সেই চাল কয়সের!

—তুই কুথাকে গেইছিলি রাজু উদিকে?—কুন্তি প্রশ্ন করলো। রাজুর ধ্যান ভা লো যেন, বলল—ঈশানকে ভূতে পেয়েছে, তাই দেখতে গেইছিলাম!

—ভূতে পেয়েছে—হাঃ হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ হিঃ—কুন্তি ভৌতিক হাসি হেসে উঠলো। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, বিষঢালা হাসি—বিশ্বেস কল্লি তুই বাজু? ভূতে পেয়েছে, বিশ্বেস কল্লি?—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! আবাব হাসি।

—হুঁ—কেনে?—নির্ব্বোধেব মত তাকালো বাজু কুন্তিব মুখেব দিকে। বহস্যময়ী কুন্তি হাসছে। বলল—ভূতে পেয়েছে! গোভূত লয়, শাঁকচিরুণী লয়, মোডলভূত! নাটু মোডল ছিল গোলাপীব ঘবে—বুঝলি—সেব পাঁচেক চাল দিয়ে ঢুকেছিল। গাইগরুটা বেচে যখন ঈশান এল ঘবকে —তখন নাটুকে দেখে ফেলেছে! একটো আঁশবটি নিযে নাটুকে কাটতে গেইছিল ঈশনে—নাটু আব গোলাপী ঈশনেকে ধবে ঐ গরুবাঁধা দড়িতে বেঁধে বেখেছিল, 'শালা গরু—আজ এইখানে বাঁধা থাক'—বুঝলি বাজু—সেই থেকে গোভূতে পেয়েছে! গোভূত লয়, মোডলভূত!

হাঁ কবে বাজু তাকিয়ে ছিল কুন্তিব দিকে। কুন্তিব হাসিব শব্দে চমক ভাঙতে বলল—কিন্তুক ঈশ্‌নেব মা যে কাঁদছে! বলছে, ভূতে পেযেছে ঈশনেকে!

—বলবে কি আব! বুড়ি জানে সবটাই।

—শঙ্কবের কাছে টাকা দিযে এল ভূত ছাড়াবাব জন্যে।

—অমন দেয়। টাকা ঐ নাটুই দিয়েছে। লোকদেখানো চিকিচ্ছে। ঈশনে আর ই জন্মে ভাল হয়েছে—হুঁ! দে, আমাকে চাল দিবি কি না বল দেখি।—রাজু ঈশানের ব্যাপাবটা বুঝবার চেষ্টা কবছে। হ্যাঁ, কুন্তিব কথাই তা হলে সত্যি! ভূত নয়—ভূত হতে পাবে না। স্ত্রীব চরিত্র-পতন ঈশানকে ভূতে পাওয়াব মূল।

—কতখুন দাঁড়াবো রাজু?

—হুঁ—দিই!—রাজু সের দুই চাল, দু'আঁজলা ডাল আর গোটাচারেক

আলু ঢেলে দিল কুন্তির আঁচলে। বলল—যাও, শীগ্‌গির চলে যাও!

বিস্মিত কুন্তি বলল—চলে যাব?

—হুঁ—হুঁ—যাও! মনে রেখো, আমি তারণ ঠাকুরের সাগরেদ্। ই সব কুকাজ আমি করি না!

রাজু ঠেলে বার করে দিল কুন্তিকে; তারপর ভেতর থেকে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চ্যাটাইটার উপর বসে পড়ল। কুন্তির মুখখানা মনে পড়ছে। সুন্দর সুশ্রী যৌবনলাবণ্য ভরা মুখ। রাজুর মত ছোট জাতের ঘরে ও এসেছিল—এই এখনি। রাজু তাকে বার করে দিয়েছে। নিষ্কলঙ্ক রেখেই বার করে দিয়েছে। না—কুন্তি তো কলঙ্কিনীই। রাজু নিজেই নিষ্কলঙ্ক থাকতে পেরেছে। ভগবান ওকে সামলে দিলেন! জয় হোক ভগবানের! রাজু দেওয়ালে টাঙানো জগন্নাথের পটের পানে চাইল—তারপর কালীঘাটের কালীর দিকে, তারপর তারণ ঠাকুরের ফটোর দিকে! তারণ ঠাকুর ওর পানে যেন চেয়ে আছে। যেন বলছে—তুই কবি—তুই পল্লীর স্বভাবকবি। তুই দেখে যা—দেখে নে এই বিপর্যয়কর মহামন্বন্তরের সত্য স্বরূপ—শুধু দেখে যা। তুই কিন্তু থাক—নিরঙ্কুশ। কবি তুই রাজু—তোর গ্রাম্য ভাষায় লিখে রেখে যা এই মহামৃত্যুর ইতিহাস। এ শুধু দেহের মৃত্যু নয়—আত্মার মৃত্যু। জন্মজন্মান্তরের সমাজ-জীবনের মৃত্যু—যুগ যুগান্তরের ঐতিহ্যের মৃত্যু! এমন মৃত্যু রোগে শোকে ভূমিকম্পে বজ্রাঘাতে তো হয় না! এ মৃত্যু মানুষের জগত থেকে মানুষকে পশু-জগতে রূপান্তরিত করবার মৃত্যু। মৃত্যু নয়—এ মহাকালের অভিশাপ। প্রলয় নৃত্য—যে নৃত্যে তাঁর পদতলে অগ্নি জ্বলছে, আবার যে নৃত্য তাঁর জটাজুট থেকে মাতা ভাগীরথীকে মুক্ত করে প্রবাহিত করে দেবে—এই মহাপাপকে, এই মহাধ্বংসকে, এই মহাশ্মশানকে পুনরুজ্জীবিত করে, শ্যামল করে, সুন্দর

করে গড়ে তুলবার জন্য। সেই গল্প যেমন আছে, মন্ত্র পড়ে ভেড়া-ছাগল বানিয়ে দেবার কথা—এই মৃত্যুও যেন তাই। ভেড়া-ছাগল হয়ে গেল সব। এর ইতিহাস কি লেখা থাকবে না? কে লিখবে—কার সে শক্তি আছে? এই মরণের ইতিহাস কোন্ জীবন-স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে রাখতে পারবে?

ওদিকে কে কাসছে—খক্—খক্—খক্! এই মরণের বীথিকায় জীর্ণ জীবনের শেষ যুদ্ধ—ছটফটানি। মাখন ডোম কাসছে পাশের কুঁড়েতে। কাসির ধমক থামছেই না। দেখে আসবে নাকি রাজু একবার! ওর তো কেউ কোথাও নেই। একটা জোয়ান ছেলে ছিল—বছর চার আগে মরেছে, তার বিধবা বৌটা এই চার পাঁচ মাস আগে পর্য্যন্ত শ্বশুরের সেবা করতো। কিন্তু যোয়ান মেয়ে, বুড়ো শ্বশুরের সেবা করার পুণ্যি সঞ্চয় করে মরে যাওয়ার চাইতে পালিয়ে বেঁচে থাকবার চেষ্টাই সে করেছে। একদিন ভোর বেলা পালিয়ে গেছে ছুঁড়ি। যাবেই না বা কেন। চব্বিশ পঁচিশ বছরের শক্ত-সমর্থ মেয়ে—খেটে খাবে কোথাও—না হয়, আর কিছু করেই খাবে। মরতে কে চায়, বলো! বেশ ছিল কিন্তু সুষী। রাজুর ইচ্ছে ছিল—ওকেই সাঙ্গা করবে। করতো হয়তো এতদিন। মঘনা পছন্দ করতো না বলেই হয়নি। সুষীর চরিত্র সম্বন্ধে মঘনা বরাবর সন্দেহ করে এসেছে। তাই ভাইয়ের বৌ হতে দেয়নি তাকে। যাক গে। মাখনা বুড়োকে একবার দেখে এলে হয়। রাজু লণ্ঠনটা নিয়ে বেরুলো। পাশেই ছোট্ট কুঁড়ে। আগুড় দেওয়া দরজা—ঠেলা দিতেই খুলে গেল। জীর্ণ তেলচিটে বিছানায় মাখন পড়ে আছে। আরশুলাগুলো উড়ছে ফরফর করে। ইন্দুরগুলো কিচমিচ শব্দ করে পালিয়ে গেল। মাখন কোটরগত চোখ দুটো দিয়ে চাইল রাজুর দিকে। ত্রাসিত দৃষ্টি। ভীত, সন্ত্রস্ত, মৃত্যু-যন্ত্রণাক্লিষ্ট দৃষ্টি! রাজুকে যেন ও যমদূত ভেবেছে। রাজু

একচোখ দেখেই বুঝলো—দুতিন দিন অনাহারে আছে বুড়ো। একটা মাটির ভাঁড়ে জল ছিল হয়তো—এখন এক ফোঁটাও নাই। মাখনই খেয়েছে, না হয় ইন্দুর-আরশুলাতে খেয়ে গেছে। ঘরটায় দুর্গন্ধ; রাজুর কষ্ট হচ্ছে দাঁড়াতে, কিন্তু মাখন আত্মীয়—ঘরের কাছে পড়ে মরে থাকবে—এটা রাজুর কাছে অকর্ত্তব্য বলে মনে হয়। ডাক দিল—জ্যেঠা! ও জ্যেঠা!

—উঁ—উঁ—কে?

—আমি রাজু!—বলল রাজু, কিন্তু বুঝতে পারলো—লোক চিনবার ক্ষমতা মাখনের নাই। চট করে গিয়ে এক গেলাস জল আর খানিকটা জমাট দুধ নিয়ে এল। জলে দুধে মিশিয়ে শুকনো তালপাতা জেলে গরম করে ফেলল দুধটা! তারপর মাখনের মুখে ঢেলে দিতে লাগল আস্তে আস্তে! গিলতে পারছে না! দু'কস বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। তার ওপর কাসি! জীর্ণ পাঁজরাগুলো দুলে দুলে উঠছে কাসির ধমকে। হয়তো এখনি মরে যাবে। এই দমটাই হয়তো শেষ দম। কিন্তু না—মাখন আবার নিশ্বাস ফেলল। আশ্চর্য্য! কত যে কচি ছেলে মরে গেল—কত যোয়ান ছেলে দুটো শ্বাসটান দিয়েই অক্কা পেল—আর এই সত্তোর বছরের বুড়ো এখনো বেঁচে আছে! এই জীর্ণ দেহপিঞ্জর ছেড়ে ওর প্রাণপাখী যেন যেতেই চায় না! রাজুর অবাক লাগছে। তিন চারদিন হয়ত খায়নি মাখন। তবু কেমন করে বেঁচে আছে এখনো! এত লোক,—যোয়ান, শক্ত, সক্ষম লোক সব মরে গেল, আর বেঁচে রইলো মাখন! কিন্তু রাজুর মনে পড়ল—মাখন ছিল গাঁয়ের চৌকিদার। মস্ত লম্বা তার দেহখানা যখন রাতের অন্ধকারে বল্লম হাতে রণ দিতে বেরুতো তখন ওর মূর্ত্তি যে দেখেছে সেই ভেবেছে, বাপরে! কি যোয়ান! দৌড়ে চোর ধরতে মাখনের জুড়ি কেউ ছিল না বলে একবার 'ম্যাজিস্টর সায়েব' ওকে পুরস্কার দিয়েছিল। সেই মাখন পাকা হাড়ে আজ শয্যা নিয়েছে। ভীষ্মের শরশয্যা। উত্তরায়ণ না হলে ও দেহত্যাগ

করবে না! রাজু জল দিল আর একঢোক। মহাবীর ভীষ্মকে যেন রাজু ভাগীরথীর অমৃত ধারা পান করাচ্ছে, এমনি একটা আত্মপ্রসাদ জাগছে মনে। মাখন মৃত্যু-উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি দিয়ে চাইল। কি যেন বলতে চেষ্টা করছে, রাজু বুঝলো, মাখন কথা বলতে পারছে না। মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে শুধুলো,—জ্যেঠা? কিছু বলবে? বলো!—রাজু ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল।

অতি কষ্টে মাখন একখানা হাত তার ছেঁড়া বালিশের তলায় এনে দেখালো রাজুকে। কিছু আছে হয়ত ওখানে; রাজু বালিশটা একটু তুলে দেখলো—একটাকার ছ'খানা নোট—মাখনের যথাসর্ব্বস্ব ঐ মাথার বালিশের নীচে গোঁজা। ছ'টা টাকা এখনো ওর সম্বল। রাজু নোট কয়খানা বার করতেই মাখন ইসারা করলো,—তুই নে—তারপর জড়িত কণ্ঠে বলল—মুখে আগুন দিস। রাজু নোটগুলো একদিকে রেখে মাখনকে ভাল করে শোয়াতে চেষ্টা করছে, মাখন আবার বলল অস্পষ্ট ভাবে—ধান ক'টা লিস তু, বুঝলি!

হ্যাঁ—বিঘে তিনেক জমি আছে মাখনের। নিজের হাতে পতিত ডাঙা ভেঙে মাখন ঐ জমি তৈরি করেছিল। ভালো জমি—খুব ধান হয়—এ বছরও মাখন ধান গাছ লাগিয়েছে ঐ জমিতে, কিন্তু তারপর আর দেখতে যেতে পারেনি। রাজু কিন্তু দেখেছে, ধানগুলো বেশ বেড়ে মেঘের মত কালো হয়ে উঠেছে।—দেখে এসেছে রাজু। যে ধান গাছ নিজের হাতে অত কষ্ট করে পুঁতেছে মাখন, সে-ধান কাটবার জন্য ও আর থাকবে না—তাই রাজুকে দান করে যেতে চায়। কথাটা বলতে গিয়ে বেদম কাসতে লাগল মাখন। শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। কাসির বেগে গলার হাড়গুলি বেরিয়ে ঠিক প্রেতের মত দেখাচ্ছে। কিন্তু চোখ দুটো যেন জ্বলছে ওর। অত বুড়ো বয়সেও অমন জ্বলন্ত চোখ—রাজু আর কখনো দেখেনি।

ইবারে বৃষ্টি নামলো। ময়না হয়তো রাস্তায়, ভিজে যাবে। রাজুর অন্তর চিন্তিত হয়ে উঠছে ময়নার জন্য। মাখন আর একবার কিছু যেন বলবার চেষ্টা করলো—ধানগুলো—বুঝলি—ঐ হারামজাদী সুখী—যেন—না লিতে পারে—বু-ঝ-লি!—ক্লান্ত, আড়ষ্ট হয়ে গেল মাখন। একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটা ঘরের চালটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল—আগুড়টা খুলে গেল। যমদূত প্রবেশ করছে হয়ত! রাজু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো মাখনের দিকে। খাবি খাচ্ছে মাখন! "হরিবোল—হরিবোল—গঙ্গা নারায়ণ—ব্রহ্ম"—উচ্চারণ করলো রাজু। অন্তিমক্ষণের শ্রোতব্য এই তারণমন্ত্র। পর-পারে যাত্রার মূল্যবান পাথেয়। মাখনের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে। ঐ হাওয়ার দমকাটাই ওকে নিয়ে গেল তাহলে! ঐ হাওয়া-রথেই এসেছিল যমদূত!

ডোমের ছেলে রাজু—ভয়-ডর কোনো কালে নাই ওর। কিন্তু আজ পাড়াটা নিচালি হয়ে গেছে। কোনো কুঁড়েতে কেউ আছে হয়তো কিন্তু সাড়া পাওয়া যায় না। মাখনের চামড়া ঢাকা মড়া হাড়গুলো আর চোখের খোলা তারাদুটো রাজুর মনে আতঙ্কের সঞ্চার করছে আজ। ময়না যে কেন এখনো আসছে না! কি করবে রাজু এখন মাখনের দেহখানা নিয়ে! লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে ও বেরিয়ে এল। আগুড়খানা ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে এসে ঢুকলো নিজের ঘরে। ভয়ই পেয়েছে রাজু। ভূতের ভয়। নিজের ঘরে এসে যেন ভয়টা খানিক কাটল ওর। চেয়ে দেখলো জগন্নাথের পটের পানে, কালীঘাটের কালীর পানে। আলোটা নামিয়ে রাজু আবার বসল। বিড়ি ধরালো একটা। ময়না এখনো আসছে না। আজ যেন বেশি রাত হচ্ছে। না—রাত বেশি হয় নি! তা ছাড়া বৃষ্টি পড়ছে। কি করেই বা আসবে ময়না! হয়ত পথের ধারে গাছতলায় দাঁড়িয়েছে—হয়ত, বৃষ্টি দেখে বার হয় নাই—কারখানাতেই আছে। কিম্বা নদীতেই হঠাৎ বান এসে পড়েছে। কিন্তু বান এলে রেলের পুল পেরিয়ে

আস্‌ত পারবে। ময়না এসে পড়লে রাজু যেন বাঁচে। বড্ড একলা একলা লাগছে ওর।

অলোটা কম করে দিবে বিড়ি টানতে লাগল। ওঘরে মাখনের মৃতদেহ। আজ আর কিছু গতি করা সম্ভব নয়। কাল সকালে রাজু লোক ডেকে নদীর ঘাটে নিয়ে গিয়ে দেবে জ্বালিয়ে। আহা! না খেয়েই মারা গেল মাখন! ছ'টা টাকা বালিশের তলায় ছিল—তবু না খেয়েই মরলো! রাজু যদি দুদিন আগে দেখতে যেত ওকে! দুঃখু হতে লাগল রাজুর। তবু শেষটায় এক ঢোক জল খেতে পেয়েছে, একটা ঢোক দুধও। ময়নার আনা দুধ। ময়নার আনা চাল আজ তারণ ঠাকুরের দিদি-বৌ খেয়েছে। কুন্তিরা ঘরগোষ্টি খেয়েছে। মাখনও দুধ খেল। ময়না যে ভাবেই এসব সংগ্রহ করুক···রাজু তাই দিয়ে কিছুটা পুণ্যি সংগ্রহ করেছে। সেই পুণ্যিটুকু ময়নার পাপকে যেন ধুয়ে দেয়—ময়নাকে যেন নিরাপদ রাখে!

কিন্তু ময়না খারাপ কিছু করেছে—বিশ্বাস করে না রাজু, এখনো বিশ্বাস করে না। ওর স্নেহশীল ভ্রাতৃ-অন্তর ময়নার কোন কাজ অসমর্থন করেনি কোনোদিন। ময়নার সব বায়না রাজু অকুণ্ঠিত চিত্তে মিটিয়ে এসেছে। আজ যদি সত্যিই ময়না পাপের পথে উপার্জ্জন করে, তাও রাজু সমর্থন করবে। সয়ে যাবে। সয়ে গেলই তো! সকালে কতখানা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল রাজু। আর এখন! এখন তো আর রাগ হচ্ছে না ময়নার উপর। দুঃখও হচ্ছে না খুব। খেয়ে যদি বেঁচে থাকতে পারে ময়না তো সেই ঢের। মরেই তো গেল সবাই—গাঁয়ের অর্দ্ধেক মরলো! রাজু তো মরতোই, ময়নাও মরে যেত। না, তার থেকে ময়না বেঁচে থাক। বড় কষ্টে মানুষ করা ওর ময়না। মনে পড়ল, কাজোড়ার সোনাদীঘিতে যখন খাটতে যেত রাজু ময়নাকে কোলে নিয়ে,—তখন ময়না এতোটুকুন,

আড়াই-তিন বছরের। দীঘি খোঁড়া মাটিগুলো যেখানে ফেলে পাহাড়ের মত উঁচু করা হোত—সেইখানে বড় একটা পাকুড় গাছ—তারই ছায়ায় ঐ ভিজে মাটির নরম বিছানায় ময়নাকে শুইয়ে দিত রাজু। ময়না ঘুমুতো, নাহয়, জেগে মাটি নিয়ে খেলা করতো। ওর পাশ দিয়ে কাজোড়া গাঁয়ে যাবার রাস্তা। যে দেখতো—এমন কি, বাবুরাও বলে যেত—আহা! কি সুন্দর মেয়েটা! রাজুর অহঙ্কার হোত কত! তার বোনকে সবাই সুন্দর বলে! কি নাম রাখবে, তখন থেকে ভাবতো রাজু। শেষে ঐ তারণ ঠাকুরই ঠিক করে দিয়েছে ওর নাম—ময়না। ভাল নাম মধুমালতী। তারণের বৌ বলে ময়নামতী। এসব নাম জানে রাজু, আর ঐ তারণ ঠাকুর। আর কেউ জানে না—শুনলে হয়তো ঠাট্টা করবে। রাজু তাই কাউকে বলে না সে নামটা। ময়না কিন্তু জানে। ও মাঝে মাঝে দাদার পেনসিল দিয়ে বড় বড় করে লেখে—মধুমালতী ডোম, সাকিন্ লাট্‌কোনা—। রাজু দেখে আর হাসে, বলে—'ডোম' কেনে লিখছিস—'দাসী' লিখ! ময়না শুদ্ধ করে লেখে 'দাসী'।

—দাদা!

—আয়—আয় মনি! ভিজে গেলি র‍্যা?—রাজু তাড়াতাড়ি দরজা খুলে আলো নিয়ে বাইরে এল। ময়নার আপাদমস্তক জলে ভিজে গেছে। শাড়িখানা লেপ্টে গেছে গায়ে—কিন্তু—কিন্তু—ও কি শাড়ি! ও কাপড় তো রাজু কোনোদিন দেখে নি ময়নার পরণে। ফিনফিনে পাত্‌লা—যেন মাকড়সার জাল। গায়ের সঙ্গে লেগে কাপড় যে আছে তা বোঝাই যাচ্ছে না। বাবুদের মেয়েরাও পরে না অমন পাতলা কাপড়। রাজু দাঁড়িয়ে গেল আলো নিয়েই।

ময়না অত্যন্ত ক্লান্ত; পা-টি পা-টি করে ঘরে ঢুকে ঝুড়িটা নামালো, —আলনা থেকে একটা ছেঁড়া কানি টেনে নিয়ে গা মুছতে লাগল।

রাজু আলোটা দরজার কাছে নামিয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যাচ্ছে ওর গা—ভ্রূক্ষেপ নাই! যে কথা ও এই সারাদিন বিশ্বাস করে নাই, এতক্ষণে সেই কথাটা নির্ম্মম সত্য হয়েই দেখা দিয়েছে। শুধু কাপড়খানাতেই নয়—ময়নার দেহে, ময়নার চোখ-মুখে, সর্ব্বত্র! ঐ দেহশ্রী রাজু চেনে। ওর বৌটা বছর দুই আগে একটা মরা ছেলে প্রসব করে মারা যায়, রাজুর আজো মনে পড়ে তার সর্ব্ব অবয়ব। কালো কুচকুচে মেয়ে ছিল সে—কিন্তু সুন্দর হয়ে উঠেছিল শেষের দিকটায়। রাজুর বেশ মনে আছে তার দেহের পরতে পরতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

ময়না কাপড়খানা ছেড়ে একটা ছেঁড়া টেনা পরলো। তারপর রাজুর চ্যাটাইটায় বসে বলল—ভিজছো যে দাদা—ঘরকে এস!

—হুঁ—যাই!—রাজু ঘরেই ঢুকলো এসে। বসল একধারে। কথা যেন কইতে ইচ্ছে করছে না।

—কাপড়টো গিন্নীমা দিলো দাদা—তাই পরে এলুম। আমারটো ছিঁড়ে গেইছিল—ময়না বলল।

—বেশ—রাজু উত্তরটা দিয়ে বাইরে বৃষ্টিধারার দিকে চাইল। ময়না অন্য দিন অনেক কথাই বলে; আজ কিন্তু ভয় ভয় করছে ওর। একটু থেমে, একটু কেসে বলল—কিছু যে রাঁধো নাই দাদা?

—নাঃ, মাখনজ্যেঠা মরে গেল আখুনি! পড়ে আছে ঘরেই। সুকালে গতি করতে হবে ওর।

—আহা! কখন ম'ল? চল তো, দেখে আসি!

—থাক-গা! তু খাবি কিছু?—রাজু প্রশ্ন করলো!

—না—আজ আর খাব না কিছু। খেয়েই বেরিয়েছিলোম—

ময়না ঐ চ্যাটাইয়ের এক পাশেই শুয়ে পড়ল! পাতলা কাপড়খানা ছেড়ে ছেঁড়া কানিটা পরে আসবার সুযোগ করতে পারে নি ও

আজ। রাস্তার মাঝে বৃষ্টি এসে সব বিপর্য্যস্ত করে দিয়েছে। ভেবেছিল—দাদা অত লক্ষ্য করবে না। হয়তো লক্ষ্য করে নাই। কাপড়ের সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎও দিয়েছে ময়না। দাদা নিশ্চয় কিছু সন্দেহ করবে না। ময়না নিশ্চিন্তে চোখ বুজে-বুজেই বলল,—আলোটা নিমিয়ে শুয়ে দাদা—রাত হইছে এনেকটো!

রাজু কোনো উত্তর দিলো না—আলোর শীষটা কমিয়ে দিল। দশ-পনর মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেল ময়না। রাজু বসে আছে তখনো। নির্নিমেষ হয়ে তাকিয়ে আছে ময়নার দিকে। তেলচিটে কালো কাপড়ের টুকরো ময়নার পরণে। অর্দ্ধেক অঙ্গও ঢাকা পড়ছে না ওর। দিনের বেলা ময়নাকে কত দিন দেখেনি রাজু, রাত্রেও কোনোদিন এত ভাল করে দেখেনি। দেখবার অবসর হয় না। ময়না এসেই একথা-সেকথা বলতে থাকে। রান্না করে, না হয়, ঘর ঝাড়পুঁছ করে। না হয়, রাজুকে খাওয়াতে লেগে যায় নতুন কোনো আহৃত বস্তু। উৎসাহের অন্ত থাকে না ময়নার। আজই কেমন যেন ব্যত্যয় ঘটেছে। রাজু উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ময়নাকে। কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। একটু ঠেলে দিল রাজু। চিৎ হয়ে গেল ময়না—ঘুমুচ্ছে। নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। আলোর শীষটায় জোর দিয়ে রাজু দেখতে লাগল—হ্যাঁ, ঠিক! পেটটা উঁচু হয়ে উঠেছে—কালো দাগ পড়েছে বুকের পুষ্প-বৃন্তে। সন্দেহ করবার কিছুমাত্র অবকাশ আর নাই। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি—রাজু তারই মধ্যে এসে দাঁড়াল বাইরে। হাতে তখনো বিড়ি দেশলাই। ধরানো হয় নাই। সেই ময়না,—কোলের ভেতর কুঁকড়ে থাকতো রাজুর। খিদে পেলেও কাঁদতো না ময়না। মাইদুধ না থাকায় রাজু গাইদুধে ন্যাকড়া ভিজিয়ে ওকে চোষাতো। তারপর—বড় হোল ময়না। খেলতে শিখলো, কাজ করতে শিখলো, রান্না করতে শিখলো—আজ রোজগার করতে শিখেছে! হ্যাঁ, রোজগারই করছে তো! আর রাজুকে

সেই রোজগারের চাল ডাল খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখছে। বাপ যেমন ছেলের রোজগারে খায়—ভাই যেমন ছোট ভাইএর রোজগারে খায়। নাঃ, ময়নার রোজগার সে-রকম নয়। ময়নার রোজগার পাপের রোজগার—ন্যক্কারজনক নষ্টচরিত্র নারীর রোজগার!—ওঃ, ওঃ!

রাজু মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে বিড়িটা ধরাবার চেষ্টা করলো। ঘরের ছাঁচকোলে দাঁড়িয়ে জ্বাললো দেশলাই। দেবে নাকি জ্বেলে ঘরটাতে আগুন! দেবে জ্বেলে? ঘুমুচ্ছে ময়না—ঘুম পাড়াচ্ছে কোথাকার কার একটা ছেলেকে ময়না গর্ভের কোমল শয়নে। জ্বালিয়ে দেবে নাকি রাজু সেই সুকোমল গর্ভশয্যা! দেবে জ্বালিয়ে? দেবে?—হাতের জ্বলন্ত কাঠিটা রাজু চালের কাছে ধরলো। যাক—জ্বলে পুড়ে যাক ঐ হতভাগ্য ভ্রূণ—তার সঙ্গে ময়নাও। না—না—না—রাজু আঁৎকে উঠে যেন কাঠিটা ফেলে দিল। ভিজে চাল না হলে এতক্ষণ দাউদাউ করে হয়তো জ্বলে উঠতো আগুন। এ কী করতে যাচ্ছিল রাজু? উঃ, ভগবান! ময়নাকে মেরে ফেলতে গিয়েছিল রাজু এখনি! কেন? কি এমন করেছে ময়না! কিসের পাপ? পাপ কিসের? বেঁচে থাকবার জন্য লোকে কত কি করে—চুরি করে, ছেনালি করে—খুন পর্য্যন্ত করে! ময়না এমন আর কি করেছে! ময়না—ওর কচি কাঁচা বোনটি, ওর কত আদরের সোনার বোনটি:

"ময়না পাখী—ময়না পাখী—গয়না দিব গায়,
দুফর বাতে বায়না লিলে গয়না কুথায় পাই।
আজকে রাতে ঘুম যাও রে ময়না—মাণিকধন,
কাল সুকালে কিনে দিব সোনারো কঙ্কন॥"

মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল কত ফেলে-আশা দিনের শান্ত মূর্চ্ছনা, কত স্মৃতির সৌরভ, কত অবলুপ্ত অশ্রুর কাহিনী, হাসির ঝর্ণা, আনন্দের তুফান! ময়নাকে অবলম্বন করেই তো জীবন ওর। রাজু

বিড়িটায় জোর একটা টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঘরে ঢুকলো এসে। ময়না ঘুমুচ্ছে—ঘুমুচ্ছে ময়না। ছোট্ট খুকিটির মত ঘুমুচ্ছে। মুখখানা শুকনো দেখাচ্ছে যেন। কিছুই কি খায় নি নাকি? রাজু হেঁট হয়ে ওর কপাল ছুঁলো। চুলগুলো রয়েছে লোটন বাঁধা,—ভিজে। অসুখ করতে পারে। রাজু খুলে এলিয়ে দিল চুলগুলো। কালো কোঁকড়া চুল তালপাতার চ্যাটাইটার উপর মর্ম্মরিয়ে উঠলো। গহন অরণ্যের বিভূতি যেন এই চুলে। আঙুলের ফাঁকে চিরুণীর মত করে রাজু চুলগুলি আঁচড়ে দিচ্ছে। এই সেদিনও রাজু ময়নার মাথা বেঁধে দিয়েছে। চার-গোছা করে বেণী পাকিয়ে দিয়েছে। খোঁপায় ফুল পরিয়ে দিয়ে তৃপ্তি হয়নি—দোলের মেলায় জরির ফিতে কিনে এনে পরিয়েছে।

—ময়না—! মাথাটা একটু টেনে তুললো রাজু, চুলগুলো ভালো করে শুকুতে দেবার জন্যে। ময়নার মা থাকলে ঠিক এমনি করেই ময়নাকে দেখতো আজ। হয়তো আরো বেশি যত্ন করতে পারত এ সময়। রাজু চেয়েই রইল অনেকক্ষণ ময়নার দিকে। ময়নার গর্ভে নবাগত অতিথি—'জীবনের ভবিষ্যৎ জয়গান!' তারণ ঠাকুরের লেখাগুলো মনে পড়ছে রাজুর। অমনি দুঃখের মধ্যে রাস্তার ধারেও শিশুর জন্ম হয়। তারণ ঠাকুর লিখেছে। ময়নার হবে, কিন্তু সেদিন রাজু যেন তাকে এই ঘরের মধ্যেই রাখতে পারে। যেন এক গ্লাস গরম দুধ খাওয়াতে পারে। কিন্তু ময়নার ছেলে হলে, সে ছেলের কোন পরিচয় থাকবে না, কোনো সমাজ থাকবে না। ঘৃণাই করবে সকলে তাকে। তাকে নিয়ে কি করবে রাজু! কোথায় রাখবে? না—না— সে ছেলে হয়ে কাজ নেই। সে ছেলেকে রাজু মাটিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নুন দিয়ে টিপে·····ময়না নড়ে উ লো; পাশ ফিরলো। মুখটা নাড়লে—শুকিয়ে রয়েছে ঠোঁটদুটি! রাজু বুঝতে পারে ময়নার পিপাসা। জল এক ঢোক হয়তো খাবে ময়না। কিন্তু সাণ্ডা জল,—অসুখ করতে পারে ময়নার। একেই তো ভিজে চুল—ভিজে

মেঝেতে চ্যাটাইয়ের উপর শুয়ে রয়েছে। যদি অসুখ করে—সামলাবে কি করে রাজু! একটা কাঁথা কেন যে পেতে শুলো না ময়না! বড্ড হয়ত ক্লান্ত হয়ে এসেছে। অতটা রাস্তা—নদী—ঝোপজঙ্গল ভেঙ্গে আসতে হয়। ক্লান্ত তো হবেই। তার উপর পেটে ছেলে—চার-পাঁচ মাস হবে বোধহয় ওর। না, অসুখ হতে দিলে চলবে না। চা করে খাওয়াবে নাকি? গরম চা, বেশী একটু দুধ দিয়ে? হ্যাঁ, তাই খাওয়াবে। মাখন-জ্যেঠা মরেছে তো কি আর এমন হয়েছে? কোন পুরুষের জ্ঞাতি ওর? চা খেলে কিছু দোষ হবে না। রাজু উনুন ধরালো। শুকনো তালপাতার আগুন জ্বলে উঠতেই ময়না চোখ মেলে বলল,—কি দাদা—কি?

—কিছু না রে, চা খাব। ঘুম ভাঙলো তুর?

—হুঁ, উঠো—আমি করছি চা।

ময়না উঠে বসল। কাপড় সামলে এগিয়ে এল। রাজু ওকে ঠেলে দিয়ে বলল—না—যা তুই শো! আর না হয়, আগুনের আঁচে শুকো চুলগুলোন। যা একবোঝা চুল!—রাজু সস্নেহে আর একবার নেড়ে দিল চুলগুলো।

* * *

ভিজেছে বারুণীও। জল সট্‌সটে শাড়িখানা সামলে মাথার ঝুড়িটা বাঁ-হাত দিয়ে ধরে সাবধানে ও ঘরের নীচু সদর দরজা পার হ'য়ে ভিতরে ঢুকেই দেখলো—মহামারী কাণ্ড! নাটু মোড়ল বসে আছে ঘরের চালায়, নাটুরই লণ্ঠনটা আলো বিকীর্ণ করছে সতেজে। ওর পায়ের কাছে কিষ্ট। খানিকটা দূরে গাঁয়ের আরো দু'তিনজন মাতব্বর—কুমদীশ, শশাঙ্ক, শম্ভু, হরিচরণ একটা চ্যাটাইয়ে বসে। এক কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বারুণীর মা—ওর কোলের বাচ্চা মেয়েটা ভীষণ চীৎকার করছে। ভয় পেয়েছে হয়ত এতগুলো লোক দেখে। বারুর বাপ—এদিকে নাটু আর ওদিকে মাতব্বরদের

মাঝখানে হাঁটু গেড়ে দণ্ডবৎ করার ভঙ্গীতে বসে বলছে,—আমি ই-সব জানি না হুজুর!

—জানিস না?—হারামজাদা!—নাটু চীৎকার করে উঠলো,—তোর বিটি উখেনে কি কত্তে যায়?—দশখানা গাঁয়ের লোক জানলো, আর তু বিটা জানলি না? চালাকি পেইছিস!

—আজ্ঞে!—আমি কিছু জানিনা মোড়ল! ই কথা শুনিই নাই আমি! খাটতে যায়। চাল ডাল পায়, তাই খাই আমরা, এই জানতোম।

—বেশ, জানিস না—আখুন তো জানলি! চুলের মুঠো ধরে বিটিকে কিষ্টের ঘরে দিয়ে আয়!

বারুণী উঠোনের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গেছে। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি, এদিকে থমথম করতে লাগল ভিতরে ঘরখানা!

—তা বই খাব কি আমরা! না খেয়ে মরবো নাকি আমরা? বারুণীর মা প্রতিবাদ করল।

—মানে! তু কি খাবি তার দায়ীক আমরা নাকি? কিষ্টে যদি তার বিয়েলি বৌকে না ছাড়ে?

—কিষ্টের নিজেরই একবিলা খাতি জুটে না, খইবে কি যে বিয়েলি বৌ নিয়ে ঘর করবে?

—সি ভার তুকে লিতে হবে না—তুই চুপ করে থাক আপনার। বলল শম্ভু ঘোষ।

—সুমত্ত মেয়েকে বেউশ্যে-গিরি করাবি নাকি তুই গাঁয়ে বসে?—বলল কুমদীশ।

—ই সব অনাচার হতে দিব না আমরা। ই কি মগের মুলুক যে, যা-তা করবি!—বলল হরিচরণ।

কিষ্ট করযোড়ে বসে। এই পঞ্চায়েতের মজলিসে ওর ভাগ্য নির্ণয় হচ্ছে; কাজেই ও পরম ভক্তিতে আসীন। বারুণীকে ও চার পাঁচ

বছর আগে বিয়ে করেছিল দু কুড়ি পাঁচ টাকা পণ দিয়ে। তা'ছাড়া গয়না,—পায়ে তোড়া, কোমরে গোঠ, কানে ফুল। রূপার গয়না ছাড়াও কিষ্ট একটি সোনার নথ দিয়েছিল বারুণীকে, নগদ ন' টাকা তার দাম। কিষ্ট তখন লোকের ঘর ছাদন করে ভালই রোজগার করতো। কাজেই বৌকে সাজাতে তার কার্পণ্য ছিল না। তা' ছাড়া বৌ তো যেমন তেমন বৌ নয়—সুন্দরী বৌ। যে দেখে, সেই বলে—"বাহা বে মেয়েটি। কাদের বৌ লো!'

সেই সব গয়না-পত্তর নিয়েই বারুণী আজ মাস চার পাঁচ বাপের বাড়ী এসে উঠেছে, ফিরে যাবার আর নামটি করছে না। আবার নদী পেরিয়ে খাটতে যাচ্ছে উদিকের কারখানায়। খাটতে যে কেমন যায়—তা কিষ্ট ভালই জানে। ওর সোমত্ত সুন্দরী বৌ এমন করে শয়তানি করে বেড়াবে—এটা কিছুতেই সে সইতে পারছে না। ওর মাথায় আগুন জ্বলছিল ক'দিন থেকে। আজ নাটু মোড়লের আশ্বাস আর সহায়তা পেয়ে বারুণীকে ও ঘরে নিয়ে যেতে এসেছে, নিয়ে যাবেই। বারুণী উঠানে দাঁড়িয়ে এক মিনিটেই ব্যাপারটা বুঝে নিল, তারপর ভিজে কাপড়েই চালের ঝুড়িটা মাথায় ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে নামাল ঝুড়িটা।

—কুথা থেকে আনলি ইসব! তুর কুন্ বাবা দিল হারামজাদি? বলল ওর বাপ চেঁচিয়ে।

—তুমি থামো দেখি!—বলে বারুণী উদ্ধত ভঙ্গীমায় এসে দাঁড়ালো সবার মাঝখানে, বলল—কিসের লেগে এত ঝামেলা—শুনি। কার বুকে ধান ভেনেছি আমি যে এত কলংখ দিছ সব?

—থাম্ বারুণী, থাম্—নাটুই বলল—ই সব ভাল কাজ লয়, বুঝলি! তুই কিষ্টের বিয়ে করা বৌ! উ তুখে দিবে কেনে ইসব করতে? আমাদের কাছে নালিশ করেছে। চল, তুখে নিয়ে যাব ওর ঘরকে।

—ও মা! নালিশ করেছে? তাই জজ-ম্যাজিষ্টর এসেছেন উনারা বিচের করবেন! আমি যাব না—বিয়ে করেছিল কেনে? দুবেলা পেটের ভাত জুটাতে লাবে—পরতে লুগা দিতে লারে—বলে সেই, 'তিনকড়া নাই ঝুলিতে লাফ মারছে কুলিতে'—হুঁ! যাও সব ঘর যাও। ভাল হবে না বলছি! দুফর রাতে কেলেঙ্কারী কবো না। তু ঢুকতে দিলি কেনে গো মা?

—আমি কি করবো—তুর বাবাকে বল!—ওর মা জবাব দিল।

নাটু সুদক্ষ মাতব্বর। বেশ ঠাণ্ডা মেজাজেই বলল—না গেলে চলবে না—আইন আছে—বুঝলি। কাল ধরে জেহেলে ভরবো, তার চেয়ে ভালয় ভালয় চল বলছি।

—ইস! জেহেল! তুমাদের লেগে জেহেল নাই? তুমি যে সেদিন গোলাপীব ঘরে ··

—চুপ কর হারামজাদা—নাটু অকস্মাৎ উঠে বারুণীর চুলের মুঠো ধরলো। রাগে নাটুর গোল চোখ দু'টো ঘুবছে—বললো—চল্ তুর কোনো বাবা রুখতে পারবে না আজ!—জলে ভেজা উঠোনে নাটু হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো বারুণীকে। মাতব্বরদের সবাই বলল—চল—চল··!

—যাও, লিয়ে যাও—আমাব কিচ্ছু বলবার নাই—লিযে যাও বাবা কিষ্ট।—বলল ওব বাবা।

ওর মা কেঁদে উঠলো। ওগো আমার বারুকে মেরে ফিলাইছে গো—ওগো তুমরা এসো গো· ওগো আমার বারুকে কড়কড় করে বজ্রেব গর্জ্জন ওর কান্নাকে ডুবিয়ে দিল একেবাবে—আলো হাতে মাতব্বররা সব নাটুকে মাঝখানে নিয়ে বিজয় গর্ব্বে বারুণী সমেত এসে ঢুকলো নাটুরই গোয়াল ঘরের পিছনের ছোট ঘরটায়। তখনো বারুণীর মা গাল দিচ্ছে—লিব্বংশ যাবি—আঁটকুড়ো হবি—মুয়ে পোকা পড়বে—কুঁঠে হবি·· !

বারুণীকে চ্যাংদোল্লা করে বয়ে আনা হয়েছে। একটা হাত, শম্ভু ঘোষ,

অন্য হাতটা হরি—পা'দুটো কিষ্ট ধরেছিল। মাথার চুলের গোছাটা এখনো নাটুর হাতে। বারুণী বেশ বুঝতে পারলে, ওকে এখন রক্ষা করবার কেউ নাই। গাঁয়ের সব মরেছে না-হয় পালিয়েছে। যারা আছে তারা নিজেদের দুঃখেই সারা হচ্ছে। নাটুর মত প্রতাপশালী, চালের মহাজনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না তারা। অতএব চেঁচিয়ে বা কেঁদে কেটে কিছু ফল হবে না—ভেবে বারুণী চুপ করেই ছিল সারা রাস্তাটা।

যে ঘরটায় ওকে আনা হোল, সেটা গোয়াল ঘরের সংলগ্ন ছোট্ট একখানা কুঠ্‌রী। উপরে খড়ের চাল। লাঙ্গল, ফাল, গাড়ীর চাকা, জোয়াল ইত্যাদি চাষের সব যন্ত্রপাতি ঐ ঘরে রেখে দেওয়া হয়—দরকার মত বার করা হয়। তাছাড়া একটা বুড়ো ছাগল—মস্ত সিংওয়ালা খাসী থাকে—ঐ ঘরটায়। নাটুর আদরের খাসী। বুড়িয়ে গেছে। চলবার সময় মচ মচ আওয়াজ হয় তার পায়ের। নাটু কিন্তু ওকে বেচে নি, বা কেটে খায় নি। ইচ্ছে আছে, ঐ খাসীটা নাটুর ব্যাটার বিয়ের সময় কাটবে। কিন্তু ছেলেটা এখনো বড্ড ছোট। খাসী ততদিন বাঁচবে কিনা কে জানে! ছাগলটার মলমূত্রে ঘরটুকু মানুষ বাসের একেবারে অযোগ্য। কিন্তু নাটুদের দল বারুণীদের মত হরিজনদের মানুষ মনে করে না। ঐ ঘরেই বারুণীকে ফেলে দিল ওরা। একটা চটও ছিল ওখানে—ধানের বীজ রাখা বস্তা—পেতে দিল কিষ্ট। বারুণীকে সেইটায় ফেলে দিয়ে নাটু সগর্ব্বে বলল,—হারামজাদী লচ্ছারী—আমার সঙ্গে চালাকী পেয়েছ? দেখি তুর কোন গোরা-চৌদ্দ পুরুষ রক্ষে করে।

—এই কিষ্টে, তামাক সাজ একছিলিম· কুমদীশ হুকুম করলো। হুঁকো-কলকে নাটুর সঙ্গেই ঘোরে, কিন্তু কাছে তামাক ছিল না। কিষ্ট কি করবে ভাবছে—নাটু বলল—চলো সব, বৈঠকখানায় যেয়ে তামাক খ' যাবে।

—হুঁ—হুঁ! কাপড়-চুপড়ও ভিজে গেইছে—বলতে বলতে সব বাইরে এল। বৃষ্টিটা এখন ধরেছে একটু। ওরা আর দেরী না করে এপাশে নাটুর বৈঠকখানায় এলো। কিষ্ট আর নাটু কিন্তু এখনো দাঁড়িয়ে; লণ্ঠনটা জ্বলছে। বারুণী তার ভিজে কাপড়খানা টেনে গা-হাত ঢাকবার চেষ্টা করছে।—সর্দিতে মরবি যে! ছাড় কাপড়টো—বলল নাটু —যা তো কিষ্টে—হরুকে বল একটা কাপড় দিতে—যা, লিয়ে আয় চট্ করে।

কিষ্ট চলে গেল। নাটু দেখছে বারুণীর যৌবনোদ্বেলিত দেহখানা। শ্যামলাঙ্গী তরুণী। বাইশ তেইশ বছরের কঠিন মাংসল দেহ—খাসিটার চেয়েও মাংসল। ওর মাংস আরো নরম—আরো সুস্বাদু! নাটুর চোখদু'টো জ্বলতে লাগল যেন! ভিজে কাপড়ের আঁচলটায় টান দিয়ে দিয়ে আধ খোলা ক'রে বলল—

—আমার কাছে থাকবি? আমি দিব ভাত কাপড়। কিসের লেগে যাবি অত ধুরকে নদী পার হয়ে—থাক এই খেনে।

—হু—বেশ!—বারুণীর ঠোঁটের কোণায় ব্যঙ্গের হাসি ফুটল। নাটু লক্ষ্য করল না—বলল—কিষ্টকে ভাগাইয়ে দিব আমি। তু' ভাবনা করিস না কিছু; থাক এইখেনে। তুর মা'কে সের দশ চালও কাল সকালেই দিব পাঠাইয়ে। বুঝলি?

বারুণী ঘাড় নাড়ল—বুঝেছে। নাটু হেসে বলল—ময়না ছুঁড়ির ক'মাস হোল র‍্যা!

—আমি কি জানি!—বলে বারুণী উঠে দাঁড়োলো। নাটু ভাব করতে চাইছিল বারুর সঙ্গে কিন্তু ওকে দাঁড়াতে দেখে বলল—উঠলি কেনে? যাবি কুথা?

—যাব না তো তুমার ইখেনে···পথ ছাড়ো মোড়ল। ভাল হবে না বলছি! আখুনি আমি ঐ কারখানায় জমাদারকে বলে তুমার দাড়ী ছিঁড়ে ফেলা করাবো—ছাড়ো—ছাড়ো···!

নাটু প্রাণপণ বলে ওর কাপড়খানা পাক দিয়ে ধরেছে। বারুণী কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না—নিরুপায় হয়ে ও কাপড়খানা ছেড়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়ল ছুটে। নাটু চীৎকার করে উঠল—ধর—ধর শালীকে—ওরে ও কিষ্ট!

কিষ্ট আসছিল কাপড় নিয়ে। বারুণী সুমুখেই পড়ে গেল তার। অন্ধকার হলেও ঘরের লণ্ঠনটার আলোর ছটায় বারুণী লুকোতে পারল না কোনকিছুর আড়ালে। কিষ্ট ওর চুলের গোছাটা ধরে গলায় শাড়ীর পাঁচ জড়িয়ে বলল—হারামজাদী লচ্ছারী! যা কি করে যাবি—যা ইবারে! একটা লাথি মারল কিষ্ট বারুণীর পিঠে। নাটুও ইতিমধ্যে আলো নিয়ে এসে পড়েছে। আবার বারুণীকে ঠেলে ঐ ঘরেই ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। আলোটাও নিয়ে চলে গেল ওরা। অন্ধকার! নিরুপায় বারুণী নিয়তির করাল কোপে পড়েছে আজ।

চ্যাঁচালে কিছু হবে না। ভগবানকে ডেকে লাভ নাই। নিজের উপায় নিজেই করতে হবে। বারুণী রোষে-ক্ষোভে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো—আচ্ছা! দেখে লিব!

—দেখছিস কিষ্টে, দেখছিস? ছুঁড়ি কী রকম বজ্জাৎ। ন্যাংটো ছুটে পালাইছিল র‍্যা!—নাটু যেতে যেতে বলল।

—হুঁ! দেখছি না আবার গুলা! উ কি আর বশ মানবে গুলা! আবার পালাইবে! নাঃ, উকে রেখে কুনো লাভ নাই!

—সি কি কথা র‍্যা—অ্যাঁ! তুর বিয়েলি বৌ! ছাড়বি কেনে তুই?

—ছাড়তে কি চাইছি গুলা! উ যে থাকবে না। গরু বেটে কি, যে বেঁধে রাখবো!

—হুঁ—বেঁধেই রাখবো। যাক দেখি কেমন মেয়ে, দেখি আমি!

কিষ্ট চুপ করে রইল। নাটুই বলল—উপোস দিয়ে রাখবো ছুঁড়িকে।

দেখি ক'দিন থাকে ত্যাজ! হুঁ—হুঁ—বাবা, ই নাটু মোড়লের পাল্লা—জানে না তো! কত হারামজাদীকে দিলুম টিট করে! ই তো কুন ছার!—নাটু অহঙ্কারে দাড়ীটা চুমরে নিল একদফা।

বৈঠকখানায় ওরা সব নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানছে। নাটু ঢুকেই বলল, —চাবিতালা দিয়ে এলুম। থাকুক আখুন দু'চারদিন অমনি। কি বল সব?

—হুঁ—হুঁ! তুমি যা করবে মোড়ল তার উপর আবার কথা কি!—ওরা বলল সমস্বরে।

কিষ্ট বসল মাটিতে আর ওরা সব কাঠের তক্তাপোষখানায়। ওরা সবাই নাটুর অনুগ্রহপ্রার্থী। কতকগুলো কাপড় এসেছে সদর থেকে—আগামী কাল দুঃস্থ-নিরন্ন বস্ত্রহীনদের তাই বিলি করা হবে। বিলির ভার নাটুর উপর। তাই ওরা নাটুর খোসামোদী করে কাপড় পাবার ব্যবস্থাটা আজই পাকা করে রাখতে চায়। নাটু বলল—হুঁ, কত যে কাজ আমার—দাও ছিলিমটো—কাল আবার শালার কাপড় বিলি কত্তে হবে। কাকে কাকে যে দিব—লিষ্টি কর দেখিনি।

কুমদীশ তৈরীই ছিল—পেনসিলটা নিয়ে বলল—হুঁ, এই ধর ভদ্দর লোকদের মধ্যে নকু চক্কোত্তির বুন আর মেয়েটো, আর রাখাল অধিকারীর ছেলের বৌ আর আমাদের পাড়ার আদুরের মা, ক্ষেন্তী আর তার পিসি আর মা, আর আমাদের শান্ত দাদার বৌ, আর·

—থাম্, থাম। ই রকম কল্লে কি আর হিসেব হয়! উসব আমিই ঠিক করছি। আর পাঁচ জনা তো আছে। যাতে কেউ কিছু মনে না করে, তাই কত্তে হবে। তুমাদের ক'জনা আজই লিয়ে লাও ভাই। খান পঞ্চাশেক আছে কাপড় সবশুদ্ধু। তা' তুমরা পাঁচজনা লাও পাঁচ জুড়া—তা বই যার যা থাকে—হুঁ—বামুন পাড়ায় নকুর ঘর—রাখাল ঠাকুরের ঘর—গিরীশ জ্যেঠার ঘর আর তারণ ঠাকুরের ঘরে দিতেই হবে।

—তারণ ঠাকুর! উ তো চাকরী কচ্ছে। উখেনে কেনে আবার?

—চাকরী না ছাই কচ্ছে। বৌটোর যা ছিঁড়া কাপড় দেখলুম সিদিন! মাথায় দু'মাস হয়তো ত্যাল পড়ে লাই। মাটির কলসী নিয়ে জল আনতে যায়। পিতলেরটো হয়ত বন্ধক দিয়েছে—না হয় বিচেছে—ওদেরও কষ্ট খুব। কত দিন নাকি উনুনই জ্বলে না। কিছু বলতে পারে না কাউকে। ভদ্দর লুকের যে অনেক জ্বালা!

—না হে, তারণ সিদিন পাঁচ টাকা পাঠাইছে ডাকে।

—পাঁচ টাকা! পাঁচটা টাকায় ক'দিন চলে হ্যা? টাকায় দেড়পো চাল—খেতে দুটো লুক—বোন আর বৌ। পাঁচ টাকায় ক'দিন চলে?

—কালই রান্না হয় নাই শুনলুম!—নাটু বলল—তারণ ঠাকুরকে হাতে রাখা চাই—বুঝলে! উ যদি একটো বক্তিতে করে, তা'হলে জজ-ম্যাজিষ্টরের মাথা ঘুরে যায়!

—হুঁ! সি কথা খাঁটি সত্যি। কী সুন্দর পদ্য যে লিখে! সিবার উই তো গাজনের সুময় লিখে দিয়েছিল গায়েনের পালাটি। সেই যে রে—রাজু গাইল জহ্নুমুনির গঙ্গাপান।—

—সি আবার কি র‍্যা?—শুধুলো হরি।

—জানিস না? সিবার উপাড়ার লুক সঙ দিল যে মা গঙ্গা সগ গ থেকে নেমে ঐরাবৎকে নাকানি চুবানি খইছে—ঐরাবৎ আমরা। তারণ ঠাকুরকে রাজু ধরলো—জবাব লিখে দিতে হবে—তারণ লিখে দিল—মা গঙ্গাকে জহ্নুমুনি গণ্ডুষে গিলে ফেলাইছে! রাজু সেজেছিল জহ্নুমুনি! তার জুবাব উপাড়ার লুক আখুনো দিতে পারে নাই।

—হঁ—হঁ! বেটে; নিখেছিল—আজকাল নাকি খবরের কাগজে নিখছে! সিদিন শুনলোম, নিখে নাকি টাকা পায়।

—যা—মিথ্যুক! নিখে টাকা পায়—হুঁ! তা'হলে আর ভাবনা ছিল না কিছু!

—হুঁ ব্যা—পায়। না হলে চলছে কি করে?

—চলছে কুথা আবার! দিদিটো কেঁদে কেঁদে বেড়াইছে। আজই দেখলাম, চাল কিনতে বেরিইছিল, পেল না কুথাও! এতটুকু একটো ছিঁড়া কাপড়। বৌটো বারই হয় না ঘর থেকে। একটো মোটে শাড়ী, তাও বিশ জায়গায় সেলাই। চলছে, না কচু!

—আচ্ছা, নিখ—নিখ—তারণ ঠাকুরের বৌ আর দিদি—একজুড়া করে।—নাটু বলল।

—লিবে নাই ওরা—বলল কিষ্ট—না খেয়ে মরে গেলেও লিবে নাই। আমি জানি দিদি ঠাকরোণকে। অভাব খুব আছে, ঠাকুর টাকা পায়াইতে লারে ঠিক মতন—কিন্তুক রিলিফের কাপড় দিদিঠাকরোণ লিবে নাই কিছুতেই!

—না লেয় তো না লিলো। তার কি করা যাবে হে? লিখ তো আখুন!

অতঃপর গাঁয়ের আরো কয়েকজন লোকের নাম—যাদের অনুগৃহীত রাখলে নাটু এবং মাতব্বর ক'জনের সুবিধা হতে পারবে, তাদেরই নাম লেখা হোল লিষ্টে। নাটু শেষে বলল—তুমাদের চাল কারু চাই নাকি হে আজ?

—হ্যাঁ—আমাকে সের দশ দিতেই হবে।

—আমাকেও সের দশ।

—আমার আবার জামাইটো এসেছে আজ! হারামজাদা আসবার যেন সুসময় পেল না! দশ সেরে হবে নাই মোডল—সের পনর দাও!

সবাই চালের কাঙাল। নাটু খাতা বার করলো। তিনগুণ চাল আগামী সালের চালের থেকে দিতে হবে, লিখিয়ে নিয়ে হেসে বলল, —নিখাই রইল ভাই! তুমাদের কাছে কি আর লিতে পারব অত! আসলটাই দিও। তবে আর বেশি আমারও নাই চাল। ইবার সব সামলাও।

—তুমার নাই ? বল কি মোড়ল ! চৌদ্দখানা হালের ধান !

—আঃ, বিচলোম যে হে ! তা বই তোমাদিগে দিচ্ছি। আর কত চাল হবে ! যা কিষ্ট, তু খেয়ে লিগা—হরুর সঙ্গেই খা, আমার একটুস দেরী হবে।

নাটু চাল মেপে দিতে লাগল প্রত্যেককে। নিজের হাতে মেপে দেয়। সেরে অন্ততঃ আধ ছটাক কম দেয়—জানে সবাই, কিন্তু কিছু বললে যদি মোটে না দেয়, তারই ভয়ে কেউ কিছুই বলে না। যা দেয় দিক—দিলে হয় ! কারণ চাল আর গাঁয়ে কারো বাড়ীতে নাই। যদি কারো কিছু আছে তো সেটা নিজের খাবার জন্যে। এই নাটুই যা চাটি বেচতে পারে বা দান করতে পারে এখন।

সবাই চলে যাওয়ার পর নাটু একছিলিম গাঁজা তৈরী করলো নিজেই। কিষ্ট হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। গাঁজার দলটি দিয়ে আলো নিয়ে বেরুলো বারুণী যে ঘরে আছে সেই দিকে। ঘরটা না খুলে ভাঙা দরজার ফুটো দিয়ে দেখতে লাগল বারুণীকে। বারুণী ঘুমুচ্ছে। দরজাটা খুলে নাটু ঘরে ঢুকলো—ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করলো—ক্লান্ত বারুণী ঘুমুচ্ছে। খাসিটা বাদলার দিনে এক কোণে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। নাটু আলোটা টাঙ্গিয়ে রেখে বারুণীর পাশে এল—বারুণী ঘুমুচ্ছে তখনো—ঘুমুচ্ছে নিঃসাড়ে। খাসীরা ঘুমায়—কিন্তু নাটুরা ঘুমায় না !

* * *

ওকে চা খাইয়ে আবার শুইয়ে দিল রাজু—ঘুমো, ঘুমো তুই বোনটি, মুখটো শুকুইয়ে গেইছে ! আহা !—রাজুর স্নেহশীল অন্তর ময়নার পরিপূর্ণ মুখখানা, ময়নার জননীত্বের তরল লাবণ্য, ময়নার নিদ্রালস চক্ষুদুটির পানে চেয়ে চেয়ে মমতায় মোহময় হ'য়ে উঠছে। ময়না যে একটা গুরুতর কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে—সে কথা এখন যেন ওর মনেই পড়ছে না। বৃষ্টিটা থেমে গেছে—বাইরে মেঘমুক্ত চন্দ্রালোক। কালো আকাশ এখন

নীলাভ তুষার-সমুদ্রের মত মনে হচ্ছে—কোথাও যেন কোনো দুর্যোগ নাই—কোনো দুর্ব্বলতা নাই—কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নাই। সব সুন্দর—সুষমাময়।

রাজু আর একবার ময়নার ঘুমন্ত মুখখানা ভালো করে দেখে নিল—মা যেমন করে নিদ্রিত শিশুর মুখখানি দেখে। একখানা ছেঁড়া কাঁথা এনে ঢেকে দিল ময়নার গা'—ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে ময়নার। আলোর শিখাটা খুব কম করে কমিয়ে দিল—ময়নার ঘুমন্ত চোখে যেন অস্বস্তি না লাগে। আহা, ঘুমাক!

বাইরে বেরিয়ে এল রাজু। ওদিকে মাখনের মৃতদেহ পড়ে আছে; সকালে রাজু তাকে নদীর শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেবে। মাখনের আত্মীয় বলতে আর কেউ নেই এখানে—রাজুই করবে মুখাগ্নি। ছ'টা টাকাও রেখে গেছে মাখন। রাজুকে কিছু খরচ করতে হবে না গাঁঠ থেকে। মাখনের সৎকার করা একটা সৎকাজ। এমনি আরো কিছু সৎকাজ করবে রাজু। ভালো কাজ, পুণ্যের কাজ, যে কাজ করলে ময়নার গায়ে কোনো পাপ লাগবে না। ভগবান ময়নাকে যেন কৃপা করেন! ময়নার যেন কোন পাপ না হয়। ময়নার অর্জিত চাল-ডাল আজ কয়েকজনকে দিয়েছে রাজু—ওতে নিশ্চয় কিছু পুণ্য হয়েছে ময়নার। ঐ রকম আরো দেবে—দেবে আরো অনেককে।

কী সুন্দর জ্যোৎস্না যে উঠেছে! আহা! গভীর রাত্রির চন্দ্রালোক! এ যেন স্বর্গপুরীর চন্দ্রালোক! মাতা ধরিত্রী কোলের সব দুরন্ত ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে চাঁদের সঙ্গে যেন ভালোবাসা-বাসির কথা বলছেন। যেন সহবাস চলছে রাত্রির সঙ্গে ঐ চাঁদের। ছেলেমেয়েরা জেগে থাকলে চাঁদ এত সুন্দর হয়ে ফোটে না—রাত্রিও এত চমৎকার সাজ পরে না। রাজু একটা দস্যি ছেলে—লুকিয়ে জেগে রাজু রাত্রির

এই ফুলশয্যা দেখে নিচ্ছে—আড়ি পেতেছে যেন রাজু রাত্রি-রূপা কনে-বো-এর বাসরঘরে।

পা কয়েক এগিয়ে এল রাজু। একটা ছোট ডোবার উঁচু পাড়, সেখান থেকে ধান আর আখের ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে নদীতে যাবার রাস্তাটা দেখা যায়। নদীর মানায় কাশফুল আর শরঝোপ-গুলো দুলছে—এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছে রাজু। শরফুল এখনো ফোটে নি। ফুটলে কিন্তু চমৎকার দেখায়—ঠিক সাদা সাদা বকের মত—অসংখ্য, অগুন্তি! লতা-বিছুটির গাছগুলো ওদের জড়িয়ে কেমন আদর করে! বিছুটি লতাও দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর; সুন্দর আরো কত জিনিষ! বিষ-লাঙ্গলে ফুল—আহা! কিবা সুন্দর দেখতে! অথচ এমন সাংঘাতিক বিষ যে গেলে আর রক্ষে নাই। ওখানে বিস্তর বিষ-লাঙ্গলে ফুল ফোটে ঐ শরঝোপে। ময়না সেদিন একটা মাথার চুলে গুঁজে এনেছিল। বিষ—তাও কতো সুন্দর! বিষ হলেই যে সুন্দর হবে না—তার তো কোনো মানে নাই। গোখ্‌রো সাপ্—সেও দেখতে কত সুন্দর! সুন্দর হলেও বিষাক্ত হতে পারে। বিষও তো সুন্দর হয়! ময়না কত সুন্দর! ময়নার মত সুন্দর ক'টা মেয়ে আছে গাঁয়ে! কিন্তু ময়না আজ বিষ!···রাজু চম্‌কে উঠলো। চিন্তাটা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে! আশ্চর্য্য তো! ময়না বিষ? ময়না রাজুর জীবনটাকে বিষাক্ত করে দিল—ব্যাধিগ্রস্ত করে দিল! ওঃ—রাজু কাল সকালে আর বেরুতে পারবে না গাঁয়ে; মুখ দেখাতে পারবে না লোকের কাছে। মকর ডোম জেল থেকে ফিরে তার বাড়ী এসে আর তাড়ি খেতে চাইবে না—মকরের বাবা আর রাজুকে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে বলবে না—'ময়নাকে আমার ঘরেই দিস বাবা।' কারণ—ময়না বিষ—হলাহল! না, না, না,—ময়না কিসের জন্য বিষ হতে যাবে! ময়নাকে বিষ খাইয়ে দিয়েছে; খাইয়ে দিয়েছে ঐ নদীর ওপারের কোন এক

শয়তান, যাকে রাজু চেনে না, দেখেনি। দেখতেও চায় না। ময়না সেই গরল পান করে মুহ্যমান হয়ে গেছে, ঝিমিয়ে পড়েছে। বিবর্ণ, পাণ্ডুর হয়ে গেছে তার কচি-পাতার মত গায়ের রং। কে সেই শয়তান, রাজুর জেনে কোন লাভ নাই। জানলে কোন লাভ হবে না। ময়নার শরীর থেকে ঐ গরল রাজু বার করে ফেলবে। ময়নাকে আবার নিরাময় করে তুলবে, নিষ্কলঙ্ক করে তুলবে। সে কাজটা এমন কিছুই কঠিন নয়। অতি সহজে ঐ ঈশানের মা—গোলাপীর শাশুড়ীই সেটা করে দিতে পারে। সের দুই কি সের চারেক চাল—ব্যাস! রাজু তাই করবে। হ্যাঁ, করতে হবে তাই!

জ্যোৎস্নাকে দিনের প্রকাশ-সম্ভাবনা ভেবে কয়েকটা কাক ডেকে উঠলো কাছের বড় শিরীষ গাছটায়। কাকগুলো জ্যোৎস্না দেখে প্রতারিত হচ্ছে—নির্বোধ জানোয়ার! রাজুও বেশ প্রতারিত হয়েছে। ময়নাকে কেন সে যেতে দিল ওখানে—কেন? না খেয়ে না-হয় মরেই যেত ভাই-বোনে। একটি বিছানায় ময়নার মাথাটা কোলে নিয়ে মরেই না-হয় পড়ে থাকতো রাজু এই মাটি-মায়ের বুকে, যেমন করে একদিন ওদের মা'র গর্ভে ছিল ওরা! কিন্তু না—মরে যাবার জন্য অত দুঃখে ময়নাকে মানুষ করেনি রাজু। নিজের খাবার ময়নার মুখে তুলে দিয়ে রাজু উপোস থেকেছে কতদিন—আবার বড় হয়ে ঐ ময়নাই কতদিন নিজে না খেয়ে দাদাকে খাইয়েছে আর মিছে করে বলেছে—'খেইছি দাদা!' সে কি মরে যাবার জন্যে? বিন্দু বিন্দু করে ময়নার দেহ-সৌষ্ঠবকে বড় হতে দেখলো রাজু—ময়নার বুদ্ধিকে জোরালো হতে দেখলো রাজু, ময়নার মনকে মেয়েলি হতে দেখলো রাজু—রাজুই লালন ক'রে ওকে মেয়েলি করেছে—আপনার অন্তরের তিল-তিল স্নেহ-সুষমা দিয়ে ওকে তিলোত্তমা সৃষ্টি করেছে—সে কি মেরে ফেলবার জন্যে? —না—না, রাজু ওকে বাঁচাবে! যত পাপ হয় হোক, রাজু ময়নার দেহ থেকে ঐ তীব্র বিষ বার করে দেবে, মুক্ত করে দেবে ময়নাকে—কলঙ্কমুক্ত করে দেবে।

মাথাটা কেমন টিপ্‌টিপ্‌ করছে—ধরেছে নাকি? লম্বা চুলগুলোয় হাত দিয়ে কয়েকটা খাম্‌চি কাটলো রাজু। দু'চার গাছা চুল ছিঁড়ে এল হাতে! আজ সারাদিন রাত মাথায় চিরুণী দেয়নি। জটা বেঁধে গেছে চুল গুলোতে! যাক্‌ গে! রাজুর এখন ওসব ভাববার সময় নাই। রাজু এগুলো আরো।

ডোবার এদিকে পথ, যে-পথ ইষ্টিশনে গেছে—আর যে পথ শাখা মেলে গেছে ঐ নদীর দিকে। এইখানেই সেই পথের তেমাথা। কত লোক ভূত ছাড়ায়—পেঁচো পাওয়া মেয়েদের স্নান করিয়ে নিয়ে যায় গভীর রাত্রে—কত লোক শনির পূজো করে এইখানটায়। তেমাথা পথেই নাকি এই সব করতে হয়। ঠিক ঐখানেই বড় শিরীষ গাছটা কালো ছায়া মেলে রয়েছে। এটা গ্রামের প্রায় প্রান্তদেশ—খানিকটা দূরে গাঁয়ের বালিকা-বিদ্যালয়ের সাদা বাড়ীটার দেওয়াল জ্যোৎস্না মেখে হাসছে যেন—ছোট্ট মেয়েদের যূঁইফুলের মত হাসি যেন ওর গায়ে ছড়ানো। মড়ক পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্কুলটা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু। বেঞ্চি, টেবিল, চেয়ার খালি পড়ে থাকে আজকাল। রাজু এপাশ থেকে দেখতে পেল, যেন কে কাৎরাচ্ছে ঐ স্কুলবাড়ীর বারান্দায়। কে? দেখতে হোল! রাজু এগিয়ে এল ঐদিকে। হ্যাঁ—কাতরাচ্ছে জন দুই লোক—শীর্ণ কঙ্কাল—কিন্তু জীবন্ত! জীবন যেন ওদের বন্দী করে রেখেছে এই ধরার কারাগারে—কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। ওরা অপরাধী, তাই জীবন-দেবতা ওদের ধরে শাস্তি দিচ্ছেন। ওরা ভয়ানক ভয়ানক অপরাধ করেছে! কী সে অপরাধ?—তারণ ঠাকুর লিখেছে তার বইটায়—ঐ "কদম ফুল" বইটায়।—"এই মানুষগুলো অপরাধী—অপরাধী জীবন-দেবতার কাছে! কত শতাব্দি ধরে ওরা সোনার পিঞ্জরে হীরের দাঁড়ে বসে চাল, ছোলা ছাতু খেয়ে জীবন রক্ষা করে এসেছে। জীবনকে বন্দী করে ওরা দেহের বিলাস আর মনের আরাম অর্জ্জন করেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল, পরপদলেহনের

আগ্রহ—আর পরাশ্রয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ জীবন রক্ষায় ওরা একনিষ্ঠ হয়ে সাধনাই করেছে। ওরা একবার ভাবতেই চায় নি,—ওদের জীবন-দেবতা কোনো দিন প্রতিশোধ নিতে পারে—কোনো দিন কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারে—কেন এমন করে জীবন রক্ষা করেছে! ওরা অপরাধী—ওদের আত্মার কাছে অপরাধী, যে আত্মাকে ওরা বিক্রী করেছে—বন্ধক দিয়েছে—সেই আত্মা আজ প্রতিশোধ নিচ্ছেন—ওদের মরতে দেবেন না। মৃত্যুর আশীর্ব্বাদ পেতে দেবেন না—তাই কঙ্কালের মধ্যেই ওদের জীবনকে বন্দী করে রেখেছেন!

কিন্তু অপরাধ কি ওদেরই? হ্যাঁ, ওদেরই; ওদেরই পূর্ব্বপুরুষের, ওদেরই বংশধারার, ওদেরই গতজন্মের, ইহজন্মের। ওদেরই মধ্য থেকে ধনী হয়ে কেউ ওদেরই খাবার আত্মসাৎ করেছে, ওদেরই মধ্যের কেউবা ক্ষমতার গর্ব্বে অন্ধ হয়ে ওদেরই মুখের গ্রাস বন্ধ করেছে। ওদেরই মধ্যের কেউ হয়তো এই মন্বন্তরের সুযোগে ধনী হয়ে উঠলো। ওরাই অপরাধী—ওরা, ঐ যারা মরবার জন্য ব্যাকুল চীৎকার করছে, অথচ মরতে পারছে না! প্রতিশোধ!—জীবনদেবতার নির্ম্মম প্রতিশোধ"—ঠিকই লিখেছে তারণ ঠাকুর!—রাজু আরো এগিয়ে এল। গোটা দশ-পনের মৃতদেহ এদিক ওদিক গড়াচ্ছে—বৃষ্টির আগে, হয়তো দিনের বেলা রোদের ভয়ে ওরা আশ্রয় নিয়েছিল এই ফাঁকা বারান্দায়। ওদের শাস্তি হয়ে গেছে; ওরা মুক্তি পেয়েছে। জীবন-দেবতা সার-বন্দী করে ওদের মরণের বীথিকায় সাজিয়ে দিয়েছেন! বাঃ, চমৎকার বিচার তো তাঁর!—রাজু নমস্কার করলো হাত তুলে। ওরাই ওদের জীবনের জন্য দায়ী ছিল,—ওরাই ওদের মরণের জন্য দায়ী হয়ে রইল। ওদের বিচার হয়ে গেছে—মৃত্যুদণ্ড! ওরা অখাদ্য খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছে—ভিক্ষা করে খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছে—না-খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছে—তবু অধর্ম্ম করেনি, অপকর্ম্ম করেনি, অনিষ্ট করেনি কারো। যাদের গোলা-ভরা ধান আর

বস্তা-বোঝাই আটা-ময়দা টাকার বানভাসী এনে দিল—ওরা তাদের শক্তির কাছে শুধু কাতর চোখে চেয়ে থেকেছে; তাদের ভাগ্যকে ঈর্ষা করেনি পর্য্যন্ত! ঐ ওদেরই মধ্যে যারা অর্থের অপব্যয়ে আজ অজর—অমর বলে ভাবছে নিজেদিকে—এই মৃতদেরই আত্মীয় তারা—ভাই, সহোদর ভাই, এক দেশমাতার গর্ভজাত ভাই—তারা নিশ্চিন্তে, নির্ব্বিকল্পে তাকিয়ে দেখল এই মরণের মাধুর্য্য, আদালতে যেমন করে বিচারাধীন আসামীকে দেখে কৌতূহলী জনতা!

কারো কারো আবার বাহাদুরী নেবার সখ আছে। সাউথুড়ি করে তারা লঙ্গরখানার লম্বাচওড়া খ্যাতি অর্জ্জন করে নিল। পুণ্যিও সঞ্চয় করে নিল কিছু। ওরা ভেবে দেখল না, এই মহিমময় মৃত্যুর জন্য দায়ী ওরাই। জীবন-দেবতার এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে যারা মৃত্যুর মধ্যে মুক্তি পেল—তারা মুক্তিই পেয়ে গেল, কিন্তু তাদের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে যারা জীবনকে রাখল বন্দী করে—জীবন-দেবতার রুদ্র রোষ, সূক্ষ্ম বিচার তাদের ছেড়ে কথা কইবে না—তারাও সব একদিন সমান হয়ে যাবে—সমতল হয়ে যাবে—শ্মশান হয়ে যাবে!

শ্মশানই তো—শ্মশানেই এমনি করে সব সমান হয়ে যায়। মরণের শ্মশান নয়—জীবনের শ্মশান—। জীবন সেদিন মানবজগতকে সমতলে নামিয়ে আনবে—আনবেই। জীবনের সাধনা, বেঁচে থাকার সাধনা—বেঁচে থাকবার জন্য বড়র আওতা সে রাখবে না—তার নিজের পুষ্টির জন্য বড়কে সে নির্ম্মূল করে দেবে, যেমন করে নদীর কিনারার শরঝোপগুলো সমস্ত বড় গাছকে নির্ম্মমভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। অমনি করে জীবন একদিন যুদ্ধ করে সবকে সমান করে দেবে, শ্মশান করে দেবে। শ্মশান—মানে সব যেখানে সমান। যে পুণ্যভূমিতে ধনী-দরিদ্রের, বড়-ছোটর—পণ্ডিত-মূর্খের তফাৎ নাই।—

কিন্তু তা কেমন করে হবে?—তারণ ঠাকুর লিখেছে, "তা হবার নয়"—নয়ই তো! রাজুরও তাই মত। সব সমান হতে পারে না—হয় না কখনো! বড় বাবুর মায়ের চিতায় দুমণ চন্দন কাঠ পোড়ে—মাখনের চিতা গোটা কয়েক তাল-বাগড়ো দিয়ে রচনা করা হবে। গিরীশ পণ্ডিতের চিতার উপর একটা ইটের স্তূপ তুলছে গাঁয়ের ছোকরারা—এই রকম আর একটা স্তূপ—ঐ খদ্দর পরে বক্তৃতা করতো, কি যে নাম—মহেন্দ্র বাবু—তার চিতায় তুলবার জন্য নাকি চাঁদা তোলা হচ্ছে। শ্মশানেও তো সব সমান হয় না তা'হলে! হতে পারে না! সব সমান হবে কি করে? সবাই কি আর মধু গনের মত ব্যবসা করতে পারে—না, গঙ্গা ময়রার মত জিলেপী বানাতে পারে! রামু ছুতোর কাঠের একেকটা কাজ করে যেন কাশ্মীরী কাজ—আর কেউ পারে না যে অমন! কাশী বাঁড়ুয্যে যে রকম করে সুদ আদায় করতে পারে—দশটা টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে দু শ' টাকার দাবী দিয়ে লোকের ভিটেমাটি নীলেম করে নিতে পারে—আর কেউ যে অমন পারে না গাঁয়ে! আবার বাবুদের ছোট বৌমা নিজের পাতের ভাত তুলে লোকের মুখে ধরে দেয়—উপোস থেকে। লুকিয়ে লোকের আঁচলের খুঁটে চাল বেঁধে দেয়—আর কে দেয় অমন! হুঁ—সমান হবে—না আরো কিছু! —ঠিক লিখেছে তারণ ঠাকুর—কোন্ দেশে নাকি সব সমান হবার চেষ্টা হচ্ছে। সে হয়তো স্বাধীন দেশ; সে দেশের সবাই হয়তো এ ওর দুঃখ দেখে—না দেখলে পাপ হবে মনে করে—না-হয়তো আইনে শাস্তি হতে পারে—আর না হয়, অন্য কিছুর লোভ দেখিয়ে সব সমান করা হচ্ছে। ইখানে তা কি করে হতে পারে মশাই? কোনো মানুষ লোভী, কোনো মানুষ রাগী, কোনো মানুষ চোর—কোনো মানুষ সাধু। কেউবা লম্পট, কেউ আবার পরের মেয়েকে মা মনে করে। এই সবকে এক করে দাও; সব সমান কর! ঐ

কারখানার মালিকরা আর মজুররা সব এক সারিতে পাতা পেড়ে ভাত খাবে—হুঁ, যত আজগুবি! তবে হ্যাঁ—সমান করতে পারে একজন—মৃত্যুরাজ—যমরাজ—রাজাধিরাজ শমনরাজ! ওর কাছে কারো চালাকীর ঘোটি নাই বাবা! সাত পুর গদীপাতা বিছানাতে শুয়েই মর—আর গো-ভাগাড়ে পড়েই মর, মরতে তোমাকে হবেই; উখেনে বাবা এডান নাই। সব সমান যদি কেউ করতে পারে তো ঐ একজন—শমনরাজ!—ঐ তো—ঐতো মরলো! আহা, গেল—হয়ে গেল! ও মুক্তি পেয়ে গেল। বাপ্‌রে! কী কষ্ট যে পাচ্ছিল ও! আহা, মরে জুড়ুলো—কিন্তু আর একটা ধুঁকছে, এখনো ওর শাস্তি শেষ হয়নি—ওর পাপ এখনো রয়েছে!—'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম'—শুনুক, শুনুক একটু ঠাকুর-নাম—যদি ওর পাপটা ক্ষয় হয়ে যায় শীগ্‌গির—হরিবোল—হরিবোল—জয় বাবা তারকনাথ—!

একটা খেঁকী কুকুর—হয়তো পিঠে ঘা হয়েছে—চেঁচাচ্ছে। মরবে বোধ হয়! মরুক—মরে জুড়োক। ও-ও তো খেতে পায় না—ওরও পাপ আছে! আছে বৈকী। নইলে পায় না কেন খেতে? জীবন-দেবতা ওকেও বাদ দেবেন না শাস্তি থেকে, রেহাই নাই—ও এত কাল মানুষের দুয়ারে দাসত্ব করে জীবন রক্ষা করে এসেছে—সেই ওর পাপ! ও অনায়াসে বনে চলে যেতে পারতো—বন্য হয়ে যেতে পারতো। বেঁচে থাকবার জন্য ওর দাসত্ব করার দরকার ছিল না কিছু। ঐ বালিকা-বিদ্যালয়ের মেয়েগুলোর খাবারের ঠোঙা চেটে ও এতকাল কেন বাঁচলো? সেই ওর অপরাধ! ও মরুক—মরে জুড়োক। ওর দাসত্বের জীবন শেষ হোক—এবার যেন স্বাধীন দেশে জন্মায়—স্বাধীন হয়ে যেন জীবনের উপাসনা করে—ঐ কুকুরটা, এই মানুষগুলো—এই এরা সব, যারা মরলো! জীবনকে রাখবার জন্য তারা যেন জীবনেরই পূজো করে—সুস্থ, সবল, স্বাধীন জীবনের—যে জীবন নিষ্পাপ করে তাদের বাঁচিয়ে

রাখতে পারবে। যে জীবনকে বেঁচে থাকার দাসত্ব করতে হবে না শৃঙ্খলিত হয়ে—বন্দী হয়ে!

কুকুরটা তো এখন মরবে না—ওর পাপ অনেক বেশি! কিন্তু ঐ দ্বিতীয় কঙ্কালটা মরছে! জল খাবার জন্যে হাঁ করছে যে! এখনো জল খেয়ে ওর বাঁচবার চেষ্টা! আশ্চর্য্য! বেঁচে থাকার বাসনা কতখানি উগ্র? কী ভয়ঙ্কর এই বেঁচে থাকার সাধনা! দেবে নাকি এক আঁজলা জল রাজু! দিলে কী আর এমন মন্দ হবে? আরো খানিকক্ষণ বেশি বেঁচে থাকবে—খানিকটা বেশি শাস্তি ভোগ হবে ওর পাপের—যেমন লঙ্গরখানা খুলে কয়েক লক্ষকে কিছু বেশি জীবনের ভোগান্তি ভোগান হচ্ছে! দিল রাজু এক আঁজলা জল এনে। আহা, খাচ্ছে দেখ। গলায় গলছে না তবু কী তৃপ্তি! চোখ দু'টো যেন কথা কইছে আনন্দে! কাদাজল এক গণ্ডুষ, তাই কি রকম চেটে চেটে মধুচাটা করে খাচ্ছে! আরো খানিকক্ষণ বাঁচবে ও! ওর শাস্তিটা রাজু বাড়িয়ে দিল—অন্যায় করলো নাকি? পাপ করলো রাজু! কে জানে? ওর ভাগ্য-বিধাতার এইটাই ইচ্ছে বোধ হয়। নইলে এত রাত্রে রাজু এখানে আসবে কেন!

রাজু ফিরলো! সারি সারি মড়া পড়ে আছে কয়েকটা—একটা ছেলের গায়ের খানিকটা ঐ খেঁকীটা খেয়েছে। দু'টো শিয়াল একটাকে নিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসেছে! বেশ আছে ঐ শেয়ালগুলো! ওরা জীবনের জন্য কারো দাসত্ব করে না। জীবনই ওদের দাসত্ব করে। ওদের কাছে সেই যে কবিতা আছে—'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'··· খাঁটি সত্য কথা! জীবন দেবতা ওদের উপর প্রসন্ন—ওদের প্রচুর খাদ্য দিচ্ছেন—পরম যত্নে রেখেছেন। ওরা বনের স্বাধীন জানোয়ার—কুকুরের মত দাসত্ব করে না মানুষ-রাজার। পাত চেটে জীবন রক্ষার চেষ্টা করে না—না পেলে না খেয়ে মরে—তবু লোভী মানুষের

দ্বারস্থ হয় না। ওরা জীবন-দেবতার সত্যি উপাসনা করে—ওরা স্বাধীন!

ভোরের বাতাস বইছে—চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস, ফুলের গন্ধ মেশানো বাতাস! ধরিত্রী-রাণীর কুসুম-বাসর শেষ হল—চাঁদ-বর এবার চলে যাবেন। ঐ পশ্চিমের ধান ক্ষেতের ওদিকে তিনি বিদায়ী সম্ভাষণ জানাচ্ছেন রাত্রিকে! রাত্রিও এবার লুকিয়ে পড়বে কচি, নব-বিবাহিতা বধূর মত, কিন্তু দিনের অভিসার-কাল আসন্ন—আসন্ন ময়নারও অভিসার-কাল—! রাজু চমকে উঠলো। উঠেছে এতক্ষণ ময়না, অভিসারে যাবার সব আয়োজন করছে হয়তো। ময়নাও যাবে অভিসারে—কিন্তু কার কাছে? সে তো সূর্য্য নয়—সে যে পঙ্ককুণ্ডের অধিবাসী একটা বিষাক্ত সাপ। তবু ময়না যাবে,—যাবে সেই সাপের বিষ পান করতে। ওহো—ও! না—ময়নাকে আর যেতে দেবে না রাজু আজ! ত্বরিতে ফিরে এল রাজু ঘরে। ময়না সত্যি উঠেছে। উনুনে কি চড়িয়েছে! রাজু বলল—তুর গা' ভাল নাই ময়না—আজ আর যাস নে!

—দেখি, বারুও তো এল না আখুনো!

—এলেও যাবি না তু!—ময়না চুপ করে রইল।

রাত্রি শেষের পাখীর কাকলী ছাপিয়ে কান্নার কলরোল উঠলো অকস্মাৎ! সদ্যমৃত আত্মীয়ের জন্য শোকার্ত পরিবারের পরিবেদনা—, মন্দাক্রান্তা ছন্দে ক্রন্দন! কোথায় কে আবার মরলো হয়তো! কান্নাটা অনেক দূর থেকে আসছে—তাঁতীপাড়ার ওদিকে নয়, বোরেগী পাড়ার দিক থেকেই আসছে শব্দটা। ময়না কুঁড়ে থেকে বাইরে এসে কাণ পেতে শুনলো খানিকক্ষণ, তারপর বলল—কে জানে গা কে আবার মলো!

রাজু একটা দাঁতন কাঠি দিয়ে দাঁত ঘসছিল, বলল—মরুক—যা তুই

চা কর। মরছে তো সবাই; উ আর ভেবে কি করবি! মাখন জ্যেঠাকে পুড়াতে হবে—যা চট্ করে!

—আজ তাহলে খাটতে যাব না দাদা—লয়? থাক গা!

—না, তুর গা' ভাল নাই। আব বারুণীও তো আসলো না আখুনো—থাক গা!

ময়না আর কোনো কথা না বলে ঘরে ঢুকে খান কয়েক রুটি সেঁকলো! বাজু ইতিমধ্যে মুখ ধুয়ে এসেছে। একখানা চিনেমাটির ছককাটা প্লেট—একটা ভালো কাচের গ্লাস—একটা ভালো কাপ ধুয়ে ময়না দাদার জন্যে চা রুটি এগিয়ে দিল!

—ই গুলন পেলি কুথা?—শুধুলো বাজু খেতে খেতে!

—ঐ উখেনেই। মিলা জিনিষ দাদা—উদেব কি কিছু অভাব আছে! বাজা সব উরা!

—হুঁ—! রাজু চা দিয়ে রুটিটা গলিয়ে নিল—আটকে যাচ্ছিল যেন!

—তুর মুনিবের নামটো কি ব্যা ময়না?

—ঠিকেদার সাহেব। কেনে দাদা?—নাম নিয়ে কি করবে?—ময়না যেন ভয় পেয়েছে একটু!

—করবো কি আব! এমনি শুধুইছি! দেখতে ক্যামোন? চেহাবা ভালো তো?

—হুঁ—দেখতে যেন রাজপুত্তুর! তবে লুক ভাল কি না কি করে জানবো দাদা!—ময়না যেন আশ্বস্ত হোল!

—একদিন যাব দিখা করতে!

—হুঁ! তুমি যেমন দাদা, দিখা করবে! উওদেব বলে সেই সায়েবী মিজাজ! না দাদা—যেও না!

রাজু চা-খাওয়া শেষ করে বলল,—লে, খেয়ে লে, তা-বই চল' জ্যেঠাকে পুড়াতে হবে!

—হুঁ—ময়না খেতে লাগল! সকাল হয়ে গেছে। ময়না তার ছেঁড়া কাপড়খানা অতি যত্নে এমন করে পরেছে যে তার মুখ-হাত-পা ছাড়া কোথাও আর কিছু নজরে পড়ে না। রাজু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ওকে আর একবার দেখে নিতে চাইল এই দীপ্ত দিবালোকে। গ্রামের পূর্ব প্রান্তে ওদের বাড়ী, কাজেই প্রাতঃসূর্য্যের প্রথম অভিনন্দন ওদেরই উঠোনে এসে হাসতে থাকে! দাদাকে তাকাতে দেখে ময়না আরও গুটিয়ে গেল। কুঁকড়ে উবু হয়ে খেতে লাগল। রাজু নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে মাখনকে পোড়াবার আয়োজনে লাগল গিয়ে। খাট নাই, বাঁশও নাই বেশী; কয়েকখানা তালবাগড়ো রয়েছে; রাজু সেইগুলো একত্র করে একগাছা খড়ের লেয়ালী-দড়ি দিয়ে বেঁধে মাখনকে টেনে বার করলো ঘর থেকে! তালবাগড়োগুলোর উপর মাখনের দেহটা রেখে আবাব বাঁধলো দড়ি দিয়ে—তারপর ময়নাকে বলল—তুখে যেতে হবে না!

—তুমি ইকা লিয়ে যেতে পারবে কেনে দাদা?

—ছেঁচড়ে লিয়ে যাব। দে, চাট্টি কাঠ দে।

—না দাদা, চল, কাঠ আমি লিয়ে যাই!

—না!···রাজু সুদৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করলো—কথাটা ধমকানিব মত শোনালো ময়নার কাণে।

ময়না নিশ্চুপ হয়ে গেল। দাদার মুখ থেকে ধমক ও কখনো খায় নি। দাদা ওর পরম স্নেহশীল মানুষ। ময়না এক বোঝা শুকনো কাঠ দিল। সেগুলোও ঐ তালবাগড়োর উপর বেঁধে নিয়ে রাজু ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চললো মাখনের মৃতদেহ! শব্দ হচ্ছে একটা ছড়-ছড় করে। উপরে আকাশে হাউই-জাহাজ গেলে যেমন শব্দ হয়—ঠিক তেমনি। নীচে মাখনও যেন তালবাগড়োর জাহাজে স্বর্গে চলেছে! বৃদ্ধ মানুষের শীর্ণ দেহ। রাজু অবাধে টেনে নিয়ে চলল; এল নদী কিনারে শ্মশানে।

কয়েকটা বাবলা-গাছের ফাঁকে ফাঁকে মানুষের অন্তিমদিনের অঙ্গার পড়ে আছে! ওরই একটায় মাখনকে তুলে জ্বালিয়ে দেবে রাজু—কিন্তু আরও একটা কাকে যেন পোড়াতে এনেছে—ঐ ওদিকে খানিকটা দূরে। কে আবার মরলো। ও—! যারা কাঁদছিল সকাল বেলা, তাদের কেউ। কিন্তু কে?—রাজু মাখনকেও টেনে নিয়ে ঐ দিকেই এগিয়ে গেল! একটা ছোট টীলার আড়ালে ডোবামত যায়গা, সেইখানেই চিতা সাজানো হয়েছে—আর চিতার উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে ঈশান! আহা! ঈশান তাহ'লে মরে গেল! মুখাগ্নি করবে গোলাপী, কিন্তু ভীষণ কাঁদছে মেয়েটা—"ওগো রাজা আমার গো, আমাকে ছেড়ে কুথা চল্লে গো···"! করুণ একটানা কান্না। কাঁদছে আধবুড়ি সেই মা মাগীও! ঈশানের জন্যে বুক ওদের ফেটে যাচ্ছে নাকি! মাখনকে ছেড়ে রাজু খানিকটা আরো এগিয়ে এল! মড়াটা যে ক'জন বয়ে এনেছে তারাই জ্বালাবার সব ব্যবস্থা করছে। সকালের রোদের আলোতে ঈশানের ফর্সা রং কেমন যেন নীলাভ দেখাচ্ছে, মুখখানা হাঁ হয়ে রয়েছে, কিন্তু নীল! ভালো করে তাকিয়ে দেখলো রাজু—নীল—নীল হয়ে গেছে ঈশান। কী মনে করে ও যেন চমকে উঠলো। মুখাগ্নি সেরে গোলাপী ইতিমধ্যে সরে এসেছে। দাউদাউ করে চিতা জ্বলে উঠলো! ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল ঈশানের দেহখানা। যাক্—আর যারা মরেছে বা মরছে তাদের ক'জনাই বা আগুন পাচ্ছে? ঈশান তবু পেল, আর পেল ওর বৌ-এর হাতেই; সহধর্ম্মিণীর হাতেই। কাল সন্ধ্যায় শোনা কুন্তীর কথাগুলো মনে পড়ে গেল রাজুর। সহধর্ম্মিণী—হাঁ, বিয়েলি বৌ তো গোলাপী ওর; কিন্তু নীল রং—এত তাড়াতাড়ি লাস জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা—রাজুর কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। বিষ দিয়ে হত্যা নয় তো? কিন্তু ঈশানের মাও কাঁদছে! রাজুর হঠাৎ মনে পড়ল—বুড়ি ঈশানের সৎমা, গর্ভধারিণী নয়। ওঃ, তাহলে বিষ খাইয়েই গোলাপী পথের কাঁটা দূর করে দিল; এবার বেঁচে থাকবার সাধনা করবে নাটুকে নিয়ে। বাঃ।

রাজুকে দেখে গোলাপী ছুটে এল—"কি হোল আমার—কি হোল রাজু দাদা গো···"

"থাম হারামজাদী নচ্ছারী—তুর সব গুণের কথা জানা আছে আমার"—রাজু মনে মনে আওড়ালো। ঈশানের মাও বলছে—"ওরে বাবা রাজু—তুর খেলার সঙ্গীকে ডেকে আন গা বে·· ও বাবা রাজু, আমার ঈশেন কুথা গেল রে···। রাজুর সমস্ত অন্তর বিষাক্ত হয়ে উঠলো এক মুহূর্ত্তে। পায়ের কাছে গোলাপী কাঁদছে, রাজু প্রচণ্ড একটা পদাঘাত করে ফেলল তার পিঠে —ভাগ হারামজাদী কুথাকার! রংতামাসা পেইছিস। বিষ খাইলি নিজের হাতে!—কতকটা আকস্মিক ভাবেই থেমে গেল গোলাপী। জলভরা চোখ তুলেই কাটা-কাটা কথায় বলল—ই সব কি বলচো রাজু দাদা—ই সব কি কথা তুমার!

রাজু কোনো কথা না বলে মাখনের দেহটা টেনে নিয়ে চলে এল নদীর বালির উপর! দেশলাই কাছেই ছিল, জ্বালিয়ে দিল মাখনের দেহখানা। এই কয়েকটা-তালপাতায় সব দেহটা হয়তো পুড়বে না; যতটা পোড়ে পুড়ুক —রাজু আর অপেক্ষা করতে পারছে না! অজয়ের জলে নামলো স্নান করতে! ওর শিক্ষায়-অভিজাত মন সইতে পারছে না যেন আর এই ভণ্ডামী।

গোলাপীর বাবা, ভাই, আর ঈশানেরই এক কাকা ঈশানের দেহটা পোড়াচ্ছে। দেহখানা কুঁকড়ে উঠছে আগুনের তাতে; হাত-পাগুলোর শিরায় টান ধরায় মড়াটা উঠে বসতে চাইছে। মোটা একটা বাঁশ দিয়ে সেটাকে চেপে ধরলো ওরা। দুম্‌দাম বাড়ী মারতে লাগলো ঈশানের দেহের উপর—দেখতে পাচ্ছে রাজু। ঈশানকে ওরা নিঃশেষ করে পুড়িয়ে ছাড়বে, একেবারে ভস্ম করে দেবে ঈশানের দেহ! ওদিকে গোলাপীর শাঁখা-নোয়া ভাঙবার জন্য ঐ বুড়িটা ওকে টেনে নিয়ে আসছে অজয়ের জলে, রাজুরই কাছ দিকে! রাজু জলে নেমে গেল। স্নানটা সেরেই ও পালাতে চায়।

অজয়ের জল বেড়েছে কিছুটা। কাল রাতের বৃষ্টির জন্যই হয়তো! ময়না আজ নদী পার হয় নি—ভালই হয়েছে। ময়নাকে শ্মশানে আনলো না রাজু। আনলে হয়তো মাখনকে ভাল করে দু'জনে পুড়িয়ে দিতে পারতো। কিন্তু না—ময়না অন্তঃস্বত্বা। শ্মশানে আসা ওর এখন বারণ—রাজু ডুব দিল জলে! "গঙ্গা গঙ্গা! মাগো পতিত পাবনি"—রাজু স্মরণ করলো মাতা ভাগীরথীকে। সর্ব্বপাপ সংহন্ত্রী, সদ্যদুঃখ বিনাশিনী মা গঙ্গার কোলে মিলেছে গিয়ে এই অজয়। রাজু উঠে আসছে,—ওদিকে কী ভীষণ কান্নাই না জুড়েছে গোলাপী! উঃ, খামোখা মানুষ এমন করে কাঁদতে পারে! এত চোখের জল ফেলতে পারে মিছেমিছি! এমন নিরুপম অভিনয় করতে পারে মানুষ! হ্যাঁ, ঈশানের স্বাভাবিক মৃত্যু হলে গোলাপীর কান্নাটাও স্বাভাবিক হোত! কিন্তু একি কান্না! নদীর সাদা-বালীর উপর গড়িয়ে গড়িয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে চীৎকার। দূর করো! রাজু গট্‌গট্ করে ফিরতে লাগল। ময়না ভাবছে হয়তো—দাদা ওকে শ্মশানে কেন সঙ্গে নিল না—দাদা যে সব জেনে ফেলেছে বোনটি; শ্মশানে তোকে আর আনবে কি করে!

কিন্তু ময়নার গর্ভে আছে একটা জারজ সন্তান! তার উপর এত মায়া-মমতা কেন রাজুর? তাকে তো নষ্টই করে দেবে, ভেবেছিল কাল! ঐ ঈশানের মা-মাগী জানে নানান রকম তুকতাক—তারই সাহায্য নেবে, ভেবেছিল রাজু। নাঃ, কেন নষ্ট করবে ময়নার ছেলেকে! সে তো শুধু সেই না-দেখা ঠিকাদারের নয়—ময়নারও ছেলে সে! ঐ শিশুর দেহ গঠনে ময়নারও অংশ আছে। তিলতিল করে লালন করছে ময়না তাকে; দাদাকে লুকিয়ে লালন করছে। তাকে রাজু নষ্ট করে দেবে? না। ময়নার ছেলে রাজুর পরম স্নেহের ধন—হোক সে ছেলে যারই হয়—সে তো ময়নারও ছেলে! রাজু নিশ্বাসটা জোরে ফেলে হাঁটছে জোরেই!

গোলাপীর কান্নাটা কি বীভৎস শোনাচ্ছে! এতটুকু মমতা জাগছে না রাজুর! ঐ হারামজাদীরা শাশুড়ী-বৌ মিলে নাটুর সহায়তায় ঈশানকে

বিষ খাইয়ে মারলো—রাজুর আর এতে কোনো সন্দেহ নাই। পুলিশে খবর দিতে পারতো রাজু, কিন্তু কি হবে খবর দিয়ে! লাস তো জ্বালিয়ে ছাই করে দিল এতক্ষণ! আর মরছে বেবাক লোক—না খেয়েই মরছে—ঈশানের মরণটাও ঐ না-খেয়ে মরাদের দলেই পড়বে। যাক গে। রাজু কুঁড়েব কাছে এসে পড়ল।

ময়না উনুনে রান্না চাপিয়ে তারণ ঠাকুরেব বইখানা উল্টাছে; পডছে নাকি!

—পড়ছিস বোনটি?

—হুঁ। ইয়েব মধ্যে জ্যেঠা পুড়ে গেল দাদা! এত শিগ্‌গি?

—না মনি, ঐটুকু কাঠে কি পুড়ে। যতটা পুড়ে পুড়ুক—ভেবে, মুখে আগুন দিয়ে চলে এলোম!

—বেশ হলো! মরছে তো হাজার লুক, কে কত পুড়াবে বাবা। লাও, কাপড ছাড!

ময়না রাজুকে কাপড দিতে উঠলো। ছেঁড়া লুগাটাই ময়না এখনো পরে আছে, অথচ ওর সেই পাতলা নীলাম্বরী শাড়ীটা শুকিয়ে গেছে—পরতে পারে এখন। কিন্তু সে শাড়ী খালি গায়ে পরা চলে না, দিনের বেলা—তলায় সেমিজ চাই! রাজু দেখলো—ময়নার পরিপূর্ণ যৌবন ছেঁড়া কাপড়খানায় আটকাচ্ছে না—অসামাল হয়ে উঠেছে ও, আর দাদার সম্মুখে বিব্রত হ'য়ে পডেছে। নিজের ধুতিখানা পরে রাজু মাথনের ঘবে পাওয়া টাকা ক'টা নিয়ে বলল—তুর লেগে একটো কাপড কিনে আনি গা তাঁতী ঘরে—ইটো বড্ড ছিঁড়ে গেইছে!

—হুঁ!—ময়না নিজের অঙ্গ সম্বৃত করতে চেষ্টিত হচ্ছে। রাজু বেরিয়ে যাবে, ময়না তাড়াতাড়ি বলল—

—কিছু মুখে দিয়ে যাও দাদা—পিথম একটুকু নিমপাতা, তা' পর দু'টি মুড়ি আর জল—লাও!

মড়া পুড়িয়ে ফিরে এসে নাকি এই সব খেতে হয়—নাহলে অমঙ্গল হয়। অমঙ্গল, কচু! কি আর হবে অমঙ্গল! রাজু গ্রাহ্য করতে চায় না অমঙ্গলের কথা! কিন্তু ময়নার যদি কিছু অমঙ্গল ঘটে। অমঙ্গলের ভয়ে রাজু ময়নাকে শ্মশানে নিয়ে গেল না! রাজু ফিরলো।

—দে কি দিবি!

ময়না খাবার দিতে দিতে বলল—অমনি বারুর খবরটো এনো দাদা—উ কেনে এল না আজ! কাল দু'জনাতেই খুব ভিজেছিলোম। জ্বরটর আবার হোল না তো?

—হুঁ—দেখে আসছি।—রাজু বেরিয়ে গেল। ময়না অনেকক্ষণ চেয়ে রইল বাইরের নদীর দিকে। বাঁশবন, ঘাসবন, কাশবন—তার পরই বালু-বেলা—মাথনের চিতাধূম ক্ষীণতর হয়ে আসছে। আর দেখা যাচ্ছে না ধোঁয়া! ময়নাকে ওর দাদা নিয়ে গেল না কেন শ্মশানে। সন্দেহ করেছে নাকি কিছু? হয়তো করেছে, হয়তো···! ময়না আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। দাদা যদি জানতে পেরে থাকে, তাহলে কি করবে ময়না? কি করে লুকোবে?—না, লুকোবার আর উপায় নাই, জানতে না পারলেও একদিন পারবেই। বেশী দেরীও নাই আর। ময়না কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ!

রাজু ভাবতে ভাবতে চলেছে—মোটা তাঁতের কাপড় একখানা কিনে নেবে। লাল পাড়—চওড়া আঁচলা দেখে কিনবে—বেশ মানায় ময়নার গায়ে। কাল কিচ্ছুটি খেল না মেয়েটা! ওর হয়ত অরুচি করেছে—হয়ত টক-ঝাল খেতে ইচ্ছে করে। হয়ত ভাল রান্না করা তরকারী খেতে মন যায়! তারণ ঠাকুরের বাড়ী বলতে যাবে নাকি রাজু—নাঃ, ফিরবার পথেই বলে যাবে ময়নার জন্যে আজ যেন বৌমা ভাত তরকারী দেয়। বৌমা রাঁধে ভালো—কাল খুব ভালই খেয়েছে রাজু ঐ তারণের বৌয়ের হাতের রান্না। রাজু গট্‌গট

করে হেঁটে উদয় তাঁতীর ঘরে ঢুকলো—কাপড় আছে হে উদয়কাকা? দাও তো একটো বড় আঁচলা—লালপাড়!

—ময়নার লেগে?

উদয় ময়নার ব্যাপারটা জানে, একটু রসিকতা করে বলতে চাইছিল, "সাধভক্ষন নাকি হ্যা"—কিন্তু বাজু এখন খদ্দের, তাই রসিকতার লোভ সামলে কাপড় বের করে দিল। একখানা বেছে কিনে নিয়ে রাজু এগুলো কিষ্টর ঘরের দিকে—বারুণীরও খবর নেবে। আর যদি সুযোগ পায় তো চাট্টি আমড়া—আছে ঐ কিষ্টর ঘরের গাছে, নেবে ময়নার জন্যে। টক খেতে ভালবাসে ময়না!

ঘরে কেউ কোথাও নেই। কুঁড়ের দরজায় তালাবন্ধ। কচি আমের গাছটা ছাগলে খাচ্ছে। আমড়া গাছেও আমড়া নেই বললেই হয়—মগডালে পাঁচসাতটা রয়েছে, বাকি সব হয়তো বেচেই খেয়েছে কিষ্ট। রাজু কাপড়খানা নামিয়ে গাছে উঠলো! আমড়া কয়টা আঁচলে নিয়ে নেমে এল আবার। গেল কোথায় হতভাগা কিষ্টে! বিবাগী হয়েই গাঁ থেকে পালালো নাকি। হবেও বা। ময়নার দাদা রাজু—রাজু ময়নার যে দোষটা ক্ষমার চোখে দেখতে চাইছে, স্বামী-কিষ্টর পক্ষে বারুণীর সে দোষ ক্ষমা করা কঠিন—রাজু বোঝে তাই এসেছিল কিষ্টকে সান্ত্বনা দিতে! কিষ্টকে না পেয়ে রাজু বারুণীদের ঘরপানে চললো! বারুণীদের ঘরটা যেন পড়োবাড়ী—কেউ যেন কোথাও নাই! হোল কি ওদের? রাজু সন্তর্পনেই ঢুকলো উঠোনে। না, কেউ নাই! চলে আসবে কিনা ভাবছে হঠাৎ মানুষের কথা শুনতে পেল! বারুণীর মা বলছে—

—কি খাবি খা' ইবার—খা সব্বনেশে! ছাই খা উনুনের! কার-খানায় যেয়ে কি করতো কেউ দেখতে যেত না—আর ইখেনে তু' দিলি নেটো মুড়লের ভুগে লাগায়ে! খা ইবার কি খাবি!

—মুড়ল যে ইমন করবে, তা কি আমি জানতাম! হায়—হায়—হায়! উঃ! শালা মুড়ল!

পুরুষের গলাটা কিষ্টর! রাজু ব্যাপারটা বিশেষ কিছু বুঝতে পারছে না! বারুণীর মা আবার বলল—

—জানথিস না, হারামজাদা! জানথিস না তু? গুলাপীকে নিয়ে কি কাণ্ড কচ্ছে নেটো—দেখছিস না খালভরা?

—মুড়ল আমাকে লোভ দেখাইল, একপাই চাল দিবে, ডাল-নুন-ত্যাল দিবে—থাকবো গোহালের ঘরে!

—বেশ! যা, ইবার থাক গা গোয়ালের ঘরে গরু হয়ে! এক পাই চালের লেগে নিজের বৌকে বিচলি তু! তু কি কম হারাম-জাদা রে আঁটকুড়ো! তু কি কম বজ্জাৎ—বেরো, বেরো ঘর থেকে! আঁটকুড়ো, আবার কাঁদতে এসেছে আমার কাছে!—যা, লিগা নাটু মুড়লের খপ্পর থেকে!

রাজু এবার বুঝতে পারছে—নাটু কিষ্টর সাহায্যে বারুণীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেছে এবং সেখানে তার যা করবার করেছে। নির্বোধ কিষ্ট এতক্ষণে নাটুকে চিনলো! ব্যাপারটা আরো ভাল করে জানবার ইচ্ছে হচ্ছে রাজুর—কিন্তু লজ্জা করছে যেন! ওর বোনের ব্যাপারটা আরো ঘোরালো—আর এরা সবাই তা জানে। তবুও রাজু এগিয়ে এসে বসল—কি হোল কিষ্ট? বারুণী কৈ?

আর কিছু বলতে হোল না—শুন বাবা রাজু—বলেই বারুণীর মা সালঙ্কারে রাত্রের সব ঘটনাই বলে দিল রাজুকে। বারুণী যে এখন বন্দী আর চাষী নাটুর কাছে—সেটাও বলতে ভুললো না। কিষ্ট দাঁড়িয়ে উঠে বলল—থানায় চললোম আমি।

—কিছু লাভ হবে না—রাজুই বলল—দারগা নাটুর বন্ধু, আর তুই শালা নিজেই বারুণীকে দিয়ে গেছিস। তু শালার আক্কেল হোক একটুস—রাজু সটান বেরিয়ে পড়ল তারণের বাড়ীর দিকে!

তারণ ঠাকুরের ঢেঙা বউটা কালকের পাওয়া চালগুলো ধুচ্ছে, ভাত রাঁধবে।

—বৌঠাকরোণ, বেশ সুময়েই এলোম! ময়নাকে আজ একবাটি পেসাদ দিতে হবে!

—বেশ তো। দিও পাঠিয়ে। এইখানেই খেয়ে যাবে—বৌ বলল। রাজু আমড়া ক'টা নামিয়ে দিয়ে বলল—দিদিঠাকরোণ কুথাকে গেল?

—টাকা এসেছে, সই করে লিতে গেল পুষ্টপিসে।

—আঃ, বেশ, তাহলে আমি বলছি গা ময়নাকে।—রাজু ওখান থেকে আবার ফিরলো। গাঁয়ের পথ—নির্জ্জন, স্তব্ধ পথ। কদাচিৎ কেউ হয়তো পথ চলছে!

—কাপড় কিনলি নাকি রে রাজু?—প্রশ্ন করলো দিদিঠাকরোণ। হাতে কয়েকখানা একটাকার নোট। পোষ্ট-অফিস থেকে ফিরছে। মুখে প্রসন্ন হাসি। ভাই-এর উপর সব রাগ-অভিমান জল হয়ে গেছে আজ—কত লিল দাম?

—তিনটাকা চার আনা, দিদি। লিবে একটো বৌটার লেগে?

—হুঁ, লিতে হবে। কাপড় একদম নাই। তা লিব কি করে, মোটে আটটি টাকা দিয়েছে!—দিদি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে; যেতে যেতে আবার বলল—দেখি, পারি তো লিব একখানা···। দিদি চলে গেল। রাজু বাড়ী ফিরছে। তারণ ঠাকুরের বৌ-এর কাপড় নাই। ওরা ভদ্রলোক, ওদের মত নিরুপায় আর কেউ নাই। না খেয়ে ওরা মরবে—তবু সম্মানটুকু নষ্ট হতে দেবে না! এই ওদের শিক্ষা, এই সংস্কার! ওরা বড়ো দুঃখী, বড়ো অসহায়। কয়েকজন একবোঝা কাপড় নিয়ে আসছে এই দিকে। ঢুকলো ঐ তারণ ঠাকুরেরই ঘর। কী ব্যাপার! বিলুবে নাকি? ফিরে এল রাজু দেখবার জন্য! নাটু মোড়ল বলছে—লাও দিদি! বৌটার লেগে

একখানা···বুঝলে! লিতে কিছু দোষ নাই। আমিই লিলোম দু'টো—লাও! তারণ এলে আমরা বলবো যে সুবাই লিয়েছে—লাও।

—না নাটু লিতে লারবো। আপনার ঘরে কচু পাতা আছে, মান পাতা আছে, তাই পরে থাকবে বৌ। দিতে আসাই তুর অন্যায় হয়েছে। তুই ভাই বড়লোক—তুর উসব লিলে চলে; আমরা গরীব, আমাদের রিলিফের কাপড় লিতে নাই।

—কিছু এমন দোষ নাই দিদি—আমি বলছি—লাও—নাটু আবার বলল।

—না,—দিদি সুদৃঢ় প্রতিবাদ করলো—এমন দিন থাকবে না আমার! আজকে কাপড় লিলে কাল বলবি, তারণ ঠাকুরের শ্যাংটো বৌকে তু' কাপড় পরাইয়েছিস! সি কথা শুনবাব আগে যেন মরণ হয় আমার!

—কাপড় তো আমার লয় দিদি, সবকারী···নাটু বলল।

তা হোক গা। আমি লিব নাই—লিতে পারবো না।

নাটুর দল ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল। রাজু ভাবতে লাগল, এরা, এই ভদ্রবা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, তবু এতটুকু নোয়াবে না! কোথায় পায় এরা এত শক্তি? রাজুইবা কেন পায় না? কেন সে ময়নাকে ও'কাজ করতে যেতে দিয়েছিল!

ওর অন্তর জুড়ে চীৎকার উঠছে আজ—কেন যেতে দিল, কেন তার মনের এতখানি দুর্ব্বলতা হল? না খেয়ে কি রাজু মরতে পারতো না? সে মরে গেলে ময়না যা ইচ্ছে করতে পারতো, রাজু দেখতে আসতো না। ওঃ! রাজু কেন ভেবে দেখে নি! না,—আর যেতে দেবে না রাজু; আজই যেতে দেয় নি—কোনদিন দেবে না।

কিন্তু যা-হবার, যতখানি অনিষ্ট হবার, হয়ে গেছে। বাকি আর এতোটুকু নাই।—কোন একটা জারজ ছেলেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে গড়ে তুলছে ময়না—শরীরের সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে আগলে বাঁচিয়ে

রেখেছে—বাঁচিয়ে রাখবে। ময়নার কাছে সেই ছেলেটা হবে ময়নার আদরের সন্তান!

মাথার চুলগুলো হাতের আঙুল দিয়ে মুচড়ে পাক দিয়ে রাজু স্বস্তি বোধ করলো কিছুটা! তার ঐ মাথাটায় এতটুকু বুদ্ধি নাই—, যাতে সে এই বিপদের কথা বুঝতে পারে—ধিক! রাজু কুঁড়ের কাছাকাছি এসে যতটা সম্ভব সহজ-স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলো; ময়না যেন না বোঝে যে রাজু জেনেছে; ময়না দুঃখ না পায়। দুঃখ দিয়ে আর লাভই বা কি? উপায় তো নেই।

—এতো দেরী কেনে হোল দাদা—কুথা ছিলে? —ময়না উঠান থেকে সানন্দে আহ্বান জানাল!

—বৌঠাকরোণকে বলে এলোম, তু আজ খাবি গা উথেনে। রাজু বলতে বলতে ঘরে এল!

—কেনে? তুমি কুথা খাবে তাহালে?—রাজুর আনা কাপড় খানা নিয়ে ময়না দেখতে লাগল খুলে!

—আমি একবার রূপশা চললোম। ইবেলা খাব নাই। কী রাঁধলি কি র‍্যা? —একটা বিড়াল খাবারে মুখ দিতে যাচ্ছে। কে জানে কি রেঁধে রেখেছে ময়না, খেতে না পেয়ে শুকিয়ে-যাওয়া বিড়ালটা তাই খেতে যাচ্ছে!

—আমি রাঁধি নাই দাদা, রাঁধা মাছ, টিনে ভরা থাকে। উরা সব খায়। কাল এনেছিলাম একটিন।

রাজু দেখলো, বাদামে' গড়নের একটা টিনের কোটোতে রান্নাকরা ছোট ছোট কয়েকটা মাছ। ঢাকনা খোলা দেখে বিড়ালটা কোথা থেকে এসে মুখ দিতে যাচ্ছে। ময়নার এত কষ্টের সংগৃহীত মাছ বিড়াল খাবে? রাজু রেগে উঠলো! হাতের কাছে শীল নোড়া পড়ে রয়েছে; নোড়াটা তুলে নিয়ে রাজু সজোরে ছুঁড়ে দিল বিড়ালটার দিকে। করুণ একটা শব্দ

করে আধমরা বিড়ালটা ছুটে পালিয়ে যেতে চাইছে—ছুটতে পারছে না। না খেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে গেছে ও। খাবে কোথা থেকে? মানুষই খেতে পায় না, তা বিড়াল। ঐ হারামজাদার জাতও দাসত্ব করে "দুধু ভাতু", 'মাছু-ভাতু' খেতে এসেছিল। সুদিনে ওর মনিব—মাখন জ্যেঠার সেই বিধবা বৌমা অনেক দুধ-ভাত, মাছ-ভাত খাইয়েছে, আজ ওর কেউ নাই। দাসত্বের এই পরিণাম! তার চেয়ে ও হতভাগা তো বেশ স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারতো স্বাধীন ভাবে! ইঁদুর ধরে খেতো, গেঁড়ী-গুগ্‌লী কুড়িয়ে খেতে পারতো। কেন এসেছিল পোষা বিড়াল হতে?—মরুক।

—উম্-মা। কল্লে কি দাদা, মরে গেল যে! আঁহা-হা!—মরে গেল দাদা—হায়—হায়! বৌদিব পোষা ছিল!

—মরুক! মরে যাক্! দে, ফেলে দিয়ে আসি।—রাজু টেনে নিল বিড়ালটাব দেহ। বাইরে যাচ্ছে ফেলে দিতে।

—বেড়াল মারতে নাই দাদা—মা-ষষ্ঠী রাগ করে।—ময়নার নির্বোধ কণ্ঠস্বব। চমকে উঠলো রাজু।

হ্যাঁ, বিড়াল মারতে নাই। বিড়াল নাকি মা-ষষ্ঠীর বাহন, মা-ষষ্ঠী সন্তান-দায়িনী, সন্তানের রক্ষয়িত্রী। ময়নাব গর্ভে আছে সন্তান, তার অকল্যাণ হবে যে! এ কি করলো রাজু! বিড়ালটাকে মেরেই ফেললো! দুহাতে বিড়ালটাকে কোলের উপর ধরে রাজু ফু দিতে লাগল মাথায়, কানে —যদি বাঁচে, যদি বাঁচাতে পারা যায়, না হলে ময়নার ছেলের যে অকল্যাণ হবে!—জল, জল দে ময়না একটুস··· !

—ফেলে দিয়ে এস দাদা, মরে গেইছে!—কথাটা বলেও ময়না জল দিল বিড়ালটার মুখে। নাঃ, বাঁচবার কোন লক্ষণ নাই। মরেই গেছে!—হে মা-ষষ্ঠি, কি করলোম্! রাজু আকুল কণ্ঠে বলে উঠলো। ময়না বলল—মরুক গা দাদা—উ মরতোই দু' একদিন পরে। দুঃখু করে কি হবে—যাও, ফেলে দিয়ে হাত ধুও!

রাজু কোনো কথা না বলে বিড়ালের দেহটা নিয়ে বাইরে এল। সেই শিরীষ গাছটার ছায়া-শীতল মাটি—পরম যত্নে রাজু ঘাসের উপর শুইয়ে দিল বিড়ালটাকে; গায়ে হাত বুলুতে লাগল—বাচ্—বেঁচে থাক!—মাথাটা কাঁপছে বিড়ালটার। তাহলে বেঁচেই আছে এখনো, বেঁচেই যাবে। বিড়াল চট করে মরে না। দাসের জাত যে, ক্রীতদাসের জাত কুকুর আর বিড়াল! স্বাধীন থাকবার সব রকম সুযোগ ঈশ্বর ওদের দিয়েছেন, তবু ওরা দাসত্বই করবে। ঐ যে, ঐ মাছ-ভাত, দুধ-ভাত, গায়ে হাত বুলুনোর আরাম! বিড়ালটা মাথা নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে, রাজু ওকে আবার তুলে নিয়ে ঘরে ফিরলো—মরে নাই রে ময়না—বেঁচে গেল; এই লে! ময়না তখন নতুন কাপড়খানার আঁচলটা দেখছে ভাল করে। বিড়ালের সম্বন্ধে কোনো কথা না বলে বলল—ক'টাকা দাম লিল দাদা?—বেশ কাপড়টি; আঁচলটো ভারী সোন্দর!···

—পর! পরবি না আখুন?—রাজু বিড়ালটাকে ছায়ায় নামিয়ে দিয়ে বলল—পর বোনটি, দেখি কেমন লাগে?

ডুব দিয়ে পরে' বামুনদের ঘর যাব দাদা···আখুন থাউক!·· কাপড়টা ভাঁজ করছে ময়না। রাজু আর কিছু বলল না। ময়না একবার কাপড়খানা এখন পরলে খুসী হোত রাজু খুবই। সে এখনি রূপশা চলে যাবে। কাপড়খানা ময়নার গায়ে কি রকম মানালো, দেখতে পাবে না। কাল কুন্তির শাড়িটা রাজু দেখছিল, বেশ চমৎকার মানিয়েছিল কুন্তিকে। ঠিক তেমনি শাড়িই রাজু কিনে এনেছে। আচ্ছা, ফিরে এসেই দেখবে রাজু। শাড়িটা রেখে ময়না বলল—বৌঠাকরোণ রাঁধে খুব ভাল দাদা···চাট্টি পালং শাক, মূলো আর বেগুন এনেছি কাল; দিয়ে এসে খা কেনে? রাঁধা তরকারী তুমার লেগে লিয়ে আসবো—উবেলা খাবে···।

—যা কেন্নে তুই; ঘরে কুলুপ দিয়ে তু চলে যা। আমি তো চললোম রূপশা···যা তু···রাজু জবাব দিল। বিড়ালটা উঠেছে।

—চুরি-টুরি না হয় আবার ঘরে। মাখন জ্যেঠা ছিল, তবু দেখতো। ঘর দুয়োর ফেলে যাব দাদা ?—

—তা বেটে। চুবি হোতে কত্‌খুন! না বোনটি, তু ঘরেই থাকিস, আমি চট্ করে ফিরে আসি রূপশা থেকে। মূলো-বেগুন কাল দিলেই হবে—রাজু তাড়াতাড়ি ফতুযাটা গায়ে দিযে ভাঙা ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রূপশার দিকে।

ওর যাওযার পব ময়না কিছুক্ষণ বসে বইল চুপচাপ। দাদা যে কি জন্যে রূপশা গেল, তা ওর জানা। মকর ডোমের সঙ্গে ময়নার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক আছে, সেটাই আবার ঝালিযে নিতে গেল। দাদা আর দেরী কবতে চায না, কিন্তু বর তো এখনো জেলে—না-কি ছাড়া পেয়েছে ? ময়না জানে না। খবর পায় নি। ছাড়া যদি পেয়ে থাকে মকর তো এই শাওনেই বিয়ে হতে পারে। হলেই চুকে যায—কিন্তু নিশ্বাস ফেললো ময়না। বিয়ে কি আর হবে! হবার যে কিছুই আশা নাই! প্রায সাত মাস হয়ে গেল তার গর্ভে সন্তান এসেছে। লুকিয়ে কিছু কববাব আব কিছুমাত্র উপায নাই। পেট এঁটে শাড়ি পরে কত দিন আর লুকোবে ময়না! হয়তো জানতেই পেরেছে দাদা, আর না হয, জানবে আজ কিম্বা কাল। আজই তাকে যেতে হবে তারণ ঠাকুরের বাড়ী। তারণের দিদি আর বৌ দেখবামাত্র বুঝবে তার অবস্থা। নাঃ, যাবে না ময়না। কিন্তু না গেলেও উপায নাই। দাদা বলে এসেছে বামুন বাড়ীব পেসাদ নিবে। ঐ জন্যেই দাদা বোধ হয় পেসাদ চেয়ে এল—ময়নার যাতে মঙ্গল হয়। ওঃ! দাদা—এখনো ময়নাকে দাদা কত ভালোবাসে। জানতে পেরেও দাদা এতোটুকু কিছু বলল না। এমন দাদা আর হয় কারুর! ময়নার চোখ ফেটে জল গড়িযে পড়ল!—দাদাকে সে প্রতাড়িত করছে—!

কিন্তু উপায় ছিল না—ময়নার কোন উপায় ছিল না আব। ময়না তো মবতোই, দাদাও না খেয়ে মরে যেতো। তাব চেযে এই কবে দাদাকে

বাঁচিয়ে তো রাখতে পেরেছে। বেঁচে থাক দাদা, বেঁচে থাক। কিন্তু আর কয়দিনই বা মেয়াদ ময়নার। ঠিকাদার এখন অন্য কোনো নতুনের সন্ধানে আছে। ময়নাকে এবার একদিন ভাগিয়েই দেবে ও। কিন্তু ভয়ও আছে ঠিকাদারের; ময়না যদি বড়সাহেবকে গিয়ে বলে দেয় তো ঠিকাদার মুস্কিলে পড়বে—কাজেই বেশি কিছু ময়নাকে বলে না। বয়স কম হলে কি হবে, দুর্ভাগ্যের শাণে ঘষা হয়ে ময়নার বুদ্ধি ধারালো হয়ে উঠেছে। ঠিকাদারের কাছ থেকে বেশ কিছু আদায় করে তবে ময়না ছাড়বে তাকে—না হলে কাঁঠালের আঠার মতো লেগে থাকবে। হুঁ—হুঁ—চালাকী তো নয় বাবা—খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে ছাড় পাবে। ময়না সহজে ছাড়ছে না।

কিন্তু কী করতে পারে ময়না? যদি না দেয়—যদি ভাগিয়ে দেয়? ওরা বড়লোক—ওরা সবই করতে পারে। ওদের টাকার জোর আছে, ওদের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারে না। ভাগিয়ে দিলেই বা করবে কি ময়না? না—তার চেয়ে ভালয়-ভালয় কিছু আদায় করে নিয়ে সরে পড়বে। ময়না মতলব ঠিক করে ফেললো।

ভালো তালা আছে একটা, এনেছে ঐ কারখানা থেকেই। খুব শক্ত তালাটা। ওটাকে দরজায় লাগিয়ে ময়না মূলো, বেগুন আর পালং শাক নিয়ে বেরুলো বামুন বাড়ীর উদ্দেশে। ঘরে একা বসে থাকতে বিরক্ত লাগছিল ওর। তার চেয়ে তারণ ঠাকুরের বৌএর সঙ্গে দুটো গল্প করবে গিয়ে। খুব ভালোবাসে ওকে ঐ ঢেঙা বৌটা।

তারণ ঠাকুরের বৌ ভালভাত নামিয়ে কি রান্না করবে তাই ভাবছিল। সামান্য যা আলু-কলা আছে তাতে একজন লোকেরও হয় না—ও খুব মুস্কিলে পড়েছে। ময়না আবার খাবে—রাজু বলে গেছে—তাই ভাবনাটা একটু বেশি। নিজেদের হলে ভাতে ভাতই খেয়ে নিত। দিদি কোথায় গেছে, হয়ত চাল কিনতে। টাকা আটটা এসেছে আজ—চাল কিনে না রাখলে আবার পাওয়া না যেতে পারে। বেলা অনেক হোল।

রাজু সকালে এসেছিল, বইটা তো কৈ ফিরিয়ে আনলো না? দেবে না নাকি বইটা আর ফেরৎ? বইটা একবার চোখেও দেখেনি বৌ। পড়তে ও পারে না, কিন্তু ওর স্বামীর লেখা বই ওর বড় আদরের ধন। স্বামীর প্রত্যেকটি বইকে ও হাত বুলিয়ে আদর করে, আঁচল দিয়ে ঝাড়ে, কোলে নিয়ে বসে থাকে—মলাটের ছবিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে—আর ভাবে, কত কি কথা আছে এর মধ্যে; কত মেয়ের কথা, কত পুরুষের কথা, কত ছোট ছোট ছেলের কথা। ছেলে ওর হোলনা একটা। যদি হয় তো সে-ছেলে নিশ্চয়ই তার বাপের বই পড়তে পারবে—তখন ছেলের কাছে ও শুনবে, কি লেখে তার বাবা। ওর কথাও কিছু কিছু লেখে নিশ্চয়। হ্যাঁ লেখে, কিন্তু ও পড়তে পারে না—ভাত না খেয়ে থাকার চাইতে এ দুঃখ ওর কম নয়। তবু কেন যে ও লেখাপড়া শেখে না! এখনো কি শিখতে পারে না? নাঃ, হয় না আর। নিশ্বাসটা চেপে রাখতে পারে না—কান্না পায় ওর। বিবাহিত জীবনের সুখস্মৃতিগুলো মনে ভীড় করে আসে। যখন ওর বিয়ে হয়, তখন ওর বয়স ছিল সাত কি আট। শাশুড়ী কোলে করে নিয়ে সেই যে ঘরে ঢোকালেন তো এক নিমিষের জন্য চোখের আড়াল করতেন না। তখন ছোট মেয়ের ফ্রকের প্রচলন হয় নি পাড়াগাঁয়ে; ফেনাড়ী পরে ও বেড়িয়ে বেড়াতো। শাশুড়ী গুড়-মুড়ি-খৈ-ঘি দিয়ে মেখে আঁচলে ভরে দিয়ে বলতেন —যা, খা গে ঘুরে ঘুরে। তারণের সঙ্গেই ও কত খেলা যে করতো! তারপর বড় হোল, শাড়ি পরতে আরম্ভ করলো, সেমিজ ব্লাউজ, পেটিকোট চড়ালো, মস্ত মেয়ে হয়ে উঠলো। তারণ তখন বিদেশে পড়তে গেছে। মাস কয়েক পরে অকস্মাৎ এক বাসন্তী পূর্ণিমায়—হ্যাঁ, দোলের দিনেই, সন্ধ্যাবেলা তারণ ঘরে এসে দেখলো, বৌটা লাজুকের একশেষ হয়ে উঠেছে। স্বামীর কাছে ও আর বেরুতেই পারে না। সর্ব্বাঙ্গে ওর বাসন্তী শ্রী ঝলমল করছে। ওর লজ্জা দেখে তারণেরও বোধ হয় লজ্জা হয়েছিল—তাই গভীর রাত্রে চুপি চুপি সেদিন কথা বলেছিল একটি মাত্র—ওকে ডেকেছিল নাম ধরে। অমন

করে তার পূর্ব্বে আর কখনো ডেকেছিল কিনা মনে পড়ে না, কিন্তু সেদিনের ডাকটি আজও তেমনি মধুর হয়ে আছে। সে-ডাক ও ইহজীবনে ভুলবে না। সেই ডাকটি শুনবার জন্য ও এত দুঃখ সয়েও বেঁচে আছে—বেঁচে থাকবে। সেই সুখের দিনের কিছু পরেই শ্বশুর গেলেন, শাশুড়ী গেলেন—দিনে দিনে দারিদ্র্যরাহু সংসারকে গ্রাস করলো। আজ একবেলাও ওর পূরো খাদ্য জোটে না—কিন্তু ওর আশা অবিনশ্বর। ওর স্বামী একদিন আবার সব সুখ ফিরিয়ে আনবে। এই আশায় ও বেঁচে আছে। ওর স্বামীর ভালোবাসাই ওকে রাখে সঞ্জীবিত।

—বৌ-দিদি?—নতুন কাপড় পরা ময়না এসে দাঁড়ালো উঠোনে। চমৎকার দেখাচ্ছে ময়নাকে, লক্ষ্মীর মতন।

—ওমা, ময়নামতী যে লো! আয়। উঠে বোস। বৌ ওকে সাদর আহ্বান জানালো। মূলো-বেগুনকটা নামিয়ে দিয়ে ময়না বসল রোয়াকের একধারে; বলল—দাদা গেল রূপশা; একলা ভাল লাগছিল না বৌদি।

—বেশ কল্লি, এলি। ই সব কুথা থেকে এনেছিস?

—ঐ যে গো, খাটতে যাই না উপারে। ঐখানে পেলুম কাল···ময়না কুণ্ঠিত হচ্ছে। বৌ অত লক্ষ্য না করে বলল—চাল-ডাল সবই দেয়, না লো?

—হুঁ, তেবে আর যাব না ভাই বৌদি। লুকগুলোন বড্ড খারাপ। দিদিঠাকরোণ কৈ? ডুব দিতে গেইছেন?

—না—চাল কিনতে গেল। আসছে আখুনি। কি খাবি বল দেখি? কি খেতে মন যায়? টক্—ঝাল?

ময়না আঁৎকে উঠলো যেন। বৌদিদি জানে তাহলে—জানে! নাহলে এমন করে খাবার কথা শুধুচ্ছে কেন? লজ্জায় ও জড়সড় হয়ে গুটিয়ে বসল; উত্তর দিতে বাধছে, কিন্তু উত্তর দিতেই হবে, বলল—যা তুমি রাঁধবে বৌদি—তুমার হাতের রান্না বড্ড মিষ্টি লাগে।

কতদিন খাই নাই……আসতেই পাই না। সুকালে যাই রাত দুফ্‌রে ফিরি…আসি কখন!

—তাই খাবি—বোস। তুর দাদাব সেই বইটো পড়া শেষ হয় নাই নাকি?

—না, পড়া শ্যাষ হয় নাই। আমিও পড়লাম একপাতা, বুঝতে লাবছিলোম বৌদি……ভারি শক্ত লিখা…।

দিদি এসে পৌছাল; আঁচলে সের তিনেক চাল—এই ছটাকার, বুঝলে, খাও কি খাবে। বৌ কোনো জবাব দিল না—ময়নাই বলল, —যা বাবা দর উঠছে দিন দিন—ক'টাকা মণ লিল দিদি?

—তিনকুড়ি টাকা—তাই কি কিনতে মিলে? আমি ধন্যি, তাই গোবিন্দের ঘর থেকে কিনলোম। কেউ বিচতেই চায় না।

—হুঁ—ময়না সর্ব্বাঙ্গ ভাল করে ঢাকতে চাইছে, কাবণ দিদি ওব দিকে তাকাচ্ছে! লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে ময়না। দিদি বলল—পালং শাক কুথা পেলি লো ই সুময়? হাটে?

—হুঁ, ঐ উখেনের হাটে! কারখানার মাঝেই হাট বসে যে, সব রকম জিনিস বিচতে আসে!

দিদি বঁটি নিয়ে কুটতে আরম্ভ করলো মূলো বেগুন পালংশাক!…

—কি খাবি বল দেখি? সেই এক প্রশ্ন! ময়না আবার সেই একই উত্তর দিল—বৌদি যা রাঁধে, তাই ভাল হয়। তাই খাবো!

—রাজু গেল কুথাকে? রূপসা? তুর বিয়ের লেগে বুঝি? বিয়েটা এইমাসেই দিতে পাল্লে ভাল হয। ক' মাস হোল লো? দিদি প্রশ্ন করলো।

জানে—এরাও সব জানে তাহলে। লজ্জার ধাক্কাটা ময়নাকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে। সীতার মতন ও যদি পাতালে প্রবেশ করতে পারতো! না, মাতা বসুমতী আজকাল আর মানুষের দুঃখ বোঝে না।

—হুঁ—ময়না একটা নিশ্বাস ছাড়লো—আমি কী যে করবো দিদি! অকূলপাথারে পড়েছি আমি···আমার বাঁচবারও যো নাই, মরবারও উপায় নাই। আশীর্ব্বাদ কর দিদি···আমি মরি—আমি যেন মরে যাই···।

—ওমা, ষাট্ ষাট্, মরবি কিসের লেগে ময়না? কত কষ্টের মানুষ করা বোন তুই রাজুর। কি দুঃখে যে তুখে মানুষ করেছে রাজু·· তা আমরা জানি! মরবি কিসের! এই অকালের বাজারে কত লুক কত কি করছে! বেঁচে থাক—কি এমন অপরাধ করেছিস যে মরবি? ·····দিদি বারম্বার সান্ত্বনা দিয়ে বলছে কথাগুলি কিন্তু ময়না ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। ও আর সামলাতে পারছে না। ওর পেটের ভিতর কে যেন আঁচড কাটছে! যে সন্তান-সম্ভাবনা পরম আনন্দের দ্যোতক হতে পারতো, অবস্থার বিপাকে সেইটাই ময়নাকে অকূলপাথারে ভাসিয়ে দিয়েছে। বৌ বলল—কাঁদিস না ময়না—চুপ কর! দাদাকে তো খইয়ে বাঁচাতে পেরেছিস তুর!

—হুঁ, সেই কথাই কথা। অত কষ্ট করে বড় করেছে। তুই না এমন করলে রাজু না খেয়ে শুকুতো—দিদি বলল আবার।

—কিন্তুক আমি ইবারে কুথাকে যাব দিদি! কে আর আমাকে বিয়ে করতে আসছে! যম যদি আসে!

হু-হু করে চোখের জল বয়ে গেল ময়নার গণ্ড বেয়ে। সমস্ত দেহটা ওর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল কান্নার আবেগে। ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না দিদি আর বৌ। তবু দিদি বলল —কি আর করবি! অত কাঁদিস না, পেট বেদনা করবে আবার! কত লোকের কত কি হয়। যা হয় হোক—ভয় খাস না কিছু!.

—দাদা হয়তো জানে না আখুনো···কান্নার মধ্যেই ময়না বলল কথাটা···বলতে আমি যে পারছি না দিদি!

—জানে না? তা হবে! উ যেরকম উদোমাদা মানুষ, না-জানবারই কথা—না লো, জেনেছে হয়তো!

—কে জানে! যদি জেনেছে তো কাল। কাল আমি টুকচেক বেসামাল হয়ে এসেছিলুম···দিদি, কি আমি করবো গো! আমি কুথাকে যাব, আমাকে কলকাতা পাঠায়ে দাও দিদি ।

ময়না আবার আকুল হয়ে কেঁদে উঠলো! ওর সর্ব্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। নিরুপায় নারীর সর্ব্বশেষ আশ্রয়-সন্ধানের আবেদন।

বৌ বলল—বেশ, তাই যাবি, কাঁদিস না ময়না।

—যাবি—তাই যাবি—দিদিও বলল—কিন্তুক যাবি কি করে? বর্দ্ধমানে লাইন ভেঙ্গেছে। যাবার ট্রেণ নাই।

চোখদুটো মুছে ময়না উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো—যাবার ট্রেণ নাই? কেনে! ট্রেণ কি হোল?

—লাইন ভেঙেছে কুথা। আখুন আবার ঐ সেই কাটোয়া দিয়ে ঘুরে ঘুরে কলকাতা যেতে হচ্ছে।

—তাই যাব—আমি ঘুরে ঘুরেই যাব···দিদি···দাদাঠাকুরকে লিখে দাও, আমার লেগে যেন কিছু ব্যবস্থা করে রাখে। আর না হলে আমি মা গঙ্গায় ডুবে মরবো··আমি···

—থাম্···থাম্! ডুবে মরবি কিসের লেগে! ইমন কত হয় সংসারে। হচ্ছেই তো আকছার। ইচ্ছে করে তো কিছু পাপ করিস নাই ময়না—তুর কপালের লিখন···মরবি কেনে!

—আমি জানতুম না দিদি—কিছু আমি বুঝতে লেরেছিলোম! আমি দাদার কুলে মানুষ; উসব আমি কিছুই জানতুম না···ইমন জান্‌লে আমি যেতুমই না উখেনে। হোল কি, জান দিদি? খুব ভাল ভাল কথা বলে' ভাল ভাল খাবার, চাল ডাল দিয়ে দিন চার পাঁচ এটো-সেটো কাজ করালো, তা বই একদিন···দিদি···আমি তখনো

বুঝতে পেরেছিলোম না···বিশ্বেস কর তুমি দিদি···বিশ্বেস কচ্ছো না তুমি বৌদি ? তুমরা ব্রাহ্মণ, দেবতা, তুমাদের পা ছুঁয়ে বলতে পারি আমি···

দিদি আর বৌ বিশ্বাস করলে ময়নার সন্তপ্ত অন্তর খানিকটা শান্ত হয় যেন। নিয়তির নিষ্ঠুর পাষাণ-ভার যেন কিছুটা কম পড়ে ওর বুকের উপর থেকে। ও যে নিষ্পাপ, ওর জ্ঞানকৃত কোন পাপ নাই, সেইটাই ও এই দরদীদের কাছে জানাতে চাইছে। ওর বেদনার্ত্ত হৃদয় এদের কাছে মুক্ত করে, এদের সহানুভূতির শীতল হাওয়ায় জুড়ুতে চাইছে। দিদি বলল—বিশ্বেস না করবো কেনে ময়না? তু ছেলেমানুষ। উসবের তু বুঝবি কি! উরা তো এমনিই করে! ভুলুয়ে-ভালিয়ে একবার নিয়ে যেতে পারলে হয়—তা বই করে সর্ব্বনাশ—খুব বিশ্বেস করছি! ···কাঁদিস না ময়না, কাঁদিস না! রাজু আসুক, আমি বলছি, তুখে কলকাতায় দিয়ে আসুক।

—হুঁ, সিখানে খালাস হয়ে আবার চলে আসবি তুর দাদাঠাকুর বইছে·· ওখেনে; ডর কি!—বৌ বলল।

তরকারী কোটা হয়ে গেছে। দিদি উঠে বলল—গল্প কর বৌএর সঙ্গে, আমি ডুব দিয়ে আসি।—গামছা নিয়ে দিদি চলে গেল! চোখ দুটো মুছে ময়না উঠে বসল ভাল হয়ে। লজ্জার নিদারুণ ধাক্কাটা এতক্ষণে সামলে নিয়েছে ও। এরা জানে সবাই, গাঁয়ের সবাই জেনেছে তাহলে। জানুক—জানবেই তো! কিন্তু ময়না এদের কাছে তার নিরপরাধত্বের কথাটা বলতে পেরেছে। দরকার হলে এরা রাজুকে সেকথা বলবে। রাজু যেন ময়নাকে ভুল না বোঝে—আর যার যা খুসী বুঝুক। ময়না বলল—আফিং খেয়ে মরতে মন যায় বৌদি; মনে হয়—অজয়ের বানে ডুবে মরবো···মরতে লারছি শুধু দাদার জন্যে! মরলে দাদা একদিনও বাঁচবে না। দাদা যে আমার বাবার চেয়েও বড় বৌদি—উঃ··· !

আবার কেঁদে উঠলো ময়না। নাঃ, ওকে চুপ করানো অসম্ভব এখন। বৌ বলল তবু—দাদার জন্যেই তো গেইছিলি ময়না। দাদার লেগেই তুর সংসার। তুর দাদা এমন অবুঝ লয়—বুঝবে।

—কিছু আমাকে বলবে না দাদা—কিছুই বলবে না বৌদি। দাদা কখনো আমাকে বকে নাই···কখনো না।

—বকবে কিসের লেগে! তু তো আর ইচ্ছে করে কিছু করিস নাই—খুন্তি দিয়ে বৌ তরকারীটা নাড়তে লাগল।

ধীরে ধীরে ময়নার কান্নার আবেগ শান্ত হয়ে আসছে। কাছিয়ে এসে চুপে চুপে বললো,—বৌদি, সাত মাস হোলো আমার। হারামজাদা আব আমাকে রাখতে চাইছে না। দাদাঠাকুরকে একটো চিঠিতে তুমি সব লিখে দাও বৌদি· ·আমার লেগে যেন ব্যবস্থা কবে রাখে, আর না হলে যেন বিষ কিনে রাখে খানিকটা!

—চুপ কর ময়না! বিষ খাবি কিসের লেগে! বেঁচে থাক···উপায় একটো হবেই ··।

—মরে গেলেই বাঁচতোম বৌদি! আহা, দাদা আমাকে কেনে এত কষ্ট করে মানুস কল্লো বৌদি—ছুটোবেলাই যদি মরে যেতুম তো দাদার বুকে এমন শেল বাজতো না ··বৌদি, আমি কুথাকে যাব, কি কর্‌বো বৌদি?

কি করবে কিছুই কেউ বলতে পারে না আজ। প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়ম—না, প্রকৃতির স্নেহের বিধানকে আজ মানুষ নিজের নীতি-বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ খড়্গে খণ্ডখণ্ড করছে। এ নিয়ম মানুষের গড়া যার জন্য ময়না আজ নিরাশ্রয়া! কিন্তু এ নিয়ম, এই শৃঙ্খলায় মানুষের প্রয়োজন আছে, তার সমাজ রক্ষার জন্য, তার বংশধারাকে বর্ণ-সাঙ্কর্য্যের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য, তার গৃহজীবনের পবিত্র শান্তিকে অব্যাহত রাখার জন্য নিতান্তই প্রয়োজন এই নীতির। কিন্তু এই নীতিই আজ ময়নার জীবনকে বিষাক্ত করেছে। হতভাগী ময়না! ওর কান্না থামানো দুঃসাধ্য প্রায়।

এর পূর্ব্বে ও একদিনও এমন করে কাঁদতে পায়নি। কার কাছে কাঁদবে! কেউ ওর প্রতি সহানুভূতি জানাবে বলে মনে করেনি ও। কান্নাটা যেন বুকের ভেতর পাথরের মত জমাট হয়ে ছিল—দিদি আর বৌএর স্নেহের উত্তাপে গলে জল হয়ে ঝরছে। ময়না ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

ওকে ভোলাবার জন্য বৌটা অন্য কথা আরম্ভ করলো—বলল,—নদীতে বান কতটো লো?

—এনেকটো। কাল জল হইছে, আজ এক গলা বান হতে পারে।

—বেশি বান হলে তুবা পুলে পাব হোস তো? পয়সা দিতে হয়?

—না, আমাদের কাছে পয়সা লেয় না। বান তো ই বছর হয়ই নাই আখুনো। এইবারে হবে।

তরকারীটা নামিয়ে বৌ বলল—টক্ খেতে মন যায়, না লো ময়না?

—কিছু না, বৌদি। কিছু খেতে মন সরে না—মনে হয় বিষ খাই। মরে যাক্ ঐ হারামজাদা ছেলে, প্যাটের ভিতর মরে যাক্!

—ষাট্ ষাট্—উ কথা বলতে নাই ময়না। ছেলের দোষ কি, বল দেখি। একটি ছেলের লেগে কত লুক মাথামুড খুঁড়ছে! আচ্ছা ময়না, লুকটো কি জাত? বামুন-কায়েত নাকি?

—কে জানে গা! উদের আবার জাত আছে! গরু খায়, শূয়োর খায়—ওদের আবার জাত বৌদি—হুঁ! জাত থাকলে কি আর এমন করতো? তবে আমিও ছেড়ে কথা কইবো না বৌদি—একটি শ' আদায় করে লিব—না যদি দেয় তো যাবো বড় সায়েবের কাছে। দেখে লিব, উ হারামজাদা কত বজ্জাৎ··

অনেকক্ষণ বৌ আর কোন কথা বলল না। ময়নার কথাই ভাবছে বৌটা। কী ভয়ঙ্কর অবস্থা-বিপাকে পড়েছে ময়না! ওকে রক্ষা করার কোনো উপায়ই দেখতে পাচ্ছে না বৌ···তবু যদি ময়না কিছু টাকা আদায়

করে নিতে পারে তো ভাল হয়। তার ভবিষ্যতের কিছু সম্বল হয়। কিন্তু টাকা কি আর দেবে সে?

ময়নার ক্লান্তি লাগছে। আঁচলটা পেতে ঐখানে শুলো। খানিকটা ঘুমুলো, তার পর উঠে খেয়ে আবার খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলো ঐখানেই। বেলা শেষ হয়ে আসছে এখন—ময়না উঠলো। ঘর যেতে ওর মন সরছে না। কিন্তু না গেলেও নয়।

দাদা এবার ফিবে আসবে—ময়না আস্তে আস্তে ঘরমুখে ফিরলো। এসে দেখলো, রাজু ফেরেনি তখনো।

* * *

রূপশায় রাজু অপমানিত হয়েছে। মকর ডোমের বাবা আজ ওর সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলল না—ববং ছোট মেয়েটাকে উদ্দেশ করে রাজুকে শুনিযে বলল—

—তুব দাদা আশ্বিন মাসে ফিবলেই, বুঝলি—আগুতে তুর বিয়েটা দিযে লিব মা কিক। যা দিন কাল পডেছে, বৌ-বিটি-বোনেব ধম্ম বিচে খেতে লেগেছে সব শালারা··।—বাজুকে দেখেই বলল কথাগুলো, অথচ এমন ভাবে বললো যেন বাজুকে সে দেখে নাই। রাজু দু'আখর লেখাপডা শিখেছে—এই সব "ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো" কথার মানে বুঝতে ওর দেবী লাগে না—তবুও রাজু এগিয়ে এসে প্রণাম কবে বলল—কেমন আছেন বাবা? ঘবেব সবাই ভাল আছে তো?

—হুঁ—আছি! তা, ই অবেলায় কি মনে কবে?—মকরের বাবা প্রশ্নটা করলো এমনি, কারণ, অ-বেলা তখনো হয় নি, ভাত বেলাও হয় নি। বাজু একটু থতমত খেয়ে বলল—যাব সারসা—পথে পডলো, তাই ভাবলোম, খববটা লিয়ে যাই···।

—অ···তা বেশ···ওরে কিরু, আমি চল্লুম বাগমারীর ক্ষ্যাতটো দেখতে···বুঝলি?

রাজুর সঙ্গে আর কথা না কয়েই ও পথে নামলো। রাজু বুঝলো—এখানের সঙ্গে সম্বন্ধ তার চুকেছে। আচ্ছা! আকাশের পানে তাকিয়ে নিশ্বাসটা চেপে চেপে ছাড়লো রাজু। কিরণ বেরিয়ে এল ঘর থেকে; চোদ্দ-পনর বছরের মেয়ে—বলল,

—তুমাদের ইসব কি কাজ গো! বুনটোকে বিচে খেলে শ্যাষে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ···মাগো মা!

এইটুকু মেয়ের জ্যাঠামী বরদাস্ত করা যায় না, কিন্তু রাজু জানে—ওর মুখের এই কথাটা এই বাড়ীতে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে এবং ও তারই প্রতিধ্বনি করছে মাত্র—কথাটা ওর নিজের নয়। ওর সঙ্গে বিতণ্ডায় কোনো লাভ নাই। বড় আশা করে রাজু আজ এখানে এসেছিল—ভেবেছিল, ওদের ছোট-লোকের ঘরে এসব কলংক খুববেশী ক্ষতি করতে পারবে না—মকরের বাবা রাজিই হবে ময়নাকে নিতে। এবং সেই আশাতেই বোনের ভবিষ্যৎ শ্বশুরকে রাজু 'বাবা' বলে সম্বোধন করেছিল আজ; নাঃ, এদের কাছে কোনো আশা নাই। রাজু কিরণের কথার কোনো জবাব না দিয়ে ফিরলো—পথে নামলো। যাবে কোথায়? সারসাই যাবে নাকি? গেলে মন্দ হয় না—ধেনো মদের দোকান আছে ওখানে—খানিকটা গিলে আসতে পারে। ট্যাকের পয়সাগুলো একবার বাজিয়ে নিল রাজু—আছে; অনেক-কটা পয়সা আছে! রাজু চলতে লাগল হনহন করে। রূপশা গাঁয়ের মাঝ দিয়ে পথ—দু'পাশের ঘরবাড়ী প্রায় জনশূন্য; লোক নাই বললেই হয়। কদাচিৎ কেউ বেরুচ্ছে—সব শীর্ণ, কঙ্কাল। এই গাঁয়ে অরুণ লায়েকের সঙ্গে চেনা আছে রাজুর। যাবে নাকি একবার? রাজু ঢুকে পড়ল অরুণের বাড়ীতে। রোগা, হাড়-জিরজিরে একটা বৌ বছর দুই-এর একটি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে আছে ঘরে। বাচ্চাটা মরেই গেছে হয়তো—বৌটা কিন্তু কাঁদছে না—চুপচাপ বসে আছে; রাজুকে দেখে মাথায় কাপড় টানতে গেল—টানবে কোত্থেকে। কাপড়

নাই—কোমরটুকু ঢাকা আছে মাত্র একটা গামছায়। রাজু বলল—অরুণ বাবু কৈ ঠাকরোণ? ঘরে নাই?

—জ্বর—মেজেতে শুয়ে আছে।

—তুমার কোলে ছেলেটির জ্বর নাকি?

—নাই—আখুনি গেল—চলে গেল। এক ঢোক দুধ পেলে না; ওরে আমার মাণিকরে···!

বৌটা অকস্মাৎ কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো। এতক্ষণ ও একেবারে কাঁদেনি কেন? কে জানে!

—চেঁচিও না—খবরদার বলছি, চেঁচিও না···অরুণবাবু ঘরের ভেতর থেকে বলল—মরে গেল তো করবো কি আর! কারো হাত নাই; কেউ মেরেও দেয় নাই ইচ্ছে করে···অরুণ বলছেই। বৌটা চীৎকার থামালো, কিন্তু ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। রাজু বুঝলো, না-খেতে পেয়ে এদের এই দশা। দেশশুদ্ধ লোকেরই এই দশা। এতে কারুর হাত নেই,—এতে, এই মৃত্যুর জন্য, এই মহামন্বন্তরের জন্য কারো কোনো দায়িত্ব নাই। এ বিধাতার খেলা—ইচ্ছে? হ্যাঁ, তাঁর ইচ্ছেই!

বৌটা তুলসীতলায় নামালো ছেলেটাকে। উঃ, কি বিশ্রী হয়ে গেছে ছেলেটা! গাল দু'টো গর্ত্ত হয়ে গেছে, চোখ দু'টো পাথরের মত—খোলা দৃষ্টি—কিন্তু ও মৃত্যুতে মুক্তি পেল। রাজু নিশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, অরুণ লায়েক টলতে টলতে উঠে এসে বলল—রেজো যে রে!

—হুঁ—রাজু ফিরে দাঁড়ালো। অরুণ বলল—তুর তো শুনছি আখুন রাজার হাল—আনা দুই পয়সা দিতে পারিস?

—পয়সা রাজু অনায়াসেই দিতে পারে। দেবার কথাও ভাবছিল সে, কিন্তু অরুণ লায়েকের মুখের ঐ "রাজার হাল" কথাটার মধ্যে ওর বোনের চরিত্রের যে ইঙ্গিত রয়েছে, তাই শুনে রাজুর মেজাজ চড়ে গেল।

বলল—দিতোম লায়েক, দিবার লেগেই এসেছিলাম, কিন্তুক আমার রাজার হাল কিসের হোল ?

—রাগ করিস না রাজু—অরুণ ভুল বুঝতে পারলো নিজের, সান্ত্বনায় বলল—আজ চার দিন খালি জল খেয়ে আছি, বুঝলি ! কাকে যে কি বলে ফেলি···দে, যদি থাকে।

একটা দু' আনি ছুঁড়ে দিয়ে রাজু বলল—লাও, দিলোম, তবে মনে রেখো লায়েক—ইটি ঐ রাজার হালের থেকেই রুজগার করা পয়সা, চারদিন বাদে তুমাকে এক দানা চাল দিল। বুঝলে লায়েক—আমার বুনের রুজগারে এনেক লুক খায় তুমার মতন··· রাজু চলে আসছে। লায়েকের কদর্য্য ইঙ্গিতটার জবাব দিতে পেরেছে রাজু, মুখের মত জবাব ! অরুণ লায়েক লোলুপ হাতে কুড়িয়ে নিল দু' আনিটা। রাজুর পিছনেই বেরুলো কিছু কিনে খাবার জন্য হয়তো। রাজু খানিকটা এসে পিছনে ফিরে তাকিয়ে বলল, —ছেলেটাকে ফেলে দিয়ে এস গা !

—সামর্থ্য নাই ভাই রাজু ! থাকুক ঐখানেই। তু চল্লি কুথাকে ?

—চল্লোম এই দিকেই। বৌটার চেহারা ভালো থাকতে থাকতে ছেড়ে দাও নাই কেনে ! ধর্ম্ম বিচে বেশ খইতে পাতো তুমাকে··· ! রাজু হাসলো মুচকে। রাগটা এখনো জ্বলছে ওর গায়ে, ওর মনে।

—রেজো !—অরুণ ধমক দিল যেন। হেসে উঠলো রাজু,— —থামো লায়েক, ঐ পথেই রুজগার করে আমাব রাজার হাল— বুঝলে ! তুমারও হতে পাতো ! বৌটোও সুন্দরই ছিল তুমার !

রাজু বিদ্যুৎ বেগে চলতে লাগলো। সে সইবে না—সইবে না আর কারো মুখের কোনো কদর্য্য কথা ; নির্ম্মমভাবে আঘাত করবে ও তাদের, যারা ওর বোন সম্বন্ধে কথা কইবে। কারুর সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব থাকবে না আর—কারুকেই রাজু আব খাতির

করবে না—ছেড়ে কথা কইবে না। ওর উষ্ণ মস্তিষ্কের মধ্যে গর্জ্জন করছে যেন বিষাক্ত কালসাপ। পথের ধারে একটা লোক মরে পড়ে আছে—পাঁজরার খানিকটা হয়ত শেয়ালে খেয়ে গেছে। লোকটার বয়স কম মনে হয়। মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে—রাজু দাঁড়িয়ে দেখল একটুক্ষণ—মরে গেছে—ও মুক্তি পেয়েছে! পৃথিবীর কোনো শালা কেউ আর কিছু করতে পারবে না ওর। মানুষ তো নয়ই—কুকুর শেয়ালও না—দুর্ভিক্ষ-মহামারী-রোগ-শোক, কারু বাবার সাধ্যি নেই—ওর কিছু ক্ষতি আর করে! বাঃ—এমন মুক্তি আর হয় না—তারণ ঠাকুর গায় সেই রবি ঠাকুরের গান :—

"মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান"—শ্যাম সমান—বাঃ বাঃ বাঃ!

শ্যাম সমান! এরা সব রাধা, সবাই এরা গোপীজন—সব মরণের সঙ্গে মিললো গিয়ে। কত দীর্ঘ দিনের বিরহ ওদের মিলনের আলোয় মধুর হয়ে উঠলো আজ—আহা, রাজু যদি দেখতে পেতো—যদি জানতে পারতো, ওরা কী আনন্দে রয়েছে এখন!

জানতে পারবে—রাজুও মরবে, খুব বেশী দেরী নাই আর! মৃত্যুকে কেউ এড়াতে পারে না। রাজুও পারবে না। তখন ওপারে গিয়ে রাজুও দেখবে ওরা কেমন মুক্তির আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মৃত্যুকে আর ভয় করে না রাজু—ভয় করবে না।

রূপশার পরে খানিকটা ডাঙা, তারপর শাল নদী, তার ওপারেই সারসা—মদের দোকানটা নদীর ঐ কিনারাতেই। ডাঙায় চলেছে রাজু। চোরকাঁটাগুলো ওর ধুতিতে ফুটছে—কাপড়টা সামলে নিল। নদীর বালিতে নামলো—দেখলো—চকচকে বালিতে এখানে ওখানে অসংখ্য মড়া পড়ে···শুকুচ্ছে সব—সব সেই মিশরের মমীর মত শুকিয়ে তৈরী হচ্ছে আগামী যুগের ঐতিহাসিকের গবেষণার খোরাক জোগাবার জন্য। সে-যুগের গবেষকরা ওদের হাড়গোড়গুলো পরীক্ষা করবে—তীক্ষ্ণ অস্ত্র

দিয়ে—সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মন দিয়ে, মনন দিয়ে, মানসিকতা দিয়ে—মজা করে পরীক্ষা করবে আর প্রবন্ধ লিখে নাম করবে। আজ থেকেই তাদের জয়ধ্বনি দেওয়া যেতে পারে। তারা আসবে—আসবেই—তাই জয়ধ্বনি দিয়ে আজ থেকেই তাদের আগমনীও গাওয়া যেতে পারে। তারা যখন আসবে, তখন এরা, এই মৃতের দল হয়তো আত্মিক অঙ্গ নিয়ে এসে দাঁড়াবে তাদের পিছনে—তাদের কর্ম্মে শক্তি সঞ্চার করবে—করবে—তাদেরকে স্নেহাশীর্ব্বাদে আপ্লুত করবে—করবে কি? কে জানে। তবে এরা মরলো ওদের গবেষণার খোরাক যোগাতে—ওদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে—ওদের উপাধি-সম্মান বাড়াতে—এতে সন্দেহমাত্র নাই!

শাল নদীর জলস্রোত একটু বেড়েছে গত রাত্রের বৃষ্টির জন্য। সামান্য বৃষ্টি হলেই এর স্রোত বাড়ে—আজ হাঁটুর উপর উঠেছে স্রোতটা। রাজু স্রোতে নামলো। ঐ সামান্য স্রোতেই একটা শিশুদেহ ভেসে যাচ্ছে—রাজুর পায়ে এসে লাগলো সেটা। ছেঁড়া কাঁথা সমেত মেয়েটাকে ভাসিয়ে দিয়েছে—আজই মরেছে মেয়েটা—এখনো তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশ সুন্দর—জলে ধুয়ে ঝকঝক্ করছে, যেন মেজেঘষে সোনার পুতুলকে সযত্নে ভাসিয়ে দিয়েছে—মাতা-ভাগীরথীকে উপহার পাঠাচ্ছে যেন কেউ তার বুক-ছেড়া ধন! হ্যাঁ—ভেসে ভেসে মেয়েটা অজয়ে গিয়ে পড়বে—তারপর অজয়ের স্রোত ধরে ভাগীরথীতেই পড়বে গিয়ে—মা-ভাগীরথী হাত বাড়িয়ে ওকে কোলে নেবেন। ও মুক্তি পেয়েছে—মা'র কোলে ফিরছে এবার।

রাজু মৃতদেহটা ঠেলে চিৎ করে দিল—সুন্দর চেহারা—যেন চাঁপাফুলের মালা একটি। না-খেয়ে শুকিয়ে মরেছে, নাকি বেশী খেয়ে ভেদবমিতে মরেছে, ঠিক বোঝা যায় না—কিন্তু দেখতে চমৎকার—যেন ঘুমুচ্ছে।

জলের কোমল শয়নে ঘুমুতে ঘুমুতে যাত্রা করেছে মার কোলে।—যা—যা—নিশ্চিন্তে চলে যা মাণিক!

রাজু এপারে এসে উঠলো। ধেনোমদের দোকানদার একটা সপে শুয়ে গান ভাঁজছিল—কেউ খদ্দের নেই—মদ খাবার সময় এখনো হয় নি—দুপুর বেলা। একটা মাত্র মাতাল মাটির একটা ভাঁড়ে মদ নিয়ে বসে আছে একটা বাঁশঝাড়ের ছায়ায়। হাতে দুটো ফুলুড়ি-বেগুনী। রাজু দেখেই চিনলো ন'-পাড়ার কিত্তিবাস গরাই। লোকটা ভয়ঙ্কর মাতাল, আর দস্যু। কতবার যে চুরি করে জেল খেটেছে তার হিসাব নাই। রাজুকে দেখেই বলল সে—আসো রাজু!

—হুঁ! যাই! রাজু এগিয়ে গেল ঐ বাঁশঝাড়টার দিকেই। কিত্তিবাস হাতের একটা বেগুনী এগিয়ে দিতে দিতে বলল—হোক—ইচ্ছে কর একটুস! বস—বস। রাজু বুঝলো, কিত্তিবাস রাজুর কেনা মদে ভাগ বসাতে চায়, তাই আগাম এই বেগুনীটা ঘুষ দিয়ে রাখছে। কোন কথা না বলে বসল রাজু—এই বেগুনীটাও নিল। তারপর দোকানীকে বলল—দাও গো এক পাণ্ট দাও দেখিনি!···উহো। দোকানী খদ্দের পেয়েছে—অতএব গানটা আরো জোরে গাইতে গাইতে উঠে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধেনোমদ আর ফুলুরী মুড়ী-ছোলাভাজা নিয়ে এল। রাজু কিত্তিবাসের মতন পাঁড় মাতালের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে মদ খাচ্ছে আর গান করছে। অশ্লীল, অভদ্র, ইতর লোকের মতন গান করছে রাজু। ওর রক্তে যে পূর্ব্বপুরুষার্জিত নোংরামী সুপ্ত ছিল—সেটার পূর্ণ প্রকাশ পাচ্ছে এখন। এই কিছুক্ষণ আগে রাজু কত বড় বড় কথা ভেবেছে—কত উচ্চশ্রেণীর চিন্তা করেছে, এখন আর সে সব কিছুই মনে পড়ছে না। এ রাজু যেন সে-রাজু নয়। রাজুর যেন এখন কোনো চিন্তা নাই। কোনো দুঃখ নাই, কিছু করবার নাই! পরমানন্দে মদের ভাঁড়টা নিয়ে গান ধরলো···

বর্ষাকালে ফর্সা দেখে দাঁড়কে উঠেছে

ও ভাই দাঁড়কে উঠেছে।

সুকাল বেলায় নদীর মানায় গুলাপ ফুটেছে—

রে ভাই গুলাপ ফুটেছে!

বাবুদের ঐ গুলাপ ছুঁড়ি···বয়স হোল বছর কুড়ি—

তার পিছুতে গুটাকতক ছোঁড়ে জুটেছে—

ও ভাই গুলাপ ফুটেছে।

মাথা নাই মুণ্ড নাই, গান চলেছে বাঁশঝাড়ের ছাওয়ায় বসে। রাজুর সাংস্কৃতিক সমস্ত চেতনা মগ্নতার অন্ধকারে। চৈতন্যের মধ্যে পূর্ণ প্রকট হয়ে উঠেছে তার জাতিগত, আর বংশগত কদর্যতা! ট্যাঁকের খুচরো পয়সা শেষ হবার পর ফতুয়ার আভ্যন্তরীণ পকেট থেকে দু'টো এক' টাকার নোট বেরুলো—শেষ হ'য়ে গেল মদে আর চাটে। মাংসের চাট, কিসের মাংস, জানবার কোনো দরকার বুঝলো না রাজু। নদীতে পড়ে থাকা ঐ মড়াগুলোর মাংসও হতে পারে—এমন সন্দেহ জাগল না ওর। প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি—দোকানী বলল—আর না রে, আর খাস না—যেতে লারবি।

—তু শালার ঘরেই থেকে যাব র‍্যা···দিবি না থাকতে! তুর তো শালা মা-বোনও নাই, ডর কি আছে! আমি শালা রাজু ডোম·· বুঝলি···টাকার ঝুড়ি পাবি—হুঁ!

মাতালদের কাছে এরকম খারাপ কথা শোনা দোকানীর অভ্যাস। কি করবে—খদ্দের, তা ছাড়া মাতাল। দোকানী আর একবার বলল—যা শালা ঘরকে যা—খাস না আর!

—ঘরকে যাব? ঘরে কি আছে বাবা সাঙাৎ? মাগ না ছেলে, ঢেঁকি না কুলো? আছে এক শালি বুন—তা, সি শালীর আজকাল. পাখা হইছে···বুঝলি ভাই কিত্তিবাস—উ শালীকে কেটে খণ্ডখণ্ড করে

দিতোম—কী করবো—বুন। করুকগা যার যা খুসী। আমি বাবা—বুঝলি কিত্তি—কুনো শালার তাঁবে খাটি না—হুঁ! মদ খাব না তো কি ডরাব নাকি ব্যা শালা?

দোকানী আর কিছু বলল না—কারণ মাতালকে থামানো প্রায় অসাধ্য। কিন্তু কিত্তিবাসই ওকে টেনে তুলে নদীতে নামালো। রাজু টলছে—ভীষণ রকম টলছে! কিত্তিবাস কিন্তু আশ্চর্য্য মাতাল। স্থির ধীর পায়ে সে রাজুকে পার করালো নদী—এপাশেও খানিকটা পথ একসঙ্গে এল—রূপশা গাঁ'টা পার করে দিয়ে লাটকোনার ডাঙায় তুলে দিয়ে বলল—যা, ইবার চলে যা ঘরকে!

—চলে যাব? কুথাকে চলে যাবো! কুন শালার ঘর! কুন শালী বিছানা পেতে রেখেছে··· ? গান ধরলো রাজু·

শেজ বিছাইয়ে মালাটি গাঁথিয়ে বাঁধিয়ে মাথার কেশ

আমি সারাটি রজনী জাগিয়ে কাটান্থ, বঁধু গেল কোন দেশ?

কিত্তিবাস আর অপেক্ষা না করে চলে গেল। রাজু টলতে টলতে ফিরছে আর গান করছে। শ্রাবণ ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্না—সুন্দর, শুভ্র, সুকোমল। প্রকৃতিস্থ থাকলে রাজু কত কথা ভাবতে পারতো, কত ভাল ভাল গানের কলি বাঁধতে পারতো।

রাজু টলছে—চলছেও—গানও চলছে। শঙ্করের বাড়ীটাই কাছে পড়ে—ঢুকে পড়লো।

—সাঙাৎ—সাঙাতিন্—আছে নাকি হ্যা সাঙাতিন্!

শঙ্কর কোথায় গেছে, ওর বৌ জবা ঘর থেকে সাড়া দিল,—এসো সাঙাৎ—উ ঘরে নাই।

—ঘরে নাই! বেশী হয়েছে মাইরা। বসো তো তুমি সাঙাতিন একবার আমার কাছে—যেমন সেই···'শ্যামের বামে রাইকিশোরী!—সুর করে বললে রাজু—বসো, বসো, ডর কি! রাজু অকস্মাৎ জবার

আঁচলটা টেনে ধরলো। জবা ভয় পেয়ে গেছে। রাজু তো এরকম করে না—এ কি! এত বেশী মাতাল কোনো দিন হয় না রাজু। জবা ভয়ে ভয়ে বলল,

—উ কি সাঙাৎ—উ কি! উসব কি বলছো···ছিঃ ছাড়, ছাড। কেউ এসে পড়বেক আখুনি!

—কুন শালা! কার বাবার সাধ্যি তুমাকে আজ আমার কাছ থেকে লিয়ে যায়···?

রাজু মত্ত আবেগে জড়িয়ে ধরলো জবাকে। জবার ভয় শঙ্করকে। শঙ্কর মন্তরের জোরে সব জানতে পারে···আর জানতে পারলেই ভেঁড়া-ছাগল করে দেবে মন্তর পড়ে। তবুও জবা মিনিটখানেক চুপচাপ থেকে গেল। রাজু ওর দেহখানাকে পিষে ফেলবার উপক্রম করছে যেন। জবা বলল—ছাড়ো সাঙাৎ, ছাড়ো—উঃ!

—না—হারামজাদী—কাঁহাকা! সাঙাৎ! তুর বাবার সাঙাৎ, তুর চৌদ্দ পুরুষের সাঙাৎ আমি? লয়?

জবা অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে—রাজু ওকে মেরেই ফেলবে নাকি! চেঁচিয়ে বলল—ছাড়—মা মনসার দোহাই—শ্যাম রায় কালো রায়ের দোহাই···ছাড়—।

—ধোত্তেরি শ্যাম রায়! শ্যাম রায় তুর বাবা হয়···চলে আয়··· আয় ইদিকে··! জবাকে টানছে রাজু সজোরে। জবা জানে, শঙ্করের আসতে দেরী আছে—সে গেছে বাগডহরী—ভূত ছাড়াতে। আজ না-ফিরতেও পারে। কাজেই সে দিকে ওর ভয় কিছু নাই, কিন্তু শঙ্করের মন্ত্রকে ওর বড় ভয়। বলল—

—যদি জানতে পারে তো ভেঁড়া করে ছাড়বেক—বুঝলে!

রাজু একটা কদর্য্য অশ্লীল কথা বলে উঠলো শঙ্করের উদ্দেশ্যে। জবাও যেন কেমন হ'য়ে গেছে। আত্মসমর্পণের ইচ্ছাটা ওর ক্রমশঃ জোরালো.

হয়ে আসছে। ভাবছে—মন্ত্রের জোরে সত্যি কি আর ভেঁড়া করা যায়! দূর! ওসব মিছে কথা।

বহুদিন রাজু নারী-সঙ্গ বর্জিত—। বহু বহু দিন। ওর উদ্দামতা এতদিন যেন সুপ্ত ছিল, আজ হঠাৎ বন্ধাছেঁড়া ঘোড়ার মতই মনটা মুক্ত হয়ে গেছে। রাজুর সমস্ত শিক্ষাকে ডুবিয়ে দিয়ে বানভাসী হয়ে যাচ্ছে কামনার গৈরিক স্রোতোধারা। ওর আত্মরক্ষা করবার কোনো উপায় নাই আজ। জবা যেতে যেতে বলল—

—তুমার হোল কি আজ সাঙাৎ! তারণ ঠাকুরের সাকরেদ্ তুমি· !

তারণ ঠাকুর—হ্যাঁ, তার সাকরেদ রাজু! রাজু সেই ঋষিবংশধরের শিক্ষার অসম্মান করছে। তারণ ঠাকুরের "কদম ফুলের"-এর কবিতা মনে পড়ল—

"মরণের বীথিকায় জীবনের জয়গান—জীবনের যাতনায়

মৃত্যুর মাধুরী

জীবনের জয়গানই বাজাতে চাইছে তো রাজু হ্যাঁ, জীবনের জয়গানই, কিন্তু জীবনের যাতনায় যে মৃত্যুর মাধুরী জাগে। দেহের কঙ্কালে বন্দী জীবনের যাতনা যে মৃত্যুর মাধুরীতেই মুক্তি পায়—জীবনের সাধনার চেয়ে মরণের সাধনা আরো বড় আরো মহান, রাজু ছেড়ে দিল অকস্মাৎ জবার হাত।

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাবে নাকি রাজু? জবা কিন্তু অদ্ভুত, আশাহত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে। বলল হেসে—কি হোল সাঙাৎ? হোল কি তুমার আবার?

—না—কিছু না! সাঙাৎ কৈ সাঙাতিন্? গেল কুথাকে?

—বাগডহরী গেইছে। আজ বুধ হয় আর আসতে লারবেক। এনেকটো রাস্তা।

—হু···আচ্ছা! চল্লোম তা'হলে·· রাজু ফিরতে গেল। জবা

ত্বরিতে ওর বুকের কাছে এসে বলল—কেনে সাঙাৎ, কেনে? যাবে কেনে হে?···আমি তো কিছু বলি নাই!

—না···বলবে কি আবার! যেতে হবে। ময়না একলা আছে। রাত হোল—ছাড়···।

—সি কি সাঙাৎ! জবার দুই চোখে কামনার উগ্র ক্ষুধা—নারীর মোহনীয় মায়া···!

নারী—রক্ত আর মাংস দিয়ে সৃষ্ট ঈশ্বরের ইন্দ্রজাল। ওদের জন্যই মানুষ ঘর বেঁধে মায়ার শ্রেষ্ঠ বন্ধন সন্তান-সন্ততির সোনার বীথি রচনা করে;—ওরাই বাধ্য করে মানুষকে ঐ রকম করে ঘর বাঁধতে—জীবনের বন্দিত্ব স্বীকার করে নিতে। জীবন-দেবতার হাতে ওরাই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র! ওদেরই আশ্রয়ে জীবন লালিত হয়, পালিত হয়, শৃঙ্খলিত হয়—জীবনের যাতনায় মৃত্যুর মাধুরী ফোটাতে ওরাই দেরী করে দেয়। ওরা সাবিত্রী হয়ে স্বামীকে বাঁচায় সংসারে বন্দী করবার জন্যই—একশ'টা ছেলের বাপ করবার জন্যই। ওরা বেহুলা হয়ে কঙ্কালগুলোকেও বন্দী করে রাখে—নাচে-গানে দেবতাদের খুসী করে লখিন্দরের কঙ্কালকে ওরা জীবনের গণ্ডীতে শৃঙ্খলিত করে। আশ্চর্য্য! যেখানে যত নারীর চরিত্র মনে পড়ছে রাজুর—সবাই এমনি—এই বন্ধনের রজ্জু—হ্যাঁ, সবাই। মুক্তি এরা দিতে চায় না—জবাও দিতে চাইছে না মুক্তি রাজুকে। জবা ওর হাতটা ধরে বলছে—চলো সাঙাৎ ঘরকে চল ভাই···ই সময় আর যেও না!

—পিশাচী! রাক্ষসী! রাজু হ্যাঁচ্‌কা টান দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল। মুক্ত।—এই পাপ থেকে মুক্ত হবেই সে—ছুটে বেরিয়ে চলে গেল রাজু গ্রাম পথের মাঝ দিয়ে। শ্রাবণী জ্যোৎস্নায় ওর সাদা ফতুয়াটা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। জবা অবাক!

* * *

গোয়াল-ঘর সংলগ্ন ছোট্ট ঘরটীতে বারুণী বন্দিনী। সারাটা দিন ওর

একলা কেটেছে। মাঝে একবার নাটু স্বয়ং এক বালতি জল আর একটা গামছা দিয়ে গিয়েছিল স্নান করবার জন্য, আর একবার নাটুর পুরোনো চাকর শামু এক থালা ভাত দিয়ে গিয়েছিল। ঐ খেয়েই বারুণীর কেটেছে সমস্ত দিনটা। বাগে বারুণী ফুলে ফুলে উঠছে, বার বার ঠোঁট কামড়াচ্ছে আর বলছে,—দেখে লিব আমিও। কিন্তু কি করে নাটুকে সায়েস্তা করতে পারে তার মত একটা ক্ষুদ্র মেয়ে, সেটা ও তখন চিন্তা করেনি। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে বারুণী একটা মতলব ঠিক করে ফেললো। আচ্ছা, সে দেখে নেবে—দেখেই নেবে একবার ভাল করে নাটুকে। সে কলঙ্কিনী, সে তার যৌবন বিক্রী করে বেঁচে থাকে- এ-কথা জেনেছে লোকে—আরো ভালো করে জানুক—সে নিজেই জানিয়ে দেবে। সমস্ত দিনের বন্দিত্বের বেদনা ওকে ভীষণ এক সংকল্পে সুদৃঢ় করে দিল। বন্ধনের বেদনা ওর জানা ছিল না। মুক্ত বিহঙ্গিনার মত ও ছোটবেলা থেকে যা-খুসি করে এসেছে, যেখানে ইচ্ছে গেছে, যার সঙ্গে ইচ্ছে মিশেছে। ওকে কেউ কিছু বলেনি বলেই ও ছিল সরল আর স্বচ্ছ। কুটিলতা ও জানলো না। তাই কিষ্টর ঘরে ও যতদিন ছিল, এক মুহূর্ত্তের জন্য অবিশ্বাসিনী হয়নি। সবাই ওকে সদিন বিশ্বাস করতো, ভালো বাসতো। তাই অভাবের দিনে কিষ্টকেই একলা পেটে খাবার সুযোগ দিয়ে ও বাপের বাড়ী এসছিল—ভেবেছিলো সুসময় এলেই আবার যাবে কিষ্টর কাছে। কিন্তু সুসময়ের বদলে এল দুঃসময়—মড়ক, মন্বন্তর। কিষ্ট ওকে আর এখন খাওয়াতে পারবে না,—তাই গেল না শ্বশুরবাড়ী। তার পর বাপের বাড়ীতেও খাদ্যাভাব ঘটলে ও যায় ঐ নদীপারে খাটতে। যে-আড়কাঠি ওকে আর ময়নাকে নিয়ে গিয়েছিল ভুলিয়ে—তাকে ওরা এখন আর দেখতে পায় না। প্রথম প্রথম ওসব লোককে ঘৃণাই করতো ওরা—হয়তো এখনো ঘৃণাই করে, কিন্তু ওখানে না গেলে খাদ্য জোটে না। বাঁচবার প্রয়োজনের তাগিদেই ওদের যেতে হয়। আরো কত গাঁয়ের কত

মেয়ে যায়—যেতে বাধ্য হয়। এখন যায়—দিন-সময় ভাল হলেই আর যাবে না—এই ছিল ওর মত, আর ওর মা'র ছিল তাই অভিমত। ঐ নিয়ে কোনো হৈচৈ ঘটবে—জানতো না বারুণী। কিন্তু আজ যতখানি হৈচৈ ঘটেছে তা বিপর্য্যয়কর। নাটু কাল সারাটা রাত ওকে ধমকেছে—সোহাগ করেছে—আদর করেছে—টাকা, পয়সা, চাল, ডাল দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—কিন্তু নাটুর আর কি এমন পয়সা বা চাল আছে! থাকলেও বারুণী বিশ্বাস করে না নাটুকে। শেষে ঐ কুন্তির দশা হবে তো! বারুণী অত বোকা হবে না।—তা ছাড়া, কাল যা হবার হয়ে গেছে—আজ এখনও বারুণীকে নাটু বন্দী করে রাখলো—আর বারুর মা-বাবা কেউ ছাড়াতে এল না—দেখতে পর্য্যন্ত এল না! বাহা রে! বেশ তো! বাবা আবার কাল গালমন্দও দিয়েছে। বাঃ! বলে সেই—"যার জন্য চুরি করি—সেই বলে চোর—" বারুণীর নিদারুণ অভিমান হচ্ছে মা-বাবার উপর। আবার ভাবছে, নাটু হয়তো তাদের ঢুকতে দেয়নি—সেইটাই সম্ভব।

বন্দিনী বারুণীর চোখ জলে ভরে উঠেছিল কাল রাত্রে—আজ সকালেও। কাকুতি মিনতি করেছিল নাটুর কাছে তাকে মুক্তি দেবার জন্য···এমন কি, আত্মসমর্পণ করে নাটুর কাছে থাকতেও চেয়েছিল, কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী—নাটু তালা দিয়ে বন্দীই করে রাখলো তাকে। আচ্ছা! বারুণী এবার দেখে নেবে কেমন নাটু!

ওর সমস্ত অন্তর নাটুর বিরুদ্ধে, ওর মা-বাপের বিরুদ্ধে, এমন কি গাঁয়ের সকলের বিরুদ্ধে গর্জ্জে উঠতে লাগল। বেশী অভিমান হচ্ছে ময়না আর বাজুর উপর। ময়না একটিবার খোঁজও করলো না। আশ্চর্য্য! প্রতিদিন বারুণী ঊষার আগেই ময়নাকে জাগিয়ে দেয় গিয়ে। নারদ বোরেগী টহল দিতে বেরুবার আগে উঠে বারুণী যায় ময়নার বাড়ী—ঘুম-কাতুরে ময়না তা' নইলে উঠতে দেরী করে ফেলবে। সেই ময়না, যাকে পাঁচ ছ' মাস বারুণী ছোট বোনের মত দেখে এসেছে, সব রকমে সাহায্য

করে এসেছে, শিখিয়ে এসেছে, কি ভাবে তার আশু বিপদটা থেকে উত্তরে যেতে পারবে—সেই ময়না একবার খোঁজও করলো না তার! আশ্চর্য! ময়নার উপর রাগ, অভিমান, বিদ্বেষ জলন্ত হ'য়ে উঠলো বারুণীর অন্তরে! ভাবতে লাগল—ময়না যদি নদীর ওপারে যেয়ে ঘোষ সাহেবকে বারুণীর বিপদের সংবাদটা দিত, তা'হলে এতক্ষণ ওখান থেকে জমাদার এসে নাটুকে হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যেত। ময়না সে কাজটা অনায়াসেই করতে পারতো—করলো না—খোঁজও নিল না!

ওখানে যারা কাজ করতে যায়—তাদেরকে কাজ করতে নিষেধ করা আইন-বিরুদ্ধ। নাটু শুধু নিষেধই করেনি, বন্দী করে রেখেছে বারুণীকে··· আচ্ছা!

বন্দিনী বারুণী জানালার গরাদে মাথা রেখে ঝিমুচ্ছে আর সামনের পথপানে চাইছে। হুঁকো-কলকে হাতে যদি কেউ যায় এই পথে তো কলকেটা চেয়ে নিয়ে দু'টান টেনে নেবে। কিংবা বিশেষ বন্ধুলোক কেউ যদি যায় তো একটা বিড়িও চাইতে পারে। কাল থেকে ও তামাক খেতে পায়নি। মুখটা কেমন বিস্বাদ হয়ে রয়েছে—মাথাটা খালি খালি লাগছে। নাটু যদি গোটাকতক বিড়ি আর দেশলাই দিত তো এতটা কষ্ট হত না বারুণীর। হতভাগা মোড়ল একবার ভেবে দেখলো না যে, খুব ছোটবেলা থেকে বারুণীর তামাক খাওয়ার অভ্যাস। বারুণী ভাত না খেয়ে একটা দিন অনায়াসে থাকতে পারে—কিন্তু তামাক না খেয়ে থাকা ওর পক্ষে বড়ই কষ্টকর।

গুটগুট্ করে কে যেন যাচ্ছে এই পথে। শ্রাবণী জ্যোৎস্নায় বারুণীর চোখ চিনে ফেললো লোকটাকে···ডাক দিল—রাজুদা···ও রাজুদা··· শোন শোন!

রাজু তখন মাতাল, অপ্রকৃতিস্থ, তারপর জবার কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে রাজু! জবা নারী···নারীকে রাজু আর বিশ্বাস করতে পারবে না।

নারী-কণ্ঠের আহ্বান ওর কানে বীভৎস মনে হচ্ছে! ভাবলো, জবাই বুঝি আসছে পিছনে পিছনে। উত্তর না দিয়ে রাজু আরও জোরে ছুটে পালাতে চাইছে। আবার ডাক এল, 'আমাকে কুলুপ দিয়ে রেখেছে! অ রাজুদা··· দেখে যাও, আমাকে চাবি এঁটে রেখেছে নেটো মোড়ল!'

রাজু শুনতে পেল কথা কয়টা। কে তা'হলে! কাকে রেখেছে নাটু কুলুপ দিয়ে! ও, বারুণীকে! সকালে বারুণীর মা আর কিষ্টর কথাগুলো মনে পড়ে গেল রাজুর। তাহলে বারুণীই ডাকছিল। ও হয়তো নাটুর ঐ গোয়ালঘরে বন্দিনী। রাজু ফিরে এল। বারুণী অভিমানে কেঁদে ফেলেছিল—ভেবেছিল, রাজু আসলো না ইচ্ছা করেই।

—কে। বারুণী?—এইখেনে ভরে রেখেছে তুখে?

—হুঁ—বারু কান্নাভরা গলায় জবাব দিল জানালার ওপার থেকে। রাজু কি করবে ভাবছে—বারুণী বলল আবার—ময়নাকে বলে ঘুষ সাহেবকে খবর দিতে পার না রাজুদা···তাহলে দেখতোম নেটো মোড়ল কেমন মরদ। চুটি আছে রাজুদা।

বিনা বাক্যব্যয়ে রাজু বিড়ি দেশলাই বার করে দিল ফতুয়ার পকেট থেকে। পরমাগ্রহে জানালার ফাঁকে বিড়ি দেশলাই নিয়ে বারুণী ধরিয়ে ফেললো বিড়িটা।

আঃ কি আরাম! অমৃতও এত মিষ্টি লাগে না। বারুণী কয়েকটা টানেই বিড়িটা শেষ করে আনলো—রাজু তখনো দাঁড়িয়ে। বারুণী বলল—আর একটো দাও বিড়ি। রাজুর কাছে গোটাচারেক বিড়ি ছিল তখনো—সব কটাই ওর হাতে দিয়ে বলল—ভাবিস না—আমি দেখছি কদ্দুর কি করতে পারি। ময়না আজ যায় নাই ওখেনে।

—কেনে? ইকলা যেতে লারলো—না কি? আচ্ছা ডরুক মেয়ে কিন্তুক ময়না!

বারুণী বেশ সহজ ভাবেই হেসে কথা কইল। কোনকিছু ভাববার

নাই। ও যে বন্দিনী সেটা গ্রাহ্য করবার মত এমন কিছুই ব্যাপার নয় এখন। মেয়েটা অমনি। যখন যেটা ভাবে, খুব ভীষণভাবেই ভাবে··· আবার ভাবে না তো একেবারেই ভুলে যায় সে ভাবনা। বাজু বড়দাদার মতই সস্নেহে প্রশ্ন করল—

—খেয়েছিস কি? খেতেও দেয় নাই নাকি?

—দিইছিল। ভাত, ডাল, বামঝিঙের চচ্চড়ি আর আমড়ার টক। খেয়েছিলাম।

ও চলে যাওয়ার পর বারুণী বিড়ি চারটি আর দেশলাইটা পরম যত্নে লুকিয়ে রাখলো ঘরের একটা ছোট কুলুঙ্গীতে। নাটু এখনো আসে নাই—আসবে নিশ্চয়ই এতে কোনো সন্দেহ নাই বারুণীর। বুড়ো খাসীটাকে আজ ঘর থেকে বার করে গোয়ালের ওদিকে বাঁধা হয়েছে দুপুর বেলা থেকে। ঐ খাসীটা তবু বারুণীর সঙ্গী ছিল। ওর গায়ে হাত বুলিয়ে—ওকে আদর করে, ওর সিং-এর খাঁজগুলো গুণে গুণে সকালটা একরকম কাটিয়েছিল ভালই। তারপর থেকে একেবারে বারুণী একা। সারাটা দিন—শ্রাবণ মাসের সুদীর্ঘ দিন পার হয়ে গেল। একটু বৃষ্টি হয় নাই যে ধারাবর্ষণ চেয়ে দেখবে—কড়া রোদে গোটা দিনটা যেন পুড়েছে আজ। গাছপাতা সব শুকিয়ে গেছে—কালকার বৃষ্টিতে যতটুকু যা ভিজেছিল। পিপাসা পেয়েছে বারুণীর, কিন্তু জল নাই আর। নাটু এলে একটু জল চাইবে। রাত বোধ হয় বেশী হয় নি।

বারুণী ঘরের মেঝেটায় বসল। প্রায় অর্দ্ধ-উলঙ্গ আছে ও। নাটুর দেওয়া কাপড়খানা বড্ড পাতলা ছিল—আর পুরোনো ছিল, পাছার কাছে ছিঁড়ে গেছে। ওর নিজের কাপড়খানা কোথায়, কে জানে। খুঁজে পাচ্ছে না বারুণী। হয়ত বাইরে শুকুতে দেওয়া আছে। ক'দিন এমন করে বন্দী থাকতে হবে, কে জানে!

—বারু! শুনছিস। ও বারু! জানালার ওদিকে কে ডাকছে।

বারুণী চিনলো, কিষ্ট ডাকছে ; ঐ মুখপোড়ার জন্যই অত কষ্ট। রাগে বারুণীর মুখখানা কুৎসিৎ হ'য়ে উঠলো। বলল—কিবে আঁটকুড়ির ব্যাটা—কি বলছিস্! নাটু মুড়লের সঙ্গে বৌ-ভাগ করতে এলি নাকি রে হারামজাদা ?···ভাগ···ভাগ ইখান থেকে বারুণী রুখে উঠে দাঁড়াল।

কিষ্ট রাগ না করে বলল—বুঝতে লেরেছিলাম বারু···রাগিস্ না—শুন্।

—শুনতে লারিগা আর! যা, পালা ইখান থেকে। তুর মুখ দেখতে চাই না—বে-আক্কেলে ছুঁড়া কুথাকার!

—শুন্—শুন্ বারু! আমি থানায় গিয়ে খবর দিব ইজেহার দিবার সময় তু বলিস যে, নাটু জুরজবরদস্তি তুখে···

—হুঁ রে আঁটকুড়ো—বলবো তাই। আমার দায় পড়েছে মিছে কথা বলতে! আমি বলবো যে কিষ্টে হারামজাদা একপাই চাল নিয়ে আমাকে বিচে দিয়েছে নাটুর কাছে! দেখিস বলি কি না·।

—বলবি! বলবি তু এমন মিছে কথা ?

—মিছে কথা! মিছে কথা হোল খালভরা ? · বিচিস নাই তুহ ? তুই বিক্কি করিস নাই আমাকে ?

—না, বারু না! বিক্কি করবো কিসের লেগে! তুখে নিয়ে ঘর করতে চাইছিলোম।

—কে ? ওদিক থেকে যেন ডাকলো। আলো হাতে আসছে লোকটা। নাটু নাকি! হ্যাঁ নাটুই! কিষ্ট চাপা-গলায় বলল—আমি আসবো আবার—বুঝলি ? পালিয়ে গেল কিষ্ট। নাটুর ভয়ে নিজের বিয়ে-করা-বৌ-এর কাছ থেকে ওকে পালিয়ে যেতে হোল। ওর দুর্ভাগ্য! নাটুকে কিছু বলবার ওর উপায় নাই, কারণ, নাটু ওকে তেরটা টাকা দিয়েছে আর লিখিয়ে নিয়েছে হ্যাণ্ডনোট। সেই হ্যাণ্ডনোটে কি যে লেখা আছে, কিষ্ট জানে না—টাকা ক'টা নিয়ে টিপসই ক'রে দিয়েছে···। সাক্ষী আছে কুমদীশ, হরি, শম্ভু—নাটুরই সব তাঁবেদার যারা। কুমদীশই

বলেছিল চুপি চুপি···'বৌটাকে বিচে দিলি র‍্যা?' টাকা ধার করলে যে বৌ বেচা হয়—কিষ্ট জানতো না—হ্যাণ্ডনোটের সর্ত্ত "টাকার সুদসমেত চাহিবামাত্র দিবার অঙ্গীকার"—কিন্তু কুমদীশ বলছে যে· ·'ঐ টাকার দায়ে তুখে আর বারুর সঙ্গে কথা কইতে দিবে না নাটু! তুখে গাঁ থেকে তাড়াবে!'

টাকাটা কিন্তু কিষ্টর বড্ড দরকার ছিল। শীতকালে একটা কাবুলীর কাছে কিষ্ট চাদর কিনেছিল একখানা· তখন কি জানতো যে, দেশের এমন দিন হবে! কিষ্ট তখন ভালই রুজগার করতো। সেই কাবুলী কিষ্টকে ডালকুত্তার মতন লেগেছে এখন। পাঁচ টাকার চাদর—তার দাম তের টাকা লিখে নিয়েছিল—সেই টাকা তেরটি আজ নাটু দিল কাবুলাকে আর কেষ্টকে লিখিয়ে নিল হ্যাণ্ডনোট। কিষ্ট দিতে না কাবুলীকে টাকা। দেবার ওর মোটে ইচ্ছে ছিল না—কিন্তু নাটু বলল- তুই আখুন আমার ঘরে থাকবি—আমার ঘরে কাবুলা এসে তুকে টাকার তাগাদা করবে—এ সব চলবে না কিষ্ট আমার মান থাকবে কেনে? আমিই দিচ্ছি···সুময়কালে উশুল দিস।· কিষ্ট নিরুপায় হয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়েছে—টাকা নিয়ে কাবুলা চলে গেলে। তারপর কুমদীশ বলেছে কিষ্টকে যে, ঐ তের টাকায় নাটু কিনে নিল বারুণীকে! কিষ্ট বিশ্বাস করে নাই প্রথম। নাটুকে জিজ্ঞাসা করবে ভেবে তার কাছে যেতেই নাটু বলল—

—বৌ পুষবি কি দিয়ে রে হারামজাদা· আমার ঘরেই চাল নিয়ে তো! তার থেকে থাউক আমার ঘরেই···নদীপারে না যেয়ে গাঁয়েই রইল—যা—কাজ করা গা তু।

ব্যাপারটা বুঝতে কিষ্টর দেরী হয় নাই। তারপর গিয়েছিল সে বারুর মা'র কাছে। কিন্তু সে তো গাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে—রাজুও বলছে থানায় গিয়ে লাভ বিশেষ হবে না। কিন্তু কিষ্ট সারা দিন ভেবেছে, কি করবে—কেমন করে উদ্ধার করবে বারুণীকে।

পালিয়ে গেল কিষ্ট—বারুণী হাসলো মুচকি হাসি! ব্যঙ্গের হাসি! হতভাগা ছুঁড়া! নাটু এসে পৌছালো—হাতে একটা শালপাতার ঠোঙ্গাতে গোটা কয়েক সেঁকা রুটি, একটু গুড আর একটু ডাল, তবকারী—বাঁ হাতে লণ্ঠন আব জলের ঘটি। বারুণীর ঘরের দবজা খুলতেই বারুণী সমাদবে বলল—সারা দিনটো না খাইযে রাখলে মোড়ল—কি অপবাধ কবেছি তুমার?

—সে কি রে—দিনে ভাত দেয় নাই?—নাটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালো, তারপর বলল—কে কথা কইছিল র‍্যা—কিষ্টে এসেছিল নাকি? উ হারামীকে তো তাড়াইয়ে দিয়েছি আমি।

—বেশ করছে মোড়ল! দাও, কি আনলে দাও দেখি। দিনে চাট্টি ভাত খেইছিলেম—তা, উ ক'টি ভাতে হয় নাকি আমার! দাও—কি এনেছ—রুটি? বেশ!—বারুণী ঠোঙ্গা খুলে দেখল।

—একটুস বাইরে যাব মোড়ল—বিশ্বেস না কর তো তুমি সঙ্গেই চল—বারু বলল একর্টু পরে।

নাটু জানে—যৌবন এদেব ব্যাঙ্ক নোট—সুবিধে মত ভাঙ্গিয়ে খায়। নাটুকে অগ্রাহ্য করবার বা নাটুর উপব রাগ করবার বিশেষ কোন কারণ নাই বারুণীর। বলল,

—যা—ঐ উঠোনে যেযে হাত-মু ধুযে আয় গা—নাটু ঘরের মধ্যে বস্তাটায় বসল।

—যদি পালায়ে যাই!—বারুণী বলল হাসতে হাসতে। কর অর্দ্ধোন্মুক্ত অঙ্গলাবণ্য সারাদিনের গরমে আর বন্দিত্বের বেদনায় স্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে। সেইদিকে তাকিয়ে নাটু বলল—আমি নাকি এতোই বোকা রে বারু! উঠোনের উদিকে সদবে কুলুপ দিয়েছি, দেখেছিস?

সত্যি! ঘরটার পরেই যে ছোট্ট উঠোনটুকু—তার চারিদিকে উঁচু পাঁচিল—একটামাত্র বড দরজা—নাটু তাতে ভিতর থেকে তালাচাবি দিয়ে এসেছে। বাঃ, নাটু মোড়ল বেশ হুঁসিয়ার। বারুণী বলল—

—অঃ মুড়ল, তা'হলে বিশ্বেস করলে না—বল? বেশ।

সাবধানে বিড়ি তিনটি আর দেশলাইটা নিয়ে ও বেরিয়ে এল—, জলের ঘটিটাও নিল হাতে। নাটু ঘরের মধ্যে বস্তাটায় বসে তামাক টানছে। বারুণী উঠোনে নামলো। ঘাস আর জঙ্গল উঠোনটায়। একপাশে এসে মুখটা ধুলো বারুণী—জল খেল খানিকটা। নাটু ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্তে তামাক খাচ্ছে। বারুণী আস্তে এগিয়ে এসে ঘরের দরজাটা টেনে দিতে দিতে বলল,—লাজ লাগছে মোড়ল—কাপড়টো ছাড়বো হে—দুয়োরটো একটুস বন্ধ করছি।—নাটু হাসলো। বারুণীদের মত মেয়েরও লাজ লাগে। বারুণী বাইরে থেকে দরজাটা টেনে শিকল তুলে দিল। যে তালাচাবিতে এতক্ষণ বারুণী বন্দী ছিল, সেটাও রয়েছে—চট্ করে বারুণী তালা বন্ধ করে দিল ঘরে। ভিতরে লণ্ঠন, বাইরে জ্যোৎস্না; নাটু তখনো নিশ্চিন্তে ভাবছে, বারুণী কাপড় ছেড়ে আসবে এখনি। হঠাৎ বারুণী বাইরে খিলখিল করে হেসে উঠল।···কেমন! দেখ আখুন মজাটি—মজাটি দেখ আখুন··· বলেই বারুণী দরজাটা একটু ঠেলে দিল ভিতর দিকে—দুপাট কপাটের মাঝের ফাঁক দিয়ে বলল,

—ইবারে! থাক্ হারামজাদা মুড়োল···তুর কুন বাবা আছে দেখি··· বারুণী বিড়ি মুখে দিয়ে দেশলাই জ্বালল।

নাটু এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে। সভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ই কি রে বারুণী! খোল— খোল—খুলে দে! বারুণী···!

—এই যে, দি খুলে—জন্মের মতন খুলে দিলোম··। হঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ···এই লাও!

বিড়ি ধরানো দেশলাই-কাঠিটা বারুণী ঘরের চালে ঠেকাচ্ছে। আতঙ্কে নাটু চীৎকার করে উঠলো—তোর পায়ে ধরছি বারুণী—খুলে দে, খুলে দে—।

—হিঃ হিঃ হিঃ;—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—প্রেতিনীর মত হাসছে বারুণী।—দেখুন গো—মোড়ল—মজাটি ক্যামন লাগছে?

গতকালের ভিজে চাল—আজও ভালরকম শুকোয় নি, ধোঁয়াচ্ছে—বারুণী উঠোনের মাঝে এসে বিড়ি টানতে লাগল। কিন্তু বারুণীও বেরিয়ে পালাতে পারবে না—উঠোনের ওদিকে সদর দরজা বন্ধ; তবে বারুণী উঠোনে রয়েছে—তাই অনেকটা নিরাপদ। নাটু দরজার ফাঁকে কাতরস্বরে বলছে,

—তুর পায়ে পড়ি বারু—খুলে দে—তু যা চাইবি, তাই দিব—বারু, দে খুলে—ওঃ পুড়ে মরলোম—আগুন—আগুন! ওবে কে আছিস,—আগুন—নাটু সজোরে চীৎকার করছে।

—হিহিহিহিঃ—প্রেতিনীর হাসি।—ঘরে কুলুপ দিয়ে রাখার মজাটি দেখ মোড়ল—দেখছো!

বারুণী বিড়িটায় জোরে টান দিল। নাটুরই বৈঠকখানায় ছিল কুমদীশ, শম্ভু, হরি—তখনো ওরা তামাক খাচ্ছিল! 'আগুন' কথাটা শুনেই বেরিয়ে এসে দেখলো, রাত্রির জ্যোৎস্নাকে ম্লান করে আগুনের ছটা আসছে নাটুরই গোয়ালের ওদিক থেকে। ছুটে এসে ওরা দেখলো—সদর বন্ধ। পাঁচিলে উঠে ওরা তিন জন দেখলো—বারুণী উঠোনে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে আর নাটু জলন্ত ঘরেব মধ্যে থেকে চীৎকার করছে। লাফ দিয়ে এপাশে নেমে পড়ল ওরা—বলল—দে···, চাবি দে বারুণী—চাবি দে! বারুর হাতের চাবিটা ওরা কেড়ে নিতে গেল। বারুণী সজোরে ছুঁড়ে দিল সেটা ঝোপজঙ্গলেব মধ্যে, খিল খিল করে হেসে উঠলো আবার—তারপর মুখের বিড়িটার আগুনেই আরেকটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে বলল—মরুক আঁটকুড়ির ব্যাটা—লিব্বংশ যাক্···হিহিহিঃ!

বারুণী ছোট জাতের মেয়ে। ঘরে ও তালাবন্ধ ছিল, এখন উঠোনে। এই পাঁচিল ডিঙুতে ওর কিছু এমন কষ্ট হোল না। এদিকে যখন কুমুদীশরা দরজা ভেঙে নাটুকে বার করবার চেষ্টা করছে, তখন ওদিকে বারুণী সেই বড় খাসীটার উপর একটা পায়ের ভর রেখে টুপ করে উঠে পড়ল পাঁচিলের

উপর—তার পর লাফ দিয়ে এপাশে। তারপর বিড়িটা টানতে টানতে বারুণী নদীর কিনারায় চলে এল।

গোয়ালঘরের দরজা—খুব বেশী শক্ত কাঠে তৈরী নয়—তিনজনে লাথি মেরে ভেঙে নাটুকে যখন টেনে বার করলো—তখন ঘরের চাল বেশ জোরে জ্বলে উঠেছে—নাটুর অঙ্গের দু'চার যায়গা ঝলসে গেছে; নাটু অজ্ঞান। গভীর স্তব্ধ রাত্রি, কিন্তু তখনো নদীর শরঝোপ আর কাশবনের মধ্যে বারুণীর হাসি প্রেতিনীর মত শোনা যাচ্ছে—হিহি হিঃ!—দেখুক মজাটি ক্যামন—হিঃহিঃহিঃহিঃ!

* * *

মাতাল রাজু টলতে টলতে ঘরের দরজায় এসে দেখলো—ময়না তার জন্যে বিছানা পেতে রেখেছে—খাবার ঠিক করে ঢাকা দিয়ে রেখেছে—কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আলোটা জ্বলছে আর ময়না ঘুমিয়ে গেছে। ময়না বড্ড ঘুমকাতর। ঘুমুতে পেলে ও আর কিছু চায় না; আর ঘুমুলে ওকে ডেকে জাগানোই মুস্কিল—জাগে না।

—ময়না!—রাজু ডাক দিল। উঃ···ময়না উঠে বসছে একটি ডাকে। আশ্চয্য! ময়নার ঘুম এত পাত্‌লা হোল কি করে! ওঃ, ওকে যে এবার থেকে সজাগ ঘুম ঘুমুতে হবে! ওর যে এখন সাবধান হ'য়ে ঘুমুবার সময়! ময়না স্বভাবতঃই শারমেয়-নিদ্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে!

—যাই বাবু···ময়না উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে। একি? কাকে সাড়া দিচ্ছে ময়না? ও, ওর সেই বাবুকে—সেই ঠিকেদার সায়েবকে মনে করেছে। হ্যাঁ, শয়নে স্বপনে ময়না তার কথাই ভাবে এখন!

—উঠ ময়না; আমি···রাজু বলল আবার।

—দাদা! এত দেরী করলে যে! ময়না দরজা খুলল।

—হুঁ—হোল দেরী একটুক্। খেইছিস তু?

—না, আমি খাব না কিছু। বৌদিদি খুব খইয়েছে।—তুমি খাও, তুমার লেগেও এনে রেখেছি।

রাজু আর বেশি কথা বলল না—কথা বলতে ওর ইচ্ছে করছে না। মানুষের জীবনের ওপর ওর যেন ভীষণ রকম একটা আক্রোশ এসে গেছে—বিশেষ করে মেয়েদের উপর।

খিদেও বিশেষ ছিল না—রাজু মুখ ধুয়ে খেতে বসল—সামান্য কিছু খেয়ে উঠে হাত ধুয়ে এলো, তারপর শুয়ে পড়ল। ময়না এঁটো তুলে হাত ধুয়ে ওর মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বলল—ঘুমুলে দাদা?

—না···নেটো মোড়ল বারুকে কুলুপ দিয়ে রেখেচে গোয়ালঘরে, দেখে এলোম।

—কেনে? নাটুর কি দোষ করল বারুণী আবার?

—দোষ কি আবার! বারুণীকে কিনে নিয়েছে নেটো মোড়ল। তুইও আর ইকলা যাসনা ঐ কারখানাতে কখনো, বুঝলি?

—না গেলে চলবে কি করে দাদা·? ময়না ভয়ে ভয়ে বলল। আবার—কাল একবার যেতেই হবে যে।

—না! আমি ঘর চালাবো কুনো রকমে। যা হবার হইছে—তু আর যাস না।

ময়না ভয় পেয়ে গেল। কি হয়েছে? কি এমন হওয়ার কথা জেনেছে দাদা? সবই জানতে পেরেছে নাকি? আস্তে আস্তে বলল,—বেশ দাদা—কাল একবার যেয়ে ছুটি নিয়ে আসি গা।

—বেশ, আমি সঙ্গে যাব।—রাজু কথাটা বলে চাইলো ময়নার মুখের দিকে। ময়না যেন পাথরের মূর্ত্তি একটা—শক্ত হয়ে গেছে ওর সর্ব্বাঙ্গ, অথচ কাঁপছে—রাজু ওর পিঠে হাত রেখে বলল—সব আমি বুঝেছি ময়না! মা-মরা তুকে আমি মানুষ করেছি—আমি সয়েই গেলুম তবে, লুকের কাছে মুখ দেখাতে লারবো আর—সেই কথাটোই ভাবছি!

ময়নার পাথরের মতন গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কথা ও আর কইতে পারবে না।

—কাঁদিস না ময়না—থাক—হোক যা-হয়—ভগবানের যা ইচ্ছে, হোক!

অকস্মাৎ ময়না দাদার কোলের ওপর লুটিয়ে পড়লো। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে—দুলে দুলে উঠছে ওর সর্ব্বাঙ্গ। রাজু সেই ছোটবেলার মতন ওকে কোলে নিয়ে উঠে বসল—মাথার খোলা চুলে হাত বুলুতে বুলুতে বলল —কাঁদিস না—বোনটি—ভাবনা কি! তুর সব দোষ ক্ষমা করবো আমি। তুর জন্যে লাথোবার মরতে পারি, বাঁচতে পারি ময়না; কিছু ভাবিস না··· গা ছেড়ে চলে যাব কাল।

এই পরম স্নেহশীল দাদার বুকে শেল হেনেছে ময়না—ওঃ ওঃ! ময়না কি বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেবে! কান্নায় আকুল হ'য়ে উঠলো ময়না আবার—দাদা দাদা আমার! কতক্ষণ ময়নাকে কোলে নিয়ে বসে আছে রাজু কে জানে—বাইরে থেকে বারুণী ডাকলো,

—ময়না!—ও ময়নামতী, ময়নামতী, ময়নামতী লো—ভো-র হোল-লো; খাট্‌তে চ-লো, ময়না লো!

—আয়। ময়না দাদার কোল থেকে উঠে চোখমুখ মুছে দরজা খুলে খুলে দিল। বারুণীর বেশ-বাস অদ্ভুত। শ্মশান থেকে যেন আধপোড়া মড়া উঠে এসেছে! গা-ময় কালি।

—কুথা ছিলি লো? তুখে নাকি নাটু মুড়ল বেঁধে রেখেছিল?

—হুঁ, রেখেছিল। নাটুকেই আমি আবার বেঁধে রেখে এলোম। চ—যাবি না খাটতে?

—হুঁ যাব। কিন্তু তুর গায়ে অত কালিঝুলি কেনে?

—আঁটকুড়ো নাটুর ঘর জ্বালায়ে আগুন দিয়ে এলোম যে মুখে—সেই কালি, লে চা কর, খাই।

রাজুর একটু তন্দ্রামত এসেছিল হয়তো! ওদের কথায় সেটুকু ভেঙে গেল। বলল—কি করে খালাস হলি বারু? ছেড়ে দিলে নাকি তুখে?

—না রাজু দাদা—ছেড়ে দিবে নাটু মুড়ল—তা হলে আর লয় কি! কি করে এলোম—শুনবে কাল সকালে।

ময়না চা তৈরী করলো—সবাই মিলে খেল—বারুণী ঐখানেই হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নিল—তারপর নিত্যদিনের মত ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল অজয় নদীর দিকে।

* * *

—কয়েকটা দিন কেটে গেল। শ্রাবণ শেষ হয়ে ভাদ্র পড়েছে, আজ জন্মাষ্টমী। রাজু বারণ করেছিল কিন্তু ময়না আজো গেছে ওপারে। একলা ঘরে রাজু চুপচাপ বসে বসে চা খেল খানিকটা। গায়ে আজকাল আর বেরয় না রাজু—কে জানে কে মুখ ফেরাবে, কে কুৎসিত রসিকতা করবে! শঙ্করের ঘরও যায় নি সেইদিন থেকে, কিন্তু আজ মনে হোল—তারণ ঠাকুরের ঘর একবার যাওয়া দরকার। আজ জন্মাষ্টমী—দিদি-ঠাকরোণ উপোস করে আছে—কিছু চাল আর তরকারী দিয়ে আসবে রাজু। তা ছাড়া মাথনের জমির ধানগুলোও একবার দেখে আসা দরকার। ধানগুলো তো রাজুই পাবে। চাল, তরকারী নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে রাজু বেরুলো। তারণ ঠাকুরের ঢেঙা বৌটা শীলে মশলা বাঁটছে—রাজুকে দেখে মাথার কাপড়খানা টেনে দিল। শীর্ণ হয়ে শুকিয়ে গেছে বৌটা। মুখখানা এমন করুণ যে দেখলেই মায়া করে। খাওয়া হয় নাই হয়তো দু'চার দিন। রাজু বললো—কি বাঁটছো বৌঠাকরোণ?

—পান্‌ফল। ঠাকুরঝির লেগে পালো করবো—বৌটা আস্তে বলল। ওর বড় বড় চোখ দুটো রাজুর চাল-তরকারীর দিকেই।

—এই লাও চাট্টি চাল। বলে রাজু নামিয়ে দিল ঝুড়িটা—দিদি কৈ? ঠাকুরঘরে গেইছে নাকি?

—হুঁ—বসো। বৌটা উঠে চালের ঝুড়িটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল অতি কষ্টে। ঐ ক'টি চালের ছোট্ট ঝুড়ি—তাও তুলতে পারছে না—এমনিই দুর্ব্বল হয়ে গেছে। মরেই যাবে হয়ত এবার। আহা, তারণ ঠাকুর বড্ড ভালবাসে বৌটাকে। যদি মরেই যায়—না, মরবে কেন? ভগবান বাঁচিয়ে রাখবে ওকে। বৌটা বাইরে আসতেই বলল,—চললোম বৌঠাকরোণ—দিদিকে বলো···

—না রে, যাবি কেনে—বোস—দিদিই বললো ঘরে ঢুকতে ঢুকতে—ময়না কেমন আছে?

—ভালই—বসবো না আর দিদিঠাকুরোণ—যাই।—রাজু বেরিয়ে পড়ল ক্ষেতপানে।

—এইখানেই খেয়ে যাস—বুঝলি রাজু—আজ তুরা ভাইবোনেই খাবি এইখানে।

—হোক, আসব—বলে রাজু বেরিয়ে গেল।

দিদি বলল বৌকে—আগুতে ভাত চাপাও দেখি—তা বই পান্‌ফল বাঁটবে।

—হুঁ—বৌ অতি কষ্টে উঠছে। উনুনটা জ্বলছিল থামোকা। পাড়াপড়শী জ্ঞাতিশত্রু সব পাছে জানতে পারে যে এদের চাল নাই বলে রান্না হয়নি—তাই দিদি থামোকা আজ তিন-চারদিন উনুন জ্বেলে ধোঁয়া করে দেয়—লোকে জানুক যে ভাত চড়েছে। আজ সত্যি ভাত চড়বে;—ভাত,—ভাতের মত বস্তু নাই আর কিছু—কিছু নাই আর। ভাতারের চেয়েও ভাত বড—ভাতের জন্যই তো ভাতার। আজ ভাতের মূল্য ভাল করে বুঝতে আরম্ভ করেছে মানুষ—মানুষ, যারা মনুর সন্তান, মান-মর্য্যাদা সম্বন্ধে হুঁস যাদের অতিরিক্ত সজাগ—সেই মানুষ আজ একমুঠো চালের কাঙ্গাল—মানমর্য্যাদা সব খুইয়েও একমুঠো চাল চায়—একমুঠো ভাত চায়। ভাতারের চেয়েও ভাত আজ মিষ্টি হয়ে উঠেছে ওদের কাছে।

রাজু পথে নামলো—নদীধারে মাখনের জমিটা দেখে আসবে একবার। ময়নার পাপার্জ্জিত চাল দিয়ে আজ জন্মাষ্টমীর দিনে কিছু পুণ্যও সে সঞ্চয় করলো। গোলাপী চলছে! গোলাপী যাচ্ছে নাটুর বাড়ীর দিকে; হাতে কয়েকগাছা রেশমী চুড়ি—সেদিন ঝুলনের মেলাতে কিনেছে হয়তো। ঈশান মরে সুবিধে করে দিয়ে গেল—বাঃ বেশ!

এই নারী—এ-ই সতীসাবিত্রীর জাত—এদেরকেই মা-বোন-বৌ বলে ডাকতে হয়! রাজু হাসলো ব্যঙ্গের হাসি—চল্লি কুথাকে গুলাপী? হাতে যে একহাত চুড়ি!

—চল্লোম—যে কাজ কত্তে ময়না যায়—গোলাপী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রত্যভিবাদন জানালো। নির্ব্বোধ রাজু কেন গেল গোলাপীকে খোঁচা দিতে! গোলাপী সইবে কেন! রাজু ধুলোপড়া-পাওয়া সাপের মত মুখখানা নামিয়ে চলে গেল।

মাখন ডোমের ধানক্ষেত। আলের উপর দাঁড়িয়ে দেখলো রাজু—ভাদরের রোদে আর হাওয়ার ধান গাছগুলো বেশ ঝাড়িয়ে উঠেছে—ঘন-শ্যামল রং—উপরে সুনীল শারদাকাশের ছায়া পড়ে এক আশ্চয্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছে। দুলছে ধানের ঢেউ—কচি শীষগুলোর পেটে এখনো চাল দানা বাঁধে নি—তাই খাড়া আছে ধানগাছ—সরু সরু পাতাগুলোন সাগর-তরঙ্গের মতই ঢেউ খাচ্ছে। দূরদিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র—নয়ন-জুড়ানো মা-লক্ষ্মীর আঁচল যেন—রাজু নির্নিমেষ হয়ে দেখল। হাঁ, দেখবার মত বস্তু। মানুষের খাদ্য, মানুষের রুধির, মানুষের জীবন—অজস্র, অনন্ত হয়ে আজ দোল খাচ্ছে। আর ক'টা দিন। রাজুরা সব এসে কেটে নিয়ে যাবে—ঘরে তুলবে পাকা ধান। পাকতে আর কটাইবা দিন!

মাখন এই ধানগাছ পুতে গেছে—মাখন আজ নাই। আহা—এই ক্ষেতভরা ধান ও চোখে দেখতে পেল না—হ'টা টাকা বালিশের তলায় গুঁজে রেখে মাখন না-খেয়ে মরেছে—তিলে তিলে মরেছে।

মাতা বসুমতী আজ সেই মাখনের ক্ষেতে প্রচুর ধান ফলিয়ে দিয়েছেন। শুধু মাখনের ক্ষেতে নয়—সবারই ক্ষেতে—হাজার হাজার বিঘে ধানক্ষেতে। রাজু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল—ঐ ওদিকে অজয়ের কিনারা—এদিকে ঐ দূরে দেয়াগঞ্জ—পূর্ব্বদিকে গ্রাম আর উত্তরে কত—কতদূর পর্য্যন্ত ধানক্ষেত। অত ধান কাটবে কে? অত জন-মুনিষ পাওয়া যাবে কোথায়—সব তো মরেই গেল—কাটবে কে এতো ধান?

কয়েকটা বিষ-লাঙ্গুলের ফুল ফুটে রয়েছে আলের উপর। চমৎকার লাল লাল ফুল। কিন্তু বিষ—খেলে আর রক্ষে নাই। রাজু তুলে নিল দু'টো ফুল—কানে গুঁজলো। তারপর ফিরতে লাগল। মাখনের জমিতে অজস্র ধান হয়েছে—রাজুই পাবে ধানগুলো, রাজুকে দান করে গেছে মাখন—কিন্তু দলিল তো কিছু নাই। জমিদার যদি না দেয়—কেড়ে নিয়ে যায়? নেবেই তো। রাজু তো মাখনের ছেলে নয় যে উত্তরাধিকারী হবে তার ক্ষেতের; নেবে জমিদারই। নিক গে! রাজু জীবনের সাধনা আর করতে চায় না। জীবন রাখবার জন্য অত চিন্তার দরকার নাই তার। কিন্তু এখনি রাজু ধানগুলো দেখে লুব্ধ হচ্ছিল। জীবনের সাধনা ত্যাগ করা কি অত সহজ?

রাজু ফিরছে—একা ঘরে ফিরে আসতে মন চায় না—বাঁশী বাজানো ছাড়া ঘরে আর কোনো কাজ নাই। করবে কি গিয়ে ঘরে? কিন্তু যাবেই বা কোথায়? রাজু আস্তে আস্তে হাঁটছে; রাস্তাটা যেন ফুরিয়ে দিতে চায় না ও—রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার সুখটা উপভোগ করছে। কদিন বেরুয় নি—আজ যেন প্রবাস-প্রত্যাগতের মতই মনে হচ্ছে গ্রামের চিরকালের চেনা পথ। তবুও রাস্তাটা ফুরিয়ে গেল—রাজু ঘরের কাছে এসে দেখল—ময়না ফিরে এসেছে—ঝিমুচ্ছে। অবাক হ'য়ে রাজু বলল—কি হোল ময়না? এত সুকালে যে আজ? উকি! কাঁদছিস কেনে র‍্যা?

ময়না দাদার কোলে এসে পড়ল অকস্মাৎ।—দাদা!—ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ময়না। রাজু বিস্ময়ে বেদনায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো;—হোল কিরে?—কেউ কিছু বলেছে? লক্ষ্মী সোনা, বল!

—হুঁ—ভেবেছিলোম, ওদের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করবো—টাকা না দিলে প্যাটে ছেলে নিয়ে কুথাকে যাব আমি! তাই বলেছিলোম কাল—ময়না আবার কাঁদতে লাগল। রাজু মাথায় ওর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—দিল না শালারা, লয়? না দেক গা—কাঁদিস না বুনটি। আখুনো আমি বেঁচে আছি—ভয় কি তুর! আমি সব ব্যবস্থা করবো।—রাজু ওকে সান্ত্বনাই দিচ্ছে, কিন্তু কী ব্যবস্থা করবে সে!

—না—কাল বলেছিল—আজ দিবে কিছু টাকা আমাকে। আজকে গেইছিলোম তারই লেগে—কিন্তুক ওরা আজ আর ঢুকতেই দিলো না—দবয়ান দিয়ে অপমান কবে, তাড়াইয়ে দিলে ওঃ দাদা!

ময়না অত্যন্ত কাতর ভাবে কাঁদছে।—কেনে ইমন কাজ কত্তে গেইছিলোম দাদা—উঃ···দাদা, তুমার পায়ে পড়ি, আমাকে বিষ এনে দাও, আমি মরে যাই দাদা!

ছোট্ট খুকীর মতন ওকে বুকে তুলে নিল রাজু। ভিজে একটা গামছা দিয়ে ওর মুখ-হাত পা সযত্নে মুছে দিতে লাগল। ময়না ফুলে ফুলে উঠছে কান্নায়। রাজু ওর থুত্‌নীটায় দেখলো—একটি ছোট্ট উল্কী আঁকা। বহুদিন হোল সে-বছর গোষ্ঠের মেলাতে ময়নাকে সখ কবে রাজু উল্কী পবিয়ে দিয়েছিল—কপালে একটি টিপ আর থুত্‌নীতে একটি টিপ! ওর গোরা মুখে চমৎকার দেখায়। গামছা দিয়ে মাজতে মাজতে রাজু লাল করে তুললো ওর মুখখানা। দু-আড়াই বছরের মেয়েকে যেমন করে মা পরিষ্কার করে, ঠিক তেমনি করে রাজু ওর ছোট্ট বোনটিকে মার্জিত করলো—তারপর ওকে বসিয়ে নিজেই সেদিনকার কেনা তাঁতী-বাড়ীর কাপড়টা আলনা থেকে এনে বলল,—পর—চল—ঠাকুরের ঘর যাব।

ময়না অনেকটা সামলেছে—বললো—কেনে? ঘরে ভাত রাঁধবোনা?

—না—দিদিঠাকরোণ খেতে বলেছে—চল, উখেনে বৌঠাকরোণের সঙ্গে গপ্প করবি—উঠ দেখি।

ময়না উঠে কাপড় পরলো—ছোট্ট আয়নায় দেখে নিল একবার নিজেকে। কোমরের কাপড়টা খুব আঁট করে পরেছে। রাজু বলল—ছেলেটো তুরই ময়না—অমন করে কাপড় আঁট করছিস কেনে! আলগা দে।—কথাটা যেন ময়না শুনতেই পায়নি। কুঁড়ের দরজায় তালা দিয়ে বলল—চল দাদা···।

গ্রামের পথে লোক আর চলে না বললেই হয়—হয় পালিয়েছে নয় মরেছে। রাজু আর ময়নার সঙ্গে এই ভর্ত্তি দুপুর বেলা কারো দেখা হল না পথে। তারা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ছে।

দিদির উপোস—বৌটা তখনো খায়নি—রাজুর জন্য অপেক্ষা করছে। ময়না ভিতরে ঢুকে বলল···বৌদি!

রাজু ময়নাকে পৌছে দিয়েই আবার বেরিয়ে গেল—কোথায়, কে জানে।

—আয়! বৌ আদর করে ডাকলো ওকে। ওর অপরাধী বুকখানি ধুকধুক করে সদাসর্ব্বদা। কে জানে, কে ওকে কতখানি ঘৃণা করে; কিন্তু এই ঢ্যাঙা বৌটা ঘৃণা করে না—ভালোই বাসে; ময়না জানে, তাই এখানে ও বেশ সহজ হতে পারে। খানিকক্ষণ গল্প করে ময়না বলল—দাদা আবার গেল কুথাকে?

আসুক—আয়, তুখে খেতে দি। পোয়াতী মানুষ···আর বিলা করে কাজ নাই—বোস্।

লজ্জার একটা লালচে আভা ছড়িয়ে গেল ময়নার মুখে। 'পোয়াতী মানুষ', ছিঃ! ও কথা কি তার সম্বন্ধে অমন আদরে উচ্চারিত হবার কথা! বললো—তুমার পায়ে পড়ি বৌদি, উকথা বলো না! বড্ড লাজ

লাগে আমার। প্যাটের দায় বড্ড দায় বৌদি···তাই···আর বলতে পারে না ময়না।

বৌটাও থেমে গেল। ওরও দুঃখ হল অজান্তে আঘাত দেওয়ার জন্য। রাজু ফিরে এল। ময়না শুধুলো—কুথাকে গেইছিলে দাদা? বিলা এনেক হোল, খাও!

—হুঁ—দাও বৌঠাকরণ। গেইছিলাম একবার কিষ্টে শালার কাছে। শালা ভেগেছে।

—কুথাকে গেল আবার! গাঁয়ে নাইথো?

—না, শঙ্করের বৌ জবাকে নিয়ে ভুর বেলা চলে গেইছে। শঙ্কর বসেবসে তাড়ি টানছে আর বলছে···'দেখ লেঙ্গা! দুকুড়ি তিন ঢাকা লগদ—খাড়ু বাউটি আর মাকড়ি—সব নিয়ে গেল!'

—হু—গেল কুথাকে তাহলে! অ, বুঝেছি দাদা···জবার সঙ্গে শঙ্কর-দাদার বনতোই না যে···কিষ্ট তাহলে বদ্ধমানে, ঐ যে লাইন ভেঙ্গেছে—উখেনেই গেল খাটতে। মিলা সব লুক লাগছে উখেনে। আমি আর খাটতে লারবো দাদা—না হলে যেতাম··। ময়না চুপ করল।

—হুঁ—রাজু চুপ করে রইল খানিক। তারপর বলল—

—চ—আমরাও যাই; খাটালি পেলে আমি তো খাটতে পারবো।

—না দাদা। তার থেকে তারণ দাদার কাছে চল—কলকাতা, সি বরং ভাল।

—কলকাতা?—রাজু চমকে উঠলো। মনে পড়ে গেল তারণ ঠাকুরের 'কদমফুল'এ পড়া সেই মোদকের দোকান—সেই ফুটপাতের প্রসূতি। ময়নাও তাই হবে না তো! না—না, কলকাতা নয়। কলকাতায় রাজু ময়নাকে নিয়ে যাবে না। কিন্তু নিয়ে যাবে কোথায়? গাঁয়ে তো প্রসব হতে দিতে পারবে না—তাহলে করবে কি রাজু? কোথায়

যাবে? রাজু যেন ভুলে যাচ্ছে মুখে ভাতের গ্রাস তুলতে! দিদি উপোসী গায়ে একদিকে শুয়েছিল; আড়মোড়া ভেঙে বলল,—কলকাতা কিসের লেগে যাবি? উখেনে আবার যায়! তার চেয়ে ঘরে থাক···যা হয় হবে।

কিন্তু ময়না থাকতে চায় না ঘরে। রাজুরও ইচ্ছে নয়। কারণ গাঁয়ে এখনো ময়নার সম্বন্ধে মুখ-ফুটে কেউ কিছু বলছে না—কুমারী ময়নার ছেলে হলে সেদিন কিন্তু আর মুখ বন্ধ করবে না কেউ। রাজু বলল—কলকাতাই যাই দিদি ঠাকরোণ। উখেনে দাদা ঠাকুর যা-হয় করবে কিছু উপায়। ময়না বলল—হু···উখেনে বড় সহর, কত লুকের কত হয়· আমাকে লিয়ে চল দাদা—ইখেনে আমি বাঁচবো না!

ময়নার অন্তরের লজ্জাটা অনুভব করছে রাজু। সস্নেহে বলল,—চল, তাই যাব।

খেয়ে ঘুমিয়ে বিকেল কবে রাজু গেল বাইরে—ময়না আরো খানিকক্ষণ থেকে গল্প করে নিজের ঘরে ফিরে এল। রাজু যখন ঘরে ফিরলো তখন রাত অনেকটা—এসেই বলল,

—ঘুমুয়ে লে খানিক। হৈ কাটোয়া দিয়ে ঘুরে যেতে হবে কলকাতা। ইদিক্‌কার টেন নাই—লাইন ভেঙেছে।—বলেই রাজু শুলো। ময়না বুঝলো, রাজু ধেনো মদ খেতে গিয়েছিল। কিছুই বলল না সে। জিনিসপত্র গুছিয়ে শুলো কিন্তু ঘুম ওর আর আসবে না। আর কখনো এ গাঁয়ে—এই ওর জন্মভূমিতে ফিরতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না ওর। যে ব্যাপার আজ আনন্দের তুফান তুলতে পারতো, সেই ঘটনাই আজ ময়নাকে চোখের জলে ভাসাচ্ছে। অনেক—অনেকক্ষণ ময়না চুপচাপ শুয়ে রইল। চোখের জলে ওর তেলচিটে বালিশটি ভিজে গেছে। রাজু জেগে বলল—রাত কতটো আছে রে ময়না—ভোরের তারা উঠেছে?

—হুঁ—উঠো—একটুস চা খেয়ে লি—ময়না উঠে উনুন জ্বালাল। কে জানে, এই আগুনই এ বাড়ীর শেষ আগুন কি না!—চা খেয়ে

ময়নার তোরঙ্গটা পিঠে ঝুলিয়ে রাজু হাতে নিল বই ক'খানি—পিছনে ময়না। রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকার কেঁপে কেঁপে উঠছে শিশু-ভানুর জন্ম-সম্ভাবনায়—ময়নার গর্ভস্থ ভ্রূণ কেঁপে কেঁপে উঠছে সেই বিমল আলোকের আকাশে আঁখি মেলবার জন্য। নদী-কিনার ধরে পাকা সড়ক। অজয় গিয়ে মিলেছে মাতা ভাগীরথীর অঙ্গে—সেদিকের পথ অনেক দূর। তাই এখানকার স্টেশনে গিয়ে ভোরের ট্রেণ ধরলো ওরা—তারপর দুপুর নাগাদ একটা জংশন স্টেশনে পৌছে আবার ছোট লাইনের ট্রেণ ধরে এল কাটোয়া। মা গঙ্গার কূলে এই কাটোয়া— ; মহাপ্রভু নাকি মস্তক-মুণ্ডন করেছিলেন এইখানে—তাই এ জায়গা তীর্থভূমি—তাছাড়া মা ভাগীরথী তো আছেনই।

একখানা মাত্র ট্রেণ কলকাতা যাবার—বহু চেষ্টা করেও রাজু তুলতে পারলো না ময়নাকে। থার্ড ক্লাসে তো নয়ই···ইণ্টারেও না। ট্রেণ চলে গেল। স্টেশনে পড়ে থাকতে হবে কাল পর্য্যন্ত এই ট্রেণের অপেক্ষায়! ময়না বলল—চলো দাদা—গঙ্গাচান করে আসি।

—যাবি—চল!—তখনো অনেকটা বেলা ছিল। ভাইবোনে ওরা গঙ্গার কিনারে এসে পৌছাল। দুর্ভিক্ষের দুঃখটা যেন এখানে আরো বেশি প্রকট—যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে একেবারে।

—"দে বাবা দুটো পয়সা—দাও বাবা ফ্যান একটু"—ওঃ, কাণ পাতবার যো নাই—ছোট শহর, তাতেই যত গেঁয়ো ভিখিরী এসে জুটেছে। নির্ম্মম হয়েই রাজু আর ময়না চলে—দান করবার মত ওদের আর সম্বল নাই। গঙ্গায় স্নান করতে নামবার পূর্ব্বেই কিন্তু ময়না কাতরভাবে বসে পড়ল।

—দাদা,—উঃ!—শুয়ে পড়ল ময়না একটা আমগাছের তলায়। ওর নীচেই মা গঙ্গা। রাজু বুঝলো, ময়নার ব্যথা আরম্ভ হয়েছে। কি উপায় করবে এখন! বড়ই ভাবনায় পড়ল রাজু। প্রসবের কিছুই রাজুর জানা নাই—এ জায়গাটায় লোকজনও দেখতে পেল না!

কিন্তু কিছুই দরকার হোল না—ময়না অল্প কষ্ট পেয়েই প্রসব করলো একটি ছেলে। আহা! কি সুন্দর! যেন একরাশি পদ্ম ফুল। কী রংই না হয়েছে! ছেলেটাকে দেখে রাজু খুসী হয়ে উঠলো। "সুন্দর শিশু আনন্দের উৎকৃষ্টতম অবলম্বন"—কিন্তু ওর নাড়ীচ্ছেদ করতে হবে!—অস্তসূর্য্য পশ্চিম গগন থেকে আশীর্ব্বাদ করছেন যেন! যেন বলছেন—"কাল আবার দেখা হবে—আমি আলোক, আজকার নিঃসীম অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করিস বৎস—আমি আবার আসবো; আঁধারের পরই আসি আমি—আমি তোদের জীবন-দেবতা—আমার আগমনী গান গাইতে গাইতে এই আঁধার রাত্রি অতিবাহিত কর!"

—ময়না! ময়নামণি!—রাজু ডাকলো।

—হুঁ—উঁ—দাদা!—ময়না সাড়া দিল। ছুরি নাই সঙ্গে। রাজু গঙ্গার কিনারায় খুঁজে একটা ঝিনুক এনে নাড়ি কেটে দিল ছেলেটার। ছেঁড়া কাপড় দিয়ে নিজের হাতে মুছলো ওকে—তারপর দেখতে লাগল। কী চমৎকার ছেলে! ওর বাপ নিশ্চয় খুবই সুন্দর—আর ময়নাও তো কম সুন্দর নয়! রাজু একে মেরে ফেলতে গিয়েছিল—ছিঃ! রাজু ওকে মানুষ করবে—ওকে বড় করে তুলবে রাজু—। আগামী প্রভাতের ঐ আলোক-বিন্দুটুকু রাজু পরম যত্নে জাগিয়ে রাখবে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের মত। ঐ অগ্নিকণাই একদিন বিশ্বধ্বংসী শক্তিতে পরিণত হবে—বিশ্বকে নবীনভাবে সৃষ্টি করবে।

ময়নাকে কিন্তু একটু দুধ খাওয়াতে হবে। বড্ড যেন দুর্ব্বল হয়ে গেছে ময়না; কিন্তু পাবে কোথায় দুধ! বাজার দূরে—হোক, রাজু একছুটে গিয়ে নিয়ে আসবে। ময়না বেশ সুস্থ রয়েছে, বলল,—আমি আসছি বোনটি, থাক তুই।

রাজু ছুটলো দোকানের সন্ধানে। কোথায় দোকান? অনেক অনেক দূর! রাজু নিরাশ হয়ে ফিরছে—হঠাৎ একটা দোকান। চার আনার

মেঘ-মেদুর

চরৈবেতি !

চল, অগ্রসর হও—আর্য্যঋষির এই অনুশাসন—আদেশ এবং উপদেশ, সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরণ—চরৈবেতি ! এগিয়ে চল ! পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত ভারত যেদিন বন্দীকারা থেকে বেরিয়ে স্বাধীনতার মুক্ত আকাশতলে এসে দাঁড়ালো—সেদিন শুনেছিলাম এই কথা, চরৈবেতি ! এগিয়ে চলবো—বলবো, 'আগে চল আগে চল ভাই—" আরো কত কি ! কিন্তু কি হবে ওসব কথা ভেবে ? রাজনীতি, সমাজনীতি নিয়ে কারবার আর করে না চিন্ময় ! কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর ও এখন অর্থনীতির দিকে ঝুঁকেছে, অর্থাৎ কিছু রোজগার করতে চায়। বুড়ি মা এখনো বেঁচে ; অতিকষ্টে তিনি এই কয়েকটা বছর কাটিয়েছেন সমান্য কয়েক বিঘা ধান-জমির উপর নির্ভর করে ; আশায় আশায় বেঁচে আছেন। ছেলে বাড়ী ফিরতেই বললেন—বিয়ে কর, বৌ এনে দে একটা, সেবাদাসী হোক—এতোকাল তো দেশের স্বাধীনতার জন্য তোকে ছেড়ে দিয়েছিলাম—স্বাধীন হোল দেশ, আর আমায় কষ্ট দিস কেন বাবা—যে কদিন আছি, একটু সুখ ভোগ করি—ইত্যাদি অনেক কথাই বললেন মা। কিন্তু বৌ আনবার আগে কিছু টাকা রোজগার করা দরকার। কি করবে চিন্ময় ? বাঙালী-পাঁঠার দোকান—কিংবা রাজ-বন্দী-রসগোল্লা, অথবা—নাঃ, কিছু ঠিক করতে পারলো না। মার পায়ে প্রণাম ঠুকে চলে এল কলকাতায়, চাকুরির সন্ধানে—এটাই বাঙালীর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন !

লেখাপড়ায় বি-এ, শরীরে সবল আর মনে যে-কোনও কাজের যোগ্য—যদিও কোন কাজই তার জানা নেই। চেহারাটাও ভাল! কিন্তু চাকরী যোগাড় করা অত সোজা নয়; টাকা চাই, মুরুব্বি চাই—আরো কতকি চাই। চিন্ময় বন্ধুর মেসে দিন চার পাঁচ থেকে নানা স্থানে ঘুরে হায়রাণ হয়ে হাল ছেড়ে দিল—চাকরী যোটান যাবে না!

—একটা ট্যুশনি আছে, করবি? বন্ধুটি বলল!

—অগত্যা—মাইনে কত, ছাত্র কোন ক্লাসের?

—ছাত্র ক্লাশ টেনএ পড়ে—মাইনে থাকা, খাওয়া, হাতখরচ—দশটাকা।

—বেশ—চল, ঠিক করে দে!—চিন্ময় রাজি হয়ে গেল।

ঐ দিনই বিকালে মদনমিত্র লেনের এক বড় লোকের বাড়ীতে তাঁর ছোট ছেলেকে পড়াবার জন্য নিযুক্ত হোল চিন্ময়—কিন্তু মাসিক নগদ দশ টাকা রোজগার করতে সে বাড়ী থেকে বের হয়নি—অতএব ফন্দি আঁটতে লাগল—টাকা কি ভাবে রোজগার করা যায়!

সময় মাত্র দুপুর বেলা, যখন ছাত্রটি স্কুলে থাকে—দুবেলা তাকে পড়াতে তো হয়ই, অধিকন্তু বাড়ীর দু একটা কাজও করতে হয়! চিন্ময় পনর দিনেই বিরক্ত হয়ে উঠলো—দুর ছাই! নাটক লিখবার চেষ্টা করেছিল চিন্ময় জেলে বসে; একখানা লিখেও ছিল। তার বাসার কাছাকাছি অনেক পুস্তক-প্রকাশকের দোকান—চিন্ময় দুপুর বেলা প্রায় প্রত্যেকের দোকানে ঘুরে নাটকখানা ছাপাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সকলেই বললেন—কোন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হলে নাটক ছেপে লাভ নেই—বিক্রী হবেনা—উপন্যাস হলে তাঁরা চেষ্টা করতেন।—উপন্যাসই একখানা লিখবে না কি চিন্ময়? কিন্তু সময় কোথায়—আর লিখলেই যে কেউ ছাপবে তারও নিশ্চয়তা নেই - তবে?

দিদারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে চিন্ময় হুদোর মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে,

করবে কি সে! এই দশ টাকা এলাউন্স আর খাওয়া থাকায় জীবন কাটানো অসম্ভব—চাকরীও যোগাড় করা যাবে না—তাহলে?

একখানা ভ্যান যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, চার পাঁচটি মেয়ে, সবাই বেশ সাজ পরা—দু তিনটে পুরুষও—ভ্যানটার গায়ে লেখা—'আলোছায়া' ওরা নিশ্চয়ই সিনেমা আর্টিস্ট। হঠাৎ চিন্ময়ের মাথায় বুদ্ধি যোগাল, তার নাটকখানা নিয়ে সে একবার সিনেমা-ওয়ালাদের কাছে চেষ্টা করলে পারে— আরেকটা লাইন তো খোলা আছে।

চিন্ময় আর দেরী করলো না, পরবর্ত্তী ট্রামেই উঠে পড়লো টালিগঞ্জের দিকে যাবার জন্য। কিন্তু সে শুনেছে, সিনেমা কোম্পানীতে মাথা গলানো বড় সহজ ব্যাপার নয়—তবে বরাতে থাকলে রোখে কে! চিন্ময় সহজে পিছুবার লোক নয়। টালিগঞ্জে যাবার আগে সে ধর্ম্মতলায় নামল, এখানে অনেক সিনেমা কোম্পানীর অফিস আছে। চিন্ময় এক এক করে প্রায় প্রত্যেকটিতেই ঢুকলো—এতেই তার সময় গেল দিন আট নয়—তারপর গেল টালিগঞ্জে—সেখানেও দিন চার পাঁচ ঘুরলো সে—কিন্তু তার নাটক নেওয়া দূরে থাক, পড়ে দেখতেও চাইল না কেউ—নিরাশ হয়ে চিন্ময় ছাত্রটিকে ভাল করে পড়াতেই মনস্থ করলো শেষে;—এই সব কাজে যখন মাসখানেকের ওপর কেটে গেছে, তখন হঠাৎ একটি খবর পেল—রঞ্জাবতী চিত্রালয় একখানা নাটক খুঁজছে—চিন্ময় চেষ্টা করে দেখতে পারে।

উৎসাহ আর নাই চিন্ময়ের, কিন্তু খবরটা যখন পাওয়া গেল, তখন একবার যাবে। এদের অফিসটা বহু দূরে—টালিগঞ্জের শেষ সীমায়। চিন্ময় দুপুর বেলা রওনা হয়ে গেল। খুঁজে বের করলো রঞ্জাবতী চিত্রালয়ের অফিস—তারপর ঢুকলো।

টেবিলের দুধারে জন পাঁচেক নারী-নর—আর আর এক দুয়ে

অন্য একখানা চেয়ারে একটি মেয়ে—বছর উনিশ কুড়ি হবে বয়স। দেখতে চমৎকার!

চিন্ময়কে দেখে টেবিলের লোকগুলি সবাই তাকাল। চিন্ময় নমস্কার জানিয়ে বলল—শুনলাম আপনারা সিনেমার জন্য বই খুঁজছেন—আমার একখানা নাটক লেখা আছে—যদি দয়া করে শোনেন···

—আপনি কি নতুন লেখক?—একজন প্রশ্ন করলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—লেখক নতুন হলেও আমি দীর্ঘদিন সাধনা করেছি!

—বসুন—শুনবো আমরা—অন্য একজন বললেন।

চিন্ময় উৎসাহিত হোল। তবু যাহোক এঁরা শুনতে চাইলেন—সে বসল একখানা চেয়ারে। আষাঢ়ের শেষ ভাগ—দিন খুব বড়—বেলা এখন তিনটে—ঘণ্টাদুই পড়ে শোনালে নাটকখানা শেষ হবে।

চা এবং সিগারেট ধরিয়ে ওঁরা শুনতে লাগলেন। চিন্ময় পড়ে চলেছে; হঠাৎ সেই তক্তাতে-বসা মেয়েটি বলল—আমায় তাহলে আপনারা নিতে পারবেন না?

—অত কনডিশ্যান করে আর্টিস্ট নেওয়া সম্ভব নয়—জবাব হোল।

—আচ্ছা, নমস্কার! বলে মেয়েটি উঠে গেল। আর এঁরা মেয়ে পুরুষ সকলেই একযোগে হেসে উঠলেন। কি এমন কনডিশ্যান যাতে এঁরা রাজি হতে পারলেন না? চিন্ময় ভাবলো একটু, তারপর আবার পড়তে আরম্ভ করলো। পড়া শেষ হতে প্রায় পাঁচটা বাজলো—মাঝে বহু বাধা, কেউ হাসলেন, কেউবা কাশলেন, কেউ উঠে গেলেন, মানে, ভালভাবে কেউই শুনলেন না।

পড়া শেষ হলে মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর কাটুবাবু, (ইনিই সম্ভবতঃ ডাইরেকটর) বললেন,—ভালই হয়েছে—চমৎকার!

সাহে (চিন্ময় চাইল তাঁর মুখপানে। কাটুবাবু এবার গলা ঝেড়ে

বললেন,—কিন্তু কি জানেন, এ সব জিনিস আমাদের দেশের লোক বুঝবে না, তারা চায় আনন্দের মধ্যে খানিকক্ষণ সময় কাটাতে। এ আপনার সাহিত্য হয়েছে।

—সাহিত্যই তো মানুষকে আনন্দ দান করে—চিন্ময় বলল।

—হ্যাঁ—কিন্তু এতটা উঁচু আইডিয়া তাঁদের মাথায় ঢোকানো যাবে না!

—আপনি হয়তো দেশের শ্রোতাদের উপর অবিচার করছেন—চিন্ময় আস্তে আস্তে বলল—ভাল জিনিষ পেলে তাঁরা নিশ্চয় গ্রহণ করবেন।

—দেখুন, আমরা সে রিস্ক্ নিতে পারি নে। পয়সার জন্য কারবার করছি—লোকসান দিতে তো নয়—আপনার এ জিনিষ আরো পঞ্চাশ বছর পরে চলতে পারে—

—ভাল! তাহলে অপেক্ষা করবো আরো পঞ্চাশ বছর,—বলে নমস্কার জানিয়ে উঠলো সে। মানুষের সম্বন্ধে এদের কতখানি অশ্রদ্ধা আর নিজেদের বিজ্ঞতা সম্বন্ধে এদের কতখানি অহঙ্কার, ভাবতে ভাবতে ঘরের বাইরে এসে দেখলো, বৃষ্টি পড়ছে; কিন্তু খুব জোরে নয়, চিন্ময় ভিজেই বেরিয়ে পড়লো; ওখানে দাঁড়াতে তার আর ইচ্ছে হোল না—হাসির হুল্লোড় ভেসে আসছে, শুনতে পেল—হয়তো তাকেই বিদ্রূপ করছে ওরা।

বড় রাস্তায় পড়তেই বৃষ্টিটা অত্যন্ত জোরে এসে পড়লো। এখনো অনেকখানি গেলে তবে ট্রামলাইন—দ্রুত হাঁটতে লাগল চিন্ময় ভিজে ভিজে—অকস্মাৎ কে যেন ডাকলো,—শুনছেন? ও মশাই শুনুন।

চিন্ময় তাকিয়ে দেখলো, রাস্তার পাশে প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটি—ভিজে গেছে সর্ব্বাঙ্গ—স্যাণ্ডেলের কাদা ছিটকে শাড়ীটাও নোংরা করে দিয়েছে। করুণ ক্লান্ত মুখ—কিন্তু হাসছে মেয়েটা। চিন্ময় এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

—ওরা নিল আপনার বই ?

—না—আপনি এই দু'ঘণ্টা কোথায় ছিলেন ?

—কা[illegible]ছিলাম—এখানে অনেকগুলো কোম্পানী আছে—প্রায় সব বাড়ীই ঘুরলাম। রোজ তো আসতে পারি না—পয়সা খরচ হয়।

—[illegible]ন কোথায় ?—চিন্ময় শুধোলো।

—মানিকতলায়।

—চলুন—আমিও থাকি ওপাড়ায়।

—থামুন, বৃষ্টিটা একটু কমুক। আপনার নাটক যে ওরা নেবে না, তা আমি তখুনি জানতাম—মেয়ে অর্থাৎ লেখিকা হলে কথা ছিল, আপনি পুরুষ!

হাসতে লাগলো মেয়েটা। চিন্ময় একটু বিরক্ত হয়ে বলল,—আগনি জানতেন তো বললেন না কেন ? এতক্ষণ সময় নষ্ট করতাম না আমি।

—অন্যায় অভিযোগ করছেন আপনি। আপনার সঙ্গে আলাপ নাই, পরিচয় নাই—আমি কেমন করে বলবো সে কথা ?

—ও হাঁ—আচ্ছা, আপনি কি করে জানলেন, ওঁরা নেবেন না ? ওঁরা কি কারো বই নিয়েছেন ?

—তা জানি না, তবে এই সব হঠাৎ-গজা কোম্পানীর দল খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়—আর্টিষ্ট চাই, মেয়ে এবং পুরুষ ; লেখক চাই, শক্তিশালী এবং নামকরা ; গল্প চাই, নতুন এবং সস্তা ! হা হা !

চিন্ময়ও হাসলো একটু। বৃষ্টি অত্যন্ত জোরে পড়ছে ; গাছতলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির হাত এড়ানো যায় না ; চিন্ময় বলল,

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজার চাইতে চলুন, হাঁটতে হাঁটতে ভিজি !

—মন্দ কথা নয়, কিন্তু শাড়ীখানা কাদায় নষ্ট হয়ে যাবে—আর জানেন তো, শাড়ী আজকাল বড় দুর্লভ!

—ও তো হয়ে গেছে, চলুন—এভাবে ভেজা যায় না আর।

চিন্ময় মেয়েটির শাড়ী ধরে টান দিল। হাসিমুখে সেও নেমে পড়লো রাস্তায়। পাশাপাশি চললো দুজনে। চিন্ময় বলল—এ বড় মন্দ লাগছে না, কি বলেন ?

—হ্যাঁ, যদি বৃষ্টিতে ভিজে অসুখ না করে—হাসলো মেয়েটি।

—সিনেমায় নামবার সখ কেন আপনার ?—চিন্ময় শুধুলো।

—সখ নয়, প্রয়োজন! আর কোন চাকরী করবার যোগ্যতা নেই, ঝির কাজও জানিনে—চেহারাটা মন্দ নয়, যদি ওঁরা দয়া করেন—এই ভেবে চেষ্টা করছিলাম!

—ওঁরা তো দয়া করতে প্রস্তুত ছিলেন—যদি আপনি ওঁদের প্রস্তাবে রাজি হোন অর্থাৎ কোন কনডিশ্যান না দেন তো কাজ পাবেন।

—সে-ভাবে কাজ নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু—থাক ওকথা—হাসলো মেয়েটি—বললো—রেশনের দোকানে কাজ একটা পাবার আশা আছে—কিন্তু মেয়ে হয়ে জন্মানোই অপরাধ।

চিন্ময় ওর মুখ পানে চাইল, কোনো জবাব দিল না কিছুক্ষণ। সামনে খানিকটা কাদা জমে গেছে। চটি জোড়া খুলে হাতে নিল মেয়েটি—হঠাৎ একখানা মোটরগাড়ী সবেগে চলে গেল এবং দুজনের সারা গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে গেল। মেয়েটি বলল,—চমৎকার—এই জন্যেই তো বড়লোক হতে হয়।

দেখা গেল, কাদাটা পার হয়েই মোটরখানা দাঁড়িয়ে পড়েছে এবং ওদের ডাকছে। দুজনেই হেঁটে এসে দেখলো, গাড়ীতে বসে সেই রঞ্জাবতী চিত্রালয়ের বাবু দুজন। মেয়েটিকে ওরা বলল সস্নেহে,—ভিজে কাকভেজা হয়ে গেছেন যে দুর্ব্বা দেবি!

—হ্যাঁ, তারপর আপনাদের দেওয়া কাদায় কাক ময়ূরপুচ্ছ পরেছে।

—ও স্যরি!—আসুন, আপনাকে পৌঁছে দিই—উঠুন গাড়ীতে।

—ধন্যবাদ! অনেক ধন্যবাদ! কিন্তু থাক, মানিকতলা অনেক দূর, আপনাদের অনেক পেট্রল খরচ হয়ে যাবে—এই তো ট্রামডিপো, আমরা ট্রামেই চলে যাব—

—আমি শ্যামবাজারেই যাচ্ছি; আসুন, আপনাকে নামিয়ে দেব!

—ও, যাচ্ছেন! তাহলে চলুন—বলে খোলা দরজা দিয়ে উঠে পড়লো দুর্ব্বা—গাড়ী ছেড়ে দিল। চিন্ময়কে এখন একা পথটা অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু উপায় কি! চিন্ময় তো সুন্দরী তরুণী নয়! কিন্তু আশ্চর্য্য, গাড়ীখানা এককদম দুকদম গিয়েই থেমে [illegible] হাতে হাণ্ডেল ঘুরিয়ে দুর্ব্বা নেমে পড়ল, গট্‌গট্ [illegible] আসছে চিন্ময়ের দিকে!

—কি ব্যাপার?—চিন্ময় সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো!

—বিপদের বন্ধুকে ছেড়ে যেতে চাইনে আমি!

—অর্থাৎ?

—আমি ভেবেছিলাম, ওঁরা আপনাকেও তুলে নেবেন গাড়ীতে। কিন্তু আপনি তো আর সুন্দরী মেয়ে নন্—হাসলো দুর্ব্বা।

—তা হোক, আপনি চলে গেলেই পারতেন!

—না—চলুন, আমরা হেঁটে গিয়ে ট্রামে উঠি।

দুর্ব্বা এবার হাত ধরলো চিন্ময়ের। দুজনে চলতে লাগলো। গাড়ীখানা এখনো অপেক্ষা করছে। ওরা কাছাকাছি এসে পড়তে গাড়ীর একজন ডাকি দিল—আসুন, দুজনেই আসুন।

—থাক, ধন্যবাদ—আমরা ট্রামেই বেশ যেতে পারবো—বলে দুর্ব্বা টান দিল চিন্ময়ের হাতে। গট্‌গট্ করে এগিয়ে চললো ওরা। চিন্ময় নিরুপায়ের মত ওর সঙ্গে চলেছে। টালিগঞ্জ ট্রামডিপো দেখা যাচ্ছে; কিন্তু মোটরগাড়ীর আরোহী তখনও ডাকছিল—মিছে কেন কষ্ট পাবেন—আসুন, দুজনকেই পৌঁছে দিচ্ছি!

দূর্ব্বা কোন জবাব দিল না—সটান এসে ট্রামে উঠলো। বসলো একেবারে সামনের সীটে। পাশেই বসালো চিন্ময়কে—তারপর রুমাল দিয়ে মুখচোখ মুছতে মুছতে বললো—মানুষ না জানোয়ার!

ব্যাপারটা রহস্যময় হলেও চিন্ময় বুঝতে পারলো—দূর্ব্বা খুব অপমান বোধ করেছে যে-কোন কারণে হোক। সে নিঃশব্দে বসলো—ট্রাম ছেড়ে দিল। দীর্ঘ পথ, বৃষ্টি চলছে। দূর্ব্বা বলল,—আপনার নাটকখানা কি নিয়ে লেখা—সামাজিক না পৌরাণিক?

—সামাজিক।

—ও—কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ আপনি করেন নি তো!

—কেন? চিন্ময় বিস্মিত হয়ে উঠলো।

—দেখেই বোঝা যাচ্ছে! আপনি পৌরাণিক নাটক লেখেন না কেন? সীতা-সাবিত্রী—এমন কি অহল্যা পাষাণীর কথা নিয়ে?

—তাতে কি লাভ? কে অভিনয় করবে?

—এ দেশে ওর দাম এখনো আছে। আপনি একখানা লিখুন, অভিনয় আমি করিয়ে দেব—

হাসি পেল চিন্ময়ের। নিজেই যে কাজের যোগাড়ে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছে, সে কি সাহায্য করবে চিন্ময়কে! শুধু নারীর সম্মান রাখবার জন্য বলল—আছে নাকি ও লাইনে কেউ আপনার?

—না—নেই কেউ! থাকলে কি আর এতো ঘুরতে হোত! তবে আমি মেয়ে এবং সুন্দরী—ও আমি যোগাড় করে নেব।

—যোগাড় করতে পারছেন না তো?

নিজের সম্মান বজায় রেখে চেষ্টা করতে চাই, তাই এখনো পারছিনা।

—এ লাইনে সম্মান বজায় রাখা খুবই কঠিন।

—হোক কঠিন—আমি সেটা করবো !

চিন্ময় আর কিছু বললো না। নিতান্ত অপরিচিতা এই নারী—কে এ, কি এর পরিচয়, কিছুই তার জানা নেই, জানবার দরকারও কিছু নেই চিন্ময়ের, তবু যেন মনটা কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে উঠছে। দৈহিক সৌন্দর্য্যে মেয়েটি সত্যিই অনুপমা, রংটাও চমৎকার—ঠিক দূর্ব্বারই মত। কিন্তু সত্যি কি ওর নাম দূর্ব্বা !

—দূর্ব্বা কি সত্যি নাম আপনার ? নাকি সিনেমার জন্য নেওয়া নাম ?

—সত্যি নাম, কেন ? আমার নাম শ্রীমতী দূর্ব্বাদল দেবী ! এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে আপনার ?

—না—আশ্চর্য্য নয়, নামটা নতুন লাগছে !

—ও হ্যাঁ—নতুন—আমিও নতুন কিনা !

—তার মানে ?

—মানে—মেয়ে হয়ে জন্মানো আমার ঠিক হয় নি—পুরুষ হয়ে জন্মালে আমার নামকৌতি কি জানেন ?

—কি ?

—দূর্ব্বাসা।

—আপনি দুর্ব্বাসার মত বদরাগী নিশ্চয় ?

—দূর্ব্বাসা মোটে বদরাগী ছিলেন না—তিনি ক্রোধ রিপুর সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন—ঋষি কখনো রাগী হয় ? আপনি কিচ্ছু জানেন না।

—সত্যি জানিনে ! কিন্তু আপনি তো যথেষ্ট জানেন দেখছি ! কোথায় পড়েছেন এসব ?

—পড়িনি—শুনেছি আমার ঠাকুরদার কাছে। তিনি পঞ্চতীর্থ ; পণ্ডিত, তাই খেতে পাননা—বুড়িয়ে বাহাত্তুরে হয়ে গেছেন !

—তাঁর চরণ দর্শনের সৌভাগ্য হবে আমার ?

—ঠাট্টা করছেন? চরণ দর্শন কি কথা মশাই?

—সত্যি ঠাট্টা করিনি! অমন একজন পণ্ডিত লোকের দর্শন তুর্লভ সৌভাগ্য বলে মনে করি।

—সত্যি হলে চলুন আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে—যাবেন?

—যাব—আর কে আছেন বাড়ীতে?

—আর কেউ না—তিনি এবং আমি—একাই সব, ঝি, রাঁধুনী এবং গৃহকর্ত্রী—চলুন, দেখবেন, আপনাকে গোলাপ ফুলের পাঁপড়ি দিয়ে চা খাওয়াবো।

—সে আবার কি রকম চা!

—ঠাকুরদা খান—ঐ একটা মাত্র নেশা তাঁর, আর তামাক অবশ্য আছে, যদি আমি সেজে দিই!

—আপনি কি স্কুল কলেজে পড়েন নি?

—বাড়ীতেই বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুলকলেজে যাব আমি কোন দুঃখে! ঠাকুরদা মূল জার্ম্মান ভাষা থেকে আমাকে গ্যেটের ফাউষ্ট পড়ান।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো চিন্ময়, একটু পরে বলল,—এতবড় পণ্ডিত খেতে পান না কেন?

—কারণ পণ্ডিত আর কেউ খোঁজে না—খোঁজে পল্লবগ্রাহী, যারা এখানে ওখানে সেখানে দু'একখামচা বিদ্যে কুড়িয়ে বাড়িয়ে যোগাড় করে আর ডায়াসে বসে বক্তৃতা করতে পারে।

কথাটা নিদারুণ সত্যি; চিন্ময় চুপ করে রইল। গাড়ী এসপ্লেনেডে এলে ট্রাম বদল করে ওরা অন্য ট্রামে উঠলো। বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু ঠনঠনে জলে ভর্ত্তি—ট্রাম আর এগোল না, অগত্যা হাঁটু অবধি জল ভেঙে দুজনে মানিকতলার একটা গলিতে এসে পৌছাল। রাস্তায় লোক হাসছে

জীর্ণ একখানি একতালা বাড়ীর দরজা ঠেলে ঢুকলো দূর্ব্বা ; চিন্ময়কে বললে—আসুন ভেতরে—এইটা আমার রাজপ্রাসাদ—দেখুন ভাল করে। ঠাকুর্দা দেহ রাখলে আমি এটা প্রত্নতত্ত্ববিদদের হাতে ছেড়ে দেব ভেবেছিলাম।

এই রঙ্গরহস্যের মধ্যে কোথায় যেন বেদনার ইঙ্গিত রয়েছে—যেন বিষের কাঁটা! চিন্ময় করুণ হেসে ঢুকলো ভেতরে। অন্ধকারে দূর্ব্বা ওকে নিয়ে এল একটা ঘরে—বলল—একটা নতুন বন্ধু পেলাম দাদু!

সেকালের তৈরী অতিজীর্ণ একটা পালঙ্কে বসে আছেন এক বৃদ্ধ!

—এস দিদি, এসো!—আহ্বান জানালেন চিন্ময়কে।

চিন্ময় তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করছে, অকস্মাৎ দূর্ব্বা উচ্চ হেসে বলল—দিদি নয় দাদা, একটা আনকোরা লেখক দাদু, তুমি আমায় ফাউষ্ট পড়াও শুনে প্রণাম করতে এলেন—চশমাটা লাগিয়ে দেখ।

চিন্ময় সেই আধো অন্ধকার ঘরেও দেখতে পেল, বৃদ্ধের চোখে যেন জ্যোতি জ্বলছে!

চিন্ময়ের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করলেন বৃদ্ধ। মাথা তুলে চিন্ময় দেখলো—জীর্ণ খাটখানার পাশে থাকে থাকে সাজানো পুস্তকরাশি—ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা তাকগুলো ভর্ত্তি বই, আর ওদিকে একটা চৌকিতে অনেকগুলো হাতেলেখা পুঁথি। একটা দেওয়ালে একখানি বড় ছবি টাঙানো—নীচে লেখা—"নমো শ্রীশ্রীগুরুদেবায়"

চিন্ময় দেখলো, জ্যোতির্ম্ময় এক পুরুষের ছবি। কি কথা সে এঁর সঙ্গে বলবে, ঠিক করতে পারছে না। উনিই প্রশ্ন করলেন—কি নামটি দাদু তোমার?

—চিন্ময় মুখোপাধ্যায়—উত্তর দিল চিন্ময়।

—কি করা হয়? বই লেখ?

—না—বলে চিন্ময় যথাসাধ্য অল্প কথায় তার বাড়ীর এবং বর্ত্তমান

জীবন-সংগ্রামের পরিচয় দিল--কিন্তু ভিজে কাপড়ে রয়েছে ইতিমধ্যে দূর্ব্বা একখানা ধোয়া ধুতি এনে দিয়ে বলল,

—আমার কাপড় ছাড়তে দেরী হোল—নিন্, ছেড়ে ফেলুন।

—থাক্, আমি বাড়ী গিয়েই কাপড় ছাড়বো!

—তা কি হয়—গোলাপ ফুলের পাঁপড়ির চা না খাইয়ে আপনাকে ছাড়ছি না—তুমি বলো দাদু ওঁকে কাপড় ছাড়তে!

—কাপড়খানা ছেড়ে ফেল ভাই, অসুখ করবে—তোমাদের শরীর তো আর আমার মত শক্ত নয়—পলকা।

—আপনার শরীর এখনো বেশ শক্ত আছে দাদু? চিন্ময় শুধুলো।

—আর কতদিন থাকবে! জীবন-যুদ্ধে বার বার হেরেছি। এখন আর যুদ্ধ নাই, সন্ধিও হয়নি এটা মাঝের অবস্থা!

—আপনি হেরেছেন, শুনে বড্ড দুঃখ হচ্ছে দাদু।

—না ভাই—দুঃখ কি! পুরুষকারের হার হলে তখন বুঝতে পারা যায় আমার শক্তি কত ক্ষুদ্র—হারাই তো দরকার, কিন্তু থাক্, তোমরা ছেলেমানুষ, ওসব বুঝবার এখন সময় নয়—কাপড় ছাড়!

এই জ্ঞানবৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলতে ভয় করছে চিন্ময়। কিন্তু কেমন যেন একটা পিপাসাও জাগছে ওঁর কাছে অনেক কিছু জানবার জন্য। আজ নয়—অন্য দিন ধীরে ধীরে প্রশ্ন করবে চিন্ময়—ভাবতে ভাবতে কাপড় জামা ছেড়ে ফেললো। খালি গায়ে কোঁচার খুঁট চড়িয়ে বসলো চিন্ময় আবার। নাটকের পাণ্ডুলিপিটা খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া ছিল—তাই খুব বেশি ভেজেনি—বিশেষ ক্ষতি হবে না।

দূর্ব্বা দুটো কাচের গ্লাসে চা নিয়ে এল—আর একটা থালায় বাটিতে পোয়াটাক মুড়ি, নারকোল কোরা, গোটাচার চিনেবাদামের খুচি—কাঁচা লঙ্কা টুকরো করে কেটে মিশিয়ে দিয়েছে মুড়ির সঙ্গে। দাদুকে দিয়ে

চা দিল আর চিন্ময়কে দিল চা-মুড়ি—বলল—বড় লোকের বাড়ীর রাজভোগ—

—রাজারাও এসব খাদ্য এরকম বাদলার দিনে পেলে ধন্য হবে—চিন্ময়ও হেসে বলল—মুড়িগুলি সাগ্রহে নিল হাতে ধরে।

বৃদ্ধ চায়ের গ্লাসটা নিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিলেন—বললেন,—রাজার ভোগে থাকে প্রচুর উপকরণ আর প্রচুর অতৃপ্তি কিন্তু কাঙালের ভোগে থাকে স্বল্প উপাদান অথচ প্রচুর তৃপ্তি—কিন্তু এই সন্তোষ যৌবনধর্ম্মী নয় চিন্ময়—মনে রেখো।

—ঠিক তো বুঝতে পারলাম না দাদু?

—বলছি যে, যৌবনে মানুষের স্বল্পে সন্তুষ্ট হওয়া যোগীর লক্ষণ হতে পারে—কিন্তু যৌবনটা আদতে ভোগের কাল; সে ভোগ পার্থিব থেকে অপার্থিব হ'তে হ'তে এগিয়ে যাবে, নইলে ত্যাগ ব্যাপারটা আয়ত্তে আসে না।—চায়ে চুমুক দিলেন আবার।

—ত্যাগ কি করতেই হবে?

—করতে বাধ্য হতে হয় যে দাদু? সব থেকে প্রিয় বস্তু এই দেহ—কিন্তু তাকেও তো ধরে রাখা যায় না, ত্যাগ করতেই হয়।

—তাহলে ত্যাগকে আয়ত্ত করার কথা বলছিলেন কেন? সে তো বাধ্য হয়েই করতে হবে—চেষ্টার কি দরকার?

—ভোগটা শেষ হলে সন্তুষ্ট মনে সেটা করা যায়—আক্ষেপ থাকে না—তাই যৌবনের ধর্ম্ম পার্থিব ভোগটা পূর্ণভাবে পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা—ভিখারীর ভোগকেই রাজভোগ বলে মেনে নেওয়া এখন তোমাদের উচিৎ নয় দাদু।

—টাকা রোজগার করতে হবে বলছেন—চিন্ময় হাসলো।

—অতি অবশ্য করতে হবে, তবে সৎ উপায়ে; কারণ অসৎ উপায়ে

উপার্জন করলে পরে আত্মগ্লানি আসতে পারে, আইনেও শাস্তি হতে পারে – এইজন্য অসৎ উপায় বর্জনীয়।

চিন্ময় চা-মুড়ি ত শুনলো কথা কয়টা, অকস্মাৎ বলল,

—দূর্ব্বাকে কি আপনি সিনেমার অভিনেত্রী হয়ে উপার্জন করতে বলেন?

—ওকে আমি শিক্ষা দিয়েছি সদুপায়ে অর্জন করতে – ডিগ্রোমা ওর নাই, কিন্তু বিদ্যা ওর আছে – তাছাড়া আছে সংযম—যা আমি সারা জীবন ওকে শেখাচ্ছি।

—মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে অবশ্য উনি যে-কোন সদুপায় অবলম্বন করতে পারতেন—কিন্তু মেয়েদের সিনেমায় যাওয়াটা……চিন্ময় আর বললো না।

—সেটা এই দেশের দুর্ভাগ্য। অন্য দেশে মানুষ নারীর সম্মান রাখতে জানে। তবে আমি সিনেমাতেই ওকে যেতে বলি নি—যে-কোন সৎ উপায় অবলম্বন তাকে করতে হবে জীবিকার জন্য!

—বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দিলে হয় না?

—বিয়ে! বৃদ্ধ যেন চমকে উঠলেন—অশ্রুসজল চক্ষে তাকালেন শ্রীগুরুদেবের ছবিখানার দিকে—তারপর যোড় হাতে প্রণাম করলেন।

চিন্ময় বুঝতে পারছে না, বিয়ের নামে বৃদ্ধ কেন এতটা বিচলিত হলেন। একটু থেমে একটু ইতস্ততঃ করে সে শুধুলো,

—বিয়ে কি দেবেন না আপনি ওর?

—বিয়ে ওর দিয়েছিলাম চিন্ময়, অষ্টম বর্ষে গৌরীদান করেছিলাম।—

দুটি চোখ জলে ভরে এল বৃদ্ধের কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে বললেন,

—তুমি ভাবছ, ভুল করেছিলাম – না, আমার গুরুদেবের আদেশ পালন করেছিলাম আমি—আর নিজেও ভেবেছিলাম, ওকে সৎপাত্রে

দম্প্রদান করে নিশ্চিন্ত মনে গুরুর চরণে শরণ নিতে পারবো কিন্তু সবই শ্রীগুরুর ইচ্ছা·····থেমে গেলেন।

এই অদ্ভুত গুরুভক্তি চিন্ময়ের ভাল লাগছে না। একজনের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল আর উনি শ্রীগুরুর ইচ্ছা দেখছেন কেবল! বলল,

—গুরুদেব এরকম আদেশ করলেন কেন? আটবছরে বিয়ে আর চলতি নেই!

—জানি না, কেন তিনি আদেশ করলেন; তবে তিনি সাধারণ গুরু নন, সত্যাশ্রয়ী যোগী, ঐ যে—যোড়হাতে প্রণাম করলেন। বিরক্তিতে সারা অন্তর ভরে উঠছে চিন্ময়ের, তবু যথাসাধ্য সে-ভাব গোপন করে বলল,

—তাঁর আদেশ পালনের ফল তো দেখতে পাচ্ছেন·····

—না—ওঁদের কাজের ফল অত সহজে ধরা যায় না তো দাদু! জানিনা, কি মঙ্গল উদ্দেশ্য আছে তাঁর মনে - তবে তা যে মঙ্গলময়, তা জানি!

—ফুৎ! চিন্ময় অব্যক্ত শব্দ করে আবার সামলে বলল,

-- তিনি কোথায়?

—দেহ রেখেছেন!

এই অসংখ্য পুস্তকরাশি সমাবৃত অগাধ পাণ্ডিত্য পূর্ণ লোকটির উপর আর তিলমাত্র শ্রদ্ধা রইলনা চিন্ময়ের। এখনো ওঁর এই দারুণ গুরুভক্তি একান্ত অসহ্য—বলল,

—দুর্ব্বা তাহাল·····

—বিধবা। ওর মা-বাবা মারা যায় ওর তিন বছর বয়সে। একসঙ্গেই গেল এক চিতায়, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু থাক—ওকে মানুষ করলাম; আট বছর বয়সে শ্রীগুরুদেব এসে আদেশ করলেন—বিয়ে দাও। সুপাত্র দেখে বাড়ী বন্ধক দিয়ে বহুটাকা খরচ করে ওর বিয়ে দিলাম—ভাবলাম, বন্ধন মুক্ত হলাম, কিন্তু [illegible] বাড়ী

আর ওকে যেতে হোল না, তিন মাসের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল—তারপর এই বারো বছর ওকে মানুষ করছি; বাড়ী নিলেম হয়ে গেছে; এখন আমার বাড়ীতে আমি ভাড়াটে—ভাড়া অবশ্য গ্রহণ করেন না আমার উত্তমর্ণ লোকটি—তবে তার কারণটা মর্ম্মান্তিক!

—কি?—চিন্ময় সবেগে প্রশ্ন করলো।

—দূর্ব্বা দেখতে সুন্দরী—ওর দিকে তাঁর চোখ আছে!

—আর আপনাকে এই হীনতা সহ্য করে যেতে হচ্ছে? চিন্ময়ের কণ্ঠে যেন অগ্নিজ্বালা!

—সবই গুরুর ইচ্ছা।

—গুরু না হাতী—রাগে চিন্ময়ের মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল—বেঁচে থাকলে তাঁকে দেখ নিতাম কেমন গুরু!

—থামো দাদু—তিনি আমার ইষ্টদেব—বৃদ্ধ করুণ কণ্ঠে বললেন। চিন্ময় থেমে গেল—তৎক্ষণাৎ সামলে বললো—আপনার গুরুভক্তিকে প্রণাম জানাচ্ছি কিন্তু এই অন্ধ ভক্তি আমি সমর্থন করিনে।

—তোমরা যৌবনধর্ম্মী; তোমরা তো এই কথাই বলবে দাদু, জানি! তবে আমি জানি—আমার গুরুদেবের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হবেই!

চিন্ময় আর ওঁকে আঘাত করতে চাইল না—বেরুবে। ঠিক সেই সময় দূর্ব্বা ওঘর থেকে এসে বলল,

—চালে ডালে চড়িয়ে দিলাম দাদু—খেতে পারবে না?

—খুব পারবো দিদি—বৃদ্ধ সহাস্যে জবাব দিলেন।

—আপনিও আসুন না—ভাগ নেবেন!

—না—আমি যাচ্ছি আজ—

—আপনি কিসের? কম পড়বেনা, আজই রেশন এনেছি সকালে।

—দুঃখের ভাগ যদি নিতে পারি তো সুখের ভাগও নিতে চাইব!

—দুঃখের ভাগ—কেন ? ওটা তো সহজে কেউ নিতে চায় না।

—তারা সুখের ভাগ নেবারও অধিকারী নয়।—আমি আজ চললাম দাদু,—কাল কোনসময় এসে কাপড়খানা দিয়ে আমারগুলো নিয়ে যাব। ওগুলো শুকোক আজ,—বলেই চিণ্ময় বেরিয়ে পড়লো। দরজার কাছ পর্য্যন্ত এসে দূর্ব্বা বলল,

—হঠাৎ কিছু কাজ করাকে বলে হঠকারিতা।

—জানি—হঠাৎ কিছু আমি করছি না—বাসায় যাচ্ছ।

চিণ্ময় জলকাদার মধ্যে খালিপায়েই ফিরলো মদন মিত্র লেনে। কিন্তু সারা মনটা জুড়ে ও কে, ও কি ?

চিণ্ময়ের আজ মাইনে পাবার দিন। মাসের পয়লা তারিখে সকালেই ওকে টাকা দশটা ফেলে দেন ছাত্রের অভিভাবক। গতকাল জলকাদায় চলার জন্য ছেঁড়া জুতোটা একেবারেই ছিঁড়ে গেছে—টাকা-কয়টা পেয়েই চিণ্ময় ভাবলো, জুতো একজোড়া কেনা দরকার। কিন্তু দাম যা বেড়েছে, দশ টাকায় চলনসই একজোড়া জুতোও পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ ; তাছাড়া সবকটা টাকাই সে খরচ করতে পারে না—এখানে সেখানে যেতে ট্রাম-বাসভাড়া লাগে—তার জন্য অন্ততঃ দুতিন টাকা হাতে রাখা দরকার। কিন্তু জুতো একজোড়া চাই-ই। যতটা সম্ভব কম দামী জুতোই কিনবে ভেবে চিণ্ময় বেরিয়ে পড়লো দুপুরবেলা।

গায়ের পাঞ্জাবীখানা দূর্ব্বাদের ওখানে শুকুতে দেওয়া আছে—অতএব খালিগায়েই চলে এল। দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেল খিলটা, ভাঙা তাই। চিণ্ময় ভেতরে ঢুকে ডাকলো,—দূর্ব্বা দেবি।

—আসুন !···দূর্ব্বারই কণ্ঠস্বর।

চিণ্ময় ঘরের ভেতর চলে এল। দূর্ব্বা একখানা অতি জীর্ণ শাড়ী শেলাই করছিল। শেলাই করে ওটা পরা চলবে, মনে হয় না।

—কি ব্যাপার—একেবারে খালিগায়ে, দুপুরবেলা, আষাঢ়ের রোদে?

—কারণ, জামা ঐ একখানিই, ওটাই পরে বেরুতে হবে আর দুপুরটাই মাত্র সময়, ছাতা বহুকাল নেই।

দূর্ব্বার তিনটে প্রশ্নের জবাব যথাক্রমে দিয়ে গেল চিণ্ময়।

দূর্ব্বা ওর মুখের পানে তাকিয়ে একটু হাসলো, শুধু বলল,—বসুন

—দাদু কোথায়?

—খেয়ে একটু শুয়েছেন···সকাল থেকে সংগ্রাম করছিলেন—ক্লান্ত আছেন।

—সংগ্রাম করছিলেন! মানে ঝগড়া?

—আরে না মশাই—দাদু আমার ঝগড়া করতে পারলে তো বেঁচে যেতাম। দাদু আমার সর্ব্বংসহা মাতা ধরিত্রী—সংগ্রাম করছিলেন মানে, সাধন সংগ্রাম।

—মানে, পূজো আচ্চা করছিলেন?

—উঁহু! ওসব উনি করেন না—তবে কি যে করেন, তাও আমি ঠিক বলতে পারবো না; আপনি দাদুকেই শুধুবেন!—তা এখন যাবেন কোথায়?

—জুতো কিনতে—কাল জলকাদায় জুতোটা গেছে একেবারে।

—জুতো আমারও দরকার। হাতে মাত্র ছটা টাকা আছে। ওতে তো জুতো হবে বলে মনে হচ্ছে না—চটি হতে পারে।

—হ্যাঁ, চটিতে ছটাকাও লাগবে না, কিন্তু কাল তো চটিই ছিল আপনার পায়ে, ভালই তো ছিল দেখলাম।

—আমারি নয়, পাশের বাড়ীর পারুলের—চেয়ে পরে গিয়েছিলাম!

হাসলো দূর্ব্বা কথাটা বলতে বলতে। তারপর আবার বলল, —পারুল অবশ্যি চটিজোড়া দিয়েই ফেলতে চায়, কিন্তু নেওয়া ঠিক হবে না ; ও-ও খুব বড় লোকের মেয়ে নয়।

—উনি বড় লোক হলে আপনি নিতেন ওঁর জুতো ?

—না—বড় লোক হলে আমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যাব কেন ? আমার কোন বড়লোক, মানে ধনীকন্যা বন্ধু নেই। আমার হীন অবস্থার জন্য ধনীমানুষ কেউ সহানুভূতি জানাবে, এ একেবারে অসহ্য।

চিণ্ময়ের মনে হোলো, বলে যে যিনি এই বাড়ী নীলাম করে নিয়েছেন, তিনি শুধু সহানুভূতি জানাচ্ছেন না, আরো অনেক বেশী অপমান করছেন দূর্ব্বার অন্তরাত্মার, কিন্তু কথাটা অপ্রিয়—অনর্থক ওকে দুঃখ দিতে চাইছে না চিণ্ময়, কিন্তু দূর্ব্বাই বলল—বড়লোকের সংশ্রবে আসতে চাইলে তো অভাব ছিল না আমার—এই বাড়ীর যে আজ মালিক, সে তো আমায় রাণী করে দিতে পারে—হাসলো দূর্ব্বা।

—হ্যাঁ—কিন্তু।···

—ঐ জন্যেই চাকরী যোগাড়ের চেষ্টা, যদি পেতাম তো দাদুকে নিয়ে উঠে যেতাম অন্য কোথাও—কিন্তু যাক—চলুন, আপনার সঙ্গে গিয়ে চটি একজোড়া কিনে ফেলি। বাইরে বেরুতে বড্ড অসুবিধে বোধকরি নাহলে।

—দাদু ঘুমুচ্ছেন—ঘর ছেড়ে যাবেন কি করে ?

—চোররা জানে মশায়, কোন বাড়ীতে ঢুকলে কিছু পাওয়া যাবে। তাছাড়া দাদু ঘুমান না—চোখ বুজে পড়ে থাকেন, হয়তো ধ্যান করেন—আমি ওঁকে বলেই বেরুবো।

দূর্ব্বা ওঘর থেকে অন্য ঘরে গেল। ইতিমধ্যে চিণ্ময় নিজের কাপড়-খানা পরে জামা গায়ে দিল—তার পা খালি। দূর্ব্বা বের হয়ে এল, পায়ে। চিণ্ময় বলল—সেই চটিজোড়া পরলেন না কেন ?

—সেগুলো যার তাকে ফিরে দিয়েছি পরের জিনিষ নষ্ট হয়ে গেল, লজ্জার কথা।

—খালি পায়েই যাবেন ?

—উপায় কি! চলুন—দুজনেই তো খালি পায়ে আছি। আপনার সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স জাগবার কোন কারণ নেই।

—নিশ্চয় না। দীনতায় আমি আপনার থেকেও বড়।

—ন্যাটাছেলের মুখে একথা মানায় না। মুটেগিরি করেও রোজগার করতে পারবেন। আর আমাদের ভগবান মেরেছে—বিশেষ এদেশে; যেখানে যাই, দেহটার দিকেই সকলের লোভ। এইটা লাভ করতে পারলেই যেন তাদের চরিতার্থতা জন্মায়—চলুন।

দুজনে পথে বেরুলো। কলকাতার বড় রাস্তা; দুপাশেই জুতা, জামা-কাপড়ের অসংখ্য দোকান। দুপুরবেলা, তাই দোকানে খদ্দেরও কম—যে কোনো জুতোর দোকানে ওরা ঢুকতে পারে। কিন্তু দুজনেই চায়—জিনিষটা সস্তা কোথায় পাওয়া যাবে তাই দেখতে। এই সঙ্কোচ কেউ কাউকে বলতে চায় না—অথচ দুজনের মধ্যেই রয়েছে।

অনেকখানা চলে এল ওরা—ফুটপাত বেশ গরম লাগছে, যদিও একদিকে ছায়া পড়েছে বড় বড় বাড়ীগুলোর, আর ঐ ফুটপাত দিয়েই তারা হাঁটছিল। কারও মুখে কোন কথা নেই। চিণ্ময় ভাবছিল—সে নিতান্ত দরিদ্র, না হলে ভাল একজোড়া লেডিজ স্যু আজ কিনে দিতে পারতে দুর্ব্বাকে। কিন্তু দুর্ব্বা হয়তো নিতে চাইতো না—তার থেকে এই ভাল হয়েছে—চিণ্ময়ের টাকা নেই। দুর্ব্বা ভাবছিল, ছয়টা টাকার মধ্যে চার টাকার বেশী সে খরচ করতে পারে না—হাতে অন্ততঃ দুটো টাকা থাকা দরকার। অতএব অতি সস্তা দোকানেই যেতে হবে। মানিকতলা থেকে ওরা কলেজষ্ট্রীট মার্কেট অবধি চলে এল, অন্ততঃ শ'খানেক জুতার দোকান পার

হয়ে এল এতখানা রাস্তায় - কিন্তু ওসব ফ্যান আর ইলেকট্রিক আলো-ওয়ালা দোকান, অভিজাত পাদুকালয় —অনভিজাত দূর্ব্বা-চিণ্ময়ের ওখানে ঢুকতে ভরসা হচ্ছে না। কিন্তু আর কতদূর হাঁটা যায়? দূর্ব্বা বলল,

—নিন্, এবার যে-কোন একটা দোকানে ঢুকে পড়ুন—নাকি দোকানই দেখবেন?

—কলেজষ্ট্রিটে সুবিধে হবে না—বেন্টিক ষ্ট্রিট দিয়ে গেলে জুতো বেশ সুবিধে পাওয়া যায়—যাবেন?

—যেতেও তো খরচ আছে চার পাঁচ আনা—আর গিয়ে হয়তো দেখবেন, বিশেষ সুবিধে হবে না—এখানেই কিনে ফেলা যাক - বলে দূর্ব্বা আর অপেক্ষা না করে পাশের দোকানটায় উঠলো গিয়ে। বড় দোকান। মেয়ে খদ্দের দেখে উঠে বসল সব বিক্রয়কারিগণ - আসুন—, আসুন—কি দেব?

—স্যাণ্ডেল—কম দামী—দূর্ব্বা বলল।

—আপনার পায়ের?

—হাঁ, আমার এবং ওঁরও·····দাম যেন বেশী না হয়।

—ভাল জিনিষ দিচ্ছি—বলে দোকানী জুতো বার করতে আরম্ভ করলে জোড়ার পর জোড়া—আটদশ জোড়া জুতো শুধু দূর্ব্বার জন্যই বেরিয়ে এল। কিন্তু মূল্য সাত টাকার কম নয় কারো।

না—জুতো কেনার আশা ছেড়েই দিল দূর্ব্বা। উঠে বলল,

—পারবো না আমরা কিনতে!

—কেন—কেন, কি হোল?

—গ্রেড্ড দাম আপনাদের জুতোর।

উঠে বার হয়ে আসবার পূর্ব্বেই ঢুকলো একজন ভদ্রলোক, গায়ে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবী—পায়ে ঝকঝকে জুতো। বললো,

—কি খবর! এখানে কি তোমার?

—জুতো কিনতে এসেছিলাম—বেরিয়ে আসছে দূর্ব্বা—আসুন দাদা, বলে চিন্ময়কে আহ্বান করলো সে। কিন্তু লোকটি বলল,

—কেন জুতো—কিনে নাও;

—না—বড্ড দাম এখানে—আমার হাতে অত টাকা নেই!

—যা কম পড়বে, আমি দিচ্ছি,

—আপনি কেন দেবেন?—দূর্ব্বার কণ্ঠ রুদ্ধ শোনাচ্ছে!

—তাতে কি! আসছে মাসে আমায় ফেরৎ দিও।

—না—আসছে মাসেও আমার টাকা বেশী হবার আশা নেই।

—তা হলে তার পরের মাসে।

—তার পরের মাসেও না—আসুন চিন্ময়দা!

দূর্ব্বা সটান নেমে এল ফুটপাতে। গটগট করে অনেকটা এগিয়ে গেছে দূর্ব্বা—চিন্ময় তাড়াতড়ি হেঁটে এসে বলল,—ব্যাপার কি? কে উনি?

—বাড়ী-ওয়ালা!—গরু মেরে উনি জুতো দান করতে চান।

—গরু তো এখনো মরে নি!

—না—খোয়াড়ে আছে মনে করেছেন—জানেন না যে গরুর শিং আছে, গুঁতোতে জানে—থাক জুতো কেনা। চলুন, ঐ রেঁস্তারায় গিয়ে চা খাব।—দূর্ব্বা এগিয়ে এসে ঢুকে পড়লো রেঁস্তারায়।

—অনেকগুলো পয়সা খরচ হয়ে যাবে কিন্তু—চিন্ময় পাশে বসে বলল,

—হোক—ঐ লোকটা দেখুক যে, আমার রেঁস্তোরায় যাবার সঙ্গী আছে।

চিন্ময় কিন্তু বুঝতে পারলো না কথাটার অর্থ। কিন্তু দূর্ব্বার চোখ মুখ কেমন যেন রক্তিমাভ হয়ে উঠেছে। ভেতরে যে ও অত্যন্ত উত্তেজিত

হয়েছে, তা বেশ বোঝা যায়। কিছু আর প্রশ্ন করতেও ভয় করছে ওর। দোকানের লোক এসে বলল—কি দেব?

—দু'খানা চপ—দুকাপ চা—কাল দুর্ব্বা।

অর্থাৎ টাকা খানেক—কিন্তু কেন! বিস্ময়ের অগাধ সমুদ্রে পড়েও চিন্ময় কিন্তু শুধুতে পারলোনা—মাত্র ছ'টাকা সম্বল নিয়ে কেন দুর্ব্বা এতখানি বড়মানুষী করছে? অনুভব করতে লাগলো, দুর্ব্বার সারা অন্তর জুড়ে একটা আশ্চর্য্য রহস্য আছে—কি সেই রহস্য? হয়তো চিন্ময় কোনদিন জানতেও পারে।

নায়িকার নাম মধুমালা—অথবা মেঘমালা, কোনটা হবে ঠিক করতে পারছে না ওরা। চারজন যুবক আর একটি উনিশ বছরের মেয়ে একখানা টেবিল ঘিরে বসে আছে। মেয়েটি নিঃশ্চুপ, যুবকরাই কথা বলছিল। এই চারজনেই সিনেমা কোম্পানী গড়ে তুলেছে—প্রত্যেকের ভাগে ত্রিশ হাজার টাকা পড়ছে—তিনজনের নব্বই হাজার, কিন্তু চতুর্থ জন ডিরেকটর—এডিটার ইত্যাদি একাধারে: সে টাকা দেবে না, বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করবে এবং তার কাজের মূল্য ধরা হবে ত্রিশহাজার টাকা। অর্থাৎ ওদের মূলধন দাঁড়ালো একলক্ষ বিশ হাজার।

নায়িকা করবার জন্য এই মেয়েটিকে ওরা সংগ্রহ করেছে। ভদ্রঘরের মেয়ে—লেখাপড়াও শিখেছে খানিকটা এবং বিবাহিতা, কিন্তু ওর অর্থের প্রয়োজন, তাই এই পথে আসতে হোল। সংসার-জীবনে ওর নাম মায়া—কিন্তু সিনেমাতে নামলে নাম নাকি বদলে নিতে হয়—এটা দেশাচার, অতএব ওকে মধুমালা কিম্বা মেঘমালা হতে হবে। চারজন পুরুষের মধ্যে দুজনের ভোট হোল 'মেঘমালা'তে অপর একজন 'মধুমালা' নামে ভোট দিল

কিন্তু ডিরেক্টর বলল, ও'মালা' কথাটাই বাদ যাক—নাম থাক উর্ব্বশী—কিম্বা উষসী—অথবা উজ্জ্বলা···

—'উ' কারটার ওপর এতো ঝোঁক কেন তোমার? বলল একজন।

—তোমাদেরই বা 'ম'কারের উপর এতো ঝোঁক কেন?

—'ম'কার পরম বস্তু জানো তো, পঞ্চ মকার সাধনা····

—এখানে 'ম'কার চলবে না—এখানে ব্রহ্মসাধনা হবে—ডিরেক্টর ধমকে দিল যেন। তারপর বলল—বেশ, উকার যাক—ক কার বা ব কার আসুক—নাম থাক কমল কিম্বা বকুল—কি বল?

—বড্ড পুরাণো নাম—ঠিক যেন মানাচ্ছে না।

—নাম সম্বন্ধে কে যেন বিশেষজ্ঞ আছে, তাকে শুধোলে হয় না?

—হ্যাঁ—তিনি আবার শো পাঁচেক দাবী করে বসুন—ডিরেক্টর বলল।

মেয়েটি—যাকে নিয়ে এতকথা, এতটা সময় চুপ করে বসে শুনছে আর সামনের চায়ের কাপটায় ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে।

—তোমার কি মত মায়া? কোন নামটা পছন্দ তোমার? বরুণ বলল,

—আপনাদের যা খুসি দিন—আমার আবার পছন্দ কি? বলে মায়া একটু হাসলো—ক্ষীণ হাসি। ও যেন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে এদের হাতে। ও যেন বোঁটা-ছেড়া পদ্ম ফুল—সংসারের শীতল পঙ্ক থেকে ওকে ছিঁড়ে আনা হয়েছে—এখন এরা তাকে পুজোতে লাগাতে পারে কিম্বা ফুলদানীতে রাখতে পারে, অথবা নর্দ্দমায় ফেলেও দিতে পারে। কিন্তু নর্দ্দমায় ফেলে দেবার জন্যই কি ওকে এত যত্ন করে আনা হয়েছে? না—ওকে এরা ফুলদানীতেই রাখবে।

বরুণের পার্শ্বচর মিহির বলল—নতুন একটা নাম দিতে হবে—বেশ, আমি প্রস্তাব করি, যে বই আমরা নেব—তার নায়িকার নামটাই ওকে দেওয়া হবে আর সেই নামেই ওকে 'বুম' করা হবে—

—বই কি আপনারা এখনো ঠিক করেন নি?—মেয়েটি শুধোলো।

—ঠিকই আছে একরকম—আমাদের ডিরেক্টর সাহেবের বইখানাই নেওয়া যেতে পারে – তবে—হাসলো বরুণ।

—তবে কি?

—গল্পটা আমাদের সকলের মনঃপূত হয়নি—তা, একটু বদল সদল করে ঐটাই নেওয়া হবে।

—তাতে নায়িকার কি নাম আছে?

—বিদুলা—ডিরেক্টর সগর্ব্বে বলল এবার।

—বেশ, তা হলে ঐ নামটাই দেবেন আমায়; আর কি দেবেন, সে কথাটাও ঠিক করে আমার সঙ্গে কনট্রাক্ট করে ফেলুন!

মেয়েটা বেশ চালাক আছে, দেখা যাচ্ছে। কনট্রাক্ট আগে করে তবে ও এগুতে চায়—অর্থাৎ মরবার পূর্ব্বে যেন জেনে নিতে চায়, তাকে ফাঁসীতে না ইলেকট্রিক চেয়ারে, নাকি জহ্লাদের কুঠারে মরতে হবে এবং তার শ্রাদ্ধটা কতখানা ঘটা করে হবে। কিন্তু কনট্রাক্ট অত সহজে ওরা করে না, বিশেষত নতুন কারো সঙ্গে। মায়ার কথাটা শুনে মিহির হাসলো একটু; বলল,

—আপনি আমাদের বিশ্বাস করছেন না, কেমন?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়—আমার প্রয়োজন। যে জন্যে বেরিয়েছি, বুঝতেই তো পারছেন – টাকার দরকার।

—টাকা এ লাইনে যা পাওয়া যায়, অন্য কোন লাইনেই তা যায় না—এ হচ্ছে রয়েল বিজনেস···তবে আমাদের দিকটাও একটু দেখতে হবে।

—কি দেখবো আপনাদের দিক আমি?—মায়া যেন বোকার মত চাইল।

—মানে, আপনাকে দিয়ে কাজ ঠিকমত হবে কি না, সেটাও তো আমাদের দেখা দরকার—ফ্লোরে গিয়ে যদি আপনি নার্ভাস হয়ে পড়েন, কিম্বা অভিনয় যদি আপনার অচল হয়, অথবা—

—হ্যাঁ, নিশ্চয় আপনারা সে-সব দেখে নেবেন। তবে ওগুলো কবে দেখবেন? বইও তো আপনাদের ঠিক হয়নি দেখছি, অথচ আমি আসছি আর যাচ্ছি; এমন করে কদিন আমি ট্রামখরচ করে টালিগঞ্জে আসবো, বলুন?

—আচ্ছা, আপনাকে এবার আমরা খবর দিয়ে আনিয়ে নেব।

—না—ডিরেক্টর বলল—আপনি এই রবিবার না, শনিবার সন্ধ্যায় আসুন—ঐদিন ফাইনেল হয়ে যাবে—কেমন, অসুবিধা নেই তো?

—আমি কাজ খুঁজতে এসেছি; সুবিধে অসুবিধে ভাবলে চলবে কেন? আজ বুধবার—আমি শনিবারই পাঁচটা নাগাদ আসবো। কিন্তু ঐ দিন যেন যা-হোক ব্যবস্থা করে ফেলেন।

—নিশ্চয় নিশ্চয়—বলল চারজনেই।

মায়া নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

মায়া চলে যাওয়ার পর ওদের কথার দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হোল। বরুণই বেশি ধনী লোকের ছেলে; দু-এক লাখ ওড়ালেও ওর কিছু ক্ষতি হবে না—কিন্তু অন্য দুজন ধনী হলেও ধনেশ্বর নয়। আর ডিরেকটর ছিল নিতান্ত গরিবের ছেলে—আটদশ বছর আগেও সে ষ্টুডিওর বাইরে শুয়ে রাত কাটিয়েছে। কিন্তু বরাতে যখন যার থাকে তখন আঙুল ফুলে হিমালয় হয়ে যায়—যাক—ডিরেক্টর বলল—এটাকে আমি খুব সুবিধা বুঝছি নে।

—কেন? মিহির প্রশ্ন করলো—তোমার বুঝি সেই মেয়েটার দিকে লোভ?

—মানে, সে এর থেকে হাজারগুণে ভালো, বয়সে, রূপে এবং·····

—এবং—?

—অভিনয়েও!

—অভিনয় না দেখে সেটা বুঝলি কেমন করে?

—ও আর দেখতে হয় না—চোখের জ্যোতি দেখেই বোঝা যায়। বইখানা যদি সত্যি ভাল করতে হয় তাহলে ওকেই আমাদের নায়িকা করা উচিৎ।

—কিন্তু ওরকম কনডিশ্যন! ওরে বাপ···ওতে কে রাজী হতে যাবে!

—ভদ্রঘরের যে-কোন মেয়ের কনডিশ্যন ঐ রকমই হওয়া উচিৎ। তোমরা তাকে কয়েকটা টাকা দিয়ে আর 'বুম' করবার লোভ দেখিয়ে যদি যা-ইচ্ছে তাই করিয়ে নিতে চাও, তো সবাই তাতে রাজি না হতে পারে!

—তারা এ পথে না এলেই পারে?

—সে এপথে এল না—এবং তোমরাও ভাল নায়িকা পেলে না।

বরুণ এতক্ষণ কথা বলেনি—সিল্কের পাঞ্জাবীর সোনার বোতামের মাথায় হীরের ঝলকানি দেখছিল বসে বসে, আর ওদের কথা শুনছিল। এতক্ষণে বলল,

—কি যেন নাম মেয়েটার—দূর্ব্বা? না?

—হ্যাঁ—ঠিকানাও লেখা আছে, মাণিকতলা—সাত নং সম্বুদ্ধ লেন।

—চল না, একবার দেখে আসি; ওর কনডিশ্যানেই না হয় রাজি হওয়া যাবে।

—না—সে হয় না—নরেন, অন্যতম ভাগীদার সজোরে ঘোষণা করলো।

—আরে ভাবছিস কেন? আগে একবার নামুক, তারপর কনডিশ্যন তার কোথায় থাকে, দেখা যাবে—গোড়ার দিকে ওরকম থাকে অনেকের।

—গোড়ায় আমরাই দিয়েছিলাম ওকে কতকগুলো সর্ত, ও তার বদলে নিজের সর্তগুলো দিয়েছে। সর্ত মাত্র তিনটি। প্রথম, দিনের বেলা ছাড়া ও কাজ করবে না; দ্বিতীয়, ষ্টুডিও ছেড়ে ও কোন জায়গায় কারো সঙ্গে যাবে না এবং সন্ধ্যা ছটায় বাড়ী চলে যাবে। তৃতীয়—ও এমন কোন

অভিনয়ে পার্ট নেবে না যাতে দৈহিকভাবে কোন পুরুষকে ওর স্পর্শ করতে হয় বা অভদ্রোচিত বেশবাস করতে হয়—এই তিনটি সর্ত!

—তা, ও তিনটিই আমরা পালন করতে পারবো। অবশ্য দুদিন পরে তার ওসব সর্ত মিনিংলেস হয়ে পড়বে—জানা কথা।

সবাই হাসলো; অতঃপর বরুণের প্রস্তাবমত তিনজন বেরুলো। বরুণ, মিহির এবং ডিরেক্টার কাটু বাবু। ওর পুরোনাম খুব কম লোকেই জানে, কাটুবাবু নামেই সে সর্ব্বত্র পরিচিত। নরেন রইলো অফিস আগলে। একটু পরেই বরুণের মস্ত গাড়ীখানা ওদের নিয়ে চলতে লাগলো মাণিকতলা অভিমুখে। পথে চলতে চলতে বরুণ বলল—সেদিন সেই ছোঁড়াটার সঙ্গে ও হাঁটছিল—হয়তো কোন সম্পর্ক আছে।

—না!—মিহির বলল—মেয়েটা কদিনই এসেছে, ছোঁড়াটা এল মাত্র সেইদিন

—আগে আগে হয়তো ওকে এস্‌কর্ট করে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকতো।

—আরে না। দেখলে না, ও একজন লেখক।

—নামটি বেশ—দূর্ব্বা—বরুণ বলল।

—উচ্চারণ করা বড্ড কঠিন কিন্তু—কাটু সাহেব বলল।

—দুর্গা বলতে যদি অসুবিধা না হয়, দূর্ব্বা বলতে হবে কেন?

—নাম একটু ছোট আর সহজ হওয়া দরকার এ লাইনে।

—বদলে দিলেই হবে। তবে নামটা ওকে মানিয়েছে বেশ।

বরুণের প্রশংসাটা শুনে মিহির এবং কাটু তাকালো ওর পানে। গাড়ী চালাচ্ছিল বরুণ স্বয়ং—সোজা সামনে দৃষ্টি রেখেই চালাচ্ছিল, হঠাৎ গড়ের মাঠের সবুজ সুন্দর রূপের পানে একবার চেয়ে বলল—দূর্ব্বা সত্যি অপূর্ব্ব বস্তু!

—কোন দূর্ব্বা? ঘাস, নাকি ঐ মেয়েটা?

—দুটোই !—বরুণ হাসলো একটু—ওকেই নায়িকা করো। মেনে নাও ওর ফ্রাস্ট্রেশন—আপাততঃ মেনে নাও, তারপর ওকে এই দূর্ব্বাঘাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে, যাতে আর দেবপূজা হবে না।

—হঠাৎ এ রকম কথার মানে ?—ডিরেক্টর তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলো।

—মানে—ওর অহঙ্কারকে গুঁড়ো করে দিতে হবে।

—ও কখন অহঙ্কার দেখালো ?

—দেখিয়েছে সেদিন—ওকে লিফ্‌ট দিতে চাইলাম, গাড়ীতে উঠলো—তারপর ঐ লেখকটা, ঐ ভিখিরীটাকে আমি গাড়ীতে নিলামনা বলে গাড়ীর ব্রেকে লাথি মেরে গাড়ী থামিয়ে নেমে চলে গেল, আমায় বলে গেল 'অভদ্র ইতর—মেয়ে বলে ওকে তুলেছি, পুরুষ হলে ওকে তুলতাম না !'

—কথাটা কিন্তু সত্যি—কাটু বলল হেসে।

—হ্যাঁ, সত্যি ! সেইটাই ওকে দেখিয়ে দেব—ও মেয়ে এবং সুন্দরী, তাই ওকেই তুলব—পাঁক তুলবার জন্য আমি পুকুরে নামি না—তুলতে চাই পদ্ম।

সবাই হেসে উঠলো—গাড়ী সবেগে চলছে।

চটি কেনা হয়নি দূর্ব্বার, কিন্তু চিন্ময় একজোড়া রেইন স্যু কিনেছে ; কারণ, দরকার হলে দূর্ব্বার তবু বন্ধু আছে চটী ধার করে পরবার, চিন্ময়ের তাও নেই ; আর জুতো না পরে কোথাও গেলে গণ্ডাধাক্কা না হোক নিজের গরজটা বড্ড বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তার সঙ্গে দীনতাও—রেইনস্যুতে দীনতা অবশ্য ঢাকা পড়ে না, তবে বর্ষাকাল—রেইনস্যুর একটা কৈফিয়ৎ আছে। যাই হোক—সাড়ে চার টাকায় জুতীজোড়া কিনেছে চিন্ময়। দূর্ব্বা হেসে বলেছিল,

—প্রার্থনা করছি, জুতো পরে বেরুবার সময় যেন বৃষ্টি হয়!

—না দেবি—অমন অকল্যাণ কামনা করোনা—একসেট মাত্র ধুতি পাঞ্জাবী, ছাতা নেই, ভিজে গেলে আর বেরুনই হবে না।

চরম দারিদ্র্য চিন্ময়ের, বুঝতে কিছুই বাকী লাগেনা—দূর্ব্বা সহানুভূতিশীলা হয়ে উঠলো। ফেরার পথে ঠনঠনের মা কালীকে প্রণাম করতে থামলো দূর্ব্বা, তার আগেই ঐ কথাকটা! হঠাৎ দূর্ব্বা বলল প্রণাম করে উঠে,

—শুনুন, আপনার আছে বুড়ি মা, আর আমার আছে বুড়ো দাদু, দুজনেই আমরা প্রায় সমান ধনী—দুজনেই বেকার—তফাৎ শুধু আপনি পুরুষ আর আমি নারী, কিন্তু দুজনের জীবনেই যুদ্ধ লেগেছে।

—দুজনে একত্র হয়ে যুদ্ধ করলে কেমন হয়? চিন্ময় জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলো। দূর্ব্বা কপট রাগ করে বলল,

—পুরুষ হলেও আপনি দেখছি খুব হীন জাতীয় পুরুষ। একত্র হবার বাসনাটা আপনার মাথায় সর্ব্বাগ্রে গজাল কেন বলুন তো? আপনার কাছে এটা আমি আশা করিনি.....

চিন্ময় গোড়ায় ভড়কে গিয়েছিল, কিন্তু ওর বুদ্ধিটা খুব ঘোলা নয়; বলল—একত্র অর্থে কো-অপারেশ্যন বলছি দূর্ব্বা—কোলাবরেশ্যন—বা ঐ রকম একটা কিছু বাংলা কথা বলতে চাই.....

—এইটুকু বাংলাভাষা নিয়ে আপনি বই লিখতে সাহস করেন!—ছিঃ! শুনুন, আমি বলছি, আমাদের দুজনের জীবনেই যুদ্ধ লেগেছে, আর যুদ্ধটা একই ব্যাপার নিয়ে অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের অভাব, অতএব আমরা পরস্পরকে সাহায্য করলে অর্থাৎ মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হলে হয়তো আমরা কিছুদিন টিকে যেতে পারি—পারস্পরিক মঙ্গলাভও হতে পারে!

—ঠিক বলেছ; মিত্রতা বন্ধন। ঐ শব্দটা কিছুতেই মনে আসছিল না আমার—

—তার কারণ, আপনি বেশী সময় ইংরাজি ভাষায় ভাবেন। যাক—তাহলে আসুন, এযুগে যা কেউ করে না, তাই আমরা করবো।

—কি?—চিন্ময় বিস্মিত হচ্ছে, কিন্তু ও এগিয়ে এল—বলো, আমি রাজি।

—আমরা জীবনের পথে চলতে পরস্পরকে সর্ব্বান্তকরণে সাহায্য করবো—দিব্যি করতে হবে এই মা-কালীর সামনে।

—শুধু জীবনের পথে কেন—মরণের পথেও—বলে হাত জোড় করল চিন্ময়।

—থামুন—আবার ধমক দিল দূর্ব্বা—আপনার সঙ্গে আমার এমন কিছু সম্বন্ধ নাই, যাতে জীবন-মরণ, জন্মজন্মান্তর বেঁধে ফেলতে হবে। যতটুকু প্রয়োজন, তাই করতে চাইছি; ওর বেশি একচুল না—

—বেশ, তাই হোক—জীবনের পথে চলতে আমরা পরস্পরকে সর্ব্বান্তকরণে সাহায্য করবো—চিন্ময় বলল, কিন্তু দূর্ব্বার ধমকের-সুরে-বলা কথাগুলো ওর মনে গুঞ্জরণ করছে। আশ্চর্য্য এই নারী, প্রতি মুহূর্ত্তে যে স্মরণ করে তার আত্মমর্য্যাদা, অপরকেও স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতি কথায়। দূর্ব্বাও ঠিক ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করে প্রণাম করলো দুজনে—উঠে দূর্ব্বা বলল,

—মনে রাখবেন, আমি ছেলেমানুষী করছিনে। অনন্ত জগতের সৃজয়িত্রী ঐ মহাজননীর অস্তিত্বে আমি পূর্ণ বিশ্বাস করি—

—আমি একটুও করি নে—বলে চিন্ময় হেসে দিল।

—করেন না!—চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠলো দূর্ব্বার, বলল,

—তাহলে আপনি ও প্রতিজ্ঞা আমার সঙ্গে করলেন কেন? আমায় খুসী করবার জন্য যদি ও কথা বলে থাকেন তা এখনি প্রত্যাহার করুন।

—না—আমার কথাকে আমি সত্যের মর্য্যাদা দিতে পারি; তার জন্য ঐ চার-হাতওয়ালা পাথরটাকে বিশ্বাস করা অনাবশ্যক।

—আপনার সঙ্গে তো আমার মিত্রতা হতে পারে না চিন্ময়বাবু!

দূর্ব্বার মুখ যেন মুহূর্ত্তে করুণ হয়ে উঠলো—যেন কি এক দুর্লভ বস্তু তার খোয়া গিয়েছে। অসহায় আর্ত্ত সে মুখ দেখে অতি বিস্ময়ে চিন্ময় প্রশ্ন করলো—মিত্রতা হতে পারবে না কেন?

—কারণ, আমি মহাধনীকন্যা, আমি রাজরাজেশ্বরী বিশ্বজননীর মেয়ে, আর, আপনি পথের ভিখারী; আপনার কেউ নেই—আপনি দীনাতিদীন শুধু নন—আপনি অভাগা। আপনার কথার সত্যতায় আর বিশ্বাস করা যায় না চিন্ময়বাবু—প্রত্যাহার করুন। নইলে সত্য রাখতে গিয়ে আপনাকে বিস্তর দুঃখ সইতে হবে। আর হয়তো আপনি তা রক্ষা করতে পারবেন না।

—কেন?

—কারণ কার বলে আপনি সত্য রক্ষা করবেন? আপনার আধ্যাত্মিক কোন বল নেই, বীর্য্য নেই—যা আছে, সেটা শারীরিক তমোগুণ মাত্র—ও দিয়ে দেশ জয় করা যায়, সম্রাট হওয়া যায়, মন্দির-মসজিদ ভেঙে চুরমার করে দেওয়া যায়, কিন্তু যে-বক্ষশোণিত থেকে জীবনরূপী স্তন্য নিস্থত হয়, তা পান করা যায় না; যে-কোলে শুয়ে সব ভুলে যাওয়া যায় সে-কোলে পৌছান যায় না, যে-মন্ত্র জীবের মুখে সবার আগে জাগে, সেই মা নাম উচ্চারণের অধিকার হয় না—সত্যরক্ষা দূরে থাক, মিথ্যাকে রক্ষা করতেও পারবেন না আপনি—প্রত্যাহার করুন কথা আপনার।

চিন্ময় প্রথমে বুঝতে পারেনি, দূর্ব্বা কতখানা নিষ্ঠার সঙ্গে ঐ কথা-কয়টা উচ্চারণ করেছিল, কিন্তু তার ভুল ভাঙলো। দূর্ব্বার চোখে মুখে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে একটা ভাব—যার অর্থ হতে পারে চিরদিনের মত সম্পর্ক মুছে দেওয়া। কিন্তু চিন্ময় সইতে পারবে না। ভাগ্যক্রমে যে অসাধারণ মেয়েটির সঙ্গে ওর আলাপ হয়ে গেছে, তাকে ছেড়ে ও রিক্ত

তে চায় না। তাড়াতাড়ি বলল,—বেশ, আমি বিশ্বাস করছি—সিরিয়সলি বলছি……

—থামুন চিন্ময় বাবু—একটা তুচ্ছ মেয়েকে খুসী করবার জন্য এবং তার সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখবার জন্য মিথ্যে বলবেন না। ওঁকে বিশ্বাস করবো বললে করা যায় না—উনি অনুভূতি-লভ্যা। কিন্তু যাক সে কথা—আপনার কথা আপনি যতদিন রক্ষা করবেন, ততদিন আমিও রক্ষা করবো, আপনি সত্য ভঙ্গ করলে আমারও আর কোনও দায়ীত্ব থাকবে না—এই কথা।

—বেশ, এ্যামেণ্ড করা গেল তাহ'লে—চিন্ময় হাসবার চেষ্টা করছে, কিন্তু দূর্ব্বা তার উজ্জ্বল চোখ দুটোর দৃষ্টি হেনে বলল,—এ্যামেণ্ড নয়, আপনি ঐ টুকুথানিই বলেছেন, মনে রাখবেন।

—আমি 'জীবনে' কথাটা বলেছিলাম।

—আপনি যেদিন এ সত্য ভাঙবেন, সেদিন আমার কাছে আর জীবিত থাকবেন না, হয় জানোয়ার না হয় মৃত বলে মনে করবো—আসুন।

ও চিন্ময়ের হাত ধরে টান দিয়ে নিয়ে চললো এগিয়ে একেবারে সিনেমায়। তারপর টাকা দিয়ে টিকিট করে ভেতরে ঢুকলো চিন্ময়কে নিয়ে। দুপুরের শো, চিন্ময় হতভম্ভ হয়ে খানিক বসে থেকে শুধুলো,—রেষ্টোরায় আর এখানে তো টাকাতিনেক খরচ হয়ে গেল।

—যাকগে—আমাদের নতুন বন্ধুত্ব একটু সম্মানিত হোক। এখন থেকে তোমায় আর 'আপনি' বলছি না আমি।

—কি বলবে, মিতা?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারি—তবে 'তুমি' বলবো—সেইটাই জানাচ্ছি।

—আমি তো আগেই সেটা বলতে আরম্ভ করে দিয়েছি।

—অন্যায় করেছিলে, এখন বলার অধিকার হোল তোমার।

তোমার ন্যায়-অন্যায় বিচারের ছুরিখানা যে-রকম ধারালো দুর্ব্বা, কে জানে হয়তো এই মিত্রতাবন্ধন অবিলম্বে কেটে যাবে।

—যখন যায়, যাবে—ভাববে, অযোগ্যের সঙ্গে মিত্রতা করেছিলে।

—যোগ্যতায় আমিই ছোট।—চিন্ময় বলল।

—ছোট বড়র কথা তো হচ্ছে না এখানে—মিত্র বলে মেনে নিলে আর ছোট বড় রইল কোথায়? তোমার ছোটত্ব আমার বড়ত্ব দিয়ে আমি পূরণ করবো, আমার বড়ত্ব তোমার ছোটত্ব দিয়ে তুমি খাটো করবে, দেখো, দুজনেই সমান হয়ে যাব—আমি মেয়ে, তুমি পুরুষ, কিন্তু আমরা দুজনেই মানুষ; মনুষ্যত্বের সাধনায় কেউ যেন ছোট না হই।

এরকম অসাধারণ মেয়ের সঙ্গে কথা বলা অত্যন্ত বিপজ্জনক ভেবে চিন্ময় আর কিছু বলতে সাহস করল না। হিন্দি একখানা বই চলছে পর্দ্দায়—হাসি-হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে দর্শকগণ, আর এক কোণায় নিতান্ত কমদামী সীটে বসে দুর্ব্বা আর চিন্ময়ের মিত্রতাবন্ধন দীর্ঘস্থায়ী হোক বলে ওরা প্রার্থনা জানাল।

পুরুষের মনের পঙ্কিল কামনা হয়তো এই কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্ময়কে ত্যাগ করেছে—অতিশয় সহজ কণ্ঠে সে বলল বেরুবার সময়,

—তোমার আমার তহবিলটাও তাহলে একত্র করে নেওয়া উচিৎ, নাও।

—অতি অবশ্য উচিৎ—বলে চিন্ময়ের প্রসারিত হাত থেকে টাকাকয়টা নিয়ে নিজের ব্যাগটায় ভরে ফেললো দুর্ব্বা, তারপর শুধোলো—সিগারেট ক' প্যাকেট লাগে তোমার রোজ? এসো, কিনে দিই।

পয়সা কোথায়?

—ও, কিন্তু সিগারেট খাচ্ছিলে যে সিনেমায়?

—নতুন বন্ধুত্বের সম্বর্দ্ধনা করছি—হাসলো চিন্ময়।

—মানে, আমায় দেখাবার জন্য আজই মাত্র এক প্যাকেট কিনেছ? এ রকম অভ্যাস করো না, বুঝলে! তুমি যে কত গরীব তা আমি বুঝে ফেলেছি।

—হুঁ!—চিণ্ময় চুপকরে চেয়ে রয়েছে।

—এসো, আজ বন্ধুত্বকে সম্বর্দ্ধনাই জানানো হোক—বলে এক প্যাকেট ক্যাপস্টেন আর একটা দেশালাই কিনে দূর্ব্বা ওর পকেট ভরে দিল—বলল, —চল, এবার বাড়ী যেতে হবে।

—একেবারে ক্যাপস্টেন! কাঁচি হলেও চলতো।

—না—দূর্ব্বা ধমক দিল—যখন ভোগ করবে, ভাল করে করবে—যতটা তোমার সামর্থ্য—কাল তো আবার বিড়িই টানতে হবে।

পথ চলতে লাগলো দুজনে। খানিকটা এসে চিণ্ময় বলল—আমার সম্বন্ধে কিছুই তোমার জানা নেই দূর্ব্বা, আমি চোর না ডাকাত, না লম্পট, না সাধু, কিছু না জেনেই মিত্র করে বসলে?

—তোমার সব দেখে-শুনে-জেনে, ভেবে-চিন্তে ক্যালকুলেশ্যন করে মিত্রতা করতে হবে? তুমি তাই করো বুঝি? না চিণ্ময় দা, তোমার মনটা সত্যি বড্ড ছোট—আধ মিনিট থেমে রইল দূর্ব্বা, তারপর বলল—তোমার মাথায় একটা ছোট ঝরণা আছে, খুব ছোট, যা দিয়ে নাটক লেখার কালি জোটে, আমি ওটাকে বড় করে নেব—মহাকাব্য লিখতে পারবে—লিখতে পারবে উদারহৃদয় দধীচির চরিত্র, দাতাশ্রেষ্ঠ কর্ণের চরিত্র, সর্ব্বস্বত্যাগী ভীষ্মের চরিত্র; আরো বড় চরিত্র আঁকবে তখন—করুণাবতার বুদ্ধ, প্রেমাবতার গৌরাঙ্গ, কৃপাবতার রামকৃষ্ণকে……

বাড়ীর দরজায় এসে পড়েছে ওরা, কিন্তু দূর্ব্বা তখনো বলছে—পয়সার জন্য সিনেমার গল্প লিখতে হয়, লেখ—কিন্তু সেই গল্পবস্তুটাও যেন খাঁটি হয়, বাজারের দুপয়সার বিস্কুট না হয়ে মুড়ি-চিড়ে-ছোলাভাজা হয়……হোক সে গল্প সস্তা, স্বাস্থ্য তাতে খারাপ হবার আশঙ্কা কম।……

উত্তর কলিকাতা টালিগঞ্জ থেকে মোটরে হলেও অনেকখানা সময় যায় পৌঁছাতে। বরুণের গাড়ী এসে পৌঁছাল সাড়ে ছটার সময়। দূর্ব্বা তখন সন্ধ্যা দীপ জেলে শাঁখবাজানর আয়োজন করছে। এ সময় কে এল বুঝতে না পেরে ও ভাঙ্গা জানালাটা দিয়ে বাইরে তাকালো—মোটরখানা দেখা যাচ্ছে। নতুন ঝকঝকে গাড়ী—দূর্ব্বা বুঝতে পারল কোন সিনেমা কোম্পানীর লোক নিশ্চয়। কিন্তু যে কাপড় ওর অঙ্গে তা নিয়ে কোনো ভদ্রলোকের কাছে বেরোনো চলে না—আসছি, বলে তাড়াতাড়ি ভাল শাড়ীখানা পরতে গিয়ে দেখে, এখনো শুকোয় নি। আর একখানা শাড়ী অবশ্য আছে। কিন্তু সেটা বড্ড বেশী ভাল, অর্থাৎ দামী কাপড়। ঘরের মধ্যে অত দামী কাপড় কেউ নিশ্চয় পরে থাকে না—ওরা বুঝবে যে দূর্ব্বা সেজে এল। দূরছাই!—দূর্ব্বা ঐ ছেঁড়া কাপড়খানাতেই বাইরের দরজায় এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বলল—আসুন। ভেতরে আসুন সব।

ঠাকুর্‌দা যে-ঘরখানায় থাকেন তার ঠিক উলটা দিকের ঘরটা এক দিন বসবার ঘর ছিল। দীনতা যেন আজ ওঘরে মূর্ত্তি ধরে বিরাজ করছে কিন্তু তবুও সেকালের কয়েকখানা চেয়ার আর একটা টেবিল আছে ওখানে—জিনিষগুলো এককালে মূল্যবান ছিল, দেখলেই বোঝা যায়; দীর্ঘদিনের অযত্নে ওরা ধূলিমলিন হয়ে আছে। আঁচল দিয়ে তিনখানা চেয়ার আর টেবিলটা ঝেড়ে দূর্ব্বা বলল,—বসুন! অকস্মাৎ গরীবের বাড়ী পদধূলি কেন, জানতে পারি?

—আপনার সর্ত মেনে নিতেই রাজি আমরা—বরুণ বলল—অন্য আর কোন কারণ নয়—আপনার স্বচ্ছন্দ কথা আর সাবলীল ভাব আমাদের নায়িকার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আর যখন ব্যবসা করতেই বসেছি, তখন জিনিষটা যাতে ভাল হয়, তা ত করতে হবে।

—অনেক ধন্যবাদ—কিন্তু—দূর্ব্বা থামলো একটু, তারপর বলল, বেশ সহজ সুরেই—আমার আরেকটা সর্ত বেড়েছে, অনুমতি করেন তো বলি—সে সর্তটিও মেনে নিলে আমার দিক থেকে আপত্তি হবে না আর।

—বেশ, বলুন, কি আপনার সর্ত—বরুণই কথা বলছে।

—আপনাদের বই এখনো ঠিক হয় নি—কেমন ?

—না—তবে কাটুবাবুর বইটাই আমরা নেব, একরকম ঠিক আছে।

—বেশ। কাটুবাবুর বইএর সামান্য অংশ আমায় সেদিন শুনিয়েছিলেন, ওর ভালমন্দ আমি কিছু বলতে চাইনে, তবে আমার নূতন সর্ত হচ্ছে, আমার একটি আত্মীয় আছেন, যাকে সেদিন আপনারা দেখেছেন।

—ও, সেই লেখকটি, যার সঙ্গে বৃষ্টির মধ্যে আপনি হাঁটছিলেন ?

—হ্যাঁ—আমার সর্ত হচ্ছে, তিনি আমায় নিয়ে যাবেন এবং নিয়ে আসবেন—মানে, সব সময়ই তিনি আমার সঙ্গে থাকবেন—কাজেই তাঁকেও একটা কাজে, যেমন ধরুন ডাইলগ বা সিনারিও লেখার জন্য নিযুক্ত করতে হবে।

—আপনি আমাদের এতোটা অবিশ্বাস করছেন কেন, বলুন তো ?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না, আমাদের প্রয়োজন, তাঁর এবং আমার।

—ওঁর বইটা আমরা ভাল করে সেদিন শুনিনি—ডিরেক্টর বলল।

—ইচ্ছে করেন তো শুনিয়ে দিতে পারি – ।

—তিনি কোথায় ?

—তিনি টুইসনী করেন—সেখানেই আছেন।

—আচ্ছা, আপনার এ সর্তও আমরা মেনে নিলাম—আর আপনার লেখক বন্ধুটিকেও—সম্পর্কে কে হন আপনার ? দাদা—না আর কেউ ?

—সেটাতো জানবার কোন প্রয়োজন নেই আপনাদের।

—ওহো, মাফ চাইছি—বলে বরুণ চুপ করে গেল। মুখের ওপর এমন জবাব ও দেবে, আশা করেনি বরুণ। সোনার বোতামের মাথায় হীরেগুলো ঝকমক করছে। কিন্তু মুখখানা অত্যন্ত মলিন। বড়লোকের ছেলে, দেখতেও সুন্দর, লেখাপড়াও মন্দ জানে না, তারপর ঐ নাকি হিরোর পার্ট করবে—তাকে এমন জবাব দিতে পারে কোন মেয়ে, ও জানতো না। কিন্তু ওর অহঙ্কার ভাঙতে হবে—ভাঙতেই হবে। বরুণের ঠোঁট দাঁতের চাপে লাল হয়ে উঠলো। দূর্ব্বা দেখলো সে মুখ। মৃদু হেসে বলল,

—যতটুকু আপনাদের সঙ্গে আমার প্রয়োজন, তার বেশি অনুগ্রহ করে কেউ এগুবেন না—এই অনুরোধ জানাচ্ছি—একটু থেমে বললো, এ লাইনটা সম্বন্ধে বিস্তর বদনাম শোনা সত্ত্বেও আমি যোগ দিতে চাইছি—প্রয়োজনের তাগিদে নিশ্চয়। কিন্তু আরো কিছু আছে ওর সঙ্গে!

—কি? বরুণ মুখ তুলে বলল এতক্ষণে—নাচগান অভিনয়ের দিকে আপনার স্বাভাবিক আকর্ষণ?

—তাছাড়াও অন্য কারণ রয়েছে—কিন্তু সেটা আধিভৌতিক নয়, আধিদৈবিক, এমন কি আধ্যাত্মিক বলতে পারেন! প্রলোভনের মধ্যে আমি পরম পদে যেতে চাই! কথাটা সিনেমা-জগতের পক্ষে একটু দুরূহ হোল—নয় কি?—হাসছে দূর্ব্বা! কি চমৎকার হাসি ওর! বরুণ নির্নিমেষ চোখে চেয়ে দেখলো ওকে। এতো গরীবের ঘরে এ রকম মেয়ে কেমন করে জন্মায়! কিন্তু না জন্মালে বরুণের দল মেয়ে পাবে কোথায়? ভগবানের অসীম করুণা। ভগবান! কথাটা মনে হতেই বরুণ হাসলো।

—আপনার বন্ধুটির বইখানা আমরা আর একবার দেখতে পারি—ওটাকে কাটছাঁট করে নেওয়া যেতে পারে—বইটা কি আপনার কাছে আছে?

— না—বলেন তো কাল ওঁকে নিয়ে আমি যেতে পারি বা আপনারাও অনুগ্রহ করে আসতে পারেন এখানে—যেটা আপনাদের সুবিধা হয়।

— গল্পটা ভালই লেগেছিল আমার—কাটুবাবু বলল এবার—তবে সিনেমার গল্পের টেকনিক আলাদা। যাই হোক, কাল তা হলে আপনি আসুন ওঁকে নিয়ে! কখন আসতে পারবেন?

—আপনাদের সুবিধামত সময় দিন—দুপুর বেলা হলে আমাদের ভাল হয়—সন্ধ্যার আগেই আমারা ফিরে আসবো।

—বেশ—বেলা একটা থেকে চারটা পর্য্যন্ত হলেই হয়ে যাবে। আমরাও ওখানে এসে জুটবো সবাই।

—বেশ—বলে দূর্ব্বা বলল—আপনারা দয়া করে একটু বসলে আমি সন্ধ্যাপ্রদীপটা জেলে আপনাদের একটু চা খাওয়াতে পারি।

—বেশ—ভালই তো—যান, আপনি সেরে আসুন, আমরা বসছি।

দূর্ব্বা বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে ঘরখানার দিকে ওদের নজর পড়লো। ধূলিমলিন ইলেকট্রিক বাল্বটার ভেতর দিয়ে যে লালচে আলো আসছে, তাতেই বড় ঘরখানা দেখা যায়—যেন রহস্যময় রাজপুরী—পরিত্যক্ত, প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার বস্তু। তিনটে আলমারী ওদিককার ময়লা দেওয়ালে, বইএ ঠাসা একেবারে—একটা বেতের ইজিচেয়ার, মাঝের বেত ছিঁড়ে গেছে। হাঙ্গরমুখ হাতলওয়ালা একখানা বড় চেয়ার, মিশ কালো—হয়তো আবলুষ কাঠের। চমৎকার কারুকার্য্য তাতে। একটা প্রকাণ্ড সাপের মাথায় হুঁকো,—হুঁকোটা বাঁধানো—সাপটা অত্যন্ত ময়লা হয়ে গেছে। ব্রোঞ্জের কয়েকটা মূর্ত্তি, নটরাজ, ধ্যানী বুদ্ধ, নীলতারা ইত্যাদি। এ সব দেখে বেশ বোঝা যায়, একদিন এই ঘর সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল। পেতলের একখানা পুষ্পপাত্র রয়েছে একধারে—তার গায়ের কারুকার্য্য দেখে যে কোন মানুষ মুগ্ধ হবে। কাটুবাবু সেইটা তুলে আলোর কাছে

ধরে ভাল করে দেখতে লাগল। জিনিষটা অত্যন্ত প্রাচীন, দুতিন জায়গায় টোল খেয়েছে, ময়লা হয়ে রয়েছে, তবু ওর সৌন্দর্য্য যেন অপরিম্লান। কাটুবাবু ডিরেক্টার এবং এডিটার হিসাবে নামকরা লোক। রসবোধ তার আছে। জিনিষটা দেখতে দেখতে প্রশংসার সুরে বলে উঠলো —এটাকে কাজে লাগাতে হবে আমাদের—এর জন্যে একটা সিচুয়েশ্যন তৈরী করতে হবে ড্রামাতে—চমৎকার জিনিষটা।

—ঐ বড় চেয়ারখানাও চমৎকার—ঐ হাঙ্গরমুখো হাতলওয়ালাটা।

—ওটা রাজাবাদশার চেয়ার—এখানা সাধারণ পূজায় লাগানো যেতে পারে।

—কিন্তু পূজার কোন দৃশ্য তো তোমার নাটকে নেই!—বরুণ হেসে বললো।

—আমার নয়, ঐ ছোকরার নাটকটাই নিতে হবে। নাটকের গোড়াতেই একটা পূজার দৃশ্য আছে, আমি শুনেছি। নতুন লেখক, টাকাকড়ি বিশেষ কিছু চাইবে না।

—সে অবশ্য সত্যি কথা—তবে ওর সঙ্গে আবার আত্মীয়তা যে দুর্ব্বার।

—তা হোক,—কাটুবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বলল—আমার নাটক, আমার ডাইরেকশ্যন, আমারই এডিটিং—এগুলো আমার ভাল লাগছে না।

—ব্যাপার কি, হঠাৎ "আমি" এবং "আমার" ওপর এতখানা বীতরাগ? বরুণের প্রশ্নটা সম্পূর্ণ ভাবে এড়িয়ে গিয়ে কাটুবাবু বলল,

—থামো, বে একজন এলেন—সটান ঘরে ঢুকে গেলেন যে?

—তা হলে সেই লেখক কুন্টিই হবে।

—না—সে রোগা, লম্বা। এ লোকটা মোটাসোটা আর বয়সও বেশী।

—হবে কেউ ওদেরই—বলে বরুণ কথাটা কাটিয়ে দিতে চাইছে। হঠাৎ গলার আওয়াজ ভেসে এল ওঘর থেকে। আগন্তুক বলছে,

—আমি তোমায় স্নেহ করি বলেই জুতোর টাকা দেবার কথা বলেছিলাম ; ওভাবে দোকানীর সামনে আমার অপমান নাই করতে

—ওভাবে আপনিই বা কেন যেখানে সেখানে যার তার কাছে আমায় টাকা দিতে চান ? আমরা গরীব হতে পারি, ভিক্ষা করি নে এখনো—যখন করবো, তখন ভিখিরির যা প্রাপ্য, একমুঠি চাল বা একটা পয়সা দেবেন, যদি যাই আপনার দরজায়।

—তুমি আমার ওপর অনর্থক রেগে আছ দূর্ব্বা,

—আপনার ওপর রাগ করবার আগে যেন আমার মরণ হয়।

—ওকি কথা ?

—হাঁা ; কে আপনি যে আপনার ওপর রাগ করতে যাব ? বাড়ীটা নীলাম করেছেন—ভাড়ায় থাকি—পাঁচ মাসের ভাড়া বাকী আছে, যদি দিতে না পারি, চলে যাব অন্যত্র, আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কোন কারণ আমার নেই। সরুন রাস্তা থেকে। ওঘরে আমার বন্ধুরা রয়েছেন—দূর্ব্বা একটা থালায় বসিয়ে চা আর চিড়ে ভাজা নিয়ে এল ; কিন্তু পিছনে এল সেই লোকটিও। বেশ নধর কান্তি গড়ন, গোঁফজোড়া পাকান—বয়স আন্দাজ ছত্রিশ হবে—একটু বেঁটে মত—তবে মুখশ্রী ভালই। সকলকে নমস্কার জানিয়ে ঘরে ঢুকে অন্য একখানা চেয়ার নিয়েই রুমাল দিয়ে ঝেড়ে বসল। বলল—চা আমাকেও এক কাপ দাও—চাইছি।

—বসুন—এনে দিচ্ছি। বলেই দূর্ব্বা ওদের চা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

—আপনারা কি সিনেমার লোক ? কি কোম্পানি আপনাদের ?

—আমরা লিমিটেড কোম্পানি করেছি—নাম এখনো ঠিক হয়নি, মানে পাকাপাকি ঠিক করিনি।

—ও—কি বই হচ্ছে ?

—পরে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখতে পাবেন,—এখন ওসব কিছু বলতে চাইনে আমরা—বরুণকে থামিয়ে দিয়ে এবার কাটুবাবু বলল।

—দূর্ব্বাকে বুঝি নায়িকা করবেন ?

—দেখা যাক—কোনটায় তিনি ঠিকমত মানান।

—ও তো নায়িকা হবার যোগ্যাই মেয়ে ।

—হতে পারে—কিন্তু আমরা কারো মত নিয়ে তো কিছু করি না।

—ও হ্যাঁ—নিশ্চয়, নিশ্চয়—সিনেমায় নামলে মেয়েরা কি ভদ্র থাকে ?

লোকটার অকারণ এ সব প্রশ্ন বরুণকে অতিষ্ঠ করে তুলছে, কিন্তু কাটুবাবু স্থির হয়েই জবাব দিল—ভদ্র থাকা বা অভদ্র হওয়া তার নিজের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু আপনি এ সব কেন জানতে চাইছেন ?. কি অধিকার আপনার ?

—অধিকার আছে বৈকি, সেটা আপনারাই বা জানতে চাইছেন কোন্ অধিকারে ?

—আমাদের জানবার কোনও দরকার নেই, আপনার কথার জবাবও দিতে চাই না আমরা—কে ভদ্র থাকে, কে অভদ্র হয়, এ কি প্রশ্ন নাকি ভদ্রলোকের—আশ্চর্য্য !—কথাগুলো বরুণ বলল এবার সরোষে। ওদিকে আর একবাটি চা আর চিড়ে নিয়ে দূর্ব্বা এসে পৌছেছে দরজায়—বরুণ থেমে যেতেই সে শুধুলো,

—ভদ্র অভদ্রের কি প্রশ্ন ?

—এই ইনি বলছিলেন—যাক—বলে কাটুবাবু থামিয়ে দিল।

অতঃপর ঘরের আকাশটা কেমন যেন থমথমে, কেউ আর বিশেষ কোন কথা বললো না—চা খাওয়া হলে বরুণ সর্ব্বাগ্রে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তা হলে কাল বেলা একটার সময় আসছেন আপনারা—আমরা তৈরী থাকবো নাটকটা শুনতে—পছন্দ হলে ওটাই নেওয়া হবে—আচ্ছা, আসি।

—নমস্কার আপনার সব সর্তই মেনে নিলাম আমরা। ঐ লেখক বন্ধুটিকে নিয়ে আপনি নিশ্চয় আসবেন কাল - বলে কাটুবাবুও নমস্কার জানালো এবং ওরা বাইরে এল। দূর্ব্বাও এল একটু সদর দরজা পর্য্যন্ত। ওরা গাড়ীতে ওঠবায় আগে বরুণ বলল—লোকটা কত টাকা পাবে আপনার কাছে ?

—অনেক টাকা, শপাঁচেকেরও বেশী—

—কালই কনট্রাক্ট করে আমি টাকা দিয়ে দেব আপনাকে, ওর টাকাগুলো ফেলে দেবেন, নমস্কার।

—ধন্যবাদ, নমস্কার !—দূর্ব্বা বাড়ীর ভেতর ঢুকলো।

বাড়ীওয়ালা বাবুটি তখনো বসে চা খাচ্ছে, দূর্ব্বা একচোখ দেখে নিয়ে চলে গেল ভেতরে। তার ক মিনিট পরে সেও ভেতরে ঢুকে দাদুর কাছে বসল গিয়ে ; বলল—কাজটা কি ভাল হচ্ছে দাদু ?

—কি কাজ ?—দাদু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

—এই দূর্ব্বা যাবে নিনেমায় অভিনয় করতে ?

—আমি তো তার স্বাধীনতায় কখনো হাত দিইনি, গোবিন্দ! আত্মমর্য্যাদা বজায় রেখে জীবনের পথে চলবার শিক্ষা তাকে দিয়েছি ; এবার সে বড় হয়েছে—তার যেমন ইচ্ছে, করবে—আমি বলিনি, বাধাও দেব না।

—আপনার বংশধর—আপনার নাতনী—আপনার এতকালের বংশগৌরব !

—কাল সব-কিছুকে ধ্বংস করে গোবিন্দ—মর্য্যাদার কোন অর্থ আজ আমার কাছে নেই। আর আমি জানি, আ ম কত ক্ষতি ওর করেছি।

—ওর আপনি বিয়ে দিন—পাত্রের অভাব হবেনা। বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ—অসবর্ণও চলছে আজকাল—আমার কথা শুনুন দাদু—আপনার ভালর জন্যই বলছি।

—কিন্তু ও যদি রাজি না হয় ?

—ওকে রাজি করান আপনি।

—না গোবিন্দ, আমি ওর স্বাধীনতায় কোনদিন হস্তক্ষেপ করিনি, আজও করবো না। সিনেমায় যোগ দেবে, দিক—এ যুগ সিনেমার যুগ—কঠোর কলি যুগ এসেছে আজ। একে বাধা দিতে যাওয়া মুর্খামী। সতীত্বতো তুচ্ছ কথা, মনুষ্যত্বকেও আজ মানুষ মানছে না।

—সিনেমায় ঢুকলে অমন সুন্দর মেয়েটা খারাপ হয়ে যাবে—

—খারাপ যে হবার সে এমনিই হয় গোবিন্দ, সিনেমায় না গেলেও হয়। কিন্তু থাক সে কথা—তোমার টাকাটা এ-মাসেও দিতে পারছি না।

—থাক-থাক, টাকার কথাতো বলছি না আমি। ওকে আপনি সিনেমা থেকে ফেরান—আমি ওকে বিয়ে করে ঘরে তুলতে চাইছি।

দাদু প্রায় তিন চার মিনিট কোন কথাই বলতে পারলেন না—কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন। গোবিন্দর মুখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এবার! গোবিন্দ ভাবছে, তার প্রার্থনা বিশেষরকম আনন্দের সাড়া তুলেছে বৃদ্ধের বুকে—এ ছাড়া উপায় কি আর! কেউ কোথাও যার নেই, সে আর করবে কি? অনেক ভেবে চিন্তেই প্রস্তাবটা আজ করেছে গোবিন্দ।

গোবিন্দর কিছু পরিচয় আবশ্যক। বছর পঞ্চাশ আগে ওর ঠাকুরদা কলকাতার কোন অজ্ঞাত পল্লীতে চিড়ে-মুড়ির দোকান করতো, তার সঙ্গে নিষিদ্ধ নেশা ভাঙও। জাতে ওরা কি, তা ভাল জানা নেই। তবে দেখা যেত, কোনও উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে গঙ্গা স্নান করে ফিরতে দেখলে গোবিন্দর ঠাকুরদা ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করতো, আর সাহেব দেখলেই বলতো, —গুড মর্ণি হুজুর, মেজাজ ঠিক হ্যায়? মানিকতলা অঞ্চলে খানিকটা জমি কিনে কয়েকখানা বাড়ী তৈরী করে গোবিন্দর বাবাকে উত্তরাধিকারী রেখে সে স্বর্গে যায়। অতঃপর গোবিন্দর বাবা নিজকে কায়স্থ বলে পরিচয় দিয়ে জাতে উঠে এল—এবং চালের আড়ৎ আর লোহার কারবার

খুললো। সে-ই টাকা ধার দিয়েছিল দাদুকে। ভালরকম ধনসম্পত্তি এবং গোবিন্দর মতন সুপুত্রকে রেখে সেও দেহরক্ষা করেছে বছর পাঁচেক হোল। এখন গোবিন্দই মালিক। লেখা পড়া গোবিন্দ মন্দ করেনি, তখনকার দিনের থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিল, তবে প্রতি ক্লাসে দুতিন বছর থেকে পাকা হওয়ার দরুণ থার্ড ক্লাসেই বয়স কুড়ি পার হয়ে গেল। বাবা ওকে স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে দিল, এবং কাজে ঢুকিয়ে নিল। গোবিন্দর সেই পত্নী পরপর তিনটি কন্যা প্রসব করার পর চতুর্থবার প্রসব করতে গিয়ে গতাসু হয়েছে বছর তিন হোল। গোবিন্দর বড় মেয়ের বয়স পনর—সেই সংসার দেখে। বিয়ের সম্বন্ধ অনেক যায়গা থেকেই এসেছে, কিন্তু গোবিন্দ গা করেনি—কিন্তু এখন আর চলছে না।

পনর বছরের মেয়ে, বিয়ে দিলেই শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে এবং সংসার দেখবার লোক থাকবে না—গোবিন্দর দ্বিতীয় বিবাহেচ্ছার এটা কিন্তু কারণ নয়; সত্যি কারণটা হচ্ছে, দূর্ব্বাকে যেভাবে আয়ত্ত করতে পারলে গোবিন্দর আশা পূর্ণ হোত, সেভাবে তাকে পাবার কোনও সম্ভাবনা না দেখে আজ মরিয়া হয়ে বিবাহের প্রস্তাব করে বসলো গোবিন্দ। প্রস্তাব সে করতে পারলো, দূর্ব্বা সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছে শুনে—অন্যথায় এ প্রস্তাব করার সামর্থ্য হোত না তার। কারণ গোবিন্দর ঠাকুরদার আমলের মুড়ি-চিড়ের দোকান থেকে এ পর্য্যন্ত সব ইতিহাস এই বৃদ্ধ জানেন—গোবিন্দর বিদ্যা, চরিত্র ইত্যাদি কিছুই অজানা নেই তাঁর।

চোখ বুঁজে তিনি ভাবছিলেন—সেই চিড়েমুড়ির দোকানদারের নাতি আজ পঞ্চতীর্থোপাধিধারী বিপ্রদাস চৌধুরীর একমাত্র নাতনীকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করছে! সবই ভাগ্যের পরিহাস। কিন্তু ভাগ্যটাকে উনি শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা বলেই মেনে নিয়েছেন। নইলে এই দুঃসহ দুঃখ সইবার শক্তি তাঁর অনেক আগেই ফুরিয়ে যেত। কিন্তু ভাবতে লাগলেন,

তাঁর জীবনের মেয়াদ আর বেশী দিন নাই—শ্রীগুরুদেব যে-কোনো মুহূর্ত্তে ডাক দিতে পারেন। ত্রিশটে মাত্র টাকা বৃত্তি পান তিনি সরকার থেকে, যুদ্ধ-পূর্ব্বে ওতে ভালই চলে যেত—এখন অর্দ্ধাশনও হয়না। তিনি দেহ রাখলে, সে বৃত্তিও বন্ধ হয়ে যাবে—এবং এই বিশ্বসংসারে এমন কোনও জীবিত মানুষ নেই যে দূর্ব্বাকে দেখবে। গোবিন্দর প্রস্তাবটা কি গ্রহণ করা উচিৎ নয় তাঁর—কিন্তু তিনি যন্ত্র, শ্রীগুরুদেব যন্ত্রী—দূর্ব্বা সম্বন্ধে আর কিছু করতে তিনি যেন নিষেধই করছেন বৃদ্ধকে। ধীরে চোখ খুলে বললেন, —বিধবা-বিবাহ আমি অসমর্থন করিনে গোবিন্দ, আর বর্ত্তমান জাতিতত্ত্বেও আমি শ্রদ্ধাবান নই—কারণ এ জাতিতত্ত্ব গুণগত নয়—সমাজগত। কিন্তু, একটু থেমে বললেন—মেয়েটা নামে দূর্ব্বা হলেও কাজে দুর্ব্বল নয়……

—সিনেমা লাইনে গেলে মেয়েটা মাটি হয়ে যাবে, তার থেকে আমায় দিন, আমি যত্নে রাখবো—সাহস পেয়ে আরও কয়েকটা কথা বলল গোবিন্দ—ওখানে কি ভদ্দরলোকের মেয়ে যায়—ছিঃ!

—থামো গোবিন্দ, ভদ্র অভদ্র বা ভালমন্দর তফাৎ আমরা করতে জানিনা, কিসে কার ভাল হবে, কারও জানা নেই—ক্ষুধিত ব্যাধ যে পশুটিকে হত্যা করে, তার মাংসে সে পরিবার প্রতিপালন করে, কিন্তু পশুটির হয় মৃত্যু; পশুর দিক থেকে বিচার করলে সেই হত্যা অসমর্থনীয়।

গোবিন্দ ভড়কে গেল। বৃদ্ধের কাছে কঠোর দর্শনশাস্ত্র সে শুনতে আসেনি—এসেছে নিজের কাজ হাসিল করতে। বলল,

—দেখুন—আপনি আর কদিন! তারপর মেয়েটার কি গতি হবে, ভেবে দেখেছেন? আর আপনার যখন বিধবা বিবাহে বা অসবর্ণ বিবাহে আপত্তি নেই, তখন আর তো কিছু বাধা দেখিনে! আপনার এই বাড়ী আর আমার আরও তিনখানা বাড়ী আমি ওর নামে লিখে দিচ্ছি—যার আয় মাসে অন্ততঃ হাজার টাকা হবে। আর জানেন তো, কলকাতা সহরে

কোথায় কে কাকে বিয়ে করল, ক'বার করলো, কেউ খোঁজ রাখে না—আপনি অনুমতি দিন, আমি আয়োজন করি।

—অনুমতি আমার দেবার আর অধিকার নেই গোবিন্দ, ওর আট বছর বয়সে সে অধিকার আমার ছিল। এখন ও সাবালিকা—অনুমতি যদি দিতে হয়, সেই দেবে। কিন্তু তোমাকে একটা প্রশ্ন আছে আমার।

—বলুন।

—এতদিন তুমি যে-চোখে ওকে দেখে এসেছ, আমি জানি—তোমার মত চরিত্রের মানুষের পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়—কিন্তু আজ যে প্রস্তাব তুমি করলে, সেটা অন্য রকম। এর হেতু কি গোবিন্দ? বিয়ে যদি তুমি করতে চাও, তোমাদের সমাজে পাত্রীর অভাব নেই···।

গোবিন্দ একটুখানি চুপ করে রইল—জবাবটা দিতে ওকে ভাবতে হচ্ছে—আজন্ম সত্যসন্ধ এই বৃদ্ধের কাছে যা-তা বলা চলে না। ভেবে বলল—ওকে সত্যিই আমি ভালবাসি···

—হাঃ হাঃ হাঃ! হেসে উঠলেন বৃদ্ধ—এ ভালবাসা সৃষ্টিধর্ম্মী গোবিন্দ—বদ্ধজীবের বন্ধন দৃঢ় হবার রজ্জু—যাক—তোমায় আর একটা প্রশ্ন করছি, কিছু মনে করো না—দূর্ব্বা শুধু সুন্দরী নয়, তার মনের গতিও দুর্ব্বার—তাকে তুমি সইতে পারবে? সামলাতে পারবে?

—বিয়ে হলেই মেয়েরা বৌ হয়ে ঘরে ঢোকে, তারপর সংসার আর ছেলেমেয়ে নিয়ে সব ভুলে যায় ওসব আপনি ভাববেন না।

—দূর্ব্বা সম্বন্ধে কথাটা সত্যি নয় গোবিন্দ! দেহের ক্ষুধার চাইতে তার মনের ক্ষুধা অনেক বেশী—সে তুমি মেটাতে পারবে না।

—দেখুন, পেটে ভাত আর পরনে কাপড় মানুষের আগে দরকার—গোবিন্দ যেন কিছুটা উত্তেজিত হয়েই বলে চলল—ওসব খিদেটিদের কথা পরে—গয়নাগাঁঠি, শাড়ীকাপড়, তেল-চিরুণী-সাবান পেলে যে-কোন

মেয়ে দু'দিনে বশ হয়ে যায়—তখন বিয়ে থাকে শিকেয় তোলা। কত বি-এ, এম-এ পাশ দেখলাম—হাঃ!

—বি-এ, এম-এ পাশই দেখেছ গোবিন্দ, বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ দেখনি—যে মেঘ থেকে বর্ষার ধারা নামে, আবার বজ্রও পাত হয়—যাক—তোমার প্রস্তাব আমি দুর্ব্বার কাছে পৌঁছে দেব—জবাব সেই দেবে।

—বেশ, তাই করবেন, আমি এসে জেনে যাব—বলে উঠবে গোবিন্দ, কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন না করে সে যেতে পারে না। উঠতে উঠতে বলল, —সেদিন একটা ছোক্‌রাকে দেখলাম ওর সঙ্গে দোকানে; কে সে? আপনার আত্মীয় কেউ তো নেই·····

—হবে কেউ—বাইরে যখন বেরোয় তখন বন্ধু তো জুটতে পারে!

—ঐ ছেলেটাই হয়তো সিনেমায় যাবার মতলব দিয়েছে ওর মাথায়! ওসব ছোকরার সঙ্গে মিশতে দিচ্ছেন কেন ওকে? ওতে কি চরিত্র ভাল থাকে?

—আমি ওর স্বাধীনতায় কখনো হস্তক্ষেপ করিনে গোবিন্দ, একথা তোমায় আগেই বলেছি। আর তোমার এই কথাটার মধ্যে ওকে বন্দী করবার যে অভিলাষ রয়েছে, সেটা ওকে ভালবাসার লক্ষণ নয়, ওকে নির্য্যাতন করবারই বুদ্ধি—তবু আমি বলেছি, তোমার প্রস্তাব আমি তাঁর কাছে পৌঁছে দেব—

—আচ্ছা, সে রাজী হলে আমি নিজেই তখন দেখে নেব।

—আচ্ছা! বলে হাসলেন বৃদ্ধ করুণা। গোবিন্দ প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।

করুণ বসে বসে চিন্তা করছে প্রকাণ্ড একখানা সোফায়। ওর প্রাসাদ ইন্দ্রালয় বললে অত্যুক্তি হয় না। অনেক পুরুষ ধরে ওরা ধনী, তাই প্রাচীন পরিবারের ঐতিহ্য ওদের বাড়ীতে কম নেই। কিন্তু গত সন্ধ্যায়

দূর্ব্বাদের বাড়ীর জিনিষগুলো দেখে ও বুঝতে পেরেছে—দূর্ব্বার জন্ম এমন একটা পরিবারে, যার সংস্কৃতি সুপ্রাচীন এবং ধর্ম্ম সদ্ধর্ম্ম—সত্য, সনাতন ধর্ম্ম। ইংরাজ আসার পর ইউরোপীয় সভ্যতার খর প্রবাহে ওদের নিজস্ব স্বত্ব ভেসে যায় নি, সে যেমন দৃঢ়মূলে ছিল, আজও তেমনি আছে; এমন কি, এত দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও আছে।

ওদের বাড়ীতে আর কে আছে, জানে না বরুণ। হয়তো দূর্ব্বার মা-বাপ, ছোটভাই—কিম্বা ছোটবোন, কিন্তু কাউকেই তো দেখতে পাওয়া গেল না। জিজ্ঞাসা করলেই হোত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে কোথায় যেন বেধেছিল ওদের। আজ বরুণ প্রশ্ন করে জেনে নেবে।

কিন্তু কেন? দূর্ব্বা আসছে অভিনেত্রী হতে। আর্টের সম্মানের সঙ্গে আর্টিষ্টের সম্মান জড়িত 'বাগার্থমিব সম্পৃক্ত'; দূর্ব্বা ভাল অভিনয় করতে পারলে প্রচুর সম্মান পাবে নিশ্চয় কিন্তু দূর্ব্বা যেন স্বতই সম্মানিতা—ঐ আশ্চর্য্য মেয়েটাকে দেখলেই কেমন যেন মাথা নুয়ে আসে। ও যেন আর্টিষ্টের প্রাপ্য সম্মানের বহু উর্দ্ধে; যে রসময়ী প্রকৃতি থেকে সমস্ত কলার উদ্ভব, ও যেন স্বয়ং সেই কলালক্ষ্মী! কিন্তু না। বরুণ অনর্থক ওর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করছে। গরীবের মেয়ে, সিনেমার অধিনেত্রী হবে, ওর আবার মর্য্যাদা কি?—ওর দৈহিক মর্য্যাদার দাম হাজার কয়েক টাকা—বরুণ তা দিতে পারবে নিশ্চয়।

কিন্তু কোথায় যেন গোল লাগছে বরুণের। হাজার কয়েক টাকা দিয়েই কি ওকে কেনা যেতে পারবে—যে অতি তুচ্ছ কারণে বরুণের মত ধনীপুত্রকে মুখের ওপর বলে যেতে পারে—'অভদ্র, ইতর!' আচ্ছা! বরুণের চোখ অকস্মাৎ জ্বলে উঠলো—ঐ কথাটা, মাত্র ঐ কথাটার জন্যই বরুণ এতোখানি করছে; ওকে পথের ধুলোয় ফেলে না দেওয়া পর্য্যন্ত বরুণের নিদ্রা নেই, শান্তি নেই, পরমার্থ নেই।

অন্যায় এমন বেশি কি আর করেছিল বরুণ? ষ্টিয়ারিং থেকে বাঁ হাতখানা তুলে ওকে একটু কাছে টেনে নেবার জন্য ওর পিঠে হাত দিয়েছিল—সতীর বাচ্চা একেবারে! তিরিক্ষে মেজাজ দেখিয়ে নেমে পড়লো। আচ্ছা!

লনের সুন্দর রাস্তায় একটা প্যারাম্বুলেটারে চড়ে বছর দুই-এর একটা মেয়ে বেড়াচ্ছে—বাজাচ্ছে কি যেন একটা লাল মত। পিছনে আয়া ঠেলছে গাড়ীখানা। ফুল দেখে খুকী চেঁচিয়ে উঠলো ফু……ফু……ফু……ল্ মা—মা—ফু……ল্ ল্।

বরুণের দৃষ্টি পড়লো মেয়েটার দিকে। একফোঁটা শিশির যেন দূর্ব্বা ঘাসের সবুজ পাতায় ঝলমল করছে—গাড়ীটার রং সবুজ, তাই দূর্ব্বার কথাটা মনে পড়লো বরুণের। নইলে আর কি কারণ থাকতে পারে 'দূর্ব্বা' শব্দটা মনে আসবার! কিন্তু বরুণ সাইকোলজী পড়েছে, মনের নিভৃত কন্দর ও দেখতে জানে—দূর্ব্বা শব্দটা গাড়ীর বর্ণের জন্য নয় এখানে, দূর্ব্বা নামধেয়া তরুণীটির জন্যই মনে পড়ল। কিন্তু ঐ মেয়েটা আরো অনেক কথা মনে করিয়ে দিল বরুণকে। আত্মার আত্মজা ও বরুণের; বরুণের মুখের গড়ন থেকে গায়ের রংটা পর্য্যন্ত ও কেড়ে নিয়েছে—না, ওকে দিতে হয়েছে—ওর অধিকার স্বতসিদ্ধ, তাই দিতে হয়েছে—কিন্তু বরুণ এখন 'ভিলিয়ান'—ও সব পুণ্য কথা ভাববার ওর সময় নেই—মেয়েটার দিক থেকে চোখ ফেরালো বরুণ।

বা—বা—বা—বা—বা :—…ডাকছে খুকী—আয়াটা হাসছে। কানে যেন বিষ ঢালছে বরুণের। নির্জনে একটু চিন্তাও এরা করতে দেবে না!

—ওকে ঐ দিকে নিয়ে যাও, ফাঁকা হাওয়ায়, বুঝলে!

বরুণ আদেশ করলো আয়াকে। কিন্তু গাড়ী ঠেলতেই খুকী কাঁদছে, —না—মা—না—বাবা!

একি বিষ না অমৃত! নাকি বিষামৃত একসঙ্গে! মনে পড়লো, "বাঁশরী রব তুয়া অমিয় গরলরে, হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরলরে।" উহুঁ, বরুণ দুর্ব্বল হবে না। চেয়ে দেখলো, ক্রন্দনাতুর মেয়েটাকে গাড়ীসমেত ঠেলে আয়া দূরে চলে গেল—অনেকটা দূরে। যাক্, কিন্তু ওর মা আছে এই বাড়ীতেই, দোতালায়। কোন সময় আবার এসে না পড়ে। কিন্তু তাকে বরুণ খুব বেশী খাতির করে না, ভয় তো করেই না। ভয় করে ঐ একফোঁটা মেয়েটাকে; সেই যেন বরুণকে শাসন করে মাঝে মাঝে; কালো, কাজলটানা চোখজোড়া তুলে গর্জন করে বলে,

—বাব্বা!

বরুণের সব আইডিয়া তালগোল পাকিয়ে যায়। ভারী মুস্কিল! ও যেন বরুণকে শাসন করতেই এসেছে। ওকে কিছু বলবার নেই; ঘর সংসার নোংরা করবে, জুতো জামা কাপড় উচ্ছন্ন দেবে, বরুণের চুল ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে, হুকুম করবে,

—বাঁশী দাও, নয় লজেন্স, নয়ত খেলনা।

তৎক্ষণাৎ তামিল করতে হবে বরুণকে। সব কাজ ভণ্ডুল করে দেয় ও। সাধে কি আর মুনি-ঋষিরা বনে চলে যেতেন! ঐ একফোঁটা একটা বাচ্চার ভয়ে!

কিন্তু বরুণ বনে যাচ্ছে না, সিনেমার আপিসে যাবে; দেরী আছে। এই তো সকাল সাতটা—বেলা দুটোর সময় এনগেজমেণ্ট। অনেক দেরী, অনেক! আষাঢ় মাসের লম্বা দিন, বাপ্! দু—টো। এখনো সাত ঘণ্টা। তারপর আসবে দূর্ব্বা—তন্বীশ্যামাশিখরীদশনা! বিরাট 'লনটা' বর্ষার বারিপাতে সবুজ হয়ে উঠেছে—মৃত্তিকা-জননীর গর্ভস্থ শষ্পাঙ্কুর তরুণী হয়ে উঠলো—তন্বীশ্যামা···পান্নার মত প্রাণমোহন। খুকীটা গাড়ী থেকে নেমে ঘাসে ঘাসে হামা দিয়ে বেড়াচ্ছে—বরুণের জীবনাঙ্কুর···কয়েকটা বর্ষার

পরেই ও-ও তরুণী হয়ে উঠবে—অমনি অপরূপ লাবণ্য-ঢলঢল·····দূর ছাই! কি সব ভাবছে বরুণ। আজ ওসব পুণ্য কথা নয়। সৎচিন্তা শিকেয় তোলা থাক : বরুণ বিরক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। গাড়ীখানা সামনেই রাখা হয়েছে ধুয়ে মুছে। বরুণ উঠেই চালিয়ে দিল। গেটের বাইরে বেরিয়ে যাবার আগেই ডাক—বাব্বা!

ওঃ! জ্বালাতন করে মারলো দেখছি! কিন্তু বরুণ অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে গেল। মেয়েটা হয়তো কাঁদবে। বরুণের কোলে বসে কচি হাত দিয়ে ষ্টিয়ারিং ঘোরায় সে—ঐ খেলাটা খেলতে পেলনা বলে কাঁদবে হয়তো। কাঁদুক! অত দেখতে গেলে চলেনা বরুণের!

কিন্তু আশ্চর্য্য! ও এই পৃথিবীতে আসবার আগে বরুণ কত কি করেছে—কারুর কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয়নি তাকে! ওর মার কাছেও না। পৃথিবীর কিছুকে গ্রাহ্য করতো না বরুণ। অর্থ আর স্বাস্থ্য থাকলে ভোগ না করা পাপ, এই তার ধারণা ছিল। অকস্মাৎ কোত্থেকে ঐ শিশিরবিন্দুটা এসে ওর অহঙ্কারের হিমাচলকে ভাসিয়ে ডুবিয়ে বিপর্য্যস্ত করে দিচ্ছে! অতটুকু একটা মাংসপিণ্ড, এতো তার শক্তি! বরুণ বাড়ী ফিরলে ও যদি ঘুমিয়ে থাকে, তবেই রক্ষে, জেগে থাকলে গলা জড়িয়ে ধরে লম্বা টানা চোখদুটো তুলে বলবে,—বাব্বা! কোথ্ ছিল্!—

বরুণ অসহায় হয়ে যায় ওর কাছে! বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বরুণ—বাপঠাকুরদার মর্য্যাদা ভাঙিয়ে সে অভিজাত হয়েই আছে, এবং থাকবে আরো অনেকদিন—কারণ অর্থসম্পদ তার অফুরন্ত! কিন্তু ঐ শিশিরবিন্দুটাকে তেমনি অভিজাত ঘরে তুলে দিতে হবে—যেখানে কচুপাতায় নয়—দূর্ব্বাদলে সে প্রদীপ্ত থাকতে পারবে—কিম্বা—

চমকে ওঠলো বরুণ! দূর্ব্বাদলে কেন? পদ্মদলে বললেই তো ভাল হয়। নিজের মনেই কথাটা সংশোধন করছে। কিন্তু ঐ মেয়েটার মা যদি

হোত!—আঃ, ছিঃ, কি সব ভাবছে বরুণ! কোন এক সিনেমা-অভিনেত্রীকে তার ঘরের লক্ষ্মী করবার কথা কেন মনে ওঠে তার?—কিন্তু দূর্ব্বা কি শুধু অভিনেত্রী—না—বরুণ আশ্বস্ত হোল। খুব অন্যায় অযোগ্য কথা সে ভাবেনি। বরুণের গৃহাধিষ্ঠাত্রী হবার মত সব যোগ্যতাই আছে দূর্ব্বার—বরুণেরই নাই, তার প্রবল প্রতিবন্ধক ঐ শিশিরকণাকে যে প্রসব করেছে সে!—

'এত তাড়াতাড়ি বিয়ে না করলেই পারতো বরুণ, কিন্তু সেকালের গিন্নীদের সঙ্গে কি পারবার যো আছে? মা শুনলেন না—মেয়ে পছন্দ হয়েছে, অতএব বিয়ে করতে হবে বরুণকে। না করলে গৃহে অশান্তি, বাইরে বদনাম এবং মেয়েটাও হাতছাড়া হয়ে যায়। মার পছন্দটা ভালই। বরুণের জন্য অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে ঠিক করেছিলেন তিনি—অভিজাত্য, সুশিক্ষিতা, নৃত্যগীতকুশলা এবং চঞ্চলা চপলা হাস্যলাস্যময়ী সুবর্ণা। ঘর আলোকরা বৌ এসেছে বরুণের বছর তিনেক আগে। রূপের দীপ্তিতে মার্ব্বেলের মেঝে ঝলমলিয়ে উঠলো—বরুণ চেয়ে দেখলো—মূর্ত্তিমতী কাঁমনা! বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের নখটি পর্য্যন্ত পালিশ করা—পায়ের জুতোর জরীতে খনির সোনা লুটিয়ে পড়ছে। পিয়ানোর সামনে বসে গান ধরলো—

মম মর্ম্মমুকুরে দূর হতে সখা পড়েছে তোমার ছায়া,
প্রণয়লোকে প্রেম-আলোকে গড়েছে স্বপন-কায়া……

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বরুণ। তারপর কয়েকমাস প্রায় গৃহবন্দী ছিল সে—নববধূর অঞ্চলবন্দী বললেই ভাল হয়। অকস্মাৎ একদিন বধূ বিরক্তমুখে প্রকাশ করলো—সন্তান আসবে! বিরক্তির কারণটা অনুসন্ধান করতে গিয়ে বরুণ জানতে পারলো, এতো শীঘ্রি ও চায়নি সন্তান—অনাহূতই আসছে সে। যে আশ্রয়ে সে এসেচে, সেখানে স্নেহস্তন্যেরও কার্পণ্য হবে,

বুঝতে দেরী হোল না বরুণের। আধুনিকা, প্রগতিবাদিনী, পরাণুকরণে অভ্যস্থা সুবর্ণাকে কিছুই বলতে পারলো না বরুণ—শুধু গর্ভস্থ সন্তানটির জন্য মমতায় তার অন্তর আকুল হয়ে উঠলো। সুবর্ণা সেই দিনই জানিয়ে দিল—মাইহুধ দিতে পারে এমন মেয়ের যেন এখন থেকে চেষ্টা করা হয়—কারণ, যৌবনকে সে নষ্ট করতে চায় না! শুনে বরুণ সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে ভেবেছিল—ঘরের বৌ আর পরের মেয়েতে তফাৎটা বড় সূক্ষ্ম আজকার দিনে।—কিন্তু যাক্ সে কথা।

বরুণের মনের গঠন বড় বিচিত্র; চরিত্রও তাই কিছু বিচিত্র ধরণের। লেখাপড়া সে ভালই শিখেছে। ইংরাজী সাহিত্য তার আয়ত্তে—আর বাংলাও ভাল জানে, তা ছাড়া কিছু বিজ্ঞানও সে পড়েছে। প্রথম যৌবনে পড়ার দিকেই ছিল ঝোঁকটা, তারপর কোথায় কি যেন ভূমিকম্প হয়ে ফাটল ধরে গেল—বরুণের জীবনে জাগলো অপরিমিত ভোগস্পৃহা। সুবর্ণা যদি স্নিগ্ধ স্নেহশীতলা স্রোতস্বিনী হোত, তা হলে হয়ত বরুণের জীবনতরণী ভালই চলে আসতে পারতো, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সুবর্ণা হোল চঞ্চলা গিরীনদী—তার গৈরিক স্রোতে বরুণ উদ্দাম হয়ে উঠলো আরো, এবং সুবর্ণার স্বর্ণনদী ছেড়ে সহস্র নদীর অনুসন্ধানে চলে এল—সিনেমার পথে আসার এইটাই হয়তো বড় কারণ কিন্তু ঠিক এই সময়েই এল ঐ একফোঁটা মেয়েটা—কী অজস্র শক্তি, কী অফুরন্ত দীপ্তি তার—যেন সৌরজ্যোতি। বরুণ চোখ বুজে উদ্দামগতিতে চলছে অন্ধকার পথে। চোখ খুললেই আলো চোখে পড়ে—খুকীর মুখখানা! কিন্তু বরুণ চোখ খুলবে না।

গাড়ীখানা নিয়ে গড়ের মাঠে কয়েকপাক ঘুরে বেশ খানিকটা পেট্রোল পুড়িয়ে বরুণ এসে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে বাড়ীতে ফোন করে দিল—বিশেষ কাজে সে আটকে গেছে। বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হবে—।

চিণ্ময়কে সকালেই পারুলের ছোটভাই খবর দিয়ে গেছে—সে যেন বারোটা-সাড়েবারোটার মধ্যে খাওয়া সেরে নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে দূর্ব্বার বাড়ী আসে। ব্যাপার কি, জানে না চিণ্ময়—কিন্তু দূর্ব্বার আদেশ অবহেলা করা অসম্ভব। বারোটার মধ্যে স্নান-খাওয়া শেষ করে সাড়ে বারোটার আগেই সে বেরিয়ে পড়ল।

গিয়ে দেখলো—দাদু একা বসে তামাক টানছেন, দূর্ব্বা কোথায় বেরিয়েছে—হয়তো পাশের বাড়ীতে। চিণ্ময়কে দেখে বললেন,

—এসো দাদা—দিদি বলে গেছে, কোথায় যেন বেরুবে তোমার সঙ্গে!

জবাব দেবার কিছু নাই। চিণ্ময় বসলো বিরাট পালঙ্কটার একধারে। দাদু কিছুক্ষণ তামাক টানলেন, তারপর আস্তে কাশলেন, বললেন,—সেদিন দিদি আমায় এসে বললো যে তার ভবিষ্যৎ জীবনের ভার নেবে এমন একজন বন্ধু সে পেয়েছে—আমি এবার যখন ইচ্ছে চোখ বুজতে পারি—থামলেন; চিণ্ময় চুপ করে রয়েছে—আবার কেশে বললেন,—তারপর তুমি আসনি; ব্যাপার কি ভাই? কি রকম বন্ধুত্ব তোমাদের?

—সে তো মাত্র পরশুর কথা দাদু—কাল আসতে পারিনি—বড্ড ঝামেলায় ছিলাম—একটা লোক তিনখানা দলিল নকল করিয়ে পাঁচটা টাকা দিল—সারাদিন ঐ-কাজ করেছি—উকিলের বাড়ী থাকি, বুঝছেন তো!

—ভাল কথা—রোজগার করবারই বয়স এখন ভাই তোমাদের—কিন্তু—আবার থেমে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর বলতে লাগলেন,—দিদির স্বাধীনতা আমি খর্ব্ব করেছি ওর আট বছর বয়সে—আর কখনো করিনি—করবো না। শ্রীগুরুদেবের যেমন ইচ্ছে, তেমনই হবে দাদা, তবে তোমাদের বন্ধুত্বটা কি ধাঁচের, একটু বলতে আপত্তি আছে?

—না, কিছু না দাদু—চিণ্ময় উত্তর দিল—তারপর বললো, কি

প্রতিশ্রুতিতে ওরা আবদ্ধ হয়েছে ঠনঠনের কালীতলায়। সবটা বলে চিঃ বলল—গোড়ায় আমি ওটাকে সিরিয়াস ভাবিনি দাদু—কিন্তু পরে বুঝলাম, নামে দূর্ব্বা হলেও আপনার নাত্‌নি ব্যবহারে দুর্ব্বাসা—ওর কথার নড়চড় হয় না।

—তোমারও যেন না হয় দাদু—এবার কাজের কথাটা বলি, শোন।

চিগ্ময় অপেক্ষা করতে লাগলো। বৃদ্ধ আরো কয়েকটান তামাক টেনে বললেন—গতকাল কারা সব এসেছিল, হয়তো সিনেমার লোক—কিন্তু আর একজন এসেছিল, গোবিন্দ, এই বাড়ীর বর্ত্তমান মালিক।

—ও—ভাড়া চাইতে?

—না, তোমাকে বলেছি, দূর্ব্বার দিকে ওর দৃষ্টি আছে; সে সিনেমায় যোগ দেবে শুনে গোবিন্দ আমার কাছে দূর্ব্বাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করলো!

—সে কি! বয়স কত তার? কি জাত?

—জাতিতত্ত্ব আমি তো মানিনে দাদু—বর্ত্তমান জাতিতত্ত্বের কোনও অর্থ নেই। ভগবান বলেছেন—'চাতুর্বর্ণো ময়া সৃষ্ট গুণকর্ম্ম বিভাগশ—' আর অন্য শাস্ত্রও বলেন—'শুচা দ্রবতি ইতি শূদ্র'—অর্থাৎ যে ব্যক্তি শোক দুঃখে অভিভূত হয় সেই শূদ্র—এ অর্থে গোবিন্দ শূদ্রই—কিন্তু যাক সেকথা, বয়স একটু বেশী—ছত্রিশ আন্দাজ হবে—স্বাস্থ্যবান—দূর্ব্বাকে আমি বললাম তার কথা।

—শুনে সে কি বলল?—বিস্ময় দমন করে প্রশ্ন করলো চিগ্ময়।

—বলল, স্বামী-সংসার করবার জন্য আমার জন্ম হয়নি দাদু—হলে আর হাতে আমায় দিয়েছিলে, সেই আরো কিছুকাল টিকে যেতে পারিতো।

—ওর মত্‌ নেই তাহলে—চিগ্ময় অকূলে কূল পেয়ে দম ছাড়ছে।

—না—ওখানে মত্ হবে না, জানতাম। ওর মনের কোন্ খোরাকটা মেটাবে গোবিন্দ! কিন্তু তোমার কথাটাও ঐ সঙ্গে আমার মনে এসেছিল।

চুপ করে রইল চিন্ময়, হয়তো একটু লজ্জা, একটু সঙ্কোচ,—বৃদ্ধ বলে চললেন,—কিন্তু আমি তো তোমায় কিছু বলতে পারি না ভাই; মেয়ে বিধবা না হলে হয়তো সে প্রস্তাব আমি করতাম।

—তোমায় কিছু আর করতে হবে না দাদু···যেদিন খুসী এরপর মহাসমাধি নিয়ে তোমার শ্রীগুরুদেবের পদসেবা করতে যেতে পার; বলে দূর্ব্বা এসে দাঁড়ালো ঘরে—হাতে একজোড়া জরী দেওয়া দামী জুতো।

—তোর বন্ধুকে কথাটা বলছিলাম দিদি···

—বলতে বাধা নেই, ভাবতে মানা করছি তোমায়। আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমায় আর কিছু ভাবতে হবে না—বুঝলে? তামাকটা সেজে দেব আর একবার?

—থাক—দিদি—তোরা বেরুবি কখন?

—এই এক্ষুনি—জুতো আনতে দেরী হয়ে গেল। খালি পায়ে যাওয়া ঠিক নয়।

—কোথায় আনলে জুতো? পারুলের কাছে?—চিন্ময় শুধোলো।

—পারুলকে বেচলে এমন জুতোর দাম উঠবে না, হুঁ! ওটা যে কি করে পরবো, তাই ভাবছি—ওর যুগ্যি শাড়ী ব্লাউজ তো চাই আবার।

—আমি টাকা এনেছি, রাস্তায় জুতো কিনে নেব—চিন্ময় বলল।

—টাকা! তোমার মাইনে তো সেদিন খরচ হয়ে গেছে! এডভান্স নিলে?

—না—বলে চিন্ময় টাকা পাওয়ার ইতিহাস জানালো। শুনতে শুনতে দূর্ব্বা সযত্নে জরী দেওয়া জুতোজোড়া কাগজ মুড়ে রেখে দিয়ে

—বাঁচালে! পরের জিনিষ নিতে হোল না। কাপড়খানা বদলে আসি বলেই ওঘরে গেল এবং ফিরে এল দশ মিনিটের মধ্যে। তারপর বেরুলো দুজনে রাস্তায়। দাদু বসে বসে 'শঙ্কর ভাষ্য' পড়তে লাগলেন।

রাস্তায় বেরিয়ে চিণ্ময় বলল—পাণ্ডুলিপিটা কি জন্যে আনতে বললে?

—ওরা শুনবে—ওরা মানে সিনেমাওয়ালারা—সেই যে গো রঞ্জাবতী না গুঞ্জমালা কি যেন?

—রঞ্জাবতী! তারা তো শুনেছে সেদিন।

—সেদিন তারা জানতো না যে আমি তোমার কর্ণধার—হাসলো দুর্ব্বা। হাসি ওর একটা রোগবিশেষ। চিণ্ময় এই কদিন লক্ষ্য করছে, দুর্ব্বা যখন তখন হাসে অতি দুঃখেও। হাসিটা অবশ্য খুবই সুন্দর ওর, কিন্তু সত্যসমস্তই ঐ সম্পদটা খরচ করা ঠিক নয়। শুধুলো,

—তুমি কি রঞ্জাবতী সিনেমা কোম্পানীতে যাবে নাকি?

—হ্যাঁ—তুমি যাবে আমার বডিগার্ড হয়ে।

—তোমারও বডিগার্ডের দরকার হয় দুর্ব্বা?

—হয়—কেন জানো? পৃথিবীর সব যায়গায় তো মানুষ নেই—গরু ছাগলও আছে, তারা পাছে মুড়িয়ে খেয়ে নেয়—হাসলো দুর্ব্বা আবার, তবু কিন্তু মরে না দুর্ব্বা, অপবিত্রও হয় না—আত্মা তার অবিনশ্বর, কিন্তু তখনকার মতন নেড়া হয়ে যায়।

—তোমার মানসিক শক্তি অসীম দুর্ব্বা।

—হ্যাঁ—আমার মন অজেয় চিণ্ময়দা, কিন্তু দেহটার জন্য রক্ষক দরকার।

—শুধু রক্ষক হয়ে আমায় চলতে হবে দুর্ব্বা? গোবিন্দ যে প্রস্তাব করতে পারে···

—থামো চিণ্ময়দা—আমি জানি, তুমি অতিশয় দুর্ব্বল পুরুষ—তবু

তোমাকেই আমার বন্ধু করলাম। কারণ জানো? তুমি দুর্ব্বল, কিন্তু তুমি মানুষ; পশুকে মানুষ করা যায় না—মানুষকে মহামানব করাও সম্ভব!

—তুমি আমায় মহামানব করতে চাও দূর্ব্বা?

—না—তোমায় শুধু দূর্ব্বার অকৃত্রিম বান্ধব করতে চাই—আকাশের মেঘের মত উদার, সজল, সুন্দর, দূর্ব্বা যার রসে সঞ্জীবিত হয়!

—মেঘে বিদ্যুৎ থাকে দূর্ব্বা—তার জ্বালা বড্ড বেশি!

—মেঘের ঔদার্য্য তাকে সহ্য করতে পারে—এসো, চটি কিনবো; দাওত টাকা গুলো।

চিণ্ময় নিশ্চুপ বসে বসে দেখলো দূর্ব্বার চটি কেনা—তারপর নিঃশব্দে ফিরে ট্রামে উঠলো। গাড়ীতে ভিড়—দূর্ব্বা অবশ্য লেডিজ সীটে বসতে পেল, কিন্তু চিণ্ময়কে দাঁড়িয়ে থাকতে হোল সারা পথ। টালিগঞ্জ ট্রামডিপোতে নেমে দূর্ব্বা সর্ব্বপ্রথম যে কথাটি বলল, তা হচ্চে,

—পা ব্যথা করছে? ভয় নাই, শীগ্রি তোমায় মোটরে চড়াবো। হাসলো চিণ্ময় একটু—কিন্তু দূর্ব্বা ঐ কথার জের ধরে বলল আবার—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

—তোমাকে কোনখানে আমি আর অবিশ্বাস করিনে দূর্ব্বা—শুধু ভাবছি, কতদিন আমার এই বন্ধু-সৌভাগ্য থাকবে, কে জানে। হয়তো কালই এই মিত্রতাবন্ধন ছিঁড়ে যেতে পারে—হয়তো আজই যাবে।

—হয়তো কোনদিনই যাবে না—দূর্ব্বা বলল—আমার দৈহিক সংস্পর্শ-টুকু বাঁচিয়ে বন্ধুত্ব রাখা কি তোমার পক্ষে এতোই কঠিন হবে চিণ্ময়দা?

—জানিনা—চিণ্ময় গট্‌গট্ করে এগিয়ে চলল। দূর্ব্বা হেসে উঠলো।

—তোমার আধ্যাত্মিক শক্তি অতিশয় কম চিণ্ময়দা—তবে ভয় নেই, আমি শক্তি যুগিয়ে যাব···দূর্ব্বা ছুটে এসে সঙ্গ নিল ওর। বলল,

—মাসকয়েক আগে একটা মাসিকপত্রে একটা কবিতা পড়েছিলাম চিণ্ময়, শ্রীচিণ্ময় মুখোপাধ্যায়ের লেখা—গোড়াটা মনে আছে ; শুনবে ?

"আমার জীবন-পদ্মদল কি গলিয়া গলিয়া পড়িবে না মা ?
তোমার ও-দুটি চরণ পদ্মে, শিশিরের মত ঝরিবে না মা ?
তবে মিছে এই জীবনোৎসব,
মিছে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈভব,
মিছে হবে মোর আয়ুর অমৃতে এ-দেহপাত্র পূর্ণ করা,
সে-পাত্র যদি তোমার চরণে উজাড় করিয়া না ঢোল ধরা।"

চিণ্ময় ওর মুখের পানে তাকিয়ে আছে ; সেই প্রকাণ্ড শিরিষ গাছটা, জনবিরল পথ—সর্পিল— দূর্ব্বা সর্পিল বেণীটা দুলিয়ে বলে চলল,

"অনেক পুণ্য করি নাই ভয়ে, বোঝা যদি মাগো অনেক বাড়ে,
পাপের বোঝা তো ফেলিয়া এসেছি তব নামামৃত সিন্ধুপারে—"

—থাক দূর্ব্বা—কবিতা লেখা, আর জীবনের পথে চলা এক নয়।

—একই ! যে কবির কলমে এই কবিতা আসে, সে দুর্ব্বল, নিজেই সে স্বীকার করেছে—কিন্তু সে সবলতার ভণ্ডামী করে না—সে অকৃত্রিম, তাই সে দূর্ব্বার বন্ধু !

—আমি যে এ কবিতার লেখক, তা তুমি কি করে জানলে দূর্ব্বা ? অন্য চিণ্ময় তো হতে পারে !

—পারে, তবে হয়নি। জানতে পারলাম আজই। যার কাছে জুতো চাইতে গিয়েছিলাম সে লেখিকা, মানে, 'লেখিকা' হবার সখ আছে তার। বড়লোকের মেয়ে, অনেক মাসিকপত্র কেনে। তোমার সঙ্গে বেরুবো শুনেই বলল—কোন্ চিণ্ময়, কবি চিণ্ময় ?

—হ্যাঁ—শুনে আরো কয়েকটা কবিতা দেখালো তোমার ! তারপর

তোমার সঙ্গে আলাপ করবার লোভে আমাকে অমন দামী জুতো জোড়া পরতে দিল—নইলে মেয়েরা সহজে কাউকে কিছু দিতে চায় না।

—মেয়ে হয়ে মেয়েদের সম্বন্ধে একথা বলোনা দূর্ব্বা!

—কথাটা সত্যি—যদিও মেয়েরা স্বীকার করেনা; আর জানো তো, আমি ঠিক মেয়ে নই—অর্দ্ধেকখানা, অর্থাৎ মনখানা আমার পুরুষের মত শক্ত—

—ঐ কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিনা দূর্ব্বা।

—যেহেতু শক্ত না হলেই তোমার সুবিধে হয়। কেমন? কিন্তু দু'দিনেই বুঝতে পারবে—বিশ্বাসও করবে। চলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে; দুটো হয়তো বাজলো।

রাস্তায় আর কোনও কথা হোল না ওদের। রঞ্জাবতী ফিল্মকোম্পানীর অফিসে ঢুকলো ওরা। অফিসটার চেহারা যেন একটু বদলেছে—অন্য আর কিছু না—টিপয়ে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা—আর ফার্ণ সাজানো। আর বরুণের পাঞ্জাবীর সোণার বোতামের মাথায় আজ হীরের বদলে মুক্তা রয়েছে। কাটুবাবু কোট প্যাণ্টেই থাকে বরাবর—অন্য দুজনও বেশ একটু দামী পোষাক পরিহিত—ঘরখানাও ঝাঁট দেওয়া। ঢুকতেই সাদর অভ্যর্থনা পেল ওরা—আসুন, আসুন—ঠিক দুটো। বাঃ!

—দেরী হলে ফাইন করতেন নাকি?—দূর্ব্বা বললে বরুণকে।

—অতটা আস্পর্দ্ধা যদি পাই কখনো!

—আস্পর্দ্ধা কেন? এও তো চাকরী একরকম, আপনারা হলেন মনিব।

—কিন্তু-মনিব সম্বন্ধটা আমরা পছন্দ করিনে এখানে—বরুণ বলল।

—পেয়ারাকে আম না বলে পেয়ারা বললেই ভাল হয় না কি? হাসছে দূর্ব্বা।

—কিন্তু এ সব আর্টের ব্যাপার—চাকর মনিব সম্বন্ধ এখানে অচল। কাটুবাবু তার কাটাকাটা কথায় বললো—ওতে কলা-লক্ষ্মীর অপমান হয়—

—কলা-লক্ষ্মীর প্রতি নিষ্ঠা যেন আপনার অটুট থাকে—বলে দূর্ব্বা এবার আর হাসল না—গম্ভীর হয়েই বলল—কলালক্ষ্মীকে অপমান করতে বলছি নে, চাকরীকে চাকরী বলেই স্বীকার করলে আমার সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হবে—আর আমি তাই করতে চাই!

কেউ আর কোন কথা বলল না। দূর্ব্বা আর চিণ্ময় পাশাপাশি বসেছে সোফায়—বরুণ সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিল ওর দিকে—খান; চা কি খাবেন এখন?

—না—থ্যাঙ্কস্—বলল দূর্ব্বাই—ও পড়তে কি আরম্ভ করবে?

—আপনার সঙ্গে কথাটা আমরা আগে পাকা করে নিতে চাই।

—বেশ; আমার কনডিশ্যান হচ্ছে—কোনো পুরুষের সঙ্গে আঙ্গিক স্পর্শ বিশিষ্ট ভূমিকা আমি নেব না; সুরুচিবিরুদ্ধ বেশবাস পরবোনা; সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমি ডিউটি থেকে অব্যাহতি নেবো—দিন ছাড়া রাত্রে কাজ আমি করবো না—আমার সঙ্গে সব সময় আমার আত্মীয় চিণ্ময়দা অবস্থান করবে—আমি থাকবো তাঁর দৃষ্টির মধ্যে। ষ্টুডিওতে অভিনয় করানো বা রিহার্সাল দেওয়ানো ছাড়া আমাকে দিয়ে আর কোনো কাজ করাতে পারবেন না।

—বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের সময়?—কাটুবাবু হেসে শুধুল।

—আমার অভিভাবক সেখানেও থাকবে; বস্ত্রপরিবর্ত্তন আমি ম্যানেজ করে নেব!

—আমাদের এতখানা অবিশ্বাস কেন করছেন দূর্ব্বা দেবি?

—অবিশ্বাস নয়, যে কোন কারণে হোক, আমি এই 'প্রিন্সিপ্‌ল্' নিয়েছি।

—বেশ, আমরা মেনেই নিলাম আপনার সর্ত্ত; তবে দেখবেন, কাজ করতে হলে এরকম বাঁধাধরার মধ্যে কতখানি অসুবিধা আপনাকেই পেতে হবে।—বরুণ বলল।

—অসুবিধার দিকটাও আমি ভেবে দেখেছি, তবু এই সর্ত্ত আমায় নিতে হচ্ছে।

বরুণ ছাড়া আর কেউ এ সর্ত্ত মানতে রাজী ছিল না ওদের মধ্যে ; কিন্তু বরুণ এখানে আসবার আগে রেস্তোঁরায় সকলকে ডেকে মিটিং করে ঠিক করে নিয়েছে, যে-কোন সর্ত্তে দূর্ব্বাকে নিতে হবে—বরুণই বেশী টাকার শেয়ার হোল্ডার, আর কার্য্যতঃ সেই ডাইরেক্টার—কাজেই আর কারো কিছু বলবার রইল না। কাটুবাবু টাকা না দিয়েই শেয়ার-হোল্ডার ; তাই বলল হেসে,

—কাজে নেমেই বুঝতে পারবেন,—সর্ত্ত রাখা যায় না। কি সর্ত্তে বন্দী হতে পারে ? বন্ধনে আর্ট কখনো খোলে না !

—ভুল করছেন—দূর্ব্বা কোমল হেসে বলল—প্রকৃতি থেকে বড় আর্টিষ্ট কেউ নেই, আর প্রকৃতি থেকে শৃঙ্খলা তো অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। শৃঙ্খলাহীন আর্ট আর্ট নয়, উদ্ভট ! এই বিশ্ব উদ্ভট নয়, কারণ এতে সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা রয়েছে।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। আপনি কি আগে কোথাও অভিনয় করেছেন ?

—প্রকাশ্য কোথাও না—পাড়ার মেয়েদের নিয়ে অনেকবার অভিনয় করেছি !

—সিনেমায় অভিনয় করাটা একটু কঠিন !

—অভিনয় অভিনয়ই, অন্য কিছু নয় ; যে সেটা পারে, সে সর্ব্বত্রই পারবে। ভাল, আমার দ্বারা যদি না হয় তো আমায় বিদায় করে দেবেন—পরীক্ষার পূর্ব্বে আমি টাকাকড়ি কিছুই নিতে চাই না।

—না—না, তা কি হয় ? আর পারবেন না কেন ! সকলেই কি সিনেমা আর্টিষ্ট হয়ে জন্মায় !—হ্যাঁ, শুনুন, আমাদের এটা প্রথম প্রচেষ্টা,

এইজন্য আপনাকে কিছু কম নিতে হবে—নায়িকার ভূমিকার জন্য আমরা পাঁচহাজার ধরেছি—তবে পরবর্ত্তী ছবিতে দ্বিগুণ হবে—

—পরবর্ত্তীতে কি হবে, সে কথা এখন থাক—দূর্ব্বা বলল—বেশ, আমি আপনাদের এষ্টিমেটের বাইরে যেতে বলছি না।

—আজ আপনাকে হাজার টাকা এড্‌ভান্স করছি—কৈ হে, কনট্রাক্ট ফর্ম্ম বের কর—বরুণ আদেশ করলো এবং পকেট থেকে মোটা মণি-ব্যাগ বের করে একশ' টাকার দশখানা নোট গুণে টেবিলের উপর রাখলো। ওদিকে কাটুবাবু কনট্রাক্ট ফর্ম্মটা পূরণ করতে করতে শুধুলো,

—সিনেমা-জগতে কি নামে পরিচিতা হতে চান আপনি ?

—দূর্ব্বা—আমার ঠাকুরদার দেওয়া নাম—

—বই-এর নায়িকার নাম অতসী, ঐ নামটা নিলেই ভাল হয়।

—অন্য বই-এর নায়িকার তো আলাদা নাম হবে—তখন অতসী নামে অসুবিধা হবে—তাছাড়া নাম আমি বদলাতে চাই নে।

—দরকার কি—বরুণ বলল—বরং আমাদের ফিল্ম কোম্পানীর নামটাই বদলে "দূর্ব্বাদল ফিল্ম প্রডাক্‌সন" করে ফেলা যাক।

—সে কি ? আমার নামে কেন নাম রাখবেন আপনারা কোম্পানীর ?

—আপনার নাম বলে নয়, নামটা সুন্দর বলে—বরুণ জবাব দিল।

—না, এতে আমার আপত্তি আছে। আমি ত কোম্পানীর কেউ নই যে, আমার নাম জড়িত থাকবে কোম্পানীর নামের সঙ্গে!

বরুণ একবার তাকালো ওর পানে, তারপর বলল,—ওরা দুজনে ষাট হাজার আর আমি ষাট হাজার দিয়ে এই কোম্পানী গড়েছি—আপনি ত্রিশ হাজার দিলে আপনাকে অন্যতম শেয়ারহোল্ডার করে নিতে পারি।

—ত্রিশ হাজার টাকা কোথায় পাব আমি?—দূর্ব্বা বিস্ময়ের হাসি হাসলো।

—তিনটে ছবিতে অভিনয় করলেই ত্রিশ হাজার হয়ে যাবে আপনার। অভিনয় ভাল হলে তো কথাই নেই—এখনই হিন্দির জন্য আলাদা কনট্রাক্ট এবং বেশী টাকা পাবেন—এই বই-ই আমরা হিন্দি করবো—তাতেও তো আপনাকে থাকতে হবে!

দূর্ব্বা একটুখানি ভাবলো। এতোটা কেন এরা করতে চায়? সাধারণ ভাবে ওকে সিনেমায় ঢুকিয়ে ওর রূপ-যৌবনটা ওরা চাইছে, এ তথ্য তার জানা; কিন্তু শেয়ার হোল্ডায় করে নিতে চাওয়া যেন অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি বলে মনে হোল তার—ভেতরে আরো কোনো বদ মতলব আছে নাকি? বলল,

—দেখুন—ওসব ঝুঁকি আমি নিতে চাইনে এখন। ভাল অভিনয় যদি করতে পারি তো তখন "দূর্ব্বাদল ফিল্ম কোং" খোলা যাবে। এ ছবিতে ঐ পাঁচ হাজার টাকাতেই আমি অভিনয় করবো—অতখানা বাড়াবাড়ি করা আমার পক্ষে ঠিক হবে না। একদিনেই বড়লোক নাইবা হলাম।

—বড়লোক তো হচ্ছেন না—ওতে আপনাকে কোম্পানীর জন্য প্রচুর খাটতে হবে, অথচ পারিশ্রমিক পাবেন না যতক্ষণ ছবির টাকা ঘরে না আসে।

—তাহলে আমার চলবে কি দিয়ে?

—তার জন্য একটা এলাউন্স ঠিক করা থাকবে—ধরুন মাসিক দু-তিনশ'—যে টাকাটা পরে বাদ দিয়ে নেওয়া হবে আপনার প্রাপ্য মুনাফা থেকে। আমি অনুরোধ করছি, আপনি রাজী হয়ে যান—এ প্রস্তাব অন্য কাউকে আমরা দিতাম না— তবে আমরা দেখে এসেছি আপনি

বনেদী ঘরের মেয়ে—সাধারণ অভিনেত্রী হিসাবে আপনাকে আমরা দাঁড় করাতে চাই না—শেয়ার হোল্ডার হিসাবে থাকলে, সাধারণ অভিনেত্রীর পর্য্যায়ে আপনি পড়বেন না—বরুণ থামলো।

দূর্ব্বা ভাবছে। এতখানা আশাতীত সৌভাগ্য কেন আসতে চাইছে তার জীবনে? সে এই সুযোগ গ্রহণ করবে কিনা—ঠিক করতে পারছে না। পরামর্শ করবার মত কেউ নাই—চিণ্ময় এ ব্যাপারে একেবারে অপদার্থ। চেয়ে দেখলো, বরুণের দামী সিগারেটগুলো সে একটার পর একটা শেষ করছে—বলল—আর খেও না, ঠোঁট জ্বালা করবে।

—আরো শুনুন—বরুণ বলল—শুধু অভিনেত্রী হলে আমরা পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারি, কিন্তু শেয়ার-এ এলে ঐ অভিনয়ের জন্যই আমরা হয়তো দশ হাজার টাকা ধরবো আপনার পারিশ্রমিক, কারণ ও-টাকা তো আমাদের নগদ দিতে হবে না—অভিনয় হলে, ছবি ভাল চললে পাঁচ-দশহাজার কিছুই নয় এ লাইনে। আপনাকে নগদ দিতে হচ্ছে বারো মাসে মাত্র চব্বিশ শ,—কাটুও এই সর্ত্তে ডিরেকটার এবং শেয়ার-হোল্ডার—ও মাসে তিনশ' করে এলাউন্স নেবে। আপনি রাজী হয়ে যান—কেমন?

—ভাবছি!—শোন তো, একটু বাইরে এসো—বলে দূর্ব্বা চিণ্ময়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাইরে। বরুণ ইতিমধ্যে সঙ্গীদের পানে চেয়ে বলল—রাজী হবে। আর রাজী হলে অন্য কোন কোম্পানীতে যেতে পারবে না, এই সর্ত্ত করে নিতে হবে—বুঝলে?

—অতটা আস্কারা কেন দিচ্ছিস তুই ওকে?—নৃপেন শুধুলো।

—ওকে আমার চাই-ই, লক্ষ টাকার বিনিময়েও—বরুণের চোখ জ্বলছে।

—সেটা আর বেশী কি! অভিনেত্রী হিসাবে যোগদান করলেই হবে!

—না—ওকে আরো গভীরে আমি টানবো—আমি প্রমাণ করে দেব যে যে-কোনও মেয়ের প্রেম লাভের যোগ্যতা আছে আমার। টাকা আমি দেব—তোমরা শুধু মুখে সম্মতি দিও···

—ঐ লোকটাকেও পুষতে হবে আমাদের!

—হোক—আমিই পুষবো—ওটা নিতান্ত গোবেচারা মানুষ, ভয় নেই! আর, আমি কোনো রকম অভদ্রতা করতে চাইনে মেয়েটার সঙ্গে। সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর প্রেমই আমার কাম্য।

—বেড়ে! অকস্মাৎ স্বাস্থ্যকর ভাষা বেরুচ্ছে বরুণ তোর মুখে, ব্যাপার কি? প্রেমটা যে তোর বুকে আগেই গজিয়ে গেছে, দেখছি!

—গেছে—যাক্ চুপ কর সব।

বাইরে আসতে আসতে চিন্ময় যেন অতর্কিতে বলে ফেললো, —আমার খুব ভাল লাগছে না দূর্ব্বা—

—আমারও না; এ যেন একটা ফাঁদ! কি বল?

—হ্যাঁ—তাই তো মনে হচ্ছে! এতখানা প্রলোভন—না দূর্ব্বা, কাজ নেই!

বেড়ার ধারে এসে দাঁড়ালো দুজনে। একটা মেহেদী ফুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে দূর্ব্বা বলল—মানুষ সর্ব্বত্র পশু, কিন্তু ঐ যে লোকটা, মুক্তোর বোতাম লাগানো—ওর মধ্যে একটা মানুষ যেন ঘুমিয়ে আছে!

—ঘুমিয়েই থাক—জাগাতে চেও না দূর্ব্বা, সে মানুষ বনমানুষ হতেও পারে।

– ভালই তো ! খাঁচায় পূরে রাখবে, অথবা জ্যু গার্ডেনে।

—জ্যু তৈরী করতে অনেক খরচ দূর্ব্বা—ও-সখ এখন থাক, বাড়ী চল দূর্ব্বা, এ বড্ড খারাপ লাগছে আমার।

—ভয় নেই, তোমার দূর্ব্বা আর কারো হয়ে যাচ্ছে না ; চল, ওদের জবাব দিই—শেয়ারে আমি আসবো না—কি বল ?

—না—কে জানে কি ফাঁদ আছে ওর মধ্যে !

কথা কয়টা আস্তে বলে ওরা আস্তে ফিরে এল আবার ঘরে। দূর্ব্বা ধীরে ধীরে বসে বলল –দেখুন, শেয়ার-হোল্ডার হবার মত বড় সৌভাগ্য আমি আজই কামনা করছি নে। আপনাদের সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ ! আমি শুধু অভিনেত্রী হিসাবেই যোগ দিতে ইচ্ছা করি।

—শুধু অভিনেত্রী !—বরুণের কণ্ঠে কাকুতি যেন !

– হ্যাঁ – শুধুই অভিনেত্রী এবং আমার সব সর্ত্ত বজায় রেখে !

—বেশ,—তবে আপনাকে যে সুযোগ আমরা দিচ্ছিলাম, তা বড় কমই পাওয়া যায় – কাটুবাবু বলল কথাটা।

– ধন্যবাদ তার জন্য অশেষ—কিন্তু আমি নিতে পারলাম না।

—আচ্ছা, তাহলে কনট্রাক্টেই সই করুন। কাটু কাগজগুলো এগিয়ে দিল।

চিণ্ময়ের হাতে সেগুলো তুলে দিয়ে দূর্ব্বা তাকে পড়ে দেখতে বলল, এবং তারপর ওদের শুধুলো—গল্পের ব্যাপার কি করবেন ?

—আপনার বন্ধুর গল্পটা শোনা যাক এবার।

—না—ও বই আপনারা নিতে পারবেন না। ও থাক ; আপনাদের যেমন ইচ্ছে, গল্প নির্ব্বাচন করুন—আমার বন্ধুর বই-এর জন্য আমি অন্যত্র চেষ্টা করবো।

—আমাদের ওপর কি অসন্তুষ্ট হলেন দূর্ব্বা দেবি ? নৃপেন শুধুলো।

—আজ্ঞে না, অসন্তুষ্ট হব কেন ? গল্প নির্ব্বাচন আপনারা করবেন,

আমার কি বলবার থাকতে পারে! তবে আমার বন্ধুর গল্প যাতে ভাল ভাবে স্ক্রীন হয়, তা আমি নিশ্চয় দেখবো!

—এখানে ভাল ভাবে হবে বলে মনে হচ্ছে না আপনার?

—না—

—কারণ?—বরুণ শুধুলো।

—কারণ, ভাল গল্প বা ভাল ছবি করবার দিকে দৃষ্টি আপনাদের

—সেকি! এ রকম অভিযোগ কেন করছেন দূর্ব্বা দেবি? বরুণ ব্যগ্রভাবে বলল।

—কথাটা সত্যি, তাই বললাম!

—বেশ—ওঁর গল্প পরে স্ক্রিন করবো; আপাততঃ যে গল্পটা আমরা ঠিক করেছি, আমারই লেখা—কাটুবাবু বলল—তার দুর্ব্বল অংশগুলো আপনি ঠিক করে দিন—শ' পাঁচেক টাকা আপনাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

চিন্ময় জবাব না দিয়ে দূর্ব্বার মুখ পানে তাকাল। কাটুবাবু বলল,

—আপনি বলুন, আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি।

—আমার কিছুই আমি বলি না—সবই ও বলে—চিন্ময় জবাব দিল।

—হ্যাঁ—আমিই বলছি—দূর্ব্বা বলল—আপনার গল্পই উনি ঠিক করে দেবেন আপনার সঙ্গে বসে—যতটা সম্ভব ভাল করতে উনি কসুর করবেন না—তবে ওঁর নাম কোথাও জড়াবেন না!

—কেন!—নামটাই তো সকলে জড়াতে চায়।

—অপরের গল্পে ওঁর নাম আমি পছন্দ করিনে—টাকার জন্যেই শুধু ওটুকু উনি করবেন—ওঁর গল্প আমি নিজে ডাইরেকশন দিয়ে তুলবো!

—ডাইরেকশন একটা আর্ট, টেকনিক্—সেটা শিখতে হয় দূর্ব্বা দেবি!

—অপরে যেটা শিখেছে, আমরাও সেটা শিখতে পারি—

—অবশ্য! আচ্ছা, তাহলে এই কথাই পাকা—হ্যাঁ—আপনি আমাদের ভ্যানে যাতায়াত করবেন তো—নাকি 'কার' পাঠাতে হবে?

—আমি ট্রামেই আসবো ওর সঙ্গে—ট্রামেই যাব।

—রাস্তায় বড় বিব্রত করে পাবলিক—বিশেষ মেয়ে আর্টিষ্টকে।

—তার ব্যবস্থা আমি নিজেই করতে পারবো।

—আমার 'কার' আপনাকে আনবে, পৌঁছেও দেবে—বরুণ বলল।

—ধন্যবাদ—দরকার হবে না আমার।

কনট্রাক্ট সই হয়ে গেল। বরুণ হাজার টাকার নোট তুলে দিল দূর্ব্বার হাতে। দূর্ব্বা সেগুলো না গুণেই তুলে দিল চিণ্ময়কে।

—রাখ—তাহলে আমরা যাই আজ!

—এক মিনিট—বরুণ বলল—আপনার খান কয়েক ফটো তুলে নেব কাগজে প্রকাশ করবার জন্য—বরুণ ক্যামেরা বের করলো—আসুন একটু বাইরে—বাগানে—বেয়ারা, চেয়ার নিয়ে আয়!

প্রথম একটু ইতস্ততঃ করলো দূর্ব্বা, তারপর সমস্ত দুর্ব্বলতা ঝেড়ে এগিয়ে গেল বাগানে। চিণ্ময়ও গেল সঙ্গে। তিন চার রকম 'পোজ' এ দূর্ব্বার কয়েকখানা ছবি তুলে নিয়ে বরুণ দূর্ব্বাকে ধন্যবাদ জানাল।

—আচ্ছা—নমস্কার!

—চা খেয়ে যাবেন না?

—না—থাক; অন্যদিন হবে—দূর্ব্বা আর চিণ্ময় বেরিয়ে পড়ল।

হাজার টাকার মালিকরা এসে রাস্তায় নামলো। ট্রামেই যাবে, কিন্তু ট্যাক্সি ওরা এখন করতে পারে; কাছাকাছি ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড নেই, নইলে হয়তো করতো। কিন্তু ট্যাক্সির কথা ওরা এখন কেউ ভাবছে না—চরিত্রের

কথা ভাবছে। চিন্ময় বলল—তোমায় কোন্ চরিত্র অভিনয় করতে হবে? রঞ্জাবতী?

—না—রাণী রঞ্জাবতীর মেয়ে অতসীর চরিত্র—এতক্ষণ শুনলে কি তুমি?

—অন্যমনস্ক ছিলাম—বলল চিন্ময়—রঞ্জাবতীর মেয়ে অতসী কেন? তার নাম হওয়া উচিত ঝঞ্ঝাবতী—কিম্বা গুঞ্জমালা···

—থামো, হাসিও না—তুমি আর একটু সিরিয়স অর্থাৎ গম্ভীর হও, বুঝলে? রাণী রঞ্জাবতীর মেয়ে আমি অতসী, আমার প্রেমে পড়লো বৈশালীর যুবরাজ মৈনাক···তারপর চললো নাটক ঘাতে-প্রতিঘাতে··· শেষে সহমরণ

—সহমরণ?

—হ্যাঁ—ভয় কি! তোমার দূর্ব্বা মরবে না, নাটকের অতসী মরবে—হাসলো দূর্ব্বা, মধুর।

এই রহস্যময়ী তরুণীর অগাধ হৃদয়-পারাবারে চিন্ময় নিতান্তই তৃণখণ্ড! কি ওর ভাব এবং অনুভাব, চিন্ময় তিল মাত্র বুঝতে পারল না। নীরবে হেঁটে চলছে রাস্তা দিয়ে—সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছটার কাছে এল।

—এইখানে তোমায় কুড়িয়ে পেয়েছি বন্ধু—এই বৃক্ষরাজকে নমস্কার।

—এখানে কেন? আমার সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা হয় ওদের অফিসে। নমস্কার সেই স্থানকেই করা উচিত!

—কবিতা লেখা তুমি ছেড়ে দিও চিণুদা—তুমি অতি মাত্রায় অরসিক আর অকবি। মাঝে মধ্যে যা লেখ, তা তোমার লেখা নয়, কোনো ভাড়াটে ভাব সেগুলো!

—সেকি, কেন?

—কারণ, এই নির্জন সর্পিল পথের পাশে তরুতলে তোমায় আমায় দেখা, এইটাই কাব্য···ওদের অফিসে তোমার চেহারা দেখা কাব্য নয়—দূর্ব্বা খুব গম্ভীর।

—কিন্তু ওটা সত্যি···চিণ্ময় সত্যবাদিতার ওপর জোর দিয়ে কথা বলছে।

—ওটা সত্যি হলেও কাব্য জগতে, রসের বিচারে এইটাই সত্যি চিণুদা! তোমার কবি-অন্তর এখনো মলিন—সত্য মাত্রই কাব্য নয়, ধ্রুব সত্য অথচ মহান-সত্য, যা বাক্য এবং অর্থকে ছাড়িয়ে মনে আনে ব্যঞ্জনা—ধ্বনি—যার রেশ আপ্লুত করে তোলে অন্তরকে···চল।

দূর্ব্বার মুখপানে চেয়েছিল চিণ্ময়—ওর কথা বলার সুমিষ্ট ভঙ্গীটা দেখছিল না—ভাবছিল নিজের অন্তরের দৈন্য—নিজের কবি-হৃদয়ের অকবিত্ব। কিন্তু দূর্ব্বা আবার তাগাদা দিল ওকে চলবার জন্য। চিণ্ময় বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে।

—চলো চিণুদা, হঠাৎ কাব্যের বান ডেকে উঠলো যে তোমার!

—না দূর্ব্বা, বান নয়, একটা উৎসমুখ যেন খুলে যাচ্ছে—জলকল্লোল শুনছি!

—পকেটে হাজারটা টাকার নোট আছে; দেখো, জলে যেন ভিজে না যায়!

—অকস্মাৎ এটা কি ধরণের কাব্য-কথা হোল দূর্ব্বা? একেবারে টাকার কথা!

—টাকা আমার দরকার, কারণ আমি কাব্য লিখি না, বই কিনে পড়ি—চলো।

দূর্ব্বা এগিয়েই হাঁটতে লাগলো। চিণ্ময় অকূল সমুদ্রে ভাসছে। দূর্ব্বা কেন এল ওর জীবনে? কী অভিপ্রায় বিধাতার? এই আশ্চর্য্য

রহস্যময়ী অথচ অনলংকৃতা তরুণীর প্রত্যেকটি চরণক্ষেপ চিণ্ময়ের চোখে বিস্ময় জাগাচ্ছে! কী ও করবে চিণ্ময়কে নিয়ে? ওর দূর্ব্বার ভাবস্রোতে ভেসে যাওয়া ছাড়া চিণ্ময়ের আর গত্যন্তর নেই—ভাবতে ভাবতে চিণ্ময় চলছে পিছনে। পথের ধারে ঘেঁটু ফুল ফুটেছে—দূর্ব্বা একটা ছিঁড়ে খোপায় নিয়ে বলল,

—জানো চিণুদা, আমাদের দেশের বিধবাদের সাজগোজ করতে নেই···

—জানি—ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি—শুষ্ক উত্তর দিল চিণ্ময়।

—কিন্তু আমি কুমারী অতসী হব, প্রেমে পড়বো, তারপর শাঁখা-শাড়ী-সিন্দুর পরে বিয়ে করবো···এ সব তো করতে হবে আমায় ওখানে!

—ভালোই তো, সখ মিটে যাবে,—চিণ্ময় কাটা জবাব দিল।

—ঠিক বলেছ, চিণ্ময়দা, সখ মিটে যাবে—কিন্তু বিয়ে যার সঙ্গে হবে, তাকে তো, আমার পছন্দ নয়—বাইরের সখটা মিটবে—তবে ওটাও দরকার—

—তাকে পছন্দ করে ভেতরের সখটাও মিটিয়ে নিতে পার—চিণ্ময় যেন খানিকটা বিরক্ত হয়েই বলল কথাগুলো। শুনে হেসে উঠলো দূর্ব্বা।

—তুমি চটেছো চিণুদা—তোমাকে দিয়ে দূর্ব্বাসার ক্রোধ-সাধনা চলতে পারে।

—তার মানে।

—মানেটা আজ জেনে কাজ নেই, অন্যদিন বলবো—এসো তাড়াতাড়ি;

ওর হাত ধরে টেনে চলতে লাগলো দূর্ব্বা। লীলাময়ীর মত মনে হচ্ছে—কিন্তু চিণ্ময় কি যেন বলতে গেল, দূর্ব্বা বলল ত্বরিত কণ্ঠে,

—চুপ! পিছনে ওদের গাড়ীটা আসছে, দেখছো না—চল, তার আগেই আমরা ট্রামে উঠি গিয়ে—চলে এস!

কিন্তু ট্রাম ডিপোয় পৌছবার পূর্ব্বেই মোটরখানা এসে পড়লো কাছে। একেবারে ওদের পাশে এসে দাঁড়ালো—গাড়ীর ভেতর থেকে কাটুবাবু বলল,

—ও মশাই, কি যেন নামটা—আপনার ?

—চিণ্ময়,···জবাব দিয়ে তাকালো চিণ্ময় কাটুবাবুর পানে।

—অবিলম্বে স্ক্রিপ্ট তৈরী করতে হবে আমাদের আপনি কখন বসতে পারবেন ?

—যখন বলবেন।

—বেশ, তাহলে আজই সন্ধ্যে বেলা···কোথায় বসবেন, আপনার বাড়ীতে ?

চিণ্ময় খুব বিপদে পড়ে গেল। বাড়ী তার নেই—তাছাড়া সন্ধ্যাবেলা ছাত্রটিকে পড়াতে হবে। কিন্তু দূর্ব্বা ওকে বাঁচিয়ে দিল। বলল,

—আগে আপনি মূল পাণ্ডুলিপিটা ওকে পড়তে দিন একদিন, ও সেটা ভাবুক একটু—তারপর দুজনে বসে স্ক্রিপ্ট লিখবেন। অত তাড়াহুড়ো করলে জিনিষ ভাল হয় না—একেই তো গল্পটা নিতান্ত বাজে আপনার।

—ঠিক কথা—ওকে গল্পটা পড়ে দেখতে দাও—বরুণ বললো চালকের আসন থেকে। গল্পটা বাজে বলায় কাটুবাবু যথেষ্ট দুঃখিত হয়েছে, বিশেষতঃ দূর্ব্বার মত 'কুমারী' মেয়ের মুখ থেকে ওরকম কথা শুনতে কারই বা ভাল লাগে ! সে ডিরেকটার, জবাব একটা দেবেই।

—গল্প সম্বন্ধে কতটুকু বোঝেন আপনি যে বাজে বলছেন ? আপনার বন্ধুর গল্প না নেওয়ার জন্য আপনি এতখানা চটবেন, জানতাম না !

দূর্ব্বা বিস্মিত হোল, বিরক্তও হল।

উত্তর সে দিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সারবান। অতিশয় দৃঢ়কণ্ঠে দূর্ব্বা বলল—বাজে জিনিষকে বাজেই বলি আমি ; আপনার সম্মান

রাখবার জন্য মিথ্যে বলতে পারলাম না, দুঃখিত!—একটু থেমে আবার বলল,

—আমার বন্ধুর গল্পকে সিনেমায় রূপ দেবার যোগ্যতা আপনার আছে বলে আমি বিশ্বাস করিনে—আত্মম্ভরিতাটা একটু খাটো করবেন।

—গল্পটা শুনেছেন আপনি আমার?

—সবটা শুনবার কোনো প্রয়োজন নেই—আমার ভূমিকাটুকুতেই ওর যথেষ্ট পরিচয় আছে। সেই আদিম ন্যাকামী আর নির্লজ্জতা···থাক্, আর কিছু বলছেন?

—গল্পটা খুব উচ্চশ্রেণীর নয়—এটা আমরা জানি দুর্ব্বা দেবি।

বলে বরুণ যেন এই অপ্রিয় ব্যাপারটা সামলাবার চেষ্টা করছে।

—ওঁর ধারণা, উনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একটা গল্প লিখেছেন—গল্প না বলে ওটাকে মহাকাব্য বললে উনি খুসী হন—কিন্তু কি করবো, মিথ্যে বলা আমার অভ্যাস নেই। চল চিনুদা—দুর্ব্বা এগুলো!

—বেশ; ও গল্পটা নাহয় নেব না—আপনার বন্ধুর গল্পটাই নেওয়া যাবে, তবে, ওটা আমাদের আরেকবার শোনা আবশ্যক—বলে কাটুবাবুও ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাইলে

—ও গল্প নেবেন কি না, আপনারা বুঝবেন; আমার বন্ধুর গল্প আমি আপনাদের দেবনা—। কুলবধূকে গণিকালয়ে পাঠানো যায় না। চলো চিনুদা···

—আপনার সঙ্গে গল্পটার দোষ ত্রুটিগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করতাম আমরা; আপনার বাড়ী গিয়েও সেটা হতে পারে···সময় হবে আপনার?

—অকস্মাৎ জ্বলে উঠে একেবারে নিবে গেলেন যে কাটুবাবু? দেশালাইয়ের কঠির মাথার বারুদের থেকেও দেখছি নৈতিক বল কম

আপনার। হঠাৎ আমার খোসামুদী কারবার মতন কি পেলেন? গল্পের আমি কি বুঝি? বিশেষ আপনাদের সিনেমার গল্প? আমি অভিনয় করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ, সেইটাই নিষ্ঠার সঙ্গে করতে চাই—আলোচনা কেন করতে যাব আপনার গল্প নিয়ে? ওর দোষ বা গুণ যাই থাক—আপনাদের দ্রষ্টব্য সেটা। আমার বন্ধু যদি তাকে সংশোধন করবার অধিকার গ্রহণ করে, তো তার কাজটা তাকে দিয়ে আমি নিষ্ঠার সঙ্গে করিয়ে দেব।

—আমার একটা অনুরোধ দূর্ব্বা দেবি—বরুণ বলল—যে গল্প নিয়ে আমরা প্রথম নামবো সেটা ভাল গল্প হোক—এ আমরা সবাই চাইছি। যদি ওটা সত্যি বাজে গল্প হয় তো ওকে বাদ দেব—অপনার বন্ধুর গল্পটা শোনাতে আপত্তি আছে কি?

—মাপ করবেন—আমার বন্ধুর গল্প তো এখানে আমি দেবই না, যে কাজটা ও নিচ্ছিল, মানে, গল্পের দুর্ব্বল অংশগুলো ঠিক করে দেওয়া, সেটাও ওকে আর করতে দিতে চাইনে আমি।

—সেকি? কেন?

—কারণ, দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের অহমিকা তাল গাছের মত। পৃথিবীর কিছু কাজ হয়তো ওতে হয়—কিন্তু সে যখন শালগাছের সঙ্গে পাল্লা দিতে আকাশের পানে মাথা তোলে, তখন ব্যাপারটা হয় হাস্যকর। সিনেমা-জগতে আপনারা মহাদ্রুম, কিন্তু জানবেন, এখানে বটবৃক্ষ নেই, সব এরণ্ড—শালগাছ নেই, সব তালগাছ, মূর্ত্তি নেই, শুধু মন্দির, তাও ভাঙা!

চলে যাচ্ছে দূর্ব্বা চিণ্ময়ের পাঞ্জাবীর খুঁটখানা ধরে; টান দিল। ছিঁড়ে গেল খানিকটা হাতায়—'আহা'! শব্দ করে উঠলো চিণ্ময়!

—যাকগে! ওতে আর নেই কিছু!—বলে হাতটা ধরলো দূর্ব্বা ওর।

—আসুন, পৌঁছে দিই,—বলে বরুণ এগিয়ে এল, বলল—সেদিনকার ব্যাপারটার জন্য সত্যি আমি লজ্জিত—উঠুন গাড়ীতে!

—অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আমরা ট্রামে দিব্যি যাব বেড়াতে-বেড়াতে!

—না, আজ তো আর আপনি পর নন আমাদের, আপনার অভিনয়ের ওপর ছবির সাফল্য নির্ভর করছে—কি বলো কাটু?

—নিশ্চয়! আমিও মাফ চাইছি দুর্ব্বা দেবি—আপনার সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না আমাদের—আপনি যে এমন রসগ্রাহী মেয়ে, কি করে জানবো!—চলুন, কথা কইতে কইতে গাড়ীতেই চলুন।

দুর্ব্বা একটু মুস্কিলে পড়লো। এতখানা রুক্ষ কথা বলার পরও এরা মাফ চাইছে এবং অনুনয় করছে। কাজ যখন নিতে হয়েছে তখন, কিছুটা সয়েও নিতে হবে—জীবনটা এই রকম অনেক 'কম্প্রোমাইজ' দ্বারাই পূর্ণ—তবু একটু ভেবে বলল,—অনর্থক আমাদের জন্য অতখানা পেট্রল পোড়াবেন?

—এ তো পোড়াতেই হবে—এগুলো আমাদের এষ্টিমেটেই থাকে।

—আচ্ছা,চলুন— দুর্ব্বা আগে চিন্ময়কে উঠিয়ে দিয়ে নিজেও উঠলো ভেতরের সীটে। কাটুবাবুও ভেতরের সীটে বসলো এসে। বরুণ গাড়ী চালাচ্ছে। এতোক্ষণে কাটুবাবু একটুখানি স্থির হয়ে বলল,—গল্পটা উৎকৃষ্ট বলে আমি কোনদিন দাবী করিনি—তবে বাজারে ঐ রকম গল্পই চলছে।

—চলছে না—পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। মানুষ আর অত বোকা নেই যে আপনি যা-খুসী দিয়ে তাদের ঠকাতে পারবেন।

—নিশ্চয়! তাহলে গল্পের কি করা যায় বলুন তো? আপনার বন্ধুর গল্পটা সত্যি উচ্চ শ্রেণীর, কিন্তু সিনেমায় ওকে রূপ দেওয়া কঠিন।—

—আপনাদের নির্ব্বাচন বিষয়ে আমার কিছু বলবার নেই—বলে দুর্ব্বা চুপ করল। গাড়ী চলছে।

উত্তর কলিকাতার দিকে চলে গেল গাড়ীখানা দূর্ব্বা আর চিন্ময়কে মালিকতলায় নামিয়ে দিয়ে। কি জানি কি ভেবে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গাড়ী আনলো না বরুণ—দূর্ব্বাও বলল, অনর্থক গলিতে গাড়ী ঢুকিয়ে লাভ নেই—ওরা হেঁটে বাড়ী ঢুকলো এসে···।

ওঘরে, ঠাকুরদার সঙ্গে কে একজন কথা বলছে; নিশ্চয় গোবিন্দ; দূর্ব্বা সটান ওখানেই ঢুকলো গিয়ে; গোবিন্দকে উদ্দেশ করে বলল,

—ভাড়ার রসিদ কি এনেছেন আপনি?

—না; কেন?

—ভাড়াটা দিতাম আমি—চার-পাঁচ মাসের বাকী পড়ে আছে!

—ও, তা এতো তাড়া কেন? দাদুর সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ রয়েছে; ভাড়ার ব্যাপার পরে আলোচনা করা যাবে।

দাদু এই সময় ধীরে ধীরে উঠে শৌচাগারে বা অন্যত্র কোথায় গেলেন। দূর্ব্বা চেয়ে দেখলো, পরে বলল,

—পরামর্শ কিছু নেই—আপনার কথা আমি শুনেছি—আপনার বাড়ীতে গৃহিণী হয়ে যেতে পারলে আমি খুশীই হতাম—কিন্তু পারলাম না—আমি এখন সিনেমা আর্টিষ্ট—নাম লিখিয়ে এলাম; এখন কি আমায় আপনি সহ্য করতে পারবেন! নিশ্চয় না। তার থেকে শান্ত-সুবোধ কোনো মেয়েকে বিয়ে করুন গিয়ে—ঘর সংসার ভালই চলবে।

গোবিন্দ ওর মুখ পানে চেয়ে রয়েছে; দূর্ব্বা একটু হেসে আবার বলল,—দেখছেন কি? লক্ষপতিরা আমায় মোটরে করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যায়, সেকি গোবিন্দবাবুর বাড়ীর গৃহিণী হবার জন্য? ও-সব বায়নাক্কা ছাড়ুন—রসিদ নিয়ে আসুন গিয়ে—বাড়ী তো কাছেই; যান।

যেন হুকুম! গোবিন্দ কি বলবে, ঠিক করতে পারছে না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। চিন্ময় সেই যে ষ্টুডিও থেকে বের হয়েছে

এখন অবধি একটাও কথা বলেনি। নিতান্ত নির্ব্বোধের মতই দূর্ব্বাকে দেখছে, আর তার কথা শুনছে এতক্ষণ। সেই বলল আস্তে,—আপনার সঙ্গে পরিচয় নেই গোবিন্দবাবু, কিছু মনে করবেন না। মানুষের দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে কাউকে এভাবে অপমান করা অনুচিত!

—অপমান করা!—গোবিন্দর কথা ফুটলো—আমি ওকে বিয়ে করে ঘরের লক্ষ্মী করতে চাইছি—আর আপনি বলেন অপমান করা! জানেন, বহুদিন আগে ওদের আমি রাস্তায় বের করে দিতে পারতাম! তখন কোথায় ছিলেন আপনি আর কোথায় ছিল সিনেমাওয়ালা?

—ধন্যবাদ যে বার করেননি, কিন্তু উদ্দেশ্যটা আপনার মহৎ নয়—অত্যন্ত কদর্য্য!

—কদর্য্য! বিয়ে করতে চাইলে কদর্য্য হয় নাকি?

—আপনার কোন্ যোগ্যতাটা আছে ওকে বিয়ে করবার?

—তোমারই বা কি আছে, শুনি? ছেঁড়া পাঞ্জাবী বদলাবার সামর্থ্য নেই। তোমার মতন তিন গণ্ডা বি, এ, আমার চাকর—জানো! কুড়ি টাকায় অমন বি, এ, মেলে আজকাল। আর স্বাস্থ্য? এস দেখি পাঞ্জায়!

বন্য বা বর্ব্বর জগতে নারী নিয়ে এরকম ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়, ঠিক এই রকম শারীরিক শক্তির প্রাধান্য প্রকাশ, কিন্তু সভ্য মানুষের জগতে এ ব্যাপার নিতান্তই অমানুষিক। দূর্ব্বা বিরক্ত হয়ে বলল,

—থামো চিন্ময়দা—পাথরে ঘাস গজায় না।—বলে সে গোবিন্দর পানে তাকালো—বলল,—আপনি আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধু, জানি; আমার রূপলাবণ্যের লোভে দীর্ঘকাল এ বাড়ীতে আমাদের থাকতে দিয়েছেন, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ—কিন্তু—একটু থামলো দূর্ব্বা···কিন্তু বিয়ে আমায় করবার বাসনা আপনার অকস্মাৎ গজালো কেন, বলতে পারেন?

—অকস্মাৎ মানে? বাসনা আমার অনেক দিনের—কথাটা বলতেই যা দেরী হোল—বলবার সুযোগ খুঁজছিলাম···

—বেশ, পাঁচমাসের ভাড়া বাকী ফেলে সেই সুযোগটা যদি করে থাকেন তো ভুল হয়েছে। টাকা আমি এক্ষুণি দিয়ে দিচ্ছি—তারপর কথা হবে—ঋণী থেকে কোনো কথা আর কইতে চাই না।

—ঋণী কেন মনে করছো? এ বাড়ী তোমারই। এই বাড়ী এবং আরও দুখানা বাড়ী আর নগদটাকাও কিছু আমি দেব তোমায় বিয়ের সময়—

—কিন্তু আরেকটা সর্ত্ত আছে। আমি সিনেমায় অভিনয় করবো; যখন ইচ্ছে যেখানে খুশী যাব—যার তার সঙ্গে বেড়াব—যে কদিন আপনার বাড়ীতে থাকবো, সেই কদিন হব আপনার গৃহিণী; পারবেন সহ্য করতে?

—বিয়ের পর আবার ওসব কেউ করে নাকি? ওতে কেউ কি রাজী হয়?

—যিনি রাজী হবেন, তাকেই তাহলে বিয়ে করতে হবে।

পুরো আধমিনিট দূর্ব্বার মুখের পানে চেয়ে রইল গোবিন্দ। তারপর বলল—সিনেমায় যায় লোকে টাকা রোজগার করতে; তুমি কি জন্য যাবে? তোমার তো টাকার অভাব থাকবে না?

—যাব সখের জন্য, সুখের জন্য, সৌখীনতার জন্য—টাকা ছাড়াও মানুষের আরো অনেক কিছুই দরকার—যেমন আমি টাকা নই, টাকা নেইও আমার, তবু আপনি আমার জন্য কী না করছেন?

—আমি ভদ্রসমাজে বাস করি দূর্ব্বা—তোমার সর্ত্ত মেনে নেওয়া চলে না।

—বেশ,—আপনি রসিদ নিয়ে এসে টাকা নিন, তারপর যে-সমাজে ইচ্ছে বাস করুন গে। আপনার কাছে ঋণী আমি থাকতে চাইনে।

বলেই চলে গেল দূর্ব্বা সে-ঘরের বাইরে। গোবিন্দ কিছুক্ষণ থেমে

রইল। চিণ্ময় ইতিমধ্যে আর কিছু করবার মত না পেয়ে একটা জলচৌকীতে বসে পড়েছে—একখানা পুঁথির পাতা ওল্টাচ্ছে।

—আপনি কি এই সমস্ত সর্ত্তে রাজি হবেন?—গোবিন্দ শুধুলো।

—কিসের সর্ত্ত? চিণ্ময় বিস্ময়ের চোখে তাকালো।

—দূর্ব্বা যা বলল—বিয়ে করার পর ওকে ঐ সব করতে দেবেন আপনি?

—দূর্ব্বাকে আমি বিয়ে করবো, কে বলল আপনাকে? আশ্চর্য্য!

—ও, আপনি তাহলে দূর্ব্বার জন্যে ঘুরছেন না—এমনিই আসছেন? কিন্তু দাদুর কাছে শুনলাম, আপনি সিনেমার লোক নন, ভদ্রঘরের ছেলে, কোথায় চাকরী করেন?

—চাকরী করি না—দূর্ব্বার জন্যই ঘুরছি এখানে, তবে তাকে বিয়ে করবার জন্য নয়—তাকে ভালবাসার জন্য—

—মানে···?

—মানে—চিণ্ময় একটু থেমে বলল, বিয়ে না করেও ভালবাসা যায়, এটা আপনাকে বোঝানো শক্ত—

—সে আবার কি রকম ভালবাসা—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইল গোবিন্দ!

—কামগন্ধহীন—উত্তর দিল চিণ্ময়—যে ভালবাসা ভালবাসার উর্দ্ধে, যেখানে নারী রক্তমাংসে গঠিত জীব নয়, জীবনদায়িনী অমৃত, যেখানে দেহটাকে বন্দী করা লক্ষ্য নয়—লক্ষ্য প্রেমের মুক্তি···যেখানে নারী মূর্ত্তিমতী বাসনা নয়, অমূর্ত্ত্য সত্ত্বামাত্র···

—থামো চিণ্ময়দা—দূর্ব্বা ধমক দিল বাইর থেকে—উলুবনে মুক্তো ছড়াচ্ছো। শুনুন গোবিন্দবাবু—আমাদের ভালবাসা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না; ওটা কাউকে বলা বোঝানো যায় না। আর—আমায় বিয়ে করলে লাভের চাইতে আপনার লোকশান অনেক বেশী হবে, তার থেকে বন্ধুত্ব আছে, এই ভালো—বুঝলেন। আমি নামকরা ফিল্মষ্টার হব—নিত্য নূতন

ভঙ্গীতে আমার ছবি বেরুবে খবরের কাগজে—রূপালী পর্দ্দায় আমায় দেখে লোক শুধু অবাক নয়, অজ্ঞান হয়ে যাবে—আর আপনি সে সব দেখে লোকের কাছে বুক ফুলিয়ে বলবেন, চিত্রতারকা দূর্ব্বার সঙ্গে আপনার কতখানা সম্বন্ধ, কেমন নিবিড়, আর নির্ম্মম আর নৈর্ব্যক্তিক···

গোবিন্দ তো চেয়ে আছেই, চিণ্ময়ও চেয়ে আছে দূর্ব্বার দিকে। কথার শেষটার কিছুই বুঝতে পারেনি গোবিন্দ। হাসছে দূর্ব্বা—সেই হাসি রোগটা ওর সারলো না—হেসেই বলল,—রসিদটা নিয়ে আসুন—চাঁ খাবেন এখানেই, আর আপনি যদি আমার উপর নির্ভর করেন তো আপনার জন্য বৌ আমি যোগাড় করে দেব—

—কোথায় ?

—কাছেই—পারুলের দিদি শীলাকে বিয়ে করতে রাজি আছেন আপনি ?

—শীলা তো বিধবা !

—হ্যাঁ—হিঃ হিঃ করে হেসে দিল দূর্ব্বা—বিধবাই তো চান আপনি !

কথাটার অসামঞ্জস্য এবং অস্থান-প্রকাশ এতক্ষণে মাথায় ঢুকলো গোবিন্দর—বলল—শীলার জন্য কাঁদছিনে আমি···

—এতক্ষণে সত্যি বললেন। বিয়ের যোগ্য কনের জন্য ভাবছেন না আপনি, ভাবছেন দূর্ব্বার দেহখানা অয়ত্ত করবার জন্য—কিন্তু জানেন তো, মন আয়ত্ত না হলে দেহও আয়ত্ত হয় না—

—তোমার মনকেও আমি আয়ত্ত করতে পারবো—

—পারবেন না—গয়না কাপড় দিয়ে, শারীরিক সামর্থ্য দিয়ে যে-মন জয় করা যায়, সে-মন আমার নেই—আমার মনটা কি জানেন ?

-কি রকম ?—গোবিন্দর কথাটায় যেন বিদ্রূপ ধ্বনিত হচ্ছে—মুনি ঋষির মতন ?

—না—হাসলো দূর্ব্বা আবার মৃদু—মুনিঋষির মনও জয় করা যায়, তার পন্থা আছে—ঋষিরা যেখানে থাকেন, আমার মনটা হচ্ছে সেই দুর্গম গহন অরণ্য—রোদন সেখানে একান্ত নিষ্ফল,—ধন দৌলত কোন কাজে লাগে না—শারীরিক শক্তি অকেজো—সেখানে মৃগয়া করতে যে অস্ত্র দরকার তা আপনার নেই···

—কি সেটা? পাশুপৎ?—আবার বিদ্রূপ করলো গোবিন্দ—

—না—পাশুপতের অধিকারী পশুপতির মন চাই—যে বিষ খায় আর লোককে অমৃত দেয়—যার কিছু নেই আছে শুধু বৈরাগ্য—কিন্তু থাক—

আপনাকে এসব বলে লাভ নেই—আমি এখন ফিল্মষ্টার, আকাশের অনেক উপরে বাস করি—আর আপনি মাটির কাদায়। অনর্থক হাত বাড়িয়ে হাস্যস্পদ হবেন না—যান, রসিদ আছে তো?

—রসিদটার জন্য এত ভাবনা কেন দূর্ব্বা—টাকা দিতে হয়, পরে দিও। আমি তো তোমার নামে নালিশ করতে যাচ্ছি না···

—টাকাটা হাতে রয়েছে, দিয়ে ফেললেই কাজ চুকে যায়—বুঝলেন। আবার হয়তো অন্য কাজে খরচ হয়ে যেতে পারে—তা ছাড়া, আপনি টাকা পেলেই বিশ্বাস করবেন যে আমি ফিল্মষ্টার হয়েছি!

—বিশ্বাস করছি আমি—কিন্তু তুমি মনে রেখো, আমি ও-লাইনে তোমায় যেতে দেব না—তোমাকে ফেরাবই—নইলে আমার বাবা···

গোবিন্দ অকস্মাৎ উঠে চলে গেল। চিণ্ময় অবাক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দূর্ব্বা আস্তে হাসলে—বললো আস্তে,

—আরেকটা শত্রু হয়তো বাড়লো চিণুদা—মনে রেখো!

—এ বাড়ী ছেড়ে দাও দূর্ব্বা—চলো, দাদুকে নিয়ে আমরা দমদমে, না হয় হাওড়ার ওদিকে বাসা করিগে···

—না—অত সহজে এ বাড়ী ছাড়তে চাইনে চিণুদা—দাদু যতক্ষণ আছেন তাঁর পুঁথীর কবরে—ততক্ষণ অন্ততঃ ছাড়া বড্ড কঠিন···

—হুঁ, চিণ্ময় অসংখ্য পুস্তকরাশির দিকে চেয়ে শুধু 'হুঁ' বলল এবং দেখলো, দূর্ব্বা ঘরের বাইরে গিয়ে দাদুর হাতে জল ঢেলে দিচ্ছে। মুখ হাত ধুয়ে বৃদ্ধ এসে বসলেন আবার খাটে। বললেন,

—গোবিন্দ বড্ড জেদী লোক দাদু—তোমরা কিন্তু সাবধানে থেকো। বছর কয়েক পূর্ব্বে ও ছিল রীতিমত গুণ্ডা···

—হুঁ—চিণ্ময় আবার হুঁ দিল একটা! হাজার টাকার নোটগুলো ট্যাঁকে গুড়গুড়ি দিচ্ছে—সেগুলো বের করে গুণে দাদুর মাথার বালিশের নীচে যেমন রাখতে যাবে, দাদু যেন চীৎকার করে উঠলেন—

উহুঁ—না দাদু—না, টাকা পয়সা এখানে নয়—ও তোমরা রাখ গিয়ে—জয়গুরু, জয়গুরু! নমস্কার করলেন হাত তুলে। চিণ্ময় যেন অপরাধী ভাবছে নিজেকে, কিন্তু কেন? টাকা না হলে মানুষের জীবন একান্ত অচল, এ'তো শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও এই বৃদ্ধ আজো সে কথা বোঝেন নি? 'অর্থম্ অনর্থম' যিনি বলেছেন—তিনি একে অনর্থ-ই বলেছেন—'অপ্রয়োজনীয়' বলেননি তো! চিণ্ময় একটু সরে এসে বলল,

—টাকা না হলে জীবন একান্ত অচল দাদু!

—হ্যাঁ—মানুষের জীবন—মানুষ যেদিন থেকে বিনিময় বিদ্যা শিখেছে—সেইদিন থেকেই টাকার জালে সে বন্দী—জীবজন্তুরা ও-বন্ধন অস্বীকার করতে পারে।

—তাদের মধ্যেও খাদ্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে দাদু···চিণ্ময় তর্ক করতে চাইল।

—হ্যাঁ, শুধু খাদ্য নিয়ে—সেটা জৈব প্রেরণা যে দাদু—তারা তো জীবের উর্দ্ধে নয়। কিন্তু মানুষ জীব এবং জীবাত্মা। আত্মা তাদের

মধ্যেও রয়েছে কিন্তু আত্মজ্ঞান তাদের নেই—মানুষ সেই পরম জ্ঞানের ধনী—অন্য ধন তার কাছে অকিঞ্চিৎকর হওয়া উচিৎ···

চিন্ময় অন্য আর কিছু না বলে টাকা নিয়ে চলে এল।

অনেকক্ষণ পরামর্শ হোল কাটুর সঙ্গে বরুণের ; বরুণেরই বাড়ীতে বসে চলছিল এই যুক্তি—সময় বিকাল বেলা। মায়া নামক যে মেয়েটি সেদিন গিয়েছিল চাকরী খুঁজতে, তাকেই গতকাল ওরা কাজ দেবে বলে কনট্রাক্ট করে এসেছে—কিছু আগামী টাকাও দিয়ে এসেছে ; রঞ্জাবতী নাটকে দুটি হিরোয়িন আছে, এক রাজকুমারী অতসী—অন্যটি যুবরাজ মৈনাকের বিবাহিতা পত্নী বিদুলা। দূর্ব্বাকে অতসীর ভূমিকায় নামানো ঠিক হয়ে গেছে—মায়াকে বিদুলার ভূমিকা দেওয়া হবে। অন্যান্য চরিত্র অভিনয় করবার জন্য লোকের অভাব হবে না—মানে,—নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী আর ওরা নিতে চায় না—দু' একজন সখী বা বয়স্য যে কোন-লোককে দিয়েই চলতে পারে।

দূর্ব্বা সেদিন বলেছে, 'গল্পটা বাজে' ; কাটু এই কথাটা যেন ভুলতেই পারছিল না। যদিও সে তখনকার মত রাগ সামলে ভদ্র ব্যবহারই করেছিল দূর্ব্বার সঙ্গে, তবু মনের ঝাল তাঁর মেটেনি। সেই বলল,

—ওর বিষ দাঁত ভেঙ্গে ঢোঁরা সাপ না করা পর্য্যন্ত নিদ্রা নেই বরুণ!

—অবশ্য, সেই জন্যই তো এতো কাণ্ড। বরুণও সায় দিল কথাটায় কিন্তু হেসে বলল—তোমার গল্পটা সত্যি খুব উঁচু দরের নয় কাটু—সত্যিই নয়।

—নিশ্চয় উঁচু দরের। সিনেমার গল্প এর থেকে ভাল হতে পারে না বরুণ। জানো—ওর রহস্য রয়েছে—গল্পটা একজন শক্তিশালী নতুন লেখকের—

—মেরে দিলে ?

—হ্যাঁ—নইলে কাটু কোনদিন ইতিহাসের গল্প লিখবে, এ কি সম্ভব ? আমার বাবা কখনো ইতিহাস পড়েনি—হাসতে লাগলো কাটুবাবু !

—সে লোকটার কোনো প্রমাণ নেই তো যে গল্পটা তার ?—বরুণ হেসে শুধুলো !

—আরে রামচন্দ্র ! শোন, একজন লেখক গত শীতকালে আমার নাম সংগ্রহ করে বাড়ীতে দেখা করলো আমার সঙ্গে—বাড়ী মানে, আমার সেই ফ্ল্যাটে।

—তারপর ?

—যখন সে গল্পটা শোনালো, তখনই বুঝলাম, সিনেমায় এই রকম গল্পই দরকার—কিন্তু লোকটার তখন জ্বর।

—কৃপা করে তাকে ঘরেই ঠাঁই দিলে ?

—দিলাম রাতটার মত। কিন্তু সকালেই দেখি, সারা গায়ে বসন্ত বেরিয়েছে। প্রশ্ন করে জানলাম—আত্মীয়ের মধ্যে তার আছে এক মাসী—হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম—সেখান থেকেই স্বর্গে গেল—

—স্বর্গেই গেছে তো, নাকি তোমার বাড়ীতেই রয়েছে ভূত হয়ে ? প্রশ্নটার সঙ্গে—হাসলো বরুণ !

—স্বর্গে যাবার খবরটা আমায় হাসপাতাল থেকেই দিয়েছিল—তখন আমি 'সতীশ্রী' স্ক্রিপথানা এডিট করছিলাম।—যাক—এ গল্প সিনেমার সম্পূর্ণ উপযোগী—শুধু দু একটা জায়গায় কিছু দুর্ব্বল আছে।

—মানে, অসামঞ্জস্য আছে বলছো তো ? আমার মনে হয়, প্লটখানা ভাল, তবে বিষয়টা ফোটে নি—বেশতো, ঐ চিত্রয়কে দিয়ে লিখিয়ে নাও—ওর লেখার হাত আছে—সেদিন যা শুনলাম—ভালই লেখে মনে হোল !

—হ্যাঁ—ওকে দিয়েই সব ঠিক করিয়ে নিচ্ছি—আচ্ছা, ঐ লেখকটার সঙ্গে দুর্ব্বার কি সম্পর্ক, ঠিক বোঝা গেল না তো ?

—ভালবাসার সম্পর্ক—বরুণ জবাব দিল।

—বিয়ে নিশ্চয় হয়নি—সীঁথিতে সিঁদুর নেই ; হবে হয়তো ঐ ছোকরার সঙ্গে !

—তার অনেক দেরী আছে—বলে বরুণ গম্ভীর হাসলো—চল না, তোমার নাটকখানা নিয়ে আলোচনা করে আসা যাক ওর সঙ্গে !

—বেশ তো। বলে তৎক্ষণাৎ সায় দিল কাটুবাবু।

অতঃপর বরুণ পোষাক বদলবার জন্য উপরে উঠে গেল। সুবর্ণা তেতালার বারান্দায় বসে আছে—হাতে একটা কালো রংএর বড় খাম। বৈকালিক প্রসাধন শেষ হয়েছে তার—হয়তো বেরুবে কোথাও। বরুণকে দেখে শুধুলো—কোথায় যোগাড় করলে আবার এটাকে ? খামের ভেতরের ছবি তিনখানা বের করে দেখালো সে। বরুণ বুঝতে পারলো, তার ব্রীফ কেসের ভেতর থেকে দুর্ব্বার ফটোগুলো বের করে ও দেখেছে। বলল,

—আমাদের বইএর নায়িকা হবে···অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে বলল সে, কিন্তু এই ইচ্ছাকৃত অন্যমনস্কতা সুবর্ণার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়ালো না—বলল,

—কোন বাজারে বাড়ী ?

—বাজারে নয়—ভদ্রলোকের মেয়ে !

— বলো কি ? বিয়ে হয়েছে বলে মনে হয় না তো ?

—হয়নি—বরুণ সাহেবী পোষাক পরতে আরম্ভ করলো !

—হয়নি তো সিনেমায় আসে কোন্ সাহসে ? ভদ্রলোকের মেয়ে বলছো !

—কেন ?

—ছেলেপিলে হয়ে গেলে পিতৃত্বটা কার ঘাড়ে চাপাবে ?

—তুমি বড্ড—অভদ্র হয়ে উঠেছো সুবর্ণা—বরুণের সুরটা একটু কড়া !

—থামোখা আমার খুকীর একটা অংশীদার জুটবে, এটা আমি চাইনে, বুঝলে ! তোমার আর যা-ইচ্ছে করতে পার, ঐটা বাদ···

—খুকীর অংশীদার ! বরুণ যেন গর্জন ছাড়লো একটা—কিন্তু তৎক্ষণাৎ সুরটা একেবারে খাদে নেমে গেল ওর—গ্যালিশ আঁটতে আঁটতে বলল,

—তবু ভাল যে খুকীর সম্বন্ধে তোমার একটা চিন্তা আছে—কিন্তু থাক, তার বিষয় তোমার আর ভেবে কাজ নেই—ক্লাবে যাবে না ?

—যাব বই কি—তুমি যদি সিনেমা-আর্টিষ্টের বাড়ী যেতে পার, তাহলে আমিও নিশ্চয় ক্লাবে যেতে পারি—সুবর্ণা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।

—আমি তো মানা করছি নে—কারও স্বাধীনতায় হাত দিইনে আমি !

—ধন্যবাদ ! হাত আমারও দেবার ইচ্ছে নেই—তবে মেয়েটা যখন জন্মেছে···

—মেয়ে সম্বন্ধে কোনো কথা তুমি বলো না সুবর্ণা, ও তোমার কেউ নয় !

—মাইরি ! সুবর্ণার বিদ্রূপটা যেন অত্যন্ত অভদ্র এবং অশ্লীল শোনাল, তাছাড়া পুরুষালী ! বরুণ অতি মাত্রায় বিরক্ত হয়ে বলল,

—সুবর্ণা, তোমার পথে তুমি চলছো, আমার পথে আমি—মাঝে অকারণ ঝড় তুফান আনবার কোনো প্রয়োজন দেখিনে। কোথায় যাচ্ছ, যাও—যখন ইচ্ছে যাবে—যখন খুসী ফিরবে, আমি তোমায় কোনো প্রশ্ন পর্য্যন্ত করিনে—আশা করি, আমার সম্বন্ধেও তুমি অনুরূপ ব্যবহার করবে—বরুণ পোষাক পরতে পরতেই বেরিয়ে গেল।

সুবর্ণা চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ—জানালাপথে চেয়ে দেখলো,

বাগানে ঠেলা গাড়ীতে খুকী—বরুণ বেরুবার পথে তাকে কোলে নিয়ে খানিক আদর করলো—তারপর আবার গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে নিজের গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে গেল। সুবর্ণাও বেরুবে এবার।

কালো খামটার ভেতর ছবি তিনখানা রাখতে গিয়ে আর একবার দেখল। ছবিতে মানুষকে যতখানা সুন্দর দেখায়, সত্যি কি আর সে তত-খানি সুন্দর? না তো। ওরা মেকআপ করে, রঙ মেখে ছবি তোলায়, নইলে গায়ের চামড়া আর সত্যি এতো মসৃণ হতে হয় না। ঠোঁটের গড়নটা—ইস্—এ রকম ধনুকের মতন ঠোঁট কম দেখা যায়—'সেক্স এ্যাপিলং!' না, কি রকম যেন দেবী-দেবী ভাব—দূরছাই! সিনেমার অভিনেত্রী, তার আবার দেবী-ভাব।

সুবর্ণা বারান্দা থেকে ঘরে এল ছবি কখানা নিয়ে। ছোট টেবিলটায় বরুণের, সুবর্ণার এবং খুকুর ছবি সাজানো রয়েছে। খুকীর ছবি বিশ-পঁচিশ খানা—বরুণের স্বহস্তে তোলা—কিন্তু সুবর্ণার মাত্র দুটো, একখানা বিয়ের সময়কার, আরেকখানা সে নিজেই তুলিয়েছিল—'একলা ছবি।' কিন্তু ঐটাই ভাল ছবি; সুবর্ণা ফ্রেমে বাঁধানো সেই ছবিটার পাশে দুর্ব্বার আ-বাঁধা ছবিটা রেখে তুলনা করতে চাইল—"দামী ফুলদানীতে সাজানো মরসুমী ফুলের পাশে যেন সদ্য ফোটা শ্বেত পদ্ম—" কিন্তু এ রকম তুলনা তার মনের অবচেতন স্তরে থাকলেও সে সাধারণভাবে ভাবলো—ফ্রেমে বাঁধানো ছবিখানা সম্রাজ্ঞীর আর ও-ছবিটা যেন হতদরিদ্র ব্যক্তির কন্যার, যার পানে সম্রাটের নজর পড়েছে—কিম্বা, ও কোনো মন্দিরের দেবদাসী, সম্রাট দেবদর্শনে গিয়ে ওকে দেখে এসেছে: কিন্তু এ সব তুলনা করে লাভ কি? মেয়েটা সুন্দরী, অস্বীকার করবার উপায় নাই সুবর্ণার—কিন্তু ছবি দেখে স্থির সিদ্ধান্ত করা উচিৎ নয়; সুবর্ণা ওকে চোখে দেখবে।

যে-কোনদিন ষ্টুডিওতে গেলেই দেখতে পাবে সুবর্ণা। কিন্তু কি

দরকার? ব্যাটাছেলের মোহ, ও বেশিদিন টেঁকে না। এই তিনবছরে আরো কতকি দেখলো সুবর্ণা—। যতদিন মোহ আছে, রূপ, যৌবন, অর্থ আছে, মিটিয়ে নিক বরুণ তার খেয়াল; সুবর্ণা কেন মিছে মাথা ঘামাতে যায়! শাড়ীখানা বদল করে সুবর্ণা নিজে গাড়ী চালিয়ে ক্লাব-এ চলে গেল চৌরঙ্গীতে!

সুবর্ণা এখানে সম্মানিতা সভ্যা;—ধনীর কন্যা এবং ধনীর গৃহিণী ও; আর ধন বস্তুটাকে সম্মান না করে, এমন লোক বিরল এই পৃথিবীতে আজ। গাড়ী থেকে নেমে সুবর্ণা ক্লাবরুমে এসে ঢুকলো, অমনি ডজন খানেক মেয়ে ওকে সম্বর্দ্ধনা জানালো—আয়, এসো, আসুন—বাংলায়। ইংরাজির বদলে ওরা ইচ্ছে করে এখন বাংলায় কথা বলা চালাচ্ছে; কারণ, কিছু একটা নূতন না করলে ওদের মনে উত্তেজনা আসে না। ছয়মাস পূর্ব্বেও ওদের মধ্যে কেউ বাংলা কথা বললে, তাকে ওরা অপাংক্তেয় মনে করতো—দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সুবর্ণারই প্রস্তাবক্রমে এই ভাষাগত পরিবর্ত্তন। ভাবগত পরিবর্ত্তনও হয়েছে—যথা, ইংরাজি 'টেমপেষ্ট' অভিনয় না করে ওঁরা বাংলা 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনয় করলো। এবার হবে অন্য একখানা বাংলা নাটক নাম 'সতীশ্রী।' ওদের উইমেন্স ক্লাবে এ বছর নাকি দুর্গাপূজা করা হবে—আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই; এই রকম উত্তেজনার সৃষ্টি না করে ওরা বাঁচতে পারে না। সিনেমায় ঐ সতীশ্রী বইখানা তোলা হয়েছিল, কিন্তু ভাল হয়নি।

সুবর্ণা সেই ছবিখানা দেখে এসে দিনকয়েক আগে মত প্রকাশ করলো,

—পৃথিবীর সেরা অসতীদের দিয়ে কি সতীশ্রীর অভিনয় কখনো হতে পারে? আমরা সব সতীকন্যারা এখানে অভিনয় করবো সতীশ্রী।

প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ পাশ হয়ে গেল, কারণ সুবর্ণাই এখানে ওসব ব্যাপারের পরিচালয়িত্রী। অতঃপর সুবর্ণা সেইদিনই দ্বিতীয় প্রস্তাব করেছিল—ইংরাজি 'ক্লাব নাম' বদলে বাংলা কিছু নাম দিতে হবে। কিন্তু অনেক

চিন্তা করেও মনোমত বাংলা নাম এখনো বের হয় নি, তাই নামটা আজও ইংরাজি রয়েছে। অবশ্য নামের জন্য এরা ভাবছেন সবাই।

আজ সুবর্ণা আসবার সঙ্গে সঙ্গে তার অভ্যর্থনাটা বেশি জোরাল হোল। কারণটা কি জানবার জন্য সুবর্ণা চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল একটি নবাগতা তরুণীকে। ক্লাবের সেক্রেটারী পরিচয় করিয়ে দিলেন—

মিসেস মায়া সেন বি, এ, আমাদের সতীশ্রী নাটকে উনিই নর্ত্তকী দিগঙ্গনার ভূমিকায় নামছেন—

নমস্কার আদান প্রদান হোল উভয়ের। সুবর্ণা বেশ খুসী হোল মেয়েটিকে দেখে—সুন্দরী নিশ্চয়ই, ফিগারটাও চমৎকার, কিন্তু মুখের গঠন তত সুন্দর নয় অর্থাৎ সুবর্ণার থেকে সুন্দর নয়—অতএব নিশ্চিন্ত! কিন্তু মনে পড়ে গেল, আজই একখানা ফটোতে একটা মুখ দেখে এসেছে সুবর্ণা; সে হয়ত সুবর্ণার থেকে সুন্দর। কে সে—কোথায় সে থাকে? এক্ষুণি তাকে একবার দেখতে পেলে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিত সুবর্ণা!

নাচগান আলাপ আলোচনার মধ্যে চা-পান ভোজনও হোল ওদের। রাত গভীর হয়ে আসছে; মায়া বাড়ী যাবে; তাকে পৌছে দেবার জন্য গাড়ী চাই। মায়ার পাড়ায় এদের কারো বাড়ী নয়, মুস্কিল---শেষটায় মায়া ট্যাক্সি করেই চলে যাবে—বলল।

সুবর্ণা ট্যাক্সিষ্টাণ্ড পর্য্যন্ত তার সঙ্গে আসতে আসতে শুধুলো—

—আর কি করেন আপনি?

—আরেকটা কাজ পেয়েছি—রঞ্জাবতী চিত্রালয়এ একটা ছবিতে নায়িকার পাঠ।

—রঞ্জাবতীর নায়িকা! সুবর্ণা বিস্মিত হোল যেন!

—হ্যাঁ—কেন? মায়া চাইল ওর পানে।

—না, কিছু না, কি বই তুলবে ওরা?

—রঞ্জাবতী'! ওতে নাকি দুজন নায়িকা আছে, আরেকজন কাকে ওরা ঠিক করেছেন—

—ও—আচ্ছা আসুন! নমস্কার জানালে সুবর্ণা ওকে এবং ভেতরে চলে এল। ভাবতে লাগলো—তাহলে এই মেয়েটা নায়িকা নয়,—উপ-নায়িকা, ঐ ছবিরটা নায়িকা—ভাল!

কিন্তু কী দরকার এত সব ভেবে? সুবর্ণা বেশ আছে। বরুণের যা ইচ্ছে করুকগে—গোল্লায় যাক না সে, সুবর্ণার কি?

সুবর্ণা কিন্তু হেরে যাচ্ছে রূপযৌবনের এই তীব্র প্রতিযোগিতায়—ক্লাব-ঘরে আর না ঢুকে সুবর্ণা নিজের গাড়ী চড়ে বাড়ী ফিরলো। বরুণ তখনো ফেরেনি। খুকী দোলনায় ঘুমুচ্ছে। দেখলো সুবর্ণা, খুকী রূপকথার রাজকুমারী নয়, সুবর্ণারই খানিকটা অংশ—কিন্তু···বরুণ ফিরলো, গাড়ীর শব্দ পেল সুবর্ণা।· সুবর্ণা শুয়ে পড়ল।

শেষে ঠিক হয়েছে যে 'রঞ্জাবতী' নাটকখানাই পর্দায় তোলা হবে, লেখকের নাম দেওয়া হবে না—সংলাপ রচয়িতা হিসাবে থাকবে চিন্ময়ের নাম—কারণ সংলাপ তাকেই লিখতে হচ্ছে। রোজই কাটু-বাবু আর বরুণ গাড়ী চড়ে আসে দূর্ব্বার বাড়ীতে এবং চিন্ময়কে নিয়ে সংলাপ রচনা চলে। ঘরখানার শ্রী-বদলে গেছে এই কদিনেই—মানে ঝেড়ে ঝুড়ে ওকে পরিষ্কার করা হয়েছে। আর ওদিকে চিন্ময় তার টুইশনিটা ছেড়ে এখানে এসে বাস করবে কিনা—তাই নিয়ে জোর তর্ক চলছে দূর্ব্বার সঙ্গে। টুইশনি এখনো ছাড়েনি সে, পনর দিনের ছুটি নিয়েছে মাত্র।

দূর্ব্বা রাজীছিল না চিন্ময়ের নাম ঐ নাটকে সংলাপ লেখক হিসাবে দিতে কারণ নাটকখানা ওর ভাল লাগেনি। ঐতিহাসিক পটভূমিকায়

লেখা নাটক কিন্তু ওতে বিস্তর অসামঞ্জস্য আছে, অবশ্য সিনেমার যোগ্য উত্তেজক উপাদানও আছে প্রচুর—আর কাটুবাবু ঐ কারণে ও বই নির্ব্বাচন করেছে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বরুণ রাজী করালো দূর্ব্বাকে এই সর্ত্তে যে—দূর্ব্বার পরামর্শ নিয়ে—চিণ্ময় যথেষ্ট পরিবর্ত্তন করতে পারবে গল্পের - পারিশ্রমিক হাজার টাকা।

বাইরের সেই ঘরটায় সবাই বসে ওরা—কাটু, বরুণ, মিহির এবং চিণ্ময়; দূর্ব্বা মাঝে মাঝে এসে বসে—চা খাবারও তৈরী করে দেয় এবং আলোচনাতেও যোগদান করে—কিন্তু সে খুব বেশী সময়ের জন্য নয়—অথচ দূর্ব্বাকে বেশী সময় পাবার জন্যই ওরা দক্ষিণ কলকাতা থেকে অতখানা রাস্তা পেট্রল এবং সময় খরচ করে যায় আর অতটা রাত্রি অবধি থাকে। চার পাঁচ দিন কাজ চললো গল্পটা মোটামুটি কি দাঁড়াবে, ঠিক হয়ে গেল এবার দৃশ্য ভাগ করে সংলাপ রচনা করতে হবে। ওদিকে অভিনেত্রী এবং অভিনেতা নির্ব্বাচন চলছে—ওমেদারের দল সন্ধান করে করে—দূর্ব্বার সেই সাত নম্বরে সম্বুদ্ধ লেনের বাড়ী আবিষ্কার করে এখানেও হানা দিতে আরম্ভ করলো—তাদের কিছু একটা পার্ট দিতে হবে।

ওঃ কি যুগই পড়েছে—কত ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে আসে, আর নাম-ঠিকানা-ফটো পরিচয় পত্র রেখে যায়, তার লেখাজোখা নেই। মস্ত একখানা একসারসাইজবুক ভরে ওঠলো প্রায়—কিন্তু ওদের কাউকেই যে নেওয়া হবে না, তা জানে দূর্ব্বা—তার মতন আশ্চর্য্য সুন্দরী কেউ যদি এসে পড়ে এই আশায় বরুণের দল কাউকে মানা করে না আসতে। কিন্তু বাড়ীটা প্রায় সিনেমা কোম্পানীর অফিস হয়ে উঠলো। দূর্ব্বা মনে মনে বিরক্ত হচ্ছে, কিন্তু এমন ঘটবে সে জানতো না। চিণ্ময় এখন ঐ বারবাড়ীর ঘরটায় থাকে—তাই পাড়ার লোকের

ধারণা—চিন্ময় দূর্ব্বার নিকট আত্মীয়, আর বরুণের দল আসে চিন্ময়ের বই সিনেমার জন্য কিনতে। এইজন্য পাড়ার অনেকেই আবার দূর্ব্বাকে ধরেছে কাজের জন্য, স্যুটিং দেখাবার জন্য বা বিনাপয়সায় সিনেমা দেখাবার জন্য। দূর্ব্বা বেশ মুস্কিলে পড়েছে এই সব ব্যাপারে।

কিন্তু দাদু নির্ব্বিকার—তিনি যেমন তাঁর ঘরে আসীন ছিলেন, তেমনি আছেন; শুধু খবর জেনেছেন যে দূর্ব্বা অভিনয়ে যোগ দিচ্ছে এবং পারিশ্রমিক ভালই পাচ্ছে; চিন্ময়ও এখানে এসে আছে, খায় এবং থাকে। গোবিন্দ সেই যে সেদিন গেছে আর আসিনি। তার পাওনা টাকাও নিয়ে যায়নি সে। কি মতলব করছে, কে জানে?

কিন্তু জানা গেল—গোবিন্দ এই কদিন পাড়ার বহু মাতব্বর ব্যক্তিকে বলেছে যে বিপ্রদাস চৌধুরীর বিধবা নাতনী, অতবড় বংশের মেয়ে কিনা ফিল্মষ্টার হচ্ছে—পাড়ার লোকের বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু সহর কলকাতা—আপনাপন দৈনন্দিন জীবন নিয়ে মানুষ এখানে আজ রুদ্ধশ্বাস—রেশনের কিউ—কাপড়ের কণ্ট্রোল, বা আফিসে যাবার ভিড়, শুধু নয়—মনোবৃত্তির মালিন্য এ সবকে ছাড়িয়ে গেছে তাদের—তারা হাসে এবং জবাব দেয়—ভালই তো, পর্দায় নতুন একখানা মুখ দেখা যাবে। অর্থাৎ ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কারো সময় যদি বা হয় তো দূর্ব্বার বিরুদ্ধে নয়—সাপক্ষেই! দু একজন বৃদ্ধ অবশ্য বললেন যে কাজটা অন্যায় করছে—দূর্ব্বা—পঞ্চতীর্থ মশায়ের বাধা দেওয়া উচিত—কিন্তু তাদের কথা এযুগে কেউ গ্রাহ্য করে না। জাতে পতিত বা ধোপানাপিত বন্ধ করে কলকাতায় কাউকে জব্দ করা সম্ভব নয়—অতএব গোবিন্দ আর কি করতে পারে?

করতে সে অনেক কিছুই পারে—গুণ্ডা লেলিয়ে দিতে পারে, বাড়ী থেকে উঠে যাবার নোটিশ দিতে পারে....এবং আরো সাংঘাতিক...

দুর্ব্বাকে গুম করে···গোবিন্দ কথাটা ভাবতে ভাবতে থেমে গেল—না, ও বড় ফ্যাসাদ। অর্থবান হলেও গোবিন্দ অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতির লোক। আদুরে মানুষ, এতোটুকু শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য তার অসহ্য! যদি···ধরা পড়ে যদি জেল হয় - যদি···না, গোবিন্দ ওপথে যাবে না। তার চেয়ে দুর্ব্বা সিনেমায় যোগদিক—তখন তো···তাকে লাভ করতে দরকার শুধু কিছু টাকার! গোবিন্দ সে টাকা যোগাতে পারবে—আয়রণ শেফ খুলে গোবিন্দ ব্যাঙ্কের পাশবই আর কোম্পানীর কাগজগুলো একবার দেখে নিল—নগদ টাকাই তার কয়েক লক্ষ! তারপর লোহার কারবারটা এখন খুব জোর চলছে—গোবিন্দ মুচকী হাসলো।

সন্ধ্যা হয়েছে—ভেতরে এসে গোবিন্দ তার শিল্কের পাঞ্জাবীখানা গায়ে দিল—সোনার বোতাম, সোনার শেকলে গাঁথা—কিন্তু বরুণের পাঞ্জাবীতে সেদিন হীরে দেখে এসেছে। হীরে বসান বোতাম নেই গোবিন্দর, তবে হীরের আংটি আছে একটা—দামী কমল হীরের। গোবিন্দ বের করে পরলো। খুব ভাল একটা সেন্ট রুমালে এবং পাঞ্জাবীতে ঢেলে নিল খামিকটা—মণিব্যাগটা ভেতরের ফতুয়ার পকেটে ভরে ভাড়া আদায়ের রসিদটাও নিল তার সঙ্গে অবশ্য—বেরুলো গোবিন্দ ছড়ি হাতে। সামনেই পড়লো মেয়েটা—ষোল বছরে পড়তে যাচ্ছে—দিব্যি ঢলঢলে হয়ে উঠেছে—চঞ্চল হয়ে গেছে তার চোখ।

—কোথায় যাচ্ছ বাবা?—প্রশ্ন করে বসলো!

—ভাড়াগুলো আদায় করে আনি—বলেই গোবিন্দ জোরে হেঁটে বেরিয়ে এল - যেন পালিয়ে এল। কিন্তু আজকালকার তুখড়মেয়ে—বাবার গায়ের গন্ধটা আর সাজ ওর দৃষ্টি এড়ালো না—মুচকী হাসলো মেয়েটা, পরক্ষণেই গম্ভীর—হয়ে গেল—এতোদিন পরে বাবা আবার বিয়ে করবে নাকি?

না—এরকম কিছু শোনেনি সে—তবে বাবার যা স্বভাব তাতো আর বদলাবে না—থাকগে। নিজের কাজে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করতে লাগলো সে—কিন্তু মানুষের মন বড্ড বিশ্রী বস্তু! কে জানে কখন ওর মনের মধ্যে নিজের বিয়ের চিন্তা এসে ঢুকেছে। কিন্তু বিয়ে সে যাকে করতে চায়—তার বাবাতো তাকে জামাই করতে চায় না—এই দুশ্চিন্তাটা মনের মধ্যে বাসা বাঁধলো—কি করবে? কিছু একটা করতে হবেই তাকে এবং অবিলম্বে। বাড়ী থেকে পালিয়েই যাবে নাকি?—না, অতটা সাহস হয় নি ওর এখনো। তবে যাকে নিয়ে কথা, সে ঐ কথাই বলে। বলে যে বাইরে কোথাও গিয়ে বিয়ে করে গোবিন্দকে সংবাদ দেওয়া যাবে—তখন গোবিন্দ আর করবে কি? বাধ্য হয়ে মেয়েকে ক্ষমা করে নেবে এবং জামাইকেও যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ন করবে। কিন্তু মেয়েটা তার বাবাকে চেনে খুব, ভরসা পায়না সে—বাবা যদি তাড়িয়েই দেয় জন্মের মত!

যে-ছেলেটির সঙ্গে তার ভালবাসা, সে স্বজাতি তো নয়ই অধিকন্তু স্বচ্ছন্দ অবস্থার লোকও নয়—বিদ্যাও বেশি নয়—তবে রোজগার করে ভালই—সিনেমার ক্যামেরাম্যান।

গোবিন্দ বেরিয়ে পড়লো দুর্ব্বাদের বাড়ীর দিকে, দূর বেশি নয়, চার পাঁচ মিনিটের রাস্তা—কিন্তু এটুকু পথেই যার সঙ্গে দেখা হোল সেই তাকালো গোবিন্দর মুখপানে। ব্যাপার কি? গোবিন্দ বুঝতে পারে নি প্রথম, তারপর বুঝলো, তার পোষাকের আভিজাত্য এবং অঙ্গের সুরভি ওদের এই কৌতূহলের কারণ। আনন্দিতই হোল গোবিন্দ, নির্ব্বোধের যা কাজ! কিন্তু ঐ চেনা লোকটাকে পাড়ার যে দেখলো সেই মুচকী হাসলো!

সটান চলে এলো গোবিন্দ গোঁফে তা দিতে দিতে। চেহারাটা নিশ্চয়ই ভাল দেখাচ্ছে ওর—বন্ধুদের সঙ্গে ওকে আজ বেমানান দেখাবে না—ফুলো ফুলো গালে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে ঢুকলো ঘরে।

বড় টেবিলখানা ঘিরে বরুণ, কাটু, মিহির আর চিন্ময়—দূর্ব্বা নেই ওখানে। হয়তো ভেতরে আছে। গোবিন্দ তো আর বাইরের লোক নয়, সে আধমিনিট দরজার কাছে দাঁড়িয়েই ভেতরে ঢুকলো

—দূর্ব্বা—দাদু!

এদের কেউ ওকে সম্বর্দ্ধনা বা অভ্যর্থনা কিছুই করলো না। আশ্চর্য্য! ওরা ভাবে কি? কতটাকা নিয়ে নেমেছে ওরা সিনেমা করতে?' ক'লক্ষ টাকা মূলধন হলে সিনেমা করা যায়? তিন লক্ষ, পাঁচলক্ষ, দশলক্ষ—গোবিন্দ করতে পারে—আছে তার টাকা! কিন্তু···

দূর্ব্বাও বেরিয়ে এল—ও আপনি? রসিদ এনেছেন?

—রসিদটার জন্য এত তাগাদা কেন দিচ্ছ তুমি দূর্ব্বা?

—কারণ, টাকাটা আপনাকে দিতে চাই—

—কিন্তু টাকা আদায় ছাড়া আমার অন্য কথাও তো থাকতে পারে?

—না—দূর্ব্বা কিঞ্চিৎ কঠোর ভাবে বলল—অন্য আর কোনো কথা থাকতে পারে না—অন্য কথার জবাব আমি দিয়েছি!

—দাও নি—বিয়ের কথা নয়—আমার অন্য একটা প্রস্তাব আছে!

—অন্য কি প্রস্তাব আবার? দূর্ব্বা গলা নামিয়ে শুধুলো!

—সিনেমায় যখন তুমি নামবেই, তখন পরের কোম্পানীতে কেন? আমি টাকা দিচ্ছি তুমি ছবি তোলার ব্যবস্থা কর—

—বলেন কি? সে যে অনেক টাকার ব্যাপার—দূর্ব্বা হাসলো!

—কত? দুলাখ—পাঁচলাখ—আমি দেব।

বিস্মিত হতে গিয়েও দূর্ব্বা বিস্মিত হোল না খুব। টাকা গোবিন্দর আছে, এবং ভালই আছে এটা তার জানা—তবে সে টাকা যে দূর্ব্বার জন্য সিনেমাকোম্পানী গড়ে গোবিন্দ খরচ করতে চাইবে এ তার জানা ছিল না। দূর্ব্বা জবাব দেবার পূর্ব্বে একমিনিট ভেবে নিল, তারপর বলল,

—সিনেমার ছবি করা খুব বড় ব্যাপার ; শুধু টাকা থাকলেই হয় না, ওটা জানতে বুঝতে অনেক সময় লাগে—ও কথা এখন থাক !

—না, গোবিন্দ আবদারের সুরে বলল, না দূর্ব্বা, থাকবে না। টাকা আমার, তুমি কোম্পানী খোল, বুদ্ধি তোমার—

—কিন্তু আমি এ বিষয়ে এখনো বুদ্ধ হয় নি—বলে হাসলো দূর্ব্বা।

—তুমি—তুমি ঠিক পারবে, তুমি আবার না পার কি ?

—ওটা শিখবার ব্যাপার আর শিখবার জন্যই যাচ্ছি আমি ওখানে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করবো। আপনি যান দাদুর কাছে বসুন গে !

দূর্ব্বা চলে গেল রান্নাঘরে। আর অসীম আনন্দে গোবিন্দ আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওখানেই প্রায় মিনিটখানেক। তারপর বেরিয়ে এল বসবার ঘরে।

দূর্ব্বা তার সঙ্গে পরামর্শ করবে বলেছে—এর থেকে আনন্দের ব্যাপার আর কি আছে গোবিন্দর জীবনে ! পরামর্শ করবে, মানে রাজি হবে, আর রাজি হবে মানেই গোবিন্দ তাকে লাভ করতে পারবে ! অন্তরটা শিউরে শিউরে উঠছে গোবিন্দর। এই আনন্দের আস্বাদই ভূমানন্দ, আঃ ! গোবিন্দ বাইরের লোকগুলোকে তার সৌভাগ্য প্রসন্ন মুখ খানা দেখিয়ে যাবে একবার।

এসে ঢুকলো—বরুণ শুধু তাকাল ওর পানে। আর সকলেই স্ক্রিপ্ট নিয়ে ব্যস্ত। একখানা চেয়ারে বসল গোবিন্দ—বরুণকেই প্রশ্ন করলো,

—আচ্ছা স্যার, কি পরিমাণ টাকা লাগে একখানা ছবি করতে ?

—দু'লাখ, তিনলাখ, চারলাখ, থেকে বিশ ত্রিশ চল্লিশ লাখ পর্য্যন্ত, যেমন ছবি।

—আমি সাধারণ ভাল ছবির কথা বলছি। গোবিন্দ পুনরায় বলল।

—কেন? ছবি তৈরী করতে চান নাকি আপনি? বরুণ প্রতিপ্রশ্ন করলো।

—ব্যবসাদার মানুষ, বলা তো যায় না, কোনদিকে কখন ঝোঁক চাপে।

—শেয়ার মার্কেটে ঝোঁক আছে? বরুণ শুধুলো।

—আজ্ঞে না—

—রেস এ?

—না—আমার লোহালক্কড়ের কারবার।

—মদভাঙ এক আধটু?

—এ সব প্রশ্ন করছেন কেন? গোবিন্দ বোকার মত শুধুলো।

—ওসব না হলে সিনেমালাইনে আসা উচিৎ নয়—হাসলো বরুণ।

বরুণ কথাটা কাটিয়ে দিতে চায়, ঠিক সেই সময় দুর্ব্বা এসে ঢুকলো—কথাগুলো ও শুনেছে ঢুকবার সময়। হেসে বলল,

—ওসব না হলেও সিনেমালাইনে আসা যায়, বরুণবাবু, সেইটে প্রমাণ করবার জন্য আমি ঢুকতে যাচ্ছি—গোবিন্দবাবুকে আপনি একেবারে গাধা বানিয়ে দিচ্ছিলেন যে!

—ওঁর প্রশ্নটা খুব বুদ্ধিমানের মত হয়নি দেবি—বরুণ হেসে বলল।

—তা না হোক, আপনার জবাবটা অসত্য হবে, এ আমি পছন্দ করিনে।

—আমি ক্ষমা চাইছি—সত্যি এরকম জবাব দেওয়া উচিৎ হয়নি আমার।

—মাফ চাইতে হয় - ওঁর কাছে চান—কথাগুলো ওঁকেই বলেছেন।

বরুণ সত্যি মাফ চাইল গোবিন্দের কাছে, বলল, কিছু মনে করবেন না, এ লাইনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নিয়ে নামতে হয়, এই কথাই বলছিলাম।

আনন্দের আমেজ লেগেছে গোবিন্দর মনে। দুর্ব্বা গোবিন্দের জন্য কোনটা না করতে পারে!—গোবিন্দ জীবন দিতে প্রস্তুত থাকবে দুর্ব্বার জন্য—না, জীবন বড় মূল্যবান বস্তু—টাকাই সে দিতে পারে - দেবেও!

উৎসবটা খুবই জমেছে সুবর্ণাদের ক্লাবে। সতীশ্রী নাটকখানার মহড়া শেষ হয়েছে,—আজ তার অভিনয় রজনী। বিশিষ্ট বন্ধু বান্ধব সব নিমন্ত্রিত হয়েছে, আসছে সব—সুবর্ণা অনেক আগেই এসেছে, সেই এর পরিচালয়িত্রী। কিন্তু সেই মায়া নামক মেয়েটি এখনো এসে পৌছায়নি। তাকেই প্রথম নামতে হবে দিগঙ্গনার নৃত্য দেখাবার জন্য। মায়া অবশ্য বলেই গেছে যে তার স্যুটিং আছে ষ্টুডিওতে—সেটা শেষ করে রাত্রি আটটার পর সে আসতে পারবে। সে-এসে পৌছালেই থিয়েটার আরম্ভ হতে পারে।

উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওরা রাস্তার পানে, কখন মায়া আসে। এত দেরী কেন হচ্ছে? বিরক্ত হয়ে সুবর্ণা টেলিফোন করলো ষ্টুডিওতে। কে একজন জানালো যে আরো আধঘণ্টা দেরী হবে স্যুটিং শেষ হতে। এদিকে যে তাহলে সুবর্ণাদের প্রোগ্রাম আপসেট হয়ে যায়! অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সুবর্ণা তার সহকারিণী চিত্রাকে কয়েকটা কাজের ভার দিয়ে গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে পড়ল—ষ্টুডিওর দিকে।

ষ্টুডিওতে এর আগে এসেছিল একদিন—কি একটা ছবির স্যুটিং দেখবার জন্য—কাজেই কোন অসুবিধা হোল না তার। গেটে গাড়ীখানা রেখে সটান গিয়ে ঢুকলো একেবারে ফ্লোরে—হটাৎ, যেখানে ছবি তোলা হচ্ছে।—ঢুকেই দেখতে পেল, রাজকুমারবেশী বরুণ বিদুলা-বেশিনী মায়াকে বলছে—চোখের জলের সমুদ্রে ডুবে মরলেও আমি সেই লোনা জলে নেমে তোমায় তুলতে যাব না বিদুলা, পথ ছাড়ো!

—যাও—বিদুলা সরে দাঁড়ালো—কিন্তু মনে রেখো, যে অগ্নিকণা আমার গর্ভে সে এই চোখের জলের সমুদ্র শুকিয়ে দিতে পারবে—কিন্তু তারপর···

—তারপর ?

—সেই হোমশিখাকে আর স্পর্শ করতে এসোনা—সে অধিকার আজ তুমি হারালে !

—আচ্ছা, আমার প্রয়োজন হবে না তাকে স্পর্শ করবার !

যুবরাজবেশী বরুণ গট্‌গট্‌ করে চলে গেল রাজপথের ওপর দৃষ্টির বাইরে—আর বিদুলাবেশিনী মায়ার চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলতে লাগলো। ক্যামেরাম্যান কাছাকাছি এগিয়ে এসে বিদুলার ছবি তুললো। ডিরেকটার বলল—'কাট্'—দৃশ্যটুকু তোলা শেষ হোল।

এতক্ষণে মায়ার দৃষ্টি পড়লো একধারে দাঁড়িয়ে থাকা সুবর্ণার পানে। তাড়াতাড়ি কাছে এসে নমস্কার করে বলল,—চলুন—আজকার মত আমার হয়ে গেছে—আমি ডিরেক্টারকে বলে আসি।

সুবর্ণা দেখতে পেল, বরুণ ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে একখানা সোফায় বসে সিগরেট ধরালো। সুবর্ণাকে সে দেখতে পায়নি—কারণ ঘরখানা প্রকাণ্ড—তাতে রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের অংশ তৈরী করা হয়েছে এবং ফুলের টব আর গাছের ডালে প্রায় সবটা ভর্ত্তি। তাছাড়া চেয়ার টেবিল অসংখ্য এবং বহু লোক কাজ করছে একসঙ্গে—বহু দর্শকও দেখছে। সকলেই বলছে—গর্জ্জাস হয়েছে দৃশ্যটা ! সুবর্ণা বুঝতে পারলো তার আসবার পূর্ব্বে অনেক দৃশ্যই তোলা হয়েছে এখানে আজ, মায়ার প্রেমের অভিনয়, মান অভিমান ইত্যাদি। কিন্তু বরুণ অত লোকের ভিড়ে এখনো তাকে দেখেনি ! দেখা আর দিতে চায় না সুবর্ণা—সে ধীরে ধীরে বাইরে চলে এল—ফ্লোরের। মায়াও বেরিয়ে এল ওদের কাছে বিদায় নিয়ে, গাড়ীতে ওঠলো।

চলছে গাড়ী—অকস্মাৎ সুবর্ণা প্রশ্ন করলো মায়াকে,—কত টাকা পাচ্ছেন আপনি ওখানে ?

—হাজার দুই দেবেন—সবটা পাব কিনা, জানি না; মাত্র পাঁচশো পেয়েছি।

—পাবেন না, মনে করছেন কেন?—ওরা কি ঠকাবে আপনাকে, মনে করছেন?

—না—মায়া খতমত খেয়ে গেল—ঠিক তা নয়, টাকা জিনিষটা হাতে না এলে বিশ্বাস করা যায় না।

—কে কে আছেন আপনার সংসারে?

—স্বামী, শাশুড়ী আর একটি ছোট দেবর—স্বামীর খুব অসুখ, তাঁর জন্যই আমায় একাজ নেওয়া। তাঁকে ভাল করতে হবে।

—কোথায় স্বামী আপনার? এখানেই—মানে, কলকাতাতে?

—না—এই টাকা পেয়েই তাঁকে আমি চেঞ্জে পাঠিয়েছি—চুনারে। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে যদি ভাল হন—তবেই···মায়ার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ।

—কি অসুখ তাঁর?

—পেটের অসুখ—বড্ড ক্রনিক হয়ে গেছে—আমি কাছে থাকতে পারলাম না, কেমন যে আছেন—দু-তিন দিন চিঠি পাইনি।

—তাঁর কাছে কে আছেন ওখানে?

—আমার শাশুড়ী—এখানে আছি দেওর আর আমি।

—কত বড় দেওর?

—পনের বছরের—স্কুলে পড়ে—আপনাদের ক্লাবে আসবে হয়তো সে

সুবর্ণা আর কিছু প্রশ্ন করলো না অনেকক্ষণ। গাড়ীখানা জোরে চলছে—কালীঘাটের মন্দির—দেখা যায় না বড় বড় বাড়ীর আড়ালে কিন্তু সুবর্ণা দেখতে পেল—মায়া হাতজোড় করে নমস্কার করছে।

—মা কালীকে?—সুবর্ণা শুধুলো।

—হ্যাঁ—কেন ?

—না—কিছু না—হাসলো সুবর্ণা, আর কিছু বললো না। মায়াও নিশ্চুপ বসে।

সুবর্ণা গাড়ী চালাতে চালাতে ভাবছে—অর্থের একান্ত প্রয়োজনেই মায়া বাইরে এসেছে—সাধারণ গৃহজীবনে ও সেবাপরায়ণা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বঙ্গবধূ। হয়তো স্বামী সোহাগিনী—সন্তান বৎসলা—কিন্তু সন্তান এখনও হয়নি ওর—সুবর্ণা চাইল মায়ার মুখপানে; কুমারী মেয়ের মত মুখ, সুন্দর, উজ্জ্বল, পবিত্র। ও কেন এল সিনেমা লাইনে ? কিন্তু কেন এলো তা শুনেছে সুবর্ণা—অর্থনৈতিক কারণ !

—ছেলে মেয়ে কিছু হয়নি আপনার—না ?—প্রশ্ন করলো সুবর্ণা।

—না—আপনার ? প্রতিপ্রশ্ন করলো মায়া !

—একটি মেয়ে—বছর দুই এর—জবাব দিল সুবর্ণা—এবং আজই বোধ হয় প্রথম ভাবলো—তার একটা মেয়ে আছে এবং কেউ প্রশ্ন করলে সেটা বলতে হয়। কিন্তু কৈ—কেউ এ প্রশ্ন তো কোন দিন করেনি সুবর্ণাকে ! মেয়েটা যে তার, একথা মনেই থাকে না ওর। ঐ ফুটফুটে যুঁইকুড়িটার ও মা নাকি—হ্যাঁ !

—কী দুষ্টু আর দামাল মেয়েটা—বাব্বা ! অনর্থক কথাটা বললো সুবর্ণা—একান্ত অনর্থক—কারণ মায়া তো প্রশ্ন করেনি—কিন্তু এমনি অকারণ কথা বলার আস্বাদ আছে—অতি চমৎকার একটা আস্বাদ—অনুভব করছে সুবর্ণা।

—কোথায় রেখে এলেন তাকে ওর বাবার কাছে ?

—না—থাকে আয়ার কাছে—বাবারই ভক্ত, আমায় সে ছুঁয়েই যায় না—চেনেই না শয়তানটা।

হাসছে মায়া কথাগুলো শুনতে শুনতে। এই মাত্র সে অভিনয়

করলে, মহাবীর—নায়ক রাজকুমারকে বলে এলো—তার গর্ভে আছে অগ্নিকণা—কিন্তু কৈ—মায়ার গর্ভ শূন্য—কোনদিন পূর্ণ হবে কি না, কে জানে? অসুস্থ স্বামীর মলিন মুখখানা মনে পড়ে গেল তার—কে জানে, কেমন আছে!

—ওকি! কাঁদছেন কেন আপনি?—সুবর্ণা অতি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো মায়ার চোখের কোণায় জল দেখে। বিব্রত, লজ্জিত হয়ে উঠলো মায়া—সত্যি তার চোখে জল এসে গেছে; কিন্তু সুবর্ণা কি মনে করবে! ছিঃ ঐ সন্তান সৌভাগ্যবতীর আনন্দের উচ্ছ্বাস শুনে সে হয়তো কেঁদেছে ঈর্ষায়—এই রকম কিছু মনে করবেনা তো সুবর্ণা? বলল,

—না দিদি না, ওঁর মুখ মনে পড়ে গেল—বড় অসহায় অবস্থায় আমি পাঠিয়েছি তাঁকে। ছেলে মেয়ের আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি ভাই—স্বামী সুস্থ হলেই হবে—আর আমার কিছু চাইনে; চোখের জলটা মুছলো মায়া আঁচল দিয়ে। রুমাল হয়তো ওর আছে, বার করে হাতে রাখে না—মায়া কান্না দেখাবার মত মন নেই ওর।

ওর চোখের অশ্রু অনাবিল, অপাপবিদ্ধ—সুবর্ণা অনুভব করলো। হেসে বলল,

—স্বামী ভাল হয়ে যাবেন—অত ভাবনার কি আছে? কিন্তু এ লাইনে আপনি এলেন কেন ভাই—আপনার মত স্বামীপরায়ণা সতী মেয়ের তো এ পথ নয়?

—না এলে ওঁকে বাঁচোনো যাবে না—আর তো কোন কাজ জানা নেই। স্কুলে নাচ শিখে ছিলাম, গাইতে পারতাম, অভিনয়ও করতে পারি—আর ঐ দেখেই উনি আমায় বিয়ে করেছিলেন—নিজেও ভাল নাচতে পারেন।...তাছাড়া অন্য কাজে তো বেশি টাকা পাওয়া যায় না, ভাইদিদি...

—হ্যাঁ—কিন্তু—সুবর্ণা একটু ইতঃস্তত করে বলল - এ লাইনে চরিত্র ঠিক রাখা খুব কঠিন।

—জানি—আমি অনুমতি নিয়েছি—ওঁর জীবনের তুলনায় আমার দৈহিক পবিত্রতা আমি তুচ্ছ মনে করি—কিন্তু···

—বলুন—

—কিন্তু ওঁর ছাড়া আর কারো সন্তান আসবে আমার কোলে, এ আমি সইতে পারবো না।

চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো মায়ার। এই আশ্চর্য্য সতীর সান্নিধ্যে সুবর্ণা যেন নির্ব্বাক হয়ে গেছে—গাড়ীখানা জোরে চালাতে ভুলে গেছে সুবর্ণা—পিছনে একখানা যাত্রীবাহী বাসের জোর 'হর্ণ' শোনা গেল—সুবর্ণা তাড়াতাড়ি নিজের গাড়ীখানা পাশ করে থামালো।

—আপনি আশ্চর্য্য মেয়েতো!—সুবর্ণা এতক্ষণে বললে।

—কেন?—চোখ মুছে মায়া প্রশ্ন করলো—করুণ হাসি তার ঠোঁটে!

—সতীশ্রী নাটকের নায়িকা আমি না হয়ে আপনি হলেই ঠিক হোত, কিন্তু এখন তো পার্ট মুখস্থ করতে পারবেন না—সুবর্ণা ওর প্রশ্ন এড়িয়ে বলল কথাটা।

—না তার কি দরকার! আমি ঐ দিগঙ্গনার নৃত্যটাই নাচবো—টাকা শোটা পেলেই ওঁকে পাঠাতে পারবো কাল—

—কাল রবিবার—পোষ্ট অফিস বন্ধ—বলে হেসে সুবর্ণা আবার গাড়ী চালাল,

—ও হ্যাঁ—আমার মনে ছিল না—বলে মায়া যেন কেমন বিমনা হয়ে গেল।

আর কোনো কথা হোল না পথে। মায়ার মনে অবশ্য কৌতূহল

জেগেছে সুবর্ণার সমস্ত পরিচয় জানবার জন্য, কিন্তু মায়া এখানে সামান্য নটী, আর সুবর্ণা পরিচালিকা, মনিব স্থানীয়া—সুতরাং কিছুই সে প্রশ্ন করতে পারলো না। আর সুবর্ণা ভাবছে, এইমাত্র মায়া যে রাজকুমারী বেশী লোকটির সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে এল—মায়া জানে না, সুবর্ণার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি। কিন্তু সুবর্ণা অন্য একটা কৌতূহল দমন করতে পারছে না—আর একজন নায়িকা কে—যার ছবি সে দেখেছে—সে কোথায়?

গাড়ী ক্লাব ঘরের ইয়ার্ডে থামলে পর নামতে নামতে সুবর্ণা বলল,

—ও গল্পটায় আপনিই নায়িকা—না আর কেউ আছে?

—আছে—সেই নায়িকা—রাজকুমারী অতসী—

—তার সত্যি নাম কি? আলাপ হয়েছে আপনার সঙ্গে?

—হ্যাঁ—নাম দুর্ব্বা চৌধুরী—বড় সুন্দরী মেয়ে।

—কৈ—তাকে দেখলাম না তো?

—আজ তার অভিনয় নেই—তাই আসেনি—বয়স আমার মতন, এমন আশ্চর্য্য সুন্দর!

মায়ার বিস্ময়োক্তিটা কানে লাগলো সুবর্ণার—হেসে বলল,

—আপনার থেকে সে সুন্দর, তাতে অত খুসী কেন আপনি? হিংসাই তো হওয়া উচিৎ।

—হিংসে? না দিদি, ওর ওপর হিংসে কেউ করবে না—শুধু রূপেই সে সুন্দর নয়, মনেও সে মহিয়সী—মানুষ শরীরে মনে অমন চমৎকার হয়—জানতাম না!

—লেখাপড়া কতটা জানে?

—তা জানি না দিদি—আমার বিদ্যেতে সেটা জানবার কথা নয়। ওখানকার সবাই ওকে সমীহ করেন—প্রডিউসার বরুণবাবু পর্য্যন্ত!

—ও, আচ্ছা, একদিন দেখে আসা যাবে—আসুন।—বলে সুবর্ণা ওকে নিয়ে ক্লাবঘরের গ্রিণরুমে ঢুকলো।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব তৈরী হয়ে গেল, অভিনেতা অভিনেত্রীগণ, প্রস্তুত হলো—দিগঙ্গনা বেশে মায়া।

অপরূপ নৃত্য মায়ার, দর্শকচক্র যেন ভূলোক ছেড়ে দ্যুলোক এসে গেছে, কী আশ্চর্য্য শিক্ষা! সমস্ত তনুলতা ঘিরে, কী অমৃতনিস্যন্দী সুষমা ওর! বিশ্বের বাসনা যেন ব্যাকুল হয়ে ওর পদপ্রান্ত চুম্বন করতে চায়—নির্ব্বাক অডিটেরিয়াম হাততালি দিতে ভুলে গেল—ভুলে গেল 'আচ্ছাবা' বলে চীৎকার করতে!

প্রথম দৃশ্যতেই মায়া জমিয়ে দিল অভিনয়—শ্রোতৃমণ্ডলী আরো কিছু পাবার প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে। পরবর্ত্তী দৃশ্যে এল সুবর্ণা, নায়িকা রূপে, এক দরিদ্র যুবকের বধূ সে—স্নেহে কোমলা, প্রেমে মাধুর্য্যময়ী আর নিষ্ঠায় অচল প্রতিষ্ঠিতা। বহু বিপর্য্যয়ের মধ্যেও সে জীবন দেবতার অভিসার পথে তার ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপ জ্বালিয়ে চলতে লাগলো—অভিনয় অনবদ্য হয়ে উঠেছে—বরুণ এসে দর্শকদের মধ্যে আসন নিল এক কোণে।

নায়িকা কল্যাণীর জ্যোতির্ম্ময়ী সতীরূপ দর্শকচিত্তকে অভিভূত করে দিচ্ছে—আশ্চর্য্য! ঐ নায়িকা বরুণের সহধর্ম্মিণী সুবর্ণা—গৃহে যার সতীত্ব দুরে থাক—পত্নীত্বের প্রকাশ কদাচিত দেখেছে বরুণ! মাতৃত্ব ও যায় মধ্যে খুঁজে পায়নি কখনো! সুবর্ণা কি দেহ মনে বদলে গেল নাকি? এমন প্রাণস্পর্শী অভিনয়নিষ্ঠা কোথায় পেল ও! ওকি সত্যি সুবর্ণা, না আর কেউ?—অবাক হয়ে দেখতে লাগলো বরুণ!

দিগঙ্গনার নৃত্যের পর গোপাঙ্গনা বেশে আবার এল মায়া। বহু দর্শক এর প্রতীক্ষা করেছিলেন। নটীজাতীয় অতি সাধারণ লাস্য-নৃত্য নয় এ,—ভাবস্নিগ্ধ আনন্দ নৃত্য! বরুণ মুগ্ধ চোখে দেখলো—আর

ভাবলো, মায়া তাদের ছবিতে রাজবধূ কিন্তু রাজনর্ত্তকী বেশে তাকে ছবিতে নামালে হয়তো আরো ভাল হোত ; কাটুর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করবে সে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাবলো—এ নৃত্য রাজকুমারের প্রমোদাগারের নৃত্য নয়—বিবসনা বিশ্ববাসনার কামানার্ত্ত প্রকাশ নয়—এ নৃত্য নটরাজের শুভ্র চরণ কমলে রক্তাক্ত হৃদ্‌পিণ্ডের অঞ্জলি—রাজোদ্যানে এর সম্মানরক্ষা হবে না। বরুণ দেখতে পেল, ঐ নৃত্যপরা দ্বাদশীর দিকে এগিয়ে আসছে সতীশ্রী কল্যাণী—মন্দিরের মর্ম্মরশ্বেত অঙ্কে তার অলক্তরঞ্জিত পদবিন্যাস পূজারিণীর পবিত্রতার মত মূর্ত্তিমতী—সুবর্ণা! সুবর্ণা! এই সুবর্ণা, সতী সুবর্ণা! বরুণ চিনতে পারছে না ওকে। সুবর্ণা অঞ্জলি উদ্যত করে পূজার্ঘ অর্পণ করছে—বলছে,

আমার সব বেদনা সব চেতনা—রচিল এযে কি আরাধনা···

কোথা দিয়ে যে সময় চলে গেল, টের পেল না বরুণ, অকস্মাৎ সে অনুভব করলো, অভিনয় শেষ হয়ে গেছে—এবং দর্শকবৃন্দ উঠতে আরম্ভ করেছে—সবাই বলছে চমৎকার!—অদ্ভুত! আশ্চর্য্য—অনুপম সৃষ্টি! বরুণ দেখতে পেল, ষ্টেজের উপর দাঁড়িয়ে সুবর্ণা সকলকে নমস্কার করছে, আর অসংখ্য দর্শকের মধ্যে থেকে বহু ব্যক্তি পুষ্পমাল্য, তোড়া ছুঁড়ে দিচ্ছে ওর গলায়, গায়ে, পায়ে। মৃদু হেসে সুবর্ণা গ্রহণ করছে এই অর্ঘ্য সম্ভার—এই প্রীতি, এই পূজা...

বরুণের সুবর্ণা বিশ্বের সুবর্ণা হয়ে উঠলো নাকি আজ? হ্যাঁ তাইতো! ও সতী কল্যাণী নয়, ও নায়িকা সুবর্ণা এখন—অসংখ্য মানবের চিত্তবিনোদনকারিণী অভিনেত্রী!—না, বরুণ আর দেখবে না, দেখাও করবে না সুবর্ণার সঙ্গে। অসংখ্য দর্শকের উদ্বেলিত প্রীতি-উৎসে সে পরিস্নাত হোক—বরুণ বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করবে—নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে বরুণ গাড়ীতে চড়লো।

দর্শকগণ দাবী জানালেন দিগঙ্গনাবেশী মায়াকেও তাঁরা দেখবেন, প্রীতি জানাবেন। কিন্তু মায়া নিজের কাজ সেরেই টাকাগুলো নিয়ে দেওয়রের সঙ্গে বাড়ী চলে গেছে। সুবর্ণা সবিনয়ে জানাল সে কথা। দর্শকগণ ক্ষুব্ধ হলেন, পুনর্ব্বার এই অভিনয় দেখবার আবেদন জানিয়ে তাঁরা প্রস্থান করলেন। এতক্ষণে সুবর্ণা একটু স্বস্তি পেল! উঃ! কী অভিনন্দন! কী আশ্চর্য্য মাদকতা এর! কিন্তু আরো আশ্চর্য্য যেটা, সেইটাই ভাবছে বাড়ী ফিরবার পথে। সৃষ্টিকর্ত্তা নাকি নিজের বিচিত্র সৃষ্টি দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, সুবর্ণারও তাই হয়েছে। এমন আশ্চর্য্য অভিনয় সে করলো কি করে, কোথা থেকে জুটলো প্রেরণা, কেমন করে কী হয়ে গেল! এই দুটো ঘণ্টা সে সুবর্ণা ছিল না, ছিল বধূ কল্যাণী, সেবায়, স্নেহে, প্রেমে, পূজায় সে যেন আরেক জন হয়ে উঠেছিল, যেন - কার শক্তিতে!

মনে পড়ে গেল সুবর্ণার—মায়ার চোখের দুফোঁটা জল,—'ওর জীবনের তুলনায় আমার দৈহিক পবিত্রতা অধিক তুচ্ছ মনে করি'—কথাটি। আশ্চর্য্য সতী মায়া! ঐ স্পর্শমণির স্পর্শেই লোহা-সুবর্ণা সত্যি-সুবর্ণা হয়ে গেছে।

বাড়ী এসে দেখলো, খুকীকে বুকে নিয়ে বরুণ ঘুমিয়ে আছে। দীর্ঘ দিন পরে সুবর্ণার অধরোষ্ঠ নীচু হয়ে এল, বরুণের ললাটের পানে!

—উহুঁ—থাক, ঠোঁটে রং রয়েছে তোমার—বরুণ বলল!

—থাক—সুবর্ণা ত্বরিতে গিয়ে ঢুকলো বাথরুমে!

লজ্জায় মিশে যাবে নাকি সুবর্ণা মাটির সঙ্গে, নাকি—বিদ্রোহের বহ্নি জ্বেলে দেবে পুড়িয়ে, দেবে সব সুকুমার মনোগন্ধ!

সিনারিও লেখা আর শেষই হচ্ছে না। কাটুবাবু বড্ড খুঁৎখুতে মানুষ, কী যে সে চায় - চিন্ময় বুঝতে পারে না। মূল গল্পটাই যথেষ্ট জোরালো

ছিল না. চিণ্ময় তার মধ্যে আরো কিছু যোগ বিয়োগ করে সেটাকে এক রকম দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু ছবিতে যে সব দৃশ্য এবং কথা তোলা হবে—সেগুলো আর কাটুবাবুর পছন্দই হয় না। অনেক ভেবে, অনেক মাথা ঘামিয়ে চিণ্ময় মনের মত করে লিখলো পাতাখানেক—কাটুবাবু শুনে বললো—'বাঃ! চমৎকার—তারপর একটু মাথা চুলকে বলল—শেষটা বোরিং মনে হচ্ছে একটু—'ওটা কেটে দিন—পরে আবার বলব এতে গল্প কিন্তু মোটে এগুচ্ছে না—আরো একটু পরে বলল, 'শুধু কথাই আছে ড্রামা কৈ?'—ইত্যাদি। শুনে শুনে চিণ্ময় বুঝে নিয়েছে, কাটুবাবুদের মত ব্যক্তিকে স্বয়ং কালিদাস ভবভূতিও খুশী করতে পারবেন না, কারণ—ওদের ধারণা, ওদের মত ব্রেণ আর জন্মায়নি। কাটা ছাঁটা শেষ হলে দেখা গেল, চিণ্ময়ের অত কষ্ট করে লেখা দৃশ্যটার মধ্যে মাত্র চার পাঁচ লাইন রইল। লেখা একেবারে বাদ গেল। অকারণ অসময়ে অসম্ভব কিছু না ঘটালে বা না বলালে ওদের ড্রামা হয় না—গল্প গতি পায় না এবং বাংলাদেশের নির্বোধ দর্শক নাকি সে চিত্র পছন্দ করে না। সুস্থ, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর কিছু খাদ্য নাকি এদের রুচি হয় না—তেলে ভাজা পাঁপর পেঁয়াজ বড়াই এখানে দিতে হবে! এতোটা বিজ্ঞ লোকের সঙ্গে কাজ করা আর নরক ভোগ করা প্রায় সমান। চিণ্ময় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলো। যে সংলাপটি সে অত্যন্ত চিন্তা করে রচনা করেছে—কাটুবাবু তার অর্থ না বুঝেই বলল, ওটা চলবে না—আবার যেটা চিণ্ময়ের মোটে পছন্দ নয়—কাটু বলবে—বা! চমৎকার!

এ লাইনে এলেই কতকগুলো কথা ওরা শিখে ফেলে—যেমন—'ডাল', 'বোরিং'—'গল্প এগুচ্ছে না'—'ড্রামা কোথায়?' 'গুরুচণ্ডালী হচ্ছে'—'জমছে না'—'রস নেই' 'রিপিটিশ্যান হোল'—ইত্যাদি! ওদের গল্প কিসে গতি পায়, আর কোথায় ড্রামা হয়, সে বিষয়ে বিভিন্ন ডাইরেক্টরের

বিভিন্ন মত আছে। আশ্চর্য্য যে ওরাই যখন কোন বিদেশী চিত্র দেখে আসে, তখন অকাতরে তার প্রশংসা করে—আর বলে—আহা! কী চমৎকার! [illegible] এদেশে ওরা বলে—ওদের দর্শক আর আমাদের দর্শকের অনেক প্রভেদ। কোন ছবি বাজারে চললে, নির্ব্বিচারে ওরা দর্শকের স্কন্ধে দোষ চাপিয়ে বলবে, অশিক্ষিত দেশ—বুঝলো না—ওরা ভেবে দেখে না, দেশকে ভাল জিনিষ ওরা কবে দিয়েছে? ফাইনেন সার বধ করে একসঙ্গে পঞ্চমকারের সাধনায় ওরা সিদ্ধ হতে চায়—ছবি কেমন হবে, চিন্তাও করে না। কিন্তু যাক্ সেকথা, চিণ্ময় যতদূর সাধ্য চেষ্টা করলো কাটুবাবুদের খুশী করতে—এর জন্য তার নিজের মত এবং চিন্তাকে সে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়ে বসেছে—তবুও পারছে না। দৃশ্য আছে—যুবরাজ চিত্রক রাজকুমারী অতসীর প্রমোদ্যানে লুকিয়ে আছে, রাজকুমারী অতসী গান গাইতে গাইতে আসছে—অপূর্ব্ব শ্রুত সঙ্গীত, চিত্রক মুগ্ধ। কাটুবাবু আদেশ করলো—এইখানে যুবরাজ গুলি করে একটা পাখী হত্যাকরুক। রাজকুমারী সেই শব্দে হকচকিয়ে না উঠলে দৃশ্য জমবে না—পাবলিক বিরক্ত হবে। মিনিট খানেক ওর মুখপানে চেয়ে চিণ্ময় নির্ব্বিচারে তাই লেখে দিল। যুবরাণী বিদুলা সন্তান সম্ভবা—প্রসব বেদনায় কাতর—ওদিকে রাজ্যের সকলে শাঁখ বাজাবার জন্য অপেক্ষা করছে—বিধবা রাজমাতা অস্থির হয়ে ঘুরছেন—কাটুবাবু আদেশ করলো—এইখানে যুবরাণী বিদুলাকে একটা বিরহ সঙ্গীত অতি অবশ্য গাইতে হবে—চিণ্ময়ের মুখখানা তেতো খাওয়ার মত বিস্বাদ হলেও সে লিখে দিল—কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারছে না চিণ্ময়।—রাজকুমার যখন কয়েক বছর পরে বহু আঘাত খেয়ে ফিরে এল স্বরাজ্যে—তখন বিদুলা মন্দিরে পূজারতা—কুমার চিত্রভানু ঐখানে খেলা করছে। মৈনাক তাকে চোখে দেখে নি—চিনতে পারলে না—বিদুলাকে তো চিনবারই উপায় নেই, সে সন্ন্যাসিনী—

কিন্তু বিদুলা স্বামীকে চিনতে পারলো,—ভানুকে ডেকে বলল,—এই তোর বাবা—যা প্রণাম কর!

ভানু গিয়ে মৈনাকের পায়ে প্রণাম করে বলল—বাবা! উদ্বেলিত অশ্রুতে দুই গণ্ড ভেসে গেল মৈনাকের।—

কিন্তু কাটুবাবু বললেন—কিচ্ছু হয় নি—ওটা কি দৃশ্য হয়েছে নাকি? রামো! মিনিটখানেক হতভম্ব হয়ে থেকে চিন্ময় বলল—কি করতে হবে?

—শুনুন—ওটাকে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে; যে স্পিড্‌এ ড্রামা এল, তারপর ঐ কি তার পরিণতি! ভেবে দেখুন—দর্শক কি চাইবে এখানে!

—কি চাইবে?—চিন্ময় নিরীহের মত প্রশ্ন করলো!

—চাইবে একটা করুণ উত্তেজনা—মানে, ড্রামা—মানে গতি, মানে—কি বলবো—? চাইবে—মৈনাক কেঁদে গিয়ে বিদুলাকে জড়িয়ে ধরুক—অজস্র চুম্বন আর অসংখ্য কথার অমন সুন্দর যায়গাটা মাটি করে দিলেন—আঃ—একটা চমৎকার গানের শিচুয়েশ্যান!!

—আচ্ছা, আমি ভেবে রাখবো—বলে নিঃশব্দে উঠে আসছে চিন্ময়—মনে মনে বলল—অসহ্য!

—ভাববেন—ক্যামেরা ক্লোজ আপ করে দিল আর মৈনাকের যুগল মূর্ত্তি আসছে এগিয়ে—মার্ভেলাস!

—আর ছেলেটা?

—ওটার কিছু দরকার নেই—আমাদের ড্রামা এই দম্পতীর মিলন দেখানোতেই শেষ!

—কিন্তু মিলনের সেতু ঐ ছেলেটাই!

—ছেলে দেখতে কেউ আসে না সিনেমায়—বিদুলার প্রেম বিহ্বল সেক্স্ এ্যাপিলিং চেহারাই তারা দেখতে চায়—দেখবেন, বাহবা পড়ে যাবে!

মানুষের যৌনক্ষুধার দুর্ব্বলতাকে কাটুবাবু পয়সা রোজগারের প্রকৃষ্ট পন্থা মনে করে—ওর থেকে উচ্চ কিছু চিন্তা করবার শক্তি ওর নেই! কিন্তু চিণ্ময় এরকম দৃশ্য লিখতে কিছুতেই পারবে না। যতরাগ আর অভিমান গিয়ে পড়ল দূর্ব্বার উপর। সেই তো এই কাজে ওকে ঢুকিয়েছে!

বৌবাজারের কাছে একটা অফিস খুলেছে 'রঞ্জাবতী চিত্রালয়'—কাজেই দূর্ব্বার বাড়ীতে এখন আর বসতে হয় না—টালীগঞ্জেও যেতে হয় না রোজ। চিণ্ময় সকাল সাতটায় যায় অফিসে, বারোটার সময় দূর্ব্বার বাড়ীতে খেয়ে আবার দুটার সময় যায়—আর রাত্রি প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত কাজ চলে। রাত বারটার পর প্রায়ই চিণ্ময়কে হেঁটে ফিরতে হয় মানিকতলায়। তার টুইস্যানি-চাকরী আর নেই—এখন দূর্ব্বার বাড়ীতেই সে থাকে—খায়, শোয়।

বাইরের সেই বৈঠকখানা ঘরটাই ব্যবহার করে চিণ্ময়। পাড়ার লোকে জানে, চিণ্ময় নিকট আত্মীয় দূর্ব্বার—কিন্তু কি রকম আত্মীয়, কেউ খোঁজ রাখে না। কিম্বা রাখলেও কিছু বলে না সম্মুখে। দূর্ব্বা সিনেমায় ঢুকেছে, এর পর ওর সম্বন্ধে ভাল কিছু ভাববার থাকতে পারে—এ রকম লোক বাংলা দেশে কম। পাড়ার ছোকরারা নিশ্চয়ই আলোচনা করে—তবে অলখ্যে!

চিণ্ময় এসে পৌছাল বেলা প্রায় দুটো। দূর্ব্বা ভাত আগলে বসে আছে। এতো বেলা হয় না, আজ কাটুর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে দেরী হয়ে গেছে।

—কী ব্যাপার! এতো দেরী! দূর্ব্বা বললো চিণ্ময়কে দেখে!

—হুঁ, তুমি স্বচ্ছন্দে আমায় জমালয়ে পাঠাতে পারতে দূর্ব্বা, ওখানে কেন পাঠালে?

—কেন! কি হোল কি?

—কত আর বলবো! বলে জামা খুলে তেল মাখতে মাখতে চিণ্ময় ব্যাপারটা ওকে জানালো। হাসিমুখে সব শুনে গেল দূর্ব্বা—তার পর হেসেই বলল,

—যাও, স্নান করো—ও গল্পে তোমার নাম দেওয়া হবে না—যা ওরা চায়, লিখে দাও—তোমার কোনো দায়িত্ব ওতে নেই—তুমি মেশিন মাত্র এখানে।

—কিন্তু ছবিটা ভাল হবে না দূর্ব্বা—তোমার নামটা তো থাকবে। বদনাম, নাম নয়।

—না—আমার অভিনয় আমি ঠিকই করবো আর জেনে রাখ, এটা তোমার আমার শিক্ষানবিসীর কাল—কাজটা শিখবার জন্যই তোমায় পাঠিয়েছি।

—সর্ব্বত্রই ঐ রকম, শিখে করবো কি?

—নিজেরা করবো ভাবনা নেই, ফাইনেনসার হাতে রয়েছে! হাসলো দূর্ব্বা।

—কে গোবিন্দবাবু?

—হ্যাঁ কেন? মুখখানা অমন ওল সেদ্ধর মতন করলে যে! কথাটা ভাল লাগল না?

—এ খেলা বন্ধ কর দূর্ব্বা! চিণ্ময়ের আবেদন অশ্রুসজল হয়ে

—না! এই নারী তার খেলা কখনো বন্ধ করে না। এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ মহামায়ার খেলা, লীলা, মেয়েরা তার অংশ, তাই তাদের খেলা চলে অবিশ্রাম—স্বামী নিয়ে—সংসার নিয়ে; আমি না হয় সিনেমা নিয়ে খেলবো। যাও, স্নান কর, চিণুদা!

দূর্ব্বা রান্নাঘরে ঢুকলো গিয়ে—চিন্ময় কলতলায় স্নান করতে গেল। দূর্ব্বার দুঃসাহস ওকে বিস্মিত শুধু নয়, বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। সত্যি সে গোবিন্দর প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে তাহলে! সত্যি সিনেমাকোম্পানী খুলবে দূর্ব্বা! কেন? কী দরকার অত বড়লোক হবার? দূর্ব্বাকে নিয়ে চিন্ময় শান্তপল্লীতে গিয়ে বাস করবে—জীবন যেখানে জীবনামৃত পেয়ে ধন্য হয়—প্রাণ যেখানে প্রাণারামে পরিতৃপ্ত—আত্মা যেখানে আত্মস্থ! সেই দূর্ব্বার ঠাঁই—সেইতো তার আশ্রয়—কিন্তু না, দূর্ব্বাকে ওরা দেবমন্দিরের অঙ্গন থেকে তুলে এনে গড়ের মাঠের ক্লাব লনে রোপন করছে—বর্ষার জল নয়—রবারের পাইপ ভরা জলে ওকে স্নান করায়—একটু বেশী বাড়লে কাঁচির রোলার চালিয়ে ওর সাবলীল বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়—ওদের লন ওদের মনের মত হতে হবে—দূর্ব্বা সেখানে দূর্ব্বা নয়। কমনীয় 'লন'—রঙিন মরসুমী ফুল আঁকবার জন্য সবুজ ক্যানভাস মাত্র। ওর পবিত্রতা, ওর পূজার গৌরব, ওর 'অক্ষত' নামের মহিমা শহরের উগ্র গন্ধে আবিল হয়ে যাচ্ছে—হায়!

দূর্ব্বা ওকে খাইয়ে বিশ্রাম করতে পাঠালো এবং নিজে খেতে বসল। চিন্ময়ের আবার রঞ্জাবতীর অফিসে যাবার কথা কিন্তু দূর্ব্বা বলে যে অনেক বেশী খাটুনী হয়েছে, আজ আর যেতে হবে না। চিন্ময় ভাবতে লাগল কাটুবাবু তাকে যথাসময়ে অফিসে দেখতে না পেলে চটবে। কিন্তু দূর্ব্বা ওসব গ্রাহ্য করে না, বলল—ক্রীতদাস তো হয়ে যাওনি—যাও, ঘুমওগে। শরীর সত্যি ক্লান্ত ছিল। চিন্ময় শুলো, ঘুমিয়ে গেল।

আগামীকাল দূর্ব্বার স্যুটিং—যেতে হবে তাকে ষ্টুডিওতে। স্ক্রিপ্ট্ লেখা একবার শেষ হওয়ার পর স্যুটিং আরম্ভ হয়েছে কিন্তু কাটুবাবুর ইচ্ছেমত সেটাকে আবার পরিবর্ত্তন, পরিবর্জন, পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি

করা হচ্ছে—খাটুনিটা ও ডবল তেভবল হয়ে গেল তাই চিণ্ময়ের। পাঁচশো টাকার মধ্যে দুশো তাকে দেওয়া হয়েছে—বাকী কবে দেবে, কে জানে! দূর্ব্বা খাওয়া শেষ করে ভাবছিল এইসব কথা। মোহগ্রস্ত গোবিন্দ তিন লক্ষ টাকা দিতে চায় ছবির কোম্পানীর খুলবার জন্য—তার ভেতরের ইচ্ছেটা জানে দূর্ব্বা—দূর্ব্বাকে লাভ, এবং আরো অনেক কিছু লাভ। এ ব্যবসায় চললে বছরের মধ্যে কোটিপতি হওয়া বিচিত্র নয়—গোবিন্দ সেসব খবরও নিয়েছে। কিন্তু কাটুবাবু বা বরুণের কোনো সংস্রবে সে দূর্ব্বাকে রাখতে চায় না—এই সর্ত্ত। দূর্ব্বা এখনো সম্মতি দেয়নি ছবির ব্যাপারে এভাবে নামবার, তবে ভেবে দেখবে বলেছে। হয়তো সম্মতি সে দেবে—তাই চিণ্ময়কে ফাইনেনসারের কথা বললো।

খেয়ে হাত ধুচ্ছে—হঠাৎ আহ্বান এল দরজা থেকে—দূর্ব্বা ভাই;—এসো—এসো—দিদি!—দূর্ব্বা সাদর আহ্বান জানালো মায়াকে।—এতক্ষণে খেলে? মায়া বিস্ময়ান্বিতা হয়ে প্রশ্ন করলো—বেলা সাড়ে তিনটে।—হ্যাঁ—বন্ধুটির আসতে দেরী হোল—বসো দিদি—দূর্ব্বা মায়ার হাত ধরে ঘরে এনে বসাল এবং মুখের পানে চেয়ে শুধুলো—চিঠি পাওনি—না?

—না ভাই—বড্ড মন কেমন করছে। তিনি ভাল আছেন তো দূর্ব্বা?

ব্যাকুল বেদনাহত কণ্ঠস্বর। দূর্ব্বা জ্যোতিষী নয়—যোগিনীও নয়—ভবিষ্যৎ বলবার কোনো ক্ষমতা তার নেই—সবই জানে মায়া—তবু মানুষের মনের দুর্ব্বলতা—মায়া আশা করছে দূর্ব্বা বলবে—নিশ্চয় ভাল আছে—আর তাই শুনে মায়ার মন শান্ত হবে। দূর্ব্বা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল—নিশ্চয় ভাল আছেন—আমি বলছি, ভাল আছেন তিনি, তুই ভাবিসনে দিদি, তোর মত সতীর স্বামীর অমঙ্গল হবে না—

কিন্তু মায়ার চোখে জল—বলল—ঘরে কিছুতেই মন টিকলো না দূর্ব্বা,

দেওরটা স্কুলে গেছে—একা বড্ড খারাপ লাগছিল। চিঠি কেন এলনা ভাই ?

—ওর দুর্ব্বল শরীর, মা বুড়ো মানুষ—চিঠি হয়তো সময়ে লিখতে পারেননি ; বেশ দিদি, তুই একটা কাজ কর—কাল থেকে তিন দিন আমার স্যুটিং আছে, তোর নেই—মানে যুবরাণী হয়ে তোকে কাঁদতে হবে না—হাসলো দূর্ব্বা। এর মধ্য দেবরকে সঙ্গে নিয়ে তুই চলে যা না,—অসুবিধে কি ?

—সবকটা টাকাই ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি—আরতো এ্যাড্‌ভান্স পাব না।

—আমার কাছে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যা

—তোমার অসুবিধে হবে না ?

—কিছু না—টাকা না থাকলেও অসুবিধা হয় না আমার—আজই তুই চলে যা দিদি।

—ছঁ—কিন্তু তুই কেন এমন করে আমায় যেতে বলছিস দূর্ব্বা ? তিনি সত্যি ভাল আছেন তো ?

—নিশ্চয় ভাল আছেন, তুই সেটা নিজের চোখে দেখে আয়—আর ওকে বলিস, দূর্ব্বা নামে তোর একটা বোন জুটেছে—দধীচির অস্থি হাতে সে তোকে পাহারা দেবে। তোর পবিত্রতা রাখতে দূর্ব্বা দানবী হতেও প্রস্তুত। বস্ দিদি, আমি দাদুকে একবার দেখে আসি—তিনি হয়তো ডাকছেন !

দূর্ব্বা বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে এবং দাদুর ঘরে গিয়ে দেখলো, দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসে আছেন। দূর্ব্বা নমস্কার করলো তাদের।

—নমস্কার ! আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি আমরা। সেদিন ষ্টুডিওতে দেখেছি আপনাকে ; তারপর ঠিকানা সংগ্রহ করতেই যথেষ্ট বেগ পেতে হোল !

—কেন? রত্নাবতী সিনেমায় তো ঠিকানা আছে আমার।

—তাঁরা সেটা বললেন না, যাক্—আমরা যে জন্য এসেছি, ধরুন আমাদের পুরানো কোম্পানী; চার-পাঁচখানা বই করেছি আমরা। এখন যেটা করতে যাচ্ছি, তারই নায়িকার ভূমিকায় যদি আপনি যোগ দেন···

দুজন ভদ্রলোকের মধ্যে যিনি কথা বলছিলেন, তিনি একটু রোগা-পাতালা। তবে সুশ্রী চেহারার, চোখগুলি বেশ বড় উজ্জ্বল—রং ফর্সা! অপরব্যক্তি একটু মোটা, গোলগাল, চোখ ছোট, রং শ্যামল—বয়স দুজনেরই প্রায় ত্রিশ।

—আমি কিন্তু কয়েকটা বিশেষ সর্ত্ত করিয়ে তবে ওখানে যোগ দিয়েছি।

—জানি—সেকথা শুনেছি আমরা—যিনি আপনার ঠিকানা দেন, তিনিই সেকথা বলেছেন। ও সব সর্ত্ত আমরাও মেনে নিতে রাজি আছি, তবে—

—কি তবে?—বলুন?

—ষ্টুডিওতে অনেক সময় রাত্রে কাজ করা দরকার হয়—আর আউটডোর সুটিং থাকলে বাইরেও যেতে হয়। আমাদের বইএ দরকার হবে।

—আমায় বাদ দিন—বাইরে আমি যেতে পারবো না, রাত্রেও কাজ করবো না। দূর্ব্বা জবাব দিয়ে দাদুকে বলল, তামাক সেজে দেব, দাদু?

—না দিদি, থাক? বৃদ্ধ উত্তর দিলেন।

এতোক্ষণে সেই মোটা লোকটি বললেন, এ লাইনে যখন আসছেন, তখন অত কনডিশান করলে চলবে কেন? পারিশ্রমিক আমরা ভালই দেব।

— মাফ্ করবেন. কনডিশ্যান ছাড়া আমি যেতে পারবো না, তাছাড়া অন্য কারণ আছে।

—আচ্ছা আমরা মেনে নেব। কত পারিশ্রমিক আপনার? দৈনিক হারে তো?

—না, সম্পূর্ণ চরিত্রাভিনয়ে কিন্তু আমি এখন আর কোন চরিত্র অভিনয় করবো না।

—কেন?

কারণ আমি রাজকুমারী অতসী। শুনেছি আপনাদের নায়িকা বড় ঘরের মেয়ে। রাজকুমারী অতসীকে আমি হত্যা করতে পারি না।

—হত্যা করবেন কেন?

—কারণ আপনাদের নায়িকার চরিত্রের সঙ্গে অতসীর চরিত্রের কোথাও মিল নেই। মাফ্ করবেন।

— দূর্ব্বা নমস্কার জানিয়ে সেঘর ত্যাগ করলো। লোকদুজন হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল, তারপর উঠে গেল।

সেদিন রাত্রের ঘটনাটা সুবর্ণাকে শুধু আঘাতই করে নি, উত্তেজিত করে তুলেছে। অনেকে আছে, যারা আহত হলে আঘাতটা সামলাবার জন্যই ব্যস্ত হয়। আবার অনেকে প্রতিঘাত না করা পর্য্যন্ত শান্ত হয় না। সুবর্ণা শেষোক্ত শ্রেণীর মেয়ে। বাথ রুমে ঢুকে নিজের অপরিসীম লজ্জাকে ও সম্বরণ করলো, তারপর দুচোখে যে জ্বালা ওর জ্বলে উঠলো,—তাতে সংসার ভস্ম হয়ে যেতে পারে। সুবর্ণা মুখের রঙপাউডার ধুয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে অন্য একটা ঘরে এলো গিয়ে—মেয়েটাকেও ছুঁলে না।

উত্তেজনায় অন্তরটা কেঁপে উঠছিল ওর, দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় ও তাকে তখনকার মত সম্বরণ করলো, কিন্তু সম্পূর্ণ শান্ত হতে পারলে না। অনেক

রাত্রে ঘুমুলো সুবর্ণা, তাই উঠতে বেলা নয়টা বাজলো ; নতুন কিছুই নয়, এরকম বেলায় শয্যাত্যাগ ওর নিত্যকার ব্যাপার।

প্রভাতী চা পান করতে করতে সুবর্ণা প্রশ্ন করে জেনে নিল, বরুণ অনেকক্ষণ পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করে খুকীকে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছে মোটরে। এরকম বেড়াতে যায় বরুণ যখন তার খেয়াল হয়। খুকীটা বরুণের একলার, সুবর্ণার যেন যেন ওতে কিছুমাত্র অংশ নেই। না—সুবর্ণা নিজেই তার অংশ ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু সুবর্ণা খুকীর কথা ভাবলো না—ভাবতে লাগলো, বরুণ কেন তাকে কাল প্রত্যাখ্যান করলো। বরুণের অন্য যতই দোষ থাক—স্বামী হিসাবে সে উদার এবং ভদ্র। অনর্থক আঘাত করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। অতএব বিশেষ কোনো হেতু আছে যার ক্রিয়ার এই প্রতিক্রিয়া—কী সেটা ?

মানুষ নিজের দোষ সহজে দেখতে পায়, না দেখতে চায় না ; মনের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে জীবন দেবতা অনেক আশ্চর্য্য খেলা খেলে যান। সুবর্ণাও তার নিজের দোষত্রুটি দেখবার চেষ্টা করলো না। সে ক্লাবে যায়, পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে মেলা মেশা করে, রাত বারোটা রাজিয়ে বাড়ী ফেরে—যখন-তখন যেখানে সেখানে চাঁদা দেয়, সভ্যা হয়, মিটিং করে ঘরের থেকে বাইরের জগৎ তার কাছে অনেক বেশী বিস্তৃত। ঘরে একটা স্বামী সংসার আছে এবং তাদের জন্য কিন্তু কর্ত্তব্যও আছে, সুবর্ণার একথা মনে থাকে না। প্রসাধিতা এবং প্রাতীক্ষিতা পত্নীকে দেখে পতির মনে যে স্নেহ কামনা জাগে, যে প্রেমসুধা ক্ষরিত হয়, গভীর রাত্রির কোমলতার মধ্যে বহু দর্শকের উগ্র দৃষ্টিতে উচ্ছিষ্ট সেই নারীকেই ঘৃণা করা অস্বাভাবিক নয়, এই অতি সহজ কথাটা সুবর্ণা বুঝতে চাইল না। কারণটা এর কিন্তু অত্যন্ত সহজ। সুবর্ণা অত্যাধুনিকা মেয়ে, আজকার অভিনয়ের অসাধারণ সাফল্য ওকে অভিভূত করে দিয়েছে

প্রশংসায়, করতালিতে, কথার উচ্ছ্বাসে। সুবর্ণা নিজের সেই অসাধারণত্ব স্বামীর কাছে প্রকাশ করে প্রশংসা পেতে চেয়েছিল—যাকে ওর ভাষায় বলে 'কমপ্লিমেণ্ট!' কিন্তু ভাববার অন্য যে একটা দিক আছে—সুবর্ণা সেটা ভাবে নি। কিন্তু ভাববার মত মন ওদের নেই, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে 'গেঁছিয়োবিকা'; সুবর্ণা সেই বেশে এসেছিল স্বামীর সান্নিধ্যে; সুবর্ণা সেটা জানে না, জানে বরুণ। তার পড়া আছে। অন্তরের অভ্যন্তরে বরুণ আধুনিক নয়, অতিমাত্রায় প্রাচীন পন্থী। সুবর্ণা সেটা আবিষ্কার করতে চায় নি কোনো দিনই, ওর প্রয়োজনাভাব।

কিন্তু সুবর্ণা তো শুধু 'কমপ্লিমেণ্ট' পাবার জন্যই স্বামীর কাছে যায় নি; প্রেমের একটা অপরূপ রূপ—একটা অশ্রুত রাগিনী—একটা অনাস্বাদিত আকর্ষণও ছিল তার তখন—একটি আশ্চর্য্য নারীর—পুণ্যময় স্পর্শের প্রভাব সেটা। সতীত্বের সংজ্ঞা সুবর্ণার জানা আছে, পছন্দ সে করে না; কিন্তু এই নতুন সংজ্ঞা তার জানা ছিল না। মনে পড়ল, সতীত্ব নায়কের লেখক এক জায়গায় বলছেন—'কে কবার বিয়ে করেছে, সতীত্ব যাচাই করবার সেইটাই নিরীক নয়, কে কতখানা নিষ্ঠায় সংসার করে, কত গভীর তার প্রেম, এবং তার বর্ত্তমান জীবনে সে স্বামীপরায়ণা এইটেই নারীত্বের সত্য তুলাদণ্ড। তা না হলে অহল্যা, দৌপদী, কুন্তীর সতীনাম তালিকা থেকে বাদ যেত। কবে কার জীবনে কি ঘটেছে তা নিয়ে সতীর বিচার হয় না—তার বর্ত্তমান প্রেম সত্য হলেই সে 'সতী'।'

সুবর্ণা প্রাতঃকালীন বেশবাস পরিধান করতে করতে ভাবলে কথাগুলো। 'তার বর্ত্তমান প্রেম সত্য হলেই সে সতী'—তার প্রেম সত্য নয় কেন? হ্যাঁ সত্য, নিশ্চয়ই সত্য; গত রাত্রিতে সে পরিপূর্ণ প্রেম নিয়েই এসেছিল বরুণের কাছে কিন্তু বরুণ তাকে অপমান করলো। কেন? কারণ ঐ মেয়েটা। ঐ যে ফটোর মধ্যে রয়েছে।

কী ওর নাম? কে ও? থাকে কোথায়? জানতেই হবে। সুবর্ণা যেমন করে হোক জানবে—জানবেই। নিঃশব্দে সুবর্ণা বেরিয়ে গেল মোটরে। কাটুবাবুর ফ্ল্যাট তার চেনা; দূরও বেশী নয়; সুবর্ণা রিপাল বাড়ীটার 'লন'এ গাড়ী দাঁড় করিয়ে খট্ খট্ করে উপরে উঠে গেল হিল-ওয়ালা জুতো পায়ে; বাড়ী নয়, প্রাসাদও নয়, পারাবত নিবাস। পাঁচতলা বিল্ডিং—তার সবকার উপর তলায় থাকে কাটু। ফ্ল্যাট খানা ভাল, মূল্যবান এবং মূল্যবান আসবাবও আছে সেখানে। বরুণ বা সুবর্ণা শুধু নয়, বহু ধনীর শুভাগমন হয় আজকাল কাটুর ঘরে; তাই তার ঘর যথেষ্ট মার্জিত রাখে সে। দুখানা মাত্র ঘর, একটা শোবার, আরেকটা বসবার এ সংলগ্ন স্নানাগার, সৌচাগার, যেমন হয়ে থাকে এসব বাড়ীতে, তাই। সামনে বারান্দা, পিছনে ব্যালকনি, ফুলেরটব গোটা কয়েক দরজা জানালায় রঙিন পর্দ্দা—যা কিছু বর্ত্তমান সভ্যতার বিশেষত্ব। তার সব আছে টেলিফোন, রেডিও, পাখা···ইত্যাদি।

সুবর্ণা দরজায় টোকা দিল, তৎক্ষণাৎ জবাব এল ইংরাজিতে—ভেতরে আসুন! সুবর্ণা ঢুকেই দেখতে পেল,—কাটু বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। আয়নাতে সুবর্ণার ছায়া দেখে ফিরে দাঁড়ালো চিরুণী হাতে। বিস্ময় অবশ্য তত বড় নয়—কারণ সুবর্ণা এখানে স্বামীর সঙ্গে দু একবার এসেছে, তবে একা এই প্রথম। কিন্তু আসলে কাটুর বাক্‌রোধ হয়ে গেছে—শুধু চিরুণী সমেত হাত তুললো সুবর্ণাকে নমস্কার করবার জন্য।

—নমস্কার!—বলে হাসলে সুবর্ণা মৃদু—এবং বসলো বড় একখানা চেয়ারে।

—একা? নাকি বরুণও সঙ্গে আছে?

একাই—বিশেষ দরকার আপনার সঙ্গে আমার। বসুন—হুকুম করলো সুবর্ণা।

—চা আনতে বলে দিই—বলেই কাটুবাবু আধ মিনিটের জন্য বাইরে গিয়ে ফিরে এসে বসলো। চিরুণীটা তখনো তার হাতে। সুবর্ণা আরেকটু হেসে বলল,

—নতুন ছবিটার নায়িকা কে আপনাদের ?

—নায়িকা দুজন ? কেন ? আপনার হাতে কেউ মেয়ে আছে নাকি ?

—না—যা প্রশ্ন করছি, অনুগ্রহ করে জবাব দিলে খুসী হই।

—নায়িকার নাম দূর্ব্বা—

—দূর্ব্বা ! থাকে কোথায় সে ?

—থাকে মানিকতলার সাত নম্বর সম্বুদ্ধ লেনে—কেন বলুন তো ?

—তাকে আমি দেখতে চাই ! অসামান্যা সুন্দরী নাকি সে ?

—আপনার থেকে নয়—কাটু হাসলো একটু !

—সত্যি বলুন ; আমার রূপের প্রশংসা শুনতে আসিনি এখানে !

—সত্যিই বলছি—কাটু আবার হাসলো—আপনার মত মোহকরী রূপ তার কিছুই নেই—দেবীর মতন দেখতে ; তবে আমাদের চরিত্রের জন্য ঐ রকমই দরকার।

—আমার রূপটা খুব মোহকরী নাকি ?—সুবর্ণা প্রশ্নের সঙ্গে তীব্রভাবে তাকালো। কাটু ঠিক বুঝতে পারছে না, সুবর্ণা চটছে কি খুসী হচ্ছে। কিন্তু সে অতিশয় দুঃসাহসী। তবু কথাটা বলবার পূর্ব্বে একবার ভেবে নিয়ে বলল—

—সুবর্ণাদেবি, আপনি যে কোথায় নারী, কোথায় আপনার মানবীত্ব, বরুণ আবিষ্কার করতে পারে নি। আদর্শের দিকে 'দেবী' দেখতে শুনতে বেশ, কিন্তু মানুষের কাছে মানবীই বড়—বৃহৎ, মহৎ, মোহকরী আর মধুর !

—সত্যি সাহিত্যিক হয়ে উঠলেন কাটুবাবু ?

—না—হই নি, হতে চাইনে। সাহিত্যিক করে কল্পনার জগৎ নিয়ে বিচরণ আর আমরা করি বাস্তব মানুষ নিয়ে কারবার—সাহিত্যিকের ধর্ম্ম আদর্শবাদ আর আমাদের ধর্ম্ম···

—বাস্তববাদ···

—না দেবি—ওটা আধুনিক কথা। বাস্তব নিয়ে কাজ করি বলেই আমরা বাস্তববাদী নই—আমরা আবিষ্কারবাদী, বিশ্লেষক বৈজ্ঞানিক। মানুষের দেহমনের অসীম রহস্যের ইন্দ্রজালকে আমরা দেখতে চাই, সেখানে কি আছে।

—আমার মধ্যে কি দেখলেন?—প্রশ্নটার সঙ্গে সুবর্ণা সুমিষ্ট শব্দিত হাসি হাসলো।

—দেখেছি, আপনি সব স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও বন্দিনী। আপনার মানবী মহিমা মর্য্যাদা পেল না বরুণের কাছে, বরং অপমানিত হোল, যার ফলে আজ আমার ফ্লাটে আপনার আবির্ভাব ···

—অর্থাৎ?—তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলো সুবর্ণা,—কি বলতে চায় কাটু?

—অর্থাৎ বহুপুষ্পলোভী বরুণ দেখতে পেল না যে তার বাড়ীতে গোলাপ ফুল ফুটে আছে, তুচ্ছ দূর্ব্বার জন্য আগ্রহ অনাবশ্যক। গোলাপ অকারণ অপমানিত হচ্ছে। বেয়ারা চা নিয়ে এল, কিন্তু সুবর্ণা সেদিকে না তাকিয়ে বলল অকস্মাৎ,

—কথায় এত অলঙ্কার দিতে কোথায় শিখলেন কাটুবাবু? কোনো সাহিত্যিক সংগমে গিয়ে পড়েছেন নাকি?

—হবে—কাটু ট্রেখানা এগিয়ে দিতে দিতে বলল।

—কিন্তু আপনাদের সিনেমা জগতে তো এ সব ভাষা চলে না—সেখানে চলে চিৎপুরী হিউমার—আর চোর-চণ্ডালের ভাষা—ব্যাপার কি?

—সিনেমা এতকাল শবের মত ছিল দেবি—মৃত দেহে আকার

নিষ্ফল—তাই তাকে সাজাতে দরকার মৃত্তিকা, মার্ব্বেল, মালা আর মায়াকান্না!

—অনুপ্রাসের ভাষাটা সত্যি আপনি আয়ত্ত করেছেন—সুবর্ণা না হেসে পারলো না—কিন্তু কোথায় শিখলেন?—শুধুলো।

—সেকথা থাক—চা খান—আমি এখানে অলঙ্কার দিয়ে কথা বলছি, কারণ আমি সিনেমার শবদেহের সঙ্গে কথা বলছিনে - সত্যিকার একটি জীবিত মেয়ের সঙ্গে কথা বলছি—ভাষার অলঙ্কার যেখানে ভাবকে সুন্দর করে!

—চমৎকার বলেছেন? আমি তাহলে জীবিত মেয়ে অর্থাৎ মহৎ মানবী?

—নিশ্চয়ই! আপনার মহত্বটা প্রকাশ থাকলেও মানবীত্ব মূল্য পেল না, কারণ আপনাকে আবিষ্কার করার শক্তি বরুণের নেই। কারণ বরুণ নারীত্ব চায় না, চায় নূতন। অথচ আপনিই নিত্য নূতনরূপে তাকে মুগ্ধ করতে পারতেন—সে শক্তি আছে আপনার।

—কিসে বুঝলেন?—চা-টা প্রায় শেষ করে সুবর্ণা শুধুলো।

—সুবর্ণা দেবি—কাটু বললো—পুরুষের চোখে এটা ধরা পড়তে দেরী হয় না। বরুণ প্রেমিক হতে পারে, পুরুষ নয়, শিক্ষিত হতে পারে সাহসী নয়, সুন্দর হতে পারে, সুদৃঢ় নয়—কাটু একটু ইতঃস্তত করলো—সোনার গহণায় নারীকে সাজাতে পারে—কিন্তু তার নারীত্বকে আকর্ষণ করে আনতে সে অক্ষম—তাহলে ধনী স্বামী তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রেম লাভ করতে পারতো।

—কে সক্ষম?—সুবর্ণার কণ্ঠে প্রশ্নটা দুর্ব্বল হয়ে আসছে যেন?

—সুদৃঢ় পেশী—যাকে বলে আয়রন নার্ভ! অলঙ্কার নারীর আয়ত্তে, পুরুষের আয়ত্তে অলঙ্কৃত বীর্য্য—নারীত্ব যেখানে নত হয়ে বন্দনা জানায়।

কাটু অকস্মাৎ সুবর্ণার বাঁহাতখানা তুলে নিয়ে বললো,—শুনুন সুবর্ণা দেবি—দুর্ব্বার খোঁজ করার মত হীনতা আপনার কেন জাগলো? সামান্য একজন অভিনেত্রী সে—আপনি অভিজাতা, অসাধারণীয়া—যে কোন পুরুষের বাঞ্ছিতা—কেন আপনি এই অপমান সহ্য করছেন?

সুবর্ণা যেন নির্ব্বোধ বনে গেছে। একি করলো সে? কেন এল ও এখানে? কিন্তু কাটুর কামনাতীক্ষ্ণ স্পর্শ সুরার মত ওর শিরায় সঞ্চারিত হচ্ছে, বলল, —ছাড়ুন—হাতটায় ব্যথা হয়ে গেল।

—ব্যথার দরকার—"ইক্ষু কি দেয় রস না পীড়িলে" কাটু অকস্মাৎ ভারতচন্দ্রকে টেনে আনলো। কিন্তু লাইনটা সুবর্ণার পড়া আছে। উঠে সে বলল কাটুকে, আপনি একটু বেশী ভাবেন আমার সম্বন্ধে কাটুবাবু!

—ভাবি—তার কারণ অতিশয় সহজ, যেখানে আপনি মহিমান্বিতা নারী, বরুণ সেখানে পৌছাতে পারেনি—পারবেও না কোন দিন; আপনি ব্যর্থ হচ্ছেন।

—আপনি সার্থক করতে পারতেন নাকি? অকস্মাৎ অতর্কিত-ভাবে কথাটা বেরিয়ে গেল সুবর্ণার মুখ দিয়ে। ওর আজন্ম-অভ্যস্ত চটুল বচন ওকে নিষ্ঠুর ভারে বিড়ম্বিত করবে—বুঝতে পেরেই চেয়ার থেকে উঠে যাচ্ছে সুবর্ণা,

—অনেক ধন্যবাদ চা খাওয়ানোর জন্য—চল্লাম এখন।

—না বসো—কাটু ত্বরিতে ওর হাতখানা ধরে ফেললো, বলল, তোমার ব্যর্থ আসা যাওয়ার বেদনা তোমার থেকে আমি বেশী অনুভব করি সুবর্ণা—বসো তোমায় আজ একটা কথা বলবো—দীর্ঘ দিনের এই প্রতীক্ষিত সুযোগ আজ এসেছে আমার···

সুবর্ণাকে টেনে কাটু চেয়ারে বসিয়ে দিল আবার; তারপর কত কি যে সে বলে গেল, সুবর্ণার কিছুই প্রায় মনে পড়ে না। তার শুধুই

মনে পড়তে লাগলো, স্বামীর উপর অভিমান করে সে এই লোকটির কাছে দুর্ব্বার ঠিকানা জানতে এসেছিল,—তাঁর আগমনটাকে কাটু আবির্ভাব এবং অভিসার মনে করেছে! হয়ত তারও বেশী—আত্মদান, আত্মসমর্পণ। একটুক্ষণ পরে সম্বিতলব্ধা সুবর্ণা বলল,—ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন কাটুবাবু, আপনার কাছে আসা আমার ভুল হয়েছিল, ছাড়ুন।

—না সুবর্ণা, ভুল তোমার হয়নি; তোমার অন্তঃপ্রকৃতির অনায়াস প্রকাশ এটা—বরুণের প্রেম তোমায় সুখী করতে পারেনি—এ সত্য আমি জানি—তবু আমি চেয়েছিলাম, বরুণ তোমায় ভালবাসবে, কোন দিন না কোনো দিন এবং তুমি সুখী হতেও পারবে। কিন্তু তা হবার নয়; বরুণ মায়া-মৃগের পানে ছুটছে···বসো আরেকটু, আমার অনেক কথা বলবার আছে।

—থাক ও আর বলে কাজ নেই, বলেই সুবর্ণা ঝটিতি বেরিয়ে পড়ল বারান্দায়—তারপর কোনদিকে সিঁড়িটা, দেখতে গিয়ে দেখলো সামনে খুকীকে কোলে নিয়ে বরুণ দাঁড়িয়ে।

স্তম্ভিত সুবর্ণা বিবর্ণা হয়ে যেতে পারতো, কিন্তু আশ্চর্য্য ওর শিক্ষা, সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে নিজকে স্থির করে নিয়ে বলল, সকাল থেকে কোথায় ঘুরছিলে মেয়েটাকে নিয়ে? দাও। সুবর্ণা হাত বাড়াল খুকীকে কোলে নেবার জন্য, কিন্তু বরুণ মেয়েকে তেমনি করে ধরে বলল,—তোমার এখানকার কাজ হয়েছে সুবর্ণা?

—হ্যাঁ—না, এখানে কি কাজ? খুকীকে খুঁজতে এসেছিলাম। দাও ওকে·····

—থাক! শাড়ীখানা ময়লা হয়ে যাবে—বলেই বরুণ পাশকেটে চলে এল খুকীকে নিয়ে কাটুর বসবার ঘরে। কাটু দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার কাছে। বরুণ নির্নিমেষনেত্রে দেখতে লাগলো কাটুর হাস্য-মধুর মুখখানা—পারিজাত যেন!

—মেয়েটাতে আমারও ভাগ আছে—সুবর্ণা সরোষে গর্জন ছাড়লো বাইরে থেকে।

—না সুবর্ণা, তোমার মত ও হয়নি—সবটাই আমার। গর্ভে ওকে ধারণ করবার জন্য তোমায় যথেষ্ট মূল্য দিচ্ছি—এই স্বাধীনতা, এই স্বেচ্ছাচারিতা, এই স্বৈরাচার—তার একটা মাত্র কারণ, তুমি আমার সন্তানের জননী—যাও, বাড়ী যাও! আমার এখানে কাজ আছে অনেক!

সুবর্ণা বলতে চাইল যে সে এখানে শুধু দূর্ব্বার ঠিকানা নেবার জন্যই এসেছিল, অন্য আর কোনো কারণ নেই—কিন্তু বরুণের কথাগুলোতে তার আভিজাত্য-রুচি, অভিমানী-মন, নিদারুণ আহত হোলো—কিছুই সে বললো না, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল শুধু বরুণের দিকে নয়, কাটুর পানে কঠোর একটা দৃষ্টি হেনে।

বরুণ চেয়ারে বসে বলছে কাটুকে—

—আজকার সুটিং-এর জন্য সব তৈরী তো কাটু? অতসীর সঙ্গে আজ আমার অভিনয়; দেখতো আমার পার্টটা।

কাটু কৈফিয়তের মত বলতে চাইল,—সুবর্ণা দেবী এসেছিলেন দূর্ব্বার ঠিকানা জানতে……

—থাক ওর কথা—দেখ, আমার পার্ট ঠিক হচ্ছে কিনা—খুকীকে চেয়ারে বসিয়ে বরুণ অভিনয়ের রিহার্সেল আরম্ভ করলো।

নতুনের এই তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে নিত্য নূতন ফিল্মকোম্পানী জন্মাচ্ছে আর মরছে, কিন্তু 'রঞ্জাবতী ফিল্ম'-এর বরাত ভাল,—ছবিখানা ভালই হচ্ছে ওদের। নগদ টাকা পাওয়ার জন্য ষ্টুডিওর তরফ থেকে ওদের যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া হয়—ডাইরেক্টার কাটুবাবু নিজে অংশীদার—

তাই ধনিক-ডোবাবার মতলব তার নেই—খরচপত্র বেশ হিসাবমত চলে। অনর্থক অপব্যয় যেটুকু হয়েছে, তা দুর্ব্বার ব্যাপারে।

কিন্তু দুর্ব্বা অসাধারণ ভাল অভিনয় করছে। রাজকুমারী অতসীকে আচারে-ব্যবহারে, ভাবে-ভঙ্গীতে-ভাষায় চিনবার উপায় নেই যে সে নিতান্ত দরিদ্র জনৈক পণ্ডিতের নাতনী—পরণের কাপড় অভাবে বাইরে বেরুতে পারতো না এই মাসখানেক পূর্ব্বেও।

স্ক্রিপ্ট লেখার ব্যাপার নিয়ে চিন্ময় অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল কিন্তু দুর্ব্বা মাঝে পড়ে সে গোলযোগ মিটিয়ে দিয়েছে; অবান্তর দৃশ্য বা অসম্ভব জায়গায় গান ইত্যাদি প্রচলিত বস্তু বাদ দিতে হয়েছে কাটুকে—কারণ দুর্ব্বা বরুণের দৃষ্টি-স্নিগ্ধা, আর কাটুর নৈতিক দুর্ব্বলতা ভালভাবেই প্রকাশ হয়ে গেছে বরুণের কাছে।

হাজার হোক্ গরীবের ছেলে—বরাতজোরে নাম করেছে এবং ঐ বরাতজোরেই বরুণের মত বন্ধু পেয়েছে—নইলে ত্রিশ হাজার টাকার শেয়ার-হোল্ডার হবার মত কোন যোগ্যতা তার কখনো হোত না। কিন্তু কাটুর মনের মধ্যে যে অগাধ আশা সঞ্চিত হয়ে উঠছে সেই মুহূর্ত্ত থেকে, তার বিরাটত্বের দিকে তাকিয়ে ও অবাক্ হয়ে যাচ্ছে—ভাবে—না, এ হবার নয়, এ আশা পূর্ণ হবে না। কিন্তু আশা নামক অবাস্তব বস্তুটা আশাই—ওকে কেউ ছাড়তে চায় না—কাটুও চাইল না।

ওদিকে গোবিন্দর অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠেছে। প্রায়-ষোড়শী কন্যার জন্য পাত্রের অনুসন্ধান স্থগিত রেখে সে ক্রমাগত দুর্ব্বার দরজায় ধর্ণা দিচ্ছে, কবে ফিল্ম কোম্পানী খোলা হবে—কে হবে পরিচালক আর কি কি অভিনীত হবে—এবং—গোবিন্দ মনে মনে ভাবে, কোনো একটা ভূমিকায় তাকে নামানো যায় কি না, দুর্ব্বাকে বলবে।

গোবিন্দর এষ্টিমেট পাঁচ লক্ষ টাকা! তিন লক্ষ সে এখুনি দিতে

চায়—বাকীটা দরকার হলেই দেবে। দূর্ব্বা এবার কাজে নামুক; কিন্তু দূর্ব্বা গা' মাখছে না। কারণটা জানবার জন্য প্রশ্ন করে গোবিন্দ জেনেছে যে, সিনেমার সব ব্যাপার ভাল ভাবে না জেনে দূর্ব্বা এগুতে চায় না; পরের টাকা নষ্ট করবার তার ইচ্ছে নেই।

গোবিন্দ কয়েকদিন গিয়ে রঞ্জাবতী নাটকের 'সুটিং' দেখে এসেছে; ওখানেই সে বড়াই করে' প্রকাশ করে ফেলেছিল যে, সে নিজেই একটা কোম্পানী খুলবে। এই নির্ব্বুদ্ধিতার ফল ভাল ভাবেই ভোগ করছে গোবিন্দ এখন। মধুলোভী মৌমাছির দল গোবিন্দ-রূপী মধুচক্রে হানা দিতে আরম্ভ করেছে—হবু ডিরেক্টার—ওদের দালাল, ভবিষ্যৎ আর্টিষ্ট এবং অতীত দেউলেগণ! গোবিন্দ কিন্তু ভুলবায় লোক নয়—সে সকলকে বলে দিল—দূর্ব্বা ডাইরেক্টার এবং প্রধানা অভিনেত্রী না হলে সে নামবে না। অতএব দূর্ব্বার বাড়ীতেও হানা দিতে লাগলো বহু ব্যক্তি। বিরক্ত দূর্ব্বা বাইরের ঘরে এসে চিণ্ময়কে বলল—

—তোমার মত দ্বারয়ানকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হয়; ওদের ঢুকতে দাও কেন?

—দাদুর কাছে আমি ওদের পাঠিয়ে দিই দূর্ব্বা!—চিণ্ময় ভয়ে ভয়ে জানালো।

—দাদু এখন আর আমার অভিভাবক নয়, জানো মুখ্যু? এখন আমার অভিভাবক তুমি। ওদের ঝামেলা দাদুর ঘাড়ে আর চড়িও না; তাঁকে শান্তিতে মরতে দাও এবার।

—ওরা জানে না, আমি তোমার কে।—ভাবে, আমি তোমার স্পেশ্যাল একজন!

—ওদের বলে দিও, তুমি আমার সব!—দূর্ব্বা ত্বরিতে ভেতরে চলে এল। আর চিণ্ময়! হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো খোলা দরজাটার দিকে!

কিন্তু এভাবে ক'দিন চালাতে পারবে চিণ্ময়! অন্তরের এই অন্তহীন আকর্ষণকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য ওর নেই। দূর্ব্বা জানে ওর দুর্ব্বলতা, এবং জানে বলেই এমন করে তাকে নিয়ে খেলাচ্ছে!—কিন্তু দূর্ব্বা কি সত্যি খেলাচ্ছে তাকে নিয়ে? না—চিণ্ময় ভুল করছে। নিদারুণ ভুল। এই অসাধারণীয়া আশ্চর্য্য নিষ্ঠাবতী তরুণীর বাক্য এবং কর্ম্ম দেখে তার চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করা একান্তই ভুল হচ্ছে চিণ্ময়ের।

অকস্মাৎ শাড়ীখানা বদলে দূর্ব্বা এসে বলল চিণ্ময়কে,—চলো, তোমার স্যুট্ হয়তো তৈরী হয়ে গেছে, নিয়ে আসি……

—এ সময় ট্রামে বড্ড ভিড় থাকে দূর্ব্বা—তার ওপর আজ নাকি খেলা আছে—ফুটবল খেলা, মানে কলকাতার লোকের হিষ্টিরিয়া···চিণ্ময় জবাব দিল।

—ট্যাক্সিতে যাব—অভাব কি আমাদের—যাও, কাপড় পর—হুকুম হল।

নিঃশব্দে উঠে চিণ্ময় কাপড় পরতে গেল; দূর্ব্বা ওর টেবিল থেকে খবরের কাগজ তুলে চোখ বুলিয়ে চলেছে—সিনেমার বিজ্ঞাপন—"—আসছে, আসছে, আসছে—দুর্ব্বার গতিতে দূর্ব্বা চৌধুরী—"

দূর্ব্বার একখানা ছবি ওই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে। কী বিশ্রী বিজ্ঞাপন! কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূর্ব্বা, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার কুড়িয়ে নিল—ব্যবসাদারের বৈষয়িক বিজ্ঞাপন—বলবার কি আছে? দূর্ব্বার রূপটাকে দেখিয়ে ওরা অর্থ অর্জন করতে চায়—দেহপসারিণী না বলে রূপপসারিণী বলা উচিৎ। হ্যাঁ—রূপপসারিণী দূর্ব্বা আজ—রূপ দেখিয়ে টাকা রোজগার করতে হচ্ছে তাকে—যদিও দেহ তার এখনো অকলঙ্কিত!—কিন্তু···

—চলো!—চিণ্ময় ধুতি-পাঞ্জাবী পরে এসে দাঁড়ালো। দেখলো দূর্ব্বা

এক নিমেষ তাকে, তারপর কিছু না বলে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ট্যাক্সিতে উঠলো দুজনে। সহরের রাস্তার দুপাশে পোষ্টার—'কুমারী দূর্ব্বা চৌধুরী—' যেন নামাবলী পরেছে সারা কলকাতা দূর্ব্বার নামের। লেখা রয়েছে, 'শ্যামস্নিগ্ধা সুরূপার বিচিত্র বিস্ময়কর আবির্ভাব—দূর্ব্বা চৌধুরী……'

সেই রূপ—সেই রূপোপজীবিনী দূর্ব্বা ট্যাক্সিতে। কুমারী দূর্ব্বা! হ্যাঁ, কুমারী কথাটা তো মিথ্যা নয়—দূর্ব্বার কৌমার্য্য অটুট, অনাঘ্রাত, অক্ষত! পাশে-বসা চিণ্ময়ের দিকে চেয়ে দূর্ব্বা বলল,—

"কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী" নয়, চিণুদা, "কুমারী দূর্ব্বা চিণুদার সাথে"

—হ্যাঁ, কি তার হয়েছে? তুমি তো কুমারীই! মিথ্যে লেখেনি ওরা কিছু!

—তোমার স্বার্থটা আত্যন্তিক হয়ে উঠছে চিণুদা'—ভাষাটা আন্তরিক হোল না!

—অর্থাৎ!

—অর্থাৎ তুমি চাইছ, আমি কুমারী দূর্ব্বা হই! তাহলে তুমি আমায় বিয়ে করতে পার—কেমন? কিন্তু তুমি জান আমি বি-ধ-বা—

—তোমাকে বিয়ে করা চলে না দূর্ব্বা, তুমি দেবচরণে উৎসর্গিতা দেবদাসী—বিয়ে তোমায় দেবতারাই করতে পারে—আমি নিতান্তই মানুষ! তাই মানুষের দুর্ব্বলতা আমার আছে—আমি কামজয়ী শিব নই, রিপুঞ্জয়ী ঋষি নই!

—তোমায় আমি নীলকণ্ঠ করবো চিণুদা, আকণ্ঠ বিষ পান করে অমৃতই পরিবেশন করবে।

——না দূর্ব্বা, থাক; মানুষের জগতে মৃত্যুঞ্জয়ের থেকে বেশি দরকার মৃত্যুশীল মানুষের।

—কেন?…দূর্ব্বা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলো।

—কারণ, লৌকিক জগতে শিব অলৌকিক, অপ্রয়োজনীয়—তাছাড়া অবাস্তব।

—শিব অলৌকিক নয় চিণুদা, সম্পূর্ণ লৌকিক এবং বাস্তব। পুরুষের যে শ্রেষ্ঠ পৌরুষ, যে বীর্য্যমহিমা, যে সাধনার সংযম, যে সত্যাচার, তাই শিবময়—নারী-পুরুষের ক্লেদপঙ্কিল কামার্ত্ততা সেখানে ভস্ম হয়, তাই তিনি মদন-ভস্মকারী—বিশ্বের সব বিষ বহনক্ষম বলে তিনি নীলকণ্ঠ, প্রেমের অমৃতক্ষরণে তিনি সব-কিছুকে অ-মৃত করেন, তাই মৃত্যুঞ্জয়; মৃত্যু এখানে দেহের মৃত্যু নয়, এ মৃত্যু মনের ক্লেদাক্ত কামনার মৃত্যু!

—থাক দূর্ব্বা—তোমার কথাগুলো অমৃতবৎ লাগছে না, বিষ মনে হচ্ছে!

—পান কর আকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ হয়ে যাবে!—দূর্ব্বা ওকে ছুঁলো একটু!

—থাক—চিণ্ময় কিছু তফাতে সরে বসে একখানা বই খুললো।

হাসছে দূর্ব্বা!

বিড়ালের ইন্দুর নিয়ে খেলা, অথবা বাঘের খেলা বাচ্চাদের নিয়ে, কিম্বা···চিণ্ময় আর মাথা তুললো না। দোকানের কাছে গাড়ী আসতেই দুজনে নেমে গেল। পোষাক তৈরী আছে, প'রে দেখে নেবে চিণ্ময়—দূর্ব্বা বলল এতোক্ষণে,—ঠিক ফিট্ করেছে কি না, দেখে তুমি রেঁস্তোরায় এসো, আমি বসছিগে।

দোকানেরই এক কোণায় রেঁস্তোরা—অভিজাতগণ এখানে বাজার করতে এসে চা-খাবার খান। দূর্ব্বা চলে গেল সেখানে, বসলো গিয়ে একটা চেয়ারে। ঝলমল করছে সর্ব্বাঙ্গ রূপের বিদ্যুতে। কাছেই অন্য একটা টিপয় ঘিরে তিনটি তরুণী চা খাচ্ছিল, তাদের একজন বলল,—বাঃ, মেয়েটা কি সুন্দর রে!

কথাটা শুনতে পেল দূর্ব্বা, তাকালো ওদের পানে হেসে।

—কিছু মনে করবেন না, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে—

লজ্জিতা মেয়েটি বলল হেসে। দূর্ব্বা জানে, দেখেছে ছবির পোষ্টারে; তবু শুধুলো—কোথায় দেখেছেন?

—ঠিক মনে পড়ছে না—খুব চেনা মনে হচ্ছে!

ইতিমধ্যে 'বয়' এসে শুধুলো, কি দেবে দূর্ব্বাকে খাবার।

—আমার সঙ্গী এখুনি আসবে, তারপর খাবার দিও—বলে দূর্ব্বা তাকে বিদায় করে দিল। কৌতূহলী মেয়ে তিনটি ওর দিকে চেয়ে বলল,

—আপনার স্বামী সঙ্গে আছেন বুঝি?

দূর্ব্বা কিছু বললো না, মৃদু হাসলো শুধু। ঠিক সেই সময় এল চিন্ময়, কথাটা সে শুনতে পেয়েছে এবং দূর্ব্বার হাসিটাও দেখেছে; বলল,

—পোষাকের একটু দেরী হবে, বললেন।

—বেশ, বসো, চা খাও—কি খাবে? চপ্ না ওমলেট্!

—তুমিই জান কি খাব।

—সেকি! তুমি খাবে, আমি জানবো কি করে?

—হ্যাঁ, তুমিই জানবে। না জানবেতো আমার কে তুমি? অবশ্যই জানতে হবে তোমায়!

চিন্ময়ের কথায় ঝাঁজ রয়েছে কিন্তু এটা দারুচিনির ঝাঁজ—সুগন্ধী, সুমধুর, সুতৃপ্তিকর। দূর্ব্বা হেসে তাকালো ওর মুখ পানে, তারপর টেনে বসিয়ে বলল,—বেশ, আমিই জানি—বসো···বয়!—ডাক দিল সে বয়কে।

বয় এলে সে খাদ্য আনবার হুকুম দিয়ে চিন্ময়ের দিকে চাইল, চিন্ময় সেই মোটা বইখানা পড়ছে। অন্য মেয়েগুলি দেখছে ওদের। হঠাৎ একজন বলল,—ওটা কি বই পড়ছেন আপনার বর?

দূর্ব্বা জবাব না দিয়ে আবার মৃদু হাসলো; বিস্মিত চিন্ময় ওর হাসিটার অর্থ কিছু মাত্র বুঝতে পারলো না। দূর্ব্বা এদের পূর্ব্বে কি

বলেছে, তার জানা নেই! কিন্তু মেয়েটিকে জবাব দেওয়া দরকার সেই জবাব দিল,—সাহিত্য দর্পণ!

—আপনি কি এম, এ, পরীক্ষা দেবেন? চিণ্ময়কেই মেয়েটি সরাসরি প্রশ্ন করলো এবার।

—ইচ্ছে আছে বাংলায় দেবার; বলে চিণ্ময় বইএ দৃষ্টি দিল আবার।

—না—দূর্ব্বাই বলল মেয়েটিকে—ওসব ওকে দিতে দেব না আমি ভাই, অনর্থক সময় নষ্ট করতে হবে না—চিণ্ময়কেই বললো সে এবার—তার চেয়ে দাদুর কাছে চর্যাপদ আর চরিতামৃত পড়ে নাও—বাকীগুলো আমিই পড়েছি···তোমার আর পড়তে হবে না।

—তার মানে?

—মানে—আমি যেগুলো পড়িনি সেইগুলো পড়লেই তো পুরো পড়া হয়ে যাবে তোমার—হাসছে দূর্ব্বা! মেয়েগুলোও হাসছে। ওদের ভাল লেগেছে দূর্ব্বাকে। বেশ মেয়েটি, স্বচ্ছন্দ, সুরূপা, স্বাস্থ্য-সুন্দরী··· বলল সেই প্রথমটি—আমিও বাংলায় পরীক্ষা দেব এবার।—কিন্তু আপনি 'সময় নষ্ট করা' বলছেন কেন আপনার বরকে?

আবার 'বর' শব্দটা কাণে বিঁধলো চিণ্ময়ের। আশ্চর্য্য এই নির্ব্বোধ মেয়েগুলো! দূর্ব্বার সিঁথিতে সিঁদুর নেই, দেখছে না কেন ওরা? কিন্তু মনে পড়লো—সিঁদুর আজকাল সব মেয়ে পরে না, বিশেষ আধুনিকারা!

—পড়তে ওকে হবেই, তবে ডিগ্রী ওর দরকার নেই—ওতে শুধু অহমিকা বাড়ে। ল্যাজ-লম্বা জীবগুলো লজ্জার ধার ধারে না—ও আমার চাইনে। দূর্ব্বা জবাব দিল মেয়েটিকে।

—সিংহের ল্যাজ খুব বড়, সে পশুরাজ—চিণ্ময় যেন ক্রুদ্ধ হয়েই বলল কথাটা।

—পশুরাজ মানে পাশব শক্তির রাজা—আমার প্রিয়কে আমি পশুর ঊর্দ্ধে রাখতে চাই,—নির্ম্মল, নিরুপাধি, নির্ব্বিশেষ—রাজা নয়, ভিখারীও নয়!

—কি তবে? সন্ন্যাসী!—কঠোর বিদ্রূপমাখা প্রশ্ন বেরুলো চিণ্ময়ের কণ্ঠ থেকে।

—না—অত্যন্ত ধীরে জবাব দিল দূর্ব্বা—না বন্ধু, আমার প্রিয়তম হবে পুরুষ—পুরুষসিংহ নয়, হিন্‌স্ ধাতু তাতে থাকবেনা, পুরুষ-প্রবর নয়, প্রবরত্ব তাতে আমি আরোপ করবো না—শুধু পুরুষ, শান্ত-শুদ্ধ-সংযত, বিজিতেন্দ্রিয়, পৌরুষ যার অধিগত, পুরুষকার যার আয়ত্তে, সংসার আর সন্ন্যাসের ঊর্দ্ধে যে শ্মশানভূমি, সেই শিবের কল্যাণের আসনে যার অধিকার।

—মিষ্টি!—বিরক্তির সঙ্গে ইংরাজি কথাটা উচ্চারণ করলো চিণ্ময়। বয় খাবার দিল, চিণ্ময় ছুরি-কাঁটা নিয়ে আরম্ভ করে দিল খেতে। দূর্ব্বা হাসছে। মেয়েটি বলল—আপনি সত্যি মিষ্টি, ওঁকে কেন ধোঁকা দিচ্ছেন এমন করে?

—ওকে খনি থেকে তুলেছি মাত্র—কাটাই-ছাঁটাই করে তবে তো গলার হারে গাঁথবো!

—কদ্দিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের?

—বিয়ে—একটু চঞ্চল হলো দূর্ব্বা, চিণ্ময় লক্ষ্য করলো—কিন্তু দূর্ব্বা হেসে বলল,—বিয়ে আমাদের অনাদিকাল থেকে হয়ে আছে আত্মায় আত্মায়, মানুষটাকে পেলাম মাত্র সেদিন, মাসখানেক হবে।

চিণ্ময় অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছে এই মিথ্যা কথায়। দূর্ব্বার সঙ্গে বিয়ে তার হয়নি এবং কোনোদিন হবার সম্ভাবনাও আছে বলে সে মনে করে না। কিন্তু দূর্ব্বা যে ভাষা ব্যবহার করলো, তাতে মিথ্যার গন্ধ নেই—অর্থ তার যাই ওরা বুঝুক না।

মেয়েগুলি নমস্কার জানিয়ে চলে যাওয়ার পর চিন্ময় বলল,

—ওরা কি বুঝে গেল তোমার আমার সম্পর্কটা ?

—এ সম্পর্ক আধ্যাত্মিক, ওদের বোঝাবার জন্য পাতানো হয় নি। খেয়ে নাও—যেতে হবে ষ্টুডিওতে।

চিন্ময় আর কিছু না বলে কাঁটা চামচ নিয়ে পড়ল।

উঠতে দেরী হয়ে গেছে সুবর্ণার; কারণ রাত্রিজাগরণ। ক্লাব বা ঐরকম কিছুর জন্য নয়; মানসিক উত্তেজনার জন্য। কাটুর সঙ্গে তার কথা এবং বরুণের আকস্মিক আবির্ভাবই এর জন্য দায়ী কিন্তু আরো কিছু আছে সংগোপনে। কাটুর অসাধারণ দুঃসাহস, আশ্চর্য্য বাক্‌পটুতা এবং অদ্ভুত সংযম। সংযমটারও প্রশংসা করলো সুবর্ণা এই জন্য যে, একলা ঘরে একাকিনী পেয়েও কাটু অস্বাভাবিক অপমান কিছু করে নি সুবর্ণার!

অনেকক্ষণ ভাবলো সুবর্ণা বসে বসে। ভাবতে লাগলো বরুণের সঙ্গে তার বিবাহ এবং ভালবাসার কথা কিন্তু—প্রেম নামক ব্যাপারটার সঙ্গে সত্য পরিচয় নেই সুবর্ণার। যে দৈহিক ভোগস্পৃহা দিন কয়েকের জন্য ওদের বিবাহিত জীবনে দেখা দিয়েছিল, খুকীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তা নিবে গেছে,—অথচ আশ্চর্য্য এই যে, সুবর্ণার রূপ-যৌবন অটুট শুধু নয়—অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু বরুণকে সে বাঁধতে পারলো না। কি এর কারণ, কোনোদিন ভেবে দেখবার চেষ্টা করেনি সুবর্ণা, আজও করলো না। চিন্তাই করলো না যে, সন্তান জননের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামী-নিষ্ঠা বৃদ্ধির পথে না গিয়ে খর্ব্ব হতে হতে লোপ পেয়ে গেছে। বর্ত্তমানে সে বরুণের গৃহবাসিনী বন্দিনী ছাড়া নিজকে আর কিছু মনে করতে পারে না। বিবাহিত জীবনে এ যে কতখানি ক্ষতিকর, সুবর্ণার

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মন সেদিক দিয়ে না ভেবে শুধু ভাবতে লাগলো, তার দেহের, তার রূপযৌবনের, তার আত্মার অপমান করছে বরুণ! ভালই। সুবর্ণাও গ্রাহ্য করবে না।

এই বিপরীত চিন্তা সুবর্ণাকে বিপথে চালিয়েছে, এবং আজ সেই আগুনে আহুতি দিল কাটু। কাটু নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তি ছিল তার কাছে। কাটুকে সুবর্ণা বরুণের করুণাপুষ্ট পোষা কুকুর ছাড়া আর কিছু মনে করতো না, কিন্তু তার চোখে আজ ঐ কাটুই বিশেষ একটা রূপ নিয়ে দেখা দিল—একজন পুরুষ রূপে।

পুরুষের যে পৌরুষ নারীর অন্তরে অভিলাষ জাগায়—যে সাহস এবং সংযম নারীকে মোহিত করে—বীর পূজার সেই বীর্য্যবত্তার নিকৃষ্টতম স্তর এই দুঃশ্চরিত্রতা—যাদের ইংরাজী ভাষায় বলা হয় 'ভিলিয়ান'। কিন্তু এর একটা আশ্চর্য্য মোহকরী শক্তি আছে সাধারণ মানবীর কাছে—দেহ এবং মন যাদের কামনাতুর। সুবর্ণার সৃষ্টিধর্মী দেহমনে সেই আকাঙ্খা জাগ্রত হতে দেরী হোল ঘণ্টা কয়েক কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে অনুভব করলো, কাটু 'ভিলিয়ান' কিন্তু কাটুই তার জীবনের সার্থকতার সেতু! এই আশ্চর্য্য এবং অকল্যাণকর অনুভূতিটার পরবর্ত্তি অধ্যায় নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাইল না সুবর্ণা। কাটুর অসাধারণ দুঃসাহসের দিকে অগ্নিশিখালুব্ধ পতঙ্গের মত তার মন এগুতে লাগলো। সমস্ত দিন হোল না সুবর্ণা বাড়ী থেকে। অথচ দু-তিন জায়গায় তার যাবার কথা ছিল—টেলিফোন করে জানিয়ে দিল—শরীর খারাপ। শুধু সজাগ সংবাদ নিতে লাগলো—বরুণ কখন ফিরলো এবং আবার কখন বেরিয়ে গেল। খুকী আয়ার কাছেই থাকে—আর বাবার কাছে। মাঝে মাঝে ঠাকুরমা অবসর মত তাকে আদর করেন। খুকী সম্বন্ধে সুবর্ণার কিছুই করবার নেই; এমন কি, সুবর্ণাকে খুকী চেনে না বলেই মনে হয় সকলের।

দুপুরের খাওয়া সেরে বরুণ আবার বেরিয়ে গেছে, খবর পেল সুবর্ণা। একটা সোফায় শুয়ে সে গড়াচ্ছিল—অকস্মাৎ উঠে বসলো। কাটুর সঙ্গে তাকে দেখা করতে হবে; কিন্তু সে জানে, বরুণও সম্ভবতঃ সেখানে থাকবে, কাজেই সুবর্ণা সঠিক খবর জানবার জন্য কাটুর ফ্ল্যাটে ফোন করতে গেল; কিন্তু এভাবে আত্মসমর্পণ সুবর্ণা-শ্রেণীর মেয়েরা করে না—অত হাল্‌কা হতে পারে না তারা। ফোনের রিসিভার তুলতে গিয়ে থেমে গেল সুবর্ণা—তার পর চলে গেল কাপড় পরতে।

বেরুবে সে,—ষ্টুডিওতে গিয়ে কাটুর সঙ্গে দেখা করবে। সে জানে, আজ তাদের সুটিং আছে এবং সেইজন্যই বরুণ খেয়েই বেরিয়ে গেছে। কাটু ডিরেক্টার, কাজেই সেও ষ্টুডিওতে থাকবে। সুবর্ণা কাপড় পরতে পরতে ভাবলো, ষ্টুডিওতে গেলে কারো কিছু বলবার নেই। সুবর্ণা জানাবে যে সে সুটিং দেখতে এসেছে নতুন বইটার। এ রকম আগেও সে গেছে অনেকবার।

গাড়ী চালিয়ে সুবর্ণা চলে এলো ষ্টুডিওতে। নতুন ষ্টুডিও—বরুণেরও অংশ আছে এতে, সেইজন্য সুটিং-ডেট্ ওরা খুশীমত পাবার ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু সুবর্ণা জানতো, বরুণের ছবি তোলার কাজ সাধারণতঃ রাত্রে হয়—এ ছবিটার কাজ বরাবর দিনে হচ্ছে কেন? কে জানে!

গাড়ী রেখে সুবর্ণা নেমেই দেখতে পেল—বিরাটকায় জনৈক ব্যক্তি মেক-আপ রুম থেকে বেরিয়ে আসছে—তার সঙ্গে একটি তরুণী এবং তার পেছনে একজন স্যুটপরা ভদ্রলোক! তরুণীর বেশ দেখলেই বোঝা যায়, সেকালের রাজকুমারী সে—কে মেয়েটা?—সুবর্ণার তৎক্ষণাৎ মনে পড়লো সেই ফটোর মেয়ে—যার নাম দূর্ব্বা—দুর্ব্বার দূর্ব্বাদল!

কিন্তু পিছনের স্যুটপরা লোকটিকে চিনতে পারলো না সুবর্ণা—কে ও! রঞ্জাবতী ফিল্ম কোং-এর প্রায় সকলকেই চেনে সুবর্ণা; মিহির, নৃপেন, কাটু তার বিশেষ পরিচিত—কিন্তু এ লোকটি কে? হয়তো নতুন কোনো

অভিনেতা ভেবে সুবর্ণা আর চিন্তা করলো না ও নিয়ে। দূর্ব্বার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য এগিয়ে এল। মেক-আপ রুম থেকে ছবি তোলার জায়গায় যাবার পথ অতি সামান্য,এক মিনিটেরও কম রাস্তা,কাজেই সুবর্ণা তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে দূর্ব্বাকে নমস্কার জানিয়ে বলল—আপনিই নায়িকা অতসী,কেমন ?

—হ্যাঁ—দূর্ব্বা জবাব দিয়ে প্রতি নমস্কার করলো এবং শুধুলো—আপনি কি সুটিং দেখতে এসেছেন ?

—হ্যাঁ—চলুন, বলে এগিয়ে চললো সে ষ্টুডিওর দিকে। অন্য ঘরে বরুণ মেক-আপ করছিল, ঠিক এই সময় সেও বেরিয়ে এসে দেখলো, দূর্ব্বা আর সুবর্ণা ঢুকছে ছবিতোলার ঘরে।

বরুণের চোখে মুখে অপ্রসন্নতার ভাব ফুটে উঠলো, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য—পরক্ষণেই চিন্তিত হয়ে উঠলো সে। সুবর্ণার পক্ষে সুটিং দেখতে আসা কিছু বিচিত্র বা বিস্ময়কর নয়, কিন্তু সাধারণতঃ সে আসে না। আজ হঠাৎ এল কেন ? দূর্ব্বাকে দেখবার জন্য কিম্বা কাটুর সঙ্গে আরো বিশেষ কোন কথা বলবার জন্য। কিন্তু কাটুর সঙ্গে গোপন কথা বলতে সে এখানে নিশ্চয় আসবে না—কারণ বরুণ এখানে থাকবেই, তার জানা ; অতএব সে দূর্ব্বাকেই দেখতে এসেছে। স্বামী-বরুণ বর্ত্তমানে কার দিকে আকর্ষিত হচ্ছে, জানবার চেষ্টা করা স্ত্রী-সুবর্ণার পক্ষে আস্বাভাবিক কিছু নয়, এবং তাহলে বরুণের বলবারও কিছু নেই বিশেষ। বিশেষতঃ কাটুও জানিয়েছে যে সুবর্ণা কাটুর কাছে দূর্ব্বার ঠিকানা জানতেই গিয়েছিল কিন্তু বরুণকেই তো সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারতো সুবর্ণা !

ছবিতোলার বদ্ধ ঘরের একদিকে খানকয়েক চেয়ার পাতা আছে, বসবার জন্য—সেইখানেই বসবে সুবর্ণা, ইতিমধ্যে কাটু তাকে দেখে এগিয়ে এল এবং মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করে বললো—আসুন এইদিকে।

প্রকাণ্ড 'সেট্'এ কাজ হচ্ছে ; রাণী রঞ্জাবতীর রাজ অন্তঃপুর।

যুবরাজ মৈনাক সেখানে গিয়ে দেখা করবে প্রেমমুগ্ধা রাজকুমারী অতসীর সঙ্গে। চমৎকার করে সাজানো হয়েছে সেট্—বহু অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এরই জন্য, দেখলেই বোঝা যায়। কাটু সেই সব দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো সুবর্ণাকে। দূর্ব্বা ক্যামেরার সামনে বসে এবং নতুন স্যুটপর চিণ্ময় বসবার যায়গায় একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে রইল। বরুণ এসে বসলো চিণ্ময়ের পাশে—সিগারেট একটা চিণ্ময়কে দিল, নিজেও একটা ধরালো—কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি—ক্যামেরা, লাইট, সাউণ্ড ঠিক করা হচ্ছে।

সুবর্ণাকে নিয়ে কাটু দেখিয়ে বেড়াচ্ছে সেট্টা। খুব বড় সেট করা হয়েছে—উদ্যান, অলিন্দ, উৎস ইত্যাদি সেকালের রাজবাড়ীতে যা থাকবার কথা—সব করা হয়েছে—যদিও সবই ফাঁকি—যথা ফুল কাগজের, গাছ কাটা ডাল, দেওয়ালগুলো কাগজ দিয়ে তৈরী, কাঠের ফ্রেম—তথাপি সুন্দর করে করা হয়েছে সব। সুবর্ণা দেখে বেড়াচ্ছে—কাটু অকস্মাৎ তার বাঁ হাতখানা ধরলো। সুবর্ণা বিস্মিত হোল না, চেয়ে দেখলো—বরুণ খুব দূরে নেই···তবে এদিকে তাকাচ্ছে না—হেসে বলল,

—ছাড়ুন···আপনাদের নায়িকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি।

—আমার নিজের নায়িকার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে—কাটু জবাব দিল।

—বেশ, তাকে বলবেন···সুবর্ণা আড়চোখে একবার তাকালো বরুণের দিকে, বরুণ নিঃশব্দে সিগারেট টানছে; স্যুটপরা ভদ্রলোকটিও সিগারেট টানছে, হয়তো ওরা কথা বলছে পরস্পর। ঠিক শুনতে পেলনা সুবর্ণা—মাঝে একটা মার্ব্বেলের দেওয়াল, অর্থাৎ কাগজের বেড়া, বাগানের অংশবিশেষরূপে খাড়া আছে। কাটু অসঙ্কোচে সুবর্ণার হাতে একটু জোর দিয়ে বলল,—আমি জানি, তুমি কি জন্য এসেছ—বরুণকে আর বরদাস্ত করা তোমার উচিৎ হচ্ছে না সুবর্ণা! তোমার নারীত্বের এই

অপমান আমাকে ব্যথা দেয়—তুমি সকল দিকে বঞ্চিতা; অথচ তুমি যে-কোনো পুরুষের হৃদয় জয় করবার শক্তি রাখ—আমি তোমায় দীর্ঘদিন দেখে আসছি—পিপাসার মত আমার অন্তরে জাগে তোমার মূর্ত্তি···

কাটু চাইল সুবর্ণার পানে, বিশ্বের সমস্ত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা যেন সেই চাহনিতে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে—'মহা-বুভুক্ষা' যেন জ্বলন্ত সে দৃষ্টিতে—সুবর্ণা মৃদু হাসলো।

আশ্চর্য্য দুঃসাহস কাটুর; সে ঐখানেই, অত কাছে, অত লোকের সান্নিধ্যেও সুবর্ণাকে কাছে টেনে বলল আবার—তুমি আমার—তোমায় আমি ওর হাত থেকে উদ্ধার করে আপনার করব, শুধু তোমার সম্মতির অপেক্ষা।—কাটু অকস্মাৎ সুবর্ণার দুই গণ্ডে চুম্বন এঁকে দেবে···

ত্বরিতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সরে এল সুবর্ণা, কপট রাগ করে বলল—যান্! শয়তান কোথাকার!···ও দেখতে পাবে···

—ওকে আমি ভয় করিনে—বিশ্বের কাউকেই ভয় করিনে আমি, তোমকে পাওয়ার পথে···

কাটু আবার এসে ধরলো সুবর্ণার দেহবল্লরী···অকস্মাৎ ক্যামেরা-ম্যান হাঁকল,—'লাইট প্লিজ'—অন্য একজন বলল,—মণিটার, অপরজন বলল—ডিরেক্টার কোথায়?

—'ইয়েস'—কাটু এসে দাঁড়ালো সামনে; সুবর্ণা অন্য দিক দিয়ে ঘুরে এসে বসলো চিন্ময়ের কাছাকাছি একটা চেয়ারে। বরুণ তখনো সিগারেট টানছে—কারণ, রাজকুমারী অতসীর অভিনয় আগে আরম্ভ হবে—গান আছে একটা। গান অবশ্য আগেই রেকর্ড করা হয়েছে, এখন শুধু ছবি তোলা হবে—কাজেই বরুণের প্রবেশের দেরী আছে। তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকিয়ে দেখলো বরুণ সুবর্ণার দিকে—লাল হয়ে গেছে মুখ তার! কিন্তু বেশ প্রসন্ন মুখ!

ক্যামেরার সামনে দূর্ব্বা। সুবর্ণা সহস্র বাতির উজ্জ্বল আলোকে চেয়ে দেখতে পেল—নিদারুণ ঘৃণায় দূর্ব্বার মুখ পরিপূর্ণ! কাটুর সঙ্গে তার কাণ্ড এবং কথাগুলো দূর্ব্বার জানা হয়ে গেছে নাকি? ও যে খুব কাছে ছিল—মাত্র কাগজের দেওয়ালটার আড়ালে!—কিন্তু দূর্ব্বা অভিনয় করতে উঠলো এবং তার মুখে প্রিয়বিরহের গভীর বেদনা পরিস্ফুট হয়ে উঠলো মুহূর্ত্তে—সুবর্ণা ঠিকমত ধরতে পারলো না—দূর্ব্বা তাদের কথা শুনেছে কি না।

রাজকুমারী অতসীর সঙ্গে যুবরাজ মৈনাকের প্রেমাভিনয়ের দৃশ্য তোলা হচ্ছে—সুবর্ণা দেখছে আসনে বসে; একটু তফাতে আছে চিণ্ময়—সুবর্ণা চেনেনা তাকে, তবু শুধুলো,—নায়িকা দূর্ব্বা দেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে নিশ্চয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমার আত্মীয়া—চিণ্ময় জবাব দিল।

—শুনেছি উনি কুমারী! আপনি কি ভাই হন ওর?

—বন্ধু—হেসে উত্তর দিল চিণ্ময়—অবশ্য আমাকে ও চিনুদা বলে ডাকে।

—বন্ধুত্বটা ভবিষ্যতে আরো নিবিড় হবার আশা আছে নিশ্চয়—সুবর্ণা হাসলো।

—আর নিবিড় হবার আশঙ্কা কম। ও দূর্ব্বা, মৃত্তিকা-জননীর কন্যা, আমি কিন্তু মৃণ্ময় নই। আমার নাম চিণ্ময়···করুণ হাসির সঙ্গে জবাব দিল চিণ্ময়!

সুবর্ণা কথাটির রস অনুভব করলো কিন্তু সম্যক্ অর্থ উপলব্ধি করতে পারলো না, তাই পুনর্ব্বার প্রশ্ন করলো,

—চিণ্ময়ের সঙ্গে দূর্ব্বার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে বাধা কি? চিৎশক্তি তো সর্ব্বত্র ব্যপ্ত!

—হ্যাঁ, কিন্তু চিৎশক্তিতে 'সৎ' যোগ করে ও আমায় 'সচ্চিৎ' করতে চায় 'আনন্দ' বাদ দিয়ে। অর্থাৎ মাটির সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক ছিন্ন করে আকাশের আলো করতে চায়।

—আলোর প্রকাশে আনন্দও আছে।

—আছে, যারা সে আলো দেখে—আলোর নিজের আছে শুধু জ্বালা···

চিন্ময়ের কথাগুলো এমন বেদনাহত শোনাচ্ছিল যে সুবর্ণা বিস্মিত হলো যথেষ্ট, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলো, এই ছেলেটি দূর্ব্বাকে ভালবাসে।

—সিনেমার মেয়েকে ভালবাসার কোন অর্থ নেই—অকস্মাৎ অতর্কিতে বলে ফেললো সুবর্ণা।

ব্যথিত চিন্ময় মুখের দিকে চাইল তার, এবং অত্যন্ত ধীর স্বরে জবাব দিল—ভালবাসার এক এবং অদ্বিতীয় অর্থই সর্ব্বত্র সুপ্রকাশ সুবর্ণা দেবি—সেটা সিনেমার মেয়ে বা সমাজের মেয়েতে তফাৎ দেখে না, যদি সত্যি সেটা ভালবাসা হয়—সে যদি হয় সত্য প্রেম—নইলে ভালবাসার নামে সে যৌন ব্যভিচার—বিবাহিত জীবনেও সেটা নিষ্কলুষ নয়—বরং অধিক দোষাবহ।

—আপনি কি সত্যি ভালবাসেন ওকে? সুবর্ণা শুধুলো।

—জানি না—আমার প্রেম এখনো কষ্টিপাথরে যাচাই হয় নি···

ওদিকে ছবিতোলা শেষ হয়েছে, সবাই উঠে এল, বরুণ, কাটু, ক্যামেরাম্যান। দূর্ব্বার কাজ শেষ হয়েছে আজকার মত; এসেই বলল—চল চিনুদা, সন্ধ্যা হয়ে এল···

—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি আমি—সুবর্ণা বলল দূর্ব্বাকে।

—আজ আর সময় হবে না সুবর্ণা দেবি—বড় ব্যস্ত আছি—কিছু মনে করবেন না—চলো চিনুদা—

দূর্ব্বা চিন্ময়ের হাত ধরে টেনে বেরিয়ে পড়লো ওখান থেকে।

দুর্ব্বা সটান চলে গেল ষ্টুডিওর গেটের বাইরে। নিশ্চুপ চেয়ে দেখলো সুবর্ণা; তার তন্বী দেহবল্লরী গেটের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর ফিরে তাকিয়ে দেখলো, কাটু ওর কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, —ওর জন্যই ছটার সময় কাজ বন্ধ করতে হোল—নইলে রাত দশটা পর্য্যন্ত কাজ করে এই সেটের সবটা তুলে নিতাম—হারামজাদী মেয়ে···

—কেন? ও থাকলো না কেন?

—ওর সঙ্গে সর্ত্ত আছে; আমরা কেউ সে সর্ত্ত মানতে চাইনি—কিন্তু জানোতো, ওর দিকে বরুণের দৃষ্টি, সেই ওর সব সর্ত্ত মেনে নিল, ···নইলে সামান্য একটা সিনেমা-অভিনেত্রী, তার এতো দেমাক—তোমার কথাটা পর্য্যন্ত শুনলো না!

—সত্যি; ও কি খুব নামকরা অভিনেত্রী?

—মোটেই না—এই প্রথম ও পর্দ্দায় আসছে। আমরাই ওকে 'বুম' করে বের করে দিচ্ছি; অজস্র টাকা খরচ হচ্ছে ওর পেছনে—পাব্‌লিসিটির নানা পলিশি খাটানো হচ্ছে—কিন্তু দেখলে তো, কি রকম শয়তান মেয়ে!

—ওর জন্য কেন এতো করছেন আপনারা?—সুবর্ণা সব জেনেও আবার শুধুলো।

—আমরা করছিনে—করছে বরুণ! ওকে তার চাই-ই—হুঁ! বরুণ একটা যাচ্ছেতাই হয়ে উঠেছে। তুমি বসো একটু, আমি কাজটা সামলে আসি!

কাটু ত্বরিতে চলে গেল; সুবর্ণা দেখতে পেল, বরুণ তার দিকে এগিয়ে আসছে—হয়তো তাই দেখেই কাটু চলে গেল। সুবর্ণা দাঁড়ালো ফিরে।

—তুমি অকস্মাৎ এখানে কেন সুবর্ণা?—বরুণ প্রশ্ন করলো!

—তোমার প্রিয়তমাকে দেখতে—উত্তর দিল সুবর্ণা নম্র স্বরে।

—অথবা তোমার প্রেমাস্পদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে! কথাটা বলার সঙ্গে অধিক রুক্ষ হলো বরুণ।

—হতে পারে—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করেই সুবর্ণা সরে চলে এল খানিকটা, চোখে ওর বিদ্যুজ্জ্বালা—অন্তরে অগ্নি। বরুণ বুঝতে পারলো, সুবর্ণা আর বরুণের নেই···পর হয়ে গেছে। নিঃশব্দে সেও অন্য দিকে সরে গেল—নিশ্বাসটা পড়লো শুধু খুকীর জন্য। সুবর্ণা সেই অভাগী মেয়েটার মা—অকস্মাৎ বরুণ ত্বরিতগতিতে ঘরের বাইরে এসে গেটে-রাখা গাড়ীখানায় চড়ে ষ্টার্ট দিল—তারপর বিদ্যুৎ বেগে চালিয়ে দিল বাড়ীর পানে। আইন অমান্য করে গাড়ী চলছে বরুণের!

সুদীর্ঘকাল খুকীকে সে দেখেনি—ওর তো মা নেই, সে মরেছে। বরুণ একাই এখন খুকীর মা-বাবা! স্নেহে উদ্বেলিত-হৃদয় বরুণের মনে হোল, এই ভাল হয়েছে। সুবর্ণার মত মা না-থাকাই মঙ্গল। সুবর্ণা যেখানে ইচ্ছে চলে যাক—খুকীর কেউ তাকে হতে হবে না আর!

সন্ধ্যা হলেও অন্ধকার হয়নি এখনো—বরুণ বাড়ী পৌঁছালো। বাগানের বড় বকুল গাছটার ডালে ঝোলানো দোলনায় খুকী দোল খাচ্ছে—আয়াটা দোলাচ্ছে ওকে; বরুণ ছুটে এসে তাকে বুকে তুলে নিল,

—মা - মা-মণি···

—বাব্বা!—খুকু জড়িয়ে ধরলো ওর গলা; বরুণের বুকভরা উচ্ছ্বাস কবিতায় ঝরছে—

"ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে—
ছিলি আমার পুতুল খেলায়, প্রভাতে শিবপুজোর বেলায়—
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি···"

অকস্মাৎ দাঁড়ানো গাড়ীখানার দিকে নজর পড়তেই বরুণ সাঁ করে এসে

উঠলো খুকীকে কোলে নিয়ে এবং তারপরই গাড়ী চালিয়ে দিল কোথায়, কে জানে! তখনো সিনেমা গৃহের রং-পাউডার ওর মুখে, যুবরাজ মৈনাকের বেশ ওর পরণে। কিন্তু বরুণের ওসব খেয়ালেই এল না।

দূর্ব্বা সবে মাত্র পৌছে শাড়ীখানা বদলেছে সন্ধ্যাদীপ জ্বালবার জন্য; প্রদীপ তার হাতে—তুলসী তলায় আসছে—অকস্মাৎ খুকী-কোলে বরুণ! বিস্ময়ে হতবাক্ দূর্ব্বা প্রায় আধ মিনিট কিছুই বলতে পারলো না। কি ব্যাপার?

—মা-মা মাম্-মা···খুকীই বলল এবং হাত বড়োলো কোলে যাবার জন্য।

—আয়! এসো—দূর্ব্বা বাঁ-হাতখানা বাড়াতেই খুকী ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে। দূর্ব্বা বিস্মিত হয়ে দেখলো—বরুণের চোখে জল রয়েছে। অবাক হয়ে শুধুলো,—কি ব্যাপার বরুণবাবু?

—কিছু না—ওকে নাও তুমি দূর্ব্বা···বরুণ সরে দাঁড়ালো কিঞ্চিৎ—সন্ধ্যাদীপ দাও তোমার।

দূর্ব্বা কি বুঝে আর কিছু শুধুলো না—নিঃশব্দে খুকীকে কোলে নিয়ে তুলসীমঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল—একহাতে প্রদীপ অন্যহাতে তায় দীপ-শিখার মত খুকী! তুলসীমঞ্চ ভেঙে গেছে—কিন্তু পরিষ্কার—খুকীকে সেইখানে নামিয়ে দূর্ব্বা প্রদীপ দিল, প্রণাম করলো ভূমিষ্ঠ হয়ে—দেখা-দেখী খুকীও করছে প্রণাম···বরুণ হাসছে দেখে। বরুণের মা এইভাবে প্রণাম করেন, সুবর্ণা কোনোদিন করেনি। খুকী করছে। খুকী—বরুণের জননীর শৈশবমূর্ত্তি···। দূর্ব্বা খুকীর মাথায় তুলসীতলার ধূলিকণা বুলিয়ে দিল—আশীর্ব্বাদ—মাতৃঅন্তরের অমোঘ অক্ষয় কবচ; বরুণ নির্নিমেষ চোখে দেখছে—খুকীকে বুকে তুলে দূর্ব্বা বলল—

—চলুন, আপনাকে দাদুর কাছে বসিয়ে দিয়ে ওকে কিছু খাওয়াই; খিদে পেয়েছে ওর।

—তুমি ওর মা হবে দূর্ব্বা ?—বরুণ অকস্মাৎ বলে বসলো।

—কেন ? ওর মা কি হলো ? বিস্মিত দূর্ব্বা প্রতিপ্রশ্ন করলো।

—ওর মা নেই···মান্ধাতার মতন ও বাপের গর্ভে জন্মেছে···মা ওর নেই দূর্ব্বা। তার কথা জিজ্ঞাসা করোনা—ওর সবটা আমার মত, ও সবটাই আমার, তুমি অংশ নাও ; সিনেমার শেয়ার নাওনি—ওর সবটাই তুমি গ্রহণ কর···

—থামুন বরুণবাবু—আপনি বড্ড উত্তেজিত হয়ে আছেন! মুখ হাত ধোননি—পোষাক পর্য্যন্ত বদলাননি···চলুন, বসবেন—এ সব কথা থাক এখন...

—তুমি ওর মা হতে পারবে না দূর্ব্বা ?

—ওর মা হতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই বরুণবাবু কিন্তু কারো স্ত্রী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়—আজ এই সন্ধ্যাবেলায় ওকে আমি তুলসীতলায় কুড়িয়ে পেলাম, আমি ওর মা—আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন—যান, বসুনগে দাদুর কাছে !

দূর্ব্বা চলে গেল খুকীকে নিয়ে। আজকাল দূর্ব্বার বাড়ীতে প্রয়োজনীয় সব জিনিষই থাকে—দুধ, মিষ্টি, চা. চিনি—কারণ বর্ত্তমানে তার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। খুকীকে খাওয়াবার জন্য তাকে ভাবতে হবেনা আজ, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে এই রকমভাবে কোনো মেয়ে এলে দূর্ব্বা অকূল সমুদ্রে পড়ে যেতো। অর্থ মানুষের কত দরকার, ভাবতে ভাবতে দূর্ব্বা খুকীকে নিয়ে রান্নাঘরে গেল। রাঁধুনী সে রাখেনি—কিন্তু একটা ঠিকে ঝি আছে—উনুন ধরিয়ে সে অপেক্ষা করছিল অন্য আদেশের। দূর্ব্বা তাকে দুধ গরম করতে বললো—তারপর চায়ের জল চড়াতে বলল। খুকীটা আশ্চর্য্য মেয়ে। দূর্ব্বাকে সে মুহূর্ত্তের জন্য পর ভাবলো না, নিজের গর্ভধারিণীকে নিকটে না পাওয়ায় যে-কোনো

মেয়েকে ও অনায়াসে মা বলে কাছে যেতে পারে—মাতৃলাভ ওর কাছে যেন অমূল্য বস্তু। কারণ অনায়াসলভ্য মাতৃরূপ ওর জীবনে দেখা দেয়নি।

ওকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে দূর্ব্বা ভাবতে লাগল,—যে মেয়েটিকে ষ্টুডিওতে সে দেখেছে কাটুর সঙ্গে কথা কইতে, সেই সুবর্ণা, বরুণের স্ত্রী এবং এই খুকীম মা! অকস্মাৎ বরুণ কেন এল তার কাছে এমন করে, তাও যেন আন্দাজ করতে পারছে দূর্ব্বা। খুকীকে কোলে নিয়ে খুকীর মার প্রতি ঘৃণাটা ধীরে ধীরে করুণায় বিগলিত হয়ে উঠতে লাগলো দূর্ব্বার অন্তরে—অভাগী নারী—আর দুর্ভাগা পুরুষ,—বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টিতে অভিশপ্ত এই দম্পতি!

বরুণ এসে দাদুকে নমস্কার করে বসলো একটা চেয়ারে। ঘরের বাল্ব সম্প্রতি বদলে দেওয়া হয়েছে, উজ্জ্বল আলোতে ঘরখানার সমস্তটা দেখা যায়—স্তূপীকৃত পুস্তকরাশির দিকে চেয়ে বরুণ প্রশ্ন করলো,—সমস্ত জীবনটা কি শুধু বই পড়েই কাটিয়ে দেওয়া যায় না দাদু?

—নিশ্চয় যায়—কিন্তু একথা কেন দাদা? অর্জিত বিদ্যা প্রযুক্ত না হলে ব্যর্থ হয়……মানুষের কোনো কল্যাণে তো সে লাগে না…মানুষের যা-কিছু কাজ জগৎ-কল্যাণেই হওয়া উচিৎ…

—নিজের আনন্দ লাভ হয় দাদু—বরুণ বলল—সন্ন্যাসীরা যে গিরিগুহায় ধ্যান ধারণা করেন, সেও তো আত্মোপলব্ধি আর আনন্দ লাভের জন্য?

—হ্যাঁ—কিন্তু সে আনন্দ ব্রহ্মানন্দ—সে আনন্দ উপলব্ধি হলে ব্রহ্মই সত্য থাকে, জগৎ মিথ্যা প্রতিভাত হয়—তখন জগৎ-কল্যাণের প্রয়োজন থাকে না; কিন্তু পুস্তক-পাঠের আনন্দ ব্রহ্মানন্দ নয়—এ আনন্দ নিজে লাভ করে অপর রসগ্রাহীকে লাভ না করানো পর্য্যন্ত পূর্ণ তৃপ্তি হয় না—তাই এখানে জগতের রসজ্ঞ লোক-সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিতে হয়—এই জন্যই এর নাম সাহিত্য!

—ব্রহ্মোপলব্ধিতে কি তার প্রয়োজন হয় না দাদু?

—না—ব্রহ্মই একমাত্র অনুচ্ছিষ্ট বস্তু—কারো মুখ থেকে তাঁকে শোনা যায় না, কোনো ভাষায় তাঁকে বলা যায় না—কোনো মূর্ত্তিতে তাঁকে প্রকাশ করা যায় না—

—কে ?···দাদু অকস্মাৎ কথা থামিয়ে প্রশ্ন করলেন বাইরে পদ শব্দ পেয়ে,—আমি গোবিন্দ—বলে গোবিন্দ প্রবেশ করে প্রণাম করলো এবং বসল।—আমি কদিন আপনাদের ওদিকে যেতে পারিনি বরুণবাবু, কাজ চোলছে তো? কতখানা হোল আপনাদের ছবির? প্রশ্ন করলো সে বরুণকে!

—চলছে—বরুণ সংক্ষেপে জবাব দিয়ে দাদুকেই আবার শুধুলো,

—তাঁকে তাহলে কি ভাবে জানতে হবে?

—গুরু, অর্থাৎ যিনি তাঁকে জেনেছেন—তাঁরই প্রদর্শিত পথে চলতে হবে—তাঁকে জানার অর্থ তাঁর উপলব্ধি হওয়া—তাঁতেই সব, এবং সবেতেই তিনি, এই বোধ জাগ্রত হওয়া:···অনন্ত বিশ্বপ্রপঞ্চে তাঁর সৎ চিৎ, আনন্দস্বরূপ জ্ঞান হওয়া।

—কার কথা হচ্ছে? গোবিন্দ অকস্মাৎ প্রশ্ন করলো দাদুকে।

—এই খুকীটার কথা—বলে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো খুকী-কোলে দূর্ব্বা।—ওর নাম দিলাম আমি সর্বানী!—ধরতো দাদু, আমি ওদের চা দিই··· খুকীকে দাদুর কোলে তুলে দিয়ে দূর্ব্বা চা তৈরী করতে চলে গেল আবার। দীর্ঘদিন পরে শিশু এল দাদুর কোলে—সুদীর্ঘ আঠারো বছর পরে; কেমন যেন রোমাঞ্চ জাগছে, কেমন অপূর্ব্ব শিহরণ···খুকীর পানে চেয়ে বললেন,

—তুই সত্যি এলি নাকি···ব্রহ্মবাদিনী বাক্ ঋষি·· বল তাহলে,

'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম···',

খুকীর সুন্দর মুখখানার পানে চেয়ে আছেন দাদু ; দূর্ব্বা ফিরে এল, —একে কোথায় পেলি দিদি··· ?

—কুড়িয়ে পেলাম দাদু —ব্রহ্মলাভ তোমার আগেই হয়ে গেল আমার !

দূর্ব্বা হাসলো, চা তৈরী করে পরিবেশন করলো বরুণকে আর গোবিন্দকে।

—চিন্ময়বাবু কোথায় ?—বরুণ চায়ের কাপ নিতে নিতে শুধুলো।

—গেছে একটু বাইরে—এক্ষুনি এসে যাবে—বলে দূর্ব্বা খুকীকে নিতে এল !

—থাক একটু আমার কাছে—বললেন দাদু।

—আবার মায়ায় পড়ছ দাদু—দূর্ব্বা কপট ক্রোধে বলল।

—মায়া নয় দিদি—মায়ের ক্ষুদ্র রূপ, অনন্তের শান্ত মূর্ত্তি—ক্ষুদ্রবীজে বিশাল বনস্পতি। এই সৃষ্টির আদি, এই-ই সংহরণের শেষ—উৎপত্তির নিবৃত্তির চরম শক্তি !···

গোবিন্দ এতোক্ষণে বুঝতে পেরেছে—কী সাংঘাতিক বোকামী সে করেছে—"কার কথা হচ্ছে" জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু এখনো এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ওর কাছে বিষবৎ বোধ হচ্ছে ; ও এসেছে দূর্ব্বার সঙ্গে সিনেমা-কোম্পানী গড়ার জন্য পরামর্শ করতে। কথাটা আজ পাকাপাকি হবার কথা ছিল এবং লেখাপড়া ইত্যাদির জন্য দলিলের ড্রাফ্‌ট আর্নতে চিন্ময় গেছে উকিলবাড়ী—এ খবরও সে জানে। উকিল অবশ্য গোবিন্দর নিজেরই—চিন্ময়কে পাঠানো হয়েছে তাঁর কাছ থেকে বুঝে ড্রাফ্‌টগুলো আনবার জন্য। হয়তো উকীলবাবু নিজেও আসবেন। গোবিন্দ বলল, —চিন্ময় বাবু ফিরলেই আমাদের কাজ নিয়ে বসতে হবে—কেমন ?

—থামুন—ষ্টুডিও থেকেই চিনুদা উকীলবাড়ী গেছে—এখনও হাতমুখ ধোয়নি—আমি ওকে বৌবাজারে ছেড়ে দিয়ে একাই বাড়ী এলাম।

সঙ্গে অবশ্য হনুমান সিং ছিল—ট্রামে যা ভিড়—ট্যাক্সি করে আসতে হোল আজ!

—হোলই বা—আমাদের কোম্পানীর জন্য 'কার' একখানা কেনা হোক্ এবার! গোবিন্দ বলল।

—এখন থেকে অত বাড়াবাড়ী করবেন না—অপব্যয় করলে ব্যবসা হয় না,

বলেই দূর্ব্বা বেরিয়ে গেল। বরুণ কথাটার কিছু জানে না, শুধুলো, —কি ব্যাপার গোবিন্দবাবু! কিসের কোম্পানী আপনাদের?

—সিনেমা কোম্পানী—'দূর্ব্বাদল কলা-মন্দির'—গোবিন্দ সগৌরবে ঘোষণা করলো।

—ফাইনেন্সার কে?—বরুণ আবার প্রশ্ন করলো!

—আমি—দূর্ব্বা একটিং পার্টনার—অর্দ্ধেক অংশ তার। আমরা চিন্ময়-বাবুর বইটা তুলবো ঠিক করেছি—'পরম পিপাসা'। গোবিন্দ সব জ্ঞাতব্য-গুলো জানালো এক নিশ্বাসে!

—ও, ভালইতো! বলে বরুণ চুপ করলো! মনে পড়লো, এই কিছুদিন পূর্ব্বে দূর্ব্বাকে সে নিজেদের কোম্পানীর অংশ দিতে চেয়েছিল—দূর্ব্বা গ্রহণ করেনি—আজ গোবিন্দর টাকায় সে কোম্পানী খুলবে—গোবিন্দই তাহলে আত্মীয় হোল ওর! বরুণ কেউ হোল না! বরুণের মুখখানা করুণ হয়ে উঠেছে—অকস্মাৎ দূর্ব্বা ফিরে এসে খুকীকে নিল দাদুর কোল থেকে, তারপর বরুণকে বলল হেসে,

—দূর্ব্বা মাটি-মায়ের কোলে বিছিয়ে থাকে, তাকে পায়েই দলে যায় পৃথিবীর লোক—পূজার জন্য তার ব্যবহার আকস্মিক বরুণবাবু—অপ্রাকৃত!

—কথাটা ঠিক মত বুঝলাম না দূর্ব্বা—বরুণ সবিনয়ে জানালো।

—বলছি যে দূর্ব্বা কারো পূজা পেতে চায় না, পূজা করতেই তার জন্ম ; একান্ত নিরহঙ্কার থেকে সে পৃথিবীর অঙ্গে শ্যামলাভা জড়িয়ে রাখে—জীবজগৎ তৃপ্তি পাবে বলে !

—এখনো কথাটা দুর্ব্বোধ্য রইল আমার কাছে দেবি—বরুণ মৃদু হেসে বলল।

—থাক্ ! সব কথা সব সময় বোঝানো যায় না—ব্রহ্মের মতন উপলব্ধি করতে হয়।

দূর্ব্বা আবার বের হয়ে যাচ্ছে। গোবিন্দ অতিশয় বিরক্ত হচ্ছে। এত দিন তার ধারণা ছিল, যতটা বিদ্যা এবং বুদ্ধি তার আছে, তাই দিয়েই পৃথিবীর সব লোকের সঙ্গে কথার কারবার সে চালাতে পারে, কিন্তু এখানে, এই সিনেমা কোম্পানীর লোকগুলোর সঙ্গে, বিশেষ করে চিন্ময়ের সঙ্গে দূর্ব্বা যেভাবে কথা বলে, গোবিন্দ তার বর্ণমাত্রও বুঝতে পারে না। একি কথা, না কাব্য ! অথচ দূর্ব্বা আজকাল এই রকম কথাই বেশি বলে। ওরা তো বুঝতে পারে, ঐ চিন্ময় ইত্যাদি। কিন্তু বরুণ বুঝতে পারছে না, শুনে আনন্দই হোল গোবিন্দর। দূর্ব্বার কথা না বুঝবার মত লোক পৃথিবীতে আরো আছে তাহলে ! বলল,

—তোমার কথাগুলো আরেকটু সরল করলেই তো হয় দূর্ব্বা, ওভাবে কি কেউ কথা বলে ?

—বলে না বলেই তো আমরা বলি—আমরা সাধারণ কেউ নই—সিনেমা আর্টিষ্ট আমরা ; আমাদের সব অসাধারণ—চলুন ওঘরে, চিনুদা এসে গেছে !

ওরা বাইরের বসবার ঘরটায় উঠে এসে দেখলো, চিন্ময়, মায়া এবং অন্য একজন লোক বসে আছে। নতুন কোম্পানী গড়বার ব্যবস্থা হবে। বরুণও রইল কিছুক্ষণ। খুকী খেয়ে ঘুমিয়ে গেছে দূর্ব্বার কোলে। রাত বারোটা নাগাদ বরুণ ঘুমন্ত খুকীকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিল সুবর্ণা, পাশে কাটু ; সর্পিল পথটা সুদূরের ইসারা। বর্ষাস্নাত বৃক্ষবল্লরী প্রগাঢ় পরিরম্ভে প্রীতিমগ্ন—বনকুসুমের সুগন্ধি শ্বাস মেদুর করে রেখেছে আকাশ-বাতাস—কুমারী সন্ধ্যার গণ্ডে লজ্জার শোণিমা-লেখা !

হাত দুটো ষ্টিয়ারিং-এর উপর রেখে কথা বলছিল সুবর্ণা কলকণ্ঠে, —মুহূর্ত্তের ভুল আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকবে—ভুলকে আমি ভয় করিনে !

—তোমার যোগ্য কথাই বলেছ সুবর্ণা—কিন্তু ভুল তো হচ্ছেনা তোমার,—তোমার নারীত্বের এই অসম্মান আর কত কাল তুমি সহ্য করবে—কেন সহ্য করবে ?

—করতে চাইনে সহ্য আমি—কয়েকটা মন্ত্র আর কয়েকপাক ঘুরে মালা দেওয়ার মধ্যে এমন কিছু মাহাত্ম্য নেই, যাতে এই অপমান সহ্য করতে হবে। সতীপনার অত ভণ্ডামী অসহ্য আমার—গাড়ীটা বাঁক ফেরালো।

কাটু সিগারেট ধরালো একটা—সুবর্ণা হেসে বলল এবার,

—সব সিগারেটগুলো একাই খাচ্ছ যে বড়—আমার ভাগ নেই ?

—ও, স্যরি !—কাটু তৎক্ষণাৎ একটা সিগারেট সুবর্ণার ঠোঁটে দিয়ে নিজে হাতে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিল। ধোঁয়া ছেড়ে সুবর্ণা বলল, —মুখে আগুন দিলে তো ?

—ওকি কথা ! ষাট্—আমি অমৃত দিচ্ছি তোমার মুখে···কা[illegible] পেওচ্ছে .

— থামো—সুবর্ণা অকস্মাৎ গাড়ীখানা ঘুরিয়ে নিতে আরম্ভ করলো দূরে অন্য একখানা গাড়ী আসছে—তার হেড-লাইটের তীব্র আলো ছড়িয়ে এসে এই গাড়ীতে। সুবর্ণা নিজের গাড়ী ঘুরিয়ে ফিরতিপথে, চালাবে

এবার—অন্য গাড়ীখানা পাশ করে চলে গেল ওদের। কাটু বলল,—এ রাস্তায় কোনো ভয় নেই!

—জানি—চোর-ছ্যাঁচড়দের ভয় করছিনে। ভিলিয়ানদের সব সময় ভয় করতে হয়।

—ভালোও বাসতে হয়—কাটু কাটা কথায় বলল।

—না—ওকে ভালবাসা বলেনা—ওটা আরশোলা আর কাচপোকার ব্যাপার।

—ঠিক বুঝলাম না সুবর্ণা!

—ভয়ের মধ্যে যে আত্ম সমর্পণ, তাকে ভালবাসা বলে না।

—ভয়ের হেতু কি এখানে?

—ভালোবাসারই বা কি হেতু?—হাসলো সুবর্ণা কথাটা বলতে বলতে।

এই ছলাকলা কাটুর বিশেষ রকম জানা আছে। দীর্ঘদিন থেকে এই সব ব্যাপারে কুশলী সে—অভিজ্ঞতা তার প্রচুর—কিন্তু সুবর্ণা-শ্রেণীর মেয়েদের হয়তো সে এখনো চেনে না। সুবর্ণা শুধু উচ্চ শিক্ষিতা নয়—উচ্চশ্রেণীর অন্তর-ঐশ্বর্য্যে পূর্ণা। কোনো পুরুষের দুঃসাহস দেখে সে সাময়িকভাবে মুগ্ধ হতে পারে—কিন্তু সে মুগ্ধতা সাময়িক মাত্র। সুবর্ণা এতোক্ষণে আত্মসংবরণ করতে সচেষ্ট হোল। সে ভুল করেছে। কাটুর সঙ্গে এভাবে বেড়াতে বেরুনো তার ঠিক হয় নি—ষ্টুডিও থেকে উত্তেজিত অবস্থায় সে এতদূর চলে এসেছে, কিন্তু যার সঙ্গে এসেছে, সে সুবর্ণার মত বহু নারীর সর্ব্বনাশ করেছে—জানে সুবর্ণা; ভালবাসবার কোনো যোগ্যতা তার নেই!

গাড়ীতে স্পীড্ দেবার পূর্ব্বেই কাটু ওর গলা বেষ্টন করে ধরলো।

—থামো—কঠোর ধমক্ দিল সুবর্ণা তাকে—নিজকে মুক্ত করে বিদ্যুৎগতিতে চালিয়ে দিল গাড়ীখানা—কিন্তু কাটুর সবল লুব্ধতা থেকে

পরিপূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করতে পারলো না—সুবর্ণার গণ্ডের কিছুটা অংশ ক্লেদাক্ত হয়ে গেল কাটুর ওষ্ঠের স্পর্শে।

কাটুর দেওয়া সিগারেটটা ফেলে দিয়েছে সুবর্ণা, গাড়ী চালাচ্ছে সামনের দিকে তাকিয়ে—কিন্তু মুখে হাসি, বললো,—বিস্তর রাত হয়ে গেল—খুকী হয়তো কাঁদবে!

—সে তো বরুণ আর আয়ার কাছেই থাকে—কাটু বললো জবাবে।

—হ্যাঁ—কিন্তু একা বরুণেরই নয় সে—আমার অর্দ্ধেক ভাগ আছে, বলে সুবর্ণা গাড়ীর গতিতে আরো জোর দিল। ভাবতে লাগলো, সে আজ শুধু বরুণের পত্নী নয়—খুকীর জননী। কতবার কতরকমে বরুণ তাকে বলেছে, খুকী তার কেউ নয়। সুবর্ণা এক্ষুণি গিয়ে বরুণকে বুঝিয়ে দেবে যে খুকী তারও মেয়ে—কিন্তু কাটুর সঙ্গে বেড়াতে এসে নিদারুণ ভুল করেছে সুবর্ণা। বরুণ জানতে পারলে বলবে—সুবর্ণা সত্যি কেউ নয় খুকীর। এ কি করলো সুবর্ণা! কাটু পাছে আরো অগ্রসর হয়, এই ভয়ে সে মুখে হাসি টেনেই রেখেছে, কারণ কাটু সত্যি দুঃসাহসী—তার পক্ষে জবরদস্তি করা কিছু মাত্র বিচিত্র নয়—দুশ্চিন্তায় সুবর্ণা কালো হয়ে উঠলো, যখন কাটু বলল,

—রাত এমন কিছু বেশি হয়নি—চলো ঐ গঙ্গার দিকে একটু—বলেই কাটু নিজের হাতে ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিতে চাইছে—কিন্তু সুবর্ণা বাধা দিয়ে বলল,—না—আজ আর রাত করলে বাড়ী ঢোকা বন্ধ হয়ে যাবে আমার।

—তাতে কি তোমার বয়ে যাবে সুবর্ণা! আমার অন্তর-দুয়ার চির দিনই খোলা আছে তোমার জন্য—তোমাকে পাবার প্রত্যাশাতেই আমি বরুণের চাকরী করি—নইলে……

—নইলে কি? সুবর্ণা প্রশ্ন করলো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

—নইলে আমার দিক থেকে ওর কোনো প্রয়োজন ছিলনা—হাসলো কাটু!

—ওঃ! শুধু আমায় ভালবাসবার জন্যই ওর চাকরী করছো?

—হ্যাঁ - বিশ্বাস হচ্ছে না সুবর্ণা?

—না—কারণ যে-প্রেম আমার জন্য এতোটা করতে পারে, সে-প্রেম কামকলুষ হবে না—সে-প্রেম আমার অকল্যাণ কামনা করবে না—আমাকে স্বামী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্জন পথে এনে কলঙ্কিত করতে চাইবে না—জোর করে আমার দেহ অধিকার করতে চাইবে না—তোমার কথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয় কাটুবাবু—

—তুমি বলছো কি সুবর্ণা—! কাটু বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধবৎ প্রশ্ন করলো!

—হ্যাঁ—সত্যিই বলছি—অবশ্য আমি স্বীকার করছি যে রূপযৌবনান্বিতা এবং স্বামী-প্রেমবঞ্চিতা নারীর চোখে তোমার এই দুঃসাহস, এই দস্যুতা এই নির্ভীকতা লোভনীয়। কিন্তু সেটা শান্ত-শুদ্ধ সংযত প্রেম নয়—সে কাম। তারও প্রয়োজন হয়ত আছে আমার জীবনে, কিন্তু যে-সংযম নারীর চোখে পুরুষকে দেবতা করে তোলে—এর মধ্যে তার অস্তিত্ব নেই; সকালের ভুলটা আমার ভাঙলো এখন—

সুবর্ণা অতি বেগে গাড়ী চালিয়ে একেবারে লেকের ধারে একটা বড় রেস্তোরাঁর সামনে এসে থামলো; এখান থেকে বাড়ী বেশি দূর নয়; কিন্তু এখানে কিছু খেয়ে নেবে সুবর্ণা। খিদে পেয়েছে ওর—মনে পড়লো, সারাদিন ও ভালকরে খায়নি। গাড়ীটা রেখে নেমে এল—কাটুও নামলো।

—কি খাবে?—কাটু প্রশ্ন করলো!

—যাহোক কিছু খেলেই হবে—পেটের খিদে তাতেই মেটে। বলে সুবর্ণা এসে বসলো একটা টেবিলের সামনে। রাত বেশি হওয়ার জন্য

রেস্তোরাঁয় লোক কম—তবে রাত্রিচর কয়েকজন নরনারী এখনো পান-ভোজন করছে। কাটু 'মেনুটা' ওর হাতে দিয়ে বলল,

—অর্ডার কর কি কি চাই!

—অনর্থক ইংরাজি কথা বল কেন? বলে ধমক দিল সুবর্ণা ওকে—যেখানে বাংলা প্রতিশব্দ নেই সেখানেই ইংরাজী বলবে—বলে সে খাবার চাইল!

কথা আর বিশেষ জমলো না ওদের; কাটু অনুভব করলো, সুবর্ণা-শ্রেণীর মেয়েদের অন্তরে আসন লাভ করবার যোগ্যতা নেই ওর। এতোকাল সে যাদের নিয়ে খেলা করেছে তারা অতি সাধারণ নারী—অর্থ, রূপ, যৌবন এবং বশের কাঙ্গালিনী—সুবর্ণা সম্পূর্ণ অন্য বস্তু—হিরণ্যগর্ভা—রহস্যময়ী।

খাওয়া শেষ করে সুবর্ণা শুভরাত্রি জানিয়ে গাড়ীতে উঠলো গিয়ে। কাটু রিকসায় চড়ে তার ফ্ল্যাটে ফিরলো! রাত সাড়ে বারোটা। সুবর্ণা বাড়ী ফিরে সটান চলে এলো শোবার ঘরে। বরুণ তার কয়েক মিনিট আগে ফিরেছে—খুকীকে কোলে নিয়ে শুয়ে আছে প্রশস্ত পালঙ্কটায়—। সুবর্ণা ঘরে ঢুকে একবার দেখলো স্বামী-সন্তানকে—হ্যাণ্ডব্যাগটা ড্রেসিং টেবিলে রেখে আয়নায় মুখ দেখছে,—বরুণ চোখ খুলে অকস্মাৎ বলল,

—তুমি তোমার ঘরে গিয়ে শোও সুবর্ণা, এ ঘরটা আমার খুকীর!

চাবুক পড়লো যেন সুবর্ণার পিঠে; বিদ্যুৎগতিতে ফিরে দাঁড়ালো সে। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা একবার কামড়ে নিল, তারপর তীব্রকণ্ঠে বলল,

—বেশ, এ ঘরটা তোমার খুকীর। কিন্তু তাকে রাখবে কোন ঘরে—সেই দুর্ব্বাকে?

—দুর্ব্বা ঘরে থাকে না সুবর্ণা—সে থাকে মাটি-মায়ের কোলে, আকাশের তলায়, আলোকের উৎসধারায় স্নান করে সে—তাকে রাখতে ঘর দরকার হয় না।

বরুণ ধীরে ধীরে উঠে বসে আবার বলল—অনর্থক রাগ করছো সুবর্ণা, আমি তোমায় কোনোদিন কিছু বলিনি—বলতে চাই না। আমার কন্যার জননী তুমি—এ সত্য ভুলতে পারলে আমি সুখী হতাম—কিন্তু তা হবার নয়। খুকীর মা হিসাবে তোমার সম্মান আমার কাছে অক্ষয় থাকবে—কিন্তু মনে রেখো, দুর্ব্বাকে হিংসা করবার মত কোনো যোগ্যতা তোমার নেই! দুর্ব্বা স্বচ্ছ, সুন্দর, সুপ্রকাশ, তার কিছুই লুকানো থাকে না—সুবর্ণ থাকে খনির তলায় আত্মগোপন করে—মণি-সংযোগে বিলাসিনীর অঙ্গশোভায় সে বিলসিত হয়—দুর্ব্বা দেবতার চরণের অর্ঘ্য; সুবর্ণা মূল্যবান হতে পারে, দুর্ব্বা অমূল্য! রাত হয়েছে—যাও, শোও গে। বরুণ বেড্ সুইচ্ টিপে আলো নিবিয়ে দিল।

অন্ধকার—নির্ম্মম নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নামলো সুবর্ণার চোখে। কিন্তু—যে প্রচণ্ড প্রলোভন পরাভূত করে সে এই মুহূর্ত্তে নিষ্কলঙ্ক হয়ে তার স্বামীর কাছে ফিরে এল, এই কি তার পুরস্কার! উদ্যত ক্রোধ বজ্রের মত জ্বলে উঠলো সুবর্ণার বুকে। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য—অকস্মাৎ সুবর্ণার মনে পড়লো—তার বামগণ্ডে একটা জ্বালা অনুভূত হচ্ছে—মৃদু, তীক্ষ্ণ, দাহকরী একটা যন্ত্রণা···কাটুর কলঙ্কিত স্পর্শ—উঃ!

গেটের বড় বাতিটার একটা ক্ষীণ রশ্মি ঘরে এসে পড়েছে, সেই আলোতে সুবর্ণা পাশের ঘরের দরজা দেখে ধীরে ধীরে ঢুকলো গিয়ে; তারপর বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন না করেই শুয়ে পড়ল—চোখের জ্বালাটা হৃদয়-বিগলিত জলে ধুয়ে যাচ্ছে!

বর্ত্তমান যুগে বড় লোকদের শয্যাগৃহ নতুন ধরণে প্রস্তুত হয়—স্বামীর এবং স্ত্রীর পৃথক করে, বরুণের বাড়ীতেও সেই ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সে কক্ষের দূরত্ব মাত্র একটা দরজার ব্যবধানেই পর্য্যবশিত! শ্বাসের শব্দও শোনা যায় এক কক্ষ থেকে অপর কক্ষে নিদ্রিত ব্যক্তির। সুবর্ণা

শুনতে পেল, ঘুমন্ত বরুণের গভীর শ্বাস। মাঝের দরজার ভারী পর্দ্দাটা গোটানো রয়েছে—অন্ধকার সবই, তবু সবই যেন দেখতে পাচ্ছে সুবর্ণা দিবালোকের মত। বরুণের বুকের কাছে খুকী ঘুমুচ্ছে—যদি জাগে তো সুবর্ণাকে দরকার হতে পারে। না—হবে না—বরুণ নিজেই তাকে সামলাতে পারবে, কিম্বা খুকীর আয়াকে ডাকবে। সুবর্ণাকে কি আর ডাকবে বরুণ!

কী বলবার থাকতে পারে সুবর্ণার! কিছু না। খুকী সুবর্ণার কেউ নয়—সত্যি কেউ নয়, আজ সেটা ভাল ভাবেই প্রমাণ হয়ে গেল। সুবর্ণা গালে হাত দিল—উঃ! না, তাকে স্নান করতে হবে।

ঢং ঢং করে দুটো বাজলো। উঠে পড়লো সুবর্ণা—বাথ্‌রুমে ঢুকলো গিয়ে। সর্ব্বাবরণ এবং সর্ব্বাভরণমুক্ত হয়ে স্নান করলো সুবর্ণা, শুধু বাঁ হাতের নোয়াটা খুললো না। ঐ লৌহবলয় বরুণের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য বন্ধনে বন্দীত্বের সাক্ষি, শৃঙ্খল—কিন্তু এ শৃঙ্খল হিন্দু নারীর মনশ্চেতনায় যে পবিত্রতার প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়, সুবর্ণ আজ যেন সেই মন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে!—কিন্তু—সুবর্ণার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি কাটু, পারবে না। জীবনের এই ক্ষণিক মোহকে নির্দ্দয় আঘাতে বিতাড়িত করে সুবর্ণা স্থির-শান্ত-সংযত হয়ে উঠবে—কিন্তু……

সুবর্ণা বারম্বার সাবান-জল দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করলো এবং বহুবার সাবান দিয়ে নোয়াগাছটা ধুলো—পরিষ্কার হয়ে গেল নোয়াটা! মনে পড়লো বিয়ের সময় তার হাতে ওটা পরিয়ে দিয়েছিল বরুণ! পাশ্চাত্য সভ্যতার উপঢৌকন সুবর্ণাঙ্গুরীয় নয়—বাংলার সুপ্রাচীন রীতির নিষ্ঠা! সীঁথির সিন্দুর আর হাতের নোয়ার অক্ষয়তার আশীর্ব্বাদ এসেছিল শাশুড়ী এবং অন্যান্য গুরুজনদের মুখ থেকে—আধুনিকা, প্রগতিবাদিনী সুবর্ণার কাছে তার মূল্য সেদিন কাণাকড়িও ছিল না—কিন্তু আজ?……

শোবার ঘরে এসে সুবর্ণা উঁকি দিয়ে দেখল একবার—অন্ধকার! গেটের আলোটাও নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে—কিছুই দেখা যায় না! ধীরে ধীরে এঘরে এসে আন্দাজে খুকীর গায়ে হাত দিয়ে বলল,

—তোর বাবা আমাকে যাই ভাবুক—তুই যেন ভুল বুঝিসনে খুকু, আমি তোর মা, অকলঙ্কিতা, অপাপবিদ্ধা—খুকুর গা থেকে হাত তুলে সুবর্ণা নিজের ঠোঁটে ঠেকালো—তারপর ধীরে ধীরে আবার ওঘরে গিয়ে শুলো!

মাটির মেয়ে দূর্ব্বা—মূল্যবান সুবর্ণের সঙ্গে তার তুলনা হয় না, সে অমূল্য। কেমন সেই দূর্ব্বা, দেখতে হবে সুবর্ণাকে। নগণ্য একটা অভিনেত্রী, এমন কি সম্পদের সে অধিকারিণী, যাতে বরুণ ও-ভাষায় প্রশংসা করে? সকালেই যাবে সুবর্ণা সাত নম্বর সম্বুদ্ধ লেনে—রাত বেশী না হলে আজই যেতো। কিন্তু কেন যাবে? ঈর্ষা? না,—সুবর্ণার আর ঈর্ষা আসছে না কারো প্রতি! সে তার খুকীর মা—সন্তান-গৌরবে গরবিনী। পৃথিবীর প্রলোভনকে জয় করে সে খুকীর মা হয়ে ফিরে আসতে পেরেছে—তার আবার ঈর্ষাভাজন কে থাকতে পারে?

তবু দূর্ব্বাকে দেখতে হবে—যে অহঙ্কার সে দেখিয়েছে ষ্টুডিওতে, তার জবাব তাকে দিয়ে আসবে সুবর্ণা—বলে আসবে,—সুবর্ণা স্বামীর পত্নী, সন্তানের জননী; তার সঙ্গে আলাপ করা সৌভাগ্য বলে মনে করা উচিৎ ছিল দূর্ব্বার পক্ষে।

কিন্তু দূর্ব্বা নিশ্চয় অসাধারণীয়া নারী। কাউকেই সে খাতির করে না, এ সত্য ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝেছে সুবর্ণা। কাটুকে তো নয়ই, বরুণকেও গ্রাহ্য মাত্র না করে চলে গেল যথাসময়ে। ওর সঙ্গে নাকি এই সর্ত্ত আছে! আশ্চর্য্য! এমন সর্ত্ত করে কেউ আবার অভিনেত্রী সংগ্রহ করে নাকি? জানতো না সুবর্ণা—কিন্তু কাটু বলেছে, দুর্ব্বল বরুণ এই সর্ত্ত মেনে নিয়েছে। কেন? কি এমন মহিমা দূর্ব্বার! সুন্দরী,

হয়তো শিক্ষিতাও, কিন্তু সুবর্ণা কম কি তার থেকে? আরো কি বেশী আছে দূর্ব্বার—জানতে হবে।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সুবর্ণা ঘুমুচ্ছে! বেলা হয়ে গেছে অনেকখানা! দু একবার চোখ খুলে দেখেও নিল, কিন্তু শরীর-মনের জড়তা ওকে শয্যা ত্যাগ করতে দিচ্ছে না। অকস্মাৎ শুনতে পেল,

—কাটুবাবু নীচের ঘরে অপেক্ষা করছেন—তাকেই বললো ঝি এসে।

—দেখা হবে না এখন; বলেদে, আমার শরীর খারাপ—সুবর্ণা ভাল হয়ে শুলো।

রঞ্জাবতী ফিল্ম কোম্পানীর ছবি তোলা শেষ হোল, এডিটিং চলছে; ওদিকে "দূর্ব্বাদল কলা-মন্দিরের" কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। দূর্ব্বার নামের যতকিছু পাব্‌লিসিটি 'রঞ্জাবতীরা' করলো তার পূর্ণ ফল ভোগ করবে 'দূর্ব্বাদল কলা-মন্দির'—এই জন্য কাটু অতিশয় অসন্তুষ্ট, কিন্তু বরুণ সব বিষয়ে সাহায্য করছে দূর্ব্বাদল কলা-মন্দিরকে—কাজেই কাটু আর কি করতে পারে?

সংবাদপত্রে এবং প্রাচীরপত্রে দূর্ব্বার নাম বিঘোষিত হয়েছে এবং হচ্ছে—বহু অর্থ এর জন্য ব্যয় করলো রঞ্জাবতী ফিল্ম—মায়া সেনের নামেও কম টাকা খরচ করা হয়নি—কিন্তু অকৃতজ্ঞ মায়া সেনও সস্বামীক দূর্ব্বাদল কলা-মন্দিরে যোগ দিল—কাটু তার কোন ক্ষতি করতে পারলো না—কারণ, দূর্ব্বা সব সময় তার প্রতি লক্ষ্য রেখেছে—রাত্রে স্যুটিং থাকলে চিণ্ময়কে পাঠিয়ে দিয়েছে মায়াকে আগ্‌লাবার জন্য।

মায়ার স্বামী ভাল হয়ে এসেই দূর্ব্বাকে অযুত নমস্কার নিবেদন করলো এবং 'পরম-পিপাসা' ছবিতে অভিনয়ে যোগ দিল।

—সব অকৃতজ্ঞ! কাটু মত প্রকাশ করলো এবং এডিটিংরুমে কাঁচি,

চালাতে বসলো। সুবর্ণার সঙ্গে এই পক্ষকাল আর দেখা হয়নি তার। কে জানে কেমন আছে সুবর্ণা, কি ভাবছে, কেনইবা দেখা করলো না! কাটু অতিশয় বিরক্ত হয়ে 'রঞ্জাবতী' ছবিখানা অবিলম্বে মুক্তি দেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো।

বরুণ আর বড় একটা আসে না 'রঞ্জাবতীতে'—দূর্ব্বাদল-কলা-মন্দিরের অফিস দূর্ব্বার নিজের ঘরে, সেখানেই সে যায়—কাটু খবর নিচ্ছে। কিন্তু সুবর্ণা কোথায়? সুবর্ণা সেদিন দেখা করে নি, অসুস্থ আছে বলেছিল, তারপর এই পনরদিন প্রায় হোল, সুবর্ণার কোন সন্ধান জানা যায়নি—অথচ খুকী বরুণের বাড়ীতেই আছে—তাহলে সুবর্ণা কি অন্তঃপুরে বন্দিনী হোল নাকি? সুবর্ণার মত মেয়ের পক্ষে সে তো সম্ভব নয়!

'পরম-পিপাসা' নাটকখানা চিন্ময়ের লেখা—কিন্তু কী সে লিখেছে, কাটু জানে না। চিন্ময় যখন ওটা পড়ে শুনিয়েছিল, তখন কাটু নিজের রঞ্জাবতীর গৌরবে এতই গর্ব্বিত ছিল যে কিছুই প্রায় শোনে নি—তবে এটা তার জানা যে এদেশের দর্শকগণ অত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাচন এবং অত সূক্ষ্ম রস পছন্দ করবে না। দূর্ব্বাদল-কলা ফেল মারবে—এ বিষয়ে কাটু নিঃসন্দেহ! কাটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে লাগল।

কিন্তু ছবিখানা ডাইরেক্ট করবে কে? সত্যি কি দূর্ব্বা স্বয়ং ঐ ছবির ডিরেক্টর হবে? অসম্ভব কিছু নয় দূর্ব্বার পক্ষে—কারণ, কাজটা সে পরম যত্নে শিখবার চেষ্টা করেছে। ভাল অভিনয়-জ্ঞান আছে তার—টেক্‌নিক্‌টাও আয়ত্ত করা কঠিন নয় অত বুদ্ধিমতী আর লেখাপড়া জানা মেয়ের পক্ষে, তবে অভিজ্ঞতা কিছু নেই! পাবলিক কি চায়, কিছুই জানে না দূর্ব্বা, তাই ওরকম সূক্ষ্ম রসের নাটক সিনেমা করতে যাচ্ছে! দেখা যাক, কি হয়!

মনের মধ্যে কিন্তু দারুণ অস্বস্তি জাগছে কাটুর। কেমন যেন ভাঙন

ধরেছে তার জীবনে। এডিটিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ডাকলো, এবং সটান চলে এল বরুণের বাড়ীতে। সুবর্ণা ঘরেই আছে, কিন্তু দেখা করলো না—বলে পাঠালো, সে অতিশয় ব্যস্ত আছে বাড়ীর কাজে! কাটু পুনর্ব্বার স্লিপ পাঠালো—এক মিনিটের জন্য দেখা করতে চায়, জরুরী প্রয়োজন। এই নাছোড়বান্দা ভাব নারীর প্রিয়। সুবর্ণা নেমে এল। মৃদু হাসির সঙ্গে নমস্কার জানিয়ে সুবর্ণা বলল,

—এমন কি জরুরী কাজ—শরীর ভালো তো?

—হ্যাঁ—ব্যাপার কি সুবর্ণা?—পনর দিন তোমার দেখা পাইনি! করছো কি?

—আমাদের ক্লাব নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি—নাম বদলে 'শক্তিমণ্ডল' করা হোল—সেখানে নতুন ধরণে সব কাজ করবার প্রোগ্রাম হচ্ছে—তা ছাড়া ভাল একখানা নাটক অভিনয় করবো—এই সব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি।

—ও! তাহলে এ গরীবের ঝামেলাটা এড়িয়ে যাচ্ছ?

—না—সুবর্ণা হাসলো সুন্দর ভঙ্গীতে—সেদিন একটি মেয়ে দেখলাম তোমার জন্য, বছর সতেরো বয়স—দেখতেও ভাল—তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চাইছি!

—অবশেষে আমার বিয়ের ঘটকালি করবে তুমি! ধন্যবাদ সুবর্ণা—কিন্তু তার কোনো দরকার নেই—নারীজাতিকে আমি চিনি……

—নারীকে চেন—নারায়ণীকে চেন না—হাসলো সুবর্ণা আবার—অলক্ষ্মীকে ভালই চিনেছ—লক্ষ্মীকে চোখে দেখনি—কামনাকেই বোঝ কামজয়ীকে বুঝতে চাওনা—

—তোমার 'শক্তিমণ্ডলকে' নিয়ে তুমি স্বর্গে যাও সুবর্ণা, আমার জন্য মাথা ঘামাবার দরকার নেই—একটা অন্য প্রশ্ন আছে।

—কি?—সুবর্ণা হেসেই প্রশ্ন করলো!

—বরুণের ভয়ে কি তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলে ?

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল সুবর্ণা মুহূর্তের জন্য। কাটুর সঙ্গে কি এমন সম্পর্ক তার ঘটেছিল, যা ছিন্ন করার জন্য কাটু আজ অভিযোগ করতে এসেছে! স্বামীর বন্ধু এবং তারও পরিচিত, এই মাত্রই তো সম্পর্ক!—না, সুবর্ণা ভেবে দেখলো—শুধু এইটুকু সম্বল করেই সে সেদিন ডায়মণ্ডহারবার রোডে বেড়াতে যায়নি কাটুর সঙ্গে—সম্পর্ক আরো এগিয়েছিল কিছুটা। ভুল করেছিল সে, কিন্তু ভুলটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ধীরে বলল,

—কারো ভয়ে আমি কিছু করিনে কাটুবাবু—আপনার সঙ্গে সেদিন বেড়াতে যাওয়াটাকে যদি আপনি নিবিড় কোনো সম্বন্ধ স্থাপন মনে করে থাকেন, তাহলে অতিশয় ভুল করেছেন—আপনার সঙ্গে সম্পর্ক যেমন ছিল, তেমনই আছে; স্বামীর বন্ধু এবং আমারও বন্ধু আপনি—এর বেশি কিছু নয়!

—তাই কি সত্যি সুবর্ণা? কাটুর প্রশ্ন তীব্র ব্যঙ্গমিশ্রিত!

—হ্যাঁ—বলেই সুবর্ণা জানালার কাছে গিয়ে জোর গলায় ডাক দিল, —আয়া, খুকীকে এখানে আনো তো একবার, শিগগির—।

—খুকীকে আনতে হবে না, খুকীর মাকে জানিয়ে যাচ্ছি, রক্তলোভী ঋষ রক্তই খোঁজে।

কথাটা বলে কাটু চলে যাচ্ছে, সুবর্ণা দেখতে পেল ওর চোখের লেলিহান শিখা। কাটু দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে আবার বলল,

—ভেবেছিলাম, বরুণের এই অপমানকর অমর্য্যাদা থেকে তোমায় আমি বাঁচাবো, কিন্তু না—তোমায় আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়াই উচিৎ—অকস্মাৎ কাটু ছুটে এগিয়ে এসে সুবর্ণার তন্বী দেহখানাকে তুলে নিষ্পিষ্ট করে দিল—তারপর একটা সোফায় ওকে ফেলে দিয়ে চলে গেল বেরিয়ে!

মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড বিস্রস্তবাসা সুবর্ণা চেয়ে দেখলো, খুকীকে

কোলে নিয়ে আয়া এসে দাঁড়ালো – খুকী একটা বেলুন নিয়ে খেলা করছে। —ওকে নিয়ে যাও—বলে সুবর্ণা নিশ্চুপ পড়ে রইল সোফাতে। কী দারুণ দুঃসাহসী এই কাটু! বাড়ী বয়ে এসে সুবর্ণাকে অপমান করতেও ওর ভয় করে না! না জানি, আরো কি সে করবে সুবর্ণার জীবনের ক্ষতি! না বুঝে আগুনে হাত দিয়েছে সুবর্ণা – এখন উপায়?

বহুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে রইল সুবর্ণা শোফাটায়। বাইরের বসবার ঘর এটা—সুবর্ণার এখানে এভাবে শুয়ে থাকা অনুচিৎ, কিন্তু মনের কেন্দ্র যেন অবশ হয়ে গেছে ওর। একটা আতঙ্কের সঙ্গে অদ্ভুত একটা সুখানুভূতি, এক রকম বিষাদের সঙ্গে বিষপানের উগ্র আনন্দ – মৃত্যুশীতল একরকম অনুভাবের সঙ্গে মারাত্মক একটা উত্তেজনা – ভাষায় যা প্রকাশ করা সম্ভব নয়—সুবর্ণা দীর্ঘক্ষণ ধরে শুয়ে শুয়ে ভাবলো—তারপর উঠে গেল নিজের ঘরে।

উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ কলিকাতার অনেকগুলি হাউসে, 'রঞ্জাবতী' চিত্রের আজ মুক্তি-দিবস। সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে হাউসগুলো—বিস্তর প্রাচীর-পত্র লাগানো হয়েছে সহরের দেওয়ালে—এবং বহু বিচিত্র ভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে সংবাদপত্রে। লোভ দেখিয়ে লোক-আকর্ষণ করবার চির প্রচলিত রীতি স্বরূপ কয়েকটা ছবিতে কিঞ্চিৎ আদিরসাত্মক ভাবব্যঞ্জনাও প্রকাশ করা হয়েছে এবং লিখে দেওয়া হয়েছে—

—"প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য"—নৃত্যগীত বহুল এই নাটকখানি নাকি মানব-মনের চিরন্তন প্রেমক্ষুধা মিটাতে পারবে—বিজ্ঞাপন রচয়িতা স্বয়ং কাটুবাবু; কিন্তু বরুণ এ ব্যাপারে একেবারে হাত দেয়নি। সে ফোন করে

জানিয়েছে, যথাকালে যে-কোনো একটা হাউসে গিয়ে সে দেখবে—ছবিটা জনসমাদর পেয়েছে কিনা।

মুক্তির পূর্ব্বেই দূর্ব্বা, চিণ্ময়, মায়া ইত্যাদি দেখেছে, ছবিখানা কেমন হোল—কিন্তু জনসাধারণ সেটা কিভাবে নেবে, না দেখলে বোঝা যায় না, তাই দূর্ব্বা বলল চিণ্ময়কে,

—কাছাকাছি কোনো হাউসের দুখানা টিকিট কিনে আন—তৃতীয় শ্রেণীর!

—তৃতীয় শ্রেণীর কেন? বসতে অসুবিধা হবে দূর্ব্বা—

—তুমি দেখছি এর মধ্যে বড়লোক হয়ে উঠলে চিনুদা—কয়েক মাস আগে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনবার ক্ষমতাও ছিল না তোমার।

—হ্যাঁ—কিন্তু আজ যখন রয়েছে ক্ষমতা···চিণ্ময় বলতে চাইল!

—না, আজও ক্ষমতা নেই। গোবিন্দর টাকা এখনো গোবিন্দরই আছে—আমাদের পারিশ্রমিকের টাকা অন্য কাজে খরচ হবার জন্য জমা আছে—অতএব আমরা এখনো গরীব—যাও, তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে আন।

চিণ্ময় নিঃশব্দে বেরিয়ে কাছের একটা হাউসে গিয়ে দুখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে আনলো এবং কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দেই দূর্ব্বার সঙ্গে বেরুলো সিনেমা দেখবার জন্যে। শুধু বিস্মিত হোল সে দূর্ব্বার বেশ দেখে। দূর্ব্বা যেন নব বিবাহিতা গ্রাম্য তরুণী—চওড়া সিঁথি করে উঁচুতে খোঁপা বেঁধেছে—ঠিক গ্রামের মেয়েদের মত শাড়ী পরেছে এবং খালি পায়ে চলেছে চিণ্ময়ের সঙ্গে। ওকে দেখে কেউ সন্দেহই করতে পারবে না যে সিনেমা-জগতের সঙ্গে কোনও যোগ ওর আছে! ও যেন বিবাহিতা বধূ—স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছে দেবমন্দিরে। চিণ্ময় চুপচাপই চলছে, কিন্তু বলল,

—এটা কি খেলা দূর্ব্বা ?

—খেলা নয়—লীলা—বলে হাসলো দূর্ব্বা !

—আমার মনে হচ্ছে ক্রীড়া—চিণ্ময় বলল—শিকার আর শিকারীর ক্রীড়া, যাতে একজনের আনন্দের জন্য অপরকে মৃত্যু বরণ করতে হয় !

—বেশ, একটা প্রশ্ন করছি, মনে কর, আমি আলেকজাণ্ডার, তুমি পুরুরাজ। আমার কাছে তুমি কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর ?—প্রশ্নের সঙ্গে হাসছে দূর্ব্বা !

—আমি পুরুষ, তুমি নারী—তোমার কাছে ঠিক পুরুষের প্রাপ্য ব্যবহার প্রত্যাশা করি !

—তোমার মনটা সাধারণ মানুষের স্তর থেকে আর উর্দ্ধে উঠলো না চিনুদা—অনর্থক খেটে মরছি আমি—তুমি নিতান্তই জৈব পদার্থ··· দূর্ব্বা গম্ভীর হোল !

—অজৈব হবার এতোটুকু আকাঙ্ক্ষা নেই আমার। লোভে কামে, পাপে-পুণ্যে আমি মানুষ—মহামানব হবার ইচ্ছে করিনে—চিণ্ময়ও গম্ভীর গলায় বলছে,—নিরন্তর এই দুস্তর লোভের পারাবারে আমি সাঁতরাবো; আর এক ঢোক জল খাব না—এতবড় কামজয়ী শিব হবার সাধ আমার নেই—এই লীলার তুমি শেষ কর দূর্ব্বা—আমি অসহায় হয়ে পড়েছি।

—আমি স্বয়ং সহায় আছি—অসহায় হবে কেন—এস।

সিনেমায় ঢুকে গেল ওরা তৃতীয় শ্রেণীর দরজা দিয়ে। বিস্তর লোক বসেছে। অধিকাংশই পুরুষ এখানে, কারণ নারী নিয়ে যারা এখানে আসে, তারা প্রায়ই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসে। কিন্তু দূর্ব্বাদের পিছনের চেয়ার-গুলোতেই দ্বিতীয় শ্রেণী—কাজেই ওর পেছনেই দু-তিনটি তরুণী ছিলেন। দূর্ব্বা বসলো, তারপর আঁচল থেকে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট বের করে চিণ্ময়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—নগদ পাঁচ আনা দিয়ে কিনলাম—

—কি দরকার ছিল কিনবার! বিড়িতেই বেশ চলে যাচ্ছে—চিণ্ময় শুষ্ক জবাব দিল।

—কথাই তো আছে যে আমার হাতে পাঁচভরির কঙ্কণ না ওঠা পর্য্যন্ত তোমায় বিড়ি খেতে হবে, ছেঁড়া চটি পরতে হবে, ষ্টিলের কলমে লিখতে হবে—আর···

—আর?—চিণ্ময় প্রশ্ন করলো। দূর্ব্বা হাসছে। হেসেই বলল,

—আর আলাদা বিছানায় শুতে হবে।

পিছনের মেয়েগুলি এই দুঃসাহসী বধূটির কথাগুলো শুনছিল, কারণ ছবি প্রদর্শন তখনো আরম্ভ হয়নি। এরা হাস্‌ছে। একজন বলল দূর্ব্বাকে,

—এই রকম সর্ত্ত করেই বিয়ে করেছেন নাকি?

—হ্যাঁ ভাই—দূর্ব্বা জবাব দিল—এতো গরীব হয়ে?—জগতে বাস করা চলে না। মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে হবে—

—পাঁচ ভরির কঙ্কণ হলেই বুঝি মানুষের মত বাঁচা হয় কথাটা বলে চিণ্ময় বিড়ি ধরাবে এবার।

—না—পাঁচ ভরির কঙ্কণের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর সিনেমার টিকিট কিনতে হবে।

—তাহলে কোনো বড় লোকের ছেলেকে বিয়ে করলেন না কেন আপনি?—বলল একটা মেয়ে।

—ওকেই তো ভালবাসি—বড়লোককে বিয়ে কেমন করে করবো, বলুন—আমি চাইছি যে আমার জন্য ও বড়লোক হোক্···ওকে হতে হবে—

—পাঁচ ভরি কঙ্কণের দাম এমন কিছু বেশি নয় দু···র্···বা···

—এই চুপ—দূর্ব্বা ধমক দিল—নামটা উচ্চারিত হলে এরা তাকে চিনে ফেলতে পারে, বলল—আমার নাম দুর্গা—আমাকে পেতে হলে শিব হওয়া

দরকার—

—শিব তো মোটেই বড় লোক নয় ভাই—একজন তরুণী হেসে বলল।

—বলেন কি! শিবের মত ধনী কেউ আছে নাকি সৃষ্টিতে! অনন্ত ঐশ্বর্য্যময়ী অন্নপূর্ণা তাঁর পদপ্রান্তে পড়ে থাকেন—গ্রাহ্যই করেন না শিব। ঐশ্বর্য্যের মহত্তম কল্পনাও ওর বেশি পৌঁছাতে পারে না—দূর্ব্বা কথাটা বন্ধ করলো, কারণ ওরা এসব কথা বোঝে না!

—শিব শবরূপী—তাই লক্ষ্য করে না—নেশাতেই আছে—আমি শব নই, নেশাও করি নি—বলে চিণ্ময় রাগ সামলাবার চেষ্টা করছে। দূর্ব্বা সিগারেটের প্যাকেটটা আবার এগিয়ে ধরে বলল—নেশাই তো করতে বলছি তোমায়—নাও—পিছনের মেয়েগুলো এবার হেসে উঠলো। কিন্তু চিণ্ময় বলল—'ধূমপান নিষেধ' এখানে; শ্মশানে গিয়ে ওটা দিও—ভূত হয়ে টানা যাবে।···

—ষাট্ ষাট্—! দূর্ব্বা অত্যন্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল—কি যে সব খারাপ কথা বল!

শো আরম্ভ হোল—কথা আর হোল না ওদের। চিণ্ময় কথাও বলতে চায় না। আর, ও সত্যি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দূর্ব্বা তাকে নিয়ে কি যে করবে, কে জানে! প্রতি মুহূর্ত্তে সে আশা করে—দূর্ব্বা এবার আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু কৈ! অথচ চিণ্ময় অনুভব করে, দূর্ব্বা তাকে প্রাণভরে ভালবাসে।

নিশ্চুপ দেখলো ওরা ছবিখানা—ভালই হয়েছে, বোঝা গেল দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে দূর্ব্বা একটা ট্যাক্সি ডেকে চিণ্ময়কে নিয়ে উঠে বসল।

গড়ের মাঠ, গঙ্গার ধার—নিস্তব্ধ রাত্রির শান্ত সৌন্দর্য্য! চিণ্ময় চুপচাপ পাশে বসে। হঠাৎ দূর্ব্বা বলল,

—কথা বলছো না কেন চিণ্ময়দা—উৎস ফুরিয়ে গেছে নাকি?

—কথার তো প্রয়োজন নেই—জীবনের পথে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করছি!

—হ্যাঁ—কিন্তু আমি এখানে একা, তুমি পুরুষ, আমি নারী - হাসলো!

—আমার পৌরুষ নারীর দেহ লুণ্ঠন করে না দূর্ব্বা—নারীকে সে সম্মান করতে জানে।

—তোমার এই মহত্ত্বকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি চিণুদা—বলে হঠাৎ দূর্ব্বা সত্যই প্রণাম করল চিণ্ময়কে।

গোবিন্দ কয়েকদিন বেশ আনন্দেই ছিল সিনেমাকোম্পানী খুলে। ভেবেছিল, দূর্ব্বাকে লাভ করা আর কঠিন হবে না তার পক্ষে! কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যেই বুঝলো—দূর্ব্বা সেই দূর—দূরতমা হয়েই রইল! কিন্তু অন্য একটা পরিবর্ত্তন এসেছে গোবিন্দের মধ্যে। সে নিজেই যথেষ্ট বিস্মিত হচ্ছে এই স্বরূপ উপলব্ধি করে। চিণ্ময়ের 'পরম পিপাসা' নাটকখানা ভাল ভাবে সে শুনেছে এবং বুঝবার চেষ্টা করেছে! দাদু বরাবর সাহায্য করেছেন ওদের—গোবিন্দ বুঝেছে ওর কিছুটা।

অপরূপ একটা অনুভাব জাগছে ওর অন্তরে! ওর যৌবনধর্ম্মী সৃজন-প্রবণ মন-মহাসৃষ্টির বৈচিত্র্যের অনুধ্যান করে; ধরণীর শ্যামল দূর্ব্বাদল থেকে আকাশের বিচিত্র গ্রহ-উপগ্রহ, মেঘ-বিদ্যুৎ বৃষ্টি-বজ্রের প্রকাশ ব্যঞ্জনা ওকে যেন একটা অননুভূত আনন্দের আস্বাদ দিচ্ছে! "পরম পিপাসার" নায়ক চন্দন সৃষ্টির সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করে মহাজননীর অপার করুণা—রাজার দুলাল সর্ব্বরিক্ত সন্ন্যাসী হয়ে জীব আর জগৎ কল্যাণে জীবনের সব কিছু সমর্পণ করলেন—তবু মানুষ তাঁকে রূঢ় আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করলো—শেষে নিশ্চিহ্ন করে দিল—তবু তিনি শেষ কথায় বললেন—'মানুষকে তিনি মার্জ্জনা করলেন, মানুষের অধস্তন পুরুষ যেন তার পিতৃগণের এই পৈশাচিক ব্যবহার

মার্জনা করে।' নিজকে নিঃশেষে ক্ষয় করে চলে গেলেন চন্দন ; শুধু বলে গেলেন—মানুষের মনুষ্যত্বকে তিনি পূজা করতে এসেছিলেন, মানুষের পূজা নিতে তিনি আসেন নি—শুধু এই জন্যই তাঁর দেহের ভস্মাবশেষও রেখে গেলেন না—শতাব্দি পরের মানুষ যা নিয়ে ওঁর স্মৃতিপূজা করতে পারে—এই অত্যদ্ভুত ত্যাগ আর আশ্চর্য্য মানবপ্রেম গোবিন্দকে কেমন আত্মবিস্মৃত করে তুলেছে। 'পরমপিপাসার'নায়ক চন্দন—নায়িকা কজ্জলীর সঙ্গে বহু জন্ম থেকে বিচ্ছিন্ন ; কাহিনীর সে-অংশ অপ্রাকৃত হলেও জননীর মুখে শোনা নিজ জীবনের এই গল্প চন্দনের কাছে ইতিহাস। চন্দনের এই জীবনেও এক বাল্য সখীর অনুসন্ধান চললো, কিন্তু মানুষ তাকে ভুল বুঝলো—বুঝলো যে চন্দন চরিত্রহীন ; তাই জন্মযোগী, চিরব্রহ্মচারী,মানব-জগতের অকৃত্রিম বন্ধু চন্দনকে তারা মানুষের সঙ্গে সব সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। নিরুপায় চন্দন নিঃশব্দে চলে গেলেন পৃথিবী থেকে—এই গল্পকে যে প্রেমপূতঃ পবিত্রতা এবং নিষ্ঠার অত্যদ্ভুত পরিবেশে চিত্রায়িত করা হয়েছে—গোবিন্দর মনকে তা শুধু রসাপ্লুত করছে না—লোকাতীত এক প্রেমানুভূতিতে জাগ্রত করছে।

চন্দনের ভূমিকায় বরুণের অভিনয় দেখে গোবিন্দ যে অনুপ্রেরণা পায় তাতে সে যেন বুঝতে পারে, দূর্ব্বার দিকে তার কামজ মোহ কতখানি অকিঞ্চিৎকর—দেহজ ক্ষুধা আর অন্তরতমের জন্য আকুতির তফাৎটা সে যেন অনুভব করতে পারছে এখন।

মানুষের মনে কোথায় কখন কি পরিবর্ত্তন ঘটে, কারো জানা নেই—অকস্মাৎ সেদিন সন্ধ্যায় বেরোবার মুখে গোবিন্দ শুনতে পেল, তার যোড়শী কন্যা সেই ক্যামেরাম্যানকে বলছে,—

—তুমি আমায় লোভ দেখিও না, বুঝলে! আমায় সত্যি ভালবাসলে অমন করে পালিয়ে বংশের মুখে চুণকালি দেবার কথা বলতে না তুমি।

—এ ছাড়া কোনো উপায় নাই রাণী, তোমার বাবা আবার শিগ্গি

বিয়ে করবেন—তাঁর বুড়ো বয়সের বৌ এসে তোমায় অপমান করবে—এটা সইবে না আমার!

—বাবা কি করবে, তা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না—মেয়েটা বললো—বাবার থেকে তুমি আমায় বেশি ভালবাস নাকি? বাবার ভালবাসায় স্বার্থ নেই।

—কেন এ কথা বলছো রাণী?

—বলছি যে আমাকে সত্যি ভালবাসলে অতখানা নীচে আমায় তুমি নামাতে চাইতে না—তোমার সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার কেলেঙ্কারী করতে পারবো না আমি—আর বাবা বিয়ে করলে ধনসম্পত্তি তো আমি পাব না—তখন তোমার ভালবাসা কোথায় থাকবে, আমার জানা আছে: যাও···

মেয়েটাই চলে এল ঘরের মধ্যে। গোবিন্দ তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করতে চায় না, কিন্তু দেখা হয়ে গেল। যেন কিছু শোনে নি, এমনিভাবে বললো—কোথায় গিয়েছিলি মা?

—দূর্ব্বাদির বাড়ী গিয়েছিলাম বাবা—

দূর্ব্বাকে 'দিদি' বলে মেয়েটা; এ পাড়ার অনেকেই বলে তাকে দিদি! কিন্তু গোবিন্দ কন্যার মুখে এই শব্দটা শুনে আজ যেন কেমন ভাবিত হয়ে উঠলো। দূর্ব্বা তার কন্যার দিদি—আর গোবিন্দ সেই দূর্ব্বার প্রতি কি ভাব পোষণ করে অন্তরে! নাঃ—গোবিন্দর মোহ মুদ্গরে প্রহৃত হচ্ছে যেন—নিজকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হচ্ছে ওর! দূর্ব্বা তো সত্যি কন্যাস্থানীয়া, সত্যিই কন্যা!

অকস্মাৎ রাণীর কথাটা মনে পড়ল—"বাবার থেকে তুমি আমায় বেশী ভালবাস নাকি? বাবার ভালবাসায় কোন স্বার্থ নেই, জানো"

সত্যি স্বার্থ নাই। সন্তানকে ভালবাসার উৎসটা স্বতঃস্ফূরিত জীবের

মনে—কামজ নয়, রূপজ নয়, মোহজ নয়—এ ভালবাসা আত্মজ! আত্মা থেকে জন্মায়—উরস থেকে জন্মায়—তাই সন্তান ঔরসজ! কেমন যেন অদ্ভুত ভাব জাগতে লাগলো গোবিন্দর অন্তরে—এতোটা বয়স সে করেছে কি? কি ভেবেছে আর কি করেছে সে! জীবনের হিসাব পরীক্ষা করলে দেখা যায়—অর্থ আর যৌবন অপরিমিত ব্যয় করেছে, সে—অর্জ্জন করেছে শুধু আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা। আধ্যাত্মিকতার ঘরে কাণাকড়িটাও জমা নেই, অথচ দিন প্রায় ফুরিয়ে এল!

গোবিন্দ চঞ্চল পদে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে দাদুর কাছে! উঠলো গিয়ে সটান দাদুর ঘরে। পঞ্চতীর্থ একবার তাকিয়ে বললেন,

—বসো গোবিন্দ, মনে হচ্ছে, তুমি বড্ড মানসিক অশান্তিতে রয়েছ, কি ব্যাপার?

—উদ্ধার করুন আমায়—বলে গোবিন্দ অকস্মাৎ তাঁর পদপ্রান্তে পড়ে চেপে ধরলো পাদুখানা। বিস্মিত, ব্যাকুল চৌধুরী মশায় এই উচ্ছ্বাসের কোন অর্থ খুজে পেলেন না। ধীরে ধীরে গোবিন্দকে তুলে বসিয়ে বললেন,

—উদ্ধার তোমায় আমি কি করবো গোবিন্দ, তুমিই আমার উত্তমর্ণ—ঋণের দায় থেকে কবে উদ্ধার পাব, জানিনে—বৃদ্ধ চাইলেন-গুরুদেবের ফটোর পানে!

—ঋণের দায়! —না, দাদু, ভাড়ার টাকা আমার আর পাওনা নেই—আর···গোবিন্দ অকস্মাৎ আবার দাদুর চরণ ধরে বললো,—আমায় দীক্ষা দিন—এই বাড়ীখানা আমি গুরুদক্ষিণা দেব···আমায় কৃপা করুন প্রভু!

—আমি তো দীক্ষা দিই না গোবিন্দ—ও কাজ কখনো করিনি আমি—

—আমার জন্য করতে হবে—বলে গোবিন্দ আরো জোরে চেপে ধরলো

দাদুর পা দুখানা। মানুষের এই সব দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ নেবার লোক দাদু নন—তিনি বুঝলেন—গোবিন্দের এই উচ্ছ্বাস সাময়িক—। এ বৈরাগ্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ওকে সান্ত্বনার বাণী কিছু বলা দরকার!

—মানুষ জন্ম থেকেই মৃত্যুর পথে এগুচ্ছে গোবিন্দ, এমনি অনন্ত মৃত্যুর মধ্যে জীব চলেছে—সেই মৃত্যুকে বরণ করবার সাধনাই জীবনের সাধনা; নির্ভয়ে নিঃশঙ্কে তাকে গ্রহণ করতে পারলেই জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়—

—সেটা কি ভাবে হতে পারে প্রভু? গোবিন্দ প্রশ্ন করলো।

—সব কামনা-বাসনার উর্দ্ধে নিজেকে বিস্তৃত করতে পারলেই হয়—ধন জন, যৌবন—আয়ু, আরোগ্য, বিজয়—পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক কিছুরই আর যে প্রত্যাশী নয়—সেই সে মহামৃত্যুকে বরণ করতে পারে—সেই পরম মৃত্যুই নির্ব্বাণ, মহা পরিনির্ব্বাণ……

চোখ দুটি জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠলো ওঁর অকস্মাৎ—গুরুদেবের ছবির পানে তাকাচ্ছেন। গোবিন্দ দেখলো সেই মূর্ত্তি। বেশী কথা উনি বললেন না—কিন্তু যতটুকু বললেন, গোবিন্দর যেন তাতেই অপরিসীম তৃপ্তি জাগছে। নিঃশব্দে বসে রইল গোবিন্দ অনেকক্ষণ, তারপর প্রণাম করে উঠে গেল—কোথায় গেল কে জানে!

দূর্ব্বা এসে দাঁড়ালো দাদুর কাছে—ধ্যানস্তিমিত মূর্ত্তিটি কিছুক্ষণ দেখে বলল,

—আজ আমাদের 'পরম-পিপাসা' ছবিখানির মুক্তি দিবস দাদু—যাবে তুমি দেখতে? গেলে আমরা সবাই খুসী হই—ওরা কেউ তোমায় বলতে সাহস করছে না—চলো না দাদু……

দাদু দেখলেন, দূর্ব্বার পেছনে চিন্ময়, বরুণ এবং মায়া দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু গোবিন্দ কৈ! এতো টাকা খরচ করে যে ছবি তোলা হোল, সেটা

দেখাবার জন্য গোবিন্দরই তো অধিক উৎসাহ হওয়া উচিৎ। তিনি প্রশ্নই করলেন,

—গোবিন্দকে দেখছি না যে—কোথায় সে ?

—কৈ, তিনি তো আসেন নি—বরুণ জবাব দিল।

—হ্যাঁ, এসেছিল আমার কাছে—বলে দাদু যেন কি ভাবতে লাগলেন।

—আপনাকে যেতে হবে দাদু—মায়া, বরুণ এবং চিন্ময় অনুরোধ জানাল!

—যাব—বলে একটু হাসলেন তিনি—মানুষের জীবন নিত্য নতুনের অভ্যর্থনা করে; যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ আমার জীবনেই বা সেটা বাদ যাবে কেন? ওপারে যদি কেউ প্রশ্ন করে তো বলতে পারবো, পৃথিবীর সর্ব্বাধুনিক আলোক-চিত্র-বিজ্ঞানও আমি চোখে দেখে এসেছি!

—এরোপ্লেনেও আপনাকে চড়িয়ে দেব দাদু—বরুণ হাসতে হাসতে বললো—ওপারে গিয়ে বলতে পারবেন যে পুষ্পকরথে চড়েছেন!

—দেহরথ জীর্ণ হয়ে গেছে ভাই, ওটায় চড়ে আর অপমৃত্যু ঘটাতে চাইনে—বলে হাসলেন দাদু—আর এটা খুব আধুনিকও নয়—পদার্থ বিজ্ঞানের চরম পরিণতি হবে সেই দিন, যে দিন জড়কে তারা চৈতন্যে আনতে পারবে—কিন্তু এসব কথা থাক এখন—কোথায় শো তোমাদের?

—কাছেই—হেদোর ধারে কলালক্ষ্মীতে—আমরা গাড়ী নিয়ে আসছি!

বলে ওরা সব চলে গেল! শুধু দূর্ব্বা রইল দাদুর কাছে!

—তুই যাবিনে দিদি?

—তোমার সঙ্গে যাব দাদু—বলে দাদুর পায়ে হাত বুলোতে লাগলো।

—দুর্ব্বল হয়ে পড়ছিস দিদি তুই? দাদু সস্নেহে প্রশ্ন করলেন।

—না দাদু—না—বলে দূর্ব্বা যেন নিজকে সম্বৃত করতে চাইল প্রবল শক্তিতে! দাদু সস্নেহে ওর মাথায় হাত দিলেন।

দূর্ব্বা নিশ্চল চোখে চেয়ে রইল দাদুর শুভ্র-সুন্দর পা'দুটির পানে কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে বলল,

—বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না দাদু—আর ব্যভিচার আমার অসহ্য—এ দুটোর উর্দ্ধে কি মানুষের জীবনে আর কিছু নেই ?—

—আছে দিদি—তার নাম প্রেম—অনাবিল, আনন্দময় চিরবিরহ. যে প্রেমরস তোদের নায়িকা কজ্জলীর মুখে উদ্গীত হয়েছে—

'শূন্য নহে মোর শূন্য অন্তর, পূর্ণ বিরহের আর্ত্ততায়—
হে প্রিয় প্রিয়তম, বিদেহী দেহ মম
তোমার দেহতেই মূর্ত্তি পায় !'

—ওতেই হবে দাদু—ঐ কথাগুলিই আমি আশ্রয় করবো—দূর্ব্বা ত্বরিতে উঠে চলে গেল। দাদুর চোখের জল সে দেখতে চায় না।

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনী চলেছে 'পরম পিপাসার'। বরুণ ছাড়া রঞ্জাবতী ফিল্মের আর কেউ যুক্ত নেই এদের কোম্পানীতে, কিন্তু আজ সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। কাটু, নৃপেন, মিঠির তো এসেছেই—সুবর্ণাও এসেছে ছবি দেখতে। 'কলালক্ষ্মী' নামক চিত্রভবনে শো দেখানো হোচ্ছে। ক্ষৌমবাস পরিহিত দাদুকে ঘিরে ওরা সকলেই—শুধু সুবর্ণা আর কাটু একটু দূরে বসে। ছবির পর্দ্দায় তপশ্চারিণী কজ্জলী প্রিয়তম চন্দনের উদ্দেশে অর্ঘ্যাঞ্জলি দিচ্ছে,—

'অনন্তকালের বিরহের বাতি জ্বালিয়ে আমার অভিসার-পথ আলোকিত রাখ প্রিয়তম, দৈহিক মিলনের কজ্জলকালিতে তাকে মলিন হতে দিও না.....'

দূর্ব্বা নিঃশব্দে শুনে উঠে গেল একটু তফাতে। এগুলো তার নিজেরই

অভিনয় করা, শোনবার কিছু নেই, কারা কজ্জলীর ভূমিকায় সেই অভিনয় করেছে। কিন্তু সেকি সত্যি দূর্ব্বা? ঐ অপরূপ বিরহের আনন্দঘন ব্যথা কি সইবার শক্তি সত্যি আছে তার? না— দূর্ব্বা দূরে-বসা চিন্ময়ের পানে চাইল। আধো অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না সে-মুখ—কিন্তু এই রহস্যময়তা যেন আরো ভাল—আরো সুন্দর—আরো মোহময়। ওর কাছে গিয়ে একটু বসবে দূর্ব্বা—"সেখানে বাড়ালে হাতে তোমার আঙুলে ছোঁয়া লাগে"? কিন্তু না—দূর্ব্বা দেখতে পেল—নায়িকা কজ্জলী বলছে—

'আমার জীবনে থাক তুমি প্রিয় বিরহের চির অন্তরালে,—'

না, দূর্ব্বা গিয়ে বসবে না চিন্ময়ের কাছে আর। কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে দূর্ব্বার—কেন এমন হচ্ছে? কেন?

কারণটা অনুসন্ধান করতে চাইল দূর্ব্বা। বুকের ব্লাউজ থেকে বের করলো একখানা খামের চিঠি—প্রেমপত্র নয়, চিন্ময়ের মার লেখা চিঠি, চিন্ময়ের নামেই—কিন্তু দূর্ব্বার খোলার অধিকার আছে। মা লিখেছেন, দীর্ঘদিন চিন্ময় বাড়ী আসেনি—এবার বাড়ী এসে বিয়ে করুক—সুন্দরী পাত্রীও ঠিক করে রেখেছেন তিনি কাছেরই এক গাঁয়ে।

চিন্ময়কে এখনো চিঠিখানা দেয়নি দূর্ব্বা—দিতে হবে, এবং তাকে' মার কাছে পাঠিয়েও দিতে হবে বিয়ে করবার জন্য—কিন্তু দূর্ব্বার কি আর রইলো তারপর?

অকস্মাৎ দূর্ব্বার চোখে অন্ধকার জাগছে—জল এসে গেছে নাকি, চোখে ওর!

* * * *

পরিতৃপ্ত দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসাধ্বনির সঙ্গে দূর্ব্বা বাইরে এল দাদুকে নিয়ে। চিন্ময় তখনো ভেতরে। তার দেরী হবে, কারণ কিঞ্চিৎ

জলযোগের ব্যবস্থা আছে ওখানে। দূর্ব্বা কিন্তু অপেক্ষা করতে পারলো না, দাদুর কষ্ট হবে, এই অজুহাত দেখিয়ে দাদুকে নিয়ে বাড়ী চলে এল—আর সবাই রইল ওখানে।

সুবর্ণা নিঃশব্দেই দেখলো দূর্ব্বার অপূর্ব্ব সুন্দর অভিনয়—উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদ এবং অনস্বীকার্য্য রূপবৈভব; কিন্তু অভিনন্দন গ্রহণ করবার জন্য দূর্ব্বা তো মুহূর্ত্তের জন্যও অপেক্ষা করলো না। সহস্র দর্শক বাইরে দাঁড়িয়ে আনন্দধ্বনির সঙ্গে চীৎকার করছে, দূর্ব্বা দেবীকে তারা দেখতে চায়—শরীরিণী দূর্ব্বাকে - এই সুন্দর নাটকের নায়িকা দূর্ব্বাকে।

চিন্ময় দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাতযোড় করে তাদের সবিনয়ে জানালো, দূর্ব্বা তার বৃদ্ধ দাদুকে নিয়ে বাড়ী চলে গেছে। অপর সব অভিনেত্রী এবং অভিনেতাগণ উপস্থিত আছেন এবং সে স্বয়ং নাট্যকার। দর্শকবৃন্দ যে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি তাদের দিচ্ছেন, নতমস্তকে এঁরা তা গ্রহণ করছেন। বরুণ, মায়া, চিন্ময় ইত্যাদি সকলে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলো ওঁদের। মুগ্ধ দর্শকগণ দূর্ব্বাকে না দেখতে পেলেও খুসী মনে চলে গেলেন অভিনন্দন জানিয়ে!

সমস্ত ব্যাপারটা একধারে দাঁড়িয়ে দেখছিল সুবর্ণা। অনেকদিন পূর্ব্বে অভিনীত 'সতীশ্রী' নাটকের অভিনয়-রজনীর কথা তার মনে পড়লো—মনে পড়লো বরুণের সঙ্গে তার সেদিনের ব্যবহার এবং মনে পড়লো, কি ভাবে দর্শকদের প্রীতি-অভিনন্দন সে গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু দূর্ব্বা তো কিছুই গ্রহণ করলো না; কেন? মানুষের মুক্ত-কণ্ঠের এই আশীর্ব্বাণী—অন্তরের এই প্রীতিধারা না গ্রহণ করবার কী কারণ ঘটেছে? হয়তো সত্যিই দাদুর অসুবিধা হবে, তাই দূর্ব্বা চলে গেল; কিন্তু এতক্ষণ দাদু তো দিব্যি বসেছিলেন, আর পনর মিনিট বসলে কি ওঁর অমন অসুবিধা হোত তাঁর? দূর্ব্বার অত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার

মূলে অন্য কোন কারণ আছে ; কি সে কারণ ?—সুবর্ণা ভাবলো—মানুষের অন্তরের এই প্রীতির উৎস প্রেম নয়, কাম। এই কামনা মানুষকে ধরে রেখেছে মর্ত্যলোকে—কল্পনায়, কলায়, কৃষ্টিতে, কিন্তু এর গতি সলীলধর্ম্মী—নিম্নাভিমুখী। দূর্ব্বার অগ্নিধর্মী মন মৃত্তিকা ছাড়িয়ে উর্দ্ধগতিতে আকাশ পানে যেতে চায়—ক্ষুদ্র দূর্ব্বা, কিন্তু তাতে প্রতিফলিত হয় আকাশের উদার নীলিমা—সাগরের অসীম ব্যাপ্তি !

—সুবর্ণা !—কাটু অকস্মাৎ আঘাত করলো ওর চিন্তাধারায়। চকিত সুবর্ণা বলল,

—কি ? কিছু বলছেন নাকি ? বিরক্তিটা চেপে বলল সুবর্ণা।

—এ ছবি বাংলা দেশ নেবে না। বিশেষ কয়েকজন বুদ্ধিমান দর্শক এর প্রশংসা করে গেলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখে এ ছবি অচল,—লোকে বুঝবে না !

—সাধারণ মানুষের মাথাগুলো আপনার মাথার মতন গোবর ভরা নয়—বুঝলেন ?

সুবর্ণা সরে এল অন্য দিকে খানিকটা। চা পানের আয়োজন হয়েছে ওখানেই দোতালার খোলা বারান্দায়। নিজেদেরই কয়েকজন লোক মাত্র খাবে। গোবিন্দ একধারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে যোড়হাতে—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যেন সে আজ। সুবর্ণা ওখানেই এসে বসলো। ওদিকে কাটু তার বলা কথাগুলোর পরিণতি দেখে কিছু যেন হতাশ হয়েছে। কিন্তু হতাশা তার জীবনে কম। সেও এসে বসল সুবর্ণার পাশের চেয়ারে। সুবর্ণা বিরক্ত হচ্ছে। হঠাৎ মায়াকে দেখতে পেয়ে ডাক দিল—

—মায়াদি—মায়াদি ! তোমার স্বামী বেশ ভাল আছেন তো ?

—হ্যাঁ—এই তো—মায়া তার স্বামীকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল সুবর্ণার সঙ্গে ! বলল,

—তোমার জীবনের জন্য ওঁদের কাছে ঋণী আমি—ইনি আর দূর্ব্বা না থাকলে তোমায় আমি বাঁচাতে পারতাম না।

সবিনয় নমস্কার জানিয়ে সুন্দর লোকটি এগিয়ে এল সুবর্ণার দিকে—মুখে পরিতৃপ্তির হাসি, যেন পত্নীর গর্ব্বে বুকখানা ভরে রয়েছে। ইনি স্বয়ং নর্ত্তক, তাই সুঠাম সুন্দর ভঙ্গী শিবের নটরাজ মূর্ত্তি মনে করিয়ে দেয়।

—মায়া যে কী আশ্চর্য্য ভালোবাসে আপনাকে—ওঃ! পৃথিবীতে এ প্রেম দুর্লভ!

—ও আমার অনাদিকালের স্বপ্নের ধন সুবর্ণা দেবি,—বহু তপস্যায় ওকে পেয়েছিলাম

—কোথায় তপস্যা করেছিলেন?—হাসছে সুবর্ণা কথাটা বলতে বলতে!

—যিনি সবকিছু দিতে পারেন তাঁর কাছে; তুষ্ট হয়ে তিনি বর দিতে এলেন, বললেন, কী তোমার প্রার্থনা বৎস? আমি বললাম—"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্"—হাসতে লাগলো বিলোচন অপূর্ব্ব সুন্দর হাসি!

প্রেমে পরিপূর্ণ এই হাসি সুবর্ণাকে কেমন যেন মোহগ্রস্ত করে তুললো। একটু দূরেই বরুণ, কিন্তু কথাগুলো সে শুনতে পাচ্ছে ওদের! বরুণের কাছে অন্য একটি মেয়ে, নাম রঞ্জিতা; এই ছবিতে কজ্জলীর সখী সেজেছে সে। কিন্তু রঞ্জিতা কোনো কথা বলছে না বরুণের সঙ্গে—চা খাচ্ছে। ওর সীমন্তে সিঁদুর নেই—হয়তো কুমারী, কিম্বা,—যাক্‌গে, কিছুই দরকার নেই ভাববার! বিলোচন পূর্ব্ব কথার রেশ ধরে বলছে তখনো—ও তো শুধু বিয়ে করা বৌ নয়, 'বিবাহের চেয়ে বড়'—কি মায়া, তোমাদের দূর্ব্বা দেবী কি যেন বলেন? মায়াকেই শেষের প্রশ্নটা করলো বিলোচন। মায়া হেসে জবাব দিল,

—দূর্ব্বা বলে না, বলেন রবীন্দ্রনাথ—

বিকশিত বিশ্ব বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার =

—ওটা তো "উর্ব্বশী" কবিতার লাইন! কাটু অকস্মাৎ ধাক্কা দিল কথাটা বলে। এই অরসিকতা এবং অননুভবশক্তি পীড়িত করছে সুবর্ণার সূক্ষ্ম রসানুভূতিকে। কাব্য যেখানে বাক্য এবং ব্যঞ্জনাকেও ছাড়িয়ে আত্মারূপী ধ্বনিতে বিলসিত হয়—সেখানে নামগত কোন কিছু আর থাকে না; সে তখন পিপাসুর রসানুভূতির সুবর্ণময় প্রকোষ্ঠে রসরাজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। কয়েকটা কথার ছটায় কাটু সেদিন সুবর্ণাকে মুগ্ধ করেছিল—হয়তো তার যৌন জীবনের দুর্ব্বলতার দুয়ারে আঘাত করেছিল সজোরে। কিন্তু তাকে অ তক্রম করে মানুষ যেখানে প্রেমের পবিত্রতম মন্দিরে পূজারী, কাটুর সেখানে প্রবেশ নাই! সুবর্ণা করুণ চোখে চাইল স্বামী বরুণের দিকে—বরুণ চোখ নামিয়ে চা খাচ্ছে! সুবর্ণা বলল,

—জীবনকে কাব্যের মত করে পাওয়া মানুষের অতি বড় ভাগ্য বিলোচনবাবু, ঈশ্বর-কৃপায় আপনারা পরস্পরকে পেয়েছেন—সবার জীবনে তো ওটা ঘটে না!

—দূর্ব্বা বলে,—মায়া বললো—আধুনিক মানুষের জীবনে এতো বেশী জটিলতা জেগেছে যে সহজ সুন্দর প্রেমকে আমরা ধরতে পারিনে। উর্ব্বশীর অতি লঘুভার পাদপদ্মতে আমরা ঘোড়ার নাল লাগিয়ে অত্যন্ত ভারী করে তুলেছি। আমাকে যে ভালবাসবে, আমার জটিল মনোবৃত্তি তাকে বিড়ম্বিতই করতে চায়—এ বিষয়েও আমাদের কবি বলেছেন,

'আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার ফিরেছি ডাকিয়া,
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া…'

এই থাকিয়া থাকিয়া দ্বার খোলা যেন আমাদের স্বভাব হয়ে গেছে!

—এর কারণ কি?—সুবর্ণা প্রশ্ন করলো মায়াকে।

—দুর্ব্বা বলে, আধ্যাত্মিকতার ক্ষয়, মানুষের যৌনানুভূতির তীব্রতা, আর—উত্তেজক মনোবৃত্তির অনুশীলন। আবর্জনা বা আগাছা থেকে আরম্ভ করে বহুমূল্য অর্কিড পর্য্যন্ত আজ মানুষের বিলাসের প্রয়োজনে লাগছে, আর তাতে অভাববোধ জাগছে তীব্রতর হয়ে, কিন্তু মনের যে বিপুল প্রসার বিশ্বকে আপনার করে নিতে পারে প্রেমের মধ্যে, তা ক্রমে কমে যাচ্ছে! মানুষের জটিল জীবনের এই দারুণ দুর্দ্দিনে একটি মাত্র বস্তু তাকে রক্ষা করতে পারে—তা হচ্ছে প্রেম, নিষ্কাম এবং নিষ্কলুষ!

—ওসব আধ্যাত্মিক কথায় কোনো লাভ নেই! কাটু বলল—আপনি কি বলতে চান যে এই এ্যাটোম বোমের অতিমানবীয় যুগে মানুষ সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে বুদ্ধের মত, যিশুখৃষ্টের মত, গৌরাঙ্গের মত শুধু প্রেম বিলোবে?

—দুর্ব্বা থাকলে আপনার কথার জবাব আরো ভাল ভাবে দিত, তবু আমিই বলছি,—লাভ কি হয়েছে না জানলেও এটা স্বীকার্য্য যে প্রেম বস্তুটা পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছে! ব্যক্তিতে, সমাজে, রাষ্ট্রে কোথাও আজ আর প্রেম নেই—ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের, পতির সঙ্গে পত্নীর—পুত্রের সঙ্গে পিতার প্রেমও আজ নষ্ট হতে বসেছে। জীবনকে জৈব করবার সাধনায় মেতেছে জগত; এ জীবন জল নয়, জলন্ত মদ্য; জ্বালা করে, তবু লোকে খায়, খেয়ে নর্দ্দমায় গড়াগড়ি যায়, তবু খায়, সর্ব্বস্ব খুইয়ে দেউলে হয়, তবু খায়—কারণ এর জ্বালার আকর্ষণ জৈব, যৌনধর্ম্মী।

—আচ্ছা, আমি দুর্ব্বা দেবীর সঙ্গেই এ বিষয়ে আলোচনা করবো—বলে কাটু উঠে যাচ্ছে, কারণ সে বুঝেছে, এখানে সুবর্ণার সঙ্গে কিছু কথা জমবে না।

—আলোচনা করতে যাবেন না, দুর্ব্বা আপনাকে এককথায় জবাব দিয়ে

দেবে, বলবে, আপনি অব্যাপারী এবং অনধিকারী—অর্থাৎ এ নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামান নি।

—তিনি বুঝি এই নিয়েই মাথা ঘামান ?

—হ্যাঁ—এই তো তার জীবন! 'পরম পিপাসার' লেখক চিন্ময়, কিন্তু ওর সবকিছু দূর্ব্বার—দূর্ব্বা না থাকলে চিন্ময়ের দ্বারা এই বই লেখা সম্ভব হোত না!

—হবে—কাটু চলে গেল। কিন্তু বরুণ এল এগিয়ে। মায়াকেই বলল,

—প্রেম সত্যি চলে যায় নি মায়া, হয়তো যাবে না; তোদের দুটিকে দেখে অন্ততঃ ভরসা হয়—আরো কিছু দিন প্রেম থাকবে এই পৃথীবিতে—চল, তোদের বাড়ী পৌছে দিই—গাড়ীটা খামোকা খালি যাবে কেন!

—খালি যাবে কেন? সুবর্ণা তো রয়েছে!—মায়া স্নেহাস্পদা ভগ্নীর মত ঠাট্টা করলো!

—ওর আলাদা গাড়ী আছে—আয়

—আলাদা কেন?

—ওর সব আলাদা—বরুণ বিলোচনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।

—সব আলাদা নয়, শোনো—সুবর্ণা হুঙ্কার ছাড়লো যেন—

কিন্তু বিলোচনকে নিয়ে বরুণ ততক্ষণে নেমে গেছে। কথাটা শুনতে পেলনা না। মায়া বললো,

—অমন সুন্দর স্বামীকে ও ভাবে কেন আঘাত করো সুবর্ণা! ছিঃ! দূর্ব্বা সেদিন বলছিল—

—কি—কি বলছিল দূর্ব্বা?—সুবর্ণা ত্বরিৎ প্রশ্ন করলো।

—বলছিল যে সুবর্ণা বড় অভাগী। তার অমন রুচিমার্জ্জিত হৃদয় পাকা সত্ত্বেও সেটাকে সে উগ্র মদের বাষ্প দিয়ে আবিল করে রেখেছে—অথচ

অমন সুন্দর একটি লীলাকমল তার রয়েছে, যা দিয়ে সে হৃদয়মুকুর মুছে ঝরঝরে করে নিতে পারে—সেটি ওর খুকী!

—হুঁ! আর কি বললো?

—ও বলে, 'প্রেমহীন যে যৌন-বিলাস, তার মত দুঃখের আর কিছু নেই। বারবধূ কেন এত অভাগী জানিস মায়াদি—সে প্রেম পায় না—পায় একটু দৈহিক আনন্দ আর অনন্ত অবসাদ—যারা তাদের কাছে যায়, তারা আরো অভাগা, কারণ তারা গৃহের উদ্বেলিত প্রেমকে অস্বীকার করে, অপমানিত করেই যায়—গিয়ে নিজেকে একটা তুচ্ছ নারীর লোভের, আর ঘৃণার আর উপহাসের পাত্র করে তোলে—সোনার হরিণ দেখানোর মত এই প্রতারণা, কিন্তু ওদিকে রাজকুলবধূ সীতা হয় অপহৃতা!'—তুমি সামলে যাও সুবর্ণা!

মায়া ধীরে ধীরে চলে গেল, কিন্তু সুবর্ণা চুপচাপ বসে ভাবছে। কতক্ষণ যে ভেবেছে ও, কে জানে, অকস্মাৎ সম্বিত পেয়ে দেখলো, সবাই চলে গেছে; রয়েছে শুধু গোবিন্দ এবং হাউসের জনকয়েক লোক। সুবর্ণা উঠলো।

—যাচ্ছেন?—গোবিন্দ বলল।

—হ্যাঁ—দূর্ব্বার সঙ্গে কি এখন দেখা হতে পারবে, জানেন?

—হ্যাঁ—হবে না কেন? রাত তো মাত্র সাড়ে দশ; যান, দেখা হবে।

সুবর্ণা আর কিছু না বলে নিজের গাড়ীতে উঠলো এসে। কিন্তু গাড়ী সে দূর্ব্বার বাড়ীর পানে চালালো না, গড়ের মাঠের দিকে চালালো। কাটু সঙ্গে নেই—বরুণও নেই—একা সুবর্ণা তার দামী ক্যাডিল্যাকে!

বিরাট, বিস্তৃত মাঠ—শান্ত জ্যোৎস্নায় পরিস্নাত; আকাশের সঙ্গে মাটির মিলন-মহিমা দূর দিকচক্রবালে দেখা যায়। উপরের আলোকলেখা এসে

পড়েছে শ্যামল দূর্ব্বাদলে—ছায়াময়, মায়াময়, মোহময় নবজাগ্রত তৃণাঙ্কুরে শিশিরবিন্দু ঝলমল করছে—যেন সুবর্ণার খুকী !

না—খুকু বরুণের—না-না। দূর্ব্বা বলেছে, খুকু সুবর্ণার হাতের লীলা-কমল, ঐ দিয়ে সে তার হৃদয়-মুকুর পরিষ্কার করে নিতে পারে—সুবর্ণা গাড়ীর গতি হ্রাস করলো !

চার বছর হোল সুবর্ণার বিয়ে হয়েছে বরুণের সঙ্গে ! ওঃ ! কতদিন যেন মনে হচ্ছে। কিন্তু কটাইবা দিন ! চার বছর তো এমন কিছুই বেশী নয়—তার বন্দিনী জীবনের জটিল অনুভূতিই চার বছরকে চল্লিশবছর করে দেখাচ্ছে।

কেন সে নিজেকে বন্দিনী মনে করে ? বরুণ তাকে ভালবাসে,না। কিন্তু সেই কি বরুণকে ভালবাসে ? না ! সুবর্ণা নিজেই নিজের কথার জবাব দিল—রূপজ মোহ বা কামজ দুর্ব্বলতাকে ভালবাসা বলা যায় না—যে রসানুভূতি জীবনের সব দুঃখকে আচ্ছন্ন করেও জেগে থাকে, তাকে বলে ভালোবাসা ; যে প্রেম দেহকে বিক্রয় করেও প্রিয়তমের জন্য কল্যাণভিক্ষু, তাকে বলে ভালবাসা ; যে অনুভূতি হাসির ঝলকে দেহমনকে জ্বালাময় করে তোলেনা—অন্তরকে ক্রন্দনাতুর করে তোলে দুঃখের নিবিড় আনন্দরসে, তাকেই বলে ভালোবাসা—যা সে মায়ার জীবনে দেখেছে !

সুবর্ণার হৃদয়ে কোথায় সেই প্রেম—কোথায় তার রুচিমার্জ্জিত অন্তরে প্রেমসুন্দরের অমর্ত্ত্য মূর্ত্তি ?

গাড়িতে আবার জোর গতি দিল সুবর্ণা—বাড়ী যাবে ; বরুণের বাড়ী—না—খুকীর বাড়ী—না—বাড়ীটা এখনো শাশুড়ীর !

চৌরঙ্গীর চওড়া রাস্তাটা ফাঁকা পড়ে আছে, সোজা দেখা যাচ্ছে ! একটা তিনতলা বাড়ীর ঝোলাবারান্দায় এক দম্পতী পরস্পরকে জড়িয়ে ; ওরা কি যেন কথা বলছে—!

—উঃ! এখুনি এ্যাকসিডেণ্ট বাধাতো সুবর্ণা—একখানা ডবল-ডেকার বাস বিপরীত দিকে চলে গেল—সুবর্ণা তখন ঐ দম্পতীকে দেখছিল! ঐ বাসখানা তার গাড়ীতে পড়লে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো সব—সুবর্ণাও। বেশ হোত, পুলিশ আসতো, অসংখ্য লোক আসতো, বরুণও আসতো হয়তো, দেখতো, সুবর্ণার সোনার দেহ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ-বর্ণা সুবর্ণা মেঘবর্ণা হয়ে গেছে—কালো—স্নিগ্ধ, শান্ত—মৃত্যু-শীতল।

গভীর রাত; চিন্ময় সিনেমা-হাউস থেকে এই মাত্র ফিরলো। খবরের কাগজের জন্য রিপোর্ট ইত্যাদি লিখতে দেরী হয়ে গেছে; এবার জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে শোবে—অকস্মাৎ ঝটিকাগতিতে ঘরে এসে দাঁড়ালো দূর্ব্বা।

উজ্জ্বল, বিদ্যুতালোকে স্থির সৌদামিনীবৎ তার দেহকান্তি—মায়াময়ী মোহময়ী, মদিরময়ী! চিন্ময় এ বেশে, এভাবে, এমন সময় কোনদিন দেখেনি দূর্ব্বাকে। একি রূপ! অতুলনীয়, অবর্ণনীয়,—কিন্তু দূর্ব্বার রূপ যেন আজ সংযমের শতবন্ধনে অনুগ্র নয়—সহস্র আহুতিতে অগ্নিময়!

চিন্ময় দেখলো মুহূর্ত্তের জন্য—তার পুরুষ অন্তর এই অত্যাশ্চর্য্য রূপশিখায় পতঙ্গবৎ আত্মাহুতি দিতে চায়—কিন্তু···ঠনঠনে কালীতলার চতুর্ভুজা মূর্ত্তির চরণে স্তূপীকৃত প্রতিজ্ঞা মনে পড়ছে, চিন্ময় একটু পিছিয়ে দাঁড়ালো—খোলা পাঞ্জাবীটা রাখতে গেল র‍্যাকে ঝুলিয়ে—ঐ অবসরেই বলল,

—শোও নি কেন এখনো? আমি তো ওখানেই খেয়েছি। এক গ্লাস জল ছাড়া আর কিছু খাব না!

—শোন—দূর্ব্বা ওর হাত থেকে নিয়ে বললো,—কথা আছে, খুব জরুরী কথা—পাঞ্জাবীটা র‍্যাকে রাখলো দূর্ব্বাই।

প্রদীপ্ত যৌবনের প্রখর দীপ্তি চিণ্ময়ের চোখ ধাঁদিয়ে দিচ্ছে। কামনার অগ্নিতে পুড়ে যাচ্ছে ওর দেহস্তূপ, মনের মধ্যে চলেছে শত বজ্রের ঝঞ্ঝনা কিন্তু চিণ্ময় তখনো ভাবছে, একি অবস্থা দূর্ব্বার! কেন সে এল এমন করে? কী সে করতে চায় চিণ্ময়কে নিয়ে?

—কি কথা দূর্ব্বা! কি এমন কথা যে এই রাত্রেই বলতে হবে?

—রাত্রেই তো গোপন কথা বলতে হয়!—হাসলো দূর্ব্বা—অমোঘ আকর্ষণের হাসি—সৌরমণ্ডলের মাধ্যাকর্ষণ যেন সে হাসিতে, যার প্রচণ্ড শক্তি অনন্ত গ্রহ উপগ্রহকে ঘুরিয়ে চলেছে অবিশ্রাম অপরিমেয় গতিতে! চিণ্ময়ের বিছানার চাদরখানা ঝেড়ে পেতে দিল—বালিশ ঠিক করতে করতে বলল,

—তোমার ফুলশয্যা রচনা করে দিই—আবার সেই হাসি!

দূর্ব্বা কি অসুস্থ হয়ে পড়েছে? অথবা—? চিণ্ময় দেখতে পেল, ওর সমস্ত দেহলতা কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় আবেগে থরকম্পিত! বক্ষবাসের রক্ষণশীলতা বিদীর্ণ করে স্তনাগ্র-চুড়ার কমনীয় মাধুর্য্য স্বমহিমায় বিলসিত হচ্ছে—যৌবনের জৈব আহ্বান—সৃজনের আদিতভূত ইঙ্গিত। মুগ্ধ চিণ্ময় আত্মবিস্মৃত হতে হতে আত্মসম্বরণ করছে—অতি কষ্টে বলল,

—জীবনের চলার পথেই আমরা পরস্পরকে সাহায্য করছি দূর্ব্বা, ফুলবাসরে তো নয়—সেখানে তো বিশ্রামের স্থান—চলবার দরকার হয় না সেখানে—যাও, শোও গে।

—প্রতিজ্ঞাটা মনে আছে তাহলে!—দূর্ব্বা এগিয়ে এসে দাঁড়ালো চিণ্ময়ের বুকের কাছে—ওর দেহ-সৌরভের সঙ্গে দেহের উষ্ণ উত্তাপটাও, যেন লাগছে চিণ্ময়ের অঙ্গে!

নিবিড় নিস্তব্ধ রাত্রির নর্ম্মসঙ্গিনী—নরের চির কাম্য নারী—চিণ্ময় ব্যাকুল হয়ে সরে এল হাতখানেক—অতি কষ্টে উচ্চারণ করলো,

—দূর্ব্বা !

—অাঁ্যা ? কি ?···বলো ! অপরিম্লান হাসি স্তবকে স্তবকে ঝরছে, যেন শিশিরাঘাত-তাড়িত বৃন্তচ্যুত শেফালীকুসুম !

—তুমি প্রকৃতিস্থ নেই দূর্ব্বা !—নিজেকে অসীম বলে সম্বরণ করে চিণ্ময় বলল কথাটুকু ! তার সৃজন-বাসনা পূর্ণ মন একথা বলতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু অন্তরের অন্তরতম যে প্রকোষ্ঠ, সেখানে দূর্ব্বা তো কামনাময়ী নারী নয়, প্রেমময়ী দেবী—প্রাণময়ী মানসী—চিণ্ময়ীর শক্তিমূর্ত্তি !

—আমি সত্যি তোমাকে অতি গোপন একটা কথা বলবো চিণুদা—দূর্ব্বা বলল।

—না—আজ থাক, এখন থাক—যাও, শোওগে—চিণ্ময়ের মুখ শুকিয়ে গেছে আবেগে—অধিরতায়—তবু সে বলল এই কথা।

—চিণুদা—! দূর্ব্বার কণ্ঠে যেন চক্রবাকীর চঞ্চল আহ্বান—চটুলা, চপল, চিত্তহরী—হাসিটা আরো মধুর হয়ে উঠেছে ওর।

—ক্ষমা কর দূর্ব্বা, এ পরীক্ষার খেলা তোমার বন্ধ কর ! আমি মানুষ, আমায় তুমি রিপুজয়ী শিব করবার কল্পনা ত্যাগ কর দূর্ব্বা—দোহাই তোমার !

চিণ্ময় অকস্মাৎ দূর্ব্বার পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে পড়লো।

—ছিঃ চিণুদা, তুমি এতো কাপুরুষ ! দূর্ব্বা যেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে !

—তোমার কাছে পৌরুষের অহঙ্কার আমার নেই দূর্ব্বা—আমি নিতান্তই মানুষ—এ প্রলোভন আমি সামলাতে পারবো না।—তুমি ভেতরে যাও !

—যাচ্ছি—যাও, শোও গে—দূর্ব্বা হাত দুই সরে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। এবার চলে যাচ্ছে দূর্ব্বা, কিন্তু চিণ্ময় দেখতে পেল,

জোয়ার-জাগা সমুদ্রের মত দূর্ব্বার বুকখানা দুলে দুলে উঠছে—ঠোঁট দুটো কাঁপছে তখনো! ক্ষীণ কণ্ঠে চিন্ময় বলল,

—তোমার দেহ থেকে তোমার আত্মাকে আমি অধিক ভালোবাসি দূর্ব্বা!

—জানি—হাসলো দূর্ব্বা এবার স্বচ্ছ, সুন্দর অপরিম্লান হাসি!

—তুমি আর মানুষ নেই চিনুদা, মদন-বিজয়ী শিব হয়েছ—যাও, বাড়ী গিয়ে বিয়ে করে এসো—মা ডেকেছেন!

দূর্ব্বা বুকের ব্লাউস থেকে চিঠিখানা বের করে ফেলে দিল চিন্ময়ের কোলে—তারপর চলে যাচ্ছে!

—বিয়ে!—চিন্ময়ের কণ্ঠে আর্ত্ততা!

—হ্যাঁ—বিয়ে। কেনো?—হাসলো দূর্ব্বা আবার!—আঁৎকে উঠলে যে?

—দেহগত কামনার ঊর্দ্ধে আমার জীবনে তোমার আসন দূর্ব্বা—কিন্তু আমি দেহজীবনের বাইরে নই—আমি দেহী। কিন্তু তোমার বর্ত্তমান হৃদ্যের আত্মসমর্পণকে আমি অস্বীকার করতে বাধ্য হলাম, কারণ ওভাবে তোমাকে গ্রহণ করা আর নিজকে তোমার অন্তর থেকে চিরনির্ব্বাসিত করা একই কথা—সে বেদনা আমি সইতে পারবো না, দূর্ব্বা!

—সইতে হবে না। আমার অন্তরে তোমার আসন চিরপ্রতিষ্ঠিত রইল, চিনুদা—শোও গে—চলে যাচ্ছে দূর্ব্বা!

—অন্যত্র বিয়ের আদেশ প্রত্যাহার কর দূর্ব্বা!—চিন্ময় সামনে এসে বলল।

—আদেশটা আমার নয় মা'র—সেটা পালন করা তোমার কর্ত্তব্য। আমার বাইরের জীবনের মত মনের জীবনেও তুমি সঙ্গী রইলে—তোমারও মনে রইলাম আমি—এবার থেকে মনের জীবনের পথেও আমাদের পরস্পরকে সাহায্য করে চলতে হবে!

—দূর্ব্বা !

—আর কথা নয়—জল খেয়ে শোও গে, যাও—মনে রেখো, শিব ঐভাবেই পার্ব্বতীকে চেয়েছিলেন ! আত্মায় আত্মায় সে মিলন অপার্থিব, লোকোত্তর !

দূর্ব্বা চলে গেল। উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোকে একা দাঁড়িয়ে চিণ্ময় ! মৃত্যুপাণ্ডুর মুখে ওর এতোটুকু রক্ত নেই, নেই কোন ভাবব্যঞ্জনা ; ও যেন পাথর হয়ে গেছে। ভাবতে পারছে না, কি কথা হোল তার দূর্ব্বার সঙ্গে—জটিল কি যেন জীবন-পথের কথা !

কোনো রকমে আলোর সুইচটা ঠেলে দিয়ে চিণ্ময় বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়ল—মার চিঠিটা মেঝেতেই গড়াচ্ছে বাতাসে !

আর দূর্ব্বা ! নিজের ঘরটায় এসে নিশ্চুপে শুয়ে পড়লো ! নিরন্ধ্র অন্ধকার ওকে আবৃত করে আছে—অতলস্পর্শ অন্ধকার, মার স্নিগ্ধ সুগন্ধী কোলের মত অতলগর্ভ—কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ ওর ফুলে ফুলে উঠছে বেদনার ঘনীভূত আবর্ত্তে—অভাগী নারীহৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণা ! আর্ত্তকণ্ঠে শুধু বললো—জাগো, প্রেমের দেবতা, আমার দেহ-মনকে অতিক্রম করে অন্তর-দেউলে প্রেম-সুন্দররূপে জেগে ওঠো……

* * * *

গোবিন্দ তার উকীল বাড়ী থেকেই উইল লিখিয়ে এনেছে। সিনেমা কোম্পানীর আয়রণ-সেফে রেখে দিয়েছে, আর দূর্ব্বার হাতে দিয়েছে তার চিঠি। বলেছে,

—"বিশেষ মূল্যবান দলিল একখানা ওখানে রইল—দূর্ব্বা যেন সকালে দেখে !" ঐ দলিলে সে তার যাবতীয় সম্পত্তি সন্তানদেরই দিয়েছে, শুধু দূর্ব্বাদের বাড়ীখানা আর সিনেমা-কোম্পানীর শেয়ারের সমস্তটাই দাদুর নামে দান করেছে—গুরুদক্ষিণা।

ছোট একখানা চিঠিতে লিখে রেখেছে, রাত্রি শেষ হবার পূর্ব্বেই সে বহুদূরে চলে যাবে—দূর্ব্বা যেন মেয়েটার বিয়ে দিয়ে তাকে সুখী করে—গোবিন্দ এবার বৃন্দাবনবিহারী গোবিন্দর সন্ধানে চললো !

* * * *

বাড়ীখানা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। শুধু উপরে বরুণের ঘরে আলো জ্বলছে। গাড়ীখানা নিঃশব্দে থামিয়ে সুবর্ণা শুনতে চাইল, কে যেন কথা বলছে।

এমনি জ্যোছনা রাতে, ঘুম নিয়ে দুটি হাতে
কে সে এসে বলে—'খুকু ঘুমা।'
রাতচরা পরী আসে, খুকুদের ভালবাসে
গালভরে দিয়ে যায় চুমা !'

সুবর্ণা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উঠে গেল উপরের ঘরে। বরুণ খুকুকে ঘুম পাড়াচ্ছে ! শয্যাগৃহের স্নিগ্ধ নীলালোক মায়াময় করে রেখেছে কক্ষটাকে। কিন্তু এ ঘরের দরজা বন্ধ। সুবর্ণা তার নিজের শোবার ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়লো—শুনতে পাচ্ছে বরুণের কণ্ঠ,

আকাশপরী, পাতালপরী, আলোর পরী—আয়,
আমার খুকু ঘুমিয়ে যাবে ফুলের বিছানায়···

—একা তোমার নয়—ওটাতে আমারও ভাগ আছে—বলে সুবর্ণা অকস্মাৎ মাঝের পর্দাটা ঠেলে এঘরে এসে দাঁড়ালো। উত্তেজনায় সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে ওর। বলল—আমার সবই আলাদা, বলে তো এলে, কিন্তু কথাটা সত্যি নয়—ওইটাতে আমার অংশ আছে !

—না সুবর্ণা !

—চুপ করো—সুবর্ণা সম্রাজ্ঞীর মত আদেশ করলো যেন। বললো যে নিজের বিয়ে করা বৌয়ের ভালবাসা আদায় করতে পারে

না, সে পুরুষ তো নয়ই, মানুষও নয়। খুকুর বাবা হ'তে হলে খুকুর মাকে মাটির তলা থেকে তুলে আনতে হয় প্রেমের আকর্ষণে—সূর্য্যের যে-প্রেম পদ্মিনীকে তোলে জলতল থেকে!

—সুবর্ণা!···বরুণ বিস্মিত হয়ে উঠে বসলো!

—থামো! আমি আজ আমার দাবী জানাতে এসেছি! কোন্ অধিকারে একাই তুমি ওকে ভালবাসবে—আমাকে বঞ্চিত করবে কেন তুমি···?

সুবর্ণার চোখ জ্বলছে জলভারে। নীল আলোটা প্রতিফলিত হয়েছে চোখে ওর; যেন বারুণী রূপসীর নয়নে মুক্তাফল। বরুণ আস্তে বলল,

—তুমি বড় উত্তেজিত আছ সুবর্ণা, শোও গে!

—না—শান্ত স্নিগ্ধ দূর্ব্বা নই আমি, আমি সুবর্ণময়ী বিদ্যুৎ, অবিরাম চাবুক চালাই আমি আমার প্রিয়তমের বুকে—সহ্য করবার শক্তি না থাকে তো সে জলের দেবতা বরুণ-মেঘ আমায় বিয়ে করেছিল কেন?—বলো—জবাব দাও!

সুবর্ণা ঝটিকা গতিতে এসে পড়ল বরুণের বুকের উপর রূপের বিদ্যুৎকশাঘাত! বরুণ ধীরে ধীরে ওকে ধরে শুইয়ে দিয়ে বলল,

—সব অপরাধের বোঝা আমি একাই নিলাম সুবর্ণা—আজ সত্যি আমার ঝড় এলে। ঘুমুও, ঘুমিয়ে যাও, তোমার চাবুক এবার সইতে পারবে।

সুবর্ণা নিঃসাড় পড়ে রইল স্বামীর বুকের কাছে মুখ গুঁজে! খুকীটা বাবার গায়ে বা পা আর মার গায়ে ডান পা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

চিরন্তন প্রেমের চিরনূতন সেতু!